[illegible]ক পত্র ও সমালোচন।

দ্বাবিংশ খণ্ড—১৩১১

শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী সম্পাদিত।

কলিকাতা,

৩০/৫ মদন মিত্রের লেন, নব্যভারত-প্রেসে,

শ্রীভূতনাথ পালিত দ্বারা মুদ্রিত ও ২১০।৪ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে

সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত।

চৈত্র—১৩১১।

মাসিক পত্র সমালোচন।

দ্বাবিংশ খণ্ড—১৩১১।

সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা প্রকৃতির ললাটে নবভানুর নব কিরণ-ছটা—এক অপূর্ব্ব শ্রী। প্রকৃতির সকল জ্ঞান বিজ্ঞান, সকল সৌন্দর্য্য ঐশ্বর্য্য, সকল বিভব সম্পদ ঐ রশ্মি হইতে;—কি অপরূপ শ্রী! সূর্য্য যেমন প্রকৃতির শ্রী, তেমনি রমণীর শ্রী সতীত্ব, পুরুষের শ্রী বীর্য্য, বালকের শ্রী সরলতা, যুবতীর শ্রী পবিত্রতা এবং জাতির শ্রী ভাষা। সূর্য্য-শূন্য প্রকৃতি, সতীত্ব-শূন্য রমণী, বীর্য্য-শূন্য পুরুষ, সরলতা-শূন্য বালক, পবিত্রতা-শূন্য যুবতী যেমন শ্রীহীন, ভাষা-শূন্য জাতিও, তেমনি, শ্রীহীন। ভাষাই জাতির জীবনী শক্তি। জাতির সকল উন্নতির মূল ভাষা। ভাষা জাতির অপূর্ব্ব শ্রী।

পৃথিবীর সকল জাতির উন্নতির ইতিহাস অভিনিবেশ সহ পাঠ করিলে ইহাই প্রতিপন্ন হয়, ভাষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জাতির উত্থান এবং উন্নতি হইয়াছে, এবং ভাষার অবনতির সহিত জাতির মহা পতন হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষার যখন শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, প্রাচীন আর্য্যজাতি তখন পৃথিবীর পূজ্য ছিল; যখন লাটিন ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, তখন রোম জগতের পূজ্য ছিল। ভাষা—জাতীয় অভ্যুদয়ের মূল বীজ। ভাষা—প্রতিভা-বিকাশের আনুপ্রাণনী শক্তি। যে জাতির ভাষা নাই, সে মূক জাতি চিরমৃত।

প্রাচীন ভাষা কোন্ সোপান অতিক্রম করিয়া এ দেশে উপনিষৎ, গীতা, বেদান্ত-দর্শন প্রসব করিয়াছিল, তাহার ধারাবাহিক ইতিহাস অন্ধকারে আচ্ছন্ন, কল্পনা-বিজড়িত, মন্তব্য, অনুভূতি এবং টিপ্পনী-সমন্বিত। কিন্তু যে সোপানই অতিক্রম করুক না কেন, উপনিষৎ, গীতা, বেদান্ত-দর্শন এদেশে যে প্রতিভা-উন্মেষের চির-সহায় রূপে চিরপ্রদীপ্ত, একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। "যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই জগতে," এই কথার মধ্যে যে কত গভীর অমূল্য সত্যবীজ লুক্কায়িত রহিয়াছে, যাঁহারা ঐ সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই তাহা অবগত আছেন। কত গভীর তত্ত্ব ঐ সকল গ্রন্থে কি রহিয়াছে। কিন্তু তবুও এ জাতি না কেন? ভাষা ত ছিলই,—এ তবুও মরণের পথে ধাবিত হইল কেন

প্রতিভা, প্রতিভাকে জাগরিত

ইহা চির সত্য বটে, কিন্তু প্রতিভা জড়কে কখনও অনুপ্রাণিত করিতে পারে না। প্রাচীন সাহিত্যে যে সকল অমানুষী প্রতিভা-স্ফুরণ হইয়াছিল, তাহা জড়ত্ব-দশাগ্রস্ত নরনারীর প্রাণে জীবনী শক্তি আনয়ন করিতে অক্ষম হইয়াছিল। যে সকল মহাজনেরা প্রতিভায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সাধারণ-জন শ্রেণীর এত উপরে উঠিয়া গিয়াছিলেন যে, তাঁহারা আর সাধারণের প্রাণ স্পর্শ করিতে পারিয়াছিলেন না। সাধারণ-জন-চিত্ত খ্রীষ্ট-মহত্ত্ব ধারণায় অসমর্থ ছিল বলিয়া খ্রীষ্টের যেরূপ হতাদর হইয়াছিল,সেইরূপ, আমাদের আর্য্য-ঋষিগণের মহত্ত্বেরও হতাদর হইয়াছিল। হতাদরের জন্যই তাঁহাদের অমূল্য উপদেশ সকল সাধারণের জীবনকে উন্নত করিতে পারিয়াছিল না। অনুপ্রাণন ত দূরের কথা, তাঁহারা সাধারণকে স্পর্শ করিতেও পারিয়াছিলেন না। তাঁহারা জীবিত থাকিয়াও সাধারণের নিকট যেন মৃতবৎ ছিলেন। তাঁহাদের নির্জ্জন সাধন বা গহন বনে বাস এ সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে ক্রমে ক্রমে আরো দূর-বর্ত্তী করিয়াছিল। তাঁহারা উপরে উঠিয়া গেলেন, সাধারণ-শ্রেণী নিম্ন হইতে আরো নিম্নে অবতরণ করিতে লাগিল। উচ্চ এবং নিম্নের যোগ-রজ্জু ছিন্ন হইল,—সুতরাং উপরকার মহাজনদিগের জীবিত কালেই কতক এবং তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই আর্য্যজাতি আরো অধঃপতনে ডুবিয়া গেল। তাঁহারা গেলেন, তাঁহাদের উত্তরাধিকারীও জাতিকে জাগাইবার জন্য রহিল না, সুতরাং জাতি ক্রমেই ডুবিতে লাগিল। যদি তাঁহারা বংশানুক্রমে সাধারণের মধ্যে জীবিত থাকিতে পারিতেন, জীবিত থাকিয়া নব-জীবনের সঞ্চার করিতে পারিতেন, তবে, বুঝিবা, এ জাতির এত অধঃপতন হইত না।

এ জগতের যত শ্রীবৃদ্ধির ইতিহাস পাঠ কর, এ সিদ্ধান্তে তোমাকে আসিতেই হইবে যে, উচ্চ এবং নিম্নের যোগ-রজ্জুর শিথিলতার জন্যই, জাতির ললাটে ভাষার শ্রী থাকা সত্ত্বেও, এ জগতের অসংখ্য জাতির পতন হইয়াছে। ভাষাবিৎগণ জীবিত থাকিয়াও যেন মৃতের ন্যায় ছিলেন। মরিয়াও মানুষ জীবিত থাকিতে পারে, জীবিত মানুষও মৃতের ন্যায় থাকিতে পারে। গিল্টির বাজারে সাচ্চার আদর হয় না, নিম্ন-শ্রেণী চাকচিক্যে ভুলিয়া যায়, গভীরতার মর্ম্ম বুঝে না। সুতরাং নিম্ন শ্রেণীর জীবনে তাঁহারা জীবিত থাকেন নাই—জীবিত কালেও না, মৃত্যুর পরেও না। কাজেই মহতের প্রতিভা, এদেশে, সাধারণের প্রাণে তেমন স্ফুরণ আনয়ন করিতে সমর্থ হয় নাই। যখন উচ্চ ও নীচে একপ্রাণতা জন্মে, তখন এক তন্ত্রীতে আর এক তন্ত্রী বাজিয়া উঠে; এক হৃদয় আর এক হৃদয়ে বীর্য্য সঞ্চার করে। ভল্টেয়ার, রুশো, ম্যাট্‌সিনির লেখনী, এই জন্যই, এ জগতে অসাধ্য সাধন করিয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছিল। তাঁহারা চিরকাল সাধারণের ভিতরে নব-জীবনের সঞ্চার করিতে জীবিত থাকিবেন।

যাঁহারা অন্যের জন্য জীবন ধারণ করেন, অন্যকে উদ্ধার করা যাঁহাদের জীবনের ব্রত,—অন্যের জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইতে যাঁহারা একটুও কুণ্ঠিত হন না, তাঁহারা, কি জানি কেন, শত সহস্র হৃদয়ের নব-অভ্যুদয়ের কারণ হন। তাঁহাদের প্রাণ যেন সহস্র প্রাণে অনুপ্রাণিত,—এক হৃদয়ে সহস্র, কোটি

হৃদয় নিমজ্জিত। তাঁহারা জীবিত কালেও শত সহস্রের, মৃত্যুর পরেও শত সহস্রের। সাহিত্য যখন কামনা-রহিত, বাসনা-বর্জ্জিত, সাহিত্য তখন জগতের আপামর-সর্ব্ব-সাধারণের সম্পত্তি। যে সাহিত্য কোন কামনাকে সম্মুখে রাখিয়া বাঁচিতে চায়, কামনার তিরোধানের সহিত সে সাহিত্যের মৃত্যু আসিবেই আসিবে; সে সাহিত্য সেবীদের তিরোধানে তাঁহাদের সাধের সাহিত্য-বীণা নীরব হইবেই হইবে। কিন্তু যে সাহিত্য কিছু চায় না, কেবল মানবের মঙ্গলের জন্য সৃজিত, রচিত, কল্পিত, সে সাহিত্য অনন্ত কাল মানব প্রাণে স্ফুরণ তুলিতে থাকে। চিরকাল সে বীণা, মধুর তানে বাজিয়া বাজিয়া, মানবের হৃদয়কে তোলপাড় করিতে থাকে।

যাহার প্রাণে জ্ঞান-ভক্তির অঙ্কুর নাই, জ্ঞানী ও ভক্তের কথা শ্রবণে তাহার প্রাণে কোন তরঙ্গ উঠে না। নিউটনের গভীর জ্ঞানের কথা পাঠে একজন কৃষকের কোনই পরিবর্ত্তন হয় না। রামায়ণ মহাভারত সহস্র সহস্র লোকে কত কত শতাব্দী ধরিয়া শুনিয়া আসিতেছে, কই কাহারও তেমন কোন পরিবর্ত্তন হয় না কেন?—উহাদের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় যে সকল অমূল্যসত্য অঙ্কিত রহিয়াছে, সাধারণের মধ্যে তাহা ধারণার অঙ্কুর নাই বলিয়া। অথবা সেই সাহিত্যসেবীদিগের জীবন তাঁহারা সাধারণের মধ্যে চালিয়া দিয়া যাইতে পারেন নাই বলিয়া। অথবা সেই সকল মহাসত্যকে জীবন্ত ভাবে কেহ শুনাইতে পারিতেছেন না বলিয়া। অথবা তাঁহারা যাইবার সময় অন্যের উপর ভারার্পণ করিয়া যান নাই বলিয়া। মৃতের প্রাণে কোন অমূল্য কথা কোন পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে পারে না। সেই সকল কথা জীবনগত করিয়া কেহ যদি প্রচার করিতে পারিত, তবে এ জাতির এত অধঃপতন হইত না। যাহার মধ্যে যে অঙ্কুর নাই, সে অঙ্কুর যদি কেহ গজাইয়া দিতে পারিতেন, তবে এ জাতি এত অধঃপতিত হইত না।

বিধাতার সৃষ্টি সাম্যময়। উন্নতির বীজ সকলের মধ্যেই ছিল, কিন্তু তাহা কুসময়ে, অবহেলায়, অনুশীলনের অভাবে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বপ্রকার উন্নতির জীবনীশক্তির অঙ্কুর লইয়া ভ্রূণ ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, কিন্তু তাহার সে সকল অঙ্কুর অনুশীলনের অভাবে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। উর্ব্বর ক্ষেত্র দেখিয়া কৃষক বীজ বপন করিয়াছিল, কিন্তু কতক উষ্ণ বায়ুতে নষ্ট হইল, কতক জলাভাবে মরিল, কতক পাখীতে খাইয়া ফেলিল। আমাদের প্রতি জনের হৃদয়ে বিধাতা যে বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহার কতক রাজা, কতক সমাজ, কতক পিতামাতা নষ্ট করিয়া ফেলিলেন; বড় হইয়া দেখিলাম, অন্যান্য জাতির তুলনায় কত হীন হইয়া কত নীচে পড়িয়া রহিয়াছি। এইরূপে সমান দান পাইয়াও মানুষ বিচিত্রতার পথে নীত হইতেছে। এক সময়ের দশটী সন্তান দশ রকম হইতেছে। কেহ ভক্ত, কেহ কর্ম্মী, কেহ জ্ঞানী, কেহ বা পশু। বৈষম্য মায়ের বিধান না হইলেও, কর্ম্মক্ষেত্রে ছুটিয়া ছুটিয়া, সকলেই সাম্যহারা হইতেছি;—কাহারও সহিত কাহারও মিল নাই। একপ্রাণতা—জগতে যেন দিন দিন অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। একের কথা অন্যে বুঝে না। একের ভাবে অন্য অনুপ্রাণিত হয় না। আমি বলি এক কথা, তুমি শুন আর এক কথা, তুমি ধারণা কর আর এক

কথা। একটী ফল আমি দেখি এক প্রকার, তুমি দেখ অন্য প্রকার। আমার প্রাণ, তোমার যোগ্য কথা বলিতে পারিতেছে না। তোমার প্রাণ যাহা চায়, আমি তাহা তোমাকে দিতে পারিতেছি না। চলিয়া—চলিয়া—চলিয়া, তুমি এক পথে যাইতেছ, আমি আর এক পথে যাইতেছি। ক্রমে ক্রমে—ব্যবধান ও পার্থক্য বড়ই বাড়িয়া যাইতেছে। অবশেষে অনন্তের এ কোন্ অমিলনের রাজ্যে আসিয়া পৌছিলাম? বিধাতা আমাদের মধ্যে যে সাম্যের বীজাঙ্কুর ঢালিয়া দিয়াদিলেন—ক্রমে ক্রমে এইরূপে সে সব হারাইয়া ফেলিয়াছি। এখন হাজার অন্বেষণ করিয়াও, তোমার আমার একপ্রাণতার রজ্জু খুজিয়া পাইতেছি না। কত মানব পরিবার, কত জাতি, কত সম্প্রদায়, এইরূপে, মিলনের ভূমি পরিত্যাগ করিয়া অগারত্বের ক্রীড়ায় মাতিয়া মাতিয়া পৃথক পৃথক হইয়া বেড়াইতেছে। যে চৈতন্য মিলনের ভূমি, আমরা যেন সে চৈতন্য হারাইতেছি; যে জ্ঞান-প্রেম-পুণ্য ভক্তিতে মিলনের বীজাঙ্কুর, আমরা তাহা হারাইয়াছি। তোমার কথায় আমি জাগিব, কিম্বা আমার কোথায় তুমি জাগিবে, সে আশা এখন কোনরূপেই করা যায় না।

আমি সাহিত্যের চর্চ্চা করি, জাতীয় ভাষার অনুশীলন করি, কিন্তু কি জন্য করি? নিজের জীবন-ধারণের অর্থ সংগ্রহের জন্য, না আর কিছুর জন্য? সাহিত্যসেবা কি ব্যবসাদারী? ব্যবসার আর কত উপায় আছে, সাহিত্য লইয়া ব্যবসা করিয়া মরিতে আসিলাম কেন? কত কত লোক সাহিত্যের ব্যবসা করিয়া ডুবিয়াছে, তাহা কি জানি না,—তাহার ইতিহাস কি জগতে অলিখিত আছে? তবে আবার সে আয়োজন কেন? সাহিত্য-সেবায় অর্থ পাইব না, যশ না—মান না,—কিছুই না; পাইব—কেবল উপেক্ষা, হতাদর, বিদ্বেষ, নিন্দা, গ্লানি, তিরস্কার। যদি নিন্দা, গ্লানি, তিরস্কারকে অঙ্গের আভরণ করিতে না পারেন, কেহ যেন সাহিত্যের পথে বিচরণ করিতে আসেন না। পানীয় জলের কষ্ট-নিবারণ-কল্পে পুকুর কাটিতে গেলেই কাদা মাখিতে হইবে। জাতির উদ্ধারের জন্য কেহ যদি নিষ্কাম সাহিত্য-সেবা-ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহাকে কষ্টের বোঝা মস্তকে বহন করিতে হইবেই হইবে। প্রথম কষ্ট—কেহ তাঁহার কথা বুঝিবে না;—এক কথা বলিলে, লোকে অন্যরূপ বুঝিবে; কেন না, সকলে বিভিন্নতার দাসানুদাস। দ্বিতীয় কষ্ট—উপেক্ষা, অপমান,—হাজার পায়ে ধরিলেও তাঁহার কথা কেহ শুনিতে চাহিবে না; কেননা, তাঁহার ও অন্যদের মধ্যে একপ্রাণতা বা সদ্ভাব নাই। অন্যেরা মনে করেন, তিনি কোন অভিসন্ধি সাধনের জন্য এই ভেক ধরিয়াছেন। তৃতীয় কষ্ট—তিনি যত চেষ্টা করুন—তাহার দারিদ্র্য কিছুতেই ঘুচিবে না; কেননা, তিনি যাহা পান, তাহা যদি অম্লানচিত্তে ঢালিয়া দিতে না পারেন, তবে অন্যের মনাকর্ষণের আশা নাই। এক কথায় তাঁহাকে সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া ফকীরী লইতে হইবে। তাঁহার পরিণাম কেবল—দারিদ্র্য এবং দুঃখ। এইরূপ করিতে করিতে তিনি যদি আপনাকে টুকরা টুকরা করিয়া ভাগ করিয়া বিলাইয়া দিতে পারেন, তবে ভবিষ্যতে তাঁহার কোন আশা জাগিতে পারে। কিন্তু তাহা কি সহজ? সুতরাং দুঃখ দারিদ্র্যের বোঝা বহন

করাই তাঁহার জীবনের পরিণাম। ৪র্থ কষ্ট,—কত লোকের বিদ্বেষের বাণে তাঁহাকে নিয়ত ক্ষত বিক্ষত হইতে হইবে; কেন না, তিনি যে হিংসা-বিদ্বেষ-অসুর বিনাশ করিয়া জাতিকে একপ্রাণতায় জাগাইতে চাহেন। বৈষম্যের পথে হাঁটিয়াং সংসারটা স্বার্থসাধন করিতেছিল, তিনি কোথা হইতে একতা; সদ্ভাব, শান্তি, একপ্রাণতার কথা ভাষা-ধামায় বোঝাই করিয়া সকলকে মাতাইতে আসিলেন? তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিতে পারিলেই সংসারের বুঝি বা লাভ!!

এই ত সাহিত্যসেবীদের অবস্থার কথা বলিলাম। ভাষা না জাগিলে জাতি জাগিবে না; কিন্তু ভাষা জাগিবে কি রূপে? এত হতাদর, এত নির্য্যাতন, এত উপেক্ষার মধ্যে ভাষা জাগিতে পারে কি? আমরা বলি, তাহাও সম্ভব হইতে পারে,যদি সাহিত্য-সেবীগণ আত্মত্যাগ-মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে পারেন। আত্মত্যাগই যদি সাহিত্যের নব জীবনের কারণ হয়, তবে এ জাতির সাহিত্য জাগিবে না কেন? রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, মাইকেল, হেমচন্দ্র—আত্ম বিসর্জ্জন পূর্ব্বক কি সাহিত্য সেবা করিয়া যান নাই? কিন্তু তবুও এদেশের সাহিত্য জাগে না কেন? বন্ধু, তুমি এ কথার কি উত্তর দিতে পার?

বড় কঠিন প্রশ্ন। আমরা বলি, সাহি-ত্যের উদয় কিছু সময়-সাপেক্ষ। বাঙ্গলা-সাহিত্যের ইতিহাস বড় সুন্দর। অতি অল্প সময়ের মধ্যে বাঙ্গলা সাহিতেরে যেরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, বুঝিবা এরূপ আর জগতে কোন সাহিত্যের হয় নাই। সুতরাং নিরা-শার কথা নাই। বাঙ্গলা ভাষা শুনিতে মধুর, বাঙ্গলা বর্ণমালা দেখিতে অতি সুন্দর। তরঙ্গে তরঙ্গে যখন ভাষার ভাব-সৌন্দর্য্য নৃত্য-ঝঙ্কারে ফুটিয়া উঠে, তখন প্রাণ গলিয়া যায়। যাঁহারা বাঙ্গলা ভাষা ভালরূপ আবৃত্তি করিতে পারেন, তাঁহারা অল্পেই অন্যকে মোহিত করিতে পারেন। এখন ভাব নাই, যাহা সুন্দর ও সরল ভাবে বাঙ্গলা ভাষায় এখন প্রকাশ না হইতে পারে। কিন্তু তবু বাঙ্গলা ভাষা অনাদৃত। ইনি বলেন, তিনি বলেন, বাঙ্গলা-ভাষায় ভাল চিন্তা-পূর্ণ পুস্তক নাই, দর্শন বিজ্ঞান নাই—নাই—নাই—নাই—কত কি নাই! নাই ত বটেই। যদি বহু অভাব এ ভাষার না থাকিত, তবে আর ইহাকে জাগাইবার জন্য তোমা-দিগকে ডাকিতাম না। বাঙ্গলা সাহিত্য মৃত এবং অভাবগ্রস্ত বলিয়াই ত ইহাকে জাগাইবার জন্য তোমাদিগের পা ধরিয়া মিনতি করিতেছি। সহস্র ২ লেকের যত্ন চেষ্টা ভিন্ন এ ভাষার অসংখ্য অভাব ঘুচিবে না। কেহ লেখক হও, কেহ পাঠক হও; কেহ পরিশ্রম দেও, কেহ অর্থ দেও;—তবে ত ভাষা জাগিবে। ভাষা না জাগিলে এজাতি কি জাগিবে? কোন জাতি কি ভাষার পূর্ব্বে জাগিয়াছে? তাহা অসম্ভব। জাতি জাগিয়াও আবার, ভাষা জীবিত থাকিতেই, জীবন-সঞ্চারিণী শক্তির অভাবে মরিতে পারে, তাহা জানি; কিন্তু নিষ্কাম সাহিত্য ভিন্ন কোন জাতি জগতে জাগে নাই। তোমরা কি জান না, "নাই নাই" বলিতে বলিতে যাহা থাকে, তাহাও বিলুপ্ত হইয়া যায়? জাননা কি "হ হ" বলিতে বলিতে যাহা না থাকে, তাহাও "হয়"? একবার সকলে সচেষ্ট হও, জগৎ কাঁপাইয়া বল ত যে—বাঙ্গলা সাহিত্য জাগিতেছে, অপূর্ব্ব সাজে সাজিতেছে, একটু অপেক্ষা কর,

একটু ধৈর্য্য ধর। যদি এইরূপ কর, দেখিবে, অসম্ভব সম্ভব হইবে। সকলে ইহার উন্নতির জন্য প্রাণপণ কর। সহস্র সহস্র লোক সাহিত্যকে জাগাইতে চেষ্টা না করিলে কখনও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতে পারে না। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মাইকেল প্রভৃতি যদি এদেশের লোককে আত্মত্যাগ মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে না পারিয়া থাকেন, তবে তোমাদিগকে তাহা করিতে হইবে। সকলের চরণে নিবেদন—উপেক্ষা, হতাদর ছাড়িয়া, সকলে এই ভাষা-শিশুকে একবার স্নেহ-কোল দিন। ছোট ছেলে চায় একটু আদর, একটু আলিঙ্গন, একটু যত্ন, একটু স্নেহ, একটু সহানুভূতি, একটু ধৈর্য্য—তুমি দুর্ব্বল অকর্ম্মণ্য, অসমর্থ, কুৎসিৎ কুৎসিৎ বলিয়া যদি ক্রমাগত শিশুকে উপেক্ষা কর, তুচ্ছ কর, ঘৃণা কর, সে কখনও বাড়িবে না, কখনও উন্নতির মুখ দেখিবে না। সহানুভূতি ভিন্ন শিশু বাঁচে না; চারাগাছ বাঁচে না; সাহিত্য কিরূপে বাঁচিবে?—উপেক্ষা, ঘৃণা,—এ সকল দূরে নিক্ষেপ করিয়া, সকলে স্নেহের কোল প্রসারণ করিয়া শিশুকে আলিঙ্গন করুন। বাঙ্গলা-সাহিত্য-শিশুকে বাঁচাইবার জন্য আমরা করযোড়ে সকলের শ্রীচরণতলে আজ নববর্ষে উপস্থিত। সকলে সাহিত্য-শিশুকে একবার প্রসন্নচিত্তে আশীর্ব্বাদ করুন। শিশু জাগিয়া উঠুক, শিশু বাঁচিয়া উঠুক। নব জীবনী শক্তির ফোঁটা জাতির ললাটে অঙ্কিত হউক, অপূর্ব্ব শ্রীতে দেশ ভূষিত হউক।

এই শিশুর জীবন-ইতিহাস আশ্চর্য্য প্রহেলিকাময়—কিরূপে যে এই অসংখ্য বাধা বিঘ্নের মধ্যে দেব-শিশু বাঁচিল, বুঝিতেছি না। দেবকীর গৃহে দেব-পুত্র শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পর পাপ-কংসের ভয়ে যেমন তাহাকে নন্দ-গৃহে যশোদার ক্রোড়ে লুক্কায়িত করা হইয়াছিল; এই বঙ্গ-সাহিত্য-শিশুকেও, তদ্রূপ, অসংখ্য হিংসা-বিদ্বেষ-অবহেলা-কংস-শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করার জন্য, অতি সন্তর্পণে, অক্ষয়কুমার-বিদ্যাসাগর-নন্দ-গৃহে ইহাকে সুরক্ষিত করা হইয়াছিল। ক্রমে ক্রমে গোষ্ঠ-লীলায়—গোচারণের মাঠে কত খেলার সাথী ইহাকে অপূর্ব্ব সাজে সাজাইয়া দিয়াছে। এখন অপূর্ব্ব শক্তিতে এই শিশু দীক্ষিত হইতে চায়। এখন এ যেন কি করিবার জন্য লালায়িত। কিন্তু হিংসা-বিদ্বেষ-অবহেলা-কংস বড় প্রবল, বড় দুর্জ্জয়। এখন সহায় কে? কে ইহাকে নবশক্তিতে দীক্ষিত করিবে? কে ইহার সকল অভাব ঘুচাইয়া অপরূপ সৌন্দর্য্যে ভূষিত করিয়া দিবে? এ দেশে কত কৃতবিদ্য মাতৃভক্ত সন্তান আছেন, তাঁহাদের চরণে নিবেদন, একটু অগ্রসর হইয়া ইহাকে রক্ষা করুন, ইহাকে অপূর্ব্ব সাজে সাজাইয়া, এই পরপদ-দলিত জাতিকে উদ্ধার করিবার বীজ-মন্ত্রে ইহাকে দীক্ষিত করিয়া দিন। শিশু নব সাজে সাজিয়া একপ্রাণতার সংগ্রামে প্রমত্ত বীরের ন্যায় ধাবিত হউক।

ঐশী শক্তিতে শ্রীকৃষ্ণ বীর পুরুষ—ঐশী শক্তি সঞ্চারিত হইলেই বঙ্গ-সাহিত্যের পবিত্রতায় দীক্ষা হইবে;—তখন বীরবেশে হিংসা-বিদ্বেষ-পাপ-কংস বিনাশে এ শিশু সমর্থ হইবে। এখনও ইহার দেহ কোমল, এখনও এই শিশু অভাবগ্রস্ত, বল সামর্থ্যহীন। বিধাতা কি এই শিশুর সহায় হইবেন না? তিনি কি, ইহার ললাটে অক্ষয়-

জয়-কবচ অঙ্কিত করিয়া দিবেন না? নিশ্চয় দিবেন, ভয় নাই।

বাঙ্গলা সাহিত্য জাগিলে, এদেশ জাগিবে, আমরা এ কথা ক্রমাগত বলিতেছি; কিন্তু বাঙ্গলা-সাহিত্য জীবিত থাকিতেও আবার এ জাতির অধঃপতন হইতে পারে। বাঙ্গলা-সাহিত্য-সেবীর-দল যদি পবিত্রতা ঢালিয়া দিতে না পারেন, যদি পরহিত-ব্রতে দীক্ষিত হইয়া নিম্ন শ্রেণীর সহিত একাত্মক হইতে না পারেন, তাঁহাদের কথায় কেহ জাগিবে না;—জাগিলেও পতনের পথে ধাবিত হইবে। চিরকাল যাহাতে পবিত্রতার ভাবে ভাবে, প্রাণে প্রাণে মিল থাকে, তাহা করিতে হইবে। চিরকাল যাহাতে অনু-প্রাণন-ক্রিয়া চলিতে থাকে, সর্ব্ব প্রযত্নে তাহা করিতে হইবে। কিন্তু সে ব্রত বড় কঠিন ব্রত।

একদিকে চরিত্র এবং একদিকে স্বার্থ-ত্যাগ, একদিকে প্রেম ও স্বদেশানুরাগ, আর এক দিকে সুরুচি ও সুনীতি লইয়া সাহিত্য-সেবীদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। ভাই, তুমি যদি ঘৃণা, উপেক্ষা, অযত্ন পাও, তবুও তোমাকে অটল ভাবে দাঁড়াইয়া জীবন-ব্যাপী সংগ্রামে লিপ্ত থাকিতে হইবে। কেন না, তুমি যে গোষ্ঠলীলার বালকগণের ন্যায়, সাহিত্য-কানাইকে পবিত্রতায় সাজাই-বার জন্য নিষ্কাম প্রেম-ব্রত গ্রহণ করিয়াছ, তাহাতে সর্ব্ব প্রকার ব্যবসা-বুদ্ধি পরি-ত্যাগ করিয়া আত্ম-ত্যাগ-মন্ত্রে তোমাকে দীক্ষিত হইতে হইবে। প্রহার, নির্য্যাতন, উপেক্ষা, দুঃখদারিদ্র্য—এ সকলকে যদি সযত্নে বক্ষে ক্রুশ-কাষ্ঠের ন্যায় ধারণ করিতে না পার, এ পবিত্র ব্রত পরিত্যাগ কর। এ পবিত্র ব্রত পালনে তুমি কোন নীচ কামনাকে হৃদয়ে স্থান দিতে পারিবে না। সকল নীচ কামনা পরিত্যাগ করিয়া কেবল খাটিতে থাক। খাটিতে আসিয়াছ, খাটিয়া খাটিয়া মরিয়া যাও। মৃত্যুত একদিন হইবেই, মৃত্যুকে ভয় না করিয়া অমর হও। যাহা হইবার, তারপর হইবে। কেহ তোমাকে চায় না?—নাইবা চাহিল;—তোমাকে অসংখ্য লোকের মঙ্গল কামনা করিতে হইবে; অসংখ্য গৃহকে তোমার নিজ গৃহ করিতে হইবে, অসংখ্য হৃদয়কে তোমার নিজ হৃদয়ে স্থান দিতে হইবে। সহস্র ভাঙ্গিয়া এক হয়, তুমি শুনিয়া থাকিবে, তুমি এক ভাঙ্গিয়া সহস্রে অনুপ্রবেশ করিবে। একে সহস্র—সহস্রে এক। অনুপ্রাণনী শক্তিতে মহা একপ্রাণতা ও একতার অভ্যুদয় হইবে। তুমি যদি সকলের হইতে পার, সকলে তোমাকে কতদিন আর পর ভাবিতে পারিবে? তুমি যদি পবিত্র হইতে পার, তোমার ভাষাও পবিত্র হইবে। তোমার পবি-ত্রতার আকর্ষণে সকলে আকৃষ্ট হইবে। তবুও যদি তোমাকে পর ভাবে, তাতেই বা তোমার কি? তোমার ব্রত ত অপালিত রহিল না। তুমি সকলের হৃদয়ে চিরকালের জন্য ডুবিয়া যাও। তুমি পবিত্রতার বীজাণুরূপে সাহিত্যে মিশিয়া, তনুক্ষয়ে অণু হইয়া, চির-কালের জন্য, অলক্ষিত ভাবে সকলের হৃদয়ে ঢুকিয়া যাও। যদি তাহা না পার, এ পবিত্র ব্রত পালন তোমা দ্বারা হইবে না।

মানব হৃদয়ে সুবীজাঙ্কুর না জাগিলে তোমার কথা কেহ শুনিবে না;—এই জন্য সকলের হৃদয়ে তোমাকে বীজাঙ্কুর রূপে প্রবেশ করিতে হইবে। যে ছাত্র পাঠে অনভ্যস্ত, তাহাকে অভ্যাসের ভিতরে আনিতে হইবে। যাহার সৎ সাহিত্যে অরুচি, তাহার সুরুচি

জন্মাইতে হইবে। কঠোর সাধন,—এক দিনে নয়, শত দিনে নয়, বহু বৎসরে—বংশানুক্রমে সহস্র সহস্র জীবন-পাত হইবে, তার পর এ সাধনে সিদ্ধি লাভ হইবে। দুই দশ বৎসরে কোন জাতির সুসাহিত্য জাগে নাই। দুই দশ বৎসরে কোন জাতি অভ্যুদিত হয় নাই। শত বৎসরের শত লোকের ধারাবাহিক চেষ্টা চাই। ধৈর্য্য ধরিয়া অবিভেদে বীজ ছড়াইয়া যাও, তোমাদের পর আর এক দল আসিবে, তার পর আর এক দল, তারপর আর একদল—সকলে ক্রমাগত বীজ ছড়াইয়া যাইবে। তোমার কাজ এখন তুমি কর, তাহাদের কাজ তাহারা করিবে। তুমি এখন সকলকে আলিঙ্গন করিতে ধাবিত হও। যদি তুমি আপনাকে ভুলিতে পার, হে সাহিত্য-সেবি, তবেই তোমার নিষ্কাম ব্রত পালিত হইবে। তারপর আর একদল আসিয়া তোমার হস্ত হইতে কর্ত্তব্য-ভার গ্রহণ করিবে। তুমি সহাস্য মুখে অন্যের হস্তে ভারার্পণ করিয়া চলিয়া যাইবে।

আমরা চাই কি? চাই—এ জাতির ললাটে একটী অপরূপ সুসাহিত্য-চন্দনের ফোঁটা দিতে। এক নব ভানুর কিরণে যেমন প্রকৃতি অতুল শোভায় শোভান্বিত হয়, একটী সাহিত্য-চন্দনের ফোঁটায়, তেমনি, এ জাতির অনুপম সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিবে। জাতীয় জীবনে, নববল ফুটিয়া উঠিবে—স্বাধীনতা-প্রদীপ্ত অপরূপ শ্রী। সেই শ্রীতে এ জাতির সকল মলিনতা বিদূরিত হইয়া যাইবে। সেই শ্রী, এ দেশের সকল অপবিত্রতা ও কলুষরাশি, বিনাশ করিবে। দেব-শিশুর জীবন ধারণ সার্থক হইবে;—আবার নব শ্রীতে জাতি মাতিয়া উঠিবে। বংশানুক্রমে, জীবন্তরূপে, উত্তরাধিকারীর দল, জাগিয়া জাগিয়া, নব জীবন সঞ্চার করিতে থাকিবে—এ জাতি আর কখনও অধঃপতিত হইবে না। বিধাতা কৃপা করুন, তাই হউক; বিধাতা নববর্ষে কৃপা করুন—তাঁহার এই হস্তরচিত বঙ্গ-সাহিত্য-শিশু অপরূপ শ্রী-রূপে, সুন্দর ফোঁটারূপে জাতির ললাট-লিপিতে শোভিত হউক। আশীর্ব্বাদ করুন, এই শিশু অজেয় মৃত-সঞ্জীবনী পবিত্র শক্তিকে জাগিয়া উঠুক।

১লা বৈশাখ, ১৩১১।

মাঙ্গলিক।

তোমারি কর-পরশ লাগি—
জাগিনু নব জাগরণে;
প্রভাতে তাই—মেলিয়া আঁখি
দেখিতে চাই তোমাধনে।

সুপ্তিমাঝে শ্রবণে আসি
পশিল ধ্বনি অভিনব;
ঝটিতি প্রভু উঠিনু বসি
চিনিয়া তব কণ্ঠরব।

আজিগো মোরে করুণা করি—
দিয়াছ যদি জাগরণ,
শুনাও বাণী শ্রবণ ভরি,
পরশে দেহ দরশন।

প্রকাশ তব মূরতি, মম
পরশ-পূত হৃদি-তলে,
রবির নব কিরণ সম
অরুণ-পূত ফুল-দলে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

পাতা মুদ্রিত নয়

।

সমাজ ও তাহার আদর্শ। (৯)

অমঙ্গলবাদ,—মৃত্যু অমঙ্গল নহে,—দুঃখ অমঙ্গল নহে,—জড়ে ও নিম্নজীবে দুঃখবোধ নাই,—জ্ঞানবিকাশে দুঃখবোধের বিকাশ,—আমাদের শারীরিক দুঃখ-বোধের প্রয়োজন।

৬৪। এই দারুণ দুঃখ মোহে পড়িয়া প্রকৃতিকে মাতৃরূপা মমতাময়ী বলিতে আমাদের অনেকের ইচ্ছা হয় না। এই যে এক জীব আর এক জীবের খাদ্যরূপে নিজ শরীর বিসর্জ্জন দিতেছে—এই যে এক জীব নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও পরার্থে আত্মত্যাগ বা আত্মবিসর্জ্জন করিয়া নিজের ক্ষতি করিতে বাধ্য হইতেছে,—এই যে জীব—জড়ের অত্যাচারে কত ক্লেশভোগ করিতেছে,—শরীর পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতেছে,—এই যে জগতে চারিদিকে জীবহিংসা প্রাণীহত্যা ব্যাপার নিয়ত চলিতেছে,—এই যে জীব দুঃখ জরা ব্যাধি মৃত্যুতে নিয়ত ক্লিষ্ট হইতেছে,—ইহাতে নিদারুণ প্রকৃতির নির্ম্মমতার কথা, অযথা অপব্যয় বা অপব্যবহারের কথা,—তাহার মহা ধ্বংসলীলার কথা আমাদের সহজেই মনে হয়। শিশুর অকাল মৃত্যুতে, যুবক যুবতীর অসময় মৃত্যুতে, শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীর বা কর্ম্মীর শক্তির পূর্ণ বিকাশের পূর্ব্বে মৃত্যুতে, ঝটিকা অগ্ন্যুৎপাৎ মহামারি প্রভৃতি আধিভৌতিক কারণে সমগ্র জনপদের ধ্বংসে, আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক বা আধিভৌতিক নানা কারণে দুঃখ ক্লেশ উৎপন্ন হইয়া তাহা দ্বারা আমাদের জ্ঞান ও কর্ম্মশক্তি একরূপ অভিভূত হওয়াতে,—আমরা প্রকৃতির অপব্যয়, প্রকৃতির অন্ধ শক্তির অন্ধ ক্রিয়া, তাহার জড়ত্ব কল্পনা করি। আমরা জগতে সর্ব্বত্র হত্যা ও মৃত্যুর রাক্ষসী লীলা, জীবহিংসার পৈশাচিক ব্যাপার, দুঃখ ক্লেশের ভৈরব অত্যাচার, জীবমুণ্ডমালিনী কালশক্তির নিদারুণ নৃত্য, নির্ম্মম প্রকৃতির সৃষ্টিনাশ খেলা, 'ভাঙ্গাগড়া' কাজ সর্ব্বত্র দেখিয়া থাকি। দেখিয়া প্রকৃতিকে জড় সর্ব্বনাশী বলিয়া আমাদের মনে হয়। আমাদের মনে হয়—যেন প্রকৃতির সঙ্গে—জগতের সঙ্গে আমাদের চির বিরোধ, যেন আমাদের নিষ্পেষিত করিবার জন্য জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, যেন আমাদের চির দুঃখসাগরে যন্ত্রণার ঘোর নরকে চির নিমগ্ন রাখিবার জন্যই সংসারের সৃষ্টি হইয়াছে। তখন সমস্ত জগৎটাকে বড় বেসুরা বোধ হয়—তখন জগতের মহাসঙ্গীতের সেই মহাতান আমরা শুনিতে পাই না। তখন আমরা সে মহাসঙ্গীতের মহা একতানের সুর হইতে বেসুরা বাঁধা তারের মত হইয়া পড়ি—বিরাট জগতের মধ্যে একটা অবাধ্য অণু (Jarring atom) হইয়া পড়ি। তখন হতাশ হইয়া জীবনব্যাপী বিষাদের দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া, দারুণ স্বার্থপর হইয়া, নির্ম্মম হইয়া আপনাকে বাঁচাইবার জন্য,—সে মহা ঘূর্ণীপাক হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য,—পরের সঙ্গে সমুদায় জগতের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে

আমরা প্রস্তুত হই। সে অবস্থায় চৈতন্য-রূপিনী মাতৃরূপা আদ্যাশক্তির তত্ত্ব আমরা ধারণা করিতে পারি না। এক জীব যখন আত্মরক্ষার জন্য আর এক জীবকে নষ্ট করে, বিশেষতঃ যখন খাদ্যের জন্য এক প্রাণী আর এক প্রাণীকে হত্যা করে, যখন চারিদিকে দেখা যায় জীব জীবহিংসা করে,—তখন মাতৃরূপা প্রকৃতির কথা ভুলিয়া গিয়া, প্রকৃতিকে রাক্ষসী বলিয়া আমাদের মনে হয়। এই যে জগতে সর্ব্বত্র জরা মৃত্যুর লীলা দেখিতেছি, এই যে জীব মধ্যে সর্ব্বত্র মারামারি, কাটাকাটি, খাওয়াখায়ি দেখিতেছি, এই যে ইতর জীব মধ্যে, মানুষের মধ্যে, চারিদিকে যুদ্ধ বিগ্রহ হত্যাব্যাপার দেখিতেছি,—এই যে সর্ব্বজীবকে জীবন-সংগ্রামে নিয়ত ব্যতিব্যস্ত দেখিতেছি, আত্মরক্ষার্থ সর্ব্বজীবকে ত্রাহি ত্রাহি করিতে দেখিতেছি, এক জীব তাহার জীবন রক্ষার জন্য—আহার সংগ্রহ জন্য লক্ষ লক্ষ অপর জীবকে নষ্ট করিতেছে দেখিতেছি—এই কি জগতে মহামাতৃশক্তির ক্রিয়া! এই যে জগতে কেবল দুঃখ, কেবল ক্লেশ, কেবল অস্থিরতা নশ্বরতা অসম্পূর্ণতা দেখিতেছি, দেখিয়া জগৎকে দুঃখময় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছি, অমঙ্গলবাদে উপনীত হইতে বাধ্য হইতেছি, তথাপি কি প্রকৃতিকে মমতাময়ী মাতৃরূপিণী বলিব? সমস্যা বড় কঠিন। যাঁহারা শিবময় মঙ্গলময়ের রাজ্যে প্রবেশাধিকার পাইয়াছেন, যাঁহারা করুণাময়ী মহাপ্রকৃতির ক্রোড়ে স্থান পাইয়াছেন, জগতের ক্রমোন্নতিতত্ত্ব মহাবিকাশতত্ত্ব বুঝিয়াছেন, তাঁহারা ইহার উত্তর দিতে পারেন। আমরা চৈতন্যরূপিনী মহাপ্রকৃতির মাতৃরূপা বিকাশ, জড়জীবময় জগতের রক্ষা ও উন্নতির প্রয়াস—বুঝিতে পারি না। কিন্তু সে আমাদের দূরদৃষ্টির অভাব জন্য,—ঐ যে ক্ষয়ব্যয় হয়, তাহার কোথায় সঞ্চয় হয়, তাহা আমরা ধারণা করিতে পারি না—এই জন্য, সুখ দুঃখের প্রকৃত তত্ত্ব আমরা বুঝিতে পারি না—এই জন্য, অনন্তের অসীমের প্রকৃত স্বরূপ আমরা বুঝিতে পারি না—এই জন্য, অনন্তময়ের অনন্তত্ব হেতু অনন্ত অণু হইতে মহানের ও অপূর্ণ হইতে পূর্ণত্বের অনন্তরূপে বিকাশ ও অনন্ত পরিণতির মহাতত্ত্ব জগতের মহা ক্রমবিকাশ-তত্ত্ব আমরা সম্যক্ ধারণা করিতে পারি না—এই জন্য।

৬৫। কিন্তু সে বিরাট তত্ত্ব ধারণা করিতে না পারিলেও, জগতের ক্রম-বিকাশের জন্য—জীবের ক্রমোন্নতি জন্য প্রকৃতির মহাকর্ম্মতত্ত্ব—সে মহাত্যাগ তত্ত্ব আমরা কতকটা ধারণা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। সেই প্রকৃতির মহাশক্তিতে জীবপ্রকৃতির ক্রমআপূরণ হইয়া জীবত্বের কিরূপে ক্রম-বিকাশ হয়, পূর্ব্বে তাহার আভাষ পাওয়া গিয়াছে। তাহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, সমষ্টিভাবে দেখিলে, সেই মাতৃরূপা মহাপ্রকৃতির কোথাও অপব্যয় নাই। আমাদের সীমাবদ্ধ দৃষ্টিতে আমরা সম্যক্ দেখিতে পাই না বলিয়া, আমরা অনেক স্থলে প্রকৃতির অপব্যয়ের কথা মনে করি। অনেক ইতর জীবজাতির ব্যক্তিরক্ষা সম্বন্ধে প্রকৃতির তাচ্ছিল্য বা সুবন্দোবস্তের অভাব দেখিয়া আমরা প্রকৃতির অপব্যয় বা অক্ষমতা মনে করি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেরূপ অপব্যয় নাই। বলিয়াছি ত, একস্থানে যাহা অপব্যয় মনে হয়, তাহা অন্যস্থানে অন্যরূপে সঞ্চিত হয়। আমরা তাহা বুঝি না, তাই

প্রকৃতির অপব্যয় মনে করি। বাস্তবিক যাহা সৎ তাহা কখন অসৎ হইতে পারে না। এই যে এক জীব আর এক জীবের অন্ন হইয়া আত্মবিসর্জ্জন করে বলিয়াছি, কিন্তু তাহাতে সে জীবের অত্যন্ত ধ্বংস হয় না। তাহাতে পারমার্থিক ভাবে সে জীবের মৃত্যু হয় না। জৈবশক্তি যখন বাহ্য স্থূল জড়ের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করে, ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া একেবারে বন্ধ করিয়া স্থূল জড়শরীর ত্যাগ করিয়া, সূক্ষ্ম জড়ের আশ্রয় গ্রহণ করে,—অথবা প্রাণশক্তির অন্য বিশেষ বিকাশের সহিত সম্মিলিত হয়, তখন জীবের ব্যবহারিক মৃত্যু হয় মাত্র। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, জীবের জন্মান্তর আছে,—জীবের ক্রমোন্নতি আছে। জীবকে ক্ষুদ্রতম জীবাণু হইতে আরম্ভ করিয়া নানাজাতীয় জীবস্তর অতিক্রম করিয়া পূর্ণত্বের দিকে অগ্রসর হইতে হয়। সুতরাং এক জীব আর এক জীবের খাদ্যরূপেই তাহার জীবন উৎসর্গ করুক, অথবা স্বাভাবিক নিয়মে যথাকালে মৃত্যুমুখে পতিত হউক, সে মৃত্যুতে জীবের অত্যন্ত ধ্বংস হয় না, তাহার প্রাণশক্তির লয় হয় না, অথবা নিম্নতর জড়শক্তিতে পরিণতি হয়। তাহাতে সে জীবের পরকালে ক্রমোন্নতিতে কোন বাধা হয় না। এ জগতে জীবনীশক্তির কোন ধ্বংস হয় না। এ জগতে প্রাণশক্তির (life এর) কোন হ্রাস বৃদ্ধি নাই, কোন অপচয় উপচয় নাই—কোন ধ্বংস নাই। যেমন জড়-পরমাণু বা জড়শক্তির কোন ধ্বংস নাই, তাহা রূপান্তরিত হয় মাত্র,—তেমনই জৈব শক্তিরও কোন ধ্বংস নাই, তাহাও রূপান্তরিত হয় মাত্র। কিন্তু রূপান্তরিত হইলেও, তাহা কখনও স্থূল জড়শক্তিতে পরিণত হয় না। সেইরূপ স্থূল জড়শক্তিও কখন প্রাণশক্তিতে পরিণত হইতে পারে না। পরাপ্রকৃতি কখন অপরা প্রকৃতিতে পরিণত হয় না। স্বয়ং ব্রহ্মপ্রকৃতি, আমাদের মধ্যে—সর্ব্বজীব মধ্যে প্রাণশক্তিরূপে অবস্থিত থাকেন। তাই প্রাণ—ব্রহ্ম। তাই ভগবানই সর্ব্বভূতের জীবন। (২) এই প্রাণশক্তি নিত্য—এজন্য মৃত্যু নাই। মৃত্যুতে প্রাণশক্তির রূপান্তর বা স্থানান্তর হয় মাত্র। একরূপে একস্থানে এই প্রাণশক্তির ধ্বংস বোধ হয়—মৃত্যুতে তাহার বিনাশ

(১) পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ জন্মান্তর স্বীকার না করিলেও প্রাণশক্তির নিত্যত্ব ইঙ্গিতে স্বীকার করিয়াছেন। কোন প্রসিদ্ধ লেখক বলিয়াছেন,—

"The attempt to get the living out of the dead has failed. Spontaneous Generation has had to be given up. And it is now recognised on every hand that Life can only come from the touch of Life. Huxley categorically announces that the doctrine of Biogenesis, or life only from life, 'is victorious along the whole line at the present day.' * * * Tyndall is compelled to say, 'I affirm that no shread of trustworthy experimental testimony exists to prove that the life in our day has ever appeared independently of antecedent life.'

H. Drummond's—*'Natural law in the Spiritual World.'* P. 63.

আধুনিক রাসায়ন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত জৈবশক্তির নিত্যত্ব ও জড়শক্তিতে তাহার অপরিণামিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। রাসায়নবিদ্যাবলে এ পর্য্যন্ত কেহ inorganic জড় হইতে organic জৈব পদার্থ প্রস্তুত করিতে পারেন নাই। যে স্থানে পারিয়াছেন বলিয়া স্পর্দ্ধা করেন, সে স্থলে উচ্চতর জৈব পদার্থের বিশ্লেষণে নিম্ন শ্রেণীর জৈব পদার্থের পরিণতি মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। উচ্চতর জীবনী শক্তিবলে যে দেহ সংগঠিত হয়, মৃত্যুর পর তাহার বিশ্লেষণে তাহা হইতে নানা জৈব পদার্থের উৎপত্তি হয়,—তাহা নানা ক্ষুদ্র জীবাণুর বংশবৃদ্ধির ভূমিরূপে পরিণত হয়।

(২) 'জীবনং সর্ব্বভূতেষু।'—গীতা—৭।৯।

অনুমিত হয়, কিন্তু অন্যদিকে অন্যরূপে তাহারই আবির্ভাব হয়। এই জন্য এক জীব অপর জীবকে খাদ্যরূপে গ্রহণ করিলে, তাহার জীবনীশক্তিও কতক অংশে গ্রহণ করে—আত্মসাৎ করিয়া লয়। অথবা অন্যত্র অন্যরূপে সেই জীবনীশক্তির আবির্ভাব হয়। (১)

[কিন্তু 'জীবের মৃত্যু নাই—জন্মান্তর আছে,'—একথা অনেকে স্বীকার করেন না। তাঁহারা মৃত্যুতে জীবত্বের অত্যন্ত ধ্বংস সিদ্ধান্ত করেন। জ্ঞানের অবিকাশিত অবস্থায়, মানুষ সতের অসৎ পরিণাম স্বীকার করে,—জড় জীবের ধ্বংস বা অত্যন্ত লয় সিদ্ধান্ত করে। তবে অসভ্য অশিক্ষিত মানুষও, কখন কখন অত্যন্ত ধ্বংসের ধারণা করিতে গিয়া, যখন তাহা জ্ঞানের স্বভাববশে ধারণা করিতে পারে না,—অথবা যখন মৃত্যুতে আত্মীয়ের অত্যন্ত লয় কল্পনা কষ্টকর হয়,—তখন পরলোকে বিশ্বাস করে। এজন্য অনেক অসভ্য সমাজেও প্রেতবাদ প্রচলিত আছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ সে স্পষ্টধারণার চেষ্টা না করিয়া অস্পষ্টভাবে—জড় ও জীবের সৃষ্টি লয় কল্পনা করে;—ঐ যে বর্ত্তিকা জ্বলিয়া জ্বলিয়া ক্ষয় হইতেছে—সে ক্ষয়ে উহার ধ্বংস হয়—মনে করে। ক্রমে ক্রমে জড় সম্বন্ধে সে ভ্রম বিজ্ঞান ঘুচাইয়া দেয়। বিজ্ঞান সিদ্ধান্ত করে যে জড় নিত্য—মৌলিক পদার্থের ধ্বংস নাই। এমন কি, যে ক্ষুদ্র 'জল-অণু' এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতেছে, এক দ্রব্যের সহিত রাসায়নিক সংযোগে সংযুক্ত থাকিয়া—আবার বিযুক্ত হইয়া অন্য দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত হইতেছে—তাহারও সহজে বিশ্লেষ হয় না। জড়শক্তিরও ধ্বংস নাই। জৈবশক্তি যে জড়শক্তি বা রাসায়নিক সংযোগশক্তি হইতে সৃষ্টি হয় না—তাহাও বিজ্ঞান স্থির করিয়াছে। জীবন যে জড়ের বিশেষ ধর্ম্ম বা সংযোগফল নহে, তাহা বিজ্ঞান বুঝিয়াছে। তথাপি কথা উঠে যে, যখন জড়-আধার ব্যতীত শক্তি থাকিতে পারে না, আর যখন জড়শরীরই জৈবশক্তি বিকাশের ভূমি, তখন অবশ্যই জড়শরীর ধ্বংসে জীবত্বের ধ্বংস বা জড়-পরিণতি হয়। একথা এক অর্থে সত্য। কিন্তু জড় দুইরূপ—স্থূল ও সূক্ষ্ম। আকাশের (Ether এর) ক্রিয়া বিজ্ঞান দেখাইয়া দিয়। ঐ যে ধাতব তারের মধ্যে দিয়া তাড়িত শক্তি নিমেষ মধ্যে সহস্র যোজন পথ পরিচালিত হইতেছে—অথচ ঐ তারের কোন বাহ্য পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না,—সে

---

(১) এই প্রাণশক্তিতত্ত্ব হার্বার্ট স্পেন্সার প্রভৃতি আধুনিক জীববিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ কতকটা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন। পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সারের মতে,—

"Life is "the sum total of the functions which resist death" ; life is a "continuous adjustment of internal relations to external relations,""a correspondence with environments.

কিন্তু হার্বার্ট স্পেন্সার কেবল প্রাণকার্য্যের কথা বলিয়াছেন, তাহাও আংশিক মাত্র। তিনি মূল প্রাণশক্তির তত্ত্ব বিশেষ করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করেন নাই।

পূর্ব্বে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ জীবনীশক্তি (বা Vital force) ও তাহার সহিত জড়শক্তির (Physical force এর) পার্থক্য স্বীকার করিতেন। জড়বাদী পণ্ডিতগণ সে পার্থক্য দূর করিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াও সফল হন নাই,—জৈবশক্তি ব্যতীত জীবের জন্ম সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। তাই কোন কোন পাশ্চাত্য আত্মতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত ও জীবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত আবার সে উভয়শক্তির মধ্যে পার্থক্য স্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

পরিচালন ক্রিয়ার মূল—সেই তারের অন্তর্গত আকাশ। সর্ব্বগত আকাশেই সূক্ষ্মশক্তির ক্রিয়া হইয়া থাকে। জড়শরীর ধ্বংসে—শরীরান্তর্গত সে সূক্ষ্ম আকাশের বা সূক্ষ্ম জড়ের কোন ধ্বংস হয় না। অতএব এইসূক্ষ্ম জড় আমাদের প্রাণাদি শক্তির আধার হইলে, মৃত্যুতে বা জড়শরীর নাশে তাহার নাশ হয় না,—এ কথায় আর আপত্তি থাকিতে পারে না।]

৬৬। বাস্তবিক, পারমার্থিক ভাবে কোথাও ধ্বংস নাই। কোথাও ক্ষয় নাই। আমরা বলিয়াছি যে, জগতে এক মহা ত্যাগ-গ্রহণের লীলা, সৃষ্টি-ধ্বংসের লীলা, ব্যয়-সঞ্চয়ের লীলা নিয়ত চলিতেছে। যে মহাশক্তি বলে এই মহাক্রিয়া সংসাধিত হইতেছে, সেই কালশক্তি নিত্য—অক্ষয়। সে শক্তির কখন হ্রাসবৃদ্ধি নাই। জড় শক্তি-বল, প্রাণশক্তি বল, মানসশক্তি বল, জ্ঞানশক্তি বল,—কিছুরই ধ্বংস নাই। আছে—কেবল রূপান্তর, কেবল কালে পরিবর্ত্তন। এই যে এ পৃথিবীতে আজ আমরা নানাজাতীয় জীব দেখিতেছি, শত বৎসর পরে বোধ হয় ইহার একটীও জীবিত থাকিবে না। এই যে এখন এ পৃথিবীতে দেড় শত কোটী মানুষ বাস করিতেছে—প্রায় শত বৎসর পরে ইহাদের একজনও থাকিবে না। কিন্তু কোথায় যাইবে? ইহাদের সমষ্টি জীবনীশক্তি বা সমষ্টি প্রাণশক্তি, সমষ্টি কর্ম্মশক্তি, সমষ্টি জ্ঞানশক্তি—কোথায় যাইবে? জগতের অলঙ্ঘ্য নিয়মে ইহার কিছুই ধ্বংস হইবে না, কিছুই ক্ষয় হইবে না। ইহার কতক এ পৃথিবীতে থাকিয়া যাইবে—কতক এই অনন্ত জগতের অন্য কোথাও চলিয়া যাইবে। আর একরূপে কোথাও তাহার আবির্ভাব হইবে। আর যে শক্তি এখানে থাকিয়া যাইবে, ও যে শক্তি জগতের অন্য কোন স্থান হইতে এখানে আসিবে, তাহা হইতে একদল জীব—আর একদল মানুষ সেই শতবর্ষ পরে এ পৃথিবী অধিকার করিবে। বলিয়াছি ত, জগতে নূতন সৃষ্টি নাই। জগতে যেমন কিছুরই ধ্বংস নাই, তেমনই জগতে কিছুরই নূতন সৃষ্টি হয় না। আমরা জগতে রূপান্তর কল্পনা বা ধারণা করিতে পারি, কিন্তু কিছুরই অত্যন্ত ধ্বংস বা শূন্য হইতে আবির্ভাব কল্পনা করিতে পারি না। আবার যেমন কিছুরই ধ্বংস নাই, তেমনই বলিয়াছি ত, প্রকৃতির কোথাও অপব্যয় নাই। এজন্য উচ্চ জীবরূপী পরাপ্রকৃতি—জীবের প্রাণ মন বুদ্ধি শক্তি—কখন নিম্ন অপরা জড় প্রকৃতিতে বা জড়শক্তিতে পরিণত হয় না। জড় জীবত্বের বিকাশে সহায় হয়, জীবত্ব ধ্বংস করিতে পারে না—প্রাণশক্তিকে নিম্ন জড়শক্তিতে পরিণত করিয়া লইতে পারে না। কেন না জড়শক্তি কখন জৈবশক্তিরূপে পরিণত হয় না। জড় ও জীব মধ্যে সে আদান প্রদান ব্যবস্থিত হয় নাই। এ সম্বন্ধে নির্ম্মলজ্ঞানে যাহা স্বতঃসিদ্ধ, প্রমাণ বিজ্ঞানবলেও আমরা সেই সিদ্ধান্তেই উপনীত হই। অতএব জগতে পারমার্থিক ভাবে সৃষ্টি লয় নাই, ইহা সত্য। এজন্য আমরা বলিতে পারি যে, শত বৎসর পরে যে সব নূতন মানুষ বা নূতন জীব—এ পৃথিবী অধিকার করিবে, তাহা নূতন সৃষ্টি নহে। তাহা পুরাতন। তাহাও অতীতের সমষ্টীকৃত জীবত্বের তৎকালীন বিশেষ বা ব্যষ্টি বিকাশ মাত্র। তাহাও একস্থানের বা এককালের জৈবশক্তি, আর একস্থানে বা আর এক-

কালে বিশেষ আবির্ভাব মাত্র। এইরূপে যে কোন সৌর বা নাক্ষত্র জগতের যে কোন পৃথিবী বা গ্রহ উপগ্রহ যখন কঠিন শীতল হইয়া জীবের বাসোপযোগী হয়, তখন কোন সুদূর সৌর মণ্ডল হইতে জৈবশক্তি আসিয়া সেখানে স্থূলশরীর গ্রহণ করিয়া জীবত্বের ক্রমবিকাশ করিতে থাকে। এই জৈবশক্তি নিত্য। তাহা ভগবানের পরাপ্রকৃতি। তাহার স্থান কাল বাধা সামান্য। জগতের সূক্ষ্মশক্তি মাত্রেরই স্থান কাল বাধা বড় সামান্য। বলিয়াছি ত, জগতে সূক্ষ্মশক্তি মাত্রেই আকাশাদি সূক্ষ্ম জড়ের সহায়ে গতাগতি করে। অই সৌরকর কোটী কোটী ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া নিমেষ মধ্যে এ পৃথিবীতে উপস্থিত হইতেছে—পৃথিবীকে অন্য গ্রহগণকে তাপ তড়িত আলোক বিলাইতেছে, জগৎকে প্রকাশ করিয়া আমাদের জ্ঞান প্রকাশ করিতেছে। সেইরূপ আমাদের সূক্ষ্ম প্রাণশক্তিও যখন এক জড়শরীর পরিত্যাগ করে, তখন সূক্ষ্ম জড়ের সহায়ে বা সূক্ষ্ম জড়শরীরের সহায়ে অল্পকাল মধ্যে জগতের একস্থান হইতে আর একস্থানে—জগতের কোন এক প্রান্তে অতি অল্পকাল মধ্যে অনায়াসে গমনাগমন করে, কোথাও বা তাহার সঞ্চিত শক্তি অনুসারে অনুকূল অবস্থার সহায়ে অন্য স্থূল জড়শরীর গ্রহণ করে, তাহা কে ধারণা করিতে পারে? (১)

এইরূপে জগতের একস্থান হইতে আর একস্থানে সূক্ষ্ম জড়ের সহায়ে সূক্ষ্মশক্তির গতাগতি হয়। মহাশক্তির কোন ক্ষয় বৃদ্ধি নাই। প্রাণশক্তির কোন ধ্বংস নাই,—জীবের কোন ধ্বংস নাই—মৃত্যু নাই। মহাকাল স্রোতে রূপান্তর আছে, পরিবর্ত্তন আছে, বিকাশ-বিনাশ আছে, ব্যবহারিক জন্মমৃত্যু আছে, সৃষ্টিলয় আছে, বৃদ্ধিক্ষয় আছে, ব্যক্তিজীবের ক্রমপরিণতি আছে—কিন্তু কিছুরই অত্যন্ত ধ্বংস নাই। মূল যাহা,—তাহা নিত্য, তাহা এক, তাহা অবিনাশী, তাহা অক্ষয়। এ তত্ত্ব আমরা শুধু এ পৃথিবীর কথা ধরিয়া বুঝিতে পারি না। বিভিন্ন পৃথিবীর কথা, বিভিন্ন সৌর ও নাক্ষত্র জগতের কথা, জড়জগৎ শক্তিজগৎ, জ্ঞানজগৎ—সমস্ত স্থূল সূক্ষ্ম জগতের কথা, সমস্ত লোকের কথা, বিভিন্ন ভুবনের কথা—সমুদায় একত্র ধারণা করিয়া এ তত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিলে, তবে ইহার কতক বুঝা যাইতে পারে,—জগতের এই মহাত্যাগ-গ্রহণ নিয়ম, এই যোগবিয়োগ নিয়ম, সেই মহাশক্তির মহাবিকাশ নিয়ম,—কতকটা ধারণা করা যাইতে পারে। কিন্তু সে যোগবল, সে ধারণাশক্তি আমাদের নাই। আমরা সে মহাতত্ত্ব ধারণা করিতে অক্ষম। এ জগতের অন্তরালে ব্রহ্মের যে মহাশক্তির মহাক্রিয়ার আমরা আভাষ পাই, সেই নিত্য অনন্ত অক্ষয় পরাশক্তির ধারণা করিতে আমরা অক্ষম। সেই অক্ষয় শক্তিভাণ্ডার হইতে যাহা জীবজড়ময়ী প্রকৃতিরূপে, বা অপরা ও পরা প্রকৃতিরূপে—এ জগতে বিবর্ত্তিত, এ জগতের বিকাশকল্পে যাহা নিয়ত কর্ম্মরূপে অথবা কর্ম্ম সঞ্চিত হইয়া জগতের বীজভূত অনাদি বাসনারূপে অভিব্যক্ত—সেই মহাশক্তিকে আমরা ধারণা করিতে

(১) আমাদের শাস্ত্র অনুসারে আমাদের সূক্ষ্ম শরীরই আমাদের জীবাত্মার আধার; সেই সূক্ষ্ম শরীর যোগেই জীবের পরলোকে গতি হয়। আমাদের শাস্ত্রোক্ত জন্মান্তরের কথা পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

অক্ষম। সেই মহাতত্ত্ব ধারণা করিতে বৃথা চেষ্টা করিয়া আমরা আমাদের ক্ষুদ্র ধারণা শক্তিকে অভিভূত করিতে চাহি না।

৬৭। সে যাহা হউক, আমরা ইহা হইতে বুঝিতে পারি যে, মৃত্যুতে জীবের অত্যন্ত ধ্বংস হয় না, জীবত্বের ধ্বংস হয় না, জগতের সমষ্টিজীবরূপী পরাপ্রকৃতির বা অক্ষয় প্রাণশক্তির কোন ক্ষয় বৃদ্ধি হয় না। জগতের ব্যবহারিক জন্মমৃত্যু ব্যাপারে, যোগবিয়োগ কর্ম্মে, ত্যাগগ্রহণ লীলায় সে মহাশক্তির কোন ক্ষয় হয় না। তাহাতে প্রাণশক্তির বা জৈবশক্তির কোন হ্রাস হয় না। আমরা বলিয়াছি যে, পারমার্থিক ভাবে সমষ্টিজীবত্ব সত্য এবং ব্যক্তিজীবত্ব মিথ্যা হইলেও, ব্যবহারিক ভাবে জগতে ব্যক্তিজীব নিত্য—ব্যক্তিজীব ক্রমবিকাশ-শীল। ব্যক্তিজীব ক্রমে কালবশে প্রকৃতির ক্রম-আপূরণে ক্রম পরিণত হইয়া অণু হইতে মহৎ হয়, ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ হয়, ব্যষ্টি হইতে সমষ্টি হয়, ক্রমে জীবত্বের পূর্ণ আদর্শে পরিণত হয়—শেষে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মলাভ করিয়া তবে জীবত্ব হইতে মুক্ত হয়। এ জন্য যে কত কালের প্রয়োজন হয়, তাহা ধারণা করিতে পারা যায় না। এই পরিণতির জন্য মৃত্যুর প্রয়োজন। মৃত্যুরূপ অবস্থান্তর ব্যতীত জীবত্বের ক্রমবিকাশ হইতে পারে না—ব্যক্তিজীবের জাত্যন্তর পরিণাম দ্বারা তাহার প্রকৃতির ক্রম-আপূরণ হইতে পারে না। মৃত্যু ব্যাপার ব্যতীত জগতের জীব-প্রবাহ—কালপ্রবাহ থাকিতে পারে না। মৃত্যু না থাকিলে এ পৃথিবীতে এতদিন মানুষের স্থানই হইত না। (১) মৃত্যু না থাকিলে, মানুষ তাহার অপেক্ষা উন্নত জীবত্বের বিকাশের অনুকূল অবস্থাসম্পন্ন উচ্চতর ভুবনে বা লোকে জন্মিবার অবসর পাইত না। মৃত্যু না থাকিলে বুঝি মানুষের দুঃখের অবধি থাকিত না। অতএব মৃত্যুকে অমঙ্গল বলা যায় না। বরং মৃত্যুকে মঙ্গল-ময়ের মহা মঙ্গলময় বিধান বলিয়া আমাদের স্বীকার করিতে হয়। যাঁহারা পরকাল বা জন্মান্তর মানেন, জীবত্বের জন্মে জন্মে ক্রম-বিকাশ মানেন, তাঁহারা কখন মৃত্যুকে অমঙ্গল বলিতে পারেন না। আর যাঁহারা মৃত্যুর পর জীবের ব্যক্তিগত অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহারাও মৃত্যুতে দুঃখের নিবৃত্তি বা অবসান বলিয়া—মৃত্যুকে মঙ্গলময় বলিতে বাধ্য হন।

৬৮। কিন্তু মৃত্যুর এই স্বরূপ বুঝিলেও অমঙ্গলবাদের শেষ মীমাংসা হয় না। কেন না, মৃত্যুতে অত্যন্ত ধ্বংস না হইলেও, জীবত্বের যে কিছু ধ্বংস হয়, কতকটা ক্ষতি হয়—ও মৃত্যুতে যে জীব দুঃখ পায়, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। আর মৃত্যুরূপ মহা ত্যাগ গ্রহণ কর্ম্মে যে আমা-দের সামান্য ক্ষতি হয়—তাহাও নহে। সে মহা হিসাবনিকাশের দিনে মানুষ সারা জীবনে এক এক করিয়া যে বিষয় গ্রহণ করিয়াছে, তাহার মধ্যে যাহা এ জীবনেই

---

(১) কোন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত হিসাব করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, প্রথমে পৃথিবীতে এক নরদম্পতি সৃষ্টি হইয়াছিল। যদি ইহা মনে করা যায়, তাহা হইলে যে নিয়মে মানুষের বংশ বৃদ্ধি হয়, সে নিয়মে যদি মানুষের বংশ বৃদ্ধি বরাবর হইত এবং মৃত্যু না থাকিত, তবে কয়েক সহস্র বৎসর মাত্র পরে এত মানুষ জন্মিত যে; পৃথিবীকে সমতল ধরিয়া, মানুষকে তাহার উপর গায়ে গায়ে দাঁড় করাইয়া, এক জনের উপর আর এক জনকে সাজাইলে, সে মানুষ-স্তম্ভ সূর্য্যকে স্পর্শ করিত।

ত্যাগ করিয়াছে, তাহা বাদে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা ত্যাগ করিয়া যাইতে হয়। স্থূলশরীর ত্যাগ করিতে হয়; স্থূল জড় ও শক্তি হইতে অথবা অপর জীব হইতে, সারা জীবন যাহা গ্রহণ করিয়া সঞ্চয় করিয়াছে—মানুষকে তাহা সমুদায় ফিরাইয়া দিয়া যাইতে হয়; যে ধনসম্পদ আত্মীয় স্বজনকে আপনার করিয়া লইয়াছে, তাহা ত্যাগ করিতে হয়। স্থূল শরীর সহায়ে স্থূলশরীরের ইন্দ্রিয় স্নায়ু মস্তিষ্ক প্রভৃতির সাহায্যে—বাহ্য বিষয় সংস্পর্শে যে জ্ঞানক্রিয়া দ্বারা মানুষের জ্ঞানশক্তির বিকাশ হইয়াছিল,—ও সেই জ্ঞানক্রিয়া ফলে যে 'অহং ও ইদং' জ্ঞানের বিকাশ হইয়াছিল—যে স্মৃতি প্রত্যেক ব্যষ্টি জ্ঞানক্রিয়াকে সম্বন্ধ করিয়া 'অহং' ধারাকে প্রবাহিত রাখিয়াছিল,—মৃত্যুতে সে জ্ঞানক্রিয়া বন্ধ হয়, সে 'আমি' ধারা সংস্কার মধ্যে বিলীন হইয়া যায়—সে স্মৃতি নষ্ট হইয়া যায়। কেবল মূল জ্ঞানশক্তি ও কর্ম্মশক্তি—সূক্ষ্ম শরীরে এ জন্মের ও পূর্ব্বজন্মের সংস্কার দ্বারা আবৃত হইয়া বীজরূপে থাকিয়া যায়। এইরূপে মৃত্যুতে এ 'আমি' সূত্র ধ্বংস হয় বটে, এ 'আমি' 'তুমি' জ্ঞান থাকে না বটে—এ ব্যবহারিক জ্ঞান লোপ হয় বটে, কিন্তু আমাদের ব্যষ্টিত্ব বা ব্যক্তিত্ব ধ্বংস হয় না। মানুষ সারা জীবন কর্ম্ম করিয়া যে বাহ্য বিষয় ত্যাগ বা গ্রহণ করিয়াছিল, মৃত্যুকালে তাহা সবই মানুষকে ত্যাগ করিতে হয় বটে,—কিন্তু সেই কর্ম্ম করিতে গিয়া তাহার প্রতিক্রিয়া ফলে যে সংস্কার হইয়াছিল, সে কর্ম্মফল ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সঞ্চিত সংস্কাররূপ কর্ম্মফল—সকলই সঙ্গে লইয়া যাইতে হয়। মৃত্যুর পরে অনুকূল অবস্থায় সহায়ে সেই সংস্কারবীজ বিকাশিত হইয়া পর জন্ম লাভ হয়—তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। মৃত্যু ও পর জন্মের মধ্যে যে অবস্থা,—তাহা আমাদের নিদ্রার বা স্বপ্নাবস্থার অনেক অনুরূপ। তবে জাগরিত হইয়া যেমন আমরা পূর্ব্বের স্মৃতি লাভ করি, পূর্ব্বের ব্যবহারিক জ্ঞান পূর্ব্বের আমি ধারা—নিদ্রার পূর্ব্বে আমার যাহা কিছু ছিল—সবই ফিরাইয়া পাই, পর জন্ম লাভ করিয়া পূর্ব্ব জন্মের সব আর তেমন ফিরাইয়া পাই না। পর জন্মে আমাদের প্রদ্যোতিত বা বিকাশোন্মুখ সংস্কারের উপযোগী স্থূলশরীর গ্রহণ করিবার পর, সেই সংস্কার বীজ বিকাশিত হইলে, জ্ঞান আবার সংস্কারাবস্থা হইতে সক্রিয় অবস্থায় আসিয়া আর এক নূতন 'আমির আবিষ্কার করে। তখনকার সে 'আমি' অতীতের যে কোন আমি তাহা মনে থাকে না। এইরূপে বিভিন্ন জন্মে বিভিন্ন জাতীয় স্থূলশরীরের মধ্যে দিয়া ব্যক্তিজীব পূর্ণ এক কাল্পনিক আদর্শ জীবত্বের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। তাই মানুষের জন্মান্তরে পূর্ব্বজন্মের কথা মনে থাকে না। তবে যেমন উন্মাদের অসম্পূর্ণ এক 'আমি' জ্ঞানের সূত্র ছিন্ন হইয়া বিভিন্ন 'আমির' জ্ঞান বিভিন্ন সময়ে উদয় হইলেও, সে রোগের অবসানে—সেই আমিধারা ফিরাইয়া পায়, যেমন পীড়াবিশেষে কোন কোন লোকের পূর্ব্বস্মৃতি একেবারে লোপ হইয়া গিয়াও—কোন বিশেষ উত্তেজনা বলে নির্ব্বাণ দীপ প্রজ্জ্বলনের ন্যায় যে স্মৃতি আবার জাগিয়া উঠিতে পারে, যেমন স্বপ্নাবস্থায় আমাতে বিভিন্ন 'আমির' আরোপ হইলেও— কখন রাজা দরিদ্র আমি, কখন পিশাচ 'আমি,' কখন দেব 'আমি'র আরোপ বা অধ্যাস হইলেও, জাগরিত হইলেই সেই

পূর্ব্বের 'আমি' ধারা ফিরিয়া আসে, তেমনই বিশেষ সাধনা বলে জ্ঞানশক্তির বিশেষ বিকাশে সেই সব পূর্ব্বজন্মের 'আমির' সূত্র মানুষ আবার ফিরাইয়া পাইতে পারে। যাহা হউক, সাধারণতঃ এ জন্মে আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের 'আমি' সূত্রের সম্বন্ধ যে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, ইহাকে আমরা মঙ্গলময় বিধান বলিতে বাধ্য হই। আমাদের এ জন্মের অনেক অবস্থাই কখন কখন এত দুঃখকর, লজ্জাকর বা দারুণ ক্লেশকর থাকে যে, আমরা তাহার স্মৃতি উৎপাটন করিতে পারিলে, অত্যন্ত সুখী হইতাম মনে করি। সেইরূপ অতীতকালে আমাদের হয়ত এমন অনেক জন্ম হইয়া গিয়াছে, যে তাহার স্মৃতি থাকিলে বড় যন্ত্রণা হইত—তাহার ভরে হয়ত আমরা নিতান্ত অবসন্ন হইয়া যাইতাম, আর অগ্রসর হইতে পারিতাম না। এই জন্য মৃত্যুতে ব্যক্তিজীবের আমিধারা ছিন্ন হইয়া যায়, সে প্রতিজন্মে নূতন করিয়া জীবনখেলা খেলিতে পায়, ইহাকে বড় শুভকর বিধান বলিতে হইবে।

৬৯। সে যাহা হউক, মৃত্যুতে স্থূলশরীর ব্যবহারিক জ্ঞান 'আমি' 'আমার' ভাব—আমার ভালবাসার সব ত্যাগ করিতে হয়। এ জন্য মৃত্যু বড় দুঃখজনক। মৃত্যুভয় মানুষের স্বাভাবিক—জীবের স্বতঃসিদ্ধ প্রধান ভয়। জ্ঞানের বিশেষ বিকাশ না হইলে,—মৃত্যুতে যে লাভ হয়, যে জীবের ক্রমবিকাশের সুবিধা হয়, তাহা না বুঝিলে—আত্মার ও মৃত্যুর প্রকৃত তত্ত্ব না বুঝিতে পারিলে, সে—মহাভয় বা দুঃখ দূর হয় না। তাই মৃত্যু এত ভয়াবহ—এত দুঃখজনক। আর শুধু মৃত্যু বলিয়া নহে,—আমরা দেখিতে পাই যে জীব নানা কারণে দুঃখ পায়। বিশেষতঃ আত্মরক্ষার্থ ও পররক্ষার্থ কর্ম্ম করিতে গিয়া, অথবা কর্ম্মে অবহেলা করিয়া জীব বড় দুঃখ পায়। যখন আমরা দেখিতে পাই যে, এ জগতে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী, তখন প্রশ্ন উঠে,—কেন এরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে? তখন প্রশ্ন উঠে যে, জগতের যদি কেহ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান নিয়ন্তা থাকেন, তবে তিনি কি সে অনন্ত জ্ঞানবলে অনন্ত শক্তি বলে জগৎকে কেবল সুখময় করিতে পারিতেন না? তাই জগতে এই অনন্ত দুঃখ ক্লেশের লীলা দেখিয়া আমরা অনেক সময় এমন অভিভূত হই যে, সে নিয়ন্তাকে স্বীকার করিতে পারি না, অথবা তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্বে বা সর্ব্বশক্তিতে বিশ্বাস করিতে পারি না,—তাঁহার মহাপ্রকৃতিকে মাতৃরূপিণী বলিয়া মনে করিতে পারি না। আমাদের সীমাবদ্ধ অজ্ঞানজড়িত জ্ঞানে সেই লীলাময়ী প্রকৃতির আশ্চর্য্য লীলা-রহস্য আমরা ধারণা করিতে পারি না। তিনি জীব মধ্যে পরার্থবৃত্তির বিকাশ করেন—পরের জন্য সর্ব্বজীবকে কর্ম্ম করিতে বাধ্য করেন, সর্ব্বজীবে মাতৃত্বের বিকাশ করেন, এ কথা স্বীকার করিলেও, মানুষ সে পরার্থ কর্ম্মে ও স্বার্থ কর্ম্মে যে বাধা পায়, যে দুঃখ ক্লেশ যন্ত্রণা পায়, জীব যে অন্য জীব ও জড়প্রকৃতির অত্যাচারে ব্যতিব্যস্ত হয়, তাহা আমরা দেখিতে পাই। সুতরাং প্রকৃতিকে একদিকে মমতাময়ী মাতৃরূপিণী বলিয়া স্বীকার করিলেও, আর একদিকে প্রকৃতিকে নির্ম্মমতাময়ী বলিতে আমরা বাধ্য হই। এই মমতা নির্ম্মমতার মধ্যে কোন সামঞ্জস্য হয় কি না, ইহার উপরের ভূমিতে আরোহণ করিয়া প্রকৃতির মহাতত্ত্ব আমরা বুঝিতে পারি কি না, তাহা দেখিতে হইবে। এবং

তাহা হইতে জন্মমৃত্যু যোগবিয়োগ সুখ-দুঃখ মঙ্গল অমঙ্গল প্রভৃতি দ্বৈত বা দ্বন্দ্ববোধের সামঞ্জস্য করিয়া, সেই দ্বৈততত্ত্বের মধ্যে দিয়া জীবের ও জগতের ক্রমোন্নতির মহাতত্ত্ব, মানব ও মানবসমাজের ক্রমবিকাশের মহাতত্ত্ব ধারণা করিয়া, সেই দ্বৈতজ্ঞানের উপরের ভূমিতে আরোহণ করিবার সন্ধান বুঝিতে হইবে। সেইজন্য জীবদুঃখের ক্রমবিকাশতত্ত্ব এবং সুখ দুঃখবোধের ক্রমবিকাশ দ্বারা মানুষের ক্রমপরিণতি তত্ত্ব আমাদের প্রথমে আলোচনা করিতে হইবে।

৭০। আমরা প্রথমেই দেখিতে পাই যে, আমরা যে জগতে দুঃখের কথা বলিয়া থাকি—প্রকৃতির নির্ম্মমতার কথা বলিয়া থাকি, সে দুঃখ সে নির্ম্মমতা এক অর্থে অতি সামান্য। জড়জগতের বিকাশকল্পে এ নির্ম্মমতার কথা আসে না। জড়জগতে চেতন। অব্যক্ত—জড়জগতের সুখদুঃখানুভূতি নাই। যখন প্রাকৃতি জড়শক্তি (Physical force) রূপে জড়জগৎকে অব্যক্ত তমোরূপ হইতে (Zero potential হইতে বা nebulous dissipated matter রূপ হইতে) আকাশাদিক্রমে ব্রহ্মকল্পনা অনুসারে পরিণত করিয়া ক্রমে সৌর ও নাক্ষত্র জগৎ সৃষ্টি করিয়া, জীবজগতের বিকাশের জন্য প্রস্তুত করেন; জড়জগৎ যখন প্রকৃতি দ্বারা বাধ্য হইয়া এই পরার্থ কর্ম্মে রত হয়; জড়জগৎ যখন ক্রমবিকাশিত হইয়া জীবের আবাসোপযোগী হয়; যখন জড়শক্তি আপনাকে অভিভূত করিয়া প্রাণশক্তির আধাররূপে—জীবের শরীররূপে—অথবা জীবের শরীর রক্ষা ও পোষণোপযোগী শক্তিরূপে ও অন্নরূপে পরিণত হয়; যখন জড় ও জড়শক্তি মানব ও মানবসমাজের ক্রমবিকাশকল্পে মানবের উচ্চতর জ্ঞানশক্তি চালিত হইয়া তাহার বিকাশের সহায় হইতে বাধ্য হয়—তখন সেখানে জড়ের নিজের সুখদুঃখের কথা আসে না—প্রকৃতির নির্ম্মমতার কথা আসে না। আর যখন নিম্নতর জীবাণু উচ্চতর জীবশরীর সংগঠনের উপকরণ হইয়া, আমাকে অভিভূত করিয়া, স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া পরার্থ কর্ম্ম করিতে বাধ্য হইয়া, সেই উচ্চতর জীবশরীরে প্রবেশ করিয়া আত্মবিসর্জ্জন করে, তখনও প্রকৃতির নির্ম্মমতার কথা বড় থাকে না। কেন না, নিম্ন শ্রেণীর জীবাণুর চৈতন্যবিকাশ বড় সামান্য। তাহার নিজের সুখ দুঃখানুভূতি শক্তি যদি থাকে, তবে তাহা নিতান্ত অল্প। যখন উদ্ভিদ পরার্থ আত্মত্যাগ করে, তখনও এ নির্ম্মমতার কথা আসে না, কেন না উদ্ভিদেরও সুখদুঃখানুভূতি শক্তি বিকাশিত নহে।

৭১। কিন্তু যখন আমরা প্রাণীজগতের কথা চিন্তা করি,—যে সকল জীবের চৈতন্যের বিশেষ বিকাশ হইয়াছে, সুখদুঃখ অনুভব করিবার শক্তি বিকাশিত হইয়াছে, তাহাদিগকে যখন বাহ্য জড়প্রকৃতির অত্যাচারে দুঃখ ক্লেশ সহ্য করিতে দেখি, যখন এক প্রাণীকে আর এক প্রাণীর খাদ্য রূপে বাধ্য হইয়া জীবন উৎসর্গ করিতে দেখি, তখন সেই জীবহিংসা ব্যাপারে প্রকৃতিকে মমতাবিহীন বলিয়া আমাদের মনে হয়। কিন্তু ইহার মধ্যেও কথা আছে। সে কথা বুঝিতে হইলে, আমাদের সুখদুঃখানুভূতি ব্যাপার বুঝিতে হয়। আমাদের অধিকাংশ দুঃখ আধ্যাত্মিক। অতীতের স্মৃতি আমাদিগকে অনেক সময় বড় দুঃখ দেয়। ভবিষ্যতের ভাবনা অনেক সময় আমাদিগকে

দুঃখে অভিভূত করে। ইতর প্রাণীদের এই অতীতের স্মৃতি বড় ক্ষীণ। তাহাদের ভবিষ্যতের ভাবনা নাই বলিলেই হয়। ইতর প্রাণীর বিশেষ বিচারশক্তি নাই,—তাহাদের 'জাতি' জ্ঞান অথবা সামান্য সত্যের ধারণা তত নাই। কাজেই তাহারা বিচার করিয়া ভবিষ্যতের কথা স্থির করিতে পারে না। এজন্য ইতর জীবকে অতীতের স্মৃতি ও ভবিষ্যতের ভাবনা বড় দুঃখ দিতে পারে না,—তাহাদের কল্পনা তাহাদিগকে দুঃখ দিতে পারে না। যূপ কাষ্ঠে বলির জন্য আবদ্ধ পশু, তাহার অতি নিকটে অপর পশুর বধব্যাপার দেখিয়াও নিজের আসন্ন মৃত্যু কল্পনা করিয়া প্রায়ই বিচলিত হয় না। তখনও সে অসঙ্কোচে ঘাতকের হস্তস্থিত ঘাস খাইয়া সুখ বোধ করে। তবে যদি সে চারিদিকে বিভীষিকাজনক বীভৎস কাণ্ড দেখিতে পায়, তখন বড় ভীত হইয়া পড়ে।

সুতরাং ইতর জীবের সুখদুঃখ সাধারণতঃ বর্ত্তমানব্যাপী। কেবল বর্ত্তমানের আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক দুঃখ তাহাদিগকে ক্লেশ দিতে পারে। 'মাত্রা স্পর্শ'—অর্থাৎ বাহ্যবিষয়ের সহিত আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সম্পর্ক হইলে, এবং জ্ঞান বা সংজ্ঞাবাহী নাড়ীর (Sensory nerves) দ্বারা আমাদের মনোবৃত্তিতে সেই সম্পর্কের জ্ঞান উৎপন্ন হইলে, আমাদের এই সুখদুঃখবেদনা অনুভূত হয়। যদি সেই জ্ঞানবাহী নাড়ীর অনুভূতিশক্তির হ্রাস হয়, তবে বাহ্য সংস্পর্শজ ক্লেশ অনুভবের শক্তিও আমাদের হ্রাস হয়। যখন (Chloroform প্রভৃতি) রাসায়নিক দ্রব্যের সহায়ে, আমাদের জ্ঞানবাহী নাড়ী অভিভূত হয়, তখন আমরা বাহ্য ক্লেশ অনুভব করিতে পারি না। যখন পীড়া বিশেষে (মূর্চ্ছা hysteria প্রভৃতি পীড়ার বিশেষ অবস্থায়) আমাদের জ্ঞানবাহী নাড়ী অভিভূত হয়, যখন আমাদের জ্ঞানের বিশেষ বিকাশে সুখ দুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতাশক্তি বিশেষ বৃদ্ধি হয়, যখন যোগবলে—বা সাধনাবিশেষবলে আমরা আমাদের জ্ঞানবাহী নাড়ীকে আয়ত্ত করিয়া তাহাকে অভিভূত করিয়া রাখিতে পারি, তখন সুখ দুঃখবেদনা আমাদিগকে আদৌ বিচলিত করিতে পারে না। যখন মন বিষয় বিশেষে তন্ময় হয়, তখন অন্য বিষয় সম্পর্কজ সুখ-দুঃখানুভূতি থাকে না। যখন সর্ব্বদেহব্যাপী চৈতন্যকে বাহ্যদেহ হইতে সরাইয়া লইয়া মস্তিষ্কের মধ্যস্থলে বা এইরূপ কোন বিশেষ স্নায়ুকেন্দ্রে সুষুপ্তি অবস্থার ন্যায় আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারা যায়, তখন আমাদের বাহ্যবিষয়-সম্পর্ক জনিত সুখদুঃখানুভূতি থাকে না। অতএব এই মাত্রাস্পর্শজ সুখ-দুঃখ আমাদের আগন্তুক ধর্ম্ম।

সুতরাং অবস্থাবিশেষে এই জ্ঞানবাহী নাড়ীর অনুভব শক্তির হ্রাসবৃদ্ধি হইতে পারে। ইহা ব্যতীত সকল প্রাণীর এ জ্ঞানবাহী নাড়ীর অনুভবশক্তি সমান নহে। অনেক প্রাণীর এই জ্ঞানবাহী নাড়ী আদৌ নাই। অনেক প্রাণীর জ্ঞানবাহী নাড়ী অসাড়। জড় পদার্থের ন্যায় এই সকল প্রাণীর জ্ঞানবাহী নাড়ী বাহ্য আঘাতে আকুঞ্চিত বা প্রসারিত হইলেও, বা বাহ্য দ্রব্যগুণে অভিভূত হইলেও—তাহাদের সেই ক্রিয়ার অনুভব শক্তি নাই। তাহারা যে সেই বাহ্য ক্রিয়ার 'সাড়া' দেয় তাহা বাহ্যিক,—তাহা আন্তরিক বা জ্ঞানকৃত নহে,—তাহা আন্তরিক সুখদুঃখ জ্ঞাপক নহে। এজন্য তাহারা বাহ্যবিষয় সংস্পর্শে

সুখদুঃখ অনুভব করিতে পারে না। এই নিম্ন শ্রেণীর প্রাণী হইতে যত উচ্চজাতীয় প্রাণীতে যাওয়া যায়, ততই এই জ্ঞানবাহী নাড়ীর অসাড়তা কমিতে থাকে, ততই এই সুখদুঃখানুভূতি শক্তি বাড়িতে থাকে। কিন্তু মানুষের ন্যায় কোন ইতর জীবে এতদূর সুখদুঃখানুভব শক্তি বিকাশিত হয় না। আমরা, সাধারণতঃ আমাদের সহিত তুলনা করিয়া, 'উপমান' প্রমাণ বলে, অন্য জীবও আমাদের ন্যায় সমানরূপ সুখদুঃখ অনুভব করে, এইরূপ মনে করি। কিন্তু বাস্তবিক তাহা সত্য নহে। (১)

শ্রীদেবেন্দ্র বিজয় বসু।

নব-বর্ষ।

নীরবে, অলক্ষ্য ভাবে, নিত্য আবর্ত্তন,
আবার অম্বর পথে কে জানে কি মনোরথে,
প্রদক্ষিণ করি ধরা পূজিল তপনে।

পরমায়ু অঙ্গ হ'তে হইয়া স্খলিত,
অতীতের ক্রোড়দেশে, চির-সুষুপ্তি-আবেশে,
করিল বরষ এক অক্ষি নিমীলিত।

কালের নূতন তূর্য্য বাজিল আবার,
ছয় ঋতু বার মাস করিবে পুন বিলাস,
তপন নবীন তেজে করিল প্রচার।

ধাইল পূর্ব্বের মত—অজেয় জগতে—
তিলে তিলে, পলে পলে, হেলায়, অভ্যাস বলে,
অতীত—বঞ্চিত তনু গ্রাসি ভবিষ্যতে।

চেয়ে দেখি শূন্য প্রাণে অতীতের পানে,
দৃপ্ত বিভীষিকাময় স্পর্দ্ধিত তিমির চয়
আসিছে গ্রাসিতে চির-বিস্তৃত বয়ানে।

চেয়ে দেখি মুগ্ধনেত্রে, বিমল কিরণে
কত দীপ্ত রবিশশী, অতীতের অঙ্কে বসি,
হাসিছে—দেখায়ে পথ ভবিষ্য গগনে।

গত বর্ষ, কত সুখ, কত দুঃখে ভাসি,
কত আশা নিরাশারে দলিয়া দেহের ভারে,
মিলিলা অনন্ত দেহে, নির্ব্বাণ প্রয়াসী।

দুর্ব্বল মানব প্রাণে নব আশাঙ্কুর
সঞ্চারিয়া ধীরে ধীরে, আবার ছলিতে ফিরে
আসিলা নবীন বর্ষ, অন্তরে নিঠুর?

জানি আমি যে তোমারে করিয়া নির্ভর,
চেয়ে রবে মুগ্ধপানে, শুদ্ধ নেত্রে, লুব্ধ প্রাণে,
সেই হবে তব শরে সতত জর্জ্জর।

ভুলিওনা কেহ অই মধুর কুহকে,
বক্ষে বাঁধি নব বল, পশরে গন্তব্য স্থল,
অতীতের ক্রোড়-ক্ষিপ্ত অই স্ফুটালোকে।

মুছি অশ্রু—কারে বাসে না করে কাতর—
কর্ম্মের সঙ্কুল পথে, ধীরতার দৃঢ় রথে,
উদ্যমে সারথি করি, হও অগ্রসর।

---

(১) নিম্ন জাতীয় জীবের অনুভূতিশক্তি না থাকায় বা ইতর জীবের অনুভূতিশক্তি আমাদের অপেক্ষা অল্প থাকায়, তাহাদের সহিত আমাদের সহানুভূতি, আমরা বাহ্যবিষয় সম্পর্কে যেরূপ সুখ দুঃখানুভব করি, তাহারাও ঠিক্ সেইরূপ সুখ-দুঃখানুভব করে, আমাদের এই ধারণা—ভ্রান্তিমূলক হইতে পারে। কিন্তু এই ধারণার ক্রমবিকাশে আমরা ক্রমে সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন করিতে শিক্ষা করি। ইহা প্রকৃতিজননীর অদ্ভুত কৌশল—আমাদের প্রকৃত জ্ঞান বিকাশের অদ্ভুত উপায়। তাহা এ স্থলে আলোচ্য নহে।

আমার ন্যায় অন্য মানুষ বা অন্য জীব যে সুখদুঃখ বেদনা অনুভব করে, আমরা যে এইরূপ আরোপ বা অধ্যাস করি, তাহাকে কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত Eject আখ্যা দিয়াছেন। যথা—

"But the inferred existence of your feelings, of the objective groupings among them similar to those among my feelings, are of a subjective order in many respects analogous to my own,—these inferred existences are the very acts of inference *thrown out* of my consciousness, recognised as outside of it, as *not* being part of me. I propose accordingly to call these inferred existences *ejects*, things *thrown out* of my consciousness, to distinguish them from *object*, things presented in my consciousness, phenomena".

W. K. Clifford's—Lectures and Essays.—P. 275.

বিদ্রূপের বক্রশিরে করি পদাঘাত,
যিনি সর্ব্বমূলাধার, চল, নমি পদে তাঁর
জপি বিবেকের মন্ত্র, তুচ্ছি ঝঞ্ঝাবাত।
নব বর্ষে, তাঁরে স্মরি, ধর তেজ মনে,
হৃদয়ের ব্যথা রাশি সহ অতীতে সম্ভাষি,"
মোর সম দশা যার, চল মোর সনে।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত। *

(শ্রীম-কথিত।)

ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও কমল রে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

["পশ্যন্তি তব পন্থানম্।"]

কার্ত্তিক কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী ২৮শে নভেম্বর, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ। আজ ঠাকুর রামকৃষ্ণের একটী ভক্ত কমল কুটীরের [Lily cottage] ফটকের পূর্ব্ব ধারের ফুট পাথে পাই-চারি করিতেছেন। কাহার জন্য ব্যাকুল হইয়া যেন অপেক্ষা করিতেছেন।

কমলকুটীরের উত্তরে মঙ্গলবাড়ী। এখানে ব্রাহ্ম ভক্তেরা অনেকে বাস করেন। কমলকুটীরে কেশবচন্দ্র থাকেন। তাঁহার পীড়া বাড়িয়াছে। অনেকে বলিতেছেন, এ-বার বোধ হয় বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ কেশবকে বড় ভাল-বাসেন। আজ তাঁহাকে দেখিতে আসিবেন। তিনি দক্ষিণেশ্বর কালী বাড়ী হইতে আসি-তেছেন। তাই ভক্তটী চাহিয়া আছেন, কখন আসেন।

কমলকুটীর সার্কুলার রোডের পশ্চিম ধারে। তাই রাস্তাতেই ভক্তটী বেড়াই-তেছিলেন।

বেলা ২টা হইতে তিনি অপেক্ষা করি-ছেন। কত লোক জন যাইতেছে, তিনি দেখিতেছেন।

রাস্তার পূর্ব্বধারে ভিকটোরিয়া কলেজ। এখানে কেশবের সমাজের ব্রাহ্মিকাগণ ও তাঁহাদের মেয়েরা অনেকে পড়েন। রাস্তা হইতে স্কুলের ভিতর অনে-কটা দেখা যায়। উহার উত্তরে একটী বড় বাগান বাড়ীতে কোন ইংরাজ ভদ্র-লোক থাকেন। ভক্তটী অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিতেছেন যে, তাঁহাদের বাড়ীতে কোন বিপদ হইয়াছে। ক্রমে কাল-পরিচ্ছদ-ধারী কোচম্যান ও সহিস মৃত দেহের গাড়ী লইয়া উপস্থিত হইল। দেড় ঘণ্টা দুই ঘণ্টা ধরিয়া ঐ সকল আয়োজন হই-তেছে। এই মর্ত্ত্যধাম ছাড়িয়া কে চলিয়া গিয়াছে—তাই আয়োজন! ভক্তটী ভাবি-তেছেন, কোথায়? দেহত্যাগ করিয়া কোথায় যায়?

উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে কত গাড়ী আসিতেছে। ভক্তটী এক একবার তাহা-দের ভিতর লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছেন, তিনি আসিতেছেন কি না।

বেলা প্রায় ৫ টা বাজিল। এমন সময়ে ঠাকুরের গাড়ী আসিয়া উপস্থিত। সঙ্গে লাটু ও আরও দু একটী ভক্ত।

কেশবের বাড়ীর লোকেরা আসিয়া

* প্রথমভাগ, মূল্য ১ টাকা, কাপড়ে বাঁধান ১৷৹; দ্বিতীয় ভাগ যন্ত্রস্থ। শ্রীপ্রভা[illegible] গুপ্তের নিকট প্রাপ্তব্য; ১৩।২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর গলি, কলিকাতা।

ঠাকুরকে সঙ্গে করিয়া উপরে লইয়া গেলেন। বৈঠক খানা ঘরের দক্ষিণ দিকে যে বারাণ্ডা, সেই বারাণ্ডায় এক খানি তক্তাপোষ পাতা ছিল। তাহার উপর ঠাকুরকে বসান হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[সমাধি—মন্দিরে।]

ঠাকুর অনেকক্ষণ বসিয়া আছেন। কেশবকে দেখিবার জন্য অধৈর্য্য হইয়াছেন। কেশবের শিষ্যেরা বিনীতভাবে বলিতেছেন, তিনি একটু এই বিশ্রাম কচ্ছেন; এইবার একটু পরে আসছেন।

কেশবের সঙ্কটাপন্ন পীড়া। তাই শিষ্যেরা ও বাড়ীর লোকেরা এত সাবধান হইয়াছেন। ঠাকুর কিন্তু কেশবকে দেখিবার জন্য উত্তরোত্তর ব্যস্ত হইতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবের শিষ্যদের প্রতি)। হ্যাঁগা! তাঁর আসবার কি দরকার? আমিই ভিতরে যাই না কেন?

প্রসন্ন। (বিনীতভাবে) আজ্ঞে, আর একটু পরে তিনি আসছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। যাও তোমরাই অমন কোরছো। আমিই ভিতরে যাই।

প্রসন্ন ঠাকুরকে ভুলাইয়া কেশবের গল্প করিতে লাগিলেন।

প্রসন্ন। আজ্ঞে, তাঁর অবস্থা আর এক রকম হয়ে গেছে। আপনারই মত প্রায় মার সঙ্গে কথা কন। মা আবার কি বলেন, শুনে হাঁসেন কাঁদেন।

কেশব জগতের মার সঙ্গে কথা কন; হাঁসেন কাঁদেন, এই সব কথা শুনিবা মাত্র ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইতেছেন। দেখিতে দেখিতে সমাধিস্থ।

ঠাকুর সমাধিস্থ। শীতকাল, গায়ে সবুজ রঙের বনাতের গরম জামা। জামার উপর একখানি বনাত। উন্নত দেহ; দৃষ্টি স্থির। একেবারে মগ্ন।

অনেকক্ষণ এই অবস্থায় আছেন। সমাধিভঙ্গ আর হইতেছে না।

সন্ধ্যা হইয়াছে। ঠাকুর একটু প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। পাশের বৈঠকখানায় আলো জ্বালা হইয়াছে। ঠাকুরকে সেই ঘরে বসাবার চেষ্টা হইতেছে।

অনেক কষ্টে তাঁহাকে বৈঠকখানার ঘরে লইয়া যাওয়া হইল।

ঘরে অনেকগুলি আসবাব—কৌচ, কেদারা, আয়না, গ্যাসের আলো। ঠাকুরকে একখানা কৌচের উপর বসান হইল।

কৌচের উপর বসিয়াই আবার বাহ্যশূন্য, ভাবাবিষ্ট।

এইবার কৌচের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া নেশার ঘোরে কি বলিতেছেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ। (কৌচদৃষ্টে) আগে এ সবের দরকার ছিল! এখন আর কি দরকার?

(God-vision.)

(রাখাল দৃষ্টে) রাখাল তুই এসেছিস্—বলিতে বলিতে ঠাকুর আবার কি দেখিতেছেন। বলছেন্—

"এই যে মা এসেছো! আবার বানারসী কাপড় পরে কি দেখাও! মা হ্যাঙ্গাম কোরোনা! বোসো গো বোসো!

ঠাকুরের মহাভাবের নেশা চলিতেছে। ঘর আলোকময়। ব্রাহ্ম ভক্তেরা অনেকে চতুর্দ্দিকে আছেন। লাটু, রাখাল, মাষ্টার ইত্যাদি ঠাকুরের কাছে বসিয়া আছেন। ঠাকুর ভাবাবস্থায় আপনাপনি বলিতেছেন—

(Immortality of the Soul.)

"দেহ আর আত্মা। দেহ হয়েছে। আবার যাবে। আত্মার মৃত্যু নাই। যেমন সুপারি। পাকা সুপারি ছাল থেকে আলাদা হয়ে থাকে। কাঁচা বেলায় ফল আলাদা আর ছাল আলাদা করা বড় শক্ত। তাঁকে দর্শন করলে, তাঁকে লাভ করলে, দেহ বুদ্ধি যায়। তখন দেহ আলাদা, আত্মা আলাদা বোধ হয়।

(কেশবের প্রবেশ)

এইবার কেশব ঘরে প্রবেশ করিতেছেন। পূর্ব্বদিকের দ্বার দিয়া আসিতেছেন। যাঁহারা তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে বা টাউন হলে দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহার অস্থিচর্ম্মসার মূর্ত্তি দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। কেশব দাঁড়াইতে পারিতেছেন না। দেয়াল ধরিয়া ধরিয়া অগ্রসর হইতেছেন। অনেক কষ্টের পর কৌচের সম্মুখে আসিয়া বসিলেন।

ঠাকুর ইতিমধ্যে কৌচ হইতে নামিয়া নীচে বসিয়াছেন। কেশব ঠাকুরের দর্শন লাভ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রণাম করিতেছেন। অনেকক্ষণ প্রণামানন্তর উঠিয়া বসিয়া দেখেন, ঠাকুর এখনও ভাবাবস্থায় রহিয়াছেন ও আপনাপনি কি বলিতেছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

[আদ্যাশক্তি ও 'নরহরি'।]

এইবার কেশব উচ্চৈশ্বরে বলিছেন 'আমি এসেছি,' 'আমি এসেছি'! এই বলিয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণের বাম হাত ধারণ করিলেন ও সেই হাতে হাত বুলাইতে লাগিলেন। ঠাকুর ভাবে গর্গর মাতোয়ারা। আপনাপনি কত কথা বলিতে লাগিলেন। ভক্তেরা সকলে হাঁ করিয়া শুনিতে লাগিলেন।

(একমেবাদ্বিতীয়ম্।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। যতক্ষণ উপাধি, ততক্ষণই নানা বোধ। যেমন কেশব, প্রসন্ন, অমৃত, এই সব। পূর্ণজ্ঞান হলে এক চৈতন্য বোধ।

"আবার পূর্ণজ্ঞানে দেখে, যে সেই এক চৈতন্য এই জীব জগৎ, এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন।

(ব্রহ্ম ও আদ্যাশক্তি।)

"তবে শক্তি বিশেষ। তিনিই সব হয়েছেন বটে, কিন্তু কোনখানে বেশী শক্তির প্রকাশ; কোনখানে কম শক্তির প্রকাশ।

"বিদ্যাসাগর বলেছিল, 'তা ঈশ্বর কি কারুকে বেশী শক্তি কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন? আমি বললুম, 'তা যদি না হতো তাহলে একজন লোক পঞ্চাশ জন লোককে হারিয়ে দেয় কেমন করে। আর তোমাকেই বা আমরা দেখতে এসেছি কেন?

"তাঁর লীলা যে আধারে প্রকাশ করেন সেখানে বিশেষ শক্তি।

"জমিদার সব জায়গায় থাকেন। কিন্তু অমুক বৈঠকখানায় তিনি প্রায় বসেন। ভক্ত তাঁর বৈঠকখানা। ভক্তের হৃদয়ে তিনি লীলা করতে ভালবাসেন। ভক্তের হৃদয়ে তাঁর বিশেষ শক্তি অবতীর্ণ হয়।

"বিশেষ শক্তির লক্ষণ কি? যেখানে কার্য্য বেশী সেখানে বিশেষ শক্তির প্রকাশ।

"এই আদ্যাশক্তি আর পরব্রহ্ম অভেদ। একটীকে ছেড়ে আর একটীকে চিন্তা করবার যো নাই। যেমন জ্যোতি আর মণি। মণিকে ছেড়ে জ্যোতিকে ভাববার যো নাই; আবার জ্যোতিকে ছেড়ে মণিকে

ভাববার যো নেই। সাপ আর তীর্য্যগ্‌গতি। সাপকে ছেড়ে তীর্য্যগ্‌গতি ভাববার যো নাই; আবার তীর্য্যগগতি ছেড়ে সাপকে ভাববার যো নাই।

(ব্রাহ্মসমাজ ও মানুষে ঈশ্বর দর্শন।)

"সেই আদ্যাশক্তিই এই জীবজগৎ হয়েছেন, এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন। অনুলোম, বিলোম। রাখাল, নরেন্দ্র ও আর আর ছোকরাদের জন্য এত ব্যস্ত হই কেন?

"হাজরা বললে, তুমি ওদের জন্য ব্যস্ত হয়ে বেড়াচ্ছ, তা ঈশ্বরকে ভাববে কখন?

(কেশব ও সকলের ঈষৎ হাস্য।)

"তখন মহা চিন্তিত হলুম। বল্লুম মা একি হলো! হাজরা বলে, ওদের জন্যে ভাব কেন? তার পর ভোলানাথকে জিজ্ঞাসা করলুম। ভোলানাথ বল্লে ভারতে * ঐ কথা আছে। সমাধিস্থ লোক সমাধি থেকে নেমে কোথায় দাড়াবে? তাই সত্ত্বগুণী। ভক্ত নিয়ে থাকে। ভারতের এই নজির পেয়ে তবে বাঁচলুম।

(সকলের হাস্য।)

"হাজরার দোষ নাই। সাধক অবস্থায় সব মনটা 'নেতি' 'নেতি' করে তাঁর দিকে দিতে হয়। সিদ্ধ অবস্থায় আলাদা কথা। তাঁকে লাভ করবার পর, অনুলোম বিলোম। ঘোল ছেড়ে মাখম পেয়ে, তখন বোধ হয় 'ঘোলেরই মাখম। মাখমেরই ঘোল।' তখন ঠিক বোধ হয় তিনিই সব হয়েছেন। কোন খানে বেশী প্রকাশ; কোন খানে কম প্রকাশ।

"ভাবসমুদ্র উথলালে ডাঙ্গায় এক বাঁশ জল। আগে নদী দিয়ে সমুদ্রে আসতে হলে এঁকে বেঁকে ঘুরে আসতে হতো। বন্যে এলে ডাঙ্গায় এক বাঁশ জল। তখন সোজা একদিক দিয়ে নৌকা চালিয়ে দিলেই হলো। আর ঘুরে যেতে হয় না।

"ধান কাটা হলে, আর আলের উপর দিয়ে ঘুরে ঘুরে আস্‌তে হয় না। সোজা একদিক দিয়ে গেলেই হয়।

"লাভের পর তাঁকে সব তাতেই দেখা যায়। মানুষে তাঁর বেশী প্রকাশ। মানুষের মধ্যে সত্ত্বগুণী ভক্তের ভিতর আরও বেশী প্রকাশ—যাদের কামিনীকাঞ্চন ভোগ করবার একেবারে ইচ্ছা নাই।

(সকলে নিস্তব্ধ।)

"সমাধিস্থ ব্যক্তি যদি নেমে আসে, তা-হলে সে কিসে মন দাঁড় করাবে। তাই কামিনীকাঞ্চন ত্যাগী সত্ত্বগুণী শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ দরকার হয়। না হলে সমাধিস্থ লোক কি নিয়ে থাকে

(ঈশ্বরের মাতৃভাব।)

যিনিই ব্রহ্ম তিনিই আদ্যাশক্তি। যখন নিক্রীয় তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলি; পুরুষ বলি। যখন সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয় এই সব কাজ করেন, তখন তাঁকে শক্তি বলি; প্রকৃতি বলি। পুরুষ আর প্রকৃতি। যিনিই পুরুষ তিনিই প্রকৃতি। আনন্দময় আর আনন্দময়ী।

"যার পুরুষ জ্ঞান আছে, তার মেয়ে জ্ঞানও আছে। যার বাপ জ্ঞান আছে, তার মা জ্ঞানও আছে। (কেশবের হাস্য।)

"যার অন্ধকার জ্ঞান আছে, তার আলো জ্ঞানও আছে। যার রাত জ্ঞান আছে, তার

---

* 'ভারত' অর্থাৎ মহাভারত। ভোলানাথ তখন কালীবাড়ীর মুহুরি। ঠাকুরকে ভক্তি করিতেন ও মাঝে মাঝে গিয়া ঠাকুরকে মহাভারত শুনাইতেন। দীননাথ খাজাঞ্চীর পরলোকের পর ভোলানাথ খাজাঞ্চী হইয়াছিলেন।

দিন জ্ঞানও আছে। যার সুখ জ্ঞান আছে, তার দুঃখ জ্ঞানও আছে।

কেশব (ঠাকুরের প্রতি, সহাস্যে।) হাঁ, বুঝেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। মা! কি না, জগতের মা। যিনি জগৎ সৃষ্টি করেছেন, পালন কচ্চেন। যিনি তাঁর ছেলেদের সর্ব্বদা রক্ষা কচ্চেন; আর ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ যে যা চায় তাই দেন। ঠিক ছেলে মা ছাড়া থাকতে পারে না। তার মা সব জানে। ছেলে খায়, দায়, বেড়ায় অত শত জানে না।

কেশব। আজ্ঞে হাঁ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

[ব্রাহ্মসমাজ ও ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য বর্ণনা।]

ঠাকুর রামকৃষ্ণ কথা কহিতে কহিতে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। কেশবের সহিত সহাস্যে কথা কহিতেছেন। ঘরে একঘর লোক উৎকর্ণ হইয়া সমস্ত শুনিতেছেন ও দেখিতেছেন। সকলে অবাক হইয়াছেন যে 'তুমি কেমন আছ,' ইত্যাদি কথা আদৌ হইতেছে না। হইতেছে, কেবল ঈশ্বরের কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবের প্রতি)। ব্রহ্মজ্ঞানীরা অত্তো মহিমা বর্ণন করে কেন? হে ঈশ্বর, তুমি চন্দ্র করিয়াছ, সূর্য্য করিয়াছ, নক্ষত্র করিয়াছ। এ সব কথা এত কি দরকার? অনেকে বাগান দেখেই তারিফ। বাবুকে দেখতে চায় ক'জন? বাগান বড় না বাবু বড়?

"মদ খাওয়া হলে শুঁড়ির দোকানে কত মোণ মদ আছে, তার হিসাবে আমার কি দরকার। আমার এক বোতলেতেই কাজ হয়ে যায়।

"নরেন্দ্রকে যখন দেখি, কখনও জিজ্ঞাসা করি নাই 'তোর বাপের নাম কি?' 'তোর বাপের কখানা বাড়ী?'

"কি জান? মানুষ নিজে ঐশ্বর্য্যের আদর ক'রে বলে, ভাবে ঈশ্বরও ঐশ্বর্য্যের আদর করেন। আর তাঁর ঐশ্বর্য্যের প্রশংসা করলে তিনি খুসি হবেন। শম্ভু (মল্লিক) বলেছিল, আর এখন এই আশীর্ব্বাদ কর যাতে এই ঐশ্বর্য্য তাঁর পাদপদ্মে দিয়ে মরতে পারি। আমি বললুম, এ তোমার পক্ষেই ঐশ্বর্য্য; তাঁকে তুমি কি দেবে! তাঁর পক্ষে এ গুলো কাঠ মাটী।

"যখন বিষ্ণু ঘরের গয়না সব চুরি গেল, তখন সেজো বাবু আর আমি ঠাকুরকে দেখতে গেলাম। সেজোবাবু বল্লে, দূর ঠাকুর! তোমার কোন যোগ্যতা নাই। তোমার গা থেকে সব গয়না নিয়ে গেল, আর তুমি কিছু কর্‌তে পারলেনা! আমি তাঁকে বললাম, এ তোমার কি কথা! তুমি যাঁর গয়না গয়না কোরছো, তাঁর পক্ষে এ গুলো মাটীর ডেলা। লক্ষ্মী যাঁর শক্তি, তিনি তোমার গুটিকতক টাকা চুরি গেল কিনা এই নিয়ে কি হাঁ করে আছেন? এ রকম কথা বলতে নাই।"

"ঈশ্বর কি ঐশ্বর্য্যের বশ, তিনি ভক্তির বশ। তিনি কি চান! টাকা নয়। ভাব, প্রেম, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য, এই সব তিনি চান।

[ঈশ্বরের স্বরূপ ও উপাসক ভেদ।]

"যার যেমন ভাব, ঈশ্বরকে সে তেমনি দেখে।

"তমোগুণী ভক্ত, সে দেখে মা পাটা খায় আর বলিদান দেয়। রজোগুণী ভক্ত নানা ব্যঞ্জন ভাত করে দেয়। সত্ত্বগুণী ভক্তের

পূজার আড়ম্বর নাই। তার পূজা লোকে জানতে পারেনা। ফুল নাই তো বিল্বপত্র, গঙ্গাজল দিয়ে পূজা করে। দুটী মুড়কি দিয়ে, কি বাতাসা দিয়ে শীতল দেয়। কখন বা ঠাকুরকে একটু পায়েস রেঁধে দেয়।

"আর আছে, ত্রিগুণাতীত ভক্ত। তার বালকের স্বভাব। ঈশ্বরের নাম করাই তার পূজা। শুদ্ধ তাঁর নাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

[সাধন, ভাবাবস্থা, ও পীড়া।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবের প্রতি, সহাস্যে)। তোমার অসুখ হয়েছে কেন, তার মানে আছে। শরীরের ভিতর দিয়ে অনেক ভাব চলে গেছে, তাই ঐ রকম হয়েছে। যখন ভাব হয়, তখন কিছু বোঝা যায় না, অনেক দিন পরে শরীরে আঘাত লাগে।

"আমি দেখিছি, বড় জাহাজ গঙ্গা দিয়ে যখন চলে গেল, তখন কিছু টের পাওয়া গেল না। ওমা! খানিকক্ষণ পরে দেখি কিনারার উপরে জল ধপাস্ ধপাস্ কোচ্ছে, আর তোলপাড় করে দিচ্ছে। হয়ত কিনারার খানিকটা ভেঙ্গে জলে পড়লো।

"কুঁড়ে ঘরে হাতী প্রবেশ ক'রলে সে ঘর তোলপাড় করে ভেঙ্গে চুরে দেয়। ভাব-হস্তী দেহ ঘরে প্রবেশ করে, আর তোল-পাড় করে।

"হয় কি জান? আগুন লাগলে কতক গুলো জিনিষ পুড়িয়ে টুড়িয়ে ফেলে আর একটা হৈ হৈ কাণ্ড আরম্ভ করে দেয়। জ্ঞানাগ্নি প্রথমে কাম ক্রোধ এই সব রিপু, তারপর অহং বুদ্ধি, ধ্বংস করে। তারপর একটা তোলপাড় আরম্ভ করে।

"তুমি মনে কোচ্ছো সব ফুরিয়ে গেল। কিন্তু যতক্ষণ রোগের কিছু বাকী থাকে, ততক্ষণ তিনি ছাড়বেন না। হাঁসপাতালে যদি তুমি নাম লেখাও, আর চলে আস্‌বার জো নাই। যতক্ষণ রোগের একটু কসুর থাকে, ততক্ষণ চলে আস্‌তে দেবেনা। তুমি নাম লিখালে কেন!

কেশব হাঁসপাতালের কথা শুনিয়া বার বার হাঁসিতেছেন। হাঁসি সম্বরণ করিতে পারিতেছেন না। থাকেন থাকেন আবার হাঁসিতেছেন। ঠাকুর আবার কথা কহিতে লাগিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবের প্রতি)। হৃদু বোল্‌তো, এমন ভাবও দেখি নাই, এমন রোগও দেখি নাই। তখন আমার খুব অসুখ। সরা সরা বাহ্যে যাচ্ছি। মাথায় যেন দুলাক পিঁপড়ে কামড়াচ্ছে। কিন্তু ঈশ্বরীয় কথা রাতদিন চল্‌ছে। নাটাগড়ের রাম কবিরাজ দেখতে এলো। সে দেখে আমি বসে বিচার ক'রছি। তখন সে বললে 'একি পাগল! দুখানা হাড় নিয়ে বিচার করছে!'

[ঈশ্বর, গুরু ও কর্ত্তা; ঠাকুর রাম-কৃষ্ণের কেশবের জন্য ক্রন্দন।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবের প্রতি)। তাঁর ইচ্ছা। 'সকলই তোমার ইচ্ছা।'

"সকলই তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।
তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা লোকে বলে করি আমি।"

"শিশির পাবে বলে মালি বসরাই গোলাপের গাছ শিকড় শুদ্ধো তুলে দেয়। শিশির পেলে গাছ ভাল করে গজাবে। তাই বুঝি তোমার শিকড় শুদ্ধো তুলে দিচ্ছে। (ঠাকুরের ও কেশবের হাস্য।)

ফিরে ফিরতি একটা বড় কাণ্ড হবে বলে।

"তোমার অসুখ হলেই আমার প্রাণটা বড় ব্যাকুল হয়। আগের বারে তোমার যখন অসুখ হয়, রাত্রি শেষ প্রহরে আমি কাঁদতুম। বলতুম, মা! কেশবের যদি কিছু হয়, তবে কার সঙ্গে কথা কবো। তখন কল্‌কাতায় এলে ডাব চিনি সিদ্ধেশ্বরীকে দিয়েছিলুম। মার কাছে মেনেছিলুম যাতে অসুখ ভাল হয়।

কেশবের উপর ঠাকুরের এই অকৃত্রিম ভালবাসা ও তাঁহার জন্য ব্যাকুলতার কথা সকলে অবাক্ হইয়া শুনিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। এবার কিন্তু অত হয় নাই। ঠিক কথা বোল্‌বো।

"কিন্তু দু তিন দিন একটু হয়েছে।

পূর্ব্ব দিকের যে দ্বার দিয়া কেশব বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই দ্বারের কাছে কেশবের পূজনীয়া জননী আসিয়াছেন।

সেই দ্বারদেশ হইতে উমানাথ ঠাকুর রামকৃষ্ণকে উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন, মা আপনাকে প্রণাম করছেন।

ঠাকুর হাঁসিতে লাগিলেন। উমানাথ বলিতেছেন,—মা বলছেন, কেশবের অসুখটী যাতে সারে। ঠাকুর বলিতেছেন, মা সুবচনী আনন্দময়ীকে ডাকো; তিনি দুঃখ দূর করবেন।

ঠাকুর কেশবকে বলিতেছেন—

"বাড়ীর ভিতরে অত থেকোনা। মেয়ে ছেলেদের মধ্যে থাকলে আরো ডুব্‌বে। ঈশ্বরীয় কথাহলে আরো ভাল থাক্‌বে।

ঠাকুর গম্ভীর ভাবে এই সকল কথা গুলি বলিয়া আবার বালকের ন্যায় হাঁসিতেছেন। কেশবকে বলছেন দেখি তোমার হাত দেখি। ছেলে মানুষের মত কেশবের হাত লইয়া যেন ওজন করিতে লাগিলেন। অবশেষে বলিতেছেন, 'না, তোমার হাত হালকা আছে। খলদের হাত ভারী হয়।

(সকলের হাস্য।)

উমানাথ দ্বারদেশ হইতে আবার বলিতেছেন,—"মা বলছেন, কেশবকে আশীর্বাদ করুন।" শ্রীরামকৃষ্ণ (গম্ভীর ভাবে)। আমার কি সাধ্য! তিনিই আশীর্ব্বাদ কোর্‌বেন। 'তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা লোকে বলে করি আমি'।

"ঈশ্বর দুইবার হাসেন। একবার হাসেন যখন দুই ভাই জমি বখরা করে। আর দড়ি মেপে বলে 'এ দিকটা আমার ও দিকটা তোমার'। ঈশ্বর এই ভেবে হাসেন 'আমার জগৎ'; তার খানিকটা মাটী নিয়ে কোরছে "এ দিকটা আমার এ দিকটা তোমার।"

"ঈশ্বর আর একবার হাসেন। ছেলের অসুখ সঙ্কটাপন্ন। মা কাঁদছে। বৈদ্য এসে বলছে 'ভয় কি মা, আমি ভাল ক'রবো।' বৈদ্য জানে না, ঈশ্বর যদি মারেন, কার সাধ্য রক্ষে করে! (সকলেই নিস্তব্ধ)।

ঠিক এই সময়ে কেশব অনেকক্ষণ ধরিয়া কাশিতে লাগিলেন। সে কাশি আর থামিতেছে না। সে কাশির শব্দ শুনিয়া সকলেরই কষ্ট হইতেছে। অনেক ক্ষণ পরে ও অনেক কষ্টের পর কাশি একটু বন্ধ হইল। কেশব আর থাকিতে পারিতেছেন না। ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন।

কেশব বিদায় গ্রহণ করিয়া অনেক কষ্টে দেয়াল ধরিয়া ধরিয়া সেই দ্বার দিয়া নিজের কামরায় পুনরায় গমন করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ কিছু মিষ্ট মুখ করিয়া যাইবেন। কেশবের বড় ছেলেটী কাছে আসিয়া বসিয়াছেন।

অমৃত বলিলেন, এইটী বড় ছেলে। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন। ওকি! মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করুন।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিলেন, আমার আশীর্ব্বাদ কোরতে নাই। এই বলিয়া সহাস্যে ছেলেটীর গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

অমৃত। (সহাস্যে) আচ্ছা তবে গায়ে হাতই বুলান। (সকলের হাস্য)

ঠাকুর অমৃত ও অন্যান্য ব্রাহ্ম ভক্তদের সহিত কেশবের কথা কহিতে লাগিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (অমৃত আদির প্রতি) 'অসুখ ভাল হোক,' এ সব কথা আমি বোল্‌তে পারিনা। আমি মার কাছে ও ক্ষমতা চাইও না। আমি মাকে শুধু বলি, মা আমাকে শুদ্ধা ভক্তি দাও।

"ব্রাহ্মসমাজ ও বেদোল্লিখিত দেবতা।"

"ইনি কি কম লোক গা। যারা টাকা চায় তারাও মানে, আবার সাধুতেও মানে। দয়ানন্দকে দেখেছিলাম। তখন বাগানে ছিল। কেশব সেন, কেশব সেন, করে ঘর বাহির করছে—কখন কেশব আসবে। সেদিন বুঝি কেশবের যাবার কথা ছিল।

"দয়ানন্দ বাঙ্গলা ভাষাকে বোল্‌তো—'গৌড়াণ্ড ভাষা।"

"ইনি বুঝি হোম্ আর দেবতা মান্‌তেন না। তাই বলেছিল, 'ঈশ্বর এত জিনিষ করেছেন, আর দেবতা কর্‌তে পারেন না?'

ঠাকুর কেশবের শিষ্যদের কাছে আবার কেশবের সুখ্যাতি করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কেশব হীনবুদ্ধি নয়। ইনি অনেককে বলেছেন দক্ষিণেশ্বরে যেও'। বলেছেন, 'যা যা সন্দেহ সেখানে গিয়ে জিজ্ঞাসা করবে।' আমারও স্বভাব এই; আমি বলি—ইনি আরও কোটিগুণে বাড়ুন। আমি মান নিয়ে কি কোরবো?

"ইনি বড় লোক। টাকা চায় যারা তারাও মানে; আবার সাধুরাও মানে।

ঠাকুর কিছু মিষ্ট মুখ করিয়া এইবার গাড়ীতে উঠিবেন। ব্রাহ্ম ভক্তেরা সঙ্গে আসিয়া তুলিয়া দিতেছেন।

সিঁড়ি দিয়া নামিবার সময় ঠাকুর দেখিলেন, নীচে আলো নাই। তখন অমৃতাদি ভক্তদের বলিলেন, এ সব জায়গায় ভাল ক'রে আলো দিতে হয়। আলো না দিলে দারিদ্র্য হয়। এ রকম যেন আর না হয়।

ঠাকুর দু একটী ভক্ত সঙ্গে সেই রাত্রে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে গমনার্থ যাত্রা করিলেন।

উত্তরকাণ্ড কি প্রক্ষিপ্ত? (২)

বিজ্ঞ বঙ্গবাসী সম্পাদক মহাশয় নব্যভারতে প্রকাশিত আমার প্রথম প্রস্তাবের সমালোচনা কালে, যাহাতে এই প্রক্ষিপ্ততা সম্বন্ধে অধিকতর আলোচনা হয়, তদ্বিষয়ে আপন পত্রিকার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং আমি পুনরায় এই বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

সীতার বনবাস উত্তর কাণ্ডের মেরুদণ্ড।

কবি আদর্শ পুরুষ ও রমণী দ্বারা সামাজিক ও নৈতিক উন্নতি সংসাধন করিবার মানসে মহাকাব্য প্রণয়নে ব্রতী হয়েন। তাঁহার কল্পিত বিষয় সমূহ তাঁহার আদর্শের পূর্ণ বিকাশের জন্য অতি কৌশলে নিয়োজিত হইয়া থাকে। সীতার বনবাসে অবশ্য অবশ্যই কবির কোন গূঢ় অভিসন্ধি লুক্কায়িত রহিয়াছে। বনবাস দ্বারা বাল্মীকির আদর্শ-সৃষ্টির কিরূপ সহায়তা হইয়াছে ও কাব্যের কিরূপ গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহাই আমাদের সর্ব্বাগ্রে দেখা কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বের প্রস্তাবে দেখাইয়াছি যে, যে লোক-রঞ্জন-স্পৃহার বশবর্ত্তী হইয়া রাম অনাথা সীতাকে বনবাস দিয়াছিলেন, তাহা উত্তর কালে রাজা ও প্রজা উভয়ের অহিত সাধন করিয়া রাজ্য ধ্বংসের দ্বার অতি সহজে উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়। এইরূপ অবস্থায় রামের মত প্রজ্ঞাবান রাজার পক্ষে এইরূপ প্রজা-রঞ্জন-স্পৃহার বশবর্ত্তী হইয়া নীতি ও ধর্ম্মের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করা কতদূর স্বাভাবিক, তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করিব।

সর্ব্বদর্শী তত্ত্বজ্ঞ বাল্মীকি কেবল কবি নহেন, তিনি যোগ-জ্ঞান-সম্পন্ন ঋষি। ভবিষ্যতে যদি কোন কারণে প্রজা সাধারণের হৃদয়ে সীতার রাক্ষস-গৃহে বাস-জনিত দোষে তাঁহার চরিত্রে কোন রূপ সন্দেহ উপস্থিত হয়, সেই জন্যই পূর্ব্বাহ্ণে অতি কৌশলে তাঁহার অগ্নি-পরীক্ষা দ্বারা সতীত্বের জ্বলন্ত প্রমাণ করিয়া রাখিয়া দিলেন।

অগ্নি পরীক্ষায় তাঁহার সতীত্বের পরীক্ষা হইয়াছিল, পুরাকালে তাঁহার দেব-দুর্লভ চরিত্রের প্রতি সন্দিহান হওয়া কেবল বিকৃত-মস্তিষ্কের পরিচায়ক, তদ্বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। যে সময়ের ঘটনা বাল্মীকির রামায়ণে বর্ণিত হইয়াছে, সেই সময়ে আপামর-সাধারণ দেবতা ও ব্রাহ্মণে অধিকতর শ্রদ্ধাবান ছিল। রামও বাহ্যতঃ সমুদয় দেবতাগণের অনুমোদনে সীতাকে শুদ্ধ ও পবিত্রা জানিয়া পরিগ্রহণ করিয়াছিলেন। সীতার অগ্নি-পরীক্ষা সর্ব্ব সাধারণের প্রবোধের জন্য হইয়াছিল, কিন্তু উত্তর কাণ্ডের বর্ণিত ঘটনার প্রতি প্রণিধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রজা-সাধারণ যেন সহসা কোন অজ্ঞেয় কারণে অতি বিজ্ঞের ন্যায় সীতার সতীত্বে সন্দিহান হইয়া পড়িল। তাঁহার অগ্নি-পরীক্ষা রূপ অদ্ভুত আধ্যাত্মিক কাণ্ডও প্রজা সাধারণের ও রাজমন্ত্রি-বর্গের নিকট নিতান্ত অর্থহীন প্রতারণা বলিয়া উপলব্ধি হইল। তাই প্রজা-সাধারণ আপনাদের প্রতিভূ স্বরূপ ভদ্র নামা মন্ত্রীর দ্বারা অতি অভদ্র ভাবে আপনাদের আন্তরিক অসন্তোষ রামকে জ্ঞাপন করিল। মন্ত্রী-সভাধিষ্ঠিত রাম সহসা ভদ্রের বাক্যে আস্থা স্থাপন করিতে না পারিয়া উপস্থিত সমুদয় সভ্যগণকে অতিশয় উৎকণ্ঠিত চিত্তে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "ভদ্র যাহা বলিতেছে, তাহা কি আমাকে সকলেই বলে ?" তখন সকলে এক বাক্যে ভদ্রের বাক্য সত্য বলিয়া স্বীকার করিল।

(ক) সহসা রাজ-সদস্য ও প্রজা-সাধারণের এইরূপ অন্যায় সন্দেহও অসন্তোষের কোন কারণ উত্তর কাণ্ডে বর্ণিত হয় নাই। রামকে কি অন্য কোন বিশিষ্ট উপায়ে প্রজা-রঞ্জক বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা যাইতে পারিত না ? যেরূপ ভাবে তিনি মিথ্যা লোকাপবাদ ভয়ে ভীত হইয়া আপনার সহধর্ম্মিণীকে বনবাস দিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়াছিলেন

যে, যদি সীতাকে বনবাস না দেওয়া যায়, তবে বুঝি তাহার প্রভুত্বের গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিত না। প্রজারঞ্জনের অন্তরালে তাঁহার হৃদয়ে অতি গোপনে আশঙ্কার ভাব নিহিত ছিল। রামের এই অস্বাভাবিক কার্য্য দ্বারা তাহার প্রজা-শাসনে কিরূপ ক্ষমতা ছিল ও প্রজাগণ তাহাকে কিরূপ চক্ষে দেখিত, তাহা স্পষ্ট অনুমিত হয়।

অনেক বিচক্ষণ লেখক রাম-চরিত্রের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন সময়ে সীতার বনবাসের উল্লেখ করিয়া তাহার উদারতা ও মহানুভবতার পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহারা দেখান যে, রাম আপনার দৈহিক ও মানসিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য প্রজাগণের কল্যাণে অম্লান বদনে বলিদান করিয়াছিলেন। আত্মসুখে জলাঞ্জলি দিয়া প্রজারঞ্জন করাই তাঁহার জীবন ধারণের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু তাঁহারা রাম ও সীতার চরিত্রের অতলস্পর্শ ঔদার্য্য ও বাল্মীকির আদর্শ দম্পতি-সৃষ্টির নিগূঢ় রহস্য বুঝিবার জন্য তেমন প্রয়াস স্বীকার করেন না। তাঁহারা রামকে প্রশংসা করিতে যাইয়া সীতাকে ভুলিয়া যান ও সীতাকে প্রশংসা করিতে যাইয়া রামকে বিস্মৃত হন।

রামায়ণকার যে, স্বামীর অধিকার ও স্ত্রীর স্বত্ব তুলাদণ্ডে সমভাবে তুলিত করিয়া আদর্শ দম্পতি সৃষ্টি করিয়াছেন এবং রামায়ণের আদর্শ রমণী যে পুরুষের উপভোগের সামগ্রী, কি আমোদ ও সুখের জিনিষ নহে, তাহা তাঁহারা আদৌ বুঝিতে চাহেন না। স্ত্রী ও স্বামীর কার্য্যগত পার্থক্য থাকিলেও, রামায়ণে তাঁহারা সমান ধর্ম্মযুক্ত, সমান গুণ ও অধিকার সম্পন্ন। স্বামীর জন্য স্ত্রী, স্ত্রীর জন্য স্বামী, রামের জন্য সীতা ও সীতার জন্য রাম সৃষ্ট হইয়াছেন। সীতা ছাড়া রাম কেহই নহেন ও রাম ছাড়া সীতার পৃথক অস্তিত্ব নাই। তবু তাহাদের উভয়ের স্বত্ব ও অধিকার, প্রকৃতি ও পুরুষের ন্যায় পৃথক হইয়াও সম্পূর্ণ রূপে তুল্য, ইহাই আর্য্য গৃহস্থদিগের সনাতন ধর্ম্ম। রামের প্রতি সীতার যেরূপ কর্ত্তব্য ছিল, সীতার প্রতিও রামের সেইরূপ অবশ্য-প্রতিপাল্য কর্ত্তব্য ছিল। সেই জন্যই ছায়ার ন্যায় সীতা সর্ব্ব সময় সর্ব্ব কার্য্যে রামের অনুগমন করিতেন। রামও সীতা ভিন্ন জীবনের কোন কার্য্য করিতে পারিতেন না। প্রকৃত প্রস্তাবে, রামায়ণ, রমণীর কর্ত্তব্য ও স্বত্বাধিকারের অপূর্ব্ব সংহিতা। রাম সহস্র বার আপনার সুখ শান্তি আপনি জলাঞ্জলি দিতে পারেন সত্য, কিন্তু ন্যায়পরায়ণ রাম স্ত্রীর স্বত্ব ও অধিকারের প্রতি অন্যায় রূপে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। সীতার, রাণীর এবং পত্নীর স্বত্বাধিকার সত্ত্বেও, তাঁহার প্রজাভাবে অপর একটী পৃথক স্বত্বাধিকার ছিল। রামরাজত্বে বিনা দোষে প্রজার কেশাকর্ষণ করিবার কাহারও সাধ্য ছিল না। সীতা একভাবে ধর্ম্মপত্নী, অপরভাবে প্রজা রমণী। তাঁহার প্রতি বিনাদোষে নির্ব্বাসন দণ্ড দূরে থাকুক, কোন রূপ সামান্য দণ্ডাজ্ঞা প্রয়োগ করাও রামের ন্যায় ন্যায়পরায়ণ রাজার আয়ত্তের সম্পূর্ণ বহির্ভূত ছিল।

বাল্মীকি যেরূপ ভাবে আদর্শ দম্পতি সৃজন করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে উত্তরকাণ্ডের বনবাস-বৃত্তান্ত সংযোজিত করা বাল্মীকির প্রদর্শিত নীতি ও ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ, তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়। রামায়ণকার স্বামী ও স্ত্রীর অধিকারের সমতা শিক্ষা দিয়াছেন, বনবাসে তাহার বিপরীত শিক্ষা ও স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অন্যায় প্রভুত্ব করিবার ক্ষমতা

প্রকাশ পাইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে উত্তর কাণ্ডের রাম, বাল্মীকির রাম হইতে যে কত নীচ, হেয় ও কাপুরুষ এবং উত্তর কাণ্ডের প্রজাগণ বাল্মীকির প্রজাগণ অপেক্ষা কতদূর উদ্ধত ও দুর্ব্বিনীত, তাহা আর এখন সুবিজ্ঞ পাঠককে অধিক করিয়া বলিয়া দিতে হইবে না।

সীতার বাহ্যিক অগ্নি-পরীক্ষার দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে প্রীত ও আশ্বস্ত করাই বাল্মীকির উদ্দেশ্য ছিল। রাম আপনার ধর্ম্মপত্নীকে অসতী ভাবিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাঁহাকে পুড়িয়া মারিবার জন্য প্রকারান্তরে অগ্নি-পরীক্ষার আয়োজন করিতে আদেশ করেন নাই। অগ্নি-পরীক্ষা দ্বারা সীতাকে কোনরূপ শাস্তি দেওয়া কাহারও অভিপ্রেত ছিল না। রাম যদি সীতার চরিত্রে কোনও রূপ সন্দিহান হইতেন, তবে অগ্নিপরীক্ষা না করাইয়া অন্য কোন সুন্দর উপায়ে সীতার সাক্ষাৎকার হইতে, তিনি দূরে থাকিতে পারিতেন, তাহা হইলে আর পাত্র পত্নীর সম্মিলন হইত না। কিন্তু যখন সীতাকে তিনি ধর্ম্মপত্নীরূপে স্বীকার করিয়া পিতৃরাজ্য গ্রহণ করিলেন, তখন বনবাস দিয়া তাঁহার প্রতি রাজদণ্ড প্রয়োগ ব্যতীত আর কিছুই করিবার তাঁহার অধিকার ছিল না। রামের ন্যায় রাজার রাজত্ব কালে নিরপরাধের দণ্ড হওয়া কখনও স্বাভাবিক নহে। নিরপরাধের দণ্ড হইলেই ত রাজার অত্যাচার সূচিত হয়। রাম রাজ্যে ত আর তাদৃশ অত্যাচার দৃষ্ট হইত না। তবে যখন তিনি আপনার সহধর্ম্মিণীকে বনবাস দিয়াছিলেন, তখন অবশ্যই তাঁহার বিরুদ্ধে আরোপিত অপবাদ প্রদর্শিত হইয়াছিল। তাই তিনি দোষ সাব্যস্ত হওয়ায় আপনার পত্নীকেও সাধারণ প্রজার ন্যায় যথোপযুক্ত রাজদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। তিনি এমনই সুশাসক ছিলেন যে, পত্নী বলিয়া ন্যায়ের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিলেন না।

সীতার বনবাসে বুঝিলাম, ধার্ম্মিক রাজা সীতাকে নির্ব্বাসন দণ্ড দিয়া লোক-ধর্ম্ম রক্ষা করিলেন। প্রকারান্তরে সীতার দণ্ডে তাঁহার অসতীত্ব প্রমাণিত হইল। সীতা যদি কখনও নির্ব্বাসিতা হইয়া থাকেন, তবে তিনি ভ্রষ্টারূপেই নির্ব্বাসিতা হইয়াছিলেন, নতুবা বাল্মীকি-প্রদর্শিত নীতি অবলম্বন করিয়া রামায়ণ কাব্য বুঝিতে গেলে উহার আর কোন রূপেই অর্থ পরিগৃহীত হয় না। তবেই সীতার বনবাস ঘটনায় হয় রামকে কাপুরুষ এবং অত্যাচারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইবে, নতুবা সীতাকে অসতী এবং পুরুষের উপভোগ্য বস্তু বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাল্মীকির রাম কাপুরুষ ও অত্যাচারী নহেন, এবং সীতাও অসতী এবং পুরুষের উপভোগ্যা বস্তু নহেন। তাহা অতি মূর্খও সহজে স্বীকার করিবে। এই বিসদৃশ অস্বাভাবিক বনবাস ঘটনাতে প্রতিপন্ন হয় যে, বাল্মীকি কখনও উত্তরকাণ্ডের রচয়িতা হইতে পারেন না।

রক্ষিসের জিতেন্দ্রিয়তার প্রশংসার জন্য এক বৎসর প্রতীক্ষার নিয়ম কখনও কল্পিত হয় নাই, উহার উদ্দেশ্য অন্যরূপ। উহা দ্বারা মহাকবি বাল্মীকি এক দিকে যেমন সীতাকে অধিকতর প্রলুব্ধা করিয়া তাঁহার চরিত্রের দৃঢ়তার সহিত পাতিব্রত্যের পরীক্ষা লইয়াছিলেন, অপর দিকে তেমনি অসহায় রাম লক্ষ্মণকে সীতার উদ্ধার সাধনার্থ রাক্ষস কুলান্তক যজ্ঞের বিপুল

আয়োজন করিবার জন্য উপযুক্ত অবসর দিয়াছিলেন। এক দিনে হয় ত কোন রমণী তাহার অমূল্য সতীত্ব রত্ন বিক্রয় করিতে সম্মত হয় না। কেহ হয়ত এক মাসেও স্বীকৃত হয় না, কিন্তু সহজে তাহাদের পতন অসম্ভব নহে। রাবণের ন্যায় ঐশ্বর্য্যশালী প্রবল প্রতাপান্বিত মহারাজাধিরাজ যদি একটী ক্ষুদ্র দীনা রমণীকে নানা প্রলোভনে এক বৎসর কাল যাবৎ প্রলুব্ধ করিতে থাকেন, তবে সেই প্রলোভন হইতে আত্ম রক্ষা করা কি কম সংযম ও তপস্যার ফল! বাল্মীকি এই এক বৎসর কাল প্রতীক্ষার নিয়ম দ্বারা দেখাইলেন যে, সীতার সতীত্ব দেশ ও কালসাপেক্ষ নহে, উহা দেশ ও কালের অতীত। কিন্তু উত্তর কাণ্ডের কবি সতীত্বের এই অপরিসীম মাহাত্ম্য একটুকুও হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া নল কুবেরের অভিশাপের সৃষ্টি করিয়াছেন। উত্তর কাণ্ড পড়িলে বুঝা যায় যে, সীতার বনবাসের ন্যায় লক্ষ্মণ বর্জ্জন ও রামের আত্ম বিসর্জ্জন সমুদয়ই কালনিয়োগ। এই কালের অপর নাম নিয়তি বা অদৃষ্ট। কিন্তু বাল্মীকি-প্রণীত ষড়কাণ্ড যুক্ত রামায়ণ মহাকাব্য পড়িলে দেখা যায় যে, পুরুষার্থ দ্বারা অদৃষ্টকে নিয়মিত ও পরাজিত করিবার জন্যই রামায়ণ কাব্য রচিত করা হইয়াছে। পুরুষার্থের প্রাধান্য সংস্থাপনই যেন রামায়ণ কাব্যের চরম উদ্দেশ্য। ষট্‌কাণ্ডে যাহা অদৃষ্ট ও নিয়তির আদেশ, তাহাই অতি কৌশলে ও নিপুণতা সহকারে পুরুষকারের নিকট পরাভূত হইয়াছে। আর তর্কিত কাণ্ডের বর্ণিত সমুদয় বিষয়ে নিয়তির প্রাধান্যের আতিশয্য লক্ষিত হয়। মানুষের পুরুষকার যেন র চক্রে নিষ্পেষিত হইবার জন্যই আগ্রহান্বিত, ভবিতব্যের রুদ্রমূর্ত্তি যাহা কিছু সুন্দর ও সৎ, সবই যেন নিমেষ মধ্যে ধ্বংস করিতে উদ্যত। স্বাধীন ও উন্নত জাতির মূল মন্ত্র স্বাবলম্বন ও অধ্যবসায়, যাহা পুরুষার্থের নামান্তর, তাহা যেন উত্তরকাণ্ড রাজ্য হইতে দূরে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। পতিত ও পরাধীনতার একমাত্র আশ্বাস ও সম্বল অদৃষ্টরূপী কাল আসিয়া সহসা পুরুষার্থের গলা টিপিয়া ধরিয়াছে। এই পরিবর্ত্তিত নীতি দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইবে, উত্তর কাণ্ড ভারতের জাতীয় অধঃপতনের যুগে কোন অজ্ঞাত নামা কবির দ্বারা রচিত হইয়াছে।

উত্তর কাণ্ডের প্রক্ষিপ্ততা সম্বন্ধে আর একটী প্রমাণ এই যে, মহাভারতে রামায়ণের কথা দুইবার উল্লিখিত হইয়াও, কোথাও সীতার বনবাস ও তাঁহার যমজ পুত্রের এবং লক্ষ্মণ বর্জ্জনের বৃত্তান্ত বর্ণিত হয় নাই। মানুষ সাধারণতঃ আপনার দুঃখ ও বিপদ অন্যের অধিকতর দুঃখ ও বিপদের সহিত তুলনা করিয়া সহ্য করিতে শিক্ষা করে। ধর্ম্মানুষ্ঠান-পরায়ণা ভাগ্যবতী কৃষ্ণা অকারণে জয়দ্রথ কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন বলিয়া যুধিষ্ঠির যখন বিষাদ-ক্লিষ্টচিত্তে মার্কণ্ডেয় ঋষিকে সম্বোধন পূর্ব্বক বিলাপ করিতেছিলেন, তখন রামায়ণ কথা শুনাইয়া মার্কণ্ডেয় তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, ভার্য্যার সহিত রাম যেরূপ কষ্ট পাইয়াছিলেন, এমন আর কখন কেহ পায় নাই। সেই সময় যদি রামায়ণের উত্তরকাণ্ড রচিত হইয়া থাকিত, তাহা হইলে অবশ্যই উপস্থিত অবসরে সীতার বনবাস বৃত্তান্ত

বর্ণনা দ্বারা যুধিষ্ঠিরের মানসিক যাতনা অতিশয় লাঘব করিতে পারিতেন। এবং যুধিষ্ঠির ও দ্রোপদীর সহিত সীতার বনবাস বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া রাম ও সীতা অপেক্ষা আপনাদিগকে ভাগ্যবান মনে করিয়া অপেক্ষাকৃত সুখী হইতে পারিতেন, সন্দেহ নাই।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্ব্বে যেমন অর্জ্জুনের মোহ উপস্থিত হইয়াছিল, যুদ্ধাবসানে যুধিষ্ঠিরের তদপেক্ষা অতি কঠিন মোহ উপস্থিত হয়। যুধিষ্ঠির রাজ্য গ্রহণ করিতে একান্ত বিমুখ হইয়া বন গমনে কৃতনিশ্চয় হইয়াছিলেন। তাঁহাকে প্রবোধ দিবার জন্য অনেক শাস্ত্রীয় যুক্তি প্রদর্শন ও অনেক পৌরাণিক গল্প বর্ণন করা হইয়াছিল। সেই সব গল্প মধ্যে রামচন্দ্রের রাজত্ব বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের ন্যায় মহাভারতের বনপর্ব্বে ও শান্তিপর্ব্বে "চতুর্দ্দশ বৎসর সস্ত্রীক বনবাসের পর ত্রিগুণ দক্ষিণা-সমন্বিত অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন করিয়া রাম একাদশ সহস্র বৎসর অযোধ্যায় রাজত্ব করিয়াছিলেন, উল্লিখিত হইয়াছে। মহাভারতের যুগে সীতার বনবাস ও লক্ষ্মণ বর্জ্জন লোক-সমাজের অজ্ঞাত ছিল বলিয়াই তদ্বিষয় মহাভারতে দৃষ্ট হয় না, এইরূপ, সহজ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই সমীচীন।

আর একটী কথা এই যে, শাখামৃগ বধ করার স্বপক্ষে কোন সারগর্ব্ব যুক্তি না থাকিলেও, বানর ও মনুষ্যের মধ্যে যে বিস্তর প্রভেদ, তাহা কাহাকেও বুঝাইবার আবশ্যক হয় না। সম্বূক নামা কোন শূদ্র দেবত্ব প্রাপ্তির আশায় কঠোর তপস্যা করিয়াছিল বলিয়া অকালে এক ব্রাহ্মণপুত্রের প্রাণ বিয়োগ হইল। ইহার মধ্যে কোন আধ্যাত্মিক সত্য যদিও নিহিত থাকে, তথাপি স্বয়ং অসি প্রহারে বিনা উত্তেজনায় রামচন্দ্রের সেই তপস্যা-নিরত শূদ্রের প্রাণবধ করা যে বর্ব্বরতা ও নির্দ্দয়তার নিদর্শন, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। তপস্যা যদি মোক্ষাভিলাষী শূদ্রের পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা হইয়া থাকে, তবে অনেক সাধু উপায়ে শূদ্রের মুক্তির পথ পরিষ্কার করা যাইত। তপস্যা-নিরত বাল্মীকি তপস্যার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া দয়ার সাগর ন্যায়পরায়ণ রামের দ্বারা তাপসের প্রাণনাশের জন্য ঘাতকের কাজ করাইলেন, ভাবিলে প্রাণ শিহরিয়া উঠে। উপসংহারে বক্তব্য এই যে, অবতারের অবতারণার জন্য কোন মহাকাব্য প্রণীত হয় না। এবং রামায়ণ কাব্যও তজ্জন্য রচিত হয় নাই, লোক শিক্ষার জন্য বাল্মীকি যেরূপ ভাবে আদর্শ দম্পতি সৃজন করিয়াছেন, সেই দম্পতি যে, উত্তর কালে তাঁহাদের চরিত্র গৌরবে অবতারের উন্নত পদে সমাসীন হইয়া প্রীতি ও ভক্তিপ্রাণ ভারতবাসী আর্য্যগৃহস্থগণের হৃদয়ে চিরকাল প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে, তাহা অনুমাত্রও বিস্ময়কর নহে।

মানবচরিত্রে যাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারাই দেখিবেন যে, মানব-সাধারণ চিরকাল প্রতিভাকেই ব্রহ্মশক্তির বিভূতিরূপে বিশ্বাস করিয়া অবতার ভাবে তাঁহার পূজা করিয়া থাকে। রাম ও সীতাকে লক্ষ্মীনারায়ণের অবতার প্রতিপাদনের জন্য উত্তর কাণ্ডের ন্যায় কোন কাব্যের প্রয়োজন হয় না। উত্তর কাণ্ডের অবতারত্বে চরিত্রের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি না হইয়া বরং অধিক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে।

উত্তরকাণ্ড প্রক্ষিপ্ত বলায় আমার কোন লাভালাভ নাই। কোন সম্প্রদায় বিশেষের ধর্ম্ম বিশ্বাসের মূলে আঘাত করিয়া কাহারও মনে কষ্ট দেওয়া আমার অভিপ্রেত নহে। রাম ও সীতার নির্ম্মল দেবোপম আদর্শ চরিত্রে কোনরূপ দোষ বা কলঙ্ক আরোপিত হইলে প্রাণে বস্তুতঃ দারুণ যাতনা অনুভব করি, তজ্জন্যই কয়েকটী অপ্রিয় কথা বলিতে বাধ্য হইলাম।

ইতি মধ্যে আমার প্রথম প্রস্তাবের প্রতিবাদ হইয়াছে। তদ্বিষয়ের আলোচনার সঙ্গে বাল্মীকির কাব্যের আলৌকিক সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করিয়া বারান্তরে দেখাইতে চেষ্টা করিব

শ্রীকুমুদকান্ত বসু

গোঁসাইজীর ছুঁচ্।

"What's the true test of living
A life that's spent in giving."
Alice King

প্রভুপাদ গোবর্দ্ধন গোস্বামী মহাশয় বর্ণে ব্রাহ্মণ, কর্ম্মে সাত্বিক, চর্ম্মে বাঙ্গালী, এবং ধর্ম্মে বিশিষ্ট হিন্দু। তাঁহার সুন্দর ও সাত্বিক দেহে, নবীন বয়সে, যৌবনের মনোমোহিনী ছায়া পতিত হইয়া, অপূর্ব্ব উজ্জ্বলে মধুরে মিশিয়াছে। সুঠাম মস্তকের সুচিক্কণ কৃষ্ণকেশ গুচ্ছের মধ্যে টীকি লম্বমান, গলায় হরিনামের মালা, গাত্রে নামাবলী, ভালে তিলক এবং হস্তে অম্বরাল (ছাতা)। তিনি শিষ্যবাটী হইতে স্বগৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে করিতে,মধ্যাহ্নকালে, জ্যৈষ্ঠের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড ময়ুখমালায় বিদগ্ধ হইয়া, প্রান্তরস্থিত তরুতলে উপবেশন করিলেন। ক্লান্ত ও শ্রান্ত দেহ কিয়ৎ পরিমাণে শান্ত হইলে, অদূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে ঢাক ও ঢোলের উচ্চ বাদ্যধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল; বোধ হইল, সেই গ্রামের ঢাকীরা বাজাইতেছে—

তাক্‌তা গুড়ুম্, তাক্‌তা গুড়ুম্
গুড়ুম্ গুড়ুম্।
গোবর্ গুড়ুম, তাক্‌তা গুড়ুম্
কুড়্‌তা, কুড়্‌তা, গুড়ুম্ গুড়ুম্॥
ইত্যাদি।

তরুতল পরিত্যাগ পূর্ব্বক, প্রভুপাদ গোস্বামী মহাশয় সেই বাদ্যধ্বনিময় গ্রাম মধ্যে প্রবেশ করিয়া আশ্রয়ের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ঢাকীরা কহিল "ঠাকুর গো! এই গ্রামে অনেক ধনবান লোক বাস করে সত্য, কিন্তু গ্রামের প্রায় সকল লোকই অধার্ম্মিক, মিথ্যাবাদী ও কৃপণ। এ গ্রামে মহাশয়ের মত গোস্বামীর পক্ষে আশ্রয় লাভ করা সুকঠিন হইবে।" ঠাকুর কহিলেন "আমি শিষ্যবাটী হইতে স্বগৃহে যাইতেছি, পথিমধ্যে অত্যন্ত ক্লান্ত ও শ্রান্ত হওয়ায় কেবল অদ্যকার দিবসের জন্য একটু বিশ্রাম লাভ করিতে ইচ্ছা করি। রাত্রি প্রভাত হইলেই স্বগ্রামে গমন করিব; বিশেষতঃ এই প্রচণ্ড মধ্যাহ্ন রৌদ্রে পথ চলা অত্যন্ত কষ্টজনক।" ঢাকীরা বলিল "তবে আপনি ধনকৃষ্ণ বাবুর বাটীতে গমন করুন, তিনি জাতিতে তিলি এবং এই গ্রামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনবান পুরুষ। কিন্তু ঠাকুর গো! সে বেটাও ভয়ানক পাপী, তাহার মত মিথ্যাবাদী, পরশ্রীকাতর এবং ভয়ানক কৃপণ, এই পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই।

যাহা হউক, সেই খানেই একবার চেষ্টা করিয়া দেখুন।" বাদ্যকারীবৃন্দের কথা শুনিয়া, গোস্বামী মহাশয় ধনকৃষ্ণ তিলির বাটীতে গমন করিলেন।

মধ্যাহ্নের আহার সমাপন করিয়া, ধনকৃষ্ণ তিলি বহির্বাটীতে উপবেশন পূর্ব্বক ধূম্রপানের সুখসম্ভোগ করিতেছে, এমন সময়ে গোস্বামীকে তাহার বাটীর অভিমুখে আসিতে দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্তির সহিত মনে মনে ভাবিল "কি উৎপাত! এমন সময়ে, এই প্রচণ্ড মধ্যাহ্ন কালে, কোথা হ'তে এই একটা লক্ষ্মীছাড়া অতিথি এসে উপস্থিত হ'লো? নিশ্চয়ই এই বেটা পাকের জন্য চাউল, ডাউল, তরকারী প্রভৃতি প্রার্থনা করিবে, তাহা হইলেই ত সর্ব্বনাশ!!" দেখিতে দেখিতে গোবর্দ্ধন গোঁসাই ধনকৃষ্ণের সম্মুখে উপস্থিত হইল। কিন্তু ধনকৃষ্ণ একটী কথাও কহিল না। ব্রাহ্মণ ঠাকুর তাঁহার উড়ানী প্রসারণ করিয়া এক কোণে উপবেশন করিলেন। এক ঘণ্টার অধিক কাল অতীত হইয়া গেল, তথাপি গোসাঁইজী সে স্থান পরিত্যাগ করিল না দেখিয়া, ধনকৃষ্ণ তিলি মুখ বাঁকাইয়া কহিল "ঠাকুর গো! আপনি যাবেন কোথা? আর কখন যাবেন মনে করিয়াছেন?" গোবর্দ্ধন বলিলেন "বাপুহে! তিন ক্রোশ দূরে আমার গ্রাম; শিষ্যবাটী হইতে স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিতেছি, পথিমধ্যে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া তোমার বাটীতে এক দিনের জন্য একটু বিশ্রাম লাভের হেতু আগমন করিয়াছি।" ধনকৃষ্ণ কহিল, "মহাশয়! আমার বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করা আর না করা, একই কথা; কারণ আমি অতি দরিদ্র, বিশেষতঃ গত সপ্তাহে আমার এক জ্ঞাতির মৃত্যু হওয়ায় আমরা সকলে অশৌচ দোষে অশুদ্ধ হইয়া আছি। আপনি ব্রাহ্মণ, আপনাকে কেমন করিয়া অশৌচ দোষাত্মক গৃহ হইতে চাউল, ডাউল ইত্যাদি দেওয়া যাইতে পারে? আমি তাহা পারিব না; কারণ এই মহাপাপের নিশ্চয়ই কুফল ফলিবে। আর আপনার ন্যায় গোস্বামী পুরুষের পক্ষেও এবাটী হইতে জল, অন্ন অথবা অন্য কিছু দ্রব্য গ্রহণ করা মহাপরাধ।" গোসাঁই কহিলেন "বাপু হে! আমি তোমার নিকটে কিছুই চাই না, আমি কেবল অদ্যকার দিনটা এখানে যাপন করিবার জন্য আসিয়াছি। সম্মুখের পুকুরে জল আছে এবং আমার সঙ্গে কতকগুলা ফল ও মিষ্ট দ্রব্য আছে, তাহাই খাইয়া দিন কাটাইব।" তিলি জিজ্ঞাসা করিল "সন্ধ্যা হইলে কোথায় যাবেন?" গোসাঁই কহিল "রাত্রেও এখানে বিশ্রাম করিব।" ধনকৃষ্ণ ভাবিল "কি সর্ব্বনাশ! এ লোকটা রাত্রেও থাকিতে চায়! চাউল, ডাউল ইত্যাদি কিছু লউক বা না লউক, তামাকুর জন্য অবশ্যই এ ব্যক্তি অনুরোধ করিবে। তাহা হইলে দেখিতেছি, অন্ততঃ দুই পয়সার তামাকু না হইলে ইহার রাত্রি কাটিবে না"। প্রকাশ্যে বলিল, "মহাশয়! আপনার মত অপরিচিত বিদেশীকে স্থান দিতে আমাদের বড় আশঙ্কা হয়, কারণ অল্পদিন হইল মহাশয়ের মত একটা বামুনকে রাত্রে স্থান দিয়াছিলাম, সেই দুষ্টলোক আমাদের প্রায় পনের টাকার জিনিষ চুরি করিয়া পলাইয়াছে। সেই অবধি আমরা আর বিদেশী লোককে রাত্রে স্থান দিই না।" ক্রমে দেখিতে দেখিতে সূর্য্যদেব অস্তমিত হইলেন, অন্ধকার আসিয়া উপস্থিত হইল; সেই অন্ধকার রাত্রে ধনকৃষ্ণ

তিলি প্রভুপাদ গোস্বামী মহাশয়কে বাটী হইতে বাহির করিয়া দিলেন। গোসাঁই ঠাকুর, গ্রামের বাহিরে, এক প্রশস্ত শ্মশানোপরিস্থিত কালীমন্দিরে শয়ন করিয়া মা জগদম্বার পদতলে রাত্রি যাপন করিলেন।

রজনী প্রভাত হইলে, স্বগ্রামাভিমুখে গমন করিতে করিতে গোবর্দ্ধন গোস্বামী মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিতে লাগিলেন 'যদি আমি এতকাল বৃথায় ভগবানের পদারবিন্দ অর্চ্চনা করিয়া না থাকি, যদি আমি এত কাল বৃথায় শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া না থাকি, যদি আমি এত বর্ষ কাল বৃথায় গুরু সহবাস বা বৃথায় তাঁহার কৃপাভোগ করিয়া না থাকি, যদি এক দিনের জন্যও সম্পূর্ণরূপে মন প্রাণ খুলিয়া, হৃদয়ের অভ্যন্তর হইতে উত্থিত ভক্তিভাবের সহিত ভগবানকে স্মরণ করিয়া থাকি, তাহা হইলে এই অধর্ম্মাচারী, মিথ্যাবাদী, ঘোরতর সংসারাসক্ত, এবং ভয়ানক কৃপণ পুরুষ ধনকৃষ্ণ তিলিকে সমুচিত শিক্ষা প্রদান করিব। আমি এই মহাপাপীকে মহাসাধু রূপে পরিবর্ত্তিত করিতে চাই; আমি এই প্রসিদ্ধ কৃপণকে প্রসিদ্ধ দাতা রূপে পরিবর্ত্তিত করিতে চাই।' এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে করিতে গোঁসাই ঠাকুর স্বগৃহে উপস্থিত হইলেন। ঘরে গিয়া রাত্রের ঘটনা কাহাকেও কহিলেন না। নিরন্তর ভগবানকে ডাকিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন "হে প্রভো! তুমি আশীর্ব্বাদ কর; হে বাঞ্ছাকল্পতরু! তুমি আমার মহৎ বাঞ্ছা পরিপূরণ কর।" বাস্তবিক, ভক্তাধীন ভগবান ভক্ত গোস্বামীর কথা শুনিলেন, মহাপাপী ও মহাকৃপণ ধনকৃষ্ণ পরিণামে মহাসাধু ও মহাদাতা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। গোস্বামীর অতুলনীয় আধ্যাত্মিক তেজ ও অসাধারণ বুদ্ধির কথা নিম্নে বিবৃত করিলাম; এই মহাপুরুষের ধর্ম্মতেজে ও ধর্ম্ম বুদ্ধিতে এই অদৃষ্টপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল।

দেখিতে দেখিতে একবর্ষ কাল অতীত হইয়া গেল। গোস্বামী ঠাকুর এই এক বৎসর কাল মধ্যে তাঁহার মাথার কেশ, হাতের নখ, বগলের চুল, দাড়ী বা গোঁপ ক্ষৌরকারের অস্ত্রে স্পৃষ্ট হইতে দিলেন না। এক দিন হঠাৎ গৈরিক বসন পরিধান করিয়া, ভস্মাচ্ছাদিত দেহে, জটাজুট সমাযুক্ত মস্তকে, কমণ্ডলু ও ব্যাঘ্রচর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক, ধনকৃষ্ণ তিলির বাটীতে উপস্থিত হইলেন। ধনকৃষ্ণ তাহাকে দেখিয়া চিনিতে পারিল না। তিলিবর তামাকু টানিতে টানিতে একটা ব্রহ্মচারীকে ঘরে আসিতে দেখিয়া ভাবিল "কি সর্ব্বনাশ! এ বেটা এখনই গাঁজার জন্য অথবা সিদ্ধির জন্য পয়সা প্রার্থনা করিবে, তা ছাড়া চাউল, ডাউল ইত্যাদির ত কথাই নাই! কি বিষম বিপদ! কি বিষম উৎপাত!" ব্রহ্মচারী আসিয়া চুপিচুপি এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন, ধনকৃষ্ণের মুখ হইতে একটা কথাও নিঃসৃত হইল না। তিলিবর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া সায়ংকাল পর্য্যন্ত অদৃশ্য হইয়া রহিল। সন্ধ্যার পরে বহির্বাটীতে আসিয়া ব্রহ্মচারীকে কহিল, "কি আশ্চর্য্য! তুমি এখনও বসিয়া আছ? এ গ্রামে অনেক স্থানে চুরি হইতেছে, পুলীশের লোকেরা বিদেশী অতিথিকে স্থান দিতে নিষেধ করিয়াছে, অতএব তুমি শীঘ্র পলাইয়া যাও, নতুবা পুলীশের সিপাহী আসিয়া তোমাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাইবে।" গোঁসাই কহিলেন "বাপুহে! আমি অদ্যকার রাত্রে এখানে থাকিব না,

তোমার ভয় বা চিন্তা নাই। আমি যে জন্য তোমার বাটীতে আসিয়াছি এবং যেজন্য এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া আছি, তাহার তুমি কিছুই জাননা। তোমার সহিত আমার একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় ও বিশেষ গুরুতর গোপনীয় কথা আছে। কথাটা তোমারই মঙ্গলজনক। ঐ কথাটা তোমাকে গোপনে শুনাইয়া আমি চলিয়া যাইব।" ব্রহ্মচারীর গোপনীয় কথায় তাহার কল্যাণ হইবে শুনিয়া অত্যন্ত কৌতূহলাক্রান্ত অন্তঃকরণে তিনি কহিল "ঠাকুর গো! তবে সেই কথাটা এখনই ব্যক্ত করুন না কেন?" ঠাকুর কহিলেন "না, ভাই, তাহা হইবে না। রাত্রি দ্বাদশ ঘটিকার সময় যখন গ্রামের সমস্ত লোক নিদ্রিত থাকিবে এবং তোমাদের বাটীর কেহই চেতন থাকিবে না, সেই সময়ে তুমি একাকী আমার নিকটে আসিও, তাহা হইলে আমি তোমাকে ঐ কল্যাণকর কথা শুনাইব।" তিনি ধনকৃষ্ণ, দ্বাদশ ঘটিকার জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল; ব্রহ্মচারী মহাশয় ভগবানের নাম যপ করিতে লাগিলেন। স্বার্থপর এবং মহাকৃপণ ধনকৃষ্ণের চক্ষে নিদ্রা আসিল না।

দ্বাদশ ঘটিকার সময়ে ধনকৃষ্ণ একাকী সেই ব্রহ্মচারীর নিকটে উপস্থিত হইলে, ব্রহ্মচারী কহিলেন "বাপুহে! আমরা ব্রহ্মচারী, যোগবলে আমরা সশরীরে স্বর্গে গমন এবং নরক প্রদক্ষিণ করিতে পারি। সম্প্রতি প্রয়োজন বশতঃ একটা লোকের সহিত সাক্ষাৎ জন্য নরকপুরে গিয়াছিলাম। সেখানে একজন জীর্ণা শীর্ণা অতি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক আমার নিকটে আসিয়া কহিল, "বাবা! আপনি কি সশরীরে পৃথিবী হ'তে এসেছেন? বোধ হয়, শীঘ্রই মর্ত্ত্যধামে আবার ফিরিয়া যাইবেন। বাবা! অনুগ্রহ করিয়া আমার একটা সামান্য অনুরোধ রক্ষা করুন।" আমি বলিলাম, "তোমার কি অনুরোধ?" স্ত্রীলোক কহিল, "বাবা! শোধনপুর নামক গ্রামে আমার একমাত্র পুত্র ধনকৃষ্ণ তিনি বাস করে। আমি দুই বৎসর হইল মৃতা হইয়া, কর্ম্ম ফলে, নরকে আসিয়া পতিতা হইয়াছি। আমার বস্ত্রখানি এমন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন এবং মলিন হইয়া গিয়াছে যে, তাহা আর ব্যবহার করা যায় না। আমার পুত্রের সম্পত্তির বার্ষিক আয় প্রায় বিংশ সহস্র মুদ্রা। আমার জন্য একখানি ধুতি বা সাড়ি পাঠাইতে, কৃপা করিয়া তাহাকে অনুরোধ করিবেন।" এই কথা কহিয়া ব্রহ্মচারী সেই তিলিকে বলিলেন "বাপুহে! তোমার মাতাঠাকুরাণীর জন্য একখানি বস্ত্র প্রেরণ করা নিতান্তই আবশ্যক। তুমি ধনবান, একখানি বস্ত্রের মূল্য তোমার পক্ষে অধিক নহে, বিশেষতঃ ঐ বৃদ্ধা স্ত্রীলোক তোমার জননী এবং বিপদগ্রস্তা। অন্ন বিনা স্ত্রীলোকেরা দুই দিবস কাটাইতে পারে, কিন্তু বস্ত্র বিনা দুই মিনিট কালও যাপন করা স্ত্রীলোকের পক্ষে কষ্টকর।" তিনি কহিল, "মহাশয়! আপনি কৃপা করিয়া আমার মাতার অনুরোধ আমাকে শুনাইয়া বাধিত করিলেন, আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি। যাহা হউক, মাতার জন্য অবশ্যই একখানি কাপড় পাঠাইয়া দিব।"

কিয়ৎক্ষণ পরে ব্রহ্মচারী বলিলেন, "বাপুহে! কেমন করিয়া নরকপুরে কাপড় খানা পাঠাইবে, বল দেখি শুনি?" তিনি কহিল, "ঠাকুর গো! ডাকে পার্শেল করিয়া পাঠাইব।" ঠাকুর কহিলেন "বাপু হে!

সেখানে ডাক যায় না, সেখানে পার্শেল চলে না।" ধনকৃষ্ণ বলিল "তবে লোক পাঠাইয়া দিব।" গোঁসাই উত্তর দিলেন "সে স্থান বড় বিষম স্থান, সেখানে লোক যাইতে পারে না।" তখন তিলি কহিল "তবে কি উপায় অবলম্বন করা যায়?" ঠাকুর বলিলেন "তোমার মাতার নিকটে সুতো আছে, তুমি একটা ছুঁচ পাঠাইয়া দাও, তাহা হইলে তিনি কাপড় খানি সেলাই করিয়া লইতে পারিবেন।" ধনকৃষ্ণ কহিল "ছুঁচ কি ডাকে যায়?' গোঁসাই উত্তর দিলেন "না"। তিলি বলিল "ছুঁচ লইয়া আমার এক কুটুম্বকে আমি পাঠাইয়া দিতে পারি।" গোস্বামী কহিলেন "মানুষ না মরিলে সেখানে যাইতে পারে না।" তিলি বলিল "ঠাকুর গোঁ! আমাদের গ্রামে রোগে অনেক লোক মরিতেছে, এই বারে যে প্রথম মরিবে, তাহার হাতে ছুঁচ পাঠাইয়া দিব।" গোসাঁই কহিলেন "কেমনে পাঠাইবে? সেত মৃত!" তিলি বলিল "তাহার কাপড়ে বাঁধিয়া দিব"। ঠাকুর কহিলেন, "দেখিতেছ না, তাহার কাপড়, চাদর, অধিক কি, অস্থি চর্ম্ম পর্য্যন্ত ভস্মসাৎ হইবে, তবে সে কেমন করিয়া ছুঁচ লইয়া যাইতে পারে? বড় লাট বা ছোট লাট সাহেব কিম্বা মহারাজা বা নবাবেরাও ইচ্ছা করিলে সেখানে একটী ছুঁচও লইয়া যাইতে পারে না। বাপু হে! খালি হাতে জন্মিয়াছ, খালি হাতে মরিতে হইবে।" কথা শুনিয়া ধনকৃষ্ণের আক্কেল গুড়ুম হইল; কাতরভাবে বলিল, "প্রভো! তবে কি মৃত্যুর পরে একটা ছুঁচও সঙ্গে যাবে না? প্রভো! আমার সম্পত্তির বাস্তবিক. বিংশ সহস্র মুদ্রা বার্ষিক আয়, এই সমুদয় সম্পত্তি কেবল লোষ্ট্রের ন্যায় পড়িয়া থাকিবে? এক পয়সায় পঁচিশটা সুঁচ, অহো! ইহার একটা ছুঁচও সঙ্গে যাবে না?" গোস্বামী কহিলেন "না বাপু! একটা ছুঁচও সঙ্গে যাবে না।" ধনকৃষ্ণ তিলির অন্তরাত্মা চমকিত হইল, তাহার চক্ষু হইতে নিদ্রা দূরে পলাইয়া গেল। এই প্রাণস্পর্শী কথার পরে আর কি পোড়া চোখে নিদ্রা আসে? কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁহার ধন্যাত্মক কবিতা মালার একস্থলে লিখিয়াছেন—

পয়জার্ চট্ চট্, কিল্ গুম্ গুম্।
আঁক পাক ঘুরাইল আর কোথা ঘুম॥

গোস্বামীর ছুঁচের কথা, তিলির হৃদয়কে ছুঁচের ন্যায় বিদ্ধ করিতে লাগিল। বোধ হইল যেন অনুতাপের শত শত পয়জার (জুতা) এবং শত কিল্ তাহার হৃদয়কে ব্যথিত করিতেছে। তিলিবর পুনরপি কহিল "প্রভো! তবে আমার গতি কি হ'বে?" এবারে তাহার চক্ষু হইতে দর দর ধারায় অশ্রু পতিত হইতে লাগিল, দিব্য চক্ষে যেন সম্মুখে নরকের ভীষণ হুতাশনকে ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতে দেখিতে পাইল; বোধ হইল যেন জ্বলন্ত ও জীবন্ত নরক—সর্ব্বগ্রাসী নরক—মুখব্যাদন করিয়া তাহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। ধনকৃষ্ণের অন্তরাত্মা চমকিল, তাহার হৃদয়ে অধ্যাত্মভাব প্রবেশপথ পাইল।

শরতের শুভ্র আকাশ হইতে মনোহারিণী পূর্ণিমার পূতালোক সেই নবীন ব্রহ্মচারীর সুন্দর ও সাত্ত্বিক বদনোপরে পতিত হইয়াছে। সেই মুখে স্বর্গের জ্যোতি প্রতিবিম্বিত হইতেছে; ধনকৃষ্ণ সেই মুখ দেখিয়া চীৎকারস্বরে কহিল "আমার ঘরে আজি দেবতার আগমন হইয়াছে; এই স্বর্গীয়

পারে না। তদবস্থায় কেবল মাত্র আনন্দ অবশিষ্ট থাকে। যতদিন শরীর ও ইন্দ্রিয়, ততদিনই সুখ দুঃখের অনুভব। শরীর ধ্বংস হইলে,—স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় শরীরের ধ্বংস হইলে,—আত্মার প্রকৃত স্বরূপ দেখা দেয়। তখন তার বৈষয়িক বিশেষ বিশেষ প্রকারের সুখ দুঃখ থাকে না। সে অবস্থায় সুখ দুঃখ থাকে না বলিয়া, আত্মার ধ্বংস হয়, একথা মনে করিও না। সুখ দুঃখ থাকে না বলাতে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, তৎকালে, মনুষ্য ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা যে বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া নির্ব্বাহিত করে, তাহার ফল স্বরূপ যে বিশেষ বিশেষ সুখ দুঃখ অনুভব করে, তাদৃশ বৈষয়িক সুখ দুঃখ থাকে না, এইমাত্র বুঝিতে হইবে। এরূপ সুখ দুঃখ সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল; এ সুখ দুঃখের উৎপত্তি ও ধ্বংস আছে; ইহাদের রূপান্তর আছে। সুতরাং ইহারা আত্মার স্বরূপ নহে। অপরিবর্ত্তনীয়, নিত্য, আনন্দই আত্মার স্বরূপ। বৈষয়িক সুখাদি সেই নিত্য আনন্দেরই আংশিক ও পরিমিত পরিচয় মাত্র প্রদান করে। প্রকাশ করাই যেমন সূর্য্যের স্বরূপ; ইহা প্রকাশ করা, উহা প্রকাশ করা প্রভৃতি যেমন তাহার স্বরূপ নহে; তেমনি আনন্দই আত্মার স্বরূপ; এই সুখ বা ঐ সুখ, বা এই দুঃখ বা ঐ দুঃখ ইত্যাদি তাঁহার স্বরূপ নহে। অর্থাৎ যাবতীয় বিষয়জ সুখ দুঃখ সেই আনন্দেরই অন্তর্ভুক্ত। যাহারা বৈষয়িক সুখ দুঃখকে কেবলমাত্র সেই সেই প্রকারের সুখ দুঃখ মাত্ররূপে মনে করে, তাহারা অজ্ঞানী। যাঁহারা সেই দুঃখ সুখকে, সেই ব্রহ্মানন্দেরই অংশ ও পরিচায়ক রূপে, সমুদয় সুখ দুঃখের মধ্যে সেই আনন্দকেই দেখিতে পান, তাঁহারাই প্রকৃত জ্ঞানী। বৈষয়িক জ্ঞান ও বৈষয়িক, ক্রিয়া সম্বন্ধেও এই কথাই বুঝিতে হইবে। প্রত্যেক বৈষয়িক খণ্ড খণ্ড জ্ঞানকে, সেই নিত্য অখণ্ড জ্ঞানেরই অংশরূপে—পরিচায়করূপে বুঝিতে হয়; যাহারা সেই সেই বৈষয়িক জ্ঞানকে কেবল মাত্র সেই সেই প্রকারের জ্ঞানমাত্র রূপে দেখিয়া থাকে, তাহারা ভ্রান্ত ও অজ্ঞানী। কথাটা এই যে, প্রত্যেক বৈষয়িক জ্ঞান, ক্রিয়া ও সুখ দুঃখের মধ্যে সেই অখণ্ড নিত্য ব্রহ্ম স্বরূপকেই realise করিতে হইবে। এক অখণ্ড ও নিত্য ব্রহ্মশক্তি, ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মানন্দের পরিচয়,—বৈষয়িক প্রত্যেক খণ্ড জ্ঞানে, খণ্ড ক্রিয়ায় ও খণ্ড সুখ দুঃখে—লইতে হইবে। যাঁহারা এইরূপ পরিচয় লইতে পারেন, তাঁহারাই প্রকৃত জ্ঞানী। নতুবা বিষয়-সংস্পর্শজ সুখাদিকে কেবলমাত্র সুখাদিরূপে ধরিয়া লওয়া অজ্ঞানীর কার্য্য। সুষুপ্তির সময়ে যে ব্রহ্মজ্ঞান ফুটিয়া থাকে, তাহা এইরূপ জ্ঞানই। বৈষয়িক কোন বিশেষ প্রকারের অনুভূতি সে সময়ে থাকে না। তৎকালে সমস্তই ব্রহ্মের স্বরূপানুভূতিতে পরিণত হয়। আত্মচৈতন্য, সর্ব্ব প্রকার জ্ঞান, ক্রিয়া ও সুখের সামান্য আধার; তিনি বিশেষ কোন প্রকার খণ্ড জ্ঞান, ক্রিয়া বা সুখ নহেন। সমুদয় জ্ঞান ক্রিয়া সুখাদি সেই অখণ্ড নিত্য জ্ঞানাদিরই পরিচায়ক অংশ মাত্র। সুষুপ্তিকালে সেই "সামান্য" আধারের অনুভূতি বর্ত্তমান থাকে; "বিশেষ" অনুভূতি অন্তর্হিত হয় বা তাহারাই অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়।

বায়ুর কোন অবয়ব বা শরীর নাই; মেঘ বিদ্যুৎ প্রভৃতিরও কোন হস্ত পদাদি বিশিষ্ট আকার নাই। বর্ষণাদি প্রয়োজন

সিদ্ধ হইবা মাত্র, ইহাদের আর মেঘাদি আকার থাকে না; ইহারা আকাশ স্বরূপে লীন হইয়া যায়। বর্ষণাদি প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই, আকাশ হইতে ইহারা মেঘাদিরূপে আবির্ভূত হয়। শীত ঋতুর অবসানে, সূর্য্যরশ্মির উত্তাপ বশতঃ বায়ু স্তিমিত ভাব পরিত্যাগ করতঃ, ঝটিকারূপ ধারণ করে, মেঘ পর্ব্বত বা হস্তির আকারে দেখা দেয়, বিদ্যুৎ জ্যোতির্লতার ন্যায় চাপল্য অবলম্বন করে;—এইরূপে বর্ষাকালে ইহারা স্ব স্ব রূপ ধারণ করিয়া থাকে। জীব ও সংসারাবস্থায়, 'আমি অমুকের পুত্র,' 'আমি জন্মগ্রহণ করিলাম,' 'আমার এই যে যৌবন কাল উপস্থিত হইল'—ইত্যাদি রূপ ধারণ করিয়া থাকে। প্রকৃত জ্ঞান জন্মিলে, আত্মা দেহেন্দ্রিয়াদি ধর্ম্ম বিশিষ্ট নহে,—এই জ্ঞান জন্মিলে,—মেঘাদি যেমন বর্ষাবসানে আকাশ স্বরূপে পরিণত হয়, সেইরূপ জীবও স্ব স্ব রূপে উপনীত হয়। এই আত্মাকে "উত্তম পুরুষ" বলে। এই উত্তম-পুরুষ, কাজেই, পূর্ব্বোক্ত "অক্ষি-পুরুষ", "স্বপ্ন-পুরুষ", ও "সুষুপ্ত পুরুষ" অপেক্ষা পৃথক্। এ অবস্থায় প্রকৃত জ্ঞান লাভ হওয়ায়, অবিদ্যার বিন্দুমাত্র সংস্রব থাকে না। ইহাই মুক্তাবস্থা। এ অবস্থায় আত্মার আর শরীর বা বিষয়-বাসনার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ থাকে না। রথাদি আকর্ষণ করিয়া লইবার জন্য যেমন অশ্বাদিকে রথাদিতে আবদ্ধ করিয়া দেওয়া যায়, সেইরূপ এই শরীর রূপ রথে জীবের কর্ম্ম ফল ভোগার্থ, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, বুদ্ধি প্রভৃতি নিযুক্ত আছে। রাজা যেমন অমাত্যকে রাজ্যাধিকারে নিযুক্ত করে, ঈশ্বরও তদ্রূপ জীবকে তখন দর্শন শ্রবণ ও চেষ্টাদি ব্যাপারে নিযুক্ত করেন *। সেই জীবের চক্ষুরিন্দ্রিয়টী রূপোপলব্ধির দ্বার স্বরূপ; ব্রহ্মচৈতন্য এই উপাধিভূত চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা রূপ দর্শন করিয়া থাকেন। ইন্দ্রিয় গুলি সমস্তই বিষয়োপলব্ধির সাধন। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, যিনি এই দেহে থাকিয়া, ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন, তিনিই জীব। (প্রজাপতি "অক্ষি পুরুষ" শব্দে এই তত্ত্বেরই ইঙ্গিত করিয়াছিলেন)। তাঁহারই গন্ধ বিজ্ঞানের জন্য ঘ্রাণেন্দ্রিয়, অভিব্যাহরণ ক্রিয়া সম্পাদনার্থ বাগিন্দ্রিয়, শ্রবণার্থ শ্রবণেন্দ্রিয়, এবং চিন্তাদি ব্যাপার নির্ব্বাহার্থ মন। জ্ঞানই আত্মার স্বরূপ এবং ইন্দ্রিয়গুলি জ্ঞানোপলব্ধির দ্বার মাত্র। দর্শনাদি ক্রিয়াগুলি অন্তঃকরণেরই বৃত্তিবিশেষ; এই বৃত্তিবর্গই সেই অসঙ্গ, নির্লিপ্ত, একরস ব্রহ্মচৈতন্যের বিষয়বোধের হেতু; সেই বিষয় বোধ নির্ব্বাহার্থ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন। আত্মার এই অন্তঃকরণ বৃত্তি বা সামর্থ্য আছে।"

প্রজাপতির এই উপদেশের শেষ অংশে একটী প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে, আত্মা যদি কেবল মাত্র জ্ঞান স্বরূপই হইলেন, তবে তাঁহার কর্তৃত্ব (agentship)

* টীকাকার আনন্দ গিরি বলেন যে, দেহাদি ব্যতিরিক্ত যে আত্মা আছেন, তাহা এতদ দ্বারাই বুঝা যায়। রথাদি অচেতন পদার্থের ক্রিয়া যেমন চেতন পুরুষের দ্বারাই সম্পাদিত হয়, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াও তদ্রূপ চেতন দ্বারাই প্রযুক্ত হয়। অচেতন জড়ের নিজের ক্রিয়া করিবার অধিকার নাই, চেতন দ্বারা চালিত হওয়া আবশ্যক। আবার সংহত পদার্থ মাত্রই পরের প্রয়োজনের জন্য সংহত হয়; যেমন শয্যাসনাদি কোন পুরুষের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য, ইন্দ্রিয়াদির সম্মিলন জাত দেহও অবশ্য কোন চেতনের প্রয়োজনের জন্য মিলিত।

সিদ্ধ হয় কিরূপে? হিন্দু শাস্ত্র সর্ব্বত্রই ত আত্মাকে উদাসীন, নিষ্ক্রিয় প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন। যদি আত্মা নিষ্ক্রিয় ও উদাসীন হইলেন, তবে তাঁহার দ্বারা জগৎসৃষ্টি সম্পাদিত হইল কিরূপে এবং তিনি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়েরই বা চালক হইবেন কিরূপে? শ্রুতিতে নানা স্থানে আত্মাকে যেমন উদাসীন বলা হইয়াছে, তদ্রূপ তাঁহাকে অন্তর্যামী ও প্রতি পদার্থের নিয়োগকর্ত্তা চালক বলিয়াও কথিত হইয়াছে। এখন দেখিতে হইবে যে, ইহার সামঞ্জস্য কোথায়? এবিষয়ে শঙ্করাচার্য্যেরই বা প্রকৃত অভিপ্রায় কিরূপ? বিষয়টী বড় গুরুতর; এই বিষয়টী হিন্দু দর্শনের নিতান্ত প্রয়োজনীয় অংশ। অনেকে ইহা বুঝিতে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। আমরা বারান্তরে এ বিষয়ে হিন্দুদর্শনের প্রকৃত সিদ্ধান্ত কিরূপ এবং কি অভিপ্রায়ে ব্রহ্মকে নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় ও উদাসীন বলা হইয়াছে, তাহার বিচার করিয়া দেখিব। (ক্রমশঃ)।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী।

কঠ। *

প্রথম অধ্যায় প্রথম বল্লী।

বাজশ্রবা যজ্ঞ ফল লাভের কারণ
সর্ব্বস্ব করিয়া দান করিছে মনন।
নচিকেতা নামে পুত্র সাধুচিত্ত অতি,
জিজ্ঞাসিছে পিতৃদেবে করিয়া মিনতি।
একবার দুইবার তিন বার সুত
জিজ্ঞাসে পিতারে অতি নির্ব্বন্ধ সহিত।
"সকলি দিলেন পিতা; এখন আমারে
কাহারে করিবে দান, কহ সত্য ক'রে।"
বারম্বার জিজ্ঞাসায় ক্রুদ্ধ হ'য়ে পিতা
কহে, "তোরে দিব যমে, শুন নচিকেতা।"
নচিকেতা ভাবে মনে, "আমিত কখন
পুত্রত্ব শিষ্যত্ব গুণে নহিক অধম।
কি হেতু আমারে পিতা দিবেন শমনে
কি কার্য্য যমের মোরে, কহিব কেমনে।"
এত ভাবি নচিকেতা কহিলা সত্বর,—
"সত্য সনাতন ধর্ম্ম আছে পূর্ব্বাপর।
মানব শস্যের ন্যায় মরে জীর্ণ হ'লে,
শস্যের সমান পুনঃ জন্মে ধরাতলে।
অতএব, তাত, মিথ্যা নাহি প্রয়োজন,
মোরে যমে দিয়া সত্য করুন পালন।"
এত শুনি বাজশ্রবা আপন তনয়ে
সত্য রক্ষা হেতু দিলা যমের আলয়ে।

* ক্রমে প্রধান প্রধান উপনিষৎ সকল পয়ারাদি চির প্রচলিত সহজ ভাষায় অনুবাদিত হইলে বঙ্গবাসীর প্রভূত উপকার সাধিত হয়, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী নাম দিয়া কঠোপনিষদের মর্ম্মানুবাদ প্রকাশ করিলাম। অন্যান্য উপনিষদ্ যথাকালে প্রকাশিত হইবে।

ভ্রম সংশোধন।

প্রথম মুণ্ডক	প্রথম খণ্ড	প্রথম পংক্তি	"অঙ্কিরা" স্থলে	অঙ্গিরা হইবে।
,,	,,	৫ পং	,, ,,	,, ,,
দ্বিঃ মুঃ	১ম খণ্ড	৭ পং	"লোমরূপ" ,,	নাম রূপ হইবে।
,,	২য় খণ্ড	১৫ পং	"সথা" ,,	যথা ,,
তৃ মুঃ	১ম খণ্ড	শেষ পং	"ভাবিবে" ,,	লভিবে ,,
,,	২য় খণ্ড	১০ পং	"বিস্ময়', ,,	নিশ্চয় ,,
,,	,,	৩১ পং	"সেই" ,,	যেই ,,

তখন না ছিলা যম আপন আবাস,
নচিকেতা গিয়া তথা কৈলা উপবাস।
অতিথি সৎকার তাঁ'র কিছু না হইল।
ত্রিরাত্রি অতীতে যম ফিরিয়া আইল।
আলয়ে আসিয়া হেরে ব্রাহ্মণ কুমার,
পাদ্য আদি কিছু নাহি অতিথি সৎকার।
"অতিথি অগ্নির ন্যায় গৃহে বাস করে,
সৎকার না হ'লে তিনি সব দগ্ধ করে।
অতিথি যাহার গৃহে থাকে উপবাসী,
সাধু সঙ্গ, পূর্ত্তকর্ম্ম, যাগ যজ্ঞ রাশি
সকলি বিফল হয় সেই পাপ তরে।"
এ ভাবে কহিলা সবে যমের গোচরে।
যম ভীত হ'য়ে তাঁরে করি নমস্কার,
কহিলা, "ব্রহ্মণ মোরে করহ উদ্ধার।
ত্রিরাত্রি আমার গৃহে আছ অনাহারে,
এ হেতু তিনটী বর দিবহে তোমারে।
এক এক রাত্রি হেতু এক এক বর,
লও তুমি আমা হ'তে, মাগহ সত্বর।"
নচিকেতা কহিলেন, "শুনহ শমন,
তিন বর মধ্যে এক করি নিবেদন।
পিতা যেন মোর শোকে না হন বিকল,
প্রসন্ন হউন তিনি, শান্ত, অচঞ্চল।
ক্রোধ-শূন্য হন তিনি আমার উপরে।
সম্ভাষণ করি মোরে লন যেন ঘরে,
যবে এই পুরী হ'তে তাঁহার চরণে
যাইব ফিরিয়া আমি আপন ভবনে।
প্রথমে এ বর মোরে করুন প্রদান,
তা' হ'লে অপর যাচি তব সন্নিধান।
"তথাস্তু" বলিয়া যম দিলেন এ বর,
"অন্য বর মাগ" বলি কহিলা সত্বর।
নচিকেতা কহিলেন কৃতান্তে তখন
"যজ্ঞের অগ্নির বার্ত্তা করুন বর্ণন।
অগ্নি আদি সত্বা, জীব জানিলে তাহারে
দিব্য জ্ঞান লভে; তাই কহ দয়া ক'রে।"

অগ্নির বিষয় যম কহিলা নিবেদি,
যেই জ্ঞানে মুক্ত হয় মৃত্যুপাশ ছেদি।
শুনিলেন নচিকেতা প্রশান্ত অন্তরে,
আবৃত্তি করিলা পরে শুনি ভক্তিভরে।
তখন তৃতীয় বর যাচি নচিকেতা
জিজ্ঞাসিল যমে;—"মো'রে কহ এই কথা:-
কেহ বলে মৃত্যু হ'লে কিছু নাহি রহে,
মরিলেও সব-ই রহে, অন্য জন কহে।
এ মহা সংশয় স্থল; তুমি জ্ঞান সার,
শুনিতে বাসনা বড় হ'য়েছে আমার।
কহ বিবরিয়া তথ্য, মরিলে কি হয়?
হে মৃত্যু, মৃত্যু কি বস্তু শুনিব নিশ্চয়।"
উত্তর করিলা যম; "শুন নচিকেতা,
জিজ্ঞাসিলা যেই ধর্ম্ম, অতি সূক্ষ্ম কথা।
অতীব দুর্গম তথ্য, গুপ্ত চরাচরে,
ত্যাগ কর এ সাধনা, মাগ অন্য বরে।"
নচিকেতা কহে; "যম, এই তত্ত্ব জ্ঞান
অন্যে কভু নাহি জানে তোমার সমান।
এ তত্ত্ব অতুল ভবে, শুনিব তাহাই,
এই বর নাহি দিলে অন্য নাহি চাই।
কত মতে বুঝাইলা কৃতান্ত তখন,
আয়ু পুত্র রাজ্য ভোগ নানাবিধ ধন—
বর দিতে কত মতে করিলা সাধনা,
এ প্রশ্নে নিবৃত্তি হ'তে কৈলা উপাসনা।
নচিকেতা কৃতান্তের নিষেধ না মানি
জিজ্ঞাসিলা;—"প্রেতপতি,কহ সে আপনি,-
মরিলে কি হয়, তাহা কহ বিবরিয়া;
আয়ু পুত্র রাজ্য ধন কি হবে লইয়া?
এ সকল ক্ষণস্থায়ী। কি কাজ ইহার?
এ সব বিভব-ভোগ থাকুক তোমার।
আমারে এ তত্ত্ব কহ, মরিলে কি হয়;
এই জ্ঞানে ভব বন্ধ খণ্ডিবে নিশ্চয়।

প্রথম বল্লী সমাপ্ত।

প্রথম অধ্যায়। দ্বিতীয় বল্লী।

বিশেষ পরীক্ষা করি যোগ্য ভাবি যম
নচিকেতা সন্নিধানে কহিলা তখন।

"শ্রেয় মোক্ষদাতা, প্রেয় ভোগার্থ সাধক,
শ্রেয় প্রেয় ভিন্ন বস্তু, পৃথক পৃথক।
বিভিন্ন ভাবেতে বাঁধে পুরুষে উভয়ে,
শ্রেয়ে মুক্তি, প্রেয়ে ভোগ, জানিবা হৃদয়ে।
জ্ঞানীজন শ্রেয় ইচ্ছা করে অনুক্ষণ।
অজ্ঞানীর চিত্ত প্রেয় করে আকর্ষণ।
কত ধন, রত্ন রাজি, আপাত সুন্দর
রমণীয় ভোগ্য বস্তু লোভিতেছে নর;
লোভিতেছে, ডুবিতেছে মোহের কর্দ্দমে;
তুমি না পড়িলা সুধী সে বিষম ভ্রমে।
না লইলা, নচিকেতা, সেই সব বর,
এ হেতু তোমারে কহি তত্ত্ব জ্ঞানীবর।
বিদ্যা ও অবিদ্যা, দুই বিপরীত গতি,
বিদ্যার্থীর ভোগ সুখে নাহি হয় মতি।
অন্ধে অন্ধজন পথ দেখালে যেমন
পথভ্রষ্ট বক্রপথে করয়ে ভ্রমণ;
সেই রূপ জ্ঞানহীন, যদি আপনারে
জ্ঞানী জন বলি মনে বিবেচনা করে।
ধনগর্ব্বী মুগ্ধচিত্ত অবিবেকী জনে
পরলোক মিথ্যা, সত্য ইহলোক জানে।
আত্মা আছে, নাই; কর্ত্তা, অকর্ত্তা আত্মাই;
এ হেন বিতণ্ডা বহু হইছে সদাই।
আত্মবিৎ সূক্ষ্মদর্শী গুরু না হইলে
আত্মজ্ঞান লাভ নাহি হবে কোন কালে।
আত্মা অতি সূক্ষ্ম বস্তু, সূক্ষ্ম অণু হ'তে,
তর্কে তাহা, নচিকেতা, বুঝিবা কি মতে?
আমা হ'তে শুনি তুমি যে জ্ঞান লভিবে,
তর্ক পরাভূত তাহে নিশ্চয় জানিবে।
শাস্ত্র পথে, তত্ত্বদর্শী গুরুর কৃপায়
যে জ্ঞান লভিবে নর, সেই ত অক্ষয়।
অন্য হ'তে সেই জ্ঞান কভু নাহি হয়।
অনিত্য বস্তুর সেবা করিলে কখন,
নিত্যবস্তু জ্ঞান নেত্রে হয় কি দর্শন?
অনিত্য বিষয়-সুখ করি পরিহার
নিত্য বস্তুতত্ত্বে চিত্ত করহ প্রসার।
বাসনার তৃপ্তি যাহে, যিনি যজ্ঞফল,
জগৎ আশ্রয় যিনি, অত্যন্ত নিষ্কল,
তাঁহারে মনন করি লভ আত্মজ্ঞান;
কোন বস্তু নহে কভু তাঁহার সমান।
দুর্দর্শ্য, দুর্গম, সূক্ষ্ম, জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত,
সে আত্মা হৃদয়রূপ গুহায় নিহিত।
দেহ হ'তে অতি ভিন্ন, পবিত্র, প্রাচীন,
এ ভাবে বুঝিয়া হও হর্ষ শোক হীন।"
নচিকেতা কহিলেন শমনে তখন,
"সে বস্তু আমারে যম করহ কীর্ত্তন,—
ধর্ম্মাধর্ম্ম, কার্য্য, হেতু, হইতে পৃথক,
যিনি অতিক্রম করে ভূত ভবিষ্যৎ।"
যম। "যাঁহার কীর্ত্তন বেদ, তপঃ যাঁর তরে,
ব্রহ্মচর্য্য কি তপস্যা যাঁরে ব্যক্ত করে,
সংক্ষেপে তাহার তত্ত্ব শুন নচিকেতা,—
তিনি ওঁ, প্রণবের গভীর বারতা।
ব্রহ্ম এ অক্ষর, শ্রেষ্ঠ, এই ব্রহ্মপথ,
এ অক্ষর লাভ হ'লে সিদ্ধ মনোরথ।
মেধাবী আত্মার নাহি জন্ম কিম্বা ক্ষয়,
তাহা হ'তে কোন বস্তু উদ্ভব না হয়।
অজ নিত্য আত্মা কভু দেহের সহিত
নাহি হয় নাশ, ইহা জানিবে নিশ্চিত।
দেহ হত হ'লে আত্মা নাহি হয় হত,
সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্মতর বৃহৎ শাশ্বত।"

নচিকেতা।—
"কেমনে, কৃতান্ত, হয় আত্মার দর্শন?
কহ প্রকাশিয়া বার্ত্তা করিব শ্রবণ।"
যম। "বাসনার উদ্বেগ, ইন্দ্রিয় বিকার,
সুখ দুঃখ বোধ যবে করি পরিহার,
আত্মার দর্শনে আত্মা অভিলাষী হবে,
অবশ্য দর্শন তা'র লভিবে, লভিবে।
প্রশান্ত সু-স্থির জনে আপনার কথা
আপনি প্রকাশে আত্মা, নহেক অন্যথা।

আত্মা অবস্থিত, তবু দূরগতিশীল
আত্মা সুখ দুঃখ, দ্বন্দ, বিশুদ্ধ পঙ্কিল।
আত্মা ভিন্ন আত্ম তত্ব অন্যে নাহি জানে,
জিজ্ঞাস তাহারে, যদি লভিবে সে জ্ঞানে।
অরূপ হ'য়েও তিনি দেহে অবস্থিত,
সূক্ষ্ম, তবু ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত সুনিশ্চিত।
বহু শাস্ত্রে, কোন শাস্ত্রে, শুন নচিকেতা,
নাহি তিনি, কিম্বা তাঁর অতর্ক্য বারতা।
তিনি যারে নিজরূপ করেন প্রকাশ,
আত্ম মাঝে হেরে সেই তাঁহার বিকাশ,
আত্ম মাঝে আত্মজ্ঞান গূঢ়ভাবে রহে,
অপ্রশান্ত জনে তাহা বোধগম্য নহে।

দ্বিতীয় বল্লী সমাপ্ত।

প্রথম অধ্যায়। তৃতীয় বল্লী।

জীব ব্রহ্ম দুইজন হৃদয়-গুহায়,—
তাহে জীব মাত্র নিজ কর্ম্ম ফল পায়।
ব্রহ্মে নাহি ফলভোগ, তথাপি জীবের
সম্বন্ধে ভোক্তৃর ন্যায় অবস্থা ব্রহ্মের।
আলো, ছায়া, যেইমত, তেমতি উভয়,
ছায়ায় নাহিক আলো, তবু দৃষ্টি হয়।
আলো, ছায়া, এ দুইএর বিপরীত ধর্ম্ম,
জীব কর্ম্ম ফল ভোগী, ব্রহ্মে নাহি কর্ম্ম।
জীবই সংসারী, ব্রহ্ম নির্লিপ্ত সংসারে,
ব্রহ্মবিৎগণ ইহা কহে তার-স্বরে।
দেহ রথ, ইন্দ্রিয় তুরঙ্গসম হয়,
সেই অশ্ব দেহ-রথে যথা ইচ্ছা লয়।
প্রগ্রহ * চালায় অশ্বে করি আকর্ষণ,
মন-রজ্জু ইন্দ্রিয়ে চালায় তেমন।
সারথির সম বুদ্ধি, কুপথে সুপথে
মন-রজ্জু ধরি তিনি চালাইছে রথে।
রথস্বামী জীব আত্মা বসি রথ মাঝে
এ তিনের † কর্ম্মফল ভুঞ্জিতেছে নিজে।

ইন্দ্রিয় সকল অশ্ব; রূপ রস আদি
যে সব বিষয়ে তারা ধায় নিরবধি,
সেইত তাহার পথ। বিষয়ের পথে
ধায় সদা ইন্দ্রিয়; নানাবিধ মতে
মন-রজ্জু-আকর্ষণে এ-দিকে ও-দিকে
ঘুরিতেছে রথ অশ্ব আঁধারে আলোকে।
শরীর ইন্দ্রিয় মন সংযুক্ত হ'লে
আত্মা হন ফলভাগী, এই ধরাতলে।
নতুবা নির্লিপ্ত আত্মা, এ তিনের সহ
হয় যদি সে আত্মার অত্যন্ত-বিরহ।
বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয় দেহ চতুষ্টয়,
সংযোগে আত্মার ভোগ; তা'না হলে নয়।
যে রথীর বুদ্ধিরূপ সারথী অজ্ঞানে
নাহি কর্ষে মনোরূপ বল্গা সযতনে,
দেহ রথ-চক্র তার ভ্রমে অনিবার,
যতনে কষিলে বল্গা ভ্রমে না সে আর।
সুজ্ঞানী সারথি যদি মন-রজ্জু ধ'রে
ইন্দ্রিয় অশ্বেরে যত্নে আকর্ষণ করে,
পুনঃ পুনঃ যাতায়াত ঘুচে সে রথীর,
ব্রহ্মপদ লাভ হয়, এই কথা স্থির।
ইন্দ্রিয় হইতে রূপ শ্রেষ্ঠ সূক্ষ্মতর;
রূপ হ'তে মন, বুদ্ধি মনের উপর;
তা'হতে', মহান্ আত্মা; শ্রেষ্ঠ আত্মা হ'তে
অব্যক্ত সূক্ষ্ম * বীজ, বুঝি লও চিতে।
সে বীজ হইতে শ্রেষ্ঠ পুরুষ পরম,
তাঁহা' হ'তে শ্রেষ্ঠ নাহি, তিনি-ই চরম।
এ বিশ্বের শেষগতি, পর্য্যবসান।
পুরুষ পরাৎপরে; নাহি অন্য স্থান।
আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত সর্ব্বভূত মাঝে
প্রচ্ছন্ন নিগূঢ় সেই পুরুষ বিরাজে;
অবিদ্যা- আবৃত; তেঁই না হয় প্রকাশ,
শুধু এক নিষ্ঠ-শুদ্ধ বুদ্ধিতে বিকাশ।
ইন্দ্রিয়েরে মনে লীন, মনেরে বুদ্ধিতে,

* লাগাম।
† ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি।

* সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম।

বুদ্ধিরে করিবে লীন মহান্ আত্মাতে ;
পরমাত্মা মাঝে বুদ্ধি করিবে বিলয়,
এই মুক্তি, এই শান্তি, নাহিক সংশয়।
সারথি অকৃতী হ'লে দুষ্ট অশ্বগণ
অ-পথে সুপথ ছাড়ি করয়ে ভ্রমণ।
বিবেকী সারথি হ'লে সদশ্বের ন্যায়
ইন্দ্রিয় সকল সদা সৎ পথে ধায়।
যেই জ্ঞানী, শুদ্ধ চিত্ত ; লভে সেইজন
চির শান্তি; জন্ম তা'র না হয় কখন।
বুদ্ধি সু-সারথি যাঁ'র, বল্গা, যাঁর মন।
তরি' পথ, লভে তিনি বিষ্ণুর চরণ।
বিষয় ইন্দ্রিয় হ'তে শ্রেষ্ঠ, সূক্ষ্মতর,
তাহা হতে' মন শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি তা'র উপর ;
বুদ্ধি হ'তে শ্রেষ্ঠ আত্মা, তা' হ'তে মহৎ
নিগূঢ় অব্যক্ত সত্তা, সূক্ষ্ম ও বৃহৎ।
একবারে যিনি হন কার্য্য ও কারণ।
পুরুষ তা হ'তে শ্রেষ্ঠ, নিত্য নিরঞ্জন।
সেই গতি সমস্তের, তা' হ'তে উদ্ভব।
তা'হতেই লয় পুনঃ হইবেক সব।
সে পুরুষ সর্ব্বভূতে আছে বিদ্যমান।
সূক্ষ্মদর্শী ভিন্ন অন্যে না পায় সন্ধান।
ইন্দ্রিয় পশিলে মনে, বুদ্ধি মাঝে মন।
আত্মায় পশিলে বুদ্ধি ; আত্মাও তেমন
প্রবেশিলে অব্যক্ত সু-সূক্ষ্ম কারণে
পরমাত্ম-রূপী যিনি ; পরমাত্মা ক্রমে
বিরাট-পুরুষে পশি হইলে বিলীন
মুক্ত হ'বে দেহী, শান্ত স্থির গতি হীন।
সুসূক্ষ্ম এরূপে ক্রমে একে অন্যে লয়
করিলে লভিবে মুক্তি, নাহিক সংসয়।
সেই ক্ষণে, নামরূপ কর্ম্ম কর্ম্ম-ফল
দূরে যাবে, জীব তবে হইবে নিষ্কল।
আত্ম মাঝে এইরূপে ইন্দ্রিয় নিচয়
মন বুদ্ধি আত্মা সবে হইবে বিলয়,
তখন লভিবে জীব আত্ম-বস্তু সার,
ক্ষুরধার বুদ্ধি তত্ত্ব নাহি পায় যাঁর।
অশব্দ অস্পর্শ তিনি অরূপ অব্যয়
অরস অ-গন্ধ নিত্য তিনি শান্তি-ময়।
তাঁহারে লভিলে জীব মুক্ত অনায়াসে,
তিনিই আশ্রয়, তিনি গতি অবশেষে।

তৃতীয় বল্লী সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়। প্রথম বল্লী।

ইন্দ্রিয়ে গড়িলা ধাতা বহির্ম্মুখ ক'রে,
তাই তা'রা বহির্ম্মুখ, না পশে অন্তরে।
ধীর জন অমৃতত্ব করিয়া বাসনা
অন্তরে ইন্দ্রিয় সবে করেন যোজনা।
ইন্দ্রিয় নিচয় যার বহির্ম্মুখ ছাড়ি
না পশে অন্তরে, ভব-বন্ধন তাহারি।
ইন্দ্রিয়ের অধিগত বিষয় নিচয়
কিছুই চাহে না জ্ঞানী, ইহাই নিশ্চয়।
রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ আদি সব
আত্ম মাঝে আত্ম জ্ঞানে হয় অনুভব।
আত্ম ভিন্ন কোন জ্ঞান নহেক সম্ভব,
সেই আত্ম মাঝে ব্রহ্ম কর অনুভব।
স্বপ্নে জানে যিনি, যিনি জানে জাগরণে
সেই আত্মা "আমি"ইহা জানে জ্ঞানী জনে।
অভিন্ন প্রত্যয় আত্মা, সর্ব্বভূত ময়,
সমষ্টি কারণ, কার্য্য, জ্ঞান ও বিষয়।
আসঙ্গ-বর্জ্জিত এক অদ্বিতীয় তিনি,—
ভেদ বুদ্ধি ত্যজি তাঁরে নেহারেন যিনি
ইতস্তত বিস্তৃত বিশ্ব চরাচরে,
সেই ধীর একনিষ্ঠ, শ্রেয় লাভ করে।
অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষ নিবসেন দেহে,
কূটস্থ ঈশান তিনি। ত্রিকাল প্রবাহে
তিনিই প্রপঞ্চ, আর প্রপঞ্চই তিনি।
এইত অভেদ জ্ঞান ; এই জ্ঞানে জ্ঞানী
হও নচিকেতা আমি দিনু এই বর,
এ জ্ঞান বিহনে জন্ম চির সহচর।
দেহে পরমাত্মা তিনি নিত্য বিনির্ম্মল,

বিবর্ণ আধার ভেদে, কহিনু সকল।
নির্ম্মল অরূপ বারি, বিবিধ আধারে
সমল সরূপ যথা ভ্রান্ত জীব হেরে।
নানা দিকে প্রধাবিত বারি হয় নাশ,
এক স্ফটিকের পাত্রে স্ববর্ণ প্রকাশ।
সেই মত একদর্শী শুদ্ধ জ্ঞানী হৃদে
স্বরূপে প্রকাশ ব্রহ্ম নিত্য মুক্ত পদে।
এরূপে বুঝিয়া তাঁরে তর্ক পরিহর;—
নচিকেতা, ভক্তি ভরে গ্রহ এই বর।

প্রথম বল্লী সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়। দ্বিতীয় বল্লী।

জন্মহীন আত্মা, নিত্য সুপ্রকাশমান,--
একাদশ দ্বার পুরে তাঁ'র অধিষ্ঠান।
এ পুরীর রাজা তিনি ; তাঁরে ধ্যান করি
কর্ম্ম-বন্ধ হ'তে মুক্ত হইবে শরীরী।
তিনি, আকাশে আদিত্যরূপে করেন ভ্রমণ,
তিনি, অন্তরিক্ষে বায়ু,বেদি মধ্যে হুতাশন।
তিনি, ভাণ্ডে সোমরস, জলে জলজ আকার,
তিনি, স্থলে স্থলজের রূপে করেন বিহার।
তিনি নরে, তিনি দেবে, সর্ব্বত্র সমান ;
তিনি সত্য, তিনি এক, অতীব মহান।
প্রাণ বায়ু ঊর্দ্ধগামী ; অপান নিম্নগ
তাঁহারি আদেশে সত্য, বুঝহ শুভগ।
বামন, বিজ্ঞানরূপে হৃদয়ে আসীন
সেই আত্মা সনাতন, অভিন্ন, প্রাচীন।
দেহ হ'তে বিচ্ছেদ হইলে তাঁহার
দেহে অবশিষ্ট কিছু নাহি রহে আর।
অপান অথবা প্রাণে নাহি জীবে দেহী,
শুধু আত্ম-বশে জীবে,—এই সার কহি।
হে গৌতম, মরণান্তে জীব কিবা হয় ?
জ্ঞান কর্ম্ম অনুসারে, কেহ প্রবেশয়
যোনি মাঝে, নানারূপ দেহ গ্রহিবারে ;
কেহবা স্থাবর রূপে প্রবেশে স্থাবরে।

সুপ্ত যবে জীব কুল, পুরুষ জাগ্রত ;
ভাঙ্গিছে গড়িছে নিত্য স্বীয় অভিমত।
যথাযোগ্য স্থানে বস্তু নির্দ্দেশ তাঁহার,
তিনি জ্যোতি,তিনি ব্রহ্ম, তিনি সারাৎসার।
এক অগ্নি, ভিন্ন ভিন্ন আধারে প্রবেশি,
প্রকাশেন ভিন্ন ভিন্ন কত রূপ রাশি !
তেমতি সে পরমাত্মা পশি সর্ব্বভূতে,
ভিন্ন ভিন্ন কত রূপে প্রকাশ জগতে। *
এক বায়ু ভিন্ন ভিন্ন আধারে প্রবেশি
প্রকাশেন ভিন্ন ভিন্ন কত রূপ রাশি !
তেমতি সে পরমাত্মা পশি সর্ব্বভূতে,
ভিন্ন ভিন্ন কত রূপে প্রকাশ জগতে।
শুচি, অশুচি বস্তু, দীপ্তিমান রবিকর জালে,—
নচিকেতা,রবি না অশুচি হয় অশুচির মলে।
তেমতি সে পরমাত্মা সর্ব্বভূতময়,
কিন্তু জীব দুঃখ তাঁরে নাহি পরশয়।
গুণাতীত তিনি, সর্ব্ব ভূতের জীবন,
নানা জীবে নানা রূপ করেন ধারণ।
আত্ম মাঝে তাঁহারে যে দরশন করে
সেই নিত্য সুখী, কভু নহে ত অপরে।
অনিত্যের † মাঝে যিনি নিত্য সনাতন,
চেতনের মাঝে যিনি এক সচেতন ;
একরূপী, তবু যিনি সহস্র লীলায়
জীব প্রয়োজন সব সাধেন হেলায় ;
আত্ম মাঝে তাঁহারে যে দরশন করে
সেই নিত্য সুখী, কভু নহে ত অপরে।
যোগী যাঁরে চিন্তি ভাসে অচিন্ত্য সুখেতে—
নচিকেতা।—
"কেমনে জানিব তাঁ'রে, কহ কোন্ মতে ?
তিনি স্বতঃ প্রকাশিত ? বুদ্ধির গোচর ?
অথবা অস্পষ্ট তিনি, বাঙ্মনোঽগোচর ?"
যম।—তিনি সর্ব্ব-প্রকাশক ; তাঁহার বিস্তার
এ ব্রহ্মাণ্ড মূর্ত্ত রূপে প্রকাশিত হয়।

* জগৎ—প্রপঞ্চভূত।
† বস্তুর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ।

রবি, চন্দ্র, তারা, কিম্বা অগ্নি, ক্ষণপ্রভা,
কভু না প্রকাশে তাঁরে; নিস্তেজ সে আভা।
বিশ্বের এ তেজোরাশি তাঁ'রই, নচিকেতা;
তিনি জ্যোতির্ম্ময়, জ্যোতি পরাভূত সেথা।

দ্বিতীয় বল্লী সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়। তৃতীয় বল্লী।

সংসার বৃক্ষের　　মূল বিষ্ণু-পদে,
শাখা নিম্নগামী তা'র;
কর্ম্ম তা'র বীজ,　　ফল-তৃষ্ণা বারি,
সেচনে পুষ্ট-আকার।
তপ, যজ্ঞ, দান　　সুপুষ্প সমান;
জীব কুল ডালে ডালে
আনন্দ ঝঙ্কারে　　শোক-হাহাকারে
পূরে দিক কোলাহলে।
এ বৃক্ষের প্রাণ　　ব্রহ্ম সঞ্জ্বল,
বুঝিলে অমর হয়।
কে লঙ্ঘিবে তাঁ'রে　　তাঁহারি আশ্রিত
এ ব্রহ্মাণ্ড সমুদয়।
তাঁ'হ'তে নিঃসৃত　　জগৎ সংসার,
তাঁহারি নিয়মে চলে;
তিনি বজ্রসম,　　মৃত্যু হীন হয়
জীব তাঁ'রে জ্ঞাত হ'লে।
তাঁহার প্রভাবে　　অগ্নি তাপ দেয়,
সূর্য্য জ্বলে তেজে তাঁ'র;
তাঁহার আদেশে　　বহে সমীরণ
মৃত্যু বহে দুঃখ ভার।
এ দেহ থাকিতে　　তাঁ'রে না জানিলে,
পুনঃ পুনঃ গতায়াত;
এ জীব আবাসে　　দেহ পরিগ্রহ,
পুনঃ পুনঃ দেহ পাত।
নির্ম্মল দর্পণে　　প্রতিবিম্ব সম,
জাগে ব্রহ্ম আত্ম-মাঝে;
স্বপ্নাবেশে নিজ-　　দর্শনের প্রায়
পিতৃলোকে ব্রহ্ম রাজে।
গন্ধর্ব্ব লোকেতে　　ব্রহ্মের দর্শন
জলে বিম্বের সমান,
আতপ ছায়ায়　　নিজ মূর্ত্তি প্রায়,
ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মজ্ঞান।
আত্মা হ'তে ভিন্ন　　ইন্দ্রিয় নিচয়;
ইন্দ্রিয়ের দুই ভাব,—
জাগ্রত নিদ্রিত;　　জানিলে জ্ঞানীর
নাহি থাকে পরিতাপ।
ইন্দ্রিয় নিচয়　　হ'তে শ্রেষ্ঠ মন,
মন হ'তে শ্রেষ্ঠ সত্ত্ব;*
তা' হ'তে মহান　　আত্মা শ্রেষ্ঠতর,
তাহা হ'তে অব্যক্ত;
অব্যক্ত হইতে　　শ্রেষ্ঠ সে ব্যাপক
অলিঙ্গ পুরুষ যিনি;
তাঁহারে জানিলে　　মুক্ত হয় জীব,
অমৃত হয় সে জ্ঞানী।
চক্ষু নাহি হেরে　　তাঁহার স্বরূপ;
হেরে বুদ্ধি বি-নির্ম্মল;
সংকল্প বিহীন　　প্রশান্তবিজ্ঞান,
নিরখে তাঁরে কেবল।
ইন্দ্রিয় সকল　　মনের সহিত,
আত্মাতে হইলে স্থিতি,
বিষয় ছাড়িয়া　　বুদ্ধি হ'লে স্থির,
হয় সে পরমাগতি।
বাসনা রহিত　　সংকল্প বিহীন
ইন্দ্রিয় সু-স্থির হ'লে,
তা'রে বলে যোগ;　　শুভ ও অশুভ
যোগেতে দুই—ই ফলে।
অশুভ তেয়াগি　　শুভলাভ তরে
প্রশান্ত সু-স্থির হও;
শুন নচিকেতা,　　এই সার কথা
হৃদয়ে বুঝিয়া লও।
বাক্যন লোচন　　নাহি বুঝে তাঁরে,
তাঁ'রে বুঝে শুদ্ধ জ্ঞান;
নাস্তিক কেমনে　　বুঝিবে তাঁহারে
বিনা "অস্তি" এই ধ্যান।
আস্তিক তাঁহারে　　হেরে আত্ম মাঝে;
আত্মারে বুঝেছে যে
তাহার অন্তরে　　জাগে তত্ত্ব কথা,
তাঁহারে চিনেছে সে।
"অস্তি" এই বোধে　　বিভিন্ন বস্তুর,
সমষ্টি বিশ্বের মূল
সোপাধিক রূপে　　হন প্রতিভাত,
উপাধি তখন স্থূল।

* বুদ্ধি।

সূক্ষ্মভাবে পুনঃ বুঝিলে তাঁহারে
কেবল চিন্ময় তিনি,
শুধু জ্ঞানময় নিরুপাধি হন,
জ্ঞানে বুঝে তত্ত্বজ্ঞানী।
বুদ্ধির বিষয়, কামনা সকল
নষ্ট হইবে যবে,
তখনি বন্ধন ছিন্ন হ'য়ে জীব
ব্রহ্মে বিলীন হ'বে।
বুদ্ধির বিষয়, অবিদ্যা প্রত্যয়
হৃদয়-গ্রন্থি সকল,
বিনষ্ট হইলে মুক্ত হবে জীব
লভিয়া অমৃত ফল।
সকলেরি হৃদে অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ
পুরুষ করেন বাস;
শরীর হইতে পৃথক রূপেতে
বুঝ তাঁরে, সু প্রকাশ।
তা'হ'লে আবার মরণ কিসের?
নিত্য মুক্ত শুদ্ধ জীব;
সকলি চৈতন্য নাহি কিছু অন্য
সকল-মঙ্গল-শিব।"
শুনি নচিকেতা যমের বচন,
বিধি মত সেবা করি,
হইলেন মুক্ত অবিদ্যা কামনা
শুভক্ষণে পরিহরি।
শুভক্ষণে পরিহরি।
ওঁ হরি॥ ওঁ হরি॥ হরি ওঁ॥
কঠোপনিষদ্ সমাপ্ত।

শ্রীশশধর রায়।

আমাদের জ্যোতিষ

শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র রায় পণ্ডিত এবং সুলেখক। তিনি যে প্রকার পরিশ্রম এবং অনুসন্ধান করিয়া এ দেশের জ্যোতিষ শাস্ত্রের ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি দেশবাসী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতা-ভাজন। সাধারণতঃ এদেশে যাঁহারা প্রাচীন শাস্ত্রের সহিত পরিচিত, তাঁহারাও প্রাচীন জ্যোতিষ এবং চিকিৎসা শাস্ত্রের কথা কিছুই জানেন না। ঐ বিশেষ ২ বিদ্যাগুলির ইতিহাস লিখিতে পারে, এমন লোক এদেশে দুর্ল্লভ। শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ইংরাজি ভাষায় রসায়ন বিদ্যার ইতিহাস লিখিয়াছেন; এখন যদি তিনি কিঞ্চিৎ সংক্ষেপে বঙ্গভাষায় ঐ বিষয়ের বিবৃতি করেন, তবে বড়ই উপকার হয়। বাঙ্গালী পাঠকেরা প্রায়শঃ এ সকল কথা জানিতে উৎসুক নহেন বলিয়াই হয়ত উহার বঙ্গ সংস্করণ হইতেছে না। যোগেশ বাবু যদি এই গ্রন্থখানি ইংরাজীতে লিখিতেন, তাহা হইলে অর্থ এবং যশ উভয়ই আয়ত্ত হইতে পারিত। কিন্তু বঙ্গ সাহিত্যের পরিচর্য্যায় উহার কোনটীই সহজলভ্য নহে! যোগেশ বাবু এ সকল জানিয়া শুনিয়া বাঙ্গলা ভাষায় গ্রন্থ লিখিয়াছেন; কাজেই আশা করি, তিনি লাভ লোকসানের দিকে তাকাইয়া ক্ষুব্ধ হইবেন না।

জ্যোতিষের কথা লিখিত হইয়াছে বলিয়া যে, কোন পাঠক ভয় পাইয়া এ গ্রন্থ পাঠে অগ্রসর হইবেন না, তাহা নহে। কারণ এক দিকে যোগেশ বাবুর ভাষা যেমন সরল, অন্য দিকে নীরস কথা সরস করিয়া বুঝাইবার ক্ষমতাও তাঁহার খুব বেশী। এ গ্রন্থখানি সুপাঠ্য এবং সুখ-পাঠ্য, এবং পড়িলে অনেক জ্ঞান লাভ হইতে পারে; তথাপি বড় কেহ পড়িবে না।

এ দেশে প্রাচীনকালে জ্যোতিষ শাস্ত্রের কতদূর উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তাহা বুঝিয়া লইতে হইলে, প্রথমতঃ একটী কথা স্থির করিবার প্রয়োজন। কথাটা এই। সকল দেশে সকল জাতির মধ্যেই সূর্য্য চন্দ্র এবং নক্ষত্রাদি দেখিয়া কতকগুলি গণনা করা অতি স্বাভাবিক। সহজ দৃষ্টিতে কতকগুলি তত্ত্ব সকল জাতির মধ্যেই অতি প্রাচীনকাল হইতে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। সূক্ষ্মতা এবং উন্নতির কথা বিচার করিতে হইলে দেখিতে হয় যে, সেই সহজলভ্য তত্ত্ব সংগ্রহের পর কোন্ জাতি কত অধিক

অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল। এইজন্য প্রথমতঃ সহজ তত্ত্বগুলির কথা কথঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

(১) জ্যোতিষ্কেরা অত্রির নয়ন-সমুথ কি না, অথবা ঐ কথাটার মধ্যে কোন একটা নিগূঢ় আধ্যাত্মিক তত্ত্ব লুকায়িত আছে কিনা, সে সকল কথা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া, এ টুকু সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে এমন কোন মানব সমাজের বিবরণ পাওয়া যায় নাই, যেখানে সূর্য্য চন্দ্রের এবং নক্ষত্রের সহিত পরিচয়ের অভাব জানিতে পারা গিয়াছে। অতি বর্ব্বরের নিকটেও জ্যোতিষ্কপুঞ্জ বিস্ময় এবং ধ্যানের বিষয়। সূর্য্যের উদয় অস্ত হইতে দিবা রাত্রির গণনা হয়। ঋতুভেদে উত্তাপের ন্যূনাধিক্য ঘটে; এবং ঋতুর গণনা হইতে বৎসর গণনা আরম্ভ হয়। কাজেই, সূর্য্যের পথ, উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ন প্রভৃতি অতি সহজে সকল জাতির মধ্যেই গণনিত হইতে পারে।

(২) চন্দ্রের গতি এবং ক্ষয় বৃদ্ধিও অতি বর্ব্বরের নিকট সুস্পষ্ট। পক্ষ এবং মাস গণনাও অতি সহজ কথা। এই মাসগুলি লইয়া ঋতুর সহিত এবং সূর্য্যের অয়নের সহিত মিলাইতে গেলে ৩৬০ দিনের বৎসর এবং প্রায় ৩৬৫ দিনের বৎসরের গণনাও উপস্থিত হয়। এটা জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিদ্যা বলিয়া গৌরব করিতে গেলে, গদ্য না লিখিয়া গদ্যে কথা কহিবার ক্ষমতার গৌরবের মতন হয়।

(৩) যাহারা নিতান্ত অসভ্য অবস্থা হইতে একটু উন্নতি লাভ করিয়াছিল, এবং বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া জ্যোতিষ্কপুঞ্জ দেখিতে দেখিতে, উহাদের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য করিয়াছিল, তাহারাই নক্ষত্রে নক্ষত্রে একটা প্রভেদ বুঝিতে পারিয়াছিল। নক্ষত্রগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাইয়াছিল যে, ওগুলি যেন ঠিক যথাস্থানে অবস্থিত থাকিয়া, অর্থাৎ relative position বজায় রাখিয়া চলিতেছে। অনুসন্ধানটা কিঞ্চিৎমাত্র সূক্ষ্ম হইবার পর ইহাও প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছিল যে, গোটাকতক নক্ষত্রের গতি সাধারণ রীতির অন্তর্ভুক্ত নহে। পাঁচটী তারার আপেক্ষিক অবস্থিতি সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল। এই পাঁচটী মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র এবং শনি নামে অভিহিত হইয়াছে।

(৪) অন্যান্য নক্ষত্রগুলি স্থির থাকিলেও সাধারণ ভাবে তাহাদের গতি এবং উদয় অস্ত লক্ষিত হয়। কোন একটী বিশেষ নক্ষত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক মাস পূর্ব্বে যে নক্ষত্রটী যে সময়ে যেখানে উঠিয়াছে, এক মাস পরে তাহার উদয়ে দুই ঘণ্টা প্রভেদ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। দুটী ঘণ্টার প্রভেদ সহজেই লক্ষিত হয়। এই সময়টা ভাগ করিয়া ঠিক ৪ মিনিটের দৈনিক প্রভেদ সুস্পষ্ট না হইলেও প্রভেদ এবং পরিবর্ত্তনটুকু বুঝিতে গোল থাকে না।

(৫) এই গণনার একটু সূক্ষ্মতা হইতে এবং সূর্য্যের গতি পথের সহিত ঐ নক্ষত্র গতি মিলাইতে গিয়া রাশিচক্রের গণনা হইয়াছে। এই রাশিগুলি গোলক চক্রপথে সমদূরবর্ত্তীরূপে স্থিত নহে। অর্থাৎ উহাদিগের দ্বারা আকাশ পথটা সমান ১২ ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায় না।

(৬) কলাক্ষয় এবং কলাবৃদ্ধি দেখিয়া চন্দ্রকে জ্যোতিহীন এবং সূর্য্যের আলোকে প্রদীপ্ত বলিয়া অতি প্রাচীন কালের সকল জাতিই সিদ্ধান্ত করিয়াছিল। কেহ কাহারও নিকট হইতে তত্ত্বটা ধার করিয়া লয় নাই। যে পক্ষে যে দিক হইতে সূর্য্যের আলোক পাইবার কথা, চন্দ্রের আলোকিত কলা সেই দিকে মুখ করিয়া থাকে; এটা সর্ব্বদাই সেইদিকে দেখিতে পাওয়া যায়।

(৭) চন্দ্রটীকে যদি কোন একসময়ে একটী নিকটবর্ত্তী নক্ষত্রের কাছে দেখিবার পর উহার আপেক্ষিক অবস্থিতির বিচার করা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায়, প্রতি রাত্রেই চন্দ্র সরিয়া সরিয়া যাইতেছে। তাহার পর আবার ২৭ দিনের পর (২৭দিন, ৮ ঘণ্টা) চন্দ্রটী নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে প্রথম পরিদৃষ্ট স্থানে ফিরিয়া আসিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। এই পর্য্যবেক্ষণও খুব সাদা। মনে কর, এই গণনাটা পূর্ণিমায় আরম্ভ করা

গিয়াছিল, তাহা হইলে চন্দ্র যখন পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসিল, তখনও উহার কলা পূর্ণ হয় নাই। সূর্য্য এই সময়ে যতটা পথ চলিয়া গিয়াছে, ততটা অগ্রসর হইতে, এবং পূর্ণ কলা পাইতে চন্দ্রের আরও দুই দিন লাগিবে। নক্ষত্র মণ্ডলের মধ্যে চন্দ্রের এই স্থিতি গণনাও বহু প্রাচীন কাল হইতে সকল সভ্য দেশেই হইয়া গিয়াছিল।

(৮) গ্রহণ গণনার সহিত ৭ম তত্বটীর বিশেষ ঘনিষ্টতা আছে। কোনও একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে চন্দ্রের প্রত্যাগমনে ২৭⅓ দিন লাগে; কিন্তু সূর্য্যের প্রায় ৩৪৭ দিন লাগে। অর্থাৎ চন্দ্রের ২৪২ বার প্রত্যাগমনের সময়ে সূর্য্যের প্রত্যাগমন ১৯ বার হয়। কেবল মাত্র গ্রহণ দর্শন করিয়া এই গণনার সহিত মিলাইয়া লইয়াই প্রাচীন কালে ভবিষ্যৎ গ্রহণ গণনা সুসাধ্য হইয়াছিল। কেবল মাত্র গ্রহণ দেখিয়া গ্রহণ গণনার কথা আরও সহজ।

গ্রহণের কারণ বুঝিতে না পারিলেও গ্রহণ দর্শন করা অসভ্যের পক্ষে স্বাভাবিক। চন্দ্র গ্রহণ অপেক্ষা সূর্য্য গ্রহণ অবশ্য সহজে উপলব্ধ হয়। সময়ে সময়ে গ্রহণ দর্শন করিয়া যে লোকে ভীত ও বিস্মিত হইত, এ কালেও এদেশে সে কথা বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। কয়েকবার গ্রহণ দেখিবার পরই যে দিন গ্রহণ ঘটে, তাহা বিশেষ করিয়া লোকে স্মরণ রাখিত। একটী মনুষ্যের পক্ষেও ১৮ বৎসর পর্য্যন্ত এই গ্রহণ পর্য্যবেক্ষণ অত্যন্ত সম্ভব। আজিকার দিনে ঠিক যে প্রকারের গ্রহণ দেখা গেল, আঠার বৎসর দশ দিন পরে প্রায় ঠিক সেই প্রকার গ্রহণ দৃষ্ট হয়। একবার এটা ধরিয়া ফেলিয়া গণনা করিলে গণনাটা প্রায়শঃ নির্ভুল হওয়া সম্ভব।

(৯) এই মোটামুটি গ্রহণ গণনার বিদ্যার সহিত চন্দ্র সূর্য্যের প্রত্যাগমনের যে কালের কথা বলিয়াছি, তাহা মিলাইয়া লইলে গণনা সহজ হইয়া পড়ে। তাহার উপর আবার চন্দ্র গ্রহণ পূর্ণিমায় এবং সূর্য্য গ্রহণ অমাবস্যায় দেখিয়া নূতন কথারও আবিষ্কার হইতে পারে। ভূভ্রমণবাদ জানা না থাকিলেও, সাধারণ গণনাগুলিতে কোন বাধা উপস্থিত হয় না। চন্দ্র এবং সূর্য্য পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে। উহাদের যখন গতি-বৈষম্য আছে, তখন দুইটী সমদূরবর্ত্তী হইলে পরস্পরে সংঘর্ষণ হইত। কাজেই একটা অপেক্ষা অন্যটা অবশ্যই কিছু দূরে। গ্রহণটা যখন অমাবস্যা পূর্ণিমায় হয়, এবং একটা যখন ঘুরিতে ঘুরিতে অবশ্যই অন্যটার দৃষ্টি বোধ করিয়া দিতে পারে, তখন একটু সূক্ষ্ম গণনায় ধীরে ধীরে ছায়াপাতের কথাও জানা পড়ে।

উল্লিখিত সহজ তত্ত্ব গুলির মধ্যে শেষের ২।৩ টী একটু বেশী সূক্ষ্ম গণনায় আবিষ্কৃত হয়। প্রাচীনকালে যে সকল জাতি সভ্যতা লাভ করিয়াছিল, সকলের মধ্যেই ঐ গণনা গুলি প্রচলিত ছিল। টলেমির 'অলমাগেষ্ট' খ্রীষ্টাব্দের ২য় শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত। উহাতে ঐ সকলগুলি গণনাই আছে, এবং আরো সূক্ষ্ম ২ তত্ত্বেরও ব্যাখ্যা আছে। কিন্তু তখন পর্য্যন্তও ভূভ্রমণবাদ আবিষ্কৃত হয় নাই। বিদেশ বাণিজ্য, সমুদ্র গমন প্রভৃতি সামাজিক সভ্যতার ফলে ঐ গ্রন্থে, সহজতত্ত্ব গুলির মধ্যেও অনেক প্রশংসনীয় সূক্ষ্মতা দেখিতে পাওয়া যায়। বিদেশীয়দিগের জ্যোতিষের জ্ঞানের কথা বিশেষ করিয়া বলিতে বসি নাই। কিন্তু এই গ্রন্থের একটী গণনার কথা উল্লেখ করিতে হইবে। গ্রহস্থিতি সম্বন্ধে টলেমির গণনায় যে গ্রহ পৃথিবী হইতে যত অধিক দূরে অবস্থিত, তাহার তালিকা দিতেছি। চন্দ্র পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে; এবং শনি সর্ব্বাপেক্ষা দূরে। দূরত্বের হিসাবে নামগুলি পরে পরে এইরূপ যথা ১ চন্দ্র (সোম), ২ বুধ, ৩ শুক্র, ৪ সূর্য্য, ৫ মঙ্গল, ৬ বৃহস্পতি, ৭ শনি।

এই গ্রহ গুলি লইয়া বারের গণনা, এবং সপ্তাহ গণনা কি প্রকার ভাবে উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা বলিতেছি। বিদেশীয়দিগের মধ্যে যাহারা ফলিত জ্যোতিষ মানিত, তাহারা গ্রহ শান্তির জন্য এবং অন্যান্য যাদুবিদ্যার জন্য একটী চক্রে ঐ গ্রহ গুলিকে সাজাইয়া একটা উল্টা পাল্টা শৃঙ্খলায় ও গুলির গণনা করিত। যাদু বিদ্যার জন্য

যে ঐ প্রকার টেড়া বাঁকা গণনা চলে, তাহা সকল দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমে গ্রহের দূরত্বের হিসাবে একটী চক্রে গ্রহ গুলি সাজাইয়া দিতেছি :—
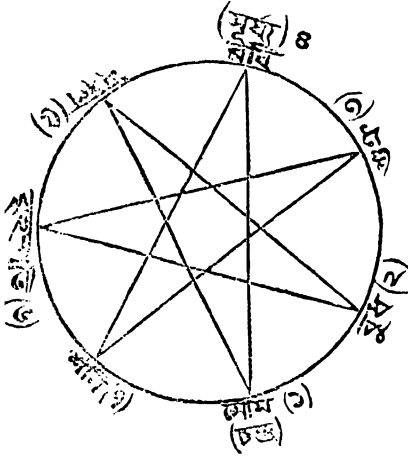
এখন দেখুন যে, টলেমির গণার হিসাবে সোম হইতে আরম্ভ করিয়া শনি পর্য্যন্ত, গ্রহ গুলি পরে ২ চক্রের উপর সজ্জিত হইয়াছে। এখন রবি হইতে আরম্ভ করিয়া বৃত্তির মধ্যস্থ রেখাগুলির পথ দেখিয়া লউন। রবি হইতে সোম পর্য্যন্ত আসিয়া তাহার পর সহজ ভাবে সোম হইতে মঙ্গল, মঙ্গল হইতে বুধ, বুধ হইতে বৃহস্পতি, বৃহস্পতি হইতে শুক্র এবং শুক্র হইতে শনিতে আসিলে, যাদুকরের ক্ষেত্রটী অঙ্কিত হইয়া যাইবে। বিদেশের বার গণনার এই ইতিহাস।

এখন একবার যোগেশ বাবুর গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া প্রাচীন জ্যোতিষের তত্ত্বাবিষ্কার আলোচনা করা যাউক। সহজ সিদ্ধ বলিয়া যে সকল কথার উল্লেখ করা গিয়ছে, তাহার প্রথম দুইটী অতি সহজ। সে দুইটী বাদ দিয়া তৃতীয়টী হইতে আলোচনা আরম্ভ করিব। চন্দ্র সূর্য্যের পর শুক্র এবং বৃহস্পতি খুব উজ্জল ; ঐ দুইটী নক্ষত্র সকলেরই দৃষ্টিতে পড়িতে পারে। মঙ্গল, বুধ ও শনি সহজে আবিষ্কৃত হইয়াছিল কি না, এবং কবে অবিষ্কৃত হইয়াছিল, এ বিষয়ে গ্রন্থখানি পড়িয়া সন্দেহ ঘনীভূত হইল। যোগেশ বাবু দেখাইয়াছেন যে, অতি প্রাচীন জ্যোতিষ গ্রন্থে রবিশশী লইয়াই কেবল গণনা ছিল। অন্য গ্রহ লইয়া কোন গণনা থাকিবার কথা কোন প্রাচীন জ্যোতিষে পাওয়া যায় না। শব্দের নানা অর্থ ঘটাইয়া নানা স্থান হইতে গ্রহ গুলি সংগ্রহ করিলে তৃপ্তি হয় না। সাহিত্যে যাহা প্রচলিত হয়, তাহার আদি, পণ্ডিতের বিশেষ গণনায়। যদি পণ্ডিতের জ্যোতিষ গ্রন্থে কিছু না পাওয়া যায়, তবে অনুমানটা লইয়া কোন মীমাংসা করা দুঃসাধ্য। গোভিল গৃহ্যসূত্রের পারিশিষ্ট ভাগ যখন অর্ব্বাচীন বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, তখন উহার দৃষ্টান্ত হইতেও কোন প্রকার ফললাভ হয় না। নবগ্রহ অতি প্রাচীন হইলে অন্য প্রাচীন গ্রন্থে উল্লেখযোগ্য স্থলে সুস্পষ্ট উল্লেখ নাই কেন?

মৌর্য্য বংশের গৌরবান্বিত রাজত্বের সময়ে দেশ বিদেশের সহিত ভারতবর্ষের সংস্রব বেশী মাত্রায় হইয়াছিল। ঐ বংশের গৌরবের অবসানকালে যবনাদি জাতীয়েরা এদেশে অনেক উপদ্রব ঘটাইয়াছিল, এবং অনেক স্থানে রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। গর্গের গ্রন্থে সে কথার সুস্পষ্ট উল্লেখ দেখিয়া পণ্ডিতেরা তাঁহার যে সময় নির্ণয় করিয়াছেন, তদ্বিরুদ্ধের যুক্তি আদৌ প্রবল বলিয়া মনে হইল না। মহাভারতে গর্গের নাম আছে বলিয়া তিনি বহু প্রাচীন, এ কথা স্বীকার করা যায় না। মহাভারতের শান্তি পর্ব্বের ৩৪০ সর্গের ৯৫ শ্লোকে গর্গের মত জ্যোতিষ পণ্ডিত কাল যবনেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। বঙ্গ দেশের ভারতে ঐ সর্গটী ৩৩৯ সর্গ। যে গ্রন্থে যবন জ্যোতিষী পণ্ডিতের কথা আছে। তাহা দ্বারা গর্গকে প্রাচীন করা যায় না। যবনদিগের জ্যোতিষের জ্ঞানের সহিত মহাভারত পরিচিত। গর্গের সময় সম্বন্ধে মাদ্রাজের গোপাল আয়ারের Chronology গ্রন্থ অতি উপাদেয়।

যখন যবনেরা এদেশে আসিয়াছিল, তখন যে তাহাদিগের সহিত জ্ঞানের আদান প্রদান হয় নাই, এ কথা বলা যায় না। আদান প্রদান স্বীকার করিলে গৌরব লঘু

হয় না, বরং বৃদ্ধি পায়। বিদেশীয় মত ভুল হউক, বা অন্যবিধ হউক, তাহা জানিবার উপায় থাকিতেও যাহাদের কৌতুহল উদ্দীপ্ত হয় না, তাহারা যথার্থ জ্ঞানপিপাসু নহে। সূর্য্য যেখানে নিজে বলিতেছেন যে, "আমিই যবন হইয়া যবনদিগকে জ্যোতিষ শিক্ষা দিয়াছি" তখন ঐ সূর্য্য যে যবন জ্ঞানের সহিত সুপরিচিত ছিলেন, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন যে, আর্য্যভট্টের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বালুকাময় ভূমিতে ভ্রমণ করিয়া ঐ সময়ে খাঁটি পৃথিবীতে পদার্পণ করিয়াছেন। আর্য্যভট্ট যখন যবন আগমনের এবং যবন জ্ঞান বিস্তারের পরবর্ত্তী, তখন অনেক বিষয়ে সন্দেহ অধিক হয়।

যবনেরা জ্যোতিষী পণ্ডিত ছিলেন, এ কথা প্রাচীন গ্রন্থে স্বীকৃত। জ্ঞান-পিপাসু আর্য্যেরা তাঁহাদের নিকট শিক্ষালাভ করিতে যান নাই, ইহা স্বীকার করা দুঃসাধ্য। জ্যোতিষ গণনার জন্য আর্য্যেরা যবনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলে, ব্রাহ্মণদিগের বিদ্বেষ জন্মিবার কথা; কারণ তাঁহারাই সর্ব্বশাস্ত্রের একচেটিয়া উপদেষ্টা। ফলেও তাহাই দেখিতে পাই। গণনা ব্যবসায় যে করিবে সে পতিত হইবে, এ ব্যবস্থা হইতে ঐ কথাটাই সূচিত হয় না কি?

বারগণনা পূর্ব্বে ছিল না; গ্রহ লইয়া বার এবং সপ্তাহ গণনা অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন বলিয়া যোগেশ বাবু স্বীকার করিতেছেন। বার গণনার বিশেষ প্রণালীটা সম্পূর্ণরূপে বিদেশীয়, তাহা দেখাইয়াছি। এরূপ স্থলে ঠিক ঐ ক্রমের গণনাটা প্রবর্ত্তিত দেখিলে, কি প্রকার সিদ্ধান্ত করিব?

রাশি চক্রের গণনা বিদেশ হইতে এ দেশে আসিয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। যে ঋতুর যে প্রকার অবস্থা হইতে দ্বাদশ রাশির নামকরণ হইয়াছে, তাহা ভারতবর্ষের ঋতু এবং অবস্থার সহিত মিলে না। মেষ বৃষাদির বসন্তে সন্তান প্রসব হইতে যদি ঐ নামের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তবে মেষপালক ভবঘুরে জাতির মধ্যে ঐ নামের উৎপত্তি সম্ভবপর হয়। সে দেশের ঋতুগুলির সঙ্গেও রাশিগুলির মিল আছে। রাশি এবং রাশিচক্রের কথা প্রাচীন সাহিত্যে নাই; মহাভারতকে প্রাচীন করিবার জন্য বনপর্ব্বের ১৯০ অধ্যায় প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ধরা হয়, এবং যবন সংস্রবের পর হইতেই এ দেশে ঐ রাশি চক্র পাওয়া যায় বলিয়া, এখন প্রায় সকলেই রাশি গণনাটা বিদেশী বলিয়া স্বীকার করেন।

গ্রহণের যে সহজ গণনার কথা উল্লেখ করা গিয়াছে, তদতিরিক্ত কোন গণনা এদেশে অতি পূর্ব্বকালে ছিল বলিয়া যোগেশ বাবুর গ্রন্থে প্রমাণ পাই নাই। আর্য্যভট্টের ছায়াপাত গণনা, এবং ভূভ্রমণবাদ, অতি গৌরবের বিষয়। ইহার আবিষ্কারগুলি সারাসানেরা গ্রহণ করিয়াছিল; এবং তাহারা তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছে। আর্য্যভট্ট যাবনিক জ্যোতিষের নিকট ঋণী ছিলেন না, এ কথা কদাচ বলিতে পারা যায় না। কিন্তু পরের মাল মসলার সহিত দেশীয় বিদ্যা যোগ করিয়া, তিনি যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহার জন্য বিদেশীয়েরা আবার তাঁহার নিকট ঋণী। আর্য্যভট্টের গণনা এ দেশের ধারাবাহিক গণনার বিরোধী ছিল বলিয়াই, তৎপরবর্ত্তী বহুকাল পর্য্যন্ত ঐ তত্ত্ব গৃহীত হয় নাই। নূতন করিয়া যখন ঐ গুলি স্থাপিত হয়, তখন সারাসেনদিগের জ্ঞানের সহিত আর্য্যেরা পরিচিত হইয়াছিলেন।

খাঁটি জ্যোতিষের গ্রন্থে জ্যোতিষের তত্ত্ব না পাইয়া যদি পুরাণের গল্পের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে সংশয় গভীর হইয়া উঠে। লোক শিক্ষার জন্য যাহা রূপকে পরিণত হয়, প্রথমতঃ তাহার স্পষ্ট জ্ঞান থাকা চাই। খাঁটি জ্যোতিষের গ্রন্থে যাহা পাই, পুরাণ হইতে তাহা বাহির করিতে গেলে গ্রহণীয় হয় না। পুরাণের অর্ব্বাচীন দেবতার কথা দিয়া যে জ্যোতিষের রূপক চলে না, তাহা বিশেষ করিয়া বলিবার সুবিধা হইতেছে না। পৌরাণিকেরা রূপক না করিয়া ভুল কথা লিখিতেন, তাহা প্রাচীন

বরাহমিহির লিখিয়া গিয়াছেন। যোগেশ বাবু নিজেই লিখিয়াছেন যে, "বরাহমিহির পৌরাণিক কল্পনা চূর্ণ করিয়া দিয়াছেন"। সেকালের পণ্ডিতেরা যাহা রূপক বলিয়া বুঝেন নাই, তাহা রূপক করা দুঃসাধ্য।

যুগ নির্ণয় সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ভি, গোপাল আয়ার প্রণীত গ্রন্থ বড় উপাদেয়। উহার সঙ্গে ডাফ্ প্রণীত গ্রন্থও পঠিত হওয়া উচিত। যোগেশ বাবু কাল নির্ণয় সম্বন্ধে যে সকল কথা লিখিয়াছেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ দিতে গেলে প্রবন্ধ অতিশয় দীর্ঘ হইয়া পড়ে। কিন্তু পাঠকদিগকে এ বিষয়ে সংক্ষেপে গোপাল আয়ার-প্রণীত গ্রন্থ পড়িতে অনুরোধ করি।

আর্য্যেরা যে বহুবিধ বিষয়ে বিশেষ গৌরবান্বিত ছিলেন, এ কথা সর্ব্ববাদী-সম্মত। জ্যোতিষ বিষয়ে যদি তাঁহারা অন্য দেশীয় লোকের সাহায্যে অধিকতর উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, তবে তাহা স্বীকার করা ভাল। ইতিহাসের পক্ষে উহা বিশেষ উপযোগী। পরের জ্ঞান লইয়া এ কালের ইউরোপে জ্ঞানের যে উন্নতি হইয়াছে, তাহাতে কি ইউরোপ গৌরবান্বিত নহে? যে দেশে আর্য্যভট্ট, বরাহমিহির জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে দেশে জ্যোতিষ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হয় নাই, কেহ বলিতে পারিবে না। আর্য্যভট্টের নিকট বিদেশ যে ভাবে ঋণী, তাহাও অস্বীকৃত হইতে পারিবে না।

পরিশেষে আবার বলি যে, যোগেশ বাবুর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বহুতত্ত্ব-যুক্ত সরল সুখ পাঠ্য গ্রন্থ যদি এ দেশে আদৃত না হয়, তাহা হইলে বড়ই দুঃখ এবং ক্ষোভ উপস্থিত হইবে। আশা করি, বাঙ্গালী পাঠকেরা বাঙ্গলার কলঙ্ক দূর করিবেন।

শ্রীবিজয় চন্দ্র মজুমদার।

প্রাচীন ভারতের বাণিজ্য। (৩)

বাণিজ্য, সাধারণতঃ, অন্তর্ব্বাণিজ্য ও বহির্ব্বাণিজ্য রূপে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া থাকে। স্বদেশ-মধ্যে স্থল বা জল পথে যে বাণিজ্য নির্ব্বাহিত হয়, তাহাকে অন্তর্ব্বাণিজ্য এবং স্থল বা জল-পথে বিদেশে যাইয়া যে বাণিজ্য নির্ব্বাহিত হয়, তাহাকে বহির্ব্বাণিজ্য কহে। সার্থবাহবণিক্ দল (Caravans) হয়, হস্তী, উষ্ট্র ও গর্দ্দভাদি বাহনের পৃষ্ঠে পণ্যদ্রব্যজাত বোঝাই করিয়া স্বদেশ-মধ্যে অথবা বিদেশে গিয়া বাণিজ্য কার্য্য নির্ব্বাহ করে। এইরূপে বণিক্গণ ক্ষুদ্র বা বৃহৎ নৌকায় পণ্যদ্রব্যজাত লইয়া স্বদেশ-মধ্যে অথবা অর্ণবপোতে বিদেশে যাইয়া বাণিজ্য কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে।

আমরা শীর্ষকোল্লিখিত বাণিজ্যের কাল সাধারণতঃ দুইটী ভাগে বিভক্ত করিয়াছি; প্রথমতঃ বৈদিক কাল হইতে বুদ্ধদেবের প্রাদুর্ভাব কাল অর্থাৎ ঋগ্বেদের সময় হইতে ৫৫৭ খ্রীঃ, পূঃ পর্য্যন্ত, দ্বিতীয়তঃ, বুদ্ধদেবের সময় হইতে ভারতবর্ষে মুসলমানগণের প্রথম আগমন কাল অর্থাৎ ৭১১ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ ইবন্ কাসিম্ কর্ত্তৃক সিন্ধু দেশাধিপতি ডাহিরের পরাজয় কাল পর্য্যন্ত প্রাচীন ভারতের বাণিজ্য সম্বন্ধে যথাক্রমে আলোচনা করিব।

উপর্য্যুপরি বৈদেশিক জাতি সমূহের ভারতাক্রমণ-জনিত রাজ্য-বিপ্লব ও রাষ্ট্র-পরিবর্ত্তনের সহিত আখ্যানময় ইতিহাসাদি গ্রন্থের ন্যায় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে লিখিত কৃষি, বাণিজ্য ও গোরক্ষা সম্বন্ধীয় বিবরণ-গুলি, বিশেষতঃ বার্ত্তানামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ বিলুপ্ত হইলেও, হিন্দু জাতীয় গ্রন্থ নিচয়ে যে সকল উন্নত ও সমৃদ্ধ সমাজ-চিত্র এবং নগর ও রাজধানীর যে প্রকার উৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্যের বর্ণনা আছে, তাহাতে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, অতি পূর্ব্বকাল হইতে ভারতে প্রকৃষ্ট রূপে হিন্দুদিগের বাণিজ্য প্রচলিত ছিল; কারণ, বাণিজ্য ব্যতিরেকে তাৎকালিক হিন্দু সমাজ, নগর এবং রাজধানী প্রভৃতি তাদৃশ রূপে উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী হইতে পারিত না।

এইক্ষণ আমরা পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদ, মনু-সংহিতা, রামায়ণ, মহা-

ভারত, পুরাণ, উপপুরাণ, নীতি-শাস্ত্র, কাব্য, নাটক, আখ্যায়িকা, উপাখ্যান ইত্যাদি এবং বৈদেশিক জাতি-নিচয়ের গ্রন্থাবলী হইতে শীর্ষকোল্লিখিত প্রবন্ধটীর প্রমাণ সকল যথা-সাধ্য ক্রমশঃ প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব।

ঋগ্বেদ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ, ইহাই ভূমণ্ডলের প্রথম পুস্তক। আমরা বৈদিক কালীন বহির্বাণিজ্য ও অন্তর্বাণিজ্যের বিবরণ গুলি লিখিবার পূর্ব্বে বহির্বাণিজ্য ও তাৎকালিক ভারতবর্ষের ভৌগোলিক ও সামাজিকাদি অবস্থা কিরূপ ছিল, তৎসম্বন্ধে ঋগ্বেদাদি গ্রন্থ হইতে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ করি; কারণ,বাণিজ্যোন্নতির সহিত সামাজিকাদি উন্নতির অতি নিকট সম্বন্ধ, একের অভাবেঅপরটীর উৎকর্ষ একপ্রকার অসম্ভব। যে অপরিজ্ঞাত বৈদিক সময়ে জাতি-বিভাগ সম্পন্ন হইয়াছিল, তৎকালেও কৃষি বাণিজ্য-বৃত্তির আবশ্যকতা ও সমাদর ছিল,নতুবা বাণিজ্যোপজীবী বৈশ্যজাতির উৎপত্তি হইত না। বৈশ্যেরা সম্মানিত ও বিদ্বান্ ছিলেন; কারণ, বেদাধ্যয়নে তাঁহাদের অধিকার ছিল। তাঁহারা বেদান্তাদি শাস্ত্রজ্ঞ এবং বিশেষতঃ, বার্ত্তানামক শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। এই বার্ত্তাশাস্ত্র কি, তাহা কামন্দকীয় নীতি-সারে জানা যায় যে,

"পাশুপাল্যং কৃষিঃপণ্যং বার্ত্তা বার্ত্তানুজীবিনাম্।
সম্পন্নোবার্ত্তয়া সাধুর্ন বৃত্তের্ভয় মৃচ্ছতি॥
কামন্দকীয় নীতি-সারে ২য় সর্গ।

পশুপালন, কৃষি এবং বাণিজ্য সম্বন্ধীয় বিধি ব্যবস্থাদি-সমন্বিত বার্ত্তা নামক শাস্ত্র বৈশ্য-দিগের জ্ঞাতব্য; বার্ত্তায় সুনিপুণ ব্যক্তির জীবিকা বিষয়ে কোন ভয় থাকে না।

বৈদিক সময়ে ভারতের অধিকাংশ দেশ ও প্রদেশই অরণ্যময় এবং পাহাড় পর্ব্বতে সমাকীর্ণ। তৎকালে আর্য্য-গণ-নিবসিত ব্রহ্মাবর্ত্ত ও ব্রহ্মর্ষি নামক দুইটী দেশ সুসভ্য ও সুপ্রসিদ্ধ। এইকালে মধ্যদেশও (গঙ্গার দোয়াব) আর্য্য-গণ কর্ত্তৃক অধিবাসিত। ঋগ্বেদের সময়ে সরস্বতী হইতে প্রয়াগ পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ সুসভ্য। বৈদিক ব্রাহ্মণ ভাগের সময়ে মগধ দেশে আর্য্য সভ্যতা প্রবেশ করে। এতদ্ভিন্ন আর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্য দেশ ও প্রদেশ গুলি অরণ্যময় এবং অসভ্য অনার্য্য-গণ কর্ত্তৃক অধিবাসিত। ঐ সকল অরণ্যে সিংহ, ব্যাঘ্র ও ভয়ঙ্কর জন্তু সকল বাস করিত। ব্যাধেরা সিংহদিগকে শিকার করিত।

বৈদিক কালে সমস্ত দাক্ষিণাত্য অরণ্যময় এবং অনার্য্য-গণের নিবাস ভূমি। কেবল মধ্যে মধ্যে দুই একটী ঋষির আশ্রম দেখা যাইত মাত্র। বেদে ভারতের বহির্ভূত দেশ ও প্রদেশাদি সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ অত্যল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে। উহাতে বর্ত্তমান কাবুল দেশ (জাবুলি স্থান) স্থিত কুভহা নদীর নাম উল্লিখিত আছে। এতদ্ব্যতীত বাহ্লীক, গান্ধার ও উত্তর কুরুবর্ষ (বর্ত্তমান সাই-বিরিয়া) এই তিনটী দেশের উল্লেখ দেখা যায়। বাহ্লীক ও গান্ধার অনার্য্য-নিবসিত এবং উত্তর কুরুবর্ষ বিরাজ নামক জাতি কর্ত্তৃক অধিবাসিত ছিল।

বৈদিক কালে আর্য্যেরা প্রধানতঃ, ব্রহ্মা-বর্ত্ত, ব্রহ্মর্ষি ও মধ্যদেশে বাস করিতেন। পরে তাঁহারা আর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্য দেশ ও প্রদেশে যাইয়া বাস করেন। আর্য্যেরা অসভ্য ও অনার্য্য জাতীয় লোকদিগকে দস্যু, রাক্ষস, পিশাচ ও অসুর ইত্যাদি নামে অভিহিত করিতেন। ইহারা কৃষ্ণ-কায়, অযাজ্ঞ ও অশ্রুত ছিল এবং আর্য্যেরা গৌরবর্ণ, যাজ্ঞিক ও মহা পণ্ডিত ছিলেন। অনার্য্য জাতীয় লোকেরা আর্য্যদিগের উপর বড়ই অত্যাচার করিত। ইহাদের ধর্ম্ম, ভাষা, আচার ও ব্যবহার আর্য্যদিগের ন্যায় ছিলনা। ঋগ্বেদে আর্য্য-গণ ও দস্যু-গণের মধ্যে বারংবার যুদ্ধের কথা উল্লিখিত আছে। এই সকল দস্যুর নগর, গ্রাম, রাজা, শাসন প্রণালী, ধর্ম্ম, অস্ত্র ও শস্ত্র ছিল। ইহাদের অধিপতি-গণের মধ্যে শম্বরা-সুরের প্রস্তর-নির্ম্মিত শত সংখ্যক নগর ছিল, তন্মধ্যে নবনবতি সংখ্যক নগর দিবো-দাসের অধীন আর্য্য-গণ ধ্বংস করিয়াছিলেন এবং শততম নগরটী দিবোদাস নিজের বাস জন্য রাখিয়াছিলেন। ক্রমশঃ।

শ্রীতারিণীকান্ত বিদ্যানিধি।

প্রাচীন ভারতের বাণিজ্য। (৪)

আর্য্যেরা নীতি-বিদ যুদ্ধ শাস্ত্রজ্ঞ ঋষি-দিগের অধীনে অবস্থিত ছিলেন। ঋষিগণ প্রথমতঃ যুদ্ধ এবং তপস্যা, এই উভয় কার্য্যই করিতেন। তাঁহারা ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞ এবং সাংসারিক ছিলেন। তাঁহাদের উৎকৃষ্ট অস্ত্র, শস্ত্র ও ধর্ম্ম ছিল। ক্রমে সমাজ বদ্ধ হইলে রাজগণ ইন্দ্রের অধীনে থাকিয়া অনার্য্য-দিগকে জয় করিতেন। আর্য্যেরা অনার্য্য-দিগের অরণ্যসকল দগ্ধ করিতেন। আর্য্য-দিগের প্রত্যেক পরিবার, গৃহস্বামী দ্বারা শাসিত ও পালিত হইত। ইহাঁদিগের পুরোহিত ছিল।

ব্রহ্মাবর্ত্তদেশে পবিত্র-সলিল পঞ্চনদের তীরে আর্য্যদিগের অনেক গ্রাম, নগর ও মহানগর ছিল। রাজারা হস্তী আরোহণ করিয়া বেড়াইতেন এবং তাঁহারা দাতা ও যুদ্ধকুশল ছিলেন। নৃপতিগণের হয়, হস্তী, রথ, পদাতি এই চতুরঙ্গিণী সেনা এবং বিবিধ অস্ত্র ও শস্ত্র ছিল। পদাতির স্কন্ধে বল্লম এবং হস্তে অসি। স্বর্ণময় ও লৌহ-ময় বর্ম্মের ব্যবহার ছিল। আর্য্যেরা রথ-নির্ম্মাণে সুপটু ও উৎকৃষ্ট শিল্পী ছিলেন। প্রজাগণ কৃষিকার্য্য, শিল্প, পশু পালন, তন্তু বয়ন ও স্থাপত্য কার্য্য করিত। গৃহপালিত পশুদিগের মধ্যে অশ্ব, মেষ, ছাগ, গো, উষ্ট্র ও মহিষই প্রধান। ঋগ্বেদে যমুনা তীরে ও গোমতী-তীরে গো-সকল চরিতেছে, ইহা দেখা যায়। অশ্বের ব্যবহার, ও যজ্ঞ-কার্য্যে হইত। যব, গোধুম, ধান্য, তিল, ও রবি শস্য, এই গুলি আর্য্য-দিগের কৃষি ছিল। আকরে স্বর্ণ, রৌপ্য ও লৌহাদি ধাতুর উল্লেখ আছে। বৈদিক সময়েও হিন্দু সভ্যতা সম্যক্ বর্ত্তমান ছিল। বেদে অনেক রাজ্য শাসকের উল্লেখ রহিয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি ক্ষত্রিয় রাজগণ কর্ত্তৃক শাসিত হইত। ব্যবহার শাস্ত্র ও ধর্ম্মাধিকরণও বর্ত্তমান ছিল। যুক্তি, সম্পত্তি-ক্রয় ও বিক্রয় এবং ঋণ-গ্রহণ প্রভৃতি বিদ্যমান ছিল। আর্য্যেরা জ্যোতির্বিদ্যা এবং চিকিৎসা শাস্ত্র জানিতেন। জল-চিকিৎসা (Hydropathy), বিধবা-বিবাহ এবং দ্যূত-ক্রীড়া প্রচলিত ছিল। আর্য্যরা সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য ধর্ম্মাধিকরণে (Hall of Justice) যাইত। স্ত্রীলোকেরা প্রকাশ্য-ভাবে রথারোহণে পথে বা যজ্ঞ-ভূমিতে গমন করিত। স্ত্রীশিক্ষা বিলক্ষণরূপে প্রচলিত ছিল। অত্রি-গোত্রীয়া বিশ্ববারা ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলের অষ্টাদশ সূক্ত রচনা করিয়াছিলেন। অগস্ত্য-পত্নী লোপা এবং মনুকন্যা ইলা লোক-শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্যের স্ত্রী গার্গী জ্ঞানকাণ্ডে সুপণ্ডিতা ছিলেন।

আর্য্যেরা মিথ্যা ও পাপকে বড়ই ঘৃণা করিতেন এবং অনুতাপ ও প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিতেন। আর্য্যেরা বড়ই সোম-প্রিয় ছিলেন। এই সোমলতা হিমালয়ের উত্তর প্রদেশ হইতে আনীত হইত। উদূখল ও মুষল দ্বারা সোমলতা হইতে রস বাহির করিয়া লইয়া তাহাতে চিনি, দুগ্ধ ও যবের জল মিশ্রিত করিলেই সোমরস প্রস্তুত হইত। সামবেদে এই সোমরসের গুণ বিষয়ে বড়ই প্রশংসা আছে। উহা মনকে আনন্দিত ও

প্রফুল্ল করে এবং শরীরে স্বাস্থ্য প্রদান করিয়া থাকে।

হিন্দুগণের ইতিহাসে লিখিত আছে যে, ঋগ্বেদের কাল হইতে আলেকজেণ্ডারের ভারতে আগমন কাল পর্য্যন্ত হিন্দু-সভ্যতা একই রূপ ছিল। এবম্প্রকারে উন্নত বৈদিক আর্য্য-সমাজে যে কৃষি বাণিজ্যাদি প্রকৃষ্ট প্রণালী ক্রমে প্রচলিত ছিল, তাহার অনুমাত্র সন্দেহ নাই। বেদেই লিখিত আছে যে, বৈদিক সময়েও আর্য্যেরা কৃষি ও বাণিজ্য-প্রিয় ছিলেন। রত্ন-প্রসূ সর্ব্বশস্যাঢ্য ভারতের মানব-গণ, অবশ্য অতি প্রাচীন কালেই যে অল্পাধিকরূপে বাণিজ্য কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তদ্বিষয়ে আর কোন সংশয় নাই।

বেদে নিম্নোক্ত নদ নদী গুলির নাম উল্লিখিত আছে ;—যথা কুভ্হা (Cabul river), সিন্ধু, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, বিতস্তা, বিপাশা (ঋগ্বেদে আর্জিকিয়া), ইরাবতী, সরস্বতী, রসা, অনিতাভা, দৃশদ্বতী, যমুনা, গঙ্গা, মালিনী (Erinesas of Megasthanes. বর্ত্তমান চুকা), কোটিকোষ্টিকা (বর্ত্তমান কোহ), কপিবতী (বর্ত্তমান-গরা), বেদশ্রুতি, তমসা (River tons), স্বান্নুমতী, সুদামা, কুলিঙ্গা, সরযূ, গণ্ডকী, গোমতী, স্যন্দিকা (Sai), শরদণ্ডা, ইক্ষুমতী, হ্লাদিনী, শিলা, আকুর্ব্বতী, শিলাবহা, পাবনী, নলিনী, সুচক্ষুঃ, সীতা এবং সিন্ধু। বেদের ব্রাহ্মণ-ভাগে বিহার দেশে সদানীরার (করতোয়া?) কথা উল্লিখিত আছে।

বৈদিক কালেও ভারতবর্ষের বহির্ভূত, পশ্চিম ও উত্তর দিগ্বর্ত্তী দেশ-নিচয়-নিবাসী অনার্য্য জাতীয় লোকের সহিত আর্য্যদিগের বাণিজ্য-ঘটিত সংস্রব ছিল। আর্য্য-গণ যেমন যাজ্ঞিক ছিলেন, তেমনি আবার তাঁহারা সমর-প্রিয়ও ছিলেন ; ক্ষত্রিয়দিগকে ব্রাহ্মণ-গণানুষ্ঠিত যজ্ঞাদি রক্ষার্থ অনার্য্য-গণের সহিত সতত যুদ্ধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হইত। তাহাতে সমর ব্যাপার নির্ব্বাহার্থ তাঁহাদিগকে হয়, হস্তী, উষ্ট্র প্রভৃতি ক্রয় করিতে হইত।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, বনায়ু (আরব), পারসীক (পারস্য), কাম্বোজ ও বাহ্লীক দেশীয় অশ্বগুলি অতি উৎকৃষ্ট। উহারা বৈদিক সময়েও সুপ্রসিদ্ধ ছিল বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। বেদে উত্তর কুরুবর্ষের (সাইবিরিয়া) ভূয়সী সমৃদ্ধির কথা উল্লিখিত আছে। এই সকল কথা দ্বারা স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, আর্য্য-গণ পূর্ব্বোক্ত দেশ-সমূহ হইতে সমরোপযোগী অশ্ব সকল বাণিজ্য যোগে ক্রয় করিয়া আনয়ন করত তদারোহণে অনার্য্যদিগের সহিত সংগ্রাম করিতেন এবং এইরূপে তাঁহারা বাণিজ্য যোগে হিমালয়ের উত্তরবর্ত্তী প্রদেশ হইতে সোমলতা আনয়ন করিয়া যজ্ঞাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

বৈদিক কালে ভারত ভিন্ন অন্যান্যদেশ অপরিজ্ঞাত, অরণ্যানী সমাচ্ছাদিত এবং অসভ্য অনার্য্য-গণ কর্ত্তৃক অধিবাসিত ছিল ; সুতরাং উত্তর কুরুবর্ষের যে এতাদৃশী সমৃদ্ধি, তাহা কেবল একমাত্র ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য যোগেই সঙ্ঘটিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। আর্য্য-গণের ন্যায় উত্তর কুরুবর্ষবাসী বিরাজ নামক জাতিও বাণিজ্যপ্রিয় ছিল ; কারণ, বাণিজ্য ব্যতিরেকে কখনই কোন দেশের শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই ও হইতে পারে না।

আর্য্যগণ হয়, হস্তী, এবং উষ্ট্রোপরি পণ্য দ্রব্যজাত লইয়া স্বদেশে বা বিদেশে বাণিজ্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। আর্য্য-বণিক্‌গণ স্বদেশ মধ্যে নৌকাযোগে বা

নদ নদী বহিয়া নানাস্থানে যাইয়া পণ্য দ্রব্য-জাত ক্রয় ও বিক্রয় করিতেন। বেদে অনার্য্যগণের শত প্রস্তরময় নগরের কথা উল্লিখিত আছে, তাহাতে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, তাহাদের মধ্যেও বাণিজ্য ব্যবসায় প্রচলিত ছিল, কেন না, বাণিজ্যের সাহায্য ব্যতিরেকে তাদৃশ সমৃদ্ধ নগর সকল নির্ম্মিত হইতে পারিত না।

অপিচ, বেদে এমন অনেক প্রমাণ আছে যে, আর্য্যগণ ঔৎসুক্য সহকারে লাভের নিমিত্ত সমুদ্র যাত্রা করিতেছেন। পোত-গমনের পথ, সামুদ্রিক নৌকাসকল, সমুদ্র এবং সামুদ্রিক পদার্থ সমূহ, সমুদ্র যাত্রা এবং পোত-ভঙ্গ প্রভৃতির বিষয় বেদের অনেক স্থানে উল্লিখিত রহিয়াছে।

আর্য্য বণিক্‌গণ সিন্ধুনদ বহিয়া সমুদ্র-তীরস্থিত সৌরাষ্ট্র, কচ্ছ, গুর্জ্জর প্রভৃতি দেশে উপনীত হইয়া পণ্য দ্রব্যজাত ক্রয় ও বিক্রয় করিতেন। সম্ভবতঃ তাঁহারা আবার ঐ সকল স্থান হইতে ভারত-সাগরস্থিত সুখতর বা শোকত্র (Sacotra), সিংহল, মল্ল প্রভৃতি দ্বীপ-বাসি-গণের সহিত এবং বঙ্গোপসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরস্থিত দ্বীপবাসীদিগের সহিত বাণিজ্য ব্যাপার নির্ব্বাহ করিতেন।

যাঁহারা বলেন যে, হিন্দুরা কোন কালে সমুদ্র পথে যায় নাই, সুতরাং কখনও পোত চালনা কার্য্য শিক্ষাও করে নাই এবং তাহা-দের সহিত কোন বৈদেশিক জাতির বাণিজ্য কার্য্য ছিল না, তাহারা কেবল চিরকাল ভারতবর্ষস্থ আপন আপন জন্মভূমিতে বাস করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছে। আমরা সেই সকল লোকের প্রবোধার্থ প্রথমতঃ, পৃথিবী মধ্যে আদি পুস্তক ঋগ্বেদ হইতে প্রমাণ সকল প্রদর্শন করিতেছি।

ঋগ্বেদের দ্বিতীয়াধ্যায়ের পঞ্চবিংশ সূক্তে সামুদ্রিক নৌকার উল্লেখ রহিয়াছে;

"বেদা যো বীনাং পদ মন্তরীক্ষেণ পততাম্।
বেদে নাবঃ সমুদ্রিয়ঃ॥"

যিনি (বরুণদেব) গগনবিহারী বিহঙ্গম-গণের পথ জানেন, তিনি সমুদ্রে নৌকা-সকলের পথ জানেন।

আর্য্যেরা সমুদ্রে পোত চালনা করিতেন বলিয়া এই ঋকের উদয় হইয়াছিল; কারণ, তাঁহারা সমুদ্রে গমনাগমনের ফল না পাইয়া তদ্বিষয়ক বাক্য দ্বারা বরুণদেবের স্তব করি-বেন, ইহা সম্ভবপর নহে। পরন্তু, ইহাও বক্তব্য যে, যৎকালে আদিগ্রন্থ ঋগ্বেদ প্রকা-শিত হইয়াছিল, তৎকালে বৈদেশিক কোন জাতি এরূপ সভ্যতা প্রাপ্ত হয় নাই যে, সেই জাতি সমুদ্র পথে যাতায়াত করিতে পারিত।

"অরিত্রং বাং দিবস্পৃথু তীর্থে সিন্ধূনাং রথঃ।
ধিয়া যুযুজ্র ইন্দবঃ॥"
ঋগ্বেদ ৩য় অধ্যায়, ৪৬ সূক্ত, ৮ ঋক্।

তোমাদের আকাশ অপেক্ষাও বিস্তীর্ণ যান সমুদ্রের ঘাটে রহিয়াছে, ভূমিতে রথ রহিয়াছে; সোমরস তোমাদের যজ্ঞ কর্ম্মে মিশ্রিত হইয়াছে।

উবা সোমা উচ্ছাচ্চনু দেবী জীরা রথানাং।
যে অস্যা আচরণেষু দধ্রিরে সমুদ্রেন শ্রবস্যবঃ॥"
ঋগ্বেদ ৯ অধ্যায়, ৫ সূক্ত।

ঊষা দেবতা পূর্ব্বে বাস করিয়াছেন, অর্থাৎ প্রভাত করিয়াছেন, অদ্যও প্রভাত করিতেছেন, যেমন ধনাভিলাষীরা (নৌকা) সজ্জীকৃত করিয়া সমুদ্রে প্রেরণ করেন।

"তং গূর্ত্তয়ো নেমন্নিষঃ পরীণসঃ সমুদ্রং ন সঞ্চরণে সনিষ্যবঃ।"
ঋগ্বেদ ৪ অধ্যায়, ৫৬ সূক্ত, ২য় ঋক্।

যেরূপ ধনার্থী বণিকেরা (সকল দিকে) সঞ্চরণ করিয়া সমুদ্র ব্যাপিয়া থাকে, সেইরূপ

হব্যবাহী স্তোতৃগণ সেই ইন্দ্রকে সকল দিকে ব্যাপিয়া রহিয়াছে।

"আ যদ্রুহাব বরুণশ্চ নাবং প্রযৎ সমুদ্রমীরয়াব মধ্যম্।
অধি যদপাং স্নুভিশ্চরাব প্রপ্রেঙ্খ ঈঙ্খয়াবহৈ শুভেকং॥"

ঋগ্বেদ ৬ অধ্যায়, ৮৮ সুক্ত, ৩ ঋক্।

যখন আমি ও বরুণ, উভয়ে নৌকায় আরোহণ করিয়াছিলাম, সমুদ্রের জন্য নৌকা সুন্দররূপে প্রেরণ করিয়াছিলাম, জলের উপরে গমনশীল নৌকায় ছিলাম, তখন শোভার্থ (নৌকারূপ) দোলায় সুখে ক্রীড়া করিয়াছিলাম।

"নূ রোদসী অহিনা বুধ্ন্যেন স্তুবীত দেবী অপ্যেভিরিষ্টৈঃ।
সমুদ্রং ন সঞ্চরণে স নিষ্যাবো ঘর্ম্ম স্বরসোনদ্যো অপব্রন্॥"

ঋগ্বেদ ৮ অধ্যায়, ৫৫ সুক্ত, ৬ ঋক্।

হে দ্যাবা পৃথিবীদ্বয়! যেমন ধনাভিলাষী ব্যক্তিরা (সমুদ্রমধ্যে) গমনের জন্য সমুদ্রকে স্তুতি করে, সেই রূপ আমি অভীষ্ট লাভের জন্য অহিবুধ্ন্য নামক দেবতার সহিত তোমাদিগকে স্তুতি করি (সেই দেবগণ) প্রদীপ্তধ্বনি-যুক্ত নদীসকলকে অপাবৃত করুক।

"তুগ্রোহ ভুজ্যু মশ্বিনোদমেঘে রয়িং ন কশ্চিন্মমৃবাঁ অবাহাঃ।
তমূহথুর্নৌভিরাত্মন্বতীভিরন্তরিক্ষ প্রুদ্ভিরপোদকাভিঃ॥"

ঋগ্বেদ ৮ অধ্যায়, ১১৬ সুক্ত, ৩ ঋক্।

কোন ম্রিয়মাণ মনুষ্য যেমন ধন ত্যাগ করে, সেইরূপ তুগ্রভুজ্যকে সমুদ্রে পাঠাইলেন। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা আপনাদের নৌকা-সমূহ দ্বারা তাহাকে ফিরিয়া আনিয়াছিলে, সে নৌকা জলে ভাসিয়া যায়, তাহাতে জল প্রবেশ করে না।

এই ঋকের ব্যাখ্যায় শ্রীমৎসায়ণাচার্য্য লিখিয়াছেন যে, তুগ্র নামে অশ্বিদিগের প্রিয় এক রাজর্ষি ছিলেন। তিনি দ্বীপান্তরবাসী শত্রুদিগের উপদ্রবে ক্লিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে জয় করিবার নিমিত্ত নিজ পুত্র ভুজ্যুকে সেনার সহিত নৌকায় প্রেরণ করেন। সমুদ্রে অনেক দূর গিয়া সেই নৌকা ভাঙ্গিয়া যায়। ভুজ্যু অশ্বিনী কুমারদ্বয়কে স্তুতি করিলেন। তাঁহারা সসৈন্যে তাহাকে আপনাদিগের পোতে আরোহণ করাইয়া তিন দিন ও তিন রাত্রিতে তাহাকে তুগ্রের নিকট পহুঁছাইয়া দিলেন।

এইরূপে আর্য্যেরা ধনলাভার্থ সমুদ্র পথে দেশ বিদেশে যাইয়া যে বাণিজ্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ বেদ হইতে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, কিন্তু লিপি-বাহুল্যভয়ে ক্ষান্ত হওয়া গেল। পরন্তু একমাত্র ঋগ্বেদ হইতেই যে সকল ঋক্ উদ্ধৃত হইল, সেই গুলি দ্বারা বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে, যে অপরিজ্ঞাত সময়ে উক্ত বেদ লিপিবদ্ধ হয়, তাহার অনেক পূর্ব্ব হইতেই হিন্দুরা সভ্য পদবীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন; কারণ, সভ্যতা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অদ্যাপি পৃথিবীর কোন স্থানে কোন জাতিকে এক দিনের মধ্যে সভ্য হইয়া উঠিতে দেখা যায় নাই।

যৎকালে ভারত ভিন্ন পৃথিবীর সমস্ত ভূভাগ অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন, জ্ঞান-রবি কেবল ভারতাকাশেই সমুদিত, সেই অপরিজ্ঞাত বৈদিক সময়ে বা সত্যযুগে ভারত, সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর ক্রোড়ে লালিত ও পালিত। আর্য্যগণ, পৃথিবীর শৈশবাবস্থায় এতদূর শৌর্য্য-বীর্য্য-সম্পন্ন, জ্ঞান-বিজ্ঞানোন্নত এবং

অন্তর্বহির্বাণিজ্য দ্বারা স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধক ছিলেন হে, আজি আমরা বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও, পৃথিবীর প্রাচীনাবস্থায়, সেই বৈদিক কালীয় ভারতের বাণিজ্যোন্নতির ষোড়শাংশের একাংশও যদি প্রাপ্ত হইতাম, তবে আমরা আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতাম। পৃথিবীর সেই শৈশবাবস্থায় আর্য্যেরা পোতারোহণ পূর্ব্বক সমুদ্র পথে দেশ বিদেশে যাইয়া বাণিজ্য করিতে যাইতেন! একথা মনে উদিত হইলেই হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-রসের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। পরন্তু পরক্ষণেই আবার সেই ভারতের দুর্দ্দশা ভাবিয়া আত্ম-গ্লানিরূপ অগ্নিতে হৃদয় দগ্ধ হইতে থাকে।

হায়! ভারতের ভাগ্যে কি সেইদিন আবার উপস্থিত হইবে? ভারতবাসিগণ কি দাসত্ব পরিত্যাগ করিয়া কৃষি বাণিজ্যের দিকে চিত্ত নিবিষ্ট করিবে? তাহারা কি মুষ্টি ভিক্ষা লাভের জন্য পরপদ লেহন করিতে বিরত হইবে! হায়, কবে ভারত-বাসী "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ" এই মহা মন্ত্রের সাধনায় সমাহিতচিত্ত হইবে! যে দিন ভারতবাসী বৃথা জাত্যভিমান পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র বাণিজ্য-প্রিয় হইবে, বাণিজ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিবে, সেই দিন হইতে ভারতের দুর্দ্দিন চলিয়া যাইবে, ভারতে সুদিন উপস্থিত ও সৌভাগ্য-সূর্য্য সমুদিত হইবে। ক্রমশঃ

শ্রীতারিণীকান্ত বিদ্যানিধি।

চণ্ডীদাস। (৩)

চণ্ডীদাস উত্তর করিলেন।—

"কুল অভিমান, নাহি মোর জ্ঞান, না দেখিযগন তোরে।
তুমার আসকে, অতন করিঞা, বিরতি করাঞে মোরে॥
তুমার পারা, করিঞা আমারে, সঙ্গিণী করিয়া নিবে।
তিলেক বিচ্ছেদে, শতবার মরি, চরণ একান্ত দিবে॥
চণ্ডীদাসে কয়, মনে হেন লয়, বলিব কি আর তোরে।
আসক দিঞাসে, শুন রজকিনী, রহিলুঁ চরণ তলে॥"

চণ্ডীদাসের গীতি প্রেমের নিখুঁত ছবি এবং নির্ভীক উক্তি। যে সমাজে ব্রাহ্মণ ও ইতর বর্ণের অধিকার, স্বর্ণ ও লৌহের ভিন্ন ভিন্ন রেখায় নির্দ্দেশিত, সেই সমাজের ক্ষুদ্র একজন পূজক ব্রাহ্মণ 'শুন রজকিনী, রহিলুঁ চরণ তলে' প্রভৃতি বন্দনা দ্বারা অত্যাশ্চার্য্য নির্ভীকতা প্রদর্শন করিয়াছেন, একথা লিখিতে তিনি সমাজের ভয়ে কিছুমাত্র কাতর হন নাই; কারণ প্রেমের বলে পিপীলিকাও মত্ত হস্তীকে দমন করিতে পারে। একথা লিখিতে তিনি লজ্জিত হন নাই, কারণ এ প্রেমে 'কামগন্ধ' নাই—ইহা তাঁহার উপাসনা রস,'—ইন্দ্রিয় লিপ্সার ঊর্দ্ধে; ইহা স্বীকার করিয়া ব্রাহ্মণ গৌরবান্বিত হইয়াছেন। লজ্জায় ম্রিয়মান হইয়া পড়েন নাই। *

চণ্ডীদাস বিবাহ করেন নাই, আজন্ম কুমার হইয়াই কাটাইয়াছেন। রামিনীর প্রেমে তাঁহার হৃদয়ে যে মদিরাময় উল্লাস সঞ্জাত হইয়াছিল, তাহা ত্যাগ করিয়া অন্য দার পরিগ্রহের চিন্তাও কোন দিন তাঁহার মনে উদিত হয় নাই। তাঁহার পদাবলীর অনেক স্থানে 'বড়ুই'' শব্দ পাওয়া যায়, ইহার এক অর্থে 'কুমার' বুঝায়।

চণ্ডীদাসের রজকিনী-প্রেম আমি নিন্দনীয় বলিয়া প্রকাশ করিতে প্রস্তুত নহি।

* বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

ভালবাসার রাজ্যে আবার হাড়ি ডোম ভেদ কি? প্রেমিক প্রেমিকার মধ্যে 'নাস্তি তেষু জাতি, বিদ্যা, রূপ, কুলধন ক্রিয়াদি ভেদঃ।' তাহাদের মধ্যে জাতি, বিদ্যা, রূপ, কুল, ধন এবং ক্রিয়ার ভেদ নাই। যেখানে ভেদ দেখিতে পাইবে, সেইখানেই জানিবে, অকপট প্রেমের অভাব। প্রেম-রাজ্যে জাতিভেদ, বর্ণভেদ স্থান পায় না। অতি অন্ত্যজ বর্ণও যদি তোমাকে প্রাণটী ভরিয়া ভালবাসে, তোমার সাধ্য আছে কি, তুমি তাহাকে পদদলিত কর? আর তুমি যত বড় মহান ব্যক্তিই কেন হওনা, রজকিনী কেন, একটী মহাপাষণ্ড কি তোমাকে ভালবাসিতে পারে না? সে যদি তোমাকে প্রাণটী ভরিয়া ভালবাসে, তবে তুমি কয়দিন তাহাকে উপেক্ষা করিয়া কাটাইতে পার? গুহক চণ্ডাল শ্রীরাম চন্দ্রকে 'ওরে হারে' বলিয়া সম্বোধন করিতেন বলিয়া লক্ষ্মণ তাঁহাকে হনন করিতে উদ্যত হন। শ্রীরাম চন্দ্র তখন কি বলিয়া অনুজকে নিরস্ত করিয়াছিলেন? তিনি কি বলিয়াছিলেন না যে, আমার বন্ধুর কোন দোষ নাই, সে যে প্রেমে বিহ্বল হইয়া আমাকে 'ওরে হারে' বলিয়া ডাকে। আমিও তাহাকে অতিশয় ভালবাসি।' শবরী চণ্ডাল-কন্যা। প্রেমের প্রভাবে সে পঞ্চবটী বনে শ্রীরাম চন্দ্রকে উচ্ছিষ্ট ফল খাওয়াইতে পারে নাই কি?

চণ্ডীদাস প্রেমের কবি, তিনি প্রফুল্লকণ্ঠে প্রেম-সঙ্গীত গাহিতে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন,—সাহিত্যের পুষ্টি সাধন তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি বাঙ্গালী ছিলেন, তাই বাঙ্গলা ভাষায় গান গাহিয়া, হৃদয়ের অতৃপ্ত প্রেম কাহিনী ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রেমময় লেখনী নিঃসৃত যে অমূল্য রত্নরাজি, সাহিত্য-ভাণ্ডারে, সঞ্চিত হইয়া তাহার কলেবর শ্রীসম্পন্ন করিয়াছে, তাহা তাঁহার অজ্ঞাতসারেই সংঘটিত হইয়াছে। সাহিত্য-উন্নত করার কল্পনা; কোন ক্রমেই তাঁহার মনে উদিত হয় নাই, তিনি নিজের মনে নিজের প্রাণে বিপুল উচ্ছ্বাস সহকারে মরমের নিভৃত প্রান্ত হইতে প্রেম সংগীত গাহিয়াছেন, তাহাই দৈবক্রমে বঙ্গভাষার, মাতৃভাষার অলঙ্কার স্বরূপ হইয়া গিয়াছে। তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কত শত কবি-কোকিল বঙ্গীয় কবিতা-কানন মুখরিত ও ঝঙ্কৃত করিয়াছে।

১৩১৩ শকের হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি খানিতে পাওয়া যায়, রামিনীর পিতার নাম সনাতন ও মাতার নাম লক্ষ্মী ছিল। তাহার আর একটী ভগিনী ও দুইটী ভ্রাতা ছিল, কিন্তু তাহাদের নাম জানিতে পারা যায় না। নান্নুরের তিন ক্রোশ উত্তর-পূর্ব্বে তেহাই নামক গ্রামে তাহাদের বসতি ছিল। অল্প সময়ের মধ্যে রামিনীর ভগিনী ও দুইটী ভ্রাতা এবং জননীর বিয়োগ হওয়ায়, সনাতন সংসারে আসক্তি-শূন্য হইয়া একাকী গৃহ হইতে পলায়ন করে। তাহার পলায়নের পর রামিনী কিয়দ্দিবস পৈতৃক ভিটাতেই বাস করে, কিন্তু পরে খাদ্যাভাব উপস্থিত হওয়ায় সে তেহাইএর মমতা ত্যাগ করিয়া নান্নুরে গমন করে এবং পরে বিশালাক্ষ্মীর মন্দিরে দাসীরূপে স্থান পায়। তৎকালে তাহার বয়স পঞ্চদশ বর্ষ হইয়াছিল। এই তেহাই গ্রামের সন্ধান আমরা জানিতে পারি নাই।

বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ।

বৈষ্ণব ধর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠধর্ম্ম আর নাই। যে ধর্ম্ম বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু, তৃণ

হইতেও সুনীচ হইতে শিক্ষা দেয়, যে ধর্ম্ম অমানী ব্যক্তিকে মান্য করিতে উপদেশ দেয়, সে ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ না হইলে আর কোন্ ধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ বলিব? আমরা প্রথম প্রস্তাবে বলিয়াছি, বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব মন্দীভূত হইতে আরম্ভ হইলে, বৈষ্ণব ধর্ম্ম মস্তক উত্তোলন করিতে আরম্ভ করে। ইহার আর একটী প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল—শাক্ত ধর্ম্ম। কিন্তু বৈষ্ণব ধর্ম্ম কিরূপে তাহার এই সন্নিকট-প্রতিবেশী প্রতিপক্ষকে পরাভূত করিয়া প্রাধান্য বিস্তার করিল, তাহা বলিবার স্থান এখানে নাই। বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সময় হইতেই, প্রকৃতপক্ষে, বৈষ্ণব ধর্ম্মের যশসৌরভ দিগ্‌দিগন্তে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন, শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্ব্বে ভারতের ধর্ম্মরাজ্যের অবস্থা কি শোচনীয় হইয়াছিল। প্রতাপান্বিত পাঠান নরপতিগণের অমানুষিক অত্যাচার নিরন্তর সহ্য করিতে করিতে গৌড়, বঙ্গ, বিহার, রাজপুতানা, উৎকল প্রভৃতি দেশবাসীগণ কিরূপ দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল, মোস্‌লেম ধর্ম্মের প্রবল বন্যার স্রোত কি ভাবে প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা আর তাঁহাদিগকে নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। ভারতের এই ঘোর দুর্দ্দিনে, চৈতন্যদেব আবির্ভূত হইয়া যদি সকলকে সমস্ত কদাচার হইতে মুক্ত না করিতেন, খোল করতালের উচ্চ নিনাদের সহিত হরিনাম কীর্ত্তন দ্বারা সেই দুশ্চিকিৎস্য রোগ হইতে আর্য্যজাতিকে উদ্ধার না করিতেন, তবে নিশ্চয়ই 'আর্য্য' শব্দ এত দিন বিস্মৃতির অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হইয়া চিরশান্তি লাভ করিত।

কিন্তু চৈতন্য দেবের সেই প্রিয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের আজ কি দুর্দ্দশা! যিনি প্রকৃতির মুখ দর্শন করিতেন না, যিনি প্রকৃতির নিকট ভিক্ষা লওয়ার অপরাধে প্রিয়শিষ্য হরিদাসকেও বর্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, আজ সেই মহাপুরুষের দোহাই দিয়া, কত নরপিশাচ 'মহাপ্রভুর গুপ্ত সাধন' করিতে কত কুলবতীকে কুলের বাহির করিয়া সমাজের ঘোরতর অবনতির পন্থা সুপ্রশস্ত করিতেছে,—গার্হস্থ্য সুখ শান্তিতে কণ্টক প্রদান করিতেছে! মহাপ্রভু বৈষ্ণবের লক্ষণ বলিয়াছেন,—

> 'প্রভু কহে যার মুখে শুনি একবার।
> কৃষ্ণ সম পূজ্য সেই শ্রেষ্ঠ সবাকার॥
> এক কৃষ্ণ নামে করে সর্ব্ব পাপক্ষয়।
> নববিধ ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয়॥
> দীক্ষা পুরশ্চর্য্যাবিধি অপেক্ষা না করে।
> জিহ্বা স্পর্শে আচণ্ডালে সবারে উদ্ধারে॥
> আনুসঙ্গ ফলে করে সংসারের ক্ষয়।
> চিত্ত আকর্ষণে করে কৃষ্ণ প্রেমোদয়॥
> *　　　*　　　*
> অতএব যার মুখে এক কৃষ্ণনাম।
> সেই বৈষ্ণব করি তার পরম সাধন। *

একবার কৃষ্ণনাম করিলে সর্ব্বপাপের বিনাশ হয়, যে সেই কৃষ্ণনাম করে, তাহাকে বৈষ্ণব বলি। 'উৎকল খণ্ডে' লিখিত আছে,—'যাহারা জগতে সর্ব্বদা পরের উপকার করেন, পরের কুশলে আপনার কুশল মনে করেন, পর দুঃখে কাতর হইয়া কেবল পরের ভাবনাই ভাবেন, তাদৃশ দয়াবান সদাশয় ব্যক্তিগণই বৈষ্ণব বলিয়া বিখ্যাত। যাঁহারা পরের সম্পদকে পাষাণ বা লোষ্ট্রখণ্ডবৎ জ্ঞান করেন, পরস্ত্রী ও কণ্টকাকীর্ণ শাল্মলীতে সমদর্শী; আপনার আত্মীয়বর্গ ও সুহৃদ্বর্গ ও শত্রুবর্গকে আত্ম জ্ঞান করেন, তাঁহারাই

* শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

বৈষ্ণব বলিয়া প্রসিদ্ধ। যাঁহারা একাগ্র ভাবে সতত ভগবানে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছেন, গুণবান ব্যক্তির সমাদর করেন, পরের মর্ম্ম কথা গোপনে রাখেন, সর্ব্বদাই সকলের প্রিয় কথা বলেন, তাঁহারা বৈষ্ণব বলিয়া প্রসিদ্ধ। যাঁহারা ভক্তিভাবে কংসহন্তা কৃষ্ণের মধুর পাপনাশী শুভ নাম কীর্ত্তন এবং উচ্চৈঃস্বরে সর্ব্বদা তাঁহার জয় ঘোষণা করেন, তাঁহারাই বৈষ্ণব বলিয়া প্রসিদ্ধ। যাঁহারা কায়মনোবাক্যে হরিতে আত্ম সমর্পণ করিয়া একাগ্র চিত্তে হরির পাদপদ্ম যুগল চিন্তা করেন, এবং সেই চিন্তাতেই বিভোর হইয়া সুখ দুঃখকে সমান জ্ঞান করেন, বিনম্র বচনে হরির স্তব এবং হরির পূজাতেই সর্ব্বদা ব্যগ্র থাকেন, তাঁহারাই বৈষ্ণব বলিয়া প্রসিদ্ধ।' (১) আজ আমরা কয়জন এরূপ বৈষ্ণব দেখিতে পাই? যে বৈষ্ণবসেবাকে শ্রীচৈতন্য প্রভু মুখ্যধর্ম্ম বলিয়া বারবার উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, আজ কেন আমরা সেই ভক্তকে ভণ্ড মনে করিয়া দ্বারোয়ান দ্বারা গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেই? স্বেচ্ছাচারিতাই বৈষ্ণব সমাজের এই অবনতির মূল। যে মহা প্রভু, রঘুনাথকে 'মর্কট বৈরাগ্য' দেখাইতে নিষেধ করিয়া গৃহে যাইয়া গৃহ ধর্ম্ম পালন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, আজ সেই মহা প্রভুর দোহাই দিয়া কত শত পাপাত্মা পিতৃ মাতৃ জল পিণ্ডের আশা রহিত করতঃ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করিয়া অজাতবৈরাগ্য হৃদয়ে বৈরাগীর ভেক গ্রহণ করিয়া গৌরাঙ্গের পবিত্র ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করিতেছে! আজ কত শত দুরাচারী সমাজ-কলঙ্ক, ধর্ম্মধ্বজী, স্বার্থপর উপদেষ্টৃবর্গ শাস্ত্রের কুব্যাখ্যারূপ বিষ প্রয়োগ দ্বারা কলির দুর্ব্বল মানবকে মূর্চ্ছিত করিতেছে,—প্রচলিত পাপাগ্নিতে শুষ্ক ইন্ধন প্রদান করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই! কর্ত্তাভজা, গৌরীদাস, ন্যাড়া, বাউল, আউল, সহজীয়া প্রভৃতি কত শত উপধর্ম্মী তাণ্ডব নৃত্যের সহিত বিকট কোলাহল করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মের কঙ্কাল লইয়া টানা হেঁচড়া করিয়া আর্য্যভূমিকে প্রেতভূমিতে পরিণত করিতেছে, তাহা ভাবিলেও ম্রিয়মান হইতে হয়। বৈষ্ণব ধর্ম্মের একলঙ্ক-কালিমা কি ধৌত হইবে না?

যাহা হউক, আমরা আলোচ্য বিষয় হইতে বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছি। চণ্ডীদাস বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁহার

রাধার কি হলো অন্তরে ব্যথা!
বসিয়া বিরলে, থাকয়ে একলে, না শুনে কাহার কথা॥
সদাই ধেয়ানে, চাহে মেঘপানে, না চলে নয়নের তারা।
বিরতি আহারে, রাঙ্গাবাসপরে, যেমন যোগিনী পারা॥
এলাইয়া বেণী, ফুলের গাঁথনি, দেখয়ে খসায়ে চুলি।
হসিত বয়ানে, চাহে মেঘপানে, কি কহে দুহাত তুলি॥
এক দিঠ করি, ময়ূর ময়ূরী, কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাস কয়, নব পরিচয়, কালিয়া বঁধুর সনে॥

পাঠে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কথাই মনে পড়ে। শ্রীচৈতন্য প্রভুও কৃষ্ণপ্রেমে এমনি আত্মহারা হইয়াছিলেন। চণ্ডীদাসের রাধিকার এভাব কি বৈষ্ণব সাধুদিগের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয় না? নীল-নিচোল-পরিহিতা রাধিকা মূর্ত্তিই বৈষ্ণব সাহিত্যে সুলভ, কিন্তু রাঙ্গাবাস (গেরুয়া) পরা রাধিকা এখানে সন্ন্যাসিনীর মত, তাহার পরিধান গেরুয়া এবং আহারে বিরতি (উপবাস আচরণ) ও মেঘ দেখিলেই কৃষ্ণ ভ্রমে কর জোড়ে সকাতর অনুনয়, এক দৃষ্টে ময়ূর ময়ূরীর কণ্ঠ দেখিয়া

(১) দশম অধ্যায়,—শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত।

বর্ণ-মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া পড়া, এ সকল বৈষ্ণব সাধুভক্তগণের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। (১)

একে কুলবতী ধনী তাহে সে অবলা।
ঠেকিল বিষম প্রেমে কত সবে জ্বালা॥
অকথন বেয়াধি এ কহা নাহি যায়।
যে করে কানুর নাম ধরে তার পায়॥
পায়ে ধরে কাঁদে সে চিকুর গড়িয়ায়।
সোণার পুতলি যেন ভূমেতে লোটায়॥
পুছয়ে কানুর কথা ছল ছল আঁখি।
কোথায় দেখিলা শ্যাম কহ দেখি সখি॥
চণ্ডীদাস কহে কাঁদ কিসের লাগিয়া।
সে কালা আছয়ে তোর হৃদয়ে জাগিয়া॥

এই স্বর্ণ পুত্তলি প্রেমিকের নয়ন-পুত্তলি কোন সুন্দরীর ছবি বলিয়া মনে করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। যিনি ধূলিময় প্রাঙ্গণ ভূমিতে ইতর জাতির মুখেও হরিনাম শুনিলে অবলুণ্ঠিত হইয়া তাহার পদে পড়িতেন, সেই স্বর্ণ-পুত্তলি গৌরহরির ছবিরই পূর্ব্বাভাষ যেন এই পদে সূচিত হইতেছে।

চণ্ডীদাসের রাগাত্মিকা পদাবলীতে বড়ই কঠিন তত্ত্ব বিচিত্র ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চণ্ডীদাসের সময়ে বৈষ্ণব ও শাক্ত সম্প্রদায়ে ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বীতা চলিতেছিল। শাক্তদিগের সাধন সংগীতাবলী প্রহেলিকাময় ভাষায় রচিত হইয়াছে। তাহারই প্রভাবে চণ্ডীদাসও রাগাত্মিকা পদাবলীতে ঐরূপ প্রহেলিকাময় ভাষা ব্যবহার না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। তাঁহার এই সকল পদাবলী পাঠে অনুমান হয় যে, তিনি অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে ও বৈষ্ণব ধর্ম্মে নিগূঢ় আস্থাবান হইবার পূর্ব্বে সে গুলি রচনা করিয়াছিলেন। কারণ কোন বৈষ্ণব কবিরই ভাষা এত জটিল নহে এবং বৈরাগ্য-ভাবাপন্ন কোন কবিই তৎপ্রদর্শিত পন্থানুসরণ করিয়া কাব্যাদি প্রণয়ন করেন নাই। চণ্ডীদাসের কথিত 'সহজ সাধন' অতীব কঠিন, অল্প লোকেই তাহা সাধন করিতে পারেন। তাই কবি গাহিয়াছেন,—

সহজ আচার, সহজ বিচার, সহজ বলিব কায়।
না জানি মরম, করে আচরণ, এ বড় কঠিন দায়॥
না জানি ধরম, না জানি করম, আচরিতে করে আশ।
ত্রিদেবের গান, শুনিয়ে যেমন, কাকে করে অভিলাষ॥
সুধাকর দেখি, খদ্যোত যেমন, সমতেজ যত চায়।
শত শত কোটী, করয়ে উদয়, তবু তার যোগ্য নয়॥
পারিজাত পুষ্প, দেবের দুর্লভ, করিতে করয়ে আশ।
শিব নৃত্য দেখি, ভূতগণ নাচে, দেবের সমাজে হাস॥
এমন যে জন, নিত্য সহজে যজায়, আচরিতে করে আশ।
বাশুলী আদেশে, ভণে চণ্ডীদাসে, নরকে হইবে বাস॥

হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি।

এই পুঁথি খানিতে চণ্ডীদাসের বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ সম্বন্ধে একটী গল্প বিবৃত আছে। একদা চণ্ডীদাস সন্ধ্যার পর বিশালাক্ষীর মন্দির হইতে রজকিনীর আলয়ে আসিতেছেন। বাড়ীর নিকট একটী বকুল বৃক্ষতলে দীপহস্তে একটী রমণীকে দেখিয়া তিনি তাঁহার নিকট অগ্রসর হইয়া দেখেন, স্বয়ং দশভুজা প্রদীপ হস্তে দাঁড়াইয়া আছেন! চণ্ডীদাস মহামায়ার চরণে প্রণাম করিলে, দেবী তাঁহাকে বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে আদেশ দিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। পর দিবস চণ্ডীদাস মস্তক মুণ্ডন করিয়া তুলসী কাষ্ঠের মালা গলায় দিয়া যুগল মন্ত্র গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত রমণী মোহন মল্লিকের সংস্করণে এ সম্বন্ধে আর একটী গল্প স্থান পাইয়াছে। পাঠকগণের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম। বিজ্ঞ পাঠকগণ সত্যাসত্য নির্ণয় করিবেন।

একদিন চণ্ডীদাস স্নানার্থে নদী তীরে

(১) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, একটী পদ্ম-কোরক জলে ভাসিয়া যাইতেছে। তিনি যত্নের সহিত ফুলটী তুলিয়া লইয়া ভাবিলেন, ফুলটী কি মনোহর। এ ফুলটী কি নির্ম্মাল্য?—না, নির্ম্মাল্য হইলে ফুলটী প্রস্ফুটিত থাকিত। ফুলটী নির্ম্মাল্য নহে সিদ্ধান্ত করিয়া, মনে মনে ভাবিলেন, আজ এই সুন্দর ফুলে মা বিশালাক্ষীর পূজা করিব। স্নানকার্য্য শীঘ্র সম্পন্ন করিয়া, তিনি বড়ই আনন্দ সহকারে মাতা বিশালাক্ষীর পূজা করিতে বসিলেন। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ভগবতীকে ফুলটী অর্পণ করিতেছেন, এমন সময়ে ভগবতী আবির্ভূতা হইয়া চণ্ডীদাসকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'হে ভক্ত সাধকাগ্রগণ্য! ও ফুল আমার চরণে তুমি অর্পণ করিও না, ও ফুল আমার মাথায় দেও।' চণ্ডীদাস সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন, ভগবতী স্বয়ং সম্মুখে আবির্ভূতা। চণ্ডীদাসের আনন্দের সীমা রহিল না। অমনই করযোড়ে বলিয়া উঠিলেন, 'মাগো, যোগীঋষি কত যজ্ঞ, কত তপ করিয়া তোমাকে পায় না, আজ আমার কি সৌভাগ্য যে তুমি আমাকে দর্শন দিয়াছ। যাহা হউক, মা আমি ভক্তি সহকারে তোমার চরণে ফুলটী অর্পণ করিতেছিলাম, কেন তুমি তাহা তোমার মাথায় দিবার জন্য আদেশ করিতেছ?' ভগবতী বলিলেন, "হে ভক্তশ্রেষ্ঠ! ও ফুলটীতে আমার গুরুর অর্চ্চনা হইয়াছে, অতএব উহা আমার মাথায় দেও।' চণ্ডীদাস উত্তর করিলেন, 'সে কি মা, তোমার আবার গুরু কে আছে?" 'ভগবতী বলিলেন, বৈকুণ্ঠপতি শ্রীগোবিন্দ আমার গুরু।' চণ্ডীদাস বলিলেন, 'মাগো, তিনি যদি তোমারই পূজ্য হন, তবে আমিও অতঃপর তাঁহাকে পূজা করিব।' ভগবতী 'তথাস্তু' বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। চণ্ডীদাস ইহার পর কৃষ্ণপরায়ণ হইলেন এবং তদ্বিষয়ক পদাবলী রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

চণ্ডীদাসের পিতা ভবানীচরণ শাক্তমতাবলম্বী ছিলেন। চণ্ডীদাসও প্রথম বয়সে 'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরঃধর্ম্ম ভয়াবহ' ভাবিতেন, কিন্তু ভগবতীর উপদেশের পর হইতে তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

বৈষ্ণবদিগের মতে 'ব্রজভাবের উদয় না হইলে কৃষ্ণ প্রাপ্তি সংঘটন হয়না। ব্রজ ভাবে কৃষ্ণের ভজনাই শ্রেষ্ঠ সাধন। রাধাকৃষ্ণের নিগূঢ় রস 'ব্রজ বিনা ইহা না জানে অন্য।' গোপিনীগণ ভিন্ন সে মধুর রস আর কেহ আস্বাদন করিতে পারে না। তাই অনেক বৈষ্ণব ব্রজের গোপী হইয়া জন্মিবার অভিলাষ করেন। রামাবতারে যে সকল ঋষিগণ রামচন্দ্রের কার্য্য উদ্ধারার্থে কপিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই কৃষ্ণলীলার গোপিনীদল। ভগবানের মাধুর্য্য রস গোপীভাব ভিন্ন আস্বাদন করা যায় না বলিয়াই তাঁহাদের এইরূপ পরিবর্ত্তন। চণ্ডীদাসও গোপীভাব হৃদয়ে পোষণ করিতেন,—'দ্বিজচণ্ডী দাস কহে শুন শ্যামধন। কৃপা করি এ দাসীরে দেহ শ্রীচরণ।'

বর্ত্তমান সময়ে যে সকল ভণ্ডতপস্বীগণ কপট বৈরাগ্য-ভেক গ্রহণ করিয়া পবিত্র বৈষ্ণব ধর্ম্মের জলন্ত কুকীর্ত্তিস্তম্ভ হইতেছে, যে সকল অধর্ম্মাচারী বৈষ্ণবগণ প্রকৃতি বিনা গুপ্তসাধন হয় না বলিয়া, দুই তিনটী করিয়া প্রকৃতি বামে বসাইয়া বৈষ্ণব জন্ম সফল করিতেছে, যাহাদের কুকীর্ত্তি "ন্যাড়ানেড়ির দরবার"বলিয়া লোকে উপহাস করিয়া থাকে, তাহারা শৃঙ্গার রসের অর্থ যাহাই করুক না

কেন, চণ্ডীদাস তাহার যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা অনেকেরই জ্ঞানের বহির্ভূত।

শৃঙ্গার রস বুঝিবে কে?
সব রস সার শৃঙ্গার এ॥
শৃঙ্গার রসের মরম বুঝে।
মরম বুঝিয়া ধরম মজে॥
রসিক ভকত শৃঙ্গারে মরা।
সকলে রসের শৃঙ্গার সারা॥
কিশোরা কিশোরী দুইটী জন।
শৃঙ্গার রসের মুরতি হন॥
গুরু বস্তু এবে বলিব কায়।
বিরিঞ্চি ভবাদি সীমানা চায়॥
কিশোরা কিশোরী যাহাকে ভজে।
গুরু বস্তু সেই সদা যজে॥
চণ্ডীদাস কহে না বুঝে কেহ।
যেজন রসিক বুঝয়ে সেহ॥

রসিক ভিন্ন এরস অন্য কাহারো বুঝিবার শক্তি নাই। উপভোগ-লালসা ও প্রেম, এ দুইটী যে ভিন্ন, তাহা উক্ত পদটীতে চণ্ডীদাস বুঝাইয়াছেন। প্রেমকে তিনি বড় উচ্চ অঙ্গের জ্ঞান করিতেন,—'পিরীতি করিয়া ভাঙ্গয়ে যে, সাধনা অঙ্গ না পায় সে।' প্রেম ভঙ্গ করিলে তাহার সাধনা নষ্ট হয়। যাহার হৃদয়ে প্রেম বদ্ধমূল হইয়াছে, তাহার মন অন্য দিকে 'টলিয়াও টলেনা।'

শাক্ত ও বৈষ্ণব, হিন্দুদিগের এই দুই সম্প্রদায়ই প্রধান এবং এই দুই সম্প্রদায়ের নিকটই বঙ্গভাষা সমধিক ঋণী। শাক্তদিগের কল্যাণে বাঙ্গালা পদ্য জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকিলেও বৈষ্ণবদিগের প্রসাদে উহা শ্রীসম্পন্ন হইয়াছে। বৈষ্ণবগণ বাঙ্গালা পদ্যে যে মধুরতা প্রদান করিয়াছেন, শাক্তগণ তাহা দিতে পারেন নাই; তাহার কারণ, বৈষ্ণবগণ সৌন্দর্য্যের উপাসক, শাক্তগণ ভীমকান্তির উপাসক। বৈষ্ণব গ্রন্থের তুলনায় শাক্তগ্রন্থ নগণ্য। বৈষ্ণবগণ যে সমুদয় পদাবলী রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিলেই প্রাণ আকুল করে। নিম্নোদ্ধৃত রাধিকার বিরহ-গীতিটী শ্রবণ করিলে কোন্ হৃদয়বান ব্যক্তি না ব্যথিত হন?

সুখের সাধরে, দুঃখ উপজিল, ভাঙ্গিল যৌবন মোর।
আপনা জানিয়া, পিরীতি করিলাম, বন্ধুয়া হইল পর॥
সুজন দেখিয়া, পিরীতি করিলাম, কুজন বোলিবে কে?
অমৃত দেখিয়া, গরল ভখিলাম, ঢলিয়া পড়িনু সে॥
আপনা ভাবিয়া, পিরীতি করিলাম, পরকি আপনা হয়।
মিছা প্রেম করি, কান্দি ২ মরি, দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়॥
(হস্ত-লিখিত প্রাচীন পুঁথি)

শাক্তদিগের গ্রন্থ পাঠ করিলে, দেশের অতীতকালের কোন কথাই জানা যায় না, পরন্তু বৈষ্ণব সাহিত্য আলোচনা করিলে অন্যূন চারিশত বৎসর পূর্ব্বেরও সামাজিক অবস্থা, আচার পদ্ধতি প্রভৃতি সুন্দর রূপে অবগত হওয়া যায়। পুরাতত্ত্বহীনতার জন্য আমাদের চির-কলঙ্ক থাকিলেও, বৈষ্ণব সাহিত্য পাঠ করিয়া বৈষ্ণবদিগের সম্বন্ধে আমরা যেটুকু জানিতে পারি, শাক্ত সাহিত্য হইতে শাক্তদিগের সম্বন্ধে সেটুকুও জানিবার কোন উপায় নাই। নবদ্বীপ, বৃন্দাবন প্রভৃতি বৈষ্ণব তীর্থগুলি এখনো কেমন সজীব, পরন্তু ক্ষীরগ্রাম, নলহাটী, চণ্ডীপুর প্রভৃতি শাক্ত তীর্থগুলি তেমনি নির্জীব। বৈষ্ণবগণ সুললিত পদাবলী দ্বারা যেমন আমাদের কর্ণ-কুহর পবিত্র করিয়া গিয়াছেন, তেমনি প্রাচীন আচার ব্যবহার সম্বন্ধেও কথঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ করিয়া অতীত অন্ধকারের মধ্যে খদ্যোতের ক্ষীণরশ্মি বিকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। এ অংশেও শাক্ত সাহিত্য হইতে বৈষ্ণব সাহিত্য আদরণীয় ও উপকারী। লোক চিত্তের উপর বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাবও সামান্য নহে। চণ্ডীদাস যখন বাশুলী মন্দির হইতে বিতাড়িত হইয়া রামিনীর

সহিত তাহার ভবনে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন একদা নান্নুরের একজন সুরাপায়ী সমাজকলঙ্ক দুষ্টবুদ্ধি ব্যক্তি তাহাদিগকে বিড়ম্বিত করিবার অভিপ্রায়ে, তাহার শয়ন গৃহে একটী অজগর সর্প ছাড়িয়া দিবার মনস্থ করিয়া, একটী মৃৎপাত্রে একটী সর্প ধরিয়া রজনীযোগে রজকিনীর গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল! রজকিনীর গৃহের সন্নিকট উপস্থিত হইয়া সুরাপায়ী শুনিল, চণ্ডীদাস গাহিতেছেন,—

পরের বেদনা পরকি জানয়ে,পর কি আনের বশ।
পরের পিরীতি আকারে বসতি, কিবা সে জানয়ে রস॥
রসিক হইলে রস কি ছাড়য়ে, সুদৃঢ় চতুর জনা।
যত বড় তেঁহো রসের রসিক, সে সব গেলই জানা॥
(প্রাচীন পুঁথি)

পদগুলি তাহার কাণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিল। ভক্তের নিকট পাপীর পরাজয় হইল। তন্মুহূর্ত্ত হইতে তাহার জীবন স্রোত অন্যগতি অবলম্বন করিল সে হাঁড়ীশুদ্ধ সর্পটী অদূরে নিক্ষেপ করিয়া চণ্ডীদাসের নিকট উপনীত হইয়া তাঁহার চরণ ধরিয়া অপরাধ উল্লেখ পূর্ব্বক বারবার ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিল।

বৈষ্ণবদিগের প্রভাব সম্বন্ধে 'ভক্তমাল' গ্রন্থেও অনেক অলৌকিক গল্প স্থান পাইয়াছে। আমরা তাহার একটী মাত্র এস্থলে পাঠকগণকে উপহার দিলাম।

এক ব্যাধ পক্ষী বধের নিমিত্ত তীর ধনুক লইয়া এক সরোবর তীরে গমন করিল। তাহাকে দেখিবা মাত্র সমস্ত পক্ষী গুলি উড়িয়া 'যঃপলায়তি সঃজীবতি' নীতির পর্য্যাদা রক্ষা করিল। সুযোগমত পুনরায় পাখী মারিবে, এই আশায় ব্যাধ এক বৃক্ষের অন্তরালে বসিয়া আছে, এমন সময় এক বৈষ্ণব স্নানার্থ সরোবরে অবতরণ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া একটী পক্ষীও উড়িয়া পলায়ন কিম্বা ভীতি-চিহ্ন প্রকাশ করিল না। এই ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া ব্যাধ ভাবিল, তবে আমিও বৈষ্ণবের পরিচ্ছদ গ্রহণ করি, তাহা হইলে আমাকে দেখিয়াও আর পাক্ষী পলাইবে না। এবং এই উপায়ে আমি সহজেই বহুতর পক্ষী বধ করিতে পারিব। এইরূপ স্থির করিয়া ব্যাধ-বৈষ্ণব বেশ ধারণ করিয়া সরোবরে অবতরণ করিল, এবার একটী পক্ষীও তাহাকে দেখিয়া পলায়ন করিল না। সে সুযোগ বুঝিয়া পক্ষী ধরিবার নিমিত্ত যেমনি হস্ত প্রসারণ করিবে, অমনি কে যেন সহসা তাহার হৃদয়-মন্দিরে আবির্ভূত হইয়া তাহার হৃদয় তন্ত্রী অন্য দিকে ফিরাইয়া দিল। তাহার আর পক্ষী বধ করা হইল না, তাহার নয়ন-যুগল হইতে অবিরল ধারায় অশ্রু পতিত হইয়া আবক্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল,— 'পাষাণ গলিল সে করুণার প্লাবনে।' সে ভাবিল, সেবকের বেশ ধারণ করাতেই পক্ষী পশু প্রভৃতি এতদূর বিশ্বাস করিয়া আমার চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতেছে, না জানি প্রকৃত ভক্ত হইলে তাহারা আরো কিবা করে? হায়, আমি এত দিন কি অন্ধকারেই রুদ্ধ ছিলাম। যাহা হউক, আর আমি এ মধুর বেশ ত্যাগ করিব না। সেই হইতে ব্যাধ বৈষ্ণব হইয়া গেল।

বৈষ্ণবদিগের সাধন প্রণালী অতি কঠিন, তাহাদের অনুশাসন অতি দুরূহ। বৈষ্ণব-সাধু কামিনী কাঞ্চন বিষধরবৎ পরিহার করেন এবং প্রকৃত বৈরাগ্য জন্মিলে বিষয়েতে আসক্তিও জন্মায় না। রামানন্দ

রায়, রূপ সনাতন, রঘুনাথ দাস প্রভৃতি জগৎ-পূজ্য বৈষ্ণবগণই তাহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। প্রকৃতই যিনি সংসারের কোন সংবাদই রাখেন না, তাঁহার চরণমূলে রাজার রাজমুকুটও বিলুণ্ঠিত হয়। 'বৈরাগ্য শতকে' এক যোগী কোন এক রাজাকে বলিয়াছিলেন যে, আমরা সামান্য বল্কল পরিধান করিয়া সন্তুষ্ট হই, তোমরা দুকূল পরিধান করিয়া পরিতোষ লাভ কর। কিন্তু উভয়ের পরিতোষই সমান, প্রভেদ এই যে, আমরা দুকূল পাইলেও যেমন সন্তুষ্ট, বল্কল পাইলেও তেমনি সন্তুষ্ট হই, পরন্তু বল্কল পরিতে তোমরা কষ্ট অনুভব কর। তাহার কারণ, তোমাদের ভোগ-লালসা নিবৃত্তি হয় নাই,—দরিদ্র ব্যক্তির কখন তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয় না। মনকে লইয়াই সুখ দুঃখ। মন যদি সন্তুষ্ট থাকে, তবে দরিদ্রই বা কে, আর ধনীই বা কে? বৈষ্ণবের মনে সদা সন্তোষ বিরাজ করে, কাজেই তাহার কিছু অভাব বোধ হয় না—সে ধনী। আর অবৈষ্ণব, অসাধুর মনে কখন ভূমানন্দের উৎপত্তি হইতে পারে না, সে মহাপ্রতাপান্বিত হইলেও তৃষ্ণা-পীড়িত, কাজেই দরিদ্র। যাহার যত লালসা, তাহার তত অভাব; বিনা অভাবে তৃষ্ণা থাকিবে কেন? যাহার লালসার নিবৃত্তি হইয়াছে, যাহার অভাব পূর্ণ হইয়াছে, তাহার তৃষ্ণারও চির-নিবৃত্তি হইয়াছে। কিন্তু ভোগের দ্বারা, এ তৃষ্ণা নিবারণ হয় না, যোগের দ্বারা, অভ্যাসের দ্বারা নিবৃত্ত হইয়া থাকে। যদি ভোগের দ্বারাই তৃষ্ণা বিদূরিত হইবার সম্ভাবনা থাকিত, তবে এতদিনেও কি আমাদের এ ঘোর পিপাসার উপশম হইত না? মনুর অনুশাসনে ব্যক্ত, কামভোগ দ্বারা কখনো কামের উপরতি হয় না, বরং অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদানের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে। ভোগের দ্বারা কামের বৃদ্ধিই হইয়া থাকে মাত্র। বৈষ্ণব মাত্রেই এই কামের প্রভাব হইতে বিনির্মুক্ত। চণ্ডীদাস সংক্ষেপে যে তত্ত্ব কথা গাহিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া আমরা এ প্রস্তাবের উপসংহার করিলাম।

সদা বল তত্ত্ব তত্ত্ব কত তত্ত্ব শুন।
চব্বিশ তত্ত্বে হয় দেহের গঠন॥
পঞ্চভূত ক্ষেত্র তেজ মরুৎ ব্যোম আপ।
ষড় রিপু কাম ক্রোধ লোভ মদ মাৎসর্য্য দম্ভ॥
দশ ইন্দ্র ক্ষত তারা হয় ত পৃথক্।
জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বিবিধ নামাত্মক॥
জ্ঞানেন্দ্রিয় জিহ্বা কর্ণ নাসাত্বক চক্ষু।
কর্ম্মেন্দ্রিয় হস্তপদ গুহ্য লিঙ্গ বপু॥
মহাভূত অহঙ্কার আর হয় জ্ঞান।
এই ত হয় চব্বিশ তত্ত্ব নিরূপণ॥
কিবা কারিকরের আজব কারিকুরি।
তার মধ্যে ছয় পদ্ম রাখিয়াছে পুরি॥
সহস্রারে হয় পদ্ম সহস্রক দল।
তার তলে মণিপুর পরম শিবের স্থল॥
নাসা মূলে দ্বিদল পদ্ম খঞ্জনাক্ষী।
কণ্ঠে গাঁথি ষোড়শ দল পদ্ম দিল রাখি॥
হৃদ পদ্ম নিৰ্ম্মিত আছে শতদলে।
কুল কুণ্ডলিনী দশ দল হয় নাভি মূলে॥
নাভির নিম্নভাগে প্রেম-সরোবর।
অষ্টদল পদ্ম হয় তাহার ভিতর॥
তস্যোপরে নাড়ীধরে সার্দ্ধ তিন কোটি।
স্থূল সূক্ষ্ম বত্রিশ তারা কিবা পরিপাটী॥
লিঙ্গ মূলে ষড়দলাম্বুজ নিয়োজিত।
গুহ্য মূলে চতুর্দ্দল পদ্ম বিরাজিত॥
এই অষ্ট পদ্ম দেহ মধ্যেতে আছয়।
মতান্তরে হৃদপদ্ম দ্বাদশ দল হয়॥
সহস্র দল অষ্ট দল দেহ মধ্যে নয়।
এই দুই পদ্ম নিত্য বস্তুর আধার হয়॥
ষটচক্রের মূল মৃণাল হয় মেরুদণ্ড।

শিরসি পর্য্যন্ত সে ভেদ করি অন্ত ॥
দণ্ড দুই পার্শ্বেতে ঈড়া পিঙ্গলা রহে।
মধ্যেস্থিত সুষুম্না সদা প্রবল বহে ॥
মূল চক্র হয় হংস যোগের আধার।
অষ্ট দল চক্রে লীলার সঞ্চার ॥
দ্বিদল চক্রেতে হয় অমৃত নির্ভর।
আর পঞ্চ চক্রে পঞ্চ বায়ুর সঞ্চার।
প্রাণ অপান ব্যান উদান সমান।
কণ্ঠাম্বুজ বধি চতুর্দ্দলে অবস্থান ॥
কণ্ঠপরে উদান হৃদিতে বহে প্রাণ।
নাভির ভিতরে সমান করে সাধান ॥
চতুর্দ্দল অপান সর্ব্বভূতেতে ব্যান।
মুখ্য অনুলোম বিলোম সকল প্রধান ॥
অজপা নামেতে তারা কুম্ভক রেচক।
অনুলোম উর্দ্ধরেতা বিলোম প্রবর্ত্তক ॥
প্রবর্ত্ত সাধন হৃদ-নাভি-পদ্মের আশ্রয়।
সিদ্ধার্থ সহস্রারে আছয়ে নিশ্চয় ॥
রতি স্থির প্রেম সরোবর অষ্ট দলে।
সাধনের মূল এই চণ্ডীদাস বলে ॥

বৈরাগ্য উদয় না হইলে সাধনার সিদ্ধি লাভ ঘটে না; সাধনার প্রথম স্তরেই বৈরাগ্যযোগ বা বিষাদযোগ। তত্ত্বজ্ঞান সহজে উদয় হইতে পারে, কিন্তু বৈরাগ্য সহজে উদয় হইবার নহে। প্রিয় পুত্র দারা সুতের মায়া মমতা কি শীঘ্র ত্যাগ করা যায়? ‘স্বাত্মতত্ত্বাভি গমনং ভবতি প্রায়শোনৃণাং। মুনে বিষয় বৈরাগ্যং কদর্থাতুপজায়তে।” আত্মতত্ত্ব বরং অল্পায়াসে লাভ হয়, কিন্তু বিষয়ে বৈরাগ্য লাভ অতি কষ্টে ঘটে। সাধন স্থায়ী করিতে হইলে বৈরাগ্যের আবশ্যক, আবার বৈরাগ্য লাভ করিতে হইলে অতিশয় শ্রম স্বীকার করিতে হয়। বৈরাগ্যই সর্ব্বসিদ্ধির মূল কারণ,—বৈষ্ণবগণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

৺ রায় বীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী বাহাদুর।

যাঁহাদের জীবনে বিশেষ কোনও গুণের উৎকর্ষ বা বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহাদের চরিত্র আলোচনা ও অনুকরণ করিলে জনসাধারণের মঙ্গল হইতে পারে, তাঁহাদের জীবন-বৃত্তান্ত সাহিত্যের অঙ্গীভূত হইবার যোগ্য, সন্দেহ নাই। যে মহাত্মার জীবনের বৃত্তান্ত এই প্রবন্ধে প্রকাশ করিবার জন্য আমরা মানস করিয়াছি, তিনি সেই শ্রেণীর মনুষ্য ছিলেন। বীরেশ্বর বাবু একজন কর্ম্মবীর। ছোট নাগপুরের ছাব্বিশ হাজার বর্গ মাইল পরিমিত পাঁচটী পার্ব্বত্য ও অরণ্যময় জেলার আদিম জাতিগণের মধ্যে শিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তার—এইটী তাঁহার জাজ্জ্বল্যমান বিরাট কীর্ত্তি। অটল বিশ্বাস ও ঈশ্বরনির্ভর, অদ্ভুত সাহস, অতিদৃঢ় কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, অসীম অধ্যবসায়, অদম্য উৎসাহ এবং আন্তরিক সরলতা ও উদারতা ব্যতীত তাঁহার জীবনের এই সুমহৎ ব্রত কখনই উদ্‌যাপিত হইতে পারিত না। অপদার্থ ভীরু বাক্যবীর বলিয়া জগতের নিকট ঘৃণিত ও উপেক্ষিত বাঙ্গালীর পক্ষে এই সকল বীরোচিত গুণের আলোচনা যেমন উপকারজনক, অন্য কিছুই তেমন নহে। আমাদের বন্ধুর বীরেশ্বর নাম ধারণ সার্থক হইয়াছিল। তাই আজ আমরা এই মনোহর জীবন কাহিনী পাঠকগণের নিকট বিবৃত করিতেছি।

যে বংশে বীরেশ্বর জন্ম গ্রহণ করেন,

তাহাতে অনেক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও শাস্ত্রাধ্যাপক উদ্ভূত হন। ইঁহারা দাক্ষিণাত্য বৈদিক শ্রেণীর কাশ্যপ গোত্রীয় ও যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে গোপীজনবল্লভ মিশ্র নামক জনৈক ব্রাহ্মণ দক্ষিণ দেশ হইতে আসিয়া হুগলী জেলার অন্তর্গত মিল্‌কির সন্নিহিত গোয়াই গ্রামে বাস করেন। তাঁহার পৌত্র পরশুরাম বিদ্যাভূষণ চন্দননগরের কোন সমৃদ্ধ জমিদারের অনুরোধে তথায় চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হন এবং ক্রমে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় গোয়াই হইতে বাস উঠাইয়া চন্দননগরেই বাস করেন। চন্দননগরের বুড়শিবতলায় "বিদ্যাভূষণের ডাঙ্গা" এখনো প্রসিদ্ধ। পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর সন্নিধানে সুবৃহৎ বৃক্ষ ও ভগ্ন দেবমন্দিরাদি-পূর্ণ প্রশস্ত ভূমিখণ্ড অতীতের সাক্ষী স্বরূপ এখনো বর্ত্তমান রহিয়াছে। বিবাহ শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মে এখনো ঐ অঞ্চলের লোকে ভক্তিভরে বিদ্যাভূষণের চতুষ্পাঠী ও দেবমন্দিরের উদ্দেশে অর্থদান করিয়া থাকে। পরশুরাম বহুসংখ্যক ছাত্রকে অন্নদান করিতেন ও তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

পরশুরামের পুত্র নীলকণ্ঠ সার্ব্বভৌমও প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু তদীয় পুত্র ভবানীচরণের যশোরাশি পূর্ব্ব পুরুষগণের বিপুল কীর্ত্তিকেও অতিক্রম করিয়াছিল। সর্ব্বশাস্ত্রে সমান পারদর্শিতা লাভ করায় ভবানীচরণ গুরুর নিকট হইতে "পঞ্চানন" এই আখ্যা প্রাপ্ত হন। তাঁহার অগাধ বিদ্যা, ঐকান্তিক ধর্ম্ম-নিষ্ঠা ও কঠোর সংযম ব্রত নিয়মাদি পালন দেখিয়া, চন্দননগর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহের আবালবৃদ্ধ বনিতা তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি ও পূজা করিত। ইঁহার পত্নী শিবানী পতির গুণে এত দূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, পতির মৃত্যুর পর তিনি জ্বলন্ত চিতায় দেহ বিসর্জ্জন করিয়া তাঁহার অনুগমন করেন। চন্দন নগরের অনেক প্রাচীন অধিবাসী এখনো শিবানীর সহমরণের যে অপূর্ব্ব আখ্যায়িকা ভক্তির সহিত বলিয়া থাকে, তাহা এত দূর বিস্ময়কর যে, এস্থলে তাহা না দিয়া থাকিতে পারিলাম না।

গঙ্গাতীরে ভবানীচরণের মৃত্যুর পর আত্মীয় স্বজনগণ সকলেই শোকাকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিল, কিন্তু তাঁহার পত্নী শিবানী চিন্তামগ্ন হইয়া স্থির ভাবে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার মুখে শোক বা ব্যাকুলতার চিহ্ন কেহ দেখিতে পাইল না। পরে যখন জ্যেষ্ঠ পুত্র রামমোহন জ্ঞাতি ও অন্যান্য বন্ধুবর্গের সাহায্যে দাহের আয়োজন করিতে উদ্যত হইলেন, তখন শিবানী তাঁহাকে ডাকিয়া ধীর ভাবে বলিলেন,—বাবা মোহন, দুই জনের উপযুক্ত চিতার আয়োজন কর। রামমোহন জননীর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন ও কনিষ্ঠভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া শিবানীর চরণতলে পতিত হইয়া আকুল ভাবে রোদন করিতে লাগিলেন। প্রবীণ জ্ঞাতি ও কুটুম্ববর্গ আসিয়াও শিবানীকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই সহমরণের সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন না। তিনি বলিলেন,—"আপনারা আমার গুরু, যাহাতে আমার পারত্রিক মঙ্গল হয়, সে বিষয়ে বাধা দিবেন না।" তখন বৃদ্ধেরা তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার মানসে সহমরণের কষ্ট ও ভীষণ যন্ত্রণার বর্ণনা করিয়া বলিলেন, "শিবানি!" তুমি

এই যন্ত্রণা কখনো সহ্য করিতে পারিবে না। আর আজ কাল সরকারের হুকুমে ফিক ধরিবার (অর্থাৎ বাঁশ দিয়া চাপিয়া ধরিবার)ও যো নাই। যদি তুমি চিতা হইতে উঠিয়া আইস তাহা হইলে বংশের সর্ব্বনাশ হইবে, আমাদের জাতি যাইবে। দাহের কষ্ট ইচ্ছা ক্রমে সহ্য করা মানুষের সাধ্য নয়।" এই কথা শুনিয়া শিবানী ঈষৎ হাস্য করিলেন; বলিলেন, "আপনারা ভয় করিবেন না, আমি পরীক্ষা দিয়া আপনাদের চিন্তা দূর করিব।" এই বলিয়া তিনি মোটা সলিতা দেওয়া একটী বৃহৎ ঘৃতের প্রদীপ আনাইলেন ও তাহা খুব তেজে জ্বালিয়া দিলেন। পরে আপনার বাম হস্তের কনিষ্ঠা অঙ্গুলিটী সেই প্রদীপের ঘৃতে ভিজাইয়া, জ্বলন্ত শিখার মধ্যে ধরিয়া রহিলেন। সকলে বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে দেখিল, আঙ্গুল পড়্ পড়্ করিয়া পুড়িয়া অঙ্গার হইতেছে, কিন্তু রমণীর মুখের একটু বিকৃতিও নাই—বরং আরও সহাস্য প্রসন্ন ভাব। আর কেহ কোন কথা বলিতে সাহসী হইল না। সকলে ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইয়া তাহাকে ভক্তি ভাবে প্রণাম করিল। শিবানী লালপাড় শাটী, সিন্দুর, শাঁখা প্রভৃতি সধবার সাজ আনাইলেন—পতির মৃত দেহের সম্মুখে সধবার সাজে সাজিলেন। দেখাইলেন যে, যথার্থ সতী যে, সে বিধবা হয় না। পরে শিবানী আম্র-পল্লব হস্তে লইয়া মস্তকের উপর ঘুরাইতে ঘুরাইতে "কালী কালী" বলিয়া পতির চিতায় তাঁহার পার্শ্বে শয়ন করিলেন ও অগ্নি সংযোগ করিতে আদেশ করিলেন। অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, সকলে দেখিল, সেই অগ্নির মধ্যে শিবানী প্রশান্ত মূর্ত্তিতে শয়ন করিয়া হস্ত ঘুরাইতেছেন ও "কালী কালী" বলিতেছেন। কিয়ৎকাল পরে হস্ত ঢলিয়া পড়িল, কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, সতী পতির সহিত স্বর্গপুরে চলিয়া গেলেন। পুত্রেরা এক সঙ্গে পিতা মাতাকে বিসর্জ্জন দিয়া ঘরে ফিরিল। গ্রামের সমস্ত সধবা রমণী সতীর নিদর্শন ভক্তিভরে সংগ্রহ করিল—কেহ এক খণ্ড বসন লইল,—কেহ শাঁকার এক টুকরা লইল,—কেহ বা যেখানে তাঁহার মাথায় সিন্দূর ঢালা হইয়াছিল, সেখান হইতে একটু সিন্দূর যত্নে উঠাইয়া লইল। এই সকল নিদর্শন অনেক পরিবারে যত্ন-সহকারে পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে রক্ষিত আছে।

ভবানীর পুত্রের নাম রামমোহন। রামমোহনের দুই পুত্র—লোকনাথ ও আনন্দ। জ্যেষ্ঠ লোকনাথ পিতৃ পুরুষের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া কেবল সংস্কৃত পাঠে মনোনিবেশ করেন এবং যথাকালে ন্যায়রত্ন উপাধি লাভ করিয়া অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হন। তিনি পুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, ভগবদ্গীতা ও বেদান্ত শাস্ত্রাদিতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং অনেকে এই সকল বিষয়ের জটিল তত্ত্বসমূহ বুঝিবার জন্য তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিত। কনিষ্ঠ আনন্দ কেবল সংস্কৃত পাঠে নিযুক্ত না থাকিয়া ইংরাজি ও ফার্সি শিখিতে আরম্ভ করেন। তিনি নিজে উচ্চ দরের শক্তিভক্ত তান্ত্রিক হইলেও, অন্য ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ বা ঘৃণা প্রকাশ করিতেন না; বরং যত্ন সহকারে অন্যান্য ধর্ম্মের গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া তাহার সার তত্ত্ব গ্রহণ করিতেন। সেকালের লোকের পক্ষে ইহা সামান্য উদারতা বা নৈতিক উন্নতির লক্ষণ নহে। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন যে, সব ধর্ম্মেরই মূলে সত্য ও মঙ্গল আছে, মানুষ বৃথা ধর্ম্মের আড়ম্বর লইয়া কলহ করে। বাইবেল

পড়িয়া তিনি বলিয়াছিলেন যে, ক্রাইষ্ট যদি ভারতবর্ষে ধর্ম্মপ্রচার করিতে আসিতেন, তাহা হইলে তিনি আমাদের সিংহাসনের একটী প্রধান ঠাকুর হইতেন। বড় দুঃখের বিষয় যে তিনি এ দেশে আসেন নাই। দেবীর উপাসক হইলেও আনন্দ পশ্বাচারী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না, সুতরাং তিনি বীরাচারী বা কৌল তান্ত্রিকদিগের প্রথানুসারে মৎস্য মাংস বা মাদক দ্রব্য ব্যবহার করিতেন না। তিনি আজীবন নিরামিষাশী ছিলেন এবং কখনো তামাক বা নস্য ব্যবহার করেন নাই। তিনি পরের ধর্ম্ম অবজ্ঞা করিতেন না বটে, কিন্তু তাই বলিয়া নিজের ধর্ম্মে নিষ্ঠার শিথিলতা ছিল না। তিনি মোদকস্পৃষ্ট মিষ্টান্ন গ্রহণ করিতেন না এবং নিজ পুত্র বা পরিবারস্থ অপর কাহাকেও তাহা গ্রহণ করিতে দিতেন না। হরিদ্রা ডাঙ্গা নিবাসী কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীর কন্যা আদ্যাশক্তি দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার ৩৮ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মার্চ্চ তারিখে বারুণী পর্ব্বের দিনে বিদ্যাভূষণের ডাঙ্গায় একটী ক্ষুদ্র কুঠরীতে তাঁহার এক মাত্র পুত্র বীরেশ্বর জন্ম গ্রহণ করেন।

আনন্দচন্দ্রের সংযম ও কঠোর ব্রত নিয়মাদির কথা শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। তিনি বহুকাল প্রতি অমাবস্যায় ষোড়শোপচারে শ্যামা পূজা করিতেন। অনেক বার তিনি সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত একাসনে বসিয়া ধ্যান ধারণা করিয়াছিলেন। তিনি যথার্থ শাস্ত্রোক্ত চান্দ্রায়ণ ব্রত করিয়াছিলেন। আজ কালের দিনে কড়ি দান করিয়া অল্প ক্ষণের মধ্যে যে চান্দ্রায়ণ হইয়া যায়, ইহা সেরূপ নহে। অমাবস্যায় নিরম্বু উপবাস করিয়া এই ব্রত আরম্ভ হয়। প্রতিপদে এক গ্রাস অন্ন ও এক গণ্ডূষ মাত্র জল। অন্নগ্রাস কুক্কুটাণ্ডের অপেক্ষা বড় হইতে পারিবে না। দ্বিতীয়ায় ঐরূপ দুই গ্রাস অন্ন ও দুই গণ্ডূষ জল। ঐরূপ তৃতীয়া চতুর্থী প্রভৃতি তিথিতে অল্প অল্প করিয়া আহার করিবে। পূর্ণিমায় পনের গ্রাস অন্ন ও পনের গণ্ডূষ জল। আবার কৃষ্ণপক্ষে এক এক গ্রাস করিয়া অন্ন ও তৎসহ জল কমিবে এবং পুনরায় অমাবস্যায় নিরম্বু উপবাসের পর ব্রত সমাপ্ত হইবে। ইহা ব্যতীত আনন্দ পুত্র লাভের জন্য বহুল পুরশ্চরণাদি তন্ত্রোক্ত কঠোর নিয়ম পালন করিয়াছিলেন। যে চরিত্রের ইতিহাস আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য, তাহা বুঝিবার সুবিধা হইবে বলিয়া আনন্দ ও তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণের বিষয় এখানে কিঞ্চিৎ বিস্তৃত ভাবে বলা হইল।

আনন্দচন্দ্রের অনেক গুণ বীরেশ্বরের হৃদয়ে প্রতিফলিত ও অধিকতর প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। পিতা পর ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ জয় করিয়াছিলেন, সকল ধর্ম্মের গ্রন্থ সমান যত্নে অধ্যয়ন করিতেন; পুত্র যে খ্রীষ্টান, মুসলমান, হিন্দু এবং ভূতপূজক আদিম জাতিদের সহিত মিশিবেন এবং সংস্কৃত টোল, আরবী মক্তব, ইংরাজি বিদ্যালয় ও বাঙ্গালা পাঠশালা সমান যত্নে স্থাপিত করিবেন, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? পিতা কঠোর সংযমী ও তপোব্রতপরায়ণ ছিলেন, শারীরিক ক্লেশ গ্রাহ্য করিতেন না, তাই বোধ হয় পুত্র ছোট নাগপুরের ন্যায় পর্ব্বত ও দুর্গম অরণ্যসঙ্কুল স্থানে ত্রিশ বৎসর ধরিয়া নানারূপ অসুবিধা ও কষ্টের মধ্যে অনবরত ঘুরিতে পারিয়াছেন—আহার, নিদ্রা, ভ্রমণাদির

অনিয়ম সহ্য করিয়া কঠোর কর্ত্তব্যের নিকট দৈহিক সুখস্বচ্ছন্দতা আরাম বিসর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আর আনন্দ পরম বিশ্বাসী ধার্ম্মিক ভক্ত ছিলেন—মঙ্গলময়ী সর্ব্বশক্তি-মতীর উপাসক ছিলেন। তাই বুঝি বীরে-শ্বর বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া, বিষম নিরাশার মধ্যে মরুভূমিতে কর্ম্ম আরম্ভ করিতে পারিয়াছিলেন,—শত সহস্র বাধা বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যে পিতৃপরিচিত সেই বিঘ্নবিনাশিনীর অভয় হস্তের সঙ্কেত দেখিয়া অসীম সাহসের সহিত মাভৈঃ মাভৈঃ রবে কর্ম্ম-ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন।

যতদূর জানা যায়, তাহাতে বাল্যকালে বীরেশ্বরের জীবনে বিশেষ কোনও ঘটনা ঘটে নাই। পিতার যত্নে ও মাতার স্নেহে পরিবারস্থ অপরাপর বালক বালিকাদিগের সহিত তিনিও বর্দ্ধিত হন। তৎকালে তাঁহার পিতা ২৪ পরগণায় সদরালার কাছারিতে আমলার কার্য্য করিতেন এবং তখনকার দিনে তাঁহার সেই সামান্য আয়ে সংসার স্বচ্ছন্দে চলিত। আনন্দচন্দ্র প্রথম হইতেই সংস্কৃতের সঙ্গে সঙ্গে পুত্রকে ইংরাজী শিখাইতে মনস্থ করিয়াছিলেন, সুতরাং দশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে পাঠশালার অধ্যয়ন শেষ করিয়া এবং চতুষ্পাঠীতে কিয়ৎ পরিমাণে ব্যাকরণ সাহিত্য পড়িয়া বীরেশ্বর চুঁচুড়ার ফ্রীচার্চ্চ স্কুলে প্রবেশ করেন। পাঁচ বৎসর কাল সেই স্কুলে তাঁহার শিক্ষা হয়। ডাক্তার ম্যাকে, মিঃ বোমো, ডাক্তার ফাইক এবং পাদরি মিলার প্রভৃতি খ্যাতনামা অধ্যাপকগণ বীরেশ্বরের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অতি যত্ন সহকারে শিক্ষা দিয়াছিলেন। স্কুলের পাঠ শেষ করিয়া তিনি হুগলী কলেজে প্রবেশ করেন এবং তথায় গ্রেভস্, থোত্রটস, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অধ্যাপকগণের নিকট পাশ্চাত্য সাহিত্য বিজ্ঞান গণিত প্রভৃতির উচ্চতর শাখা সমূহ যত্ন সহকারে অধ্যয়ন করেন। ইতিহাস, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও ব্রহ্মবিজ্ঞান এই তিন বিষয়ের অধ্যয়নে তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। তিনি সময় পাইলেই কলেজের বিপুল পুস্তকাগারের এক কোণে বসিয়া এক মনে ক্রমাগত অধ্যয়ন করিতেন এবং এই সময় হইতেই তাঁহার গভীর মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করিবার অভ্যাস জন্মিয়া যায়। এই অভ্যাসটী তাঁহার জীবনের শেষ পর্য্যন্ত ছিল এবং ইহার গুণেই তিনি গাড়ী, পাল্কী, বা কোনও জনতার মধ্যে বসিয়া স্বচ্ছন্দ চিত্তে লেখা পড়ার কার্য্য করিতে পারিতেন। উপন্যাসাদি গ্রন্থ তিনি বেশী পাঠ করিতেন না। যাহা পড়িতেন, তাহার গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিতেন। পাঠ কালে পুস্তকের পার্শ্বে পেন্সিলে নোট্ করা তাঁহার অভ্যাস ছিল। পরের পুস্তক হইলে ফিরাইয়া দিবার পূর্ব্বে লেখা গুলি রবার দিয়া মুছিয়া দিতেন। একবার একজন প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী ব্যারিষ্টারের একখানি বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করিয়া ফিরাইয়া দেন, কিন্তু তাঁহার লেখা দুই একটী নোট্ তুলিয়া দিতে ভুল হইয়াছিল। গ্রন্থাধিকারী সে নোট্ গুলিকে দেখিয়া বিস্মিত হন ও বাকীগুলি মুছিয়া ফেলা হইয়াছিল বলিয়া অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করেন।

দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমে বীরেশ্বর বাবু পিতৃহীন হন ও তাঁহার জীবনসংগ্রাম আরম্ভ হয়। এই সময় কয়েক বৎসর ধরিয়া অবস্থার ঘাত প্রতিঘাতে তাঁহাকে ক্রমাগত বিধ্বস্ত

করিতে থাকে। কিন্তু এই বিষম দুঃখ দারিদ্র্য কষ্টের মধ্যেই তিনি সাংসারিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভের সুবিধা পাইয়াছিলেন। কালিপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র মাতুল রামচন্দ্র এই বিপদে ভাগিনার সহায় না হইলে অবস্থার এই প্রতিকূল স্রোতঃ সহ্য করা বীরেশ্বরের পক্ষে বোধ হয় অসম্ভব হইত। মাতা আদ্যাশক্তিও এই সময়ে অসীম সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছিলেন; এবং তাঁহারই স্নেহ ও উৎসাহে সকল কষ্ট তুচ্ছ করিয়া বীরেশ্বর অবশেষে এই দারুণ অবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া জীবন সংগ্রামে জয় লাভ করেন।

বীরেশ্বর পিতৃহীন হইয়া দেখিলেন যে, দারুণ অর্থাভাব তাঁহার ও তাঁহার জননীর সম্মুখে বদন ব্যাদান করিয়া রহিয়াছে। আদ্যাশক্তি নিরুপায় হইয়া ভ্রাতার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পুত্র কলেজের মাহিনা দিবার বা পুস্তকাদি ক্রয় করিবার জন্য সামান্য অর্থ চাহিলেই মাতুলানী বলিয়া উঠিতেন "ওঃ ভারিত পড়া! উনি কি ডেপুটী ম্যাজিষ্টর হইবেন নাকি?"

মাতুল মাতুলানীর ব্যবহার বীরেশ্বরের কিশোর হৃদয়ে সাহস উৎসাহ নিষ্পেষিত করিয়া তাঁহাকে দারিদ্র্য ও নৈরাশ্যের কঠোর কশাঘাতে আকুল করিত। তখন তিনি জননী আদ্যাশক্তির স্নেহময় শীতল বক্ষে মস্তক রাখিয়া অশ্রুজলের মধ্যে শান্তি লাভ করিতেন। আদ্যাশক্তির চরিত্রের দৃঢ়তা, সহিষ্ণুতা, বিশ্বাস প্রভৃতি গুণ অনেক ছিল। তিনি ভ্রাতা বা ভ্রাতৃবধূকে একটী কথাও বলিতেন না, কেবল দয়াময়ী, বিপদ্‌বারিণী জননীকে ডাকিতেন। পুত্রের পড়িবার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য কখনো বা এক খানি বাসন বিক্রয় করিতেন,—কখনো বা বহুদিনের বহু স্মৃতিবিজড়িত এক খানি সামান্য রৌপ্য অলঙ্কার বাঁধা দিতেন,—কখনো বা মিষ্ট বাক্য ও গৃহ কর্ম্মাদি দ্বারা ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূকে তুষ্ট করিয়া পুত্রের আবশ্যক দ্রব্যের যোগাড় করিতেন।

যাহাই হউক, তাঁহার মাতুল তাঁহার অসহায় অবস্থার সহায় হন, এই জন্য বীরেশ্বর স্বীয় মাতুল ও তদীয় বংশধরগণের প্রতি চিরকাল কৃতজ্ঞ ছিলেন। মাতুল কঠিন পীড়াক্রান্ত হইলে সুদূর দেশ হইতে বীরেশ্বর তাঁহার শয্যা পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। দিবারাত্র তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। [রামচন্দ্রের পুত্রগণও তাঁহার তেমন সেবা করিতে পারেন নাই।] অবশেষে গঙ্গাতীরে তাঁহার দেহান্ত হইলে বীরেশ্বর শোকাকুল হইয়া বালকের ন্যায় রোদন করিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের পুত্রগণকে বীরেশ্বর অতিশয় ভালবাসিতেন ও তাহাদের নানা প্রকার দুর্ব্ব্যবহার সত্ত্বেও তাহাদের সাহায্য করিতে বা সৎপরামর্শ দিতে কখনো ত্রুটি করেন নাই।

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে কলেজের লেখা পড়া এক প্রকার শেষ করিয়া বীরেশ্বর কর্ম্মের চেষ্টায় বহির্গত হন। হুগলি জেলার বড়া নামক গ্রামের গবর্ণমেণ্ট সাহায্যপ্রাপ্ত উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে কিয়ৎকাল দ্বিতীয় শিক্ষকের কার্য্য করিয়া ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টম্বর মাসে বারাকপুর গবর্ণমেণ্ট স্কুলে সরকারী চাকুরী লাভ করেন। ঐ স্কুলকে তখন গবর্ণর জেনারেলের স্কুল বলিত। বারাকপুর হইতে বীরেশ্বর ক্রমান্বয়ে গোপীনাথপুর, বালেশ্বর ও মেদিনীপুর স্কুলে প্রেরিত হন

এবং প্রত্যেক স্থানেই অতি সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করেন। মেদিনীপুর স্কুল তখন বঙ্গদেশের একটী প্রধান বিদ্যালয়,সেই বিদ্যালয়ে বীরেশ্বর প্রথমতঃ দ্বিতীয় ও পরে প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করেন। যে যে বিদ্যালয়ে তিনি কিছু কালের জন্যও কার্য্য করিয়াছিলেন, সেই স্কুলেরই অতি অল্প-কালের মধ্যে অত্যন্ত উন্নতি হইয়াছিল। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হইবে। বীরে-শ্বর যখন গোপীনাথপুর স্কুলে কার্য্য গ্রহণ করেন, তখন স্কুলের অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল, কিন্তু তাঁহার অসাধারণ পরিশ্রম ও শিক্ষা-কৌশলের ফলে এক বৎসরের মধ্যে স্কুলের অবস্থা সমধিক উন্নত হয় এবং অনেক বড় বড় গবর্ণমেণ্টের বিদ্যালয়কে পরাভূত করিয়া ঐ বিদ্যালয় প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।

খ্রীষ্টীয় ১৮৬৭ সালে মেদিনীপুর হইতে বীরেশ্বর ছোট নাগপুরে প্রেরিত হন। এই ছোট নাগপুরেই তাঁহার জীবনের অব-শিষ্টাংশ যাপিত হয়। এই সুবিশাল ক্ষেত্রে তিনি যে অনশ্বর কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা বঙ্গবাসীর একান্ত গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। ষড়্‌বিংশতি সহস্র বর্গমাইল পরিমিত হিংস্র শ্বাপদ পরিপূর্ণ অরণ্যময় দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশ; তাহার মধ্যে শিক্ষা সংস্পর্শবিহীন নিম্নশ্রেণীর হিন্দু, মুসলমান, এবং নানা প্রকার অসভ্য আদিম ও মিশ্রজাতির বাস; অধিবাসীরা অজ্ঞান ও কুসংস্কারের অন্ধকারে আচ্ছন্ন ও একান্ত হিংস্রক ও সন্দিগ্ধচিত্ত, কোন বাহিরের লোককে কাছে আসিতে দেয় না। এইরূপ স্থলে শিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তারের ভার বীরে-শ্বরের উপর অর্পিত হইল। তখন তাঁহার মনে হইল, যেন জীবনের বিশাল পবিত্র ব্রত তাঁহার সম্মুখে। সেই ভয়ানক পার্ব্বত্য প্রদেশের শত সহস্র অসভ্য অজ্ঞান নর-নারী সমুদ্ধারের জন্য জগদীশ্বর তাঁহাকেই নিজ দূতরূপে তাহাদের মধ্যে প্রেরণ করি-য়াছেন, বিশ্বাসী বীরেশ্বরের মনে এই ধারণা দৃঢ়বদ্ধ হইয়া গেল। ধর্ম্ম ও বিশ্বাসের সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত না হইলে এরূপ বিরাট লোকহিতকর কার্য্য এত বাধা বিপত্তির মধ্যে কখনই সংসাধিত হইতে পারে না। প্রাণপণ যত্নে বীরেশ্বর কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলেন,—জীবনের প্রত্যেক কার্য্য, প্রত্যেক চেষ্টা সেই এক উদ্দেশ্যের অভিমুখে ছিল। যে কেহ তাঁহার কার্য্যের সহায় হইল বা তাহাতে সহানুভূতি প্রকাশ করিল, সেই তাঁহার বন্ধু ও পরামর্শদাতা হইল। এইরূপে অনেক খ্রীষ্টান পাদরি, রাজা জমীদার প্রভৃতি দেশীয় বড় লোক, অনেক উচ্চ পদস্থ ইংরেজ রাজকর্ম্মচারী, অনেক অসভ্য আদিম জাতীয় ক্ষমতাশালী মানকী তাঁহার কার্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সহায় হইয়া-ছিল। ভারতবর্ষে নিম্ন ও উচ্চশিক্ষা বিস্তার কল্পে অনেক ইংরাজ ও অনেক দেশীয় ব্যক্তি অকাতরে পরিশ্রম করিয়া জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন সত্য; কিন্তু সরকারী কর্ম্মচারীই হউক, কিম্বা বাহিরের লোকই হউক এক ব্যক্তিদ্বারা এত বড় একটী বিরাট কার্য্য কখনই সম্পন্ন হইতে দেখা যায় নাই। এই জন্য বিশেষ ভাবে ইহার সমালোচনা করিতেছি।

কর্ম্মক্ষেত্র ছোটনাগপুরে উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ বীরেশ্বর বাবু দেখিলেন যে, তিনি স্কুল ইন্‌স্পেক্টর অর্থাৎ বিদ্যালয়ের পরি-

দর্শক রূপে তথায় প্রেরিত হইয়াছেন, কিন্তু পরিদর্শনের নিমিত্ত বিদ্যালয় তথায় একেবারেই নাই। যেখানে ছাব্বিশ হাজার বর্গ মাইল পর্ব্বত ও অরণ্যের মধ্যে ষোড়শটী মাত্র বিদ্যালয়, সেখানে কি পরিদর্শন সম্ভব? আবার এই ষোড়শটী বিদ্যালয়ের মধ্যে আটটী বার্লিন ও এংলিকন মিশনের সংস্থাপিত অতি ক্ষুদ্র পাঠশালা মাত্র। বীরেশ্বর তখন বুঝিলেন, তাঁহার কার্য্য পরিদর্শন নহে, সংগঠন; প্রস্তুত ক্ষেত্রের রক্ষা ও উন্নতি সাধন নহে; মাটি ভাঙ্গিয়া, বন কাটিয়া, কাঁটা সরাইয়া প্রস্তরময় অনুর্ব্বরা ভূমিকে শস্য শ্যামল ক্ষেত্রে পরিণত করা। সুতরাং প্রথম হইতেই তাঁহাকে নূতন নূতন উপায় সমূহ উদ্ভাবন করিতে হইল, সেইরূপ প্রদেশের পক্ষে উপযোগী নিয়মাবলী প্রস্তুত করিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইল এবং কোন্ নিয়মের কি রূপ ফল হয়, তাহা দেখিয়া ক্রমে ২ আবশ্যক মত পরিবর্ত্তনাদি করিতে হইল। তাহার উদ্ভাবিত নিয়ম ও শিক্ষাদানের উপায় সমূহ যে বিশেষ সফল হইয়াছিল, তাহা বলিবার প্রয়োজন করে না। কারণ, বিশ পঁচিশ বৎসর সময়ে সেই সকল নিয়ম ও উপায়াদির ফলে লক্ষ লক্ষ শিক্ষাশূন্য ও সভ্যতাবিদ্বেষী নরনারী ক্রমে ক্রমে শিক্ষা ও সভ্যতার আলোকে আনীত হইয়াছে; এবং যাহারা ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আপনাদের আচার ব্যবহার বিশ্বাস প্রভৃতি হইতে এক তিল বিচলিত হইবার নামে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিত, তাহারাই আজ আগ্রহ সহকারে সদাশয় গবর্ণমেণ্ট-স্থাপিত বিদ্যালয় সমূহে শিক্ষা লাভ করিয়া অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার সমূহ ক্রমে ক্রমে বিসর্জ্জন দিতেছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন বীরেশ্বর ছোটনাগপুরের শিক্ষাভার গ্রহণ করেন, তখন সেই বিভাগের পাঁচটী জেলায় ষোলটী মাত্র পাঠশালা ছিল। পক্ষান্তরে ৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন তিনি কার্য্যভার পরিত্যাগ করিয়া অবসর গ্রহণ করেন, তখন উচ্চ মধ্য নিম্নাদি সর্ব্ব-সমেত তিন সহস্র বিদ্যালয় ছোটনাগপুরকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। একজন সাধারণ ব্যক্তির নিকট স্বপ্নেও কি এত কার্য্য প্রত্যাশা করা যায়! ষোল হইতে তিন সহস্র! পাঠক বিবেচনা করিবেন না যে, আমাদের দেশে একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিবার জন্য যে পরিশ্রম উদ্যমাদির প্রয়োজন, ছোটনাগপুরে একটী বিদ্যালয় খোলা সেই পরিমাণে যত্ন ও পরিশ্রমের দ্বারা হইতে পারে। যে জাতির ব্যবহারাদি বিষয়ে কিঞ্চিৎ মাত্র হস্তক্ষেপ করিতে দেখিলে শঠতার সহিত বধ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না; তাহাদের সহিত মিশিয়া, তাহাদের সন্দেহ ক্রমে অপনোদন করিয়া, তাহাদের মন হইতে অল্পে অল্পে কুসংস্কার-অন্ধ রক্ষণশীলতার প্রভাব তিরোহিত করিয়া, তাহাদের মধ্যে শিক্ষা ও সভ্যতার বিস্তার সহজ কর্ম্ম নহে। কিন্তু কার্য্য যেরূপ, তাহার উপযুক্ত ব্যক্তিই ঈশ্বর সেই কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছিলেন।

প্রথমতঃ বৎসরের পর বৎসর বীরেশ্বরকে ছোটনাগপুরের গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বিদ্যা শিক্ষার মহিমা প্রচার করিতে হইয়াছিল। তিনি সেই অসভ্য নিবাসীদের সহিত মিশিতেন, তাহাদের মধ্যে তাহাদেরই একজন হইয়া বাস করিতেন। অসীম অধ্যবসায় ও একান্ত সাবধানতার

সহিত তাহাদের মধ্যে শিক্ষা ও সভ্যতার উৎকর্ষ প্রচার করিতে করিতে যখন দেখিতেন যে, বিদ্যার মহিমা ও বিপুল শক্তি তাহাদের অশিক্ষিত মনে কিঞ্চিৎমাত্র মুদ্রিত হইতেছে, তখন তাঁহার আর আহ্লাদের সীমা থাকিত না। বলা বাহুল্য যে, সেই সময়ে ছোটনাগপুরে রেল, ষ্টীমার, ডাকগাড়ী বা যাতায়াতের অন্য কোনও সহজ উপায় ছিল না। অশ্ব, পাল্কী, প্রভৃতি যান অধিকাংশ স্থলে ব্যবহৃত হইত, কিন্তু স্থলবিশেষে পদব্রজে ক্রমাগত গমন ভিন্ন উপায় ছিল না। এইরূপ কঠোর পরিশ্রমে ক্রমে তাঁহার বীর দেহ ভগ্ন হইয়া পড়ে।

শাল পিয়ালাদি বৃক্ষের নিবিড় অরণ্যাবৃত পর্ব্বতপার্শ্বে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম কল্পনা করুন। গ্রামখানি কয়েকটী অতি ক্ষুদ্র কুটীরের সমষ্টি, পথ ঘাট কিছুই নাই, যেন পৃথিবীর অন্য কোন অংশের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধই নাই। প্রাতঃকালে কৃষ্ণবর্ণ নগ্নপ্রায় গ্রামবাসী নরনারীগণ আপন আপন কর্ম্মে ব্যস্ত। কেহ বা ক্ষেত্র কর্ষণ করিতেছে, কেহবা গরু, মহিষ চরাইতেছে, কেহবা শিকারের জন্য তীর বন্দুক প্রভৃতি ঠিক করিতেছে। কোথাও বা বালিকা ও যুবতীগণ মহুল পুষ্প আহরণ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেছে এবং কোথাও বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাগণ বৃক্ষতলে একত্র হইয়া ব্যাঘ্র ভয় নিবারণার্থ দুষ্ট বোঙ্গা বা ভূতের নিকট একটী মোরগ বলি দিবার উদ্যোগ করিতেছে। তাহাদের বিশ্বাস যে, ঐ দুষ্ট বোঙ্গাই ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করিয়া নিশীথে উপদ্রব করিয়া থাকে। গ্রামের কার্য্য যেমন দুই তিন সহস্র বৎসর ধরিয়া কালের প্রবাহে চলিয়া আসিতেছে, ঠিক সেইরূপ অপরিবর্ত্তিত ভাবেই আজও চলিতেছে। হঠাৎ গ্রামের প্রান্তভাগে একখানি পাল্কী দেখা গেল, পশ্চাতে দুই তিন জন বাঙ্গীওয়ালা। এ দৃশ্যত গ্রামবাসীদের অভ্যস্ত নহে, তাহারা একটু বিচলিত হইল, ভীত হইল, সন্দিগ্ধচিত্তে কাণাকাণি করিতে লাগিল। নিশ্চয়ই কোনও রূপ নূতন ট্যাক্স ধার্য্য করিবার প্রস্তাব হইতেছে, তাহাদের প্রাচীন রীতি নীতির কোনও রূপ ব্যত্যয়ের ব্যবস্থা হইবে, সন্দেহ নাই। পাল্কীর দুই পার্শ্ব হইতে বালক বালিকা নর নারী সকলে সন্দেহে ভয়ে ছুটিয়া পলাইতে লাগিল, গ্রামের মধ্যে তুমুল আন্দোলন বাধিয়া গেল। পাল্কীর ভিতরে যিনি, তিনি বসিয়া ২ অতি মনোযোগের সহিত এই সকল ব্যাপার নিরীক্ষণ করিতেছেন। আবশ্যক বুঝিয়া যথা সময়ে তিনি পাল্কী হইতে অবতরণ করিলেন। এত চোগা চাপকান শাম্‌লাআঁটা উচ্চ পদস্থ রাজকর্ম্মচারী নহে, সামান্য ধুতি ও চটিজুতাপরা সাধারণ পথিক মাত্র। গ্রামবাসীদের ভয় কতক কমিল। বীরেশ্বর একাকী পদব্রজে গ্রামের মানকী বা মণ্ডলের অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর কুটীরে উপস্থিত হইলেন, পাল্কী বাঙ্গীওয়ালা অনুচরবর্গ গ্রামের বাহিরে কোনও ছায়াশীল শাল বা অশ্বত্থ মূলে বিশ্রাম ও আহারাদির উদ্যোগ করিতে লাগিল। মানকীর গৃহে উপস্থিত হইয়া বীরেশ্বর হয়ত দেখিলেন যে, বৃদ্ধ মানকী কুটীর প্রাঙ্গণে খাটিয়ায় উপবিষ্ট হইয়া স্ত্রী পুত্রগণ কর্ত্তৃক হাঁড়িয়া বা পচাও মদ্যের প্রস্তুতপ্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে ও তাহাদিগকে অতি যত্নের সহিত আবশ্যকমত উপদেশ দিতেছে। সমাগত প্রায় ভূত পূজার উৎসবে সেই একাধারে আহার ও

ঔষধরূপী অন্নজাত মাদক দ্রব্যের বহুল পরিমাণে প্রয়োজন। বীরেশ্বর খাটিয়ার নিকটে উপস্থিত হইয়া কিঞ্চিৎ বিস্ময়াপন্ন মানকীকে তাহার নিজের ভাষায় কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। মানকী আরও বিস্ময়াপন্ন হইল—"দিকুর" (অর্থাৎ বিদেশীয়ের) মুখে এমন পরিষ্কার উঁরাও বা মুণ্ডা ভাষা সে ত কখন শুনে নাই। কিন্তু সে সৌম্য ও সরল মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার সন্দেহ কতক পরিমাণে কমিল। সে বীরেশ্বরকে স্বকীয় খাটিয়ার এক পার্শ্বে বসিতে বলিল ও তাঁহাকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার আগমনের প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিল। কিন্তু কাজের কথা কহিবার পূর্ব্বে বীরেশ্বর গৃহস্থালী ও গ্রাম সম্বন্ধীয় নানারূপ প্রশ্ন ও কথা বার্ত্তা দ্বারা মানকীর সন্দেহ ভার যথা সম্ভব দূর করিলেন। ক্রমে ক্রমে অতি সাবধানতার সহিত শিক্ষা ও সভ্যতার কথা উত্থাপিত হইল; অবশ্য শ্রোতার ধর্ম্ম-মতের প্রতি সম্মান দেখাইয়া কথা কহিতে হইল। এক একটী করিয়া ক্রমে অনেকগুলি গ্রামবাসী আসিয়া সেই কথাবার্ত্তায় যোগ দিতে লাগিল। বেলা দ্বিপ্রহরের সময় হয়ত দেখা গেল যে অর্দ্ধনগ্ন আদিম নিবাসিগণের একটী বৃহৎ মন্ত্রমুগ্ধ প্রায় জনতার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বীরেশ্বর অনর্গল মুণ্ডারী, হো, বা সাঁওতালী ভাষায় বক্তৃতা করিতেছেন। অতঃপর সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই অধিবাসীদের সম্মতি সহকারে স্থির হইয়া গেল যে গ্রামে বিদ্যালয় সংস্থাপনে কাহারও অমত হইতে পারে না। এবং এক মাসের মধ্যে বালকদিগের একটী নিম্ন শ্রেণীর পাঠশালা ও বয়ঃস্থ ব্যক্তিগণের জন্য একটী নৈশ বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়া গেল।

কিন্তু এরূপ অনায়াসে সিদ্ধিলাভ সচরাচর বীরেশ্বরের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিত না। অধিকাংশ স্থলেই শিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তারের বিরুদ্ধে অমূলক আপত্তি অতি দৃঢ়তার সহিত উত্থাপিত হইত। এক গ্রামে তিনি যখন বলিলেন যে, সুদূর রাঁচিসহর হইতে তাঁহার সেখানে আসিবার উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে, কেবল বিদ্যা দান, তখন কেহই তাঁহাকে বিশ্বাস করিল না। আমরা সভ্য ও শিক্ষিত হই, তাহাতে তোমার কি? এই প্রশ্ন সকলে একবাক্যে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিত। তাহাদের মনে নিঃস্বার্থ কর্ত্তব্যবোধ বা পরোপকারের ভাব কখনো উদয় হয় নাই। কোনও কোনও গ্রামবাসিরা সন্দেহ করিত যে, এ বুঝি গ্রামকে গ্রাম খ্রীষ্টান করিবার ফন্দি। "আপনি যাহা বলিতে হয় বলুন, কিন্তু অশ্বত্থবৃক্ষবাসী মহাশক্তিশালী ব্যাঘ্র, সর্প, মহিষাদি ইচ্ছানুরূপ দেহধারী যোদ্ধার যদি আপনি নিন্দা করেন, তাহা হইলে আপনাকে জীবিত ফিরিতে হইবে না।" এই বলিয়া ক্ষিপ্তপ্রায় অসভ্যদল তাঁহাকে কত ভয় দেখাইত। তিনি তখন তাহাদিগকে বুঝাইতেন, তিনি নিজেই সেই অনন্তশক্তি বোঙ্গার উপাসক। বোঙ্গা মেঘ হইতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, বোঙ্গা সদ্যোজাত শিশুর জন্য মাতৃস্তনে দুগ্ধের সঞ্চার করেন, বোঙ্গা রোগীকে রোগমুক্ত করেন, বোঙ্গা আমাদিগকে সর্প ব্যাঘ্রাদি হনন করিবার জন্য শক্তি প্রদান করেন। ও সকলের দোষ গুণ বিচার করেন। বোঙ্গার প্রশংসা শুনিয়া গ্রামবাসিরা অনেক সময় বীরেশ্বরকে আপনাদের সমধর্ম্মী বলিয়া অত্যন্ত আদর করিত।

তাহারা জানিত না যে, বোঙ্গা এই শব্দটীর সাহায্যে চতুর বীরেশ্বর তাহাদিগকে হিংস্রক ও ছাগ কুক্কুটপ্রত্যাশী ভূতের অধীনতা হইতে প্রেমময় সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের নিকট লইয়া গিয়া তাহাদের হৃদয়ে কি এক অভূতপূর্ব্ব উষালোকের সৃষ্টি করিতেন!

লেখাপড়া শেখাকে যে ছোটনাগপুরের অধিবাসীরা কিরূপ ভয়ের নেত্রে দেখিত, তাহা নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে সহজেই প্রতীয়মান হইতে পারে। বীরেশ্বর যখন আট দশ বৎসর ছোটনাগপুরে খাটিয়াছেন, যখন তাঁহার পরিশ্রমের বীজ সেই প্রস্তরময় ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, একদা তিনি এক গ্রামে মানকীর সহিত কথাবর্ত্তা কহিতে কহিতে বলিলেন, "ভাল মানকি, তোমার ঐ ছেলেটীকে লেখা-পড়া শেখাও না কেন? তোমার মত লোক যদি লেখাপড়ার আদর না করে, তবে কে করিবে? আমার সব পরিশ্রম যে বিফল হইবে?' এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধ অত্যন্ত ভীত হইল ও করুণ স্বরে বলিল, "বিলেস্‌রা, তুমি ত জান, তোমার কথাতে আমি একটী ছেলে ইতিপূর্ব্বে সরকারকে দিয়াছি। এটীকেও যদি সরকারকে দি, তাহা হইলে আমার শস্যক্ষেত্র ও গরু মহিষ গুলির কি হইবে।" বৃদ্ধের জ্যেষ্ঠ পুত্র তখন রাঁচিতে থাকিয়া তত্রত্য জেলা স্কুলের এন্‌ট্রেন্‌স ক্লাসে পড়িতেছিল এবং তাহার পিতা ভাবিয়াছিল সে আর কোন কাজে আসিবে না। লেখাপড়া শিখাইলে যে ছেলে সরকারকে দিয়া দিতে হয় না, বরং সে ছেলে অর্থ উপার্জ্জনাদি দ্বারা সাংসারিক বিষয়ে পিতার অধিকতর সাহায্য করিতে পারে, ইহা সেই বৃদ্ধ মানকীকে বুঝাইতে বীরেশ্বরকে বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

স্বর্গীয় রায় বাহাদুর মহাজনসুলভ বিনয় গুণে সমধিক ভূষিত ছিলেন, তিনি কখনো বলিতেন না যে,ছোটনাগপুরের এই বিস্ময়কর উন্নতি তাঁহা হইতে হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা ছোট নাগপুরের গত চল্লিশ বৎসরের ইতি-হাস কিছুমাত্র আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, ঐ প্রদেশে শিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তারের ইতিহাস বীরেশ্বরের জীবন ও কার্য্য কলাপের ইতিহাস ব্যতীত আর কিছুই নহে। অবশ্য এই কার্য্যে অপরের সাহায্য প্রয়োজন হইয়াছে, শত শত ব্যক্তির আন্তরিক সহায়তা ব্যতীত এরূপ বৃহৎ ব্যাপার সংসাধিত করা কখনই সম্ভবপর নহে।

উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীর দুই একখানি পত্র এস্থলে উদ্ধৃত না করিয়া আমরা থাকিতে পারিলাম না।

হাজারীবাগ জেলার ডেপুটী কমিশনার ও ছোটনাগপুরের অস্থায়ী কমিশনর কর্ণেল হঙ্গার ফোর্ড বডাম সাহেব অবসর গ্রহণান-ন্তর ভারতবর্ষ হইতে যাত্রা করিবার সময় রায় বাহাদুরকে যে পত্র লিখেন, তাহাতে বলিয়াছিলেন "আপনি যখন এই জেলায় কার্য্য আরম্ভ করেন, তখন শিক্ষার অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। আপনার যত্নে শিক্ষার ক্রমশঃ উন্নতি হইয়াছে এবং এক্ষণে ইংরাজি বিদ্যালয় ও দেশীয় পাঠশালা সমূহে জেলাটী আচ্ছন্ন হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহা কেবল আপ-নারই আন্তরিক উদ্যমের ফল।"

ছোটনাগপুরে বিশপ জে, সি হুট্‌লি সাহেব বীরেশ্বরের অবসর গ্রহণের পর

তাঁহাকে যে পত্র লেখেন, তাহার এক অংশ এইরূপ;—"আমি ত ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ছোটনাগপুরে আসিয়াছি, কিন্তু আপনি আমারও দুই বৎসর পূর্ব্বে হইতে এখানে কর্ম্ম করিয়াছেন। এবং অতীত কালে ক্রমে ক্রমে দেশের অবস্থার যে শুভ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা স্মরণ করিলে যে আপনি আনন্দ ও কৃতার্থতা লাভ করেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। ছোটনাগপুর আমাদের চারিদিকেই অসভ্য আদিম নিবাসীগণের নিবাস। তাহাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার কল্পে আপনার যে উদ্যম, তাহা আমি বিশেষ রূপে অবগত আছি; এবং আমাদের খ্রীষ্টীয় মিশনের সংস্থাপিত বিদ্যালয়গুলিকে আপনি যে এত কাল ধরিয়া সাহায্য ও উৎসাহ দ্বারা জীবিত রাখিয়াছেন, তজ্জন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না।" কমিসনার গ্রিম্লি মহোদয় তাঁহাকে এইরূপে একখানি পত্র লেখেন—"১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আমি ছোটনাগপুরের কমিশনর ছিলাম। শিক্ষা বিস্তার সম্বন্ধে আপনার কার্য্যের মূল্য যে কত অধিক, তাহা সেই সময়ে আমার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। সেই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে আমি পরিদর্শন সূত্রে অনেক ভ্রমণ করিয়াছিলাম এবং পরিভ্রমণের সময়ে পদে পদেই শিক্ষা-বিস্তার-কল্পে আপনার অধ্যবসায়, উৎসাহ ও বুদ্ধিমত্তার বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হইতাম। বিশেষতঃ সকল স্থানেই অত্যধিক সংখ্যক পাঠশালা আপনার উল্লিখিত গুণ সমূহের পরিচয় দিত। এই সকল বিদ্যালয় আপনার উদ্যম বলেই স্থাপিত। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন আপনি এই বিভাগে আগমন করেন, তখন ত গ্রামের লোকেরা লেখা পড়ার নাম পর্য্যন্ত জানিত না। কিন্তু এখন এমন গ্রাম প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না, যেখানে কতক লোক হিন্দি লেখা পড়া না জানে। আপনার শিক্ষা সম্বন্ধীয় সাম্বৎসরিক রিপোর্ট গুলি আমি অতি যত্ন সহকারে পাঠ করিতাম এবং গবর্ণমেণ্ট আপনাকে যে "রায় বাহাদুর" উপাধি দিয়াছেন, তাহার জন্য, আমার মতে, আপনা হইতে যোগ্যতর পাত্র আর কেহ হইতে পারে না। আপনি যখন এই প্রদেশে কার্য্য আরম্ভ করেন, তখন সমগ্র বিভাগে কুড়িটীর অধিক বিদ্যালয় ছিল না; আপনার অবসর গ্রহণ কালে সেই সংখ্যা প্রায় তিন সহস্র হইয়াছে। ছোটনাগপুরের আদিম নিবাসীগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারকল্পে আপনার আন্তরিক যত্নের ইহা অপেক্ষা আর উৎকৃষ্টতর প্রমাণ কি হইতে পারে?"

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভিক্টোরিয়া যখন "ভারতরাজরাজেশ্বরী" উপাধি গ্রহণ করেন, তখন বড়লাট লিটন বাহাদুর দিল্লীতে মহা সমারোহে এক দরবার করেন। সেই সভায় নিম্নলিখিত প্রশংসা পত্র খানি বীরেশ্বরকে প্রদত্ত হয়,—"মহামান্য গবর্নর জেনারেল ও রাজ প্রতিনিধির আজ্ঞানুসারে এবং ভারত-সাম্রাজ্যের রাজরাজেশ্বরী শ্রীশ্রীমতী ভিক্টোরিয়ার নামে ৺ আনন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর পুত্র শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর চক্রবর্ত্তীকে শিক্ষা-বিস্তার-কল্পে অসাধারণ কার্য্যকলাপের জন্য রাজপ্রসাদ স্বরূপ এই প্রশংসা পত্র প্রদত্ত হইল।"

রিচার্ড টেম্পল্। (লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর)

আস্তাকুড় নর্দ্দামা প্রভৃতি পরিষ্কার করা, বন কাটা, ইত্যাদি জঘন্য কার্য্য

যাহাদের উপজীবিকা ছিল, যাহারা ইঁন্দুর ভেক এমন কি জল ঢোঁড়া সাপ পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিত, তেমন ধাঙ্গড় আর আমাদের দেশে সচরাচর কেন দেখা যায় না? তাহাদের মধ্যে এক্ষণে অনেকে লেখা পড়া শিখিয়াছে এবং যে সকল কার্য্যে লেখা পড়া বা হিসাব বুঝিবার প্রয়োজন, সেইরূপ কার্য্য দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করিতেছে।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে ছত্রিশ বৎসর ক্রমাগত অকাতরে পরিশ্রম করিয়া রায় বীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী বাহাদুর গবর্ণমেণ্টের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তদনন্তর তিনি ভারতবর্ষের কতিপয় প্রদেশে ভ্রমণ করেন, কিন্তু অধিকাংশ সময় গিরিধি নামক স্বাস্থ্যকর স্থানে তাঁহার শেষ জীবন অতিবাহিত হয়। যাঁহারা ইদানীং গিরিধি গিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই বীরেশ্বরের সুন্দর "আদ্যানন্দ-কুটীর" দেখিয়াছেন। সেই গৃহের দ্বার জাতি ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলের নিকটই উন্মুক্ত ছিল—ধনী দরিদ্র, স্বাস্থ্যবান্ রুগ্ন, বিদ্বান্ মূর্খ, গুণী নির্গুণ সকলেই সেখানে আদর অভ্যর্থনা লাভ করিত। অনেক জানিত ও অজানিত ব্যক্তি তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য ও তাঁহার উপদেশ বাক্য শুনিবার জন্য সেখানে আগমন করিতেন এবং সকলেই সেই নির্লিপ্ত গৃহস্থের আগ্রহ, আশা ও আনন্দপূর্ণ তত্ত্ব-কথায় পরিতৃপ্ত হইতেন। ইদানীং তিনি পরকাল, আত্মা, ঈশ্বরত্ব ও যোগ সম্বন্ধীয় ভিন্ন অন্য সম্বন্ধে বাক্যালাপ প্রায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। নিজের বাড়ীর লোকের সহিতও অন্য বিষয়ে অধিক কথা কহিতেন না।

বীরেশ্বর বাবু ইংরাজি লিখিতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার ইংরাজী প্রবন্ধ ও রিপোর্ট-সমূহ সরকারী কর্ম্মচারীগণ ও অপরাপর অনেক ইংরাজীশিক্ষিত ভদ্রলোক যত্নের সহিত পাঠ করিতেন। তাঁহার লিখিত এক খানি রিপোর্ট দেখিয়া শ্রীযুক্ত এফ্. জে, রো মহোদয় তাহাতে পরিবর্ত্তন বা সংশোধন করিবার বিশেষ কিছু পান নাই। রো সাহেব বাঙ্গালীর লিখিত ইংরাজী কাটিতে পারিলে ছাড়িতেন না—বাবু-ইংলিস কখনই তাঁহার অনুমোদিত হইয়া বাহির হইত না। সাহিত্যসংগ্রহ গ্রন্থের প্রারম্ভে বীরেশ্বর এক সুদীর্ঘ ইংরাজী ভূমিকা লেখেন। সেটী হিন্দী ভাষার অবনতি ও পুনরুন্নতির একটী সুন্দর ও সুখপাঠ্য ইতিহাস বিশেষ। ফতেপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট কলেক্টরের নিকট এক খণ্ড সাহিত্য সংগ্রহ প্রেরিত হয়। ঐ সাহেব গ্রন্থের ইংরাজী ভূমিকা পড়িয়া এত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, গ্রন্থ সমালোচনা কালে তিনি ভূমিকারও সমালোচনা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। তিনি লেখেন "ভূমিকাটী অতি সারগর্ভ, সুখপাঠ্য ও সুললিত ভাষায় লেখা হইয়াছে"। সারচার্লস্ এলিয়ট্ যখন বঙ্গদেশের ছোটলাট, তখন একবার বীরেশ্বরকেও লাটের সহিত বিদ্যালয়াদি দেখাইবার নিমিত্ত ঘুরিতে হয়। তিনি "কোলেদের সঙ্গীত" নামে একটী সুদীর্ঘ ইংরাজী কবিতা রচনা করিয়া তৎকালের প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক পত্র "রেইস্ এণ্ড রায়ট্" এ প্রকাশিত করেন। অনেকে অনুমান করেন যে, পেলামো জেলার তাৎকালিক ডেপুটী কমিশনার ব্রাইট্ সাহেবই ঐ কবিতার রচয়িতা হইবেন। বীরেশ্বর বাবুর বিরচিত ইংরাজী কবিতায় শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার সম্পূর্ণ অনুবাদ এক অতি উপাদেয়

পদার্থ। ইহার দুই তিন অধ্যায় নববিধান পত্রে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল এবং প্রথম কয়েক অধ্যায় অপেক্ষাকৃত নীরস হইলেও ঐ অনুবাদের চমৎকারিত্ব ও নিপুণতায় অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। ঐ গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে বাঙ্গালীর একটী গৌরব করিবার বস্তু হইবে, ইহা অনেকের বিশ্বাস। শীঘ্রই গ্রন্থ যন্ত্রস্থ হইবার সম্ভাবনা।

আমাদের বন্ধুর ধর্ম্মমত অতীব উদার ছিল। তিনি কোনও ধর্ম্মকেই বিদ্বেষ বা ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন না, সকল সম্প্রদায়ের সাধুগণের জীবনী অতি যত্ন সহকারে পাঠ করিতেন ও তাঁহাদের অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টীয় ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের গ্রন্থ তিনি অনেক পাঠ করিয়াছিলেন। উপনিষদ্-বর্ণিত যোগধর্ম্মের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। প্রথমতঃ তিনি গীতা হইতেই নিষ্কাম কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগের আভাস প্রাপ্ত হন। কিন্তু শেষ অবস্থায় মূল উপনিষদ্‌ই অধিক আলোচনা করিতেন। বিজনে মন স্থির করিয়া, দেশ কাল ভুলিয়া, ভগবদ্ধ্যানে তন্ময় হইয়া তাঁহার সহিত যুক্ত হওয়াই তাঁহার জীবনের প্রধান সুখ ছিল। নির্জ্জন স্থানে প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে ধ্যান, চিন্তা ও নাম গান করিতেন। যেদিন কোনও বিঘ্ন হইত, সে দিন অতি কষ্টে অতিবাহিত করিতেন। অনেক সময় বালকের ন্যায় কাঁদিতেন, কিছু খাইতেন না।

তিনি নিম্নলিখিত ভাষাগুলি উত্তমরূপ জানিয়াছিলেন ;—বাঙ্গালা, সংস্কৃত, ইংরাজী, হিন্দী, উড়িয়া, হো, মুণ্ডারী, সাঁওতালী। শেষোক্ত পাঁচটী ভাষা তিনি কার্য্য বশতঃ নানা দেশে অবস্থান কালে আপন অধ্যবসায় বলে শিক্ষা করিয়াছিলেন।

নিজে যাহা জানিতেন বা বুঝিতেন, তাহা অপরকে শিখাইবার নিমিত্ত তাঁহার অত্যন্ত বলবতী আকাঙ্ক্ষা জন্মিত। মানসিক বা নৈতিক অবস্থায় আপন অপেক্ষা হীনতর ব্যক্তিগণকে আপনার সমতলে আনয়ন করিবার এক পবিত্র চেষ্টা সর্ব্বদাই তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক থাকিত। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ডেপুটী কলেক্টরের পদ প্রাপ্ত হন এবং ইচ্ছা করিলে বিচার বিভাগেও তিনি অনায়াসে প্রবেশ লাভ করিয়া উচ্চ পদ পাইতে পারিতেন। কিন্তু দৃঢ়ব্রত, স্থির-সংকল্প বীরেশ্বর ঐ সমস্ত প্রলোভন সম্বরণ করিয়া শিক্ষা-দান ও শিক্ষা-বিস্তারকেই আপনার জীবনের কার্য্য বলিয়া গ্রহণ করেন। কোনও প্রসঙ্গ তাঁহার নিকট উত্থাপিত হইলেই কোনও নূতন ভাব বা দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা অধিকতর সরস ও চিত্তাকর্ষক করিয়া দিতেন। বিপদ্ কালে তাঁহার দৃঢ়তা ও কার্য্যতৎপরতা সকলেরই অনুকরণীয় ছিল। অবসরকালে যাহারা তাঁহার নিকট আসিত, তাহারা দেখিত যে, তাঁহার সেই বীর-চরিত্রে কোমল গুণ সমূহের অসদ্ভাব ছিল না। তিনি সর্ব্বদাই বহুব্যক্তি-পরিবৃত হইয়া বাস করিতেন। কেহবা বিপদে পড়িয়া তাঁহার নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে আসিত,—কেহ বা শোকাতুর হইয়া সান্ত্বনা পাইবার আশায় তাঁহার শরণাপন্ন হইত, কেহবা অভাবে পড়িয়া সাহায্য চাহিত,—কেহ বা নিরাশ অন্ধকারের মধ্যে সাহস ও সহানুভূতি পাইবে বলিয়া সেই হাস্যমুখ গৃহস্থ-বৈরাগীর সন্নিধানে উপস্থিত হইত।

বীরেশ্বর বাবু সুবৃহৎ একটী পরিবার রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পাঁচপুত্র, ছয় কন্যা,এবং পৌত্র দৌহিত্রাদিও অনেকগুলি। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান সিদ্ধেশ্বর মুন্‌সেফ্; দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান সত্যশরণ ক্যাম্বেল হাঁসপাতালের অস্ত্রচিকিৎসক ও কলিকাতার এক জন খ্যাতনামা ডাক্তার; তৃতীয় পুত্র শ্রীমান জ্ঞানশরণ এসিষ্টাণ্ট একাউণ্টাণ্ট জেনারেল। অপর দুইটী পুত্রের এখনো পাঠ্যাবস্থা। জামাতাগুলিও সকলেই কৃতবিদ্য। তাঁহার অন্তরাত্মা পার্থিব সকল বিষয় হইতে ক্রমে ক্রমে নির্লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। দিবারাত্রি সেই প্রেমানন্দময়ী জননীর ভাবে তন্ময় হইয়া থাকাই যেন তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য;—

"যেন রে বিশাল তুঙ্গ হিমাদ্রি শিখর,
ছাড়ায়ে ধরণী পৃষ্ঠ উঠেছে আকাশে;
বক্ষে তার দিন রাত, মেঘ বৃষ্টি বজ্রাঘাত,
কিন্তু তাহে বিচলিত নহে ত অন্তর;
শিরে তার চিরালোক চির রৌদ্রহাসে।"

বীরেশ্বরের জীবনের আর দুই একটী ঘটনার উল্লেখ করিয়া আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রমে স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। দুই একবার সেই মহাত্মার সাক্ষাৎ লাভ করিয়া বীরেশ্বর বুঝিলেন যে, সেই স্ফুলিঙ্গ কালে বিশ্বব্যাপী হইবে, সেই যুবকের দিকেই এক দিন সমগ্র জগৎ বিস্ময় ও আশাপূর্ণ নেত্রে চাহিয়া থাকিবে। কয়েক বৎসর পরে বীরেশ্বরই অন্যান্য বন্ধুদের সহিত চেষ্টা করিয়া কেশবচন্দ্র ও তাঁহার অনুচরবর্গকে হাজারিবাগে লইয়া যান। তিনি সর্ব্বদাই কেশবচন্দ্রের সঙ্গে থাকিতেন এবং ক্রমে ২ তাঁহার একান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়েন। কেশবচন্দ্রও বীরেশ্বরকে আন্তরিক স্নেহ করিতেন।

বীরেশ্বরের সরলতা ও স্পষ্টবাদিতা অতি উত্তম রূপে বুঝিতে পারা যায়। এক সম্ভ্রান্ত ইংরেজমণ্ডলীর মধ্যে তাঁহার অনেক বন্ধু ছিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন এবং আপনাদের সামাজিক কার্য্যাদিতে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতেন। কিন্তু তিনি সাহেবদের বাটীতে আহারাদি বিষয়ে বিশেষ সাবধান ছিলেন। সরকারী কার্য্যে উপরিতন কর্ম্মচারিগণের সহিত মতভেদ ঘটিলে তিনি আপনার মত স্পষ্ট ও নির্ভীকতার সহিত বিবৃত করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। অপরের মতের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শনও করিতেন। শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর ক্রফ্‌ট্ মহোদয় বীরেশ্বরকে বড় ভালবাসিতেন ও তাঁহার গুণের মর্য্যাদা বুঝিতেন। যখন ক্রফ্‌ট্ সাহেবের অবসর গ্রহণের সময় আসিল, বীরেশ্বর তাঁহাকে জানাইলেন যে, সঙ্গে সঙ্গে তিনিও অবসর লইবেন। কোনও বন্ধু কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বীরেশ্বর বলিয়াছিলেন—"চাকুরী বড় না আত্মসম্মান বড়?" তাহার প্রতি সার এল্‌ফ্রেড্ ক্রফ্‌টের কি ভাব ছিল, তাহা নিম্নলিখিত পত্র হইতে কতক পরিমাণে জানা যাইবে—

"প্রিয় জ্ঞানশরণ, [তৃতীয় পুত্র]

দুই দিন হইল, তোমার ৫ই জুন তারিখের পত্র পাইয়াছি। তোমার পিতৃ-বিয়োগের শোক সংবাদ আমি পূর্ব্বেই শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের পত্রে অবগত হইয়াছিলাম। চন্দ্র বাবুর পত্রে জানিলাম যে, তোমার পিতার প্রতি তাঁহার গাঢ় শ্রদ্ধা ও

আন্তরিক অনুরাগ ছিল এবং তোমার পিতার মৃত্যুতে তিনি বড়ই ব্যথিত হইয়াছেন। আমারও মনের ভাব ঠিক সেইরূপ জানিবে। তোমার পিতা গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগের মধ্যে এক জন পরম বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার চরিত্র অতি উচ্চ দরের ছিল এবং তিনি কখনো সৎপথ হইতে এক চুল মাত্রও বিচলিত হন নাই। এই সকল কারণে তাঁহার সংসর্গে থাকিলে লোকের চরিত্র উন্নত হইত। তাঁহার বন্ধুত্ব আমি অতি মূল্যবান জ্ঞান করিতাম। তিনি অনেক দূরে থাকায় সর্ব্বদা সাক্ষাৎ লাভ ঘটিয়া উঠিত না।"

বাল্যকালে দারিদ্র্য অভাবের মধ্যে প্রতিপালিত হওয়ায়, রায় বাহাদুর আহার পরিচ্ছদাদি বিষয়ে অতি সামান্য ভাবে থাকিতেন। তিনি বেশ রাঁধিতে পারিতেন এবং মধ্যে মধ্যে রন্ধনশালে গিয়া সমস্ত রন্ধন করিতেন ও সকলকে খাওয়াইয়া আনন্দ ভোগ করিতেন। যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থায় তিনি অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু ছিলেন। মফস্বলে পরিভ্রমণ কালে অনেক সময় পাল্কী হইতে নামিয়া পনের ষোল মাইল পথ অবলীলাক্রমে চলিয়া যাইতেন। রোগীর সেবায় তিনি বেশ পটু ছিলেন; নিজের বাড়ীতেই হউক, আর অপরের বাটীতেই হউক, আবশ্যক হইলে রোগীর শয্যাপার্শ্বে রাত্রির পর রাত্রি বসিয়া কাটাইতে পারিতেন। চিকিৎসা শাস্ত্রের অনেক গ্রন্থ তিনি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং ক্রমাগত রোগ ঘাঁটিয়া ঘাঁটিয়া সাধারণ পীড়াগুলি সম্বন্ধে অত্যধিক অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল। বিচক্ষণ চিকিৎসকেরা অনেক সময় তাঁহার মত যত্নের সহিত গ্রহণ করিতেন।

স্বকীয় সমাজের ও স্বজাতির কিসে মঙ্গল হইবে, সতত তাঁহার এই চেষ্টা ছিল। মৃত্যুর তিন চারি মাস পূর্ব্বে স্বজাতীয় কয়েক জন প্রধান ২ ব্যক্তির সাহায্যে তিনি দাক্ষিণাত্য বৈদিকগণের উন্নতির নিমিত্ত এক সভা স্থাপন করেন। ঐ সভা হইতে ক্রমে ক্রমে দুই একটী সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতেছে এবং কালে তাহা হইতে যে বৈদিক জাতির অনেক কল্যাণ উদয় হইতে পারে, তাহারও চিহ্ন দেখা যাইতেছে। বর্ম্মা পরিভ্রমণ কালে তিনি ঐ দেশে নয় মাস অতিবাহিত করেন এবং রেঙ্গুন সহরে পঞ্জাবী ও হিন্দুস্থানী অধিবাসীগণকে লইয়া এক আর্য্যসমাজ সংস্থাপন করেন।

রাজনীতি সম্বন্ধেও তিনি সুবুদ্ধি ও সৎসাহসপূর্ণ রক্ষণশীল মতের পক্ষপাতী ছিলেন। এই বিষয়ে বিবেকের স্থির ও পবিত্র আলোকে যাহা যুক্তিযুক্ত বোধ হইত, তাহাই করিতেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নানা দোষ সত্ত্বেও তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, ইংরেজের শাসনে ভারতের মঙ্গল হইতেছে ও হইবে এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাবের শুভ সম্মিলনে অশেষ কল্যাণের উৎপত্তি হইবে।

ধর্ম্মজ্ঞানপিপাসা বীরেশ্বর বাবুর চিরকালই অতি প্রবল ছিল। তিনি সাধু পুরুষদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও সদালাপ করিতে সর্ব্বদাই ইচ্ছুক থাকিতেন এবং সুযোগ পাইলে সাধু দর্শন না করিয়া থাকিতেন না। এলাহাবাদ হইতে কিছু দূরে গঙ্গার অপর পারে ঝুঁসি নামক স্থানে অনেক সাধু সন্ন্যাসী বাস করেন। তিনি সেখানে গিয়া সাধুদের সহিত শাস্ত্র ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলাপ করিয়া পরিতৃপ্ত হন। এই স্থান

দর্শন করিয়া তাঁহার মনে এক অপূর্ব্ব শান্তিরসের উদয় হয় এবং সেখানকার নানকপন্থীয় দয়ারাম বাবা নামক জনৈক সাধুর উপর তাঁহার আন্তরিক ভক্তি ও অনুরাগ জন্মে। রেঙ্গুনে থাকিবার সময় তিনি শুনিলেন যে, হোয়াইট্ নামক একজন সুবিদ্বান্ স্কট্‌লণ্ডবাসী ব্যক্তি বুদ্ধদেবের অনুরাগী হইয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছে এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মের নানারূপ সাধন ও অনুষ্ঠানাদির দ্বারা ক্রমে পুঙ্গী বা ভিক্ষুর পদবী লাভ করিয়াছে। বীরেশ্বর সেই শ্বেত ভিক্ষুর সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ করিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। এমন কাঠনাস্তিক বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে কেহ কখনো দেখে নাই। ঈশ্বর মানা ত দূরের কথা, ঈশ্বরের নাম সূচক কোনও কথাও সে মুখে আনে না। যদি কখনো তর্কের খাতিরে গড্ এই কথাটী বলিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে বানান করিয়া জি—ও—ডি এইরূপ বলেন। তচ্ছ্রবণে বীরেশ্বর স্তম্ভিত হইলেন, কিন্তু চুপ্ করিয়া রহিলেন না। মধুর ভাষায় সেই বিজাতীয় নাস্তিকের কর্ণে সচ্চিদানন্দময়ীর মধুময় নাম ও গুণাবলি কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কিছু ফল বুঝি ফলিল; নাস্তিকের মন একটু নরম হইল। ব্রহ্মদেশে নয় মাস অবস্থান কালে কেবল তিনি বুদ্ধচরিত ও বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত গ্রন্থ সকল পাঠ করিতেন। তাঁহার মাতৃভক্তি, আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে আদর্শ স্থানীয় বলিয়া গণ্য হইত। মাতা আদ্যাশক্তিও পুত্রের মনের ভাব বুঝিতেন, তাঁহার মনস্তুষ্টির জন্য বীরেশ্বরের আন্তরিক চেষ্টা কিরূপ ছিল।

বন্ধুবরের বিচিত্র ঘটনাবলি পূর্ণ জীবন অনেক বার আসন্ন মৃত্যুর মুখ হইতে দৈবানুকম্পায় রক্ষা পায়। এবং সেই সেই সঙ্কটের কালে তাঁহার উপস্থিত বুদ্ধি, সাহস, দৈবনির্ভর ইত্যাদির বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

হিন্দী সাহিত্যের বর্ত্তমান লেখকগণের মধ্যে যাঁহারা লব্ধপ্রতিষ্ঠ, তাঁহাদের মধ্যে, অনেকেই বীরেশ্বরের হিন্দী লেখার অত্যন্ত প্রশংসা করিতেন। বিদ্যালয় সমূহের উচ্চ শ্রেণীস্থ বালকগণের হিন্দী সাহিত্য সম্বন্ধীয় উত্তম পাঠ্য পুস্তকের অসদ্ভাব দেখিয়া তিনি সাহিত্য-সংগ্রহ নামে একখানি গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। এই গ্রন্থের গদ্য প্রবন্ধ সমূহের অনেকগুলি তাঁহার স্বকীয় লেখনী প্রসূত। সাহিত্য সংগ্রহ বহুকাল ধরিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্য পুস্তক রূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল। কিন্তু হিন্দীর এতদূর সেবা করিয়া তিনি মাতৃভাষা বাঙ্গালাকে পূজা করিতে ভুলেন নাই। তাঁহার "ভারতবর্ষীয় ভক্তকবি" বাঙ্গালা ভাষার এক নূতন জিনিস। "কোলকাহিনী"তে কোল সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্য জাতি সমূহ সম্বন্ধে তাঁহার ত্রিশ বৎসরের অভিজ্ঞতার ফল অতি সংক্ষেপে ও সুমধুর ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তিনি সাময়িক পত্রিকাতে মধ্যে মধ্যে সুন্দর সরল গদ্য ও পদ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত করিতেন। আমাদের প্রিয় ভ্রাতার বিরচিত বাঙ্গালা সঙ্গীতগুলি অতিশয় ভক্তিভাবপূর্ণ ও শ্রুতিমধুর। এই গানগুলি সর্ব্বদা তিনি গাহিতেন। অনেক গীতে "কাঙ্গাল দাস" ভণিতা আছে। তাই গীতগুলি সংগ্রহ করিয়া "কাঙ্গালদাসী" নাম দিয়া তাহা প্রকাশ করিবার তাঁর বড় ইচ্ছা ছিল। আমরা নিয়ে

কয়েকটী কাঙ্গালদাসী সংগীত উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম। আশা করি, ভবিষ্যতে এই গীতাবলীর সহিত ভ্রাতৃবর বীরেশ্বর চক্রবর্ত্তীর এক খানি সংক্ষিপ্ত জীবনী তাঁহার উপযুক্ত সুপুত্রগণ প্রকাশ করিবেন। তাঁহার জীবনের অন্যান্য জ্ঞাতব্য ঘটনা তাহাতেই বিস্তারিতরূপে থাকিবে। প্রবন্ধ দীর্ঘ হওয়াতে আমরা তদ্বিষয়ে লোভ সম্বরণ করিতে বাধ্য হইলাম।

প্রথম সঙ্গীত। ভৈরবী—পোস্তা।

জেনেছি তোমারে তারা কেমনে বলিতে পারি।
'নাহি জানি মা তোমারে' এ ভাবও ভাবিতে নারি॥
প্রপঞ্চে জড়িত আমি, চৈতন্যরূপিণী তুমি,
কেমনে ধরিব তোমায়, সঙ্কটে পড়েছি ভারি॥
চপলা প্রকাশ হেন, নয়ন নিমেষ যেন,
"ইতি ইতি" মাত্র মাগো অরূপ রূপ নেহারি॥
ধরিয়া রাখিতে যাই, খুঁজিয়া নাহিক পাই,
এই আছ এই নাই (মা) কিছুই বুঝিতে নারি॥
বুদ্ধির আলোক জ্বেলে, সন্ধান করিতে গেলে,
কল্পনা(অবিদ্যা) কুহকে ফেলে মা,যতই দেখি ফক্কিকারি॥
জানি যে এমনো নয়, না জানি কেমনে হয়,
দুরূহ এ তত্ত্বতবু সুধামাখা বলিহারি! (১)

(২) বাউল।

ও তুই নাচ্ দেখিরে মন।
হরি হরি হরি বলে পাবি মোক্ষ ধন।
বিষয়বাসনা ভুলে, হৃদয় কবাট খুলে,
গোরার মতন। (নদের গোরার মতন)
নামামৃত রসে মেতে, নাচরে খেতে, নাচরে শুতে,
ওরে কিবা দিবা কিবা রেতে, সদা সর্ব্বক্ষণ॥
প্রেমের মদিরা পানে, মত্ত হয়ে নাম গানে,
আনন্দ উৎফুল্ল প্রাণে, জুড়াবে জীবন॥

(৩) বাউল।

(হরি) ভাঙ্গা ঘরে থাকব কত কাল।
ও তার পচে গেছে বাঁশ বাঁকারী,উড়ে যায় হে খড়ের চাল॥
যখন আটা সাঁটা বাঁধন ছিল তার,
ঝড় ঝাটাতে থাকত খাড়া নড়ত না একবার;
আবার বাদলা বৃষ্টি মান্‌ত নাক,
ছিল না কোনও জঞ্জাল॥
এযে, মাটীর বাড়ী পাকা কোটা নয়,
তাতে বহুকালের হল হরি, কতদিন আর রয়?
দুটো জানলা দিয়ে জল পড়েছে,
ভিজে মলো দাস কাঙ্গাল॥

(৪) বাউল।

(হরি) কেমন করে ডাক্‌ব হে তোমায়।
যদি রোগের দায়ে, বিষম ঘায়ে, কণ্ঠনালী বুজে যায়।
আমি দেহের কষ্টের জন্য না বলি,
হৃদয়বিহারী তুমি জান সকলি;
যেন শেষ অবধি নিরবধি হরি নামটী বাহিরায়।
কাঙ্গাল বলে বাঁচি আর মরি,
যেন বদন ভরে বলতে পারি "দয়াময় হরি";—
আমার যে সময়ে দেহ ছেড়ে,
প্রাণপাখীটা উড়ে যায়।

(৫) রামপ্রসাদী।

এবার যাব গো পাগল হয়ে।
আমার ভবের আগুন জ্বলছে মাথায়,
আর কত দিন থাক্‌বো সয়ে।
কামিনী কাঞ্চনে তারা,
(আমায়) করেছে গো আত্মহারা,
আমি খেটে খেটে হলেম সারা
ভূতের বোঝা মাথায় বয়ে।
(ওমা) বহুকষ্টে যদি চিত,
তোমাতে হয় সমাহিত,
(তথায়) স্থিরভাবে থাকে নাত
ক্ষিপ্ত হয় মা বিষয় লয়ে।
(ওমা) কাঙ্গাল দাস কাতরে ভণে,
ও তার আর কেহ নাই ত্রিভুবনে,
তার নিবেদন মা ওই চরণে
যেন জন্মের মতন যায় না বয়ে।

(৬) সিন্ধু—যৎ।

এবার আমি সার ভেবেছি
চরণ তলে পড়ে র'ব।
নির্ভয় অন্তরে তারা (মাগো)
দেখ্‌ব রুদ্ররূপ তব।
(ওমা) নির্ভয়ে বাঁধিয়ে বুক,

(শুধু) হেরিব তোমার মুখ,
সংসারের দুঃখ সুখ
ভুলিয়ে কৃতার্থ হব।
(ওগো) ত্যাগ করিয়ে নড়া চড়া,
থাক্‌ব শুয়ে যেন মড়া,
আমি ছেড়ে দেব বোঝা পড়া
কিছুতে না কথা কব।
(ওমা) কাঙ্গাল তোর আদুরে ছেলে,
ও সে ছাড়বে নাক কোল না পেলে,
তবে কেন তায় সঙ্কটে ফেলে,
করিয়ে রেখেছ শব॥

শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা।

সমাজ-চিন্তা

উপক্রমণিকা।

জিজ্ঞাসা—প্রমাণ।

সহজ বুদ্ধিতেই যাহা প্রকাশিত হয়, যাহা স্বতঃসিদ্ধ, তাহাই আমাগিগকে রীতিমত তর্ক যুক্তি দ্বারা বুঝিতে হয়। খুব লম্বা চৌড়া তর্কের সূত্র অবলম্বন করিয়া ধীর গতিতে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। উক্তরূপ মার্গে অবলম্বন করাই পাণ্ডিত্য, আমাদের দেশের অনেক পাণ্ডিত্য এই রকমের।

তর্কের বেড়াজালে পড়িয়া অনেক সময় সত্য হারাইয়া যায়। হেতু ছাড়িয়া হেত্বাভাসে মন প্রবঞ্চিত হয়। সম্পূর্ণ অলীক অসম্ভব সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া পড়ি; তবু তাহা অসম্ভব বলিয়া প্রতীতি হয় না, সেই সিদ্ধান্ত উলটাইতে চাহি না, সিদ্ধান্তে অনাস্থা করিতে চাহি না। কারণ যে যুক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া আসিতেছি, তাহাতেও ভ্রম দেখিতে পাইতেছি না।

যে পর্য্যন্ত না তর্কমার্গের ভ্রম বুঝিতে পারি, সেই পর্য্যন্ত অসম্ভব জানিয়াও তাহা বিশ্বাস করি। তদনুসারে কার্য্য করি।

আমরা অবতার-বাদী। আমাদের দেশে ঈশ্বর আসিয়াও তর্ক যুক্তি দ্বারা সত্য বুঝাইতে চেষ্টা করেন। যে যত বড় তর্কের ফাঁদ পাতিয়া আমাদিগকে বেকুব করিয়া দিতে পারে, সহজ জ্ঞানে যাহা বুঝিতেছি, তাহাকে একেবারে উড়াইয়া দিতে পারে, সে-ই তত বড় পণ্ডিত এবং ঈশ্বরের ঘনিষ্ট অবতার বলিয়া আমরা ধরিয়া লই। চোকে ধূলা পড়িয়া দৃষ্টিশক্তি যতই রহিত হইতে থাকে, ততই অধিক দেখিতে পাইতেছি, মনে করি।

এক কথায়, যাহা অন্ধের কাছে স্বতঃসিদ্ধ, তাহাই আমাদের নিকট প্রমাণ-সাধ্য। আমরা এই জগৎ সংসারকে একটা ভেল্‌কী বলিয়া ধরিয়াছি, ইহার ঈশ্বর আমাদিগকে ঠকাইবার জন্য দুর্ব্বোধ্য মায়াজাল, প্রবঞ্চনা-জাল বিস্তারিয়া, বসিয়া আছে; আমরা তাহার হাত এড়াইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছি।

সুতরাং আমাদের প্রত্যেক দর্শনের, প্রত্যেক জিজ্ঞাসাবাদের গোড়ায় এক এক প্রমাণ খণ্ড আছে। কি কি রকমের প্রমাণ বিশ্বাস করি, পূর্ব্বেই তাহার একটা স্থির করা আবশ্যক হইয়াছে। ইহা একবার স্থির করিতে পারিলেই আমাদের ধর্ম্মের এবং সমাজের যাবতীয় তত্ত্ব অনায়াসে অজ্ঞানের মায়ার কূটকাঠিন্য হইতে ছাঁকিয়া বাহির করা যায়। খ্রীষ্টান, মুসলমান অথবা বৌদ্ধ

জাতিকে জিজ্ঞাসা কর, বিধবা রমণীর স্বামী গ্রহণ উচিত কি না, তাহারা এক বাক্য বলিবে--হাঁ। জিজ্ঞাসা কর, জন্মগত জাতিভেদ-প্রথা উচিত কি না? তাহারা, এইরূপ প্রশ্নও কি আবার জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, ভাবিয়া আমাদের দিকে সন্দিগ্ধ চক্ষে তাকাইবে। অথচ, এই সমস্ত বিষয়েই আমরা তর্কের দ্বারা একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। সেই সিদ্ধান্ত পৃথিবীর অন্য জাতির বিশ্বাসের সঙ্গে মিলে না।

না মিলিল বলিয়া আমরা চিন্তিত নহি। আমরা আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াই জানি, আধ্যাত্মিকতার গৌরব করি। এই জগৎকে মায়াময় জানিয়া আমরা জগতের স্রোতের প্রতিকূলে বরাবর নৌকা চালাইয়া আসিয়াছি, তাই, জগতের অপর জাতির চক্ষে আমাদের ধর্ম্মের এবং সমাজের সমস্ত অনুশাসন, নিয়ম, আচার ব্যবহার, ঘোর কৃত্রিমতায় পরিপূর্ণ, বরাবর সহজ জ্ঞানের বিরোধী।

জগৎকে এবং জগতের স্রষ্টাকে বিশ্বাস করিতে পারি নাই বলিয়াই আমাদের এই দশা। আমাদের ধর্ম্মের উপর কৃত্রিমতা হইতে কৃত্রিমতার আবর্জ্জনা পড়িয়া স্তূপীকৃত হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের সমাজ-নদী বহু সহস্র বৎসরের মনুষ্য-নির্ম্মুক্ত জঞ্জালে পরিপূর্ণ হইয়া পূতিগন্ধে ভরপুর হইয়া উঠিয়াছে। তাহা যে এক সময়ে অমৃতময়ী অগাধসলিলা স্রোতস্বিনী ছিল, জগতের অন্য জাতি যে এক সময় তাহার নিকট হইতে আপন ঘট পূর্ণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহা শুধু ইতিহাসে পড়িতে পাই, কোন মতে ধারণা করিতে পারি না।

আমাদের ধর্ম্ম এবং আমাদের সমাজ আমাদিগকে বর্ত্তমান অবস্থায় আনিয়াছে। বর্ত্তমান ভারত অতীতের ধর্ম্ম এবং সামাজিক বিধি নিয়মের অবশ্যম্ভাবী ফল। আমরা জগৎকে ঘৃণিত বোধে ডিঙ্গাইতে গিয়া জগতের পূতিপূর্ণ পঙ্কিল জলে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া পড়িয়াছি। যাহারা সরল প্রাণে হাঁটিয়া চলিয়াছিল, যাহাদিগকে অজ্ঞান বলিয়া ঘৃণা করিয়াছি, তাহারা উচ্চ গিরিশৃঙ্গে আরোহণ করিয়া জ্ঞানী ভ্রাতাদের জ্ঞান গবেষণার দিকের চাহিয়া চাহিয়া দুঃখ করিতেছে। যাহারা এক সময় আমাদের পদতলে বসিয়া শিক্ষা করিয়াছে, তাহারাই কাল বশে আমাদিগকে শিক্ষা দিতে আসিয়াছে। তাহারা কি শিক্ষা দিতে পারে, একবার আমাদের তলাইয়া দেখা উচিত, বৃথা গর্ব্ব ও অহংকারে স্ফীত হইয়া থাকার আর সময় নাই। আমাদের দশা যে শোচনীয়, তাহা সকলে বুঝিয়াছে, আমরাও বুঝিয়াছি, এখন আর আত্মবঞ্চনা করিবার সময় নহে। বিদেশীর নিকট হইতে আমরা কি শিক্ষা করিতে পারি, যথাসাধ্য কার্য্য কারণ ও ফলাফল বিবেচনা করিয়া তাহা নির্ণয় করা একান্ত আবশ্যক হইয়াছে।

প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ সম্ভব অথবা ঐতিহ্য প্রমাণের কোন্‌টা গ্রহণ করিব, প্রথমে তাহার নির্দ্দেশ করার আবশ্যক নাই। প্রত্যেক প্রমাণ নিজেই আপনার বিশ্বাস্যতা প্রকাশ করে, নিজেই মনের মধ্যে আপন অধিকার বিস্তার করে, প্রত্যক্ষ অনুমান অথবা উপমানের সিলমোহর পড়িলেই তাহার বলবত্তা বৃদ্ধি হয় না, বরং তদ্দারা বঞ্চিত হইবার, চক্ষে ধূলা পড়িবার সম্ভাবনাই বাড়িয়া উঠে। একবার শব্দ সম্ভব কিংবা ঐতিহ্য প্রমাণ মানিয়া চলিব,

অঙ্গীকার করিলে তৎ সঙ্গে সঙ্গে জগৎ সংসারের অনেক প্রশ্ন নির্ব্বিবাদে নির্দ্ধারিত হইয়া যায়, জিজ্ঞাসাবাদের আবশ্যক পড়ে না। প্রাচীনগণ এই জন্য অনেক স্থলে প্রতারিত হইয়াছেন।

ইয়োরোপীয় দর্শন বিজ্ঞানে এইরূপ প্রমাণ নিরূপণ নাই। তদ্দরুণ, তাহাদের সিদ্ধান্তের প্রামাণিকতা কমে নাই। মানব হৃদয় চিরদিন জাগ্রত, প্রথমেই তাহার চক্ষে ঠুলি বাঁধিয়া না দিলে সে স্বাধীনতায় অনায়াসে প্রকৃত বিষয় বুঝিতে পারে। সে আপন হইতেই অন্ধ নহে। তাহাকে আপন শক্তিতে বিশ্বাসহীন করিয়া বেদ স্মৃতি অথবা মুনিগণের মত-বৈষম্যের মধ্যে ফেলিয়া কোন্‌টা গ্রহণ করিবে, জিজ্ঞাসা করিলেই সে আপন প্রতিভা হারাইয়া ফেলে, গ্রহণ করা না করায় যখন তাহার হাত নাই, একটা যখন গ্রহণ হইতেই হইবে, তখন তাহার প্রকৃত স্বাধীনতা হরণ করা হইয়াছে।

মানবের সহজ বুদ্ধি দীপ-শিখার ন্যায়, সে স্বতঃ চারিদিকে সমভাবে আলোক বিকীর্ণ করিয়া প্রকাশিত করিয়া তোলে। তাহার প্রবৃত্তিই সমস্ত বিষয়ের প্রমাণ। সহজ বুদ্ধির প্রবৃত্তি নিরোধ করিয়া যখন মানব অন্য উপায়ে সত্যানুসন্ধানে তৎপর হইয়াছে, তখনি বিশ্ব-কুসুমের ভিতর হইতে মধু চলিয়া গিয়াছে। তত্ত্বের পরিবর্ত্তে অতথ্য ধরা দিয়াছে, দর্শনে ফাঁকি আসিয়াছে, জ্ঞানের পরিবর্ত্তে ঘনীভূত অজ্ঞান তাহাকে চারিদিক হইতে জড়সড় করিয়া স্বভাবের উন্মুক্ত সূর্য্যালোক হইতে চিরকালের জন্য দূরে রাখিয়াছে।

আমাদের মনে এই অজ্ঞান, এই ফাঁকি, এই অন্ধকার এত সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, তাহার হাত হইতে সহসা সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি লাভের আশা করিতে পারি না। সকল দেশে সকল জাতির মনেই ইহার অল্পাধিক প্রতিষ্ঠা আছে। তবে তাহারা কালে কালে একবার গা ঝাড়া দিয়া উঠে, সমস্ত ধূলা কাদা ঝাড়িয়া ফেলিয়া পরিষ্কার হয়। আর আমাদের গায়ে চারি যুগের ধূলি লাগিয়া আছে; আবর্জ্জনায় আমরা জীবন্ত নিষ্ক্রিয় ভাবে সমাহিত আছি। সময় সময় আমরাও গাত্রোত্থান না করিয়াছি, এমন নহে, কিন্তু তাহা ক্ষণিক। যাহা মলিন বোধে দূরে ফেলিয়াছি, তাহাই আবার কিছু পরে দ্বিগুণ স্নেহে টানিয়া লইয়াছি। ইহার ইতিহাস কোন গ্রন্থে লিখিত হয় নাই। প্রকৃত ইতিহাস লিখিবার প্রণালী আমাদের ছিল না। ইতিহাস লিখিতে হইলে পূর্ব্বাপর দোষ গুণ, উত্থান পতন প্রভৃতি উজ্জ্বল হইয়া ধরা দেয়। ভারতে মানব মনের পরিচালন-দণ্ড যাঁহাদের হস্তে ছিল, তাঁহারা দু'একজন ব্যক্তি নহেন, তাঁহারা একটা সম্প্রদায়, সুতরাং তাঁহারা নানা কারণে ইতিহাস লেখা উচিত মনে করেন নাই। কিন্তু দেশ কাল ভেদে রচিত শত শত ধর্ম্মগ্রন্থে, সংহিতা পুরাণে, উপপুরাণে এই ইতিহাস গৌণ ভাবে লিখিত হইয়াছে। বিভিন্ন ভাবের বেদ পুরাণ সংহিতাদির প্রচলনে ও প্রবর্ত্তনে, ও স্থল বিশেষে সমন্বয় চেষ্টায় আমরা বুঝিতে পাই, এই ভারতে মানবমন কি দুর্ব্বিসহ অন্তর্ব্বিপ্লবে বিলোড়িত হইয়াছিল। এই ভারতের ন্যূনাধিক ৪॥ শত উপাসক সম্প্রদায় ও শাক্ত, শৈব, গাণপত্য, নানকপন্থী, বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব প্রভৃতি মতের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কারণে সমুত্থান ও পরিশেষে একই 'হিন্দু' নামক নানার্থ-যুক্ত অনার্য্য শব্দে স্থিতি এবং

বিলয়পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝা যাইবে, মনুষ্য-মন পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় কিরূপে নানা পথে নানা উপায়ে অর্গল-মুক্ত হইবার প্রয়াস পাইয়াছে।

এই ভারতে উপাসনা প্রণালীই মানব মনকে নিষ্পিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল। কি উপায়ে ক্রুদ্ধ ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারা যায়, লোভী দেবতাকে পরিতুষ্ট ও বশীভূত করিতে পারা যায়, এই চিন্তা সমস্ত মানব জাতির আদিম ধর্ম্মভাব। অন্য দেশে ইহার উন্নতি এবং বিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কিন্তু ভারতে নানা কারণে নানা মতে তাহাকে অক্ষত এবং সজীব রাখার চেষ্টা হইয়াছে।

ভারতের দর্শন ভারতের সমাজে প্রকৃত প্রস্তাবে কার্য্যকর হয় নাই। তাহা কেবল কতকগুলি জীবে আবদ্ধ ছিল। ভারতের দর্শন তাহার সমাজে কার্য্য করিতে পারিলে অদ্যকার সমাজ-চিন্তার আবশ্যক ছিল না। একবার মানব-নেত্রে দর্শনের দ্বার উদ্ঘাটিত হইলে সে যে স্বাধীনতার আভাষ পায়, কায়মনে প্রাণপণে তাহা রক্ষা করিবার, অনুশীলন করিবার চেষ্টা করে। একদিন না একদিন তাহার দাসত্ব-শৃঙ্খল বিচূর্ণ করিতে পারে। পৃথিবীর অন্য সমস্ত জাতি এইরূপে কালক্রমে আদিম দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়াছে ও হইতেছে।

আমরা পৃথিবীর অন্য জাতির ইতিহাস দেখিতেছি। আমাদের শোচনীয় অবস্থা দেখিতেছি, তাহারা কিসে উন্নত হইতেছে, দেখিতেছি, আমাদের যে নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়, ইহাও বলিতেছি। আমাদের এই অবস্থা এবং যেই সমস্ত ধর্ম্মনীতির, সমাজনীতির অথবা রাজনীতির অবলম্বনে, অনুসরণে আমাদের এই অবস্থা আসিয়াছে, ইহাদের কিছুই আমাদের প্রিয় অথবা রক্ষণীয় হইতে পারে না। সুতরাং এখন ভাল মন্দ পরিজ্ঞাত হইয়া কার্য্য করার সময় আসিয়াছে।

প্রথমে জ্ঞান পরে কার্য্য, জ্ঞান অর্দ্ধেক কার্য্য, জ্ঞানের শক্তি অপরিসীম। সুতরাং পৃথিবীতে জ্ঞান-বীর এবং কর্ম্মবীরগণের সমান আসন। ফরাসী-বিপ্লবের প্রধান শক্তি জ্ঞানবীরগণ। ফ্রান্সে ভলটেয়ার, রোসু প্রভৃতি জ্ঞানবীরগণ দেশের হৃদয়ে যে জ্ঞানানল প্রজ্বলিত করিয়া যান, তাহাতেই দেশের ভূমি কর্ম্মবীরগণের বীজ-প্রসূতি হইয়াছিল। সমস্ত ইয়োরোপীয় সভ্যতাকে ফ্রান্স যে অভাবনীয় উপায়ে উন্নীত করিয়াছে, সেই ভূমিকম্পের মূলে জ্ঞানবীরগণের আগ্নেয় শক্তি তলে তলে নিহিত ছিল। সুতরাং যাঁহারা বলেন "কথায় কিছুই হইবে না, কার্য্য চাই," তাঁহারা প্রকৃত কথা শুনেন নাই, কথার অর্থ বুঝেন নাই। আমাদের দেশে এখন কথার যত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, এমন বোধ করি, পৃথিবীর অন্য কোন দেশে পড়ে নাই, আমরা সহস্র বৎসরের কর্ম্মহীন, নির্জ্জীব এবং নানারূপে দাসত্বলীন অবস্থায় মৃতবৎ পড়িয়া আছি। আমাদের আত্মাদর এবং আত্মবুদ্ধির প্রতি সহজ নির্ভর পর্য্যন্ত বিনষ্ট করা হইয়াছে। সরল দৃষ্টিতে যাহা প্রকাশিত হয়, তৎপ্রতি আমাদের আস্থা হয় না। নিতান্ত আবৃত কি অবোধগম্য, কিম্বা রহস্য* বিষয় প্রাপ্ত হইলেই ভাব-পুলকে আমাদের রোমাঞ্চ হয়। "ইহার কোন গূঢ় তাৎপর্য্য আছে, আমি যাহা বুঝিতেছি না," ইত্যা-

* যুক্তার্থক বাক্যের অভাবে ইংরাজী mystry অর্থে রহস্য শব্দ প্রযুক্ত হইল।

কার বাক্য স্বতঃপরতঃ আমাদের দেশে সর্ব্বত্র শুনিতে পাই। এতদ্দেশে সর্ব্ব প্রকার বিচার এবং বিতর্কের বিরুদ্ধে উহা ব্রহ্মাস্ত্র স্বরূপ নিযুক্ত আছে। "উহা অতি গূঢ় বিষয়, তোমার একালের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাহার ধারণা হইবে না," এইরূপ বাক্যে প্রতিপক্ষকে অতি সহজে নিরস্ত করা হইতেছে। প্রতিপক্ষও তাহা অতি সহজে মানিয়া লইয়া সুস্থচিত্তে বসিয়া আছেন। আমাদের দেশে এইরূপ ভাব বিনয়ী, বিশ্বাসী এবং জ্ঞানীর লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত। ঈদৃশ চিত্তবৃত্তি, ঘোর মোহ, অবিদ্যা এবং আত্মকৃত অন্ধত্বেরই পরিচয় দিতেছে। মানুষের মনের স্বতোদীপ্ত দীপশিখাকে নির্ব্বাপিত করিয়া তাহাকে নিরেট অন্ধকারের মধ্যে জড়ভরতের মত বসিয়া থাকিতে শিক্ষা দিতে কত শতাব্দী লাগিয়াছিল, কে জানে, কিন্তু তাহার পরিণাম-ফল আমরা আপনাদের ভিতর প্রতিনিয়ত দেখিতেছি। আমাদের হৃদয়ের এই ম্রিয়মান অগ্নিস্ফুলিঙ্গকে সমুত্থিত করিতে হইবে। তাহাতে মুখের ফুৎকার দিতে হইবে। কথায়, বাক্যে দেশের লোককে প্রকৃত অবস্থা-পরিজ্ঞানে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে।

প্রকৃত অবস্থা পরিজ্ঞানে—প্রকৃত আত্মজ্ঞানে যে পর্য্যন্ত না মানুষ উদ্বুদ্ধ হইতেছে, সেই পর্য্যন্ত তাহার কার্য্যকরী শক্তি কোথা হইতে আসিবে? সে যখন কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া আছে, তাহার যখন প্রকৃত নিশ্চয়তা বোধ হয় নাই, তখন অসীম স্নায়বিক শক্তিধর হইলেও সে ভীরু, কাপুরুষ! নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিই আসল মনুষ্যত্ব—ইহাই মানবের জগদ্বিজয়িনী শক্তি।

তাই আমাদের দেশে সমাজ দর্শন বর্ত্তমানে এত উপযোগী। কথা ও বক্তৃতার, সভা ও সমিতির এ দেশে বিশেষ দরকার। এই পথেই দেশের মধ্যে কর্ম্মদেবীর আবির্ভাব হইবে। দেশের সর্ব্বসাধারণও যাহাতে আপনার ধর্ম্মের, সমাজের প্রকৃত দোষগুণ বুঝিতে সমর্থ হইতে পারে, তাহার উপায় করা একান্ত আবশ্যক।

পৃথিবীর অন্য সভ্য জাতির নিকটে যে আলোচনার আবশ্যক নাই, তাহাই আমাদের আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং যে আলোচনা তাহাদের নিকট হাস্যকর, অনাবশ্যক ও অতীত বিষয়ের পুনরুদ্ঘাটন বলিয়া ঠেকিবে, এক কথায় অবস্থা ও প্রচলিত সংস্কার গুণে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া প্রতীতি হইবে, তাহাই আমাদিগকে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়া স্থির করিতে হইবে।

এইরূপ আলোচনায় আমরা পূর্ব্ব প্রচলিত কোনরূপ প্রমাণ প্রসিদ্ধির উপর আস্থা স্থাপন করিব না, পূর্ব্বে প্রকাশ করা গিয়াছে। এই আলোচনায় আমরা কোনরূপ শাব্দ অথবা শাস্ত্র-প্রমাণের উপর একান্ত নির্ভর করিব না। যুক্তিসিদ্ধ বিষয়ের শাব্দপ্রমাণ যেখানে সহায় হইবে, কেবল সমর্থনকল্পে তথায় শাব্দ প্রমাণ গ্রহণ করা যাইতে পারে। এইরূপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে, জাতিবর্ণ ও ধর্ম্মগত সমস্ত অর্জ্জিত সংস্কার দূরে রাখিয়া চলা আবশ্যক। আমি আর্য্য, আমি হিন্দু, অথবা অমি ব্রাহ্মণ, এইরূপ ধারণা লইয়া কোন বিষয়ের মীমাংসা করিতে প্রবৃত্ত হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। আমি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খ্রীষ্টান, এইরূপ ভাব কোনও সত্যানুসন্ধানের উপযোগী নহে। হিন্দু কি মুসলমান প্রভৃতি শব্দ

কতকগুলি সংস্কারের আধার মাত্র। তাহার ভিতর অনেক প্রশ্নের গোপনে নির্ব্বিবাদ মীমাংসা হইয়া আছে। মনুষ্য জাতি সত্যানুসন্ধান করিতে গিয়া চিরদিন এইরূপ দল বাঁধিয়াছে ও চিরদিন বঞ্চিত হইয়াছে।

তত্ত্বানুসন্ধানের প্রাক্কালে, আমি হিন্দু, মুসলমান, কি খ্রীষ্টান, কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত নহি এবং আমি কিছুই জানিনা, এইরূপ নিশ্চয়াত্মক সিদ্ধান্ত আবশ্যক। মনকে প্রথমে সিদ্ধান্তহীন করিয়া ভূয়োদর্শন এবং পরীক্ষা প্রণালী অবলম্বনে জিজ্ঞাসাবাদে প্রবৃত্ত হইলে, সত্য আপনি প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। সত্য কোথাও "চাপা" নাই—বিশ্বজগতে সত্য কোথাও আত্মগোপনের চেষ্টা করিতেছে না। আমরা নিজে তাহাকে চাপিয়া রাখিয়াই তাহাকে বাচিক অনুসন্ধানের ছল করিতেছি, তাহাকে লইয়া 'লুকোচুরী' খেলিতেছি।

জিজ্ঞাসুর বিপদ।

এইরূপ আলোচনা, নিরাপদ নহে। প্রথমতঃ দেশের প্রচলিত ধর্ম্ম প্রণালী হইতেই এতদ্বিরুদ্ধে তুমুল বিদ্রোহ ঘোষিত হইবে।

দেখা যায় যে, পৃথিবীর প্রায় সমস্ত জাতিই ধর্ম্মবিশ্বাসের দ্বারা ন্যূনাধিক সংযত অথবা গঠিত হইয়াছে। এই ব্যাপারে পারম্পর্য্য নির্ণয় করা সুকঠিন। তবে মোটামুটি এই মাত্র বলিতে পারা যায়, আগে সমাজবন্ধন, পরে ধর্ম্মবন্ধন। মানুষ, প্রাকৃতিক নিয়মে অতর্কিতে সমাজবদ্ধ হইয়াছে, পরে পরে সমাজবন্ধন অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য বিধি নিয়ম গুলিকে অলঙ্ঘ্য ও সুদৃঢ় করিবার জন্য, তাহার উপর ধর্ম্মের দোহাই দিয়াছে। এইরূপে পৃথিবীর কোন কোন স্থানে ধর্ম্মের নিয়ম ও সামাজিক নিয়ম এত ওতঃপ্রোত হইয়া পড়িয়াছে যে, পরস্পর বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব। সমস্ত প্রাচীন জাতির সমাজ বন্ধনে ইহার অল্পাধিক দৃষ্টান্ত আছে। চীন অথবা ভারতবর্ষের প্রতি দৃষ্টি করিলেই ইহা বিশেষ রূপে স্পষ্টীকৃত হইবে।

ইয়োরোপীয় সমাজে খ্রীষ্টধর্ম্ম বিদেশ হইতে প্রবিষ্ট হইয়াছে। খ্রীষ্টধর্ম্ম এসিয়ার আমদানি। এসিয়া ইয়োরোপকে ধর্ম্ম দিয়াছে, কিন্তু ইয়োরোপের সমাজ বাঁধিয়াছে প্রধানতঃ গ্রীস; এবং পরে গ্রীক সভ্যতাকে আত্মসাৎ করণান্তর রোম, রোমক সভ্যতায় যে সমাজ বাঁধিয়াছিল, খ্রীষ্টধর্ম্ম তাহাকে একেবারে 'ভাঙ্গিয়া' গড়ে নাই।

অপর পক্ষে, খ্রীষ্টধর্ম্মের জন্মও যে রোমক সভ্যতার সম্পর্কহীন নহে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। খ্রীষ্টধর্ম্মও এক ভাবে রোমক সভ্যতার ছায়ায় প্রসূত ও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। প্রজাতান্ত্রিক শাসনই গ্রীক ও রোমক সভ্যতার আদিম ভিত্তি ছিল, এবং উহার ফলেই গ্রীস ও রোম জগতে মস্তক উন্নীত করিতে পারিয়াছিল। উক্ত নীতি রোমের সমাজ-তন্ত্রেও সংক্রামিত হয়। তাহার ফলে সমাজ মধ্যে যে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের বাতাস বহিতে থাকে, তাহার প্রভাব যে খ্রীষ্টধর্ম্মের জন্মভূমি পালিষ্টাইনে যায় নাই, তাহা অসম্ভব। কেন না, মহামতি যীশুর সময়ে ও তাঁহার বহুপূর্ব্ব হইতেই পালিষ্টাইন রোমানদের অধীনে শাসিত হইতেছিল। যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পরিপোষণ খ্রীষ্টধর্ম্মের মূল প্রকৃতি ও যাহার ফলে ইয়োরোপের বর্ত্তমান উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহা অন্ততঃ রোমক সভ্যতা ও রোমক

সমাজনীতির বিরোধী নহে, মহাত্মা যীশুর ধর্ম্মোপদেশ এত উদার এবং ব্যাপক যে, তাহারা কোথাও সমাজকে শৃঙ্খলিত করিতে কি সমাজনীতিকে আত্মসাৎ করিতে চেষ্টা করিতেছে না।

সুতরাং বর্ত্তমানে ইয়োরোপীয় সভ্যতার ধর্ম্মনীতি ও সমাজনীতি দাক্ষিণ্য-গুণযুক্তা সপত্নী রমণীর ন্যায় ন্যূনাধিক নির্ব্বিবাদে মানবের ঘরকন্না করিতেছে। আমাদের দেশে ধর্ম্মনীতি সমাজনীতিকে আত্মসাৎ করিয়াছে। দুটীকে পৃথক করিয়া অনুধাবন করাও কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। কোন কথা বলিলে দেশে হুলস্থূল লাগিয়া যায়। বিশেষতঃ অচল-প্রতিষ্ঠ ধর্ম্মনিয়মের ছায়ায়, তাহার সাহায্যে, অতএব নির্ব্বিরোধে, উচ্চ উচ্চতর সম্প্রদায়ের লোক নিম্নতরের উপর প্রাধান্য স্থাপন করিয়া আবহমান কাল হইতে ভোগ দখল করিয়া আসিতেছে। সমাজ সম্বন্ধে স্বাধীন চিন্তা প্রকাশ করিতে গেলেই তাহাদের কাহারও না কাহারও স্বার্থে আঘাত লাগে। তাহাতে ধর্ম্মানুরাগ বশতঃই হোক, অথবা স্বার্থরক্ষার্থেই হোক, তাহারা "ধর্ম্ম গেল" বলিয়া কোলাহল করিয়া উঠে। সেই কোলাহলে যতই নির্ভীক লোক হউক না কেন, নানা কারণে তাহাকে বিব্রত ও বিকল হইতে হয়। এইরূপে ভারতে শত শত মহাপুরুষ কালে কালে আপন চিন্তার প্রবর্ত্তন করিতে গিয়া শত শত উপাসক সম্প্রদায় গঠন করিয়াছেন মাত্র, বিভিন্ন ভাবে সমাজ গঠন, কি তাহার প্রবাহের মৌলিক পরিবর্ত্তন করিতে পারেন নাই। ঘাতপ্রতিঘাতে হীনবল এবং নিস্তেজ হইয়া পড়িলেই "হিন্দু" নামক অতি বৃদ্ধ একটা সমাজ-দেহ তাহাদিগকে অনায়াসে আপন কুক্ষিজাত করিয়া নিরুদ্বেগে নিদ্রামগ্ন হইয়াছে।

ভারতবর্ষের প্রচলিত সমাজ-বন্ধন আর ধর্ম্মের দ্বারা সংস্কৃত হইতে পারে না, ঐ উপায়ে এই সমাজের সংস্কার একরূপ অসম্ভব। এখন এই প্রকাণ্ড প্রাচীন অট্টালিকা হইতে একটা ইট খসাইতে হইলেই সমস্ত বস্তুটা নড়িয়া উঠে ও ইহার অধিবাসীগণ কোলাহল করিয়া উঠে; প্রাণপণে দোহাই দিতে থাকে। বিশেষতঃ এ দেশের লোক যুগে যুগে অনেক ধর্ম্মকথা শুনিয়াছে। তাহারা অনেক বড় বড় ঋষি তপস্বীর নাম ও অনেক বড় বড় ধর্ম্মের কথা মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছে, তাহারা এত ভাব-প্রবণ যে যুক্তি অপেক্ষা কল্পিত কথা তাহাদের অধিক উপাদেয়, তাহারা আপনাদের প্রাচীন কাব্য কবিতা গুলিকেও সত্য এবং ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে। রূপক ও কাব্যাদির উচ্ছ্বাসে মানুষ যে মুগ্ধ হয়, মনের সেই অবস্থা ও ভক্তির মধ্যে দেশে কোন বিশেষ পার্থক্য নাই। সুতরাং ধর্ম্মোপদেশে এ দেশের লোকের মন দ্রব করা দুঃসাধ্য। এই দেশের সমাজে যদি কোন পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহা অ-ধর্ম্মের কথাতেই ঘটিবে। ধর্ম্ম-প্রসঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, তাহার সম্পর্ক-মাত্র পরিহার করিয়া, এমন কি অবহেলা পর্য্যন্ত করিয়া, একমাত্র সামাজিক কল্যাণোদ্দিষ্ট যুক্তির নির্ভরে, যদি কোন কথা বলা যাইতে পারে, তবে তদ্দ্বারাই এ দেশের কথঞ্চিৎ উপকার হইতে পারে। দয়াময় বুদ্ধদেব তাহা বুঝিয়াছিলেন, তাই তিনি এই ধর্ম্ম-ক্লিষ্ট দেশে নিরীশ্বরবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্ম, মনে হয়, এই এক-

মাত্র গুণেই এত পৃথিবী-ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বিনা যজ্ঞে, বিনা পূজায়, বিনা ঈশ্বর স্বীকারে, একমাত্র চরিত্রের পবিত্রতা বিধানে যে মানবের শ্রেয়োলাভ হইতে পারে, এই সংবাদ, এই ধর্ম্মকর্ম্ম-পীড়িত দেশে দৈববাণী হইয়াছিল, তাই প্রাচীন ভারত কেন, প্রায় অর্দ্ধেক পৃথিবী বুদ্ধের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু বুদ্ধের শিষ্যগণ ক্রমে সত্য-পথ-ভ্রষ্ট হইলেন, বুদ্ধের প্রবর্ত্তিত প্রণালী বৌদ্ধধর্ম্ম হইল। আবার সেই "ধর্ম্ম", সেই পূজা, সেই পৌরোহিত্য আসিল। তখন সেই প্রাচীন অতি বৃদ্ধ হিন্দু সমাজ গাত্রোত্থান করিয়া বলিয়া উঠিল "এস ভাই! এই যে তুমি আমারি কথা কহিতেছ! ঘরের ছেলে এতদিন কোথায় বাহিরে ঘুরিতেছিলে?" এইরূপে এই ভারতে বুদ্ধদেবেরও পরাজয় হইয়াছিল। সুতরাং ধর্ম্মের নামে আর হইবে না। এ দেশে ঈশ্বরের কি ধর্ম্মের দোহাই দিয়া যিনি যেই সংস্কার করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, তিনিই পরাস্ত হইয়াছেন, এ দেশে অন্ততঃ কিছুকালের জন্য অ-ধর্ম্মবাদিতার বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। ফরাসীদেশে সেই বিশ্ববিশ্রুত বিপ্লবের সময় সর্ব্বপ্রকার দেবপূজা রহিত হইয়া কেবল মাত্র যুক্তি দেবীর (reason) মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। উহার সুফল সমস্ত খ্রীষ্টীয় সমাজ এখন ভোগ করিতেছেন। যে বিশ্বগ্রাসী নির্ম্মম অগ্নিকাণ্ডে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফরাসীর জাতীয় হৃদয় দগ্ধ করা হইয়াছিল, তাহাতে তাহার সমস্ত আবর্জ্জনা এবং অন্ধ-সংস্কার ভস্ম হইয়া গিয়াছে। সমস্ত ইয়োরোপ সেই দৃষ্টান্তে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছে, সর্ব্ব প্রকার ism এবং ityর সম্পর্ক বিনষ্ট করিতে না পারিলে এ দেশের আপাততঃ শ্রেয়ঃ নাই।

এই কথায়, দেশের সকল সম্প্রদায়ের লোক হইতে, এবং অল্প বিস্তর পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্মের উপাসকগণ হইতে লেখকের উপর অজস্র গুলী গোলা বর্ষিত হইতে থাকিবে, তাহা লেখক বুঝিতেছেন। লেখক ইহার ভবিষ্যৎ বুঝিয়াছেন, বুঝিয়া নিরুদ্বিগ্ন দৃঢ় চিত্তেই এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। লেখক সকলকে আহ্বান করিতেছেন। বিদ্বেষহীন, অসূয়াহীন সরল চিত্তে যাঁহারা এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন, লেখক তাঁহাদিগকে সসম্মানে গ্রহণ করিবেন। এ দেশে প্রকৃত সমাজ-দর্শন এখনো চিন্তিত হয় নাই, তাহার কারণ সম্প্রদায়গত স্বার্থ, পূর্ব্বে আভাষ দেওয়া গিয়াছে। কোন কোন মহাপুরুষ এই স্বার্থ ত্যাগ করিতে পারিলেও, তাঁহার পরবর্ত্তীগণ পারেন নাই, তাই কালে কালে অনেক ধর্ম্ম-সংস্কারকের চেষ্টা বিফল হইয়াছে। বর্ত্তমান লেখকও স্বার্থের গণ্ডী সম্পূর্ণরূপে ছাড়াইয়া উঠিতে পারিবেন, এমন গর্ব্ব করিতে পারেন না। হয়ত, অতর্কিত ভাবে চিরার্জ্জিত সংস্কার বশতঃ অনেক স্থলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবেন। সুধীগণ সমস্ত দিক বিবেচনা করিয়া তাহা মার্জ্জনা এবং সংশোধন করিবেন।

এই প্রবন্ধে লেখকের কতগুলি চিন্তা ন্যূনাধিক অসম্বদ্ধভাবে প্রকাশিত হইবে। কোনও নূতন বিষয়ে লেখনী চালনা করিতে থাকিলে, ভাবের সমন্বয়, যুক্তির স্বাধীনতা, চিন্তাসূত্রের অখণ্ডতা এবং প্রক্রান্ত বিষয়ের পৌর্ব্বাপর্য্য ও সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখার সময়, শক্তি এবং সুবিধা অনেকের থাকে না, লেখকেরও নাই। তবে কালে এই সমস্ত অসংবদ্ধ

চিন্তা-প্রণালীর অন্বেষণ সাহায্যে, কোন যোগ্যতর লেখক, এই দেশের প্রকৃত সমাজ-দর্শন লিপিবদ্ধ করিয়া যাইতে পারিবেন, এই আশাতেই এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

শ্রীশ—

উপনিষদ গ্রন্থাবলী

[ক্রমে প্রধান প্রধান উপনিষৎ সকল পয়ারাদি চির-প্রচলিত ছন্দে সহজভাষায় অনুবাদিত হইলে বঙ্গবাসীর প্রভূত উপকার সাধিত হয়, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া উপনিষৎ গ্রন্থাবলী নাম দিয়া মাণ্ডুক্য এবং কেনো উপনিষদের মর্ম্মানুবাদ প্রকাশ করিলাম। অন্যান্য উপনিষৎ যথাকালে প্রকাশিত হইবে।]

মাণ্ডুক্য।

ওঁকারের সম আত্মা, করহ বিচার ;
আত্মা ব্রহ্ম অদ্বিতীয়, অন্য নাহি আর।
ওঁকার-ই বর্ত্তমান ভূত ভবিষ্যৎ ;
ত্রিকাল অতীত ওঁ, প্রকৃতি বৃহৎ।
আত্মা ব্রহ্ম ; বক্ষ্যমাণ চারি পদ তাঁ'র ;
ব্যবহারে চারি ভাব, সত্যে এক সার।
জাগরিত, স্বপ্নাবস্থ, সুপ্ত তিন ভাব,
চতুর্থে সর্ব্বভাবের অত্যন্ত অভাব।
জাগ্রত ভাবেতে বাহ্য বিষয়ের জ্ঞাতা,
কিম্বা বাহ্য বিষয়ের প্রকাশক, ধাতা।
সপ্ত অঙ্গ, (১) উনবিংশ (২) উপলব্ধি-দ্বার,
স্থূল-ভোক্তা, বিশ্বরূপ,—এই বুঝ সার।
এইত প্রথম পদ। দ্বিতীয় উপাধি
স্বপ্নাবস্থা। দ্বারে সেই একোনবিংশতি,
অঙ্গ সপ্ত। বাহ্যেন্দ্রিয় রুদ্ধ এই কালে,
অন্তর প্রত্যয় মাত্র রহে এই স্থলে।
সূক্ষ্ম বিষয়ের ভোক্তা, তৈজস (১) আকার,
বাসনা-সংযুত প্রজ্ঞা, স্বপ্নেতে আত্মার।
জাগ্রত কি স্বপ্নে-আত্মা, নানাবিধ বোধ
নানাবিধ শোক হর্ষ করিছেন ভোগ।
তৃতীয় চরণ সুপ্তি, বাসনা-বর্জ্জিত,
জাগ্রত-স্বপ্ন-বিহীন-প্রজ্ঞা-অধিষ্ঠিত।
বিভিন্ন বিষয় বোধ, বিভিন্ন বিজ্ঞান,
একীভূত ঘনীভূত রূপে বর্ত্তমান
হয় এই সুপ্তিকালে। এক মাত্র তা'র
চিদানন্দময় ভাব ; জ্ঞান মাত্র দ্বার ;
সুপ্ত ভাবে হয় সর্ব্ব ভোগ পরিহার।
বাহ্য বিষয়ের কিম্বা অন্তর্জগতের,
দ্বৈত জ্ঞান কিম্বা সর্ব্বনাম লক্ষণের
অতীত যখন আত্মা, বিষয় অতীত,
ইন্দ্রিয় অথবা চিন্তা হয় পরাজিত,
তন্মাত্র আশ্রিত, শান্ত, গুণ-চিহ্ন-হীন,
অব্যক্ত যখন আত্মা, আত্মাতে বিলীন,—
সেইত চতুর্থ পদ। আদি, মধ্য শেষ,
ওঁকার সমান তিনি বুঝ সবিশেষ।
অ-কার, উ-কার, আর ম-কারে ওঁকার,
অ-আদি, উ মধ্য, ম শেষ অক্ষর তা'র।
অকার যেমতি সর্ব্ব বর্ণেতে ব্যাপৃত,
আ র যথা সর্ব্ব বর্ণ আদিতে স্থাপিত,
তেমতি জাগ্রত ভাবে আত্মা বিশ্বরূপ,
সর্ব্বভূতে পরিব্যাপ্ত, প্রথম স্বরূপ।
উ-কার মধ্য অবস্থা ; স্বপ্নও তেমন,
জাগ্রত সুপ্তির মাঝে প্রজ্ঞার দর্শন।

(১) স্বর্গ—মূর্দ্ধা, সূর্য্য—চক্ষু, বায়ু—প্রাণ, অন্ন ও জল উদর, আকাশ—মধ্য দেশ, পৃথিবী—পাদ দ্বয়।

(২) পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ বায়ু, মন, বুদ্ধি, অহংকার চিত্ত।

(১) বিষয়-শূন্য বাসনাময়ী প্রজ্ঞাতে বিষয়ী রূপে বিদ্যমান।

ম-কার যেমন শেষ, অ-উ-পরিণতি,
সুপ্তি ও অন্তের ভাব, জানিবে তেমতি।
এ ভাবে নাহিক ভোগ, বোধ বিষয়ের,
শান্ত চিদানন্দ ভাব এই সময়ের;
মাত্রা-শূন্য, নির্গুণ, অচিন্ত্য, সু-শম,
নিত্যানন্দময় আত্মা ওঁকারের সম।
ওঁ হরি। হরি ওঁ। হরি ওঁ।

কেন।

শিষ্য। কেন মন ধায় সদা বিষয়ের প্রতি;
বিষয়ে প্রাণের সদা কেন হয় গতি;
কাহার আদেশ বাক্য কহিছে রসনা;
চক্ষু কর্ণে স্ব স্ব কার্য্যে কা'র প্ররোচনা?
গুরু। চক্ষুর দর্শন যিনি, কর্ণের শ্রবণ,
মনের মানস যিনি, বাক্যের বচন,
যে দেব প্রাণের প্রাণ, সেই মূলাধারে
বুঝি লও ভেদ-বুদ্ধি পরিত্যাগ ক'রে।
চক্ষু কর্ণ মন প্রাণ, শক্তিহীন সব,
সর্ব্বশক্তিমান বীজে কর অনুভব।
চক্ষুর অতীত যিনি বাক্যের অতীত,
মনের অতীত যিনি জ্ঞানের অতীত,
যিনি সর্ব্বভূত শ্রেষ্ঠ, তাঁহার স্বরূপ
শুনিয়াছি আচার্য্যের মুখে এইরূপ।
বাক্যে অপ্রকাশ তিনি বাক্য তাঁহা হ'তে,
তিনি ব্রহ্ম, তাঁরে তুমি বুঝি লও চিত্তে।
যারে উপাসনা কর সেত তিনি নয়,
এই সার কথা সত্য, বুঝিও নিশ্চয়।
মন যাঁরে অসমর্থ করিতে ধারণ,
মনেরে জানেন যিনি নিত্য অনুক্ষণ,
তিনি ব্রহ্ম; কিন্তু যারে কর উপাসনা,
সেত ব্রহ্ম নহে, কর নিশ্চয় ধারণা।
চক্ষু নাহি হেরে যাঁরে, চক্ষু যাঁর তেজে
হেরে বিশ্ব চরাচর নিমেষে সহজে,
তিনি ব্রহ্ম; কিন্তু যারে কর উপাসনা,
সেত ব্রহ্ম নহে, কর নিশ্চয় ধারণা।
কর্ণ নাহি শুনে যাঁরে, যাঁর শক্তি বশে
শব্দ কর্ণমূলে আসি সতত প্রবেশে,
তিনি ব্রহ্ম; কিন্তু যারে কর উপাসনা,
সেত ব্রহ্ম নহে, কর নিশ্চয় ধারণা।
নাসিকা যাঁহারে কভু করেনা আঘ্রাণ,
যাঁহার শক্তিতে নিত্য হয় গন্ধ জ্ঞান,
তিনি ব্রহ্ম, কিন্তু যারে কর উপাসনা,
সেত ব্রহ্ম নহে, কর নিশ্চয় ধারণা।
যদি ভাব ব্রহ্ম তব অতি সুবিদিত
তবে বুঝ নাই কিছু, জানিবে নিশ্চিত।
ব্রহ্মই বিচার্য্য তব, এক মাত্র জ্ঞেয়।
শিষ্য। আমি জানিয়াছি তাঁরে; কি হেতু অজ্ঞেয়
কহেন আচার্য্যগণ সেই সনাতনে?
গুরু। জানি না, বুঝি কি তাঁরে নাহি বুঝি মনে;
নিতান্তই বুঝি না যে তা'ও সত্য নহে,
বুঝি যে, এমন কথা, কার সাধ্য কহে!
জানি না, তবুও জানি, এই কথা যাঁর,
তিনিই সে ব্রহ্ম বস্তু বুঝেছেন সার।
যে জন ভাবেন মনে, বুঝি নাই তাঁরে,
সেই ভাগ্যবান তাঁরে বুঝেন অন্তরে।
যেই জন কহে ব্রহ্ম বুঝিয়াছি আমি,
সে জন কভু না চিনে সেই অন্তর্যামী।
সর্ব্বদর্শী সর্ব্বজ্ঞানময় রূপে তাঁরে
বুঝে যেই, অমরত্ব সেই লাভ করে।
ইহলোকে ব্রহ্ম জানি জনম সফল,
তা না হ'লে পুনঃ পুনঃ গতায়াত ফল।
জ্ঞানীগণ সর্ব্বভূতে পরমাত্মা হেরি,
মুক্ত হন অমরত্ব আশু লাভ করি।
দেবাসুর রণে ব্রহ্ম দেবের সহায়;
তাই দেব জয়ী, দৈত্যে তাই পরাজয়।
কিন্তু দেবগণ ভাবে, "নিজ মহিমায়
অসুরে পরাস্ত করি লভিনু বিজয়।"

দেবের এ দর্প ব্রহ্ম বুঝিলেন মনে,
আবির্ভাব হৈলা আসি দেব সন্নিধানে।
দেবগণ নাহি চিনি সে মহাপুরুষে
অগ্নিরে যাইতে বলে তাঁহার সকাশে।
"জাতবেদ, যাও তুমি, ত্বরা আইস দেখি,
কে এই অতিথি পূজ্য, প্রয়োজন বা কি ?
"তথাস্তু" বলিয়া অগ্নি করিলা গমন,
আগন্তুক পরিচয় জিজ্ঞাসে তখন।
অগ্নি কহে "আমি অগ্নি, আমি জাতবেদা"
অতিথি কহেন, "তবে কি তব ক্ষমতা"!
অগ্নি কহে "পৃথিবীতে আছে যাহা কিছু
সকলি দহিতে পারি, আমি নই পিছু"।
সম্মুখে রাখিয়া তৃণ কহিলা অতিথি
"দগ্ধ করি দেখাও ত কিরূপ শকতি।"
সমগ্র দেহের বল দিয়া হুতাশন
চেষ্টা করি, দহিবারে নারিলা তখন।
লাজে ফিরি অগ্নিদেব কহে দেবগণে
নারিনু চিনিতে আমি অভ্যাগত জনে।
দেবগণ কহে তবে বায়ুরে ডাকিয়া,
"কেবা এই পূজ্য জন আইস দেখিয়া"।
"তথাস্তু" বলিয়া বায়ু করিলা গমন,
আগন্তুক পরিচয় জিজ্ঞাসে তখন।
বায়ু কহে "আমি বায়ু, মাতরিশ্বা আমি,
আকাশে আমার গতি আমি সর্ব্বগামী।"
অভ্যাগত ব্রহ্ম তবে কহিলেন বাণী,
কি তব ক্ষমতা বায়ু দেখাও আপনি।"
বায়ু কহে, পৃথিবীতে আছে যাহা কিছু
উড়া'য়ে লইতে পারি, আমি নহি পিছু।"
সম্মুখে রাখিয়া তৃণ কহিলা অতিথি,
"লওত ইহারে দেখি কিরূপ শকতি।"
সমগ্র দেহের বল প্রকাশি পবন
চেষ্টা করি উঠাইতে নারিলা তখন।
লাজে ফিরি বায়ু আসি কহে দেবগণে,
"নারিনু চিনিতে আমি অভ্যাগত জনে।"
দেবগণ কহে তবে ইন্দ্রেরে ডাকিয়া
"মঘবন্, এই পূজ্যে আইস চিনিয়া।"
"তথাস্তু বলিয়া ইন্দ্র করিলা প্রয়াণ
সম্মুখে আসিলে ব্রহ্ম হৈলা অন্তর্ধান।
তখন হেরিলা ইন্দ্র আকাশের গায় *
স্বর্ণ বর্ণ মহাজ্যোতি সুন্দর শোভায়।
তাঁহারে জিজ্ঞাসে ইন্দ্র, "এবা কোন্ জন
এই ছিলা, এই নাহি পাই দরশন।"
উত্তরিলা সেই জ্যোতি ইন্দ্রের গোচরে,
"ইনি ব্রহ্ম, ইনি ব্রহ্ম, বুঝহ অন্তরে।
ইঁহার প্রসাদে, ইন্দ্র, এই ব্রহ্ম-বলে
দেবাসুর রণে জয়ী হয়েছে সকলে।"
সেই বাক্য শুনি ইন্দ্র বুঝিলা তখন
সর্ব্ব শক্তি মূল ইনি ব্রহ্ম সনাতন।
অগ্নি বায়ু ইন্দ্র ব্রহ্মে প্রথমে হেরিলা,
তাই দেব মধ্যে তাঁরা শ্রেষ্ঠতা লভিলা।
এ তিনের মাঝে ইন্দ্র চিনিলা প্রথমে,
তাই দেবদলে তাঁরে সর্ব্ব দেব নমে।
দেবত্রয় হেরিলেন পলক প্রমাণ,
ব্রহ্মের প্রকাশ তাই বিদ্যুৎ সমান।
সাধকের চির বাঞ্ছা ব্রহ্ম পদে মতি,
ব্রহ্ম পদে মন যেন সদা হয় গতি।
ভজনীয় নাম তাঁর, সদা সেই পদে
পূজিবে মানব হৃদে ভক্তি কোকনদে।
স্থির শান্ত দেহ মন ইন্দ্রিয় নিচয়,
কর্ম্ম বেদ বেদ-অঙ্গ, এই সমুদয়,
ব্রহ্ম জ্ঞান পথে নিত্য ইহাই আশ্রয় ;
সত্য সনাতন ব্রহ্ম তিনি সত্যময়।

শ্রীশশধর রায়।

* মতান্তরে—তখন হেরিলা ইন্দ্র আকাশের গায়, নারী মূর্ত্তি হৈমবতী সুন্দরী উমায়।

সম্রাট নেপোলিয়ন্ ও আকবর

এ জগতে সকলেই কেন প্রধান যোদ্ধা, লেখক বা বক্তা হয় না? সকলেই দুই হস্ত-পদ-বিশিষ্ট মনুষ্য; তবে একজন অন্যের অপেক্ষা কোন কোন বিষয়ে সম্পন্ন বা হীন হয় কেন? এ প্রশ্নের উত্তর সহজ নহে। অদৃষ্টবাদী বলিবেন "ইহাইত অদৃষ্ট"! কেহ বলিবেন "কর্ম্মফল!" যাঁহারা এ সমস্ত কিছুই স্বীকার করেন না, তাঁহারা নানা অর্থশূন্য বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিবেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, ইহা একটী প্রাকৃতিক নিয়ম। প্রাণী ও জড় জগতের ভিতর শক্তির যথেষ্ট তারতম্য দেখা যায়। মনুষ্যের ভিতর যেমন কেহ কেহ অমিত শক্তিশালী, জড় জগতের ভিতরেও তাহার প্রচুর প্রমাণ রহিয়াছে। 'ইহাই সৃষ্টি-রহস্য' ভিন্ন বোধ হয় অন্য কোন সদুত্তর খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। মহাবীর নেপোলিয়ন ও আকবর এই সৃষ্টি-রহস্যের দুইটী ফল।

যখন কর্সিকা-বাসীরা (Corsica) ফরাসীদের অধীনতা-জাল ছিন্ন করিতে দৃঢ়-সঙ্কল্প হইয়াছে; স্বদেশপ্রেমিক বীর Pasquale de Paoli র জ্বালাময়ী উৎসাহ বাক্য সমগ্র কর্সিকেন্‌দিগকে স্বদেশের জন্য উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছে; আর তাহারা কাহারও অধীনে থাকিবে না, Paoli প্রভৃতি মহাত্মাদের শাসন-নীতিই তাহাদের স্বদেশ সংরক্ষণের পক্ষে যথেষ্ট হইবে, ইত্যাদি ভাব কর্সিকার প্রত্যেক বালুকণাতেও প্রবেশ করিয়াছে—তখন নেপোলিয়ন সবে মাত্র কৈশোরে পদার্পণ করিয়াছেন। কিন্তু স্বদেশে সেই ঘোর দুর্দ্দিনের সময় হইতেই তাঁহার প্রাণে একটী নিরবচ্ছিন্ন আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হইতেছিল। প্রথমবার স্বদেশবাসীদের সহিত মিলিত হইয়া ফ্রান্সের সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে অগ্রসর হওয়ার সময় যে তাঁহার মনে অধীশ্বর হইবার আকাঙ্ক্ষা ছিল না, তাহা কে বলিবে! নানা ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে নেপোলিয়নের স্রোত ভিন্ন পথে ধাবিত হইল, স্বদেশে স্বীয় মনোরথ ব্যর্থ হওয়ায় তিনি ফ্রান্সে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। যদিও ইতিপূর্ব্বে স্বদেশের আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতিই তাঁহার নিকট অধিক প্রিয় ছিল, কিন্তু নানা কারণে এখন ফ্রান্সের সহিত তাঁহাকে বাধ্য হইয়া আত্মীয়তা করিতে হইল। ইহা যে কতকটা স্বার্থ-মিশ্রিত, তাহার বহু প্রমাণ আছে। স্বদেশে তাঁহার স্থান না হওয়ায় ফ্রান্সই তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের লীলাভূমি হইয়াছিল; তিনি ফ্রান্সকে আপনার সাহায্যে আনিবার জন্যই ইহার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিয়াছিলেন। তিনি সামান্য সামরিক কর্ম্মচারী হইতে কিরূপে ফ্রান্সের রাজদণ্ড হস্তে লইয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসজ্ঞ মাত্রেই অবগত আছেন; সে সমস্ত বিষয় বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করিবার স্থান বা প্রয়োজন এখানে নাই। যতই তাঁহার পদ বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই তাঁহার শক্তির বিকাশ ও আকাঙ্ক্ষা উচ্চ হইতে উচ্চতর মার্গে ধাবিত হইতে লাগিল। সমস্ত ফরাসী তাঁহার জয়োদৃপ্ত প্রতিভার নিকট মস্তক অবনত করিল। ইউরোপের আকাশে তিনি যেন একটী সূর্য্য হইয়া

শোভা পাইতে লাগিলেন। ইহাই প্রকৃতির অন্তর্নিহিত মানবী শক্তি। প্রবল স্রোতের সম্মুখে হস্ত রক্ষা করিলে যেমন স্রোত হস্তকে দূরে রাখিয়া বা ডুবাইয়া বহিয়া যায়, এই শক্তিও বাধা প্রাপ্ত হইলে রুদ্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তৃণের ন্যায় ভাসাইয়া লইয়া যায়! তখনই ইহা—"ঐশি শক্তি; ইহা অমানুষিক"।

১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে, নেপোলিয়ন বহু চেষ্টার পর ফ্রান্সের ভাগ্য-বিধাতা—সম্রাট হইলেন। যদি এইখানেই তাঁহার আকাঙ্ক্ষার শেষ হইত,তাহা হইলে পৃথিবীতে আজ তাঁহার এই নাম-মাহাত্ম্য হইত কিনা সন্দেহ। তিনি এই সর্ব্বোচ্চ সম্মান ও অধিকারেও সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না,—নেপলস্, স্পেইন্, হোলণ্ড প্রভৃতি দেশের রাজ সিংহাসনে তাঁহার ভ্রাতাদিগকে বসাইলেন। সমস্ত ইউরোপ তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। তখন ফরাসী সৈন্যের বিপুল বাহিনীর সম্মুখে দাঁড়ায় কাহার সাধ্য! এক টুকরা চুম্বক যেমন তাহার পার্শ্বের লৌহ খণ্ডগুলিকে আপনার দিকে টানিয়া লয়, সমস্ত ফরাসী সৈন্যও সেই মহাবীরের শৌর্য্য, বীর্য্য ও ক্ষিপ্রকারিতায় আকৃষ্ট হইয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহারই করতলগত হইল। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত 'ওয়টার লিজের' ক্ষেত্রে অষ্ট্রিয়ান্‌দিগকে, ১৮০৬ খ্রীঃ জুনার যুদ্ধে প্রাসিয়ানদিগকে এবং ১৮০৭ খ্রীঃ রুসিয়াকে পরাজিত করিলেন। ইহাতেও তাঁহার সমর-পিপাসা মিটিল না;—অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল! সমস্ত ইউরোপ তাঁহার শাণিত অস্ত্র, অদ্ভুত সমর-নীতি ও অদম্য আকাঙ্ক্ষা সহ্য করিতে না পারিয়া, ১৮১৩ খ্রীঃ ইংলণ্ড, অষ্ট্রিয়া, রুসিয়া ও প্রাসিয়া পরস্পরে বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হইয়া, সেই মহাপ্রলয়কারী বেগ খর্ব্ব করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইল। এদিকে নেপোলিয়নের সৈন্য সামন্তেরা অবিরাম যুদ্ধ করিতে করিতে ক্রমে যুদ্ধ-ক্লিষ্ট হইল। কাহারও কাহারও ভিতর অসন্তোষের চিহ্ন দেখা দিল। তাহারা বুঝিল যে, সমগ্র জীবন যুদ্ধে অতিবাহিত করা মানব জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য নহে। ধীরে ধীরে ফ্রান্সের বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ অবিরাম যুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া অদূরে স্বদেশের ভাবী পতন-ছায়া দেখিতে পাইলেন। রাজকোষে অর্থের অনাটন হইল। সমস্ত ফ্রান্সে নেপোলিয়নের সমর-পিপাসার বিপক্ষে একটা প্রবল অসহিষ্ণুতার স্রোত ফল্গু নদীর ন্যায় প্রবাহিত হইতে লাগিল। কেন না, মহাবীরের ভয়ে কেহই রাজকীয় কার্য্যের প্রতিকূলে দাঁড়াইতে সাহস করিল না। ১৮১২ খ্রীঃ নেপোলিয়ন বহু সৈন্য সামন্ত লইয়া রুষ বিজয় করিতে যাত্রা করিলেন। সেই যাত্রাই তাঁহার পতনের আর একটী প্রধান কারণ হইল। Borodino র ঘোরতর যুদ্ধের পর নেপোলিয়ন মস্কো নগরে প্রবেশ করিলেন। রুষগণ, সেনাপতি ডিউক অফ্ ওয়েলিংটনের উদাহরণ অনুসরণ করিয়া, মস্কো নগরীতে অগ্নি সংযোগ করিয়া দিল—মস্কো ভস্মে পরিণত হইল! শীতে,অনাহারে, রোগে নেপোলিয়নের বহু সৈন্যক্ষয় হইল। এমন কি, রুষ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করাই তাঁহার কঠিন কার্য্য হইল। বহু সৈন্যক্ষয়, নানা যন্ত্রণা ভোগ করিয়া, সেই বিপুল বাহিনী ৪০০,০০০ সৈন্যের মধ্যে কেবল মাত্র ২০,০০০ জন ছিন্ন বস্ত্র, শীর্ণ দেহে প্রায় অর্দ্ধ মৃতাবস্থায় ফ্রান্সে ফিরিল!

এবার ফরাসীরা তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিতে পারিল না। ক্রমেই তাঁহার সৌভাগ্য-দীপ নিবিয়া আসিতেছিল,—এই ভীষণ পরাজয়ে এখন অনেকেই স্পষ্ট ভাবেই তাঁহার কার্য্যে অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল। অবশেষে ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এলবাদ্বীপে বন্দীরূপে প্রেরিত হইলেন! কিন্তু আবার ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে এলবা হইতে পলায়ন পূর্ব্বক তাঁহার ফ্রান্সে আগমন-বার্ত্তা প্রচারিত হইলে সমগ্র ইউরোপবাসী ভয়ে ও নানা ভাবী দুর্ঘটনার সম্ভাবনায় উদ্বিগ্ন হইল! দীপ নির্ব্বাণের পূর্ব্বে আর একবার শিখা প্রজ্জ্বলিত হইল—ফরাসী সৈন্য "সম্রাটের জয় হউক" শব্দে দিগন্ত কাঁপাইয়া আবার তাঁহাকে বেষ্টন করিল।

তার পর সেই ভীষণ ওয়াটারলুর সমর ক্ষেত্রে নেপোলিয়নের জীবনের শেষ অধ্যায়। সেনাপতি ওয়েলিংটন, ওয়াটারলুর ক্ষেত্রে নেপোলিয়নকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। সেই সময় ফ্রান্সের অবস্থা, ফরাসীদের মানসিক ভাব এবং নেপোলিয়নের সেনাধ্যক্ষদের চাতুরীতে মহাবীরের হৃদয় ঘোর অশান্তিতে ভাঙ্গিয়া পড়িল। বিশেষতঃ যুদ্ধের সময় তিনি পূর্ব্বের ন্যায় প্রকৃতিস্থ ছিলেন না। তবুও অল্প সংখ্যক বিশ্বাসী সৈন্য লইয়া ওয়েলিংটনকে প্রায় পরাজয় করিয়াছিলেন; কিন্তু সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় প্রুসিয়ার সৈন্য আসিয়া যোগদান করিলে পর নেপোলিয়নের সৈন্যগণ চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। এত দিনের পর সমগ্র ইউরোপের সমবেত চেষ্টা ফলবতী হইল! বহু বৎসরের পর ইউরোপে অবিরাম নরশোণিত-পাত কিছু দিনের জন্য ক্ষান্ত হইল! ইউরোপের ইতিহাস আর এক মূর্ত্তিতে গঠিত হইল! নেপোলিয়ন ফ্রান্সে আসিয়া ফরাসীদের নিকট নিষ্ফল সাহায্য যাচ্ঞা করিলেন। অবশেষে সমস্ত ইউরোপের শঙ্কা উৎপাদক সেই সমর-সিংহ নিরুপায় হইয়া আত্ম সমর্পণ করিলেন! এই বার বহু প্রহরী বেষ্টিত হইয়া তিনি সেণ্ট্ হেলেনা দ্বীপে চির নির্ব্বাসিত রূপে প্রেরিত হইলেন! ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর দিন ভয়ানক ঝড় ও বৃষ্টিতে সমস্ত দ্বীপটী টলমল করিতেছিল, একজন কবি জ্বলন্ত ভাষায় তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

(১)

—"Wild was the night, yet a wilder night
Hung round the soldier's pillows;
In his bosom there raged a fiercer fight
Than the fight on the rathful billows.

(২)

A few fond mourners were kneeling by
The that his stern heart cherished;
They knew by his glazed and unearthly eye
That life had nearly perished." & &.
(M 'Lellan)

১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে হুমায়ুন বাদসাহের মৃত্যু হয়। তিনি পারস্য রাজ সা-তমাসের আনুকূল্যে—১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দে কান্দাহার এবং ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে কাবুল জয় করেন। তৎপর লাহোর বিজয় করিয়া দিল্লি ও আগ্রা হস্তগত করেন। হুমায়ুনের মৃত্যুর সময় আকবর কেবল মাত্র চতুর্দ্দশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন। এই অল্প বয়সে পিতৃহারা হইয়া তিনি যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন; কিন্তু স্বীয় মানসিক শক্তি প্রভাবে এই কৈশোরেই নানা বাধা বিঘ্ন উত্তীর্ণ হইতে লাগিলেন। তখনও, দিল্লির সিংহাসন কাহার করায়ত্ব হইবে, তাহার স্থিরতা নাই। ভারতবর্ষে মুসলমানদের পূর্ব্বাধিকৃত বহু রাজ্য আবার মস্তকোত্তলন করিতেছে। মহম্মদ আলি সাহের প্রধান হিন্দু সেনাধ্যক্ষ হামু, দিল্লির তাৎকালিক

শাসনকর্ত্তা তরদিবেগকে পরাভূত করিয়া আকবরের উচ্ছেদ সাধন কল্পে লাহোর যাত্রা করিয়াছে। বলিতে গেলে, ভারত এক মহা অরাজকতার লীলা-ক্ষেত্র হইয়াছে—ভারত-লক্ষ্মী কাহার প্রতি প্রসন্না হইবেন, তাহার নিশ্চয়তা নাই। আকবর জীবনের সেই প্রথম বিপদে কেবল মাত্র নিজের সাহস ও পিতৃবন্ধু বৈরাম খাঁর উৎসাহে বলবান হইয়া অতিশয় সাবধানে হামুকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। হামু যুদ্ধে পরাজিত, বন্দী এবং হত হইল। রাজত্বের প্রারম্ভেই এইরূপ বিপদাক্রান্ত হইয়াও আকবর যথেষ্ট সহিষ্ণুতা ও চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়াছেন। ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নিজ হস্তে সমস্ত শাসন ভার গ্রহণ করিলেন। ইহার কিছু পরেই আজমীর ও গোয়ালিয়র জয় করেন। তাঁহার গ্রহ-বৈগুণ্যে বৈরাম খাঁ, সেনাপতি খাঁন জামন এবং আদম খাঁ বিদ্রোহী হইল। আকবর অসীম সাহস ও কৌশলে তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া, ভারতের নানা স্থানে বিদ্রোহিতার অগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে লাগিলেন। তিনি কর্ম্ম-জীবনের প্রাক্কালেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, দ্বিগ্বিজয়ের দ্বারা ভারতবর্ষে আপনার শক্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া জাতি নির্ব্বিশেষে, ন্যায় ও ধর্ম্মানুমোদিত শাসন-দণ্ড-হস্তে ভারত শাসন করিতে না পারিলে দিল্লির সিংহাসন নিরাপদ হইবে না। ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে চিতোরের প্রায় সমস্ত অংশই অধিকার করেন। ফেরেস্তা বলেন—"সেই যুদ্ধে প্রায় ১০,০০০ রজপুত বীর নিহত হইয়াছিল।" ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে আকবর গুজরাট অধিকার করেন; এই যুদ্ধে তাঁহাকে বহু বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। তাহার পরই বঙ্গ বিজয় যাত্রা। বহুদিন হইতেই বাঙ্গালায় পাঠানদের শক্তি বদ্ধমূল হইয়াছিল। হুমায়ুন, বঙ্গ ও বিহার জয় করিতে আসিয়া সের সাহের হস্তে পরাজিত হন। বলিতে গেলে এই সের সাহই হুমায়ুনকে শক্তিশূন্য করিয়া ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইয়া দেয়। যতগুলি মুসলমান বিজেতা বঙ্গদেশের শাসন দণ্ড ধারণ করিয়াছিল, এক আলিবর্দ্দি খাঁ ব্যতীত সের সাহই তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহাঁর প্রকৃত নাম ফরিদ। জাতিতে আফগানবাসী পাঠান। ইনি পনের বৎসর কাল যুদ্ধ করিয়া ১৫৪১ খ্রীষ্টাব্দে আগ্রার রাজ সিংহাসন অধিকার করেন। সের সাহের মৃত্যুর পর হইতে আকবরের বঙ্গ বিজয় পর্য্যন্ত চারি জন রাজা বঙ্গে রাজত্ব করেন। ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে তেলিঙ্গ মুকুন্দ দেব উড়িষ্যার রাজা হন। ইনিই উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নরপতি। তখন বাঙ্গালার শাসন কর্ত্তা বা রাজা সলিমন উড়িষ্যা জয় করিতে তাঁহার সেনাপতি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কালাপাহাড়কে প্রেরণ করেন। কালাপাহাড়ের ভীষণ অত্যাচার ও জগন্নাথ দেবকে লুক্কাইত স্থান হইতে আনিয়া অর্দ্ধদগ্ধ করিয়া নদীতে ভাসাইয়া দিবার কাহিনী মনে পড়িলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে! কথিত আছে, কালাপাহাড় ব্রাহ্মণ ছিল, পরে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দু দেব দেবীর উপর যথেষ্ট অত্যাচার করে। ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে সলিমনের মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র দায়ুদ খাঁ পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে আকবর দায়ুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া বাঙ্গালা জয় করিতে যাত্রা করেন। মৈনাম খাঁ ও টোডর মল্লের কৌশলে দায়ুদ পরাজিত এবং সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করেন। কিন্তু সেনাপতি মৈনামের মৃত্যুর পরই দায়ুদ আবার

স্বীয় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। অবশেষে রাজ মহলের নিকটে দায়ুদ আকবর সৈন্য কর্ত্তৃক পরাজিত হন এবং তাঁহার মস্তক আকবরের নিকট প্রেরিত হয়!!! দায়ুদের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গালার প্রকৃত পক্ষে আফগান-শক্তি লোপ পায়। ইহার পর কতলু খাঁ প্রভৃতি কেহ কেহ স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিলেও, মোগল সৈন্য কর্ত্তৃক পরাজিত হয়। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালা ও বেহার এবং ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে কাবুল, মোগল সাম্রাজ্য ভুক্ত হয়। তারপর কাশ্মীর, সিন্ধু, ও দাক্ষিণাত্যের বহু স্থান আকবর কর্ত্তৃক অধিকৃতহয়। কিন্তু আকবরের ন্যায় পরাক্রমশালী সম্রাট, সেই স্বদেশপ্রাণ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অমিত-তেজ-সম্পন্ন, নরসিংহ প্রতাপকে কিছু দিনের জন্য রাজ্যচ্যুত করিলেও বশ্যতা স্বীকার করাইতে পারেন নাই। প্রতাপের ন্যায় এত স্বার্থত্যাগ, দৃঢ়তা, স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি ভালবাসা দেখাইতে আর কেহ পারিয়াছেন কি না, জানি না। তাঁহার সহিষ্ণুতা এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, এই দাসত্বপ্রাণ বাঙ্গালী কি আপনাদের কর্ম্মময় জীবনে কতক পরিমাণেও আদর্শ রূপে গ্রহণ করিতে পরিবে? এতবড় সম্রাট আকবর—যাঁহার অসি ও প্রখর বুদ্ধির প্রভাবে কাবুল হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত থরথরি কাঁপিতেছিল, ক্ষুদ্র দেশের অধীশ্বর, স্বরাজ্য হইতে তাড়িত, নিঃস্ব, অল্প সর্দ্দার বেষ্টিত রাণা প্রতাপকে কিছুতেই আয়ত্ত করিতে পারিলেন না! আকবরের জীবদ্দশাতেই প্রতাপ মেওয়ার পুনরুদ্ধার করিয়া উদয়পুরে নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। শারীরিক বল অপেক্ষা মানসিক শক্তি যে কত বৃহৎ ও কার্য্যকরী, প্রতাপই তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। ৫০ বৎসর কাল পর্য্যন্ত বহু সমর ও শান্তির পর দিল্লির ঈশ্বর আকবর ইহলীলা সম্বরণ করেন। যদি তাঁহার পুত্র আরঙজেব Divide and Rule কে অনুসরণ না করিয়া, আকবরের রাজনীতি অবলম্বন করিতেন, তাহা হইলে অত শীঘ্র মোগলদের পতন হইত না।

নেপোলিয়ন ও আকবর উভয়েই সম্রাট ছিলেন। উভয়েই বাল্যাবস্থা হইতে নানা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া পরে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। পৃথিবীতে যে অধিক ক্ষমতাশালী হয়, কোথা হইতে নানা বিপদ তাহাকে বেষ্টন করে; কিন্তু এই সমস্ত বাধা বিঘ্ন কিছুতেই তাহাকে গন্তব্য পথ হইতে স্খলিত করিতে পারে না; বরং ইহাতে তাহার শক্তি দ্বিগুণিত হয়। আকবর ও নেপোলিয়ন উভয়েই বিদেশে আপনাদের প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। নেপোলিয়ন যেমন ফ্রান্সকে আপনার করিতে চাহিয়াছিলেন, আকবরও তেমনি, ভারতের উন্নতি ও তথায় একছত্র রাজত্ব কামনা করিতেন। উভয়েই যুদ্ধ-বিশারদ এবং বুদ্ধিমান ছিলেন। কিন্তু উভয়ের লক্ষ্য ভিন্ন পথে ধাবিত হইয়াছিল। নেপোলিয়ন অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং সমর-প্রিয় ছিলেন। ফ্রান্সকে তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে ভালবাসিতেন কি না, সন্দেহ-স্থল। তিনি অতি প্রথমেই জন্মভূমিতে স্বীয় প্রভুত্ব স্থাপনে বিফল হইয়া ফ্রান্সে আশ্রয় গ্রহণ করেন। নেপোলিয়ন-শক্তি যেন প্রজ্জ্বলিত অগ্নির ন্যায় ছিল; শত চেষ্টায়ও সেই শক্তি অসময়ে কেহ নির্ব্বাণ করিতে পারে নাই, বোধ হয়, তাহা প্রকৃতির স্বভাব-বিরুদ্ধ। অগ্নি যেমন আপনার স্বধর্ম্ম অনুসারে জ্বলিতে জ্বলিতে একটী

নির্দ্দিষ্ট সময়ে ভস্মে পরিণত হয়, নেপোলিয়নের জীবনেও তেমনি তাহা ঘটিয়াছিল। যতদিন তাঁহার ভিতর সেই তেজ ছিল, ততদিন তাঁহাকে সর্ব্বত্র অজেয় ও অমর দেখিয়াছি। কিন্তু তাঁহার এক উৎকট আত্মোন্নতির চিন্তা ভিন্ন জীবনে আর কোন সদুদ্দেশ্য ছিল বলিয়া মনে হয় না। ওয়টারলুর যুদ্ধের পরই সেই মহাবীরের মহাতেজ কোথায় অন্তর্হিত হইল! তিনি পলায়নে অপারক হইয়া ইংরাজের হস্তে আত্ম সমর্পণ করিলেন। তখন তাঁহার কার্য্য ও বাক্য লক্ষ্য করিলে মনে হয় না যে, এই বীরই একদিন সমস্ত ইউরোপের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া এত অমানুষিক কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি যদি প্রকৃতই ফ্রান্সের হিতাকাঙ্ক্ষী হইতেন, তাহা হইলে কি আর ফ্রান্সের মঙ্গলের দিকে না চাহিয়া অবিরাম যুদ্ধ দ্বারা ফ্রান্সকে দরিদ্র ও নিষ্পেষিত করিতে পারিতেন? তিনি আকবরের ন্যায় বিবেচক সাম্রাজ্য-স্থাপয়িতা ছিলেন না। যুদ্ধই যেন তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছিল। হানিবল, জুলিয়স সীজর ও আলেকজেণ্ডারের কথা ছাড়িয়া দিলে, নেপোলিয়নের মতন বীর আর জন্ম গ্রহণ করিয়াছে কি না, সন্দেহ। পূর্ব্বোক্ত বীরেরা নেপোলিয়নের ন্যায় সমর-নীতি-বিশারদ ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। এ কথার সমর্থনে একজন প্রসিদ্ধ ইংরাজ-লেখক Encyclopedia Britanicaয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"Of all great rulers of the world none has been by breeding so purely a military specialist."

আকবর অপেক্ষা নেপোলিয়ন সমরনীতি ও ক্ষিপ্রকারিতায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু অবিরাম যুদ্ধের দ্বারা পৃথিবীতে কেহ সম্পূর্ণ রূপে লাভবান এবং পৃথিবীর হিতসাধন করিতে পারে নাই। যে ফ্রান্স নেপোলিয়নকে চিরপ্রসিদ্ধ করিয়াছে, তাহার পরিবর্ত্তে নেপোলিয়ন সে ফ্রান্সের কি উন্নতি করিয়াছিলেন? যে ভারত আকবরকে আশ্রয় দিয়াছিল, আকবর সেই ভারতের অনেক হিতসাধন করিয়াছিলেন,—ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিবে। এত যুদ্ধ করিলেও নেপোলিয়নের হৃদয় দয়ামায়া-শূন্য ছিল না—

"The character of Napolean" says Bourrienne "was not a cruel one. He was very fond of children, and a bad man has seldom that disposition."

বহুকার্য্যে তাঁহার হৃদয়ের উন্নত ভাব প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি বলিতেন—

"The English have represented me as a monster of cruelty. A man is known by the treatment of his wife, of his family and of those under him." (Abbott)।

তিনি মাতৃভক্ত ছিলেন। যদিও কঠোর রাজনৈতিক ব্যাপারে ও সাম্রাজ্য-পিপাসার অনুরোধে তিনি পত্নী জোসেফাইনকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তথাপি জোসেফাইনের প্রেম আজীবনই তাঁহার হৃদয়ে জাগ্রত ছিল, মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেও 'জোসেফাইনের' নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার চারিত্র অতি নির্ম্মল ছিল; এ বিষয়ে আকবরের একটু দুর্নাম শুনা যায়। আকবরের ন্যায় তাঁহারও ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল।

কত যুগ, কত শতাব্দী চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু মহাপুরুষদের জীবনী চিরকাল জীবিত থাকিবে। ইহা অক্ষয়, অমর। যতই দিন চলিয়া যাইতেছে, ততই যেন মহাপুরুষদের জীবনী আরও স্পষ্ট, আরও উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র।

মহাভারতের নাস্তিক।

আস্তিকতা এবং নাস্তিকতা, আলোক এবং অন্ধকারের মত চিরকালই হয়ত এক-সঙ্গেই বাস করিতেছে। একালে নাস্তিক-তার অর্থ ঈশ্বরে অবিশ্বাস; কিন্তু অতি প্রাচীনকালে ঠিক এই অর্থে কথাটার ব্যব-হার ছিল না। যাহা অদৃষ্ট বা অদৃশ্য এবং যাহার কথা বেদাদিতে প্রতিপাদিত, তাহার প্রতি অবিশ্বাসের নামই নাস্তিকতা ছিল। একজন ঈশ্বর মানিত, কিন্তু পরলোক মানিত না, সেও নাস্তিক নাম পাইত। তাহার পরে আবার দেখিতে পাওয়া যে, যে ব্যক্তি ঈশ্বর এবং পরলোক লইয়া সন্দেহ-সূচক মতবাদ প্রচার করিত, কিন্তু স্বীয় মতবাদের প্রমাণের জন্য বেদকেই অবলম্বন করিত, সে আস্তিক নাম পাইত। যে বেদ অগ্রাহ্য করিত, তাহার নাম হইত নাস্তিক। ঐ উভয় অর্থেই নাস্তিক শব্দ মহাভারতে পাওয়া যায়। শান্তি-পর্ব্বের দ্বাদশ অধ্যায়ের ৫ম শ্লোক আছে,—বেদবাদাপবিদ্ধাংস্তু তান্ বিদ্ধি ভৃশনাস্তিকান্। ঐ পর্ব্বের ২৭০ অধ্যায়ের ৬৭ শ্লোকেও ঐ অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়।

যাঁহারা বেদবিহিত ক্রিয়া করেন না, ব্রাহ্মণকে দান করিবার সময় "নাস্তি" বলেন, তাঁহারাও মহাভারতে নাস্তিক বলিয়া অভি-হিত। এ অর্থটা পূর্ব্ব অর্থেরই অনুগামী; এইজন্য এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই।

নাস্তিক অর্থে মহাভারতে পাষণ্ড শব্দ পাওয়া যায়। (সভা, ৩১ অ ১০; বন, ১৯১ অ, ১০; শান্তি, ১৮০, ৪৭—৪৮; অনুশা—২৩অ, ৬৭ ও ৭২; ইত্যাদি)। এই পাষণ্ড শব্দটা সংস্কৃত নহে; এটা দেশী-শব্দ। মহাভারত এবং রামায়ণে সংস্কৃত ব্যতীত দেশী-শব্দেরও ব্যবহার আছে বটে; কিন্তু অত্যন্ত অল্প। এই নিন্দা এবং ক্রোধ-বাচক দেশী-শব্দটার প্রতি লক্ষ্য করিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এই শব্দটী বৌদ্ধ এবং জৈনদের অভিধা। পরবর্ত্তী সময়ে যে বৌদ্ধদের নাম করিতে হইলেই মুণ্ডিত-মস্তক, কষায়-ধারী, পাষণ্ড বলা হইয়াছে, তাহা বাণভট্ট, দণ্ডী প্রভৃতি কবিদিগের গ্রন্থে ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। তথাপি ঐ শব্দটা দ্বারা যে মহাভারতের সময়েও কেবল বৌদ্ধ জৈন প্রভৃতি অভিহিত হইয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায় না। ঐ যুগে বৌদ্ধ জৈনাদি ছিল না, তাহা নহে। অনেক স্থানে তাহাদের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করা হই-য়াছে; সে কথা পরে দেখাইতেছি।

নাস্তিক-বর্গে যে লোকায়ত বা লোকায়-তিক পাওয়া যায় (আদি, ৭০ অ, ৪৬), তাহাও বৌদ্ধদের নাম নহে। কারণ ঐ কথাটা হইতে বরং নাস্তিক শব্দের অতি প্রাচীন অর্থই সূচিত হয়। মহাভারতে যে চার্ব্বাকের কথা আছে, তিনি যখন ব্রাহ্মণ পরিব্রাজের বেশধারী, অথচ তাহা নাস্তিক, তখন তিনিও বৌদ্ধ নহেন। মাধবাচার্য্যের সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে অতি সরল ভাষায় ইহাদের বর্ণনা আছে। প্রবাদ যে, এই শ্রেণীর নাস্তিকতার উৎপত্তি বৃহস্পতি হইতে। অর্ব্বাচীন যুগের গ্রন্থে যাহাই থাকুক, মহা-ভারতে কিন্তু বৃহস্পতি নাস্তিক নহেন।

তিনি অর্থ-শাস্ত্র-প্রণেতা (অনুশা—৩৯ অ, ১০), এবং পূজ্য গুরু বা শিক্ষক (শান্তি, ৩২৫ অ, ২৩)।

মহাভারতে বহুবিধ শ্রেণীর নাস্তিকের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। শান্তিপর্ব্বের ১৯ অধ্যায়ের ২৩ শ্লোকে "হেতুমন্তাঃ" পণ্ডিতগণকে নাস্তিক বলা হইয়াছে। ইহারা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে না, এবং বৃথা তর্কজালে জড়িত হইয়া যথার্থ তত্ত্ব লাভ করিতে পারে না। উহারা বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও সূক্ষ্মদর্শন বিহীন; এবং কেবল পাণ্ডিত্যের অভিমানে আপনাদিগকে বাক্‌পটু বলিয়া প্রচার করিয়া, মোক্ষধর্ম্মের নিন্দা করিয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া থাকে। একালে এই শ্রেণীকে Rationalist বলা যাইতে পারে। এই "বাবূদুকা বহুশ্রুতাঃ" পণ্ডিতেরা যাজ্ঞিক ক্রিয়া-কলাপের যথার্থ ব্যাখ্যা সম্বলিত "পূর্ব্বশাস্ত্র" (পূর্ব্বমীমাংসা) অগ্রাহ্য করে। "একান্তব্যাদাস" শব্দে আত্মার একত্ববাদ-বিরোধী নাস্তিক সূচিত হইয়াছে।

যে সকল স্থলে অতি পরিষ্কারভাবে মুণ্ডিত-মস্তক, কষায়ধারী অথবা দিগম্বর, নাস্তিক পাষণ্ডগণের উল্লেখ আছে, সেস্থলে যে বৌদ্ধ এবং জৈনদিগের প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ করা চলে না। সাবধানতার জন্য একটী কথা বলিয়া লই। দিগম্বর হইলেই যে জৈন হইবে, একথা ঠিক নহে; শৈব-সন্ন্যাসীগণও দিগম্বর বলিয়া উল্লিখিত দেখিতে পাই। অশ্বমেধ-পর্ব্বের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে বারনসী নগরে শিব দর্শনের জন্য, সংবর্ত্ত দিগম্বর হইয়া উন্মত্তের মত ভ্রমণ করিতেছেন বলিয়া লিখিত আছে। "চংক্রমীতি দিশঃ সর্ব্বা দিগ্বাসা মোহয়ন্ প্রজাঃ", এবং "উন্মত্তবেশং বিভ্রৎ স চংক্রমীতি যথাসুখং", পড়িলে সহসা জৈন বলিয়া ভ্রম হয় বটে, কিন্তু উঁহাকে শিবদর্শনের জন্য বারনসীতে দেখিয়াই ভ্রম দূর হয়। শোক এবং দুঃখের সময়ে আর্য্যেরাও যে কষায়বাস পরিতেন, তাহা নলোপাখ্যানে দেখিতে পাই। বৌদ্ধেরা রক্তপট্ট এবং পীতপট্ট-পরিত, এবং ঐ পরিচ্ছদ ঘৃণিত, বলিয়াও উল্লেখ পাওয়া যায়; কিন্তু উহা দ্বারাই শেষ মীমাংসা হয় না।

কিন্তু শান্তিপর্ব্বের ১৮ অধ্যায়ের ৩২ শ্লোকে, ১৬৭ অধ্যায়ের ৪৬ শ্লোকে এবং ১৬০ অধ্যায়ের ৩৩ শ্লোকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বৌদ্ধ ও জৈনদিগকে নাস্তিক বলা হইয়াছে। উহারা বেদপরিত্যাগী, মুণ্ডিত-মস্তক, পীতপট্টধারী এবং ভিক্ষুব্রতাবলম্বী (১৮ অধ্যায়) উহাদিগকে "নির্ব্বাণ" প্রার্থী এবং বৌদ্ধ বলিয়া ১৬০ এবং ১৬৭ অধ্যায়ে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। নির্ব্বাণ কথাটা মহাভারতে মোক্ষ অর্থে কোথাও ব্যবহৃত আছে বটে, কিন্তু তাহাতে এই পরিষ্কার উল্লেখটা চাপা পড়ে না। নির্ব্বাণের বিশেষ অর্থটা সাধারণ মুক্তি অর্থে পরিণত হইতে অনেক সময় লাগিয়াছিল; ইহাও স্মরণ করা উচিত।

"স্বভাবং ভূতচিন্তকাঃ" নামে যাহারা উল্লিখিত,তাহাদিগকে একালের Materialist নামে ঠিক অভিহিত করা যাইতে পারে। "বহুত্বং" বাদীদিগকে নীলকণ্ঠ পরমাণুবাদী (বৈশেষিক ?) বলিয়াছেন। কিন্তু কণাদের নাম হরিবংশ ভিন্ন মূল মহাভারতে খুঁজিয়া পাই নাই।

যাহারা "আক্রোষ্টাচাভিবক্তাচ ব্রহ্ম বাক্যেষু চ দ্বিজান্", তাহারা "মূর্খাঃ পণ্ডিতমানিকাঃ" বলিয়া নিন্দিত। এই

শ্রেণীর হৈতুক এবং তার্কিক বেদনিন্দুকেরা শৃগাল হইয়া জন্মগ্রহণ করে বলিয়া শান্তি-পর্ব্বের ১৮০ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। ঐ পর্ব্বের ১৫০ অধ্যায়ের ১৯ শ্লোকে আছে যে,—"যদিদং মন্যসে রাজন্ নায়মস্তি কুতঃ পরঃ, প্রতিস্মারয়িতারস্তাং যমদূতা যমক্ষয়ে"। যদি তুমি ইহপরলোক অগ্রাহ্য কর, তাহা হইলে যমদূতেরা তোমাকে সে কথা স্মরণ করাইয়া দিবেন। নাস্তিকের কপালে যে নরকভোগ হয়,তাহা গীতাতেও উল্লিখিত আছে। যাহারা সংশয়াত্মা, তাহাদেরও ঐ ভাগ্য। "There is more faith in honest doubt" কথাটা স্বীকৃত বলিয়া মনে হয় না। Honest doubt ওয়ালারা যদি "জিজ্ঞাসু"দলে পড়েন, তাহা হইলে তাঁহারা পরব্রহ্ম লাভ করিতে পারিবেন না বটে (শান্তি ২৩৩ অ, ৩০), কিন্তু তাঁহারা শব্দ ব্রহ্ম লাভ করিতে পারিবেন। উক্ত পর্ব্বের ২৩৭ অধ্যায়ে আছে, যে—"অপি জিজ্ঞাসমানোঽপি শব্দ ব্রহ্মাতি-বর্ত্ততে।" গীতার শ্লোকটী কিন্তু এইরূপঃ—

> অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যত,
> নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ।
> ৪,৪০।

এই নির্দ্দেশে অজ্ঞ হউন, সংশয়াত্মা হউন, কাহারও নিস্তার নাই।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

প্রতিভা।

জগদীশ্বরের সৃষ্টি-কৌশল এরূপ বৈচিত্র্য-পূর্ণ, এরূপ অদ্ভুত যে, তাহার বিষয় চিন্তা করিয়া আমাদের ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ মনোমধ্যে আলোচনা করা এক প্রকার অসম্ভব। তাঁহার সৃষ্টিতত্ত্বের বিচিত্রতার কৌশল ও শিল্পনৈপুণ্য উদ্ভাবন করা মনুষ্যের বোধ ও চিন্তাশক্তির গণ্ডীর সম্পূর্ণ বাহিরে। আমরা তাঁহার অসংখ্য অসংখ্য সমূহের মধ্যে আকৃতি বা প্রকৃতিগত বৈষম্য দেখিয়া বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হই, হৃদয় পরমাত্মার অনন্ত শক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যায়;—কিন্তু এই পার্থক্যের কারণ নির্ণয় করিবার শক্তি মনুষ্যের কোথায়!

জাগতিক সমশ্রেণীর জীব সমূহের মধ্যে এমন একটী প্রাণী দেখা যায় না, যাহার সহিত সেই শ্রেণীর অপর একটীর সহিত আকৃতি বা প্রকৃতিতে কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই। প্রত্যেক মনুষ্যই আকৃতি বা প্রকৃতিতে কিছু কিছু স্বতন্ত্র প্রকারের। একের সহিত অপরের মিল নাই। এ কারণ সহস্র লোকের মধ্য হইতেও আমরা আমাদের পরিচিত ব্যক্তিটীকে বাছিয়া লইতে পারি। আকৃতিগত ঐক্য থাকিলে আমাদিগকে প্রায় প্রতিপদেই ভ্রমে পতিত হইতে হইত। যেমন আকৃতিগত পার্থক্য দেখা যায়, তদ্রূপ মনুষ্য মধ্যে প্রকৃতিগত বৈষম্যও প্রভূত পরিমাণে বিরাজমান। কারণ, কাহাকেও সঙ্গীতপ্রিয়, কাহাকেও বা সঙ্গীত শ্রবণে বীতস্পৃহ দেখা যায়; কেহ কাব্যামোদী,কেহ বিজ্ঞান চর্চ্চার অভিলাষী, কেহ দর্শন শাস্ত্রের চিন্তায় সুখানুভব করে,কেহ বা গণিত লইয়া ব্যতিব্যস্ত। কেহ শান্তিপ্রিয়, কেহ যুদ্ধামোদী, কেহ অর্থগৃধ্নু, কেহ দানশীল, কেহ ঘোর স্বার্থপর, কেহ বা স্বার্থত্যাগী পরার্থ-

পর। আবার এই প্রকৃতিগত বৈষম্যের মধ্যে বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি প্রভৃতিও সকল মনুষ্যের সমান নহে। কেহ জ্যামিতির কোন কঠিন অধ্যায় একবারে বুঝিতে সক্ষম, কেহ বা বহু চেষ্টায়ও তাহা সম্যকরূপে বুঝিতে পারে না। কেহ একবার মাত্র পাঠ করিয়া একখানি সমগ্র বৃহৎ গ্রন্থ অবলীলাক্রমে আবৃত্তি করিতে পারে, কেহ বা তাহারই দুই পৃষ্ঠা বিংশতিবার পাঠ করিয়াও আবৃত্তি করিতে অক্ষম।

পৃথিবীতে যে সকল লোক প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বুদ্ধিমান বা স্মৃতিশক্তি-সম্পন্ন ও মেধাবী ছিলেন। সাধারণ মনুষ্যাপেক্ষা তাঁহাদের মানসিক বৃত্তিগুলি অনেক পরিমাণে ক্ষমতাপন্ন ছিল; এই জন্যই, ব্যক্তি সমষ্টির মধ্যে তাঁহাদিগকে অসাধারণ ব্যক্তি বলা হইয়াছে। উপরোক্ত এই শ্রেণীর জনগণকে আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এই সকল অত্যুন্নত মানসিক-বৃত্তি-যুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি পুরাতন জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া, প্রচলিত রীতি নীতে ও শিক্ষা দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে বিশেষ দক্ষতা দেখাইয়া থাকেন। সাধারণ জন সমূহ অপেক্ষা তাঁহাদের জ্ঞান বুদ্ধি ও বিচার শক্তি অনেক পরিমাণে সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ বলিয়া জন সমাজে তাঁহাদের প্রাধান্য লাভ ঘটিয়া থাকে। অপর দল অপরিসীম জ্ঞান ও বুদ্ধি বলে নিত্য নূতন পথে প্রবেশ করিয়া, নব চিন্তা ও নব ভাবের সাহায্যে নূতন বস্তু আবিষ্কার করিয়া থাকেন। একদল ভাঙ্গিয়া চূরিয়া গড়িতে পারেন, অপর দল নূতন জিনিষ সৃষ্টি করিতে পারেন। প্রথমোক্ত শ্রেণী দক্ষ বা পারদর্শী, দ্বিতীয়োক্ত প্রতিভাশালী।

যিনি বায়স্কোপ বা ফনোগ্রাফ্ দেখিয়া অথবা তাহার প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা করিয়া ঠিক তদ্রূপ গড়িতে পারেন, তাঁহাকে দক্ষ শিল্পী বা পারদর্শী বলিব—প্রতিভাশালী এডিসন্ বলিব না। যাঁহার মস্তিষ্কের অসাধারণ বলে এমন জিনিষের সৃষ্টি হইয়াছে, তাঁহাকেই প্রতিভাবান বলিতে হইবে।

কেহ কেহ গেলেলিও-আবিস্কৃত দূরবীক্ষণ যন্ত্র সুন্দর রূপে প্রস্তুত করিতে পারে, নিউটনের থিওরি সকল সম্যকরূপে বুঝিয়া কণ্ঠস্থ রাখিয়া পরীক্ষায় প্রধান স্থান অধিকার করিতে পারে, বেকন বা রঘুনাথ শিরোমণির সুগভীর দার্শনিক ভাবরাশি সহজে হৃদয়ঙ্গম করিয়া স্মরণ রাখিতে পারে, সেক্ষপীয়র, কালিদাস ও গেটের কাব্য সমুদয় কণ্ঠস্থ রাখিয়া উপযুক্ত স্থানে তাহার প্রয়োগ করিতে পারে, কিন্তু, তথাপি গেলিলিও, নিউটন, রঘুনাথ, বেকন, কালিদাস ও সেক্ষপীয়র ও গেটের অমানুষিক ক্ষমতার নিকট ইহাদের শক্তি কত সামান্য, কত হীনপ্রভ, কত বিভিন্ন!

পূর্ব্বকালে প্রতিভাকে দেবানুগৃহীত শক্তি বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করিতেন। এখন একথায় অনেকেই আস্থা স্থাপন করেন না। প্রতিভা স্বাভাবিক শক্তির পূর্ণ বিকাশ বলিয়া তাঁহারা বুঝিয়া থাকেন। একথা স্বীকার্য্য হইলেও প্রতিভা যে দেবদত্তশক্তি, ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সৃষ্টিকর্ত্তা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন প্রকারের প্রকৃতি দিয়াছেন। অতএব এই স্বাভাবিক শক্তিভেদ যে প্রতিভার মূল, তাহা কতকটা নিশ্চিত। তাহা না হইলে আমরা সকলেই কালিদাস ও গেটে হইতে পারিতাম।

প্রতিভা স্বাভাবিক শক্তি হইতে উদ্ভূত বটে, কিন্তু সেই শক্তি বিকশিত না হইলে প্রতিভার দেদীপ্যমান উজ্জ্বল প্রভা চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতে পারে না। অর্থাৎ প্রতিভা কতকটা শিক্ষা সাপেক্ষ। আপনাকে প্রতিভা শালী মনে করিয়া যদি কেহ শিক্ষা ব্যতিরেকেই বড় লোক হইবার আশা করেন, তবে তাঁহাকে বাতুল ব্যতীত আর কি বলিব? যাঁহারা মহাকবি কালিদাস ও সেক্ষপীয়রের প্রাথমিক জীবনের জ্ঞান-চর্চ্চা ও বিদ্যাশিক্ষা হয় নাই মনে করিয়া প্রতিভাকে শিক্ষা-নিরপেক্ষ মনে করেন, তাঁহাদের দারুণ ভ্রম। কারণ, উক্ত মহা কবিদ্বয়ের জীবনগত প্রচলিত আখ্যান বস্তু সকল ছাড়িয়া দিয়া যদি তাঁহাদেরই কাব্য সমূহ পাঠ করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, সেক্ষপীয়র কাব্য রচনার পূর্ব্বে রঙ্গমঞ্চে অনেকবার অভিনয় দেখিয়াছিলেন এবং লাটিন ভাষায় তাঁহার সবিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। এবং কালিদাস সম্বন্ধে ইহাই বলা যায় যে, তাঁহার আর কিছু শিক্ষা হউক বা না হউক, তিনি যে মহাভারত ও রামায়ণ সম্যক্‌রূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ রঘুবংশের প্রারম্ভে তিনি নিজেই দিয়াছেন ; যথা,—

"অথবা কৃতবাগদ্বারে বংশেঽস্মিন্ পূর্ব্ব সূরিভিঃ।
মণৌ বজ্র সমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ।"

অতএব বুঝা যাইতেছে যে, প্রতিভা শিক্ষা-নিরপেক্ষ হইতে পারে না। তবে সামান্য শিক্ষাতেই আবার কাহারো কাহারো প্রতিভা বিকশিত হইয়া উঠে। অসাধারণ প্রতিভা-সম্পন্ন কবি ও দার্শনিক গেটে অল্প শিক্ষা প্রাপ্তির পরই স্বীয় অমানুষিক প্রতিভার পরিচয় প্রদান করেন। তিনি ষষ্ঠ কিম্বা সপ্তম বৎসর বয়সের মধ্যেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প ও কবিতা রচনা করিয়া প্রকাশিত করেন। কবিবর পোপ ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় তাঁহার গাথা কবিতাগুলি প্রকাশিত করেন। কিট্‌স্ পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমের মধ্যেই তাঁহার অলৌকিক প্রতিভার পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক ইহলোক হইতে একেবারে অপসৃত হন। এবং লর্ড বায়রণও কাব্যোপযোগী শিক্ষা আদৌ প্রাপ্ত হন নাই। তথাপি তাঁহার কাব্য-প্রতিভার ওজঃস্বিনী শক্তিতে জগৎ স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হইয়াছিল। যাঁহারা প্রতিভাকে শুধুমাত্র মনোযোগ ও অনুশীলন সাপেক্ষ বিবেচনা করেন, তাঁহাদের অন্ধ সংস্কার খণ্ডনার্থে গেটে, বায়রণ, শঙ্কর ও নিউটন প্রভৃতি প্রতিভাবান জনগণের প্রাথমিক জীবনের অনুশীলনাভাব দেখাইলেই যথেষ্ট হইবে। কবিবর মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্যের অনুকরণ করিয়া কাব্য লিখিবার শত অভ্যাস করিলেও, আমি প্রতিভাশালী কবি হইতে পারিব না। প্রতিভা স্বাভাবিক শক্তির বিকাশ হইলেও, ইহা দেবদত্ত শক্তি, ইহা স্বতন্ত্র বস্তু। যাঁহার কণ্ঠস্বরে মাধুর্য্য নাই, লালিত্য নাই, তিনি সারা জীবন চেষ্টা ও যত্ন করিয়া যদি সঙ্গীত চর্চ্চা করেন, তবে সুর ও লয়ে তাঁহার দক্ষতা লাভ হইতে পারে, কিন্তু তিনি সুগায়ক হইতে পারিবেন না। তাঁহার যতটুকু স্বাভাবিক শক্তি, তাহারই বিকাশ হইবে সত্য, কিন্তু, সেই প্রকার সকল বিকাশকেই প্রতিভা বলা যায় না। যে শক্তি এক একটা যুগের সৃষ্টি করে, আপামর সাধারণের মনোরাজ্যে স্বীয় প্রভুত্ব বিস্তার করে, অজ্ঞাত বা অচিন্তাভাব বা বস্তু উন্মেষিত করে, যাহার নিকট অপর সকল শক্তি, সকল দক্ষতা হীনপ্রভ, জ্যোতিহীন ও

ম্লান হইয়া যায়, যাহার প্রভা মেঘবক্ষস্থিত তেজোময়ী, আলোকময়ী, জ্যোতির্ম্ময়ী ক্ষণপ্রভা তুল্য, তাহাই ত প্রতিভা।

তবে সকল প্রতিভা সমান শক্তি-সম্পন্ন নহে। কাহারও একমুখীন্ প্রতিভা, কাহারও বা তদতিরিক্ত। কাহারও কাব্যে ও দর্শনে সমান অধিকার, কেহ বা কাব্যেই বিশেষ ক্ষমতাশালী। কেহ কেবলমাত্র গণিতে প্রতিভা দেখাইলেন, কেহ বা গণিত ও দর্শনে, অথবা সাহিত্যে প্রতিভার সমবিকাশ দেখাইলেন। কেহ কেহ এরূপ ধারণার বশবর্ত্তী যে, প্রতিভাশালী গণিতবিদ্‌দিগকে তাঁহারা সাহিত্য ক্ষেত্রের সম্পূর্ণ অনুপযোগী বা সাহিত্য শাস্ত্রে অজ্ঞ বলিয়া বিবেচনা করেন। কিন্তু এ ধারণা কতকটা ভ্রমপূর্ণ। কারণ প্রমাণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, "Leibnitz was universally gifted." ডাক্তার জর্জ্জ বট্‌লার (Dr. George Butler) সাহিত্য জগতে অশেষ প্রতিভাবান বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিলেও, গণিত শাস্ত্রে তিনি সমধিক খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। যে বৎসর লর্ড চান্সেলার লিণ্ডহার্ষ্ট (Lord Chancellor Lyndhurst) গণিতের সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন, সেই বৎসরেই ডাক্তার বাট্‌লার সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া Senior Wrangler এর পদ প্রাপ্ত হন। ডাক্তার কেই (Dr. Kaye) এবং ইংলণ্ডের একজন বিচারপতি Sir Alderson এই উভয় মহাত্মাই গণিত ও সাহিত্যে সমতুল্য প্রতিভার পরিচয় প্রদান করেন।

কেহ কেহ প্রতিভার বংশানুগত অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশেষ সন্দিহান। তাঁহারা প্রমাণ স্বরূপ দেখাইতে চাহেন যে, নিউটন তাঁহার বংশ রক্ষা কর্তব্য কর্ম্ম বলিয়া কখন মনেও করেন নাই। নেপোলিয়নের সন্তান রুগ্ন ও প্রতিভাশূন্য ছিল। ক্রমওয়েলের পুত্র রিচার্ড ক্রমওয়েল্ পিতার সম্পূর্ণ অযোগ্য পুত্র ছিলেন। ইত্যাদি ইত্যাদি। এইরূপ অত্যল্প সংখ্যক প্রমাণ স্বীকার্য্য হইলেও, ইহার বিরুদ্ধে এত অধিক সংখ্যক সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে, যাহাতে প্রতিভার বংশানুগত অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। Sir Galton মহোদয় তাঁহার hereditary genius অর্থাৎ বংশানুগত প্রতিভার যে সকল সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, পাঠকবর্গের অবগতির জন্য তাহার মধ্য হইতে উদাহরণ স্বরূপ দুই একটী প্রমাণ তুলিয়া দিলাম।

লর্ড মেকলের অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি ছিল। বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থ সমুদয় একবার মাত্র পাঠ করিয়া তিনি অবলীলাক্রমে সমস্ত আবৃত্তি করিতে পারিতেন। তিনি এক জন প্রথিতনামা কবি ও ঐতিহাসিক ছিলেন। তাঁহার পিতামহ রেভারেণ্ড জন্ মেকলে প্রসিদ্ধ বাগ্মী ও ধর্ম্ম যাজক, তাহার পিতা অতি ক্ষমতাপন্ন সুলেখক ছিলেন। এবং তাঁহার খুল্লতাত জেনারেল কলিন মেকলে ডিউক অব ওয়েলিংটনের দক্ষিণ বাহু স্বরূপ ছিলেন। ইনি মান্দ্রাজ প্রদেশে কিছু কাল শাসনকর্ত্তা রূপে নিযুক্ত ছিলেন। ইহা হইতে প্রতীয়মান হইতেছে যে, লর্ড মেকলের পূর্ব্ব পুরুষেরা প্রায় সকলেই প্রতিভাশালী ছিলেন।

নীরোর (Nero) শিক্ষক সেনেকা রোম দেশীয় প্রসিদ্ধ দার্শনিক ছিলেন। তাঁহার পিতার বিলক্ষণ স্মৃতিশক্তি ছিল, এবং তাঁহার

পিতামহের স্মৃতিশক্তি এত অধিক ছিল যে, সে সম্বন্ধে Galton সাহেব বলেন যে,—

"He was a man of prodigious memory; he could repeat two thousand words in order he heard them."

গ্রীস্ দেশীয় পণ্ডিত পারসনের স্মৃতিশক্তি বংশানুক্রমে চলিয়াছিল বলিয়া অনেকে তাঁহাদের "পারসনী-স্মৃতিশক্তি" বলিতেন।

প্রতিভাশালী কবিবর গেটে তাঁহার বুদ্ধি-বৃত্তি যে তাঁহার পিতা মাতার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ স্বরূপ তিনি নিজেই একস্থলে লিখিতেছেন;—

"From my father I inherited my frame and the steady guidance of my life; from dear little mother my happy disposition and love of story-telling."

মিল্টনের পিতার সঙ্গীত-বিষয়ক প্রতিভা অসামান্য ছিল। পিতার সেই প্রতিভা, মিল্টনের কবিত্বে সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুট হইয়াছিল।

পিটের প্রতিদ্বন্দ্বী ফক্স (Fox) মহোদয় অসাধারণ বাগ্মী ও রাজনীতিবিশারদ, তাঁহার পিতা লর্ড হলার্ড (Lord Hollard) যুদ্ধ সম্বন্ধীয় সেক্রেটারী (War Secretary) ও পিতামহ প্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন।

এতদ্ব্যতীত লর্ড বেণ্টিঙ্ক, কেনীং, পীল ও বেকন প্রভৃতির উদাহরণ দিয়া প্রতিভার বংশানুগত অস্তিত্ব প্রমাণ করা যাইতে পারে।

শ্রীযতীন্দ্র নাথ রায়।

পদকর্ত্তা শ্রীঘনশ্যাম দাস ঠাকুর।

প্রাচীন পদকর্ত্তাগণের মধ্যে শ্রীঘনশ্যাম নামে দুই জন মহাত্মার নাম অবগত হওয়া যায়। এক জন বৈদ্যকুলোদ্ভব প্রসিদ্ধ কবি গোবিন্দ দাসের পৌত্র, দিব্য সিংহের পুত্র। পদকল্পতরুতে তাঁহার বিষয় এই প্রকার বর্ণিত আছে—

কবিনৃপ বংশজ ভুবন বিদিত যশ
জয় ঘনশ্যাম বলরাম।

আর একজন, আজ আমরা এই প্রবন্ধে যাঁহার বিষয় বলিতেছি, ভাগবতের টীকাকার বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের শিষ্য জগন্নাথ চক্রবর্ত্তীর পুত্র।

প্রায় দ্বিশত বৎসর পূর্ব্বে, গঙ্গা তীরবর্ত্তী কোন গ্রামে, শ্রীঘনশ্যাম দাস ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার আর এক নাম নরহরি দাস। ঘনশ্যাম অতি অল্প বয়সেই সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনবাসী হইয়াছিলেন। ভক্তি রত্নাকরে তাঁহার আত্মপরিচয় সম্বন্ধে লিখিত আছে—

নিজ পরিচয় দিতে লজ্জা হয় মনে।
পূর্ব্ব বাস গঙ্গাতীরে জানে সর্ব্বজনে॥
শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী সর্ব্বত্র বিখ্যাত।
তাঁর শিষ্য মোর পিতা বিপ্র জগন্নাথ॥
না জানি কি হেতু মোর হৈল দুই নাম।
নরহরি দাস আর দাস ঘনশ্যাম॥
গৃহাশ্রম হইতে হইলু উদাসীন।

এ পর্য্যন্ত বর্ণনা করিয়া নরত্তম-বিলাসের শেষে নিজের, নিজ গুরু, পিতা ও পিতৃ-গুরুর পরিচয় একটু বিস্তৃত রূপে প্রকাশ করিয়াছেন—

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু ভক্তের জীবন।
ভক্ত বিনা প্রভুর অন্যত্র নাই মন॥

ভুবন পাবন সে প্রভুর ভক্ত যত।
নিরুপম মহিমা কহিবে কেবা কত ॥
অসংখ্য প্রভুর ভক্ত অন্ত কেবা করে।
জগতে ছাইল সে ভক্তের পরিকরে ॥
প্রভুপ্রিয় পার্ষদ গোস্বামী লোকনাথ।
যাঁহার চরিত্র চারু জগতে বিখ্যাত ॥
তাঁর প্রিয় শিষ্য নরোত্তম প্রেমময়।
যাঁর খ্যাতি জগতে ঠাকুর মহাশয় ॥
তাঁর শিষ্য গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী।
পরম পণ্ডিত যেঁহ প্রেমভক্তি মূর্ত্তি ॥
তাঁর শিষ্য চক্রবর্ত্তী শ্রীকৃষ্ণচরণ।
প্রেমময় রামকৃষ্ণাচার্য্যের নন্দন ॥
শ্রীরামচরণ চক্রবর্ত্তী শিষ্য তাঁর।
সর্ব্বাংশে প্রবীণ অতি শুদ্ধ ভক্তি যাঁর ॥
তাঁর প্রিয় শিষ্য বিশ্বনাথ দয়াময়।
যাঁর জন্মকালে হৈল সবার বিস্ময় ॥

এই বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পৌত্র শ্রীনৃসিংহ চক্রবর্ত্তী ঘনশ্যামের গুরু ছিলেন।

মোর ইষ্টদেব শ্রীনৃসিংহ চক্রবর্ত্তী।
জন্মে জন্মে সে চরণ সেবি এই আর্ত্তি ॥

* * * *

শ্রীবিশ্বনাথের নাম শ্রীহরিবল্লভ।
গীতের আভাসে ব্যক্ত কহে বিজ্ঞসব।
বিশ্বনাথে কে বা না আদরে বৃন্দাবনে?
সদা ভক্তি-রসে মগ্ন লৈয়া শিষ্যগণে ॥
বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী শিষ্য কৈল যত।
সকলেই হইলেন মহা ভাগবত ॥
বৃন্দাবনে হৈতে যবে গৌড়দেশ আইলা।
সেই কালে বিপ্র জগন্নাথে শিষ্য কৈলা ॥
জগন্নাথ বিপ্রের আনন্দ অতিশয়।
পাইয়া ঠাকুর বিশ্বনাথ পদাশ্রয় ॥
হইল বিবাহ পূর্ব্বে তাহে নাহি ধন।
অল্প কালে কৈলা বহু তীর্থ পর্য্যটন ॥
কৃষ্ণে প্রীতি অতি পতিব্রতা ভার্য্যা তাঁর।
স্বামীর চরণ বিনা না ধ্যানয়ে আর ॥
অকস্মাৎ বিপ্র জগন্নাথ দেশে আইল।
সঙ্ক্ষেপে জানাই যৈছে গৃহেতে রহিলা ॥

নিরন্তর প্রভু-পাদপদ্ম আরাধয়।
না ভায় সংসার সদা উদ্বিগ্ন হৃদয় ॥
যাঁহার আজ্ঞায় স্থিতি করিলেন ঘরে।
তাহা কিছু কহি এই প্রসঙ্গানুসারে ॥
প্রভু নিত্যানন্দ হাড়োওঝার নন্দন।
রাঢ়ে একচক্রাগ্রামে যাঁহার ভবন ॥
শ্রীসুন্দরামল বন্দি ঘাটি গাঁই তেঁহ।
করিলা উজ্জ্বল শ্রীনিতাইর পিতা যেঁহ ॥
প্রভু নিত্যানন্দ বলদেব ভগবান্।
রামভদ্র বীরভদ্র দুই পুত্র তান্ ॥
একদিন প্রণমিয়া নিত্যানন্দ রামে।
অল্পকালে রামভদ্র গেলেন স্বধামে ॥
বীরভদ্র প্রভুর হইল পুত্রত্রয়।
জ্যেষ্ঠ শ্রীগোপীজনবল্লভ দয়াময় ॥
মধ্যম তনয় রামকৃষ্ণ গুণসিন্ধু।
কনিষ্ঠ শ্রীরাম চন্দ্র পতিতের বন্ধু ॥
প্রভু গোপীজনবল্লভের পুত্রত্রয়।
জ্যেষ্ঠ রামনারায়ণ গুণের আলয় ॥
শ্রীরামলক্ষ্মণ হন মধ্যম সন্তান।
কনিষ্ঠ শ্রীরামগোবিন্দাখ্য দয়াবান্ ॥
প্রভু বংশে বিখ্যাত এ শ্রীরামলক্ষ্মণ।
যাঁহার প্রতাপে কাঁপে পাষণ্ডির গণ ॥
তাঁর শিষ্য শ্রীলক্ষ্মণদাস কৃপাবান্।
পরম বৈরাগ্য মহা প্রভাব তাহান্ ॥
তেঁই জগন্নাথে গৃহে স্থিতি করাইলা।
"হইব সন্তান" বর প্রদান করিলা ॥
তাঁর আজ্ঞামতে গৃহে করিলেন বাস।
কথো দিন পরে হৈলা অত্যন্ত উদাস ॥
বৃন্দাবনে গিয়া কৈল শ্রীগুরু দর্শন।
গুরু আজ্ঞামতে গৃহে কৈল আগমন ॥
পুনঃ কথো দিন পরে বৃন্দাবন আইলা।
ভক্তি-রসে মত্ত ব্রজে ভ্রমণ করিলা ॥
ইষ্ট অদর্শনে অতি ব্যাকুল হইয়া।
গোঙাইলা কথো দিন কান্দিয়া কান্দিয়া ॥
মাঘপূর্ণিমার শেষ রজনী সময়ে।
অপ্রকট হৈতে, প্রভু চরণ চিন্তয়ে ॥
সে সময়ে মোর অল্প নিদ্রা আকর্ষিল।
নির্লজ্জ হইয়া কহি স্বপ্নে যে দেখিল ॥

বিপ্র জগন্নাথ আসে এক ভৃত্য সঙ্গে।
আইলেন বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী রঙ্গে॥
পরিধেয় বস্ত্র শুভ্র সূক্ষ্ম সুনির্ম্মল।
চন্দন তিলক চারু ললাট উজ্জ্বল॥
তুলসীর মালা গলে পরম সুন্দর।
অতি স্থূল নহে চম্পকাভা কলেবর॥
কিবা ভুরুদ্বয় নাসা নয়ন যুগল।
কি আশ্চর্য্য গণ্ডগ্রীবা বদন মণ্ডল॥
কিবা বাহু বক্ষ কটি জানু পদদ্বয়।
কিবা সে গমন ভঙ্গী উপমা না হয়॥
দেখিতে সে শোভা মোর কি হইল চিতে।
ঝরয়ে নয়নে জল নারি নিবারিতে॥
মোরে যে কহিল মৃদু হাসিয়া হাসিয়া।
কহিতে না আইসে মুখে উমড়য়ে হিয়া॥
তেঁহ নিজ শিষ্য জগন্নাথে লৈয়া সঙ্গে।
অদর্শন হৈলা, দুঃখ পাইলুঁ নিদ্রা ভঙ্গে॥
হেন জগন্নাথের নন্দন মুঞি ছার॥
না বুঝিলুঁ ভক্তি-মর্ম্ম, হৈলুঁ কুলাঙ্গার॥
আজন্ম করিলুঁ পাপ অপরাধ যত।
এক মুখে তাহা আমি কহিব বা কত॥
মুঞি মহা দুরাচার জানে সর্ব্ব লোকে।
মজিল সংসার ঘোর বিষয় নরকে॥
আমার দুর্গতি দেখি বৈষ্ণব গোসাঞি।
অনুগ্রহ করিয়া নিলেন নিজ ঠাঞি॥

ঘনশ্যাম বৃন্দাবন গমন করিলে তাঁহার পাণ্ডিত্য, কবিত্ব ও ভগবদ্ভক্তি দর্শনে ব্রজবাসী মহান্তগণ অতি অল্পকাল মধ্যেই পরম পরিতোষ লাভ করিয়া, তাঁহাকে গ্রন্থ রচনা করিতে আদেশ করেন। মহান্তগণের আদেশে তিনি যে গ্রন্থ প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার গ্রন্থ মধ্যেই পুনঃ পুনঃ লিখিয়াছেন—

বৈষ্ণবের চেষ্টা কিছু বুঝিতে নারিল।
মো হেন মূর্খেরে বর্ণিবারে আজ্ঞা দিল॥
* * * * *
বৈষ্ণব আদেশে এই করিল বর্ণন।
করি পরিশোধন করহ আস্বাদন॥

শ্রীনিবাসআচার্য্য-চরিত, ভক্তিরত্নাকর, নরোত্তমবিলাস, শ্রীগৌরচরিত-চিন্তামণি প্রভৃতি তিনি যে কয়খানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যেক খানাই, কি বর্ণনার মিষ্টতায়, কি ভাষার ওজস্বিতায়, কি কাব্যাংশে, সর্ব্ব প্রকারেই শ্রেষ্ঠ। বিশেষতঃ গৌরচরিত চিন্তামণি নানা রাগরাগিণীসমন্বিত একটী বৃহৎ সঙ্গীতের ন্যায় মনোরম। আর ভক্তিরত্নাকর বৈষ্ণবধর্ম্মের নানা প্রসঙ্গ বিশিষ্ট এক অতুলনীয় গ্রন্থ। পঞ্চদশ তরঙ্গ বিশিষ্ট এই বিরাট কাব্য মধ্যে শ্রীমন্মহা প্রভুর আদ্য, মধ্য, অন্ত্য, প্রায় সমগ্রলীলা, শ্রীনিত্যানন্দ ও অদ্বৈতপ্রভুর জন্ম, বাল্যলীলা, বিবাহ, শ্রীরূপ সনাতন ও শ্রীজীব গোস্বামীর পূর্ব্ব-পুরুষগণের পরিচয়, শ্রীগোপাল ভট্ট ও লোকনাথ গোস্বামীর বিবরণ, প্রভুর অন্তর্ধানের পর বঙ্গদেশের তাৎকালিক অবস্থা, শ্রীনিবাস আচার্য্য, বীরচন্দ্র গোস্বামী, শ্যামানন্দ ঠাকুর, গোবিন্দ কবিরাজ ও শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় প্রভৃতির বৃত্তান্ত, বিস্তৃত রূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই সমস্ত বর্ণনার স্থানে স্থানে বাসুঘোষ,গোবিন্দ দাস প্রভৃতি পূর্ব্ব পদকর্ত্তাগণের ও তাঁহার নিজ রচিত সাময়িক প্রাসঙ্গিক বহুপদ ও শ্রীমদ্ভাগবত, ভগবদ্গীতা, পদ্মপুরাণ, চৈতন্যচরিতামৃত কাব্য, চৈতন্যচরিত মহাকাব্য, চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, চৈতন্যভাগবত,চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যচন্দ্রামৃত, গৌরগণোদ্দেশদীপিকা প্রভৃতি বিবিধ সংস্কৃত ও ভাষাগ্রন্থের শ্লোক প্রমাণ স্বরূপে উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থ খানার গৌরব ও সৌষ্ঠব আরও বিশেষ রূপে সংবর্দ্ধিত করিয়াছেন। গ্রন্থের কোন্ কোন্ তরঙ্গে কি কি বিষয় বর্ণিত, তাহা গ্রন্থ মধ্যেই উল্লিখিত আছে—

পঞ্চদশ তরঙ্গ শ্রীভক্তিরত্নাকরে।
যে তরঙ্গে যে বিলাপ কহি অল্পাক্ষরে॥
প্রথম তরঙ্গে কৈনু মঙ্গলাচরণ।
শ্রীজীবগোসাঞির পূর্ব্বপুরুষ-কথন॥
গোস্বামীগণের যত গ্রন্থ নাম তার।
শ্রীনিবাসাচার্য্যের জন্মাদি সূত্র আর॥
দ্বিতীয় তরঙ্গে বিপ্র শ্রীচৈতন্য দাস।
নীলাচলে গেল পূর্ণ হৈল অভিলাষ॥
শ্রীনিবাস জন্ম পিতা পুত্রে বহু কথা।
বৃন্দাবনে গোবিন্দ প্রকট হৈল যথা॥
তৃতীয় তরঙ্গে, ক্ষেত্রে আচার্য্য চলিলা।
শ্রীচৈতন্য সঙ্গোপন শুনি দগ্ধ হৈলা॥
নীলাচলে গেলা স্বপ্নে প্রভুর আদেশে।
প্রভুগণ কৃপা কৈল, আইলা গৌড়দেশে॥
চতুর্থ তরঙ্গে গৌড়ে আচার্য্য ভ্রময়।
শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার কৃপা হৈল অতিশয়॥
প্রভু পরিকরে মহা অনুগ্রহ কৈল।
বৃন্দাবন গমনাদি ইহাতে বর্ণিল॥
পঞ্চম তরঙ্গে শ্রীনিবাস নরোত্তম।
শ্রীরাঘব সঙ্গে কৈল ব্রজেতে ভ্রমণ॥
গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈত তিনের বিহার।
মধ্যে মধ্যে হৈল নানা প্রসঙ্গ প্রচার॥
ষষ্ঠ তরঙ্গে শ্রীশ্যামানন্দ ব্রজে গেলা।
মদন গোপাল গোবিন্দের প্রিয়া আইলা॥
শ্রীনিবাস লৈয়া গোস্বামির গ্রন্থগণ।
বিদায় হইয়া গৌড়ে করিলা গমন॥
সপ্তম তরঙ্গে গ্রন্থ চুরি বিষ্ণুপুরে।
আচার্য্যানুগ্রহ রাজা শ্রীবীরহাম্বীরে॥
শ্রীশ্যামানন্দের হৈল উৎকলে গমন।
বিবিধ প্রসঙ্গ ইথে কর্ণ রসায়ন॥
অষ্টম তরঙ্গে শ্রীঠাকুর মহাশয়।
শ্রীগৌড় ভ্রমিয়া ক্ষেত্রে করিলা বিজয়॥
ক্ষেত্র হইতে আসিয়া শ্রীআচার্য্যে মিলিল।
শ্রীআচার্য্য রামচন্দ্রাদিকে শিষ্য কৈল॥
নবম তরঙ্গে ভক্তি গ্রন্থ প্রচারিয়া।
শ্রীআচার্য্য আইলা পুন বৃন্দাবন গিয়া॥
আর যে প্রসঙ্গ এথা হইল প্রচার।
সে সব শুনিতে ধৈর্য্য ধরে শক্তি কার॥
দশম তরঙ্গে গ্রাম কাঞ্চন গৈড়ায়।
হইল যে মহোৎসব কহনে না যায়॥
শ্রীখেতরি গ্রামে মহামহোৎসব হৈল।
গণ সহ গৌর সঙ্কীর্ত্তনে নৃত্য কৈল॥
একাদশ তরঙ্গে খেতরি গ্রামেতে।
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী আইলা ব্রজে হৈতে॥
ঈশ্বরী-গমন হৈল একচক্রা দিয়া।
শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মাইলেন খড়দহে গিয়া॥
দ্বাদশ তরঙ্গে আচার্য্যাদি তিন জন।
শ্রীঈশান সঙ্গে কৈল নদীয়া ভ্রমণ॥
হৈল নানা প্রসঙ্গ পরমানন্দ যাতে।
প্রভু নিত্যানন্দে বিবাহ আদি ইথে॥
ত্রয়োদশ তরঙ্গে শ্রীআচার্য্য ঠাকুর।
দ্বিতীয় বিবাহ কৈল কৌতুক প্রচুর॥
প্রভু বীরচন্দ্র করি বিবাহ উল্লাসে।
গণ সহ ব্রজে গিয়া আইলা গৌড়দেশে॥
চতুর্দ্দশ তরঙ্গে শ্রীআচার্য্যগণ সনে।
কৈলা মহামহোৎসব বোরাকুলি গ্রামে॥
সঙ্কীর্ত্তনে হৈলা নিমগ্ন নিরন্তর।
ইথে আর বিবিধ প্রসঙ্গ মনোহর॥
পঞ্চদশ তরঙ্গে প্রকাশ মহানন্দ।
গণ সহ উৎকলে বিলসে শ্যামানন্দ॥
মহা মহা পাষণ্ডিরে কৈল ভক্তি দান।
এ সব প্রসঙ্গ আস্বাদয়ে ভাগ্যবান॥
ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থ পরম সুরস।
আস্বাদহ নিরন্তর, না কর অলস॥
মুই মূর্খ মোর কোন দোষ না লইবে।
করিবে শোধন সুখে গ্রন্থ আস্বাদিবে॥
কহিতে কি জানি, মোরে জানি নিজ দাস।
করুণা করিয়া পূর্ণ কর অভিলাষ॥

ঘনশ্যাম নিজ বিবরণ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তদ্ব্যতীত এই গ্রন্থও তাঁহার হৃদয়ের সুকুমারত্ব, ভক্তিপ্রবণতা, কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য প্রভৃতির এক প্রকৃষ্ট পরিচয়। গ্রন্থখানার ভাষা যে প্রকার হৃদয়দ্রাবী, তাহাতে মনে হয়—বুঝি ভক্তিরসে লেখনী সিক্ত করিয়া এই গ্রন্থের আদ্যোপান্ত লিখিত হইয়াছে।

পঞ্চম তরঙ্গে নায়কনায়িকাভেদ ও রাগ-রাগিণী সম্বন্ধে যে গভীর গবেষণা প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার সেই অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব দর্শনে একেবারে স্তম্ভিত হইতে হয়। আর শ্রীবৃন্দাবন ও নবদ্বীপধামের বর্ণনা—তেমন বর্ণনা জগতের কোন ভাষার কোন গ্রন্থে এ পর্য্যন্ত আর শুনা যায় নাই। নব্যশিক্ষিতগণের মধ্যে যাঁহারা মেণ্ডিভাইলের জিরুজিলেম ও হিউএন্‌সিয়াংএর কুশীনগরের বর্ণনা পাঠে মোহিত হইয়াছেন, তাঁহারাও ঘনশ্যামের এই বর্ণনার শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে অধিকতর প্রশংসা করেন।

বঙ্গীয় সাহিত্যগুরু শ্রীঘনশ্যাম, সুধীমণ্ডলীর মধ্যে পদকর্ত্তা বলিয়া যেরূপ পরিচিত, গ্রন্থকার বলিয়াও তদ্রূপ প্রসিদ্ধ। মহাপ্রভুর মধুর আখ্যান লইয়া যাঁহাদের পবিত্র লেখনী স্পর্শে এই দীনা বঙ্গভাষা অশেষ প্রকারে ধন্যা হইয়াছেন, তন্মধ্যে তিনিও একজন প্রধান। গৌরচন্দ্রের চারুচরিত্রের আদ্য, মধ্য ও অন্ত্যভাগ শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীলোচন দাস ঠাকুর বঙ্গভাষায় যে প্রকার বিস্তৃত রূপে বর্ণনা করিয়াছেন, প্রভুর লীলার পরিশিষ্ট বিষয় সমূহ শ্রীঘনশ্যাম দাস ঠাকুরও সেই প্রকার বিশদভাবে প্রকাশ করিয়াছেন; এ জন্য, কি বঙ্গসাহিত্যসেবী, কি ভক্তবৈষ্ণব, সকলের নিকটই তিনি পরমার্চ্চনীয়। আর পদ-রচনায় যে অমিয় মাধুরী রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা আর নিঃশেষ হইবার নহে। যুগ যুগান্তের জন্য সেই সরস মাধুরী সঞ্চিত থাকিয়া অসংখ্য নরনারীগণের মন প্রাণ শীতল করিবে। পদসংগ্রহকারক শ্রীবৈষ্ণব দাসের পরবর্ত্তী সময়ে তাঁহার অভ্যুদয়, এ জন্য পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত না থাকায় আমাদের পাঠকবর্গের মধ্যে যাঁহাদের ভাগ্যে ঘনশ্যামের পদ আস্বাদন ঘটিয়া উঠে নাই, তাঁহাদিগকে দুইটী পদ এখানে উপহার প্রদান করিয়া আমরা এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিলাম।

ফাল্গুন পূর্ণিমা মঙ্গলের সীমা
প্রকট গোকুল ইন্দু।
নদীয়া নগরে প্রতি ঘরে ঘরে
উথলে আনন্দ সিন্ধু॥
কিবা কৌতুক পরস-পরে।
শচীদেবী ভালে পুত্র লৈয়া কোলে
বিলসে সূতিকা ঘরে॥
বালকে দেখিতে ধায় [illegible]রি ভিতে
[illegible]হা না ধরয়ে ধৃতি।
গ্রহণান্ধকারে কে চিনে কাহারে
অসংখ্য লোকের গতি॥
বালক মাধুরী দেখি আঁখি ভরি
পাশরে আপন দেহা।
নরহরি কয় শচীর তনয়
প্রকাশে কি নব লেহা।

ভুবন মোহন গোরা নদীয়া নগরে।
রূপের ছটায় দশদিশ আলো করে॥
কনক ভূধর গরব ভঞ্জন
মঞ্জু মূরতি রসাল রে।
অতনু ধনু দূরে দরপ ভুরুদিঠী
ভঙ্গি কি মধুর ভাতিয়ারে॥
হাস মিলিত ময়ঙ্ক মুখলস
দশন মোতিম পাতিয়ারে।
চারু শ্রুতি অব— তংশ সুন্দর
গণ্ড মণ্ডল শোভয়েরে॥
নাসিকা শুক চঞ্চু জিনিয়ে
যুবতীগণ মন মোহয়েরে।
আজানুলম্বিত ললিত ভুজযুগ
গাঞ্জ ভুজগ মৃণালরে।
বক্ষ পরিসর পরম সুগঠন
কণ্ঠে মালতী মালারে॥

ত্রিবলি বলিত সুনাভি সরসিজ
ভ্রমর তনু রুহ রাজয়ে রে।
সিংহ জিনি কটি— দেশ কৃশ ঘন
অংশু আংশুক ভাজয়ে রে॥

মদন মদদালি কদলি উরু উরু
পর্ব্ব অতি অনুপম রে।
চরণ তল থল কমল নখ মণি
নিছনি ঘন ঘনশ্যাম রে॥

শ্রীতরণী কান্ত চক্রবর্ত্তী।

উপনিষদের উপদেশ। (১২)

ইন্দ্র-বিরোচন-সংবাদ।

বেদান্ত ও সাংখ্য, উভয় দর্শনেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, ব্রহ্ম বা পুরুষকে নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় ও উদাসীন রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে; অথচ জগৎ তাঁহা হইতেই প্রসূত হইয়াছে। জগতে যে নানা প্রকারের শব্দ স্পর্শাদি জ্ঞান (জন্য জ্ঞান) ও নানা প্রকারের ক্রিয়া দেখা যাইতেছে, তাহাও তাঁহা হইতেই আসিয়াছে। এখন আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, এই দুই তত্ত্বের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? ইহার তাৎপর্য্য না বুঝিলে, অনেক ইংরেজ-পণ্ডিতের ন্যায়, হিন্দুদর্শনের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণের পক্ষে, বিশেষ ভুল হইবার সম্ভাবনা। বেদান্ত ও উপনিষৎ সমূহের শঙ্কর-ভাষ্য এবং সাংখ্য দর্শন পড়িয়া আমরা যাহা বুঝিতে পারিয়াছি, এ স্থলে আমরা তাহাই বলিব। আমরা প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণে ভুল করিয়াছি কিনা, সহৃদয় পাঠক তাহার বিচার করিবেন।

আমাদের ধারণা এই যে, বেদান্তের ব্রহ্ম বা সাংখ্যের পুরুষ উভয়েই পূর্ণজ্ঞান ও পূর্ণ ক্রিয়া স্বরূপ। তবে যে ব্রহ্মকে নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় বলা হইয়াছে, তাহার বিশেষ একটী গূঢ় তাৎপর্য্য আছে। জড়জগতে যে প্রাকৃতিক জ্ঞান ও প্রাকৃতিক ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়, উহারা অবভাসাত্মক (phenomenal) মাত্র। প্রতি মুহূর্ত্তে উহারা রূপান্তর পরিগ্রহ করিতেছে, উহারা অনিত্য-বিকারী। ব্রহ্ম-জ্ঞানকে এই সমস্ত বিকারী ও অনিত্য জ্ঞানের সহিত এক ও অভিন্ন মনে করিলে, ব্রহ্মকেও বিকারী ও পরিণামী বলিতে হয়। যদি আত্মাকে এই প্রাকৃতিক সুখ দুঃখাদি জ্ঞানের সমষ্টি রূপে মনে করা যায়, তবে ত আত্মার নিত্যজ্ঞান স্বীকার করা চলে না। প্রত্যেক শব্দ স্পর্শ সুখ-দুঃখাদি জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে, সেই এক অখণ্ড নিত্য জ্ঞানই উপস্থিত থাকে; প্রত্যেক প্রাকৃতিক ক্রিয়াগুলির সঙ্গে সঙ্গে, সেই এক অখণ্ড নিত্য ক্রিয়াই উপস্থিত থাকে। সুখদুঃখাদি জ্ঞানগুলি সেই এক নিত্য-জ্ঞানেরই পরিচয় প্রদানের জন্য অবস্থিত রহিয়াছে; প্রাকৃতিক ক্রিয়াগুলিও সেই এক নিত্যশক্তিরই পরিচায়ক চিহ্ন রূপে বর্ত্তমান। হিন্দুদর্শনের এইরূপই তাৎপর্য্য। শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যেরও মর্ম্ম এইরূপ। পাঠক শঙ্করের গীতাভাষ্যে দেখিতে পাইবেন যে, তাঁহার আত্মা নিতান্ত নিষ্ক্রিয়। কিন্তু নিষ্ক্রিয় অর্থ এই যে, এই যে প্রতিক্ষণে পরিণামযুক্ত, বিকারী, অনিত্য নানা প্রকারের ক্রিয়া জগতে দেখা যাইতেছে, আত্মার ক্রিয়া-শক্তি সেরূপ নহে। প্রাকৃতিক প্রত্যেক ক্রিয়ার সহিত আত্মার ক্রিয়াকে অভিন্ন মনে করিলে, আত্মার অস্তিত্বেরই আবশ্যকতা থাকে না। কেবল এক জড়ের

ক্রিয়া বলিলেই চলিতে পারে। আবার অভিন্ন বলিয়া মনে করিলে, আত্মার অখণ্ড, নিত্য শক্তিকেও পরিণামী ও বিকারী বলিতে হয়। এই জন্যই শঙ্কর আত্মাকে নিষ্ক্রিয় বলিয়া প্রমাণ করিতে অত যত্ন স্বীকার করিয়াছেন। আত্মার বা জীবের ক্রিয়া বলিতে আমরা কি বুঝি? কর্ত্তৃত্ব শব্দের অর্থ কি? "অনুকূল কৃতিমত্বই কর্ত্তৃত্ব।" অর্থাৎ যাহা করিবে তজ্জন্য প্রবৃত্তি আবশ্যক; প্রবৃত্তি-চালিত হইয়া, সাধনসহায়ে ও কোন ফলোদ্দেশে, লোকে ক্রিয়া করিয়া থাকে। জীবের এইরূপ কর্ত্তৃত্বই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ব্রহ্মের জগৎ-সৃষ্টি-কর্ত্তৃত্ব এরূপ হইতে পারে না। ব্রহ্মের এরূপ কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলে, তাঁহাকে প্রত্যেক মুহূর্ত্তে নানা প্রকারের প্রবৃত্তি কামনা দ্বারা চালিত ও দোষ দুষ্ট বলিতে হয়। আরো একটী কথা আছে। যাহা জীবে আত্মচৈতন্য, তাহাই বিশ্বে ব্রহ্ম-চৈতন্য। যদি বিশ্বের প্রতিক্ষণ-জাত-বিবিধ ক্রিয়ার সহিত ব্রহ্ম-শক্তিকে এক ও অভিন্ন বলিয়া ধরা যায়, তবে ত ব্রহ্মচৈতন্যের অস্তিত্বেরই আবশ্যকতা থাকে না। আর অস্তিত্ব থাকিলেও, প্রকৃতির বিশেষ বিশেষ প্রত্যেক ক্রিয়ার কর্ত্তা বা অধিষ্ঠাতারূপে ব্রহ্মকে স্বীকার করিতে হয় এবং (special creator) যাহাকে বলে, তাহাও স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তাহা বিজ্ঞান সম্মত নহে। ভগবান যে মনুষ্যের চক্ষুর্দ্বয়কে ঠিক্ ঐরূপ ভাবে মনুষ্য স্থষ্টির দিনে নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, একথা আর বিবর্ত্তবাদে টিকিতে পারে না। ঐ চক্ষু বহু পূর্ব্ব হইতে মনুষ্য প্রাদুর্ভাবের অনেক অগ্র হইতেই ক্রমে, অতি ধীরে বিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে। এই দোষ নিবারণের জন্যই সাংখ্য সগুণ ঈশ্বর স্বীকার করিতে পারেন নাই; এই জন্যই বেদান্তে নির্গুণ ব্রহ্ম বা গুণের সাধারণ বীজরূপে ব্রহ্ম স্বীকৃত হইয়াছে। প্রকৃতির প্রথম পরিবর্ত্তনের ক্রিয়া প্রবাহ যে ব্রহ্ম হইতেই প্রাপ্ত, একথা হিন্দুদর্শন অস্বীকার করেন নাই। ব্রহ্ম সর্ব্ব ক্রিয়াও সর্ব্ব জ্ঞানের অধিকরণ স্বরূপ। পুরুষের অধিষ্ঠান বশতঃ প্রকৃতির প্রথম ক্ষোভ জন্মিয়াছিল, সাংখ্য দর্শনের এ তত্ত্ব অতীব সত্য। একটা নিয়ম বা প্রণালীক্রমে প্রকৃতি নিম্নস্তর হইতে ক্রমাগত উন্নততরস্তরে উন্নীত বা বিবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে; এই নিয়মের বিধানকর্ত্তা পুরুষ বা ব্রহ্ম, এ কথা সাংখ্য স্বীকার করিতেছেন। শঙ্করেরও ইহাতে বিশেষ সম্মতি আছে।

এতদ্দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, আত্মা বা ব্রহ্মের সাধারণ ক্রিয়াশক্তি ও সাধারণ জ্ঞানশক্তি কোথাও অস্বীকৃত হয় নাই। অস্বীকৃত হইয়াছে কেবল বিশেষ বিশেষ পরিণামী জ্ঞান এবং বিশেষ বিশেষ বিকারী ক্রিয়া বা কর্ত্তৃত্ব। ইন্দ্রিয়াদিক্রিয়ার মূলে ব্রহ্মই বর্ত্তমান; তবে প্রত্যেক দর্শন-ক্রিয়া, প্রত্যেক স্পর্শক্রিয়া প্রভৃতি তাঁহার নহে এইমাত্র। "চেতনস্য গুণবিশেষ বিশিষ্টত্ব মুনিষ্টং নির্গুণত্বাৎ" (আনন্দগিরি, গীতা ৫।১৯)। বিজ্ঞানভিক্ষুও সাংখ্য দর্শনের প্রথমাধ্যায়ের ১৪৬ সূত্রের টীকায় "গুণশব্দোঽত্র বিশেষগুণবাচী" এই কথা বলিয়াছেন। ইন্দ্রিয়াদি তাঁহার জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির অভিব্যঞ্জক বা দ্বার মাত্র। ইন্দ্রিয়াদি সেই অখণ্ড নিত্য জ্ঞান ও শক্তিরই নানারূপে পরিচয় প্রদান করে মাত্র। সেই জ্ঞান ও সেই শক্তি, নিত্য অবিকারী

থাকিয়া, ঐন্দ্রিয়িক বৈকারিক জ্ঞান ও ক্রিয়া সমূহের আশ্রয় ও অধিকরণ রূপে সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান রহিয়াছে। হিন্দু দর্শনের তাৎপর্য্য এইরূপ। ব্রহ্ম নির্গুণ হইয়াও সগুণ এবং সগুণ হইয়াও নির্গুণ। বিকারী, সদোষ ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান ও ক্রিয়া গুলির সহিত লোকে পাছে ব্রহ্মের অখণ্ড নিত্য জ্ঞান ও শক্তিকে এক ও অভিন্ন মনে করে, এই আশঙ্কাতেই হিন্দুদর্শন বারম্বার ব্রহ্মকে নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় বলিয়াছেন। ইচ্ছা, সুখাদি সমস্ত গুণই অনিত্য, বিকারী; ইহারা এখন একরূপ, পরক্ষণেই অন্যরূপ। ব্রহ্মজ্ঞান এরূপ হইতে পারে না; কেননা, তাহা হইলে তাঁহাকেও সুখী, দুঃখী, বিকারী বলিতে হয়। আত্মপ্রকৃতির অবস্থান্তর দ্বারা জ্ঞানের অবস্থান্তর সাধিত হইতেছে; প্রকৃতির নানাবিধ বিকারের দ্বারা আত্মারও বিকার সাধিত হইতেছে; ইহা সত্য। কিন্তু তাহাতে আত্মার নিত্যজ্ঞান ও নিত্যশক্তির কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হইতেছে না। প্রত্যেক খণ্ড খণ্ড জ্ঞান ও ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই নিত্যজ্ঞান ও নিত্যশক্তি উপস্থিত থাকে। ইহারা তাহারই পরিচায়ক চিহ্ন মাত্র। কিন্তু যাহা পরিচায়ক চিহ্নমাত্র, সেই চিহ্ন ও চিহ্নী এক ও অভিন্ন হইতে পারে না। হিন্দুদর্শনের এ কথা বড়ই পরিষ্কার। এই মর্ম্ম না বুঝিয়া, ব্রহ্ম বা আত্মাকে নিতান্ত সম্বন্ধ-বর্জ্জিত নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় বলিয়া, লোকে মনে করে। "নিরিচ্ছত্বাদকর্ত্তাঽসৌ কর্ত্তা সন্নিধিমাত্রতঃ,—এতদ্দ্বারা ব্রহ্মের সাধারণ কর্ত্তৃত্ব বীজই সূচিত হইতেছে। তবে যে প্রকৃতিকে কর্ত্রী বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ এই যে, প্রকৃতি বিকারী ক্রিয়া সমুহের কর্ত্রী। প্রতি মুহূর্ত্তে যে ক্রিয়া হইয়া চলিয়াছে, উহা প্রকৃতিরই অন্তর্নিহিত শক্তি বলে। এই অন্তর্নিহিত ক্রিয়ার বীজশক্তি কিন্তু প্রকৃতি পুরুষ হইতেই পাইয়াছে; কেননা মূলে প্রকৃতি পুরুষেরই শক্তিমাত্র। জ্ঞান ও ক্রিয়াসম্বন্ধে এতক্ষণ যাহা বলা হইল, সুখদুঃখাদি ভোগ (feeling) সম্বন্ধেও তাহাই প্রযোজ্য। ব্রহ্ম আনন্দ স্বরূপ। সুখদুঃখাদি, প্রকৃতি সংযোগে আত্মার অবস্থান্তর মাত্র। এই সুখদুঃখাদি ভাবগুলি, সেই অখণ্ড আনন্দেরই অভিব্যঞ্জক বা পরিচায়ক চিহ্নমাত্র। এই বিকারময় সুখদুঃখাদির ভোক্তা আত্মা হইলেও, প্রকৃতপক্ষে আত্মার নিত্যানন্দেরই ভোগ সূচিত হয়। অর্থাৎ সমস্ত অনুভব বা ভোগের মূলবীজ ব্রহ্মই, যেমন সমস্ত ক্রিয়ার মূলে তাঁহারই কর্ত্তৃত্ব। জ্ঞান শক্তি ও অনুভবের মূলবীজ তিনিই, অর্থাৎ এইগুলিই তাঁহার স্বরূপভূত। তবে যে জড়রাজ্যে খণ্ড জ্ঞান ও খণ্ড ক্রিয়া ও খণ্ড সুখাদি দেখা যাইতেছে, সেগুলি প্রকৃতিরই পরিবর্ত্তনজাত ও প্রকৃতিরই অন্তর্নিহিত শক্তিজাত।

এখন আমরা উপরে যে মর্ম্মের আভাষ দিলাম, তাহা সাংখ্য দর্শনের ও শঙ্করভাষ্যের কতিপয় স্থল উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শন করিব। পাঠক দেখিবেন, ইহা আমাদের স্বকপোল কল্পিত ব্যাখ্যা নহে; বাস্তবিকই শঙ্কর ও কপিল এই মর্ম্মেই নির্গুণাদি শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন।

প্রকৃতি বা জড়ের ক্রিয়ার প্রবৃত্তি যে ব্রহ্ম হইতে প্রাপ্ত, একথা সাংখ্য স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন। সাংখ্য দুইভাবে এ কথার আভাষ দিয়াছেন। এক, পুরুষের সান্নিধ্য বশতঃই প্রকৃতির প্রথম ক্ষোভ জন্মিয়াছিল; অপর, পুরুষার্থই প্রকৃতির

সাম্যাবস্থাচ্যুতির প্রতিহেতু। সাক্ষীরূপে সমীপস্থিত পুরুষের ভোগ ও মুক্তির জন্যই প্রকৃতির পরিবর্ত্তন প্রবাহ। "সাক্ষী" অর্থ কি? আনন্দগিরি সাক্ষী শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন—"সর্ব্বেষু ভূতেষু সত্তাস্ফূর্ত্তিদত্বেন সন্নিধিমাত্রোচ্যতে, ন কেবলং কর্ম্মণামেবায়মধ্যক্ষঃ, অপিতু তদ্বতাম পীত্যাহ সাক্ষীতি।" অন্যত্রও তিনি বলেন—"নহি দৃশ্যা ব্যাপ্যত্বং বিনা জড়বর্গস্য কাপি প্রবৃত্তিঃ" (গীতা ১৩।১০)। বিজ্ঞান ভিক্ষুর সাংখ্যসারে আছে—"স্বামার্থে ভৃত্যবৎ যস্মাৎ জড়বর্গঃ প্রবর্ত্ততে"। পুরুষার্থই জড়ের ক্রিয়ার হেতুভূত এবং পুরুষ হইতেই জড় ক্রিয়াপ্রবৃত্তি পাইয়াছে। "সংঘাত পরার্থত্বাৎ" এই সাংখ্যকারিকাতেও ইহারই ইঙ্গিত প্রদত্ত হইয়াছে এবং শঙ্করও নানাস্থলে একথা বলিয়াছেন। চেতনের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই প্রকৃতির প্রবৃত্তি। এ কথার অর্থই এই যে, জড় প্রথমে ব্রহ্ম হইতেই প্রবৃত্তি পাইয়াছে; অথবা জড় ব্রহ্মেরই শক্তিমাত্র। গীতার ৮ম অধ্যায়ের ১০ম শ্লোকের টীকায় আনন্দগিরি বলিতেছেন—"অন্তর্যামিণা প্রের্য্যমাণং সর্ব্বং যথা স্বাং মর্য্যাদাং অনতিক্রম্য চেষ্টতে।" জড় প্রকৃতি যে নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করে, তাহা ব্রহ্মেরই প্রেরণাসম্ভূত। আবার— "সর্ব্ববিশেষ রহিতস্যাবাঙ্মনস গোচরস্য ব্রহ্মণঃ শূন্যত্বে প্রাপ্তে, প্রত্যক্ষেন ইন্দ্রিয় প্রবৃত্ত্যাদি হেতুত্বেন কল্পিতদ্বৈতসত্তাস্ফূর্ত্তিদত্বেন চ সত্বং দর্শয়ন্ দেহাদীনাং প্রবৃত্তিমতাং প্রেক্ষা পূর্ব্বক প্রবৃত্তিমত্বাৎ চেতনাধিষ্ঠিতত্বম্" (আনন্দগিরি, গীতা ১৩।১৩)। সকল ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তি ব্রহ্ম হইতেই উদ্ভূত, চেতনের প্রয়োজনের জন্যই উহারা ক্রিয়া বিশিষ্ট, এই কথাই উদ্‌ঘোষিত হইতেছে। শঙ্করাচার্য্য কেণোপনিষদের দ্বিতীয় শ্লোকের ভাষ্যে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া আত্মশক্তি হইতেই প্রাপ্ত, ইহা প্রমাণ করিয়াছেন। ঐতরেয়োপনিষদের ৪র্থ অধ্যায়ের ভাষ্যে ও এ সম্বন্ধে একটী দীর্ঘ বিচার দৃষ্ট হয়। সে স্থলে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়দর্শন শক্তি অনিত্য এবং আত্মার দর্শন শক্তি নিত্য, এই কথা উল্লিখিত আছে।

" The *transient* nature of the vision of the eye is wellknown in the world, for during the disease of the eye and after the removal of the disease, people say respectively "The sight is lost" and " The sight is gained." Such is also the case with hearing and thinking. The *eternal* nature of the vision &c. of the Self is also wellknown."

(বোধ সৌকর্য্যার্থে ইংরাজী অনুবাদ প্রদত্ত হইল)। তবেই দেখা যাইতেছে যে, দর্শনাদি ক্রিয়ার মূল শক্তি আত্মপ্রেরিত ও আত্মারই প্রয়োজনার্থ।

"The *director* is inferred by logical necessity from the activity manifested by the ear and others combined, such as deliberation, volition, enuring for the benefit of something distinct from them all."

(কেণোপনিষৎ, ১।২)। সাংখ্যদর্শনের "দ্রষ্টৃত্বাদিরাত্মনঃ, করণত্বমিন্দ্রিয়ানাং" (২। ২৯) সূত্রেও, পুরুষকেই ইন্দ্রিয়াদির প্রযোক্তারূপে বলা হইয়াছে।

এইরূপে আমরা শত শত স্থল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে পারি, জড়বর্গের ক্রিয়ার মূলস্থান ব্রহ্মই। এইরূপ বুদ্ধ্যাদির যে জ্ঞান, তাহারও মূলস্থান ব্রহ্ম, ইহাও দেখান যাইতে পারে। প্রকৃতি জড়, বুদ্ধ্যাদি তাহারই বিকৃতাবস্থা মাত্র। জড়ের জ্ঞান থাকিতে পারে না। জড়ের সান্নিধ্যবশতঃ একই নিত্যজ্ঞানের নানারূপ অবস্থা হয়, ইহা বলাই বেদান্ত ও সাংখ্যের অভিপ্রায়। সুখ দুঃখাদির ভোগ সম্বন্ধেও একথা খাটে।

জ্ঞানও ভোগ উভয়ই চেতনের। তবে জ্ঞান ও ভোগের যে বিবিধ অবস্থা হয়, তাহা জড়ের সন্নিধান বশতঃ। তবেই প্রকৃতির জ্ঞান ও ভোগ বাস্তবিকপক্ষে ব্রহ্ম হইতেই মূলতঃ উদ্ভূত। "জ্ঞাস্বামী ত্যাদ্যবগতিনিষ্ঠা অবগতিরবসানে" (গীতা, শাঙ্করভাষ্য ১৩।১০)। আবার—"সর্ব্বসাক্ষীভূত চৈতন্য মাত্রস্বান্নচান্যো ভোক্তা চেতনান্তরাভাবাৎ।" তবেই দেখা যাইতেছে যে, খণ্ড খণ্ড সমস্ত জ্ঞান এবং ভোগ, সেই নিত্য চৈতন্যেই পর্য্যবসিত। "ভোগশ্চিদবসানঃ" সাংখ্যসূত্রও এই কথাই বলিয়াছেন। "নমু প্রবৃত্তীনাং ফলাবসায়িতয়া সুখদুঃখয়োরণ্য তরার্থত্বান্ন স্বার্থং তত্রাহ,—প্রবৃত্তীনাং সুখদুঃখার্থত্বেঽপি তয়োঃ স্বার্থত্বাৎসিদ্ধেরর্থিত্বেন আত্মা সিধ্যতি" (আ° গি° গীতা, ১৮।৫০)। গীতার ১৩।২২ ভাষ্যেও ব্রহ্ম চৈতন্যকে ভোক্তা রূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অতএব আমরা দেখিতেছি যে, Knowledge, Action, Feeling—এ তিনই মূলতঃ ব্রহ্ম হইতে আসিয়াছে। অথবা, অন্য কথায় বলিতে গেলে, এক অখণ্ড নিত্য জ্ঞান, শক্তি ও আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মেরই, সংসারে খণ্ড খণ্ড জ্ঞান, ক্রিয়া ও সুখদুঃখাদি দেখা যাইতেছে। শাঙ্করভাষ্যের আর একটী স্থল আমরা পাঠকবর্গকে দেখিতে অনুরোধ করিতেছি। প্রশ্নোপনিষদের ৬ষ্ঠ প্রশ্নের ৩য় শ্লোকের ভাষ্যে শঙ্কর দীর্ঘ বিচার দ্বারা ব্রহ্মকেই কর্ত্তা ও ভোক্তা বলিয়া মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন।

তবে যে নানাস্থানে ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং নানাস্থানে তাঁহাকে নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় বলা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য ইহা নহে যে ব্রহ্ম শূন্য পদার্থ; তিনি ক্রিয়া, জ্ঞান ও ভাবাদির মূল হেতু নহেন। হিন্দু দর্শনের সেরূপ তাৎপর্য্য নহে। ইহা না বুঝিয়া অনেকে ব্রহ্মকে নিতান্ত নিষ্ক্রিয়, শূন্য স্থির করিয়া লইয়াছেন ও প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ বর্জ্জিত ও প্রকৃতির অতীতরূপে সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। আমরা উপরে ভাষ্যাদি হইতে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা হইতে বুঝিয়াছেন যে, ব্রহ্ম নিঃস্বরূপ নহেন, সমস্ত শক্তি, ক্রিয়া, জ্ঞান, সুখাদি তাঁহাতেই পর্য্যবসিত আছে। তিনি পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণশক্তি ও পূর্ণানন্দ স্বরূপ "সর্ব্বাত্মত্বাৎ তস্য পরিপূর্ণতা" এবং "ব্রহ্ম সংপত্তির্ণাম পূর্ণত্বেন অভিব্যক্তি অপূর্ণত্ব হেতোঃ সর্ব্বস্যাত্মসাৎকৃতত্বাৎ"(আনন্দগিরি)। নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় শব্দের প্রকৃত অর্থ ইহাই, নতুবা উদ্ধৃত স্থল গুলি নিরর্থক হইয়া পড়ে। তবে ব্রহ্মে কর্ত্তৃত্বাদি নিষিদ্ধ হইয়াছে কেন? ব্রহ্মে তবে কিরূপ কর্ত্তৃত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে? ভাষ্যেই তাহার উত্তর আছে।

তুমি, আমি, যেমন কোন কার্য্যাদি করিতে প্রবৃত্ত হইলে, ক্রিয়াব্যাপৃত রূপে প্রবৃত্ত হই, ব্রহ্মের মূল ক্রিয়া সেরূপ নহে; কার্য্যব্যাপৃততা নিবারণের উদ্দেশে ও বিকার নিষেধ করিবার জন্যই, ব্রহ্মে "কর্ত্তৃত্ব" অস্বীকৃত হইয়াছে। "যত্তু শাস্ত্রেষু পুরুষে দর্শনাদি কর্ত্তৃত্বং নিষিধ্যতে, তদনুকূল কৃতিমত্ত্বং তত্তৎ ক্রিয়াবত্ত্বং বা" (বিজ্ঞানভিক্ষু, সাংখ্যদর্শন, ২।২৯)। আবার তিনি বলেন—"কারকচক্র প্রযোক্তৃতা শক্তে রাত্মস্বরূপতয়া দ্রষ্টৃত্বাদিকং আত্মনো নিত্যমেব।" শঙ্করও তাহাই বলেন যথা,—"স্বব্যাপারাদৃতে সন্নিধিরেব কর্ত্তৃত্বং"। আনন্দগিরি ও ছান্দোগ্য ভাষ্যের টীকায় বলিতেছেন—"আত্মনঃ সত্তামাত্র এব জ্ঞানকর্ত্তৃত্বং, নতুব্যাপৃততয়া।"

অতএব দেখা যাইতেছে যে, মুখ্য কর্তৃত্ব বা আমরা যেরূপ ব্যাপৃত হইয়া কার্য্য করি, তাদৃশ কর্তৃত্ব ব্রহ্মে নিষেধ করা হইয়াছে। ব্রহ্ম সাধারণ ভাবে সর্ব্ব ক্রিয়ার চালক; বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার কর্ত্রী প্রকৃতিই। অর্থাৎ প্রকৃতিতে গোড়া হইতেই এরূপ শক্তি নিহিত আছে যে, প্রকৃতি ক্রমে ক্রমে বিশ্বাকারে পরিণত হইয়া ক্রিয়া করিবে। ক্রিয়ার বীজ ব্রহ্ম। গীতার ১৮ অধ্যায়ের ৬৬ শ্লোকের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্যের সুপ্রসিদ্ধ বিচারটী দেখিলেই ইহা আরো স্পষ্ট বুঝা যাইবে। সে স্থলের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে, রাজা বা সেনাপতিগণ স্বয়ং যুদ্ধাদি ক্রিয়া না করিলেও, ধনদানাদি ও আদেশাদি দ্বারা ক্রিয়ানির্ব্বাহ করেন, ইহা গৌণ ক্রিয়া। ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়ায় আত্মার সেইরূপ গৌণ কর্তৃত্বমাত্র আছে; আত্মার সেরূপ গৌণ কর্তৃত্ব অস্বীকৃত হয় নাই; কেবল মুখ্য কর্তৃত্বমাত্র নিষেধ করা গিয়াছে। আমরা যখন কোন কার্য্য করি, তখন বাসনাবশে চালিত হই, ফলকামনা উদ্দেশ্য থাকে, ও তৎসম্পাদনে ইন্দ্রিয়াদির অপেক্ষা থাকে; ব্রহ্মের এরূপ কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে, তাঁহাকে বিকারী বলা আবশ্যক হয়। আনন্দগিরির কথা শুনুন্ঃ—"মিথ্যাজ্ঞানং নিমিত্তং কৃত্বা কিঞ্চিদিষ্টং কিঞ্চিদনিষ্ট মিত্যারোপ্য তদ্বারা সুভূতে প্রেপ্সাজিহাসাভ্যাং ক্রিয়াং নিবর্ত্ত্যতয়া ইষ্টমনিষ্টঞ্চ ফলংভুক্ত্বা তেন সংস্কারেণ তৎপূর্ব্বিকাঃ স্মৃত্যাদয়ঃ স্বাত্মনি ক্রিয়াং কুর্ব্বন্তীতি যুক্তং কর্তৃত্বস্য মিথ্যাত্বং"। আমরা সাধারণতঃ এইরূপ বাসনা ও সংস্কার বশতঃই ক্রিয়ানির্ব্বাহ করিয়া থাকি; এরূপ ক্রিয়া কাজেই বিকারী ও অনিত্য। আবার,—"সংঘাতেঽহংমমাভিমানদ্বারাহং করোমীতি আত্মনো মিথ্যাধী পূর্ব্বিকা কর্ম্মণি প্রবৃত্তি দৃষ্টা, তেনাবিদ্যা পূর্ব্বকত্বং তস্য যুক্তং"॥ এই কারণ বশতঃই আত্মকর্তৃত্ব শাস্ত্রে বারম্বার নিষিদ্ধ হইয়াছে। "নায়ংহন্তি ন হন্যতে ইত্যাদি আত্মাঽবিক্রিয়ত্বে তাৎপর্য্যং"। অতএব সিদ্ধান্তিত হইতেছে যে, আত্মার সাধারণ কর্তৃত্ব কোথাও নিষিদ্ধ হয় নাই, কেবল বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার বিশেষ কর্তৃত্বই নিষেধ করা হইয়াছে। শব্দ স্পর্শাদিজ্ঞান ও সুখদুঃখাদি ভোগ সম্বন্ধেও ইহাই বুঝিতে হইবে।

অতএব আমরা দেখিতেছি যে, ব্রহ্ম নির্গুণ ও সগুণ উভয়ই। সগুণ ভাব বিকারী ও ক্রমাভিব্যক্ত; এই ভাবই নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপ দেখাইবে বলিয়া, পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। ব্রহ্মে কোন শক্তি ছিল না বা স্তম্ভিত আছে, সেই শক্তি পরে আসিয়াছে, এরূপ তাৎপর্য্য শঙ্করের নহে। সগুণ ভাবে বা প্রকৃতির প্রত্যেক কার্য্যেই, সেই নির্গুণ বা পূর্ণ স্বরূপেরই পরিচয় লইতে হইবে। শঙ্করের মায়াবাদের তাৎপর্য্য এইরূপ। গীতার ১৮ অধ্যায়ের ৪৮ শ্লোকের ভাষ্যে বৈশেষিক মতের যে খণ্ডন আছে, তাহা হইতেই বুঝা গিয়াছে যে, শঙ্করের ব্রহ্ম একাধারে নির্গুণ ও সগুণ দুই-ই। নির্গুণ ভাব পূর্ণ ও অনন্ত, এবং সগুণ ভাব অপূর্ণ ও বিকারী। অপূর্ণ ভাবই, পূর্ণ ভাবে আরোহণ করিবার সেতু।

আমরা এতদূরে এই ইন্দ্রবিরোচন সংবাদ শেষ করিলাম। এই উপাখ্যান হইতে আমরা নিম্ন সংগৃহীত বিষয়গুলির জ্ঞানলাভ করিয়াছি:—

১। এই দেহেই আত্মা অবস্থিত আছেন।

২। ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া এই আত্মা দ্বারাই নির্ব্বাহিত হইতেছে।

৩। দেহের জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই তিনটী অবস্থা।

৪। এই ত্রিবিধাবস্থার সহিত সম্বন্ধ বশতঃই আত্মাকে দেহের সঙ্গে লিপ্ত বলিয়া মনে হয়।

৫। এই ত্রিবিধাবস্থা ব্যতীতও, আত্মার আর একটী অবস্থা আছে। সে অবস্থায় আত্মা সর্ব্বাতীত, অসঙ্গ, উদাসীন এবং কেবল জ্ঞানস্বরূপ (জ্ঞানস্বরূপ বলাতেই আত্মাকে শক্তি স্বরূপ ও আনন্দস্বরূপও বলা হইল)।

৬। ইহাই আত্মার প্রকৃত স্বরূপ।

৭। ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতি এই আত্মার ক্রিয়ানির্ব্বাহক যন্ত্রমাত্র।

৮। ইন্দ্রিয়ের ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়াগুলি অন্তঃকরণেরই শক্তি বিশেষ। অন্তঃকরণের শক্তি আবার সেই আত্মারই সামর্থ্যমাত্র।

৯। অন্তঃকরণ আত্মারই নিত্যজ্ঞান, নিত্য শক্তি ও নিত্যানন্দের অভিব্যঞ্জক সামর্থ্যমাত্র। ইহা অপূর্ণ হইলেও, সেই পূর্ণেরই পরিচায়ক চিহ্নরূপে অবস্থিত আছে।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

(শ্রীম-কথিত)

উত্তর বিভাগ—প্রথম খণ্ড।

[নরেন্দ্র (স্বামী বিবেকানন্দ) ও তাঁহার গুরুভাইদের বৈরাগ্য ও সাধনাবস্থা]

আজ ২৫শে আগষ্ট, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ, বুধবার।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ সবে দশদিন ভক্তদের রাখিয়া স্বধামে গমন করিয়াছেন।

কলিকাতা বসুপাড়ায় বলরামের বাড়ীর বৈঠকখানায় নরেন্দ্রাদি ভক্তেরা আসিয়াছেন। যেন মাতৃহীন বালকেরা। তাঁহাদের দেখিলে ঠাকুরের অদর্শন জনিত শোকসাগর যেন উথলিয়া উঠে। সকলে ভাবিতেছেন, ঠাকুর স্বধামে গেলেন, আমরা এখন কি করি? ভক্তদের এমন কোন স্থান নাই যে কয়টী এক সঙ্গে থাকেন। রোজ নিজের২ বাড়ীতে যাইতে হইতেছে। ছোড়ভঙ্গ হইবার উপক্রম হইয়াছে। কেননা মণির হারের সূত্র খুলিয়া গিয়াছে। সবে দশদিন তিনি অদর্শন হইয়াছেন। আমরা কোথায় যাই, কি করি, তাঁহারা সর্ব্বদা এই ভাবিতেছেন। আর বিরলে বসিয়া তাঁহার চিন্তা আর অশ্রু বিসর্জ্জন।

নরেন্দ্র, রাখাল, কালী, শরৎ, শশী, তারক, গোপাল, ভবনাথ, মাষ্টার আসিয়াছেন। পরে নিরঞ্জনও আসিলেন।

সকলেই নরেন্দ্রের মুখ পানে চাহিয়া আছেন। নরেন্দ্র কয়েকটী ভাইকে বৃন্দাবনে পাঠাবেন। ভক্তদের কাছে টাকা যোগাড় করিতেছেন।

* * *

[নরেন্দ্র ও ঠাকুর রামকৃষ্ণের আদেশ—কামিনীকাঞ্চনত্যাগ।]

নরেন্দ্র এইবার কয়েকটী ভাই সঙ্গে করিয়া নিকটবর্ত্তী গিরীশের বাড়ী যাইতে-

ছেন। পথে মাষ্টারের সহিত কথা কহিতে কহিতে যাইতেছেন।

নরেন্দ্র। মাষ্টার মহাশয়, আপনি বাবুরামের এক পিটের ভাড়া দিন ?

মাষ্টার। আচ্ছা।

নরেন্দ্র। এক্ষণই।

মাষ্টার। এক্ষণেই ?

যে কয়টী ভাইকে বৃন্দাবনে পাঠাবেন স্থির করিয়াছেন, বাবুরাম তাঁহাদের ভিতর একজন। ভক্তেরা গিরীশের বৈঠকখানায় আসিয়া পেঁছিলেন। গিরীশকেও টাকার কথা বলিলেন।

গিরীশ। আমার কাছে এখন তত নাই। যদি চাও ১০।১১ টাকা দিতে পারি। এরা বৃন্দাবনে যাচ্ছে কেন ?

নরেন্দ্র (গম্ভীরভাবে)। তিনি বলে গেছেন, কামিনীকাঞ্চনত্যাগ করতে।

একজন ভক্ত। তুমিও কি যাবে ?

নরেন্দ্র। সকলেই বেরিয়ে পড়া যাক্। আমার একটু বাড়ীর কাজ আছে বটে। মোকর্দ্দামাটা এখনও চোকে নাই। (ঈষৎ চিন্তা করিয়া) আর মোকর্দ্দামা যা হয় হউক। কিছুই ত বোঝা গেল না! কেন আর ও সব মিছে করা।

রাখাল। আর এখানে থাকলেই সংসার টানে।

নরেন্দ্রের পিতার কাল হইয়াছে—ও ছোট ২ ভাই ভগিনীরা আছে—অভিভাবক আর কেহ নাই, আর ভরণ পোষণের কোন উপায় নাই। নরেন্দ্র বি-এ পাশ করিয়াছেন। তিনি মনে করিলে তাহাদের ভরণপোষণ করিতে পারেন। রাখালের বাড়ীতে পিতা, পরিবার ও শিশু সন্তান আছে।

কাঁকুড়গাছির বাগানের কথা হইতে লাগিল, বাগানের trustee নিযুক্ত হইবে।

রাখাল। নরেন্দ্রকে trustee করলে আমরা সকলে সন্তুষ্ট হই।

নরেন্দ্র। না না; কি হবে।

সকলে নরেন্দ্রকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তখন তিনি গিরীশকে বললেন, আচ্ছা তবে করবেন। নরেন্দ্র কিন্তু নিযুক্ত হন নাই।

[ঠাকুর রামকৃষ্ণের অদর্শনে ভক্তদের শোক।]

গিরীশের ঘরে মণি আর একটী ভক্তের কথা হইতেছে।

ভক্তটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। বলিলেন, তাঁর কাছে আর কিছু প্রার্থনা করবো না।

মণি। কোন বিষয়ে না ?

ভক্ত। না, কোন বিষয়ে আর প্রার্থনা করবো না। ভক্তির জন্যও না; সংসারের জন্যও না।

এই বলিয়া ভক্তটী আবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

ভক্ত। তিনি বলেছিলেন, এত দুখ কেন ? তারা সংসারী; পারবে কেন ?

এ কষ্ট কখন মন থেকে যাবে না।

কাশীপুরের বাগানে গৃহস্থ ভক্তরা ঠাকুরের সেবার্থ খরচ দিতেন। ঠাকুর সর্ব্বদা দেখতেন, যাতে তাদের বেশী খরচ না হয়।

ভক্ত। ইচ্ছা ছিল, একটী ডাক্তার সর্ব্বদা কাছে রাখবার বন্দোবস্ত হয়। তাত পারলাম না।

ভক্তটী কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। আবার বলিতেছেন—

"আচ্ছা তাঁর নাম করে আমি কি সংসা-

রের উন্নতির চেষ্টা করি? আমি কি চাচ্ছি যে লোকে আমায় ভাল বলবে, ধার্ম্মিক বলবে?

* * *

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বৃহস্পতিবার, ২রা সেপ্টেম্বর, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ।

শশী মাষ্টারের কাছে আসিয়াছেন। মাষ্টার কলিকাতায় গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেনে একটী বাসার ঘরে পড়িবার আড্ডা করিয়াছেন। সেই ঘরে তক্তপোষের উপর দুই জনে বসিয়া আছেন। শশী ও শরৎ তাঁহাদের পটলডাঙ্গার বাড়ীতে থাকেন। আজ শশী খুব ফরসা কাপড়, জামা ও চাদর পরিয়া আসিয়াছেন। হাতে একটী নূতন ছাতি। দুই জনে ঠাকুরের গল্প করিতে লাগিলেন।

মাষ্টার। ঠাকুর আমাকেও বলেছিলেন, এখানকার মধ্যে নরেন্দ্র প্রধান।

শশী। নরেন্দ্র আমাদের leader হবে, একথা গুরু মহারাজ বলেছেন, আমার বেশ মনে আছে।

মাষ্টার। আর লেখা পড়ার কথা কি বলেছিলেন, মনে আছে?

শশী (সহাস্যে)। বেশ মনে আছে। একদিন নরেন্দ্রকে বলেছিলেন, এদের লেখা-পড়া করতে দিস্‌নে।

মাষ্টার। আর কালীকে?

শশী। হাঁ বকেছিলেন। বলেছিলেন, তুইতো এখানে লেখা পড়া ঢোকালি!

"আমি পার্শি পড়তে আরম্ভ করেছিলাম। পার্শি পড়াতে আমাকে বকেছিলেন।

পরে শরতের সঙ্গে কথা হইতে লাগিল। ঠাকুর রামকৃষ্ণের নাম কবে প্রচার হইবে? কে প্রথম প্রচার করিবে?

মাষ্টার। তাঁর ভাব কে বুঝেছে। আচ্ছা বৈষ্ণবচরণের পুঁথির কথা তিনি কি বলতেন মনে পড়ে?

শরৎ। হাঁ মনে পড়ছে, তিনি বলেছিলেন 'বৈষ্ণবচরণ আমার সব অবস্থা জানতো—মনে করেছিলাম, সেই প্রথম প্রচার করবে।

নরেন্দ্র। * * * আমায় তিনি বলেছেন "ব্রহ্ম জ্ঞানই ঠিক।

এই প্রথম প্রচার করবে। তা হলো না। কেশব সেন প্রথম প্রচার করলে।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

[বরাহনগরে ঠাকুর রামকৃষ্ণের প্রথম মঠ]

(ভক্ত সুরেন্দ্র।)

প্রায় দুই মাস হইল তিনি স্বধামে চলিয়া গিয়াছেন। ভক্তদের স্নেহ-সূত্রে বাঁধিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা কোথায় যান; বাড়ী আর ভাল লাগেনা। এখন ইচ্ছা, পরস্পর মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকেন ও তাঁহার চিন্তা ও তাঁহার কথাবার্ত্তা রাত্রি দিন করেন। দুই তিনটী ভক্তের ফিরিয়া যাইবার বাড়ীও নাই। সুরেন্দ্র তাঁহাদের বলিলেন, ভাই তোমাদের থাকিবার স্থান নাই; আর আমাদেরও জুড়াইবার স্থান নাই। এসো বরাহনগরে একটী বাসা করা যাউক। তোমরাও থাকিবে, আর আমরাও সেখানে মাঝে মাঝে যাইব।

সুরেন্দ্র কাশীপুরের বাগানে ঠাকুরের সেবার্থ ৫০্ টাকা করিয়া দিতেন। তিনি বলিলেন, ভাই আমি ঠাকুরের সেবার জন্য যৎকিঞ্চিৎ দিতাম, তাহাই এই বাসা খরচের জন্য দিব।

ক্রমে নরেন্দ্রাদি অবিবাহিত ভক্তগণ ঐ মঠে গিয়া রহিলেন। আর সংসারে ফিরি-

লেন না। মঠের ভাইদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সুরেন্দ্র ক্রমে ১০০্ একশত টাকা পর্য্যন্ত মঠের খরচ দিতেন।

ধন্য সুরেন্দ্র! এই প্রথম মঠ তোমারি হাতে গড়া। তোমার সাধু ইচ্ছায় এই আশ্রম হইল! তোমাকে যন্ত্র স্বরূপ করিয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাঁহার মূলমন্ত্র কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ মূর্ত্তিমান করিলেন। বৈরাগ্যবান শুদ্ধাত্মা কুমার নরেন্দ্রাদি ভক্তের দ্বারা আবার সনাতন হিন্দু ধর্ম্মকে জীবের সম্মুখে প্রকাশ করিলেন। তোমার ঋণ কে ভুলিবে! মঠের ভাইরা মাতৃহীন বালকের ন্যায় থাকিতেন—তোমার অপেক্ষা করিতেন কখন তুমি আসিবে। আজ বাড়ী ভাড়া দিতে সব টাকা গিয়াছে—আজ খাবার কিছু নাই—কখন তুমি আসিবে, ভাইদের খাবার বন্দোবস্ত করিয়া দিবে। তোমার অকৃত্রিম স্নেহ স্মরণ করিলে কে না অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিবে!

[নরেন্দ্র ও জ্ঞান-যোগ]

বরাহনগরের মঠ। ঠাকুরঘরের পূর্ব্ব দিকের বারাণ্ডায় নরেন্দ্র ও মণি, চাঁদের আলোতে বেড়াইতেছেন। আজ কোজাগর লক্ষ্মী পূজা। অক্টোবর মাস, ১৮৮৬ সাল। উভয়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথা কহিতেছেন। জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের কথা হইতেছে।

মণি। তিনি ত দুই-ই পথ বলিতেন। দুই পথ দিয়েই এক জায়গায় যাওয়া যায়। জ্ঞান যেখানে নিয়ে যায়, ভক্তিও সেইখানে নিয়ে যায়।

নরেন্দ্র। তা বলতেন বটে। কিন্তু একটা কথা আপনাকে বলি। অতি গুহ্য কথা। কারুকে বলবেন না।

মণি। কি বলো না।

নরেন্দ্র। * * আমায় তিনি বলেছেন "ব্রহ্মজ্ঞানই ঠিক। ভক্তি বাহিরের দেখাবার জিনিষ। হাতির বাহিরের দাঁত আর ভিতরের দাঁত; বাহিরের দাঁত শোভার জন্য, ভিতরের দাঁতে কাজ হয়।"

মণি। ভক্তি পথে গেলেও ব্রহ্মজ্ঞান হয়, এ কথাও ত বলেছেন। জ্ঞান পথে ব্রহ্ম জ্ঞান হয়, আবার ভক্তি পথেও ত হয়। আরও বলতেন, তোমার বোধ হয় মনে আছে, ব্রহ্মজ্ঞানের পর কেউ ২ ভক্তি নিয়ে থাকে। 'লীলা থেকে নিত্য, আবার নিত্য থেকে লীলা।'

নরেন্দ্র। যে দিন ব্রহ্মজ্ঞানের কথা কাশীপুরের বাগানে বলেন—সেদিন আপনি ছিলেন?

মণি। আমি সে সময়টা ছিলাম না। কিন্তু শুনিছি, অনেকক্ষণ ধরে কথা হয়েছিল। শুকদেবের কথা কি বল্লেন, তোমার মনে আছে?

নরেন্দ্র। মনে একটাও পড়ছেনা।

মণি। সেই চিনির পাহাড়ের পক্ষে শুকদেব হদ্দ একটা ডেও পীপড়ে; শিব সেই সাগরের জল হদ্দ স্পর্শ করেছেন, জোর এক গণ্ডূষ খেয়েছেন।' এই সব কথা নাকি হয়েছিল।

নরেন্দ্র। হাঁ এই রকম অনেক কথা হয়েছিল।

[নরেন্দ্রের দর্শন (Vision) ও অহংত্যাগ।]

মঠের ভাইদের কথা হইতে লাগিল।

মণি। এখন তোমার উপর সব নির্ভর। এদের সব তোমাকে দেখেতে হবে।

নরেন্দ্র। অহংকার হলেই মুস্কিল। হ—কে একটু ঘৃণা আর শাসন করেছিলাম। অমনি তিনি কি দেখালেন জান? তিনি যেন

বলছেন, তুই কি ভেবেছিস্? জানিস্ এদের ভিতর যে খুব ছোট, তাকেও আমি সকলের বড় করতে পারি, আবার যে সকলের বড় তাকে আমি ছোট করতে পারি। * আমি ঐরূপ তাঁকে দর্শন করা অবধি সাবধান হয়ে গেছি।

'The least shall be the greatest and the greatest least.'

মণি। তা বটে। তাঁকে লাভ করা সে তাঁরই কৃপা। বড় করতেও তিনি, ছোট করতেও তিনি। তাঁকে কি নিজের শক্তিতে পাওয়া যায়? তাঁর কৃপা চাই।

[নরেন্দ্রের ঈশ্বর দর্শনার্থ ব্যাকুলতা]

নরেন্দ্র গান করিলেন—যেন ঈশ্বর লাভ সম্বন্ধে ক্ষীণাশা হইতেছেন

'শ্যামাধন কি সবাই পায়!'

নিকটের ঘরে গিয়া বসিলেন। নরেন্দ্র সমস্ত গানটী গাইলেন—

গান।

শ্যামাধন কি সবাই পায়,
অবোধ মন বুঝেনা একি দায়।
শিবেই অসাধ্য সাধন মন মজান রাঙ্গা পায়॥
ইন্দ্রাদি সম্পদ সুখ তুচ্ছ হয় যে ভাবে মায়
সদানন্দ সুখে ভাসে শ্যামা যদি ফিরে চায়॥
যোগীন্দ্র,মুণীন্দ্র, ইন্দ্র, যে চরণ ধ্যানে না পায়
নির্গুণে কমলাকান্ত—তবু সে চরণ চায়॥

আর এক ঘরে গিয়া নরেন্দ্র বসিলেন। নরেন্দ্র কি ভাবিতেছেন? ঠাকুর রামকৃষ্ণের প্রেমমূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়ে কি হঠাৎ জাগিয়া উঠল? নরেন্দ্র গান ধরিলেন—

গান।

ধরম করম সকলি গেল লো
শ্যামা পূজা মম হলোনা।
মন নিবারিতে নারি কোন মতে
ছি ছি কি জ্বালা বলনা।
দিতে পুষ্পাঞ্জলি মায়ের চরণে
ত্রিভঙ্গিম ঠাম পড়ে সখি মনে।
পীত বসনে হেরিগো নয়নে
ভাবিতে দিক রসনা।
ভাবি নরমালী কালী অসি করে,
হেরি বনমালি বাঁশরী অধরে,
ত্রিনয়না ধ্যানে বঙ্কিম নয়নে
হেরে হই সই বিমনা॥
একিলো একিলো ছলনা, মোরে
নিদয়া হর ললনা॥

গানের পর নরেন্দ্র একটু চুপ করিয়া রহিলেন। হঠাৎ বলিলেন, চল্ শ্মশানে যাই।

কিয়ৎক্ষণ পরে বলিতেছেন, বাবা! শ্মশান নয় যেন বৈঠকখানা! (সকলের হাস্য)

মঠের নিকটেই পরামাণিকের ঘাট। সেই ঘাটের অদূরে শ্মশান। শ্মশান ভূমি প্রাচীর বেষ্টিত। ভূমির পূর্ব্ব ধারে ২।৩ খানি পাকা ঘর। তাই নরেন্দ্র বলিতেছেন, যেন বৈঠকখানা। নরেন্দ্রাদি ভক্তেরা সাধনের জন্য রাত্রে একাকী কখনও কখনও ঐ শ্মশানে গিয়া থাকিতেন।

* * *

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী এখন বৃন্দাবন ধামে আছেন। নরেন্দ্র ও মাষ্টার তাঁহার কথা বলিতেছেন। কাশীপুরের বাগানে একদিন ভক্তেরা ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছে তাঁহাদের প্রতি শ্রীশ্রীমার স্নেহের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। মা তখন ঠাকুরের সেবার্থ ঐ বাগানে ছিলেন। ভক্তেরা ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন, এমন মহৎ হৃদয় তাঁহারা কখন দেখেন নাই।

---

* Compare দেবী-সূক্ত।

মাষ্টার। পরমহংস মহাশয় কি বললেন?

নরেন্দ্র। তিনি হাঁসতে লাগলেন, আর বললেন 'আমার শক্তি কিনা, তাই এইরূপ।'

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[নরেন্দ্র ও গীতোক্ত কর্ম্ম।]

বরাহনগরের মঠ। আজ শুক্রবার ১৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৭। বেলা প্রায় ১২॥ টা হইবে। নরেন্দ্র ও অন্যান্য মঠের ভাইরা আছেন। হরমোহন ও মাষ্টার আসিয়াছেন। শশী ঠাকুর সেবা লইয়া আছেন।

নরেন্দ্র গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেছেন।

নরেন্দ্র। গীতাতে জপ তপাদির কথাই বলেছেন।

মণি। কেন? তা হলে অর্জ্জুনকে উপদেশ দেওয়া কেন?

নরেন্দ্র। সংসারের কর্ম্ম বলে নাই।

মণি। অর্জ্জুনকে যে কালে যুদ্ধ করতে বলা হলো, আর অর্জ্জুন যে কালে সংসারে ছিলেন, তা হলে সংসারের কর্ম্ম অনাসক্ত হয়ে করতে বলা হয়েছে।

নরেন্দ্র কর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার এই মত পরে পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। আমেরিকাতে যে কর্ম্ম যোগ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন, তাহাতে সংসারের কর্ম্ম অনাসক্ত হইয়া করিতে বলিয়াছেন। যখন প্রথম সন্ন্যাস করেন, তখন সংসারের কর্ম্ম সম্বন্ধে যারপর নাই বীত-রাগ হইয়াছিলেন। তাই গীতার উদ্দেশ্য জপতপাদি কর্ম্ম বলিয়াছিলেন।

একটী গৃহস্থ ভক্ত একজন মঠের ভাই-এর সহিত কথা কহিতেছেন। তাঁর ইচ্ছা মঠে থেকে যান। মঠের বিশুদ্ধ ভাব দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছেন, সংসার আর ভাল লাগেনা। তাঁহারা রান্নাঘরের দক্ষিণের বারাণ্ডায় বসিয়া কথা কহিতেছেন। এ দিকে নিরঞ্জন রান্না ঘরে আছেন।

গৃহস্থ ভক্ত। যদি মঠে থেকে যাই তা হলে পরিবারদের maintenance এর জন্য কি নালিশ চলে?

মঠের ভাই। না তা কেন চলিবে? সে আপনি যদি চাকরী করেন, তাহলে চলতে পারে।

নিরঞ্জন (রান্নাঘর হইতে)। ওরে ছোঁড়া, কি কচ্ছিস্? কি মন্ত্রণা দিচ্ছিস্? কি করিস? (সকলের হাস্য)

নরেন্দ্র গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। কালী তপস্বীও গঙ্গা স্নান করিয়া আসিলেন। কালী * তখন সর্ব্বদা বেদান্ত বিচার করেন। তখন তাঁহার 'আমি ভক্ত তুমি ভগবান' এ ভাব নাই। সর্ব্বদা বিচার করেন 'আমি' সেই; আমার নাম রূপ নাই। তাই স্নানের পর ঘরে আসিয়া বেদান্ত বাক্য উচ্চারণ করিতে লাগিলেন।

'নামরূপব্যতীতমব্যয়ং।
অহম অহম।'

নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং তুভ্যং মহ্যং নমো নমঃ।

ভক্তেরা প্রসাদ পাইতে বসিবেন।

মঠে কেবল একটী পাকে ব্রাহ্মণ আছেন। চাকর নাই; আহারান্তে প্রত্যেকে উচ্ছিষ্ট পত্র হাতে করিয়া ফেলিয়া দিলেন। মাষ্টারের উচ্ছিষ্ট পত্র নরেন্দ্র হাতে করিয়া ফেলিয়া দিলেন। মাষ্টার অনেক আপত্তি করিলেন। নরেন্দ্র বলিলেন "এখানে Republic."

* স্বামী অভেদানন্দ। এখন New York এ আছেন।

দানাদের ঘরে (বৈঠকখানায়) ভক্তেরা বসিয়াছেন। পান ও তামাক খাইতেছেন।

রাখাল (শ্রীম-র প্রতি)। আপনার কাছে একদিন যাবো। পরমহংস মহাশয়ের বিষয় কি লিখেছেন, শুনতে যাবো।

শ্রীম। সে মনে করেছি জীবন না বদলালে কারুকে বল্‌বনা। তাঁর কথা মন্ত্রের স্বরূপ—জীবনে করতে চেষ্টা করা ভাল নয় কি ?

রাখাল। তা বটে। আচ্ছা আপনার সংসার কেমন লাগে ?

শশী। ওরে রাখাল lecture দিচ্ছে।

রাখাল (সহাস্যে শ্রীম—র প্রতি)। এখানে আমার আগে আসতে ইচ্ছা যায় নাই। এখন দেখছি এদের সঙ্গ বড় ভাল। *

এইবার নরেন্দ্র তামাক খাইতে ২ কথা কহিতেছেন।

নরেন্দ্র। কোন্ মানুষের ভিতর পদার্থ আছে ? সব হেয়—একজন ছাড়া। আর সব পা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলিতে ঘৃণা হয়। নিজের শক্তি কার আছে ? সব অবস্থার অধীন। অবস্থার দাস।

"তবে একথা বলছি যে আমারই মত সকলেই দাস—sport of circumstances.

রাখাল হাসিতে ২ ফিস ২ করিয়া হরমোহনকে শিখাইয়া দিলেন, অমুক দাদা কি রকম জিজ্ঞাসা কর। হরমোহন নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অমুক দাদা কেমন ?

নরেন্দ্র। তবে বল্‌বো কুত্তা—হেয়। যদি সাধু হবে, তবে টাকা রেখেছে কেন ? সাধুর আবার টাকা কি ? একজন মঠের ভাই। সব্বাই কুত্তা, উনি একজন যা আছেন। উনি বোধ হয় mediator. (সকলের হাস্য)

নরেন্দ্র। তা বলছি। আমার মত কুত্তা। যে circumstance এর দাস, সে কুত্তা নয় ত কি ? নিজের কিছু শক্তি আছে ?

মাষ্টার (স্বগত)। circumstance না ঈশ্বর ? ঠাকুর রামকৃষ্ণ কি বলতেন ? 'রামের ইচ্ছা'।

নরেন্দ্র। "টাকা যার রয়েছে সে আবার সাধু কি ? তার উপর আবার lecture (লোককে শিক্ষা দেওয়া) ? preaching করে ! লজ্জা করে না ?

[নরেন্দ্র ও বুদ্ধ।]

হরমোহন। আচ্ছা যদি কারুর ভাব কি সমাধি হয়, তা হলে সেতো মহৎ !

নরেন্দ্র। আরে বুদ্ধ পড়্‌গিয়ে যা ! গীতাই বল আর শঙ্করাচার্য্যই বল, শঙ্করের শেষ কথা নির্ব্বিকল্প সমাধি বুদ্ধের প্রথম অবস্থা।

এক জন ভক্ত। নির্ব্বিকল্প সমাধি যদি প্রথম অবস্থা হয়,তাহলে ওর পরে সব stage ত আছে ? দু একটা বলনা। অবশ্য বুদ্ধ তা হলে কিছু বলে গেছেন ?

নরেন্দ্র। কি জানি।

ভক্ত। নির্ব্বিকল্প সমাধি যদি বুদ্ধের প্রথম অবস্থা হয়,—তাহলে 'অহিংসা পরম ধর্ম্ম' এ মত পরে রাখলেন কেন ?

নরেন্দ্র। ওটা বোঝা যায় না। তবে বৈষ্ণবেরা শিখেছে বুদ্ধের কাছে।

ভক্ত। বুদ্ধের কাছে অহিংসা শিখতে হবে, এমন কি কথা। এমন ত অনেক শোনা যায়,কারুর কাছে উপদেশ না পেয়েও লোক আপনাপনি মাছ ত্যাগ করেছে। তাই বৈষ্ণবেরা যে বুদ্ধের কাছে শুনেই জীবহিংসা ত্যাগ করেছে, তা না হতে পারে।

---

* শশী—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ Madras-মঠের প্রধান ইনি কলেজে B.A পড়িয়াছিলেন।

নরেন্দ্র। যদি না শুনে না উপদেশ পেয়ে কেউ ত্যাগ করে, তবে বলতে হবে Hereditary transmission—অর্থাৎ পিতা পিতামহের কাছ থেকে সেই সংস্কার লাভ করেছে।

ভক্ত। তা যদি বল তা হলে ইউরোপে অনেকে যে জীবহিংসা ত্যাগ করে, তার অর্থ কি? তারা ত গরুখেকো জাত। তারা ত আর বুদ্ধের কাছে শিখে নাই।

নরেন্দ্র। বুদ্ধ কিন্তু ঐটা discover করেছিলেন।

মাষ্টার (স্বগতঃ)। বাহ! ভক্তেরা সকলেই এক এক জন বীর। Independent thinker শুধু নরেন্দ্র নয়! তা হবে না? কার শিষ্য। তিনি যে সকলকে হাতে গড়ে তয়ের করেছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নরেন্দ্র গীতা পড়িতেছেন ও ভাইদের বুঝাইয়া দিতেছেন। নিম্নলিখিত এই দুটী শ্লোক বিশেষ করিয়া ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন ও ভক্তদের সহিত উহা সম্বন্ধে বিচার করিতে লাগিলেন।

১ম শ্লোক—কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে।

২য় শ্লোক—ইন্দ্রিয়ানি ইন্দ্রিয়ার্থেষু—

গীতা কিয়ৎক্ষণ পাঠের পর বলিলেন, আমি চললাম, তোমরা মাষ্টার মশায়কে নিয়ে আনন্দ কর। নরেন্দ্রের কিন্তু যাওয়া হইল না। বাবুরাম বলিলেন, আমি অত গীতা ফিতা বুঝি না। গুরু মহারাজ বেশ বলেছেন 'ত্যাগী ত্যাগী।'

শশী। ত্যাগী ত্যাগী এর মানে কি জানিস্? আমি যেন কল, একটী যন্ত্র, এইটী মনে করে থাকা।

প্রসন্ন নির্জ্জনে কালী তপস্বীর ঘরে গীতা পড়িতে চলিলেন। শরৎ সেই ঘরে নির্জ্জনে ইংরাজি দর্শন শাস্ত্র পড়িতেছেন—Luwi's History of Philosophy. আর একটী মঠের ভাই ঠাকুর ঘরে ধ্যান করিতে লাগিলেন।

[নরেন্দ্র ও ঈশ্বরের রূপ দর্শন।]

এইবার ঈশ্বরের রূপ দর্শন সম্বন্ধে কথা হইতেছে।

নরেন্দ্র। ও সব ভুল।

রাখাল। কেন তোমারও ত হয়?

নরেন্দ্র। সে সব brain এর বিকৃত অবস্থার দরুণ হয়; যেমন Hallucination (সকলের [illegible])

মণি। তুমি যাই বল ভাই, তাঁর যে কালে রূপ দর্শন হতো, সে কালে মস্তিষ্কের বিকার কেমন করে বলা যায়? শিবনাথ বলেছিল, বেহেড্ হয়—তখন ঠাকুর বলেছিলেন, মনে আছে তো, 'চৈতন্যকে চিন্তা করে কেউ কি অচৈতন্য হয়?'

* * *

নরেন্দ্রাদি মঠের ভাইরা পান খাবার ঘরে একত্রিত হইয়াছেন, কেহ বসিয়া, কেহ দাঁড়াইয়া, কেহ পান খাইতেছেন, কেহ তামাক খাইতেছেন। বসন্তকাল—প্রকৃতি আনন্দময়ী; মঠের ভাইরাও যেন সদানন্দ পুরুষ। একে কৌমার বৈরাগ্য, তাহাতে অহর্নিশি ঈশ্বর চিন্তা, আবার সম্মুখে মহৎ আদর্শ শ্রীগুরুদেব ঠাকুর রামকৃষ্ণ। আনন্দে ভাইরা মাঝে ২

'বা গুরু জি কি ফত্তে'

অর্থাৎ 'শ্রীগুরুদেবের জয়' শিখ ভক্তদের এই মহামন্ত্র মাঝে ২ সমস্বরে ওঁকারের সহিত উচ্চারণ করিতেছেন। নরেন্দ্র তাঁহাদের এই জয়ধ্বনি শিখাইয়াছেন।

মাষ্টার শরৎকে ধরিলেন। ঐ জয় ধ্বনি এক ক্রমে এক শ০বার বলিতে হইবে। তাঁর শুনিয়া বড় আনন্দ হইয়াছে।

নরেন্দ্র। ফরমাসে কি ও সব হয়? নিজে ধরিয়ে দিতে হয়।

বলরাম তাঁহার বোসপাড়ার বাড়ী হইতে মিষ্টান্ন পাঠাইয়াছেন। কচুরিগুলি বড় উপাদেয় হইয়াছে। ভক্তেরা একসঙ্গে বসিয়া ঐ সকল জলযোগ করিতেছেন। একজন ভক্ত বেশী খাবার চেষ্টা করিতেছেন।

নরেন্দ্র। (ভক্তের প্রতি) যা শালা লোভী! বেশী খাবার চেষ্টা!

[মঠে নরেন্দ্রাদি ভক্তদের ঠাকুর সেবা।]

সন্ধ্যা হইল। শশী, ঠাকুরের ঘরে ধুনা দিলেন ও সুমধুর নাম করিতে২ ঠাকুর প্রণাম করিলেন। পরে যত ঘরে যত ঠাকুরদের পট ছিল, সম্মুখে আসিয়া নামোচ্চারণ করিয়া প্রণাম করিলেন ও ধুনা দিলেন। মধুর কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—শ্রীগুরুদেবায় নমঃ; (কালিপটের কাছে আসিয়া) শ্রীকালিকায় নমঃ; (ষড়ভুজ মহা প্রভুর কাছে আসিয়া) শ্রীষড়ভুজায় নমঃ; (রাধাকৃষ্ণের পটের কাছে আসিয়া) শ্রীরাধাবল্লভায় নমঃ; (নিত্যানন্দাদি) ভক্তদের পটের কাছে আসিয়া) শ্রীঅদ্বৈতায় নমঃ, ভক্তেভ্য নমঃ; (যশোদার কাছে গোপাল, এই পটের কাছে আসিয়া) শ্রীগোপালায় নমঃ, শ্রীযশোদায়ৈ নমঃ; (বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রাম লক্ষ্মণ এই পটের কাছে আসিয়া) শ্রীরাম লক্ষ্মণাভ্যাম্ নমঃ, শ্রীবিশ্বামিত্রায় নমঃ।

বুড় গোপাল আরতি করিতেছেন। ভক্তেরা সকলে আরতি দেখিতেছেন। দালানের ঘরে নরেন্দ্র মাষ্টার ইত্যাদি আছেন। মাষ্টার বলিলেন, নরেন্দ্র বাবু, এস আরতি দেখি গিয়ে। নরেন্দ্র বলিলেন, হাঁ চলুন। নরেন্দ্রের কিন্তু কার্য্যগতিকে আরতি দেখিতে যাওয়া হইল না।

ভক্তেরা আরতি করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন—

জয় শিব ওঁকার
ভজ শিব ওঁকার

রাত্রে ভক্তেরা এক সঙ্গে বসিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করিতেছেন। প্রত্যেকে কয়েক খানা করিয়া আটার রুটি, একটা তরকারি ও একটু গুড় পাইয়াছেন। মাষ্টারও সঙ্গে বসিয়া খাইতেছেন। বাবুরাম পরিবেশন করিতেছেন। মাষ্টার নরেন্দ্রের পার্শ্বে বসিয়াছেন। তাঁহার পাতে দু এক খানা পোড়া রুটি পড়িয়াছে দেখিয়া নরেন্দ্র ভাল রুটি তুলিয়া২ দিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রের সকল দিকে দৃষ্টি।

ভক্তেরা রাত্রে একসঙ্গে বসিয়া আছেন। মঠের একজন ভাই মাষ্টারকে বলিতেছেন, আজ কাল মার গান বড় একটা হয় না। আপনি একটা গাননা। গুরু মহারাজের সেই গানটী—

গান।

কখন কি রঙ্গে থাক মা শ্যামা সুধা তরঙ্গিনী।
তুমি রঙ্গে ভঙ্গে অপাঙ্গে অনঙ্গে দাও জননী॥
লম্ফে, ঝম্পে কম্পে সদা অসি ধর কপালিনী,
তুমি ত্রিগুণা ত্রিপুরা তারা ভয়ঙ্করা কাল কামিনী।
সাধকের বাঞ্ছাপূর্ণ কর নানা রূপধারিণী।
কভু কমলির কমলে থাক মা, পূর্ণব্রহ্ম-সনাতনী॥

রাখাল মাষ্টারেরর সহিত গল্প করিতে করিতে বলিতেছেন 'কাশীতে এক একবার যাবার ইচ্ছা হয়। এক একবার একলা২ বেড়াতে ইচ্ছা হয়।'

রাখালের গৃহে পিতা, পরিবার ও একটী ছেলে। সমস্ত ত্যাগ করে এসেছেন। ভগবানের জন্য। এখন তাঁহার তীব্র বৈরাগ্য। মন সর্ব্বদা ভগবানের জন্য ব্যাকুল। তাই একলা বেড়াতে ইচ্ছা হয়।
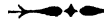
সমাজ ও তাহার আদর্শ। (১০)

৭২। অতএব আমরা বুঝিতে পারি যে, নিম্ন জাতীয় জীবের সুখদুঃখানুভূতি নিতান্ত সামান্য। প্রকৃতির ক্রমআপূরণে যতই জীবত্বের ক্রমবিকাশ হইতে থাকে, যতই জীব নিম্ন জাতি হইতে উচ্চতর জাতিতে আরোহণ করিতে থাকে, ততই তাহার সুখদুঃখানুভূতি শক্তি বৃদ্ধি হইতে থাকে। মানুষেই সুখদুঃখানুভূতি শক্তির পূর্ণবিকাশ হয়। এই জন্য—অর্থাৎ জড়ে সুখদুঃখানুভূতি নাই বলিয়া, ও ইতর-জীবের সুখদুঃখানুভব শক্তি মানুষের তুলনায় সামান্য বলিয়া, জড় ও ইতরজীবের কথা ছাড়িয়া দিয়া, (১) আমরা মানুষের সুখদুঃখের কথা বুঝিতে চেষ্টা করিব। মানুষে চৈতন্যের বিশেষ বিকাশ হয়, জ্ঞানের বিশেষ বিকাশ হয়। জীবের যখন জ্ঞান বা চৈতন্যের বিশেষ অভিব্যক্তি থাকে না, বলিয়াছি ত, তখন স্বয়ং প্রকৃতি তাহার বিকাশের জন্য তাহাকে পরিচালিত করেন,—কর্ম্মে নিরত করেন। পরে মানুষে যখন সেই জ্ঞানের বিশেষ বিকাশ হয়, তখনও প্রকৃতি সেই জ্ঞানশক্তির সহায়ে মানুষকে পরিচালিত করিতে চেষ্টা করেন। আমরা পূর্ব্বে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, মানুষে এই জ্ঞানের বিশেষ বিকাশ সত্বেও,—তাহার বিকাশের উপযোগী,—তাহার শরীরগঠন ও রক্ষার উপযোগী অধিকাংশ কর্ম্ম প্রকৃতি নিজে প্রাণ-শক্তিরূপে—মানুষের অজ্ঞাতসারে সম্পাদন করেন। প্রাণ-শক্তির সমুদায় কর্ম্ম আমাদের অজ্ঞাতসারে—আমাদের বিনা চেষ্টায় সম্পাদিত হয়। কিন্তু এই শরীর সংগঠন ও রক্ষার জন্য—প্রাণশক্তির প্রাণকর্ম্ম সম্পাদন জন্য নানা উপকরণের প্রয়োজন। ইহার মধ্যে

(১) আমরা ইতর জীবের একরূপ দুঃখের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। জীব জীবের খাদ্য, আমরা এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। আমরা এ পক্ষে বলিতে পারি যে, এই জীব মধ্যে উদ্ভিদ অপর জীবের খাদ্য হইলেও, তাহাতে তাহার দুঃখানুভব হয় না। নিম্ন জাতীয় জীব অপেক্ষাকৃত উচ্চ জাতীয় জীবের খাদ্য-রূপে শরীর ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেও, তাহাতে তাহার দুঃখবোধ বড় অধিক হয় না। যাহা হউক, উচ্চ শ্রেণীর জীবের মধ্যে প্রাণীহিংসাকারী জীব জাতির সংখ্যা উদ্ভিদ বা নিরামিষভোজী জীবজাতির সংখ্যা অপেক্ষা নিতান্ত অল্প। আর পৃথিবীতে জীব-জাতির ক্রমোন্নতিতে সেই সকল প্রাণীহিংসাকারী জীবজাতির এবং সেই জাতির অন্তর্গত ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিতেছে। মানুষ যে স্বভাবতঃ নিরামিষভোজী শস্যজীবী—তাহা আধুনিক অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত স্বীকার করেন। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ—উদ্ভিদ বা শস্য ভোজী। সাধারণতঃ রাজসিক তামসিক প্রকৃতির লোক বা রাক্ষস ও পিশাচ প্রকৃতির লোক মাংসভোজী। বিজ্ঞানের ও সভ্যতার ক্রমোন্নতিতে সাত্বিকতা বা ধর্ম্মপ্রবৃত্তির ক্রমোন্নতিতে মানুষ মাংসভোজন ত্যাগ করিয়া নিরামিষভোজী হইয়া থাকে। অতএব জীব জীবের খাদ্য হইলেও প্রকৃতির ক্রমআপূরণে যে সকল জীবের মৃত্যুতে দুঃখ হয়, মৃত্যুতে জীবত্ব বিকাশে ক্ষতি বা বাধা হয়, তাহাদের খাদ্যরূপে বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিতেছে।

বায়ু প্রভৃতি কতক বিষয় প্রকৃতি আমাদের বিনা চেষ্টায় বাহ্যজগৎ হইতে আপনিই সংগ্রহ করিয়া লন। কতক আমাদের দ্বারা ও অপরের দ্বারা সংগ্রহ করাইয়া লন। আমাদের শৈশব অবস্থায়—যখন আমাদের জ্ঞান বা কর্ম্মশক্তি বিকাশিত হয় না, তখন প্রকৃতি আমাদের জন্য অন্যকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইয়া, আমাদের বিকাশের উপযোগী সেই সকল উপকরণ সংগ্রহ করিয়া লন। ক্রমে যখন আমাদের জ্ঞান ও কর্ম্মশক্তির বিকাশ হইতে থাকে, তখন প্রকৃতি স্বাভাবিক প্রবৃত্তিরূপে বা সহজজ্ঞানরূপে আমাদের অন্তরে অধিষ্ঠিত থাকিয়া আমাদিগকে শরীর রক্ষাদি কর্ম্মে প্রবৃত্ত করান। প্রকৃতি এইরূপে আমাদের জ্ঞানকে বিকাশিত করিয়া দিয়া, আমাদের অহঙ্কারকে বা কর্ত্তৃত্বঅভিমানকে বিকাশিত করিয়া দিয়া, কতক কর্ম্মভার আমাদের হস্তে অর্পণ করেন—সুখদুঃখানুভূতিরূপ পথদর্শকের সহায়ে জ্ঞানকে পরিচালিত হইয়া কর্ম্ম করিতে ইঙ্গিত করেন। জ্ঞান তখন এইরূপে প্রকৃতির দ্বারা পরিচালিত হইয়া কর্ম্মে রত হয়—প্রকৃতির দাসরূপে প্রকৃতির প্রেরণায় কর্ম্ম করে।

আর সকল স্থলেই যে জ্ঞান প্রথমে বিকাশিত হইয়া এইরূপে প্রকৃতির প্রেরণায় কর্ম্ম করে, তাহা নহে। শরীর রক্ষার্থ ও পোষণার্থ প্রাণকর্ম্ম প্রভৃতি অনেক কর্ম্ম যেমন প্রকৃতি সকল অবস্থায় আমাদের জ্ঞান ইচ্ছা বা কর্ম্মবৃত্তির সাহায্য না লইয়া সম্পাদন করেন বলিয়াছি, তেমনই অনেক স্থলে আরও কতক কর্ম্ম প্রকৃতি আমাদের অজ্ঞাতসারে সম্পাদন করেন। শরীরতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, যেমন আমাদের কতক কাজ জ্ঞানকৃত (voluntary) তেমনই আরও কতক কাজ অজ্ঞানকৃত (involuntary, reflex বা spontaneous)। বাহ্যবিষয় অনুভূতিকালে ইন্দ্রিয়দ্বারে বিষয়ের যে সম্পর্ক হয় বলিয়াছি, তাহার ক্রিয়া জ্ঞাননাড়ী দিয়া মস্তিষ্কের নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলে, তদধিষ্ঠিত চৈতন্য বা বুদ্ধি, তাহা গ্রহণ করিয়া প্রয়োজন হইলে কর্ত্তব্য স্থির করে, ও তদনুসারে কর্ম্ম করে। এইরূপ কর্ত্তব্য স্থির করিতে করিতে যে অভ্যাস বা সংস্কার হইয়া যায়, তাহাতে পরে সেই কর্ত্তব্য স্থির জন্য যে জ্ঞানক্রিয়া হয়, তাহা অতি সহজে ও সহসা সম্পাদিত হয় বলিয়া, সে জ্ঞানক্রিয়ার আয়াস আমরা বুঝিতে পারি না। তাই সে অভ্যাস বা সংস্কারজ কর্ম্ম অনেক সময় আমাদের জ্ঞানজ নহে বলিয়া বোধ হয়। একটা 'ক' লিখিতে কত আয়াসের প্রয়োজন, তাহা বালক যখন 'ক' লিখিতে শিখে তখন বুঝিতে পারে। ক্রমে লেখা আমাদের এমনই অভ্যস্ত হইয়া যায় যে, আমরা গল্প করিতে করিতে, সে গল্পে মনোনিবেশ করিয়া ও পত্র লেখায় মন না দিয়া, আমরা অনর্গল লিখিয়া যাইতে পারি। সেই অভ্যস্ত সংস্কারজ সহজ কর্ম্মে তখন বিশেষ জ্ঞানক্রিয়ার প্রয়োজন হয় না। ইহা ব্যতীত কতকগুলি কর্ম্ম আছে—তাহা আদৌ এরূপ জ্ঞানজ নহে। সেই সকল কর্ম্মকালে বাহ্যবিষয় সংস্পর্শে ইন্দ্রিয়দ্বারে জ্ঞাননাড়ীতে কোন ক্রিয়া হইলে, তাহার প্রতিক্রিয়া আমাদের কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কর্ম্মনাড়ীতে (motor nerves) স্বতঃ উৎপন্ন করে। তাহাতে যে কার্য্য আরম্ভ হয়, সে কার্য্যে আমাদের জ্ঞানের হাত থাকে না। শরীরের কোন স্থানে হঠাৎ কোন বিপদের সম্ভাবনা হইলে, প্রকৃতি আপনিই সতর্ক হইয়া

সে বিপদ হইতে শরীরকে উদ্ধারের উপায় করেন। কেন না, তখন জ্ঞানকে সংবাদ দিয়া তাহার সময়সাপেক্ষ বিবেচনাদিব্যাপার দ্বারা কর্ত্তব্য স্থির করিয়া, সে বিপদ হইতে শরীরকে রক্ষা করিবার জন্য, কর্ম্ম করিতে অবসর থাকে না। আমাদের চক্ষুর নিকট সহসা কেহ আঘাতের চেষ্টা করিলে পলক আপনিই পড়িয়া যায়। পশ্চাৎ হইতে হঠাৎ কোন শব্দ হইলে মানুষ আপনিই তখনই লাফাইয়া সরিয়া যায়। তখন আমরা বিচার করিয়া কর্ম্ম করি না। এই সকল কর্ম্ম আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি ইচ্ছাদির সাহায্য ব্যতীত প্রকৃতি প্রাণকর্ম্মের ন্যায় আপনিই সম্পাদন করেন। সে অজ্ঞানকৃত কর্ম্মের কথা এ স্থলে আর উল্লেখের প্রয়োজন নাই।

৭৩। প্রকৃতি যেমন প্রাণকর্ম্ম প্রভৃতি কর্ম্মের দ্বারা আমাদের জ্ঞানের অপেক্ষা না রাখিয়া অপনিই আমাদের সংস্কারোপযোগী শরীর গঠন করেন, তেমনই শরীর রক্ষা ও পোষণ জন্য আমাদের জ্ঞানকৃত কর্ম্মেও প্রকৃতি আমাদিগকে নিয়মিত করেন। আমাদের এই শরীর গঠন ও রক্ষা কর্ম্মে প্রকৃতি কিরূপে আমাদের নিয়োজিত করেন, কিরূপে আমাদের জ্ঞানকে পরিচালিত করেন, তাহা পূর্ব্বে আভাষ দেওয়া হইয়াছে। সে কথা এস্থলে আরও বিশদ করিয়া বুঝিতে হইবে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, আমাদের অভাববোধ ও অভাব জন্য দুঃখানুভূতি এবং সেই অভাব দূর হইলে আমাদের সুখানুভূতি—এই সুখ-দুঃখানুভূতি দ্বারা প্রকৃতি আমাদের কর্ম্মে নিয়োজিত করেন। শরীর পোষণ জন্য যখন আমাদের খাদ্যের প্রয়োজন হয়, তখন প্রকৃতি ক্ষুধাতৃষ্ণারূপ অভাববোধ বা দুঃখবোধের দ্বারা আমাদের জ্ঞানকে বা ইচ্ছাবৃত্তিকে সেই অভাব দূর করিবার জন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত করেন। শৈশব অবস্থায় যখন আমাদের জ্ঞান ও কর্ম্মশক্তি বিকাশিত হয় না, বলিয়াছি ত, তখন আমরা নিজে এই অভাব দূর করিতে পারি না। তখন এই অভাববোধ জ্ঞাপন জন্য ক্রন্দন করি, এবং প্রকৃতির প্রেরণায় বা মমতার বশে পিতা-মাতা বা অন্যে আমাদের সেই অভাব বুঝিয়া তাহা দূর করিতে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন,—তখন মা আমাদের ক্ষুধা হইয়াছে জানিয়া আমাদের স্তন্য দান করেন—বা অন্য আহার দান করেন। তাহার পর আমাদের জ্ঞান ও কর্ম্ম শক্তির বিকাশ হইলে আমরা স্বয়ং সেই অভাব দূর করিবার জন্য কর্ম্মে নিরত হই। শুধু তাহাই নহে। সে অভাব জানিতে পারিলে,—প্রকৃতি আমাদের শরীর গঠন ও রক্ষার জন্য কি উপকরণ চাহিতেছেন জানিতে পারিলে, আমরা সে উপকরণ সংগ্রহে ব্যাপৃত হই। সেই অন্ন প্রভৃতি উপকরণ মধ্যে আমাদের কোন গুলি গ্রহণীয় বা কোন গুলি ত্যাজ্য, তাহাও প্রকৃতি সুখ-দুঃখানুভূতি দ্বারা আমাদের জানাইয়া দেন। তাহা রসনা ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সুখদুঃখানুভূতি দ্বারা আমাদের বাছিয়া লইবার জন্য অবকাশ দেন। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সুখদুঃখানুভূতি শক্তি দ্বারা, কোন্ বায়ু স্বাস্থ্যকর ও গ্রহণীয়, কোন্ পুণ্যগন্ধ উপাদেয় ও শুভকর—তাহা প্রকৃতি আমাদের বুঝাইয়া দেন। আবার যখন রসনা ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সহায়ে আমরা আহার বাছিয়া লইয়া গ্রহণ করি, তখন যতদূর পর্য্যন্ত শরীর রক্ষার জন্য আহারের প্রয়োজন, ততদূর পর্য্যন্ত আহারে আমরা

সুখ পাই। তাহার পর রসনার তৃপ্তি হয়, —ক্ষুধা ও ক্ষুধানিবৃত্তিজনিত দুঃখসুখের বিরাম হয়। সে তৃপ্তি হইতে, আহারের প্রয়োজন যে শেষ হইয়াছে—প্রকৃতির এই ইঙ্গিত আমরা বুঝিতে পারি।

এইরূপে শরীরের বৃদ্ধি ও পরিণতির জন্য—আমাদের কর্ম্মেন্দ্রিয় পরিচালনার প্রয়োজন হয়, সমস্ত শরীর মধ্যে গতি বা ক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। এজন্য প্রকৃতিবশে বালকগণ ছুটাছুটী দৌড়াদৌড়ি কাজে বা খেলায় এত উত্তেজনা বা এত সুখ বোধ করে। এজন্য যুবক ব্যায়ামে আনন্দ বোধ করে। এজন্য নীরোগ ও কর্ম্মক্ষম শরীরে কর্ম্মের উত্তেজনায় আমরা এত স্ফূর্ত্তি পাই। আবার যখন কর্ম্ম করিয়া শরীর ক্ষয় হয়—শক্তি অবসন্ন হয়, যখন শরীরের বা কর্ম্ম-বৃত্তির বিশ্রাম ও পুনঃ শক্তি সঞ্চয়ের প্রয়োজন হয়, তখন সেই শ্রান্তি হেতু দুঃখ বা অবসাদ জ্ঞান দ্বারা প্রকৃতি আমাদিগকে বিরাম জন্য প্রস্তুত করেন,—বা নিদ্রারূপে আবির্ভূত হইয়া আমাদের বাহ্যজ্ঞান ও কর্ম্মশক্তি হরণ করিয়া লন। এইজন্য পরিমিত নিদ্রায় আমাদের সুখ হয়। এইরূপে প্রকৃতি—আমাদের শরীর গঠন ও রক্ষা কর্ম্মে প্রাণশক্তিরূপে প্রবৃত্ত হইয়া সেই কর্ম্মের জন্য যে উপকরণ প্রয়োজন—তাহা আমাদিগকে সংগ্রহ করিয়া দিবার জন্য—শারীরিক ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রাদি নানারূপ অভাব বা দুঃখানুভূতির দ্বারা জ্ঞাপন করান, —এবং প্রকৃতির প্রয়োজনে আমরা সেই কর্ম্মে রত হইলে, তাহার পারিতোষিক স্বরূপ আমাদের সুখ দান করেন। যদি আমরা প্রকৃতির সে ইঙ্গিত না শুনি, বা না বুঝিতে পারি,—যদি আমরা অল্প বা অনুপযুক্ত আহার করিতে পাই, অথবা অযথা ভোজনসুখলালসায় অখাদ্য খাই বা অতিরিক্ত ভোজন করি—বা অল্প কি অতিরিক্ত নিদ্রা যাই,—যদি আমাদের আহার নিদ্রা প্রভৃতি অবিহিত হয়, আলস্য বা অন্য কারণে শরীরের উপযুক্ত পরিচালনার অভাবে বা কোন কারণে শরীরের ক্ষয় হয়, তবে পীড়া-রূপ দুঃখ দিয়া প্রকৃতি আমাদের প্রকৃত কর্ম্মপথ দেখাইয়া দেন। আবার পীড়া হইলেও, প্রকৃতি স্বয়ং অধিকতর যত্নের সহিত তাহার উপশম জন্য চেষ্টা করেন—ও সেই জন্য আমাদিগকে কর্ম্মে প্রেরণ করেন। আমরা দেখিতে পাই যে, ইতর জীব আহার বিহার সম্বন্ধে প্রকৃতি বা সহজজ্ঞান পরিচালিত হয় বলিয়া, তাহাদের পীড়া অল্প। আর প্রকৃতি স্বয়ং সে পীড়া উপশম জন্য ইতর জীবকে পরিচালিত করেন। স্বাভাবিক অবস্থায় ইতর জীবের চিকিৎসার জন্য অন্য চিকিৎসকের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু মানুষের কথা স্বতন্ত্র। মানুষ জ্ঞানের অভিমানে চালিত হইয়া তাহার সহজজ্ঞান উপেক্ষা করে। ক্রমে মানুষ সহজজ্ঞানের সে ইঙ্গিত একেবারে ভুলিয়া গিয়া, নিজের অপরিণত বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয়। সে জন্য তাহার ব্যাধি অসংখ্য—আর সে ব্যাধি দূর করিবার প্রকৃতিনির্দ্দিষ্ট পথ সে আর দেখিতে পায় না। তাই বাধ্য হইয়া কৃত্রিম পথ অবলম্বন করিয়া বৃথা দুঃখ পায়। (১)

(১) পীড়ার সময় আমাদের কি কর্ত্তব্য, এবং পীড়া আরোগ্যের জন্য প্রকৃতি আমাদের নিকট কি চাহেন, তাঁহা প্রকৃতিই আমাদিগকে দেখাইয়া দিতে চেষ্টা করেন। পীড়া উপশমের জন্য বিশ্রামের প্রয়োজন হইলে প্রকৃতি আমাদের কর্ম্মশক্তি হরণ করেন, অনাহারের প্রয়োজন হইলে ক্ষুধা হরণ করেন, পানী-

৭৪। অতএব শরীর রক্ষা ও পোষণ জন্য আমাদের শারীরিক সুখদুঃখজ্ঞানের প্রয়োজন,—ক্ষুধাতৃষ্ণাদি দুঃখ বা অভাব বোধের প্রয়োজন,—বাহ্য ও আন্তর দুঃখ-বোধের প্রয়োজন,—বাহ্যবিষয়ের সহিত আমাদের ইন্দ্রিয়ের সম্পর্ক হেতু সেই সম্পর্ক-জনিত সুখদুঃখজ্ঞানের প্রয়োজন, (২)—আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখজ্ঞানের প্রয়োজন। সে সুখদুঃখজ্ঞান না থাকিলে আমাদের সংস্পৃষ্ট কোন্ বাহ্য বিষয়কে ত্যাগ করিতে হইবে, কাহাকে বা গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতাম না। অগ্নির সংস্পর্শে তাপ-রূপ-দুঃখবোধ না হইলে, শরীর ভস্মসাৎ হইয়া গেলেও আমরা ভ্রূক্ষেপ করিতাম না। সেই জন্য আমাদের সংস্পৃষ্ট বাহ্যবিষয়ের মধ্যে কাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে, কাহাকে বা গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা কেবল সুখদুঃখানুভূতির দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি। এই জন্য পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, সুখরূপ পারিতোষিক বা পুরস্কার ও দুঃখরূপ দণ্ডের দ্বারা প্রকৃতি আমাদের ত্যাগগ্রহণাত্মক কর্ম্মপথ দেখাইয়া দেন, আমাদের ইচ্ছাবৃত্তিকে পরিচালিত করেন, আমাদের বিকাশের জন্য—শরীর রক্ষণ ও পোষণের জন্য কি গ্রহণ করিতে হইবে বা কি ত্যাগ ক'রতে হইবে, তাহা বুঝাইয়া দেন। এই জন্য সুখদুঃখ বোধের একান্ত প্রয়োজন। এই জন্য সুখদুঃখবোধ অবশ্যম্ভাবী। এই সুখদুঃখানুভূতির প্রয়োজন না থাকিলে; বাহ্য বা আন্তর বিষয়ের সহিত শরীর ও তৎসৃষ্ট বাহ্যবিষয়ের সহিত সম্পর্ক-জনিত সুখদুঃখানুভূতির জন্য প্রকৃতি আমাদের সংজ্ঞাবাহী নাড়ী সৃষ্টি করিতেন না। আমরা বুঝিতে পারি আর না পারি, ইহা জ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, প্রয়োজন ব্যতীত—কারণ ব্যতীত কিছুরই সৃষ্টি হয় না। বলিয়াছি ত, যতক্ষণ জীবের জ্ঞান বিকাশের সময় বা প্রয়োজন না উপস্থিত হয়, ততক্ষণ তাহার সুখদুঃখানুভূতি থাকে না। ততক্ষণ তাহার পূর্ব্ব সংস্কারানুসারে, তাহার অভাব-পূরণ-কার্য্য বা ক্রম-আপূরণ

য়ের প্রয়োজন না থাকিলে তৃষ্ণা হরণ করেন। কখন দুষ্ট ক্ষুধা তৃষ্ণার ভাণ হইলে, পরে অরুচি শ্লেষ্মাবৃদ্ধি প্রভৃতি দ্বারা সে ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ করেন। পীড়ার সময় যে খাদ্যের প্রয়োজন, প্রকৃতি সে খাদ্যের প্রতি আমাদের অতিরিক্ত লোভ উৎপাদন করিয়া তাহার ইঙ্গিত করেন, যে রসের প্রয়োজন—সে রসের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি করিয়া তাহা দেখাইয়া দেন। শরীরের যে অংশ পীড়িত হয়—প্রকৃতি জোর করিয়া সেই অংশে আমাদের প্রাণ, মন, বুদ্ধি, সমুদায় শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া, সেই পীড়ার যাতনা বিশেষরূপে আমাদের অনুভব করাইয়া, সে পীড়া নিবারণের জন্য আমাদের সমুদায় চেষ্টাকে, সমুদায় শক্তিকে নিয়োজিত করেন। পীড়ার সময় এই ভীষণ আন্তর অনুভূতিবলে আমাদের তদানীন্তন অভাব আমরা বুঝিতে পারি—ও সে অভাব দূর করিতে বিশেষ ব্যগ্র হই। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান একথা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাই আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্র মতে, Disease is the outward expression of nature's own attempt to drive out poison from the body. তাই Nature —cure এবং Treatment of diseases without medicine এর কথা উঠিয়াছে। তাই ঔষধিকে এখন পীড়া উপশম কর্ম্মে প্রকৃতির সহায় মাত্র বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। যাউক, সে সকল অবান্তর বিষয় এস্থলে উল্লেখের আবশ্যক নাই।

(২) শরীর (জড়শরীর) আমাদের জ্ঞানের প্রথম বাহ্যবিষয়। এই শরীরের সহিত আমাদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় মনের সম্পর্ক হেতু, ক্ষুধা তৃষ্ণা, ব্যাধি প্রভৃতি আন্তরিক সুখদুঃখানুভূতি হয়। বাহ্যজগৎ আমাদের দ্বিতীয় বাহ্যবিষয়—দ্বিতীয় কায়ব্যূহ। এই বাহ্যজগতের সহিত আমাদের পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের সম্পর্ক হেতু মাত্রা স্পর্শজ সুখদুঃখানুভূতি জন্মে।

কার্য্য প্রকৃতি স্বয়ং তাহার অজ্ঞাতসারে সম্পাদন করেন,—প্রকৃতি তখন 'অন্ধ' জড়শক্তি (physical force) বা চেতনা-বিহীন প্রাণশক্তি (stimulus) রূপে সেই জীবের রক্ষণ, পোষণ ও ক্রম-আপূরণ জন্য সমুদায় কর্ম্ম করেন,—জড়জগতে, উদ্ভিদ্‌-জগতে, এমন কি, নিম্ন শ্রেণীর প্রাণিজগতে সমুদায় কর্ম্ম প্রকৃতি স্বয়ং সম্পাদন করেন। পরে যখন উচ্চশ্রেণীর জীবে চৈতন্য জাগরিত হয়, জ্ঞান বিকাশিত হইতে আরম্ভ হয়, প্রকৃতি ইচ্ছাশক্তি রূপে জীবহৃদয়ে বিকাশিত হন, যখন প্রকৃতি সেই ব্যক্ত ইচ্ছাশক্তির প্রেরণায় জীবকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে প্রবৃত্ত হন,—তখন সুখদুঃখানুভূতি বিকাশ হইতে থাকে, তখনই সুখজ কর্ম্মে ইচ্ছা ও দুঃখজ কর্ম্মে অনিচ্ছা জন্মে,—সুখজ বিষয় গ্রহণে ও দুঃখজ বিষয় ত্যাগে প্রবৃত্তি জন্মে, তখন সুখজ বিষয়ে অনুরাগ ও দুঃখজ বিষয়ে দ্বেষ জন্মে, ও এই রাগ দ্বেষ হইতে কাম ক্রোধাদি বৃত্তির বিকাশ হইয়া জীব সেই বৃত্তিবশে পরিচালিত হইতে থাকে। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ইতর জীবের 'সহজ' জ্ঞান সীমাবদ্ধ সঙ্কীর্ণ, তাহার ক্রম-বিকাশ নাই, যদি থাকে তবে তাহা নিতান্ত সামান্য। ইতর জীব প্রাণকর্ম্মে বা শরীর রক্ষণ ও পোষণ কর্ম্মে এবং বংশ বৃদ্ধি ও রক্ষা কর্ম্মে, এই প্রথম বিকাশিত সুখদুঃখ-জ্ঞানবলে, রাগ-দ্বেষ-বশে ও কাম-ক্রোধাদি-প্রবৃত্তিবলে পরিচালিত হইয়া কর্ম্ম করে।

৭৫। এইরূপে ইতরজীব নিজ শরীর রক্ষণ ও পোষণ কর্ম্মে ও বংশ রক্ষা কর্ম্মে সুখদুঃখানুভূতির দ্বারা পরিচালিত হয়। এই সুখদুঃখানুভূতি মানুষের ও ইতর জীবের সাধারণ ধর্ম্ম। এই দুঃখ নিবারণ জন্য মানব ও ইতরজীব প্রথমে কর্ম্ম করে। এই সুখদুঃখানুভূতি সাধারণতঃ বড় তীব্র, এবং এজন্য সেই দুঃখ দূর করিবার চেষ্টাও বড় অধিক, এবং সেই দুঃখ দূর করিলে যে সুখলাভ হয়, তাহার তীব্রতাও সেইরূপ অধিক। যাহারা অন্নসংস্থান জন্য কষ্ট ভোগ করে না, তাহারা ক্ষুধারূপ দুঃখের তীব্রতা বুঝিতে পারে না। ঐ কুক্কুর ক্ষুধার জ্বালায় কাতর হইয়া কিরূপ যন্ত্রণা ভোগ করে, পাগলের মত কিরূপ ধাবিত হয়, সামান্য এক টুক্‌রা মাংস পাইলে সেই ক্ষুধাতুর কুক্কুর কিরূপ সুখলাভ করে, কিরূপ আরামের সহিত অর্দ্ধ-নিমীলিত-নেত্রে এক টুক্‌রা হাড় চিবাইতে থাকে,—দুর্ভিক্ষ সময়ে বা দারিদ্র্যের উৎকট পীড়নে, ক্ষুধার জ্বালায় নিতান্ত পীড়িত না হইলে—সে ক্ষুধার জ্বালা ও সে জ্বালা নিবারণ জনিত উৎকট সুখ আমরা বুঝিতে পারি না। অবশ্য ইতর জীবের সুখদুঃখ প্রায়শঃ শারীরিক। এবং তাহাদের সেই সুখদুঃখানুভূতির তীব্রতাও বড় অধিক।

মানুষেরও সেই সুখদুঃখানুভূতির তীব্রতা কম নহে। মানুষ যখন 'অসভ্য' থাকে, তাহার জ্ঞান যখন স্বপ্নময় অবস্থা হইতে জাগরিত অবস্থায় আসিতে পারে না, যখন মানুষে পশুতে বিশেষ প্রভেদ থাকে না, যখন মানুষ আমমাংসভোজী—এমন কি নরমাংসভোজী রাক্ষস ব্যতীত আর কিছুই নহে, যখন মানুষ শরীর রক্ষণ ও পোষণ কর্ম্মের জন্য বাহ্যজগতের সহিত—জড় ও জীবের সহিত—এক মানুষ আর এক মানুষের সহিত নিয়ত সংগ্রাম করিতে বাধ্য হয়, তখন মানুষের এই শারীরিক খদুঃখানুভূতির তীব্রতা বড় অধিক। কিন্তু বলিয়াছি ত,

মানুষে পশুতে প্রভেদ আছে। মানুষের জ্ঞান ক্রমবিকাশশীল। পশুর সেরূপ নহে। এজন্য মানুষ ক্রমে এই সুখদুঃখানুভূতির তীব্রতা কমাইয়া লইতে পারে। মানুষ সমাজবদ্ধ হইয়া পরস্পর পরস্পরের সহায়ে—সেই সুখ-দুঃখ নিবারণ করিতে সমর্থ হয়। যতদিন সমাজ উপযুক্তরূপে উন্নত না হয়, যতদিন মানুষ এই শারীরিক সুখদুঃখ-ভূমি অতিক্রম করিয়া যাইতে না পারে, ততদিন তাহার উন্নতির, বা জ্ঞানবিকাশের উপায় থাকে না। বলিয়াছি ত, পশুর ন্যায় মানুষেরও শরীর রক্ষা চেষ্টা প্রধান কর্ম্ম—শরীর রক্ষা প্রধান ধর্ম্ম। শরীরই সকল কর্ম্মের—সকল ধর্ম্মসাধনের মূল। এজন্য ইতর জীবের ন্যায় মানুষের শারীরিক সুখদুঃখানুভূতি এত বলবতী,—এজন্য শারীরিক দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা ইতর জীবের ন্যায় মানুষে এত প্রবল। যতদিন সে দুঃখ দূর করা মানুষের পক্ষে অসাধ্য বা অসম্ভব হয়, যতদিন মানুষ দুঃখভারে নিষ্পিষ্ট হইতে থাকে, ততদিন তাহার অন্যদিকে উন্নতির উপায় থাকে না, —ততদিন তাহার অন্য কোনরূপ সুখ-দুঃখানুভূতির অভিব্যক্তি হয় না। অন্নচিন্তা মানুষের প্রধান চিন্তা—অন্নের অভাব প্রধান অভাব। মানুষ যতদিন এই অন্নাভাব ও অন্য শারীরিক অভাব বা দুঃখ দূর করিতে না পারে, ততদিন সে মহাজ্ঞানী বা মহাধার্ম্মিক না হইলে, সেই দুঃখে নিষ্পিষ্ট হইয়া যায়। যতদিন মানুষ দরিদ্রতা জন্য অন্নাভাবে বস্ত্রাভাবে আবাসাভাবে কষ্ট পয়, যতদিন সমাজ মানুষের সে দুঃখ নিবারণ করিতে না পারে। মানুষের অন্নের সংস্থান, বস্ত্রের সংস্থান আবাসের সংস্থান ও তাহাদের রক্ষার উপায় করিয়া দিতে না পারে,—যতদিন মানুষ পীড়ার জ্বালায় নিয়ত কষ্ট পায়, সমাজের উপযুক্ত বিধানের অভাবে সেই চির-নূতন চিরক্লেশকর দরিদ্রতাভারে নিপীড়িত হইতে থাকে,—ততদিন মানুষের উন্নতির পথ বন্ধ হয়।

দুঃখের সাধারণ নিয়ম এই যে, দুঃখানুভূতি যত তীব্র হয়—দুঃখ দূর করিবার চেষ্টাও তত অধিক হয়—এবং সেই দুঃখ দূর জনিত সুখও তত তীব্র হয়। দুঃখের তীব্রতা ও গভীরতা ও বিস্তার অনুসারে—সে দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা বৃদ্ধি হয়। যেখানে অভাব সামান্য, সেখানে দুঃখবোধ সামান্য, সেখানে দুঃখের পরিমাণ ও গভীরতা তত সামান্য, সেখানে সে অভাব দূর জনিত সুখবোধও সামান্য। যেখানে অভাববোধ দূর হয়, —দুঃখবোধ দূর হয়—, সেখানে সুখবোধও দূর হয়,—সেখানে সুখদুঃখ দ্বন্দ্বজ্ঞানও দূর হয়। সাধারণতঃ আমাদের শারীরিক অভাব সীমাবদ্ধ। স্বচ্ছন্দ-বনজাত-শাকান্নে আমাদের শরীর রক্ষা হইতে পারে, সামান্য বস্ত্রে আমাদের শীত তাপ নিবারণ হইতে পারে, সামান্য আবাস গৃহে আমাদের আশ্রয়স্থান হইতে পারে। ইহা ব্যতীত মানুষ সাধনা দ্বারা ক্ষুধাতৃষ্ণাবেগ সহ্য করিতে পারে—এবং সামান্য চেষ্টায় সে ক্ষুধাতৃষ্ণাবেগ নিবারণও করিতে পারে। আর আমাদের কর্ম্মশক্তি—বিশেষতঃ সমবেত কর্ম্মশক্তি বড় অধিক। এজন্য আমরা সমাজ সহায়ে, শারীরিক অভাবের অতীত হইতে পারি, শারীরিক দুঃখ দূর করিতে পারি,—শারীরিক সুখদুঃখবোধের অতীত হইতে পারি। বিশেষতঃ যে দেশে প্রকৃতি আমাদের জন্য প্রচুর আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া দেন,—যেখানে আমরা বিনা চেষ্টায় বা অল্প চেষ্টায় আমা-

দের আহার্য্য সংগ্রহ করিতে পারি, যেখানে শীত গ্রীষ্মের তাড়না সামান্য বা সহনীয়, সেখানে মানুষ অনায়াসেই শারীরিক দুঃখের অতীত হইতে পারে। অতএব আমাদের শরীর রক্ষণ ও পোষণ জন্য শারীরিক দুঃখানুভূতির প্রয়োজন। সে দুঃখ জন্য আমরা প্রকৃতিকে মমতাহীন বলিতে পারি না। সে দুঃখ যে অমঙ্গলবাদের কারণ নহে,—তাহা আমরা সহজে বুঝিতে পারি।

শ্রীদেবেন্দ্র বিজয় বসু।

কেমন তোমার লীলা।

কেমন তোমার লীলা প্রভো কেমন তোমার লীলা,
কেমন বোচা দিলা প্রভো কেমন বোচা দিলা!
ছিলাম অতি দুঃখী দীন,
চিরকালই ভাগ্যহীন,
এক নিমেষে ভিখারীরে বাদ্‌সা বানাইলা!
তুচ্ছ—তুচ্ছ—তুচ্ছ স্বর্গ,
চাইনা মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ,
তুচ্ছ সে অলকাপুরী কুবের যাহা নিলা!
কেমন বোচা দিলা প্রভো কেমন বোচা দিলা!

২

কেমন তোমার লীলা প্রভো কেমন তোমার লীলা,
কেমন বোচা দিলা প্রভো কেমন বোচা দিলা!
এমন রত্ন মাণিক্যের,
ইন্দিরা কি পায়নি টের,
লক্ষ্মীর অলক্ষ্যে কিসে ত্রৈলোক্যে রাখিলা।
আপন হাতে পদ্ম শঙ্খে,
কৌস্তুভে কি কণ্ঠে অঙ্কে?
চক্র গদা নিয়ে সদা রক্ষা করেছিলা?
দীনবন্ধু দয়াল হরি,
তাই কি দিলে দয়া করি,
দীনে তোমার কত দয়া তাই কি দেখাইলা?
কেমন তোমার লীলা প্রভু কেমন তোমার লীলা?

৩

কেমন তোমার লীলা প্রভো কেমন তোমার লীলা
কেমন বোচা দিলা প্রভো কেমন বোচা দিলা!
কাদায় মাথা ধূলায় মাথা,
যত্নে তারে যায় না রাখা,
কোন্ সোণাতে এমন সোণা কোথায় গড়েছিলা?
ধূলায় দেখি শত দীপ্ত,
কর্দ্দমে কুঙ্কুম লিপ্ত,
সুমেরু গালিয়ে নিলে তরল স্বর্ণশিলা?
অথবা বৈকুণ্ঠপুরে,
তোমারি বাঁশীর সুরে,
পূর্ণিমাতে পারিজাতে চন্দ্র চুয়াইলা?
এতদিন এ টুকু মণি কোথায় রেখেছিলা?

৪

কেমন তোমার লীলা প্রভো কেমন তোমার লীলা,
কেমন বোচা দিলা প্রভো কেমন বোচা দিলা!
কোঁক্‌ড়া চুল কপালে বেড়া,
সোণার কমল শেওলা ঘেরা,
সন্ধ্যাকালের স্বর্ণমেঘে চন্দ্র আছে গিলা।
দন্তপংক্তি মুক্তা চাঁচা,
খল্‌খলায়ে হাসে বাছা,
ফোটে যেন গোলাপ কুন্দ একই সাথে মিলা!
কি অপূর্ব্ব নীলনেত্র,
আনন্দ অমৃত ক্ষেত্র,
শোভে যেন বিল 'বেলাইয়ে' সুন্দী নীলা নীলা!
কোমল দুটী ভুরু চিকণ,
কেমন সুন্দর বাঁকা তীখণ,
দিগ্বিজয়ী কামের যেন ধনুর খোলা ছিলা!
কেমন বোচা দিলা প্রভো কেমন বোচা দিলা!

৫

কেমন তোমার লীলা প্রভো কেমন তোমার লীলা,
কেমন বোচা দিলা প্রভো কেমন বোচা দিলা!
সোণামুখে দুধের গন্ধ,
কি আনন্দ! কি আনন্দ!
আনন্দে আনন্দময় জগৎ ভাসাইলা!

তাহে পুরে' ধূলা বালি,
কি আনন্দের করতালি,
কি আনন্দে আনন্দের তুফান তুলিলা।
আনন্দময় তুমি হরি,
রয়েছ ভুবন ভরি,
সকলি আনন্দময় আনন্দেরি লীলা,
অবিশ্বাসী নিরানন্দে তাই কি বুঝাইলা?

৬

কেমন তোমার লীলা প্রভো কেমন তোমার লীলা,
কেমন বোচা দিলা প্রভো কেমন বোচা দিলা?
ভবিষ্যতের শত আশা,
ললাটে করেছে বাসা,
সোণার যেন উদয়াচল উষায় উজলিলা।
নবীন অমৃত পাত্র,
কণ্ঠেতে খুলিতে মাত্র,
বক্ষভরা লক্ষ জন্মের জ্বালা জুড়াইলা।
কেমন তোমার লীলা প্রভো কেমন তোমার লীলা।

৭

কেমন তোমার লীলা প্রভো কেমন তোমার লীলা,
কেমন বোচা দিলা প্রভো কেমন বোচা দিলা!
জান ত অন্তরযামী,
বজ্র হ'তে বজ্র আমি,
লোহার চেয়ে শক্ত লোহা, পাপের পেরেক্ত শিলা!
কয়লার চেয়ে ময়লা মতি,
নরক হতে অধোগতি,
রাক্ষসের জ্বলন্ত আশা যজ্ঞ নিকুম্ভিলা!
তোমার দয়া তোমার স্নেহ,
সাধ্য কি যে বুঝ্‌বে কেহ,
পতিতপাবন ঠাকুর কত পতিত তরাইলা,
এই যে শিশু, এই যে বোচা,
কোঁক্‌ড়া কনক চুলের গোছা,
এইরূপেই আজ যে আবার পাষাণ গলাইলা!
চাঁদের মত পরের ছেলে,
ঘৃণায় দিছি দূরে ফেলে,
আজ যে এমন বোচা ছেলেয় কিসে ভুলাইলা,
হে সুন্দর, হে সুন্দর,
কি সুন্দর! কি সুন্দর!
তোমারি সৌন্দর্য্যে বুঝি এরে সাজাইলা!
নইলে কি আনন্দ ভরে,
পাথর ভেঙ্গে কাতর করে,
বুঝ্‌তে নারি দয়াল হরি কেমন তোমার লীলা,
কেমন বোচা দিলা প্রভো কেমন বোচা দিলা!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

রামের বনবাস

সমদর্শী বাল্মীকি বালকের দ্বারা বৃদ্ধের, সন্তানের দ্বারা পিতার, স্ত্রীর দ্বারা পুরুষের পরাজয় ঘোষণা করিলেন। এই ঐন্দ্রজালিক পরীক্ষায় বৃদ্ধের স্ত্রৈণতা, সত্য পাশের আবরণে কেমন কৌশলে লুক্কায়িত রহিয়াছে। পিতৃ আজ্ঞা পালনে রামচরিত্রের দৃঢ়তার প্রতি সার্ব্ব-ভৌমিক মহানুভূতি, করুণ রসের কি অপূর্ব্ব স্ফুরণ সম্পাদন করিয়াছে। সহস্র বৎসর পরে আজিও রাম বনবাসের অভিনয় দর্শনে সহস্র নয়ন অলক্ষিত ভাবে বাষ্পাকুলিত হইয়া উঠে।

বিজয়ী পুত্র চীর বাস পরিধান করিয়া সন্তোষ-গম্ভীর-চিত্তে বনগমনের জন্য ত্বরান্বিত হইয়া পিতা ও বিমাতার সন্নিধানে উপস্থিত। এরূপ বীরত্ব ভারত দেহে নূতন না হইলেও সম্ভবতঃ কবিত্ব-জগতে সর্ব্ব প্রথম। হিন্দু-জগতে রামের প্রতিদ্বন্দী না থাকিলেও প্রাচীন ভারতবর্ষে তাহার একজন প্রতিদ্বন্দী আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

উভয়েই রাজপুত্র, যুবক ও বিবাহিত। উভয়েই ভোগ লালসায় পালিত ও বর্দ্ধিত। শাক্যসিংহ রাজপ্রাসাদে অতি সমাদরে আশৈশব বাস্তব্য করিয়াও দণ্ডীর ন্যায় সংসারে বীততৃষ্ণ ও রাজত্বে বীতস্পৃহ হইয়াছিলেন।

সংসারের সুখ শান্তি তাঁহার নিকট ভ্রান্তি বলিয়া উপলব্ধি হইত। তিনি ধর্ম্মের আজ্ঞায়, শান্তির আশায়, জীর্ণ বাসের ন্যায় রাজ্য পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ মনে করিলেন; তাঁহার নিকট রাজত্ব, স্ত্রী ও পুত্র জঞ্জাল ও কণ্টকবৎ পরিত্যাজ্য। তাই তিনি গভীর নিশীথের অন্ধকারে, আপনার ধর্ম্মপত্নী গোপার অজ্ঞাতসারে চোরের ন্যায় আপন পিতার রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বনগমন করিয়াছিলেন।

রামচন্দ্র কিন্তু রাজপুত্রের ন্যায় রাজশ্রীর একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। রাজ্য শাসনের অতৃপ্ত লালসায় তাঁহার হৃদয় নিয়ত পরিপূর্ণ ছিল। রাজ্যাভিষেকে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা আপনাকে অধিকতর সৌভাগ্যশালী মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি পিতার আজ্ঞায় সাধারণ সুবোধ শিশুর ন্যায় সুপ্রভাতে সর্ব্বজন সমক্ষে পিতা মাতার আশীর্ব্বাদ লইয়া ধর্ম্ম-পত্নী সীতার সহিত প্রফুল্ল চিত্তে বনবাসে যাত্রা করিলেন। সুখের সংসার নিমেষ মধ্যে পরিত্যাগ করিতে কোন দ্বিধা মনে করিলেন না। তিনি বিজিত শত্রুর প্রতি ক্ষমার ন্যায়, প্রাপ্ত রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া, তুল্য আনন্দ উপভোগ করিলেন। রাম যেন পিতৃ আজ্ঞায়, বিভক্ত ফলের ন্যায়, অযোধ্যা রাজ্য কনিষ্ঠকে দান করিয়া স্বয়ং দণ্ডকারণ্যের রাজত্ব লইয়া আনন্দিত হইলেন। শাক্যসিংহ স্ত্রী ও রাজ্য পরিত্যাগ করিতে না পারিলে বস্তুতই আপনাকে হতভাগ্য মনে করিতেন। তাই স্ত্রী ও রাজ্য পরিত্যাগ করিতে পারিয়া প্রকৃতপক্ষে তিনি আনন্দিত হইয়াছিলেন। রামের রাজ্য লাভে ও ত্যাগে তুল্য সুখ।

বুদ্ধ নিজ সহধর্ম্মিণীকে ধর্ম্মের অন্তরায় জানিয়া সঙ্গে লইতে ভীত হইয়াছিলেন। কিন্তু রাম বনগমনে কেবল সীতার কষ্ট ভাবিয়া, প্রথমে সঙ্গী করিতে অসম্মত থাকিয়া, পশ্চাৎ সীতার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া হৃষ্ট চিত্তে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়াছিলেন। রাম ও শাক্যসিংহের চরিত্রে গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ ধর্ম্মের নিগূঢ় রহস্য নিহিত রহিয়াছে। বানপ্রস্থাবলম্বী বাল্মীকি গার্হস্থ্য ধর্ম্মের জয় ঘোষণার জন্যই বুদ্ধচরিত না লিখিয়া রামচরিত্র অঙ্কনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি দেখাইলেন যে, ধর্ম্ম ও নীতি কেবল পতি বা পত্নীর জন্য নহে, উহা স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের জন্য। বুদ্ধদেব সমাজের বহির্ভূত থাকিয়া কঠিন ইতিবৃত্তের অবলম্বনীয় হইয়া চিরদিন অমর থাকিবেন। তাঁহার আবির্ভাব অতিশয় সময়োচিত হইয়াছিল বলিয়া আজও জগতের এক তৃতীয়াংশ লোক তাঁহার মন্ত্রে দীক্ষিত, কিন্তু রাম ও সীতার দুর্লভ চরিত্র হিন্দু জগতে এমনই জাতীয় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, তাঁহারা চিরকাল গৃহস্থের আদর্শ দেবতারূপে আদৃত ও পূজিত হইবেন। কস্মিনকালেও সংসারীর হৃদয় হইতে কোন রূপে বিচ্যুত হইবেন না।

উভয়েই—ধর্ম্মবীর। কিন্তু উহাদিগের মধ্যে স্রষ্টা ও পালকের বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। একজন সমাজ ধ্বংস করিয়া নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, অপরে যাহা সামাজিক, তাহাই প্রতিপালন করিয়া সামাজিক ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন। বুদ্ধ স্রষ্টা, রাম পালক। বুদ্ধ উপদেষ্টা, রাম শিষ্য। বুদ্ধ এক অভিনব ধর্ম্ম সংস্থাপন করিলেন। রাম কেবল তাঁহার পূর্ব্ব

পুরুষানুষ্ঠিত ধর্ম্ম প্রতিপালন করিলেন। বুদ্ধের মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিবে, কিন্তু তাঁহার প্রকৃত উপদেশ দণ্ডী ছাড়া সাংসারিকেরা জীবনের আদর্শ করিতে সাহসী হইবে না। এখনও যাঁহারা তাঁহার ধর্ম্মানুসারে গৃহস্থভাবে জীবন যাপন করিতেছেন, তাঁহারাও তাঁহার প্রদর্শিত পথ হইতে অনেক দূরে সরিয়া পড়িতেছেন। তাহা বোধ হয় স্পষ্ট করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। জগৎ সহস্রবার বুদ্ধের সম্মাননা করিয়াও, এখন আর বানপ্রস্থ অবলম্বন করা সমীচীন বলিয়া ধারণা করিতে পারিবে না। কিন্তু রামের ন্যায় সকলেই গার্হস্থ্যনিষ্ঠা প্রতিপালনে সর্ব্বতোভাবে চির দিন যত্ন করিতেছে ও করিবে। আধুনিক জগৎ যে পথে নিয়ত প্রধাবিত হইতেছে, তাহাতে দ্বিতীয় বুদ্ধের আবির্ভাব হওয়া স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয় না, কিন্তু রাম সদৃশ অনেক মহাত্মা উহার পথ প্রদর্শনের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন ও হইবেন, সন্দেহ নাই। অশ্বমেধ যজ্ঞে যেরূপ অশ্বের অবারিত দিক্‌ভ্রমণ অত্যাবশ্যকীয় অন্তরঙ্গ বিশেষ, সেইরূপ, ভাবী রক্ষকুলান্তক-যজ্ঞে যাজকের সস্ত্রীক বন-পর্য্যটনই বিধি, তাই রত্নালঙ্কার-বিভূষিতা কৌশেয় 'বস্ত্র' পরিহিতা সীতা রামের সঙ্গে বন গমনের জন্য দীক্ষিতা হইলেন। এইরূপ দীক্ষা জগতে নূতন ও অতুলনীয়, বনবাসে বল্কল ধারণই চিরন্তন রীতি বলিয়া কৌশেয় বস্ত্রের উপর সীতাকে চীর পরিধান ও রত্নালঙ্কারের উপর বল্কল ধারণ করিতে হইল। তাহাতে তাঁহার স্বাভাবিক কমনীয় কান্তি কি অপূর্ব্ব জ্যোতি বিকাশ করিল। চীর ধারণে অনভ্যস্ততা ও ব্রীড়াবনত মাধুর্য্য সৌন্দর্য্যের অনন্ত আধার। লৌকিক যুক্তি অনুসরণ করিয়া আরব্ধ কার্য্যের মঙ্গলার্থ কৌশলী কবি নিরাভরণা করিয়া সীতাকে বনে পাঠাইলেন না। সালঙ্কৃতা হইয়াই তিনি বন গমনে অনুজ্ঞাত হইলেন। সীতা আপনার জন্য অলঙ্কার ধারণ করিতেন না। স্বামীর জন্য, বশিষ্ট নামান্তরিত বাল্মীকি সীতাকে ন্যাস স্বরূপ অলঙ্কার অর্পণ করিলেন। নতুবা বনবাসের প্রাকালে রাম ও সীতাকে একত্রে আপনাদিগের মহা মূল্য বসন ভূষণ ও বিলাস দ্রব্যাদি মুক্ত হস্তে দান করিতেন না। চিরদিনই আভরণ উত্তর কালে স্ত্রী জাতির মহোপকার সাধন করিয়া থাকে। সালঙ্কৃতা সীতা যেন তাপস কন্যার বেশ অনুকরণ করিয়া তাপস কন্যাদিগের সঙ্গে সৌহৃদ্য সংস্থাপনার্থ তপোবনে যাইতেছেন,—প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সম্ভোগের জন্য যেন বনভ্রমণে রামের সঙ্গে চলিয়াছেন। কৌশেয় বস্ত্রের উপর, চীর পরিধান, রত্নালঙ্কারের উপর বল্কল ধারণ চিরকাল পাতিব্রত্যের আলৌকিক মাহাত্ম্য ঘোষণা করিবে। সাহিত্য-সংসারে এরূপ সৌন্দর্য্য ও কবিত্বময় চিত্র একান্ত দুর্লভ। উহা কোটী কোহিনুর অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান। ধন্য কবি, তোমার সামাজিক অভিজ্ঞতা কবিত্বের সহচর হইয়া, তোমার ভাবী উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অজ্ঞাতসারে কেমন নিয়োজিত হইল।

রাম ও সীতা, বনবাসোপযুক্ত বেশে বনগমনের জন্য প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু ভীষণ অরণ্যে কিরূপে চতুর্দ্দশ বৎসরকাল একাকী অসহায় অবস্থায় যাপন করিবেন, তাহা বৃদ্ধ কবি পূর্ব্বেই নির্দ্ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ঋষিকবির দ্বিদেহ

পুরুষ স্থষ্টির কৌশল এখন সহজ বুদ্ধির অনুমেয়। লক্ষ্মণ জন্মাবধি রামের অনুগত হইবেন,ইহা গণিতের সত্যের ন্যায় অভ্রান্ত। কিন্তু লক্ষ্মণের কেবল রামের অনুগমন করাই, কবির অভিপ্রেত নহে। তিনি রামের চরিত্র-বিকাশের জন্য লক্ষ্মণের স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় অমনোযোগী নহেন। রামের অন্তঃকরণ যেন দ্বিধা হইয়া ক্ষত্র ও ব্রহ্ম শক্তি, রজ ও সত্ত্ব গুণ পৃথক হইবে। সত্য-প্রতিম রাম ব্রহ্মত্বের ও রজ-প্রধান লক্ষ্মণ ক্ষত্র বীর্য্যের অভিনয় করিবেন। নাটক-শাস্ত্রবেত্তা বাল্মীকি দ্বিদেহ পুরুষ সৃষ্টি দ্বারা অতি সুন্দররূপে চারিত্র-জটিলতার কি অপূর্ব্ব ইন্দ্রজাল বিস্তার করিয়াছেন। একদিকে লক্ষ্মণ ক্ষত্র ধর্ম্ম অনুপ্রাণিত হইয়া অবিবেকী পিতার মস্তক ছিন্ন করিতে উদ্যত, অপরদিকে রাম ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মাশ্রিত হইয়া যাহাতে পিতা প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট না হন, তাহার জন্য বনগমনে একান্ত বিনয় প্রদর্শন করিতেছেন। অন্ধ ক্ষত্র তেজ আর অধিকক্ষণ স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিতে পারিল না। ক্রমে ব্রাহ্মণত্বের অনুগমন করিল। রাম ও সীতার সঙ্গে, লক্ষ্মণও বনগমনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। এখন দুষ্কর বনবাস সুকর হইল। দুরতিক্রমণীয় নিয়তির এখন অচিন্তনীয় পুরুষকারের হস্তে পরাজিত হইবার সূত্রপাত আরম্ভ হইল।

রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের বনগমন সময়ের অলৌকিক চিত্র অঙ্কিত করিয়া যদি কাহারও নয়নাগ্রে স্থাপন করা যায়, তবে সেই ভাগ্যবান নিশ্চয়ই জীবন্মুক্ত হয়। ক্রুশাবদ্ধ খ্রীষ্টের পবিত্র চিত্রের ন্যায়, রামের দারা-সুজ সহ বনগমনালেখ্য মানব-সাধারণের গৌরবের সম্পত্তি, সন্দেহ নাই। কিন্তু তথনও কোন প্রতিভাশালী ভাস্করের তুলি উহা অঙ্কিত করিতে প্রয়াসী হয় নাই। ইহা কি অধিকতর বিস্ময়কর নহে? আশা করি, রবিবর্ম্মা দ্বারা এই অভাব অচিরে পূরণ হইবে।

শ্রীকুমুদকান্ত বসু।

খণ্ডপাড়া।

উড়িষ্যার পার্ব্বত্য রাজ্যগুলি ব্রিটীশ রাজত্বের বহির্ভূত। এখানে কোনও অপরাধ ঘটিলে ব্রিটীশ বিচারালয়ে তাহার বিচার হইবে না। রাজারা করদ রাজ্য বলিয়া পরিগণিত। তাঁহাদিগের দুই বৎসর কারাবাস ও সহস্র মুদ্রা দণ্ড করিবার অধিকার আছে। তাঁহাদিগের উপরে আসিষ্টান্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের সেসন জজের অধিকার, সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের ক্ষমতা হাইকোর্টের ক্ষমতার তুল্য।

রাজারা সৈন্য রাখিতে বা মুদ্রা প্রস্তত করিতে পারেন না। সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের ক্ষমতা কোনও আইনানুসারে বিধিবদ্ধ নহে। রাজাদিগকে পরামর্শ দিয়া সুশাসনে সাহায্য করিতে তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

এই সকল গড়জাত বা পার্ব্বতীয় রাজ্য সকলের সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস হইয়া আসিতেছে। কণিকা, আল, মধুপুর, দর্পণ প্রভৃতি রাজ্য সকল ইংরাজ রাজত্ব আরম্ভ হইবার পূর্ব্ব হইতে মোগল বন্দী জমিদারী বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে। বাঁকী ও অনুল

ইংরাজ রাজত্ব-ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। ডোমপাড়া এখন জমিদারীতে পরিণত হইয়াছে। এখন যে সকল রাজ্য করদ বলিয়া গণ্য হয়, তাহাদের মধ্যে ময়ূরভঞ্জ, কিয়ঞ্জর, ঢেকানল, পাললহড়া, হিণ্ডোল, আটগড়, টিগড়িয়া, বড়ম্বা, নরসিংহ, খণ্ডপাড়া, দশপাল্লা, নয়াগড়, আটমল্লিক ও বোদ বিখ্যাত। অল্প বয়স বা অনুপযুক্ততা হেতু ঢেঁকানল, পাললহড়া, বড়ম্বা, নরসিংহপুর ও নয়াগড় এখন ইংরাজের প্রতিনিধির দ্বারা শাসিত হইতেছে। রাজ্যগুলির আয়তন হিসাবে খণ্ডপাড়া একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। কিন্তু এ রাজ্যটীর একটু বিশেষত্ব আছে। খণ্ডপাড়ার আয়তন ২৪৪ বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা প্রায় ৭০০০০। নিজ সহরের লোক সংখ্যা পূর্ব্বে ছয় হাজার ছিল, এখন চারি হাজার হইয়াছে। সহরকে গড় বলে। রাজার প্রাসাদের চারিদিকে গড়খাই বা পরিখা থাকুক বা না থাকুক, রাজধানীর নাম গড়। দুর্গও নাই, সৈন্যও নাই, তথাপি "তালপুকুর" নামটা আছে। রাজাদিগের অসামান্য প্রতাপ। রাজারা সকলেই দেবতা বলিয়া গণ্য। রাজদর্শনে পুণ্য হয়, অস্নাত শরীরে রাজদর্শন করিতে নাই। কেবল পুরীর রাজাই "চলন্তীবিষ্ণু" নহে, প্রত্যেক রাজাই সাক্ষাৎ নারায়ণ। রাজধানীর অধিবাসীর প্রায় সকলেই রাজবৃত্তি ভোগ করে। প্রজাদিগের অবস্থা সাধারণতঃ অতি হীন। জমির খাজনা অতি সামান্য। বাঙ্গালা দেশের বিঘার হিসাবে দুই আনা হইতে ছয় আনা পর্য্যন্ত। জমির উর্ব্বরতা সামান্য নহে। কৃষিকার্য্য ভিন্ন অন্য ব্যবসায় নাই। পথ ঘাটের অসুবিধা হেতু দ্রব্যাদির রপ্তানি অতি অল্প। কৃষিবিত্ত ধনহীন প্রজার বিলাস বাসনা নাই। সকলেরই এক রকম সুখে দিন যাইতেছে। বেগার খাটিতেও বিরক্ত নহে। সেটা কর্ত্তব্য বলিয়া সকলেই জানে। প্রত্যেক রাজ্যে রাজা সূর্য্য, রাজাকে অবলম্বন করিয়া সকলে আছে। রাজার বিরাগ ও অনুরাগে নরক ও স্বর্গ। রাজার প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। খণ্ডপাড়ার আয় বার্ষিক ত্রিশ হাজার টাকা হইবে। কিন্তু দ্বারবঙ্গ ও বর্দ্ধমানের রাজাদের প্রতাপ খণ্ডপাড়ার রাজার প্রতাপের এক কণাও নহে। বোদ রাজ্যের আয়তন দুই সহস্র বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা এক লক্ষ ত্রিশ হাজার, রাজস্ব পঁয়ত্রিশ হাজার। নয়াগড়ের আয়তন ৫৮৮ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ১১৫০০০, রাজস্ব ৬৩০০০৲। ঢেঁকানলের আয়তন ১৪৬৩ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা দুই লক্ষ, রাজস্ব ১২০০০০। কিয়ঞ্জরের আয়তন তিন সহস্র বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা ২১৫০০০, রাজস্ব ৯০০০০৲। ময়ূরভঞ্জের আয়তন ৪২৪৩ বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা চারি লক্ষ, রাজস্ব চারি লক্ষ।

ধনে কিয়ঞ্জর, সভ্যতায় ময়ূরভঞ্জ এবং প্রতাপে খণ্ডপাড়া শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়। খণ্ডপাড়ার রাজা নটবর সিংহ দেব মর্দ্দরাজ ভ্রমরবর রায় বয়সে জ্যেষ্ঠ, ঢেঁকানলের কুমার সুরপ্রতাপ মহেন্দ্র বাহাদুর কনিষ্ঠ। ময়ূরভঞ্জ ইংরাজীতে সুশিক্ষিত, খণ্ডপাড়া সংস্কৃতে সুপণ্ডিত। নটবর সিংহের বয়স সত্তর বৎসর হইবে। ব্যূঢ়োরস্কবৃষস্কন্ধ লম্বিত বাহু পলিত কেশ দেখিলেই মহারাজা দশরথকে স্মরণ হয়। রাজা অসাধারণ কবি, তাঁহার চৌপদ্যাবলী ও ভজনমালা প্রকাশিত হইয়াছে, রঘুনাথ বিলাস এখনও মুদ্রিত হয় নাই। যে কোমল করে কবিতার মালতী মালা বিরচিত হয়, সেই করের বজ্রাঘাতে তিনশত

ব্যাঘ্র পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। রাজা নিজ হস্তে বন্দুক ও কৃপাণ প্রস্তুত করিতে পারেন, পালঙ্কে গজদন্ত খচিত করেন, রাধাবিনোদের চারুমূর্ত্তি তাঁহার স্থাপত্যের ঘোষণা করে। রাজার কবিত্ব শক্তির সমালোচনা কিঞ্চিৎ পরে করা যাইবে।

খণ্ডপাড়ায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, করণ ও বৈশ্য হইতে পালহাড়ি কণড্রা প্রভৃতি নিকৃষ্ট জাতি বাস করে। শাসন ব্রাহ্মণের সংখ্যা অল্প। বর্ণ ব্রাহ্মণ অধিক। রাজা সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়, রেওয়ার রাজা বাঘলবংশীয়দিগের নিকট আত্মীয়। রেওয়ার বর্ত্তমান রাজা ইঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র। ইঁহারা উৎকলে আসিয়া প্রথমে নয়াগড়ে রাজত্ব স্থাপন করেন। সেখান হইতে তদানীন্তন রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা যদু নাথ মন্দরাজ খণ্ডপাড়ার রাজত্ব স্থাপন করেন। খণ্ডে খণ্ডে সমগ্র রাজ্য অধিকৃত হইয়াছিল বলিয়া ইহার নাম খণ্ডপাড়া। তাঁহার পুত্র নারায়ণ মন্দরাজ, নারায়ণের পুত্র বালুকেশ্বর মন্দরাজ। বালুকেশ্বরের পুত্র বনমালী অসাধারণ বীরপুরুষ ছিলেন। লোকে বলে, তিনি একটী হাতীকে তুলিয়া ফেলিয়া দিতে পারিতেন। বিদ্রোহ সময়ে তিনি পুরীর রাজাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া পুরীর রাজা তাঁহাকে "মর্দ্দরাজ" উপাধি দেন। "শত্রুনাম্ মর্দ্দতি ইতি মর্দ্দরাজ"। এই অবধি মন্দরাজ পরিবর্ত্তে খণ্ডপাড়ার রাজাগণ মর্দ্দরাজ উপাধিতে বিভূষিত হন। বনমালীর পুত্র বৈরাগী সিংহ দেব মর্দ্দরাজ ভ্রমরবর রায়। তাঁহার পুত্র নীলাদ্রি, নীলাদ্রির পুত্র নৃসিংহ। এই নৃসিংহের সহিত ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট উড়িষ্যা অধিকার পূর্ব্বক সন্ধি করিয়া তাঁহাকে করদ রাজ্য বলিয়া স্বীকার করেন। নৃসিংহ ত্রিশ বৎসর, তাঁহার পুত্র পুরুষোত্তম সাত বৎসর, তাঁহার পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র দ্বাবিংশতি বৎসর, তাঁহার পুত্র কুঞ্জবিহারী ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ত্রয়োদশ বৎসর রাজত্ব করেন। রাজা নটবর সিংহদেব মর্দ্দরাজ ভ্রমরবর রায় কুঞ্জবিহারীর ভ্রাতা। তিনি ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। এমন প্রজারঞ্জন রাজা অতি অল্প দেখা যায়। তাঁহার নন্দন বনে সত্তর হাজার আম গাছ আছে। ক্ষুদ্র বৃহৎ আম্র বাগান দুই তিন শতের কম নহে। গাছের ফল প্রজারা খাইবে। কেহ ফল পাড়িলে আম্র শেষ হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে কারাবাস করিতে হইবে। কিন্তু ফল পাড়িলে কুড়াইয়া লইতে সকলের অধিকার। গ্রীষ্ম দিনে পার্ব্বত্য প্রদেশে বন্য পশু পক্ষীর তৃষ্ণার জলের বড় অভাব হয়। এই অভাব দূর করিবার জন্য মানুষের অগম্য অধিত্যকায় রাজা বহুব্যয়ে চারি পাঁচটী সরোবর প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় করণ ও বৈশ্যদিগকে উচ্চ বংশীয়, গোঁড়, গুড়িয়া, ভাণ্ডারী ও খণ্ডায়ত প্রভৃতিকে মধ্যবংশীয় এবং পানহাড়ী কনড্রা প্রভৃতিকে নীচ বংশীয় বলিয়া গণনা করা যায়। উচ্চ বংশের আচার ব্যবহার শাস্ত্রসম্মত এবং অন্য দেশীয়দিগের মত। কেবল রাজ বংশের বিশেষত্ব এই যে, মনুর নিয়মানুসারে রাজা "স্ত্রী রত্নং দুষ্কুলাদপি" গ্রহণ করিতে লাগিল। আপনা অপেক্ষা হীন বংশের কন্যা বিবাহ করিলেও রাজা শ্বশুর বংশের অন্ন জল গ্রহণ করিতেন না। মধ্য ও নীচ বংশে পঞ্চামৃত ও সাধ ভক্ষণের নিয়ম নাই। জাত ও বিবাহ কর্ম্মে এবং দেবা রাধনায় অনেক ভিন্নতা আছে।

সন্তান জন্মের পঞ্চম দিবসে পাঁচ প্রকা-

রের পত্র সংগ্রহ করিয়া (বাশুনিয়া, বেগু-নিয়া, ভণ্ডকারী, অর্ক এবং জড়া) নীচ জাতিতে প্রসূতি ও শিশুকে স্নান করাইয়া দেয়। সপ্তম দিবসে শিশুর মস্তক মুণ্ডন করা হয়, এবং দুই হাঁড়ী ভাত রাঁধিয়া সন্তানবতী রমণীদিগকে ভোজন করান হয় এবং শিশুর নামকরণ হয়। পূজাপাঠ কিছু নাই। অতঃপর বিবাহ পর্য্যন্ত আর কোন কার্য্য নাই।

মধ্য জাতির মধ্যে দ্বাদশ দিবসে প্রসূতি ও শিশুকে স্নান করাইয়া শুদ্ধপূত করা হয়, মলিন বস্ত্রগুলি ধোপাবাড়ী পাঠান হয়, রন্ধনের হাঁড়ী নূতন করা হয়। একবিংশ দিবসে থড়ীরত্ন (জ্যোতিষীর) সহিত পরা-মর্শ করিয়া শিশুর নামকরণ হয়। ছয় আট বা বার মাসে অন্নপ্রাশন হয়, তখন জ্ঞাতীদিগকে ভোজন করাইতে হয়। আড়াই বৎসরে কর্ণবেধ হয়। ইহার পরে বিবাহ পর্য্যন্ত আর কোনও কর্ম্ম নাই। উচ্চ জাতির মধ্যে পঞ্চম দিবসে ভুজার সহিত কড়ি মিশাইয়া বালকদিগকে দেওয়া হয়। ইহাকে পঞ্চুয়াতী বলে। এই দিন শিশুর হাতে কুশের দড়ী এক গাছা বাঁধিয়া দেওয়া হয়। ছয় দিনে ষষ্ঠী পূজা। এই দিন নাড়ী খসিয়া পড়ে এবং সূতিকা-গৃহ পরি-ষ্কার করা হয়। ষষ্ঠী ঠাকুরাণী এই দিন শিশুর কপালে ভাগ্য লিখিয়া দেন। একা-দশ বা দ্বাদশ দিবসে রন্ধনের পাত্র নূতন করা হয় এবং জ্ঞাতি কুটুম্বদিগকে ভোজন করাইতে হয়। একুশ দিনে বন্ধু বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া শিশুর নামকরণ হয়। ছয় মাসে অন্ন-প্রাশন এবং এক বৎসরে জন্মদিন করা হয়। তিন বৎসর হইতে এগার বৎসর মধ্যে কর্ণ-বেধ হয়। পনর ষোল বৎসরে বিবাহ। করণ প্রভৃতি জাতির বিবাহ সময়ে উপবীত হয়।

নীচ জাতির সাত বৎসর হইতে ষোল বৎসরের মধ্যে বিবাহ হয়। কন্যার ও বরের জাতক মিল না হইলে বিবাহ হয় না। কথা বার্ত্তা কহিবার পর জাতক মিলাইয়া কন্যা দেখিবার লগ্ন করিতে হয়। থড়ু, খই, এক বিড়া কুশলা শাঁক, এক আনার দই, পাঁচ পয়সার মাছ, আট আনার মুড়কী, বার আনার মদ লইয়া কন্যা দেখিতে যাইতে হয়। কন্যার দ্বারে পৌছিলে দ্বার লেপা হয়, সেখানে বর-ঘরের উপহার রাখিয়া তাহার উপর আলো চাউল চারিটী ছড়াইয়া দেওয়া হয়। ইহাকে বন্দনা বলে। তাহারপর জিনিস গুলি ঘরে লইলে বর ঘরের লোকেরা হাত পা ধুইয়া উপবেশন করে। কন্যা ঘরের মদ আনিয়া তখন বরপক্ষকে খাইতে দেয়। তাহাদের মদ শেষ হইলে বর ঘরের মদ খাওয়া হয়। ইহার নাম সুকৃত। খাইবার পূর্ব্বে দেখিয়া লয় যে কলসী পূর্ণ আছে কিনা, অপূর্ণ থাকিলে খায় না। সক-লের খাওয়া হইলে দুই বৈবাহিক ও উভয় পক্ষের এক এক জন ভাল লোক এই চারি জনের জন্য চারি চুমুক মদ রাখা হয়। সকলের খাওয়া হইলে তাহারা সেই চারি জনকে সুকৃত করিতে বলিবে। তাহারা বলিবে, আপনকার সুকল্যাণ হইলে আমরা সুকৃত করিতেছি। এই বলিয়া তাহারা সাত পুরুষকে সাক্ষ্য রাখিয়া পুত্র দিয়া কন্যা এবং কন্যা দিয়া পুত্র লইতেছি বলিয়া সুকৃত করিবে। ইহার আট দিন পরে বিবাহ। বিবাহের আভরণ থড়ু, কাপড়, সিন্দুর, কজ্জল ঠাকুরাণীকে দেখাইয়া কন্যা ঘরে লাওয়া হয়। সাত ঘর হইতে জল

সংগ্রহ করিয়া আনিয়া বিবাহ রাত্রের পূর্ব্ব প্রভাত সময়ে (কুইলি বোবাইবা সময়ে বা কোকিল ডাকিবার সময়ে) সেই জলে বর কন্যা স্নান করে। ইহার নাম বাড়ু পাণি। যে স্ত্রীর বাড়ুপাণি হয় না—মৃত্যু পরে তাহার মোক্ষ নাই। উভয়ে এ জলে সেজলে বসিয়া চির দিন মুখামুখী চাহিয়া থাকে। বিবাহের জন্য কন্যার বাপ চারি কলসী মদ রাখিবে। ভাত তরকারী, পাঁঠার মাংস ও দু কলসী মদ বিবাহের পূর্ব্বে খাওয়া হয়। বিবাহ শেষ হইলে বাকী দুই কলসী উদর-সাৎ করে।

বিবাহের সময়ে চারি জন লোক পৈতা পরিয়া ব্রাহ্মণ হয়। তাহারা চারি আঁটী খড়ের উপরে বেদীতে বসে। এবং সাল কাঠে স্বাহা স্বাহা বলিয়া ঘি ঢালিয়া হোম করে। হোম সময়ে বরের মামা বরকে এবং কন্যার মামা কন্যাকে ধরিয়া থাকে। চারিটী কুম্ভ বেদীর উপর রাখিয়া সাতখিয়া সুতা দিয়া বেড়িয়া দেওয়া হয়। বড় কন্যা সামনা সামনী হইয়া বসে। তখন মঙ্গল গীত গান হয়।

লক্ষ্মী রাজা বরণীরে চারি রাজা উনা
ধনুশর টেকিলে বীর যে লক্ষণ।
দ্রৌপদী যে বর্ণমালা গলারে পকাইরে-
ঝিয় দিবে বলি বলিলে জনক। •
দশরথ ছামকু শ্রীরাম চন্দ্র লেখ।
সে লেখ ঘেনিনু সত্যানন্দ গলা
অযোধ্যা নগরে প্রবেশ হইলা।
বসি করি পাঠ কৈলে অযোধ্যা দণ্ডধারী
বিবাহ লগ্ন সুঝিলা রামকু নিজে বলি
রামকু বরিনেই কলে বরবেশ
রামের ললাটে বাধিলে মুকুট।

এই সময়ে বরের মাথায় টোপর পরান হয়

রাম বিভা কালে যে লক্ষণ বরযাত্রী
কনক মণ্ডনরে মুকুতার খুপী।
পড়িলা মঙ্গল গীত দোল হুলহুলী
বিবিধ জহদ দাণ্ডে পড়িছে উছলি।
বাঁধিলে হস্তার আসাড়ুয়া সুতা।

এই সময়ে সেই সাতখিয়া সুতা লইয়া হাতে গণ্ঠী (গ্রন্থী) বাঁধা হয়।

কন্দার পকাইলে সুবর্ণ পৈতা—এই সময় বরের গলায় পৈতা দেওয়া হয়। গীত শেষ হইল। গ্রন্থী বাঁধিবার মন্ত্র—

অশ্বথ পত্র থস মস
এ গোত্রে যাই ও গোত্রে পস
লাঙ্গল উপার কণ্ঠি
পড়ু হাত গণ্ঠী।

কন্যার ভাই হাত গণ্ঠী খুলিয়া দিতে নূতন বস্ত্র পাইবে। বর কন্যার হাত ধরিয়া রহিবে, মামা কন্যাকে আনিয়া বরের দক্ষিণ দিকে (ভোজনী আড়ে) তাহাকে বসাইয়া দিবে।

তখন কড়ি খেলা হইবে। বর সাত বার কড়ি ফেলিয়া দিবে, কন্যা গুটাইয়া বরের হাতে দিবে, কন্যা সাতবার ফেলিয়া দিবে, বর গুটাইয়া কন্যার হাতে তুলিয়া দিবে। তাহার পর কন্যা এক কড়া কড়ি মুঠা করিয়া ধরিবে, বর কড়ে আঙ্গুল দিয়া তাহা ছাড়াইতে চেষ্টা করিবে। অপারক হইয়া তখন প্রার্থনা করিলে কন্যা বলিবে কি দিবে বল? বর বলিবে, ভাড়-গণ্ডায় (চারিটা) দিব। তখন কন্যা মুঠা ছাড়িয়া দিবে। বর আবার ঐরূপ করিবে, কন্যা মুঠা খুলিতে অক্ষম হইয়া স্বীকার করিবে, সঞ্চিত ধন দিয়া তোমাকে পুষিব। তখন সেই চারি ব্রাহ্মণ উঠিয়া আশী-র্ব্বাদ করিবে, এক বর, এক বর, দিন

যাবে, যুগে যুগে রাজ্য করিবে, বিঘ্ন হবে না, সাতপো সোণা নাকী ঝি হইবে। ব্রাহ্মণেরা উঠিয়া যাইলে শ্বাশুড়ী ননদ সকলে আসিয়া বন্দনা করিবে। বাড়ীর ঈশান কোণের ঘরে গড়গড়িয়া নামে গৃহ দেবতা থাকেন। সে দেবতাকে তখন মুণ্ডিয়া মারিবে (নমস্কার করিবে)। তখন বর কন্যা আহার করিবে। তাহাদের আহার শেষ হইলে বাকী দু কলসী মদ খাইয়া কুটুম্বেরা যে যেখানে পারে "পড়িয়া যাইবে।" কন্যা শ্বশুর বাড়ী আসিলে বরের পিতা পাচ কলসী মদ ভাত তরকারী করিয়া কুটুম্বদিগকে খাওয়াইলে বিবাহ শেষ হয়। যাহার বাড়ুপাণি হয় নাই, সাহাড়া গাছে কাপড় খাড়ু মালা সিন্দুর দিলে তাহাকে বিবাহ করা হয়।

মধ্য জাতীয় লোকের বিবাহ পদ্ধতি কিছু ভিন্ন। খড়ী রত্নের কাছে জাতক মেল সব জাতিরই আছে। জাতক মিল হইলে কাপড়, শালাকে ধুতী এবং তিনটী টাকা দিয়া বরের পিতা বিবাহের দিন স্থির করিয়া আসিবে। বিবাহের পূর্ব্ব দিন গায় হলুদ। বরের বাড়ীর মেয়েরা চুয়া সিন্দুর, সোণা রূপা হলুদ ঘি লইয়া কন্যাকে স্নান করাইয়া আসিবে। প্রভাতে উভয় পক্ষের প্রেরিত পাঁচ ঘরের জলে স্নান করিতে হয়। স্নানের কাপড় নাপিত পায়। নূতন কাপড় পরিয়া আইবুড়া ভাত খাইতে হয়। গুড়িয়া ভাণ্ডারী কেয়উ চাসা গোড় প্রভৃতি মধ্য জাতীয় লোকেরা ঘোড়ায় চড়িয়া বিবাহ করিতে যায়। উচ্চ শ্রেণী চতুর্দ্দোলে। বিবাহ যাত্রার পথে যত দেবতা দেখিতে পাইবে, তাহাকে চাউল অঞ্জলী দিয়া যাইবে। কন্যা ঘরে পৌছিলে বাটবরণ হয়। নূতন বস্ত্র পরিয়া বেদীর উপর বসিয়া বিবাহ হয়। বিবাহের চতুর্থ দিনে শ্রাদ্ধ হয় এবং হোম করা হয়। পঞ্চম দিনে শ্বশুর বাড়ীর কাহারও মুখ না দেখিয়া বর নিজ গৃহে ফিরিয়া আসে। কন্যা গৃহযোগ্যতা না হইলে শ্বশুর বাড়ী আসে না। দ্বিরাগমন সময়ে জ্ঞাতি কুটুম্বকে ভোজন করাইতে হয়।

উচ্চ শ্রেণীতে জাতক মিল হইলে কন্যা ঘর হইতে "স্বীকার" আসে। বরের জন্য সোণার মুদি হার; পাটের কাপড়, ঘটী, থালা, রূপার থালায় মহাপ্রসাদ, মাছ, দই, পুরোহিত, জ্যোতিষ ও নাপিতের কাপড় লইয়া বাজানা বাজাইয়া কন্যা পক্ষ বিবাহ স্বীকার করিয়া যায়। বরের আত্মীয় কুটুম্ব আসিয়া "স্বীকার" স্বীকার করিলে কন্যাপক্ষ বিদায় হয়। বিদায় সময়ে উভয় পক্ষের জ্যোতিষী বর পক্ষের স্বীকারের দিন নির্দ্ধারণ করে। সে দিন পুরোহিত জ্যোতিষ ও নাপিত গহনা শাড়ী প্রভৃতি মহাপ্রসাদের সঙ্গে লইয়া যায়।

এক জোড়া মূল্যবান ধুতী দেখাইবার জন্য লইয়া যায়। আর সব জিনিস দেখাইয়া এই "ব্যবহারের" ধুতী জোড়াটী ফিরিয়া আনা হয়। বিবাহের অন্যান্য পদ্ধতি মধ্য শ্রেণীর মত। বিবাহের পূর্ব্বদিন গায়ে হলুদ। গায় হলুদের দিন "বর ধরা" হয়। কন্যাপক্ষ হইতে লোকজন পালকী ও বাজনা লইয়া যাইয়া বরকে বরণ করিয়া আসে। তাহারা সে দিনই ফিরিয়া যায়। যে বরধরার দিন বরণ করে, সেই বাটবরণে বরণ করিয়া থাকে।

খণ্ডপাড়ায় গোপীনাথ, রঘুনাথ, চিন্তামণি, হনুমান, নারায়ণ, জগন্নাথ, করুণা সাগর

মহাদেব প্রভৃতি দেবতা ভিন্ন অনেক গুলি দেবতা দেখা যায়। ইহাদের কাহাকে কাহাকেও সাঁওতাল পরগণায় দেখিয়াছিলাম। বোধ হয়, বনভূমের ধর্ম্মভাব একই জাতীয়। খণ্ডপাড়ার গ্রাম্য দেবতাদিগের নাম উমা দেই, ডোমনী, মঙ্গলা, পাটচণ্ডী, সুরিয়া এবং বেহারা গুনি। মালী জাতীয় লোকে মহাদেবের পুরোহিত। তয়োলা জাতীয় জলচল জাতি উমাদেই, ডোমনী, মঙ্গলা ও পাটচণ্ডীর এবং সুদ জাতি সুরিয়া ও বেহারাগুনির পূজা করে। শুদ জাতি ও জলচল। মালী জাতি মহাদেবের ন্যায় হনুমানেরও পূজা করে। উমা ডোমনী মঙ্গলা পাটচণ্ডী সুরিয়া এবং বেহারাগুনি দেবীদিগের পূজা মদ পাঁঠা ও মুরগী দিয়া সাধিত হয়। অগচ হিন্দুরা এই সকল মদ মুরগী-প্রিয় দেবীদিগকে পূজা দিয়া থাকে। কাটিবার পূর্ব্বে মুরগী ও পাঁঠাকে চারিটী চাউল খাইতে দেয়। যখন খাইতে থাকে, তখন অস্ত্রাঘাতে মস্তক ছিন্ন করিয়া থাকে।

সহস্র বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু রাজত্ব কি প্রকার ছিল, খণ্ডপাড়ায় আসিলে বুঝা যায়। ইংরাজী হিসাবে দেবীর দরবারকে আলস্য মণ্ডল বলা যাইতে পারে। রাজা হিন্দু, প্রজাগণ হিন্দু। চাতুর্মাস্যে, বৈশাখ কার্ত্তিক ও মাঘে, রবিবারে, দশমী, একাদশী ও দ্বাদশী তিথিতে শীকার করা পর্য্যন্ত চলে না। রাজকুমার খুব ভাল শীকারী। আমরা এক দিন "আড়ি পাতিয়া" শীকার করিতে গিয়াছিলাম। দলে দলে হরিণ রাজকুমারের সম্মুখে উপস্থিত। তিনি একটী আওয়াজও করিলেন না, হরিণগুলি ফিরিয়া আমার দিকে আসিল, কুমার বুঝাইলেন যে, অভ্যাগতের সম্মানের জন্য তিনি তাহাদিগকে আমার দিকে পাঠাইয়াছিলেন। আমি শেষ বুঝিলাম, সে দিন রবিবার ছিল।

ভাষা বিশুদ্ধ উড়িয়া। এখানে একটী কথা বলিয়া রাখি। পুরাণেও ওড্র দেশ খোরদা অঞ্চল। খোরদা পুরীর রাজার প্রাচীন রাজধানী। এ দেশের সাধারণ লোকে এই অঞ্চলকে উড়িষ্যা এবং তত্রত্য উৎস বা খণ্ডায়েত অধিবাসীদিগকে উড়িয়া বলে। ইহারা পূর্ব্বে খণ্ড ধরিয়া সৈন্য হইত। এখন খণ্ড ভাঙ্গিয়া ফাল প্রস্তুত করিয়াছে। কটক অঞ্চলে যে নূতন দেশহিতৈষিতা জন্মিয়াছে, তাহাতে প্রথমে দেশীয় লোকেরা আপনাদিগকে "ওড়িয়া" বলিয়া অভিহিত করিয়াছিল। এখন আপনাদের দেশকে উৎকল ও আপনাদিগকে উৎকলীয় বলিয়া অভিহিত করে। পৌরাণিক ভূগোল অনুসারে এ দুইটী শব্দেই তাঁহাদের অধিকার নাই। এ জন্য প্রাচীন মতে ভাষাটীকে আমি উড়িয়া ভাষা বলিয়া অভিহিত করিলাম।

খণ্ডপাড়ার ভাষা বিশুদ্ধ উড়িয়া। ইহাতে ইংরাজী বাঙ্গলা পার্সীর বকুনী কিছু মাত্র নাই। আমাদের দেশে সংস্কৃত মূলক শব্দকে সাধুভাষা বলা হয় এবং শিক্ষিত লোকে সেই ভাষায় কথা বার্ত্তা কহে। এ দেশে অতি নিম্ন শ্রেণীরও ভাষা সাধু ভাষা।

প্রায় বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে নব্যভারতে আমি সময় ক্রিয়ার কথা লিখিয়াছিলাম। খণ্ডপাড়ায় এখনও এই প্রকারের বিচার প্রথা প্রচলিত আছে। একটী অতি নিম্ন শ্রেণীর দরিদ্র লোক চৌর্য্যাপরাদ ক্ষালন করিবার জন্য রাজধানীতে ধর্ম্মদ্বার করিতে আসিয়াছিল। সে বলিল, সে মাণ্ডু করিবে। সময় ক্রিয়াকে এ দেশে মাণ্ডু বলে। পূর্ব্বে চারি প্রকারের মাণ্ডু হইত। এখন দুই

প্রকারের হয়। অগ্নি দগ্ধ ফাল ধারণ করিয়া ও গোক্ষুর-সর্প-পূর্ণ কুম্ভ হইতে সুপারী উঠাইয়া আপন নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিবার মাণ্ডু এখন উঠিয়া গিয়াছে।

হোম করিয়া দুইটী মৃণ্ময় গোলক জল পাত্রে প্রক্ষেপ করা হয়। দুই খণ্ড তাল পত্রের একখানিতে "ষম" ও অন্য খানিতে "ধর্ম্ম" লিখিয়া গোলক মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া একটী শিশুকে একটী গোলক উঠাইতে দেওয়া হয়। যমপূর্ণ গোলক উঠিলে দোষী ও ধর্ম্মপূর্ণ গোলক উঠিলে নির্দ্দোষী প্রমাণ হয়। কিন্তু এ মাণ্ডু সাধারণের প্রিয় নহে।

ষাট্ হাত দূরে একটী বট শাখা বসাইয়া হোম করিবার পরে অভিযুক্ত ব্যক্তি জলে ডুব দেয়। একজন তাহার মাথা স্পর্শ করিয়া থাকে। আর একজন ধনুক লইয়া সেই বটশাখা লক্ষ্য করিয়া তিনটী বাণ প্রয়োগ করে। অপর একজন তখন যাইয়া বাণগুলি লইয়া আসে। তাহার ফিরিবার পূর্ব্বে অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি ভাসিয়া উঠে, তবে সে অপরাধী। এই মাণ্ডুটী সাধারণের বড় প্রিয়। অধিকাংশ মোকদ্দমা সাক্ষ্য ও প্রমাণ লইয়া মীমাংসা করা হয়।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

বরষা-রঙ্গ

দিগঙ্গনা কোলে বর্ষা লয়েছে আশ্রয়
প্রিয়ে কেন গেলে নাক জনক আলয়।
নবীন নীরদ কান্তি মর্দ্দিত কজ্জল
আভায় প্রভায় যেন সুনীল কমল।
রিমি ঝিমি বরষণ বড় মনোহর
শ্যামল শোভায় বিশ্ব হ'য়েছে সুন্দর।

২

বুক ভ'রে বিরহের গাঢ় আলিঙ্গন
না পাইনু হায় প্রিয়ে তোমারি কারণ।
হোথায় কবিরা কাঁদে কত ফুকরায়
আতপ্ত নিশ্বাসে উষ্ণ করে বরষায়।
দেখে চপলার হাসি চকিত চমক
আমি আছি দেখিবারে মানের ঠমক।

৩

পুলকে ভাবুক-দল দেখে আঁখি ভ'রে
বপ্র-ক্রীড়া-পরায়ণ মাতঙ্গ নিকরে।
বিচ্ছেদ বিভ্রম রসে 'রক্ত দশনায়'
শিখরি দশনা ভাবি কাঁদে উভরায়।
মিলন আতুর প্রাণে নিশ্চল হরষ
এ বাদলে হারায়েছে উদ্দাম তরষ।

তাই বলি ও গৃহিণি! মানময়ি বঁধু
আদর বাদর ভরা প্রেম কঞ্জ মধু।
হাসি ল'য়ে রঙ্গ লয়ে লয়ে সান্দ্র মান
করিলে না এবাদলে কেনলো পয়াণ?
কালি ফেলা পুঁথিছেড়া স্নেহ চোরা যুথী
শ্রীবিহীন করিয়াছে সবগুলি পুঁথি।
কুন্দ দশনের তার মধুর বিকাশ
তাও আজি করিয়াছে পরাণে উদাস।
নিকটে থাকার চেয়ে 'থাকার সম্ভব'
যোগাত এ বরষার নূতন বিভব।
নিবিড় নীরদ স্নিগ্ধ গম্ভীর ঘর্ঘর
উচ্চারে উদাত্ত স্বরে বিরহ মন্তর।

৫

তোমা ছেড়ে রব ল'য়ে তোমারি বিরহ
পিয়াব সোহাগ-সুধা তারে অহরহঃ।

জনক আলয়ে প্রিয়ে যাও তুমি ত্বরা
বাদলে বিষম লাগে হাতে পায়ে ধরা।
দুইটী প্রেমের মাঝে বিরহের স্থান
নেহাত দু দিন তরে ক'রে যাও দান।

৬

শ্যামল মাধুরী ভরা আউষ কম্পন
অতৃপ্ত নয়নে একা করি দরশন।
কেতকী কদম্ব বাসে আর্দ্র সমীরণ
তুলুক জাগায়ে মনে তোমারি স্বপন।
প্রেম না সহিতে পারে মিলনের চাপ
অলঘু মিলন আনে নিবিড় সন্তাপ।
মিলন, বিরহ যাচে—বিরহ মিলন,
বরষায় ভাল লাগে নীরব রোদন।
তোমা হ'তে স্মৃতি তব আরো মনোহর
পুরাণ প্রেমের রূপ নব জলধর।

বাস্তব জগত ছাড়ি ঘোর বরষায়
চায় মন কল্পনার বৈদূর্য্য প্রভায়।
প্রেমময়ী রাধিকার মুগ্ধ অভিসার
চিত্রকূটে অভিসপ্ত যক্ষ হাহাকার।
'উদয়ন' 'পত্র লেখা' 'রেবা' 'জম্বুবন'
সবে মিলে আনে মনে মধুর স্বপন।

৮

মানমণি কর দান যেয়ে কাজ নেই
বরষার দাঁড়াবার হবে প্রিয়ে ঠাঁই।
চপলার খর হাসি থাক চপলার
শুচিস্মিতে কুন্দ কান্তি করহ বিস্তার।
ধূপে সুরভিত কেশ দিয়ে এলাইয়া
দাঁড়াও ফিরিয়া হেথা চিত বিনোদিয়া।
কেশের তরঙ্গোচ্ছ্বাসে খেলিবে পুষ্কর
প্রেম, কলাপিনী হ'য়ে নাচিবে সুন্দর।
হাসি হ'তে বাহিরিবে বিজলি শীতল
মূক মেঘ হরষে করিবে দলমল।
দেহ সরোবর মাঝে রূপের প্লাবন
"লিথি", মাঝে বরষায় করিবে ক্ষেপণ।

৯

থাক থাক কাছে থাক বসন্তবল্লরি
শরতের কুবলয়—জোছনা লহরী।
বরষার ঢলঢল সোহাগ ফোয়ারা
নিদাঘের প্রথম শীতল জলধারা।
তপ্ত মুড়ি এনে দাও দিয়ে তাহে ঘি
রাগ কেন কর আমি মজা ক'রেছি।
আমার যুথীরে দেও আমার সকাশ।
পার যদি কর কিছু কচুরী প্রকাশ।
মুরলীরে বল কিছু আনিতে সন্দেশ
রসনায় বরষার হতেছে প্রবেশ।

শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী।

কর্ম্মযোগী প্যারিচাঁদ মিত্র।

বাঙ্গালা-সাহিত্য আজকাল যেরূপ উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে, ইহার আদি অবস্থা কিরূপ ছিল, এই সময়ে অনেকেরই তাহা জানিতে ইচ্ছা হইতে পারে। মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্র লুপ্ত-রত্নোদ্ধারের ভূমিকায় সে অবস্থা অতি সুন্দর রূপ বিবৃত করিয়াছেন। তাহা এই—

"প্রাচীন কালে, অর্থাৎ এদেশে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে, বাঙ্গালায় সচরাচর পুস্তক রচনা সংস্কৃতের ন্যায় পদ্যেই হইত। গদ্য রচনা যে ছিল না, এমন কথা বলা যায় না, কেন না, হস্ত-লিখিত গদ্য গ্রন্থের কথা শুনা যায়। সে সকল গ্রন্থও এখন প্রচলিত নাই, সুতরাং তাহার ভাষা কিরূপ ছিল, তাহা এক্ষণে বলা যায় না। মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপিত হইলে, গদ্য বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রথম প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইল। প্রবাদ আছে যে, রাজা রামমোহন রায় সে সময়ের প্রথম গদ্য-লেখক। তাঁহার পর যে গদ্যের সৃষ্টি হইল, তাহা লৌকিক বাঙ্গালা ভাষা হইতে সম্পূর্ণ রূপে ভিন্ন। এমন কি, বাঙ্গলা ভাষা দুইটী স্বতন্ত্র

বা ভিন্ন ভাষায় পরিণত হইয়াছিল। একটীর নাম সাধুভাষা অর্থাৎ সাধুজনের ব্যবহার্য্য ভাষা, আর একটীর নাম অপর ভাষা, অর্থাৎ সাধু ভিন্ন অপর ব্যক্তিদিগের ব্যবহার্য্য ভাষা। এ স্থলে সাধু অর্থে পণ্ডিত বুঝিতে হইবে। আমি নিজে বাল্যকালে ভট্টাচার্য্য অধ্যাপকদিগকে যে ভাষায় কথোপকথন করিতে শুনিয়াছি, তাহা সংস্কৃত ব্যবসায়ী ভিন্ন অন্য কেহই ভাল বুঝিতে পারিতেন না। তাঁহারা কদাচ 'খয়ের' বলিতেন না—'খদির' বলিতেন; কদাচ 'চিনি' বলিতেন না—'শর্করা বলিতেন। "ঘি" বলিলে তাঁহাদের রসনা অশুদ্ধ হইত, "আজ্যই বলিতেন, কদাচিৎ কেহ ঘৃতে নামিতেন। 'চুল' বলা হইবে না,—কেশ' বলিতে হইবে। 'কলা বলা হইবে না,—'রম্ভা' বলিতে হইবে। ফলাহারে বসিয়া 'দই' চাহিবার সময় 'দধি' বলিয়া চীৎকার করিতে হইবে। আমি দেখিয়াছি, একজন অধ্যাপক একদিন 'শিশুমার' ভিন্ন 'শুশুক' শব্দ মুখে আনিবেন না, শ্রোতারাও কেহ শিশুমার অর্থ জানেনা, সুতরাং অধ্যাপক মহাশয় কি বলিতেছেন, তাহার অর্থবোধ লইয়া অতিশয় গণ্ডগোল পড়িয়া গিয়াছিল। পণ্ডিতদিগের কথোপকথনের ভাষাই যেখানে এইরূপ ছিল, তবে তাঁহাদের লিখিত বাঙ্গালা আরো কি ভয়ঙ্কর ছিল, তাহা বলা বাহুল্য। এরূপ ভাষায় কেন গ্রন্থ প্রণীত হইলে, তাহা তখনই বিলুপ্ত হইত, কোন না, কেহ তাহা পড়িত না। কাজেই বাঙ্গালা সাহিত্যের কোন শ্রীবৃদ্ধি হইত না।

এই সংস্কৃতানুসারিণী ভাষা প্রথম মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয় কুমার দত্তের হাতে কিছু সংস্কার প্রাপ্ত হইল। ইঁহাদিগের ভাষা সংস্কৃতানুসারিণী হইলেও তত দুর্ব্বোধ্য নহে। বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্ব্বে কেহই এরূপ সমধুর বাঙ্গালা গদ্য লিখিতে পারে নাই, এবং তাঁহার পরেও কেহ পারে নাই। কিন্তু তাহা হইলেও সর্ব্বজন-বোধগম্য ভাষা হইতে ইহা অনেক দূরে রহিল। সকল প্রকার কথা এ ভাষায় ব্যবহার হইত না বলিয়া, ইহাতে সকল প্রকার ভাব প্রকাশ করা যাইত না এবং সকল প্রকার রচনা ইহাতে চলিত না। গদ্য ভাষার ওজস্বিতা এবং বৈচিত্র্যের অভাব হইলে, ভাষা উন্নতিশালিনী হয় না। কিন্তু প্রাচীন প্রথায় আবদ্ধ এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষার মনোহারিতায় বিমুগ্ধ হইয়া কেহই আর কোন প্রকার ভাষায় রচনা করিতে ইচ্ছুক বা সাহসী হইত না। কাজেই বাঙ্গালা সাহিত্য পূর্ব্বমত সঙ্কীর্ণ পথেই চলিল।

ইহা অপেক্ষা বাঙ্গালা ভাষায় আরও একটী গুরুতর বিপদ ঘটিয়াছিল। সাহিত্যের ভাষাও যেমন সঙ্কীর্ণ পথে পথে চলিতেছিল, সাহিত্যের বিষয়ও ততোধিক সঙ্কীর্ণ পথে চলিতেছিল। যেমন ভাষাও সংস্কৃতের ছায়া মাত্র ছিল, সাহিত্যের বিষয়ও তেমনই সংস্কৃতের এবং কদাচিৎ ইংরাজির ছায়ামাত্র ছিল। সংস্কৃত বা ইংরাজি গ্রন্থের সার সঙ্কলন বা অনুবাদ ভিন্ন বাঙ্গালা সাহিত্য আর কিছুই প্রসব করিত না। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিভাশালী লেখক ছিলেন, সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহারও শকুন্তলা ও সীতার বনবাস সংস্কৃত হইতে, ভ্রান্তিবিলাস ইংরাজি হইতে এবং বেতাল-পঞ্চবিংশতি হিন্দি হইতে সংগৃহীত। অক্ষয় কুমার দত্তের ইংরাজি একমাত্র অবলম্বন ছিল। আর সকলে তাঁহাদের অনুকারী ও অনুবর্ত্তী। বাঙ্গালি-লেখকেরা গতানুগতিকের বাহিরে হস্ত প্রসারণ করিতেন না। জগতের অনন্ত ভাণ্ডার আপনাদের অধিকারে আনিবার চেষ্টা না করিয়া, সকলেই ইংরাজি ও সংস্কৃতের ভাণ্ডারে চুরির সন্ধানে বেড়াইতেন। সাহিত্যের পক্ষে ইহার অপেক্ষা গুরুতর বিপদ আর কিছুই নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অক্ষয় বাবু যাহা করিয়াছিলেন, তাহা সময়ের প্রয়োজনানুমত, অতএব তাঁহারা প্রশংসা ব্যতীত অপ্রশংসার পাত্র নহেন; কিন্তু সমস্ত বাঙ্গালি-লেখকের দল সেই একমাত্র পথের পথিক হওয়াই বিপদ।

এই দুইটী গুরুতর বিপদ হইতে প্যারীচাঁদ মিত্রই বাঙ্গালা সাহিত্যকে উদ্ধৃত করেন। যে ভাষা সকল বাঙ্গালির বোধগম্য এবং সকল বাঙ্গালী কর্ত্তৃক ব্যবহৃত, প্রথম তিনিই তাহা গ্রন্থ প্রণয়নে ব্যবহার করিলেন। এবং তিনিই প্রথম ইংরাজি ও সংস্কৃতের ভাণ্ডারে পূর্ব্বগামী লেখকদিগের উচ্ছিষ্টাবশেষের অনুসন্ধান না করিয়া, স্বভাবের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে আপনার রচনার উপাদান সংগ্রহ করিলেন। এক "আলালের ঘরের দুলাল" নামক গ্রন্থে এই উভয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। "আলালের ঘরের দুলাল" বাঙ্গালা ভাষায় চিরস্থায়ী ও

চিরস্মরণীয় হইবে। উহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তৎপর কেহ প্রণীত করিয়া থাকিতে পারেন, অথবা ভবিষ্যতে কেহ করিতে পারেন, কিন্তু "আলালের ঘরের দুলালের" দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের যে উপকার হইয়াছে, আর কোন বাঙ্গালা গ্রন্থের দ্বারা সেরূপ হয় নাই এবং ভবিষ্যতে হইবে না।

আমি এমন বলিতেছি না যে, "আলালের ঘরের দুলালের" ভাষা আদর্শ ভাষা। উহাতে গাম্ভীর্য্যের এবং বিশুদ্ধির অভাব আছে এবং উহাতে অতি উন্নত ভাব সকল, সকল সময়ে, পরিস্ফুট করা যায় কিনা সন্দেহ। কিন্তু উহাতেই প্রথম এ বাঙ্গালা দেশে প্রচারিত হইল যে, বাঙ্গালা সর্ব্বজন মধ্যে কথিত এবং প্রচলিত, তাহাতে গ্রন্থ রচনা করা যায়, সে রচনা সুন্দরও হয় এবং যে সর্ব্বজন হৃদয় গ্রাহিতা সংস্কৃতানুযায়িনী ভাষার পক্ষে দুর্লভ, এ ভাষায় তাহা সহজ গুণ। এই কথা জানিতে পারা বাঙ্গালি জাতির পক্ষে অল্প লাভ নহে এবং এই কথা জানিতে পারার পর হইতে উন্নতির পথে বাঙ্গালা সাহিত্যের গতি অতিশয় দ্রুতবেগে চলিতেছে। বাঙ্গালা ভাষার এক সীমায় তারা শঙ্করের কাদম্বরীর অনুবাদ, আর এক সীমায় প্যারীচাঁদ মিত্রের "আলালের ঘরের দুলাল।" ইহার কেহই আদর্শ ভাষায় রচিত নয়। কিন্তু "আলালের ঘরের দুলালের" পর হইতে বাঙ্গালি লেখক জানিতে পারিল যে, এই উভয় জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ দ্বারা এবং বিষয়-ভেদে একের প্রবলতা ও অপরের অল্পতা দ্বারা, আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যে উপস্থিত হওয়া যায়। প্যারীচাঁদ মিত্র, বাঙ্গালা গদ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন, কিন্তু বাঙ্গালা গদ্য যে উন্নতির পথে যাইতেছে, প্যারীচাঁদ মিত্র তাহার প্রধান ও প্রথম কারণ। ইহাই তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি।

আর তাঁহার দ্বিতীয় অক্ষয়কীর্ত্তি এই যে, তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে—তাহার জন্য ইংরাজি বা সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা চাহিতে হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যেমন জীবনে তেমনই সাহিত্যে ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর, পরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধ হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যদি সাহিত্যের দ্বারা বাঙ্গালা দেশকে উন্নত করিতে হয়, তবে বাঙ্গালা দেশের কথা লইয়াই সাহিত্য গড়িতে হইবে। প্রকৃত পক্ষে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আদি "আলালের ঘরের দুলাল।" প্যারীচাঁদ মিত্রের এই দ্বিতীয় অক্ষয় কীর্ত্তি।

অতএব বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান অতি উচ্চ। এই কথাই আমার বক্তব্য। তাঁহার প্রণীত গ্রন্থ সকলের বিস্তারিত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইবার আমার অবসর নাই।"

এতৎ সম্বন্ধে ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয় "তাঁহার বাঙ্গালা-ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতায়" লিখিয়াছিলেন—

"বিদ্যাসাগরের ইদানীন্তন ভাষা যেমন সহজ, কোমল ও মসৃণ হইয়াছে, পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না। তিনি সংস্কৃত-শব্দ-বহুল সাধুভাষা ব্যবহার করাতে শ্রীযুক্ত রাধানাথ শিকদার ও শ্রীযুক্ত প্যারীচাঁদ মিত্র বিরক্ত হইয়া গত ১৮৫৪ সালে অপভাষায় লিখিত একখানি মাসিকপত্রিকা প্রকাশ করেন। উহার নাম মাসিক-পত্রিকা।" ঐ পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় একটী বিজ্ঞাপন থাকিত, সেই বিজ্ঞাপনে এই কথাগুলি লেখা থাকিত, "পত্রিকা পণ্ডিত লোকদিগের জন্য প্রকাশিত হচ্ছে না। তাঁহারা পড়তে চান পড়বেন, কিন্তু তাঁদের জন্য এ পত্রিকা নহে।" ঐ পত্রিকার টেকচাঁদ ঠাকুর প্রণীত "আলালের ঘরের দুলাল" প্রথম প্রকাশিত হয়। ঐ কল্পিত টেকচাঁদ ঠাকুর আমাদের মাননীয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র। সেই অবধি দুই প্রকার ভাষা সৃষ্টি হইয়াছে, বিদ্যাসাগরী ভাষা ও আলালী ভাষা। কোন্ ভাষা জয়লাভ করিবে, অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহাতে সন্দেহ ছিল। একণে যেরূপ চিহ্ন দেখা যাইতেছে, তাহাতে বোধ হয়, এই দুই ভাষা হইতে উৎপন্ন এবং মিশ্র ভাষা গ্রন্থকারদিগের মধ্যে প্রচলিত হইবে। এই মিশ্রভাষা ব্যবহারের প্রথম দৃষ্টান্ত-প্রদর্শক বিখ্যাত উপন্যাস-রচয়িতা বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।"

বঙ্গদেশের উপরোক্ত দুই জন প্রসিদ্ধ মহাত্মার মন্তব্য পাঠ করিয়া সকলেই বুঝিতে পারিলেন, প্যারীচাঁদ মিত্র এদেশের কিরূপ বন্ধু ছিলেন। যতদিন বাঙ্গালা ভাষা জীবিত

থাকিবে, প্যারীচাঁদের নাম ততদিন এদেশের নরনারীর হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিবে। কিন্তু এই মহাত্মা কে ছিলেন? তাঁহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে দিতেছি।

নীমতলার সুবিখ্যাত দত্ত বংশে, ১৮১৪খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জুন, শনিবার, তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম বাবু রামনারায়ণ মিত্র। রামনারায়ণ,মহাত্মা রামমোহন রায়ের একজন বিশেষ বন্ধু। বাল্যকালে প্যারীচাঁদ বড়ই রুগ্ন ছিলেন। প্রথমে তিনি গুরুমহাশয়ের নিকট বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করেন, তৎপর একজন মুন্সীর নিকট পার্সী ভাষা শিক্ষা করেন। পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে, ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জুলাই তারিখে হিন্দুকলেজের একাদশ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি প্রতিভাগুণে সকলের প্রিয়পাত্র হন। প্রথম শ্রেণীর পরীক্ষায় অনেক পারিতোষিকের পুস্তক এবং মাসিক ১৬৲ টাকার বৃত্তি প্রাপ্ত হন। একসময়ে, রাজা দিগম্বর মিত্র মহোদয়কে পরাস্থ করিয়া গ্রান্ট সাহেব সম্বন্ধে রচনা লিখিয়া পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। বক্তৃতা শিক্ষার জন্য, ডেভিড হেয়ার মহোদয়-প্রতিষ্ঠিত একাডেমিক এসোসিয়েসনে প্রবেশ করেন। এখানেও প্রতিভাগুণে সকলকে মোহিত করেন। এই সময়ে বাড়ীতে একটী অবৈতনিক স্কুল সংস্থাপন করিয়া পাড়ার ছাত্রদিগকে প্রাতঃকালে পড়াইতেন। এই স্কুলে বাবু রসিককৃষ্ণ মল্লিক, বাবু রাধানাথ সিকদার এবং শিবচন্দ্র দেব অবৈতনিক শিক্ষক ছিলেন। এই স্কুলে বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র, বাবু গোপীকৃষ্ণ মিত্র, বাবু গোবিন্দচন্দ্র দে বাল্যশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে, স্কুল পরিত্যাগের পর, গবর্ণমেণ্ট পবলিক লাইব্রেরির ডেপুটী লাইব্রেরিয়ান হন। এই লাইব্রেরির উন্নতির জন্য প্রভূত পরিশ্রম করেন। তৎপর তাঁহার অসাধারণ কৃতীত্বের গুণে তিনি ইহার সম্পাদক ও লাইব্রেরিয়ান পদ প্রাপ্ত হন। এখানে অধ্যয়নের বিশেষ সুবিধা হয়। এই সময়ে সাহিত্যানুশীলনে মনোনিবেশ করেন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত পদ পরিত্যাগ করেন। দাসত্ব করা তিনি ভাল বাসিতেন না, এইজন্য, পূর্ব্বেই বাবু তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সহিত মিলিত হইয়া ব্যবসা আরম্ভ করেন। তারাচাঁদ বাবুর মৃত্যুর পর, ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার দুই পুত্রের সহিত মিলিত হইয়া "প্যারীচাঁদ মিত্র এবং পুত্র" কোম্পানী নামে কারবার আরম্ভ করেন। এই সময়ে চরিত্রগুণে তিনি সকলের নিকট বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। গ্রেট-ইষ্টারণ-হোটেল, পোর্ট ক্যানিং ল্যাণ্ড ইনভেষ্টমেন্ট কোম্পানি, বেঙ্গল টি কোং, ইষ্ট ইণ্ডিয়া টি কোং, ডুরাঙ্গ টি কোং প্রভৃতির ডিরেক্টর হন। বাল্যের একাডেমিক এসোসিয়েসন কালে Society for the Acquisition of general knowledge এ পরিণত হইল, এবং তিনি ইহার সম্পাদক হইলেন। এই সভা হইতে মুদ্রিত বক্তৃতা-সমূহের মধ্যে তাঁহার রচিত অনেক বক্তৃতা আছে। বাল্যকালে রাজা দক্ষিণাচরণ মুখোপাধ্যায়ের সহিত মিলিত হইয়া জ্ঞানান্বেষণ বাহির করেন এবং বাবু রামগোপল ঘোষ ও রসিককৃষ্ণ মল্লিকের সহিত মিলিত হইয়া বেঙ্গল স্পেকটেটর প্রচার করেন। ইহা ভিন্ন বাঙ্গালার প্রথম ম্যাগাজিন "মাসিক পত্রিকা" প্রকাশ করেন। ইহা ভিন্ন ইংলিসম্যান, বেঙ্গল হরকরা, ইণ্ডিয়ান ফিল্ড, পেট্রিয়ট, এবং কলিকাতা-রিভিউ পত্রিকা প্রভৃতিতে সর্ব্বদা প্রবন্ধ লিখিতেন। বাঙ্গালা ভাষার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তিনি সর্ব্ব প্রথমে "আলালের ঘরের দুলাল" প্রকাশ করেন। মদ্য পানের অপকারিতা প্রদর্শন করিয়া "মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়" লেখেন। স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির জন্য রামারঞ্জিকা, বামাতোষিণী, হেয়ারের জীবনী লেখেন। তাঁহার যৎকিঞ্চিৎ একেশ্বরবাদ প্রচার করিবার জন্য প্রচারিত হইয়াছিল। তাঁহার অভেদী, আধ্যাত্মিক ভাব পূর্ণ গল্পের পুস্তক। তাঁহার গীতাঙ্কুর সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থ, আধ্যাত্মিকা, যোগ-তত্ত্বের আখ্যায়িকা। জীবনচরিত লেখায় তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। ডেভিড হেয়ার, দেওয়ান রামকমল সেনের জীবনী ও গ্রান্ট সাহেবের জীবনী তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি। তিনি দেশী এবং বিদেশী বহু কাগজে নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতেন। কৃষি, বাণিজ্য, ধর্ম্ম, সমাজ — সর্ব্বদর্শী জ্ঞানে এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিতেন। তিনি ডিষ্ট্রীক্ট চেরিটেবল সোসাইটীর মেম্বর থাকা কালীন বহু দরিদ্রের অভাব মোচন করিয়াছিলেন।

১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে সুবিখ্যাত বক্তা জর্জ টমসনের সহিত সম্মিলিত হইয়া "ব্রিটিস ইণ্ডিয়া সোসাইটী" স্থাপন করেন। জমীদার এবং প্রজা, উভয়ের মঙ্গল সাধন করা এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল। তিনি ইহার প্রথম সম্পাদক হন। এই সভা উঠিয়া গেলে ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনে তিনি যোগ দেন। তিনি বেথুন সোসাইটীর প্রথম সম্পাদক হন। তিনি স্ত্রীশিক্ষার অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। মহাত্মা বেথুনের সহিত একযোগে বেথুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে সহায়তা করেন। তদানীন্তন কালের ছোট লাট,সুবিখ্যাত গ্রে সাহেব, স্বহস্তে পত্র লিখিয়া তাঁহাকে বেঙ্গল কাউন্সিলে প্রবেশ করিতে অনুরোধ করায়, ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তথায় প্রবেশ করিয়া ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নানা হিতকর কার্য্য করেন। পশু-ক্লেশ-নিবারণের আইন Act. I and III of 1869) তিনিই প্রণয়ন করেন ও পাশ করাইয়া দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধনে সক্ষম হন। তিনি পশুক্লেশ-নিবারণী সভার একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। গ্রাণ্টের মৃত্যুর পর তিনি এই সভার সম্পাদক হন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মিউনিসিপাল আইনানুসারে তিনি মিউনিসিপাল কমিসনার নিযুক্ত হন এবং ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্র, বাবু কৃষ্ণদাস পাল এবং মিঃ ওইম্যান সাহেবের সহিত মিলিত হইয়া কলিকাতার অধিবাসীগণের অনেক উপকার করেন। তিনি অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি স্কুল-বুক-সোসাইটীর সভ্য এবং বেঙ্গল-সোসিয়াল-এসোসিয়েসনের সম্পাদক ছিলেন। তিনিই প্রথম হেয়ার এনিভারসারির অনুষ্ঠান করেন। তিনি হেয়ার-প্রাইজ ফণ্ড কমিটীর সম্পাদক ছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ফেলো ছিলেন। পুলিস সংস্কারের জন্য বিশেষ পরিশ্রম করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে Calcutta Lyceum প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি তাহার সভ্য হন। সমস্তই বিদেশীয় সভ্য ছিল, কেবল বাবু রমানাথ ঠাকুর,বাবু হরিমোহন সেন ও প্যারীচাঁদ মিত্র বাঙ্গালী সভ্য ছিলেন। তিনি খড়দহের ৺ প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের কন্যার পাণি গ্রহণ করেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে, তাহার পত্নী বিয়োগের পর, স্পিরিচুয়ালিজম্ (প্রেততত্ত্ব) সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। তিনি লণ্ডন, নিউইয়র্ক প্রভৃতি দেশের স্পিরিচুয়ালিজম ও থিয়োসফিক্যাল সভার সভ্য হন। তিনি বেদ এবং যোগদর্শন অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি সঙ্গীত বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি আদর্শ স্বামী, আদর্শ পিতা এবং আদর্শ বন্ধু ছিলেন। তাঁহার বিশুদ্ধ চরিত্রের গুণে তিনি সকলকে মুগ্ধ করিতেন, এবং নিঃস্বার্থতার গুণে সকলের বিবাদ মীমাংসা করিতে সমর্থ হইতেন। ১৮৬৬-৬৭ খ্রীষ্টাব্দে দারুণ দুর্ভিক্ষের সময় তিনি নিজ গৃহে অন্নছত্র খুলিয়া প্রত্যহ প্রায় ২০০ ভিক্ষুককে খাইতে দিতেন। তিনি একেশ্বরবাদী ছিলেন। প্রতিদিন প্রায় দুই ঘণ্টা পরিবারের সহিত মিলিত হইয়া উপাসনা করিতেন। শেষ জীবনে কেবল ফল ও দুগ্ধ খাইয়া জীবন ধারণ করিতেন। দুই বৎসর উদরী পীড়াতে কষ্ট পান। হোমিওপেথি, কবিরাজি ও এলোপেথি—সকল চিকিৎসাই ব্যর্থ হইল এবং ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে নবেম্বর, বিশুদ্ধ চরিত্রের আদর্শ রাখিয়া, তিনি স্বর্গারোহণ করেন। এরূপ লোকের জীবন ধারণে বঙ্গ ধন্য হইয়াছে।

আমরা যখন এই মহাত্মার কথা স্মরণ করি, তখন ভক্তি ও বিস্ময়ে প্রাণ পূর্ণ হয়। সেই সময়ে এমন কোন সৎকাজ ছিল না, যাহাতে তাঁহার যোগ ছিল না। কেবল নামমাত্র যোগ নয়,সকল কাজ তিনি একপ্রাণতার সহিত সুসম্পন্ন করিতেন। একব্যক্তি দ্বারা এত কার্য্য কিরূপে সুসম্পন্ন হইত, আমরা ভাবিতে পারি না। যে অসামান্য শক্তি লইয়া প্যারীচাঁদ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে অনায়াসে সকল সুসম্পন্ন হইত। এরূপ কৃতী এবং কর্ম্মী পুরুষ, বুঝিবা, এদেশে আর জন্মগ্রহণ করেন নাই।

যখন স্ত্রীশিক্ষার নামে লোকে খড়্গহস্ত হইত, সেই সময়ে প্যারীচাঁদ স্ত্রীশিক্ষার উৎকর্ষ সাধনে বদ্ধপরিকর হন এবং তজ্জন্য সরল ভাষায় সুন্দর ২ পুস্তক প্রচার করেন। যখন পৌত্তলিকতা ও নাস্তিকতায় দেশ ডুবিয়া যাইতেছিল, সেই সময়ে প্যারীচাঁদ একেশ্বরবাদ প্রচারের জন্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিতেন। তাঁহার যৎকিঞ্চিৎ নামক পুস্তক খানি ধর্ম্ম বিজ্ঞানের এক সুন্দর সংস্করণ। এই পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব, ২য় অধ্যায়ে ঈশ্বর কি রূপ, তাঁহার সহিত

কি সম্বন্ধ, ৩য় অধ্যায়ে, আত্মার অবিনাশিত্ব, ৪র্থ অধ্যায়ে পরলোক, ৫ম অধ্যায়ে ঈশ্বরের রাজ্যের নিয়ম, ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে উপাসনা, ৭ম অধ্যায়ে ঈশ্বর কি প্রকারে উপাস্য, ৮ম অধ্যায়ে পরমেশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, ৯ম অধ্যায়ে অন্নত্মোন্নতি ১০ম অধ্যায়ে গল্পের শেষ। গল্পচ্ছলে অতি সুন্দর ভাষায় ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব সকল এই পুস্তকে ব্যক্ত হইয়াছে। মদ্য পানের স্রোতে যখন দেশ ভাসিয়া যাইতেছিল, তখন তিনি মদ্য পানের অপকারিতা সুন্দর ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন। ইংরাজি শিক্ষা বিস্তার ভিন্ন দেশের ভাবী উন্নতির আশা নাই বুঝিয়া ইংরাজি শিক্ষাবিস্তারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি না হইলে কখনও এই পরাধীন জাতির উন্নতি হইবে না বুঝিয়া আজীবন বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে চেষ্টা করেন। দাসত্ব করাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন এবং কখনও জীবনে দাসত্ব করেন নাই। বাঙ্গালা ভাষা যখন সংস্কৃতের অনুসরণ করিতেছিল, তখন "আলালী" ভাষার সৃষ্টি করিয়া অভিনব বাঙ্গালার সৃষ্টি করেন। সেই অভিনব বাঙ্গালা ভাষা মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্রের অসাধারণ ক্ষমতা বলে নূতন পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া উন্নতির পথে চলিয়াছে। মহাত্মা রামমোহন রায়কে বাদ দিলে, সকল দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এদেশের আর কোন মহাপুরুষ চলিতে পারেন নাই। আমাদের মনে হয়, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামমোহন রায়ের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। ঐ মহাত্মার প্রবর্ত্তিত সমস্ত কার্য্যভার যেন প্যারীচাঁদ গ্রহণ করিয়া বঙ্গভূমির মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গদেশ ধন্য যে, এহেন রত্নকে বক্ষে স্থান দিয়াছিলেন।

মহাত্মা রামমোহন উনবিংশ শতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। খুব উন্নত বৃক্ষের নিম্নে স্থানে পাইলে, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বৃক্ষের দিকে যেমন মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না, তেমনি, রামমোহনের নিকটস্থ বলিয়া প্যারীচাঁদের নাম এদেশে তেমন আদর পায় নাই। এমন অবস্থা হইয়াছিল যে, প্যারীচাঁদের নাম বিলুপ্ত হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল। এমন সময়ে, শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, মহাত্মার গ্রন্থাবলী "লুপ্তরত্নোদ্ধার" নাম দিয়া প্রকাশ করিয়া এদেশের মহদুপকার করিয়াছেন। জানি না, এগ্রন্থ কিরূপ বিক্রীত হইতেছে। আমাদের মনে হয়, এ জাতির দৃষ্টি যখন বহির্মুখী হইয়া উঠিতেছে, তখন প্রকৃত মহত্ত্বের আদর এ জাতি করিতে শিখিবে কি না, সন্দেহস্থল। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে যে মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে, সেই মহাত্মার গ্রন্থাবলী "লুপ্ত" হইতেছিল, সৎদৃষ্টান্ত উপেক্ষিত হইতেছিল, কীর্ত্তি অপরিজ্ঞাত হইতেছিল, ইহা যারপর নাই দুঃখের কথা। একথা যখন ভাবি, তখন এজাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশা আসিয়া হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে। আজকাল হিংসা বিদ্বেষ সাহিত্যসেবীদিগের অন্তরে যেরূপ ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে, ভবিষ্যতের গর্ভে এজাতির কি আছে, জানি না। মহৎ এবং মহত্ত্বের প্রতি যে জাতির উপেক্ষা ও উদাসীনতা দেখা যায়, সে জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন। এখনকার তাঁহারা বলেন, এবং যুক্তি দেখাইয়া বলেন, তাঁহারাই সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ; তাঁহাদের ধারণা, রামমোহন, অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র, রামগোপাল, রামতনু, মাইকেল, রাজনারায়ণ, হরিশ্চন্দ্র, প্যারীচাঁদ কিছুই নহেন, কেহই নহেন। তাঁহারা বলেন. তাঁহারা যেমন কর্ম্মী, সুলেখক, সুবক্তা, সুসংস্কারক, এমন আর এদেশে হয় নাই। তাই অতিতের প্রতি তাঁহারা ঘৃণা উপেক্ষার ভস্মরাশি সাদরে সোল্লাসে ঢালিতেছেন। এমন ঘৃণা ও উপেক্ষা আর কোন দেশের কোন মহাপুরুষের উপরে বর্ষিত হইতে দেখিয়াছ কি? আমরা যাঁহাদের জন্য কিছুই করি নাই, তাঁহাদের স্মরণার্থ লর্ড কর্জ্জন স্মারক প্রস্তর-ফলক দ্বারে দ্বারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পুর্ব্বগৌরব সংরক্ষণ করিতেছেন!

সত্যই বলিতেছি, আমরা প্যারীচাঁদের পুণ্যময় জীবনের ধারাবাহিক স্বদেশানুরাগের পরিচয়ে বিমুগ্ধ হইয়াছি। এরূপ কর্ম্মময় সুন্দর জীবন যদি এদেশের আদর্শ হয়, তবে এজাতি কত উন্নতি লাভ করিতে পারে। প্যারীচাঁদ, তুমি অতি দুঃখে সংগ্রাম-ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিলে, একবার এদেশে পুনরুত্থিত হইয়া এজাতির আদর্শ রূপে দাঁড়াইবে না কি? দেখ, দেখ, এদেশ দিন দিন কত অধঃপতিত হইতেছে! একবার তোমার কর্ম্মময় স্বদেশানুরাগের উজ্জ্বল আদর্শে এদেশ আবার উজ্জ্বলকর। নচেৎ আর যে উপায় নাই, আর যে আশা নাই!

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

তিলোত্তমা।

কে বলে উপেক্ষি তুমি এ তুচ্ছ ভুবন
মিশেছ অনলময় তপন প্রভায়,
কে বলে দেখেনা তোমা মানব-নয়ন
কে বলে প্রভাব তব নাহি বসুধায় ?
যেই দিকে তিলোত্তমে, করি নিরীক্ষণ,
ছদ্মবেশী অঙ্গ তব দেখি এ মরতে ;
হিংসা, ক্রোধ, লোভ, মোহ, যুদ্ধ অগণন
অক্ষুণ্ণ প্রতাপ ঘোষে তোমারি জগতে।
বিজ্ঞানের শিক্ষাবলে বিস্তৃত আকারে
এখনো সুন্দেরে লক্ষ্যি উপসুন্দ ধায়,
অর্ণবে, ভূধরশিরে, নগরে, কান্তারে
মানবে মানবে দ্বন্দ্ব তোমারি কৃপায়।
এখনো নিবৃত্তি দাসী প্রবৃত্তির পায়,
তিল তিল হ'য়ে তুমি এখনো ধরায়।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

কনক-অঞ্জলি।

সসীমের ক্ষুদ্র ভালবাসা,
সৌন্দর্য্যের অতৃপ্ত পিয়াস,
মরের জীবনে তুচ্ছ আশা,
মাদকতা কুরুচি বিকাশ।
ব্যথায় আকুল প্রাণ যাঁর
বিগলিত স্নেহ করুণায়,
হেন পুণ্য ইষ্ট দেবতায়,
অর্চ্চিতে না উঠে সাধ কার ?
প্রাণহীন নির্ম্মম এ বঙ্গে
সিঞ্চিলে যে সুধা সঞ্জীবনী !
'মাতৃত্বের কোমলতা' মন্ত্রে !
ঝঙ্কারে সে করুণ রাগিণী
প্রতি ঘরে, আজি নবতন্ত্রে !
শত হৃদি উঠেছে উথলি,
সুষমা-সম্ভারে দীপ্তরবি
হেম-আভা ফুটেছে আননে,
প্রভাতের বায়ুসনে লু'টি
ঢালে কবি কনক-অঞ্জলি।

শ্রীনীলরতন মুখোপাধ্যায়।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ততর্কালঙ্কার।

বাণীর সুপুত্র তুমি অবনী ভূষণ,
পরিহরি ত্রিদিবের হৈম সিংহাসন,
নররূপে অবতীর্ণ হয়ে মরধামে
অভিহিত হ'লে দেব 'চন্দ্রকান্ত' নামে।
দেব ভাষা-প্রিয় সৌম্য সরল অন্তর
প্রদীপ্ত প্রতিভা পূর্ণ প্রজ্ঞার সাগর !
বিমোহিত প্রাচ্যবঙ্গ গৌরবে তোমার
জনে জনে প্রদানিছে 'অরঘ' সম্ভার !
সুদূর ইংলণ্ডে তব জাগিছে মহিমা,
উজলিয়া বারিধির অপার নীলিমা !
ধন্য মাতৃভূমি মম ধন্য দেশবাসী
ত্বরিত্ত দুর্ভাগ্য দিছ' তাহাদের নাশি।
ওপদ ছুঁইতে দেব শঙ্কায় শিহরি
অকপটে করপুটে প্রণিপাত করি।

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

এসেছি চরণে।

(১)

এই এসেছি চরণে
"এস বাছা এস" বলি
করুণ নয়ন তুলি
লও নিজ নিকেতনে।

(২)

এসেছি চরণে
অনেক খেয়েছি বিষ
প্রাণ দাও জগদীশ,
অমৃত সিঞ্চনে।

(৩)

এসেছি চরণে
বৃথা করি খেলা ধূলা
কাটায়ে দিয়েছি বেলা,
সন্ধ্যা আগমনে
এসেছি চরণে।

(৪)

এসেছি চরণে
নিশ্চিন্তে রয়েছ বসে

পাঠাইয়া দূর দেশে,
প্রাণের সন্ধানে।

(৫)

এসেছি চরণে
আমিও বিদেশে এসে
মহা ভুলে আছি বসে
আপনার জনে।

(৬)

এসেছি চরণে
মায়া-মরীচিকা ভরা
মরুভূমি সম ধরা
টানে অন্ধকার পানে
তাই এসেছি চরণে।

(৭)

এসেছি চরণে
ষড়রিপু শত সর্প
মান অভিমান দর্প
বুকে বজ্র হানে।
তাই এসেছি চরণে।

(৮)

এসেছি চরণে
বরাভয় প্রদ হরি
কলুষ বিনাশ করি
লও নিজ স্থানে।
এসেছি চরণে।

শ্রীমতী অম্বুজা সুন্দরী দাস।

কবে ?

কতদিন ভাবি বসে কবে, কোন্ সুলগনে
ঘুমায়ে পড়িবে হৃদি তোমার ও শ্রীচরণে,
কবে অন্ধ ভক্তি ভয় কেন্দুলী কুসুম প্রায় ;
পুলকে উঠিবে ফুটি তোমার চরণ ছায় ;
অর্পিব তোমারে কবে যত কার্য্য ফলাফল,
সুখ দুঃখ বাধা বিঘ্ন প্রেম প্রীতি সুবিমল।
ডাকিতে পারিব কবে তোমারে হৃদয় ভরি,
যাবে কবে পাপ স্মৃতি আঁখি জল সনে ঝরি,
শ্রবণে পশিবে কবে তোমার আরতি গান,
তোমার আবাস-কেতু হেরি সুখী হবে প্রাণ,
দীর্ঘ উপবাস শেষে পুতঃ 'রোজা' অবসানে
যথা মসলেম ভ্রাতা চেয়ে থাকে চাঁদ পানে,
তেমনি পারিব কবে চাহিতে পুলক ভরে
তোমার মিলন নিশি শুভ মরণের তরে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

আরাধনা।

নবীন মানসে নবীন সাহসে
ভিখারী উঠেছে জাগিয়া,
চরণ লক্ষে ঢালিয়া অর্ঘ্য
সুবর লইতে মাগিয়া !

মা ! তব রাজ্যে অযুত কার্য্যে
অসংখ্য পরাণী মাতিয়া,
বিবিধ কর্ম্ম মানসি ধর্ম্ম
দিতেছে শ্রীপদে গাঁথিয়া !
নূতন ছন্দে নব আনন্দে
সাজিয়া নবীন বরষে,
ফুটিয়াছে ফুল বিহগ আকুল
গায় নব গীতি সরসে !

কিছুই জানিনা বুঝালে বুঝি না
কিবা নিবেদিব চরণে,
কোন স্বপ্নালোকে ঘুরিয়া পুলকে
কি লব দেবতা বরণে !
কিসের অভাব ? বিশ্বময় ভাব
তোমারি, তোমাকে পুজিতে,
নিতি উদ্দেশিয়া কান্দিয়া হাসিয়া
পাতি পাতি আছে খুঁজিতে !
শুনিতেছ যদি লইতেছ যদি
প্রার্থনা অর্চ্চনা সকলি,
আমি কেন তবে থাকিব নীরবে
নিরাশা আঁধারে কেবলি !
লহ অর্ঘ্য-ফুল হৃদয় আকুল,
নূতন আনন্দে নয়নে,
হাসি অশ্রুরাশি উঠিতেছে ভাসি
বক্ষ মূলে চেপে সঘনে !

চির পুরাতন ফুরায় যেমন
ফুরাল তেমনি নীরবে,
নূতন স্বপনে নব জাগরণ
জাগিয়া উঠিছে গরবে !
বেলা বেড়ে গেল অশ্রু শুকাইল
হৃদয় কাঁপিছে স্মরণে,
নবীন মানসে নবীন সাহসে
জাগো মা ! অমৃত পরশে !!

শ্রীঅনাথ বন্ধু সেন।

তুলসীকৃত হনুমান বাহুক পাঠে রচিত।

ইমন কল্যাণ—চৌতাল।

ভ্রমিতাম সিন্ধুতটে কানন সুন্দরে
ক্ষুদ্র আমি বনচারী সকলেতে জানে।
বনমাঝে একদিন দেখি সে ভিখারী
রঘুকুলপতি অতি দুঃখ-হতগতি
বলিলেন কাছে আসি রক্ষ সীতা দয়া করি,
ঋষিধর্ম্ম আর্য্যভূমি রক্ষ মহাবলি॥

কি আশ্চর্য্য সেই মহারক্ষো যুদ্ধং
মহাবীর নাম লভি বীরমাঝে একবীর
পুনঃবর্ণি মহারণ যথা পূর্ব্ব মহাজন
ভক্তিবলে মহাকবি আমি হীন কপি॥
কুরুযুদ্ধে বীরধর্ম্মী দেবধর্ম্ম দেবভূমি
রক্ষার প্রয়াসী নব নারায়ণ যবে,
বসি তাঁর রথোপরি শুনিলাম মহাগীতি,
যদুকুলপতি মুখে সে মহা দুর্দ্দিনে॥
কালবশে দেখি পুনঃ শক পারসীক হূন
আরব ম্লেচ্ছগণ পদদলিত ক্ষুধিতা
রাঘব কৌরবমাতা ছিন্নবসন দুঃখিতা
যশঃবসনা কভু অহো চিরজীবী আমি॥
বহু যুগ পরে ভ্রমি কাশীপতিপুরে
লুব্ধ আমি, রঘুপতি যশঃগানমধুলোভে,
দুঃখী মহারোগে কবি তুলসীরে,
বহু স্নেহভরে রক্ষিলাম বাহুধরে॥

এ দাস ভূমে আজি সমধর্ম্মা নাহি দেখি
সীতা সে তনয়াহীনা রঘু ও অন্বয়হীন,
আমি বন্ধুহীন ভ্রমি নিরাশ্রয় তদবধি,
কভু সরযূর তটে কভু জাহ্নবীর কূলে,
দেখি আদরিণী আজি ভিখারিণী
জননী ধরণীমণি কাঁদি যথা কাঁদিলাম
দেখিয়া সীতা দুঃখিনী বন্দিনী রক্ষোমাঝে
বলহীন অভিশপ্ত অহো চিরজীবী আমি॥

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।

হিমালয় দর্শনম্

আজি আমরা "হিমালয়দর্শনম" নামক পুস্তকখানি সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিব। পুস্তকখানি সংস্কৃত ভাষায় কবিবর শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন কর্ত্তৃক বিরচিত, পূর্ব্বাপেক্ষা পরিবর্দ্ধিত, এবং তাঁহার প্রিয়শিষ্য শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী, এম্, এ, কর্ত্তৃক প্রকাশিত। এবার ইহাতে সর্ব্বশুদ্ধ ১১৭টী শ্লোক, বঙ্গানুবাদ সমেত সন্নিবেশিত হইয়াছে। চারি আনা মাত্র মূল্য নিরূপিত হইয়াছে।

আমরা অমুক্ষণসহ শ্লোকগুলি পাঠ করিয়াছি ও অসীম তৃপ্তিলাভ করিয়াছি, এই কথা বলিলেই এ সম্বন্ধে পর্য্যাপ্ত বলা হইল, বোধ করিতে পারিতেছি না। স্বভাব-রমণীয়া প্রকৃতির শোভা সন্দর্শনে প্রকৃত কবির মনের ভাব-তরঙ্গ সমুচ্ছলিত হওয়া স্বভাবসিদ্ধ। সমুচ্ছ্বসিত মনের ভাবগুলি সরল ভাষায় ব্যক্ত করাই কবির কৃতিত্ব। হিমালয়ের বিশেষতঃ উহার ধবলাচলের অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শনে বিমুগ্ধ কবির হৃদয় হইতে যে কবিতাগুলি বাহির হইয়াছে, তাহা যেন অনন্ত সময়-সাগর-গামিনী পাবনী নির্ঝরিণী। পাঠ করিতে করিতে এক একটীতে মজ্জন করিয়া ভাব-তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে যেন শৈলরাজের সমুন্নত শিখরে উন্নীত হইতেছে মনে হয়। ইহাই প্রকৃত কবিত্বের মাহাত্ম্য। ৮৭ সংখ্যক শ্লোকে কবি বলিতেছেন,—ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া

যে ব্যক্তি এই ধবলাচল দেখিলেন না, তাঁহার জন্ম ও চক্ষুষ্মত্তা বৃথা। আমিও কবির এই কথার সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়া বলিতেছি, —ভারতবাসী সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই অন্ততঃ এই পুস্তকে চিত্রিত ধবলাচলের বিচিত্র চিত্রটী একবার দেখুন, নচেৎ তাঁহার সংস্কৃত ভাষাবিভজ্ঞতা ও লোচনবত্তা বৃথা।

বহু পাঠকের তৃপ্তি সম্পাদন কবির অবশ্য উদ্দেশ্য। কাব্যের গুণবত্তা ও সার-বর্ত্তা বহু পাঠকের গোচর নিমিত্ত ঘোষণা করা সমালোচকেরও উদ্দেশ্য অন্যায্য বোধ হইবে না। কবিরত্ন তারাকুমার সংস্কৃত ও বঙ্গ সাহিত্যে সুপরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত। উভয় ভাষাতেই তাঁহার অপূর্ব্ব কবিত্বশক্তি, ললিত পদবিন্যাসে মাধুর্য্য ও রচনাচাতুর্য্যের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এই হিমালয় দর্শনেও তাঁহার পূর্ব্বোক্ত গুণাবলীর কিছুমাত্র ব্যত্যয় লক্ষিত হয় না। 'হিমালয়-দর্শনম্'—এই কথাটী মাত্র অবলম্বনে কবি-রত্ন যে শ্লোকরত্নগুলি গাঁথিয়াছেন, তাহার এক একটী তাঁহার কবিত্বশক্তির অক্ষয় কীর্ত্তি-পতাকা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাঁহারা সংস্কৃত সাহিত্যের মধুর ঝঙ্কারে মুগ্ধ হয়েন, তাঁহারা এ কবিতাগুলি অন্ততঃ এক-বার পাঠ করেন, ইহাই আমার অনুরোধ। যাঁহারা এই অনুরোধবশে এতৎপাঠে অগ্রসর হইবেন, তাঁহারা, "শ্রম ও যত্ন সফল হইল,' এইমাত্র জ্ঞান না করিয়া, হয়ত পথপ্রদর্শক বলিয়া আমার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবেন।

আজ কাল কৃতবিদ্য মধ্যে অনেকেই সংস্কৃত ভাষায় সমাদর ও অনুরাগ প্রদর্শন করিতেছেন, এবং অনেকেই সুললিত ও সরল সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করি-য়াছেন। তাঁহারা মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলে দেখিতে পাইবেন, হিমালয়দর্শনে কবিরত্নের শ্লোকগুলি যেমন প্রাঞ্জল ও প্রসাদ গুণবিশিষ্ট, তেমনি ভাবোন্নত। সরল ও মধুর ভাষায় ভাব প্রকাশ করাই কবিরত্নের কবিত্বচাতুর্য্য। তাঁহার লেখনী হইতে কখনও দুর্ব্বোধ বা কঠোর শব্দ বিনি-র্গত হইয়াছে, জানি না।

হিমালয় দর্শনের কবিতা মধ্যে ভালমন্দ নির্ব্বাচন করিতে গিয়া আমি বাঁশ-বনে ডোমকাণার মত হইয়া পড়িলাম। যা ধরি ও যা পড়ি, তাতেই মগ্ন হইয়া পড়ি। যাহা হউক, পাঠকগণকে ২০, ২১, ২৪, ৫৮, ৫৯, ৬৫, ৭৯, ৯১ সংখ্যক শ্লোকগুলিতে বিশেষ-রূপে দৃষ্টিপাত করিতে বলি। এই গুলিতে যেমন শব্দালঙ্কারের সদ্ভাব, তেমনি অর্থ-গৌরব দেখিতে পাইবেন। ৭৯ সংখ্যক শ্লোকে কবিবর লোকান্তরিত ভারতীয় মহর্ষি ও রাজর্ষিগণের অভাব জন্য খেদোক্তি করিতেছেন, আমিও তাঁহার সঙ্গে এই আক্ষেপ করিতেছি, আজি ভারতে হিন্দু-রাজগণ ও মহর্ষিগণ বিরাজমান থাকিলে, কবিরত্নের ন্যায় সুকবির অন্নসিদ্ধি ও খ্যাতি-বৃদ্ধির অভাব থাকিত না।

যখন সামান্য চারি আনা ব্যয়েই হিমা-লয়দর্শন জন্য তৃপ্তিলাভের সম্ভাবনা, তখন ইহাতে অনেকেই আস্থা প্রদর্শন করিবেন-সন্দেহ নাই।

শ্রীরামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায়।

পৃথিবী কি অচলা নয় ?

শ্বেতদ্বীপ-বাসী বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের সিদ্ধান্তে "পৃথিবী স্বয়ং গতিশীল ও সূর্য্য চলচ্ছক্তি-বিহীন" বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ইদনীন্তন কালে আপামর সাধারণ সকলেই এ মতের পক্ষ সমর্থনকারী, সুতরাং ইহা অভ্রান্ত সত্য বলিয়াই সাধারণের বিশ্বাস। আমরাও এতদিন পাশ্চত্য মতের পক্ষপাতী ছিলাম, কিন্তু সূর্য্যসিদ্ধান্তের যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া আমাদের সে ভ্রম অপনীত হইয়াছে। মহাত্মা ভাস্করাচার্য্য "ধরিত্রী অচলা ও সূর্য্য পরিভ্রমণশীল" বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে বাদ প্রতিবাদ মূলক যে সমস্ত প্রবন্ধ "নব্যভারতে" মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা সাধারণের অবিদিত নাই। পাশ্চাত্য মত সমর্থনকারী প্রতিবাদ-লেখক গণ অশেষবিধ প্রয়াস পাইয়া থাকিলেও, তাঁহাদের পরিশ্রম ব্যর্থ হইয়াছে; কারণ সূর্য্যসিদ্ধান্তের মত খণ্ডনে কেহই কৃতকার্য্য হন নাই। ভাস্করাচার্য্যের অমোঘ যুক্তি বলে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত অরুণোদয়ে কুজ্ঝটিকার ন্যায় শূন্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে। এ কথায় যাঁহারা সংশয়াবিষ্ট হন, তাঁহারা উল্লিখিত প্রবন্ধ নিচয় * মনযোগ সহকারে পাঠ করিয়া দেখিবেন। বস্তুতঃ পৃথিবী সচলা কি অচলা, ইহা নিরূপণ করা, এইক্ষণ বিষম সমস্যা হইয়া পড়িয়াছে।

"পৃথিবী গতিশীল হইলে আকাশমার্গে উড্ডীয়মান বিহগাবলী—যাহারা স্বীয় কুলায় পরিত্যাগ করিয়া বিমান পথে বিচরণ করে, তাহারা প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কদাপি স্বীয় নীড় প্রাপ্ত হইত না।"* এই যুক্তিটী পাষাণের ন্যায় অটল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। উহার প্রভাবে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত—যাহা বিজ্ঞানের সৃষ্টিকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত অভ্রান্ত বলিয়া প্রতীয়মান, ক্ষয়িত মূল অট্টালিকার ন্যায় সে দুর্ব্বল ভিত্তি সামান্য আঘাতেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। সুতরাং বিজ্ঞানের সুদৃঢ় অট্টালিকাও সেই সঙ্গে ভূমিস্মাৎ হইয়াছে, সন্দেহ নাই। সূর্য্যসিদ্ধান্তের এ মত আজও পাশ্চাত্য প্রদেশে প্রতিভাসিত হয় নাই। ভস্মাবৃত অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের ন্যায় এতদিন উহা লোক-চক্ষুর অগোচরে—কীটদষ্ট-জীর্ণ গ্রন্থপত্রে নিবদ্ধ ছিল। কিন্তু ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি প্রজ্জলিত হইতে কতক্ষণ লাগে? জলদমণ্ডিত মার্ত্তণ্ড মুহূর্ত্ত মধ্যেই প্রচণ্ড রশ্মি বিকীর্ণ করিয়া বসুধাকে সন্তপ্ত করিয়া তুলে। বস্তুতঃ ভাস্করাচার্য্যের যুক্তি বলে বৈজ্ঞানিক মীমাংসা নিতান্তই ভিত্তিশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। উল্লিখিত আপত্তি নিরসন না হওয়া পর্য্যন্ত বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া সূর্য্যসিদ্ধান্তের মত ভ্রান্ত বলিয়া অবধারণ করা অর্ব্বাচীনতা, সন্দেহ নাই।

আর্য্য সভ্যতার মুখোজ্জ্বলকারী ভারতের অদ্বিতীয় জ্যোতির্ব্বিদ ভাস্করাচার্য্য-কৃত "সিদ্ধান্ত শিরোমণি" বিশেষতঃ "সূর্য্য-সিদ্ধান্ত'

* ১৩০৯ সনের ফল্গুনের সংখ্যা নব্যভারতে "সূর্য্য সিদ্ধান্তের মত" ও চৈত্রের সংখ্যায় "সূর্য্য সিদ্ধান্তের মত প্রতিবাদ" এবং পরবর্ত্তী বৈশাখের সংখ্যায় "পৃথিবীর গতি" ও জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ের সংখ্যা নব্যভারতে "সূর্য্য সিদ্ধান্তের মত বিচার" প্রভৃতি প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

* "সূর্য্যসিদ্ধান্তের মত" শীর্ষক প্রবন্ধে এই যুক্তিটী আরও বিশদভাবে বিবৃত করা হইয়াছে। প্রতিবাদ-লেখকগণের পক্ষে উহা অবশ্য-পাঠ্য।

গ্রন্থ—যাহা অবলম্বনে চন্দ্র ও সূর্য্য-গ্রহণ প্রভৃতি খগোল বিদ্যার দুরূহ গণনাদি সমাধান হইতেছে; চন্দ্র, সূর্য্য ও গ্রহ নক্ষত্রাদি আকাশপটে বিরাজমান থাকিয়া যাহার সাক্ষ্যদান করিতেছেন, বালকের ক্রীড়া কন্দুকের ন্যায় সেই সমস্ত গ্রন্থ উপেক্ষার জিনিষ নহে। সূর্য্যসিদ্ধান্তের গোলাধ্যায় প্রকরণে পৃথিবীর অচলতা ও সূর্য্যের কক্ষ-আবর্ত্তন এবং দিবা রাত্রির হ্রাস বৃদ্ধি ও ঋতু পরিবর্ত্তনের নিয়ম এবং গ্রহণের কারণ নির্ণয় প্রভৃতি জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের দুরূহ তত্ত্ব অতি বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। আধুনিক অজ্ঞ জ্যোতির্ব্বিদগণ তৎপ্রতি লক্ষ্য না করিয়া স্থূল বুদ্ধিসাধ্য বিষয়—"যাত্রার শুভাশুভ ফল,' 'লগ্নমাস' এবং 'কালবেলা' ও 'বারবেলা' নির্ণয় প্রভৃতি মূলশূন্য বিষয়ের মূলানুসন্ধানে সময় ও শক্তির যথেষ্ট অপব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের দৃষ্টি এদিকে নিপতিত হইলে অন্ধ-তমসাচ্ছন্ন ভারতাকাশে জোনাকীর ক্ষীণালোক কদাপি মার্ত্তণ্ড দীপ্তি বলিয়া বিভ্রম জন্মাইতে সমর্থ হইত না।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের একদেশদর্শী যুক্তি অকাট্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করা অদূর-দর্শিতার পরিচয়, সন্দেহ নাই। একটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাউক। পশু মাত্রেই চতুষ্পদ, অথচ গো, মেষ, ছাগ, মহিষ, গণ্ডার প্রভৃতি পশুগুলি শৃঙ্গ ও পুচ্ছবিশিষ্ট। সুতরাং চতুষ্পদ পশু মাত্রেই শৃঙ্গ ও পুচ্ছধারী, যদি এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায়, তবে উল্লিখিত মীমাংসাটী যে নিতান্তই ভ্রমপূর্ণ, তাহা সহজেই প্রতীয়মান হইবে। কারণ ঘোটক চতুষ্পদ ও পুচ্ছধারী, অথচ শৃঙ্গ বিহীন। সেইরূপ, পৃথিবীর সচলতা সম্বন্ধেও বৈজ্ঞানিক যুক্তি ভ্রমের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কিনা, পাঠকগণ তাহার বিচার করিবেন।

প্রস্তাবিত প্রবন্ধে ধরিত্রীর সচলতা সম্বন্ধে আপত্তি খণ্ডন জন্য পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে সুশিক্ষিত সম্প্রদায় ভরসা করি যথাযোগ্য সাহায্য করিবেন। যুক্তির সহায়তায় বিজ্ঞানের সত্যতা প্রমাণিত না হইলে, সূর্য্যসিদ্ধান্তের মত অখণ্ডনীয় বলিয়া ধরণীকে অচলা স্বীকার করিতে কেহ কুণ্ঠিত হইবেন কি?

শ্রীমহেশচন্দ্র সেন।

চীনদেশে সন্তান চুরি। (১)

ব্রহ্ম-দেশের উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তে ইরাবতী নদীর বাম ধারে ভামো সহর। চীন রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত বলিয়া ভামো বিখ্যাত। যত বিদেশী লোক ব্রহ্মদেশ ভ্রমণ করিতে আইসেন, তাঁহারা একবার ভামো পদার্পণ না করিয়া অন্যত্র প্রত্যাবর্ত্তন করেন না। আবার যত বিদেশী ভ্রমণকারী চীনদেশে আইসেন, এবং তথা হইতে ব্রহ্মদেশ হইয়া অন্যত্রে যাইতে চাহেন এবং যত ভ্রমণকারী ব্রহ্মদেশ হইয়া চীনদেশ দিয়া অন্যত্র যাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের ভামো হইয়া যাওয়া ভিন্ন অন্য পথ দিয়া যাওয়ার বিশেষ সুবিধা নাই। তবে ভামোতে দেখিবার যোগ্য বিশেষ কিছুই নাই। ভামোর নিম্নে দুই পাহাড়ের মধ্যে ইরাবতী নদী অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হইয়া এমন খর বেগে জল ঢালিয়া দিতেছে যে নৌকা ত দূরের কথা, ষ্টিমার পর্য্যন্ত তথায় উজাইয়া আসিতে অত্যন্ত

কষ্ট পায়। এই স্থানকে সাহেবগণ ডিফাইল (difile) বলেন। এই ডিফাইলের উভয় পার্শ্বে অতি উচ্চ মারবল পাথরের মত নানা রংএর প্রস্তরময় প্রাচীর লম্বভাবে নদীর দুইধারে দণ্ডায়মান থাকিয়া পথিকের মনে এক অপূর্ব্ব আনন্দের আবির্ভাব করিয়া থাকে। বাস্তবিক ভামো-যাত্রীর পক্ষে এই অসামান্য প্রাকৃতিক দৃশ্য অতিশয় মুগ্ধকর। স্থানটী জনমানবশূন্য, সুতরাং নীরব। নদীর উভয় ধারের মর্ম্মর প্রস্তরময় প্রাচীরের পশ্চাতে ও পার্শ্বে নানাবিধ তরু লতা তৃণাদিতে এক অপূর্ব্ব শোভা-বিশিষ্ট নিকুঞ্জবন সদৃশ বোধ হয়। আমার দুর্ব্বল লেখনীর এমন সাধ্য নাই যে, সেই মনমুগ্ধকর নৈসর্গিক দৃশ্য যথাযথ বর্ণনা করি। প্রস্তরময় প্রাচীরের গাত্র হইতে যে অজস্র ঝরণা-বারি বর্ষিত হইতেছে, তাহা দেখিলে, বোধ হয়, যেন প্রকৃতি দেবী নির্জ্জনে বসিয়া রোদন করিতেছেন। এই স্থান নূতন ভ্রমণকারীর পক্ষে যেমন মন-মুগ্ধকর,তেমনই ভীতিপ্রদ। ইহার জল-কল্লোলে প্রাণে ভীতির সঞ্চার হয়। ইহা বর্ষাকালে আরো ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করে। এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া কয়েক মাইল গেলেই দূর হইতে ভামোর ঘাটে ইরাবতী (Irrawaddy Flotila co.) কোম্পানির জাহাজ সকল এবং অসংখ্য দেশী নৌকা সকল দৃষ্ট হয়। অতি দূর হইতে সহরের দৃশ্য সকল ক্রমে পথিকের নয়নগোচর হইতে থাকে। নদীর ধারে হিন্দু-মন্দির, চীনাবাজার, বনবিভাগের আফিস্, মিলিটারি পুলিশের লাইন এবং জেলখানা একে একে দৃষ্ট হয়। এ কেবল বর্ষাকালের কথা বলিতেছি। কারণ গ্রীষ্মকালে নদীর জল কম থাকায় এবং সহরের সম্মুখে এক বৃহৎ চড়া থাকায়, জাহাজ সকল দুই তিন মাইল দূরে থাকিতে বাধ্য হয়, সুতরাং যাত্রীগণ পূর্ব্বোক্ত দৃশ্য সকল ভাল মত দেখিতে পারেন না। ভামোতে গোরা পল্টন, কালা সেপাহির পল্টন এবং মিলিটারি পুলিশ পল্টনের কেল্লা আছে। সিবিল হাঁসপাতাল, মিলিটারী পুলিশের হাঁসপাতাল, কেল্লার গোরা হাঁসপাতাল এবং কালা পল্টন ও তোপখানার হাঁসপাতাল আছে। রোমান কাথলিক গির্জ্জা, প্রটেষ্ট্যাণ্ট সম্প্রদায়ের গির্জ্জা, মুসলমানদিগের মসজিদ, চীনাদের ধর্ম্ম মন্দির, এবং অনেকগুলি ব্রহ্মদেশী ধর্ম্মমন্দির বা কুঁদ্দিচাঁও আছে। হিন্দু মন্দিরের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এই স্থানে দুইটী বাজার আছে। চীনা বাজার এবং বর্ম্মা ও ভারতবাসীদের বাজার। এখানকার অধিবাসীগণের মধ্যে বর্ম্মা, সান-বর্ম্মা, চীনা, বাঙ্গালী, মান্দ্রাজী,পঞ্জাবী, হিন্দুস্থানীই প্রধান। এতদ্ভিন্ন অল্প সংখ্যক ইউরোপীয় এবং ইহুদির বাস।

ভামো প্রায় চতুর্দ্দিকেই পাহাড় বেষ্টিত। এই সকল পাহাড়ে কাচিন নামক এক অসভ্য জাতি বাস করে। পূর্ব্ব ও দক্ষিণস্থ পাহাড়ের অপর পার্শ্বে সান রাজ্য। ভামোতে খাঁটি বর্ম্মা বড় নাই, অধিকাংশই সান-বর্ম্মা। সান ও সান-বর্ম্মারা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। সান-বর্ম্মাদিগের আচার ব্যবহার, পরিচ্ছদাদি সমস্তই বর্ম্মাদের মত। ইহারা অধিকাংশই সান ভাষায় কথা বলে এবং অল্প সংখ্যক লোকে সান ও বর্ম্মাভাষা, উভয় ভাষাতেই কথা বলিয়া থাকে।

ভামো সহর পূর্ব্বে কখনও চীনাদিগের অধিকারে আসিত, কখনও বর্ম্মা রাজার

অধীন থাকিত। প্রকৃত পক্ষে বলিতে গেলে এই স্থান বর্ম্মা রাজ্যের অন্তঃর্ভুক্ত। ইংরেজগণ কর্ত্তৃক অপার বর্ম্মা দখলের সময় এই স্থান বর্ম্মার রাজার অধীন ছিল। এই স্থানে খাদ্যাদি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এখানকার চাউল উৎকৃষ্ট এবং এখানে শাক সবজী ও মৎস্য যথেষ্ট মেলে।

এই সহর নানা মহাল্লায় বিভক্ত। সে সমস্ত লিখিয়া পাঠকের বিরক্তি জন্মাইতে ইচ্ছা করি না। তবে যে মহল্লা লইয়া আমাদিগের উপস্থিত বিষয়ের সম্বন্ধ, তাহাই এখন উল্লেখ করিব।

ভামোর "মিন্ জান্ গোং" নামক মহল্লায় মং কোতি ও তাহার স্ত্রী মাশোয়ের বাস করে। মাশোয়ে ও মংকোতি খাঁটি বর্ম্মা নহে। মংকোতির মা কাচিন এবং পিতা বর্ম্মা এবং মাশোয়ার-মা বর্ম্মিণী, কিন্তু বাপ সান বর্ম্মা। ইহাঁদের একটী মাত্র পুত্র সন্তান আছে, কিন্তু কন্যা সন্তান নাই। ইহারা একটী কন্যা সন্তান লাভের জন্য কত প্রার্থনা করে, কিন্তু ভগবান ইহাদিগকে এ বিষয়ে বঞ্চিত করিয়াছেন। ব্রহ্মদেশীয় লোকেরা প্রায়ই কন্যা সন্তান প্রার্থনা করে; ইহারা পুত্র সন্তানের জন্য বড় লালায়িত নহে। কারণ ইহাদের নিয়ম, পুত্র সন্তান যতদিন ছোট থাকে, ততদিন তাহারা পিতা মাতার লালন পালন বিনা থাকিলে কষ্ট পায়। যখন তাহারা বড় হয়, তখন দেশের প্রথানুসারে বিবাহ করিবার জন্য কুমারী (আপিয়) বালিকাগণের অনুসন্ধানে ফেরে। বোধ করি, প্রায় সকলেই জানেন যে, ব্রহ্মদেশীয় কুমারীগণ ইচ্ছা-বর গ্রহণ করিয়া থাকে। তাহারা আপন চক্ষে দেখিয়া ভাবী স্বামীর দোষ গুণ ও বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় লইয়া তবে তাহাকে বিবাহ করে। পরের কথা শুনিয়া বা অন্যের অনুরোধে, নিজের মনোমত স্বামী না হইলে, ইহারা কখনও বিবাহ করে না। এ বিষয়ে পিতা মাতার কর্ত্তৃত্বাধীনে তাহারা থাকে না। বিবাহ বিষয়ে বর্ম্মাদের রীতি সাহেবগণের কোর্টশিপের ন্যায়। সুতরাং আমাদিগের ও চীনাদিগের রীতির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। কিন্তু বিচার করিতে গেলে উভয় রীতিরই দোষ গুণ লক্ষিত হয়। আমাদিগের দেশের বিবাহ প্রণালীতে সময় সময় এমন দোষ ঘটে যে, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে চিরকাল এক ভয়ানক অশান্তি বিরাজ করে। কেন না, স্বার্থপর পিতামাতা বা অন্য অভিভাবকগণ অর্থ লোভে বা কুল-মর্য্যাদার অনুরোধে হতভাগ্য কন্যাটীকে চিরকালের জন্য দুঃখসাগরে ভাসাইয়া দেন। কাহাকেও বা ৫।৬ বৎসর বয়সের সময় ৪০।৫০ বৎসরের পাত্রের হস্তে পতিত হইলে হয়, কাহারও বা ঘরে স্বপত্নীর যন্ত্রণায় তিষ্ঠিবার যো নাই, হয়তঃ কাহারও স্বামী গণ্ডমূর্খ কি মাতাল, কাহারও বা "আদ্য ভক্ষ্য ধনং নাস্তি" ইত্যাদি নানা দোষের আকর হয়। মূল কথা, এ বিষয়ে অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন, বঙ্গ দেশীয় পাঠকগণ একবার আপন ২ ঘর ও গ্রামের অবস্থা চিন্তা করিয়া দেখিলে সহজেই বুঝিতে পারিবেন। চীন দেশের রমণীদিগকে এই প্রকার দুঃখে পতিত হইতে হয়। তাহাদের যদিও অধিক বয়সে বিবাহ হয়, তবুও অনেকের দুঃখেই কাল কাটাইতে হয়। চীন দেশে আমরা যে স্থানে থাকি, তথায় দুইটী ভাই আছে, তাহারা দুই জনই বোবা, কিন্তু তাহাদের অভিভাবকগণ প্রবঞ্চনা করিয়া কৌশলে তাহাদিগের বিবাহ দিয়াছে। তাহাদের স্ত্রীরা ঘরে আসিয়া

কিছু কালের জন্য অন্নজল পরিত্যাগ করিয়াছিল। এখনও তাহারা দারুণ মনের কষ্টে দিন যাপন করিতেছে। আবার যেমন স্ত্রীলোকের দুঃখের কথা বলিলাম, সেইরূপ, সত্যের অনুরোধে পুরুষের দুঃখের কথাটাও বলা উচিত। অনেক পুরুষের স্ত্রী হয়তঃ মূক বধির, অন্ধ বা অকর্ম্মণ্য তাহাতে সেই সকল পুরুষগণও চিরকাল মনের কষ্টে কাল কাটায়। তবে প্রভেদ এই যে, স্ত্রী পরাধীন এবং পুরুষ স্বাধীন, ইচ্ছা করিলে অপর বিবাহ করিতে পারে। ব্রহ্মদেশের বিবাহ প্রণালীতে এই প্রকার কোন দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। তবে ঘটে কি? তাহাদের অনেকের মধ্যেও অন্যরূপ নানা অশান্তি ঘটে। ব্রহ্মদেশীয় যুবক যুবতীগণের অনেকে হয় ত অপরিণামদর্শিতায় এবং আশু ও ক্ষণিক মোহে ভুলিয়া ভাল মন্দ বিচার করিতে না পারিয়া, পরস্পরে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়, পরে ভ্রম বুঝিতে পারিয়া অচিরে বিবাহ বন্ধন ছেদন করিতে বাধ্য হয়। অনেকের বিবাহের পূর্ব্বেই অবৈধ প্রণয় সঞ্চার হয়, তজ্জন্য ঘটনা বশতঃ সময় সময় তাহারা পরস্পরকে বিবাহ করিতে বাধ্য হয়। এরূপ ঘটনা নিতান্ত বিরল নহে। কোন কোন স্থলে পিতা মাতা যদি কন্যার ভাবী বরের প্রতি অমত প্রকাশ করে, কিন্তু কন্যা তাহাকে ভালবাসে, এরূপ স্থলে হয়ত কন্যা গোপনে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া আপন প্রণয়-পাত্রের সঙ্গে স্থানান্তরে গিয়া কিছু দিনের জন্য বাস করে, পিতা মাতা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াও কিছু করিতে পরে না। পরে ক্রোধ সম্বরণ হইলে কন্যা জামাতা আপন গৃহে আনয়ন করে। ইহাকে গন্ধর্ব বিবাহ বলে।

পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, ব্রহ্ম দেশীয় লোকেরা অনেকেই কন্যা সন্তান প্রার্থনা করে। কারণ পুত্র বড় হইলে এবং উপার্জ্জনশীল হইলে বিবাহ করিয়া শ্বশুরালয়ে গিয়া বাস করে এবং সে তদবধি শ্বশুরের পরিবার মধ্যে গণ্য হয়। তাহার উপার্জ্জিত অর্থে শ্বশুর শাশুড়ীর দাবী কিন্তু পিতামাতার বড় দাবী নাই। যদি ছেলে বুদ্ধিমান এবং পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়, তাহা হইলে সে গোপনে পিতামাতাকে সাহায্য করে, কিন্তু প্রকাশ পাইলে স্ত্রী ও শাশুড়ীর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। এই জন্যই মংকোতি ও মাশোয়ে একটী কন্যা সন্তান লাভের জন্য এত আকিঞ্চন করে। কারণ, তাহাদের ছেলেটী বড় হইলে শ্বশুর বাড়ী চলিয়া গেলে তাহাদের শেষ কালে ভরণ পোষণের লোক থাকিবে না।

একদা ডিসেম্বর মাসের মধ্যভাগে মংকোতি আপনার ঘরের সম্মুখে রাস্তার ধারে বসিয়া ছোট একটী কাঠের বাক্স প্রস্তুত করিতেছে এবং তাহার অনতিদূরে বসিয়া মাশোয়ে ব্রহ্ম দেশী চুরট প্রস্তুত করিতেছে। মংকোতি সূত্রধরের ব্যবসা করে এবং মাশোয়ে ব্রহ্মদেশীয় চুরট বা দেশালাই প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে। ব্রহ্মদেশীয় চুরটগুলি প্রায় ৯ ইঞ্চ হইতে এক ফুট লম্বা হইয়া থাকে এবং স্থূল প্রায় একটা মধ্যমাকৃতি ভুট্টার সদৃশ। এই চুরট প্রস্তুত করিতে তামাকের পাতা ব্যবহৃত হয় না; তামাক গাছের ডাটা সকল কুচি ২ করিয়া কাটিয়া ভুট্টাফলের গাত্রস্থ আবরণ দ্বারা জড়াইয়া এই গুলি প্রস্তুত হয়। আবার শালপাতার দ্বারা জড়াইয়া

অপেক্ষাকৃত ছোট আর এক প্রকার চুরট প্রস্তুত হয়। এই সকল চুরটই ব্রহ্মদেশীয় জাতীয় চুরট। বিদেশীয় লোকে যে চুরট ব্যবহার করে, তাহা তামাকের পাতা দ্বারা প্রস্তুত হয়। পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকার চুরটই বালক বৃদ্ধ সকলের মুখেই দেখা যায়। কোন যাত্রা বা থিয়েটারের নর্ত্তক নর্ত্তকীগণের হাতে ইহার একটা চুরট না থাকিলে শোভা পায় না। বর্ম্মিণীগণের কোথাও সাজ সজ্জা করিয়া যাওয়ার সময়, কি ফটোগ্রাফ তুলিবার সময়, ইহার একটী সুদীর্ঘ চুরট হাতে না থাকিলে সুন্দরী দেখায় না। মূল কথা এই, চুরট ইহাদের জাতীয় পোষাকের এক অঙ্গ বিশেষ।

মংকোতি ও মাশোয়ে আপন ২ কার্য্য করিতেছে এবং মাঝে মাঝে পরস্পরে দুই একটী কথা বলিতেছে। ইতিমধ্যে এক অশীতি-বর্ষ বয়স্ক কাচিন বৃদ্ধ ছোট একটী বালিকাকে সঙ্গে করিয়া রাস্তা দিয়া যাইতেছে। মংকোতি তাহা দেখিতে পাইয়া কাচিন ভাষায় বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিল "হে থাঁও, নাং গাডে ছাই?" অর্থাৎ "হে মহাশয়, তুমি কোথায় যাইতেছ?" মংকোতি কাচিন কথা রীতিমত জানে। বৃদ্ধ নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে "পাদ্রী রবার্ট সাহেবের গির্জ্জা কোথায়, আমি তথায় যাইতেছি।" মংকোতি বলিল "কেন, কি জন্য তুমি রবার্ট সাহেবের গির্জ্জায় যাইতেছ?" বৃদ্ধ উত্তর করিল যে "তথায় এই বালিকাটীকে রাখিতে যাইতেছি।" মংকোতি জিজ্ঞাসা করিল "কেন?" বৃদ্ধ তখন আপন পৃষ্ঠস্থ ঝুড়িটী নামাইয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বসিয়া পড়িল এবং বলিল যে "সে দুঃখের কথা আর কি জিজ্ঞাসা কর?" সেই দেখাদেখি বালিকাটীও আপন পৃষ্ঠস্থ ক্ষুদ্র ঝুড়িটী নামাইয়া বসিল। ক্রমশঃ।

শ্রীরাম লাল সরকার।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। অভিব্যক্তিবাদ—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর, বি, এ, তত্ত্বনিধি কর্ত্তৃক বিরচিত। মূল্য ২৷৷০। বর্ত্তমান যুগের গল্প ও উপন্যাসময় বঙ্গীয় সাহিত্যে এরূপ বৈজ্ঞানিক বিষয়ের অবতারণা দেখিলেও মন হর্ষোৎফুল্ল হয়। গ্রন্থকার পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অভিব্যক্তিবাদের মধ্যে স্থানে ২ স্বীয় অভিমত সন্নিবেশিত করিয়া এবং অনেকগুলি সুন্দর প্রতিকৃতি যোজিত করিয়া এই পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি কেবল জীব দেহের অভিব্যক্তি বিবৃত করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, জড়, আত্মা, ও মৃত্যুর স্বরূপ, পাপ ও পুণ্যের দায়িত্ব ইত্যাদিও আলোচনার বিষয়ীভূত করিয়াছেন। আমাদের মতে গ্রন্থখানি আরও কিছু সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ রাখা উচিত ছিল। গ্রন্থকার আনুষঙ্গিক অন্যান্যতত্ত্ব স্বতন্ত্র পুস্তকে বিস্তারিত ভাবে প্রকাশ করিলেই ভাল করিতেন। তিনি লিখিয়াছেন "সত্য অনুসন্ধান করিতে গিয়া নাস্তিকতা লাভও সহ্য হয়, সত্যানুসন্ধানে পরাংমুখ হইয়া আস্তিক্যাভিমানে জীবন্মৃত থাকা অসহ্য।" একথায় আপত্তি করিবার কিছুই নাই। যদি সত্যের স্রোতে পাপ, পুণ্য ও আত্মা সম্বন্ধে চিরন্তন সংস্কার, এমন কি, সেই সর্ব্বনিয়ন্তা পূর্ণশক্তি মঙ্গলময় বিধাতার আসন পর্য্যন্ত ভাসিয়া যায়, তাহাতে দ্বিরুক্তি করা অর্ব্বাচীনতা মাত্র, কিন্তু এরূপ গুরুতর বিষয়ে যুক্তি ও তর্কের পথ সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম। "অভিব্যক্তিবাদ" এর মত গ্রন্থের দুই এক অধ্যায়ে ইহার আলোচনা করিয়া জগৎ সমক্ষে

"জীবনীশক্তি জড়শক্তিরই সংহত আকার মাত্র। আমাদের বিশ্বাস যে আমরা যাহাকে মানবাত্মা বলি, তাহাও জড়শক্তির সংহত আকার ব্যতীত আর কিছুই নহে।"

"পারমার্থিক দিক দিয়া যেমন দেখিয়াছি যে, মানুষের ন্যায় ক্ষুদ্র জীব পাপের জন্য দায়ী হইতে পারে না, ব্যবহারিক দিক দিয়াও তেমনি দেখিতেছি যে, প্রকৃতির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীট আমরা পাপের জন্য দায়ী হইতে পারি না।"

"ঈশ্বরের যদি ইচ্ছা না হয় যে তুমি পাপ বা অসংহতিজনক কর্ম্ম কর, তবে তোমার তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তিই হইবে না।"

ইত্যাদি অভিমত বিজ্ঞানের পবিত্রনামে উপস্থিত করা আমাদের মতে যুক্তিযুক্ত নহে। গ্রন্থকার কোথাও ঘোর অদৃষ্টবাদের পোষকতা করিয়াছেন, কোথাও বা অপরিস্ফুটরূপে মানবকে পুরুষকারের বৈজয়ন্তীপতাকা উত্তোলন পূর্ব্বক কর্ত্তব্য-সংগ্রামে অগ্রসর হইতে পরামর্শ দিয়াছেন। যখন গ্রন্থকারের নিজের মনেই এইরূপ অসামঞ্জস্য রহিয়াছে, তখন এরূপ গ্রন্থে এ সকল বিষয়ের অবতারণা না করিলেই ভাল হইত।

মানব দেহের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে অভিব্যক্তিবাদের পৃষ্ঠপোষকগণ যতদূর অগ্রসর হইতে প্রস্তুত, সাধারণ মানব সমাজ কখন ততদূর হইবে কি না সন্দেহ। বনমানুষ বা বানর হইতে মানবদেহের উৎপত্তির সম্ভাবনা বরং স্বীকার করা যায়, কিন্তু ক্ষুদ্র মক্ষিকা বা সলিলস্থ ক্ষুদ্র কীটাণু যে মানবের পূর্ব্ব পুরুষ কিম্বা একই পূর্ব্ব পুরুষের বংশজাত জাতি, অথবা সমস্ত জীব জড় পদার্থের অভিব্যক্তি মাত্র, এইরূপ মতের আরও সমীচীন প্রমাণ আবশ্যক। দশাবতারবাদের সহিত জীবদেহের অভিব্যক্তির সামঞ্জস্য বর্ণন আমাদিগের ভাল লাগিয়াছে, কিন্তু অভিব্যক্তির সূত্র-ব্যাখ্যায় গ্রন্থকার নিজে যে সমস্ত উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার সকলগুলিরই যে প্রাসঙ্গিকতা দেখাইতে পারিয়াছেন, তাহা নহে। গ্রন্থকার দক্ষিণে বা বামে লক্ষ্য না করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে স্বীয় মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ধীরে২ পরিস্ফুটরূপে অভিব্যক্ত করিলে গ্রন্থ উৎকৃষ্টতর হইত। মঙ্গলময় বিধাতার নাম যতই পবিত্র ও মধুর হউক, যাত্রার দলের অধিকারীর ন্যায় প্রস্তাবিত বিষয়ের মধ্যে স্থানে স্থানে অসংলগ্নভাবে তাহার উচ্চারণ বা অপব্যবহার (?) বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে শোভা পায় না।

গ্রন্থের ভাষা সাধারণতঃ উৎকৃষ্ট এবং প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপযোগী, কিন্তু স্থানে স্থানে বিসদৃশ প্রয়োগও আছে। "জগতে যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তনে এই নিয়মেরই প্রাধান্য উপলব্ধি করি" এবং "ধান্যচারায় নাগাল না পায়" একই পৃষ্ঠায় পরস্পর নিকটবর্ত্তী থাকিয়া যেন কর্ণজ্বালা উৎপাদন করে। এইরূপ ত্রুটি সত্ত্বেও এই বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের প্রণয়ন জন্য বঙ্গভাষা গ্রন্থকারের নিকট ঋণী থাকিবে। মূল্য ২॥০ টাকা কিছু অতিরিক্ত বোধ হইল।

২। Indubala : A Domestic Picture By Sitanath Tattvabhushan, অন্তঃপুর প্রেস্।—এই পুস্তিকায় বরাহনগর-নিবাসী শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোকগতা ষোড়শ বর্ষ বয়সের দুহিতা ইন্দুবালার পবিত্র জীবনচরিত বর্ণিত হইয়াছে। বাঙ্গালায় লিখিত হইলে ইহা বঙ্গদেশের গৃহে গৃহে পঠিত হইতে অনুরোধ করিতে পারিতাম। সীতা নাথ বাবু এই পুস্তিকা কেন ইংরেজীতে লিখিয়াছেন, সে কৈফিয়ৎটা বড় অকিঞ্চিৎকর। এমন এক আধটুকু বিশ্বজনীন উপযোগিতা কোন্ বিষয়েরই বা নাই ?

৩। নারীধর্ম্ম। ৺ নবীন চন্দ্র রায় প্রণীত। অন্তঃপুর প্রেস্। মূল্য ।০ আনা। স্ত্রীজাতির কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এই পুস্তকে মন্বাদিশাস্ত্র হইতে কতকগুলি বচন উদ্ধৃত, অনূদিত, ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ব্যাখ্যার দুই একটা স্থানে বিচক্ষণতার পরিচয় আছে।

৪। Three Gospels : গীতাত্রয়—By Rai Jadunath Mozoomdar Bahadur M, A., B. L. কুন্তলীন্ প্রেস। মূল্য ।০ আনা—এই পুস্তিকায় জ্ঞান কর্ম্ম ও প্রেমবিষয়ে এক এক সেট্ ইংরেজী এবং এক এক সেট্ বাঙ্গালা উপদেশ আছে। উপদেশগুলিতে কোনও নূতনত্ব নাই।

৫। সঙ্গীত পুষ্পাঞ্জলি। শ্রীযোগেন্দ্রলাল শর্ম্মা চৌধুরী প্রণীত। Acme Printing and process works. মূল্য কত, লেখা নাই। গানগুলি অপদার্থ। যোগেন্দ্র বাবু আবার কাওআলী তালকে পুস্তকের সর্ব্বত্রই "কয়ালী" বলিয়া লিখিয়াছেন। এটী কিন্তু বড় গ্রাম্যতার পরিচায়ক। কাওআল্-নামক এক শ্রেণীর গায়কেরা বহু

প্রয়োগ করিতেন বলিয়াই তেতালার আর এক নাম কাওআলী।

৬। সটীক আর্য্য-অনার্য্যের যুদ্ধ। মহাকাব্য। প্রথম ভাগ। শ্রীলক্ষ্মণ মজুমদার প্রণীত। সাম্যযন্ত্র—ভারতবর্ষে প্রবেশ হইতে আরম্ভ করিয়া আর্য্যগণ স্বার্থ-সাধনোদ্দেশে অনার্য্যদিগের প্রতি কত অত্যাচার, উৎপীড়ন, নির্য্যাতন করিয়া আসিতেছেন—মহাকাব্যের বিষয়টা এই। কিন্তু কাব্যখানা serious না হাস্যরস প্রধান, একখানা ইংরেজী ভূমিকা ও ভূরি ভূরি টীকা থাকাতেও তাহা ঠিক বুঝা যায় না। টীকার বিষয়গৌরব, সঙ্গতি, ও ভাষা দেখিলে হাস্য সংবরণ করা কঠিন হয় সত্য, কিন্তু কাব্যখানা এমনই দারুময় যে এবংবিধ টীকার চাপেও তাহা হইতে একরতি হাস্যরস নিষ্কাশিত হয় নাই! 'পক্ষান্তরে, serious কাব্য হইলে তাহাতে কীটবৃন্দ' থাকিবে কেন? সার কথা, এরূপ কাব্য ছাপাইয়া অর্থনষ্ট করা উচিত হয় নাই।

৭। বাল্মীকির রামায়ণ। শ্রীনিত্যানন্দ রায় প্রণীত। ভিক্‌টোরিয়া প্রেস্। মূল্য ১্ টাকা—এই পুস্তকে মূল গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া সংক্ষেপে সপ্তকাণ্ড রামায়ণই নানা বাঙ্গালা ছন্দোবন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। কৃত্তিবাসের গ্রন্থ মূলানুযায়ী নয়। বাঙ্গালায় গদ্য পদ্যে মূল রামায়ণের যে সকল অনুবাদ আছে, সে সকলও অতি বিস্তীর্ণ, দুর্ব্বোধ, অল্পাধিক মহার্ঘ। তাই এই নূতন উদ্যম। আমরা এ কৈফিয়তে প্রীত হইয়াছি। নিত্যানন্দ বাবুর রচনাও আমাদের কাছে বেশ বিশুদ্ধ, প্রসন্ন, ও মধুর লাগিয়াছে।

৮। বাঙ্গালার ইতিহাস। তৃতীয়ভাগ ৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রণীত। চুঁচুড়া বুধোদয় যন্ত্র। মূল্য ॥০ আনা। রামগতি ন্যায়রত্নের "বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম ভাগ" নামক পুস্তকে নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর শাসনকাল পর্য্যন্তের ইতিহাস বর্ণিত হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহারই পরিশিষ্ট রূপে "বাঙ্গালার ইতিহাস, দ্বিতীয় ভাগ" প্রণয়ন করেন। কিন্তু তাহাতেও তিনি লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের শাসনকাল পর্য্যন্ত নামিয়াছিলেন মাত্র। ১২৭২ সালের অগ্রহায়ণে আবার ভূদেব বাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অসম্পূর্ণ গ্রন্থের পরিশিষ্ট ভাগ লিখিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু এ কার্য্যে যেন কি একটা অভিশাপ ছিল, ভূদেব বাবু ও এ ইতিহাস সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। যতটা—লর্ড লরেন্স্ ও সর্ সিসিল্ বীডনের শাসন কাল পর্য্যন্ত—লিখিত হইয়াছিল, তাহাই "বাঙ্গালার ইতিহাস, তৃতীয় ভাগ" নামে গত বৎসর প্রকাশিত হইয়াছে। সংক্ষিপ্ত এবং কোনও কোনও দিকে অসম্পূর্ণ হইলেও, দীনক্ষীণ বাঙ্গালা ঐতিহাসিক সাহিত্য ইহাতে অলঙ্কৃত হইবে। পুস্তকখানির একটা বিশেষ গুণ এই যে,—যে স্বদেশপ্রীতি আত্মদোষ-দর্শনে মানুষকে অন্ধ করে, যথার্থ ইতিহাস সঙ্কলনে যাহা হইতে গুরুতর বিঘ্ন আর নাই, ইহাতে স্বদেশানুরাগের যথেষ্ট পরিচয় আছে, কিন্তু সেরূপ স্বদেশপ্রীতির কোনও গন্ধ নাই। ভূদেবের উদার অভয় বলিষ্ঠ মনুষ্যত্ব এ ক্ষুদ্র পুস্তকেও জাগিতেছে।

৯। বেদান্ত-সূত্র। প্রথমাধ্যায়। প্রথম খণ্ড। রায় শ্রীযদুনাথ মজুমদার বাহাদুর এম্-এ, বি-এল্ দ্বারা সম্পাদিত। যশোহর, হিন্দু পত্রিকা প্রেস্। মূল্য ৸০ আনা। এই পুস্তকে ব্রহ্ম সূত্রের প্রথমাধ্যায়ের সূত্র গুলি অতি পরিষ্কার রূপে বুঝান হইয়াছে। সেগুলি সর্ব্বত্র যথাযথ অধিকরণে সাজাইয়া বুঝাইলে আরও ভাল হইত। ব্যাখ্যা প্রায়ই শাঙ্কর ভাষ্যের অনুসারিণী, কিন্তু দুই এক স্থলে যদুবাবু ভাষ্যকার হইতে আপনার মতভেদও দেখাইয়াছেন। শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে কিনা, এতদ্বিষয়ক প্রসিদ্ধ অধিকরণে যদু বাবু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—ছান্দোগ্যোপনিষৎ-জনশ্রুতি-সংবাদ-পঠিত শূদ্র শব্দের যে ব্যাখ্যা সূত্র ও ভাষ্যে অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা কষ্টকল্পিত। আমাদেরও সেই সন্দেহ হয়। এ বিষয়ে যে

স্বয়ং বেদান্তাচার্য্যদিগের মধ্যেও মতভেদ ছিল, অপ্পয়দীক্ষিত-কৃত সিদ্ধান্ত-লেশ সংগ্রহে তার প্রমাণ আছে। এই পুস্তক সম্পূর্ণ হইলে সংস্কৃতানভিজ্ঞ বাঙ্গালী পাঠকের মহোপকার সাধিত হইবে।

১০। পারিবারিক প্রার্থনা। শ্রীধর্ম্মদাস বসু প্রণীত, মূল্য ৸৹, বীরভূম গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য। আমরা এই পুস্তক খানি বিশেষ মনোযোগ সহ পাঠ করিয়া যারপর নাই তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। ধর্ম্মদাস বাবু একজন জ্ঞানী ব্যক্তি, কিন্তু সে জন্ম তাঁহাকে আমরা আদর করি না; তিনি একজন পদস্থ ব্যক্তি, সে জন্যও আমরা তাঁহাকে সম্মান করি না;—তাঁহার ধর্ম্ম জীবনের মাধুর্য্যে আমরা তাঁহাকে অন্তরে সর্ব্বদা পূজা করি। তাঁহার বিশেষত্ব—ধর্ম্ম-বিশ্বাস;—সেই নিগূঢ় ঐকান্তিক ধর্ম্ম বিশ্বাসের উজ্জ্বল চিত্র এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই পুস্তকে মহাত্মা মার্টিনো, থিওডোর পার্কার ও ভয়েসী মহোদয়গণের কয়েকটী সুন্দর প্রার্থনা অনুবাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু সে জন্ম এই পুস্তক আদৃত নয়, যে সকল মৌলিক কাতরোক্তি ধর্ম্মদাস বাবুর জীবনের অন্তঃস্থল হইতে সমুত্থিত হইয়াছে, সেই সকল কাতর প্রার্থনা পাঠ করিলে মন ভক্তি বিশ্বাসে পূর্ণ হয়, শরীর পূত চরিত্রের অনুপ্রাণনে রোমাঞ্চিত হয়। এরূপ সুন্দর পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় বড় অধিক প্রকাশিত হয় নাই। মহাত্মা কেশব চন্দ্রের "প্রার্থনা" সকল পাঠে যদি লোকের উপকার হইয়া থাকে, তবে ইহা পাঠেও প্রভূত উপকার হইবে, আমাদের বিশ্বাস।

অনেকের ধারণা আছে যে, অন্যের প্রার্থনা পাঠে লোকের উপকার হয় না। ধর্ম্মদাস বাবুরও কতকটা সেই ধারণা আছে। কিন্তু সে ধারণা ঠিক নহে। সকল পুস্তকই ব্যক্তি বিশেষের মত ও মন্তব্যে পূর্ণ;—একের মত ও মন্তব্যে যদি অন্যের উপকার হয়, তবে একের প্রার্থনায় অন্যের উপকার হইবে না কেন? অভিজ্ঞতা, সরলতা ও তন্ময়তা যে মন্তব্যের মূল, তাহা অন্যকে বিচলিত করিবেই করিবে। বাহিরে এক ভাব ভিতরে আর এক ভাব রাখিয়া যাঁহারা পুস্তক লিখিয়া ব্যবসাদারী করেন, তাঁহাদের মত ও মন্তব্য জগতের কোন স্থায়ী উপকার করিতে পারে না। কিন্তু ভিতরের খাঁটী জিনিস যাঁহারা ঢালিয়া দিতে পারেন, তাঁহারা জগতের উপকার করিতে নিশ্চয় সমর্থ। যদি তাহা না হইত,কোনপুস্তক পাঠে কোন লোকের উপকার হইত না। ব্যথিত হৃদয়ের সরল ক্রন্দনোচ্ছ্বাস অন্যকে ব্যথিত করিবেই করিবে। সুতরাং প্রার্থনা যখন সরলতায় পূর্ণ, তখন সেই প্রার্থনা যে ব্যক্তি শ্রবণ করিবে, তাহারই উপকার হইবে। অনুপস্থিত ব্যক্তিগণ সেই সরল প্রার্থনা পাঠ করিলে উপকার প্রাপ্ত হইবেন। ধর্ম্মদাস বাবুর এই পারিবারিক প্রার্থনা কালে কত হৃদয়ের যে পরিবর্ত্তনের কারণ হইবে, কেহ ধারণা করিতে পারিবেন না। ইহার পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে, জীবনব্যাপী সংসার-সংগ্রামের যে সরল ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা আশা করি, তাহা অনেক জীবনের উপকারে আসিবে। বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

হিন্দু ও মুসলমান। (১)

দুইটী অভ্রভেদী পর্ব্বতের সানুদেশে দাঁড়াইয়া পর্ব্বতস্থ বৃক্ষ, লতা ইত্যাদি দেখিলে এবং নানা বিহঙ্গমের কলধ্বনি শুনিলে যেমন পর্ব্বতের সৌন্দর্য্য, গাম্ভীর্য্য ও অবস্থিতি দর্শকের মনে একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও অনুসন্ধিৎসার ভাব জাগাইয়া তুলে, পৃথিবীতে বহু পুরাতন—হিন্দু ও মুসলমান—এই দুইটী জাতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, তেমনি, ইহাদের পূর্ব্ব সভ্যতার ইতিহাস প্রভৃতি বহু কথা জানিবার ইচ্ছা আমাদের মনে জাগিয়া উঠে। অজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মাণ্ডের ঐশ্চর্য্য দেখিয়া যেমন বলে—'এই বিশ্ব কি বৃহৎ,কি মহান্!' আমিও এই দুইটী প্রাচীন জাতির পূর্ব্ব, মধ্য ও বর্ত্তমান সমাজ, সভ্যতা ও ধর্ম্ম প্রভৃতি বুঝিতে চেষ্টা করিবার পূর্ব্বেই, তেমনি, ইহাঁদের বিশালত্বের নিকট মস্তক অবনত করিয়া বলিতেছি—'ইহাঁরা কি মহান্!'

হজরৎ মহম্মদের জন্মের বহুপূর্ব্বে আরব দেশকে তদ্দেশবাসীরা 'জেজিরৎ,অল্ আরব' বলিত। প্রাচীন ভৌগোলিকেরা ইহাকে প্রস্তরময় (Arabia Petrœa), মরুভূমি (Arabia deserta) এবং সুখ শান্তির আরব (Arabia felix) এই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছিল। প্রাচীন আরবের সীমা নির্দ্দেশ লইয়া বহু বাদানুবাদ হইয়াছে; কাহারও মতে Arabia felixই আরবের যথার্থ সীমা। প্রতীচ্য লেখকেরা আরবকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—'ইয়েমান্' (Yaman), হেজাজ্ (Hejaz), তেহামা (Tehama), নজ্ (Najd),এবং ইয়েমামা (Yamama)। আরবের অধিকাংশ ভূমিই অনুর্ব্বর, জলহীন; কিন্তু এডেনের (Eden) নিকটবর্ত্তী 'ইয়েমান্' উর্ব্বরতার জন্য বিখ্যাত। ইহার প্রধান সহর 'সেন্না' (Sanaa) অতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহার জল বায়ু, উর্ব্বরতা এবং ধন ধান্যের সংবাদ শুনিয়া বিশ্বজয়ী বীর আলেকজাণ্ডার এই স্থানেই তাঁহার রাজধানী স্থাপন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। আরবের বহু স্থান অনুর্ব্বর হওয়াতেই, বোধ হয়, তদ্দেশবাসীরা পূর্ব্বকাল হইতেই বাণিজ্যে বিশেষ পারদর্শী হইয়াছিল। বহুদেশ ভ্রমণ করিয়া তাহারা ভৌগোলিক, নাক্ষত্রিক প্রভৃতি বিদ্যার অধিকারী, কষ্টসহিষ্ণু ও সাহসী হইয়াছিল। সিরিয়া, মিশর, ফিনিসিয়া, গ্রীস্ ও ভারত প্রভৃতির সহিত তাহাদের বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল বলিয়া জানা গিয়াছে। মুসলমান লেখকগণ, আরব জাতিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে—প্রাচীন ও বর্ত্তমান আরব জাতি। প্রাচীন আরবের নানা সম্প্রদায়, সভ্যতা ও ধর্ম্ম প্রভৃতি বিলুপ্ত হইয়াছে,—কেবল কোরাণের স্থানে স্থানে তাহাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহাই এখন তাহাদিগকে জানিবার সর্ব্ব প্রধান ইতিহাস। প্রাচীন আরবীয়দের মধ্যে অদ্ (Ad), থামুদ্ (Thamud), তাম্ (Tasm), যদিস্ (Jadis) প্রভৃতি সম্প্রদায়ই অধিক প্রসিদ্ধ ছিল। নোয়ার (Noah) পুত্র 'সেম,' সেমের পুত্র এরেম, এরেমের পুত্র অশ্ (Aws), অশের পুত্র অদ্। এই অদের পুত্র সেদাদ (Shedad) একজন বিখ্যাত নরপতি ছিলেন। যখন অদের বংশধরেরা এক মাত্র সত্য

ঈশ্বরকে ছাড়িয়া দেব দেবীর পূজায় (১) মনোযোগ দিল, তখন ভগবান তাহাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোকে আনিবার জন্য হুদকে (Hud) পাঠাইলেন। অদেরা তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করাতে ভগবান তাহাদের উপর উত্তপ্ত বায়ু প্রেরণ করিলেন! সাত রাত্র এবং আট দিবস পর্য্যন্ত ক্রমাগত সেই বায়ুর তাড়নায় বহু অদ্ বংশীয় প্রাণত্যাগ করিল! কেবল যাহারা হুদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া অন্যত্র গিয়াছিল, তাহারাই রক্ষা পাইল! হুদের কবর স্থানটী এখন 'কবর হুদ' নামে একটী ক্ষুদ্র সহরে পরিণত হইয়াছে। জোরহাম্ নামক আর একটী সম্প্রদায় অদ্‌দের সমসাময়িক। কিন্তু ইহারা অধিক দিন আপনাদের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে না পারাতে একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল। কথিত আছে, ইশমাইল (Ishmael) পিতা আব্রাহাম কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া জুরহাম জাতির একটী সুলক্ষণা কন্যা বিবাহ করিয়া তাহাদের সহিত বাস করেন। এইরূপে পুরাকালে আরব ও য়িহুদী জাতির মধ্যে এক অপূর্ব্ব সম্মিলন হয়। আব্রাহাম স্বীয় পুত্র ইশমাইলের জন্য ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করিলে পর, এইরূপে ভগবান কর্ত্তৃক আশ্বস্ত হন—

"And—as for Ismael, I have heard thee: Behold, I have blessed him and will make him fruitful and will multiply him exceedingly; twelve princes shall he beget and I will make him a great nation (Genesis XVII, 20)

(১) They chiefly worshipped four deties, Sakia, Hafedha, Razeka and Salema. The first, as they imagined, supplying them with rain, the second preserving them from all dangers abroad, the third providing food for their sustenance, and the fourth restoring them to health when afflicted with sickness, according to the signification of the several names. Vide Sales Koran, Page 111, foot note.

আরব ঐতিহাসিকগণ, ইবেরের (Eber) পুত্র কাতন্ (Kahtan) এবং ইশমাইলের বংশধর অদনন্ হইতেই বর্ত্তমান আরবজাতির উৎপত্তি নির্দ্দেশ করেন। ইবেরের পুত্র হইতে উৎপন্ন আরব জাতিকেই 'খাঁটি আরব' বলিয়া মনে করেন। আরব দেশে আরও বহু জাতি ও সম্প্রদায়ের সংমিশ্রণে যাহারা উদ্ভূত হইয়াছিল, বাহুল্যভয়ে এখানে তাহাদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম না।

এই বিশাল ধরণী, বহু প্রাচীন আরব জাতির প্রথম সভ্যতার সময় তাহাদের মনে যুগপৎ, আশ্চর্য্য, ভয় ও হর্ষের ভাব সৃষ্টি করিয়াছিল। তাহারা ঊর্দ্ধে অনন্ত আকাশ, তেজময় সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র প্রভৃতি এবং নানা বৃক্ষ পশু, গিরি, নদী ও নীলাম্বু রাশির অনন্ত বিস্তার, এবং অমূর্ত্ত বায়ুর অদ্ভুত ক্রিয়া দেখিয়া প্রকৃতির অনন্ত দুর্ভেদ্য রহস্যের নিকট মস্তক অবনত করিল;— নক্ষত্র, সূর্য্য প্রভৃতি তাহাদের উপাস্য দেবতা হইল! মহম্মদের আবির্ভাবের পূর্ব্বে যে ধর্ম্ম আরবে প্রচলিত ছিল, বর্ত্তমান আরবসন্তানেরা তাহাকে 'অজ্ঞানীর ধর্ম্ম' বলে; কারণ তাহা পৌত্তলিকতায় পূর্ণ ছিল। মহম্মদের পূর্ব্বে, সাবিয়ান্ ধর্ম্ম (১) আরব

(১)......They (Sabians) have also a great respect for the temple of Mecca, and the pyramids of Egypt; fancying these last to the the sepulchres of Seth and of Enoch and Sabi his two sons, whom they look on as the first propagators of thier religion;—Sales 'The—Preliminary discourse,' Page 12. কিন্তু ঐতিহাসিক সত্যের অনুসরণ করিলে, মিশরের রাজা চিওপস্ (Cheops) কেই পিরামিদের নির্ম্মাণকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। পিরামিদ নির্ম্মাণ সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। বর্ত্তমান্ ইতিহাসের জন্মদাতা হেরোদোতাস্ বলেন—"The pyramid itself was a work of twenty years." রাজা চিওপাসের পিরামিদ্ নির্ম্মাণ সময় কেহ ৩০০০ খ্রীঃ পূর্ব্ব মনে করেন ('An old

জাতির প্রধান ধর্ম্ম ছিল ;—সেতের (Seth) পুত্র সবি হইতেই এই নামের উৎপত্তি হইয়াছিল। তাহাদের ভিতর একেশ্বরবাদ ছিল বটে, কিন্তু ঈশ্বরকে প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাহারা নক্ষত্র, দেবদূত, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতির পূজা করিত। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ প্রসিদ্ধ ডাক্তার প্রিডুস্ (Dr Prideaux) এ সম্বন্ধে বহু আলোচনা করিয়াছেন। সেবিয়ানুরা বিশ্বাস করিত যে, দুরাত্মাদের আত্মা নয় হাজার বৎসর পর্য্যন্ত শাস্তি ভোগ করিয়া অবশেষে ভগবানের দয়া লাভ করিবে! তাহারা উপাস্য দেবতার নিকট বলি দিত; কিন্তু বলির কোন অংশ গ্রহণ না করিয়া অগ্নিতে ভস্মীভূত করিত। বৎসরে ৪৬ দিন উপবাস করিত। দিবসে তিন বার (কোন কোন মতে সাত বার) উপাসনা করিত। বৃক্ষরোপণ, ভূমি কর্ষণ প্রভৃতিতেও তাহাদের উপাস্য দেবতা এবং সর্ব্বময় ভগবান্ আপন আপন ভাগ পাইতেন!! ঠিক যেন দিল্লীর বাদসাহ ছিলেন ভগবান্—আর নানা ওমরাহ ও শাসনকর্ত্তারা উপাস্য দেবতা। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রাচীন আরবজাতির সহিত আর্য্যদের এ বিষয়ে অনেকটা সাদৃশ্য দেখা যায়। আর্য্যেরাও প্রথমে অগ্নিতে মহাশক্তি উপলব্ধি করিয়াছিলেন; ঋকের প্রথম সূত্রই অগ্নির উপাসনা। তাঁহারাও প্রথমে সরল শিশুর ন্যায় বায়ু, আকাশ, উষা প্রভৃতি দেবতার স্তব করিয়াছিলেন। প্রথমে বাহ্য প্রকৃতির ঐশ্বর্য্য ও শক্তি দেখিয়া প্রকৃতির বহু শক্তিকে আরাধনা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরে সেই প্রকৃতি অর্চ্চনার ভিতর দিয়াই স্বাভাবিক গতিতে, এই বাহ্য প্রকৃতির অন্তরালে আর কেহ আছেন কি না, জানিবার জন্য উৎসুক হইলেন। তখন জড় ও চৈতন্য দুইটী পৃথক বস্তু (?) অনুভব করিতে লাগিলেন। ক্রমে সেই চিন্তা গাঢ় হইয়া উপনিষদাদির সৃষ্টি করিল। মানবের আদিম সভ্যতার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, প্রকৃতির শক্তিপুঞ্জের প্রতি তাহাদের একটী সরল বিশ্বাস, ভয় ও ভক্তি বিনা শিক্ষা ও তর্কেই জাগিয়া উঠিয়াছিল। একদিন, আর্য্য ও অন্যান্য জাতি কর্ত্তৃক অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র প্রভৃতির যেরূপ উপাসনা হইয়াছিল, এখন আর পণ্ডিতসমাজে—এমন কি, সাধারণ শিক্ষিত সমাজের মধ্যেও তাহার কথা মাত্রও গৃহীত হইবে না। বিজ্ঞান ও অনুসন্ধিৎসা ক্রমেই মানব সমাজের স্তরে স্তরে প্রবেশ করিয়া এক নব যুগ, নবধর্ম্মের সূত্রপাত করিতেছে। যদিও অতি প্রাচীন কাল হইতেই পৃথিবীর একজন 'মালিক' সম্বন্ধীয় জ্ঞান মানব হৃদয়ে স্থান পাইয়াছিল, কিন্তু ব্রহ্মকে ধারণা করিবার সূত্রগুলি হৃদয়ে খুঁজিয়া না পাওয়াতেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দীপ্তিমান্ সূর্য্য, অগ্নি প্রভৃতির স্তব করিয়াছিল। দেবতাদের মধ্যে যাঁহার ক্ষমতা অধিক, উপাসকের নিকট তাঁহার প্রাধান্যও তদ্রূপ অধিক। কৃষি মানবগণের প্রাণ ধারণের একমাত্র উপায়; কিন্তু জল ব্যতিরেকে কৃষিকার্য্য সুসম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। কাজেই আকাশের দেবতা ইন্দ্র অধিক সম্মান লাভ করিয়াছিল। আমাদের ইন্দ্রদেব বৈদিক সময় অপেক্ষা পৌরাণিক যুগেই রাজকীয় বেশ, ভূষণ ও ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছিলেন! তখন তাঁহার রাজপ্রাসাদ, ইন্দ্রাণী, অপ্সরা ও মোসায়েব

friend with a new face' by John Ward F. S. A. "Good words" Page 824. December 1899.)

প্রভৃতির সমাগমে ইন্দ্রভবন টলমল করিতেছে! মানবগণ নানা বসনে ও ভূষণে ভূষিত করিয়া আপনাদের উপাস্য দেবতার পূজা করিত; এবং এখনও পৌত্তলিক হিন্দুরা সে প্রথা জাকজমকের সহিতই রক্ষা করিতেছে। খ্রীষ্টের প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে গল জাতিও (১) চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহগণকে দেবতার পদে বরণ করিয়াছিল। তাহারা হ্রদ ও পর্ব্বতকেও অত্যন্ত সম্মানের চক্ষে দেখিত। অনেক পশু, পক্ষী, জলচর প্রভৃতিও মানবগণের উপাসনা হইতে অব্যাহতি পায় নাই। হিন্দুরা ঘোর পৌত্তলিকতার যুগে সর্প হইতে আরম্ভ করিয়া নানা পশু, পক্ষীকে প্রণাম করিয়াছে! প্রাচীন মিশরবাসীরা আপনাদের দেবতার নিকট বৃষ বলি দিত। কিন্তু তাহাদের প্রসিদ্ধা দেবী Isis গাভীকে সম্মান করিত বলিয়াই গাভী মিশরীদের চক্ষে বড় পবিত্র। Isisর মাথার উপরে গো-শৃঙ্গের ন্যায় শৃঙ্গ থাকাও ইহার অন্য কারণ হইতে পারে। মিশরীরাও হিন্দুদের ন্যায় পশু, পক্ষী, জলচর প্রভৃতির পূজা করিত (২)।

পৌত্তলিক আরবীয়দের বহু উপাস্য দেবতার মধ্যে নিম্নোক্ত দেব দেবীগুলিই প্রসিদ্ধ এবং কোরাণে ইহাদের উল্লেখ পাওয়া যায়—'অল্ লত, অল উজ্জা (Al Uzza) 'মানা' (Manah) 'ওয়াদ' (Wadd) 'সোয়া' (Sawa) 'ইয়াগুথ' (Yaghuth) 'নসর' (Nasr) প্রভৃতি। আমরুলোহেই সিরিয়া হইতে 'হবল' (Hobal) নামক একটী দেবতা আনিয়াছিলেন; অনেকেই এই দেবতার বারিবর্ষণ ক্ষমতা স্বীকার করিত। পরে মহম্মদের হস্তে ইনি ধ্বংস প্রাপ্ত হন বলিয়া অনেকের বিশ্বাস! 'হবল' দেবের সহিত 'এসফ্'ও নেয়িলা' নামে আরও দুইটী দেবতা আসিয়াছিলেন! প্রথমটী পুরুষ, দ্বিতীয়টী স্ত্রীলোক। ইহঁাদের একটীকে 'সেফা' অন্যটীকে 'মারওয়া' পর্ব্বতে স্থাপন করা হইয়াছিল। কথিত আছে যে, অমরুর পুত্র 'এসফ্' এবং 'সেহালের' কন্যা নৈয়িলা উভয়েই জোরহাম বংশীয়। কাবাতে তাঁহারা ন্যায়-বিরুদ্ধ ব্যবহার (whoredom) করায় ভগবান্ তাঁহাদিগকে প্রস্তরে পরিণত করিলেন! কিন্তু ইহঁারা কোরেশ কর্ত্তৃক এত অধিক সম্মান লাভ করিয়াছিলেন যে, ভগবানের ন্যায়-বিচারের স্তম্ভস্বরূপ সেই পর্ব্বত দুটীকে দর্শন ও সম্মান প্রদর্শন প্রথা মহম্মদকে বাধ্য হইয়া রক্ষা করিতে হইয়াছিল (১)।

মহম্মদের বহু পূর্ব্ব হইতেই আরব জাতির মধ্যে পারস্য, য়িহুদি ও খ্রীষ্টান ধর্ম্ম প্রবেশ করিয়াছিল। পারস্য দেশের মাজিয়ান (Majian) ধর্ম্ম আরবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। রোমানদের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া যে সকল য়িহুদি আরব দেশে পলায়ন করিয়া আসিয়াছিল, কালে তাহারাই তদ্দেশবাসীকে মুসার ধর্ম্মে

(১) "...... and they (Gauls) had, at the same time, deified the heavenly host, and particularly the sun and the moon." "They worshipped, or at least—paid extraordinary honours to, lakes and mountains." Vide History of the Roman Empire by T. Arnold, D. D. Jacob Henry Brooke Mountain, D. D. &c &c. Edited by E. Pococke Esq. Second Edition, 1853.

(২) "The hippopotamus is esteemed sacred in the district of Papremis, but in no other part of Egypt." "They have also another sacred bird; which, except in a picture, I have never seen : it is called the Phœnix.' "In the vicinity of Thebes there are also sacred serpents, not at all troublesome to men ;"

Vide Egypt and Scythia by Herodotus, Edited by Professor Henry Morley.

(১) Sales the Preliminary discourse, page 16.

দীক্ষিত করিতে আরম্ভ করে। মহম্মদের প্রায় ৭০০ বৎসর পূর্ব্বেও মুসার ধর্ম্ম আরবে অজ্ঞাত ছিল না। 'কেনানা' (Kenanah) হরেথকাবা (al Hareth Caaba) এবং কেন্দা (Kendah) সম্প্রদায়ের মধ্যে মুসার ধর্ম্ম বিশেষ ভাবে শক্তি বিস্তার করিয়াছিল। য়ুসেফ নামক একজন আরব, য়িহুদি ধর্ম্মের গোঁড়া ছিলেন। যাহারা য়িহুদি ধর্ম্মে বিশ্বাস করিত না, তিনি তাহাদিগকে অমানুষিক যন্ত্রণা দিয়া বধ করিতেন! নজরানের অধিবাসীরা খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিল। তিনি য়িহুদি ধর্ম্মের বিরোধীকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিতেন! কোরাণে সে বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়।

"By the heaven adorned with signs; by the promised day of Judgment; by the witness and witnessed; cursed were the contrivers of the pit, of fire supplied with fuel; &c." (Sales translation, Chapter Lxxxv) (১)

খ্রীষ্টধর্ম্মই আরব জাতিকে বিশেষরূপে আয়ত্ত করিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। 'হেমিয়ার', 'ঘশন', 'রবিয়া', 'তগ্‌লাব', 'বারা', 'তোনুক্', 'তে', 'কোদ্দা' প্রভৃতি সম্প্রদায় খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। যেমন হইয়া থাকে—সে সময় য়িহুদি ও খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে আপন আপন ধর্ম্মের প্রাধান্য দেখাইবার নিমিত্ত তর্ক বিতর্ক হইত। কথিত আছে, একদিন য়িহুদিরা বলিতে লাগিল—"যদি তোমাদের যিশু প্রকৃতই জীবিত থাকেন এবং তাঁহার শিষ্যদের প্রার্থনা শুনিতে পান, তাহা হইলে তিনি তাহার সম্মুখে আবির্ভূত হউন।' এই কথা গুলি শেষ হইতে না হইতেই হঠাৎ বিদ্যুৎ ও ভয়ানক মেঘ গর্জ্জনের সহিত ঝটিকা উত্থিত হইল! আর বায়ুর উপর ভাসমান্ মেঘে চড়িয়া যিশু তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন! তাঁহার চতুর্দ্দিকে পুণ্যালোক; মস্তকে অমূল্য শিরস্ত্রাণ; হস্তে তরবারি! তিনি বলিলেন—"দেখ, আমি তোমাদের সম্মুখে! যাহাকে তোমাদের পিতৃপুরুষেরা ক্রুশবিদ্ধ করিয়াছিল, আমি সেই যিশু।" ইহা যে কোন গোঁড়া খ্রীষ্টানের রচিত, তাহার আর সন্দেহ নাই। মহম্মদের বহু পূর্ব্বে আরব দেশে খ্রীষ্ট প্রচারকগণ প্রচার কার্য্যে যাইত। খ্রীষ্টাব্দের প্রায় প্রথম শতাব্দীতে Thomas ইথোপিয়ায় প্রচার করিতে গিয়াছিলেন; এমন কি, তিনি নাকি ভারতবর্ষেও প্রচারার্থে আসিয়াছিলেন। (১) কিন্তু খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রবিদ্ Edward Burton D. D. তাঁহার বক্তৃতার এক স্থানে বলিয়াছেন যে, একজন আরব নৃপতি, প্রসিদ্ধ লেখক ও প্রচারক Origenর উপদেশ শুনিবার জন্য আলেকজান্দ্রিয়ার তদানীন্তন বিশপ Demetrius ও মিশরের রোমক শাসনকর্ত্তাকে অনুরোধ করেন, যেন Origen তাঁহার আশা পূর্ণ করে।

(১) কোরাণের বহু ইংরাজী অনুবাদ থাকিলেও Saleর অনুবাদ—সর্ব্বাপেক্ষা না হইলেও—উৎকৃষ্ট। "where (in English) we have the extremely paraphrastic, but for its time admirable translations of Sale (repeatedly printed.) &c. &c. vide Encyclopædia Britannica, latest Edition, E. W. Lane কর্ত্তৃক "Selections from the Kur-an",ও পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক বিশেষরূপে আদৃত হইয়াছে।

(১) "He (Thomas) is reported to have visited Ethiopia; by which we are perhaps to understand the eastern Part of Arabia: and more than one ancient writer has stated that he travelled into India." Vide Lectures upon the Ecclesiastical History of the first three Centuries. Lecture XI Page 245, Published by J. Henry Parker. 2nd Edition, mdcccxlv.

প্রায় ১৮৮ খ্রীষ্টাব্দে Origen আরব যাত্রা করিয়াছিলেন। ইহাঁর আরব যাত্রার সহিত Pantœnusর ভারতবর্ষ যাত্রার একটী কৌতূহলোদ্দীপক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয় (১)। যে খ্রীষ্টান প্রচারক Thomas র কথা এখানে উল্লিখিত হইয়াছে, সম্ভবতঃ তিনি রাজা কণিষ্কের সময় ভারতে আসিয়া ধর্ম্মার্থে ভারতেই প্রাণত্যাগ করেন। (২) বাহুল্য ভয়ে Saul, Thomas, Pantœnus, Origen প্রভৃতির আরবে প্রচার কার্য্যের বিস্তৃত বিবরণ এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম না।

মহম্মদের জন্মের পূর্ব্বে আরবে দুইটী দল ছিল,—একদল কৃষি এবং গো প্রভৃতি পশু পালন করিত; অন্যটী কৃষি অপেক্ষা লুটের উপর অধিক নির্ভর করিত। শেষোক্তেরা তাঁবুতে বাস করিত; প্রধানতঃ দুগ্ধ ও উটের মাংস খাইত; একস্থানে অধিক দিন থাকিত না। ইহারাই পরে সভ্য জগতের ভয় উৎপাদক Wandering Arabs নামে পরিচিত হইয়াছে। শুনা যায়, এখনও ইহারা ইহাদের পূর্ব্ব পুরুষদের লুণ্ঠনবৃত্তি ত্যাগ করে নাই। যখন (১) এব্রাহিম, পুত্র ইসমাইলকে তাড়াইয়া দেন, ভগবান কৃপা করিয়া ইসমাইলকে মরুভূমি ও ক্ষেত্র দান করেন; এবং সেই মরুভূমি ও ক্ষেত্রের অন্তর্গত সমস্ত আত্মসাৎ করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন! কাজেই Wandering Arabs রা লুণ্ঠনকে একটা পাপ কার্য্যের মধ্যে গণ্য করে না। আমাদের দেশেও ঠগিদের সম্বন্ধে এইরূপ একটী গল্প শুনা যায়। আদ্যাশক্তি কালী, অসুরনাশ কালে ঠগিদের পূর্ব্বপুরুষগণ কর্ত্তৃক উপকৃত হওয়াতে, তিনি তাহাদিগকে একখানি গলায় ফাঁসি দিবার রুমাল বকসিস দিয়া ইচ্ছামত লোক মারিতে হুকুম দিয়াছিলেন!! আরবীয়েরা চিরকালই আতিথ্যের জন্য জগতে প্রসিদ্ধ। কেহ দস্যুর তাঁবুতে অতিথি হইলেও তাঁবুতে অবস্থিতির সময় পর্য্যন্ত কেহ তাহার একটী কেশ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিবে না। (২) প্রাচীনকালেও আরবেরা অঙ্গীকার অনুযায়ী কার্য্য করিত, এবং তাহাদের কুটুম্বদিগকে ভালবাসিত। আরবেরা চিরকালই অতি শীঘ্র কোন বিষয় বুঝিতে পারে; মহম্মদের পূর্ব্বে তাহাদের পরিহাস শক্তির কথা জানা গিয়াছে। কিন্তু ইসলাম ধর্ম্মগ্রহণ করিবার পর হইতেই তাহারা অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য ও কঠোর ধর্ম্ম বিশ্বাসে অনেকটা নীরস হইয়াছে। আরবী ভাষা সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে; তবে

(১) ১৮৮ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পরে Pantœnus ভারতে প্রচারার্থে আসিয়াছিলেন। Jerom নামক জনৈক প্রচার কাহিনীর লেখক বলিয়াছেন যে, সেই সময় খ্রীষ্ট ধর্ম্মের উপদেশ শুনিবার জন্য ভারত হইতে মিশরে বিশপের নিকট লোক প্রেরিত হইয়াছিল। Pantœnusই সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত বিবেচিত হওয়ায় ভারতে প্রেরিত হন।' Jerom ইহাও অনুমান করেন যে, ব্রাহ্মণেরা উক্ত প্রচারকের উপদেশ শুনিয়াছিল! এ সম্বন্ধে বহু মতান্তর আছে। তখন কোন কোন লেখক Arbia Felixকেই ভারত বলিয়া ভ্রম করিতেন।

(২) কিন্তু Clement, Rufinus প্রভৃতির লেখার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া Edward Burton D.D. ইহা বিশ্বাস করিয়াছেন;—বিশেষতঃ ইউফ্রেতিস নদীর পূর্ব্বদিকে ইডিসা (Edeessa) নামক স্থানে Rufinus তাঁহার সমাধি নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(১) Sale.

(২) "A stranger's arrival is often the occasion of an amicable dispute among the wealthier inhabitants as to who shall have the privilege of receiving him; &c." vide Encyclopœdia Britannica.

কোরাণের রচনা হইতেই আরবী ভাষা প্রকৃতপক্ষে ঐশ্বর্য্যশালিনী হইয়াছে বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন।

মানব শিশুরা ভাবের প্রথম উন্মেষেই কবিতার সৃষ্টি করিয়াছিল। ভারতে বহুদিন পর্য্যন্ত কেবল কবিতাতেই শাস্ত্র, ইতিহাস, রাজনীতি প্রভৃতি বহুবিষয় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল। অনেকেই মনে করিতে পারেন, মরুভূমির সন্তান আরবীয়েরা কেবল লুণ্ঠন ও ধর্ম্মোন্মত্ততার (Fanaticism) জন্য বিখ্যাত। প্রাচীন আরবে কবিতার (১) আদর ছিল। যে ব্যক্তি কোন সভা বা সম্মিলনীতে সহজ অথচ জ্বলন্ত কবিতায় আপনার ভাব ব্যক্ত করিতে পারিত, সমাজে তাহার যথেষ্ট সম্মান হইত। প্রাচীন আরব জাতি আপনাদের বংশ ও পদ-মর্য্যাদার আদর করিত, অনেকেই নিজ নিজ বংশ-কাহিনী লইয়া কবিতা রচনা করিত। তাহাদের ভিতর কবিতা রচনাকে সজীব রাখিবার জন্য প্রতিবৎসরে একবার ওখাদ নামক স্থানে মেলা আহ্বান করিত। এই মেলা প্রায় একমাস কাল স্থায়ী হইত। মেলাতে ব্যবসা বাণিজ্য ব্যতিরেকে কবিদের রচনার এক বিরাট প্রতিযোগিতা চলিত, সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচয়িতা দেশবাসী ও রাজা কর্ত্তৃক পুরস্কৃত ও উৎসাহিত হইত। হজরৎ মহম্মদ ওখাদের কবি-সঙ্গম বন্ধ করিয়াছিলেন। মহম্মদের আবির্ভাব, এমন কি, তাঁহার লোকান্তরের পরেও আরবেরা কবিতাকে একপার্শ্বে ঠেলিয়া তরবারি হস্তে 'দিন্' 'দিন্' রবে ধর্ম্মযুদ্ধে বহির্গত হইয়াছিল। ইসলাম ধর্ম্মের প্রাধান্যের সময় হইতে পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মযুদ্ধ ক্রুশেদ পর্য্যন্ত ইহাদের তরবারির আঘাতে কত মুণ্ড যে ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা করাও সহজ নহে! কিছুদিন শান্তি স্থাপিত হইলে পর, যদিও আরবে কবিতা উঁকি ঝুঁকি দিয়াছিল, এবং ক্রমে পূর্ব্বের ন্যায় আদৃত হইবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু নানা কারণে আর প্রাচীন কালের উন্মুক্ত ভাব ও ভাষা আরবে আশ্রয় পায় নাই;—ইসলাম ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপনের নিমিত্ত অবিরত নরহত্যা ইহার একটী প্রধান কারণ বলিয়া মনে হয়। প্রাচীন আরবে বহু কবিতা একেবারে বিস্মৃতিতে ডুবিয়া গিয়াছিল। মহম্মদের পূর্ব্বে আরবীয়েরা বক্তৃতা, অস্ত্রবিদ্যা, জ্যোতিষ, ইতিহাস ও স্বপ্ন বিষয়ক গবেষণায় পরদর্শী হইয়াছিল।

যখন মধ্য এসিয়া (১) হইতে একদল

(১) "From very early times the Arabs had great delight in verses and tales, and the development of their language was much influenced by this fact."

"Oman Ebu Rabeeya, of the tribe of korcysh; Jameel, of the Benoo-Adhrab; Jareer and Farazdak, both of Tameem; and Noseyyeh, a negro by birth—the first and second masters of erotic, the third and fourth of satirical and the fifth of descriptive poetry—with a cloud of lesser celebrities, lived and sang in the sunshine of the Damascene Court. "Abu-Teman of the tribe of Tai, known not as a poet only, but also a critic and the compiler of the celebrated anthology the Hamasa, the "Golden Treasury" of the Arabs, first came forward in the field. His successor the well-known Mutenebhe is still esteemed by many the greatest of Arab poets. Epic and Dramatic poetry were never even attempted by the Arabs. Vide Encyclopoedia Britannica, Tenth Edition.

(১) আর্য্যেরা ঠিক কোন্ স্থান হইতে আসিয়াছিলেন, তাহার যথার্থ ইতিহাস পাওয়া এক প্রকার অসম্ভব। এ বিষয়ে নানা পণ্ডিতের নানা মত। কেহ বলেন, বল্টিকসাগর, কেহবা কাসপিয়ান সাগরের নিকটবর্ত্তী কোন স্থান হইতে ইহাদের ভারতে উপনিবেশ স্থাপন বিশ্বাস করেন। সম্প্রতি বল্

সভ্যজাতি আসিয়া সিন্ধুনদ তটে আপনাদের সভ্যতার নিশান প্রোথিত করিয়াছিল, তখন ভারত ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। ক্রমে তাহাদের বিজয় শঙ্খ নিনাদে বন, গিরি, নদী, পশু প্রভৃতি সকলেই শিহরিয়া উঠিল! অনার্য্যগণ সেই বিজিগীষু আর্য্যদের জয়-লিপ্সা কিছুতেই প্রতিরোধ করিতে পারিল না। আর্য্যেরা প্রথমে কৃষি, গো প্রভৃতি পশুপালন করিয়াছিল। অগ্নিতে আহুতি দান ও বেদমন্ত্রোচ্চারণই আর্য্যসভ্যতার সর্ব্ব প্রথম ইতিহাস। হিন্দুদের পতনের একটী প্রধান উপকরণ 'জাতিভেদ' সে সময়ে ছিল না বলিয়াই তাহাদের সমবেত চেষ্টায় অনার্য্যগণ ধীরে ধীরে পশ্চাৎপদ হইয়া পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। ক্রমে সমাজবন্ধনের সঙ্গে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতির উৎপত্তি হইল। কার্য্য বিভাগের দ্বারা সমাজের উন্নতি সাধন করাই সে সময়ের জাতি বিভাগের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে ইহা ব্যক্তি ও বংশগত হওয়াতেই ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টের কারণ হইল! ব্রাহ্মণ, পৌরোহিত্য, সমাজ শাসন, শাস্ত্র রচনা প্রভৃতির নায়ক হইলেন; ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধ বিগ্রহ; এবং বৈশ্যেরা বাণিজ্যের ভার গ্রহণ করিল। কিন্তু হতভাগ্য শূদ্রেরা কেবল সেবার জন্যই রহিল! আর্য্যেরা স্ত্রীলোকদিগকে যথেষ্ট সম্মানের চক্ষে দেখিতেন; সমাজে তাঁহাদের কিছু কিছু অধিকারও ছিল—স্থানান্তরে সে বিষয় আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। ক্রমে আর্য্যের পঞ্জাব ছাড়িয়া গঙ্গা ও যমুনার নিকটবর্ত্তী স্থানে আপনাদের অধিকার বিস্তার করিয়াছিল। তাহাদের রাজ্য বিস্তারের সহিত, রাজ্যশাসন প্রণালী ও রাজার সৃষ্টি হইল। এখন আর তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় সমবেত শক্তি লইয়া ভারতে 'আর্য্য শক্তি' বিস্তার করিতে পারিল না;—কুরু, পাঞ্চাল, বিদেহ, কোশল, কাশি প্রভৃতি বহুরাজ্যে স্থাপিত হইল। রাজত্বে ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত তাহাদের পরস্পরের ঈর্ষা, কলহ প্রভৃতি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রমে কুরু ও পাঞ্চালেরা, দিল্লি ও কম্পিলা নগরে আপনাদের রাজধানী স্থাপন করিল। তারপর কুরুক্ষেত্রের ভীষণ যুদ্ধের পর হিন্দুরা (১) দুর্ব্বল হইয়া পড়িল! বহুদিনের অর্জ্জিত, ঈর্ষা, দ্বেষ কুরুক্ষেত্রের শবপূর্ণ, রুধির-রঞ্জিত রণ-প্রাঙ্গণকে চিরকালের জন্য জগতের নিকট পরিচিত করিল! এই যুদ্ধের ফলে আমরা

গঙ্গাধর তিলক মহাশয় তাঁহার নব প্রকাশিত পুস্তকে উত্তর সাইবেরিয়ার কোন স্থানে আর্য্যদের উৎপত্তি স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, শুনিতেছি। যদিও ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা (অনেকেই) বেদ রচনার সময় খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২০০০ বৎসরের অধিক বলিয়া স্বীকার করেন না, কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, বেদ রচনারও বহু পূর্ব্বে আর্য্যসভ্যতা তাহাদের অনিশ্চিত আবাস স্থানে আবদ্ধ ছিল। পণ্ডিতগণ সংস্কৃতকেই আর্য্যদের প্রাচীনতম ভাষা বলিয়া মনে করেন। অবশ্য সেই সময়ের ভাষা বর্ত্তমান সংস্কৃতের অনুরূপ ছিল না।

(১) হিন্দু শব্দের উৎপত্তি লইয়া প্রায়ই গোলযোগ হয়! কেহ বলেন 'সিন্ধু' হইতে 'হিন্দু' হইয়াছে, মুসলমান লেখকেরা বলেন—'হিন্দু' পারস্য শব্দ, ইহার অর্থ 'দাস'। হইতে পারে, যখন পারস্যবাসীরা আর্য্যদের সহিত বিবাদ করিয়া পৃথক হইয়াছিল, তখন তাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া আর্য্যদিগকে 'দাস' নামে অভিহিত করিয়াছিল। কিন্তু কোনটীরই বিশেষ প্রমাণ নাই। Dr. Brewer, 'হিন্দুস্থান' শব্দের ব্যাখ্যায় লিখিতেছেন—"The Country of the Hindus. (Hind [Persic] and Sind [Sanskrit] means "black" and tan = territory. &c".

অমূল্য 'মহাভারত' পাইয়াছি ;—একাধারে ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজনীতি, কাব্য, ইত্যাদি আর কোন গ্রন্থে বর্ণিত হয় নাই। দাক্ষিণাত্যে আর্য্যসভ্যতার বিস্তারের ফলে 'রামায়ণ' পাইয়াছি। ইহার আখ্যান বস্তু মহাভারতের ন্যায় অত জটিল ও বহু বিষয়ক না হইলেও, ইহা ভারতের একখানি অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য। স্থানান্তরে এ বিষয় বুঝিতে চেষ্টা করিব। রামায়ণ ও মহাভারতের সময় কেহ খ্রীঃ পূঃ ১৪০০, কেহবা খ্রীঃ পূঃ ১২০০ হইতে প্রায় ১০০০ খ্রীঃ পূঃ অনুমান করেন। সেই সময় জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনা হইয়াছিল। ইহার কিছু পরে, হিন্দুরা দ্রুতগতিতে ভারতের বহু রম্য স্থান অধিকার করিয়া আপনাদের শক্তি বিস্তার করেন। মগধ, বঙ্গ, উড়িষ্যা, গুজুরাত, মালওয়া এবং দাক্ষিণাত্যের কোন কোন স্থান তাহাদের করতলগত হইল। খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে সিংহবাহুর পুত্র বিজয় লঙ্কায় নির্ব্বাসিত হন। তিনি সেই দেশ অধিকার করিয়া হিন্দুর বিজয় নিশান প্রোথিত করেন। প্রায় ১০০০ খ্রীঃ পূঃ হইতে ২৮০ খ্রীঃ পূঃ পর্য্যন্ত হিন্দুদের অধিকার, সভ্যতা, সাহিত্য, অঙ্কশাস্ত্র প্রভৃতি উন্নতির দিকে ধাবিত হইয়াছিল। সেই সময় জ্যামিতি ও অঙ্ক শাস্ত্রের পুষ্টিসাধন হইয়াছিল। কথিত আছে, পাইথোগোরাস্ ভারত হইতেই জ্যামিতি-বিদ্যা গ্রীসে এবং আরবীয়েরা অঙ্ক বিদ্যা স্বদেশে (১) প্রচার করিয়াছিল। ক্রমে বেদের সহজ উপাসনা লঙ্ঘন করিয়া হিন্দুরা কঠোর জ্ঞান চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিল। বেদের মন্ত্রগুলি চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া চতুর্ব্বেদের সৃষ্টি করিল। যখন যাগ, যজ্ঞের ধূমে ভারতের জ্ঞানাকাশ তমসাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছিল, সেই সময় মহাত্মা শাক্যসিংহের আবির্ভাবে ভারত আর একটী উজ্জ্বল ধর্ম্ম ও নীতির আলোকে উদ্ভাসিত হইলেন। তিনি জাতিভেদ, যাগ যজ্ঞের বৃথা আড়ম্বর প্রভৃতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। হিন্দুরা বুদ্ধের প্রবল ধর্ম্মমতের ঘাত প্রতিঘাতে কিছুদিন নদী তীরে লোষ্ট্রবৎ অস্থির হইয়া পড়িল! প্রায় ৩০০ খ্রীঃ পূঃ হইতে ৫০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম্ম ভারতে রাজত্ব করিয়াছিল। রাজা অশোকের সময়ই বৌদ্ধ ধর্ম্ম উন্নতির চরম সীমায় আরোহণ করিয়াছিল। তিনি কেবল ভারতের বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধ-প্রচারক প্রেরণ করিয়া নিরস্ত হন নাই, মিশর (Egypt) ও পেলেস্তাইনেও বৌদ্ধধর্ম্মের সুসমাচার প্রেরণ করিয়াছিলেন (১)। পরে, পূর্ব্ব-

(১) "In mathematics the Arabs based themselves on what they had acquired from the Greek and Indian originals. The former gave them Geometry, the latter Algebra." Encyclopædia Britannica.

(১) রমেশ বাবু তাঁহার Civilisation in Ancient India নামক পুস্তকে বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত খ্রীষ্ট ধর্ম্মের সামঞ্জস্য করিতে বলিয়াছেন—"Jesus went to John and lived with him, and no doubt learnt from John many of the precepts and teachings of the Essenes &c. &c." "......the Essenes, who admittedly represented the Budhist movement in Palestine, before the birth of Chirst, as we shall see later on." Page 376. Peoples Edition. ["The Essenes were remarkable for their strict morality, for their ascetic and abstemious habits, for having a community of Goods, and for living in villages apart from the great towns. Some of them held maniage to be unlawful. &c" Burton's Lecture I. "যদিও বহু লেখকের মতে Palestine Essenes দের বাসস্থান ছিল, কিন্তু Pliny Dead Sea র নিকটবর্ত্তী স্থানে তাহাদের প্রধান আড্ডা ছিল বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন। ইহাঁরা জাতিতে Jew ছিল।

মধ্যে ও দক্ষিণ এসিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। মিশর, পেলেস্তাইন, চীন, জাপান, লঙ্কা, বর্ম্মা, তিব্বৎ প্রভৃতির সহিত ভারত বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার কার্য্যে পরিচিত হইয়াছিল। তখন ব্রাহ্মণগণ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের সূক্ষ্মতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া ভারতে— পৃথিবীতে এক অমূল্য তত্ত্বের প্রচার করিতেছিলেন। সমুদ্র মন্থনের ন্যায়, বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী, মনুষ্য প্রভৃতির বাহ্য ও অন্তর প্রকৃতি মন্থন করিয়া ব্রাহ্মণেরা যে জ্ঞান প্রচার করিয়াছিলেন, কালে তাহা মানব সমাজের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছে। যখন ব্রহ্মণগণ 'দ্রব্য গুণ' লৌহ, পারদ প্রভৃতি জারন, শরীর তত্ত্ব, শরীরে ঔষধের ক্রিয়ায় পারদর্শী হইয়াছিলেন, তখন ইউরোপ, বিশেষতঃ ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মেনি প্রভৃতি দেশে সভ্যতার আলোক প্রবেশ করে নাই। পুরাকালে ব্রহ্মণেরা 'ব্যবচ্ছেদ' করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। কিন্তু যে দিন হইতে 'চিকিৎসার' সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ দৃঢ় ভাবে শৃঙ্খলিত হইল, সেই দিন হইতেই 'ব্যবচ্ছেদ' হিন্দু চিকিৎসা হইতে লোপ পাইল,—ব্রাহ্মণগণ 'আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যা' একদল লোকের হস্তে সমর্পণ করিলেন —পরে তাহারাই বৈদ্য জাতি বলিয়া খ্যাত হইল। ব্রাহ্মণেরাই পৃথিবীতে আয়ুর্ব্বেদের উজ্জ্বল আলোক সর্ব্ব প্রথমে জ্বালিয়া দিয়াছিলেন—একথা মনে করিতেও যুগপৎ হর্ষ ও বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়! আরব ও গ্রীক জাতি ব্রহ্মণদের আয়ুর্ব্বেদের নিকট ঋণী (১)। রাজা অশোকের সময় আয়ুর্ব্বেদের আলোচনা ও সংস্কার চরমসীমায় পৌঁছিয়াছিল। ক্রমে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবনতির সহিত আয়ুর্ব্বেদের পতন হইল!

সঙ্গীত কি এবং তাহার কি কি লক্ষণ, তাহা এখানে উল্লেখ করিব না, তবে প্রাচীন ভারতে কিরূপ চর্চ্চা হইয়াছিল, তাহা অতি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতেছি। ঋকের মন্ত্রোচ্চারণ হইতেই ভারতে সঙ্গীতের প্রথম সূত্রপাত হইয়াছিল বলিয়া আমার বিশ্বাস। তৎপূর্ব্বে যে আর্য্যদের ভিতর সঙ্গীতের অস্তিত্ব ছিল না, এমন নহে; কিন্তু সাম্‌বেদের পূর্ব্বে সঙ্গীত একটী বৈজ্ঞানিক ভাবে গঠিত হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। সঙ্গীতের অপার্থিব মোহ, গায়ক ও শ্রোতাকে বিমোহিত ও বিচলিত করিতে করিতে ইহার ভিতর নব নব রাগ ও রাগিণীর সৃষ্টি করিল! বোধ হয়, ইহারই ফলে সাম্‌বেদের আবশ্যক অনুভূত হইয়াছিল। একজন বিখ্যাত সাহেব ঐতিহাসিক, যিনি বহু বর্ষ পর্য্যন্ত ভারতের বহু স্থানে ভ্রমণ এবং ভারতের ধর্ম্ম প্রভৃতি বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তিনি আমাদের প্রাচীন সঙ্গীত সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"The Brahmans had also an art of music of their own. The seven notes (সপ্তরাগ) which they invented probably four centuries before Christ, passed though the Persians to Arabia, and were then introduced into European Music in the 11th Century A. D. Hindu music declined under the Muhammaden rules. Its complex divisions or modes and numerous subtones prevent it from pleasing the European ear, which has been trained in a different system; but it is

(১) In medicine the Brahmans learned nothing from the Greeks, but taught them much. Arab medicine was founded on translations from Sanskrit works about 800 A. D. European medicine, down to the 17th Century, was based upon the Arabic. The Indian physician Charaka, who is supposed to have lived before Christ, was often quoted in European books of medicine written in the middle ages." W. W. Hunter, C. I. E, L. L. D.

highly original and interesting from a scientific point of view." W. W. Hunter, C I E, L L D.

ঐতিহাসিক মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতের পর হিন্দু দর্শন ও পুরাণ আপন আপন জ্ঞান, বিশ্বাস ও ধর্ম্ম লইয়া তাৎকালিক হিন্দুদিগকে প্রাচীন আর্য্যগণের বিশ্বাস, ধর্ম্ম ও জ্ঞান হইতে পৃথক করিয়া দিয়াছিল। যদিও মনুসংহিতার কোন কোন 'শাসন' বর্ত্তমান যুগের পক্ষে অব্যবহার্য্য, কিন্তু সেই প্রাচীন কালের কথা মনে করিলে, মনুসংহিতা যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা প্রভৃতি সমাজ ও ধর্ম্ম সংক্রান্ত আইন পুস্তকগুলি যে, হিন্দু সভ্যতার উত্তম উদাহরণ, তাহার আর সন্দেহ নাই। মহাকবি কালিদাসের সময় হইতেই সংস্কৃতে প্রকৃত কাব্য রচিত হইয়াছিল। তাঁহার "শকুন্তলার" স্নিগ্ধোজ্জল সৌন্দর্য্য, স্ফটিক-প্রভ কাহিনী পড়িয়া ইউরোপের বিখ্যাত কবি 'গেটে' পর্য্যন্ত বিচলিত হইয়াছিলেন! মহাভারত ও রামায়ণের কবির পরেই কালিদাসের স্থান নির্দ্দেশ করিলে অন্যায় হয় না। ভারতীর অর্থগৌরব সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা বিদিত ও স্বীকৃত হইয়াছে। ষষ্ঠ খ্রীষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ 'পঞ্চতন্ত্র' রচিত হইয়াছিল; পারস্যের খ্যাতনামা নরপতি নশ্‌রাওনের সময় তাহা প্রথমে পারস্য, পরে আরব্য ভাষায় অনূদিত হইয়া ক্রমে ইউরোপের বহু ভাষায় স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল। কেহ কেহ হিন্দুদের কাব্য রচনার ব্যপদেশে গ্রীক কল্পনার গন্ধ পাইয়া থাকেন;— একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত এ সম্বন্ধে বলিতেছেন,—

"The origin of the Indian drama may unhesitatingly be described as purely native....... On the other hand there is no real evidence for assuming any influence of Greek examples upon the Indian drama at any stage of its progress." Vide Encyclopœdia Britannica.

মহম্মদের জন্মের প্রায় ১৭০ বৎসর পূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক Fa Hian ভারতের বহু স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে সংক্ষেপে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সে সময় বৌদ্ধ ধর্ম্মই ভারতের সর্ব্ব প্রধান ধর্ম্ম ছিল; ভারতের বহু স্থানে বৌদ্ধ ভিক্ষু (স্ত্রী ও পুরুষ) বুদ্ধের ধর্ম্ম শিক্ষা ও প্রচার করিতেছিল। রাজা ন্যায় দণ্ড হস্তে প্রজা শাসন করিতেছিল; এমন কি, যাহারা রাজকীয় ভূমি কর্ষণ করিত, তাহারা ইচ্ছানুসারে ভূমি কর্ষণ ও ত্যাগ করিতে পারিত (১)। নানা কারণে বৌদ্ধ ধর্ম্মের পতন হইতে আরম্ভ হইলে পর, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম, ধর্ম্মের নামে নানা ক্রিয়া কর্ম্মের গুরুতর বোঝা মস্তকে করিয়া বৌদ্ধবহুল ভারতকে বৌদ্ধ শূন্য করিতে প্রবৃত্ত হইল! যদি বুদ্ধের পরবর্ত্তী প্রচারক ও শিষ্যেরা তাঁহারই আদেশ পালন ও প্রচার করিতেন, তাহা হইলে হয়ত বৌদ্ধধর্ম্মই ভারতের প্রধান ধর্ম্ম হইত। কিন্তু ভস্মাচ্ছাদিত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম অবসর পাইয়া খাণ্ডব দাহনের ন্যায় বৌদ্ধভূমি ভারতকে দগ্ধ করিতে লাগিল! ব্রাহ্মণদের জয় হইল! কিন্তু সেই সময় হইতেই বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের ভিতর প্রবেশ করিয়া এখন পর্য্যন্তও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে! ক্রমে 'ধর্ম্মকে' ব্রাহ্মণেরা তাহাদের নিজস্ব করিয়া লইল! বৈদিক ও তাহার পরবর্ত্তী সময়ের ন্যায় ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে অন্যান্য জাতি আর

(১) It is abundantly proved by the literature of the Hindus and by the testimony of Greek and Chinese travellers, that the system of agricultural slavery, which prevailed in Europe in the Middle ages was never known in India. Vide R. C. Dutt's Civilisation in Ancient India.. Page 56.

ধর্ম্ম ও ধর্ম্মশাস্ত্রে অধিকারী রহিল না! সমাজের এক অংশ নানা কঠোর শাসনে মৃতপ্রায় হইল! হায়! ভারতের প্রকৃত অধঃপতনের সূত্রপাত হইল!! যে শূদ্র বা অন্যান্য নিকৃষ্ট জাতি (?) বৌদ্ধ ধর্ম্মের অনুগ্রহে ধর্ম্মে কিঞ্চিৎ অধিকার লাভ করিয়াছিল, আবার তাহারা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের কঠোর শাসনে নিস্তেজ ও পরমুখাপেক্ষী হইল!! (১)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র।

উপনিষদের উপদেশ। (১৩)

মৈত্রেয়ীর উপাখ্যান।

পুরাকালে যাজ্ঞবল্ক নামক ঋষির মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী নামে দুইটী পত্নী ছিলেন। একদা যাজ্ঞবল্ক, বিশুদ্ধ ব্রহ্মবিদ্যার সম্পূর্ণ অনুশীলনের জন্য, বিষয়বাসনা হইতে দূরে থাকিতে অভিলাষী হইয়া, মৈত্রেয়ীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"মৈত্রেয়ি! আমি বিষয়-কোলাহল হইতে সম্পূর্ণ দূরে থাকিয়া, একাকী নির্জ্জনে বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। যাইবার সময়ে, আমার যাহা কিছু সম্পত্তি ও দ্রব্যাদি আছে, তাহা তোমাদের উভয়ের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিব মনঃস্থ করিয়াছি। অতএব তুমি কাত্যায়নীকেও এইখানে লইয়া আইস।" মৈত্রেয়ী স্বামীর এইরূপ কথা শুনিয়া ক্ষুব্ধচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভগবন্! আপনি যে ধন-সম্পত্তির কথা বলিতেছেন, জিজ্ঞাসা করি, এই সাগর-মেখলা সমগ্র পৃথিবী যদি ধন ধান্যাদিতে পরিপূর্ণ হইয়া আমার অধিকারভুক্ত হয়, তবে প্রভু! তাহাতে আমি কি অমরত্ব লাভ করিতে পারিব? আর, এই ধন সম্পত্তি দ্বারা বহুবিধ যজ্ঞাদিক্রিয়া নির্ব্বাহিত করিলেই কি আমি অমর হইতে পারিব?" যাজ্ঞবল্ক পত্নীর এতাদৃশ সাধুবাক্য শ্রবণ করিয়া বড় আহ্লাদে উত্তর দিলেন—"না মৈত্রেয়ি! তাহা কেমন করিয়া হইবে? বিভবশালী ব্যক্তির যেমন কোন প্রকার সাংসারিক অভাব থাকে না, সে যেমন সাংসারিক বিবিধ সুখ লাভ করিতে সমর্থ হয়; তোমার এই ধন-সম্পত্তি দ্বারা তাদৃশ সুখ ও স্বচ্ছন্দতা হইতে পারিবে, সন্দেহ নাই; কিন্তু প্রিয়তমে! তুমি যে অমরত্ব-লাভের কথা বলিলে, এই ধনসম্পত্তি দ্বারা সে অমরত্ব লাভের আশা কখনও করা যাইতে পারে না"। মৈত্রেয়ী স্বামীর এই উত্তর শ্রবণ করিয়া, নিতান্ত বিমর্ষ-অন্তঃকরণে, স্বামীকে নিবেদন করিলেন—"ভগবন্! তবে এ ধনসম্পত্তি, বিষয়বিভব লইয়া আমি কি করিব? যাহাতে আমায় অমরত্ব দিতে পারিবে না, যাহা হইতে আমি অমৃতত্ব লাভে বঞ্চিত হইব, এরূপ অসার ধনসম্পত্তি মাত্র লইয়া আমার কি হইবে? স্বামিন্! আপনি যে বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, দয়া করিয়া আমাকে সেই ব্রহ্ম বিদ্যার উপদেশ প্রদান করুন্"।

যাজ্ঞবল্ক দেখিলেন, মৈত্রেয়ী ধনসম্পত্তি প্রত্যাখ্যান করিতেছে, বিত্তাদির লোকে

(১) মহম্মদের জন্মের পূর্ব্বে আরব ও ভারতের ইতিহাস সংক্ষেপেই লিপিবদ্ধ করিলাম। আগামী বারে মহম্মদের সময়ে আরব ও ভারতের অবস্থা এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করিবার ইচ্ছা রহিল।

তাহার চিত্ত কিছুমাত্র লুব্ধ হইতেছে না, ইহা দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত আহ্লাদ সহকারে তিনি বলিতে লাগিলেন ;—

"মৈত্রেয়ি! তুমি চিরকালই আমার অত্যন্ত প্রিয়; কিন্তু আজ্ আমি তোমার এইরূপ কথায় অতীব সন্তুষ্ট হইয়াছি; তুমি আজ্ আমার নিতান্তই প্রিয় হইলে; আইস, আমার নিকটে উপবেশন কর, আমি তোমায় অমৃতত্ব লাভের উপদেশ প্রদান করিতেছি। মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করিয়া যাও।

পতি যে জায়ার প্রিয় হন, তাহা পতির প্রয়োজন সাধনার্থ নহে, আত্মারই প্রয়োজনের জন্য পতি জায়ার প্রিয় হন। এইরূপ পুত্র, ধনরত্নাদি, এমন কি বিশ্বের যাবতীয় বস্তুই আত্মার্থই লোকের নিকটে প্রিয় বলিয়া বোধ হয়। এই সমস্ত বস্তু, আত্মার প্রীতি সাধন করিয়া থাকে বলিয়াই, প্রিয় বলিয়া বোধ হয়, নতুবা কোন বস্তুই স্বাধীনভাবে—সেই বস্তুরই জন্য—কাহারও প্রিয় হইতে পারে না। অতএব আত্মাই লোকের একমাত্র মুখ্য প্রিয় পদার্থ। এই তত্ত্বটী তুমি বিশেষ করিয়া হৃদয়ে ধারণ করিবে। জানিবে, জগতে আত্মাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রেমের পদার্থ, ভালবাসার সামগ্রী। জগতের যত কিছু খণ্ড খণ্ড প্রেম, স্নেহ, আসক্তি, ভালবাসা দেখিতে পাও, সমস্তই সেই মহাপ্রেমের অন্তর্ভুক্ত এবং সেই মহাপ্রেমেরই অংশ ভূত। সেই পরমা প্রীতি লাভের জন্যই, জগতের অন্যান্য প্রীতি অবস্থিত রহিয়াছে। পত্নী-প্রেম, পিতৃ-ভক্তি, অপত্য-স্নেহ, বন্ধু প্রীতি, ধনের প্রতি আসক্তি,—এইরূপ যত কিছু প্রীতির সামগ্রী দেখিতে পাইতেছ, সমস্তেরই একমাত্র লক্ষ্য সেই মহা-প্রেম-লাভ। জাগতিক সমস্ত প্রীতিই সসীম, বিকারী, ক্ষুদ্র। সেই মহা-প্রেম অখণ্ড, নিত্য, ভূমা। ইহারা সেই মহাপ্রেমেরই আংশিক বিকাশ। আত্ম-গণ্ডী হইতে ক্রমশঃ সম্প্রসারণ করিয়া এই প্রীতি বাড়াইতে হয়। আত্ম-প্রীতিকে, পারিবারিক প্রীতিতে, পারিবারিক প্রীতিকে পরকীয় প্রীতিতে, পরকীয় প্রীতিকে ভিন্ন জাতি ও ভিন্ন দেশের প্রীতিতে সম্প্রসারিত করিয়া, ক্রমে সমগ্র মানব সমাজের প্রীতিতে পরিণত করিতে হয়। এইরূপ সম্প্রসারণ ক্রমে ব্রহ্ম প্রেমে যাইয়া নিমজ্জিত হয়। অতএব সেই এক, অখণ্ড, মহা-প্রেম-সাগর হইতে,—ইহাদের কোন পৃথক্, স্বাধীন সত্তা নাই। অতএব সেই অখণ্ড পরমাত্ম-প্রেমই মুখ্য প্রেম। এই প্রেমের জন্যই অন্যান্য প্রেমের বিকাশ। অতএব সেই মহা প্রেমসাগর পরমাত্মাকে দর্শন করিতে হইবে। আচার্য্য ও উপনিষদাদির বাক্যদ্বারা তাঁহার শ্রবণ করিতে হইবে। তৎপর, তর্ক যুক্তির বলে এই আত্মতত্ত্ব মনে ধারণ করিতে হইবে। এইরূপে নিশ্চিত আত্মাকে সর্ব্বদা ধ্যান করিতে হইবে। এইরূপ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিতে করিতে আত্মার সত্যত্ব ও একত্ব ক্রমে পরিস্ফুট হইতে থাকিবে। এইরূপে আত্মতত্ত্ব জানিতে পারিলে, বিশ্বের আর কোন বস্তু জানিতেই বাকী থাকে না। পরমাত্মাই বিশ্বের যাবতীয় পদার্থের আশ্রয়; পরমাত্মা ব্যতীত কোন বস্তুরই পৃথক্ স্বাধীন সত্তা নাই। তাবৎ পদার্থই আত্মা হইতে প্রাদুর্ভূত, স্থিতিকালে আত্মাকে অবলম্বন করিয়াই অবস্থিত এবং লয়কালে আত্মাতেই সূক্ষ্ম শক্তিরূপে অবিভাগাবস্থায় বিলীন থাকে। তাঁহারই শক্তি ক্রমাভিব্যক্ত হইয়া,

ক্রমোন্নততত্ত্বর দিয়া, সেই পূর্ণতার দিকেই অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। তিনি ব্যতিরেকে কাহারই পৃথক্ সত্তা নাই। মৈত্রেয়ি! অদ্য যে তত্ত্বটী বুঝাইয়া দিলাম, ইহা উত্তমরূপে হৃদয়ে ধারণ কর। আবার আর একদিন আরো বিশদরূপে এ তত্ত্ব বুঝাইয়া দিব"।

(ক্রমশঃ)।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

উপনিষদ গ্রন্থাবলী

[ক্রমে প্রধান প্রধান উপনিষৎ সকল পয়ারাদি চির-প্রচলিত ছন্দে সহজ ভাষায় অনুবাদিত হইলে বঙ্গবাসীর প্রভূত উপকার সাধিত হয়, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া উপনিষৎ গ্রন্থাবলী নাম দিয়া শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের মর্ম্মানুবাদ প্রকাশ করিলাম। অন্যান্য উপনিষৎ সকল যথা সময়ে প্রকাশিত হইবে]।

শ্বেতাশ্বতর।

প্রথম অধ্যায়।

কহে ব্রহ্মবাদী:—

ব্রহ্ম কি কারণ? এই প্রপঞ্চের
ব্রহ্ম কি কারণ আদি?
অথবা কি কাল, যদৃচ্ছা,* স্বভাব,
পুরুষ, ভূত, নিয়তি?
এদের সংযোগ নহে ত কারণ;
সংযোগ কর্ম্ম আত্মার†;
আত্মা সুখ দুঃখ ভোগের অধীন
কর্তৃত্ব নাহিত তা'র।
তবে সে কেমনে কোথা হ'তে মোরা
আইনু সংসার তটে?
জীবিছি কেমনে, কোথায় রহিব
প্রলয়ের সে শঙ্কটে?
ঋষিগণ ধ্যানে যে গূঢ় শকতি
নেহারেন জ্ঞানাতীত;
সে এক কারণ, কালাদি সকলে
করিছেন নিয়মিত।

জীব হ'তে ব্রহ্ম ভিন্ন, যত দিন
রহিবে তব প্রত্যয়।
ব্রহ্ম চক্র মাঝে ভ্রমিবে নিয়ত,
তাহাতে নাহি সংশয়।
বেদান্ত কথিত পরব্রহ্ম তিনি,
ভোক্তা, ভোগ্য, নিয়ামক;
তিনিই অক্ষর তাঁহারে জানিলে
লভে তাঁ'রে সু-সাধক।
তাঁহে হয় লীন; রহেনা তাহার
জনম মরণ আর;
যোনি-মুক্ত হয়; ভোগ অবসানে
প্রশান্তি হয় আত্মার।
ক্ষর ও অক্ষর ব্যক্ত ও নিগূঢ়
সর্ব্ব আধার তিনি;
তিনি উদাসীন নির্লিপ্ত সদা,
সাক্ষী মাত্র বিশ্বযোনি।
তিনি ঈশ, আর অনীশ তিনিই
সুখ দুঃখ কর্ম্মাধীন;
এই দুই ভাব এক করি তাঁরে
জানি জীব বন্ধ-হীন।
ভোগ্য রূপে যিনি বিশ্ব চরাচর,
ভোক্তা রূপে ঈশ তিনি;
ভোগ অবসানে শান্তি, মুক্ত এক,
নিত্য, নির্লিপ্ত, নির্গুণী।
জ্ঞানী ও অজ্ঞানী, অজাত ও জীব,
ঈশ অনীশ উভে,

* অকস্মাৎ, হঠাৎ। † জীবাত্মা।

ভোক্তার ভোগের বিষয় প্রকৃতি,
ব্যক্ত শক্তিরূপে ভবে ;
এ তিনে জানিলে ব্রহ্মে হয় লীন,
না হয় মরণ জন্ম ;—
অজ পরমাত্মা, বিশ্বরূপ তিনি,
নিষ্ক্রিয়, নিগুর্ণ, শম।
প্রকৃতি, অ-ক্ষরে নিয়মিত করে
সেই দেব, যিনি এক ;
তাঁহার চিন্তনে, একত্ব যোজনে
উদিবে পূর্ণ বিবেক।
তাঁহারে জানিলে ঘুচে ভব-পাশ,
যায় দুঃখ, মোহ ভ্রম ;
দেহ পাত হ'লে লভে দেহ-ধারী
নিত্যানন্দ নিরুপম।
একমাত্র জ্ঞেয় তিনিই সংসারে,
আত্ম-মাঝে বাস তাঁর ;
জীব ও প্রকৃতি, আর সে নিয়ন্তা,
ত্রিভাবে তাঁর বিহার।
এই তিন ভাব অভিন্ন মূলেতে,
সকলি সে ব্রহ্মময়।
এই বুঝি জ্ঞানে এই বুঝি ধ্যানে
জ্ঞানী জন মুক্ত হয়।
যজ্ঞকাষ্ঠ যুগ ঘর্ষণে বিকাশ
প্রজ্বলিত হুতাশন,
ঘর্ষণের অগ্রে ছিল তেজোভাবে
অব্যক্ত সূক্ষ্ম-কারণ।
তেমতি দেহেই আছেন নিগূঢ়
অব্যক্ত কারণ-রূপ
আত্মা তেজোসম, প্রণব মথনে
প্রকাশ হয় স্বরূপ।
তাই এক যজ্ঞ- কাষ্ঠ কর দেহে,
অন্য কাষ্ঠ সে প্রণবে,
ধ্যান নির্ম্মথনে ঘর্ষ পুনঃ পুনঃ,
ব্রহ্ম তেজ দীপ্ত হ'বে।
দধি মধ্যে ঘৃত, তৈল তিল মাঝে,
যজ্ঞ-কাষ্ঠে অগ্নি যথা,—
তপের প্রভাবে বুঝিলে প্রকৃত,
আত্মাতে ব্রহ্মও তথা।
দুগ্ধে সর্পি যথা ব্যাপ্ত সর্ব্বস্থলে,
সর্ব্বব্যাপ্ত তথা তিনি,
আত্ম-বিদ্যা বলে, ধ্যান ও মননে
বুঝিবেন সার যিনি,
অহো! বুঝিবেন সার তিনি।
ওঁ তৎসৎ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সবিতা, আমার বাহ্যজ্ঞান রাশি,
আর সে বিপথী মন,
আন ফিরাইয়া আত্মার মাঝারে,
বিতর পূর্ণ কিরণ।
ইন্দ্রিয় নিচয় যোগ করি মনে,
মনে যুঝি আত্মা সহ,
পরমাত্ম তত্ত্ব হয় যেন লাভ,—
সবিতা, এ শক্তি দেহ।
ইন্দ্রিয়, বিষয় দু'য়েরই কারণ
নিত্য নিরঞ্জন বিভু.
আইস হৃদয়ে সাধু পথ বাহি,
করুণা-নিধান প্রভু।
অগ্নি যেথা জ্বলে, বায়ু রুদ্ধ হয়
প্রাণায়াম যোগে দেহে,
কিম্বা সোমরস পড়ে উথলিয়া,
মূঢ় মন তথা রহে।
সবিতা, তোমার প্রসাদে আশ্রয়
হয় যেন ব্রহ্মপদ,
তা'হলে কখন পূর্ব্ব কর্ম্ম রাশি
ঘটাইবে না সঙ্কট।
বক্ষ গ্রীবা শির করি সমুন্নত,
সমভাবে স্থাপি সবে,

মন ও ইন্দ্রিয় লুপ্ত করি হৃদে,
পার হন ভবার্ণবে
ধীর শান্ত দেহ, স্থির প্রাণবায়ু,
সর্ব্বথা নিষ্ক্রিয় মন,
নাশা পুটে নহে মৃদু ক্ষীণ শ্বাস,
ধন্য, অহো! জ্ঞানীজন।
শুচি, সমতল, বহ্নি-বালু-হীন,
খণ্ড-শিলা-বিবর্জ্জিত,
নীরব নিবাত, মনোরম গুহা
আশ্রয় করিয়া চিত
পরমাত্মা সনে করিবে সংযোগ,
সেই ত প্রকৃত স্থান,
হেন স্থানে যোগী পরমাত্মা মাঝে
আত্মারে মিশায়ে দেন।
যোগস্থ হইলে ব্রহ্ম প্রকাশের
অগ্রে হ'বে আবির্ভূত
নিহার, তপন, ধূম, বায়ু, তেজ,
স্ফটিক, চন্দ্র, বিদ্যুৎ।
ক্ষিতি, জল, বহ্নি, বায়ু ও আকাশ,
হৃদয়ে প্রকাশ হ'লে,
যোগ-অগ্নিময় দেহ হ'তে জরা,
রোগ, শোক যায় চলে।
লঘু হয় দেহ, বর্ণ সমুজ্জ্বল,
কণ্ঠে মধুর স্বর,
মল মূত্র হীন নিরোগ সুবাস;—
চিত্ত হয় ত্যাগ-পর।
ধাতু খণ্ড যথা মৃত্তিকা পরশে
মলিন হইয়া যায়,
সুধৌত হইলে আবার নির্ম্মল
শোভা পায় তেজোময়।
তেমতি সমল আত্মা ধৌত হ'লে
আত্ম-তত্ত্ব-দর্শী জন
বিশুদ্ধ ভাস্বর পরমাত্মা হেরি'
অশোক কৃতার্থ হন।

এক দীপ-শিখা অন্য দীপ মাঝে
প্রবেশি মিশিয়া যায়,
তেমতি জীবাত্মা পরমাত্মা সহ
যুক্ত হ'লে এক হয়।
তখনি যোগীর জন্ম রহিত
বিশুদ্ধ দেবত্ব লাভ,
খসি পড়ে খুলি কর্ম্ম বন্ধ যত,
ঘুচে যায় পরিতাপ
সেই দেব দশ— দিকে বিভাসিত
হিরণ্যগর্ভ তিনি,
প্রথম উদ্ভূত। এ প্রপঞ্চ-মাঝে,
তিনি সর্ব্বভূত যোনি।
যাহা জাত, আর জনমিবে যাহা,
তিনি সব, তিনি সব;
একমাত্র তিনি, অন্য নাহি কিছু,
জ্ঞানে কর অনুভব।
যে দেব অনলে, ওষধি সলিলে,
(যিনি) বিশ্বভুবন-ময়;
তাঁরে বার বার করি নমস্কার,
(যেন) তাঁহাতেই চিত্ত রয়।
যেন তাঁহাতেই চিত্ত রয়॥
ওঁ তৎসৎ।

তৃতীয় অধ্যায়।

যেই অদ্বিতীয় বিরাট মায়াবী,
করে বিশ্ব নিয়মিত;
করে, সর্ব্বভুবন সৃজন পালন
যাঁ'র শক্তি বোধাতীত;
অন্তকালে যাঁর অনন্ত শকতি
বিশ্ব করিবে নাশ;—
তিনি?—তিনি রুদ্র; তাঁহারে জানিলে
মুক্ত হয় কর্ম্ম পাশ।
বিশ্বময় যাঁর মুখ, চক্ষু, বাহু,
বিশ্বময় পদ যাঁ'র,

পৃথিবী আকাশ যাঁহার প্রকাশ,
যিনি সকল সংসার
যিনি দেবগণে, মানবে বিহগে,
বিশ্বাধিপ যিনি ঋষি ;—
তিনি ? তিনি রুদ্র ; বিতরুন মোরে
বুদ্ধি অশুভ-নাশী।
রুদ্র, তব পুণ্যা সু-মঙ্গলময়ী
সুখতমা তনু দিয়া
কর দৃষ্টিপাত, হে শৈলবিহারী,
কলুষ রাশি নাশিয়া।
হে ভূধরচারী ; গিরিত্রাণকারী,
হে প্রলয় বজ্রধর,
ক'র না বিনাশ, মানবে, জগতে,
হ'ক বজ্র শুভকর।
জগতের শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বদেহগত,
বিশ্ব-ব্যাপন্ন যিনি,
এক, গূঢ় সূক্ষ্ম, তাঁহারে জানিলে
অমৃত হ'য়েন জ্ঞানী
এই যে মহান্ সুপ্রকাশ রূপ
অজ্ঞানের পারে স্থিত
পরম পুরুষ, জানি আমি তাঁ'রে
জানি আমি সুনিশ্চিত।
তাঁহারে জানিয়া হ'য়েছি অমর,
মৃত্যু হ'য়েছি পার,
সেই জ্ঞান বিনা মৃত্যু দলিবারে
অন্য পথ নাহি আর।
যাঁহা হ'তে নাহি শ্রেষ্ঠ কি অশ্রেষ্ঠ
সূক্ষ্ম বৃহৎ ভবে,
তিনিই আকাশে স্তব্ধ বৃক্ষ সম,
বিশ্ব পূর্ণ তাঁ'র ভাবে।
তিনি অনাময়, জগৎ অতীত,
তাঁ'রে জানি দুঃখ নাশ ;
না জানিলে তাঁ'রে গতায়াত দুঃখ,
নাহি ঘুচে ভব পাশ।

সর্ব্বানন তিনি, সকল মস্তক,
তিনি সর্ব্ব গ্রীবা যুত,
তিনি সর্ব্ব হৃদে, তিনি সর্ব্বগত,
শিব, ব্যাপ্ত, তিনি পূত।
তিনিই পুরুষ, পরমাত্মা তিনি,
তিনি প্রভু, প্রবর্ত্তক ;
তিনি জ্যোতির্ম্ময়, ঈশান, অব্যয়,
নির্ম্মল-পদ-প্রাপক
অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ পুরুষ প্রধান,
সর্ব্ব হৃদয়ে বাস ;
এক নিষ্ঠ ধ্যানে, মননে দর্শনে,
জ্ঞান রূপে সু-প্রকাশ
সহস্র মস্তক, সহস্র লোচন
সহস্র চরণ-মান,
ভূমি সর্ব্ব দিকে করিয়া আবৃত,
হৃদয়ে তাঁহার স্থান।
হইয়াছে যাহা, অথবা হইবে,
সকলি সেই পুরুষ ;
অমৃত, ঈশান ;— তাঁহার স্মরণে
বিগত সর্ব্ব কলুষ
পাণি পদ অক্ষি, শ্রুতি শিরোমুখ
সর্ব্বত্র বিরাজে তাঁর,
সর্ব্বত্র আবরি সে মহা-পুরুষ
করিছেন অধিকার।
তাঁহারি প্রভাবে ইন্দ্রিয়ে শকতি,
সহজে শকতি শূন্য ;
সকলের প্রভু, অসীম, ঈশান
তিনি বৃহৎ, শরণ্য।
বাহ্য বিষয় প্রকৃত বলিয়া
অবিদ্যা জনিত ভ্রম,

* সহস্র শীর্ষা পুরুষঃ ইত্যাদি। এই মন্ত্রের নানারূপ অর্থ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে একটী মাত্র এ স্থলে দেওয়া হইল।

ইন্দ্রিয় নিচয় পারে কি বুঝিতে
বাহ্য বিষয়-ক্রম।
জীব অনুভূতি যে ভাবে বিষয়
যবে করে অনুভব,
সে ভাবে তখন বিশ্ব প্রতিভাত,
সেই ভাবে সমুদ্ভব।
নবদ্বার-দেহে অবিদ্যা নাশক
বিরাজেন যিনি বশী;
বহির্মুখ-গত তাঁহারই বিভূতি
বাহ্য বিষয় রাশি।
কর কি চরণ, শ্রবণ লোচন,
কিছুই নাহি বিভব;
তিনি বেগবান, অতুল, গ্রাহক,
শুনেন দেখেন সব।
তিনিই জানেন জ্ঞেয় যাহা কিছু
তাঁহারে জানে না কেহ,
তিনি সর্ব্ব ঘটে প্রকটিত এক
বিস্তৃত—বিরাট-দেহ।
নিহিত হৃদয়ে, ক্ষুদ্র হ'তে ক্ষুদ্র,
বৃহৎ, বৃহৎ হ'তে;
ঈশ অকাম— তাঁহারই প্রসাদে
দৃশ্য হ'ন জীব-চিতে।
জানি আমি সেই, অজর, পুরাণ,
সর্ব্ব ব্যাপ্ত বিধাতারে;
অজাত স্বয়ম্ভু সর্ব্ব আত্মরূপী,
জানি আমি, জানি তাঁ'রে।
সেই সর্ব্ব ব্যাপ্ত বিধাতারে।
সেই সর্ব্ব ব্যাপ্ত বিধাতারে॥
ওঁ তৎসৎ।

চতুর্থ অধ্যায়।

যেন এক শকতি বর্ণ * রহিত
স্বার্থ শূন্য লীলাময়,
বিবিধ শক্তিতে বিষয়ে বিষয়ে
নানা রূপে ব্যক্ত হয়,
যা' হ'তে উদ্ভব যা' হ'তে বিলয়,
শুভ বুদ্ধি দিন্ মোরে;
যাহাতে অশুভ নাহি পরশিবে,
কাটিবে মোহের ডোরে।
তিনি অগ্নি বায়ু আদিত্য চন্দ্রমা
উজ্জ্বল তারকা তিনি,
তিনি ব্রহ্ম সার, আপঃ প্রজাপতি
তাঁ'রে জানি মুক্ত জ্ঞানী।
তিনি স্ত্রী, তিনি পুং, তিনি উভ যোনি
অযোনি তিনিই সত্য,
তিনি জরাগ্রস্ত, দণ্ড হস্তে করি
কম্পিত গতি নিত্য।
তিনি, কুমার কুমারী যুবক যুবতী
পরম আনন্দময়,
এ বিশ্ব সংসারে বিশ্বরূপ তিনি
ইতস্ততঃ সমুদয়।
নীল পতঙ্গ, শুকাদি বিহঙ্গ,
তড়িৎ—জড়িত ঘন,
ঋতু, পয়োনিধি, ব্যাপক, অনাদি,
তাঁহাতে জাত ভুবন।
অজ এক জন, * সে ত্রিগুণময়ী
প্রকৃতিরে ভোগ করে;
অন্য অজ † তা'রে পরভুক্ত বলি
দূর হ'তে পরিহরে।
দুইটী বিহঙ্গ সদা সহচর
সখা ভাবে এক বৃক্ষে;
একে খান ফল, অন্যে অনাহারী
সাক্ষী সম দেখে চক্ষে।
এক বৃক্ষে বসি শক্তি হীনতায়
পুরুষ শোকের বশ,
কিন্তু তিনি যবে হেরেন অপরে
অ-শোক হন নীরস।

---

* বর্ণ—রূপাদি বিষয়।

* জীবাত্মা। † পরমাত্মা।

যিনি সে অক্ষর শুদ্ধ শ্রেষ্ঠতম
আকাশ সমান জনে
জানে না, বুঝে না, খর মন্ত্র ত'ার
ঝঙ্কারিবে কোন্ তানে ?
দেবতা সকল যাঁহার আশ্রিত
তাঁহারে জানিবে যিনি,
সেই ত কৃতার্থ হইবে নিশ্চিত,
মুক্ত হ'বে সেই জ্ঞানী।
মায়াই প্রকৃতি, মায়াবী মহেশ,
যিনি ব্যাপ্ত চরাচরে ;
যিনি কারণের নিয়ন্তা কারণ,
যাঁহে বিশ্ব লীন পরে,
যিনি বরপ্রদ, পূজ্য অধিপতি,
তাঁহারে লভিলে শান্তি ;
তিনি দেবগণে উদ্ভব প্রভব,
তাঁ'র জ্ঞানে ঘুচে ভ্রান্তি।
রুদ্র সে মহর্ষি, ক-নাম দেবতা,
হিরণ্য-গর্ভ-রূপ,
দ্বিপদ চৌপদ সর্ব্ব-নিয়ামক,
পূজিব তাঁ'র স্বরূপ।
সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্ম, অবিদ্যার মাঝে
স্থিত যিনি বহু মূর্ত্তি,
যিনি স্রষ্টা এক, বিশ্ব ব্যাপ্ত যিনি,
মঙ্গলময়-কীর্ত্তি।
স্থিতি কালে যিনি ব্রহ্মাণ্ড পালক
গূঢ়রূপে সর্ব্বগত,
যাঁহারে জানিয়া ব্রহ্মর্ষি, দেবতা
মৃত্যুপাশ হ'তে মুক্ত।
ঘৃতোপরি মণ্ড সম সূক্ষ্ম যিনি,
শিব, গূঢ় সর্ব্বভূতে,
তিনি অদ্বিতীয় ; মুক্ত হয় দেহী
তাঁহারে হেরিলে চিতে।
তিনি বিশ্ব কর্ম্মা বিরাট মহান্,
সর্ব্ব হৃদয়ে গুপ্ত,
হৃদয়ে মননে দর্শনে বিজ্ঞানে
তাঁ'রে জানি হও মুক্ত।
জ্ঞানের উদয়ে নাহি থাকে দিবা,
নাহি, নাহি থাকে রাত্রি,
সৎ কি অসৎ সবিতা চন্দ্রমা,
নাহি থাকে ধরিত্রী।
সুমঙ্গলময় থাকেন কেবল
অক্ষর পুরাণ জ্ঞাতা ;
তিনি নহে উর্দ্ধে তিনি নহে নিম্নে
নহে মধ্যে সেই ধাতা।
প্রতিমা তাঁহার নাহিক, নাহিক—
মহাযশ তাঁ'র নাম,
নাহি তাঁর রূপ, হৃন্মর্ম্মস্থলে
জ্ঞানে তাঁর পরিণাম।
সংসারের ভয়ে ভীত হয়ে নর
লইছে শরণ তব,
চিদানন্দময় রূপে দীন জনে
রক্ষা কর ভব-ভব।
রুদ্র, তব সেই দক্ষিণ বদন
পবিত্র করুক মোরে
পুত্র পশুগণ করনা নিধন
ডাকি তোমা ভক্তি ভরে।
নাথ, ডাকি তোমা ভক্তি ভরে ॥
ওঁ তৎসৎ।

পঞ্চম অধ্যায়।

অক্ষর ব্রহ্মেতে বিদ্যা ও অবিদ্যা
উভয় নিহিত রয় ;
অবিদ্যা সংসারী, বিদ্যা মোক্ষ হেতু,
অক্ষর পৃথক হয়।
সর্ব্ব কারণের, সমষ্টি-রূপের,
সর্ব্ব বীজের ঈশ্বর,
কনক বরণ হিরণ্য গর্ভেরে
প্রভবিলা তমোহর।

এক এক জাল বহুধা করিয়া
ফেলিছেন যেই দেব,
তিনিই আবার লইছেন টানি
সংযমিয়া সে বিক্ষেপ।
আদিত্য যেমন ঊর্দ্ধ অধঃ পার্শ্ব
দিঙ্মণ্ডল করে দীপ্ত,
পরমাত্মা তথা কারণ রূপেতে
প্রকাশেন বিশ্ব গুপ্ত।
বস্তুর, স্বভাব গুণ, ধর্ম্ম, যত
যাঁহা হ'তে উৎপন্ন,
সকল ব্যাপিয়া অধিষ্ঠাতা যিনি
সকল হ'তে অভিন্ন;
উপনিষৎ মাঝে তিনিই নিহিত
সর্ব্বময় ব্রহ্মযোনি,
পূর্ব্ব দেবগণ, ঋষিগণ সবে,
তাঁহারে জানিয়া জ্ঞানী।
ত্রিগুণ সংযোগে ফল-কর্ম্ম-ধাতা,
ফল-কর্ম্ম-ভোগী তবু,
ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান যাঁহার বিধান,
তিনিই অকর্ম্ম বিভু।
নির্ব্বিকার তিনি, সত্ত্ব রজ তমঃ
ত্রিগুণে সগুণ হন;
ফল-কর্ম্ম-প্রভু ফল-ভোগী তবু
কর্ম্মপথে বিচরণ।
তিনিই কারণ, তিনি কার্য্যরূপ
তিনি দাতা, ভোক্তা তিনি;
অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ, জ্যোতির্ম্ময় তিনি,
অতি সূক্ষ্ম, অভিমানী।
আত্মা রূপে তিনি, বুদ্ধিরূপে তিনি,
সংকল্প জনিত রূপ;
স্থূল সূক্ষ্ম তিনি জ্ঞেয়, জ্ঞাতা, জ্ঞান,
ত্রিবিধ তাঁ'র স্বরূপ।
তিনি নহেন স্ত্রী, পুরুষ নহেন,
তিনি নহে নপুংসক;
সর্ব্বভাবে দেহে করেন ভ্রমণ,
তিনি সর্ব্ব নিয়ামক।
বাসনা ও মোহ, দৃষ্টি, স্পর্শ বশে
পায় আত্মা জন্ম বৃদ্ধি;
কর্ম্ম অনুসারে আত্মা রূপ ধরে,
অন্ন জল বসে বৃদ্ধি।
প্রাক্তন কর্ম্মের, আর সংস্কারের
ফলে স্থূল সূক্ষ্ম দেহ;
আত্মা করে যোগ পূর্ব্ব কর্ম্ম গুণ
শারীর গুণের সহ।
এ হেতু জনম, এ হেতু করম,
কর্ম্মফল এই হেতু;
এ চক্র তরিতে সেই আত্ম জ্ঞান
এক মাত্র হয় সেতু।
অনাদি অনন্ত বহু রূপ যাঁ'র
এ বিশ্বের স্রষ্টা যিনি,
যিনি অদ্বিতীয় অরূপ, তাঁহারে
জানি মুক্ত হয় জ্ঞানী।
তিনি ভাবময়, তিনিই ভাবুক,
অরূপ বিশ্বরূপ;
ভাবাভাবকর, মঙ্গল নিধান,
কে জানে তাঁর স্বরূপ?
জানিয়াছে যেই জন, দেহ মুক্ত সেই হয়।
নাম, রূপ, গুণ, কর্ম্ম, ডুবে যায় সমুদয়॥
ওঁ তৎসৎ।

ষষ্ঠ-অধ্যায়।

কি কারণ ব্রহ্ম-চক্র অবিরাম করিছে ভ্রমণ?
কোন ভ্রান্ত কহে কাল, কেহ কহে স্বভাবই কারণ।
কিন্তু যিনি কাল-কর্ত্তা, যিনি জ্ঞাতা, যিনি সর্ব্বময়,
পঞ্চভূত যাঁর কর্ম্ম, তিনি বিশ্ব-কারণ নিশ্চয়।
যিনি একমাত্র বস্তু, এই বিশ্বে যিনি স্বপ্রকাশ,
প্রকৃত কারণ তিনি, কার্য্যরূপে তাঁহারই বিকাশ।
ক্ষিতি জল অগ্নি বায়ু, ব্যোম মন, বুদ্ধি অহঙ্কার,
কাল আর বিষয়ের, আত্ম-মাঝে করিয়া সঞ্চার,

কর্ম্ম করি, যিনি কর্ম্ম ঈশ পদে করেন অর্পণ,
তাঁহার সে কর্ম্ম রাশি, বন্ধ-হেতু না হয় কখন।
ত্রিগুণ জনিত কর্ম্ম, হয় তাঁর অকর্ম্ম সমান,
কর্ম্মক্ষয়ে তাঁর আত্মা, ঈশপদে পায় চিরস্থান।
আদি তিনি, সংযোগ-কারণের নিমিত্ত কারণ,
কালের অতীত তিনি, বিশ্বরূপ, অরূপ অ-মন ; *
কার্য্য ও কারণ তিনি, অন্তরস্থ, দেশকাল হীন,
প্রপঞ্চ বিকৃতি তাঁ'র, তাঁরে জানি ব্রহ্মে হও লীন।
ঈশ্বরের মহেশ্বর, দেবতার পরম দেবতা,
প্রভুগণে মহাপ্রভু, শ্রেষ্ঠ হ'তে যিনি শ্রেষ্ঠ ধাতা ;
তাঁ'রে জানিয়াছি আমি হৃদয়ের নিভৃত গুহায়,
হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে জ্ঞানরূপে তাঁহার উদয়।
ইন্দ্রিয় বিহীন তিনি, নাহি তাঁর মূর্ত্তি কিবা দেহ,
তাঁহার সমান নাই, তাঁহা হ'তে শ্রেষ্ঠ নাহি কেহ।
বিচিত্র শকতি তাঁর ; শক্তিময়, কহিছেন শ্রুতি,
জ্ঞানময়, স্বপ্রকাশ ; জ্ঞান শক্তি তাঁহার বিভূতি।
তাঁহার নিয়ন্তা নাই, সেই দেব সর্ব্ব নিয়ামক,
নাহিক প্রতিমা তাঁর, তিনি সর্ব্ব কারণ, চালক।
উর্ণনাভ যেইমত, সৃজি তন্তু, ঢাকে নিজ দেহ,
সেইমত সেই দেব, সৃজি বিশ্ব, আবরে স্বদেহ।
সর্ব্বভূতে গূঢ় তিনি, সর্ব্ব ব্যাপ্ত, আবৃত সকলে,
কর্ম্মাধ্যক্ষ, বি-নিগু'ণ, সাক্ষীরূপে হৃদি কেন্দ্রস্থলে।
যিনি একমাত্র বীজ, যিনি বৃক্ষ, শাখা ও পল্লব,
এক হ'য়ে বহু তিনি ; মুক্ত হও করি অনুভব।
আত্ম মাঝে তাঁ'রে নিত্য যেই জ্ঞানী করে দরশন,
সেই জ্ঞানী হয় মুক্ত, অন্যে কভু না হয় কখন।
প্র। অনিত্যের মাঝে নিত্য, যেই দেব চৈতন্য চেতনে,
অচেতনে অচেতন, করি' কাম্য-বিধান ভুবনে,
যিনি কারণের পারে, অহো ! তাঁরে কেমনে জানিব ?
উ। সাংখ্য-যোগে † মগ্ন হ'য়ে,জ্ঞানরূপে তাঁহারে চিনিব।
তথা না প্রকাশে সূর্য্য, না প্রকাশে চন্দ্রমা তারকা,
না চমকে ক্ষণপ্রভা, তথা নাহি বরষে করকা,
নাহি গর্জ্জে জলধর, তথা নাহি দহে হুতাশন,—
প্রকাশে বিপুল বিশ্ব, তাঁ'র জ্যোতি নেত্র বিনোদন।
তিনি এক তিনি হংস, অবিদ্যারে করেন বিনাশ,
নির্ম্মল হৃদয়ে তিনি, অগ্নিরূপে দহেন অধ্যাস।
তাঁহারে জানিলে মুক্তি, অন্য পথে নাহি মুক্তি কভু,
তিনি একমাত্র জ্ঞান, তিনি জ্ঞাতা, তিনি জ্ঞেয় বিভু।
বিশ্বকর্ম্মা বিশ্ববিৎ, সর্ব্বগত, তিনি আত্মযোনি,
কালকার ক্ষেত্রজ্ঞাতা, আদি শক্তি, নিগু'ণ ও গুণী।
সংসারের স্থিতি-বন্ধ মোক্ষ হেতু, তিনিই প্রধান,
তন্ময়, সংস্থিত তিনি, তিনি শান্ত অনন্য-সমান।
তিনি গোপ্তা,তিনি গুপ্ত,ব্যক্ত তিনি, নিত্য নিরঞ্জন,
তিনি বিনা জগতের, অন্য কিছু নহেক কারণ।
প্রথমে ব্রহ্মারে সৃজি, বেদ-ধনে দিয়াছেন তাঁরে,
মুমুক্ষু হইয়া আমি স্মরিতেছি সেই সারাৎসারে।
নিষ্কল নিষ্ক্রিয় শান্ত, নিরঞ্জন নিগু'ণ নির্দ্দোষ,
জ্যোতির্ম্ময় সেই দেবে, জানি আমি সদা আশুতোষ।
মানব যেদিন ব্যোম, চর্ম্ম সম করিবে বেষ্টন, *
সেইদিন ব্রহ্মজ্ঞান বিনা হ'বে দুঃখের মোচন।
বিদ্বান্ শ্বেতাশ্বতর, তপোবলে, দেবের দয়ায়,
পরম পবিত্র আর, ঋষিগণ সেবেন যাঁহায়,
এ হেন ব্রহ্মের জ্ঞান লাভ করি, আশ্রমি জনেরে
কহিলা সে পুণ্য কথা ; হে সাধক, শুন ভক্তিভরে।
পুরাকালে প্রকাশিত,　　বেদান্ত মাঝে নিহিত,
　　ব্রহ্মজ্ঞান সুপবিত্র ধন ;
অশান্ত অযোগ্যজনে,　　দুষ্ট শিষ্য পুত্রগণে,
　　না করিবে দান কদাচন।
দেবে যাঁর ভক্তি অতি,　　গুরু পদে রত মতি,
　　ব্রহ্মজ্ঞান বিতরিবে তাঁরে ;
তা'হলে সে দীপ্তিমান　　জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মজ্ঞান
　　বিনাশিবে অজ্ঞান আঁধারে।
　বিভাসিত করি তাঁর হৃদয় কন্দরে।
ওঁ তৎসৎ।
শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ সমাপ্ত।
শ্রীশশধর রায়।

* বিবিধ শক্তি ও ভেদজ্ঞান যুক্ত সংকল্পাদিময় মন যাঁহাতে নাই, তিনি অমনা।

† সাংখ্য—বস্তুতত্ত্ব বিচার। যোগ—ব্রহ্মে চিত্ত বৃত্তির স্থিরীকরণ।

* অর্থাৎ মনুষ্য এই কার্য্য কখনই করিতে পারিবে না।

ভারতে দুর্ভিক্ষ। (১)

বিবর্ত্তনবাদী বলেন, পৃথিবী ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। পাশ্চাত্য প্রদেশ সমূহের ইতিহাস আলোচনা করিলে ইহার সত্যতা উপলব্ধি হয়। কিন্তু সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম আছে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সেই ব্যতিক্রমের কথা খাটে। পৃথিবীর সমগ্রদেশ জ্ঞানানুশীলনে, শিল্পবাণিজ্যের উৎকর্ষে ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া উঠিতেছে, ক্ষুধিত, ক্লিষ্ট ভারতবর্ষ চিরভিক্ষা পাত্র হস্তে জগতের নিকট প্রার্থীরূপে দণ্ডায়মান। দুর্ভিক্ষ-দানবের উষ্ণ নিশ্বাসে সোণার ভারত ভস্মস্তূপে পরিণত হইতে বসিয়াছে। চীরবাস-পরিহিত,নগ্ন,অভুক্ত অর্দ্ধভুক্ত, কঙ্কালাবশিষ্ট দুর্ভাগ্যের আর্ত্তনাদ চতুর্দ্দিক! মাতা দুগ্ধপোষ্য শিশু সন্তানকে রাজপথে ফেলিয়া জঠর-জ্বালায় পাগলিনীর ন্যায় বন হইতে বনান্তরে লতা পাতার অন্বেষণে ধাবিতা হইতেছে। অনন্যসহায়া বনিতাকে শ্বাপদ-শার্দ্দূল-বিমর্দ্দিত ঘন তরু-চ্ছায়ান্ধকারময় বিজন অরণ্যে ত্যাগ করিয়া দুর্ভাগ্য স্বামী-মুষ্টিমেয় অন্নের জন্য উন্মত্তের ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে! চলচ্ছক্তি-হীন স্থাবর পিতাকে বন্যজন্তুর হস্তে সমর্পণ করিয়া জীর্ণ-যুবক-পুত্র কোথায় চলিয়া গিয়াছে, মুগ্ধ অবোধ শিশু মুমূর্ষু জননীর শীর্ণ, নিস্পন্দ-বক্ষে পড়িয়া চিরশুষ্ক স্তন্য লইয়া টানাটানি করিতেছে! চতুর্দ্দিকে এই শ্মশান দৃশ্য,চতুর্দ্দিকে বুভুক্ষা রাক্ষসীর লেলিহান জিহ্বা ধক্ ধক্ জ্বলিতেছে। কত সুন্দর জনপদ সেই জলন্ত বহ্নিতে দাবদগ্ধ অরণ্যানির ন্যায় পুড়িয়া ছারখার হইতেছে!

কিন্তু ভারতবর্ষের অবস্থা চিরদিন এরূপ হীন ছিল না। মুসলমান রাজত্বে ভারতীয় প্রজা দুইবেলা উদর পূর্ণ করিয়া খাইতে পাইত, টাকায় ৮আট মণ চাউল, ২মণ আটা, ১৬সের তৈল মিলিত, দেশের পর্য্যাপ্ত শস্য দেশেই থাকিত, অবাধ-বাণিজ্যের ধুয়ায় ক্ষেত্রের বীজগুলি-শুদ্ধ বিদেশে রপ্তানি হইত না। দেশের শ্রমজাত শিল্প-দ্রব্যে সকল অভাব পূর্ণ হইত। লজ্জা নিবারণের বস্ত্র, সেলায়ের সূচিটীর জন্য ম্যাঞ্চেষ্টার বা সেফিল্ডের মুখাপেক্ষী হইতে হইত না। বড় বেশী দিনের কথা নয়, দুই শতাব্দী পূর্ব্বেও ভারতবর্ষ ধরিত্রীর ধন-ভাণ্ডার বলিয়া সর্ব্বত্র প্রথিত ছিল। মধুকর-গুঞ্জিত মুঞ্জরিত চূত বৃক্ষের ন্যায় নানা দেশীয় বণিকগণের কলরবে সর্ব্বদা মুখরিত থাকিত। ইউরোপীয়গণের বিশ্বাস ছিল, ভারতবর্ষ কল্পতরু, পথের ধূলির ন্যায় তথায় ধনরত্ন পড়িয়া আছে, খুঁটিয়া লইতে পারিলে দৈন্য-দারিদ্র্য ঘুচিয়া যায়। প্রলুব্ধ বণিকগণ রত্নের আশায়, তরণী সাজাইয়া, অস্ত্র বাঁধিয়া দলে দলে ভারতবর্ষ আচ্ছন্ন করিতে লাগিল। অচিরে বাণিজ্য ব্যাপার যুদ্ধব্যসনে পরিণত হইল। অমিততেজা ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানি বাহুবলে ফরাশি, ওলন্দাজ প্রভৃতি অন্যান্য বণিকদিগকে বিতাড়িত করিয়া বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিলেন। ভারত-লক্ষ্মীও স্বীয় রত্নভাণ্ডার সেই অজ্ঞাতকুলশীল বণিক-রাজের পদতলে খুলিয়া দিলেন। কিন্তু তাহাদের দুরাকাঙ্ক্ষা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বাণিজ্য বিস্তারের ছলে রাজ্য বিস্তার আরব্ধ হইল। কোম্পানির অধ্যক্ষ-

গণ বৃটিশরাজকে বার্ষিক একটা নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি দিয়া ভারতবর্ষে যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। সেরূপ পৈশাচিক অত্যাচার পৃথিবীর কোন সভ্যদেশে অনুষ্ঠিত হয় নাই। এখনও সে বীভৎস কাহিনী পাঠ করিলে আমাদের হৃদয়ের রক্ত শুকাইয়া যায়, চিত্ত-বৃত্তি নিচয় স্তম্ভিত হয়। ইংরাজ চরিত্রে ঘোর ঘৃণা জন্মে। ভারত-প্রত্যাবৃত্ত কোম্পানির কর্ম্মচারিগণের অবস্থা দেখিয়া ইউরোপীয়দিগের পূর্ব্ব বিশ্বাস আরও বদ্ধমূল হইয়াছিল। কোম্পানির কর্ম্মচারিগণকে তাহারা 'নবাব' আখ্যায় অভিহিত করিত। বাস্তবিক তাঁহারা এত ধনবান হইয়াছিলেন যে, নবাবের ন্যায় জাঁকজমকে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। মানব জ্ঞানে যত প্রকার অত্যাচারের সৃষ্টি হইতে পারে, কোম্পানির অর্থগৃধ্নু কর্ম্মচারিগণ তাহার অনুষ্ঠানে কোনই ত্রুটী করেন নাই। সেই ভীষণ অত্যাচারের পরিণাম ১৭৭০ খ্রীঃ ভীষণ দুর্ভিক্ষ। ইহাই বাঙ্গালার ইতিহাসে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে প্রসিদ্ধ। সেই দুর্ভিক্ষে বাঙ্গালার এক তৃতীয়াংশ লোক কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল। বৃটিশ শাসনের পূর্ব্বে এদেশে দুর্ভিক্ষ ছিল না, এ কথা সপথ করিয়া বলা যায় না। কিন্তু আজ কাল দুর্ভিক্ষের যেরূপ ছড়াছড়ি, সেরূপ ছিল না। অজন্মাহেতু লোকের ক্লেশ হইত, পুনরায় শস্য জন্মিলে সে ক্লেশের অবসান হইত। সে কালের প্রবাদ বাক্য দুর্ভিক্ষমল্লং স্মরণং চিরায়ুঃ। সে দুর্ভিক্ষ স্থান বিশেষে নিবদ্ধ থাকিত, সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বগ্রাসী হইত না। সে দুর্ভিক্ষের আরও একটু বিশেষত্ব ছিল, কোন বিশেষ কারণে খাদ্য বস্তুর অভাব হইত, অর্থের অভাব হইত না। পথের দুর্গমতা ও অন্যান্য কারণে অর্থের বিনিময়েও আহার্য্য দ্রব্য মিলিত না। 'আনন্দ-মঠে' দস্যুপতির মুখে আমরা শুনিতে পাই 'সোণা রূপা চাই না, তিনদিন উপবাসী আছি, সোণা রূপা লইয়া এক মুষ্টি চাউল দাও।' একথা অতিরঞ্জিত নহে। শস্যের অভাবে লোকে লতা, পাতা, মানকচু সিদ্ধ করিয়া খাইত, বনের পশু ধরিয়া অর্দ্ধদগ্ধ করিয়া উদর পূর্ত্তি করিত, পেটের জ্বালায় হিতাহিত জ্ঞান-শূন্য প্রেতকল্প নর-নারী হিংস্র জন্তুর ন্যায় মহামাংস খাইতেও কুণ্ঠিত হইত না। একালের দুর্ভিক্ষের স্বরূপ স্বতন্ত্র। চিরদারিদ্র্য শস্যনাশের ফল নহে, অর্থ হ্রাসের পরিণাম। সঞ্চিত অর্থ থাকিলে অজন্মার বৎসরে লোকে কোন প্রকারে বিদেশ হইতে শস্য আমদানি করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে। দুর্ব্বৎসরে শস্য মহার্ঘ হয়, অনায়াস-লভ্য থাকে না, কিন্তু একবারে অপ্রাপ্য হয় না। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান-কালের দুর্ভিক্ষ অর্থের, শস্যের নহে। ভূত ও বর্ত্তমান কালের দুর্ভিক্ষের প্রভেদ এইরূপ। কোম্পানির রাজ্যাধিকারের পূর্ব্বে ১৭৪৫ খ্রীঃ পর্য্যন্ত ১১শতাব্দীতে ২, ১৩শে ১, ১৪শে ৩, ১৫শে ২, ১৬শে ৩, ১৭শে ৩, ১৮শে ৪টী দুর্ভিক্ষের ইতিহাস জানা যায়। কোম্পানির রাজত্বে উৎপীড়ন, লুণ্ঠন ও অত্যাচারের চরম হইলেও প্রজার অবস্থা নিতান্ত হীন হয় নাই। সিপাহী যুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত এদেশে টাকায় এক মণ চাউল পাওয়া যাইত। এক্ষণে একমণ চাউলের মূল্য ৩৲টাকা। তখন দুর্ভিক্ষের কারণ ছিল—মোগল রাজত্ব ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। ইংরাজ রাজত্বের সূচনা—সর্ব্বত্র যুদ্ধবিগ্রহ, বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা। এক্ষণে সে সব কারণ বর্ত্তমান নাই। দেশে গভীর শান্তি বিরাজিত, দুর্ভি-

ক্ষেরও বিরাম নাই। বিগত একশত বৎসরের ইতিহাসে দৃষ্টিপাত করিলে জানা যায়, এই শতাব্দীর প্রথম পাদে ৫টী দুর্ভিক্ষে দশ লক্ষ, দ্বিতীয় পাদে দুইটী দুর্ভিক্ষে ৫ লক্ষ, তৃতীয় পাদে ২টী দুর্ভিক্ষে ৫০ লক্ষ প্রাণী কালকবলিত হইয়াছে। শেষপাদে ছোট বড় ১৮টী দুর্ভিক্ষে অন্যূন ২ কোটী জীবের ভবযন্ত্রণার মোচন হইয়াছে। ১৮৬০—১৯০০ পর্য্যন্ত ৪০ বৎসরে ১০টী দুর্ভিক্ষের বিবরণ জানা যায়।

১৮৬০ উত্তর ভারতে দুর্ভিক্ষ,—১৮৫৭খ্রীঃ সিপাহীযুদ্ধে ভারতবর্ষ বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ১৮৫৮খ্রী ১লা নভেম্বর মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বহস্তে ভারত শাসনভার গ্রহণ করেন। সিপাহী যুদ্ধে গবর্ণমেণ্টের প্রায় ৪০ কোটি টাকা ঋণ হইয়াছিল। তথাপি লর্ড ক্যানিং বাহাদুরের ক্ষিপ্রকারিতায় শীঘ্রই দুর্ভিক্ষের দমন হয়। মৃত্যু সংখ্যা ২০০০০০। ১৮৬৬—৬৭ উড়িষ্যা ও বিহারে দুর্ভিক্ষ—রাজ-কর্ম্মচারিগণের অমনোযোগে উড়িষ্যা-দুর্ভিক্ষের পরিণাম কি লোমহর্ষণ হইয়াছিল, ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। অবাধ-বাণিজ্য (free-trade), ও সংরক্ষণ (protection) উভয়ের সামঞ্জস্য না হইলে, স্থান ও সময় বিশেষে কি কুফল ঘটে, এই উড়িষ্যা দুর্ভিক্ষে তাহাও পরিলক্ষিত হইয়াছে। দুর্ভিক্ষের পূর্ব্ব ৬বৎসর বার্ষিক ২০০০০ টন বা প্রায় ৫৪৪৫০০ মণ চাউল উড়িষ্যা হইতে রপ্তানি হইয়াছে। ১৮৬৪খ্রীঃ রপ্তানির পরিমাণ অত্যাধিক বৃদ্ধি হইয়া প্রায় ৯৮০০০০ মণে উঠিয়াছিল। অবাধ-বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করা নিষিদ্ধ বলিয়া রপ্তানি হ্রাসের সকল প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইতে লাগিল। রপ্তানির আধিক্যে ও চতুর্দ্দিক অলঙ্ঘ্য সাগর ও নিবিড় পন্থা-বিহীন অরণ্য-বেষ্টিত উড়িষ্যার প্রাকৃতিক অবস্থান হেতু আমদানি সুলভ না হওয়ায়, আহার্য্যদ্রব্য দুর্মূল্য এবং ক্রমশঃ দুর্ভিক্ষের প্রকোপ অনুভূত হইতে লাগিল। সংবাদ পত্রের সম্পাদক ও ব্যবসায়িগণ উড়িষ্যায় চাউল আমদানি করিবার জন্য গর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের নিদ্রাভঙ্গ হইল না। বালেশ্বরের ম্যাজিষ্ট্রেট কমিশনরকে লিখিলেন, এ অঞ্চলে ধান্যের অবস্থা শোচনীয়, প্রজা মুদ্রার পরিবর্ত্তে ধান্য কর্জ্জ করিতেছে। জমিদারগণ লাটের খাজনা দিতে অপারক। কমিশনর ও রেভেনিউ বোর্ড কালেক্টরের রিপোর্টে দৃকপাত করিলেন না। নানা দিক হইতে উড়িষ্যার আসন্ন বিপদের কথা কর্ত্তৃপক্ষের কর্ণগোচর হইতে লাগিল। স্বয়ং বঙ্গেশ্বর সার সিসিল বীডন (Sir Cecil Beadon) উড়িষ্যায় গিয়া দরবার করিলেন, তাঁহারও নিকট দুর্ভিক্ষের প্রকোপ প্রতিভাত হইল না। ইংলিশম্যানে 'উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষ' শীর্ষক মন্তব্য বাহির হইলে ভারত-গবর্ণমেণ্ট ১৮৬৬ খ্রীঃ ১০ই মে বঙ্গেশ্বরকে টেলিগ্রাম করিলেন। কোন উত্তর না পাইয়া পুনরায় ১০ই জুন লর্ডলরেন্স লিখিলেন—চেম্বর অব কমার্স (Chamber of Commerce) দুর্ভিক্ষের যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা নিতান্ত ভয়াবহ, অচিরে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের উত্তর প্রার্থনীয়। সার সিসিল উত্তর দিলেন, চেম্বর-প্রদত্ত বিবরণ ঠিক নয়। এইরূপ কার্য্য-শৈথিল্যে গ্রীষ্ম অতিবাহিত হইল, বর্ষার প্রারম্ভে নদ, নদী তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল, প্রাবৃটের অবিরল জলধারায় পথ, ঘাট, কর্দ্দম-লিপ্ত হওয়ায় উড়িষ্যার গমনা-

গমন বিপদসঙ্কুল হইল, তখন অসহায় উড়িষ্যাবাসী সত্য সত্যই অরণ্যে, পর্ব্বতে, নদী-সৈকতে, রাজপথে পড়িয়া শৃগাল কুকুরের ন্যায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। এই দুর্ভিক্ষে দশ লক্ষ উড়িষ্যাবাসী ও সিংহ-ভূম মানভূম প্রভৃতি প্রদেশের ৩ লক্ষ অধিবাসী কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। বঙ্গেশ্বর সার সিসিলের অপরিনামদর্শিতাই যে এই বিপুল প্রজা নাশের কারণ, তাহার সন্দেহ নাই। লর্ড লরেন্স যদি বীডনের কথায় কর্ণপাত না করিয়া, সময়ে প্রতিকার-প্রয়াসী হইতেন, তাহা হইলেও মঙ্গল হইত। ১৮৬৭ খ্রীঃ ২৫ শে জুলাই ভারত-সেক্রেটারি ষ্ট্রাফোর্ড নর্থকোট (Sir Strafford Northcote লিখিয়াছিলেন—"I am obliged to say that Sir Cecil Beadon did not upon this occasion, show the energy or the sagacity which might have been expected from an officer of such high distinction and such well-deserved reputation."—এই দুঃসময়ে বীডনের ন্যায় উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী পদোচিত শক্তি সামর্থ্য প্রকাশে পরাঙ্মুখ হইয়াছিলেন, ইহা স্বীকার করিতে আমি বাধ্য।

বিহার দুর্ভিক্ষে রিলিফ কার্য্যে ২,৩০,০০০৲ টাকা ব্যয় ও প্রায় ১৩৫০০০ লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

১৮৬৯ খ্রীঃ উত্তর ভারতে দুর্ভিক্ষ—লর্ড লরেন্স নিয়ম করেন, যাহাতে অন্নাভাবে প্রজা নাশ না হয়, তদ্বিষয়ের তত্ত্বাবধান জন্য গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ প্রত্যেকেই দায়ী।

১৮৭৪ খ্রীঃ বঙ্গ বিহারে দুর্ভিক্ষ—উড়িষ্যা দুর্ভিক্ষে গবর্ণমেণ্ট যে অভিজ্ঞতা লাভ করেন, তাহারই ফলে বঙ্গ ও বিহারে অন্নকষ্টে প্রজা হানি হয় নাই। দুর্ভিক্ষ প্রশমন ও প্রজা রক্ষা নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট যথোচিত চেষ্টা করিয়াছিলেন। তদানীন্তন ষ্টেট-সেক্রেটারি আরল অব আরগিল (Earl of Argyle) জানাইয়াছিলেন, লোক রক্ষার জন্য 'যাহা আবশ্যক, ব্যয় করিতে হইবে।' লর্ড নর্থব্রুকের উদ্যোগে ও সার রিচার্ড টেম্পলের পরিশ্রমে শীঘ্রই দুর্ভিক্ষ প্রশমিত হয়। Times যথার্থই বলিয়াছেন—ভারতবর্ষে নর্থব্রুক যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষ দমন সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ ও শ্রেষ্ঠ। এই দুর্ভিক্ষে গবর্ণমেণ্টের ৬৫০০০০০০৲ টাকা ব্যয় হয়।

১৮৭৭ খ্রীঃ মাদ্রাজে দুর্ভিক্ষ—সার রিচার্ড টেম্পল বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষ দমনে অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করায়, লর্ড লিটন তাঁহাকে রিলিফ কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিবার নিমিত্ত মাদ্রাজে প্রেরণ করেন। পূর্ব্বে রিলিফ কার্য্যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে ৵০ দুই আনা হিসাবে দেওয়া হইত। দুই আনায় তিন পোয়া চাউল মিলিত। সার রিচার্ড দুই আনার পরিবর্ত্তে আধসের চাউলের ব্যবস্থা করায় মৃত্যু সংখ্যা অধিক ঘটে। মৃত্যু সংখ্যা ৫২৫০০০০। এই দুর্ভিক্ষের পর ফেমিন-কোড (Famine code) বিধিবদ্ধ হয়। ইহার দ্বারা দুর্ভিক্ষের সূচনায়, দুর্ভিক্ষের সময়ে ও দুর্ভিক্ষ অবসানে কিরূপ ভাবে কাজ করিতে হইবে, স্থির হইয়াছে।

১৮৭৮ খ্রীঃ উত্তর ভারতে দুর্ভিক্ষ।

১৮৭৯ খ্রীঃ মাদ্রাজ ও উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষ।

১৮৯২ খ্রীঃ মাদ্রাজ, রাজপুতানা, বঙ্গ ও ব্রহ্মদেশে দুর্ভিক্ষ।

১৮৯৭ খ্রীঃ মাদ্রাজ, বম্বে, উত্তর ভারতে দুর্ভিক্ষ।

১৯০০ খ্রীঃ পঞ্জাব, রাজপুতানা, বম্বে, মধ্য ভারতে দুর্ভিক্ষ। লর্ড কর্জ্জন বলিয়াছেন,

এরূপ সুদূরব্যাপী ও ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ ভারতে আর কখনও হয় নাই। মৃত্যু সংখ্যা ৫০-৬০ লক্ষ। দুর্ভিক্ষ কমিশনার সার এ, পি, ম্যাকডোনেল বলিয়াছেন, মাছির ন্যায় ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ মরিয়াছে।

গণনায় জানা যায়, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশ বৎসরে গড়ে প্রতি মিনিটে ৪ জন, প্রতি ঘণ্টায় ২৪০ জন, প্রতিদিনে ৫৭৬০ জনের মৃত্যু হইয়াছে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র যে দেশের শস্যশ্যামলা খ্যাতি, যে দেশের অর্থে ইংলণ্ডের সুখ, ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইতেছে, সেই দেশের লক্ষ লক্ষ অধিবাসী অনাহারে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেছে, ইহা স্মরণ করিলে শোকে, ক্ষোভে হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হয়, চক্ষে অশ্রু-প্রবাহ ছুটিতে থাকে। দুর্ভিক্ষ সময়ে যখন আমরা ভিক্ষা পাত্র হস্তে ইংলণ্ড, আমেরিকার শরণাপন্ন হইয়া তুমুল আর্ত্তনাদ করিতে থাকি, তখন আমাদের জাতীয়তার অভিমান নিতান্ত তুচ্ছ হইয়া পড়ে, সভ্যতার গৌরব আমাদিগকে শত ধিক্কার দেয়। আজ কাল দুর্ভিক্ষের সমালোচকদিগের মধ্যে দুই দল দৃষ্ট হয়। এক গবর্ণমেণ্টের দল, দ্বিতীয় প্রজার প্রতিনিধির দল। প্রথম পক্ষ বলেন, ইংরাজ রাজত্বে প্রজার সুখ, সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইয়াছে, যাহা কিছু দুঃখ দারিদ্র্য, তাহা প্রজার নিজের দোষ ও দৈববিড়ম্বনায় ঘটে। অন্য পক্ষ বলেন, প্রজার সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি মিথ্যা কথা, ভারতবাসীর অবস্থা উত্তরোত্তর মন্দ হইতেছে, সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। এই প্রতিবাদে বিরক্ত হইয়াই লর্ড জর্জ্জ হ্যামিল্টন বলিয়াছিলেন—'বৃটিশ রাজত্বে ভারতবাসী দিন দিন দরিদ্র হইতেছে, এ কথা স্বীকার করিলে বৃটিশ শাসনে দুরপনেয় কলঙ্ক-কালিমা লেপিত হয়, এবং ইংরাজের ভারত-শাসন নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়ে।'

ভারতবর্ষের ঘোর দারিদ্র্যের কথা গোপন করিতে যাইয়াই ভারত-সচিবকে এরূপ অবান্তর যুক্তির অবতারণা করিতে হইয়াছে। দুর্ভিক্ষ বা দরিদ্রতা স্বীকার করিলেই যে ইংলণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের সম্পর্ক চির বিচ্ছিন্ন হইবে, ইহা স্বীকার্য্য নহে। যাহারা ভারতের অর্থহীনতার জন্য গবর্ণমেণ্টকে দায়ী করেন, তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান শাসন পদ্ধতির পরিবর্ত্তন কামনা করেন, ইংরাজ শাসনের উচ্ছেদ আকাঙ্ক্ষা করেন না। প্রজ্জলিত বহ্নি যেরূপ বস্ত্রাভ্যন্তরে লুক্কায়িত থাকে না, এ দেশের দুরবস্থার কথা গোপন-প্রয়াসও তদ্রূপ বৃথা। ভারত ভ্রমণকালে রুষিয়ার বর্ত্তমান সম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাস এদেশের লোকের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। দিন ২ ভারতের আভ্যন্তরীণ অবস্থা যে মন্দ হইতেছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অল্পদিন হইল, সার রবার্ট গ্রিফিন (Sir Robert Griffin) দেখাইয়াছেন, বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা লোক সংখ্যার অনুপাতে ভারতবর্ষের সঞ্চিত ধন সর্ব্বাপেক্ষা অল্প। তাঁহার প্রদত্ত তালিকা—

দেশ	মোট আয় কোটি পাউণ্ড	সঞ্চিত ধন কোটি পাউণ্ড	লোক সংখ্যা লক্ষ
বৃটন	১৭৫	১৫০০	৪.২০
কানেডা	২৭	১৩৫	৬০
অষ্ট্রেলিয়া	২১	১১০	৩৫
ভারতবর্ষ	৬০	৩০০	৩০.০০

তাঁহার মতে ভারতবর্ষের ত্রিশ কোটি অধিবাসী সম্বৎসরে যত টাকা উপার্জ্জন করে,

বৃটনের চারি কোটি বিশ লক্ষ লোকে কেবল খাদ্য পেয় সংগ্রহের জন্য তত টাকা ব্যয় করিয়া থাকে। ১৮৮২ খ্রীঃ লর্ড রিপণের রাজত্ব কালে লর্ড ক্রোমার স্থির করেন, ভারতবাসীর আয় ৪৬৮০০ লক্ষ পাউণ্ড, লোক সংখ্যা ২৫৩১১১৫০০। গড়ে প্রতি জনের বার্ষিক আয় ১ পাং ১৬ শিলিং অর্থাৎ ২৭৲ টাকা। ১৮৯৮ খ্রীঃ ভারতবাসীর আয় ৪২৮৮২৫৬৮৫০ টাকা, বা গড়ে বার্ষিক আয় ১৮৶ হইয়াছিল, ১৯০১খ্রীঃ ২৮৯৯১৯৯১৯ পাউণ্ড বা জন প্রতি ২৫৲ টাকা ছিল, ডিগবী (Digby) একথা সপ্রমাণ করিয়াছেন। লর্ড কর্জন ও গ্রিফিনের মতে এক্ষণে ভারতবাসীর বার্ষিক আয় জন প্রতি ৩০৲ টাকা। ৩০৲ টাকা হইলে দৈনিক ⁄৪ পাই পড়ে। ঐ সামান্য আয়ে আহার, পরিচ্ছদ, রাজস্ব সকল ব্যয় নির্ব্বাহ হয়

অধিক বেতনে এদেশে যে সকল বিচারক নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদের মধ্যে শতকরা ৬০ জনের নিকট ৫০৲ টাকা অপেক্ষা কম দাবীর মোকর্দ্দমার বিচার হইয়া থাকে। ইহা হইতে এদেশের লোক কিরূপ দরিদ্র ও কত অল্প টাকার আদান প্রদান করে, তাহা বুঝা যায়। যাঁহারা মহাজনদিগকে প্রজার বর্ত্তমান দুঃখের মূল মনে করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক। ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্বে এদেশে গ্রামে২ মহাজন ছিল, প্রজাগণ দুঃসময়ে অল্প বা অধিক সুদের হারে তাঁহাদের নিকট হইতে অর্থ কর্জ্জ লইত, সে জন্য প্রজার অবস্থা কখনও হীন হয় নাই। বড়লাটের সভার মাননীয় টয়নবী বলিয়াছিলেন, বিচার বিভাগে গবর্ণমেণ্টের আয় দিন২ বাড়িতেছে, তাঁহার মতে আইন আদালতের চক্রান্তে পড়িয়া ভারতবাসীর অবস্থা ক্রমশঃ দুঃস্থ হইতেছে। বম্বে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সার আরস্কিন পেরি মহোদয়ও ঠিক এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। মহাজনদিগকে প্রজার দুঃখ দারিদ্র্যের কারণ স্বরূপ নির্দ্দেশ করা সমীচীন নহে।

অন্য প্রকারেও ভারতবাসীর অবনতির কথা প্রতিপন্ন হয়। গবর্ণমেণ্ট রিপোর্টে প্রকাশ, ১৮৮৬-৮৭খ্রীষ্টাব্দে এদেশের প্রতিজনে গড়ে ⁄৭ সের লবণ ক্রয় করিয়াছিল। ১৮৮৯—৯০খ্রীঃ সাড়ে ছয় সেরের অধিক ক্রয় করিতে পারে নাই। ১৮৮৯—৯০খ্রীঃ ভারতবাসীর গড়ে জন প্রতি ১৬৪ টাকা হিসাবে ডাকঘর সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা ছিল, ১৮৯৯—১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে উহার পরিমাণ হ্রাস হইয়া ১২৫৲ টাকা হইয়াছে। ইহাই প্রজার আর্থিক অবনতির সুস্পষ্ট প্রমাণ।

গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক শাসন বিবরণী হইতেও প্রজার দরিদ্রতার আভাস পাওয়া যায়। বেহার অঞ্চলে শতকরা ৪০জন লোক কোন কালে পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, বহুদিন ধরিয়া উপবাসী থাকিতে বাধ্য হয়। এলাহাবাদের নিম্ন-শ্রেণীর প্রজাপুঞ্জ অর্দ্ধাশনে দিন যাপন করে। বম্বে বিভাগের শ্রমজীবিদিগের চির-দারিদ্র্য স্বাভাবিক অবস্থা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ১৯০১খ্রীঃ ফেমিন কমিশন স্থির করিয়াছেন, ঐ অঞ্চলের সমস্ত কৃষিজীবিদিগের এক চতুর্থাংশ ঋণের দায়ে যোতজমা হারাইয়া নিঃস্ব হইয়াছে। ঐ প্রদেশে এক পঞ্চমাংশ অধিবাসী ব্যতীত সকলেই ঋণগ্রস্ত। মোটের উপর বলা যাইতে পারে, বৃটিশ-ভারতের দশকোটি অধিবাসী ঘোরতর দারিদ্র্যে দিনপাত করে।

হ্যামিল্টনের ন্যায় উন্নতিবাদী রাজপুরুষকেও অবশেষে স্বীকার করিতে হইয়াছে, ভারতের লোক বড়ই দরিদ্র। কর্তৃপক্ষের মুখে সময়ে২ এই দুরবস্থার কাহিনী প্রকাশিত হয়, কিন্তু প্রতিবিধানের কোন চেষ্টাই লক্ষিত হয় নাই। দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে রিলিফ কার্য্যের ধূম পড়ে, পৃথিবীর দ্বারে দ্বারে যাচঞা আরম্ভ হয়, এই মাত্র। অসংখ্য প্রাণিসংঘ সমন্বিত একটী মহাজাতি অনাহারে দিন দিন মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইতেছে, তাহাদের শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক অবনতির পথ প্রশস্ত হইতেছে। এই মহাজাতিকে আসন্নধ্বংসের করালগ্রাস হইতে রক্ষা করার ন্যায় পবিত্র কার্য্য জগতে আর কি আছে? যে পূতচরিত্র বৃটিশজাতি পৃথিবী বক্ষ হইতে দাসত্ব প্রথা বিলুপ্ত করিবার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছিলেন, আশ্রিত পরাধীন জাতির প্রতি ঔদার উদাসীনতা তাহাদের চরিত্রে ঘোর কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিতেছে। রাজপুরুষদিগের মধ্যে কেহ কেহ প্রজার দারিদ্র্যের কথা প্রকাশ করিলেও কর্তৃপক্ষ প্রজার অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ হইতেছে, এ কথা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন। লর্ড কর্জ্জনের শাসনকালে ভারতবর্ষে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, কমিশন বসাইয়া দুর্ভিক্ষের কারণ অনুসন্ধান করা হইয়াছে, কিন্তু তিনিও প্রজার মন্দ অবস্থা স্বীকার করেন না। Imperial Legislative Council এ তিনি বলিয়াছিলেন, প্রজার দরিদ্রতা ঠিক নহে, প্রজার অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া আমার এই অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে। ১৮৮০ খ্রীঃ প্রজার আয় ২৭৲ টাকা ছিল, এক্ষণে ৩০৲ টাকা হইয়াছে। কৃষকের আয় কমে নাই, জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে। ১৮৮০ খ্রীঃ ১৯৪০০০০০০ একার ভূমিতে চাষ হইত, ১৯০০ খ্রীঃ ২১৭০০০০০০ একর ভূমিতে চাষ হইয়াছে। ১৮৮০ খ্রীঃ প্রতি একারে ৩৬৫ সের শস্য জন্মিয়াছিল, ১৯০০ খ্রীঃ ৪২০ সের জন্মিয়াছে। দেশের ধন কমিতেছে না, দরিদ্র লোকের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বাড়িতেছে। ভূমি-করের কথা উত্থাপন করিয়া তিনি বলিয়াছেন, দুর্ভিক্ষ বা দরিদ্রতার সহিত ভূমিকরের কোন সম্বন্ধ নাই, এবং সেই সিদ্ধান্তের পরিপোষক স্বরূপ যে কয়েকটী মন্তব্য বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ, বর্ত্তমান করের পরিমাণ প্রজার পক্ষে দুর্ব্বহ বা গুরুভার নহে।

রাজনীতিজ্ঞ লর্ড কর্জ্জন এবম্বিধ দুর্ভেদ্য তর্কজাল বিস্তার করিয়া মূল কারণগুলি উড়াইয়া দিয়া প্রতিপন্ন করিতে চা'ন, দুর্ভিক্ষ দেবী আপদ, অনাবৃষ্টির ফল। কিন্তু বুভুক্ষা রাক্ষসী রাজপ্রতিনিধির অমোঘ যুক্তির প্রতি বিশেষ সমাদার প্রদর্শন করিতেছে, তাহার আচরণে এরূপ কিছু লক্ষিত হয় না। গবর্ণমেণ্টের মতের যাঁহারা পোষকতা করেন, তাঁহাদেরও বিশ্বাস, প্রজার দুরবস্থার কাহিনী অলীক। তাঁহারা বলেন, অধুনা শ্রমের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, পূর্ব্বে যে কার্য্যে সারা দিন খাটিয়া মজুরেরা দুই আনা রোজগার করিত, এক্ষণে সেই কার্য্যে আট আনা অর্জ্জিত হইতেছে, এইরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিদ্যমান থাকিতে কিরূপে প্রজার দুরবস্থা স্বীকার করা যায়? তাঁহাদের এই যুক্তিও অসার। মোগল রাজত্বে জনৈক ভারী মাসে ১৸৵৹ আনা উপার্জ্জন করিত। ১৷৹ টাকায় তাহার পরিবারের পাঁচ ছয়টী প্রাণীর আহার ও বাকী ॥ আনায় বস্ত্র ও অন্যান্য বিলাস উপকরণ সংগৃহীত হইত।

সে কালের মুদ্রার ক্রয়করী শক্তির তুলনায় এক টাকা চৌদ্দ আনা নিতান্ত তুচ্ছ ছিল না। আজকাল ঐ কার্য্যে মাসিক ৫।৬টাকা আয় হয়, কিন্তু পাঁচ ছয়টী প্রাণীর গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ হয় না, কারণ মুদ্রার ক্রয়করী শক্তি কমিয়াছে, খাদ্য বস্ত্র মহার্ঘ হইয়াছে। এইরূপ পরস্পর বিরোধী যুক্তি তর্কের প্রাবল্যে ভারতীয় দুর্ভিক্ষ-মীমাংসা অত্যন্ত জটিল ও দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছে। প্রজার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বাড়িতেছে, ধন বৃদ্ধি হইতেছে, শ্রমের মূল্য অধিক হইয়াছে, দুর্ভিক্ষেরও বিরাম হইতেছে না, ইহাত কম প্রহেলিকা নয়। মনে হয়, কোন অশরীরী দৈত্য আলাদিনের প্রদীপ জ্বালিয়া যাদুমন্ত্রে আমাদের বিপুল ধনরাশি উড়াইয়া দিতেছে!

দুর্ভিক্ষ ভারতবর্ষের একটী শক্ত রাজনৈতিক সমস্যা। এই সমস্যার মীমাংসার জন্য রাজা ও প্রজা উভয়ের মতের একতা বাঞ্ছনীয়। দুর্ভিক্ষের যে সকল কল্পিত ও প্রকৃত কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, এস্থানে তাহার কিছু আলোচনা আবশ্যক।

১। অনাবৃষ্টি—অনেকের মতে অনাবৃষ্টি ভারতীয় দুর্ভিক্ষের কারণ। এই মতাবলম্বীদিগের মধ্যে সার হেনরী ফাউলার (Sir Henry Fowler) প্রধান। তাঁহার মতে, ভারতবর্ষের পুনঃ ২ দুর্ভিক্ষ প্রাকৃতিক ক্রিয়ার ফল এবং তাহা নিবারণ করা গবর্ণমেণ্টের অসাধ্য। ক্ষেত্রে বীজ বুনিয়া যে দেশের লোক চাতকের ন্যায় আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকে, অনাবৃষ্টি হেতু শস্য নাশ সে দেশে অসম্ভব নহে। উপর্য্যুপরি অনাবৃষ্টি বশতঃ শস্য অজন্মা হইলে দুর্ভিক্ষ স্বতঃই উপস্থিত হয়। 'অতি বৃষ্টিরনাবৃষ্টি শলভা মূষিকা শুকাঃ। অত্যাসন্নাশ্চ রাজানঃ ষড়েতি ঈতয়স্মৃতাঃ।" অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, পঙ্গপাল প্রভৃতি ছয়টী শস্যের ক্ষতি বা বিঘ্ন। কিন্তু অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্রাকৃতিক নিয়মে ঘটে। প্রদেশ বিশেষে নৈসর্গিক ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হয়, ইহা সহসা বিশ্বাস করা যায় না। মিশর, আয়র্লণ্ডে অনাবৃষ্টি বশতঃ দুর্ভিক্ষ নাই। অনাবৃষ্টি দুর্ভিক্ষের মুখ্য কারণ হইলে পৃথিবীর অন্যান্য প্রদেশে বৃষ্টির অভাব জন্য দিগন্তব্যাপী হাহাকার উঠে না কেন? ভারতীয় দুর্ভিক্ষের ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায়, প্রায় কোন ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষই দীর্ঘকালব্যাপী অনাবৃষ্টির ফল নহে। নিম্নের তালিকা ইহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

প্রদেশ	দুর্ভিক্ষ বৎসর	বারিপাত (ইঞ্চ-পরিমাণ)
উড়িষ্যা	১৮৬৬	৬০.০০
মান্দ্রাজ	১৮৭৭	৬৬.৩
উঃ পঃ প্রদেশ ও অযোধ্যা	১৮৯২	৪৯.৭৫
বম্বে	১৯০০	৪০.০৩
মধ্য প্রদেশ	"	৫২.৪১

প্রত্যেক দুর্ভিক্ষ বৎসরে সময়ে বা অসময়ে যথেষ্ট পরিমাণে বারিপাত হইয়াছে। কিন্তু ঐ বিশাল বারি রাশির কোন সদ্ব্যবহার না হওয়ায় শস্যহানি ঘটিয়াছে। উইরোপীয় প্রদেশ সমূহে কৃত্রিম উপায়ে জল সেচন দ্বারা অনাবৃষ্টির বৎসরেও কৃষকগণ আশানুযায়ী শস্য উৎপাদন করে। ভারতবর্ষে যে সকল পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা ভারতবর্ষের ন্যায় কৃষি প্রধান দেশের পক্ষে যথেষ্ট নহে। যাহা আছে, তাহার সুব্যবহার হইলেও অনেক উপকার হয়। বারি-বিহীন জয়পুর রাজ্যে কর্ণেল জেকব (Col. Jacob) কৃত্রিমপয়ঃপ্রণালী দ্বারা যে উপকার সাধন করিয়াছেন, তাহা

অত্যন্ত বিস্ময়জনক। স্থানান্তরে এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে। দৈবের স্কন্ধে সমস্ত দোষ ন্যস্ত করিয়া স্বকর্ত্তব্যের লাঘব করা কদাচ ন্যায়পরায়ণ গবর্ণমেণ্টের উচিত নহে। কোন দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বে অনাবৃষ্টি হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই অনাবৃষ্টিই দুর্ভিক্ষের মূল কারণ বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

২। কেহ২ বলেন, লোক সংখ্যা বৃদ্ধি এ দেশের দুর্ভিক্ষের কারণ। স্বয়ং ভারত-সচিব লর্ড হ্যামিল্টন তাহাই বিশ্বাস করেন। অন্যান্য স্থলে যে সকল কারণে লোকসংখ্যার হ্রাস হয়, ভারতবর্ষে সে সকল কারণ বর্ত্তমান নাই। ভারতে গভীর শান্তি বিরাজিত, যুদ্ধ বিগ্রহে লোক হ্রাস প্রায়ই ঘটেনা এবং গৃহকোণ ছাড়িয়া ভারতবাসী অন্য স্থানে উপনিবেশ স্থাপনেরও প্রয়াসী নহে, সুতরাং লোকসংখ্যার বাহুল্য বশতঃ আহার্য্য বস্তুর অল্পতা ঘটায় দুর্ভিক্ষ ও মৃত্যু একই সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু সরকারী Census Report দ্বারা এই ভিত্তিহীন উক্তির অসারতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। রিপোর্টে দেখা যায়, ২৮ টী সুসভ্য দেশের মধ্যে ভারতবর্ষ লোক সংখ্যার অনুপাতে বিংশ স্থান অধিকার করিয়াছে। ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি মৃদুতর, দ্রুততর নহে। ১৮৯১ খ্রীঃ লোক-গণনায় দেখা গিয়াছিল, শতকরা ১১ জন বাড়িয়াছে, ১৯০১ খ্রীঃ শতকরা ১ জন বা ইংরাজাধিকৃত ব্রহ্মদেশ ছাড়িয়া দিলে, শতকরা ·৯৪ বৃদ্ধি হইয়াছে। ভারতবর্ষের তুলনায় ইংলণ্ড, ওয়েলস প্রভৃতি ইউরোপীয় প্রদেশগুলির লোক সংখ্যা অধিক, অথচ সে সকল প্রদেশে দুর্ভিক্ষের লেশ মাত্র নাই। ইংলণ্ড, ওয়েলসে লোক সংখ্যা প্রতি বর্গ মাইলে ৪৪৫, ফ্রান্সে ১৮০, বেলজিয়মে ৪৮২, ভারতবর্ষে ১৬৬। লোক সংখ্যা বৃদ্ধি যে দুর্ভিক্ষের কারণ নহে, বাঙ্গালা দেশ তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সমগ্র ভারতবর্ষে বাঙ্গালার লোক সংখ্যা অধিক, কিন্তু দুর্ভিক্ষের প্রকোপ তথায় অল্প অনুভূত হয়। আর এক কথা, প্রজা বৃদ্ধি, ধন বৃদ্ধির কারণ, ভূমণ্ডলের অন্যান্য সুসভ্য দেশের ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য দিতেছে।

৩। অনেকে অনুমান করেন, ভারতীয় কৃষক কুলের অমিত-ব্যয়িতা ও অদূরদর্শিতা তাহাদের ধারাবাহিক দুরবস্থার প্রধান কারণ। দুর্ব্বৎসরের জন্য তাহারা সঞ্চয় করিতে জানে না, শ্রাদ্ধ শান্তি, পূজা, পার্ব্বণ ইত্যাদিতে অযথা ব্যয় করিয়া ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়ে। স্বর্ণকারের চক্রান্তে পড়িয়া বিড়ম্বিত হয়। একথা ঠিক নহে। এ দেশের কৃষকদিগের ন্যায় মিতব্যয়ী, পরিশ্রমী, নিরলস প্রজা পৃথিবীতে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। পাশ্চাত্য কৃষিজীবীর ন্যায় তাহারা বিলাসী বা অপরিণামদর্শী নহে। তাহাদের আহার, পরিচ্ছদ, বাসগৃহ সকলই মিতব্যয়িতার নিদর্শন। আহারের জন্য মটন চপ, বা পানীয়ের জন্য বহুমূল্য একসা হুইস্কী তাহাদের আবশ্যক হয় না। ভারতীয় প্রজা য়ুরোপীয় প্রজা অপেক্ষা অধিক সঞ্চয়শীল। দাক্ষিণাত্য-রায়ত-কমিসনে(Deccan Ryot Commission) তাহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে। তবে কুসংস্কার, ভ্রান্তি, মূর্খতা, তাহাদের উন্নতির পথের যে অনেকটা অন্তরায়, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। অলঙ্কারাদি নির্ম্মাণ বিষয়ে তাহাদের কিঞ্চিত অবিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়। শস্যে গোলা, আড়ি পূর্ণ হইলে

কৃষক-বধূ রূপার পৈঁছার জন্য আব্দার করে বটে। সরল স্বামীও স্ত্রীর সেই অন্যায় অনুরোধ রক্ষা করিতে কুণ্ঠিত হয় না। অলঙ্কারের ক্ষতি দুই প্রকার, ১ম, আট ভরি ওজনের কোন অলঙ্কার গড়িতে হইলে প্রতি ভরি বার আনা হিসাবে ছয় টাকা, মজুরি প্রতি ভরি দুই আনা হিসাবে এক টাকা, একুন সাত টাকা খরচ পড়ে। কিন্তু ঐ সাত টাকা অলঙ্কারের বিক্রেয় মূল্য নহে, অর্থাৎ ঐ অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া সাত টাকা পাওয়া যায় না। স্বর্ণকারের মজুরি অযথা লোকসান। ২য়, ঐ সাত টাকা মূলধন রূপে না খাটিয়া আবদ্ধ থাকে। কিন্তু জড় মূলধন রূপে বদ্ধ থাকিলেও দুর্ব্বৎসরে ঐ অলঙ্কার বিক্রয়লব্ধ মূল্যে অনেক উপকারে লাগে। মহাজনের নিকট ঋণ করিয়া তাহারা অলঙ্কার গড়ে না। ঋণ গ্রহণ তাহাদের ধর্ম্ম ও প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। ঋণ দারিদ্র্যের ফল—কারণ নহে। সংসার যাত্রা অচল হইলেই তাহারা মহাজনের আশ্রয় লয়, সাধ করিয়া লয় না।

৪। অনেকে সিদ্ধান্ত করেন, ধনবৈষম্য ভারতের দরিদ্রতার অন্যতম কারণ। কিন্তু ১৮৭২ খ্রীঃ বৃটিশ পার্লামেণ্টে ভারতবর্ষের আয়ব্যয় সম্বন্ধীয় যে বিবরণী উপস্থাপিত করা হইয়াছিল, তাহা পাঠে জানা যায়, লক্ষ টাকা আয়-বিশিষ্ট লোক বাঙ্গালার জমিদার, অযোধ্যার তালুকদার, ও বম্বের সদাগরদিগের মধ্যে থাকিলেও তাহাদের সংখ্যা বড় বেশী নহে। (বলা বাহুল্য বিদেশীয় সদাগরগণও ঐ তালিকা ভুক্ত)। ইংরাজাধিকৃত ভারতের তাৎকালীন প্রজার মধ্যে শতকরা ৩ জনের ৫০০৲ বা ততধিক বার্ষিক আয়, এবং শতকরা ৫৪ জনের আয় ২০০৲ টাকার অনুন। গ্রেট বৃটনের মোট ২৮০ লক্ষ প্রজার মধ্যে ১৪ লক্ষের বার্ষিক আয় ১৫০ পাউণ্ড, অর্থাৎ শতকরা ৫জনের বার্ষিক আয় ২২৫০৲ টাকা। গড়ে প্রত্যেক ব্যক্তির আয় ৩৬০৲ টাকা। আজকাল ভারতবর্ষের লোকের গড়ে বার্ষিক আয় ২৭৲ বা ৩০৲ টাকা।

৫। অনেকের বিশ্বাস, ভারতবাসীর বিলাস বাসনা বর্দ্ধিত হইতেছে, তজ্জন্য তাহারা অর্থোপার্জ্জনের আশায় খাদ্যদ্রব্যের পরিবর্ত্তে শন, পাঠ প্রভৃতি আবাদ দ্বারা ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা নষ্ট করিতেছে। কিন্তু পাটের দর যদি ধান্যের দর অপেক্ষা অধিক হয়, এবং বিদেশ হইতে খাদ্যোপযোগী দ্রব্য আমদানি করা যাইতে পারে, তাহা হইলে, সুবিধা। আমদানি না থাকা সত্ত্বে যদ্যপি ঐ পরিবর্ত্তন ঘটে, ব্যক্তিগত লাভ হইলেও তাহা দ্বারা জাতিগত ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী। যদি কোন কৃষকের ৫ বিঘা জমি থাকে এবং ঐ জমির উৎপন্ন ধান্য ৩০ মণ হইলে আজকালকার বাজার দরে উহার মূল্য ৩০৲ টাকা, কিন্তু ঐ জমিতে পাটের আবাদ দ্বারা অন্ততঃ ৬০টাকা লাভ হইতে পারে। ১৩০৪ সালে এদেশে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, ১৩০৩সালে পাট অপেক্ষা অধিক জমিতে ধান্যের চাষ হইয়াছিল। আর এক কথা, ইংলণ্ডে খাদ্যদ্রব্যের এক তৃতীয়াংশ উৎপন্ন হয়, কিন্তু সে দেশে দুর্ভিক্ষ নাই।

৬। পাইওনিয়র (Pioneer) প্রভৃতি এংগ্লো ইণ্ডিয়ান-পত্র-সম্পাদকগণ ভারতীয় দুর্ভিক্ষের এক অভিনব কারণ নির্দ্দেশ করেন। ইহা তাঁহাদের উদ্ভাবনী শক্তির চরম ফল সন্দেহ নাই। তাঁহারা বলেন, গবর্ণমেণ্টের এদেশে রিলিফ কার্য্যের প্রবর্ত্তন করায় সাধারণ লোকের স্বাবলম্বন

কমিয়া গিয়াছে। তাহারা জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য সম্যক পরিশ্রম করে না। তাহাদের আলস্যের ফলে এই দুর্ভিক্ষ। একথা প্রতিবাদের অযোগ্য হইলেও দু একটী কথা এখানে বলা আবশ্যক। বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টই যে দুর্ভিক্ষের সময় এদেশে প্রজার প্রাণ রক্ষার জন্য রিলিফ কার্য্য খুলিয়া থাকেন, তাহা নহে, সাজাহান, আরঙ্গজীব প্রভৃতি মোগল বাদসাহগণ দুর্ভিক্ষ উপশমের জন্য প্রজা রক্ষার নিমিত্ত রাজকোষ হইতে যথেষ্ট মুদ্রা ব্যয় করিতেন। পঞ্জাবে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে মহারাজ রনজিৎ সিংহ কিরূপ ক্ষিপ্রকারিতার সহিত অজস্র অর্থব্যয় করিয়া তাহা দমন করিয়াছিলেন, ইতিহাস পাঠকের তাহা অবিদিত নাই। ষ্টুয়ার্ট, মার্সম্যান প্রভৃতি ইংরাজ ঐতিহাসিক-গণের গ্রন্থেই এই কথার প্রমাণ আছে।

ভারতীয় দুর্ভিক্ষের ইতিবৃত্ত পুনঃ২ আলোচনা করিয়া আমাদের প্রতীতি জন্মিয়াছে, অনাবৃষ্টি, লোক সংখ্যা বৃদ্ধি দুর্ভিক্ষের কারণ নহে। এদেশের দুর্ভিক্ষের মূলীভূত কারণ—

১। রাজস্বের আধিক্য।

২। শিল্প-বাণিজ্যের অবনতি।

৩। জাতীয় ধনের হ্রাস।

অতঃপর আমরা এই গুলির বিস্তারিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

শ্রীকুলদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রাচীন ভারতের বাণিজ্য। (৫)

এখন আমরা মন্বাদিশাস্ত্র-প্রমাণিত ও রামায়ণোক্ত ভারতীয় বাণিজ্য সম্বন্ধে আলোচনা কবিব।

যে দেশে কোন বিষয়েরই প্রকৃষ্ট প্রণালীবদ্ধ রূপে লিখিত পুরাবৃত্ত নাই, তথায় প্রাচীনকালের বাণিজ্যবৃত্তান্ত সকল লিপিবদ্ধ থাকিবার সম্ভাবনা কি? তাৎকালিক বাণিজ্যের বিবরণ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ-নিচয় কোন্ অজ্ঞাতকালে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? তবে অতি পুরাতনকালে বাণিজ্য ব্যবসায় যে হিন্দুদিগের অতি প্রিয় ছিল, এবং তাঁহারা দেশদেশান্তরে গমনাগমন করিয়া বাণিজ্যকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, তদ্বিষয়ে ভূরি ভূরি প্রমাণ হিন্দুদিগের গ্রন্থাবলীতে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। তবে নাইবুর বা গ্রোটের ন্যায় বিচক্ষণ সংগ্রহকারের অভাবেই ঐ সমস্ত প্রমাণ একত্র লিপিবদ্ধ হইয়া ভারতের বাণিজ্য-বিষয়ক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর একখানি গ্রন্থ সংগৃহীত হয় নাই।

"আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্ত্তা দণ্ডনীতিশ্চ শাশ্বতী"।

আর্য্যদিগের নানাবিধ শাস্ত্র মধ্যে দর্শন, বেদবার্ত্তা এবং দণ্ডনীতি এই সকল শাস্ত্রও উল্লিখিত আছে। এই বার্ত্তা নামক শাস্ত্রেই কৃষি ও বাণিজ্য সম্বন্ধীয় নিয়ম সকল লিখিত ছিল।

বণিক্‌দিগের বৃত্তি রক্ষা এবং বাণিজ্যব্যাপারের বিধি ব্যবস্থা সকল মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে। বেদ ভিন্ন অন্য কোন সংস্কৃত গ্রন্থ মনুসংহিতা ও বাল্মীকি রামায়ণের অপেক্ষা পুরাতন নহে। এই গ্রন্থদ্বয়ের রচনাকালে ভারতবর্ষীয় লোকেরা দেশদেশান্তরে গমন করিয়া বাহুল্যরূপে বাণিজ্য ব্যবসায় সম্পাদন করিতেন।

মনুসংহিতার ৯ম অধ্যায়ের ৩৩১ ও ৩৩২ শ্লোকে লিখিত আছে যে,—

সারাসারঞ্চ ভাণ্ডানাং দেশানাঞ্চ গুণাগুণান্।
লাভালাভঞ্চ পণ্যানাং পশূনাং পরিবর্দ্ধনম্॥
ভৃত্যানাঞ্চ ভৃতিং বিদ্যাৎ ভাষাশ্চ বিবিধানৃণাম্।
দ্রব্যাণাং স্থানযোগাংশ্চ ক্রয় বিক্রয়মেবচ॥"

বৈশ্যেরা দ্রব্যজাতের উৎকর্ষাপকর্ষ, দেশ সকলের গুণাগুণ, পণ্যদ্রব্য গুলির বিক্রয় দ্বারা লাভালাভের বিষয়, গবাদি পশুর পরিবর্দ্ধি, ভৃত্যগণের বেতন, বিবিধ প্রকার ভাষা, দ্রব্যগুলির স্থানযোগ অর্থাৎ কোন্ দ্রব্য কিরূপে স্থাপন করিলে বহুকাল থাকে, তদ্বিষয় এবং ক্রয় বিক্রয়ের রীতি অবগত হইবে।

মনুর ৮ম অধ্যায়ের ১৫৭ শ্লোকে লিখিত আছে যে,—

"সমুদ্রযান-কুশলা দেশকালার্থদর্শিনঃ।
স্থাপয়ন্তিতু যাং বৃদ্ধিং সাতত্রাধিগমং প্রতি॥"

সমুদ্র গমন বিষয়ে নিপুণ এবং দেশ, কাল, ও লাভালাভদর্শী বণিকেরা যান-ভাটক (নৌকাভাড়া) বিষয়ে যে ব্যবস্থা করেন, তাহাই প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হইয়া থাকে।

মনুসংহিতায় লিখিত পোতপণ বিষয়ক বচনটীতে উক্ত হইয়াছে যে,—

"দীর্ঘাধ্বনি যথাদেশং যথাকালং তরোভবেৎ।
নদীতীরেষু তদ্বিদ্যাৎ সমুদ্রে নাস্তি লক্ষণম্॥"
মনু—৮ম অধ্যায়, ৪০৬ শ্লোক।

দীর্ঘপথ অর্থাৎ অধিক দূরদেশে গমন করিলে দেশ কাল বিশেষ পোত মূল্যের যে তারতম্য আছে, তাহা নদী বিষয়ে জানিবে, সমুদ্র গমন বিষয়ে তাদৃশ নির্দ্দেশ নাই, কারণ, সমুদ্রে কেবল বায়ুর প্রতিগমনের নির্ভর থাকাতে নদীর ন্যায় ক্রোশ বা যোজানুসারে মূল্য নিরূপিত হইতে পারে না।

"ক্রয়বিক্রয়মধ্বানং ভক্তঞ্চ সপরিব্যয়ম্।
যোগক্ষেমঞ্চ সম্প্রেক্ষ্য বণিজোদাপয়েৎ করান্॥"
মনু—৭ম অধ্যায় ১২৭ শ্লোক।

বাণিজ্য দ্রব্যের ক্রয় ও বিক্রয়ের মূল্য, তাহা কত দূর হইতে আনীত, পাথেয় ব্যয়, এবং তাহা দস্যু তস্করাদি হইতে রক্ষণাবেক্ষণ নিমিত্ত যে ব্যয়, এই সকল বিষয় অনুসন্ধান করিয়া এবং তজ্জন্য যত ব্যয় হইয়াছে, তাহা ধরিয়া তদতিরিক্ত যাহা লব্ধ হইয়াছে, তাহা নিশ্চিত হইলে, তদনুসারে বাণিজ্য দ্রব্যাদির উপর বণিকদিগের নিকট হইতে রাজা কর গ্রহণ করিবেন।

"পঞ্চাশদ্ভাগ আদেয়োরাজ্ঞা পশু হিরণ্যয়োঃ।
ধান্যানামষ্টমোভাগঃ ষষ্ঠোদ্বাদশ এববা॥"
মনু—৭ম অধ্যায়, ১৩০ শ্লোক।

পশু ও স্বর্ণ সম্বন্ধীয় লভ্যের কর পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ, ধান্যাদি শস্য বিষয়ের কর ষষ্ঠ বা অষ্টম অথবা দ্বাদশাংশের একাংশ রাজা গ্রহণ করিবেন।

"আদদীতাথ ষড়্ভাগং দ্রু-মাংস-মধু-সর্পিষাম্।
গন্ধৌষধিরসানাঞ্চ পুষ্পমূলফলস্য চ॥
পত্রশাকতৃণানাঞ্চ বৈদলস্য চ চর্ম্মণাম্।
মৃন্ময়ানাঞ্চ ভাণ্ডানাং সর্ব্বস্যাশ্মময়স্যচ॥"
মনু—৭ম অধ্যায়, ১৩১, ১৩২ শ্লোক।

বৃক্ষ, মংস, মধু, ঘৃত, গন্ধদ্রব্য, ঔষধি, বৃক্ষাদির রস, পুষ্প, মূল, ফল, পত্র, শাক, তৃণ, বংশ নির্ম্মিত পাত্র, চর্ম্মপাত্র, মৃন্ময়পাত্র, প্রস্তরময় দ্রব্য, এই সকল সপ্তদশ প্রকার দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয়ে যাহা লাভ হইবে, রাজা তাহার ষষ্ঠভাগ গ্রহণ করিবেন।

"কারুকান্ শিল্পিনশ্চৈব শূদ্রাংশ্চাত্মোপজীবিনঃ।
একৈকং কারয়েৎ কর্ম্ম মাসি মাসি মহীপতিঃ॥"
মনু—৭ম অধ্যায়, ১৩৮ শ্লোক।

কারুক ও শিল্পী অর্থাৎ পাচক, মদক, কাংস্যকার, শস্ত্রকার, মালাকার, কর্ম্মকার, স্বর্ণকার, কুম্ভকার, তন্তুবায়, চিত্রকর,

লেখক, সূত্রধর, তৈলিক প্রভৃতি ও শূদ্র অর্থাৎ দাস পদবাচ্য এবং যাহারা শারীরিক পরিশ্রমে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, সেই সকল ব্যক্তিকে রাজা মাসে মাসে এক এক দিন কর্ম্ম করাইয়া লইবেন।

এই সকল উদ্ধৃত বচন দ্বারা ইহা স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, মানব ধর্ম্মশাস্ত্রে পণ্য দ্রব্য মাত্রের উপর রাজ কর স্থাপিত হইয়াছিল এবং হিন্দু রাজত্বকালে ভারতে যে বাণিজ্য ব্যবসায় প্রকৃষ্টরূপে প্রচলিত ছিল, এতদ্বারা তাহা বিলক্ষণরূপে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। মনুতে হিন্দুদিগের ধর্ম্ম, আচার, ব্যবহার, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি ও সমাজনীতি প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের বিধান রহিয়াছে এবং হিন্দু রাজত্বকালে বাণিজ্য বিষয়ে এতাদৃশী উন্নতি হইয়াছিল যে, মানব ধর্ম্মসংহিতাতে তৎসম্বন্ধে বিধি ব্যবস্থা সকল নিবদ্ধ করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছিল। বৈদিক কালে যেমন কল্প সূত্রাদি গৃহ্যশাস্ত্র দ্বারা আর্য্য সমাজ শাসিত হইত, তেমনি আবার বৈদিককালের পরবর্ত্তী কাল হইতে ভারতের শেষ সম্রাট্ পৃথ্বীরাজার সময় পর্য্যন্তও হিন্দুসমাজ প্রধানতঃ মনুসংহিতা দ্বারা শাসিত হইয়াছিল।

"বেদার্থোপনিবদ্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃস্মৃতম্।
মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে॥
মনুটীকা।

ভগবান মনু সাক্ষাৎ বেদার্থই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন বলিয়া মনু-বিরুদ্ধ কোন স্মৃতিশাস্ত্র প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হইবে না।

এতদ্বারা ইহাও সূচিত হইল যে, মানব ধর্ম্মসংহিতার কালে হিন্দুদিগের মধ্যে যে সকল ধর্ম্ম, আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি প্রভৃতি ছিল, ঐ সকল আবার বৈদিক কালেও অপরিস্ফুট ভাবে তাঁহাদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। মনু সংহিতায় উৎকল ও দ্রাবিড় প্রভৃতি দেশ অনার্য্য ও ম্লেচ্ছভূমি বলিয়া কথিত হইয়াছে। অতএব তৎকালে অর্থাৎ মনু-সংহিতার ত্রেতাযুগে আর্য্যাবর্ত্তেই বিশিষ্টরূপে বাণিজ্য ব্যবসায় প্রচলিত ছিল, দাক্ষিণাত্যে কেবল সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী প্রদেশ সমূহেই বাণিজ্য প্রচলিত ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় সমুদ্রগামী বণিকদিগের ঋণ গ্রহণের ব্যবস্থা রহিয়াছে; যথা—

"যে সমুদ্রগাবৃদ্ধাধনং গৃহীত্বা অধিকলাভার্থং প্রাণ-ধন-বিনাশশঙ্কা-
স্থানং সমুদ্রং গচ্ছন্তি,তেবিংশং শতকং মাসি মাসিদদ্যুঃ।
মিতাক্ষরা—ব্যবহারাধ্যায়, ঋণাদান প্রয়োগ।

যে সমুদ্রগামী বণিকেরা অধিক লাভের জন্য প্রাণ ও ধনের বিনাশ শঙ্কাযুক্ত সমুদ্রে গমন করে, তাহারা মাসে মাসে শতকরা লভ্যের বিংশতি ভাগের একভাগ রাজ-কর-রূপে প্রদান করিবে।

বরাহপুরাণে গোকর্ণ মাহাত্ম্য নামক অধ্যায়ে একটী গল্প লিখিত আছে যে, গোকর্ণনামক একজন সন্তানহীন বণিক্ বাণিজ্য করিবার জন্য সমুদ্রে গমন করে, পথিমধ্যে প্রচণ্ড বাত্যা উপস্থিত হওয়ায় তাহার পোত ভগ্নপ্রায় হইয়াছিল।

মনু, সাগরগামী ও দূরদেশগামী বণিক্-গণের বাণিজ্য সম্বন্ধে যে সকল বিধিব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। মনু-হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র। বৈদিক কালের পর হইতে সমস্ত হিন্দুসমাজ যে মানব সংহিতা দ্বারা শাসিত হইত, ইহা হিন্দুদিগের শাস্ত্রেই নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। বৈদিক কালীয় হিন্দু-সমাজ, গোভিলাদি-

গৃহ্য শাস্ত্র দ্বারা শাসিত হইত। বৈদিক কালের পরবর্ত্তী কাল হইতে হিন্দু রাজত্বের শেষ সময় পর্য্যন্ত মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্র দ্বারাই সমগ্র হিন্দু সমাজ শাসিত হইত।

বর্ত্তমান সময়েও ভারতের সর্ব্বত্র মনু-সংহিতার প্রাধান্য বিদ্যমান রহিয়াছে; বিশেষতঃ, রাজপুতানাদি দেশে হিন্দু রাজগণের সমাজ মন্বাদি শাস্ত্র দ্বারাই শাসিত হইয়া থাকে।

অতএব পূর্ব্বোক্ত মনুবচন-নিচয় দ্বারা ইহা স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে যে, অতি পূর্ব্বকালিক হিন্দুদিগের মধ্যে বাণিজ্য ব্যবসায় প্রকৃষ্টরূপে প্রচলিত না থাকিলে ভগবান্ মনু, তৎসম্বন্ধে বিধিব্যবস্থা সকল লিপিবদ্ধ করিতেন না। এইক্ষণ আমরা বাল্মীকি রামায়ণোক্ত হিন্দু বাণিজ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

রামায়ণ পাঠ করিলে জানা যায় যে, তৎকালে দাক্ষিণাত্যের অধিকাংশ প্রদেশ, সিংহ ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুসঙ্কুল ও দুর্গম মহারণ্যে পূর্ণ ছিল। তথায় কেবল বন্য অসভ্য ও অনার্য্য লোকেরা বাস করিত। রামায়ণে নদ নদী ও পর্ব্বতাদির যথাযথ অবস্থান সম্বন্ধে যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহাতে উক্ত গ্রন্থের রচনার সময়ে দাক্ষিণাত্যে যে হিন্দুদিগের গমনাগমন আরব্ধ হইয়াছিল, তাহাতে কোন সংশয় নাই, এবং তৎকালে সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী প্রদেশ সমূহে বিশিষ্টরূপ বাণিজ্য ব্যবসায় প্রচলিত ছিল। রামায়ণের অনেক স্থলে স্থল-পথে ও জল-পথে বণিক্‌দিগের বাণিজ্য করিবার বিবরণ উল্লিখিত রহিয়াছে।

রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের ৬৩ অধ্যায়ে ৫৪৩ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে,—

"উদীচ্যাশ্চ প্রতীচ্যাশ্চ দাক্ষিণাত্যাশ্চ কেরলাঃ।
কোট্যাঃ পরান্তাঃ সামুদ্রা রত্নান্যুপহরন্তু তে।"

উত্তর দেশীয়, পশ্চিমদেশীয়, দাক্ষিণাত্য (এস্থলে দক্ষিণাত্য সমুদ্রকূলবাসী) ও কেরল দেশীয় এবং কোটি কোটি সমুদ্রগামী বণিক্ রত্ন সকল উপহার প্রদান করুক্।

রামায়ণের নানা স্থানে বণিক্‌দিগের সমুদ্র গমনের যে সকল নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়, তন্মধ্যে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে সুগ্রীব, বানরদিগকে যে সকল আদেশ করিয়াছিল, সেই সমস্ত অতি উপাদেয় বলিয়া এস্থলে উদ্ধৃত হইল:—

"সমুদ্রমবগাঢ়াংশ্চ পর্ব্বতান্ পত্তনানিচ।"

রামায়ণ—কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ৪০ সর্গ, ২৫ শ্লোক।

সমুদ্র মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বত ও নগর সকল (অন্বেষণ করিবে)। টীকাকার বলিয়াছেন যে "সমুদ্রমবগাঢ়ান্" = "সমুদ্রান্তর্গতান্"। "পত্তনানি" = "সমুদ্রদ্বীপবর্ত্তীনি নগরাণি"।

অপিচ, "ভূমিঞ্চ কোষকারাণাং ভূমিঞ্চরজতাকরম্।"

ঐ—ঐ—ঐ—২৩ শ্লোক।

কোষকারদিগের দেশে এবং রজতাকর দেশে গমন করিবে। এস্থলে টীকাকার বলেন যে,"কোষকারাণাং ভূমিং" = "কোষের তন্তুৎপাদক জন্তুৎপত্তি স্থান ভূতাং"।

প্রাচীন কালে চীনদেশেই উৎকৃষ্ট কোষকীট সকল জন্মিত। অতি প্রাচীনকাল হইতেই চীনদেশীয় কোষেয় বস্ত্র অত্যুৎকৃষ্ট বলিয়া বিখ্যাত ছিল। এই জন্যই সংস্কৃত গ্রন্থকারেরা কোষেয় বস্ত্রকে "চীনাংশুক"এবং "চীন-চেলক" নামে অভিহিত করিয়াছেন; যথা—

"গচ্ছতিপুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ।
চীনাংশুক মিবকেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য।"

অভিজ্ঞান শকুন্তলা—১ম অঙ্ক।

"সুগন্ধি মাল্যাভরণৈশ্চীন চেলৈঃ সুশোভনৈঃ।
জীজয়েৎপুণ্ডরীকাক্ষং" ইত্যাদি।

রঘুনন্দন-কৃত যাত্রাতত্ত্ব।

রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে লিখিত আছে যে,—

"যত্নবন্তো যবদ্বীপং সপ্তরাজ্যোপশোভিতং।
স্বর্ণরূপ্যকদ্বীপং সুবর্ণাকর মণ্ডিতং॥"

তোমরা যত্নবান্ হইয়া সপ্তরাজ্যে পরিশোভিত যবদ্বীপ এবং সুবর্ণের খনি দ্বারা সুশোভিত সুবর্ণরূপ্যক দ্বীপে গমন করিবে। এই দুইটী দ্বীপ ভারত-মহাসাগর মধ্যবর্ত্তী যাবা ও সুমাত্রাদ্বীপ, তাহা বিলক্ষণ সম্ভাবিত হইয়া থাকে; কারণ, টলেমি (Ptolemy) যাবাদ্বীপের সংস্কৃত নাম যবদ্বীপ লিখিয়া পরে গ্রীক ভাষার শব্দে তাহার অর্থ করিয়াছেন। অল্‌বিরুণি নামক একজন আরব দেশীয় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে, হিন্দুরা পূর্ব্বোক্ত দ্বীপপুঞ্জকে "সুরন্দিব" বলে, এবং ফরাসি জাতীয় রীণও (Reinand) নামে একজন পণ্ডিত ও "সুরন্দিব" শব্দে যাবা ও সুমাত্রা নামক দ্বীপদ্বয়কে উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণে যবদ্বীপ ও সুবর্ণ দ্বীপ নামে দুইটী পৃথক্ দ্বীপ নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে।

ঐ কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডেই লিখিত আছে যে,—

"ততঃ সমুদ্রদ্বীপাংশ্চ সুভীমান্ দ্রষ্টুমর্হথ।"

যবদ্বীপাদি অতিক্রম করিয়া উক্ত সাগর মধ্যস্থিত ভীষণ দর্শন দ্বীপগুলি পরিদর্শন করিবে।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের ৪৩ সর্গে সুগ্রীব বানরগণকে উত্তরদিগ্বর্ত্তী দেশগুলিতে সীতা দেবীর অন্বেষণার্থ বলিয়াছিল যে,—

"এতম্লেচ্ছান্ পুলিন্দাংশ্চ"—
"কাম্বোজ যবনাংশ্চৈব শকানাংপত্তনানিচ।
অন্বিষ্যবরদাংশ্চৈব হিমবন্তং বিচিন্বথ।"

উত্তরদিক ম্লেচ্ছ ও পুলিন্দদিকের দেশ সকল অন্বেষণ করিবে, এবং কাম্বোজ, যবন, বরদ ও শকদিগের নগরগুলি অন্বেষণ করিয়া হিমালয় পর্ব্বতে অনুসন্ধান করিবে।

রামায়ণে শক, দরদ, পহ্লব, বর্ব্বর, হূণ, কিরাত, খশ, হারীত প্রভৃতি দুর্দ্দান্ত মহাবল পরাক্রান্ত জাতি সকল হিমালয়ের উত্তর দেশবর্ত্তী ভূভাগে বাস করে বলিয়া লিখিত আছে। কালক্রমে এই সকল জাতীয় লোক ভারতে, ইয়োরোপে, আফ্রিকায় ও আমেরিকায় যাইয়া বাস করিয়াছিল। ইহারাই ইয়োরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকার আদিম নিবাসীদিগের পূর্ব্বপুরুষ। শক প্রভৃতি জাতি বিলক্ষণ বাণিজ্য প্রিয় ছিল এবং ভারতবর্ষীয় লোকের সহিত ইহাদের বাণিজ্য কার্য্য প্রধানতঃ নির্ব্বাহিত হইত। ইহাদের বাসভূমি সকল বৃহৎ বৃহৎ নগরীতে পরিশোভিত ছিল। কথিত আছে, যৎকালে সিউ জাতীয় লোকেরা জিট্ বা জাঠদিগকে পরাজিত করে, তৎকালে তাহারা ভারতবর্ষীয় দ্রব্যজাতযুক্ত এবং রাজপুত্রগণের প্রতিকৃতি-চিহ্নিত মুদ্রা-সকল-সমন্বিত শতাধিক নগর দেখিতে পাইয়াছিল। এমন কি, যখন জঙ্গীস্ খাঁ এই সকল দেশ ও প্রদেশ জয় করে, তখন সেও এই সমস্ত স্থানে বৃহৎ বৃহৎ নগর সকল দেখিতে পায়। *

* We have much to learn in these unexplored regions, the abode of ancient civilisation and which, so late as Jungeez Khan's invasion, abounded with large cities. It is an error to suppose that the nations of Higher Asia were merely pastoral and De Guignes, from original authorities, informs us that when the Su invaded the Yuche or Jits, they found upwards of a hundred cities containing the merchandise of India and with the currency bearing the effigies of the princes.

Such was the state of central Asia long before the Christian era, though now depopulated and rendered desert by desolating wars which have raged in these countries, and to which Europe can exhibit no parallel.

Timur's wars, in modern times against

বাল্মীকি রামায়ণে উক্ত দ্বীপগুলির নাম এবং তথায় গমন করিবার প্রসঙ্গ উল্লিখিত থাকায়, অতি পূর্ব্বকালেই যে হিন্দুদিগের চীনদেশে এবং যাবা ও সুমাত্রাদি দ্বীপে যাতায়াত ছিল, তাহা বিলক্ষণ সূচিত হইতেছে।

পূর্ব্বেই রামায়ণোক্ত দেশ ও বিদেশনিচয়ের পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে, এইক্ষণ উক্তাবশিষ্ট কতিপয় দেশ এবং তৎকাল বিখ্যাত নদ, নদী ও পর্ব্বতগুলির উল্লেখ করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হওয়ায়, ঐ সকল উল্লিখিত হইল ; যথা—

দেশ সকল—বিদেহ (বর্ত্তমান ত্রিহুত), মেখল, উৎকল, ঋষ্টিক, কৌশিক, প্রাগ্‌-জ্যোতিষ, চন্দ্রচিত্র, অঙ্গলেপ এবং পাণ্ড্য।

নদী ও নদ সকল—সিন্ধু, সরস্বতী, বিপাশা, বিতস্তা, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী, গঙ্গা, যমুনা, সরযূ, কৌশিকী, গণ্ডকী, মহী, কালমহী, মহানদী, নর্ম্মদা, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী, তাম্রপর্ণী প্রভৃতি প্রধান।

পর্ব্বত সকল—হিমালয়, যামুন, বিন্ধ্য, ঋক্ষ, মহেন্দ্র, শুক্তিমান্‌, সহ্য, মলয় প্রভৃতি প্রধান। মহেন্দ্র পর্ব্বতে প্রচুর সুবর্ণ উৎপন্ন হইত। বিন্ধ্য, সহ্য ও মলয় পর্ব্বতে হস্তি সকল ধৃত হইত। মলয় পর্ব্বতে চন্দন বৃক্ষ এবং নানাবিধ ধাতুর আকর ছিল। মহামুনি অগস্ত্য মলয় পর্ব্বতোপরি আপন আশ্রম সংস্থাপন করিয়াছিলেন।

শ্রীতারিণীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

চণ্ডীদাস। (৪)

বিদ্যাপতির সাক্ষাৎ

জাতীয় সাহিত্য জাতীয় জীবনের প্রধান উপকরণ। সাহিত্য জাতীয় গৌরব-চিহ্ন। যে জাতির সাহিত্য উন্নত ও পরিশুদ্ধ, সে জাতিও তত প্রতিষ্ঠান্বিত। জাতীয় সাহিত্যই জাতীয় জ্ঞান, জাতীয় স্মৃতি, জাতীয় শক্তি। যে জাতি জাতীয় সাহিত্য উন্নত, পরিপুষ্ট করিতে পারে, সে জাতি এক অচিন্ত্য ঐশী-শক্তি প্রভাবে জাতীয় প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে। সাহিত্যের এই চিরস্থায়ীত্ব গুণ আছে বলিয়াই জাতি বিশেষের সভ্যতার পরিমাণ-দণ্ডরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, কারণ জাতীয় সাহিত্যের উন্নতিতে জাতীয় জীবন উন্নত হইয়া থাকে। জাতীয় সাহিত্যের উন্নতিতে দেশের উন্নতি, স্বজাতির উন্নতি। আর্য্য-ভারত যে একদিন সভ্য-জগতের শীর্ষস্থানীয়া হইয়াছিল, তাহা কেবল সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব হইতেই। কবির রমণীয় কাব্যালাপে, বৈজ্ঞানিকের বিশ্ব-ব্যাপিনী প্রতিভায় ভারতবর্ষ শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। কিন্তু হায় ! সে দিন কোথায় ?

পূর্ব্বে জাতীয় সাহিত্য বলিতে সংস্কৃত বুঝাইত, কিন্তু এখন বঙ্গ-সাহিত্যই আমাদের জাতীয় সাহিত্য ; এখন তাহা যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে। কিন্তু সর্ব্বাঙ্গীন পরি-পুষ্টি লাভ এখনো তাহার অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে নাই। তবে গত অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে বঙ্গ-

the Getic nation, will illustrate the paths of his ambitious predecessors in the career of destruction.
Vide Tod's Rajasthan, Vol I.

সাহিত্য যেরূপ উন্নত হইয়াছে, তাহাতে পুনঃ আশা হয় যে, হয়ত একদিন আমাদের জাতীয় সাহিত্যের সম্পূর্ণতা সংসাধিত হইতে পারিবে। কিন্তু জাতীয় সাহিত্য উন্নতি করিতে হইলে, সাহিত্যসেবীকে উৎসাহ দান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে অনেকানেক রাজা মহারাজাগণ শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকে আশ্রয় দান করিতেন, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশের ধনী সন্তানগণ মধ্যে সেরূপ প্রবৃত্তি স্ফূর্ত্তিলাভ করিতে পারে নাই। তাহা না হইলে কি দাতব্য চিকিৎসালয়ে মধুসূদন মরণের কোলে আশ্রয় লইতেন? কবিবর রাজকৃষ্ণ ও কৃষ্ণচন্দ্র অন্নকষ্টে জীবন ত্যাগ করিবেন কেন? শেষ জীবনে অক্ষয়চন্দ্রকে আদি ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় লইতে হইয়াছিল কেন? বেশী দিনের কথা নয়, সেদিন আমরা দেখিলাম, চক্ষুহীন হেমচন্দ্র দারিদ্র্যের তীব্র কষাঘাতে নিষ্পেষিত হইয়া গেলেন! দেশে কি তাঁহাকে অভয়দান করিবার একটী লোকও ছিল না? তাঁহাদের সেই ভাষাহীন অভিসম্পাতেই আমাদের সুখ, শান্তি, কল্যাণ দূরে দাঁড়াইয়া থাকিবে, 'ভারত শুধু ঘুমাইয়া রবে।'

ইংরেজ-কবি সেক্ষপীয়র কতদিন হইল অমরধামে প্রস্থান করিয়াছেন, কিন্তু আজিও ইংরেজগণ তাঁহার স্মৃতির প্রতি কেমন সম্মান প্রদর্শন করিতেছেন, তাঁহার জন্মতিথিতে ষ্ট্রাফোর্ড-অন-য়্যাভনে কেমন উৎসব করিয়া থাকেন! দৃষ্টান্ত স্বরূপে সেক্ষপীয়রের কথাই বলিলাম, অন্যান্য প্রতিভাশালী সাহিত্য-সেবীদিগের প্রতিও সম্মান প্রদর্শন করিতে ইংরেজগণ কুণ্ঠিত নন। কিন্তু তাঁহারা যদি ইংলণ্ডে না জন্মিয়া ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিতেন, তবে তাঁহাদের কিরূপ অবস্থা হইত? নবরত্নের সাররত্ন মহাকবি কালিদাস, মিথিলার মনুমেণ্ট বিদ্যাপতি, বীরভূমের অমর বৈজয়ন্তি জয়দেব ও চণ্ডীদাস, বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের বিজয়স্তম্ভ কাশীদাস ও কৃত্তিবাস যে পথের পথিক হইয়াছেন, তাঁহাদিগকেও সেই পথের যাত্রী হইতে হইত! ইহাঁদিগের ন্যায় তাঁহাদিগের জন্যও সহানুভূতির একটী দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে কেহ অগ্রসর হইত না! হায়, বাঙ্গালী জাতি, কবে তোমাদের এ কলঙ্ক দূর হইবে? কবে তোমরা সাহিত্য-সেবীর পূজা করিতে আরম্ভ করিবে?

বাঙ্গালী জাতি যদি গুণীর আদর করিতে জানিত, সাহিত্য-সেবীর স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে জানিত, তবে কি আজ আমাদিগকে তাঁহাদের জীবনী আলোচনা করিতে বসিয়া অন্ধকারের মধ্য দিয়া লেখনী চালনা করিতে হইত। আমরা যে জ্ঞান-সমুদ্রের তীর হইতে কতদূরে পড়িয়া আছি, তাহা ভাবিলেও স্তম্ভিত হইতে হয়।

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি সমসাময়িক— উভয়েই চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান থাকিয়া কাব্য-সুধা বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। বিদ্যাপতি মিথিলাধিপতির সভায় ও চণ্ডীদাস নান্নুরের বিশালাক্ষী দেবীর মন্দিরে থাকিয়া প্রেমসঙ্গীত গাহিতেন। কিন্তু বিদ্যাপতি অপেক্ষা চণ্ডীদাস খাঁটি ও শ্রেষ্ঠ প্রেমিক; গীতিকাব্যে তাঁহার অপেক্ষা উচ্চস্থান আর কাহাকেও দেওয়া যাইতে পারে না। তাঁহার ভাষা আড়ম্বরহীন ও বহুল উপমাবর্জ্জিত। বিদ্যাপতিকেও আমরা প্রগাঢ় প্রেমিক ও ভক্ত বলিয়া বার বার প্রণাম করি, কিন্তু তাঁহার ভাষা উপমা-বাহুল্যে ও অনাবশ্যক আড়ম্বরে ভারা-

ক্রান্ত। চণ্ডীদাসের কতিপয় অশ্রুসিক্ত পদ কুসুমের সুরভির ন্যায় প্রকৃতি আপনা আপনি দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া প্রচার করিতেছে—শিক্ষার কর্ষণ আবশ্যক হয় নাই। তদীয় গীতি কবিতার সরস অক্ষরে কণ্টকাকীর্ণ কুসুমের ন্যায় সুধা ও বিষমিশ্রিত প্রেমের কথা একত্র গ্রথিত রহিয়াছে—কাব্যক্ষেত্রে চণ্ডীদাস প্রভু কর্ম্মক্ষেত্রে চৈতন্য প্রভুর ন্যায় অন্য এক প্রেমাবতার। বিদ্যাপতির কবিতা টীকা টিপ্পনী দিয়া ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু চণ্ডীদাসের পদ যিনি নিজে আস্বাদ করিতে না পারিবেন, তাঁহার নিকট অপরাপর বৈষ্ণবীয় পদের সঙ্গে সেগুলি একই মূল্যে বিকাইবে। তাদৃশ পাঠক সম্বন্ধে বিদ্যাপতির কথায় বলা যাইতে পারে

> কাচ কাঞ্চন না জানয়ে মূল।
> গুঞ্জা রতন করাই সমতুল॥
> যো কিছু কভু নাহি কলা রস জান।
> নীরক্ষীর দুহুঁ করই সমান॥ (১)

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস সমসাময়িক হইলেও বিদ্যাপতি প্রথমে প্রেম-সঙ্গীত গাইতে আরম্ভ করেন, তাঁহার যশ-সৌরভে চণ্ডীদাসের যশ-সৌরভ চাপা পড়ায় তাহা বিস্তৃত হইতে কিছু বিলম্ব হয়ও চলাচল পক্ষেও কিছু ব্যাঘাত করিয়াছিল। কিন্তু চণ্ডীদাসের ভাব-সম্মিলন, অনুরাগ, স্বয়ং দৌত্য, খণ্ডিতা প্রভৃতিতে যে সৌন্দর্য্য ও কমনীয়তা আছে, তাহা বিদ্যাপতিতে নাই। অবশ্য বিদ্যাপতিও তাঁহাকে কোন কোন অংশে পরাজয় করিয়াছেন। বিদ্যাপতির প্রবাস, মান, রসোদ্গার, মাথুর, কল্লানার অমৃতময় সৌরভে টলটলায়মান। তাঁহাদের উভয়েরই নায়ক সেই প্রেমকেলি মুরলীধারী শ্রীকৃষ্ণ এবং নায়িকা সেই বিরহ-দুঃখ-কাতরা পাগলিনী শ্রীরাধিকা। প্রভেদ এই যে, চণ্ডীদাসের অধিকাংশ পদ রাধা ভাবে ও বিদ্যাপতির অধিকাংশ পদ সখা ভাবে চিত্রিত। চণ্ডীদাস কেবল প্রেমিক, বিদ্যাপতি প্রেমিক ও ভক্ত। এক জনের পদ তরল রসে ভরপুর, সহজ ভাবে মনোজ্ঞ, আর একজনের পদ চমৎকারিতায় মাতুয়ারা, গভীরতায় চিত্তহারা। বিদ্যাপতির কবিত্বশক্তি ঈশ্বর-প্রদত্ত—বিবিধ বিচিত্র ভাব অঙ্কনে সুদক্ষ, চণ্ডীদাসের কল্পনা স্বীয় নায়ককে কখন নাপিতানী, কখন দেয়াশিনী, কখন বৈদ্য, কখন ভুবাক বেশে সাজাইয়া নাটকাভিনায়কের ন্যায় সাজাইতে কৃতিত্ব দেখাইতে সক্ষম।

বিদ্যাপতি মিথিলার শৈবধর্ম্মাবলম্বী নরপতি শিব সিংহের প্রিয় সভাসদ ছিলেন। রাজা সময় সময় প্রজাগণের অবস্থা দেখিতে বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত করিতেন। চণ্ডীদাসের কবিত্ব-সৌরভ বিদ্যাপতির নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইলে ও রামীর সহিত তাঁহার অলৌকিক প্রেম-বন্ধন-সংবাদ কর্ণে পৌঁছিলে, তাঁহার সহিত একবার দেখা করিতে বিদ্যাপতির প্রবল বাসনা জন্মে। তিনি বাসনা চরিতার্থ করিবার অবসর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, দেখিতে দেখিতে অবসরও জুটিল। রাজা কোন কার্য্যোপলক্ষে বর্দ্ধমান জেলায় গমন করিতে উদ্যত হইলে, তিনিও তাঁহার সঙ্গ লইলেন। যথা সময়ে বর্দ্ধমানে উপনীত হইয়া বিদ্যাপতি রূপনারায়ণ রায় নামক এক ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া নান্নুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। চণ্ডীদাস এই সংবাদ

(১) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

জানিতে পারিয়া তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য লিখিত গ্রাম ত্যাগ করিয়া বর্দ্ধমানের রাস্তা বহিয়া চলিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহাদের মানসিক অবস্থা পদকল্পতরুর একটী গীতে ব্যক্ত হইয়াছে ;—

চণ্ডীদাস শুনি, বিদ্যাপতি গুণ, দরশনে ভেল অনুরাগ।
বিদ্যাপতি তব, চণ্ডীদাসগুণ, দরশনে ভেল অনুরাগ॥
দুহুঁ উৎকণ্ঠিত ভেল।
সঙ্গহি রূপনারায়ণ কেবল বিদ্যাপতি চলি গেল॥
চণ্ডীদাস তব রহই না পারই চললহি দরশন লাগি।
পন্থহি দুহুঁজন দুহুঁগুণ গায়ত দুহুহিয়ে দুহুরহু জাগি॥
দৈবহি দুঁহু দোঁহাদরশনা পাওল দেখই না পারই কোই।
দুহুঁ দোহঁনাম শ্রবণে তহি জানল রূপনারায়ণ গোই॥

চণ্ডীদাস বর্দ্ধমান অভিমুখে চলিতেছেন, বিদ্যাপতি বীরভূম অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন। পথিমধ্যে মধ্যাহ্ন সময়ে গঙ্গাতীরে এক বটবৃক্ষ মূলে উভয়ে উভয়ের সাক্ষাৎ পাইলেন। তথায় বসিয়া উভয়ে উভয়ের কবিত্ব, রসিকতা, পাণ্ডিত্য অনুভব করিতে লাগিলেন। চণ্ডীদাস বলিলেন,—

সময় বসন্ত, যাম দিন মাঝহি বট তলে সুরধুনীতীর।
চণ্ডীদাস কবি, রঞ্জনে খিলল, পুনক কলেবর নীর॥
দুহুঁজন ধৈরজ ধরই না পার।
সঙ্গহি রূপনারায়ণ কেবল দুঁহুক অবশ প্রতিকার॥ ধ্রু
ধৈরজ ধরি দুহুঁ, নিভৃতে আলাপই, পুছত মধুর রস কি?
রসিক হইতে কিয়ে, রস উপজায়ত, রস হইতে রসিক কোহি॥
রসিকা হইতে, কিয়ে হোয়ত রসিক হইতে রসিকা।
রতি হইতে প্রেম, প্রেম হইতে রতি, কিয়ে কাহে মানব অধিকা॥
পুছত চণ্ডীদাস, কবিরঞ্জনে, শুন তঁহি রূপনারায়ণ।
কহ বিদ্যাপতি, ইহ রস কারণ, লছিমা পদ পরিধ্যান॥

বিদ্যাপতির উত্তর,—

রসের কারণ, রসিকা রসিক কায়াটি ঘটনে রস।
রসিক কারণ রসিকা হোয়ত, যাহাতে প্রেম বিলাস॥
স্থূলত পুরুষে কাম সূক্ষ্মগতিঃ স্থূলত প্রকৃতি রতি।
দুহুঁক ঘটনে, যে রস হোয়ত, এবে তাহা নাহি গতি॥
দুহুঁক যোটন, বিনহি কখন, না হয় পুরুষ নারী।
প্রকৃতি পুরুষ যে কিছু হোয়ত, প্রেম পরচারি॥
পুরুষ অবশ প্রকৃতি সবশ, অধিক রস যে পিয়ে।
রতি সুখ কালে, অধিক সুখহি তা নাকি পুরুষে পায়ে॥
দুহুঁক নয়নে, নিকসয়ে বাণ, বাণ যে কামের হয়।
রতির যে বাণ, নাহিক কাসম, তবে কৈছে নিকসয়॥
কাম দাবানল, রতি যে শীতল, সলিল প্রণয় পাত্র।
কুল কাট খড়, প্রেম যে আধেয়, পছনে পিরিতি পাত্র॥
পচনে পচনে, লোভ উপজিয়া, যব ভেল দ্রবময়।
সেই বস্তু এবে, বিলাসে উপরে তাহাকে রস যে কয়॥
ভণে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস তথি, রূপনারায়ণ সঙ্গে।
দুঁহু আলিঙ্গন, করল তখন, ভাষাল প্রেম তরঙ্গে॥

উত্তর প্রদানান্তর দুই কবি দৃঢ় আলিঙ্গনবদ্ধ হইলেন। পরে উভয়ের কুশল বার্ত্তাদি জানার পর, তথায় অনেকক্ষণ বসিয়া উভয়ে উভয়ের পাণ্ডিত্য, রসিকতা পরীক্ষা করিয়া একত্রে নান্নুরে আগমন করিলেন। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতিকে নিজের ভ্রাতা নকুল ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের সহিত আলাপ পরিচয় করাইয়া দিলেন। তাঁহার জনক জননী পূর্ব্বেই স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন, তাহারা স্বর্গ হইতে কবিবর বিদ্যাপতি ঠাকুরের চরণ স্পর্শে স্বীয় কুটীর পবিত্র হইতে দর্শন করিলেন। পথিমধ্যে সুরধনী তীরে বটবৃক্ষ মূলে যেখানে উভয় কবির প্রথম সাক্ষাৎ হয়, সেই স্থানেই তাঁহারা স্নানাদি করিয়াছিলেন। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে তাঁহারা নান্নুরে চণ্ডীদাস কুটীরে উপনীত হন। বিদ্যাপতির অভ্যর্থনার নিমিত্ত চণ্ডীদাস পূর্ব্বেই আয়োজন করিয়াছিলেন। সন্ধ্যার সময় রূপ নারায়ণের সহিত তাঁহাকে পরিতোষ পূর্ব্বক অন্যান্য ব্যঞ্জনাদির সহিত 'জিলেপি, মালপা, সীতামিশ্র' আদি মিষ্টান্ন

ভোজন করাইলেন। আহারান্তে উভয় কবি অনেকক্ষণ আলাপাদি করিয়া শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

পর দিবস প্রাতঃকালে উভয়ে শয্যাত্যাগ করতঃ স্নান করিয়া বিশালাক্ষীর মন্দিরে দেবী সন্দর্শনার্থ গমন করিলেন। চণ্ডীদাস নানাবিধ সুগন্ধী পুষ্প দিয়া সভক্তি চিত্তে বিশালাক্ষীর পূজা করিতে বসিলেন, বিদ্যাপতি নিকটে বসিয়া ছল ছল নেত্রে দেবীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন। পূজা শেষ হইলে উভয়ে একত্রে জগদ্ধাত্রীর রাতুল চরণে পুষ্পাঞ্জলী প্রদান করিলেন।

মধ্যাহ্ন সময়ে আহারাদির পর বিদ্যাপতি রাম মণির সহিত দেখা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। চণ্ডীদাস প্রথমে সেকথা উড়াইয়া দিলেন, পরে তাঁহার নিতান্ত আগ্রহ দেখিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া রজকিনীর আলয়ে গমন করিলেন। বিদ্যাপতি রজকিনীর সহিত আলাপ করিয়া প্রীত ও তাহার অকৃত্রিম প্রেম ও ভক্তিনিষ্ঠা দর্শনে বিস্মিত হইয়া বলিলেন, 'রজকিনী সামান্যা স্ত্রী নহে।' রামমণির প্রতি চণ্ডীদাসেরও অত্যধিক আসক্তি ও ভালবাসা দেখিয়া বিদ্যাপতির মনে হইল, চণ্ডীদাসের কথাই সত্য, চণ্ডীদাস 'মরিয়া হইবে রজকের ঝি।'

তৎপর তাঁহারা চণ্ডীদাসের কুটীরে প্রত্যাগমন করিলেন। তথায় কিয়দ্দিবস সুখে অবস্থান করিয়া বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া বর্দ্ধমান যাত্রা করিলেন। তাঁহাদের আর কখনো দেখা হয় নাই, তবে মধ্যে মধ্যে উভয়ে উভয়ের সংবাদ লইতেন ও তাঁহাদের কবিতা উপহার আদান প্রদান চলিত।

চণ্ডীদাস আজন্ম দুঃখে প্রতিপালিত, তাই তিনি দুঃখের কবি। দুঃখের সহিত মনের ভাবগুলি সহজ ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি প্রাচীন কবিকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। চণ্ডীদাসের সুখ দুঃখে সমান জ্ঞান। জগৎকে তিনি প্রেমময় বলিয়া জ্ঞান করিতেন। সুদীর্ঘ বিরহের পর মিলনেও তাঁহার সুখ নাই। তিনি সুখের মধ্যে দুঃখের অগ্নিশিখা অনুভব করেন, দুঃখের মধ্যে সুখের শীতল কণা তাঁহার গাত্র স্পর্শ করে। তাঁহার সুখের মধ্যেও আশঙ্কা অথচ দুঃখের প্রতিও অনুরাগ। বিদ্যাপতি সুখের কবি, অল্পতেই ধৈর্য্য-হারা হইতেন,—বিরহে কাতর হইয়া পড়িতেন। পৃথিবীর মধ্যে প্রেমকেই তিনি শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতেন।

বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস কত দিন হইল, এই নশ্বর জগৎ ত্যাগ করিয়া মহা প্রস্থান করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে স্মরণ করিবার কোন চিহ্নই নাই—কোন স্মৃতি-স্তম্ভই ধরণীর মূক বক্ষে দণ্ডায়মান থাকিয়া অতীতের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় না। কেবল তাঁহারা কাব্যোদ্যানে যে অতুলনীয় সৌন্দর্য্য রাখিয়া গিয়াছেন, সেই সৌন্দর্য্যে, সেই সৌরভে অদ্যাপিও আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। বিস্মৃত হইতে গেলেই তাঁহাদের সেই অমর বীণার অমর কাব্য-রাগিণী আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিয়া বিহ্বল করিয়া ফেলে।

"Sweet Bidyapati ; sweet Chandidas ? the earliest stars in the firmament of Bengali literature ! Long, long will your strains be remembered and sung in Bengal ;" *

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

* Literature of Bengal, R. C. Dutt.

রাজা বিজয় সিংহ।

শ্রীহট্ট জেলার প্রাচীন হিন্দু রাজাদের মধ্যে রাজা বিজয়সিংহ ব্রাহ্মণ জাতীয় ছিলেন। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনশীল ক্ষমতার বলে, তাঁহার নাম ভিন্ন ভিন্ন জেলায় দূরে থাকুক, স্বদেশীয়দের মধ্যেই লুপ্তপ্রায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তবে শ্রীহট্ট জেলার সর্ব্বস্থানে এখনও তাঁহার নাম কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে দেশের লোকের অবস্থা ও আচরণ যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে ভবিষ্যতে যে এ জেলায় প্রাচীন হিন্দু রাজাদের নাম ঘোষিত হইবে, এরূপ আশা করা যায় না।

বর্ত্তমান সুনামগঞ্জ সবডিবিসনের অন্তর্গত আতুয়ান পরগণার জগন্নাথপুর গ্রামে রাজা বিজয় সিংহের রাজধানী ছিল। গ্রামের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলেও রাজবাড়ীর পরিচয় পাওয়া যায়। অনেক চেষ্টা করিয়া, উক্ত রাজার বংশধর উক্ত জগন্নাথপুর-গ্রাম-নিবাসী স্বর্গীয় রামনারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয়ের সংগৃহীত লিপি হইতে, অতি সংক্ষেপে, উক্ত রাজার আদিপুরুষ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্তের বিবরণ যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, নিম্নে বিবৃত করিলাম।

অতি প্রাচীন কালে কাত্যায়ন গোত্রীয় রমাকান্ত মিশ্রি নামধেয় রাঢ় দেশীয় জনৈক শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ নিজ দেশ ছাড়িয়া ভিন্ন দেশে বাস করার অভিপ্রায়ে শ্রীহট্ট জেলায় আসিয়া উপস্থিত হয়। তিনি শ্রীহট্টের নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে লাউড় পরগণাতে একটী প্রকাণ্ড বাড়ী প্রস্তুত করতঃ বাস করিতে থাকেন। ক্রমান্বয়ে তাঁহার পাঁচ পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে প্রথম পুত্রের নাম কেশব মিশ্রি, দ্বিতীয় পুত্রের নাম রঘুপতি মিশ্রি, অপর তিন জনের নাম জানিতে পারি নাই। উক্ত পাঁচ পুত্র মধ্যে প্রথম পুত্র কেশব মিশ্রি উপরোক্ত জগন্নাথপুর গ্রামে আসিয়া বাড়ী প্রস্তুত করেন। দ্বিতীয় পুত্র রঘুপতি মিশ্রি শ্রীহট্টের ইটা পরগণার ব্রাহ্মণ বংশীয় অন্যতম রাজা সুবোধ নারায়ণের কন্যা বিবাহ করিয়া ভূমিউড়া, পাঁচগাও, পশ্চিম ভাগ, সুরানন্দ ও এওলাতলী নামক পাঁচ খানা গ্রাম যৌতুক স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া তথায় ভট্টাচার্য্য উপাধি ধারণে বাস করিতে থাকেন। ইদানীং তাঁহার বংশধরেরা ভট্টাচার্য্য, চৌধুরী ইত্যাদি উপাধি ধারণে উক্ত ভূমিউড়া প্রভৃতি গ্রামে সসম্মানে বাস করিতেছন। যাহাদের নাম অজ্ঞাত, সেই তিন পুত্র মধ্যে এক জন ৺ কাশীযাত্রা করেন। একজন শ্রীহট্ট জেলায় কশবা বানিয়াচুঙ্গ আসিয়া প্রকাণ্ড বাড়ী প্রস্তুত করিয়া বাস করিতে থাকেন। এবং অন্যজন আজও লাউড়ের বাড়ীতেই থাকেন।

উপরোক্ত কেশব মিশ্রির এক পুত্র জন্মে, তাঁহার নাম শনাই কুর, তদীয় পুত্র প্রজাপতি, তাঁহার পুত্র দুর্ব্বার খাঁ, তদীয় পুত্র রাজ পণ্ডিত, তাঁহার দুই পুত্র, জয় সিংহ ও বিজয় সিংহ। উক্ত বিজয় সিংহই অবশেষে মুরশিদাবাদের নবাব হইতে রাজা উপাধি পাইয়া রাজা বিজয় সিংহ নামে অভিহিত হন।

ঐ সময়ে লাউড়ের বাড়ীতে যিনি ছিলেন, তাঁহার বংশলোপ হইয়া যায়। কশবা বানিয়চুঙ্গে যিনি আসিয়াছিলেন, তাঁহার বংশে গোবিন্দ চন্দ্র ঠাকুর বর্ত্তমান ছিলেন। উক্ত গোবিন্দ চন্দ্র ঠাকুরের পূর্ব্ববর্ত্তীদের বিবরণ জানিতে না পারায় এস্থলে তাহা বিবৃত হইল না।

কথিত জয় সিংহ, বিজয় সিংহ ভ্রাতাদ্বয় এবং কশবা বানিয়াচুঙ্গের গোবিন্দ চন্দ্র ঠাকুরের জমিদারী একত্রে এজমালীতে ছিল। তাহার চতুঃসীমা—পূর্ব্বে রাজা সুবোধ নারায়ণ ও আখালীয়ার দস্তিদারের স্বত্ব, পশ্চিমে জেলা ময়মনসিংহ, উত্তরে-লাউড়ের উত্তর সীমা, দক্ষিণে রাজা সুবোধ নারায়ণ ও তরফের মজুমদারের স্বত্ব। এই চতঃসীমার অন্তর্গত পূর্ব্ব পশ্চিম অনুমান ৫০ মাইল এবং উত্তর দক্ষিণ অনুমান ৬০ মাইল পরিমিত স্থানে ইহাঁদের জমিদারী বিস্তৃত ছিল। বর্ত্তমানে বানিয়াচুঙ্গ, নবিগঞ্জ, ছাতক, দিরাই, সুনামগঞ্জ, ধর্ম্মপাশা, জগন্নাথপুর, আবিদাবাদ, বিশ্বনাথ, তাহিরপুর ও পাণ্ডুয়া, এই এগারটী পুলীশ ষ্টেশন ও আউট পোষ্টের এলাকাভুক্ত সমস্ত স্থান তাঁহাদের জমিদারীর অন্তর্গত ছিল বলিয়া সরকারী কাগজাদিতে দৃষ্ট হয়। এই জমিদারী মুরশিদাবাদের নবাবের অধীনস্থ করদ রাজ্য ছিল।

একদা নবাব সাহেব উক্ত গোবিন্দচন্দ্র ঠাকুরের কোন অন্যায় আচরণে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার জাতিনাশ করতঃ হবিব খাঁ বলিয়া তাঁহার নাম দিয়াছিলেন। তদবধি তাঁহার নাম গোবিন্দচন্দ্র ওরকে হবিব খাঁ হইয়াছিল। ইহার পর অনেক দিন গত হইলে, জয়সিংহের মৃত্যুর পরে, উক্ত হবিব খাঁ নবাব সরকারে যাইয়া বিজয় সিংহের কথা গোপন রাখিয়া কোনও প্রকারে নবাবের মনোরঞ্জন করতঃ "দেওয়ান হবিব খাঁ।" উপাধি ধারণে উপরোক্ত সমস্ত সম্পত্তির সনদ গ্রহণ করেন। এবং দেশে আসিয়া বিজয় সিংহকে সম্পত্তি হইতে বেদখল করিতে আরম্ভ করেন।

অনন্তর বিজয় সিংহ, হবিব খাঁ নবাবকে ফাঁকি দিয়া দেওয়ান উপাধি ধারণে সমস্ত সম্পত্তির সনদ লইয়া আসিয়াছেন, জানিতে পারিয়া, যথাকালে নবাব সদনে যাইয়া হবিব খাঁর অন্যায় চতুরতার কথা জ্ঞাপন করতঃ নিজ দুঃখ জানাইলে পর, নবাব বাহাদুর হবিব খাঁর অন্যায় চাতুরী বুঝিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন এবং তৎকালে তাঁহার সনদ রহিত করিয়া বিজয় সিংহকে রাজা উপাধি দিয়া তাম্রখণ্ডে উক্ত সমস্ত সম্পত্তির সনদ দিয়াছিলেন।

রাজা বিজয় সিংহ এইরূপে নবাব হইতে তাম্রখণ্ডে সমস্ত সম্পত্তির সনদ প্রাপ্ত হইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ সমস্ত সম্পত্তি রশাসন সংরক্ষণ আরম্ভ করিলেন। এদিকে দেওয়ান হবিবখাঁ রাজা বিজয় সিংহের রাজা উপাধি ও তাম্রখণ্ডে সমস্ত সম্পত্তির সনদ প্রাপ্তির বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, যথাশক্তি রাজা বিজয় সিংহকে বেদখল রাখার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহাতে উভয় মধ্যে ক্রমে ঘোরতর বিবাদ বাড়িয়া উঠে। কিন্তু কেহই কাহাকে পরাস্ত করিতে পারেন না, দেখিয়া আপোশের প্রস্তাব করিয়া, যার যার সীমা নির্দ্ধারণ জন্য একটী তারিখ ধার্য্য করেন। তাহাতে কথা হয় যে, নির্দ্ধারিত দিনে অতি প্রত্যূষে উভয়ই উভয়ের বাড়ী হইতে অশ্বারোহণে

রওয়ানা হইবেন এবং যে স্থানে আসিয়া উভয়ের মিলন হইবে, সেইস্থানেই উভয়ের মধ্যে সীমানা ধার্য্য করা যাইবে।

তদনুসারে রাজা বিজয় সিংহ নির্দ্দিষ্ট দিনে আপন রাজধানী হইতে প্রত্যূষে অশ্বারোহণে রওয়ানা হইয়া কশবা বানিয়াচুঙ্গের নিকটবর্ত্তী সকুটি নদীর তীরে আসিলে দেওয়ান হব্বিখাঁর সহিত সাক্ষাৎ হয়। তাহাতে প্রায় বার আনা সম্পত্তি রাজা বিজয় সিংহের অধিকারে পড়িয়াছে দেখিয়া হব্বি খাঁ উক্তরূপ সীমা নির্দ্ধারণে অস্বীকৃত হইয়া অন্যরূপ মীমাংসার প্রস্তাব করেন। কিন্তু রাজা বিজয় সিংহ সেই প্রস্তাবে অসম্মতি জানাইয়া নিজালয়ে প্রত্যাগমন করেন। তাহাতে এ বিবাদ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বাড়িয়া উঠে।

অতঃপর দীর্ঘকাল বিবাদের পর রাজা সুবোধনারায়ণ প্রভৃতি নিরপেক্ষ জমিদারগণ মধ্যবর্ত্তী হইয়া সমস্ত সম্পত্তির ষোল আনার ৷৷৶০ দশ আনা অংশ দেওয়ান হব্বি খাঁ ও ৷৶ ছয় আনা অংশ রাজা বিজয় সিংহকে দিয়া সমস্ত বিবাদ মিটাইয়া দেন। তদবধি খালিশা ও মুজরাইর সৃষ্টি হয়। দেওয়ান হব্বি খাঁর দশ আনী হিস্যা মুজরাই ও রাজা বিজয় সিংহের ছয় আনী হিস্যা খালিশা নামে অভিহিত হয়। তদনুসারে তাঁহাদের জমিদারীর প্রত্যেক পরগণার ছয় আনা অংশ খালিশা ও দশ আনা অংশ মুজরাই বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। শ্রীহট্ট জেলার বর্ত্তমান কালেকটারি তদন্ত করিলেও উক্ত খালিশা ও মুজরাইর মৌজাওয়ারির মোট জমি জমার সহিত হার করিলে খালিশাতে ছয় আনা ও মুজরাইর দশ আনা পরিমাণ জমি জমা ধার্য্য থাকা দৃষ্ট হয়।

কথিত আছে, রাজা বিজয় সিংহ রাজা হওয়ার পর, প্রতিবৎসর মাসে মাসে প্রত্যেক দিন একটী নূতন পুষ্করিণী খনন করিয়া সদ্য উত্থিত জল দ্বারা স্নান করিতেন। রাজঅন্নে প্রতিপালিত ৭০০ সাত শত ঘর ব্রাহ্মণ ছিল। ঐ সকল ব্রাহ্মণের প্রত্যেক পরিবারের জন্য তিনি এক একখানা বাড়ী প্রস্তুত ও এক একটী পুষ্করিণী খনন করিয়া দিয়াছিলেন। উক্ত ৭০০ সাত খান বাড়ী ও ৭০০টী পুষ্করিণী এখনও জগন্নাথপুর গ্রামে রাজবাটীর পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে বিদ্যমান আছে। এতদ্ ব্যতীত রাজা বিজয় সিংহের কৃত আরও অনেক সরোবর সদৃশ দীঘী বর্ত্তমান আছে। ঐ সকল দীঘীর দৈর্ঘ্য বিস্তার দেখিলে তাহা রাজা ব্যতীত অন্যের দ্বারা খনিত হওয়া সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না।

ইহা ছাড়া, বর্ত্তমান বিশ্বনাথ আউট পোষ্টের এলাকায়, পুরকায়স্থের বাজারের কিয়দ্দূর পশ্চিমে, রাজা বিজয় সিংহের কাছারী বাড়ী বলিয়া একটী প্রকাণ্ড বাড়ী ও বড় দীঘী বিদ্যমান আছে। বর্ত্তমান অবস্থানুসারেও তাহা রাজার কাছারী বাড়ী বলিয়াই মনে হয়। অধিকন্তু রাজা বিজয় সিংহের বর্ণিত আদিপুরুষ রমাকান্ত মিশ্রি লাউড়ে যে বাড়ী প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সেই বাড়ী খানি এখনও বর্ত্তমান আছে। তাহাও রাজা বিজয় সিংহের কাছারী বলিয়া বিখ্যাত আছে।

রাজা বিজয় সিংহের বংশধরেরা চৌধুরী উপাধি ধারণে বর্ত্তমানে উক্ত জগন্নাথপুর গ্রামে রাজবাড়ীতেই সসম্মানে বাস করিতেছেন, এবং দেওয়ান হব্বি খাঁর বংশধর দেওয়ান আজমান রজা সাহেব কশবা বানিয়াচুঙ্গে খুব সম্মানের সহিত বাস করিতেছেন।

ইহা ছাড়া, কশবা বানিয়াচুঙ্গে যে সকল কাত্যায়ন গোত্রীয় ব্রাহ্মণ এবং বেত-কান্দি-নিবাসী চোধুরী উপাধিধারী যে সকল কাত্যায়ন বর্ত্তমান আছেন, তাঁহারাও পূর্ব্বোক্ত রমাকান্ত মিশ্রির বংশধর বলিয়া অনুমিত হয়।

উপসংহারে পাঠক মহোদয়গণ সমীপে প্রার্থনা এই যে, কোন স্বদেশহিতৈষী মহাত্মা, রাজা বিজয় সিংহের বংশের এতদতিরিক্ত বিশেষ বিবরণ প্রমাণ সহ অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে জানাইলে এবং কথিত বিবরণে কোন ভ্রম থাকিলে প্রমাণ সহ তাহা ধরিয়া দিলে চিরবাধিত হইব।

শ্রীতারানাথ চৌধুরী।

পৃথিবী কি অচলা নয় ?

প্রতিবাদ।* (১)

গত আষাঢ় মাসের নব্যভারত 'পৃথিবী কি অচলা নয়?' শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়ের মত এই যে, পৃথিবী অচলা, আর সূর্য্য পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে, তাহাতেই দিনের পর রাত্রি, আর রাত্রের পর দিন আসিতেছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অন্য রকম সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এমন এক সময় ছিল, যখন তাঁহারাও ভাবিতেন, সূর্য্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে এবং তাহাতেই দিবা রাত্রি হইতেছে; কিন্তু সে মত বহুদিন হইল পরিত্যক্ত হইয়াছে। এখনকার একরূপ সর্ব্ববাদীসম্মত মত এই যে, পৃথিবী আপনার মেরুদণ্ডের চারিদিকে আবর্ত্তিত হইতেছে এবং উহাই দিবা রাত্রির কারণ। অতবড় সূর্য্য এবং অন্যান্য নক্ষত্রাদি যে সকলেই একই সময়ে (২৪ ঘণ্টায়) পৃথিবীকে বেষ্টন করিতেছে, এরূপ বিবেচনা করা অপেক্ষা, পৃথিবী স্বয়ংই ২৪ ঘণ্টায় একবার মেরুদণ্ডের চারি দিকে আবর্ত্তিত হইতেছে, এরূপ বিবেচনা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। অধিকন্তু পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে বেগে ঘুরিতেছে। দিবা রাত্রি ভেদের কারণ লইয়া তর্ক করিবার দিন আর নাই।

যাহা হউক, উপরিউক্ত প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় বলিতেছেন যে, পৃথিবীকে অচলা বলিবার কারণ পাওয়া গিয়াছে; কারণ এই;—"পৃথিবী যদি সচলা হইবে, বেগে ঘুরিতে থাকিবে, তবে পক্ষী স্বীয় কুলায় পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে আবার প্রত্যাগমন করিতে পারে? পৃথিবী সচলা হইলে উহা সম্ভব হইত না, কাজেই পৃথিবী অচলা"। এ আপত্তির যুক্তিসঙ্গত উত্তর দিতে না পারা পর্য্যন্ত, অবশ্য, পৃথিবী সচলা একথা জোর করিয়া বলা চলেনা; কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ আপত্তি নূতন নহে, অখণ্ডনীয়ও নহে, বহুদিন হইল ইহার উত্তর পাওয়া গিয়াছে। এখনকার দিনে বড় কেহ, এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করিয়া পৃথিবীকে অচলা বলিতে চাহেন না। তথাপি পৃথিবী সচলা, এই পরীক্ষিত সত্য মানিয়া লইয়া যে ২ ব্যাপারগুলিকে ঐ সত্যের বিঘ্ন বলিয়া মনে হয়, উক্ত বিষয়ের মীমাংসা করিতে

* নব্যভারতে এ সম্বন্ধে অনেক বাদ প্রতিবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে আর বাদ প্রতিবাদ প্রকাশিত হইবে না। ন, স।

চেষ্টা করা সুবুদ্ধির কার্য্য এবং তদ্দ্বারা জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

উপরিউক্ত আপত্তির মীমাংসা করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানা আবশ্যক :—

(১) জড় পদার্থ আপনা হইতে চলিতে পারে না, আর যদি গতিবিশিষ্ট হয়, তবে আপনা হইতে থামিতেও পারে না—যে বেগে যে দিকে চলিতেছে, সেই বেগে সেই দিকে ক্রমাগত চলিতেই থাকিবে। জড়ের এই ধর্ম্মকে 'নিশ্চেষ্টতা' আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে।

(২) জড় পদার্থকে গতি বিশিষ্ট করিতে হইলে, কি ইহার গতির পরিবর্ত্তন করিতে হইলে, বাহির হইতে ইহার উপর 'বল' প্রযুক্ত হইবার আবশ্যক।

মহামতি নিউটন গতির এই নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করা যাইতে পারে, এমন কোন প্রমাণ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

এই বিষয়গুলি স্বীকার করিয়া লইলে আর উপরিউক্ত আপত্তির মীমাংসা করা কঠিন হইবে না। পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে বেগে ঘুরিতেছে, সেই সঙ্গে২ পৃথিবীর উপরিস্থিত বায়ুরাশি, গাছ পালা ও অন্যান্য দ্রব্যও বেগে ঘুরিতেছে। ধরাপৃষ্ঠবাসী ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল জীবই বেগে ঘূর্ণ্যমান হইতেছে। বৃক্ষের উপর বসিয়া পক্ষীও বেগে ঘুরিতেছে। সহসা যদি পৃথিবীর সহিত পক্ষীর সম্বন্ধ ঘুচিয়া যায়, এমন কি, পৃথিবীর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ পায়, তাহা হইলেও, যদি বাহির হইতে পক্ষীর উপর কোন বল প্রযুক্ত না হয়, তবে উহা পূর্ব্ব বেগে চলিতে থাকিবে। তাই উড্ডীয়মান অবস্থাতেও পক্ষী পৃথিবীর সঙ্গে২ বেগে ঘুরিতে থাকে, পৃথিবী উহাকে ছাড়িয়া যায় না; তাই পাখী যদি তাহার বৃক্ষ ছাড়িয়া খানিকটা দূর উড়িয়া যায়, তাহা হইলে উহার বৃক্ষের সহিত চিরবিচ্ছেদের সম্ভাবনা উপস্থিত হয় না,—যে পথে যতখানি যায়, ফিরিয়া সেইপথে তত খানি আসিলেই পুনরায় স্বীয় নীড়ে উপস্থিত হইতে পারে।

উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটী ব্যাপারের উল্লেখ করা যাইতে পারে :—

বেগে যাইবার সময় গাড়ীর ভিতর হইতে একটা দ্রব্য ফেলিয়া দিলে উহা মাটীতে পড়িবার কালে গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে আসিতে থাকে, তাই গাড়ীর ভিতর হইতে জ্ঞান হয় যেন উহা ঠিক খাড়াভাবে মাটীতে পড়িল।

অশ্ব যখন বেগে দৌড়িতে থাকে, তখন অশ্বারোহী উল্লম্ফন করিয়া পুনরায় অশ্বপৃষ্ঠে পতিত হয়—অশ্বপৃষ্ঠ পরিত্যাগ করিলেও আরোহীর অশ্বের সঙ্গে২ একটা গতি থাকে, অশ্ব তাহাকে ছাড়িয়া যায় না।

গাড়ী যখন বেগে যায়, তখন তাহার ভিতর হইতে মাটীতে লাফাইয়া পড়িলে সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতে হয়।

জড়ের নিশ্চেষ্টতা ধর্ম্ম হইতেই উক্ত ব্যাপার সমূহ সংঘটিত হইয়া থাকে। যদি জড়ের নিশ্চেষ্টতা ধর্ম্ম না থাকিত, তাহা হইলে পৃথিবী ও সৌর-পরিবারস্থ অন্যান্য গ্রহবর্গ স্বীয়২ উপগ্রহবর্গের সহিত বিশাল সূর্য্যদেহে নিপতিত হইয়া লয় প্রাপ্ত হইত, আমাদের আর তর্ক করিবার অবসর থাকিত না। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

প্রতিবাদ। (২)

পৃথিবীর অচলত্ব ও সচলত্ব লইয়া তের-শত নয় ও দশ সনের নব্যভারতে যতদুর বাদ প্রতিবাদ হইয়া গিয়াছে, তাহাতে মনে করা গিয়াছিল, প্রশ্নকর্ত্তা বা তাঁহার মতাবলম্বী-গণ তাহাতেই (অন্ততঃ সঙ্কে সেই কয়েকটী প্রশ্নের উত্তরে) সন্তুষ্ট হইয়াছেন বা আলো-চনা অনাবশ্যক মনে করিয়াছেন। এখন দেখা যাইতেছে যে, কথাটা চাপা পড়ে নাই। অবশ্য এরূপ আলোচনা দোষের বিষয় নহে। বরং সম্পূর্ণরূপে সুফলপ্রদ; বিশেষতঃ আমাদের ন্যায় অজ্ঞের পক্ষে।

কিন্তু গত সংখ্যা নব্যভারতে "পৃথিবী কি অচলা নয় ?" শীর্ষক যে একটী প্রবন্ধ বা প্রশ্ন প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা আমাদের বিশেষ কোন উপকারে আসিবে বলিয়া বোধ হয় না। যেহেতু তেরশত নয় সনের নব্যভারতে প্রকাশিত মূল প্রশ্নাবলী হইতে লেখক একটী কথা উদ্ধৃত করিয়া কেবল ইহা ঠিক, ইহা ঠিক নয়, এই রকমের দুই চারিটী কথার দ্বারায় স্বকীয় অভিমত ব্যক্ত করি-য়াছেন মাত্র। প্রশ্নটীর প্রমাণ কল্পে বা পূর্ব্বপ্রদত্ত উত্তর সমূহ খণ্ডনের নিমিত্ত কোন প্রকার যুক্তি তর্কের অবতারণা করিলে আমরা বিশেষ উপকৃত হইতাম

যাহা হউক, লেখকের বিরুদ্ধ পক্ষ হইতে যে সমস্ত উত্তর প্রদত্ত হইয়াছিল, এখন দেখা যাইতেছে, তাহা আরও বিশদ হওয়া উচিত। আকাশমার্গে উড্ডীয়মান পক্ষীর গতিশীলা পৃথিবীস্থ বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন সম্ভব কি অস-ম্ভব, এইটী মীমাংসার পূর্ব্বে পৃথিবীর এলাকা অবধারণ বিশেষ আবশ্যক করে। পৃথিবীর এলাকার কথা মনে রাখিয়া আলোচনা করিলে প্রশ্নটীর বিশেষ কোন গুরুত্ব থাকে বলিয়া বোধ হয় না। এই তিন ভাগ জল, একভাগ স্থল-সমন্বিত ২৫ হাজার মাইল পরিধি-বিশিষ্ট জড় পৃথিবী বাদে, আমরা প্রশ্নকর্ত্তাকে আরও একটু অগ্রসর হইতে অনুরোধ করি। বৃক্ষের গোড়াটী পৃথিবী পৃষ্ঠে থাকাহেতু তাহার শাখা পল্লবাদিকেও যদি পৃথিবীস্থ বলিয়া মনে করা যায়, তাহা হইলে পৃথিবী-সংলগ্ন বায়ুর উর্দ্ধ শেষ সীমা পর্য্যন্ত ৫০ মাইল ব্যাপিয়া স্থানকেও আমরা পৃথিবী বলিতে বাধ্য। যেহেতু, আশীর্ষ বৃক্ষ ও এই বায়ু-সমুদ্র, নদী হ্রদ পর্ব্বতাদির ন্যায় পৃথিবীর সহিত ঘনিষ্টভাবে সংসৃষ্ট; কাহা-রও পৃথিবীকে ছাড়িয়া এক পদ অগ্রসর হইবার বা পিছাইয়া পড়িবার সাধ্য নাই। বহু দূরবর্ত্তী চন্দ্রমণ্ডলের কথা না হয় ছাড়ি-য়াই দেওয়া গেল।

এখন কথা হইতেছে এই যে, উড্ডীয়মান পক্ষী এই বায়ু-সমুদ্র ছাড়াইয়া যায় কি না ? এবং পৃথিবীকে গতিশীল মনে করিয়া লইলে বায়ুরাশিরও সংসহ গতি থাকা অসম্ভব কি না ? প্রথম প্রশ্নের উত্তর অনাবশ্যক। পৃথিবীর সহিত সংলগ্নাবস্থায় বায়ুর গতি না থাকিলে, চলন্ত রেলগাড়ীর আরোহীর ন্যায় বায়ু ভেদ হেতু আমরাও পৃথিবীতে বসিয়া অহর্নিশি বায়ুর আঘাত সহ্য করি-তাম। সুতরাং পৃথিবীর সহিত সংসৃষ্ট ও তাহারই সহিত একত্রে গতিশীল বায়ুতে ভাসমান পক্ষীর পক্ষে নিজ বাসায় ফিরিয়া আইসা অসম্ভব কিসে হইল ? পৃথিবী বায়ুকে ছাড়িয়া বা বা বায়ু ভেদ করিয়া চলিলে কথাটী খাটিত। কিন্তু পূর্ব্বে প্রমাণ করা গিয়াছে, তাহা অসম্ভব। চলন্ত ট্রেণ হইতে একটী পক্ষী কয়েক ঘণ্টা উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া যদি পূর্ব্বস্থানে নামিয়া আইসে, তাহা হইলে

সেই পক্ষীটার ট্রেণ পাইবার পক্ষে যেরূপ অবস্থা হয়, সেই অবস্থার সহিত লেখকের উড্ডীয়মান পক্ষীর অবস্থার সহিত তুলনা হইতে পারে। যেহেতু ট্রেণ খানা যে বায়ু ভেদ করিয়া চলিতেছিল, পক্ষীটীও সেই বায়ুর উপর প্রায় নিশ্চল অবস্থায় (ট্রেণের গতির তুলনায়), ভাসমান ছিল। সুতরাং তাহার পক্ষে আর ঐ ট্রেণ পাওয়া সাধ্যায়ত্ব ছিল না।

পৃথিবী অচল কি সচল, সে ভিন্ন কথা। গেলিলিও ও ভাস্করাচার্য্যের গোঁড়ামি করা আরও ভিন্ন কথা। কিন্তু লেখকের পক্ষে "পাষাণের ন্যায় অটল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত" প্রমাণটীকে পাখার চোটে উড়াইয়া দিয়া সচলা পৃথিবী হইতেও উড্ডীয়মান পক্ষীকুল যে অনায়াসেই নিজ নিজ নীড়ে ফিরিয়া আসিতে পারে,তাহাতে অবিশ্বাস বা সন্দেহ করিবার প্রমাণ কি আছে?

শ্রীআমানত উল্যা আহম্মদ।

প্রতিবাদ। (৩)

বিগত জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যা নব্যভারতে "পৃথিবী কি অচলা নয়?" ইতি শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র সেন মহাশয়, অধুনাতন পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর পৃথিবীর গতি সম্বন্ধীয় মত ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করায় মানসে, প্রাচীন সূর্য্যসিদ্ধান্তের মতের দোহাই দিয়া প্রতিবাদ আহ্বান করিয়াছেন। পৃথিবী সচলা হইলে উড্ডীয়মান বিহগের নীড়প্রাপ্তি অসম্ভব। এই ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়াই তিনি প্রধানতঃ পৃথিবীকে অচলা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। আমরা নিম্নে যথাসাধ্য তাঁহার যুক্তি খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিব।

যে সকল পদার্থ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের শাসনাধীনে থাকিয়া, সচল অথবা নিশ্চল অবস্থাতে ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন আছে, সেই সমস্ত পদার্থ লইয়াই পৃথিবী। যাবতীয় সত্ত্বাবান পদার্থই মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আয়ত্বাধীন। এই মহতী শক্তির প্রভাবেই আমরা ভূপৃষ্ঠে দাঁড়াইয়া অনন্তের পথে স্খলিত হইতেছি না এবং এই শক্তির প্রভাবেই বায়ু-মণ্ডল পৃথিবী পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ। সুতরাং মৃত্তিকা, ভূধর এবং সাগরাম্বুরাশি যেমন পৃথিবীর বিষয়ীভূত, তেমন এই বিরাট বায়ুমণ্ডলও পৃথিবীর এক বিরাট অংশ ব্যতীত আর কিছুই নহে এবং এই বায়ু-মণ্ডল যেখানে যাইয়া শেষ হইয়াছে, তাহাই পৃথিবীর প্রকৃত পৃষ্ঠদেশ। সাগর-তলচারী জল জন্তুর ন্যায় আমরা এই মহান মরুৎ-সাগরের তলস্থ ভূপৃষ্ঠে বিরাজ করিতেছি। এখন এই মৃদম্বু-মরুৎ-মণ্ডিত পৃথিবী পরিচালিত হইলে তদ্ধেতু তৎসংশ্লিষ্টা কোন পদার্থ আন্দোলিত বা প্রবাহিত হওয়ার কোন কারণ নাই; যে হেতু, বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগে মহা শূন্য—সেখানে বায়ু মণ্ডলের বাধা জন্মাইতে পারে, এমন কোন পদার্থই বিদ্যমান থাকিতে পারে না। সুতরাং কোন পদার্থ কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত না হইলে, কি প্রকারে উহা আন্দোলিত বা প্রবাহিত হইবে?

বিহগবর যদি শ্বাসরুদ্ধ করিয়া বায়ুমণ্ডল পরিত্যাগ পূর্ব্বক একবারে মহা শূন্যে পঁহুছিতে পারিত, তবে সে আর কিছুতেই কুলায়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিত না, ইহা ধ্রুব সত্য। নীড় পরিত্যাগ পূর্ব্বক বায়ুমণ্ডল মধ্যে ভাসমান থাকিলে উহার নীড়হারা হইবার কোনই কারণ নাই, যে হেতু

সমগ্র বায়ুমণ্ডল যে ভূপৃষ্ঠের সহিত যোগ-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া, তৎ সঙ্গে সঙ্গেই আবর্ত্তিত হইতেছে।

শ্রীহরিপ্রসন্ন দাস গুপ্ত।

হিমালয়।

(১)

পরিধানে নীলাম্বর, শুভ্রজটা শির'পর,
যুড়ি দেশ দেশান্তর, গিরিবর,কে তুমি,
পদতলে ধরাতল, ক্রোড়েতে জলদ-দল,
আছ স্থির অবিচল, অনন্তে উর্দ্ধে চুমি ?

ভারতের প্রান্তদেশে, লামার সাম্রাজ্য শেষে,
আছ সদা নির্নিমেষে, রক্ষিবেশে দাঁড়ায়ে,
উপেক্ষিয়া ঝঞ্ঝাবাত, উপেক্ষিয়া বজ্রাঘাত,
উপেক্ষিয়া উল্কাপাত, রিপুবক্ষ কাঁপায়ে।

কত যে তব মহিমা, কে কহিতে পারে সীমা,
ভীষণতা মধুরিমা, একাধারে ধরিছ,
তোমার আশ্রিত স্থলে, সদা নিজ তেজোবলে,
সদা স্বীয় সুকৌশলে, সযতনে পালিছ।

অবহেলে, অদ্রিপতি, রোধি জলধর-গতি,
বারিদানে বসুমতী- তৃষা দূর করিছ,
তুচ্ছি তপনের তাপ, তুচ্ছি কপিলের শাপ,
হরিতে ধরার পাপ জাহ্নবীরে প্রেরিছ।

তোমার কৃপার বলে কত স্রোতস্বতী চলে,
আর্য্যাবর্ত্ত-বক্ষে ফলে কত মণি মুকুতা,
পেয়ে তব কণাচয় তটিনী গরবে বয়,
কঙ্কর কর্দ্দমময়, ধরা শান্তি যুকুতা।

তুমি শক্তি-জনয়িতা, ভবানী গৌরীর পিতা,
আজো যিনি সুপূজিতা শক্তিশূন্য ভারতে,
কল্পিত দেবেন্দ্র পুরী তব তুঙ্গতনুপরি,
অতুল্য তুমি হে, মরি, স্বরগে বা মরতে।

(২)

পরিধানে নীলাম্বর, শুভ্রজটা শির'পর,
কতকাল, গিরিবর, হেন ভাবে রয়েছ ?
কত মানবের রঙ্গ, কত প্রকৃতির ব্যঙ্গ,
কত মিল কত ভঙ্গ, নিজ চক্ষে দেখেছ ?

দেখেছ নীলিমাময় দুলর্জ্ঘ্য বারিধি-পয়,
কুম্ভীর মকর চয়, বঙ্গভূমি যেখানে,
দেখেছ অরণ্যাবৃত, হিংস্রজন্তু-সমাদৃত,
যারে সৌধ-অলঙ্কৃত রঙ্গভূমি বাখানে।

দেখেছ কর্ব্বুরদলে, নৃমুণ্ড—কঙ্কালগলে,
গর্ব্বভরে জলে স্থলে সর্ব্বত্র বিচরিতে,
দেখিয়াছ বেদপূত, তূণীর-কার্ম্মুক-যুত,
পঞ্চ নদে, হর্ষাপ্লুত আর্য্যাসুতে পশিতে।

কত দেবাসুর দ্বন্দ্ব, কত বজ্র, কত স্কন্ধ,
কত সুন্দ, মহাক্রন্দ, গিরিরাজ, দেখেছ,
কত শুম্ভ, দুর্গাসুর, রক্তবীজ, মধু, মুর,
দেখেছ ত্রিপুর ক্রূর, তাকি মনে রেখেছ ?

দেখিয়াছ রঘুবরে বনে পিতৃ-সত্য-তরে,
দেখিয়াছ লঙ্কেশ্বরে দর্পভরে মরিতে,
দেখেছ অযোধ্যাধামে জানকী রামের বামে
প্রজাতুষ্টি-তরে রামে সতীপত্নী ত্যজিতে।

দেখেছ হস্তিনাপুর, ক'রে যার দর্পচূর
কৃষ্ণ ভীমার্জ্জুন শূর কুরুক্ষেত্র প্রাঙ্গণে,
ধর্ম্মপুত্রে সিংহাসনে বসাইয়া হৃষ্টমনে,
পুন গেলা মহারণে পাপক্ষয়-কারণে।

বৃষ্ণি, জরাসন্ধ, কংস, সেকেন্দার, নন্দবংশ
জন্মিয়া পেয়েছে ধ্বংস, তুমি আছ স্বস্থানে,
চন্দ্রগুপ্ত, শিলাদিত্য, অশোক, বিক্রমাদিত্য
ক'রে মাতৃপূজা নিত্য গেছে মহাপ্রস্থানে।

দেখেছ বঙ্গের বীরে ধাইতে জলধি-নীরে,
স্থাপিতে ত্রিকূট-শিরে লঙ্কাদ্বীপে রাজত্ব,
প্রত্যক্ষ দেখিলে পরে, আজি না প্রত্যয় করে
বঙ্গনারী কিবা নরে, হারায়ে সে মহত্ত্ব।

দেবর্ষি নারদ যবে সহর্ষে আসি এভবে,
বিমর্ষ দেখিয়া সবে, বীণাযন্ত্র-বিধানে
ঢালিতেন সুধাধারা, অনন্ত তিমিরে তারা,
ছিলে, গিরি, বসুন্ধরা, আজি আছ যেখানে।

বশিষ্ঠ, ভৃগু, গৌতম, অগস্ত্য, পুলস্ত্য, যম,
অষ্টাবক্র অনুপম, এ সবারে দেখেছ,
দেখেছ বাল্মীকি ব্যাসে, ভবভূতি কালিদাসে
বর্ষিতে পীযূষ-ভাষে, সে কথা কি ভুলেছ ?

কত গার্গী, অরুন্ধতী, কত খণা, লীলাবতী,
বিদ্যাবতী, বুদ্ধিমতী, পৃথী আলো করেছে,
যে সময়ে, শৈলেশ্বর, গর্ব্বিত য়ুরোপ'পর
টিউটন্ ধনুর্দ্ধর দস্যুভাবে ফিরেছে।

ধর্ম্মতত্ত্ব, যোগবল, কে দেখিবে সে সকল
আর, গিরি, ধরাতল, তুমি যাহা দেখেছ,
কত মোক্ষ-অভিলাষী অহোরাত্র উপবাসী,
গৃহত্যাগী পরবাসী তুমি বক্ষে ধরেছ।

দেখেছ গৌতম বুদ্ধ, ত্যজি রাজ্য, সন্ধি, যুদ্ধ,
চিন্তাশীল, চিত্তশুদ্ধ, রুদ্ধ গহ্বরে ধ্যানে,

যাঁর জ্ঞানরশ্মি-মালা ধরিত্রী করেছে আলা,
যাঁর জন্য ধর্ম্মশালা ব্রহ্ম চীন জাপানে।

দেখেছ শঙ্করাচার্য্যে জিনি সবে মহোদার্য্যে
লিপ্ত অমানুষ কার্য্যে, আর্য্যধর্ম্ম স্থাপনে,
চৈতন্য নানক কত দেখিয়াছ মনোমত,
তুলসী কবীর শত পড়েছে হে নয়নে।

দেখেছে ভারতবালা, স্বর্গীয় রূপের ডালা,
ত্যজি আভরণ মালা, পতি পিতা সম্মুখে
দিয়াছে উৎসাহ ভরে, মাতৃভূমি হিত তরে,
প্রিয়ে প্রেরি অসিকরে চেয়ে আছে উন্মুখে।

(৩)

পরিধানে নীলাম্বর, শুভ্রজটা শির'পর,
কি কাজ হে, গিরিবর, এ সকল স্মরিয়া,
কহ অন্য উপাখ্যান, কর অন্য গাথাগান,
শুনুক এ দগ্ধপ্রাণ চক্ষু কর্ণ মেলিয়া।

কত শত দেবালয়, দেখেছ, করিয়া লয়,
পূর্ণ করি মুদ্রাশয় পাঠানেরে ভ্রমিতে,
দেখেছ অস্থলবারে আফ্‌গানেরে গর্জ্জিবারে,
স্বয়ম্ভূ-মন্দির-দ্বারে ম্লেচ্ছপুরে পশিতে।

লুব্ধ মহম্মদ ঘোরী ক্ষুব্ধ হয়ে সে তিরোরী
শুদ্ধভাবে নিজপুরী, দেখেছ, যে ফিরেছে,
পুনরায় মহাতেজে চতুরঙ্গদলে সেজে,
খলতার বুদ্ধি মেজে পৃথ্বীরাজে নেশেছে।

দেখেছ তৈমুরলঙ্গে, বিকট ভ্রূকুটিভঙ্গে,
বসা'তে ভারত অঙ্গে কত তীক্ষ্ণ ছুরিকা,
দেখিয়াছ সেরসারে খেদাড়িতে সিন্ধুপারে
তৈমুরের বংশধরে, নাহি দিতে কণিকা।

দেখিয়াছ আকবরে, পুন বিধাতার বরে,
আর্য্যাবর্ত্ত পেয়ে করে, এক ছত্রে শাসিতে,
তুলিয়া সাম্যের কেতু স্থাপিতে কীর্ত্তির সেতু,
কাবুল শাসন হেতু হিন্দুরাজে প্রেরিতে।

দেখেছ বাপ্পার বংশ, সূর্য্যকুল অবতংশ,
রক্ষিতে আপন অংশ বর্দ্ধমনা প্রতাপে,
মেঘাবৃত-নিশা শিরে বিস্তারি কিরণ ধীরে
সন্তোষিয়া ধরণীরে শশাঙ্ক সম দাপে।

দেখেছ নগরী রাজি অপূর্ব্ব বিভবে সাজি,
কত রত্ন, গজ, বাজি, মোগলের প্রসাদে,
কোথা বৈজয়ন্ত ধাম, শুধু তার আছে নাম,
পরাজিত-গুণ গ্রাম অলকা যাহে কাঁদে।

(৪)

পরিধানে নীলাম্বর, শুভ্র জটা শির'পর,
স্কন্ধঃপর গিরিবর, কি দেখেছ নয়নে?

দেখেছ উজ্জ্বলাকারা, বর্ষিছে তেজের ধারা,
মহারাষ্ট্র ভাগ্য-তারা দাক্ষিণাত্য গগনে।

দেখেছ সহ্যাদ্রি-চূড়ে শিবাজী-পতাকা উড়ে
দেখেছ ভারত যুড়ে বর্গী চলে সদলে,
হৃত-শিখি সিংহাসন হৃত কোহিনুর-ধন
দিল্লী পক্ষে দেয় রণ আহম্মদে স্ববলে।

দেখেছ দিল্লীর দ্বারে হুঙ্কারিতে সিন্ধিয়ারে,
শুনেছ যমুনা পারে পুনঃ হিন্দু-গর্জ্জনে,
মোগল সাম্রাজ্য ধ্বস্ত, মোগল-মহিমা অস্ত,
মোগলের ভৃত্য ব্যস্ত স্বস্ব রাজ্য স্থাপনে।

দেখেছ জলধি তরি, বণিকের বেশ ধরি,
ভাগ্যলক্ষ্মী অঙ্কে করি শ্বেতাঙ্গেরে আসিতে,
চূর্ণি মহারাষ্ট্র-গর্ব্ব করি দৃপ্ত শিখে খর্ব্ব,
করি পদানত সর্ব্ব, কলিকাতা সাজাতে।

সমুদ্র তরঙ্গোপরি, তবোপরি, হে শিখরী,
বায়ু বজ্র তুচ্ছ করি, ভ্রমে যার বাহিনী,
যাহার প্রতাপ বলে বাষ্পযন্ত্র বেগে চলে,
রাজবর্ত্ম নদী তলে আজ্ঞাবহা দামিনী।

(৫)

পরিধানে নীলাম্বর, শুভ্রজটা শির'পর,
থাকি যুগ যুগান্তর, গিরিবর, এ বেশে,
দেখেছ ধর্ম্মের গতি, অধর্ম্মের পরিণতি,
ভিক্ষাজীবী ক্রোড়পতি, রাজা ক্রীত বিদেশে।

অভিমান, দম্ভকত, জল বুদ্বুদের মত,
উঠিয়া হয়েছে নত, দেখে মনে হেসেছ,
অত্যাচার, অবিচার, নাহি যার প্রতীকার,
দেখি কত ক্লেশভার মনে মনে সয়েছ।

রোষে, গিরি, মর্ম্মাহত নাশিতে দুর্ম্মতি কত,
মত্ত পতঙ্গের মত, শক্ত হ'লে গমনে;
বিধির বিধানফল বদ্ধ তুমি, হে অচল,
নতুবা কি অখণ্ডল সাধ্য তোমা দলনে?

এত যে বর্ব্বর বীর এসেছে কালিন্দী-তীর,
কেহ লঙ্ঘি তব শির আসিবারে পারেনি,
আছ তুমি একস্থানে, তথাপি আশ্রয় দানে
যা করেছ সবে জানে, অন্য কেহ করেনি।

কে জানে বিধির মনে, ভাগ্য চক্র-আবর্ত্তনে
পুন এ নন্দন-বনে কে জানে কি ঘটিবে?
পরিধানে নীলাম্বর, জটাজুট শির'পর,
বেঁচে থাক, গিরিবর, আরো কত দেখিবে।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

আত্ম-বলি ও আত্ম-বিলি।

রুষ-জাপান-যুদ্ধের পরিণাম যাহাই হউক, এই যুদ্ধে আমাদের ন্যায় পরাধীন দেশের লোকের পক্ষে কতকগুলি শিক্ষার বিষয় আছে। প্রথম শিক্ষার বিষয় এই, এত অল্প সময়ের মধ্যে এই জাতির এতদূর উন্নতি যখন সম্ভব হইল, তখন আমাদের নিরাশ হইবার কারণ নাই। দ্বিতীয় শিক্ষার বিষয় এই, সুশিক্ষা বলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে মানবের কতদূর উন্নতি হইতে পারে, জাপান তাহা দেখাইয়াছেন। তৃতীয় শিক্ষার বিষয় এই, শিল্প-বিজ্ঞান ও বাণিজ্যের উন্নতি ভিন্ন জাতির উন্নতি অসম্ভব। চতুর্থ শিক্ষা, জাতীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধি ভিন্ন জাতির উন্নতি সুদূর-পরাহত। সকল শিক্ষার সার শিক্ষা —আত্মোৎসর্গ! এবং আত্মত্যাগ। জাপান আত্মত্যাগ-মন্ত্রে দীক্ষিত না হইলে কখনও এতদূর উন্নতি লাভ করিতে পারিতেন না।

আমাদের নিরাশার কারণ নাই, তাহা বুঝিয়াছি। কিন্তু আমাদের দেশে সুশিক্ষা কোথায়? গবর্ণমেণ্ট পরাধীনতার বীজমন্ত্র নানা উপায়ে আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন বটে, কিন্তু যে শিক্ষায় মানুষ মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে, সেই শিক্ষা দিতেছেন না। সেরূপ শিক্ষা দিলে তাঁহাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়ার সম্ভব, এই জন্য তাঁহারা উদারতার পরিবর্ত্তে সঙ্কীর্ণতার আশ্রয় লইয়াছেন। শিল্প-বিজ্ঞান ও বাণিজ্য শিক্ষা দিবার কোনই বন্দোবস্ত নাই। এরূপ অবস্থায়, ভারতের উন্নতির উপায় কি? এরূপ অবস্থায় ভারতের উন্নতির আশা কোথায়?

জাপানের উন্নতির মূল মিকাডো। মিকাডো হাতে ধরিয়া জাপানকে তুলিয়াছেন। আমাদের মিকাডো কোথায়? গবর্ণমেণ্টের নিকট কোনই প্রত্যাশা নাই; সুতরাং কে আমাদিগকে, এই পরাধীন জাতিকে, হাতে ধরিয়া উন্নতির পথে লইয়া যাইবে?

জাতীয় মহাসমিতি প্রদেশের আশার স্থল ছিলেন, কিন্তু জাতীয় মহাসমিতি, বহুদিনেও, ভিক্ষানীতি ভিন্ন অন্য নীতি অবলম্বন করার আবশ্যকতা বুঝেন নাই। এবার বর্দ্ধমান প্রাদেশিক-সমিতিতে যদিও কৃতি-সন্তান মহামতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় ভিক্ষা-নীতি পরিহার করিয়া শিল্প-বিজ্ঞান ও বাণিজ্যের নীতি অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার কথা জাতীয়-মহাসমিতি পর্য্যন্ত পৌঁছিবে বলিয়া মনে হইতেছে না। কেন না, অনেকে তাঁহার মতের প্রতিবাদ করিতেছেন, অনেকে তাঁহার সার কথা উপেক্ষা করিতেছেন। জাতীয় মহাসমিতি ভিক্ষানীতি ধরিয়াই চলিবেন, বোধ হয়। কেন না, তাহা খুব সহজ। বহুবার বলিয়াছি, অন্যের কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দেওয়ার চেয়ে সোজা কাজ এজগতে আর নাই; কেন না, তাহাতে নিজের কিছু করিবার কষ্ট পাইতে হয় না। 'তুমি কর, তুমি কর'; একথা বলা যত সহজ, "আমি করি, আমি করি", তত সহজ নয়। "আমি করি, আমি করি" নীতি ভিন্ন কোন মানুষ কি কখনও বড় হইতে পারিয়াছে?

বহুদিনের লেখার পর, আমাদের দেশের কয়েক জন মহাত্মার মনে "আমি করি, আমি করি," নীতি জাগিয়া উঠিয়াছে। তাহারই ছায়া বর্দ্ধমান-সমিতিতে পড়িয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতিও এই কথা বলিতেছেন। এত দিন পর কিরূপে এই নীতি জাগিল, তাহা জানি না; কিন্তু আমাদের মনে হয়, ইহা "রুষ-জাপান"-যুদ্ধের মহাশিক্ষা। এই মহাশিক্ষা—কতিপয় মহাত্মার নিভৃত-হৃদয়-কন্দরে স্থান পাইয়াছিল, আজ কাল তাহার ফলে এদেশে একটা হই-চই পড়িয়া গিয়াছে, একটা বিশেষ আন্দোলন উঠিয়াছে। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয় যে মহাব্রতের নেতারূপে আজ বঙ্গে অবতীর্ণ, সে ব্রত কি এদেশে উদ্‌যাপিত হইবে না?

এ সময়ে, নানা মতলবী, সমাজধ্বজী, ভণ্ড-তপস্বী, আসরে নামিয়াছেন। তাঁহারা দিগ্‌-জয়ী স্বরে গোপনে২ নানা বিরুদ্ধ কথা বলিয়া বেড়াইতেছেন। সেদিন বর্দ্ধমানে একটী

সভা হইয়াছিল, সেই সভায় কোন ব্যক্তি অনেক বিরুদ্ধ কথা প্রকাশ্যে বলিতে সাহসী হইয়াছিলেন। যাঁহারা পরের টাকা আত্মসাৎ করাকে দোষের মনে করেন না, তাঁহারা, অন্যে স্বার্থত্যাগ করে, তাহা ভালবাসেন না। "জাতীয় ধনভাণ্ডারের টাকা কোথায় গেল?" "বেঙ্গল-ব্যাঙ্কিং করপোরেশনের টাকা গুলি কোথায় গেল?" "ধর্ম্মভবনের জন্য যে টাকা সংগ্রহ হইল, সে টাকার কি হইল?" ইত্যাদি নানা কথা অন্যান্য লোকেরা বলিতেছে। এইরূপ আত্মসাৎরূপ সব অপকার্য্য এদেশে যদি হইয়া থাকে, তবে তাহা লজ্জার বিষয়, সন্দেহ নাই; কিন্তু যেদেশে অসৎ লোক থাকে, সে দেশে কি আর সৎলোকের অভ্যুদয় হইবে না? দশজন চোর যে দেশে থাকে, সে দেশে দশজন সাধুলোকের অভ্যুদয় কি অসম্ভব? কেহ খারাপ কাজ করিলে সকলেই যে সেরূপ করিবে, তাহার কোন প্রমাণ নাই। ভাল মন্দ সব দেশেই আছে, এদেশেও আছে। কেহ মন্দ কাজ করিয়াছে বলিয়া শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ভাল কাজ করিতে পারিবেন না, তাহার কোন কারণ নাই। পূর্ব্বে কেহ মহৎ কাজ করিতে পারে নাই বলিয়া যে আর কেহ পারিবে না, কোন্ যুক্তিতে এ কথা বল? জাপানকে মিকাডো, ইতালীকে ম্যাট্সিনি যদি উদ্ধার করিতে পারিয়া থাকেন, এদেশকেও কোন মহাত্মা উদ্ধার করিতে পারিবেন, নিশ্চয় জানি। রুষ-জাপান-যুদ্ধের ইহা মহাশিক্ষা।

তুমি খারাপ লোক, তুমি মহৎ লোকের মহত্ত্ব বুঝিবে কেন? লোক সৎ থাকিতে পারে, আমরা ৭ বৎসরের চেষ্টায় একজন খারাপ লোককে তাহা বুঝাইতে অক্ষম হইয়াছিলাম। খারাপ লোক, ভাল লোকের "ভালটুক" বুঝিতে পারে না; সে মনে করে, সকলেই তাহার ন্যায় খারাপ। খারাপ লোকের কথায় যদি মহতের মন বিকৃত হয়, তবে সে মহতের মহৎ ব্রত পরিত্যাগ করাই ভাল। আমরা কাহাকেও উপদেশ দিবার জন্য একথা বলিতেছি না; আমরা সামান্য ব্যক্তি, আমাদের পক্ষে সে ধৃষ্টতা অমার্জ্জনীয়। মহৎ ব্যক্তিকে ধীর, স্থির, অবিচলিত ভাবে চলা উচিত। তাঁহাকে আত্মত্যাগ-মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে হইবে।

"চারি-আনা-চাঁদা-সংগ্রহ" সফল হইবে, আমরা কিছুতেই মনে করি না। এত উৎসাহ এদেশে এখনও হয় নাই যে, সকলে দীর্ঘকাল বারম্বার দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া চাঁদা সংগ্রহ করিবে। এশিক্ষা এখনও এদেশে হয় নাই যে, চাঁদা স্বাক্ষর করিলেই তাহা বারম্বার দিতে হইবে। পত্রিকা গ্রহণ করিয়া যে দেশের অসংখ্য প্রধান২ শিক্ষিত লোকও তাহার মূল্য দেওয়াকে কর্ত্তব্য মনে করে না, তাঁহারা যে যথারীতি বরাবর চাঁদা দিবে, তাহা আমরা মনে করি না। তারপর কত লোক মরিবে, কত লোক স্থানান্তরিত হইবে, কে লক্ষ লক্ষ লোকের এত সন্ধান রাখিবে? তারপর পয়সা দিয়া লোক রাখিয়া আদায় করাও অসম্ভব, কেন না, এদেশে প্রতারকের সংখ্যা বড়ই বাড়িয়া গিয়াছে। আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মসাৎ করা এদেশের নীতি, আত্মত্যাগ নয়। প্রথমতঃ "আত্মত্যাগ" শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন। আত্মত্যাগ শিক্ষা হইলে তবে সকল সম্ভব হইবে। যতদিন তাহা না হইবে, ততদিন এরূপ চাঁদা সংগ্রহের কাজ সফল হইবে না।

তবে কি কর্ত্তব্য? এখন স্বেচ্ছা-দানের উপর প্রধানত নির্ভর করিয়া যাহাতে এদেশকে আত্ম-ত্যাগ মন্ত্রে দীক্ষিত করা যায়, তাহা করা কর্ত্তব্য। নিঃস্বার্থ ভাবে কেহ দেশের উপকার করিতে পারে, একথা এদেশের লোকে এখনও বিশ্বাস করে না। কাজ দেখাইয়া এবিশ্বাস সাধারণের মধ্যে জন্মাইতে হইবে। ঘর হইতে টাকা দিয়া, বিদেশে লোক পাঠাইয়া শিক্ষিত করিয়া আনিয়া, লোকের কুসংস্কার দূর করিতে হইবে। স্বেচ্ছ-দান কোথায় মিলিবে? যে দেশের রাজা রাজরাজেরা গবর্ণমেণ্টের পোষ্যপুত্র; যে দেশের অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা উপাধির জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইতে প্রস্তুত, সেদেশে "স্বেচ্ছা-দান" কোথায় মিলিবে? যাঁহারা একার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহারা অগ্রে সর্ব্বস্ব এই মহাকার্য্যে ঢালিয়া দিন। তবে

লোকেরা বুঝিবে, আত্মত্যাগ-মন্ত্র কি জিনিস। যখন তাহা বুঝিবে, তখন দলে দলে লোক "স্বেচ্ছা-দান" লইয়া উপস্থিত হইবে।

ইতিহাস সংগ্রহ কর, বুঝিতে পারিবে, যেখানে আত্মত্যাগ নাই, সেখানে কোন কাজ হয় নাই। ম্যাট্সিনি আত্মত্যাগ-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, একা ম্যাট্সিনির কুহক-মন্ত্রে ইতালী মাতিয়া উঠিয়াছিল। গ্যারিবল্ডি আত্ম-ত্যাগ-মন্ত্রে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার আদেশে পঙ্গপালের ন্যায় দলে দলে লোক যুদ্ধে প্রাণ দিতে গিয়াছিল। নেপোলিয়ন আত্ম-ত্যাগ-মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই, সেণ্ট-হেলেনা তাঁহার পরিণাম! রুষ-জাপান যুদ্ধের—এক পক্ষের নেতাগণ "আত্মসাৎ" মন্ত্রে দীক্ষিত, আর এক পক্ষের সকল লোক "আত্মত্যাগ-মন্ত্রে" দীক্ষিত। জয় কোন্ পক্ষকে অবলম্বন করিতেছে, সকলেই দেখিতেছেন। এক পক্ষের লোকেরা চুরিচামারি করিয়া আত্ম উদর পূরণের জন্য ব্যতিব্যস্ত, অপর পক্ষ "জীবন বিসর্জ্জন দিতে" অগ্রসর! স্বেচ্ছা-সৈনিকের জেনেরেল মহাত্মা বুথ আত্মত্যাগ-মন্ত্রে সিদ্ধ হইয়া কি অসাধ্য সাধন করিয়াছেন, চিন্তা কর। জীবন-মায়া বড় বিষম মায়া। জীবন-মায়া যে পরিত্যাগ করিতে পারে, তাহার আর কিসের ভয়? জয় তাহারই। জাপান যদি এই মহা সমরে পরাজিতও হন, তবুও এজগতে আত্ম ত্যাগ-মন্ত্রের যে শিক্ষা রাখিয়া যাইতেছেন, চিরকাল সে শিক্ষা সর্ব্ব দেশকে পরাজয় করিবে। খ্রীষ্টের আত্মত্যাগের ন্যায়, চিরকাল, জাপানের আত্মত্যাগ শিক্ষা জগৎকে মাতাইবে।

বড় কথা ছাড়িয়া ছোট ছোট বিষয়ের বিবরণ সংগ্রহ কর, বুঝিতে পারিবে, যে কাজের মূলে আত্মত্যাগ, সেই কাজই এজগতে সফল হইয়াছে। আর যে সকল কাজ "আত্ম-প্রতিষ্ঠার" জন্য, তাহা অকালে ধরা-পৃষ্ঠ বিলীন হইয়া গিয়াছে। আপনাকে উৎসর্গ করিয়া যে বীর মরণকে চুম্বন করিতে প্রস্তুত, চির জয় তাহারই, নির্ভয়ে লিখিতেছি, চির জয় তাহারই। মৃত্যু ত সকলের জীবনেরই পরিণাম; তবে আত্মত্যাগের জন্য আমরা এত কাতর কেন? আজ হউক, কাল হউক, বা দশদিন পরে হউক, আমাদিগকে শরীর পরিত্যাগ করিতেই হইবে। দেখিতে দেখিতে—চক্ষের পলক পড়িতে না পড়িতে কত প্রাণাপ্রিয়, আত্মীয় বন্ধুকে হারাইলাম—এখনও কি শিক্ষা হইল না যে, আমাদিগকেও যাইতে হইবে? যদি যাইতেই হয়, সৎকাজে এ প্রাণ ঢালিয়া দেহ না কেন? খাটিয়া, খাটিয়া, খাটিয়া—কেবল দেশের জন্য, পরের জন্য খাটিয়া খাটিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন কর না কেন? জাপানের অসংখ্য বালক, বালিকা, অসংখ্য যুবা বৃদ্ধ যেরূপে দেশের জন্য জীবন বিসর্জ্জন দিতেছে, আমরা কেন সেরূপ, দেশের জন্য জীবন-বিসর্জ্জন দেই না? আত্ম-বলি ভিন্ন এ দেশ কিরূপে জাগিবে? স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক সৎকাজে আত্ম-বলি না করিলে, কে দেশোদ্ধারের কার্য্য সুসম্পন্ন করিবে?

জাপান জগতে কি শিক্ষা দিতেছেন? আর কিছুই নয়। কেবল "আত্মবলি"র মহা-শিক্ষা দিতেছেন। তুমি আমি জীবন রক্ষার জন্য কত শত অন্যায় কার্য্য করিতেছি, তাঁহারা সেই জীবনকে দেশের জন্য অম্লান চিত্তে ঢালিয়া দিতেছেন। জাপানের "মিকাডো"—আত্মবলির উৎকৃষ্ট উদাহরণ। "মিকাডোর" জীবনের কাহিনী পাঠ কর, বুঝিবে, এই মহাপুরুষ আপনার সমস্ত তিল তিল করিয়া দেশের উদ্ধারের জন্য "বিভাগ" করিয়া দিয়াছেন; নিজের আত্মতৃপ্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কিছুই রাখেন নাই। তাঁহার শিষ্য, প্রশিষ্য ইটো, ওহিমা, আমাগাটা, কোডামা, কুরুফি, টোগো, ওকু, যাঁহার কথা তুলিবে, সকলেই তাঁহার ঐ দুর্জ্জয় আত্ম-ত্যাগ-মন্ত্রে দীক্ষিত;—দেখ, দেখ, দেখ—স্বদেশের রক্ষার জন্য, স্বদেশের উন্নতির জন্য আজ কত কত বৃদ্ধ মহারথী আত্ম-বলি দিতে অগ্রসর। কোন্ মুহূর্ত্তে মৃত্যু আসিয়া তাহাদিগকে গ্রাস করিবে, তাঁহারা জানেন না, তবুও তাঁহারা কেমন প্রফুল্ল, কেমন উৎসাহী, কেমন কষ্টসহিষ্ণু; কেমন, কেমন মধুর!! আপনাকে বলি দিতে এরূপ আর কে কবে পারিয়াছে?

আত্ম-ত্যাগ মন্ত্রে দীক্ষিত মিকাডো যখন শত লোক চাহিতেছেন, সহস্র লোক "আত্ম-বলির" ক্ষেত্রে উপস্থিত হইতেছে, যখন সহস্র লোক চাহিতেছেন, তখন লক্ষ লোক প্রাণ দিতে যাইবার জন্য আবেদন করিতেছে। কি অপরূপ দৃশ্য! মাতা আপনি মৃত্যুকে চুম্বন করিয়া সন্তানকে নিষ্কণ্টক করিয়া যুদ্ধে যাইতে আদেশ করিতেছেন, সতী,জীবনের সর্ব্বস্ব উপেক্ষা করিয়া,স্বামীকে প্রফুল্ল চিত্তে সমরে প্রেরণ করিতেছেন। পিতা বলিতেছেন,—"আমার এ সকল সন্তান আমার নয়, সকলই মিকাডোর"। সৈন্যগণকে বিপক্ষেরা যখন "আত্ম-সমর্পণ" করিতে বলিতেছে, তখন আত্মসমর্পণ করা কাপুরুষের কাজ, হেয়, ঘৃণিত ও নীচ মনে করিয়া অম্লান চিত্তে তাহারা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেছে। কত লোক যে এইরূপে আত্ম-বলি দিতেছে, তাহার সংখ্যা হয় না। আত্ম-বলির,আত্ম-ত্যাগের এরূপ দৃষ্টান্ত, রাণা প্রতাপ-সিংহের সময়ে একবার শোনা গিয়াছিল, আজ কাল এসিয়া ভূমিতেই আবার শোনা যাইতেছে। ধন্য এসিয়া, ধন্য জাপান, ধন্য মিকাডো!

রুষ-জাপান-যুদ্ধের মহাশিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া আজ যোগেন্দ্রচন্দ্র মহাপুণ্যময় আত্মত্যাগ-ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান। তাঁহার ঘরে সুখ সম্পদ আছে, সে সকলকে কেন তিনি ভুলিতেছেন? তাঁহার ব্যবসায়ে পসার আছে, কেন তিনি তাহা উপেক্ষা করিয়া লোকের গালাগালি, তিরস্কার, ভর্ৎসনা খাইতে আসিলেন? মহাত্মা বিদ্যাসাগর বলিতেন, "মাছ ধরিতে যে জলে নামিবে, তাহার গায়েই কাদা লাগিবে। যে ব্যক্তি কোন সৎকার্য্যে ব্রতী হইবে, তাহাকেই অবহেলা, গঞ্জনা, গালাগালি খাইতে হইবে।" যোগেন্দ্র চন্দ্র কি তাহা জানিতেন না? জানিয়া, শুনিয়া, কিসের আকর্ষণে, কিসের মত্ততায় ভুলিয়া তিনি সর্ব্বস্ব-পণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন? প্রবন্ধটা কিছু ব্যক্তিগত হইয়া পড়িতেছে, কিন্তু উপায় নাই। যোগেন্দ্রচন্দ্র কি এক মহামন্ত্রে যেন আত্মহারা হইয়াছেন।

বাল্যকাল হইতে আমরা তাঁহাকে জানি। তিনি সর্ব্বদাই যেন কি ভাবিতেন, কি যেন একটা গভীর ভাবের নেশায় সর্ব্বদা অন্যমনস্ক থাকিতেন। বুঝিতাম না, ভিতরের কি খেলায় তিনি মাতিতেছেন। কঠোর সাধনা যদি কেহ করিয়া থাকে, তবে তিনি করিয়াছেন। ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্ম সুধা-রসপান তাঁহার জীবনের ব্রত—বাল্য হইতে তিনি কঠোর সাধনা করিয়াছেন। চরিত্রে তিনি অটল, ভাবে তিনি কোমল, স্বাধীনতায় তিনি নির্ভীক;—তিনি, কি জানি কেন, তিনি কি যেন একটা অহেতুকী ভাব লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। থিয়েটার, রং-তামাসায় তাঁহার মন মজিত না, কিন্তু জলটুঙ্গির পুকুরের উপরিস্থ ক্ষুদ্র কুটীরে ব্রহ্মোপাসনার আয়োজন করিয়া তিনি কি-মহা ধ্যানে নিমগ্ন হইতেন। বাল্য হইতে যোগেন্দ্র চন্দ্র কঠোর, সংযমী, উদাসীন, কি জানি, কি ব্রত লইয়া তিনি সদা যেন অন্যমনস্ক!

এহেন লোকের সমক্ষে জাপান আজ "আত্ম-বলি"র দৃষ্টান্ত লইয়া উপস্থিত। তুমি আমি এই দৃষ্টান্তে আত্মহারা না হইতে পারি, কিন্তু যোগেন্দ্র চন্দ্র তাহা পারিলেন না; তিনি মাজলেন। ঐ আত্ম-বলি-মন্ত্রপূত হইয়াই যেন যোগেন্দ্র চন্দ্র "আত্ম-বলি" ক্ষেত্রে এত দিন পর ধরা দিলেন। এতদিনের সাধনার ফল আজ জগৎ সমক্ষে প্রকাশিত হইল। জাপান যুদ্ধের পরিণাম,যাহাই হউক—আমরা বলিতেছি, "আত্মবলির" উদাহরণ হইয়া চিরকাল তাহা জগৎকে, এইরূপে, জয় করিবে। আর যোগেন্দ্র চন্দ্রের সাধনায় সিদ্ধি লাভ ঘটিবে কি না, তাহা জানিনা, তবে ইহা জানি, তিনি "আত্ম-বলির" যে উদাহরণ রাখিয়া যাইতেছেন, ইহা চিরকাল এদেশকে জয় করিতে থাকিবে। কোন সৎ কথা বা সৎ কাজ এজগতে কখনও বিফলে যায় নাই, কখনও যাইবে না। তিনি মিকাডোর জাপানের ন্যায় এদেশকে উদ্ধার করিতে পারিবেন কিনা, জানি না। কিন্তু ইহা জানি, তিনি যে দৃষ্টান্ত দেখাইলেন, ইহার পরিণামে—এদেশে নব-যুগের

অভ্যুদয় হইবেই হইবে। ধন্য এসিয়া, ধন্য বঙ্গ, ধন্য যোগেন্দ্র চন্দ্র। তিনি যদি আত্মত্যাগ-মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া থাকেন, ভয় নাই, আত্মবলির পুণ্যমেয় অক্ষয় ক্ষেত্রে অগ্রসর হউন। যত শত্রু তাঁহার সম্মুখে থাকে, সব পরাজিত হইয়া ধূলির ন্যায় উড়িয়া যাইবে—বিধাতার মহা ইচ্ছা পূর্ণ হইবে।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

১১। বোধন।—প্রীতি ও গীতি কবিতা, শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত, মূল্য ॥০। যোগ ও বিয়োগের কবি এবার বোধন লইয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন। বোধনে সর্ব্বসমেত ৭৯টী কবিতা আছে, তাহা ছাড়া মঙ্গলাচরণ ও উপহার আছে।

এক শ্রেণীর লোক আছে, তাঁহারা অন্যের ভাল কিছুতেই দেখিতে পারেন না, তাঁহারা যাহা করেন, বলেন এবং লেখেন, তাহাই ভাল, অন্যের কার্য্য, বক্তৃতা, লেখা, তাঁহাদের নিকট বিষ-তুল্য বোধ হয়। তাঁহারা যখন এই বিদ্বেষ-বিষ অন্তরে ধারণ করিতে অক্ষম হন, কিম্বা যখন তাঁহারা বন্ধুমহলে বা পরিবারে সেই নিন্দা-বিষ ঢালিয়া ঢালিয়া শেষে সক্ষম পুরুষ বলিয়া আত্ম-বোধ মঞ্চে আরোহণ করেন, তখন তাঁহারা হঠাৎ সম্পাদক হইয়া উঠেন। জন্মিয়াই পরনিন্দা, পরচর্চ্চাকে আলিঙ্গন করিয়া লেখনীকে সার্থক করেন!! তাঁহাদের সেই উদ্গারণ সম্ভোগ করিবার জন্য কত, কত, কত ব্যক্তি উল্লসিত হন। বাঙ্গালার কবির দল তিরোহিত হইয়াছে, এখন বহু সাহিত্য-সেবী সেই ভার গ্রহণ করিয়া আসর জমকাইয়া বসিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কত দিন মানুষ এরূপ পারে? তাই দেখিতেছি, অসময়ে, কত নিন্দুক অন্তর্ধান হইতেছেন!! বোধনের সমালোচনা উপলক্ষে এ কথা লিখিতেছি কেন? কেন,—পাঠকগণ সে বিচার করিবেন।

যোগ ও বিয়োগের সব কবিতাই যে ভাল, কখন মনে করি নাই, এই বোধনের সব কবিতাই যে উৎকৃষ্ট, তাহাও মনে করিতেছি না। তবে মনে করিতেছি এই—ইহাতে হৃদয় আছে, প্রাণস্পর্শী সমবেদনা আছে;—পরদুঃখকাতরতা আছে, পবিত্রতার আভাস আছে, সুরুচির অঙ্কুর আছে, বাঙ্গালা ভাষার প্রতি অনুরাগ আছে। তোমরা মনে কর, দুই দশ জন লেখকের দ্বারাই ভাষা হইবে, আমরা তাহা মনে করি না;—আমরা মনে করি, সহস্র সহস্র লোকের আত্মত্যাগ, স্বার্থত্যাগ ভিন্ন বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হইবে না। কত কত লোকের আত্মত্যাগ হইলে তবে সাহিত্য-ক্ষেত্র রচিত হইবে, তৎপর সেখানে ফুল ফুটাইবার জন্য কত লোকের অভ্যুদয় হইবে। এখনও, প্রকৃত সাহিত্য-ক্ষেত্র রচিত হয় নাই। এই জন্যই, সক্ষম সাহিত্য-সেবী পাইলেই তাঁহাকে সাদরে আমরা আলিঙ্গন করি, কত সম্মান করি। ইহাতে যদি অন্যায় হয়, সকলে ক্ষমা করিবেন।

বোধনের গ্রন্থকার কিরূপ ব্যক্তি, জানি না, কখনও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। তবুও তাঁহাকে চিনিয়াছি। বুঝিয়াছি, তাঁহা দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার কিছু কিছু উপকার হইতে পারে। কিছু কিছু কিছু, সাহিত্য-বারিকণা মিলিয়াই শেষে সাহিত্য-সাগরের সৃষ্টি হইবে। তাই বলি, এস, এস, বঁধু এস—ঘৃণা ও উপেক্ষার এই সামান্য আত্ম ত্যাগ-রূপ আসনে উপবেশন কর।

গ্রন্থকার বলেন—

"সে মোরে নিত্যই করে ঘৃণা তিরস্কার,
সে থাকে ফিরায়ে মুখ যাই যতবার!
আমি যে মিলন চাই, সে চায় বিরহ,
প্রীতিকামী আমি কিন্তু সে করে কলহ!
সে চায় মেঘের মত ছুটিতে অম্বরে,
তৃষিত চাতক আশা কভু যে না পূরে!
অথবা অনল শিখা হ'তে যদি পারে,
অধীন পতঙ্গে রঙ্গে পোড়াইয়ে মারে।
তথাপি তাহারে আমি ভুলিব না পণ,
মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন।"

আমরা বলি, তিনি এই প্রেম-মন্ত্র, প্রেম-তন্ত্র ও দৃঢ়পণ লইয়া আত্মত্যাগের অক্ষয় পুণ্যক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হউন;—ঘৃণা,

তিরস্কার, উপেক্ষার ঝঞ্ঝা বহিয়া যা'ক, শেষে তিনি কৃতিত্বের অমর-ধামে অক্ষয় সোণার আসন পাইবেন। সাহিত্য সেবাকে যে সকল ব্যক্তি লাভের উপায় মনে করেন, তাঁহারা দূর হউন, যাঁহারা কেবল, কর্ত্তব্যের অনুরোধে, নিষ্কাম সাহিত্য-সেবা ব্রত গ্রহণ করেন, কেবল তাঁহারাই থাকুন। মহেশচন্দ্র নিষ্কাম সাহিত্য-সেবা-মন্ত্রে দীক্ষিত; তাই তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিতেছি এবং প্রার্থনা করিতেছি, তাঁহার পূত কামনা সিদ্ধ হউক।

১২। সৃষ্টি-বিজ্ঞান। শ্রীপূর্ণ চন্দ্র বসু প্রণীত। মূল্য ১৲ টাকা। গ্রন্থকার বিবিধ হিন্দু শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া শাস্ত্রানুযায়ী সৃষ্টিতত্ত্ব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহিত তাহার সামঞ্জস্য প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সৃষ্টিবিজ্ঞান কঠিন, প্রহেলিকময়—মানবের মস্তিষ্ক সে প্রহেলিকার নিকট ঘূর্ণায়মান হয়। পূর্ণ বাবুর মতে বেদ, দর্শন ও পুরাণে, ন্যায়, সাংখ্য ও বেদান্তে একই সৃষ্টিতত্ত্ব অধিকারি-ভেদে রূপান্তরিত হইয়া সাধারণ মানবের নিকট উপস্থিত হইয়াছে এবং সেই সৃষ্টিতত্ত্ব পাশ্চাত্য বিজ্ঞানসম্মত। আমরা পূর্ব্বে জানিতাম।

> "বেদাঃ বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ।
> নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং॥

কিন্তু গ্রন্থকার এই বিভিন্নতা স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক। অভ্রান্ত ঋষিগণ ভিন্ন ২ শ্রুতিতে সৃষ্টিতত্ত্বের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন প্রকারে সন্নিবেশিত করিয়াছেন মাত্র। গ্রন্থে লিপি-কুশলতা আছে, কিন্তু আমাদের মনে হয়, অনেকস্থলে সামঞ্জস্য প্রদর্শন জন্য কল্পনাদেবীর কিছু অধিক সেবা করিতে হইয়াছে।

১৩। স্বর্গীয় দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায়ের আত্মজীবন-চরিত। মূল্য ২৲ টাকা। দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় বহুকাল কৃষ্ণনগরের রাজ-এষ্টেটে কার্য্য করিয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার আত্ম-জীবন-চরিত তাঁহার সুযোগ্য পুত্রগণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থপাঠে দেওয়ান বাহাদুরের সমসাময়িক অনেক কৌতূহলোদ্দীপক সামাজিক অবস্থা অবগত হওয়া যায়। সরল-প্রাণের সরল-কাহিনী সরল-ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ভাষা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ না হইলেও, জীবনী-শক্তি-সম্পন্ন এবং তজ্জন্য গ্রন্থের অনেক স্থলই পড়িতে উপন্যাসের ন্যায় বোধ হয়। এই জীবনীতে শিক্ষাপ্রদ অনেক বিষয় আছে।

১৪। জাতিতত্ত্ব, প্রথমভাগ—বঙ্গে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য। মূল্য ১৷০। গ্রন্থকার শেষ অধ্যায়ে কায়স্থ ও বৈদ্য অভিন্ন জাতি, এইরূপ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থের মধ্যে অনেক-স্থানেই কায়স্থ ও বৈদ্যের আভিজাত্যের তারতম্য বিচার সময়ে লেখনী সংযত রাখিতে পারেন নাই। পুরাবৃত্তের তত্ত্বানুসন্ধিৎসু হইয়া প্রশান্ত ভাবে এই সকল বিষয়ের আলোচনা করা উচিত, নতুবা কেবল বিদ্বেষ-বহ্নি অধিকতর প্রজ্বলিত করা হয় মাত্র। গ্রন্থে গবেষণার পরিচয় আছে, কিন্তু কায়স্থের প্রাধান্য স্থাপনোদ্দেশে অপ্রামাণিক কথারও সমাবেশ আছে। গ্রন্থকার বিখ্যাত কবি উমাপতি ধর (যিনি সম্ভবতঃ ঘৃত-কৌষিক শ্রোত্রীয় দাক্ষিণাত্য বৈদিক ছিলেন) এবং উত্তরবঙ্গের সুবিখ্যাত নৃপতি গণেশকে (যিনি বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন) বিনা তর্কে কায়স্থ মনে করিয়া লইয়াছেন।

১৫। কুলপ্রতিভা, ১ম ও ২য় খণ্ড, শ্রীকৃষ্ণনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত। মূল্য ॥০ আনা ও ॥৵০ আনা। গ্রন্থকার বংশাবলী সংগ্রহে, বিশেষতঃ ফতেয়াবাদ সমাজের বঙ্গজ কায়স্থগণের বংশাবলী সংগ্রহে, বিশেষ যত্ন করিয়াছেন, কিন্তু গ্রন্থে বিচারশক্তির পরিচয় নাই এবং বিষয়ে ও ভাষায় বিস্তর ভুল ও ত্রুটী আছে। গ্রন্থকারের সংগৃহীত উপাদান ভবিষ্যতে অন্য গ্রন্থকারের প্রভূত উপকারে আসিবে।

সমাজ-চিন্তা ।(২)

সমাজের প্রকৃতি ।

মনুষ্যজাতির বয়স ।—পৃথিবীর বয়সের তুলনায় মানবজাতির বয়স অতি নগণ্য; মানব সবেমাত্র পৃথিবীতে জন্মিয়াছে। পৃথিবীকে মানব-বাসোপযোগী হইতে বহুকাল লাগিয়াছিল। পণ্ডিতেরা দেখিতেছেন, পৃথিবীর দেহে লক্ষ লক্ষ অতীত বৎসরের চরণচিহ্ন বর্ত্তমান আছে, পৃথিবীর জন্মেতিহাস কি, তাহারও সঙ্কেত রহিয়াছে। আমাদের মাথার উপরে আকাশের গর্ব্ভে এখনও অসংখ্য পৃথিবী ভ্রূণাবস্থায় বর্ত্তমান আছে; অনেকের এখনও ছানা ধরে নাই, যে বিশ্ব পরিবারের মধ্যে পৃথিবী একটী ক্ষুদ্র বালিকা, তাহার কোটী কোটী যুবক-যুবতী মহাকাশে হাত ধরাধরি করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহার কোটী কোটী শিশু ইতস্ততঃ হামাগুড়ি দিতেছে, কোটী কোটী ডিম্বাবস্থায় গঠিত হইতেছে।

পৃথিবী, তৎস্থিত মানব কি মানবসমাজের বিষয় চিন্তা করিতে বসিলে, সর্ব্বপ্রথম বিশ্বজগতের এই প্রকটিত প্রকাণ্ড আকৃতি প্রকৃতি এবং গঠন এবং তৎসমস্তের সাঙ্কেতিক অর্থ একবার মনে করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য, তদ্বারা পদে পদে উপকৃত এবং শিক্ষিত হইব। প্রতি রজনীতে মহাকাশে জগৎ-কাব্যের যে পৃষ্ঠা আমাদের নয়নে উন্মোচিত হয় ও তাহার পরে স্তরে স্তরে যে অনন্ত নীহারিকার প্রচ্ছন্ন ছায়া চিরদিন অবস্থান করিতে থাকে, উহার ধ্যান ধারণায় মনের অহঙ্কার তিরোহিত হয়। আকাশের জ্যোতিষ্ক-পরিকীর্ণ মহাগ্রন্থ কেবল কবিকল্পনা নহে, তাহা নিত্য এবং অবিকৃত সত্য; মানবের প্রধান শিক্ষক।

আমাদের পৃথিবীও একদিন ভ্রূণাবস্থায় ছিল; জড়ময়ী, জড়শক্তির ক্রীড়াভূমি; ক্ষিতি জল বায়ু অগ্নি প্রভৃতি মহাভূত লক্ষ লক্ষ বৎসর পৃথিবীময় ভীষণ মল্লক্রীড়া করিয়াছে; তাহার নিদর্শন এখনও শনি সূর্য্যাদিতে বর্ত্তমান আছে। ভূতাত্মক নীহারিকার অবস্থা হইতে ঘনত্ব প্রাপ্ত হইয়া উদ্ভিদ এবং পরে পরে জীবের বাসভূমি হইতে পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ বৎসর লাগিয়াছে। উদ্ভিদের পর পর্য্যায়েই উদ্ভিদধর্ম্মী এবং নিকৃষ্ট জাতীয় জীব, ও জীবজাতির ক্রমপর্য্যায়ে মানব পৃথিবীতে জন্মিয়াছে। এই পৃথিবীতে কিছু পূর্ব্বে মানবজাতির কোনরূপ অস্তিত্ব ছিল না, ইহা এককালে নানা প্রকার আকৃতি-বিশিষ্ট দ্বিপদ চতুষ্পদ জীবে পরিপূর্ণ ছিল। এখন তাহাদের ভূগর্ভমগ্ন প্রস্তরীভূত কঙ্কালাদি তাহার সাক্ষ্য দিতেছে; মানব ক্রমে কোন বিলয়প্রাপ্ত জীবজাতি হইতে উপজাত হইয়া কিছুকাল ধরা পৃষ্ঠে লীলা করিয়া চলিয়াছে। যাঁহারা বলেন, পৃথিবীর বয়স কেবল মাত্র ৬ হাজার বৎসর; কিংবা যাঁহারা বলিতে চাহেন, আমাদের জাতি যাবচ্চন্দ্র দিবাকর অর্থাৎ ধরাসৃষ্টির প্রত্যূষ হইতেই বর্ত্তমান আছে, দুঃখের বিষয়, পৃথিবীর ইতিহাস কিম্বা বিজ্ঞান তাঁহাদিগকে কিছুমাত্র সাহায্য করিতেছে না।

দল ও সমাজ ।—মনুষ্যেতর জীবে সমাজ নাই; দল আছে। এই দলের মধ্যে সমাজের আদি প্রকৃতি উদ্দেশ করা যায়,

এই আদি প্রকৃতি বিকশিত হইয়া ক্রমে সমাজে উন্নীত হইয়াছে। আদিম মানবজাতিও প্রথমতঃ সমাজ-বন্ধন জানিত না; দলবদ্ধ ছিল, এই দল-বন্ধন মানবের পশু-সাধারণ ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম মানব আত্ম প্রকৃতির বীজ-কোষে বহন করিয়া পৃথিবীতে আসিয়াছিল, পৃথিবী তাহাকে পরিপুষ্ট ও বিকশিত করিয়াছে। একাকী থাকা মনুষ্যজীবের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ; সমাজবন্ধনই সাধারণ জীব হইতে মানবত্বের প্রথম সোপান। সামাজিক জীব বলিয়াই মানুষ অপর জীব অপেক্ষা উন্নত ও ক্ষমতাশালী হইয়াছে এবং পৃথিবীতে আপন অধিকার বিস্তৃত করিতে পারিয়াছে।

দলবদ্ধ পশু ও সমাজবদ্ধ মানবের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য এই যে, স্বার্থত্যাগ, পরার্থের সম্মান, স্নেহ সহানুভূতি, পরস্পর সাহায্য, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি মানবে সমধিক বিকশিত হইয়াছে। যেই কারণেই হউক, পশুদের মধ্যে তাহা ঘটিতে পারে নাই, তাই পশুরা পৃথিবী পৃষ্ঠে মানবের তুল্য প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে নাই।

সমাজের ফলে মানবের বুদ্ধিবৃত্তি বিকশিত হইয়াছে; স্মৃতি শক্তি বর্দ্ধিত হইয়াছে, সৃজন শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। সমাজের দরুণ মানব মনে ন্যায়ান্যায়, পাপ পুণ্য ও ধর্ম্মভাব জন্ম লাভ করিয়াছে ও বিধি নিয়মের আবশ্যক পড়িয়াছে। একাকী অর্থাৎ জীব-সম্পর্ক-হীন মানবের পক্ষে পাপ পুণ্য কিংবা ধর্ম্মাধর্ম্মের অস্তিত্ব নাই; সে কোনরূপ বিধি নিয়মের সংশ্রবে পদার্পণ করে না।

সমাজের বাচ্যার্থ দেশে দেশে নানা কারণে বড় সংকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের দেশে সাধারণ্যে এখন সমাজ বলিতে এক পাড়ার অথবা এক পংক্তিভোজী কতগুলি লোক সমষ্টিই বুঝায়; নিতান্ত পক্ষে এক ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত লোক সমষ্টিই বুঝাইতে পারে।

কিন্তু সমাজের বাচ্যার্থ ও আদর্শ বহু বিস্তৃত। সমগ্র সম্মিলিত মানব জাতি, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গও বাদ যায় নাই। তৎ সঙ্গে সামাজিক বিধি নিয়ম ও সমাজ-বদ্ধ মনুষ্যের জীবন এবং আদর্শ অতি বিশাল হইয়া পড়িয়াছে। এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সমস্ত সভ্য দেশে সামাজিক বিধি নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে। সুতরাং মানব কেবল মাত্র আপন পরিবার কি গোষ্ঠী কি আপন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের বিধি নিয়ম মানিলেই চলিতেছে না; তাহার নিকট মানব সমাজের বিশ্বরূপ প্রকটিত হইয়াছে।

এই বিশ্বরূপের মধ্যে যেই বিরাট বিশাল একত্ব আছে, সমগ্র মানব সমাজ তাহাকেই ধারণ করিতেছে। উহাই তাহার ধর্ম্ম। সমাজ ধর্ম্মই সমস্ত ধর্ম্মের মূল ভিত্তি। তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই মানব হৃদয়ের সহস্র দল বিকশিত হইতেছে। এই ধর্ম্ম এবং মানবের তৎসাধন প্রণালী কিরূপে মূল লক্ষ্য হইতে পরে পরে ভ্রষ্ট হইয়াছে, তাহা পরে বিশদীকৃত হইবে।

শিশুমানব পূর্ণমাত্রায় স্বার্থপর। তাহার ভিতর পরার্থপরতার বীজ নিহিত থাকা স্বীকার্য্য, কিন্তু উহার বিকাশ বহু সময় এবং শিক্ষার অপেক্ষা করে। মানুষ সমাজবদ্ধ হইয়াছে আত্ম রক্ষার জন্য, স্বার্থের জন্য। এ পৃথিবী বড়ই দুঃখের; মানুষ ইহাতে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় পতিত হয়; প্রতিপদে তাহাকে বিমাতা ধরণীর শত সহস্র বিঘ্নজালের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া

আপোষ করিয়া চলিতে হয়। তাই মানব সমবেত শক্তি ও চেষ্টা যন্ত্রের প্রভাব বুঝিতে পারিয়া দলবদ্ধ হইল। স্বার্থরক্ষা প্রযত্নে দল বদ্ধ হইয়া মানুষ বুঝিল যে, সে-ই যে একা নিজের স্বার্থ অন্বেষণ করিতেছে, এমন নহে, তাহার দলস্থ সকলেই স্বীয় স্বীয় স্বার্থ অন্বেষণে তৎপর আছে, আরও বুঝিল যে, কখন বা দুই পক্ষের স্বার্থ পরস্পর বিরোধী; একের স্বার্থ উত্তরাভিমুখী হইলে অন্যের স্বার্থ দক্ষিণাভিমুখী। উভয়ের মধ্যে সুমেরু কুমেরু ব্যবধান। স্রষ্টা মনুষ্য মাত্রকে একই অন্তঃকরণ তত্ত্বের নির্ভরে সৃষ্টি করিয়া সমাজ বদ্ধ হইবার উপযোগী করিয়াছেন; আবার, সেই সমস্ত তত্ত্বকে দেশ কাল পাত্র ভেদে শত মুখে, সহস্র মুখে বিশিষ্ট করিয়া, প্রত্যেকের উপজীব্য পদার্থ বিভিন্ন করিয়া মানুষকে সমাজ-বন্ধনের কিয়ৎ পরিমাণে অনুপযোগী করিয়া তুলিয়াছেন। সাম্যের মধ্যে বৈষম্য, পরস্পরাপেক্ষিতার মধ্যে পরস্পর-বিরোধিতা সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন।

মানুষ এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ গৌণে প্রবুদ্ধ হইয়াছিল, হয়তঃ সহস্র সহস্র বৎসর আদিম মানব জাতি এইরূপে পশুদের মত দল বাঁধিয়া চলিয়াছে। জীবন-সংগ্রামে পরস্পরকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়াছে, একে অন্যের রক্ত পান করিয়াছে, আবার আবশ্যক পড়িলে এক দলের লোক একযুক্ত হইয়া অন্য দলের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছে; প্রকৃত সমাজ-বন্ধন তখনও ঘটে নাই।

সমাজ এবং সামাজিক ভাব, মানবের বহু সহস্র বৎসরের অনির্দ্দেশ্য দুঃখ যন্ত্রণার, রক্তারক্তির অভিজ্ঞতার ফলে মানব-হৃদয়ে প্রসূত হইয়াছে। মানবজাতির সেই ভয়াবহ শৈশবেতিহাস কবি-কল্পনার অপূর্ব্ব সামগ্রী! কিরূপে, কি সাধনায়, কি ঘটনায় পশুত্বের মধ্যে এক একটী করিয়া সদ্‌গুণের বীজ উপ্ত হইয়াছে, কিরূপে তাহা অঙ্কুরিত, জাগরিত ও প্রকাশুতা প্রাপ্ত হইয়া বর্ত্তমান মানব সমাজে প্রকাশিত হইয়াছে, সে যুগযুগান্তের, লক্ষ লক্ষ বৎসরের, অজ্ঞাত, অকথিত ইতিহাস ভাবিতে গেলে ভয়ে, বিস্ময়ে এবং অনির্ব্বচনীয় ভাব-পুলকে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে।

সহোদরগণের সঙ্গে স্বার্থসংঘর্ষে মানুষ জানিতে পারিল যে, দলের মধ্যে পরস্পরের বিভিন্ন স্বার্থ রহিয়াছে। তখন স্বার্থ-বিস্মৃতির, স্বার্থোৎসর্গের এবং পরার্থপরতা শিক্ষার সময়। প্রত্যেককে স্বীয় স্বীয় অবাধ স্বার্থান্বেষণ হইতে নিয়ন্ত্রিত করিবার, এককে বহুর জন্য অপেক্ষা করিতে বাধ্য করিবার, ব্যষ্টিকে সমষ্টির জন্য আপন ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করিতে উদ্বুদ্ধ করিবার যুগ।

প্রথমে দল, পরে সমাজ। একের স্বেচ্ছাচারকে বহুর জন্য নিয়ন্ত্রণের কালেই সমাজ, ইহাই সমাজ-বন্ধনের আদিম সূত্র; পশুত্ব হইতে মনুষ্যত্বে আরোহণ করিবার প্রথম সোপান। সমাজ অনাদি নহে।

এইরূপে দেখা যাইবে যে, জ্ঞাত অথবা অজ্ঞাত, প্রাকৃত অথবা অতিপ্রাকৃত, ভৌতিক অথবা দৈবিক বিপদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষাবৃত্তিই সমাজ গঠনের মূল কারণ, এই আত্মরক্ষিণী শক্তি মূলতঃ মানুষকে উপাদান করিয়া, ওই উপাদানকে নিষ্পিষ্ট, সংযত, অথবা সংহত করিয়া দেশে দেশে সমাজমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছে, দেশ কালের সামান্য পার্থক্য প্রতীয়মান থাকিলেও তাহাদের মধ্যে এক বিশাল ঐক্য আছে, এই সর্ব্বসাধারণ প্রবাহই আমাদের চিন্তনীয় বিষয়;

উহা বর্ত্তমানে কি অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, উহার আদর্শ এবং লক্ষ্য কি, সংক্ষেপে তাহার ধারণা করিতে চেষ্টিত হওয়া যাইতেছে।

সমাজের প্রবাহ বা গতি।—পশুজাতি আপন চরিত্রের ন্যূনাধিক পূর্ণতা লইয়া পৃথিবীতে আসিয়া থাকে। পৃথিবীতে তাহাদের আত্মোপযোগী শিক্ষার অথবা সাহায্যাপেক্ষিতার অবস্থা অত্যল্প কাল স্থায়ী। কোন কোন পশু জন্মমাত্রেই এক একটী সম্পূর্ণ জীব। গোবৎস জন্মমাত্রেই বিচরণ করিতে পারে; আপন আহার্য্য এবং মাতৃস্তন চিনিয়া লইতে পারে; হংস-শিশু জন্মমাত্র জলে সাঁতার দিতে পারে। জীবন পথের জন্য প্রস্তুত হইতে তাহাদের কোন প্রকার শিক্ষা-নবীশির আবশ্যক হয় না। সমস্ত ইতর প্রাণী বিষয়ে এই কথা অল্পাধিক প্রযুক্ত হয়। কিন্তু, জীবোন্নতি-সোপানে যতই অগ্রসর হওয়া যায়, যতই জটিল শরীর-বৃত্তি এবং মনোবৃত্তি-যুক্ত জীব পরম্পরার দিকে উপনীত হওয়া যায়, দেখা যায়, ততই জীবের শৈশব এবং শিক্ষানবীশির সময় দীর্ঘায়তন হইতেছে। উন্নত চতুষ্পদ এবং উন্নত দ্বিপদ জন্তু অতিক্রম করিয়া মানবে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাই, মনুষ্যের শিক্ষা-নবীশির কাল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। মানুষকে শারীরিক, মানসিক সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে অন্যূন ষোড়শ বৎসরের আবশ্যক হয়। শিশু মানবের বীজমাত্র, তন্মধ্যে প্রকাণ্ড বৃক্ষ সুপ্ত আছে। কিন্তু সেই সুপ্তি ভাঙ্গিতে হইলে উপযুক্ত শিক্ষার আবশ্যক। তাহার পূর্ব্বগণ, পিতামাতা, প্রতিবেশী, তাহার আধার-ভূতা বহিঃ-প্রকৃতি তাহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া তাহাকে শিক্ষিত, বিকশিত, গঠিত করিয়া তুলিতেছে; সুতরাং মানবের রক্ষা, মানবের স্বাস্থ্যোন্নতি সংসার সমাজ সমস্তই বহু পরিমাণে মানবের উপর নির্ভর করিতেছে। মানব-তরণীর কাণ্ডারী স্বয়ং মানব; তাই তাহার অনুযোগ বা দায়িত্ব আছে, ইতর জন্তুদের দায়িত্ব নাই।

আমরা দেখিতে পাই, মানব মর্কট অপেক্ষা অধিক হীনাবস্থায় সংসারে আসিতেছে, কিন্তু আসিবামাত্র সে দুই তিন বৎসরের মধ্যেই ইতর জীবজাতিকে বুদ্ধি-মার্গে অতিক্রম করিয়া থাকে, অপরন্তু, বিবর্ত্তবাদী পণ্ডিতেরা বলেন, শিশু পিতৃ-শরীর হইতে মাতৃশরীরে আসিয়া যে দশ-মাস অপেক্ষা করে, তাহাতে মাসে মাসে তদীয় আকৃতি যেরূপ বিবর্ত্তন প্রাপ্ত হয়, সে যেরূপে নিম্নশ্রেণীর জীব হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চ-উচ্চশ্রেণীর জীবের ছায়াকৃতি ধারণ করে, তাহাতে যেন সে এই অল্প সময়ের মধ্যেই স্থূলতঃ জীবাণু অবস্থা হইতে মানুষ পর্য্যন্ত লক্ষ লক্ষ বৎসরের সৃষ্টি-বিবর্ত্তন ন্যূনাধিক দশ মাসের মধ্যে সমাধা করিয়া সংসারে উপস্থিত হয়।

শিক্ষা-নবীশির সময় অধিক বলিয়া মানুষ শ্রেষ্ঠতা লাভ করিতে সমর্থ হয়, সে পূর্ব্ব-পুরুষের অভিজ্ঞতা এবং বিজ্ঞান-সম্পদের অধিকারী হইতে পারে। জ্ঞান-চর্চ্চা পূর্ব্বগণ যে স্থানে শেষ করিয়া গিয়াছেন, মানুষ সেই স্থান হইতে আরম্ভ করিতে পারে। তাহাকে আদিম মনুষ্য জাতির প্রাথমিক দুঃখ যন্ত্রণা এবং উৎকণ্ঠা পুনরনুভব করিতে হয় না। প্রত্যেক নূতন বৎসর, নূতন যুগ, নূতন শতাব্দী তাহার নিকট নব নব অভিজ্ঞতার উপঢৌকন উপস্থিত করে। এইরূপে অভিন্ন জ্ঞানসূত্রের অনুসরণ

করিতে করিতে মানব ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে।

এই অগ্রসর হওয়াই গতি; এবং এইরূপ গতিই উন্নতি। যে মানব পূর্ব্বগণের অভিজ্ঞতা যতদূর আয়ত্ব করিয়া আপন নৈপুণ্য ও শক্তি সাহায্যে বর্ত্তমানকে নিয়ন্ত্রিত এবং ভবিষ্যৎকে আশান্বিত করিতে পারিয়াছে,সে মানব ততদূর উন্নত। এইরূপে সমষ্টির ভাবে যে সমাজ পূর্ব্বগণের অভিজ্ঞতা যতদূর আয়ত্ব করিয়া বর্ত্তমানকে নিয়ন্ত্রিত এবং ভবিষ্যৎকে আশান্বিত করিতে পারিয়াছে, সে সমাজও ততদূর উন্নত। সমাজ এক একটী সোপান আরোহণ করিয়া তাহার উপর পা রাখিয়া দাঁড়াইতেছে। এই কথায় পূর্ব্বগণের প্রতি কোনরূপ অবজ্ঞা উদ্দিষ্ট হইতেছে না। সমাজের যে একটা গতি এবং উন্নতি আছে, তাহা বুঝিতে পারিলেই এই বাক্যের অপরিহার্য্যতা ও সারবত্তা উপলব্ধ হয়। পূর্ব্বগণ দেশ কালের মাহাত্ম্যে আমাদের নি[illegible]র মাত্র, পরিচালক বা কাণ্ডারী নহেন।

সমাজের এই গতি আর একটু বিশেষ করিয়া বুঝিতে হইলে, সমাজ যে কয়েকটী সোপান আরোহণ করিয়া আসিয়াছে,তদ্বিষয় চিন্তা করা আবশ্যক। এখনও সমাজের এই গতি-চিহ্ন মানব জাতি হইতে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। এখনও অনেক অসভ্য অর্দ্ধসভ্য নরব্যূহ পৃথিবীতে বর্ত্তমান আছে, তাহাদের মধ্যে সমাজের অপোগণ্ডাবস্থা দেখিতে পাই। অনেক প্রবীণ এবং প্রাচীন প্রিয় জাতির মধ্যে উক্ত অবস্থা হইতে বর্ত্তমান কাল্যাবধি সমাজের ধীর পদক্ষেপ এবং অবিচ্ছিন্ন গতি পর্য্যন্ত পর্য্যবেক্ষণ করা যায়।

মানুষ প্রথমে পশুজাতির ন্যায় দলবদ্ধ ছিল, সমাজ-বন্ধন জানিত না, ইহার পূর্ব্বে আভাষ দেওয়া গিয়াছে। মানুষের এই অবস্থার কোন বিশিষ্ট প্রমাণ আমাদের হাতে আসে নাই,কিন্তু সকল দিক বিবেচনা করিলে এই সিদ্ধান্ত অপরিহার্য্য হইয়া উঠে, পৃথিবীতে হয়ত লক্ষ বৎসর হইল, মানব উৎপন্ন হইয়াছে; কিন্তু তন্মধ্যে খ্রীষ্টপূর্ব্ব তিন সহস্র বৎসরের কিছু কিছু জাতি-ইতিহাস মাত্র আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহাও ইতিহাস নহে, কোনরূপ বিবরণ নহে; সামান্য নিদর্শন মাত্র। পঞ্চ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর স্থানে স্থানে যে মানুষ ছিল, ধারণা মাত্র করিতে পারিতেছি, কিন্তু এতৎ পূর্ব্বে মানুষ কি করিত, তাহাদের সুখ দুঃখ, শিক্ষা চিন্তা এবং অভিজ্ঞতা প্রভৃতি কোথায়? তাহারা কথা কহিতে পারিত কি? তাহাদের মানুষের মত ইন্দ্রিয়-গ্রাম এবং বুদ্ধিবৃত্তি ছিল কি? তাহার কোন বিশেষ নিদর্শন আমাদের হাতে আসে নাই। আমরা মানব শরীর এবং মানব সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা আলোচনা করিয়া, অথবা ভূপ্রোথিত কঙ্কাল প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াই একটা ধারণা করিতেছি যে, যুগযুগান্ত ধরিয়া মানুষ এই ভূপৃষ্ঠে, এই আকাশ, এই বায়ু এবং এই সূর্য্যালোকে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে,তাহাদের মমতা, ইচ্ছা, জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার আমরা শোণিত-সম্বন্ধসূত্রে ন্যূনাধিক উত্তরাধিকারী হইয়াছি। তাহা না হইলে কেবলমাত্র পঞ্চ সহস্র বৎসরের মধ্যে জীব পর্য্যায়ে মানবের এই শারীরিক, মানসিক, সামাজিক এবং নৈতিক উন্নতি হইতে পারে না।

এই নিদর্শনাভাবের প্রধান কারণ এই যে, মানবের তখন আত্মরক্ষাই মূল লক্ষ্য

ছিল, তজ্জন্য সে অসতর্কে দলবদ্ধ হইয়া কোন মতে জীবন যাপন করিতেছিল। আপন অভিজ্ঞতা পরবর্ত্তীতে প্রসারিত করিবার, কি নিজের জ্ঞান চিন্তা অনায়াসে অন্যের নিকট প্রকাশ করিবার শক্তি তখনও মানবে সমধিক বিকশিত হয় নাই। ভাষাই ভাব প্রকাশের প্রধান দ্বার, অপর দিক হইতে দেখিলে, তাহাই আবার মানবের ভাব প্রকাশ চেষ্টার ফল। এখনও অনেক অসভ্য জাতি দেখা যায়, যাহাদের ভাষাভিধানে ন্যূনাধিক দুই তিন শত এক পদাত্মক শব্দ ভিন্ন আর কিছুই নাই। সামান্য বস্তুবাচক এবং সাধারণ ক্রিয়াবাচক শব্দ ভিন্ন কোনরূপ সংমিশ্র-মনোভাবের প্রকাশক শব্দ এই সমস্ত ভাষায় বিরল। এমন কি, ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ যখন অপেক্ষাকৃত উন্নত সামাজিক অবস্থায় মধ্য এসিয়া হইতে চলিয়া আসেন, তাঁহাদের তাৎকালীন ভাষা ও স্থূলতম গার্হস্থ ও কৃষক জীবনের নিত্য ব্যবহার্য্য শব্দ সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই ছিল না; ইহা ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন। এইরূপ অপ্রচুর ভাষাশ্রয়ী জাতি বিশেষের জ্ঞান-সম্পত্তি সহজেই অনুমেয়।

প্রভাত হইতে সায়ংপর্য্যন্ত নিছক আত্মরক্ষার্থে ব্যাপৃত থাকায় আদি মানব জাতির আর নিশ্বাস ফেলিবার সময় ছিল না। আদি মানবের জীবন শ্বাপদ অর্থাৎ মৃগয়ু জীবন। প্রত্যহ আহার্য্যের অন্বেষণ এবং সংঘটন করিতে হইবে। ভবিষ্যতের সংস্থান করিয়া কিছু দিন নিশ্চিন্ত নির্ব্যাকুল ভাবে-বিশ্রাম করার সুবিধা নাই; হৃদয়ের ভাব গুলিকে লইয়া খেলা করার,কি মনের ভিতর-প্রকোষ্ঠে একটু দৃষ্টি নিক্ষেপ করার অবসর নাই। চারিদিকে আকাশে বাতাসে কত শত্রু নিয়ত তাহার প্রাণ হরণ করিবার জন্য বসিয়া আছে। সুতরাং এই অবস্থায় মানব সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া পৃথিবী পৃষ্ঠে কেবল আত্ম রক্ষাই করিয়া গিয়াছে। ইতর জীবজন্তুর মত কেবল প্রাণ ধারণ করিয়াই গিয়াছে; তাহার হৃদয় বিকশিত হয় নাই; তাহার প্রকৃত মনুষ্যত্ব জাগ্রত হয় নাই। সে ভয়ে ভয়ে পৃথিবী পৃষ্ঠে ঘুরিত, সিংহ ব্যাঘ্র হস্তী কিম্বা বানরের নির্ভীক স্বৈরাচার ছিল না। সে জ্ঞান এবং মোহের সঙ্গমস্থলে। পৃথিবী, আকাশ এবং আপন হৃদয়ে, তাহার জন্য দুর্ব্বোধ্য রহস্যের ছায়া-রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল। সে সর্ব্বদা ভীত ভীত না থাকিয়া এবং আত্ম রক্ষার উপায় চিন্তায় নিয়ত উদ্বিগ্ন না থাকিয়া কি করিবে! সর্ব্বপ্রকার অবস্থা পরিবর্ত্তন তাহার ভয়ের কারণ হইত; যখন আমাদের এই সূর্য্য উদিত হইতেন, যখন উষা মেঘলোকে আপনার সৌন্দর্য্য কান্তি বিস্তার করিয়া পৃথিবীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া হাসিতেন, তাঁহার সেই হাসি আদিম মানবের হৃদয় অনুভব করিতে পারিত কি? তাহার হৃদয়ে কোনরূপ বিস্ময় বা চমৎকারের উদ্রেক হইত কি? বোধ হয় না। কেন না, বিস্ময়ও একটা উচ্চ চিত্তবৃত্তি; ভয়ের সম্ভাবনা না থাকিলেই বিস্ময়ের উদ্রেক হয়। আমরা তাহার ইতিহাসও পাইয়াছি। সূর্য্য, উষা, মেঘ প্রভৃতিকে নিরবচ্ছিন্ন ভয়ের সহিত না দেখিয়া কখন মানব বিস্ময় এবং ভক্তির সহিত দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার নিদর্শনও আমরা ঋক্‌বেদে পাইয়াছি। তাহাও ন্যূনাধিক চতুঃ সহস্র বৎসরের বিশেষ অগ্রবর্ত্তী হইতে পারে না।

মৃগয়ু জীবন যে মানবের সর্ব্ব নিম্ন এবং আদিম অবস্থা, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, এই অবস্থায় মানব যে বহুকাল অবস্থিত ছিল, ইহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে যে তাহার সহস্র সহস্র বৎসর লাগিয়াছে, তাহা বিশেষ রূপে বোধগম্য হয়। মনোবৃত্তি পরিচালনার যথোচিত সুবিধা এবং অবসর না থাকায়, মানব সহজে ইহার পাশমুক্ত হইতে পারে নাই। আমমাংসভোজী অসভ্য আণ্ডামান কি ফিজিদ্বীপবাসী এ যাবৎ এই অবস্থায় বাস করিতেছে, উন্নততর জাতির চালচলন হইতে শিক্ষা এবং সঙ্কেত না পাইলে তাহাদিগকে আরও কত সহস্র বৎসর উক্তভাবে অবস্থান করিতে হইত, তাহার ঠিক নাই। তাহারা এ পর্য্যন্ত নিজ বাসগৃহের কি গাত্রাচ্ছাদনের কোন সুবিধা উদ্ভাবন করিতে পারে নাই। খাদ্যাখাদ্যের নির্ণয় কিম্বা পাক প্রণালী প্রবর্ত্তন করিতে পারে নাই। কিছু পূর্ব্বে পর্য্যটকগণ তাহাদিগকে নরমাংস আহার করিতে দেখিয়াছেন। পারিবারিক সম্বন্ধ ভেদ কি বিবাহের পাত্রাপাত্র জ্ঞান পর্য্যন্ত তাহাদের ছিল না। এইরূপে তাহারা স্মরণাতীত কাল হইতে পশু হইতে কিঞ্চিদূর্দ্ধে, অথচ সভ্য মনুষ্য হইতে বহু নিম্নে, এক নিতান্ত প্রকৃত স্থাবর এবং অপকৃষ্ট জীবন যাপন করিয়া আসিতেছিল।

সেন নদীর উপত্যকায় গুহাগর্ভে সম্প্রতি যে শিলা-প্রহরণ পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের বয়স অন্যূন ১০ দশ সহস্র বৎসর হইবে; ইহা এবং উক্ত নদীর জলসীমার বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, ভারতের এবং ইউরোপের নানাস্থানেও ওই জাতীয় অস্ত্র শস্ত্র মনুষ্য কঙ্কাল সঙ্গে পাওয়া গিয়াছে। অতীত কালে কোন বিলয়প্রাপ্ত মৃগয়াজীবী মনুষ্য-জাতি কর্ত্তৃক এই সমস্ত পাষাণাস্ত্র ব্যবহৃত হইত, তাহারা অপরিসীম ধৈর্য্য এবং পরিশ্রম সহকারে শিলা-দেহকে ঘষিয়া মাজিয়া ওইরূপ অস্ত্রে পরিণত করিত, ধাতু দ্রব্যের সন্ধান কিম্বা ধাতবাস্ত্রের ব্যবহার তাহারা জ্ঞাত ছিল না। মৃত শরীরের সঙ্গে এইরূপ অস্ত্র শস্ত্র সমাহিত করা, বোধ হয়, তাহাদের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার অঙ্গ ছিল।

মৃগয়ু জীবনের শিলাযুগের পরে ক্রমান্বয়ে তাম্র ও লৌহযুগের নির্দ্দেশ করা যায়। আকর হইতে লৌহের উদ্ধার করা অপেক্ষাকৃত কঠিন, তাই লৌহ প্রচলিত হইতে সময় লাগিয়াছে। পরে এই সকল ধাতুনির্ম্মিত অস্ত্র সাহায্যে মানুষ জীবিকা নির্ব্বাহ ও আত্মরক্ষা করিত, তাহার নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে।

ইহার অন্বয়ে কৃষি জীবন। এই স্থান হইতেই প্রকৃত সমাজের আরম্ভ, এবং মানবের উন্নতির সূত্রপাত হইয়াছে। ভূমির শক্তি, শস্যের উপযোগীতা এবং কৃষির আবশ্যকতা উপলব্ধি সহজে হয় নাই। পৃথিবীতে অনেক অসভ্য জাতি এখনও ইহা পারে নাই। আবার কতকগুলি সবে মাত্র মৃগয়া হইতে কৃষি জীবনে প্রয়াণ করিতেছে। নাগা কুকি জুমিয়া প্রভৃতি এখনও স্পষ্টতঃই প্রয়াণ পথেই রহিয়াছে।

কৃষিজীবী সমাজের প্রধান অবলম্বন পরিবার। পরিবার প্রথা ভিন্ন কৃষিজীবন পূর্ব্বকালে দাঁড়াইতেও পারিত না। ইতিপূর্ব্বে মৃগয়াজীবিদের মধ্যে পরিবার-প্রথা নিজকে বিশেষভাবে ব্যক্ত করিতে পারে নাই। মৃগয়াজীবক প্রত্যেকে অল্লাধিক স্বতন্ত্র।

পুত্রের বয়স্থ হওয়ার পর পিতার সঙ্গে তাহার সম্বন্ধও বহু পরিমাণে শিথিল হইয়া পড়ে। কেননা সেও তখন একজন স্বতন্ত্র মৃগয়াজীব। তখন সেও আত্মানুরূপ একজন সঙ্গিনী করিতে ব্যস্ত হইয়া যায়। এই অবস্থায় মানব অনেক পরিমাণে ইতর-জন্তুধর্ম্মী।

পরিবারের ঐক্য বন্ধন কিম্বা সংযুক্ত চেষ্টা মৃগয়া জীবনে পরিস্ফুট নহে। অপরন্তু স্বার্থত্যাগ, পরার্থের সম্মান প্রভৃতি সমাজের যে সমস্ত লক্ষণ পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তৎসমস্তও উহাতে প্রকট নহে। সুতরাং উহা দল ও সমাজের মধ্যবর্ত্তী, পশুত্ব হইতে মনুষ্যত্বে প্রয়াণের সেতু। মানুষকে এই সেতু অতিবাহন করিয়া আসিতে হইয়াছে।

অতএব, আমরা দেখিতেছি, সমাজের দ্বিতীয় সোপান পরিবার। শ্রীশঃ—

ভারতে দুর্ভিক্ষ। (২)

রাজস্বের আধিক্য।

ভারতের সর্ব্বত্রই রাজস্বের আধিক্য, প্রজাবর্গের দুরবস্থার প্রধান কারণ। অনেক স্থলে প্রজাদিগকে এত অধিক কর দিতে হয় যে,তাহারা দুর্ব্বৎসরের জন্য কিছুই সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারে না। প্রজাদিগের আর্থিক অবস্থার সহিত তুলনা করিলে ভারতের শাসন প্রণালী ব্যয়সাধ্য বলিয়া বোধ হয়। প্রকৃতিপুঞ্জের হিতকল্পে যে সকল বিধি ব্যবস্থার প্রণয়ন হয়, রাজপুরুষেরাই তাহা করিয়া থাকেন, প্রজাদিগের সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার কোন ক্ষমতা নাই। কোন কর বৃদ্ধি বা স্থাপনের সময় গবর্ণমেণ্ট য়ুরোপীয় ধনশালী নগরগুলির শাসন প্রথার অনুকরণ করেন, তাহার ফল স্বরূপ ভারতবাসী ক্রমশঃই বিবিধ করভারে পীড়িত হইয়া পড়িতেছে। ইহা উষ্ণ মস্তিষ্কের প্রলাপোক্তি নহে, অতি কঠোর সত্য। প্রত্যেক নূতন কর স্থাপনের সময় প্রজার আর্থিক অবস্থা, আপেক্ষিক দারিদ্র্য, করের সমতা প্রভৃতির উপর কর্ত্তৃপক্ষের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের আর্থিক অবস্থার ব্যবধান অতি বিস্তৃত। কিন্তু ভারতবাসীকে ইংলণ্ডবাসী অপেক্ষা দ্বিগুণ বা চতুর্গুণ কর দিতে হয়। নিম্নে কতকগুলি প্রদেশের প্রত্যেক অধিবাসীর বার্ষিক আয় ও দেয় রাজস্বের একটী তালিকা প্রদত্ত হইল, দৃষ্টিপাত করিলে এই উক্তির সত্যতা উপলব্ধি হইবে।

দেশ	বার্ষিক আয়	দেয় রাজস্ব	মন্তব্য
ইংলণ্ড	৩৬০	৩০	১৮৮৫ ৮৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রতি পাউণ্ড দশ
ইউনাইটেড ষ্টেটস্ আমেরিকা	৩৪০	১৫	টাকাহিসাবে গণন করিয়া এই তালিকা
ফ্রান্স	২৯০	৩৪	প্রস্তুত হইয়াছে।
জর্ম্মানি	১৮৫	২৫	
ইটালি	৭৫	১১	
স্পেন	৬৫	২০	
জাপান	৬০	৪	
ভারতবর্ষ	২১	৪	

অল্প দিন হইল, বৃটিশ পার্লামেণ্টে ভূতপূর্ব্ব ভারতসচিব লর্ড জর্জ্জ হ্যামিণ্টন যে হিসাব দাখিল করিয়াছিলেন,তাহাতে প্রকাশ, গড়ে প্রত্যেক ভারতবাসীর দেয় রাজস্ব ৩ শিং ৩১/৪ পেন্স অর্থাৎ ২।/১৩ টাকা। কিন্তু এ হিসাব সমীচীন বোধ হয় না। প্রত্যেক প্রদেশের রাজস্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আমরা অন্য সিদ্ধান্তে উপনীত হই। উদাহরণ স্বরূপ বাঙ্গালা প্রদেশের রাজস্বের কথা

প্রথমে ধরা যাউক, কারণ ভারতবর্ষে বঙ্গদেশই অধিক সমৃদ্ধিশালী। বাঙ্গালাদেশের রাজস্বের প্রধান ভিত্তি ;—

(ক) ভূমিকর (খ) আবগারি (গ) লবণ
(ঘ) চুঙ্গি (ঙ) ষ্ট্যাম্প (চ) প্রাদেশিক কর
(ছ) আয়কর (জ) গ্রাম্য পুলিস (ঝ) বন
(ঞ) রেজিষ্ট্রেসন (ট) জল সেচন।

ভারত-সচিবের হিসাবে বঙ্গদেশের ভূমিকর ৪ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে। কিন্তু ইহা কেবল গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য কর। তা' ছাড়া প্রজাদিগকে জমির জন্য আরও অধিক খাজানা দিতে হয়। ১৯০১—২ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের পথকর ও পবলিক ওয়ার্কসেসের রিপোর্টে দেখা যায়, সর্ব্বসমেত বঙ্গদেশের ভূমি সম্বন্ধীয় প্রজার দেয় কর ১৭৫০ লক্ষ টাকা। আমরা শেষোক্ত হিসাবই প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিলাম। আবগারির আয় ১৪০ লক্ষ। লবণ ও চুঙ্গি অর্থাৎ আমদানি রপ্তানি দ্রব্যের মাশুল প্রদেশ বিশেষে স্থিরীকৃত হইতে পারে না, কিন্তু সমগ্র ভারতের লোক সংখ্যা ও লবণ চুঙ্গি রাজস্বের গড় পড়তা স্থির করিয়া একটা মোটামুটি হিসাব হইতে পারে। ভারতবর্ষের লবণ ও চুঙ্গি কর ১৪৫০ লক্ষ, সুতরাং ভারতের ও বাঙ্গালার লোক সংখ্যার অনুপাত অনুসারে বঙ্গদেশের লবণ-কর৩৯৭ লক্ষ। ঙ। চ। ছ। জ। ঝ। ঞ। ট, বিভাগের রাজস্ব যথাক্রমে ১৭৫, ৯৬ লক্ষ, ৫২ লক্ষ, ৪ লক্ষ, ৪ লক্ষ, ১৫ লক্ষ, ও ১৭ লক্ষ। উল্লিখিত রাজস্বের সমষ্টি ২৬৫০ লক্ষ। বঙ্গদেশের লোক সংখ্যা ৭৭৪৪৪০০০ কোটি মধ্যে ঐ ২৬৫০ লক্ষ টাকা বিভাগ করিলে গড়ে প্রত্যেক বঙ্গবাসীর দেয় রাজস্ব বার্ষিক ৩৷৶৯ পাই পড়ে। লর্ড কর্জ্জনের হিসাব মতে প্রত্যেক ভারতবাসীর বার্ষিক আয় গড়ে ৩০ টাকা ধরিলে প্রত্যেক বঙ্গবাসীর আয়ের ১১·৪ ভাগ রাজস্ব স্বরূপ দিতে হয়।

মাদ্রাজ ও বম্বে প্রেসিঃ (দক্ষিণ ভারত)— যাঁহারা মাদ্রাজ ও বম্বে প্রদেশের রাজস্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, তথায় প্রায় এক তৃতীয়াংশ ভূমি জমিদারদিগের অধীনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আছে। তাঁহারা তজ্জন্য বার্ষিক ৬০ লক্ষ পেসকাশ প্রদান করিয়া থাকেন।

জমিদারেরা প্রজার নিকট হইতে ১৬৫ লক্ষ টাকা আদায় করেন। অবশিষ্ট রায়তি জমির বার্ষিক জমা ৫৪০ লক্ষ। (38 of Appendix to the Land Resolution of 16th January, 1902) প্রজারা যে সকল জমি দখল করে, সর্ব্বসমেত তাহার বার্ষিক জমা ৭১৫ লক্ষ। বম্বে প্রেসিডেন্সিতে (সিন্ধু প্রদেশ সমেত) শতকরা ১০ ভাগ জমিতে রায়তি ও বাকী জমিতে জমিদারী প্রথা প্রচলিত আছে। জমিদারী ও রায়তি জমির রাজস্ব যথাক্রমে ৬৫ লক্ষ ও ৩৯০ লক্ষ। সুতরাং মাদ্রাজের সর্ব্ববিধ জমির প্রজার দেয় খাজানা ৭১৫ লক্ষ ও বম্বে প্রদেশের ৪৫৫ লক্ষ।

মাদ্রাজ।

(খ)	আবগারি	১৪০ লক্ষ
(ঙ)	ষ্ট্যাম্প	৮৫ "
(চ)	প্রাদেশিক কর	৮৫ "
(ছ)	আয়কর	৩০ "
(জ)	বন	১৫ "
(ঝ)	রেজিষ্ট্রেসন	১৫ "
(ঞ)	গ্রাম্য পুলিস	
(ট)	জলসেচন	২ "

বম্বে।

(খ)	আবগারি	১০৫ লক্ষ

(ঙ)	ষ্ট্যাম্প	৬০
(চ)	প্রাদেশিক কর	৩০
(ছ)	আয়কর	৪০
(জ)	বন	৬
(ঝ)	রেজিষ্ট্রেসন	১৬
(ঞ)	গ্রাম্য পুলিস	
(ট)	জলসেচন	৫ "

(গ) ও (ঘ) বিভাগের রাজস্ব পূর্ব্ব হিসাবানুযায়ী উভয় প্রদেশের ২৯০ লক্ষ। (ঞ) বিভাগের অর্থাৎ চৌকিদারি ট্যাক্স উভয় প্রদেশেই নাই।

উভয় প্রদেশের মোট রাজস্ব ২০৮৪ লক্ষ, লোক সংখ্যা ৫৬৭৫০০০০। অতএব প্রত্যেক ব্যক্তির দেয় রাজস্ব ৩৸৶৯ পাই, সুতরাং মাদ্রাজ ও বম্বেবাসীদিগকে আয়ের শতকরা ১২·২ ভাগ রাজস্ব দিতে হয়।

উত্তর ভারত।—উত্তর ভারতের অযোধ্যা ও আগরাযুক্ত রাজ্য ও পঞ্জাব অন্তর্ভূত। যুক্ত রাজ্যে ও পঞ্জাবে জমিদারী প্রথা প্রচলিত। যুক্তরাজ্যে ৬৫০ লক্ষ রাজস্ব আদায় হয়। প্রচলিত প্রথানুসারে প্রজার দেয় রাজস্ব ১৩০০ লক্ষ। পঞ্জাবে ২৭৫ লক্ষ রাজস্ব ও প্রজার দেয় কর ৫৫০ লক্ষ। উত্তর ভারতের প্রজাবৃন্দ ১০৩½ লক্ষ একর ভূমি ভোগ করে এবং তাহার রাজস্ব ১৮৫০ লক্ষ টাকা দিয়া থাকে। ষ্ট্যাম্প, আবগারি, প্রাদেশিক কর, বন, রেজিষ্ট্রেসন এবং আয়কর বিভাগের রাজস্ব যথাক্রমে ১২৫ লক্ষ, ৯৫ লক্ষ, ১৪৫ লক্ষ, ৫ লক্ষ, ৯ লক্ষ ও ৪৩ লক্ষ। লবণ ও চুঙ্গি-শুল্ক লোক সংখ্যার অনুপাতে ৩৪৮ লক্ষ। উত্তর ভারতে শস্যোৎপাদনের জন্য জল সেচনের আবশ্যক, তজ্জন্য তথায় বহু পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মিত হইয়াছে। উক্ত বিভাগ হইতে বার্ষিক ২২৫ লক্ষ রাজস্ব আদায় হয়। সর্ব্ববিধ রাজস্বের সমষ্টি ২৪৮৫ লক্ষ, লোক সংখ্যা ৬৮০০০০০০ কোটি। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তির দেয় রাজস্ব ৪৶৹ অর্থাৎ আয়ের ১৩·৯ ভাগ।

এক্ষণে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের রাজস্বের ও প্রজার দেয় করের আলোচনা করা যা'ক। গ্রিফিনের হিসাব মতে গ্রেট-বৃটনের আয় ১৫০০ কোটি পাউণ্ড, লোক সংখ্যা ৪২০ লক্ষ, প্রত্যেক ব্যক্তির বার্ষিক আয় ৩৬ পাউণ্ড।

বুয়র যুদ্ধের পূর্ব্ব বৎসর ইংলণ্ডের সর্ব্ববিভাগ হইতে ৯৯ কোটি পাউণ্ড আদায় হইয়াছিল, সুতরাং ইংলণ্ডবাসী প্রত্যেক ব্যক্তির দেয় রাজস্ব আয়ের প্রায় ৬·৫ ভাগ।

লবণ-শুল্ক—এরূপ জঘন্য ও অনিষ্টকর শুল্ক পৃথিবীর কোন সভ্যদেশে প্রচলিত নাই। অনেকে ইহাকে জীবন-কর (Life tax) নামে অভিহিত করেন। জীবনধারণোপযোগী প্রধান দ্রব্যের উপর উচ্চহারে কর স্থাপন কদাচ ন্যায়-পরায়ণ গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য নহে। শতকরা ২০০০ টাকা হারে লবণ-শুল্ক আদায় হয়, অর্থাৎ একজন দরিদ্র কৃষককে স্বীয় পরিবারের জন্য এক পয়সার লবণ ক্রয় করিতে হইলে বিশ পয়সা খরচ করিতে হইবে। শারীরবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন, স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির ২০ পাউণ্ড লবণ আবশ্যক। লর্ড-লরেন্সের রাজত্বকালে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ১২পাউণ্ড লবণ ব্যবহৃত হইত, যত শুল্ক বৃদ্ধি হইতে লাগিল, লবণ ব্যবহারও তত কমিয়া গেল। আজ কাল প্রত্যেক ব্যক্তি ১০ পাউণ্ডেরও কম লবণ ব্যবহার করে।

১৮৮৮ খ্রীঃ লবণ-শুল্ক বৃদ্ধি হইলে রাজস্ব-সচিব সার জেমস্ ওয়েষ্টল্যাণ্ড বলিয়াছিলেন,

—'দায়ে পড়িয়া দারুণ অনিচ্ছায় গবর্ণমেণ্টকে লবণ কর বৃদ্ধি করিতে হইয়াছে।' ভারত-সচিব লর্ড ক্রস লবণ-শুল্ক বৃদ্ধির জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন—'সুযোগ হইলে ইহা উঠাইয়া দেওয়া হইবে।' ১৮৯৫ খ্রীঃ লর্ড জর্জ্জ হ্যামিল্টন ইহার অপকারিতা বুঝিতে পারিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন—'যাহা দ্বারা ভারতীয় কৃষক-বৃন্দকে অধিক পীড়িত হইতে হয়, সেরূপ শুল্ক শীঘ্রই হ্রাস করা বাঞ্ছনীয়।'

কোন্ বৎসর কত লবণ খরচ হইয়াছে, তাহার একটী তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। তৎপাঠে জানা যাইবে, যে যে বৎসর লবণের শুল্ক হ্রাস করা হইয়াছে, সেই বৎসর লবণের কাটতিও অধিক।

	লক্ষ মণ।
১৮৮১—৮২	২৮.৩৭
১৮৮২—৮৩	২৯.৭৯
১৮৮৩—৮৪	৩০.৬৫
১৮৮৪—৮৫	৩০.৬৯
১৮৮৫—৮৬	৩১.৬৯
১৮৮৬—৮৭	৩৩.৭২

শুল্ক হ্রাসের জন্য ৫ বৎসরে ৫.৩৫ লক্ষ মণ লবণ অধিক খরচ হইয়াছে অর্থাৎ শতকরা ১৮ মণ বাড়িয়াছে।

	লক্ষ মণ।
১৮৮৬-৮৭	৩৩.৭২
১৮৮৭-৮৮	৩৩.০৬০
১৮৮৮-৮৯	৩১.৩৫১
১৮৮৯-৯০	৩৩.০৪৬
১৮৯০-৯১	৩৩.২৮০

১৮৮৭-৮৮ হইতে ১৮৯০-৯১ পর্য্যন্ত ৪ বৎসরে শুল্ক বৃদ্ধি হওয়ায় কাটতি কম হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই সময়ে উত্তর ব্রহ্মের লোক সংখ্যা ও ভারতের লোক সংখ্যার সহিত যোগ করিয়া এই হিসাব প্রস্তুত হইয়াছে।

	লক্ষ মণ।
১৮৯১—৯২	৩৪.৪২৯
১৮৯২—৯৩	৩৫.০৫৭
১৮৯৩—৯৪	৩৩.৬১৮
১৮৯৪—৯৫	৩৪.১৫০
১৮৯৫—৯৬	৩৪.৬৮৫
১৮৯৬—৯৭	৩৪.০৬২
১৮৯৭—৯৮	৩৫.৫২৪
১৮৯৮—৯৯	৩৫.২৬
১৮৯৯—১৯০০	৩৫.০৫
১৮০০—১৯০১	৩৫.৭২

বিগত ১৪ বৎসরে লবণের কাটতি ৩৩.৭২ হইতে ৩৫.৭২ লক্ষ মণ হইয়াছে, অর্থাৎ ২ লক্ষ মণ বা শতকরা ৬ মণ বেশী হইয়াছে। উপরি উক্ত হিসাব হইতে জানা যায়, ১৮৮৬—৮৭ খ্রীঃ প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ১৩.৯ পাউণ্ড লবণ লাগিত, ১৮৯৯—১৯০০ খ্রীঃ তাহা ১২.৭ পাউণ্ডে পরিণত হইয়াছে।

আয়-কর।—পাঁচ শত টাকা আয়বিশিষ্ট ভারতবাসীর আয়কর ১০ টাকা ছিল। ইংলণ্ডে যাহাদের বার্ষিক আয় ১৫০ পাউণ্ড বা ২২৫০টাকা, তাহাদিগকে আয়কর দিতে হয়। ইহা দিতেও তাহারা নারাজ। ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব রাজস্ব-সচিব মাইকেল হিকস্‌বিচ সেদিন ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন, "যাহাদের বার্ষিক আয় ২৪০০ টাকার অধিক নয়, তাহাদের নিকট হইতে আয়কর গ্রহণ করা অন্যায়, নিতান্ত উৎপীড়নের কার্য্য।"

১৮৯৯-১৯০০ খ্রীঃ ভারতবর্ষে ১৯৩১৮৯৩৫ টাকা আয়কর আদায় হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৩৫১৩১৬৭ টাকা, যাহাদের আয় বার্ষিক ১০০০ টাকার কম, তাহাদের নিকট হইতে গৃহীত। ১৯০১-২ খ্রীঃ ১৯৬৩৪৩৮১ টাকার মধ্যে ৩৪৯১,৬৭২ টাকা

৩০২৪১৭ লোকের নিকট হইতে গৃহীত, যাহাদের বার্ষিক আয় ১০০০ টাকার কম। দেখা যাইতেছে যে, ১০০০ টাকার কম আয়বিশিষ্ট লোকের নিকট হইতে গৃহীত আয়-করের পরিমাণ অধিক নহে। ১০০০ টাকা আয়-বিশিষ্ট লোকের নিকট আয়-কর গ্রহণের নিয়ম করিলে রাজস্বের অধিক ক্ষতি সম্ভব নহে।*

১৮৬০ খ্রীঃ আয়কর-আইনের বিধান মতে আয়করের সমষ্টির শতকরা এক টাকা সাধারণের হিতজনক কার্য্যে ব্যয় হইত। উক্ত আইন প্রচলনের ৫ বৎসরে প্রায় ১৪২ লক্ষ টাকা ঐ উদ্দেশ্যে ন্যস্ত হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে আয় করের সেরূপ কোন ব্যবস্থা নাই।

ষ্ট্যাম্প-শুল্ক।—ভারতীয় ষ্ট্যাম্প বিষয়ক আইন (১৮৯৯ সালের ২ আইন) ও ইংলণ্ডের ষ্ট্যাম্প বিষয়ক রিপোর্টের পরিশিষ্ট(১) পাঠ করিলেও কর-বৈষম্যের বিষয় জানিতে পারা যায়।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ উভয় প্রদেশের নানা বিষয়ক ষ্ট্যাম্প-ডিউটী উল্লিখিত হইল।

হস্তান্তর বা কবালা।

(Transfer or Conveyances)

ইংলণ্ড		
৫ পাউণ্ড ... ৬ পেন্স		পাউণ্ড ... ১০ শিলিং
১০	শিলিং	" ... ১ পাউণ্ড
৫০		

শতকরা ·৫ হার।

ভারতবর্ষ	
৫০ টাকা ... ॥০ আনা	১০০০ টাকা ... ১০ টাকা
১০০ " ... ১ টাকা	২০০০ " ... ২০ "
৫০০ " ... ৫ "	৫০০০ " ... ৫০ "

শতকরা ১ টাকা হার, ইংলণ্ডের ষ্ট্যাম্প-শুল্কের দ্বিগুণ।

বিনিময় পত্র।

(Bills of Exchange)

ইংলণ্ড	
৫ পাউণ্ড ... ১ পেন্স	
১০ " ... ২ "	১০০০ পাউণ্ড ... ৬ পেন্স
২৫ " ... ৩ "	হইতে ১ শিলিং।

ষ্ট্যাম্প-ডিউটি শতকরা ·০৮ হইতে ·০২৫ মধ্যে।

ভারতবর্ষে ১০০ টাকায় এক আনা অর্থাৎ শতকরা হার ·০৬।

বন্ধকী পত্র।

(Mortgage Deed)

ইংলণ্ড			
১০ পাউণ্ড	...	...	৩ পেন্স
৫০ "	...	...	১ শিং ৩ পেঃ
১০০ "	...	...	২ শিং ৬ পেঃ
২০০ "	...	...	৫ শিং

শতকরা ·১২৫ হার।

ভারতীয় বন্ধকী পত্রের ষ্ট্যাম্প কবলার অনুরূপ। ইহার হার যথাক্রমে শতকরা ১ হইতে ·৫।

শিক্ষানবিশী পত্রের ইংলণ্ডীয় হার ২ শিং ৬ পেঃ, অর্থাৎ কিঞ্চিৎ ন্যূন ২৲ টাকা, ভারতবর্ষের হার ৫৲ টাকা।

ভূমিকর—ভূমিকরের আধিক্য ভারতীয় দুর্ভিক্ষের অন্যতম কারণ। ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশে, অধিবাসীর মধ্যে শতকরা ৮০ জন কৃষক। কৃষিজীবীর ভূমিই জীবিকা নির্ব্বাহ ও পরিবার প্রতিপালনের প্রধান উপাদান। ভূমির রাজস্ব অধিক হইলে

* লবণ শুল্ক ও আয়-করের ইদানীং কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কিন্তু তাহার দ্বারা প্রজার বিশেষ কোন লাভ হয় নাই। বরং কর্ম্মচারিগণের দৌরাত্ম্য অধিক বাড়িয়াছে।

(১) Pages 56-60 of the 44th Report of the Commissioners of His Majesty's Inland Revenue (Parliamentary paper 764 of 1901)

প্রজার অবস্থার অবনতি অবশ্যম্ভবী। যাঁহারা ভারতবর্ষের রাজস্বের বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাঁহারা ভূমির করাধিক্য দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব প্রধান সচিব লর্ড সলিসবরি ভারতের সেক্রেটারিরূপে বিভিন্ন বিভাগের রাজস্বের আলোচনা করিয়া ১৮৭৯ খ্রীঃ লিখিয়াছিলেন—"ভারতবর্ষের কর প্রথা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে দরিদ্রদিগকে করভার হইতে মুক্তি দেওয়া প্রথমেই বাঞ্ছনীয়। বিত্তহীন পল্লিবাসী কৃষককুল অপেক্ষা ধনশালী বিলাসী নাগরিকদিগের নিকট শুল্ক কর গ্রহণ কর্ত্তব্য। ভারতের রক্ত-শোষণই যদি আমাদের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে তাহার শোণিত-বহুল স্থানে অস্ত্র প্রয়োগই উচিত, নীরক্ত স্থানে অস্ত্রাঘাতে ফল কি?" উইলিয়ম হণ্টারের মতও ঐরূপ—'ইংলণ্ডে ভূমিকরের অধিকাংশই প্রজাদিগের হিতার্থে ব্যয়িত হয়, ভারতবর্ষে তাহা রাজার প্রাপ্য। * * * * * জগতের কোন সভ্য দেশে এরূপ উচ্চ ভূমিকর প্রচলিত নাই। এখানে ইহা রাজস্বের মূলভিত্তি।'

প্রাচীন কালে হিন্দুরাজগণ উৎপন্ন শস্যের ষষ্ঠাংশ রাজস্ব স্বরূপ গ্রহণ করিতেন। হিন্দু ব্যবহার শাস্ত্র ও কাব্যাদিতে এই বিষয়ের ভূরি ২ প্রমাণ পাওয়া যায়—

১। ষড়োভাগী ভৃতো রাজারক্ষেৎ প্রজাঃ। বৌধায়ণ

২। পঞ্চাশদ্ভাগ আদায়ো রাজ্ঞা পশু হিরণ্যয়োঃ।
ধান্যানামষ্টমোভাগ ষষ্ঠো দ্বাদশ এববা॥ মনু ৭।১৩০

৩। পুণ্যাৎ ষড়ভাগ মাদত্তে ন্যায়েন পরিপালয়ন্।
সর্ব্বদানাধিকং যস্মাৎ প্রজানাং পরিপালনং॥
যাজ্ঞবল্ক্য।৩৩৭

৪। কো অবরো অবদেশোতুহ্মানং রাআণং নীবারছট্ঠভাঅং
অহমানং উব হবন্তি।অভিজ্ঞান শকুন্তলং। ২ অঙ্ক।

মুসলমান বাদসাহগণ হিন্দুদিগের বহু সহস্র বৎসরের অভিজ্ঞতালব্ধ এই রাজস্বপ্রথা প্রজার পক্ষে হিতকরী জানিয়া স্বীয় রাজত্ব কালে প্রচলন করেন। উদাহরণ স্বরূপ বঙ্গ দেশের রাজস্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিলে তাহা জানা যাইবে।

মোগল সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্যের এক তৃতীয়াংশ রাজকর রূপে গৃহীত হইত। আকবরের রাজস্বমন্ত্রী তোড়রমল্ল বাঙ্গালা দেশ ১৯ সরকার ৬৮৮২ পরগণায় বিভক্ত করিয়া ১০৬৯৩২৫৩ টাকা রাজস্ব নির্ণয় করেন। তাঁহার পূর্ব্বে আলাউদ্দিন খিলিজি ও সেরসাহার রাজত্ব কালে এই নিয়মে রাজস্ব আদায় হইত।

নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর সময় বাঙ্গালা দেশ ১৩ চাকলা ও সেই সকল চাকলা ১৬৬০ পরগণায় বিভক্ত হইয়া ১৪২৮৮১৮৬ টাকা রাজস্ব নির্দ্ধারিত হয়। (১)

মিরকাশিম বাঙ্গালার শেষ স্বাধীন নবাব। তাঁহার রাজত্ব কালে রাজস্বের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই, তবে সরকারি কাগজ পত্রে কিছু বাড়িয়াছিল। ইতিহাসজ্ঞ পাঠক অবগত আছেন, যে সময়ে রাজস্ব আদায় বিষয়ে কাশিম আলি ইংরাজ হস্তে ক্রীড়া-কন্দুকে পরিণত হন, সেই সময়ে বাঙ্গালার রাজস্ব আড়াই কোটী হইয়াছিল এবং এই রাজস্ব সংক্রান্ত বিবাদই মিরকাশিমের ভাগ্যবিপর্য্যয়ের প্রধান কারণ। এই পরিমাণ রাজস্ব আদায় করিবার জন্যও যখন প্রজাপুঞ্জের উপর বিষম উৎপীড়ন হইত, তখন অবশ্য ইহা স্বীকার্য্য যে, হিন্দুদিগের উদ্ভাবিত রাজস্ব-হারই প্রজার পক্ষে উপযুক্ত ছিল।

(১) Grant's Analysis of Finances of Bengal.

মিরকাশিমের রাজস্ব আদায়ের নাম সারজন সোরের ভাষায় লুণ্ঠন ইত্যাদি (pillage and rack rent) কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বৎসর আদায় হইয়াছিল ২৬৮০০৯৮৯ কোটি টাকা।

সম্রাট কনষ্টান্টাইনের অর্থগৃধ্নু রাজস্ব-সচিবেরা গলের (Gaul) অধিবাসীগণের গড়ে বার্ষিক ২৫ স্বর্ণ মুদ্রা ভূকর ধার্য্য করেন। পরবর্ত্তী সম্রাটের সময়ে তাহা রহিত হইয়া ৭ মোহরে পরিণত হয়, কিন্তু অন্যান্য সময়ে গড়ে প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট হইতে বার্ষিক ১৬ স্বর্ণ মুদ্রা বা ৯ পাউণ্ড আদায় হইত। (২)

২৫ স্বর্ণমুদ্রা বা ১৫ পাউণ্ড রাজস্বের কথা শুনিয়া রোমের ইতিহাস-লেখক বিস্মিত হইয়াছিলেন, কিন্তু বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান কালে ভারতবাসীর নিকট হইতে যে পরিমাণ ভূমিকর গ্রহণ করিতেছেন, তাহা জানিতে পারিলে সেই মনস্বী ঐতিহাসিকের প্রেতাত্মা শিহরিয়া উঠিবে, সন্দেহ নাই।

ইংলণ্ডে ৯৭২৮৩৬ ভূস্বামী আছেন। বার্ষিক কুড়ি লক্ষ পাউণ্ড ভূমিকর তাঁহারা দিয়া থাকেন, অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তির বার্ষিক দেয় ভূমির রাজস্ব ২ পাউণ্ডের অধিক নয়।

এক্ষণে আমরা ভারতবর্ষের ইংরাজাধীন প্রদেশ সমূহের ভূমিকরের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

বঙ্গদেশ।—চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গুণে ও ১৮৫৯।৬৮।১৮৮৫ সালের আইনের ফলে বঙ্গীয় প্রজাগণ অন্যায় কর বৃদ্ধির দায়ে রক্ষা পাইয়াছে। এ দেশের কোন অঞ্চলেই খাজনা উৎপন্ন দ্রব্যের ষষ্ঠাংশের অধিক নহে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ক্রমশঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উপর হস্তক্ষেপ করিতেছেন। ১৭৯৩খ্রীঃ ২২শে মার্চ্চের ঘোষণাপত্রে যে রাজস্ব হার 'অপরিবর্ত্তনীয়' ও 'অপরিবর্দ্ধনীয়' বলিয়া ধার্য্য করা হইয়াছিল, ১৮৬২খ্রীঃ গবর্ণমেণ্ট তাহারই উপর জমিদারী ডাক-সেস্ বার করিলেন। ইহাকে পুলিস-ট্যাক্স বলাই অধিক সঙ্গত, কারণ মফস্বলের পুলিসের পত্রাদি বহনের জন্যই ঐ ট্যাক্সের সৃষ্টি। আজ কাল অতি ক্ষুদ্র পল্লীতেও ডাকঘরের অভাব নাই, সুতরাং ঐ ট্যাক্সের কোন আবশ্যকতাও নাই। আশ্চর্য্যের বিষয়, ইহার পরিমাণ প্রতি বৎসরই বৃদ্ধি হইতেছে। ১৮৬৯ খ্রীঃ বর্দ্ধমান বিভাগে ডাকসেস ছিল ২৮৮০টাকা, ১৮৭৯-৮০খ্রীঃ তাহা ৬৩৯৭ টাকায় উঠিয়াছিল। (১) এই খানেই শেষ নহে। প্রায় একশতাব্দী পরে পথকর পবলিক ওয়ার্কসেস্ স্থাপিত হইল। জমিদারেরা নিজের জমিদারীর উন্নতি সাধনে অসমর্থ, রাস্তা মেরামত, বা নূতন পথ নির্ম্মাণের ভার গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিবেন, এই ধুয়ায় ঐ দুই করের প্রবর্ত্তন। এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক, দুর্ভিক্ষের জন্য স্থায়ী তহবিল সৃষ্টি পথকর স্থাপনের অন্যতম কারণ বলিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ করিয়াছিলেন।

লর্ডলিটন লিখিয়াছিলেন—'সাম্রাজ্যের ভাবী দুর্ভিক্ষ আশঙ্কা নিবারণ জন্য এই অতিরিক্ত কর প্রজার উপর স্থাপিত হইল। উদ্বৃত্ত টাকা হইতে বার্ষিক দেড়কোটি টাকা দুর্ভিক্ষ তহবিলে প্রদত্ত হইবে।

"The sole justification for the increased taxation which has just been imposed

২। Gibbon's Decline and fall of the Roman Empire, Chap XVII.

১। Calcutta Review, ccxix, January, Land Tax of Bengal.

upon the people of India for the purpose of ensuring this Empire against the worst calamities of future famines, so far an assurance can now be practically provided, is the pledge we have given that a sum not less than a million and a half sterling which exceeds the amount of additional contributions obtained from the people for this purpose, shal l be annually applied to it' Minute of Lord Lytton, 12 March, 1878.

এই সকল সেস খাজনার সহিত দাখিল করিবার নিয়ম। রাজস্ব আদায়ের সময় ইহার কোন অংশ বাকী থাকিলে বার্ষিক শতকরা বার টাকা হার সুদ সমেত তাহা আদায় হয়, এবং প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর সেসের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সেস্ পুনরবধারণের (Revaluation) সময় প্রজার কথায় কর্ণপাত বা তাহাদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয় না। কর্ম্মচারীদিগের অনুমান বা খামখেয়ালির উপর ঐ হ্রাস বৃদ্ধি নির্ভর করে।

উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশ।—এ অঞ্চলে ও অযোধ্যা প্রদেশে বঙ্গের ন্যায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না থাকায়, প্রত্যেক নূতন কর নির্দ্ধারণকালে প্রজার খাজনা প্রায়ই বৃদ্ধি হইয়া থাকে। মুদ্রা-কমিশনের সমক্ষে সাক্ষ্যদানকালে সার এণ্টনি ম্যাকডোনাল বলিয়াছেন—'জমিদারগণই প্রজার খাজনার হার নির্দ্ধারিত করেন। তাঁহাদের যাহা আয় হয়, তাহার কিঞ্চিন্নূন অর্দ্ধাংশ গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করেন। প্রজারা উৎপন্ন শস্যের এক পঞ্চমাংশ জমিদারকে দেয়। গবর্ণমেণ্ট প্রতি ত্রিশ বৎসর অন্তর কর বৃদ্ধি করেন। প্রত্যেক নূতন কর নির্দ্ধারণকালে বৃদ্ধির ভয়ে জমিদারেরা প্রজার অর্থ শোষণ করিতে কুণ্ঠিত হয় না।'

মাদ্রাজ।—মাদ্রাজের অবস্থা অধিকতর শোচনীয়। এদেশের অধিকাংশ স্থানেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বা জমিদারী প্রথা নাই। কৃষিকার্য্যের ব্যয় আছে, কৃষকের যাহা লাভ থাকে, তাহার অর্দ্ধাংশ গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করেন। ১৮৫৭ খ্রীঃ গবর্ণমেণ্ট প্রজাদিগের ভূস্বামীত্ব স্বীকার পূর্ব্বক আর কর বৃদ্ধি করিবেন না—বলিয়াছিলেন। ১৮৮২ খ্রীঃ রিপনের শাসন সময়ে শস্যের মূল্য বৃদ্ধি না হইলে খাজনা বৃদ্ধি হইবে না, ইহাও গবর্ণমেণ্টের কথা। কিন্তু এক্ষণে জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি অনুসারেও রাজস্ব বৃদ্ধি হইতেছে, তদ্ভিন্ন যে সকল জমিতে সরকারি ব্যয়ে জল সিঞ্চিত হয়, তাহার উপর গবর্ণমেণ্ট ১৮৭৯ খ্রীঃ হইতে শতকরা ৪০ ভাগ ও অন্য জমির উপর শতকরা ৩৩ ভাগ কর নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ইহার পরিণাম অমঙ্গলজনক। মিঃ রোজার্স লিখিয়াছেন—'প্রজারা খাজানা দিতে পারেনা বলিয়া মাদ্রাজে অনেক জমি পতিত রহিয়াছে।'

বম্বে।—বম্বে প্রদেশের কর প্রথা কতকটা মাদ্রাজের অনুরূপ। তবে মাদ্রাজে নিরবচ্ছিন্ন অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া প্রজার রাজস্ব স্থিরীকৃত হয়, বম্বে পূর্ব্ব ২ বৎসরের প্রজার দেয় খাজনার হার দেখিয়া কর নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। গুরু কর-ভার জন্যই এ অঞ্চলের প্রজাদিগের অবস্থা শোচনীয় এবং দুর্ভিক্ষের প্রকোপও অধিক লক্ষিত হয়। গবর্ণমেণ্টের বিশ্বাস, মহাজনদিগের উৎপীড়ন জন্য প্রজার অবস্থা-হীন। রাজস্বের আধিক্য তাঁহাদের মতে দুর্ভিক্ষের কারণ নহে। ১৮৬৫ খ্রীঃ কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে দাক্ষিণাত্যে খাতকদিগের প্রতি মাহাজনদিগের অত্যাচার সম্বন্ধে নানা স্থানে আলোচনা ও আন্দোলন হইতেছিল, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট আদৌ তৎপ্রতি মনোযোগ করেন নাই।

যখন লোকের কষ্ট অসহ্য হইল, প্রজারা ক্ষেপিয়া মাড়োয়ারি মহাজনদিগের গৃহাদি লুণ্ঠন ও নাসিকা ছেদনাদি দ্বারা অত্যাচারের প্রতিশোধ দিতে লাগিল, তখন গবর্ণমেণ্ট শিহরিয়া উঠিয়া প্রজাদিগের অসন্তোষের কারণ নিবারণ জন্য কমিশন নিযুক্ত করিলেন। কমিশনে স্থির হইল, মাড়োয়ারি মহাজনদিগের অত্যাচার ও রাজস্বের গুরুভারে প্রজারা উৎপীড়িত হইয়া উন্মত্তবৎ হইয়াছে। তখন ব্যবস্থা হইল, মহাজনেরা খাতকের নিকট স্বীয় প্রাপ্য আদায় করিতে পারিবে না, রাজা স্বীয় প্রাপ্য যে প্রকারেই হউক, আদায় করিয়া লইবেন। ডাক্তার পোলেন এই আইন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"এই আইনের দ্বারা মহাজনদিগকে প্রজার উপর উৎপীড়ন করিতে নিষেধ করা হইয়াছে, কিন্তু প্রজাদিগকে যাহাতে খাজনার জন্য মহাজনের শরণাপন্ন হইতে না হয়, তাহার কোন ব্যবস্থা এই আইনে নাই। ফলতঃ এই আইনের দ্বারা প্রজাকে কিঞ্চিৎ সুখী করিবার জন্য উত্তমর্ণের প্রতি অত্যাচার করা হইয়াছে।" পঞ্জাবের প্রজাবর্গকেও মহাজনদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি এক আইন পাশ করিয়াছেন; তদ্বারা মহাজন কর্ত্তৃক কৃষকের জোত জমি নিলাম বিক্রয় নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই আইনে প্রজার শক্তি হ্রাস ব্যতীত বৃদ্ধি হয় নাই। বরং ইহা দ্বারা (১) স্বাধীন প্রতিযোগীতা নষ্ট হওয়ায় ভূমির মূল্য হ্রাস হইয়াছে, (২) বন্ধক-গৃহিতার আবদ্ধ সম্পত্তি হইতে প্রাপ্য আদায়ের পথ রুদ্ধ হইয়াছে, (৩) বিপদের সময় কৃষকদিগের কর্জ্জ পাইবার উপায় নাই, কারণ জমির বিক্রেয় মূল্য হ্রাস হইয়াছে, (৪) সামান্য মধ্যসত্ব বহু উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে বিভক্ত হইলে অতি ক্ষুদ্র অংশ হইতে কোন ব্যক্তির পরিবার প্রতিপালনের অসুবিধা ঘটিলেও তাহা হস্তান্তর হওয়া কঠিন, (৫) গবর্ণমেণ্টের মুদ্রায় রাজস্ব আদায় হওয়া দুষ্কর।

মধ্য-প্রদেশ।—১৮৯৭ খ্রীঃ দুর্ভিক্ষের সময় মধ্যপ্রদেশেই অধিক প্রাণী ক্ষয় হইয়াছিল। ১৯০০ খ্রীঃ দুর্ভিক্ষের প্রকোপও তথায় বেশী অনুভূত হইয়াছিল। রাজস্ব ব্যবস্থার কঠোরতাই ইহার কারণ। তথায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নাই, মধ্যে ২ খাজনার হার নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, এবং প্রতিবারেই খাজনার বৃদ্ধি হয়। এই বৃদ্ধির পরিমাণও ভয়ানক। মহাসভায় ভারতসচিব বলিয়াছিলেন যে, মধ্য প্রদেশের কর্ত্তারা প্রতি ২০ বৎসর অন্তর এবং তদপেক্ষা অল্প সময়ের মধ্যেও খাজনা বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। শেষ বন্দোবস্তে জমির খাজানার পরিমাণ (সেস বাদে) শতকরা ২০ হইতে ৯৩ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহার উপর সেস আছে। পূর্ব্বে সেস সমূহের হার শতকরা ৪॥০ টাকা ধার্য্য ছিল। গত পূর্ব বন্দোবস্তে সেসের হার শতকরা ১২॥ টাকা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সেসের হার খাজনার অনুপাতে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। শেষ বন্দোবস্তে সেসের পরিমাণ দুইটী উপায়ে বৃদ্ধি করা হইয়াছে। প্রথমতঃ হারের বৃদ্ধি, তাহার উপর আবার জমির খাজনা বৃদ্ধি হওয়ায় সেসের পরিমাণ বর্দ্ধিত হইল। কোন প্রজার জমি শেষ বন্দোবস্তের পূর্ব্বে ১০০ টাকা ছিল, সেস্ সমেত তাহাকে ১০৪॥ টাকা দিতে হইত। নূতন বন্দোবস্তে তাহার জমির খাজনা শতকরা ৫০ টাকা হারে বৃদ্ধি হইলে ১৫০ টাকা ও সেসের দরুণ ১৮৮ একুনে মোট ১৬৮৮ টাকা

আদায় দিতে হইতেছে। তাহাকে পূর্ব্ব দেয় টাকা অপেক্ষা ৬৪.০ টাকা বা শতকরা ৬০ টাকার অধিক খাজনা আদায় দিতে হইতেছে। জমিদারগণের নিজ জোত বা খাসখামার জমিগুলির উপরও কর ধার্য্য করা হইয়াছে, পূর্ব্বে ঐ সকল জমি নিষ্কর ছিল, এক্ষণে খাসখামার কোন জমি নাই। মধ্যে প্রদেশের মালগুজারদিগকে সকল প্রকার জমির উপর মোট উপস্বত্বে শতকরা প্রায় ১২ টাকা কর স্বরূপ দিতে হইতেছে। ডেকান্ রায়ত কমিশনের (The Deccan Ryot commission) তিনজন ইংরেজ সিভিলিয়ান সভ্য মাদ্রাজ, বম্বে ও মধ্যে প্রদেশের রাজস্ব প্রথার ভূয়সী নিন্দা করিয়াছেন।

বাস্তবিক সভ্য জগতের কোথায়ও ভারতের ন্যায় এত উচ্চহারে রাজস্ব আদায় হয় না। ইংলণ্ডে প্রতি পাউণ্ডে চারি শিলিং মাত্র জমির রাজস্ব, ইংলণ্ড অপেক্ষা এদেশের রাজস্ব হার তিনগুণ অধিক। ফ্রান্সে জমির রাজস্ব খাজনার অষ্টমাংশের অধিক নহে, ভারতবর্ষে অর্দ্ধেকেরও অধিক। রুষিয়া ও তুরস্ক ভিন্ন য়ুরোপের কোন দেশেরই রাজস্ব জমির খাজনার চতুর্গুণ নহে। ব্রীগস্ রচিত প্রাচীন জাতির ভূকর বিষয়ক গ্রন্থ (Brigg's Land Tax of the Ancients) পাঠ করিলে জানা যায়, অতীত কালে মিসরে উৎপন্ন শস্যের এক পঞ্চমাংশ এবং গ্রীস, পারস্য, চীন ও ব্রহ্মদেশে দশমাংশ রাজকর গ্রহণের নিয়ম ছিল।

ইংলণ্ডের ভূকরের ধারাবাহিক ইতিহাস পাঠ করিয়া জানা যায়, কোনও কালে তথায় জমির রাজস্ব প্রতি পাউণ্ডে চারি শিলিংয়ের অধিক হয় নাই। ১৬৮৮ খ্রীঃ ১ শিং, ১৬৯০-৯২ খ্রীঃ ৩ শিং, ১৬৯৭ খ্রীঃ ৪ শিং, ১৭৬৭-১৭৭০ খ্রীঃ ৩ শিং ১৭৭৬ খ্রীঃ হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত প্রতি পাউণ্ডে ৪ শিলিং। (১) এই প্রসঙ্গে জমির জরিপের কথাও উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমানকালে জরিপ সংক্রান্ত যে নিয়মাবলী প্রচলিত আছে, তাহা প্রজার পক্ষে হিতকর নহে। ভূমির কর বৃদ্ধির ইহা একটী কৌশল মাত্র। সার্ভে আমিন প্রদত্ত রিপোর্ট অনুসারে ভূমিকরের হ্রাস বৃদ্ধি বা পথকর প্রভৃতি পুনরবধারণ (Revaluation) হইয়া থাকে। ঐ আমিন-প্রদত্ত রিপোর্ট ভ্রমসঙ্কুল কিনা, তাহা বিশেষরূপে অনুসন্ধান করা যায় না, সুতরাং প্রজাদিগকে তদ্বারা বিড়ম্বিত হইতে হয়। প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে সার লুইস ম্যালেট (Sir Louis Mallet) লিখিয়াছিলেন—'জরিপের দ্বারা জমির কর অধিকস্থলে বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ভূমিকর বৃদ্ধি রাজনৈতিক বিপদের হেতু। এই সঙ্কীর্ণ নীতি প্রজার পক্ষে অমঙ্গলজনক ও দারিদ্র্য-বর্দ্ধক। ম্যালেটের এই মন্তব্য ১৭৮৯ খ্রীঃ দুর্ভিক্ষ কমিশনের রিপোর্টের পরিশিষ্টে লিপিবদ্ধ আছে।

বঙ্গের ন্যায় ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রসার বৃদ্ধি করিলে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ বহু পরিমাণে খর্ব্ব হওয়া সম্ভব। প্রত্যেক দুর্ভিক্ষ কালে বঙ্গদেশ ভিন্ন ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে দুর্ভিক্ষদানবের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ লক্ষিত হইয়া থাকে। মহানুভব পিট (Pitt) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উপকারীতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ইহার অনুমোদন করিয়াছিলেন। লর্ড গ্রেনভিল, লর্ড মেলভিল প্রভৃতি রাজনীতিবিৎ পণ্ডিতেরাও এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষপাতী ছিলেন।"

(১) Tegg's Epitome of the Universal History p 53.

লর্ড ওয়েলস্‌লি (Lord Welsely) ভারতের প্রত্যেক শাসনকর্ত্তাকে এই শুভকর বন্দোবস্তের প্রসার বৃদ্ধি বিষয়ে উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন "ইহা রাজ্য রক্ষার প্রধান ভিত্তি।" কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, গবর্ণমেণ্ট অধুনা ইহার প্রসার বৃদ্ধি বিষয়ে কোন যত্ন করিতেছেন না, বরং ইহা এক্ষণে এক প্রহসনে পরিণত হইতে বসিয়াছে।

প্রজার রাজস্বভার লঘু করিবার প্রস্তাব উত্থিত হইলে লর্ড কর্জ্জন মাদ্রাজ মহাজন সভার সভ্যদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, সমগ্র ভারতের চতুর্থাংশ রাজস্ব হ্রাস করিলে দেশে আর দুর্ভিক্ষ হইবে না, কষ্ট, দুঃখ বিদূরিত হইবে, একথা কি সাহস করিয়া বলা যায়? শপথ করিয়া কেহ বলিতে অগ্রসর না হইলেও ইহা নিশ্চয় যে বম্বে, মাদ্রাজ ও মধ্য-প্রদেশের শতকরা ২৫ টাকা খাজনা কমাইলে দুর্ভিক্ষের সময় অনেক হাহাকার কমিয়া যাইবে এবং দুস্থ প্রজাও দুর্ভিক্ষ সময়ে দুর্ভিক্ষগ্রাস হইতে বহু-পরিমাণে মুক্তিলাভ করিবে।

পুনঃ ২ জমি জরিপ করিয়া নূতন খাজনার হার নির্দ্ধারণের প্রথা রহিত করিলেও অনেক স্থলে প্রজারা জমির উন্নতি সাধন বিষয়ে মনোযোগী হইতে পারে।

শ্রীকুলদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

চীনদেশে সন্তান চুরি। (২)

অংকোতি আবার জিজ্ঞাসা করিল, রবার্ট সাহেবের গির্জ্জায় এই বালিকাটীকে রাখিতে যাইবার কারণ কি? বৃদ্ধ উত্তর করিয়া বলিল যে সে দুঃখের কথা আর কি বলিব? সে কথা মনে করিলে প্রাণ অস্থির হয়।

পাঠক এইস্থানে কাচিন-জাতির পরিচ্ছদ, আচার ও ব্যবহার সম্বন্ধে প্রথমে উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করি, পরে বৃদ্ধের দুঃখের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিব।

ব্রহ্ম-দেশ ও চীন-রাজ্যের মধ্যে যে সকল পাহাড় আছে, তথায় কাচিন নামক এক অসভ্য জাতি বাস করে। এই কাচিনগণের কতক লোক চীন সাম্রাজ্যের অধীন এবং কতক ব্রহ্ম রাজার অধীন ছিল। কিন্তু তাঁহাদের এই অধীনতা নাম মাত্র ছিল, কেন না, সুবিধা পাইলেই তাহারা উভয় রাজ্যের গ্রাম সকল লুট পাঠ ও নরহত্যা ইত্যাদি করিত। কোন রাজাকেই ইহারা বড় ভয় করিত না এবং কেহই ইহাদিগকে রীতিমত শাসন করিতে পারিত না। ফলতঃ ইহারা অতি দুর্দ্দান্ত লোক। এখন ইংরাজের অধীনে ব্রহ্মদেশ আইসায়, চীন ও ব্রহ্মদেশের সীমানা নির্দ্ধারণ হওয়ায়, ইংরাজাধিকৃত কাচিনগণ রীতিমত শাসিত হইয়াছে এবং সেই দেখাদেখি, চীনাদের অধীনস্থ কাচিনগণও পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে শাসনের অধীনে আসিয়াছে। কিন্তু চীনদেশের শাসন-প্রণালী অতিশয় শিথিল বলিয়া সময় ২ ভয়ানক অরাজকতার অভিনয় এখনও হইতেছে।

পোষাক।

কাচিন পুরুষগণ মাথায় পাগড়ী, গাত্রে মোটা নীলরং বিশিষ্ট কাপড়ের কোট এবং পা-জামা পরিধান করিয়া থাকে। ইহারা

(২) Common's Committee Appendix p 67.

জুতা পরিধান করে না। তবে আজকাল নূতন ধরণের যুবক সকল, যাহারা ব্রহ্ম-দেশে ইংরেজের চাকরি করিতেছে, তাহারা অবশ্য জুতা কেন, আরো নানা রকমের ইংরেজি ধরণের কাপড় ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এবিষয়ে আমাদের দেশে যে পরিবর্ত্তন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, যেখানে ইউরোপীয় লোকদের আগমন হইয়াছে, সেই স্থানেই সেই পরিবর্ত্তনের যুগ আরম্ভ হইয়াছে। কাচিন পুরুষগণের কাণের নতিতে বৃহৎ ছিদ্র, উহার মধ্যে ব্রহ্মদেশী একটা মোটা চুরট পর্য্যন্ত রাখা যায়। জানুর নিম্নে কতকগুলি কৃষ্ণ বলয় পরিধান করে। ঐ বলয় সকল পাতলা বাঁশের শলাকা দ্বারা প্রস্তুত করিয়া কাল রং করিয়া রাখে। স্কন্ধে অর্দ্ধ মুক্ত কোষে তরবারি বা দা, হস্তে বল্লম এবং পৃষ্ঠ দেশে ভারসহ একটী ঝুড়ি।" এই ঝুড়ি গুলি আমাদের দেশের মৎস্যধরা পোলোর আকৃতি। এই ঝুড়ির প্রশস্ত রশি দ্বারা এক অর্দ্ধ বৃত্তাকৃতি কাষ্ঠ-ফলকের দুই প্রান্তস্থ ছিদ্রের সঙ্গে বন্ধন করিয়া রাখে। ঝুড়িটী বহন করিবার কালে উহা পৃষ্ঠে উঠাইয়া ঐ কাষ্ঠফলক কপালে বা গলদেশে সংলগ্ন করিয়া উহা পিঠের উপর ঝুলাইয়া দেয়। যাঁহারা ভুটিয়া-দিগের ভার বহনের ঝুড়ি দেখিয়াছেন, তাঁহারা ইহার ব্যবহার ও আকৃতির অনুমান করিতে পারিবেন। এই ঝুড়ির মধ্যে আপন ব্যবহারোপযোগী নানা দ্রব্য, এমন কি, ভাতের হাঁড়ি পর্য্যন্ত রাখিয়া থাকে। বালক বৃদ্ধ সকলেরই স্কন্ধে তরবারি এবং প্রায় সকলের হাতেই বল্লম এবং পৃষ্ঠে ঐরূপ ঝুড়ি। ইহা কাচিনগণের জাতীয় পোষাক। প্রায় সকলের পায়েই নীল রঙ্গের কাপড়ের পটী বাঁধা। স্ত্রীলোক-দেরও মাথায় নীল কাপড়ের পাগড়ি, গাত্রে নীল রংয়ের মোটা কাপড়ের কোট এবং পরিধানে প্রায় তিন বা চারি হাত লম্বা এবং দেড় হাত প্রস্থ সতরঞ্চের মত মোটা নীল কাপড়ের এক খণ্ড। এই পরিধানের কাপড়ের উপর লাল, পীত ও সবুজ রংয়ের সুতা দ্বারা নানাপ্রকার সূচীর কার্য্য করা থাকে, তাহাতে কাপ-ড়খানি বড় সুন্দর দেখায়। এই বস্ত্র-খানি হাঁটুর নিম্নে বড় নামে না। ইহা-দের কোট পুরুষগণের কোট অপেক্ষা স্বতন্ত্র ধরণের। এই কোটের সম্মুখে, পৃষ্ঠে ও হাতের অবস্থানুসারে রূপার ঠোষ সকল এবং নানবিধ প্রকারের কড়ি সকল সংবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। ইহা ভিন্ন, যেমন পল্টনের মধ্যে নায়ক, হাবিলদার প্রভৃতির কোটের হাতার উপর লাল বনাতের বেল্লা সকল থাকে, এই কাচিন রমণীগণও আপন আপন ২ কোটে সেই প্রকার লাল বনাতের খণ্ড সকল সেই ভাবে গাথিয়া রাখে। ইহাদেরও কাণের নতির মধ্যে অতি বৃহৎ ছিদ্র থাকে। ঐ ছিদ্রের মধ্যে প্রায় ৬ ইং লম্বা এবং ¾ ইং পরিধি-বিশিষ্ট রূপার নল সকল ব্যবহার করে। আবার ঐ রূপার নলের অগ্রভাগে আয়ত ক্ষেত্রাকৃতি রূপার পাতাসকল ও লাল বনাতের সুতার ঝলম সকল ঝুলাইয়া থাকে। স্ত্রীলোকদিগের মাথার পাগড়ি পুরুষ অপেক্ষা বড় এবং প্রায় এক ফুট উচ্চ। ইহারাও জানুর নিম্নে ও উপরে পূর্ব্ব প্রকার কাল রংয়ের বলয় পরিধান করে, এবং পায়ে গোছার অর্থাৎ জানুর নিম্নে ও সন্ধির উপরে নানা রংয়ের পটি বাঁধিয়া থাকে। স্ত্রীপুরুষ উভয়েই অত্যন্ত পান

খায় এবং সেই জন্য সর্ব্বদা ইহাদের মুখ লাল থাকে। স্ত্রীলোক সকল কোমরে আর এক প্রকার বেতের ও বাঁশের দ্বারা নির্ম্মিত বহুসংখ্যক বৃত্ত সকল পরিধান করে। পথ চলিবার সময় ঐ সকল বৃত্ত বাম হস্ত দ্বারা ধরিয়া না চলিলে অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। কারণ ঐ সকল এত বড় যে নিম্নগামী হইয়া এক পদও অগ্রসর হইতে দেয় না। ইহাদের পৃষ্ঠেও পুরুষের মত ঝুড়ি সকল পূর্ব্ববৎ ঝুলান থাকে।

গৃহ নির্ম্মাণ প্রণালী।

ইহারা পর্ব্বত বা পাহাড়ের শীর্ষদেশ ভিন্ন সমতলে কখন বাস করে না। যত কাচিন-বসতি দেখিয়াছি, তাহাদের সে সকল বসতিতেই চারি পাঁচ খানি, বা ছয় খানি ঘরের বেশী দেখি নাই। এক এক খানি ঘর এক এক গৃহস্থের জন্য। এই ঘর সকল প্রায় ৩০।৪০ হস্ত লম্বা এবং ১৫।২০ হস্ত প্রশস্থ। উচ্চে ঘরের মটকা ৭।৮ হস্ত এবং চাল সকল এত নিম্ন যে বালক বালিকাগণ অনায়াসে লাফ দিয়া উপরে যাইতে পারে। সমস্তই দোচালা ঘর, খড়ের ছাউনি, আদত বাঁশের দ্বারাই বেড়া দেওয়া। মাটী হইতে ঘরের মেজে দেড় বা দুই হাত উচ্চ। উহাও আদত বাঁশের দ্বারা প্রস্তুত। এই ঘরের দরজা ঘরের লম্বা প্রান্তের একদিকে। পার্শ্ব ও অপর প্রান্ত আবদ্ধ। মূল কথা, এত বড় ঘর খানির লম্বা প্রান্তে মাত্র একটী দরজা। ইহার মধ্যে সপরিবারে সমস্ত লোক, মায় শূকর মুরগী গরু পর্য্যন্ত বাস করিয়া থাকে। ঘরের ভিতরে ও বাহিরে নানা আবর্জ্জনা পূর্ণ।

কৃষি প্রণালী।

কাচিনগণ পাহাড়ের গাত্রস্থ ছোট বড় বৃক্ষ সকল কাটিয়া কৃষি কার্য্যের ব্যবস্থা করে। তিন বৎসরের অধিক এক স্থানে শস্য বপন করে না। তিন বৎসর অন্তে আবার নূতন স্থানে জঙ্গল কাটিয়া তবে ক্ষেত্র সকল প্রস্তুত করে। ইহাদিগকে লাঙ্গল ব্যবহার করিতে দেখা যায় না। কোদালি দ্বারা চাষের কার্য্য করে। এবং বর্ষাকাল হইলেই ধান, ভুট্টা, আফিং প্রভৃতির বীজ বপন করিতে থাকে।

ভাষা ও ধর্ম্ম।

কাচিনদিগের লিখিত কোন ভাষা নাই, কাচিন ভাষার নানা শাখা আছে, ভিন্ন ২ পাহাড়ের কাচিনগণের ভাষা সম্পূর্ণ এক নহে।

ইহাদের বিশেষ কোন ধর্ম্ম মত নাই। ইহারা সয়তান বা অপদেবতার পূজা করিয়া থাকে। কেহ পীড়িত হইলে বা গ্রামে কোন অমঙ্গল হইলে, অথবা কোন বিশেষ ব্যাধির আক্রমণ হইলে, বাটীর বাহিরে বাঁশের মাচা প্রস্তুত করিয়া তাহার উপর একটী মুরগী কাটিয়া, গরু বা শূকরের উদরস্থ যন্ত্র সকল তদুপরি রাখিয়া তবে ভূতকে উপাসনা করে এবং ভূত বা অপদেবতা ঐ সকল পূজা গ্রহণ করিয়া গ্রামের বা কোন ব্যক্তি বিশেষের আপদ দূর করিয়া থাকে।

বিবাহ প্রণালী।

বাল্য বিবাহ বিশেষ নাই, বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে এবং বহু বিবাহ বড় কম। ব্যভিচার খুব কম। বর কন্যা উভয় পক্ষের কথাবার্ত্তা স্থির হইলে, বর পক্ষ হইতে কন্যার বাড়ী, একটী শূকর, মহিষ প্রভৃতি উপঢৌকন পাঠাইয়া কন্যাকে বাটীতে আনয়ন করে। মদ্যপান ও আহারাদি দ্বারা বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়।

বর কন্যাকে এবং কন্যা বরকে মদ্যপান করিতে দেয় এবং উভয়ের মুখে ভাত দেয়। খাদ্য দ্রব্য—পৃথিবীতে যত জন্তু আছে, তাহার প্রায়ই ইহাদের ভক্ষ্য। অর্থাৎ শূকর, গরু, ভেড়া, সাপ, চেঙ্গ, ইঁদুর, বিড়াল, খাটাস প্রভৃতি সকল জন্তুর মাংসই ইহারা খায়।

কাচিনগণ প্রায়ই খর্ব্বাকৃতি, কিন্তু ইহারা অত্যন্ত সাহসী ও সমরপ্রিয়। ইহাদের দ্বারা ভামোর মিলিটারী পুলিশের দুই তিনটী কোম্পানি গঠন করা হইয়াছে। ইহারা সেপাহীর ইউনিফরম পোষাক পরিধান করিলে নেপালি গুর্খা সিপাহীগণের মত দেখা যায়।

ভামো জেলায় বর্ম্মা ও সানেরা, এই কাচিনদিগের ভয়ে সর্ব্বদা জড়সড় থাকিত। সময় ২ কাচিনগণ দলবদ্ধ হইয়া সহর লুণ্ঠন করিয়া চলিয়া যাইত এবং বেশী আক্রোশ থাকিলে লোক সকলকে বাঁধিয়া লইয়া যাইত। কিন্তু এখন লোকের ভয় অনেক শান্ত হইয়াছে।

মংকোতি জিজ্ঞাসা করিল, তোমার বাড়ী কোথায়? বৃদ্ধ বলিতে আরম্ভ করিল "আমার বাড়ী মংখা * নামক পাহাড়ে। আমরা ইংরাজের অধীনস্থ প্রজা নহি। আমরা চীন সম্রাটের অধীন "লোংটাং নামক সান সুভার এলাকাস্থ প্রজা। আমাদের গ্রামে অনেকগুলি লোক ছিল। আমার ছেলের নাম "মাখাম"। তাহার স্ত্রী, চারি পুত্র এবং তিন কন্যা ছিল। সানসুভার লোকে আমাদিগের উপর বড় অত্যাচার করিত। অনেক সময় বেগার খাটাইয়া একটী পয়সা পর্য্যন্ত দিত না। গত বৎসর কর দিতে বিলম্ব হওয়ায় সানসুভার সেপাহীগণ আমার ছেলে মাখামকে এবং গ্রামের আরো দুই চারিজনকে ধরিয়া লইয়া যাওয়ার সময় গ্রামের অপরাপর সমস্ত লোক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সশস্ত্রে সুভার সেপাহীদিগকে আক্রমণ করে, এবং এই উপলক্ষে উভয় পক্ষে ভয়ানক দাঙ্গা হয়। সানদিগের পক্ষের দুই জন সেপাহী হত এবং চারি পাঁচ জন আহত হয় এবং আমাদিগের পক্ষের একজন হত এবং তিন জন আহত হয়। সুভার অপর লোক সকল পলায়ন করে। এই ঘটনা সুভার কর্ণগোচর হইলে সুভা আমাদিগের গ্রাম আক্রমণ করিবার জন্য বহু সংখ্যক লোক সংগ্রহ করিল। এই কথা পরস্পর শুনিতে পাইয়া আমরাও অপরাপর পাহাড়ের কাচিন সকলকে সংবাদ দিয়া আনিয়া বহু সংখ্যক লোক একত্র করিয়া আত্ম রক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিন্তু সুভার লোক আমাদের গ্রাম আক্রমণ করিতে আসিল না দেখিয়া, আমাদিগের মধ্যে যে সকল লোক বড় দুরন্ত ও লড়াইপ্রিয়, তাহারা লড়াইয়ের সুযোগ না দেখিয়া পরামর্শ করিল যে, সুভার বাটী আক্রমণ করা উচিত। আমরা নিষেধ করা সত্ত্বেও সমস্ত লোক ক্ষেপিয়া উঠিল এবং বন্দুক, তরবারি, এবং বল্লম তীর লইয়া পাহাড়ের নিম্নাভিমুখে সুভার গ্রাম অভিমুখে চলিল। সুভার ইয়ামিন বা কাছারি বাড়ীতে বহু সংখ্যক লোক মজুদ ছিল। ইহাদের মধ্যে কয়েক জন চীনে সেপাহীও দেখা গেল। আমাদের পক্ষের লোক সংখ্যা প্রায় চারি শত ছিল এবং সুভার লোক সংখ্যা ছয় কি সাত শত হইবে। ইহা সত্ত্বেও কাচিনগণ সুভার বাড়ী ...

* এই পাহাড় অল্প কয়েক বৎসর হইল ইংরেজের অধীনে আসিয়াছে।

গ্রাম আক্রমণ করিল। উভয় পক্ষে ভয়ানক যুদ্ধ হইল। সানগণ হটিয়া পালাইতে আরম্ভ করিল। আমাদিগের লোক সকল গ্রামের ও সুভার বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া লুটপাট করিয়া লইয়া আসিল। সানদিগের পক্ষে ৮০ জন হত এবং প্রায় দেড় শত লোক আহত হয় এবং আমাদিগের পক্ষে ২০ কুড়ি জন হত এবং ৪০।৫০ জন আহত হয়। আহত লোকদিগের মধ্যে যাহারা গুরুতর আঘাত পাইয়াছিল, তাহারা আর গ্রামে ফিরিতে পারিল না। সানদিগের হস্তে বন্দী হইল। যাহারা অল্প আঘাত পাইয়াছিল, তাহারা অতি কষ্টে পাহাড়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। সুভা এই সকল ঘটনা বিবৃত করিয়া চীনের টেঙ্গিয়ে সহরের সর্ব্বপ্রধান চীন-রাজকর্ম্মচারীকে সংবাদ দিল, এবং কাচিনদিগকে শাস্তি দিবার জন্য সরকারী সাহায্য প্রার্থনা করিল। টেঙ্গিয়ের চীনা জেনেরাল লীনের আদেশে বহু সংখ্যক বন্দুকধারী চীনা সেপাহী উপস্থিত হয়। চীনা সৈন্যগণ দাঙ্গাকারীদিগের মধ্যে প্রধান প্রধান লোকদিগকে ধরিয়া বন্দী করিয়া টেঙ্গিয়ে পাঠায়। গ্রাম লুট করে এবং ঘর সকল জ্বালাইয়া দেয়। অনেক স্ত্রী, বালক বালিকাদিগকে কাটিয়া ফেলে। পাহাড়ের জঙ্গলে ও গহ্বরে লুকাইয়া কেহ ২ আপন প্রাণ রক্ষা করিতে পারিয়াছিল; আমার পুত্র মাথাম এবং তাহার বড় ছেলে "লাবাম থাম"কে কয়েদীরূপে পাঠায়। আর সকল অর্থাৎ আমার পুত্রবধূ ও পৌত্র ও পৌত্রীগণ কাটা গিয়াছে। আমি এই বালিকাটীকে লইয়া জঙ্গলে ২ পালাইয়া প্রাণে বাঁচিয়া আছি। এত দিন গ্রামে ২ লোকের বাড়ী ২ খাইয়া বেড়াইতেছিলাম, আশা ছিল, আমার "মাথাম ও লাবাম থাম" টেঙ্গিয়ে হইতে ফিরিয়া আসিবে এবং যে কয়েক দিন বাঁচি, তাহাদের সঙ্গে বাস করিয়া যাইতে পারিব। কিন্তু হায়, দুরাদৃষ্ট আমার, সে আশায় হতাশ হইলাম। গত মাসে পরম্পর সংবাদ পাইলাম, যত লোক ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহাদের সকলেরই মাথা কাটা গিয়াছে এবং তাহাদের মাথা নাকি টেঙ্গিয়ের নগর-প্রাচীরের দক্ষিণ দ্বারের শীর্ষ দেশে ঝুলিতেছে এবং কাকে তাহাদের মুণ্ডের চক্ষু মাংস খুঁড়িয়া খাইতেছে। একথা মনে করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। হায়! আমার মাথামরে! তোদের কেন এত দুর্ম্মতি হইলরে? তোরা সবংশে নির্ব্বংশ হইলি, কেবল আপন বুদ্ধির দোষে।" বৃদ্ধ এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। চক্ষুর জল মুছিয়া বৃদ্ধ পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল।

"আমার এই শেষ কাল, চলিবার শক্তি নাই, তাহাতে শোকে শরীর জর্জ্জরিত। এ অবস্থায় আমার নাতিনী বালিকাটীকে লইয়া বড়ই বিপদে পড়িয়াছি। ইহাকে যে আহার ও বস্ত্র দিয়া প্রতিপালন করি, এমন সাধ্য আমার নাই। কত লোকের বাড়ীতে ইহাকে লইয়া গিয়া রাখার জন্য অনুনয় বিনয় করিলাম, কেহই ইহাকে রাখিতে স্বীকৃত হইল না। আমি শুনিয়াছি, এখানে রবার্ট সাহেবের গির্জ্জায় অনাথা কাচিন বালক বালিকাগণ আশ্রয় পায়; তাই তথায় ইহাকে রাখিবার জন্য যাইতেছি। ইহার বয়স এখন মাত্র ৭ বৎসর। ইহাকে তথায় রাখিয়া আসিতে পারিলে, আমি কোন মতে ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করিব,

এবং যথায় তথায় শয়ন করিয়া রাত্রিটা কাটাইব।"

পাঠকগণ হয়তঃ রবার্ট সাহেবের বিবরণ জানিবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন। রবার্ট সাহেব আমেরিকান ব্যাপ্টিষ্ট মিশনের পাদ্রী। ত্রিশ বৎসরের উপর হইল, ইনি এই স্থানে আসিয়া কাচিনগণের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। ইংরেজগণ কর্ত্তৃক আপার বর্ম্মা দখলের পূর্ব্বে ভামো অতি কদর্য্য স্থান ছিল। এখানে একজন বর্ম্মা রাজকর্ম্মচারী ছিল এবং কতকগুলি বর্ম্মা সেপাই থাকিত। নদীর ধার ব্যতীত লোকের বশতি ছিল না। সমস্ত স্থান জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। নদী হইতে প্রায় এক মাইল দূরে জঙ্গলের মধ্যে রবার্ট সাহেবের গির্জ্জা। এখন সমস্ত স্থান পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও জঙ্গলশূন্য হইয়াছে। সেই পূর্ব্ব কালের অরাজকতার মধ্যে রবার্ট সাহেব কাচিনগণের অন্ধকারময় মনের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম্মের আলোক প্রবেশ করাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। তখন ভামো বড়ই ম্যালেরিয়া প্রধান ছিল। ষ্টিমারের গতিবিধিও বিশেষ ছিল না। সেই সময়ে অন্ধকারময় নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে রবার্ট সাহেব যেন একটী উজ্জ্বল প্রদীপ বিশেষ ছিলেন। ইনি বহুসংখ্যক কাচিনকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছেন এবং বহু অনাথা বালিকা ও বালকদিগকে শিক্ষা দিয়া উন্নত করিয়াছেন। ইহাঁর মিশনের নাম "কাচিন-মিশন"। ইহাঁর যে স্কুল আছে, তথায় ইংরেজী ও কাচিন ভাষা, কাচিন বালকদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহার গির্জ্জায় যত কাচিন বালক আছে, তাহাদের পোষাক একটু ভিন্ন ধরণের হইয়াছে এবং বালিকাগণ বর্ম্মিণীদিগের পোষাক পরে। কেহই কাচিন পোষাক পরে না। কাচিনগণের লিখিত ভাষা ছিল না। রবার্ট সাহেব কাচিন ভাষার ব্যাকরণ প্রস্তুত করিয়াছেন। কাচিন ভাষা বর্ম্মা ভাষার অক্ষরে লিখিত হয়। কাচিন শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী পর্য্যন্ত এখন এই স্কুলে আছে। বর্ত্তমান সময়ে রবার্ট সাহেবের সঙ্গে রেভারেণ্ড হ্যান্‌সন এবং দুইজন মিশ্‌ আছেন।

ভামোতে আমেরিকার মিশনের আর এক গির্জ্জা আছে, তাহাকে "সান-মিশন" বলে। ডাক্তার গ্রীগ (Dr. Grigg) এই মিশনের পাণ্ডা। ইনি এম-ডি উপাধিধারী এবং এক জন ভাল ও দয়ালু চিকিৎসক। ইনি গরিবের মা বাপ স্বরূপ। ইহাঁর স্কুল সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত ও শ্রেষ্ঠ।

পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, মংকোতির স্ত্রী মাশোয়ে অনতিদূরে বসিয়া চুরট প্রস্তুত করিতেছিল। মাশোয়ে কাচিন বৃদ্ধের কথা শুনিতেছিল, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারে নাই। মাশোয়ে জিজ্ঞাসা করিলে, মংকোতি সমস্ত কথাগুলি মাশোয়েকে জানাইল। ঘটনার আমূল বিবরণ শুনিয়া বালিকাটীকে হস্তগত করিবার জন্য একান্ত ইচ্ছা প্রকাশ করিল। কেন না তাহাদের কন্যা নাই। মংকোতি প্রথমে অসম্মত হইয়াছিল, কিন্তু মাশোয়ের পুনঃ২ অনুরোধে শেষে সম্মত হইল। মংকোতি বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিল যে, সে ঐ বালিকাটীকে ক্রয় করিতে ইচ্ছা করে। তাহাদের কন্যা সন্তান নাই, সুতরাং তাহারা উহাকে আপন সন্তানের মত পালন করিবে। মংকোতি বলিল যে, রবার্ট সাহেবের গির্জ্জায় উহাকে রাখিলে সে কিছুই পাইবে না এবং তথায় বহুলোকের মধ্যে তাহাকে অর্থাৎ বালিকাকে কষ্ট দিবে। বৃদ্ধ

প্রথমতঃ বিক্রয় করিতে অস্বীকার করিল, কিন্তু অবশেষে সম্মত হইল। বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিল, সে কত দিতে চাহে? মংকোতি বলিল যে, সে গরিব লোক, তাহার টাকা নাই, সে মাত্র দশটী টাকা দিতে পারে। বৃদ্ধ পঞ্চাশ টাকা চাহিল। পরে উভয়ের মধ্যে দরদাম করিয়া কুড়ি টাকা স্থির হইল। মংকোতি তাড়াতাড়ি বিশটী টাকা আনিয়া বৃদ্ধের হাতে দিল। বালিকার নাম "মা লুঃ"। মা লুঃ সমস্ত কথা শুনিয়া ফ্যাল্‌ফ্যাল করিয়া বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিল। মংকোতি বুড়ার হস্তে টাকা দিবা মাত্র মা লুঃ চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল—'দাদা! হ্যাঁ তুই আমাকে বেচ্‌লি?' এই বলিয়া সে দৌড়িয়া বুড়ার হাত হইতে টাকা লইয়া মংকোতির সম্মুখে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বুড়ার গলা জড়াইয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া রোদন করিতে লাগিল। ক্রমশঃ

শ্রীরামলাল সরকার।

উপনিষদের উপদেশ। (১৪)।

মৈত্রেয়ীর উপাখ্যান।

তৎপর দিবস যাজ্ঞবল্ক পুনরায় মৈত্রেয়ীকে নিকটে বসাইয়া বলিতে লাগিলেনঃ—

"মৈত্রেয়ি! ব্রহ্মের একত্বের কথা সেদিন বলিয়া দিয়াছি, সে কথা বুঝিতে পারিয়াছ ত? সৃষ্ট যত কিছু পদার্থ দেখিতেছ, ব্রহ্ম-ব্যতিরেকে উহাদের কাহারই পৃথক্ স্বাধীন সত্তা নাই। জাগতিক সমস্ত খণ্ড খণ্ড ক্রিয়া সেই এক অখণ্ড, পূর্ণ মহাশক্তিরই অন্তর্ভুক্ত; জাগতিক সমস্ত খণ্ড খণ্ড জ্ঞান সেই এক অখণ্ড মহাজ্ঞানেরই অন্তর্ভুক্ত; জাগতিক সমস্ত সুখ,দুঃখ, স্নেহ, প্রেম, সেই এক অখণ্ড, পূর্ণ মহাপ্রেমেরই অন্তর্ভুক্ত। ইহারা অপূর্ণভাবে সেই এক পূর্ণস্বরূপেরই পরিচয় প্রদানের জন্য অবস্থিত। অদ্যও এই কথাই অন্যরূপে বুঝাইব। তুমি মনোযোগ দাও। মৈত্রেয়ি! যেমন দুন্দুভি নামক বাদ্যযন্ত্রে আঘাত করিলে, সেই এক দুন্দুভির শব্দ হইতে পৃথক্‌ভাবে অন্যান্য শব্দ গৃহীত হয় না; অন্যান্য সমস্ত বিশেষ বিশেষ শব্দ, সেই এক তাড্যমান দুন্দুভিরই সাধারণ শব্দে মিশিয়া যাইয়া, এক বলিয়া অনুভূত হইতে থাকে; তদ্রূপ এক ব্রহ্ম-সত্তা ব্যতিরেকে অন্যান্য বিশেষ বিশেষ সত্তার পৃথক্‌ভাব নাই। যেমন শঙ্খধ্বনি করিলে, বাহ্যিক অন্যান্য শব্দ সেই এক শঙ্খধ্বনিতেই মিশিয়া যায় বলিয়া অনুভূত হইতে থাকে; শঙ্খধ্বনি হইতে ভিন্ন ভাবে অন্যান্য শব্দের শ্রুতি-গোচর হয় না; অথবা যেমন বীণাধ্বনি হইতে থাকিলে, অন্যান্য বাহ্যিক বিশেষ শব্দ সেই এক বীণাধ্বনি হইতে পৃথক্‌রূপে অনুভূত হয় না; এক বীণাধ্বনিতেই সেই সকল শব্দ গৃহীত হইয়া যায়; এইরূপ সৃষ্টির পূর্ব্বে, সৃষ্টির পরে এবং সৃষ্টির লয় কালে,—সর্ব্বাবস্থায়, ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রতীয়মান বিশেষ বিশেষ পদার্থ মাত্রই, সেই এক সাধারণ ব্রহ্ম পদার্থেই অন্তর্ভুক্ত থাকে। যেমন অগ্নি হইতে সমুত্থিত ধূম, বিস্ফুলিঙ্গ, অঙ্গার, তেজ প্রভৃতি বিভিন্ন ভাবে দেখা দিবার পূর্ব্বে, ঐ সমস্ত ধূমাদি পদার্থ অগ্নিতে অবিভাগাবস্থায় থাকে বলিয়া, অগ্নিকে কেবল একমাত্র অগ্নিরূপেই দেখিতে পাওয়া যায়;—

এইরূপ, এই নামরূপাদি বিভাগ বিশিষ্ট জগৎও উৎপত্তির পূর্ব্বে সেই একমাত্র প্রজ্ঞানঘন পরমেশ্বরেই অন্তর্ভুক্ত থাকে। যেমন অগ্নিতে আর্দ্র কাষ্ঠ প্রদান করিলে, সেই এক অগ্নি হইতে ধূম, বিস্ফুলিঙ্গাদি হইতে থাকে, তদ্রূপ বিনা যত্নে, বিনা আয়াসে, মনুষ্যের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় অতি সহজে, সেই একমাত্র ব্রহ্মপদার্থ হইতে বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ উত্থিত হইয়াছে। পরমাত্মারই আত্মভূত, অবিভক্তরূপে স্থিত (তখনও আকাশাদি বিভাগ হয় নাই, কেবল শক্তিরূপে অবস্থিত আছে), অনির্ব্বচনীয়, অনভিব্যক্ত নামরূপই (Percepts and Concepts),—সমুদ্র হইতে সমুত্থিত ফেন-তরঙ্গ বুদ্‌বুদাদির ন্যায়,—ব্যাকৃত হইয়া এই বিশ্বরূপে দেখা দিয়াছে। ফেন-তরঙ্গ বুদ্‌বুদাদি যেমন বাস্তবিক পক্ষে সমুদ্র জল হইতে পৃথক্ নহে,—উহারা সমুদ্র-জলের বিকৃত অবস্থাভেদমাত্র—সেইরূপ যাবতীয় নামরূপ কর্ম্মাদিও, সেই মহাশক্তি স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে বাস্তবিক পক্ষে পৃথক্ নহে। নদী, বাপী, কূপ, তড়াগাদির বিশেষ বিশেষ জলের যেমন সমুদ্র জলই একমাত্র আয়তন,—এক সাধারণ সমুদ্র জলেরই যেমন ইহারা বিশেষ বিশেষ বিভাগাবস্থামাত্র,—সমুদ্র জলেই যেমন এই বিশেষ বিশেষ জল সকল অবিভাগ প্রাপ্ত হয়; যেমন মৃদু, কর্কশ, কঠিন, পিচ্ছিলাদি বিশেষ বিশেষ স্পর্শগুলির একমাত্র ত্বক্‌ই আয়তন ও আধার, যেমন ঐ সকল বিশেষ বিশেষ স্পর্শ-ক্রিয়া, এক সাধারণ স্পর্শ-শক্তিরই অন্তর্ভুক্ত;—সেই এক সাধারণ স্পর্শ-শক্তিরই উহারা বিশেষ বিশেষ সংস্থান বা অবস্থাভেদমাত্র; যেমন নানাবিধ বিশেষ বিশেষ গন্ধ (পৃথিবী গন্ধেরই বিশেষ অবস্থামাত্র; "পরমাণুর্নাম পৃথিব্যা গন্ধঘনায়াঃ পরমঃ সূক্ষ্মোঽবয়বঃ গন্ধাত্মকঃ—শঙ্করভাষ্য, বৃহঃ উপঃ ৭।৩।৩০) একমাত্র সাধারণ নাসিকারই (গন্ধশক্তিরই) অন্তর্ভুক্ত;—যেমন নানাবিধ বিশেষ বিশেষ রস সকলের (জল রস-শক্তিরই অবস্থাভেদ মাত্র) জিহ্বেন্দ্রিয়ই একমাত্র আশ্রয়-স্থান;—যেমন নানাবিধ রূপের (তেজ রূপশক্তিরই অবস্থাভেদ মাত্র) চক্ষুই এক সাধারণ আশ্রয়-ভূমি;—আবার যেমন বিশেষ বিশেষ শব্দের গ্রাহক একমাত্র শ্রবণেন্দ্রিয়;—আবার যেমন শ্রবণেন্দ্রিয় প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-শক্তি নিচয়, উহাদের সাধারণ আশ্রয় স্বরূপ এক মনঃ শক্তিরই অন্তর্ভুক্ত; আবার মন যেমন উহার সাধারণ আশ্রয়-স্বরূপ এক বুদ্ধি বা বিজ্ঞানেরই অন্তর্ভুক্ত;—তদ্রূপ এই বিজ্ঞান শক্তিও আবার সেই একমাত্র প্রজ্ঞানঘন ব্রহ্মচৈতন্যেরই অন্তর্ভুক্ত। এইরূপ বচন, গ্রহণাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াগুলি, একমাত্র প্রাণ-শক্তিরই অন্তর্ভুক্ত; এবং প্রাণশক্তিও আবার উহার আশ্রয় স্বরূপ একমাত্র প্রজ্ঞান-ঘন-ব্রহ্মচৈতন্যেরই অন্তর্ভুক্ত।"

আমরা এস্থলে বিষয় ও ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্যের অভিপ্রায় কিরূপ, তাহা বুঝাইতে ইচ্ছা করি; নতুবা যাজ্ঞবল্ক-কথিত উপদেশের এই অংশটীর মর্ম্ম ভাল হৃদয়ঙ্গম হইবার সম্ভাবনা কম। শব্দ স্পর্শাদি বিষয় সমূহ ও তাহাদের গ্রাহক চক্ষু শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে শঙ্কর এইরূপ আভাষ দিয়াছেন:— যে জাতীয় উপাদান হইতে শব্দ স্পর্শাদি বিষয় উৎপন্ন হইয়াছে, চক্ষু শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ও সেই উপাদান হইতে প্রাদুর্ভূত। অতএব বিষয় ও ইন্দ্রিয় একজাতীয়, ভিন্ন

জাতীয় পদার্থ নহে। ইন্দ্রিয়গুলি বিষয়েরই গ্রাহক বা উপলব্ধির হেতু ; এবং বিষয়েরই অনুরূপ সংস্থান ভেদমাত্র। প্রদীপ যেমন রূপ-বিশেষেরই বিশেষ অবস্থা ভেদ মাত্র, —তদ্রূপ আত্ম-প্রকাশের জন্য, বিষয় সকলই, ইন্দ্রিয়রূপে বিশেষ অবস্থান্তর বা আকার ধারণ করিয়াছে। সূক্ষ্ম-পঞ্চভূত শক্তিরূপে ব্রহ্মে একাকারে বিলীন ছিল। উহাদের ক্রিয়া-শক্তিও উহাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই পঞ্চশক্তিই শব্দ স্পর্শাদি বিষয়রূপে এবং চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়রূপে দেখা দিয়াছে। জীবে দুইটী প্রধান শক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। একটী ক্রিয়া-শক্তি, একটী বিজ্ঞান-শক্তি। জীবের যাবতীয় বচন, গ্রহণ, ত্যাগ প্রভৃতি চলনাত্মক-ক্রিয়া গুলির সাধারণ আশ্রয় প্রাণ-শক্তি। "নহি প্রাণাদন্যত্র চলনাত্মকত্বোপপত্তিঃ, চলন ব্যাপারপূর্ব্বকাণ্যেব হি সর্ব্বদা স্বব্যাপারেষু লক্ষ্যন্তে" (শঙ্কর ভাষ্য, ৩।৫।২১)। আবার লজ্জা, ভয়, শোক, সুখদুঃখাদি নানাবিধ বিজ্ঞান ও শব্দ-স্পর্শাদি-বিজ্ঞান সকলের সাধারণ আশ্রয় মন বা বুদ্ধি। "বুদ্ধি-তন্ত্রাণি ইতরাণি করণানি, তেন বুদ্ধিঃ কর্ম্মবশাৎ শ্রোত্রাদীনি কর্ণশস্কুলাদিস্থানেভ্যঃ প্রসারয়তি ; প্রসার্য্য চাধিতিষ্ঠতি" (৪।১।১৯)। প্রাণ ও বুদ্ধি এবং প্রাণ ও বুদ্ধির বিষয় সকল, ইহারা সকলেই একজাতীয় উপাদানে নির্ম্মিত। "মনসি সতি বিষয়িবিষয়ভাব দর্শনাৎ অসতি চাদর্শনাৎ, মনঃস্পন্দিতমাত্রং বিষয়জাতং, তস্য তদ্বিষয়মাত্রে প্রবিষ্টস্য তদতি রেকানাং অভাবঃ (আঃগিঃ টীকা, ৪।৪।১১)। আবার "মূর্ত্তামূর্ত্তাখ্যং (পঞ্চভূত সূক্ষ্মং) তজ্জনিত বাসনাশ্চ ব্রহ্মণোরূপং" (শঙ্কর ভাষ্য, ৪।৩।১)। অতএব একই ব্রহ্মশক্তি হইতে গ্রাহ্য বিষয় ও গ্রাহক ইন্দ্রিয় উপজাত হইয়াছে। পঞ্চভূত ও তদন্তর্গত শক্তি সমূহ একই ব্রহ্মশক্তির ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাভেদ মাত্র। উভয়ই একজাতীয় বলিয়া, শব্দস্পর্শাদি বিষয়ের বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে, মন ও প্রাণশক্তিও বিলীন হইয়া এক ব্রহ্মচৈতন্যে বিলীন হয় ; কেন না ব্রহ্ম পূর্ণজ্ঞান ও পূর্ণশক্তি স্বরূপ। "সর্ব্ব কর্ম্মবিশেষানাং মননদর্শনাত্মকানাং চলনাত্মকানাঞ্চ ক্রিয়া সামান্যমাত্রে অন্তর্ভাবঃ" (৩।৬।৩)। ইহাই শঙ্করের প্রকৃত সিদ্ধান্ত। আমরা এ সম্বন্ধে বিস্তৃত ব্যাখ্যা বিগত দ্বাদশ সংখ্যায়ও আরও পূর্ব্বসংখ্যায় বিবৃত করিয়াছি ; পাঠক দয়া করিয়া এই সঙ্গে সেই সংখ্যা দুইটীও পড়িয়া দেখিবেন। পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থই রূপান্তর মাত্র, ইহা শঙ্কর বিলক্ষণ বুঝিতেন। সেই জন্যই শঙ্কর এই রূপান্তরিত অবস্থাটীকেই মিথ্যা বা মায়া বলিতেন। বাস্তবিক ইহা অভাবাত্মক পদার্থ নহে। এক প্রজ্ঞান ঘন ব্রহ্ম চৈতন্যেরই ইহা অবস্থাভেদ মাত্র।

যাজ্ঞবল্ক বলিতে লাগিলেনঃ—"কঠিন লবন-খণ্ড জলেরই রূপান্তর, জলেরই বিকারমাত্র। এই লবণ-খণ্ডটীকে জলের মধ্যে ছাড়িয়া দিলে, তাহা সেই জলে অবিভক্তভাবে বিলীন হইয়া যায়। জলই কঠিন হইয়া জমিয়া লবণ-খণ্ড হইয়াছিল, সেই কাঠিন্য অন্য স্বীয় উপাদানের (জলের) সংযোগ বশতঃ অপগত হইল। অতি নিপুণ ব্যক্তিও এখন সে লবণ খণ্ডকে জলের মধ্য হইতে পৃথক্ করিয়া পূর্ব্ববৎ তুলিতে পারিবে না। সেই জলের যেস্থান হইতেই গ্রহণ কর না কেন, এখন কেবল লবণের স্বাদমাত্র অনুভূত হইতে থাকিবে, কিন্তু উহার সেই পার্থক্যের অবস্থা—কঠিনভাব—বিলুপ্ত

হইয়া গিয়াছে। এই যেমন দৃষ্টান্ত দেখিলে তদ্রূপ তুমিও মৈত্রেয়ি! সেই ব্রহ্মচৈতন্য হইতেই তুমিও অবিদ্যাবলে উত্থিত হইয়াছ, কার্য্য কারণরূপ উপাধির সহিত সংযোগ বশতঃ অদ্য তুমি, ক্ষুধিত, পিপাসিত, জরা মরণ-বিশিষ্ট মর্ত্ত্য-মানবীরূপে, সেই লবণ-খণ্ডের ন্যায় স্থূলভাব (Solid state) ধারণ করিয়া, সংসারের বিবিধ কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছ। লবণ-খণ্ড যেমন উহার কারণীভূত জলে বিলীন হইয়া গিয়াছে, তদ্রূপ তুমিও এই কার্য্যকারণাত্মক উপাধিবিগমে, স্বযোনি স্বরূপ, মহা সমুদ্র স্থানীয় সেই অজর, অমর, অভয়, শুদ্ধ, অপার, অনন্ত, প্রজ্ঞান-ঘন, ব্রহ্মচৈতন্যে প্রবিষ্ট হইয়া, তৎস্বরূপ প্রাপ্ত হইবে *।

সমুদ্র হইতে যেমন ফেন-তরঙ্গ বুদ্বুদাদি উত্থিত হইতে দেখা যায়, তদ্রূপ একমাত্র প্রজ্ঞানঘন ব্রহ্মচৈতন্য হইতে, এই সকল কার্য্যকারণাত্মক বিষয়াদি আকারে রূপান্তরিত নামরূপ গুলি, উত্থিত হইয়া পুনরায় এই সকলের অপগম হইলে, একেবারে তৎস্বরূপে অবস্থিত থাকিয়া যায়। উদকের অপনয়নে যেমন সূর্য্য-প্রতিবিম্ব, অলক্তকের অপনয়ন করিলে যেমন স্ফটিক আত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ অবিদ্যাধ্বংস হইলে, জীব তৎস্বরূপ প্রাপ্ত হয়; আর তাহাকে উত্থিত হইতে হয় না। তখন আর জীবের বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞা বা নামরূপ থাকে না; কেন না তখন আর তাহার কার্য্যকারণ সংঘাত দেহ নাই। অতএব মৈত্রেয়ি! বাস্তবিক দেখিতে গেলে সুখ-দুঃখ, আমি উহার ভার্য্যা, পুত্র ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন ভাবগুলি মিথ্যা বৈ আর কি হইতে পারে? যতদিন অবিদ্যা, ততদিন এই পার্থক্যভাব আছে। ব্রহ্ম-বিদ্যার বলে এই অবিদ্যার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হইয়া যায়। তখন আর এরূপ বিশেষ দৃষ্টি থাকে না। ইহারই নাম পরমার্থ দর্শন। তখন আর চক্ষু-কর্ণাদির পার্থক্য জ্ঞান নাই, সুতরাং তখন আর কে কাহা দ্বারা কাহাকে দেখিবে বা শুনিবে? তখন সমস্ত বিশেষ বিশেষ ভাবকে সেই এক পূর্ণভাবের আং-শিক বিকাশরূপে ও পরিচায়ক চিহ্নমাত্র-রূপে বোধ জন্মে; সুতরাং আত্ম-ব্যতিরেকে অন্য কাহারও পৃথক্ সত্তার বোধ থাকে না। তখন ক্রিয়ারও অস্তিত্ব থাকে না; কেন না, ক্রিয়ামাত্রেই সেই এক অখণ্ড মহাশক্তির বোধ জন্মিয়া যায়।

এই পরমাত্মা সর্ব্বভূতের অধিপতি, সর্ব্বভূতের রাজা। ইহা কারণান্তর শূন্য; ইহার বাহিরে কোন জাতি নাই, কোন বস্তু নাই। ইহাঁর জন্যই জীবাত্মাকে দ্রষ্টা, শ্রোতা, মননকারী, বোদ্ধা ও সর্ব্বানুভব-কারী বলিয়া বোধ হয়"।

এই মৈত্রেয়ীর উপাখ্যান হইতে আমরা

* পাঠক এই লবণের দৃষ্টান্তটীর তাৎপর্য্য অনুভব করিয়া দেখিবেন। জলে স্থূলভাব বিলীন হইয়া গেলেও যেমন লবণের স্বাদটী ছিল, তদ্রূপ ইহা বুঝা যাইতেছে যে, করণাদি সমস্ত স্থূল ও সূক্ষ্মভাগ রূপান্তরিত হইয়া ব্রহ্মচৈতন্যে লীন থাকিবে। শক্তির ধ্বংস নাই, কিন্তু অবস্থান্তর আছে মাত্র। এই জন্যই প্রলয়াবসানে, মনুষ্যদিগের পুনঃ প্রাদুর্ভাব সিদ্ধ হইতেছে। একান্ত অভাব হইতেছে না। "প্রজ্ঞান-ঘন" শব্দটীও বিশেষ অনুধাবনের যোগ্য। "ঘন" শব্দের প্রয়োগে জাত্যন্তরাভাব সূচিত হইতেছে। যেমন অয়োঘন, সুবর্ণঘন প্রভৃতি নিজেরাই এক একটী ভিন্ন ভিন্ন জাতি, এইরূপ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম নিজেই এক বিলক্ষণ জাতি, উহার আর জাত্যন্তর নাই। সৃষ্টিকালে নিজেই নানা জাতিতে রূপান্তরিত হন মাত্র।

নিম্ন সংগৃহীত বিষয়গুলি জানিতে পারিয়াছি :—

১। আত্মাকে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন করিতে হইবে।

২। বিশ্বের যাবতীয় বস্তুই এই ব্রহ্ম-চৈতন্য হইতে সমুত্থিত হইয়াছে এবং তাহাতেই লীন হইবে।

৩। শব্দ-স্পর্শাদি বিষয় ও চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়শক্তি এবং মনবুদ্ধি প্রভৃতিকে সেই চৈতন্যেই প্রতিলোমে বিলীন করিতে হয়।

৪। বিষয় ও ইন্দ্রিয় একজাতীয় উপাদান দ্বারা গঠিত। কেবল ভিন্নাকারে অবস্থাভেদেই ভিন্ন বলিয়া বোধ হয়।

৫। জীবে ক্রিয়াশক্তি ও বিজ্ঞানশক্তি এই দুইটী শক্তি আছে। বিষয়ের সহিত ক্রিয়াশক্তি প্রাণে, এবং বিষয়ের সহিত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়শক্তি মনে বিলীন হয়। প্রাণ ও মনঃশক্তি ব্রহ্মচৈতন্যে লীন হয়।

৬। এই সকল উপাধিযোগেই জীবের জীবত্ব। উপাধিবিগমে জীব ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয়।

পার্থক্য-বোধই মায়া বা অবিদ্যা। পূর্ণ-স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে কাহারই পৃথক্, স্বাধীন সত্তা নাই। বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ ও ভাব গুলি, সেই পূর্ণ-পুরুষের পূর্ণস্বরূপের পরিচয় দিবার জন্যই বর্ত্তমান। এই বোধ জন্মিলে পার্থক্যবোধ তিরোহিত হয়।

৮। এই বোধই মুক্তি।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা

আশা।

(১)

নিত্য ঝঞ্ঝা ঝটিকা বৃষ্টি,
আকাশ আবৃত জলদে।
ক্ষুদ্র হৃদয় অন্ধ-দৃষ্টি
মানব-ভাগ্যে জগতে।
কুহেলি-বিলীন আলোক মলিন
তরাসে পারেনা ফুটিতে।
পড়ি মুরছিয়া দীপ্তি খুঁজিয়া
পাতা ঢাকা আঁখি দুটীতে।

(২)

সুধীর শান্ত মুক্ত গগনে
শুভ্র তুষার মণ্ডিত
উন্নত গিরি-শৃঙ্গ বিজনে
সৌর কিরণ-রঞ্জিত।
তেজিয়া ভুবন হোথায় ভবন
পারি না কি আমি গড়িতে?
জগতের তীর সীমার প্রাচীর
পারি না কি আমি ছাড়িতে?

(৩)

হেথায় বিষাদ, হেথায় শ্রান্তি,
হেথায় ভ্রান্তি মানসে।
ওপার প্রান্তে স্নিগ্ধ শান্তি,
বিমল আলোক আকাশে।
তনুর ক্লান্তি আঁখির ভ্রান্তি
নির্ব্বাণ কোথা লভিবে?
আলোক আঁধারে এপার ওপারে
সেতু বাঁধি মোরে কে দিবে?

শ্রীবিজয় চন্দ্র মজুমদার।

সোহাগ।

(১)

অবশ উদাস প্রাণ,
শত দুখে ম্রিয়মাণ,
কাতরে মাগিল বর
বিধাতার পদতলে।
দেবশিশু মহামায়া,
লভিয়ে উজল কায়া,

অবতীর্ণ হলি এসে
　　তাই তাঁর কৃপাফলে ॥
　　(২)
মুছাতে নয়ন লোর,
বৃন্তভাঙ্গা মন মোর
বাঁধিতে চরণে তাঁর
　　অটুট প্রেম-শিকলে,
শুভাশীস শিরে লয়ে,
মূর্ত্তিমতি 'প্রীতি' হয়ে,
ভুবনমোহিনী মেয়ে
　　ঝাঁপায়ে পড়িলি কোলে।
　　(৩)
প্রাণের আকুল শ্বাস,
হৃদয়ের হা হুতাশ,
ঘুচাতে মরম ব্যথা
　　নিরমিলা বিধি তোরে।
আয় আয় খুকুমণি,
আনন্দ-অমৃত-খনি,
আয়রে বাছনি মোর,
　　আয় দেখি প্রাণ ভ'রে॥
　　(৪)
সুধাই রে মন-চোর,
চম্পক কলিকা মোর,
কোথায় লুকিয়ে ছিলি,
　　কোন্ স্বপনের বনে ?
কল্পনার কাব্যতীরে,
নন্দন নিকুঞ্জে ফিরে,
ঢাকি ও কনক কান্তি
　　দিব্য দীপ্তি আভরণে ?
　　(৫)
মন্দার-সুরভি-ভার'
দিতে বিশ্বে উপহার,
ফুল্ল মুখে দুলেছিলি
　　কোন্ বসন্তের বায় ?
ললিত লাবণ্য ভরে,
দেহলতা টলে পড়ে,
রূপের মালঞ্চ খানি
বুঝি ভেঙ্গে যায় যায় !
　　(৬)
ফুল দল বুকে দলি,
সেথা কি গুঞ্জরে অলি,
কুহরে কি পিকবধূ
　　কুসুমিত কুঞ্জ ছায় ?
মধুর মধুপ রবে,—
বিহরে কি সেথা সবে,
কাননে প্রমোদ ভরে,
　　উদাসী মলয় বায় ?
　　(৭)
পুষ্পিতা ব্রততী সেথা,
গায় কি প্রেমের গাথা,
মুখরিত সে কানন
　　প্রেম নির্ঝর নিস্বনে ?
মাধুরী-মদিরা পিয়ে,
বিভল বিবশ হয়ে,
ঘুমায় প্রকৃতি-সতী
　　মৃদু মধুসমীরণে ?
　　(৮)
কোমল কুসুম গায়,
জ্যোছনা কি মূর্চ্ছা যায়,
শিহরে কি সেথা ফুল
　　কৌমুদী পরশে হেসে ?
শ্যামল শৈবাল কোলে,
বিকচ নলিনী দলে,
কাঁপিয়া তরঙ্গে রঙ্গে
　　শারদ সুষমা ভাসে ?
　　(৯)
সেথা কিরে দেববালা,
গাঁথিয়া ফুলের মালা,
করে নিত্য ফুল খেলা
　　ফুল্ল নব বৃন্দাবনে ?
কুসুম-বন্যার জল,
তাই কি রে টলমল,
নীরবে নিথর দেহে
　　উছলিছে আন মনে !
　　(১০)
আবেশের ঘুম ঘোরে,
মায়াময় ফুল ডোরে,
হৃদি প্রেম ডালে বাঁধা
　　তুই কিরে কুহুরব ?
নেহারি বদন-ইন্দু,
উথলিল সুখ-সিন্ধু,

পুলকে পূরিল হিয়া,
মধুর মধুর সব !
(১১)
কল কণ্ঠে উলুধ্বনি,
করি বনবিহগিনী,
আকাশে উধাও হয়ে,
গাইছে মঙ্গল গান !
তোরে পেয়ে খুকুমণি,
বরষে বিটপশ্রেণী,
কুসুম অঞ্জলি ভরি,
সমীরণে ধরি তান !
(১২)
সোহাগ করিতে তোরে,
তটিনী অস্ফুট স্বরে,
ঊর্ম্মি বাহু প্রসারিয়া
করে মৃদু সঞ্চরণ !
তোরে খুঁজি চারি পাশ,
সমীরণ মৃদুশ্বাস
ফেলি করে নিশি দিন
মঞ্জু কুঞ্জে বিচরণ !
(১৩)
তুই কিরে ফুলবাস,
প্রকৃতির প্রেমোচ্ছ্বাস,
ললিত তড়িত লতা
নিবিড় নীরদ কোলে ?
প্রতি অঙ্গে প্রতিভাত,
কোটি চন্দ্র করস্রোত,
শিহরে ব্রহ্মাণ্ড-তনু
চারু কিরণ হিল্লোলে !
(১৪)
সুকোমল, সুশীতল,
প্রীতি-ফুল্ল শতদল,
নির্ম্মল জোছনা ঝরে
নলিন নয়ন কোণে !
ঢল ঢল রূপরাশি,
শরতের রাকা শশী,
আয় রে 'প্রতিভা' মোর,
আয় তোরে রাখি প্রাণে।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র রায়।

মহাপ্রয়াণ।

(১)
যাও মা জননি, জগদম্বা-সুতা,
বিষ্ণুদূত আসি দাঁড়িয়ে আছে।
বৈকুণ্ঠের রথ সাজায়ে এনেছে
যাও মা তোমার মায়ের কাছে।
দয়া-ধরমের, চারু নেমি যুগ,
ভকতি, বিশ্বাস, বাহন তার।
পুণ্য-প্রেমে গড়া অভ্রভেদী চূড়া,
শ্রদ্ধায়দানের ঝালর ভার।
নির্ভর-আসন, সাধনা খচিত,
ত্যাগ-কোকনদ চরণ তলে।
শান্তি-ছত্র শিরে, বামে ও দক্ষিণে
প্রীতি আর সেবা, চামর দোলে।
অমল ধবল, উড়িছে পতাকা,
পবিত্রতা তায় রয়েছে লেখা।
যাওমা জননি, চড়ি দিব্য যান,
"পরলোকে পুনঃ হইবে দেখা।"
(২)
তোমাকে ভেটিতে রথে,
সারি দিয়া ছায়া পথে,
অনিমেষে চেয়ে আছে সুরবালাগণ।
করে ল'য়ে স্বর্ণথালা,
অক্ষয় তুলসী মালা,
বৃন্দাবনী, নামাবলী কৌষেয় বসন।
জ্বালিয়া ঘৃতের বাতি,
কাঞ্চন প্রদীপ পাতি,
মাঙ্গলিক উলুধ্বনি দেয় সঘনন।
অগুরু চন্দন ভার,
নব পারিজাত হার,
পুণ্যতোয়া মন্দাকিনী করিছে বহন,
স্বরভেদে ঋভুগণ,
করে সদা বেদগান
দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি করে নগর কীর্ত্তন।
গন্ধর্ব্বের ঐক্যতান
কিন্নরেরা করে গান,
দেবশিশু মত্ত হয়ে করিছে নর্ত্তন।
(৩)
নাহি সেথা অনশন,
শোক-তাপ অসহন,

দারিদ্র্য অভাব নাই বৃথা অহঙ্কার।
কাম-মোহ-লোভ-দ্বেষ,
দুর্নীতির নাহি লেশ,
মর্ম্মপীড়া, প্রতিহিংসা, নাহি অত্যাচার।
বিবাদ, গঞ্জনা, ক্রোধ,
জাতিভেদ, অবরোধ,
কুটিলতা, তঞ্চকতা, নাহি মিথ্যাচার।
নিরাশা, বাসনা, ভোগ,
লোকনিন্দা, অনুযোগ,
ক্রটী ভয়, স্বার্থসিদ্ধি, নাহি ব্যভিচার।

(৪)

মধুর ওঁকারাক্ষরে চিরশান্তি সুধা ঝরে,
স্নিগ্ধ-দ্যুতি নিত্যধাম মোক্ষফলাধার
সেথা মম জ্যেষ্ঠ সনে বিরাজিত রত্নাসনে
হৃদয় দেবতা তব জনক আমার।

(৫)

তিলেক দাঁড়াও, দেবি! সেনেহ-আধার
লহমা অন্তিম সেবা, শেষ উপচার।
ধোয়ায়ে নয়ন জলে চরণ কমল,
কৃতজ্ঞতা অর্ঘ্য দেই, প্রীতি-গঙ্গাজল।
গন্ধপুষ্প ভক্তিশ্রদ্ধা বিকল অন্তর।
আশীর্ব্বাদ, ক্ষমা ভিক্ষা পূজা অন্তে বর।

মাতৃহীন সন্তান।

শাক্য ও ইশাশিষ্য

শত শত যোগী হিমাচল শিরে
আছিল যোগে মগন।
হেনকালে তথা গরজে গম্ভীরে
ভীষণ ম্যাক্সিম গন।
শাক্য শিষ্যগণ নিভৃত কন্দরে
হিমাচল দুর্গশিরে।
শান্তভাবে বসি গভীর নির্জ্জনে
ডাকিছে বিশ্বপতিরে।
কারও নাহি খায়, কারেও না জ্বালায়
শিষ্ট শুদ্ধ শান্তমতি।
কভু কোন দিন ভ্রমেতে কখন
চায়না রাজ্যের প্রতি।
নাহি ইর্ষা দ্বেষ দম্ভলোভ মোহ
পররাজ্য আক্রমা।

জীবনের আশা জীবনের কাজ
থাকিতে যোগে মগন।
কে তুমি আইলে, গভীর গরজে
ধ্বনিয়া ম্যাক্সিম গন্।
গভীর বিজনে নির্ব্বাণ স্বপন
করিতে বিনাশ পণ।
জীবে দয়া তরে নর হত্যা পরে
ঘৃণা কি এদের দোষ।
পর অধিকার করিছে সন্মান
তাই কি এতেক রোষ।
কাম ক্রোধ লোভ করিছে দমন
শাক্যের শিক্ষার বলে।
এ হেতু কি এরা লভিছে নিগ্রহ
শাসিবে অসুর বলে।
পূর্ব্বে দেবাসুর করিত সমর,
নিরীহ দেবের দল,
ক্রুদ্ধ পাপাচারী অসুরের হাতে
লভিত বিষম ফল।
ইশার নামেতে গর্ব্বিত তোমরা
এই কি ইশার শিক্ষা
নিরীহ ধার্ম্মিক শান্ত শিষ্টগণে
অগ্নি মন্ত্রে দিবে দীক্ষা।
এই কি সভ্যতা এই নর-প্রেম
এই কি শিক্ষার ফল!
শিষ্ট শান্তগণে দলিত চরণে
কেন আকিঞ্চন বল।
ইশার আদেশ "অন্যের জিনিষ
কর না হরণ কভু।"
পররাজ্য তরে এত লালসায়
অন্ত নাই কেন তবু।
বড় দুঃখ তব আসিয়ার লোক
শিখেনি সভ্যতা রীতি।
সুরার উন্মাদ ব্যভিচার পাপ
মানব নিধনে প্রীতি।
তাই শান্তিময় হিমাচল শিরে
গরজে কামান শত।
তাই অস্ত্রহীন যোগী ঋষিগণে
নাশিছ পশুর মত।
শত ধিক এই মানব হিংসায়
বিনাশে পরের ধন।

উলটী পালটী করিতে নিধন
হেন শান্তি-নিকেতন।
সাগরে-রোধিত তোমাদের ঘরে
কে যায় কামান লয়ে ?
নাশিতে তোমার গৃহের কুশল
কে বল চলিছে ধেয়ে ?
আছেন জগতে এক ভগবান
যিনি সে ইশার পিতা।
ধরম পুণ্যের পুরস্কার-দাতা
দুর্ব্বলের পরিত্রাতা।
শ্বেত পীতে তাঁর নাহি পক্ষপাত
খ্রীষ্টান হিদেন বলি।
এক দিন তিনি ন্যায় দণ্ড লয়ে
অসুর দিবেন বলি।
নিঃশ্বাসে তাঁহার উত্থান পতন
রাজ্যের দেশের সব।
শত পাপাচার দানবীয় বল
নিমেষে হবে নীরব।
দূর বটে কিছু কিন্তু নহে, জেন,
ন্যায় দণ্ড অন্তর্দ্ধান।
এক দিন শত ম্যাক্সিম কামান
হইবেক অবসান।
পিতা ন্যায়বান ধর্ম্ম রক্ষা তরে
পাঠাবেন ন্যায়দণ্ড।
সে দিন সকল অত্যাচার পাপ
হইবেক খণ্ড খণ্ড।
আছে সেই রাজ্য সেই বিচারক
সেই প্রভু ন্যায়বান।
যাঁর সুবিচারে সব অত্যাচার
হইবে শতেক খান।

শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাস।

কাহিনী।

(১)

আজি বর্ষা নেমে এল ঘেরি চারিধার
সমস্ত জগৎ জুড়ি মহা আন্দোলন !
দুইটী বালিকা শুধু রোগিণী মাতার
স্নেহের অঞ্চল ধরি করিছে ক্রন্দন !

(২)

শূন্য মাঠ—তারি মাঝে ক্ষুদ্র সে কুটীর—
তুচ্ছ করি প্রকৃতির ভৈরব-নর্ত্তন,
রক্ষিছে তিনটী প্রাণ চঞ্চল অধীর !
তুচ্ছ করি বরিষার গভীর রোদন !

(৩)

"বৃথা কান্না"—রুগ্না আমি বাহিরে প্রলয় ;
এ সময়ে বহুদূরে তোমাদের পিতা !
মোদের দারিদ্র্য হেতু ছাড়ি লোকালয়
মৎস্য অন্বেষণে ফিরে নদীর সৈকতা"।

(৪)

রোধিলা আপন কথা চাহি শূন্য পানে !
শূন্য দৃষ্টি, নাহি শব্দ পড়েনা নিশ্বাস !
কি ভীষণ যন্ত্রণার চিহ্ন সে নয়নে ;—
মরমের কত কথা করিছে প্রকাশ !

(৫)

কতক্ষণে ফেলি শ্বাস, ক্ষীণ হস্ত তুলি
কহিতে লাগিলা মাতা—"অদৃষ্ট তোদের" !
"ঘরে অন্ন নাহি আজ ক্ষুধা যাও ভুলি
আজ বুঝি শেষ দিন মোর জীবনের" !

(৬)

মনে পড়ে জীবনের প্রথম সেদিন,—
হুলুধ্বনি, শঙ্খরোল, মালা বিনিময় !
তার পর 'পরিচয়' মধুর নবীন !
মোদের হৃদয় মাঝে প্রেমের আলয়।

(৭)

কত আশা, কত স্বপ্ন ক্ষুদ্ধ হৃদয়ের
অপূর্ণ বিলীন হবে আঁধারের কোলে ?
আর কি মিলন কভু হবেনা মোদের !
এত প্রেম এত স্নেহ ডুবিবে অতলে !

(৮)

বাহিরে গভীর ঘন করিল গর্জ্জন !
সন্তানে ধরিয়া বক্ষে শিহরিলা মাতা !
ধীরে ধীরে থেমে এল হৃদয়স্পন্দন ;—
দুনয়নে বহে ধারা বদন সস্মিতা !

(৯)

কত বর্ষা বহে গেছে আছে সে প্রান্তর !
নাহি শুধু সে কুটীর, বালিকা-যুগল !
হুহু ক'রে ক্ষিপ্ত বায়ু বহি নিরন্তর
জাগাইয়া দেয় স্মৃতি আনে পরিমল।

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ মিত্র।

কর্ম্ম সাধনা।

জনম ল'ভেছ ভবে
কর্ম্ম করিতেই হবে
কর্ম্ম তরে মাতাও জীবন,
মুখে গাও সমস্বরে　　বম্ বম হরে হরে
বন্দে মাতরং। ১

কর্ম্ম সংসারের সার,
কর্ম্ম স্বরগের দ্বার,
কর্ম্ম ভক্তি মুক্তির কারণ,
মুখে গাও সমস্বরে　　বম্ বম্ হরে হরে
বন্দে মাতরং। ২

কর্ম্ম দেব, কর্ম্ম দেবী,
হও সবে কর্ম্ম সেবী,
কর্ম্ম-ত্যাগী হওনা কখন,
মুখে গাও সমস্বরে　　বম্ বম্ হরে হরে
বন্দে মাতরং। ৩

কর্ম্ম বেদ, কর্ম্ম তন্ত্র,
কর্ম্ম গুরু, কর্ম্ম মন্ত্র,
কর সদা কর্ম্মের সাধন,
মুখে গাও সমস্বরে,　　বম্ বম্ হরে হরে
বন্দে মাতরং।৪

দেশ হিত কর্ম্ম তরে,
প্রাণ দিবে অকাতরে,
কর্ম্ম-ফল না ক'রে গ্রহণ,
মুখে গাও সমস্বরে　　বম্ বম্ হরে হরে
বন্দে মাতরং। ৫

অসভ্য বর্ব্বর যারা,
কর্ম্ম বশে আ'জ তারা,
জগতের মুকুট-ভূষণ,
মুখে গাও সমস্বরে,　　বম্ বম্ হরে হরে
বন্দে মাতরং।৬

কর্ম্ম তীর্থ, কর্ম্ম ব্রত,
কর্ম্ম যাগ যজ্ঞ যত,
কর্ম্ম নাশে অসার জীবন,
মুখে গাও সমস্বরে　　বম্ বম্ হরে হরে
বন্দে মাতরং। ৭

এ কর্ম্ম আমার নয়,
ব'ল না কোন সময়,
যে যা' পার কর সম্পাদন,
মুখে গাও সমস্বরে,　　বম্ বম্ হরে হরে
বন্দে মাতরং। ৮

হইবে না, পারিব না,
কখন তা' বলিবে না,
হ'বে ব'লে দেখাও উদ্যম,
মুখে গাও সমস্বরে,　　বম্ বম্ হরে হরে
বন্দে মাতরং। ৯

কর্ম্ম তরে গ্রহগণ
ভ্রমিতেছ অনুক্ষণ।
কর্ম্ম বশ যত জীবগণ,
মুখে গাও সমস্বরে　　বম্ বম্ হরে হরে
বন্দে মাতরং।১০

কর্ম্ম ধাতা, কর্ম্ম পিতা,
কর্ম্ম মাতা কর্ম্ম ভ্রাতা,
কর্ম্মে সৃষ্ট বিশ্বের গঠন,
মুখে গাও সমস্বরে　　বম্ বম্ হরে হরে
বন্দে মাতরং।১১

কর্ম্মেতে যাহার মতি,
কর্ম্মেতে যাহার রতি,
যে উদ্যমী পুরুষ রতন
মুখে গাও সমস্বরে　　বম্ বম্ হরে হরে
বন্দে মাতরং। ১২

পেয়েছ ইন্দ্রিয়চয় কর্ম্ম করিবারে,
লভেছ বিবেক বুদ্ধি কর্ম্ম সাধিবারে।
অতএব কর্ম্ম কর করি' প্রাণ পণ,
মুখে গাও সমস্বরে,　　বম্ বম্ হরে হরে
বন্দে মাতরং।১৩

স্বামী কেশবানন্দ।
বিনোদপুর—যশোহর।

মহাত্মা শিবনাথ শাস্ত্রী।

হে সৌম্য, হে শান্ত মূর্ত্তি, বঙ্গের ভূষণ,
পরিহরি ত্রিদিবের স্বর্ণ সিংহাসন,
উদয় ধরার মাঝে জ্ঞানের প্রচারে,
শুভ স্নেহাশীস বর্ষি দীনে অকাতরে,
কল্যাণ কামনা নিত্য ধর্ম্মদ্রোহী জনে,
শিখায়েছ বিশ্ব প্রেম আত্ম-বিসর্জ্জনে।
তব উপদেশবাণী সুধা-সঞ্জীবনী
মৃতকল্প প্রাণে বাজে আনন্দ রাগিণী।

প্রসন্ন আনন্দ দীপ্ত পূর্ণ প্রতিভায়,
নাহি চিত্রকর হেন চিত্রে তুলিকায়।
তোমার তুলনা তুমি এ মহীমণ্ডলে,
চিরযশঃ বঙ্গবাসী গায় কুতুহলে.
কি আছে আমার দেব দিতে উপহার,
হৃদয়ের ভক্তি রাশি প্রীতিফুল হার,
মিশায়ে নয়ন বারি ইষ্টদেব ধ্যানে,
অরঘ-সম্ভার ঢালি, রাজীব চরণে।

শ্রীনীলরতন মুখোপাধ্যায়।

প্রেম।

শুধু মরমের কান্না নয়নের জল,—
শুধু আত্ম-বলিদান পরের চরণে,—
আমরণ হেসে হেসে তুষানলে পোড়া,-
প্রেমের নিয়ম এই জগত বিধানে॥

শ্রীতিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

নিদয়া

পরাণে পরাণে জেগে আছ তবু
দেখা তব নাহি পাই।
কাননে কাননে ফুটে আছ তবু
আমার নয়নে নাই!!
সৌরভ তোমার বাতাসে ভাসিয়া
আকুল পরাণে পশে,
পলকের তরে হই আত্মহারা
প্রেম-নীরে যাই ভেসে।
স্বপনে শুনিয়া বাঁশরীর তান
সহসা জাগিয়া উঠি।
সহসা তোমার অভয় চরণে
হৃদয় পড়য়ে লুটি।
(কিন্তু) স্বপন হতেও এ যে গো স্বপন,
নিমেষে ভাঙ্গিয়া যায়,
গভীর আঁধারে কাঁদে যে গো প্রাণ
একাকী লুটা'য়ে হায়!
এত ভালবাস, এত কাছে তবু
বারেক দেখা না দাও,
মাঝে মাঝে এসে মনের কিনারে
ছায়া খানি রেখে যাও।
আমি যে গো নিতি, তোমারি লাগিয়া
শ্মশানে বসিয়া কাঁদি
আকুল পরাণে 'মা' 'মা' বলিয়া
আকাশেরে ধরে সাধি!
পতিত বলিয়া এত কি নিদয়া?
এমনি দিবে মা! ঠেলে?
ধুলা ঝারি কি গো নিবে না বারেক
অধম সন্তানে কোলে?

শ্রীকালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ব্যাকরণতীর্থ।

রামকৃষ্ণ।

কবে কোন্ সুবিমল শান্ত শুভ যোগে
হে সৌম্য! হে জগতের সাধক সুন্দর,
জাগাইলে প্রাণ-হীন সুপ্ত ধরণীরে—
স্নেহের পরশে তব, নীরব-নিথর—
সুপ্ত মৌন বিশ্ববাসী জাগিল সহসা
পুলকে পূজিল সবে ভক্তি অশ্রু ভরে
মায়ের চরণ-পদ্ম,—নব পুণ্যছটা
ভাতিল ধরণী তলে,—সম্মিলিত সুরে
উঠিল শতেক কণ্ঠে শান্ত সামগীতি।
পুণ্যের আলোক স্রোত অনন্ত অম্বরে
আবরিল সুপ্ত মৌন পাপ ম্লান ছবি,—
মুছে দিল বিষাদের অনন্ত তিমিরে।
আজি শান্ত-শান্তিময়ী ধরণী অম্বর—
তোমারি প্রভাবে,—তুমি সাধক সুন্দর!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা।

প্রাচীন ভারতের বাণিজ্য। (৫)

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, হিমালয়ের উত্তরে এবং উত্তর মহাসাগরের দক্ষিণে উত্তর কুরুবর্ষ (সাইবিরিয়া) নামে একটী বৃহৎ জনপদ অতি প্রাচীনকাল হইতে সুবিখ্যাত আছে।

রামায়ণে ঐ দেশের সমৃদ্ধি বিষয়ে বর্ণিত আছে যে,—

———"সদেশঃ সর্ব্বতোবৃতঃ।
নিম্নগাভিশ্চ মুক্তাভি মর্ণিভিশ্চ মহাধনেঃ।
উদ্ধৃত পুলিনাস্তত্র জাতরূপৈশ্চ নিম্নগাঃ।
সর্ব্বরত্নময়ৈশ্চিত্রৈর্হ্রদৈগোঢ়া নগোত্তমৈঃ"।

সেই (উত্তর কুরুবর্ষ) দেশ নিরুপম মুক্তা ও মহামূল্য মণিসকল দ্বারা সর্ব্বত্র আবৃত। ঐ দেশের নদীগুলির পুলিন-দেশ সকল সুবর্ণখনিযুক্ত এবং তীরস্থিত পর্ব্বতমালা বিবিধ বিচিত্র রত্নরাজীতে পরিপূর্ণ।

রামায়ণে লিখিত আছে যে, হিমাচলের উত্তরে কাল, সুদর্শন, দেবসখা, কৈলাস, মন্দর এবং মৈনাক নামক পর্ব্বতগুলি অবস্থিত আছে। ঐ মৈনাক পর্ব্বতে শিল্পি-প্রবর ময় দানবের বাস ভবন ছিল। হিমালয়ের উত্তরে মুনি ও ঋষি-গণের প্রিয় মানস-সরোবর বিরাজিত। রামায়ণ ও মহাভারতের সময়ে ভারতীয় বাণিজ্যের উন্নতি পরম উৎকর্ষ লাভ করে। বণিকগণ হয়, হস্তী, উষ্ট্র, অশ্ব, অশ্বতর, বলীবর্দ্ধ ও গর্দ্দভের পৃষ্ঠে পণ্য দ্রব্যজাত বোঝাই করিয়া দেশ মধ্যে ক্রয় ও বিক্রয়াদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। এই রূপে বণিকগণ উল্লিখিত নদ ও নদী বাহিয়া নৌকাযোগে স্বদেশ মধ্যে বাণিজ্য কার্য্য সম্পাদন করিত। রামায়ণের সময়ে ভারতীয় আর্য্য-গণ দান, ধর্ম্ম, তপস্যা ও তীর্থ দর্শনে রত এবং অগ্নিহোত্র-পরায়ণ ছিলেন।

রাজ-গণ নানাবিধ ভূরি দক্ষিণ যজ্ঞাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন; যথা—

"দানধর্ম্মরতা নিত্যং তপস্যা তীর্থ দর্শনম্।
অগ্নিহোত্র পরালোকা রাজানো যজ্ঞকারিণঃ॥"

এই সকল যজ্ঞকার্য্য সম্পন্ন করিতে যে সমস্ত দ্রব্য আবশ্যক হইত, তন্মধ্যে অনেকগুলি হিমালয়ের উত্তরবর্ত্তী দেশ সমূহ হইতে আনীত হইত। মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে বহুবিধ সুখকর দ্রব্যের উল্লেখ আছে, তাহাতে বোধ হয় যে, ঐ সকল দ্রব্যের মধ্যে অনেকগুলি বিভিন্নদেশ-জাত। কিন্তু ঐ সকল বস্তু ভারতে প্রচুর পরিমাণে থাকায় ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, তৎকালে ভারতের সর্ব্বত্র অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য বাহুল্য রূপে পচলিত ছিল।

সিন্ধুনদ পার হইয়া, অথবা হিমালয়ের অংশভূত ক্রৌঞ্চ নামক গিরির সঙ্কট পথ দ্বারা হিমাচলের উত্তরদিগ্বর্ত্তী দেশ সমূহের সহিত ভারতীয় বাণিজ্যকার্য্য নির্ব্বাহিত হইত।

কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ডে উক্ত আছে যে,—

"ক্রৌঞ্চ গিরিং সমাসাদ্য বিলং তস্য সুদুর্গমং।
অপ্রমত্তৈঃ প্রবেষ্টব্যং দুষ্প্রবেশং হিতৎস্মৃতম্॥"

ক্রৌঞ্চ গিরি পাইয়া তাহার দুর্গম সঙ্কট পথ সাবধানে প্রবেশ করিবে, কেননা, সেই পথে প্রবেশ করা বড়ই কঠিন। হিমালয়ের উত্তরে শকাদিজাতীয় ও কুরুবর্ষবাসী এবং চীন দেশীয় জন-গণের সহিত ভারতীয় বণিকদিগের বাণিজ্য কার্য্য সম্পাদিত হইত। সম্ভবতঃ স্থলপথ ও জলপথ, এই উভয় পথ দ্বারাই চীনদেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য-কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত।

বনায়ু (আরবদেশ), পারসীক (পারস্য), কাম্বোজ এবং বাহ্লীক (বাল্খ) দেশ সকল হইতে অতি উৎকৃষ্ট অশ্ব-সকল বাণিজ্যযোগে ভারতে আনীত হইত এবং ভারত হইতে সুবর্ণ, হীরক, বৈদূর্য্যাদি মণি, হস্তী এবং উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী সকল ভিন্ন ভিন্ন দেশে নীত হইত। মিহালয়ের উত্তর প্রদেশ হইতে রঙ্কুনামক মৃগের লোম-জাত বস্ত্র (শাল) এবং বিবিধ লোমজ-বস্ত্র বাণিজ্য-যোগে ভারতে আনীত হইত। সোমলতা হিমালয়ের উত্তর-প্রদেশেই জন্মিত, উহা দ্বারা ভারতে সোমযাগ সম্পাদিত হইত।

সম্ভবতঃ, জলপথে বৈদেশিক জাতিনিচয়ের সহিত বাণিজ্যার্থ আর্য্যাবর্ত্তের

বাণিজ্য দ্রব্যজাত পোতযোগে সিন্ধুনদ বাহিয়া ভারত মহাসাগরোপকূলবর্ত্তী দেশ সমূহে নীত হইত। পরে, তত্তৎস্থান হইতে ভারত মহাসমূদ্রস্থিত সুখতর বা শোকত্র, সিংহল, মল্ল, যব, সুমাত্রা ও বলি প্রভৃতি দ্বীপে এবং চীনদেশে নীত ও বিক্রীত হইত। চীনদেশ হইতে আবার কৌষেয় বস্ত্র সকল ভারতে আনীত হইত।

অপিচ, মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডীতে সমুদ্রপোত এবং সামুদ্রিক রত্ন সমূহের উল্লেখ রহিয়াছে ; যথা

আঘুর্ণিতো বা বাতেন স্থিতঃ পোতে মহার্ণবে।
চণ্ডী—ফলশ্রুতি।
"নিশুম্ভস্যাব্ধিজাতাশ্চ সমস্তা রত্নজাতয়ঃ"।
চণ্ডী—দূতসংবাদ।

আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ আর্য্যগণ এক সময় সমস্ত পৃথিবীর উপদেষ্টা ছিলেন। রামায়ণাদি মহাভারতান্তকাল পর্য্যন্ত আর্য্যগণ সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির চরম সীমায় সমুত্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সভ্যতায় অভিমানী হইয়া আর্য্যাবর্ত্তের বহির্ভূত দেশ-সমূহবাসী জাতি নিচয়কে পশুজাতির মধ্যে গণ্য করিতেন। বাস্তবিক তৎকালে ভারতবর্ষ ভিন্ন পৃথিবীর অধিকাংশ স্থান, অপরিজ্ঞাত এবং অসভ্য অনার্য্যগণ কর্ত্তৃক অধিবাসিত।

যে ভারতের সৌভাগ্য-রবি বৈদিক সময়ে সমুদিত হইয়া রামায়ণ ও মহাভারতের শেষকাল পর্য্যন্ত উজ্জলতম জ্যোতিতে দেদীপ্যমান থাকিয়া কুরুক্ষেত্র-মহাসমরসাগরে নিমজ্জিত হয়, সেই অস্তমিত সৌভাগ্য-রবির গোধূলিপ্রায় দীপ্তিচ্ছটা যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহাও আবার ভারতের দুর্দ্দিনে তীরোরি-ক্ষেত্রে চিরান্ধকারে বিলীন হইয়া গিয়াছে! হায়, আর কি সে সৌভাগ্য-সূর্য্য ভারতাকাশে উদিত হইবে! অপিচ, এস্থলে বক্তব্য এই যে, যেমন কোন কৃতবিদ্য বুদ্ধিমান ব্যক্তি ভারতের বর্ত্তমান বাণিজ্যাবস্থা জিজ্ঞাসু হইয়া তৎসম্বন্ধে কোন পুস্তক পাঠ না করিয়াও ভারত রাজধানী একমাত্র কলিকাতা মহানগরীর শোভা ও সমৃদ্ধি পরিদর্শন করিয়া বর্ত্তমান ভারতের অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য সম্বন্ধে বিশিষ্টরূপ উন্নতি দেখিতে পান, তেমনি রামায়ণোক্ত কালের বাণিজ্য সম্বন্ধীয় কোন পুস্তক না থাকিলেও তাৎকালিক ভারতের রাজধানী একমাত্র অযোধ্যা মহানগরীর শোভা ও সমৃদ্ধি বিষয়ে বর্ণনা পাঠ করিলেই তৎকালীয় ভারতের অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য সম্বন্ধে যে মহতী উন্নতি হইয়াছিল, তাহা বিশেষরূপে জানিতে পারা যাইবে। এইক্ষণ আমরা সেই অযোধ্যা-মহানগরীর শোভা ও সমৃদ্ধি সম্বন্ধীয় বর্ণনাটী বাল্মীকি রামায়ণ হইতে অনুবাদ করিয়া রামায়ণোক্ত সময়ের অর্থাৎ ত্রেতাযুগের ভারতীয় বাণিজ্য বিষয়ক প্রস্তাবটী শেষ করিব।

বাল্মীকি রামায়ণের বালকাণ্ডের পঞ্চমসর্গে বর্ণিত আছে যে, সরযূনদী-তটে প্রচুর ধনধান্যসম্পন্ন হৃষ্টপুষ্ট বহুলোক-সমাকীর্ণ কোশল নামে এক বিশাল রাজ্য বিদ্যমান আছে। ত্রিভুবন-বিখ্যাত অযোধ্যা নামে মহানগরী উহার রাজধানী। মানব-শ্রেষ্ঠ বৈবস্বত মনু, স্বয়ং সেই অযোধ্যা-নগরী স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই রমণীয় মহানগরী দ্বাদশ যোজন দীর্ঘ ও তিন যোজন বিস্তীর্ণ এবং সুবিভক্ত মহাপথে (বহির্মার্গ) ও সুপ্রশস্ত রাজপথে সুশোভিত। পথসকল বিকশিত কুসুম-কলাপ সহযোগে

রমণীয়। রাজ-মার্গ নিয়ত বারিধারা সংযোগে ধূলি-শূন্য। ইন্দ্রতুল্য মহারাজ দশরথ, অমরাবতী সদৃশ সেই নগরীতে বাস করিতেন। তদীয় শাসন ধর্ম্ম ও ন্যায়-সঙ্গত হওয়ায়, বহুতর লোক তথায় আসিয়া বাস করিয়াছিল। তোরণ-শ্রেণী কপাট-সম্বদ্ধ এবং আপণ-সকল সুবিভক্তাবকাশ-সংযুক্ত। নগরে প্রাকারোপরি যন্ত্র সমূহ ও আয়ুধাগার সকল সংস্থাপিত। সর্ব্ববিধ শিল্পী ও সূত মাগধাদি বৈতালিক-গণের নিবাস হেতু,সেই মহানগরী অতুল শোভায় পরিশোভিত। স্থানে স্থানে উচ্চ সৌধাবলী বিরাজ করিতেছে এবং প্রাসাদশিখরস্থ পতাকা সকল উড্ডীন হইতেছে। নগরের চতুর্দ্দিক প্রাচীরে বেষ্টিত এবং প্রাচীরোপরি শত শত লৌহময় শতঘ্নী (তোপ) নামক আয়ুধ সংস্থাপিত। নগরীর সর্ব্বত্র বধূগণের নাট্যশালা, কুত্রাপি বা ক্রীড়ার্থ পুষ্পবাটিকা ও আম্রবন সকল বিরাজমান। দুর্গমগভীরজল-পূর্ণ পরিখা-পরিবেষ্টিত সেই মহানগর, শত্রুগণের নিতান্ত দুরাক্রম্য ও দুরাসাদ্য। মন্দুরাদি গৃহ সমূহ, হয়-হস্তি-গো-উষ্ট্র-গর্দ্দভাদি পশু সমূহে পরিপূর্ণ। তথায় করদ ও মিত্ররাজগণ সতত করদান করিতে সমাগত হইতেছে। নানা দেশ-নিবাসী বণিকেরা বাণিজ্য দ্বারা নগরটী শোভাময়ী করিয়া তুলিয়াছে। রত্ন-বিনির্ম্মিত, পর্ব্বত প্রমাণ প্রাসাদসকল নিরতিশয় শোভা বিস্তার করিতেছে। কুত্রাপি বা নারীগণের ক্রীড়া-গৃহ-সমূহ বিদ্যমান থাকায়, নগরীটী অমরাবতীর ন্যায় শোভমানা হইয়াছে। কোথায় বা বারনারীগণ বিচিত্র সর্ব্বরত্ন-বিভূষিত সপ্ততল গৃহ সমূহে বাস করিতেছে। নগরের সমভূমি সন্নিবেশিত পেরি ও কুটুম্বিগণের গৃহগুলি এরূপ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে অবস্থিত যে, কুত্রাপি আর অবকাশ মাত্রও নাই। নগরী শালিতণ্ডুলে পূর্ণ এবং সরোবর সকল ইক্ষুরসবৎ সুস্বাদু বারিতে পরিপূর্ণ। স্থানে স্থানে দুন্দুভি, মৃদঙ্গ, বীণা ও পণবাদিবাদিত্র সকল নিরন্তর বাদিত হইতেছে। অযোধ্যাপুরী, দেবলোক-স্থিত সিদ্ধগণের তপোলব্ধ বিমানের ন্যায় পৃথিবীতে এক অনুপম স্থান। ইহা সুন্দর বেশধারী সাধুজনগণে সমাবৃত। যাঁহারা স্বজনবিহীন, নিঃসহায়, পিত্রাদি ও পুত্রাদি-রহিত, লুকায়িত এবং যুদ্ধ করিয়া পলায়িত ব্যক্তিগণকে বাণ-বিদ্ধ না করিয়া ক্ষমা করিয়া থাকেন, যে সকল অস্ত্র শস্ত্র প্রয়োগ-নিপুণ শীঘ্রবেধকারী বীরগণ,লঘুহস্ততাপ্রযুক্ত নিশিত সায়ক ও মল্লযুদ্ধ দ্বারা মত্ত সিংহ-ব্যাঘ্র বরাহ প্রভৃতি আরণ্য হিংস্র জন্তু সকল বিনাশ করেন, তাদৃশ সহস্র সহস্র মহারথ বীরগণ দ্বারা মহারাজ দশরথ অযোধ্যা নগরী পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। অযোধ্যা, সাগ্নিক, গুণবান্, বেদবেদান্ত-পারগ, বদান্য, সত্যরত, মহর্ষিকল্প, ব্রাহ্মণ-গণ দ্বারা পরিপূরিত হইয়াছিল *।

ক্রমশঃ—

শ্রীতারিণীকান্ত বিদ্যানিধি।

* কোশলোনাম মুদিতঃ স্ফীতো জনপদোমহান্। নিবিষ্টঃ সরযূতীরে প্রভূত ধনধান্যবান্ ॥৫ অযোধ্যানাম নগরী তত্রাসীল্লোকবিশ্রুতা মনুনা মানবেন্দ্রেণ যাপুরী নির্ম্মিতা স্বয়ম্॥৬ আয়তাদশবহেচ যোজনানি মহাপুরী। শ্রীমতী ত্রীণি বিস্তীর্ণা সুবিভক্ত মহাপথা॥৭ রাজমার্গেণ মহতা সুবিভক্তেন শোভিতা। মুক্ত পুষ্পাবকীর্ণেন জলসিক্তেন নিত্যশঃ॥৮ তাংতুরাজা দশরথো মহারাষ্ট্রে বিবর্দ্ধনঃ। পুরীমাবাসয়ামাস দিবিদেবপতি-

উপনিষদ-গ্রন্থাবলী।

[ক্রমে প্রধান প্রধান উপনিষৎ সকল পয়ারাদি ছন্দে সহজ ভাষায় অনুবাদিত হইলে বঙ্গবাসীর প্রভূত উপকার সাধিত হয়, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া, উপনিষৎ গ্রন্থাবলী নাম দিয়া কৈকল্য এবং ঈশোপনিষদের মর্ম্মানুবাদ প্রকাশ করিলাম। অন্যান্য উপনিষৎ যথাকালে প্রকাশিত হইবে।]

কৈবল্য।

কহিলা আশ্বলায়ন ব্রহ্মার সমীপে,
ব্রহ্মবিদ্যা, ভগবন্, শুনিব সংক্ষেপে।
যে বিদ্যা প্রভাবে জীব পাপমুক্ত হয়,
শুনিব অন্তিমে যাহে ব্রহ্ম হয় লয়।
দয়া করি পিতামহ কহিলা তখন,
যে তত্ত্ব বুঝিলে হয় বন্ধন-মোচন।

যথা॥৯ কপাটতোরণবতীং সুবিভক্তান্তরাপণাং। সর্ব্বযন্ত্রায়ুধবতী মুষিতাং সর্ব্ব শিল্পিভিঃ॥ ১০ সূতমাগধ সম্বাধাং শ্রীমতী মতুলপ্রভাম্। উচ্চাট্টালধ্বজবতীং শতঘ্নীশত সঙ্কুলাম্॥১১ বধূ নাটক সঙ্ঘৈশ্চসংযুক্তাং সর্ব্বতঃপুরীম্। উদ্যানাম্রবনোপেতং মহতীং সালমেখলাম্॥ ১২ দুর্গগম্ভীরপরিখাং দুর্গামন্যৈর্দুরাসদাম্। বাজিবারণ সম্পূর্ণাং গোভিরুষ্ট্রৈঃ খরৈস্তথা॥ ১৩ সামন্তরাজ সঙ্ঘৈশ্চ বলিকর্ম্মভিরাবৃতাম্। নানা দেশ নিবাসৈশ্চ বণিগ্ভিরুপশোভিতম্॥ ১৪ প্রাসাদৈরত্ন বিকৃতৈঃ পর্ব্বতৈরিবশোভিতম্। কূটাগারৈশ্চ সম্পূর্ণা মিন্দ্রস্যেবামরাবতীম্॥১৫ চিত্রা মষ্টাপদাকারাং বরনারীগণাযুতাম্। সর্ব্বরত্ন সমাকীর্ণাম্ বিমান গৃহ-শোভিতাম্॥১৬ গৃহগাঢ়ামবিচ্ছিদ্রাং সমভূমৌ নিবেশিতাম্। শালিতণ্ডুল-সম্পূর্ণামিক্ষুকাণ্ডরসোদকাম্॥১৭ দুন্দুভিভির্ম্মৃদঙ্গৈশ্চবীণাভিঃ পণবৈস্তথা। নাদিতং ভৃশমত্যর্থং পৃথিব্যাংতামনুত্তমাম্॥ ১৮ বিমানমিব সিদ্ধানাং তপসাধিগতং দিবি। সুনিবেশিত বেশানাং নরোত্তম সমাবৃতাম্॥ ১৯ যেচবাণৈর্ণবিধ্যন্তি বিবিক্তমপরাপরম্। শব্দবেধ্যঞ্চ বিততং লঘুহস্তা বিশারদাঃ॥২০ সিংহ-ব্যাঘ্র বরাহাণাং মত্তনাং নদতং বনৈ। হন্তারো নিশিতৈঃ শাস্ত্রর্ব্বলাদ্বাহুবর্লরপি ॥২১ তাদৃনাং সহস্রৈস্তামভিপূর্ণং মহারথৈঃ। পুরীমাবাসয়ামাস রাজ দশরথ স্তদা॥২২

তামগ্নিবদ্ভি গুর্ণবদ্ভিরাবৃতাং
দ্বিজোত্তমৈ র্বেদষড়ঙ্গপারগৈঃ।
সহস্রদৈঃ সত্যরতৈর্ম্মহাত্মভি
র্মহর্ষিকল্পৈ ঋষিভিশ্চ কেবলৈঃ॥

প্রকৃতই ব্রহ্মবস্তু বাঙ্মন-অতীত,
অনন্ত, অব্যক্ত, শান্ত, মূর্ত্তিবিরহিত।
বিশ্বরূপে ব্যক্ত তিনি, বিশ্বের কারণ,
চিদানন্দময় তিনি, নিত্য সনাতন।
এ ভাবে জানিলে তাঁরে হৃৎ-কেন্দ্রস্থলে,
অবিদ্যা বিনাশ ক্রমে হয় শুভকালে।
সর্ব্বভূতে আত্মবোধ, আত্ম মাঝে সব
হেরিলে, বুঝিলে ব্রহ্ম হয় অনুভব।
তখন পরম ব্রহ্ম-গতি-প্রাপ্তি হয়,
এই জ্ঞান বিনা মুক্তি নাহিক নিশ্চয়।
দুই যজ্ঞকাষ্ঠ ঘর্ষি অগ্নি হয় জাত,
আত্মাও প্রণব ঘর্ষে জ্ঞান সেই মত।
জ্ঞানাগ্নি দহনে ভব-বন্ধ দগ্ধ হয়,
অজ্ঞান রজ্জুর-গ্রন্থি হয় তত্ত্বময়।
দেহী যথা স্বপ্নে করে সুখ দুঃখ ভোগ,
নিজ মায়াবশে সৃজি মিথ্যা জীবলোক;
তেমতি নির্গুণ আত্মা স্বীয় মায়াবশে
রূপ গ্রহি পূর্ণকাম হন অবশেষে।
ইন্দ্রিয় নিস্পন্দ হ'লে সুপ্ত দেহীগণ,
ভোগ অবসান হ'লে আত্মাও তেমন
সুষুপ্তি মগন হ'য়ে নিত্য সুখী হন।
শরীরীর স্বপ্নাবস্থা ব্রহ্মের জাগ্রত,
শরীরীর সুপ্তাবস্থা, ব্রহ্মে সেইমত
সুষুপ্তি-অবস্থা, শান্ত নিত্য সুখময়।
বুঝ এই, জান এই, কহিনু নিশ্চয়।
সুষুপ্তি হইতে জীব পূর্ব্ব কর্ম্মবশে
জাগেন আবার, কর্ম্ম-ফল-ভোগ আশে।
স্থূল সূক্ষ্ম জ্ঞান-দেহে সে আত্মা বিহরে,
তা'হতে উদ্ভব সব বিশ্ব চরাচরে।
রজ্জু হেরি ভ্রমবশে সর্প জ্ঞান হয়;
ব্রহ্মে হেরি, ভ্রমে বিশ্ব হইছে প্রত্যয়।

তাঁহা হ'তে জাত প্রাণ মন ও ইন্দ্রিয়,
আকাশ পৃথিবী বায়ু জ্যোতি যাবতীয়।
বিশ্বের আধার যিনি, অতীব মহান,
সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্মতর যিনি সর্ব্বপ্রাণ,
যিনি নিত্য,—তিনি ব্যক্ত সর্ব্বভূত রূপে,
সেই তিনি, তিনি সেই, অরূপ স্বরূপে।
জাগ্রত, সুষুপ্তি, স্বপ্ন যা'র ভাবত্রয়,
তিনি আমি, আমি ব্রহ্ম, এ নিত্য প্রত্যয়
হইলে জীবের ঘুচে ভবের বন্ধন,
গতায়াত দুঃখ তাহে হয় বিমোচন।
ত্রিবিধ ভাবেতে যাহা ভোগ্য,ভোক্তা ভোগ,
তা'হ'তে পৃথক আমি, চিন্মাত্র, দর্শক।
আমা হ'তে জাত সব, আমাতেই স্থিত,
আমাতেই লয়, আমি ব্রহ্ম সুনিশ্চিত।
অণু হ'তে সূক্ষ্ম আমি, আমিই বৃহৎ
আমি বিশ্ব, আমি নিত্য, আমিই জগৎ *।
আমি পুরাতন, ঈশ, আমি হিরন্ময়,
মঙ্গল স্বরূপ আমি, আমি সর্ব্বময়।
আমি নিরাকার, মম অচিন্ত্য শকতি,
চক্ষুহীন দৃষ্টি মোর, কর্ণহীন শ্রুতি।
এইভাবে আত্মজ্ঞান জনমিবে যবে
শান্ত নির্ব্বিকার জীব মুক্ত হ'বে তবে।
পাপ নাহি পরশিবে, কর্ম্ম না রোধিবে,
কৈবল্য মুকতি লাভ তখনি হইবে।

সমাপ্ত।

ঈশা।

এ জগতে ক্ষণস্থায়ী সব,
(কিন্তু) ঈশ্বরের সকলই আবৃত।
ব্রহ্মময় এ প্রপঞ্চ, কর অনুভব।
ত্যজ বিষয়-বাসনা,ভোগ কর পরমাত্ম চিত।
পর ধনে কভু নাহি হও আকাঙ্ক্ষিত ॥১

ব্রহ্ম যোগে অসমর্থ যেবা,
কর্ম্ম যোগে শতায়ুঃ হইবে।
এ বাসনা কর যদি, কর্ম্মে * কর সেবা।
অন্য পথ নাহি তব,অন্য পথ কভু না পাইবে,
অশুভ কর্ম্মেতে যাহে বদ্ধ নাহি হ'বে ॥২

অবিদ্যান অজ্ঞান যে জন,—
য'বে আয়ুঃ হইবে নিঃশেষ
যা'বে চলি যথা নাহি রবির কিরণ,
অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন অতি ঘোর তমোময় দেশ;
তথা যা'বে যবে আয়ুঃ হইবে নিঃশেষ ॥ ৩

ব্রহ্ম বস্তু এক, অচঞ্চল,
স্থির, তবু অতি বেগবান।
মনঃ পরাভূত বেগে; ইন্দ্রিয় সকল,
কিম্বা বাক্,অতিবেগে কভু তাঁর না পায় সন্ধান,
তিনি দেহে, তাই বায়ু দেহে ক্রিয়াবান ॥৪

তিনি চল, অচল তিনি-ই,
দূরে তিনি, তিনি ইতস্ততঃ
সদা সন্নিকট তিনি; সর্ব্বভূত যোনি;
এ বিশ্বের অন্তর বাহিরে তিনি সতত জাগ্রত।
ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত, সর্ব্বভূতগত ॥৫

সর্ব্বভূতে যে হেরে আপনা,
আত্ম মাঝে হেরে সর্ব্বভূত,
সেই জ্ঞানী কোনো জনে নাহি করে ঘৃণা।৬
সর্ব্ব ভূতে আত্মময় একত্ব হইলে অনুভূত
কোথা শোক, কোথা মোহ, সব হয় গত ॥৭

পরমাত্মা নিত্য জ্যোতির্ম্ময়,
সর্ব্বব্যাপ্ত, কিন্তু অশরীরী,—
অক্ষত অপাপবিদ্ধ, অশির * নিশ্চয়;
মনীষী, স্বয়ম্ভু, শ্রেষ্ঠ,তিনি শুদ্ধ,সর্ব্ব দৃষ্টিকারী
কর্ম্ম উপযুক্ত বস্তু বিধান তাঁহারই ॥৮

* প্রপঞ্চ ভূত।

* বিহিত কর্ম্ম।

* শিরা=স্নায়ুহীন।

কর্ম্মমাত্র ভজে যেইজন,
অজ্ঞান আঁধারে তা'র স্থান ;
বিদ্যামাত্র যেইজন করেন অর্জ্জন,—
(বিদ্যামাত্র,অনুরূপ কর্ম্ম নাহি করেন বিধান)
আরো ঘোর অন্ধকারে তাঁ'র অধিষ্ঠান ॥৯

শুনিয়াছি জ্ঞান কর্ম্মবাদ,—
গুরুতত্ত্ব দিলেন কহিয়া ;
জ্ঞান এক, কর্ম্ম আর, নিগূঢ় সম্বাদ ॥১০
জ্ঞানকর্ম্ম উভয় সাধনে, কর্ম্মে মৃত্যু পার হ'য়ে
জ্ঞানে অমৃতত্ব লাভ হয় অশংসয়ে ॥১১

প্রকৃতিরে ভজে যেইজন,
অজ্ঞান আঁধারে তা'র স্থান ;
ব্রহ্মে মাত্র যেইজন রত অনুক্ষণ,—
(ব্রহ্মে মাত্র, উভয়ের না করেন একত্র সাধন),
আরো ঘোর অন্ধকারে তাঁর অধিষ্ঠান ॥১২

শুনেছি প্রকৃতি ব্রহ্মবাদ,
গুরুতত্ত্ব দিলেন কহিয়া ;
ব্রহ্ম এক, প্রকৃতি পৃথক, এ সম্বাদ ॥১৩
উভয়ের একত্র সাধনে, একে* মৃত্যু পার হ'য়ে
অন্যে অমৃতত্ব লাভ হয় অশংসয়ে ॥১৪
হে সূর্য্য, হে পূষা † জ্যোতির্ম্ময়—
পাত্রে মুখ আবৃত সত্যের,—
তব মণ্ডলের মাঝে যাঁহার আলয়।
সত্য ধর্ম্ম জানিবার হইয়াছে বাসনা মনের,
মুক্তকর আবরণ তব মণ্ডলের ॥১৫

পূষা, একা ভ্রমণ তোমার ;
হে বিশ্বের সংযমিতা যম,
প্রজাপতি-সুত সূর্য্য,—স্বতেজঃ সংহর,
সংহর তোমার রশ্মি, সৌম্যমূর্ত্তি করিব দর্শন,
আমি (ও) সেই, যিনি তব অধিষ্ঠাতৃ জন ॥১৬

আজি মোর মরণের কালে,
বায়ু—প্রাণবায়ু হউক মিশ্রিত
ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বব্যাপ্ত প্রশান্ত অনিলে ;
এই দেহ, এই দেহ হউক রে ভস্মে পরিণত।
স্মর মন, স্মর কর্ম্ম, নিজ কর্ম্ম যত ॥১৭

অগ্নে, স্বকর্ম্ম জনিত ফল
ভুঞ্জিবারে সুপথ বাহিয়া
লও মোরে, তুমি, দেব, জানিছ সকল।
কুটিল কলুশরাশি মন হ'তে লও গো তুলিয়া
বারম্বার নমস্কার করিছি কাঁদিয়া
কুটিল কলুষরাশি মন হতে লও গো মুছিয়া ॥১৮

সমাপ্ত

শ্রীশশধর রায়।

* প্রকৃতি উপাসনায়।
† পোষণকারক।

সমাজ ও তাহার আদর্শ। (১১)

সুখদুঃখানুভূতির ক্রমবিকাশ,—কামমানসজ সুখ,—অহঙ্কারজ সুখ,—সাত্ত্বিক হ্লাদিনী শক্তি,—সৌন্দর্য্যানুভূতি,—শিল্প ও কলা বিদ্যা,—সৌন্দর্য্যের আদর্শ জ্ঞান,—অসৌন্দর্য্যানুভূতিজ দুঃখ দূর চেষ্টা,—আদর্শ লাভ চেষ্টা,—পূর্ণাদর্শ ভগবান।

৭৬। শরীররক্ষা ও পোষণের জন্য যে জীবের শারীরিক সুখদুঃখানুভূতির প্রয়োজন আছে, এবং মানুষ সমাজবদ্ধ হইয়া চেষ্টা করিয়া যে ক্রমে সেই শারীরিক সুখদুঃখের অতীত হইতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু এইখানে মানুষের সুখদুঃখানুভূতির শেষ হয় না। এখানে যদি মানুষের সুখ দুঃখানুভূতির শেষ হইত, তাহা হইলে মানুষ আর অগ্রসর হইতে পারিত না। তাহা হইলে মানুষে ও

ইতরজীবে বিশেষ প্রভেদ থাকিত না। তাহা হইলে মানুষের মনুষ্যত্বের আর বিকাশ হইত না—মানুষ ক্রমে অলস, অকর্ম্মণ্য, তামসিক প্রকৃতিযুক্ত হইয়া শেষে পশুত্বে পরিণত হইত। তামসিক মানুষ বড় জড়স্বভাব। কোন রূপে উদর পূর্ত্তি হইলে সে আর কিছু চাহে না। সে আলস্য, অতি নিদ্রা, বিহ্বলতা, দীর্ঘসূত্রতা, কর্ম্মবিমুখতা ভালবাসে। তবে কখন কখন ইন্দ্রিয়ের বা লোভাদি রিপুর উত্তেজনায় হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া কর্ম্ম করে। এমন বিচিকিৎস্য অলস লোকও থাকিতে পারে যে বিশ্রাম-সুখভঙ্গভয়ে দহ্যমান গৃহের পতনে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষার জন্য সামান্য পলায়ন-চেষ্টাও কষ্টকর মনে করে। কাজেই মানুষের সে প্রকৃতি আরও উন্নত না হইলে—মানুষের অনুরূপ সুখদুঃখানুভূতির বিকাশ না হইলে—সে আর অগ্রসর হইতে পারে না।

এজন্য মানুষ যখন ক্ষুধা তৃষ্ণা, শীত গ্রীষ্মাদি দুঃখ নিবারণ করিয়া অবসর পায়, তখন প্রকৃতি যদি তাহাকে ক্রমশঃ উন্নতির পথে লইয়া যাইতে চাহেন, তবে তাহার অনুরূপ সুখদুঃখানুভূতিশক্তির বিকাশ হয়। সে সুখদুঃখানুভূতি সাধারণতঃ মানসিক বা কাল্পনিক। ইহাকে আমরা সাধারণতঃ সূক্ষ্মশরীরজ সুখদুঃখও বলিতে পারি। বাহ্য-বিষয়ের সহিত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সম্পর্কজনিত যে অনুভূতি—আন্তর ইন্দ্রিয় মনের যে অনুভূতি—তাহার মধ্যে সাধারণতঃ কতকগুলি সুখজ, আর কতকগুলি দুঃখজ। আর এই সুখদুঃখানুভূতির মধ্যে কতকগুলি শারীরিক আর কতকগুলি মানসিক—বা কাল্পনিক। ইহার মধ্যে ইন্দ্রিয়জ বা কামমানসজ সুখ-দুঃখানুভূতিই প্রথম। এই ইন্দ্রিয়জ বা কাম-মানসজ সুখদুঃখ মধ্যে বংশ রক্ষা প্রয়োজন জন্য কামবৃত্তিজনিত সাধারণ সুখদুঃখবোধ—শারীরিক ক্ষুধা তৃষ্ণাদি বোধের ন্যায় মানুষের ও ইতর জীবের সাধারণ ধর্ম্ম। সাধারণ ভাবে ইন্দ্রিয়জ সুখদুঃখানুভূতি মানুষ ও ইতর জীবের সাধারণ ধর্ম্ম। শরীররক্ষার্থ চেষ্টা, আহার সংগ্রহ চেষ্টা, আচ্ছাদন বা আশ্রয় সংগ্রহ চেষ্টা, বংশ রক্ষার্থে সন্তান উৎপাদন চেষ্টা, জীবের সাধারণ ধর্ম্ম। কিন্তু বলিয়াছি ত ইতর জীবের সে চেষ্টায়, সে সুখদুঃখানুভূতির সীমা আছে। তাহাদের সে সুখদুঃখানুভূতি একই প্রকারের। তাহার কোন হ্রাস বৃদ্ধি নাই—তাহার ক্রমবিকাশ নাই।

১১। কিন্তু মানুষের সেই ইন্দ্রিয়জ বা কামমানসজ সুখদুঃখানুভূতিরও ক্রমবিকাশ আছে। মানুষের যত জ্ঞানের বিকাশ হইতে থাকে—যতই তাহার বাহ্যবিষয়ের সহিত সম্বন্ধের বিস্তার ও বৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই কল্পনা বশে মানুষেররসনার, সুখদুঃখবোধের,—স্পর্শেন্দ্রিয়ের সুখদুঃখবোধের ক্রমশ বৃদ্ধি হইতে থাকে। সে সুখদুঃখবোধের কতদূর বিস্তার হইতে পারে, এবং সেই কাল্পনিক সুখ লাভ করিবার চেষ্টা কতদূর বৃদ্ধি হইতে পারে, ও সেই কাল্পনিক সুখের অভাব কতদূর দুঃখকর বোধ হইতে পারে, তাহা আমরা অনেক সময় ধারণা করিতে পারি না। বলিয়াছি ত, মানুষের ক্ষুধা তৃষ্ণার জ্বালা অত্যন্ত অধিক—অনেক সময় সে জ্বালা অসহ্য। কিন্তু সে জ্বালা সহজে নিবারিত হইতে পারে। মানুষ সমাজবদ্ধ হইয়া চেষ্টা করিয়া—ক্রমে সে সুখদুঃখানুভূতির অতীত হইতে পারে। কিন্তু মানুষ অনেক

স্থলে সে ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবৃত্তি করিয়াও উদর পূরণ করিয়া সন্তুষ্ট থাকে না। যে 'বড় লোক' সে ত এই সাধারণ ক্ষুধা তৃষ্ণার জ্বালা জানে না। সে ক্ষুধা নিবারণ-জনিত সুখ কেমন, তাহাও বুঝি সে কখন জানে না। বরং সে অনেক স্থলে ক্ষুধা হয় না বলিয়া, অথবা অগ্নিমান্দ্য অজীর্ণ প্রভৃতি জন্য দুঃখ পায়। তখনও সে কাল্পনিক উপায়ে আহার-জনিত বা রসনা-তৃপ্তি-জনিত সুখ লাভের চেষ্টা করে। তাহার জন্য সে যে কত উপায় উদ্ভাবন করে,—কত উপাদেয় সুরুচিকর, সুমধুর খাদ্য দ্বারা রসনা তৃপ্তির চেষ্টা করে। সে চেষ্টা কতদূর তীব্র হইতে পারে—সেই কাল্পনিক সুখদুঃখবোধ কতদূর পর্য্যন্ত বিকাশিত হইতে পারে, তাহা আমরা অনেক স্থলে ধারণা করিতে পারি না। সে ইন্দ্রিয়ের ভোগসুখ-বাসনা কতদূর বলবতী হইতে পারে,তাহার তাড়না কতদূর বৃদ্ধি হইতে পারে—সে ভোগ-বাসনা যে কেন কিছুতেই নিবারণ করিতে পারা যায় না—যতই সে ইন্দ্রিয় সুখ উপভোগ করা যায়, ততই অগ্নিতে ইন্ধন সংযোগের ন্যায় কেন তাহা বর্দ্ধিত বেগে জ্বলিতে থাকে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। যে সামান্য শাকান্নে সন্তুষ্ট, সে আধুনিক পাশ্চাত্য ধনীর টেবিলে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত—ভূধর শিখর হইতে পাতাল বা সাগরতল পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন অনুসন্ধান করিয়া সংগৃহীত এত আহার্য্য কেন রাশীকৃত হয়, কেন একরূপ তামসিক আহ্লাদ বা বিহ্বলতা নাশের জন্য—উৎকট তৃষ্ণা নিবারণ জন্য, দেশদেশান্তর হইতে এত মূল্যবান বস্তু সংগৃহীত হয়, কেন সে ধনীর একবারের মাত্র ভোজনের জন্য কত কঠোর চেষ্টায়, কত দরিদ্রের অর্থ ও শক্তি শোষণ করিয়া সংগৃহীত অর্থ হইতে শত কি সহস্র মুদ্রা অকাতরে অপব্যয় করা হয়,—যে অর্থে সহস্র কি অযুত কাঙ্গালের উদারান্নের সংস্থান হইতে পারিত, তাহা বৃথা নষ্ট করা হয়—তাহা ধারণা করিতে পারে না। যে শীত গ্রীষ্ম, আতপ বর্ষা নিবারণের জন্য সামান্য আবাস যথেষ্ট মনে করে, যে সামান্য গুহা পর্ণকুটীর বা বৃক্ষাশ্রয় পাইলে সন্তুষ্ট হয়, সে কোটিপতির সহস্র প্রকোষ্ঠযুক্ত বিংশতিতল প্রাসাদের কি প্রয়োজন—কিরূপ আবাসের অভাব-জনিত কাল্পনিক দুঃখানুভূতির ক্রমবিকাশের ও সে দুঃখ দূর করিবার ক্রমবর্দ্ধিত চেষ্টা হইতে সেই ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর এত বড় প্রসাদে পরিণত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারে না। যে সামান্য পরিচ্ছদ আমাদের লজ্জা নিবারণ জন্য প্রয়োজন, সেই পরিচ্ছদে যে পরিতুষ্ট হয়, তাহাতে যাহার দুঃখ নিবারণ হয়, সে সেই পরিচ্ছদের পারিপাট্য জন্য—সে সম্বন্ধে বিলাসিতা বা অভিমান নিবৃত্তি করিবার জন্য মানুষ কেন অকাতরে এত অর্থ ব্যয় করে, কেন তাহার জন্য দেশদেশান্তর হইতে কত চেষ্টায় এত মূল্যবান দ্রব্য সংগ্রহ করে, কেন বা সুদূর তুষারাবৃত সাইবিরিয়া দেশ হইতে এরূপ কোমল মসৃণ লোম সংগ্রহ করে, কেন মরুময় তাপদগ্ধ আফ্রিকার দুর্গম সাহারা দেশ হইতে এত সুন্দর দ্রব্য আহরণ করে, কেন অগাধ জলধিতলে প্রবেশ করিয়া এত মণি মুক্তার অনুসন্ধান করে, অথবা গভীর খনির তিমির-গর্ভে প্রবেশ করিয়া কেন এত রত্ন উদ্ধার করে, তাহা বুঝিতে পারে না। যে স্বাভাবিক শারীরিক দুঃখ দূর করিয়াই তৃপ্ত হয়, সে,—মানুষের

শারীরিক ভোগলালসা, বিলাসিতা, ইন্দ্রিয়-সুখচেষ্টা কতদূর বিকাশিত হইতে পারে, কিরূপ অদম্য তেজে ক্রমবর্দ্ধিত বেগে মানুষকে সে সম্বন্ধে কাল্পনিক দুঃখ নিবারণ চেষ্টায় প্রবৃত্ত করিতে পারে, কিরূপে সেই বিলাসিতার উপকরণ সংগ্রহ করিবার চেষ্টায় মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করে—তাহাকে জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে অনেক সময় বাধ্য করে, কেন যে তাহার বিলাস-লালসা চরিতার্থ জন্য এত দাসদাসীর জীবন উৎসর্গ, এত অর্থের অপব্যয়, এত কর্ম্মশক্তির বৃথা ক্ষয় প্রয়োজন হয়, তাহা ধারণা করিতে পারে না।

৭৮। যাহা হউক, মানুষ যদি এই কামমানসজ সুখ বা ইন্দ্রিয়সুখলাভই একমাত্র পুরুষার্থ মনে করিত, তাহা হইলে আর তাহার অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইত না। এই জন্য মানুষের এমন এক অবস্থা আসে, যখন সে এই ইন্দ্রিয়জ সুখদুঃখভুমি পরিত্যাগ করিয়া অন্তরূপ সুখদুঃখ অনুভব করে—সেই অন্তরূপ দুঃখ দুর করিতে চেষ্টা করে—সেই অন্তরূপ দুঃখ দুর করিয়া সুখ লাভ করিতে প্রবৃত্ত হয়। এই সুখদুঃখানুভূতির মধ্যে আমাদের অহঙ্কারজ বা অভিমানজ সুখ-দুঃখানুভূতিই প্রথম। "আমি"কে অন্যের অপেক্ষা ক্ষুদ্র বা হীন বোধ করায় যে দুঃখ, ও সেই 'আমি'কে অন্যের অপেক্ষা বড় করিবার চেষ্টায় ও সে চেষ্টার সফলতায় যে সুখ, অন্যকে আমা অপেক্ষা ছোট করিয়া আমার বড় হইতে পারিলে যে সুখ—সে সুখদুঃখ এই অভিমানজ। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজবদ্ধ থাকা হেতু, মানুষে মানুষে নানারূপ সম্বন্ধ ঘটে, নানারূপে মানুষ মানুষের সংস্রবে আসে। এই সংস্রব হইতে মানুষ অভিমানবশে তৎসংসৃষ্ট অন্য অপেক্ষা বড় হইতে—বা বহুমান লাভ করিতে চেষ্টা করে। এবং সে অন্য অপেক্ষা বড় হইতে পারিলে সুখবোধ করে, এবং বড় হইতে না পারিলে বা ছোট হইয়া গেলে দুঃখ পায়। এই অভিমানজ সুখদুঃখানুভূতি সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়ভোগবৃত্তির সহিত প্রথমে বিকাশিত হইতে থাকে। প্রথমে মানুষ ইন্দ্রিয়সুখ-ভোগকেই তাহার পরম-পুরুষার্থ মনে করে। কাজেই অন্য অপেক্ষা সেই ইন্দ্রিয় সুখ-ভোগের অধিক ব্যবস্থা করিয়া, অন্য অপেক্ষা অধিক বিলাসিতার উপকরণ সংগ্রহ করিয়া, অন্য অপেক্ষা আপনাকে বড় ও অধিক সুখী মনে করে। ক্রমে অন্যরূপে মানুষের এই অভিমানবৃত্তির আরও বিকাশ হইতে থাকে। এই অভিমানবশে মানুষ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। যেখানে অভিমানবশে মানুষ মানুষকে প্রত্যাখ্যান করে, যেখানে মানুষ পর অপেক্ষা বড় হইতে চেষ্টা করে, পর হইতে গ্রহণ করিয়া, পর অপেক্ষা অধিক অর্থ সম্মান মর্য্যাদা সম্ভ্রম প্রভৃতি লাভ করিতে চেষ্টা করে, পরকে আপনার পথ হইতে সরাইয়া দিয়া আপনি অগ্রসর হইতে যায়, পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে, অথবা পরকে আপনার অনুগামী করিয়া লইতে চাহে, জোর করিয়া পরকে আপনার পথে আপনার অধিকারে বা অধীনতায় আনিতে চাহে, পরকে ছোট করিয়া আপনাকে বড় করিয়া পরকে আকর্ষণ করিয়া লইতে চাহে,—সেখানে মানুষ পরকে বড় দেখিয়া পরকে আপনার পথের অন্তরায় দেখিয়া, পরের দ্বারা আপনাকে পরাজিত বা অভিভূত হইতে দেখিয়া পরকে আপনার পথে বা আপনার অধিকার মধ্যে না আনিতে পারিয়া, পরের নিকট

যাহা চাহে, তাহা পায় না দেখিয়া,—দ্বেষ ঈর্ষা ক্রোধ হিংসা প্রভৃতি বৃত্তিবশে বা অপমান অনাদরজনিত দুঃখবশে কষ্ট পায়। সেখানে অর্থলিপ্সা, যশোলিপ্সা, পদলালসা প্রভৃতি নানারূপ মানসিক বা কাল্পনিক দুঃখ আসিয়া মানুষকে ক্লেশ দেয়। মানুষ সেই দুঃখ দূর করিবার জন্য,অন্য অপেক্ষা আপনাকে যথাসাধ্য বড় করিবার জন্য, অথবা অন্য "বড়"র সমকক্ষ হইবার জন্য, কিম্বা অর্থ যশঃ পদ প্রভৃতি লাভ করিবার জন্য—কর্ম্ম করে। কিন্তু সে যতই সেই সকল ইপ্সিত বিষয় লাভ করে, ততই তাহার তৃষ্ণা বৃদ্ধি হয়, ততই সে আরও অর্থ, আরও যশ, আরও পদ লাভ করিবার জন্য লালায়িত হয়। এই অভিমান বৃত্তির বিশেষ বিকাশাবস্থায় মানুষ ইন্দ্রিয়সুখভোগের কথাও ভুলিয়া যায়। যেখানে ধনলিপ্সা, পদলিপ্সা, যশোলিপ্সা প্রবল, সেখানে ইন্দ্রিয়ভোগসুখের কথা মনে থাকে না। কৃপণের ভোগবিলাসবাসনা থাকে না।

এই অহঙ্কারজ সুখদুঃখানুভূতি কতদূর বিকাশিত হইতে পারে, তাহা আমরা অনেকে ধারণা করিতে পারি না। যে সামান্য অর্থার্জ্জন দ্বারা গ্রাসাচ্ছাদনাদি সাধারণ অভাব দূর করিয়া সন্তুষ্ট হয়, পরিতৃপ্ত হয়, সে সুখদুঃখের অতীত হয়, সে লক্ষপতি-কোটীপতি না হইতে পারায় যে দুঃখ, কোটীপতির—বৃন্দপতি বা যক্ষের ন্যায় ধনশালী হইতে না পারায় যে দুঃখ ও সেই দুঃখ দূর করিবার জন্য যে উৎকট চেষ্টা, যে জীবন পর্য্যন্ত পণ—তাহা বুঝিতে পারে না। আর সেই জন্য সে, লক্ষপতি বা কোটীপতি যে সমস্ত জীবন কেমন করিয়া উৎসর্গ করে, ও সেই দুঃখবোধের দ্বারা, সে তাহার অন্তরূপ বা উচ্চতর দুঃখবোধ কেমন করিয়া বিস্মৃত হয়, তাহা বুঝিতে পারে না। যে সামান্য অধিকারে সন্তুষ্ট,—সে জিগীষাবৃত্তির তীব্রতা, সেকন্দর বাদ্‌সাহের সমস্ত জ্ঞাত পৃথিবী জয়ের পর, জয়ের জন্য আর পৃথিবী নাই বলিয়া যে উৎকট দুঃখানুভূতি, তাহা ধারণা করিতে পারে না। অথবা আরাঞ্জীব প্রভৃতি বাদসাহগণ—পিতা ভ্রাতা প্রভৃতি নিতান্ত আত্মীয়গণকে নৃশংসরূপে হত্যা করিয়া রক্তের নদী বহাইয়া—কেন সিংহাসনের পথ পরিষ্কার করিত,—সামান্য রাজাধিকার লাভের জন্য পুত্রত্ব,ভ্রাতৃত্ব, মনুষ্যত্ব সব ভুলিয়া কেন ভীষণ রাক্ষসে পরিণত হইত, তাহা সে বুঝিতে পারে না। যাহা হউক, আমাদের অহঙ্কার বৃত্তির বা অহঙ্কারবৃত্তিচরিতার্থতাজনিত সুখভোগেচ্ছার এইরূপ অতি বিকট বিকৃত বীভৎস বিকাশের কথা এস্থলে আর উল্লেখের প্রয়োজন নাই। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, সাধারণতঃ মানুষের এই অহঙ্কারবৃত্তির শক্তি বড় অধিক। যে সকল লোক এইরূপে অহঙ্কারপরিচালিত হইয়া দুঃখ পায়, ও সেই দুঃখ দূর করিবার জন্যই কেবল ব্যস্ত থাকে, তাহারা আর অন্যরূপ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না।

১৯। কিন্তু বলিযাছিত, আমাদের সুখদুঃখানুভূতির ক্রমবিকাশ হইতে থাকে। আমাদের মনুষ্যত্বের যত বিকাশ হইতে থাকে, ততই আমাদের শারীরিক সুখদুঃখানুভূতি হইতে ইন্দ্রিয়জ সুখদুঃখানুভূতির ও ইন্দ্রিয়জ সুখ দুঃখানুভূতি হইতে অহঙ্কারজ সুখদুঃখানুভূতির ক্রমবিকাশ হয়। এই বিভিন্ন সুখদুঃখানুভূতি—অবস্থা ভেদে বিভিন্ন। মানুষের প্রকৃতি বা স্বভাব বিভিন্ন। কোন মানুষ সাত্ত্বিক, কোন মানুষ রাজসিক,

কোন মানুষ বা তামসিক প্রকৃতিসম্পন্ন।(১) এই প্রকৃতির প্রভেদ অনুসারে মানুষের সুখদুঃখানুভূতিও বিভিন্ন হয়। সাধারণতঃ শারীরিক ও ইন্দ্রিয়জ সুখদুঃখানুভূতি তামসিক। আর অহঙ্কারজ সুখদুঃখানুভূতি রাজসিক। তবে মানুষের প্রকৃতি ভেদে এই শারীরিক ও ইন্দ্রিয়জ সুখও সাত্বিক হইতে পারে—রাজসিক অহঙ্কারজ সুখও সাত্বিক হইতে পারে। (২) আহার দ্বারা ক্ষুধা নিবারণ হইলে যে সুখ হয়, সেই আহার স্নিগ্ধ হৃদ্য 'আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্য-সুখপ্রীতিবর্দ্ধক' হইলে সে সুখ কতকটা সাত্বিক। দুঃখশোকাময়প্রদ রাজসিক-আহারে যে সুখ, তাহা রাজসিক, আর বিরস দুর্গন্ধ পর্য্যুষিত উচ্ছিষ্ট আহারের সুখ তামসিক। পুণ্যগন্ধ, পুণ্যস্পর্শ, পুণ্যরস ভোগজনিত সুখ সাত্বিক, দুর্গন্ধ কঠিনস্পর্শ বিকৃতরস ভোগজনিত তামসিক লোকের সুখ তামসিক। জাতিরক্ষার জন্য সন্তান উৎপাদনার্থ—কেবল "প্রজায়ৈ গৃহমেধি" হইয়া বৈধধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কামচরিতার্থতাজনিত যে সুখ, তাহা সাত্বিক, আর অবৈধ ইন্দ্রিয়চরিতার্থতাজনিত সুখ, রাজসিক বা তামসিক। ক্রোধ প্রবৃত্তিও অনেক সময় শুভ বা সাত্বিক হইতে পারে, তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আমাদের পুরাণাদি ধর্ম্মগ্রন্থে পাওয়া যায়। এইরূপে আমাদের অর্থোর্জ্জন প্রবৃত্তি রাজসিক হইলেও, বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে নিজের দারিদ্র্য বা গ্রাসাচ্ছাদনের একান্ত অভাব ও পরিবার ও আত্মীয়গণের সেই অভাব দূর করিবার জন্য, যজ্ঞার্থ বা পরার্থ কর্ম্ম জন্য যে অর্থের প্রয়োজন, তাহার অভাব দূর করিবার জন্য,—বৈধ ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ উপায়ে অর্থার্জ্জন চেষ্টা কতকটা সাত্বিক। বলিয়াছি ত, আমাদের অন্নাভাব বড় অভাব, অন্ন হইতে আমাদের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হয়, অন্ন আমাদের প্রাণ ও শরীর পোষণ করে—তাই জীবে অন্নদান বড় অধর্ম্ম। অন্নাভাব দূর করিতে না পারিলে, সাধারণ শারীরিক দুঃখ দূর করিতে না পারিলে—মানুষ আর উন্নত হইতে পারে না—মনুষ্যত্ব বিকাশের পথে আর অগ্রসর হইতে পারে না। এ কারণ নিজের ও পরের সে অভাব দূর করিবার জন্য বৈধ উপায়ে

(১) মানুষের এই বিভিন্ন প্রকৃতির কথা, আমাদের শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। এই বিভিন্ন প্রকৃতির অনুসারে কোন মানুষ দৈবী প্রকৃতি সম্পন্ন, কেহ বা রাক্ষস বা আসুরী প্রকৃতি সম্পন্ন হয়। গুণানুসারে প্রকৃতিভেদের কথা আমাদের শাস্ত্র হইতে জর্ম্মাণ-পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ সপেনহর উল্লেখ করিয়াছেন। যথা,—

"We may theoretically assume three extremes of human life and treat them as its elements viz :—(1) The powerful passion,—*Raja guna.* It appears in great historical characters and in the little world. (2) Pure knowing, the comprehension of the Ideas—conditioned by the freeing of knowledge from the service of the will—the life of genius,—*Satwa guna* (3) The greatest lethargy of the will and of knowledge attaching to it, empty longing, life benumbing' langour,– *Tama guna.* The life of the individual is seldom fixed in one of these extremes, but is a wavering approach to one or the other. The life of the great majority of men is dull meaningless, unenlightened. They are like clockwork,—which is wound up and goes, it knows not way."

Schopenheaur's—World as Will and Idea,—Sec. 58,

(২) সুখদুঃখ সাধারণতঃ সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে ত্রিবিধ। কিন্তু তাহারও অন্তর্বিভাগ হইতে পারে। তামসিক সুখদুঃখকে—তামসিক-তামসিক, তামসিক-রাজসিক ও তামসিক-সাত্বিক এইরূপে;—রাজসিক সুখদুঃখকে—রাজসিক-তামসিক, রাজসিক-রাজসিক ও রাজসিক-সাত্বিক এইরূপে;—ও সাত্বিক সুখদুঃখকে সাত্বিক-তামসিক, সাত্বিক-রাজসিক, ও সাত্বিক-সাত্বিক এইরূপে বিভাগ করা যাইতে পারে। গীতায় ত্রিগুণ-ভেদে ত্রিবিধ সুখের কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

অর্থার্জ্জন গ্রাসাচ্ছাদন অর্জ্জন ও অন্য কর্ম্ম চেষ্টা রাজসিক হইলেও কতকটা সাত্ত্বিক। আর কেবল আপনার শারীরিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য চৌর্য্য দস্যুতা শঠতা বঞ্চনা দ্বারা অর্থার্জ্জন চেষ্টা ও সে অর্থার্জ্জনজনিত সুখ তামসিক। এইরূপ অভিমানজ সুখও অবস্থাভেদে বিভিন্ন হইতে পারে। বিশেষরূপে কর্ম্মী জ্ঞানী বিদ্বান্ বা ধার্ম্মিক হইয়া সম্মান-লাভেচ্ছা-চরিতার্থতাজনিত এই রাজসিক অভিমানজ সুখ কতকটা সাত্ত্বিক। আমাদের আদর্শ অনুযায়ী মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া বা ধার্ম্মিক হইয়া আত্মতৃপ্তিজনিত যে সুখ বা সৎকর্ম্ম করিয়া কি ধর্ম্মাচরণ করিয়া পরকালে সুখলাভাশাজনিত যে সুখ —তাহা সাত্ত্বিক। এইরূপে মানুষের প্রকৃতি অনুসারে তাহার শারীরিক ইন্দ্রিয়জ বা অহঙ্কারজ সুখদুঃখের তারতম্য হইয়া থাকে। এই সকল ইন্দ্রিয়জ ভোগসুখ ও অহংকারচরিতার্থতাজনিত সুখ লাভের চেষ্টা আমাদের তামসিক রাজসিক প্রকৃতিজ বাসনাজনিত। যতদিন আমাদের প্রকৃতির আরও উন্নতি না হয়, ততদিন আমাদের এই ভোগবাসনা নিবৃত্তি হয় না। যতদিন মানুষ সাত্ত্বিকতা লাভ করিতে না পারে, ততদিন মানুষ অহঙ্কার গণ্ডীর সীমা অতিক্রম করিতে পারে না।

৮০। যাহা হউক, এই ভোগসুখেচ্ছার বা বাসনার মূল কি, আমরা এস্থলে তাহা সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিব। বলিয়াছি ত, মানুষ শুধু জ্ঞাতা নহে, শুধু জ্ঞাতা ও কর্ত্তা নহে। মানুষ ভোক্তাও বটে। মানুষ জ্ঞাতা, কর্ত্তা ও ভোক্তা। মানুষের জ্ঞানবৃত্তি আছে, কর্ম্মবৃত্তি বা ইচ্ছাবৃত্তি আছে, মানুষের সুখভোগবৃত্তি আছে। মানুষে জ্ঞানশক্তি, কর্ম্মশক্তি ও ভোগশক্তি আছে। মানুষের এই ভোগ শক্তির মূলে তাহার হ্লাদিনীশক্তি—তাহার চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তি। মানুষ এই জন্য দুঃখনিবৃত্তি যথেষ্ট মনে করে না—মানুষ দুঃখনিবৃত্তির পরে সুখভোগ করিতে চাহে। তাই শুধু ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তিই মানুষের পরম পুরুষার্থ নহে। মানুষ দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তি করিয়া পরে আনন্দ ভোগ করিতে চাহে,—আনন্দময়ত্ব লাভ করিতে চাহে। মানুষ মূলতঃ এই আনন্দস্বরূপ বলিয়া তাহার জ্ঞান বিকাশ হইবার প্রথম হইতেই সে সুখ লাভের জন্য এত লালায়িত হয়—সেই আনন্দময়ত্ব লাভের জন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। মানুষ কোন অবস্থাতেই দুঃখ দূর করা—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক দুঃখ দূর করা যথেষ্ট মনে করে না। তবে যেখানে মানুষ দুঃখ দূর করিতে অসমর্থ, দুঃখের ভারে নিষ্পেষিত, সেখানে স্বতন্ত্র কথা। বলিয়াছি ত, এই দুঃখ মধ্যে শারীরিক দুঃখই প্রধান। শারীরিক দুঃখ কোনরূপে নিবৃত্তি করিতে পারিলেই মানুষ সুখ লাভ চেষ্টায় কর্ম্মে রত হয়। তখন মানুষ আনন্দ অন্বেষণ করে। প্রথম অবস্থায় মানুষের এই আনন্দবৃত্তি তামসিকসুখমূলক। তামসিক আনন্দবৃত্তিবশে মানুষ ইন্দ্রিয়জ ও কামজসুখভোগ করিতে প্রবৃত্ত হয়। রাজসিক আনন্দবৃত্তিবশে মানুষ অহঙ্কারবৃত্তিচরিতার্থতাই সুখলাভের প্রধান উপায়—তাহাই পরম পুরুষার্থ মনে করে। মানুষের মন বড় অস্থির। মানুষ নিতান্ত অলস বা জড়স্বভাব না হইলে, স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। তাহার চঞ্চল মন সহজে তৃপ্তি বা শান্তি চাহে না—তাহা দুঃখকর বা অবসাদজনক মনে করে। মানুষ

সুখ চাহে—সুখের ভাবনা চাহে, সুখলাভের জন্য অস্থিরতা বা নিয়ত কর্ম্মচেষ্টা চাহে। তাই মানুষ কাল্পনিক দুঃখ সৃষ্টি করিয়াও সে দুঃখ নিবারণ-জনিত সুখভোগ করিতে প্রবৃত্ত হয়। এই শ্রেণীর সুখভোগের জন্য মানুষ মাদকসেবনজনিত অস্থিরতা, বিহ্বলতা বা উন্মত্ততাও শ্রেয়ঃ মনে করে। এইরূপ সুখ লাভের জন্য মানুষ নানারূপ ক্রীড়া-কৌতুক, রঙ্গরস, হাসিতামাসা প্রভৃতি সৃষ্টি করে। এই তামসিক-রাজসিক-আনন্দ বৃত্তিবশে মানুষ ক্ষুধাতৃষ্ণাদি-জনিত শারীরিক দুঃখ দূর করা—সাধারণ ভাবে শারীরিক সুখদুঃখের অতীত হওয়া যথেষ্ট মনে করে না। এজন্য মানুষ রসনাতৃপ্তিজনিত সুখলাভের জন্য নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করে। এই তামসিক-রাজসিক আনন্দবৃত্তি বশে মানুষ উপযুক্ত বস্ত্রাদির সাহায্যে শীতাতপ-জনিত দুঃখ দূর করিয়া, বা শীত গ্রীষ্মদ্বন্দ্বভাবজনিত দুঃখের অতীত হইয়াও কত মূল্যবান বা চিত্তরঞ্জক পরিচ্ছদ লাভের জন্য লালায়িত হয়। এই তামসিক-রাজসিক ভোগ সুখ প্রবৃত্তিবশে মানুষ সামান্য আবাস গৃহ দ্বারা তাহার গ্রীষ্ম বর্ষা নিবারণ কারণ আশ্রয়ের-প্রয়োজন-সিদ্ধ হইলেও মনোহর হর্ম্ম্য প্রস্তুত করত তাহাতে আবাস-জনিত আনন্দ ভোগের জন্য লালায়িত হয়। এই তামসিক-রাজসিক ভোগ সুখ প্রবৃত্তি বশে মানুষ তাহার ভোগ্য বস্তুকে শুধু তাহার ভোগের উপযোগী করিয়া—ব্যবহারের উপযোগী করিয়া সন্তুষ্ট হয় না। সে তাহাকে সুন্দর করিতে চাহে —সুন্দর দেখিতে চাহে,—তাহার সৌন্দর্য্যের যতদূর ধারণা হইয়াছে, সেই ধারণা অনুসুন্দর করিতে চাহে। তাই এই সৌন্দর্য্যানুভূতির তামসিক ও রাজসিক ভাবের সহিত আমাদের ইন্দ্রিয়জ সুখচেষ্টার সম্মিলনে—আমাদের বিভিন্ন ভোগ্য বিষয়কে বা উপকরণকে সুন্দর করিবার চেষ্টায় —নানারূপ শিল্পবিদ্যার বিকাশ হইয়াছে, —আমাদের সুখপ্রদ প্রেয়ঃ বিষয়ের ক্রমোন্নতি হইয়াছে। যাহাতে আমাদের প্রয়োজন, তাহাকে সুন্দর করিবার চেষ্টায়, ব্যবহারের সহিত 'বাহারে'র, অথবা the useful এর সহিত the ornamental এর সম্মিলন চেষ্টায়—বিভিন্ন শিল্পবিদ্যার ক্রমোন্নতি হইয়াছে। সেই চেষ্টার ফলেই সামান্য পর্ণকুটীর—সুবৃহৎ মনোহর অট্টালিকায়, বা অদ্ভুত কারুকার্য্য-শোভিত তাজমহলে পরিণত হইয়াছে—, সামান্য ভেলা বা নৌকা, বৃহৎ কোটী মুদ্রা মূল্যের অর্ণবযানে পরিণত হইয়াছে,—সামান্য যান কলের গাড়ীতে (motor car এ) বা রেলগাড়ীতে পরিণত হইয়াছে। সেই চেষ্টা ফলেই আমাদের বসন ভূষণ তৈজস ও শয্যা প্রভৃতি প্রত্যেক ব্যবহার্য্য দ্রব্যকে শিল্পী যথাসাধ্য সুন্দর করিয়া প্রস্তুত করিতে গিয়া তাহার শিল্পের আশ্চর্য্য উন্নতি করিয়াছে।

অতএব ভোক্তা মানুষ—আনন্দস্বভাব মানুষ শুধু সাধারণ দুঃখ দূর করাই যথেষ্ট মনে করে না। দুঃখ দূর করিয়া যে সামান্য ক্ষণিক সুখ পায়—তাহা সে যথেষ্ট মনে করে না। প্রকৃতি তাহাকে শারীরিক দুঃখনিবারণজনিত যে সামান্য সুখ পুরস্কার দিয়া তাহাকে সুখের পথ দেখাইয়া দেন, তাহা হইতেই তাহাকে তাহার আনন্দ স্বরূপের কিঞ্চিৎ আস্বাদ দেন, তাহার ভোক্তৃত্ববৃত্তির বিকাশ করিয়া দেন। সেই সুখের—সেই আনন্দের ক্রমবিকাশ জন্য,

সেই আনন্দের আরও বৃদ্ধি করিবার জন্য, সেই সুখ ও আনন্দ আরও স্থায়ী করিবার জন্য মানুষ চেষ্টা করে। এইরূপে মানুষের হ্লাদিনী শক্তির ক্রমবিকাশ হইতে থাকে। মানুষের প্রথম বিকাশের অবস্থায় তাহার ইন্দ্রিয়জ সুখভোগ চেষ্টার, কামমানসজ সুখভোগ চেষ্টার ... চেষ্টার মূলে যে মহাতত্ত্ব নিহিত আছে, মানুষের আনন্দময়ত্বের ক্রমবিকাশের পথ যে নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা আমরা সহজে বুঝিতে পারি না। ক্রমশঃ

শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু।

চণ্ডীদাস।

কবিত্ব।

নিত্যপরিবর্ত্তনশীলা চির-রহস্যাবগুণ্ঠিতা প্রকৃতির সুগভীর যবনিকাভ্যন্তরে নিমজ্জিত হইয়া, মানব যখন তাহার প্রবহমানা আনন্দধারা আপন হৃদয়ে অনুভব করিতে পারে, তখন প্রকৃতির ভাষা ব্যক্ত করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষায় সহজেই সে উৎকণ্ঠিত হয়। তাহার হৃদয়ের শিরায় শিরায়, প্রতি রোম কূপে সেই সৌম্য সৌন্দর্য্য যতই অভিসিঞ্চিত হয়, ততই প্রকাশ করিবার জন্য তাহার ব্যগ্রতা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। প্রকৃতি-দীপ্ত হৃদয়কে জগতে বিকশিত করিয়া তুলাই তাহার একমাত্র বাসনা হয়। এই আকাঙ্ক্ষা, বাসনার ফলেই সাহিত্যের (কাব্যও ইহার মধ্যে) সৃষ্টি। এই জন্যই কাব্যের বা সাহিত্যের আদি অন্ত মধ্য কেবলই মধুর, কেবলই আনন্দ। যে কাব্যে আনন্দের যত স্ফূর্ত্তি,—সে কাব্যও তত উন্নত, তত গভীর।

কণ্ঠস্বর সুমোহন হইলেও শ্রবণেন্দ্রিয় ও মানব তৃপ্তির নিমিত্ত বাক্য সংযোগ প্রয়োজনীয়। এইরূপ বাক্য সংযোগে ও বিভিন্ন প্রকারে বাক্যবিন্যাসের চতুরতায় গীতেরও কমনীয়তা সংশোধিত হয়; গীতের পূর্ণতা প্রাপ্তির ইহাই প্রধান উপায়। গীত কেহ বা রচনা করেন, কেহ বা গান করেন। যিনি রচনা করিবেন, তিনিই যে গায়ক হইবেন, তাহার কোন কারণ নাই,—সুকবি মাত্রেই সুগায়ক নহে। এইরূপে গীতি কাব্যের উৎপত্তি।

সঙ্গীতেই জাতীয় চরিত্রের পূর্ণ বিকাশ। প্রাণের কথা, অন্তরের ব্যথা গান ভিন্ন আর কিছুতেই সুস্পষ্টরূপে পরিব্যক্ত হয় না। তাই আমাদের বেদে গান, পুরাণে গান, মহাম্মদীয় কোরাণে গান, খ্রীষ্টীয় বাইবেলে গান, তাই জয়দেবে গান, চণ্ডীদাসে গান, তুলসীদাসে গান, রামায়ণে গান। প্রকৃতির প্রেমের কাহিনী প্রকৃতির প্রিয় শিষ্য গায়। তাই বুঝি পাপিয়ায় গান গায়, মলয় সমীরণে প্রকৃতির প্রশান্ত গম্ভীর সঙ্গীত প্রবাহমান। তাই বুঝি, ইন্দ্রের অমরাবতীতে গান, কমলাপতির বৈকুণ্ঠে গান, ভোলানাথের কৈলাস শিখরে বিল্বমূলে সঙ্গীতের মোহন তান ধ্বনিত হয়। সঙ্গীত বিষাদে সান্ত্বনা, বিরহে মিলন, শরতে জ্যোৎস্না, নিদাঘে সন্ধ্যা, অন্ধকারে আলোক।

মনকে লইয়া সুখ দুঃখ এবং সুখ দুঃখ লইয়াই সংসার। মনে সঙ্গীতের উৎপত্তি এবং সুখ দুঃখে তাহার পরিণতি মানব

জীবনের এই সাধারণ গন্তব্য পথে, প্রবল দুর্ব্বলের এই সমানাধিকারে, বঙ্গীয় কবি নিঃসঙ্কোচে প্রাণের সঙ্গীত গাহিয়াছেন। প্রকৃতি অতুলনীয়া সৌন্দর্য্যে বিভূষিতা, ভাষা চিরাশ্রিতা দাসী, দুঃখ দুর্দ্দিনেরও অভাব নাই এবং প্রাণের কপাটও কেহ অর্গল-বদ্ধ করিতে পারে নাই। কাজেই গীতি কাব্যের সাধারণ নিয়মে প্রস্ফুটিত হইবার পক্ষে কোন অন্তরায় নাই।

সুখ দুঃখ লইয়া সংসার হইলেও, সুখই জীবনের প্রধান লক্ষ্য। এই সুখের দিকেই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, নিরন্তর প্রধাবিত। সকলেরই উদ্দেশ্য, সুখের অধিকারী হওয়া। যিনি নিষ্কাম যোগী,—সংসারের সকল কোলাহল হইতে নিজকে স্বতন্ত্র করিয়াছেন, তাঁহারও উদ্দেশ্য সুখ, কারণ চরম কালের পরম গতি—সাযুজ্য বা মোক্ষ সুখেরই প্রকার ভেদ মাত্র। কিন্তু এই সুখ সকল সময়ে পাওয়া যায় না, মন নিত্য নূতন সুখের জন্য লালায়িত। সুখ ভিন্ন আর কিছুতেই মনের আসক্তি বা স্থিতি নাই। এই সুখের পদার্থ কোথায় পাওয়া যায়? —সৌন্দর্য্যের রাজ্যে। সৌন্দর্য্যের প্রতিপদে মনের গতি, তাহার অণুতে অণুতে মন মিশিয়া তাহাতেই বিলীন হইয়া যায়; এইজন্য সৌন্দর্য্যেই মনের পূর্ণ আধিপত্য। এই আধিপত্যই তাহার মুক্তি, স্বাধীনতা এবং সুখের শেষ সীমা।

সুখ সকলের উদ্দেশ্য হইলেও এ মলিন জগতে সুখ কতটুক্? বিশেষতঃ বঙ্গভাগ্যে দুঃখের হিসাবে সুখ ক্ষণস্থায়ী বিদ্যুৎপ্রভা তুল্য। কাজেই দুঃখের গান অধিক—অনন্ত প্রায়। এ হেন দুঃখ দারিদ্র্যেও যদি বাঙ্গালী জাতি দুঃখের গান না গায়, তবে কোন্ জাতি গাহিবে? অধীনতা, উৎপীড়ন, অবিচারে যে জাতির জাতীয় চরিত্র সংগঠিত, সে জাতির অসীম দুর্ভর জীবনের বিরাম বিস্মৃতি গীতি কাব্যে। শোকাকুল দুর্ব্বল হৃদয়, কাঁদিয়া হৃদয়ভার লাঘব করে এবং লাঘবের জন্যই গীতিকাব্য রচিত হয়। দুঃখে পড়িয়া যে কাঁদে না, সে হয় কাঁদিতে চায় না, না হয় কাঁদিতে জানে না। ক্রন্দনে দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইলেও উচ্চতার দিকে লক্ষ্য থাকে। চণ্ডীদাসের রাধিকা কৃষ্ণ-বিরহে আত্মহারা হইয়া গরল 'ভখিয়া' আত্ম বিসর্জ্জন দিতে উদ্যতা। হস্তে বিষপাত্র, মুখে আর দিতে পারিতেছেন না, বুঝি বা আবার দেখা হইবে! যাহার জন্য অনেক সাধনা করিয়াছেন, বুঝি বা সেই কালিয়া সোণাকে আবার আমার করিয়া বক্ষে ধরিতে পাইবেন।

এইজন্য আমরা সঙ্গীত শ্রবণ করিতে ভালবাসি, এই জন্য আমরা সঙ্গীত শ্রবণে তৃপ্ত হই। কারুণ্য, নৈরাশ্য, অলসতা, উন্মত্ততা, কাতরতা, এক সঙ্গে গীতিকাব্যে ফুটিয়া উঠে। দুঃখের জীবনে দুঃখের দিনে দুঃখ প্রকাশ করিতে গীতের জন্ম। দুঃখের সুদীর্ঘ সহবাসে উহার প্রতিকূলতা আত্মীয় স্বজনের নিগ্রহবৎ হইয়া উঠিয়াছে। ইহাই অনন্ত পতনের সূত্রপাত। যে পতনে পতনের জ্ঞান থাকে না, সে পতন হইতে উত্থানের আর আশা কোথায়? উদ্ধারের আশা রাখিতে হইলে পতনের স্বরূপ বুঝিতে হইবে, —ইহার অভিব্যক্তি গীতি কাব্যে। গীতিকাব্য নিরাশার আশা। গীতে প্রাণে সাড়া পাই বলিয়া, প্রাণ অনুভব করি বলিয়া, তাহা এত আদরণীয়। সঙ্গীত শ্রবণে পিঞ্জরাবদ্ধ সংকীর্ণতা ভুলিয়া বিমুক্ত বায়ু সেবনে পরিতৃপ্ত হই। রাধিকা শ্যামের মোহন বংশীরবে কুলের মানা, ধরম, করম সব ভুলিয়া কৃষ্ণেরই অনুরাগিণী হইলেন। আত্মীয় স্বজন তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন যে, তোমার জন্য আমাদের নির্ম্মল কুলে কলঙ্ক অর্শিল, অতএব তুমি যদি নিজ মঙ্গল কামনা কর, তবে আর কৃষ্ণের মুখও দর্শন করিও না। বিরহিনী রাধিকা সংকীর্ণতা ভুলিয়া গাহিলেন,—

কাহারে কহিব, মনের মরম, কেবা যাবে পরতীত?
হিয়ার মাঝারে, মরম বেদনা, সদাই চমকে চিত।
গুরুজন আগে, দাঁড়াইতে নারি, সদা ছল ছল আঁখি।
পুলকে আকুল, দিক নেহারিতে, সব শ্যামময় দেখি।
সখির সহিতে, জলেরে যাইতে, সে কথা কহিবার নয়।
যমুনার জল, করে ঝলমল, তাহে কি পরাণ রয়?

কুলের ধরম, রাখিতে নারিনু, কহিলাম সবার আগে।
কহে চণ্ডীদাস, শ্যাম সুনাগর, সদাই হিয়ায় জাগে।

কেবল অধীনতা-জনিত বিলাপ-ধ্বনিতেই গীতিকাব্য পূর্ণ নহে। গীতি কাব্য প্রেমময়। মূলে আত্মপ্রেম না থাকিলে অধঃপতনে বিকার উপস্থিত হইবে কেন? এই আত্ম প্রেমের চরম অবস্থা আত্মদান। কৃষ্ণপ্রেম এই জন্যই গীতি কাব্যের অবলম্বন। রাধিকার কৃষ্ণপ্রেম প্রেমের উচ্চ সীমা। কৃষ্ণের অনাদরে রাধিকার মান হইয়াছে। কিন্তু মান করিবার তাঁহার সাধ্য নাই। ইন্দ্রিয় আদি মুগ্ধ, মান করিবেন কেমনে?

যত নিবারিরে তায় নিবার না যায়।
আন পথে ধাই কানু পানে চায়।
এছার রসনা মোর হইল কি বাম।
যাঁর নাম নাহি লব লয় তাঁর নাম।
এছার নাসিকা মুঞি কত করু বন্ধ।
তবু ত দারুণ নাসা পায় শ্যাম গন্ধ॥
সে কথা না শুনিব করি অনুমান।
পর সঙ্গ শুনিতে আপনি যায় কাণ॥
ধিক রহুঁ এছারই প্রিয় আদি সব।
সদায় সে কালিয়া কানু হয় অনুভব॥

ইহাই প্রেমের পরাকাষ্ঠা—অপূর্ব্ব তন্ময়ত্ব।

রাধাকৃষ্ণ প্রেম অপেক্ষা প্রেমের উচ্চাবস্থা আর কিছু কল্পনার নিরঙ্কুশ পথে পতিত হয় কি? যে ভালবাসার—আদরের—যত্নের ধন, সে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের রাজা। এমন আদর্শ প্রণয়ী ও প্রণয়িনীকে যিনি প্রকৃতির ক্ষুদ্রাংশ ভাবে দেখেন, তিনি প্রেমের মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম। কয়জন দেখিতে পান যে, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড প্রেমিক প্রেমিকার অনুরাগে অনুরঞ্জিত। প্রেমিকাকে জগন্ময়ভাবে কয়জন ভাবিতে পারেন? এই তন্ময়ত্বই বিশ্ববিস্মৃতি প্রেমের পূর্ণ ফটো। নিখুঁৎ প্রেমে ব্যভিচার নাই। সকলে অক্লেশে তাহা লাভ করিতে পারে না, কিন্তু কোন প্রকারে একবার আয়ত্ত করিতে পারিলে শত জন্মেও তাহা ছাড়িতে পারা যায় না। রাধিকার বহু বর্ষব্যাপী বিরহে তাহার আভাষ।

কবিত্বই সর্ব্ব সৌন্দর্য্যের নিদান; সুন্দরের সৌন্দর্য্য কবিত্বেরই অংশ। সৌন্দর্য্যসংসারে কবিত্বই অদ্বিতীয় নিয়ন্তা। এই সৌন্দর্য্য ভাব দুই প্রকার,—বস্তুগত সৌন্দর্য্য ও অবস্থাগত সৌন্দর্য্য। একটী প্রস্ফুটিত গোলাপের সৌরভে আমাদের প্রাণ পুলকিত হয়, মন প্রফুল্ল হয় এবং নরকের পূতিগন্ধময় দৃশ্যে সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত হয়, মন তাহা হইতে দূরে পলায়ন করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু সেই গোলাপের সৌন্দর্য্য, যাহার সুরভিটুকু আমাদিগকে মাতাইয়া তোলে,—সেই সুগন্ধে হয়ত একটী নরকের কীট সঙ্কুচিত হইবে, নরকের দুর্গন্ধই তাহার অপার আনন্দ উৎপত্তির কারণ হইবে। এখানে গোলাপ মনুষ্যের পক্ষে সুন্দর কিন্তু নরকের কীটের পক্ষে অসুন্দর। কাজেই বস্তুর গুণের সহিত জীবের ইন্দ্রিয়গত সম্বন্ধেই বস্তুগত সৌন্দর্য্যের উদ্ভব। এবং যে বস্তু আমরা কখনো পূর্ব্বে দেখি নাই, তাহা সুন্দরই হউক বা অসুন্দরই হউক, তাহা দেখিবার জন্য মন উৎকণ্ঠিত হয় এবং দেখিয়া তৃপ্তি লাভ করে। এই তৃপ্তিই সুখ, এই নূতনত্ব অবস্থাগত সৌন্দর্য্য। অবস্থাগত সৌন্দর্য্যের ভাব প্রধানতঃ নয়টী:—সাদৃশ, নূতনত্ব, কল্পনা, ন্যায় সমাবেশ, বহু সমাবেশ, গূঢ়ানুসন্ধান, পূর্ণতা, স্মৃতি-উদ্দীপনা এবং সমবেদনা-উদ্দীপনা।

গীতিকাব্যে কাল্পনিক সৌন্দর্য্য, তাহা তিন প্রকার, সাধারণ, অসাধারণ ও অসম্ভব। প্রকৃতির অনন্ত বিভবে যাহা সচরাচর আমরা দেখিতে পাই, অথবা কবির রচনা-চাতুর্য্যে যাহা নিত্য নূতন বলিয়া প্রতিভাত হয়, তাহাই সাধারণ সৌন্দর্য্য। রাধিকার সেই বিরহ-খেদ,—

শুন হে চিকণ কালা!
বলিব কি আর, চরণে তোমার, অবলার যত জ্বালা।
যদি কোন ছলে, তব কাছে এলে, লোকে করে অপযশ।
বদন থাকিতে, না পারি বলিতে, তেঞি সে অবলা নাম।
নয়ন থাকিতে, সদা দরশন, না পেলাম নবীন শ্যাম॥
অবলার যত দুঃখ, প্রাণনাথ, সব থাকে মনে মনে।
চণ্ডীদাস কয়, রসিক যে হয়, সেই সে বেদনা জানে॥

সাধারণ সৌন্দর্য্য। কি অপূর্ব্ব মাধুর্য্য, কি অসামান্য কবিত্ব! প্রত্যহ কত শত প্রণয়িনী প্রণয়ীর সহিত নবপ্রেমে বদ্ধ হই-

তেছে এবং তাহাদের বিচ্ছেদ ঘটিতেছে, কিন্তু এরূপ তন্ময়ত্ব ভাব কয়জনের হইয়া থাকে? 'বদন থাকিতে, না পারি বলিতে, তেঞি সে অবলা নাম' এইখানেই নূতনত্ব অথচ অসাধারণ বা অসম্ভব কিছুই নাই।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাহা সচরাচর আমরা দেখিতে পাই না, কিন্তু সৃষ্টির নিয়মানুসারে তাহা সাধারণ বলিয়া অনুমিত হয় এবং যাহা কেবল আমরা কল্পনায়, বাসনায় সাজাইয়া দেখি, তাহাই অসাধারণ সৌন্দর্য্য। বাল্মীকির সীতা, পুরাণের হরিশ্চন্দ্র, সেক্ষপীয়রের ডেসডেমিনা প্রভৃতিতে অসাধারণ সৌন্দর্য্য। রাধিকার এই প্রেম-বিহ্বলতা ও বিরহ-কাতরতাতেও অসাধারণ সৌন্দর্য্য।

কি হৈল কি হৈল মোর কানুর পিরীতি।
আঁখি ঝরে পুলকেতে প্রাণ কাঁদে নিতি॥
শুইলে সোয়াস্তি নাই নিদ গেল দূরে।
কানু কানু করি প্রাণ নিরবধি ঝুরে॥
নবীন পানীর মীন মরণ না জানে।
নব অনুরাগে চিত ধৈরজ না মানে॥
এই রস যে না জানে সে না আছে ভাল।
হৃদয়ে রহিল মোর কানু-প্রেম-শেল॥
নিগূঢ় পিরীতি খানি আরতির ঘর।
ইথে চণ্ডীদাস বড় হইল কাঁকর॥

যাহা সচরাচর আমরা দেখিতে পাই না, যাহা সম্ভবপরও নহে এবং যাহার সহিত আকাঙ্ক্ষারও সংস্রব নাই, তাহাই অসম্ভব বা অবাস্তব সৌন্দর্য্য। এই সৌন্দর্য্যই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মোহকরী ও তাহাতে বিশেষ আকর্ষণী শক্তি আছে। ইহার দ্বারা আমরা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান ভুলিয়া আত্মহারা, দিশেহারা হই, মন বাস্তব সৌন্দর্য্য ছাড়িয়া ক্ষণকালের জন্য অবাস্তব সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া স্বর্গরাজ্যে বিচরণ করে, স্বর্গের অতুলনীয় সৌন্দর্য্য রাশিতে বিহ্বল হয়। তথায় যে সৌন্দর্য্য দেখিতে পায়, তাহা অপার্থিব, অলৌকিক, অসম্ভব।

চণ্ডীদাসের কল্পনা তাদৃশ দুরূহ বিষয় লইয়া আলোচনা না করিলেও তাহাতে বাল-সুলভ চপলতা নাই, যৌবন-সুলভ লঘুতা নাই। তাহাতে যুবতীর যৌবন-সুলভ দোষের কথা থাকিলেও, বারবিলাসিনীর কলুষ কুটিল কটাক্ষ নাই, লোক-মোহকরী হাবভাব নাই, পরন্তু তাহাতে যুবতীর রূপ ও নবীনত্ব দেদীপ্যমান। রাধিকার বিরহ-অবস্থা বর্ণনকালে চণ্ডীদাসের কল্পনা যেরূপ শোকাতুরা হইয়া সুর ভাজিয়াছে, তাহা অনেক কবির বিরহে দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার রাধিকা যৌবনেই সন্ন্যাসিনী, শোকাকুলা, উন্মাদিনী, কিন্তু দেব-সেবায় নিরতা, ভক্তিতে পরিপূর্ণ। দেব লোকের ঐশ্বর্য্য চণ্ডীদাস জীবলোকে আনয়ন করিয়াছেন, সে কল্পনা উষ্ণ হইলেও উত্তাপশূন্য।

পিরীতি সুখের সাগর দেখিয়া নাহিতে নামিলাম তায়।
নাহিয়া উঠিয়া, ফিরিয়া চাহিতে লাগিল দুখের বায়॥
কেবা নিরখিল, প্রেমের সরোবর, নিরমল তার জল।
দুখের মকর, ফিরে নিরন্তর, প্রাণ করে টলমল॥
গুরুজন জ্বালা, জলের শিহালা, পড়সী জীয়ল মাছে।
কুল পানীফল, কাঁটা যে সকল, সলিল বেড়িয়া আছে॥
কলঙ্ক পানায়, সদা লাগে গায়, ছাঁকিয়া খাইলে যদি।
অন্তর বাহিরে, কটু কটু করে, সুখ দুখ দিল বিধি॥
কহে চণ্ডীদাস, শুন বিনোদিনী, সুখ দুখ দুটি ভাই।
সুখের লাগিয়া, যে করে পিরীতি, দুখ যায় তার ঠাঞি॥

কি সুন্দর তুলনা, কি চমৎকার কবিত্ব শক্তি!

চণ্ডীদাসের কবিত্ব কখন শক্তি-সঞ্চারিণী, কখন নির্জ্জনাশ্রুর পরিচায়ক। বিরহ-কাতরা রাধিকা যখন নৈরাশ্যের হাহাকার রব উত্থিত করিতেছেন, তখন কবি তাঁহাকে উৎসাহ-বাক্যে উদ্যমশীলতায় উপস্থাপিত করিতেছেন; আবার কখনো বা তাঁহার মর্ম্মভেদী ক্রন্দনে বিগলিত হইয়া, সেই ক্রন্দন-সুরে যোগদান করতঃ দুর্জ্জয় শোকাবেগ প্রশমন করিতেছেন। চণ্ডীদাসের কবিত্বে দুন্দভি-নিনাদ বা জয়োল্লাস-ব্যঞ্জক কিছুই নাই; আছে কেবল মৃদুমন্দ সমীরণ-সঞ্চালন-জনিত বৃক্ষপত্রের শন্ শন্ শব্দ এবং রুদ্র হুতাশের তপ্তদীর্ঘশ্বাস।

কালি বলি কালা, গেল মধুপুরে, সে কালের কত বাকি।
যৌবন সায়রে, সরিতেছে ভাঁটা, তাহারে কেমনে রাখি॥

কি তীব্র নৈরাশ্যে উত্তেজিত হইয়া কবি রাধিকার মুখ দিয়া এই কথাগুলি বাহির করিয়াছেন! বাঙ্গালী কবি বীর-

ম্বের গান গাহিতে না পারিলেও কান্নার গান গাহিতে বিশেষ অভ্যস্ত। বীরত্বের গান, স্বাধীনতার গান, বঙ্গের কবি সেই এক দিন গাহিয়া এখন নীরব হইয়াছে, পুনরায় তাহা গাহিবার বঙ্গ-কবির আর অধিকার নাই। "চণ্ডীদাসের কল্পনা-শক্তি বিলক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। মানবতী রাধা সমীপে শ্রীকৃষ্ণের নাপিতানী, মালিনী, বিদেশিনী, বণিক-পত্নী প্রভৃতি বেশে গমন বিষয়ক যে সকল বর্ণনা আছে, তাহাতে এবং অন্যান্য স্থলেও কল্পনা শক্তির বিলক্ষণ প্রাচুর্য্য লক্ষিত হয়। কিন্তু বিদ্যাপতির গীতাবলীতে যেরূপ ভাবগাম্ভীর্য্য ও বচন-বৈচিত্র্য আছে, ইঁহার গীতে সেরূপ অতি কম পাওয়া যায়। ইঁহার রচনা সাদাসিদা সামান্য ভাব লইয়াই অধিক—বিশেষতঃ প্রায় সকল গীতই নিতান্ত আদিরস-সম্পৃক্ত হওয়াতে প্রীতি-কর বোধ হয় না। কিন্তু তাহা হইলেও, তাঁহাকে একজন প্রবীণ কবি বলিয়া অবশ্য গণনা করিতে হইবে। কারণ তিনি যে সময়ের লোক, সে সময়ে ঐরূপ ছন্দোবন্দে রচনা করা সাধারণ ক্ষমতার কার্য্য নহে। তিনি তৎকালে অপরের অনুকরণ করিতে অধিক পান নাই, যাহা কিছু রচনা করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার স্বাভাবিকী শক্তি-সম্ভূত বলিয়া বোধ হয়।" * তৎকালে চণ্ডীদাস অপরের অনুকরণ করিতে অধিক পান নাই, না বলিয়া, অপরের অনুকরণই করেন নাই বলা, আমার মতে সঙ্গত। কারণ তৎপূর্ব্বে আর যে কেহ পদাবলী রচনা করিয়াছেন, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। চণ্ডীদাসের পূর্ব্বে হিন্দুর ভারতী দেবী সংস্কৃত ভাষায় ক্রীড়া করিতেছিলেন, চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে নিম্নগাঙ্গেয় অধিবাসীগণ দেবভাষা ছাড়িয়া বঙ্গভাষার আশ্রয় গ্রহণ করেন। অজয় নদীতীরস্থ কেন্দুবিল্বের বৈষ্ণবকবি তরল সংস্কৃতে গোবিন্দ-লীলামৃত বিতরণ করিয়া অবসর গ্রহণ করিলে, তাঁহার দেশবাসী ও মৈথিলী শিষ্যদ্বয় তাঁহার পদানুসরণ করিয়া বাঙ্গালা কাব্যের সূচনা করেন। বিদ্যাপতির দুই একটী পদের সহিত চণ্ডীদাসের পদের সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু তাহা বিদ্যাপতির অনুকরণ কি স্বভাবের অনুকরণ, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। আমরা নিম্নে বিদ্যাপতির একটী ও চণ্ডীদাসের একটী পদ উদ্ধৃত করিলাম; কে কাহার অনুকরণ করিয়াছেন, বিজ্ঞ পাঠকগণ তাহা বিবেচনা করিবেন। বিচার করিবার সময় তাঁহারা যেন স্মরণ রাখেন, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস সমসাময়িক, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করিতেন এবং তৎকালে মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল না।

বিদ্যাপতির পদ,—

আজ কেন তোমায় এমন দেখি।
সঘনে ঢুলিছে অরুণ আঁখি॥
অঙ্গ মোড়া দিয়া কহিছ কথা।
না জানি অন্তরে কি ভেল ব্যথা॥
সঘনে গগনে গণিছ তারা।
দেখ অপঘাত হৈয়াছ পারা॥
যদি বা না কহ লোকের লাজে।
মরমী জনার মরমে বাজে॥
আচরে কাঞ্চন ঝলকে দেখি।
প্রেম কলেবর দিয়াছে সাখি॥
বিদ্যাপতি কহ এ কথা দড়।
গোপত পিরীতি বিষম বড়॥ *

চণ্ডীদাসের রসোদ্গারের একটী পদ এই,—

রাই, আজু কেন হেন দেখি।
আঁখি ঢুলু ঢুলু, মেঘেতে আকুল
জাগিয়াছ বুঝি নিশি॥

---

* বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব।

* এই পদটী সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথগুপ্ত মহাশয় 'বিদ্যাপতির প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত পদাবলী' প্রস্তাবে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা প্রণিধান যোগ্য। আমরা এস্থলে তাহার নিজের ভাষা উদ্ধৃত করিলাম;—"এই পদটীকে, মনে কোন দ্বিধা না করিয়া, বিনা আপত্তিতে যদি কেহ বিদ্যাপতির পদ বলিয়া গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বিদ্যাপতির বিশেষত্ব ও মৌলিকত্ব বুঝাইবার চেষ্টা করা বৃথা। যে কয়েকটী সঙ্কলনে এই পদ দেখিয়াছি, তাহার কোন একটীতে ইহার সম্বন্ধে কোন প্রকার অভিমত প্রকাশিত হয় নাই। বিশুদ্ধ অথবা অবিশুদ্ধ বাঙ্গালায় এখন যদি কেহ পদ রচনা করিয়া তাহাতে বিদ্যাপতির নাম জুড়িয়া দেয়, তাহা হইলে হয়ত সংকলনকার তাহাকে সংগ্রহ-ভুক্ত করিবেন।"—বঙ্গদর্শন, চতুর্থ বর্ষ (নবপর্য্যায়)।

রসের ভরেতে, অঙ্গ নাহি ধরে
বসন পড়িল খসি।
স্বরূপ করিয়া, কহনা আমারে
মনের মরম সখি॥
এক কহিতে, আর কহিতেছ
বচন হইয়া হারা।
রসিয়ার (রসিকের) সনে, কিবা রস রঙ্গে
সঙ্গ হয়েছে পারা॥
ঘন ঘন তুমি, মুড়িতেছ অঙ্গ
সঘনে নিশ্বাস ছাড়।
স্বরূপ করিয়া, কহনা কহসি
কপট কেন বা কর॥
ভালের সিন্দূর, অধিক আছয়ে
নয়নে আধ কাজল।
চাঁদে নিঙ্গড়িয়া, এমন করিয়া
কেবা নিল এ সকল॥
চণ্ডীদাসে কয়, যেবা সেই হয়
ভালে ভুলাইলে কান্।
সঙ্গের সঙ্গিনী, বঞ্চিতে নারিবে
কিবা কর আর লাজ॥

স্থানে স্থানে উভয় কবির বাক্য প্রায় একরূপ। কোন্ পদটী পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, তাহা নিদ্ধারণ করিতে পারিলে, কে কাহার অনুকরণ করিয়াছেন, তাহা জানা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা নির্দ্ধারণের কি উপায় আছে?

চণ্ডীদাসের রচনা আদিরস-সম্পৃক্ত হইলেও তাহা অপাঠ্য বা অপকৃষ্ট নহে। পরবর্ত্তীকালে রামপ্রসাদ বা ভারতচন্দ্র আদিরসের তরল বন্যায় যেমন ভাষাসুন্দরীকে নিতান্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিয়াছেন, তিনি তেমন কিছুই করেন নাই। তাঁহার আদিরস-সম্পৃক্ত পদাবলী পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিগণ অতি আদরের সহিত আস্বাদ করিতেন। (১) তাঁহারা চণ্ডীদাসকে রস-শেখর উপাধি দিয়াছিলেন। (২) প্রেমাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলী, স্বরূপ, রামানন্দের সহিত পরম আনন্দে শ্রবণ করিতেন।

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীত গোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রি দিনে
গায় শুনে পরম আনন্দে॥ (৩)

বঙ্গীয় কাব্যোদ্যানে চণ্ডীদাসের ন্যায় মধুর কলকণ্ঠ সুদুর্লভ। তাঁহার তুলনা কেবল বঙ্গ-সাহিত্যেই বিরল নহে, ইংরাজি, পারশি, আরবি প্রভৃতি অন্যান্য সাহিত্যেও তাঁহার সমকক্ষ মধুবর্ষী কবির দর্শন বিরল। দীনেশ বাবু বলেন যে, তিনি ভাষার দিকে আদৌ লক্ষ্য করেন নাই, কিন্তু ভাষা চিরাশ্রিতা দাসীর ন্যায় তাঁহার ভাবের অনুসরণ করিয়া যে সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছে এবং সেই সাহিত্যে যে স্বভাব-সুন্দর চিত্র সুনিপুণ চিত্রকরের তুলিকা-নিঃসৃতের ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণে অঙ্কিত হইয়া আছে, সেরূপ পরবর্ত্তী অন্য কোন কবিই চিত্রিত করিতে সক্ষম হন নাই। গোবিন্দদাসও চণ্ডীদাসের ন্যায় প্রেমিক ও সহজ ভাবের কবি ছিলেন, কিন্তু তাহা হইলেও তিনি চণ্ডীদাসের সমতুল্য নহেন। চণ্ডীদাসের পদ যেন স্বভাবের শান্ত শীতল সুনির্ম্মল চরণ হইতে নিঃসৃত,

(১) জয় জয় চণ্ডীদাস দয়াময় পণ্ডিত সকল গুণে।
অনুপম যার যশ রসায়ণ গায়ত জগৎ জনে॥
বিপ্র কুলোদ্ভব ভুবনে পূজিত অতুল আনন্দ দাতা।
যার তনু মন রঞ্জন না জানি কি দিয়া করিল ধাতা॥
সতত সে রসে ডগমগ নব চরিত বুঝিবে কে।
যাহার চরিতে ঝোরে পশু পাখী পিরীতে মজিল সে॥
শ্রীরাধা গোবিন্দ কেলি বিলাস বাসল বিবিধ মতে।
কবিবর চারু নিরূপম মহী ব্যাপিল যাহার গীতে॥
শ্রীনন্দনন্দন নবদ্বীপপতি গৌরাঙ্গ আনন্দ হঞা।
যাহার গীতামৃত আস্বাদ স্বরূপ রায় রামানন্দ লঞা॥
পরম পণ্ডিত সঙ্গীতে গন্ধর্ব্ব জিনিয়া যাহার গান।
অনুক্ষণ কীর্ত্তনানন্দে মগন পরম করুণাবান॥
বৃন্দাবনে রতি যার তার সঙ্গ সতত সে সুখে ভোর।
রসিক জনার প্রাণধন গুণ বলিতে নাহিক ওর॥
চণ্ডীদাস পদে যার রতি সে পিরীতি মরম জানে।
পিরীতি বিহীন জনে ধিক রহুঁ দাস নরহরি ভণে॥

(২) জয় জয়দেব কবি নৃপতি, শিরোমণি বিদ্যাপতি
রসধাম।
জয় জয় চণ্ডীদাস রসশেখর, অখিল ভুবনে অনুপাম॥
বৈষ্ণব দাস।

(৩) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা—দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীত গোবিন্দ।
এই তিন গীতে করায় প্রভুর আনন্দ॥ মধ্য লীলা-
১০ম পরিচ্ছেদ।
বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীত গোবিন্দ।
ভাবানুরূপ শ্লোক পড়ে রায় রামানন্দ॥
ঐ, অন্ত্যলীলা—সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

তাহাতে না জানি কেমন একটা মাধুর্য্য ও মাদকতা মাখান আছে, যাহা অন্য কোন কবির পদে দেখিতে পাওয়া যায় না। এবং সে মাধুর্য্য নিজে আস্বাদন না করিলে অন্যে বুঝাইয়া দিতে পারে না। তাঁহার পদাবলীতে এমন কি একটা ঐশী আকর্ষিণী-শক্তি নিহিত আছে যে, একবার কর্ণে প্রবেশ করিলে মন ভুলিয়া যায়, প্রাণ সুশীতল হয়, হৃদয়ে কি জানি কি এক অব্যক্ত প্রীতির উদয় হয়। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে তাঁহার পদাবলী সমালোচনার সময় আমরা এ বিষয় আরো বিশদ করিবার চেষ্টা করিব।

ভারতবর্ষ ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের দৃশ্য স্থল, ভারত-সন্তান ভাগ্য-নিগ্রহের দৃষ্টান্তস্থল। হিন্দুর সুখ-সৌভাগ্য পূর্ব্বে কিরূপ ছিল, আর আজি বা কিরূপ ?—যেন স্বর্গ ও রসাতল। হিন্দুর অদৃষ্ট-নেমি ঘুরিতে ঘুরিতে সে সৌভাগ্যকে রসাতলে নিমজ্জিত করিয়াছে, এখন আর তাহার আবর্ত্তন-শক্তি নাই, ঊর্দ্ধে উঠা পরের কথা। কিন্তু বহু-শতাব্দীর এ ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়াও, এরোগ শোক দুঃখ দারিদ্র্য, বিপদ বিপত্তির মধ্য দিয়াও, এপর-পীড়ন-রুধিরাক্ত কলেবর ও ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন শ্মশান ভূমির মধ্য দিয়াও, সেই আর্য্য হৃদয় প্রবাহিত হইতেছে; হিন্দুর আদি কবি প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া বেদগান করিয়া গিয়াছেন, হিন্দু-সন্তান পূর্ব্ব-পুরুষের সকল হারাইয়া থাকিলেও, হিন্দুর মন সেই কবি-কল্পনা, সেই কাব্যানুরাগ হইতে বিরত হয় নাই, হিন্দুর হৃদয়ে কবিত্ব-স্রোত, এমরুর নিম্নস্তর বহিয়া এখনো প্রবাহিত হইতেছে। হিন্দু-সন্তান বাহ্যিক জীবনের অগৌরব হইতে মুখ লুকাইবার জন্যই বুঝি, বাহ্যিক জীবনের গ্লানি ও যাতনা ভুলিবার জন্যই বোধ হয়, অন্তরাভিমুখে তাকাইয়া শান্তির স্থান অনুসন্ধান করিয়াছেন, করিতেছেন; তাই বাহিরে জড়ত্ব প্রাপ্ত হইলেও, অন্তঃস্রোত প্রবাহমান রহিয়াছে। বাহিরে বালুকা-রাশির মধ্যে নৈরাশ্যের ছবি অঙ্কিত দেখিলেও ফলগু যে অন্তঃসলিলা, হিন্দু সন্তানের, অন্ততঃ বঙ্গীয় যুবকের কাব্যানুরাগে কবি-কল্পনায় তাহা প্রতীয়মান হইতেছে। হিন্দু সন্তানের আভ্যন্তরীণ প্রবাহের বিরতি নাই, সংকীর্ণতা প্রাপ্ত হইলেও অবরুদ্ধ গতিতে চলিয়া আসিতেছে। এত অধঃ-পতনের মধ্যেও বাঙ্গালা কাব্যের গতি ও উন্নতি আলোচনা করিলে প্রতীতি হইবে, হিন্দুর—বঙ্গসন্তানের জীবনালোক একবারে নিবিয়া যায় নাই। এই দেখিয়াই বোধ হয় সূক্ষ্মদর্শী বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "সাহিত্যালোচনাই, জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি সাধনই বাঙ্গালীর সভ্য জগতে গৌরব লাভের একমাত্র উপায়।"*

'বান্ধবে'র প্রবীণ সমালোচক-প্রবর লিখিয়াছিলেন,—"লাভালাভ বিবেচনায় কবিতাকে প্রধানতঃ তিনশ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যথা অধম, মধ্যম ও উত্তম। যে কবিতায় মনুষ্য সমাজের জ্ঞান, নীতি ও সুখ ব্যাহত হয়, তাহাকে অধম কবিতা বলা যাইতে পারে; যে কবিতায় মনুষ্যের জ্ঞান, নীতি বা সুখ এ তিনের একটীরও কিছুমাত্র হ্রাস বৃদ্ধি হয় না, তাহাকে মধ্যম কবিতা বলা যাইতে পারে? আর যে কবিতায় মানুষের জ্ঞান নীতি বা সুখ পরিপুষ্ট, পরিমার্জ্জিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়, তাহাকে উত্তম কবিতা, এই আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে।' যদি কবিতার এইরূপ শ্রেণীবিভাগ করিতে পারা যায়, তবে চণ্ডীদাসের কবিতা কোন্ শ্রেণীভুক্ত হইবে, তাহা পাঠকগণের বিচার্য্য। চণ্ডীদাসের পদাবলী সম্বন্ধে আরো কিছু লিখিব, সেই সময় পাঠকগণের রসাস্বাদনের অধিক অবসর হইবে। তবে এস্থলে ইহা বলিয়া রাখি যে, চণ্ডীদাস সর্ব্বাদিম ও সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ প্রাচীন কবি ও তাঁহার কবিতা প্রথম শ্রেণীর উপরেও যদি কোন শ্রেণী থাকে, তবে সেই শ্রেণীভুক্ত। তাঁহার ন্যায় সহজ ভাবের কবি আর নাই, চণ্ডীদাসের তুলনা কেবল চণ্ডীদাস। শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

* উৎসাহ।

মেধসাশ্রম আবিষ্কার।

উদাসীন শ্রীমদ্ বেদানন্দ স্বামী-বিরচিত শ্রীচন্দ্রশেখর-মাহাত্ম্য আমি ও আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বিজয়কেশব মিত্র প্রকাশ করিয়াছি। এই পুস্তক প্রচার করিবার বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। সে উদ্দেশ্য মেধসাশ্রম-আবিষ্কার-প্রচার। যাঁহারা মার্কণ্ডেয়চণ্ডী পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা মেধসাশ্রমের কথা অবগত আছেন। সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য স্বজন কর্তৃক তাড়িত হইয়া মেধসাশ্রমে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তথায় তাঁহারা মেধস ঋষির নিকট দেবী মাহাত্ম্য অবগত হইয়া দেবীপূজা করেন ও অভিলষিত ফল লাভ করেন। সুরথ ও সমাধির সেই যোগস্থান মেধসাশ্রম। অতএব হিন্দুর নিকট সেই মেধসাশ্রম মহাতীর্থ স্থান। কিন্তু সে পুণ্যময় আশ্রম কোথায়? চণ্ডীতে তাহার উল্লেখ নাই। দেবী ভাগবতে বা দেবীপুরাণে অথবা অন্য কোন পৌরাণিক গ্রন্থে তাহার উল্লেখ নাই, এ পর্য্যন্ত সেই আশ্রমের কোন সন্ধান হয় নাই। তাহার কোন অস্তিত্ব ছিল কি না, অথবা এখনও তাহার কোন চিহ্ন আছে কি না, তাহা এ পর্য্যন্ত কেহ জানিতে চেষ্টা করেন নাই।

শ্রীমদ্ বেদানন্দ স্বামী এই মহাতীর্থ আবিষ্কার করিয়াছেন। এ শুভ সংবাদ হিন্দুর নিকট প্রচার করা আমার কর্ত্তব্য মনে করিয়াছি। কিরূপে ইহার আবিষ্কার হইয়াছে; তাহা আমরা স্বামীজীর নিকট যেরূপ শুনিয়াছি, তাহা লিখিতেছি।

গৌরতন্ত্র নামে একখানি তন্ত্র আছে। তাহা পুরাতন। সেই তন্ত্রের কামাখ্যা পটলে এই আশ্রমের উল্লেখ আছে। যথা—

"কর্ণফুলী মহানদী গো পর্ব্বত সমুদ্ভবা।
তস্যাশ্চ দক্ষিণে তীরে পর্ব্বতঃ পুণ্যবিত্তমঃ।
তত্র দশমহাবিদ্যা গঙ্গানাভি যৎপিনী।
মার্কণ্ডস্য মুনেঃ স্থানং মেধসো মুনেরাশ্রমঃ
তত্র চ দক্ষিণা কালী বাণলিঙ্গং শিবঃ স্বয়ং॥

বেদানন্দ স্বামী ৩/৪ বৎসর পূর্ব্বে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া চট্টগ্রামের নিকট যোগ অভ্যাস কারণ যোগস্থান নিরূপণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি এই স্থান আবিষ্কার করেন। পরে দৈববশে গৌরতন্ত্রের উক্ত শ্লোক প্রাপ্ত হইয়া সেই স্থান যে মেধসাশ্রম, তাহা সিদ্ধান্ত করেন। গৌরতন্ত্রে আরও উল্লিখিত আছে যে, কলিতে এই আশ্রমের আবিষ্কার হইবে।

চট্টগ্রাম জেলাস্থ এই মেধসাশ্রম দক্ষিণ সমুদ্রের উত্তর তটে, কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ তীরে, নীল পর্ব্বতমালা-পরিশোভিত চন্দ্রশেখরের অগ্নি-কোণে, বেতসা তট হইতে কর্ণফুলী তীর পর্য্যন্ত বিরাজমান আছে। এখন এই আশ্রমের পাদদেশ দিয়া কর্ণফুলী প্রবাহিত হয় না সত্য; কর্ণফুলী কালপ্রভাবে এখন সেখান হইতে অনেক দূর সরিয়া আসিয়াছে, কিন্তু এখানে উক্ত গৌরতন্ত্রোক্ত সকল চিহ্নই বর্ত্তমান আছে। আমরা স্বামীজীর নিকট ইহার বিবরণ পাইয়া, তাহা যেরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছি, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"ভদ্রপল্লী সারোয়াতলী হইতে এই আশ্রম দেখা যায়। চট্টগ্রাম সদর ঘাট হইতে সারোয়াতলী ৩।৪ ঘণ্টার পথ। সারোয়াতলী হইতে আশ্রম পর্ব্বতের সানুদেশ প্রায় এক ক্রোশ ব্যবধান। আশ্রমের শোভা অতি রমণীয়। সঘনশ্যামলতরুলতাশোভিত পর্ব্বত স্তরে স্তরে সুদূর ব্যাপিয়া ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত বিরাজমান। সর্ব্বোচ্চস্তরে মেধসাশ্রম। পর্ব্বত স্তরের নিম্নভাগে চম্পকারণ্য। চম্পকারণ্যের উভয় পার্শ্বস্থ পর্ব্বতবাহুর উপর দিয়া আশ্রমে উঠিবার পথ। বাম বাহুর বাম ভাগে নাভিগঙ্গা। ঐ গঙ্গা নাভিসদৃশী গভীর কুণ্ডাকারে বিরাজমান। সেই কুণ্ডমধ্যে পর্ব্বত নির্ঝরিণীর নির্ঝরনিকর সুমধুর ধ্বনিতে অবিরাম ধারায় প্রবাহিত। জল অতি মধুর। পর্ব্বত সমীপবাসীগণ দেবতা বোধে ঐ কুণ্ড পূজা করে। তদুর্দ্ধে বিষ্ণুপদলাঞ্ছিত শঙ্খ-চক্র-চিহ্নিত

অনেক কুণ্ড বর্ত্তমান রহিয়াছে। একটী কুণ্ড পার্শ্বে সর্পজড়িত শিবলিঙ্গ বর্ত্তমান। নাভি-গঙ্গার নিম্নদেশে ত্রিশূল-চিহ্নিত ব্যাস কুণ্ড। উপরন্তু অধিত্যকা ভূমিতে মেধসাশ্রম। উহার দক্ষিণাংশে নানাবিধ সুরভিকুসুমকুঞ্জভূষিত সুরথ কুণ্ড ও বৈশ্যকুণ্ড বিরাজমান রহিয়াছে। আশ্রম সম্মুখে একটী প্রাচীন বিল্বতরু ও চারিদিকে আমলকী কানন। আশ্রমের সন্নিহিত পূর্ব্বাংশে চতুর্দ্দিক্ পরিমিত মার্কণ্ডেয় কুণ্ড। পূর্ব্বোক্ত পর্ব্বত নির্ঝরিণী দ্বিধা হইয়া এক ধারায় নাভি-গঙ্গায় ও অপর ধারা মার্কণ্ডেয় কুণ্ডে প্রবাহিত, মার্কণ্ডেয় কুণ্ডে কচ্ছপাকৃতি পাষাণ খণ্ড বিরাজিত। কুণ্ডের উপরিভাগে মার্কণ্ডেয় ঋষির পদচিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে। তদূর্দ্ধে মার্কণ্ডেয় আশ্রম ও দশমহাবিদ্যার স্থান স্তরে স্তরে বিরাজমান। উভয় আশ্রমের দৃশ্য অতি মনোহর। সুদূর ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত পর্ব্বতের মালা অপূর্ব্ব শোভায় সুশোভিত—অদূরে চন্দ্রনাথের মহাতীর্থ স্থান—সম্মুখে অনন্ত সমুদ্র যেন সকল সৌন্দর্য্যের একত্র সমাবেশ হইয়াছে। সে শোভা বর্ণনাতীত। আশ্রমে প্রবেশ করিলেই চিত্ত-প্রসাদ উপস্থিত হয়।

এই আশ্রমের নিকটে অনেক দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত পর্ব্বত বাহুদ্বয়ের দক্ষিণ বাহুর উপর মনসা শীতলা ও চামুণ্ডা স্থান। বাম বাহুর উপর ভুবনেশ্বরী ও ষোড়শী স্থান। মার্কণ্ডেয় আশ্রমে তারাবাড়ী।"

শ্রীমদ্ বেদানন্দ স্বামী কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করিয়া এই মহাতীর্থে দক্ষিণাকালীর এক টিনের মন্দির করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু আর কোন ব্যবস্থা হয় নাই। স্বামীজী এখন কাশীতে অবস্থান করেন। তাঁহার কার্য্য তিনি করিয়াছেন। তিনি বলেন, "ঐ আশ্রম মহর্ষি মেধস ভারত-সংস্কার-বীজ স্বরূপ নিরূপণ করিয়াছেন।" এখন সকল হিন্দুর পক্ষে এই মহাতীর্থ স্থান রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকে আমরা সংস্কৃতে রচিত শ্রীচন্দ্রশেখর মাহাত্ম্যের বাঙ্গালা অনুবাদ ও শ্রীমদ্ বেদানন্দ স্বামীর সংক্ষিপ্ত জীবনী সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছি।

শ্রীমদ্ বেদানন্দ স্বামী নিতান্ত অপরিচিত লোক নহেন। তাঁহার গৃহাশ্রমের নাম শ্রীশীতলচন্দ্র বেদান্তভূষণ। ইদানীং তিনি ফরিদপুর জেলাস্থ মাদারিপুর গ্রামে বাস করিতেন। এখানে প্রথমে তাহার টোল ছিল। তাঁহার অধ্যাপনায় অনেকে সাংখ্য বেদান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। তিনি সংস্কৃতে বেদান্ত-বিজয় রচনা করেন। পণ্ডিত মোক্ষমূলরও তাহার প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি বাঙ্গালায় বেদান্ত-রত্নাকর ও বিবেক-রত্নাকর প্রকাশ করেন। সংস্কৃতে "লক্ষ্মণ শক্তিশেল" "ঘোষযাত্রা" নামক দুইখানি নাটকও তিনি রচনা করেন।

তিনি যখন কলিকাতায় থাকিয়া অধ্যাপনা করিতেন, তখন মহামতি জজ স্বর্গীয় স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র, টাকির প্রসিদ্ধ বিদ্বান জমীদার রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রভৃতি ব্যক্তিগণ তাঁহার নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। পরে তিনি মাদারিপুর আসিয়া তাঁহার স্বর্গীয় পিতার নামে জগদ্বন্ধু সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করেন। তাহার বেশ উন্নতি হইতেছিল, কিন্তু এই সময়ে যখন তিনি বেদান্ত প্রচার কল্পে বক্তৃতাদি দিবার জন্য চট্টগ্রাম গমন করেন, সেই সময় তাঁহার জীবনের গতি ফিরিয়া যায়, তিনি সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন। যাহা হউক, সন্ন্যাসী হইয়াও তিনি মেধসাশ্রম প্রচার রূপ যে মহা উপকার সাধন করিয়াছেন, তাহাতে হিন্দু মাত্রেরই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকা কর্ত্তব্য।

সন্ন্যাসী হইয়াও তিনি কৃপা পরবশে আমাদের অনুরোধে মাদারিপুরে আসিয়া কয়েক দিন আমাদের অধ্যাপনা করান ও উপদেশ দেন। সেই উপদেশের কিয়দংশ আমরা এই আলোচ্য পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

শ্রীদেবেন্দ্র বিজয় বসু।

সমাজ ও তাহার আদর্শ। (১২)

৮১। সে যাহা হউক, মানুষ প্রথমে কামজ বা ইন্দ্রিয়জ সুখভোগ করিতে করিতে ক্রমে সেই সুখের তামসিক ও রাজসিক অবস্থা হইতে সাত্ত্বিক অবস্থায় আসিতে পারে। সেই সাত্ত্বিক অবস্থায় আসিলে তবে তাহার আনন্দবৃত্তি প্রকৃতরূপে বিকাশিত হইতে থাকে। প্রথমে মানুষ নিম্নশ্রেণীর ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য কর্ম্ম করে, —জিহ্বা ত্বক ও নাসিকার সুখবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য—রসনা স্পর্শ ও ঘ্রাণসুখভোগের জন্য চেষ্টা করে। সেই জন্য সেই সব ইন্দ্রিয়ের সুখজ বিষয় গ্রহণ করিতে, ও সেই ইন্দ্রিয়ের দুঃখজ বিষয় পরিহার করিতে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। তাহার পর শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয়—চক্ষু ও কর্ণের পরিতৃপ্তিজ সুখ অন্বেষণ করিতে মানুষ প্রবৃত্ত হয়। এই সময় হইতেই মানুষের প্রকৃত হ্লাদিনী শক্তির বিকাশ হইতে আরম্ভ হয়। চক্ষু কর্ণ আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। রসনা স্পর্শ ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা কেবল অতি নিকটস্থ বস্তুর আংশিক জ্ঞান মাত্র লাভ হইতে পারে। যে অন্ধ ও বধির, তাহার বিষয়জ্ঞান বা বাহ্যজগৎজ্ঞান নিতান্ত সামান্য বা আংশিক। চক্ষু দ্বারাই আমরা অতি দূরস্থ বাহ্যবিষয়ের রূপ আকার ও বর্ণ জ্ঞান লাভ করি। চক্ষুর সাহায্যে ও আমাদের স্মৃতি শক্তি হেতু বাহ্যবিষয়ের মধ্যে পরস্পরের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াজনিত বাহ্য পরিবর্ত্তন আমরা বুদ্ধি দ্বারা জানিতে পারি। তাহা হইতেই আমাদের প্রকৃত বাহ্যজগৎজ্ঞান লাভ হয়। চক্ষু দ্বারাই আমাদের প্রকৃত প্রত্যক্ষ প্রমাণজ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। চক্ষুর ন্যায় কর্ণও আমাদের জ্ঞানার্জ্জনের প্রধান দ্বার। বিশেষতঃ কর্ণের দ্বারা আমাদের শব্দজ্ঞান ও সুর জ্ঞান হয়,—বর্ণ বা অক্ষর জ্ঞান হয়,—ভাষা জ্ঞান হয়। কর্ণের দ্বারা আমরা শব্দ-প্রমাণজ জ্ঞান লাভ করি। যেমন চক্ষু দ্বারা বাহ্য বিষয়ের রূপ ও আকার জ্ঞান হয়—তাহাদের পরস্পরের সহিত পরস্পরের ক্রিয়া ও পরিবর্ত্তনাদি জ্ঞান হয়—এক কথায় প্রত্যক্ষ প্রমাণজ্ঞান (Perceptive knowledge লাভ হয়—সেইরূপ কর্ণের দ্বারা আমাদের যে শব্দজ্ঞান হয়, তাহা হইতে ক্রমে আমাদের পূর্ব্বসংস্কারশক্তি বলে—আমাদের সামান্যের জ্ঞান (abstract knowledge) লাভ হয়, ব্যাপ্তিজ্ঞান লাভ হয়,—তাহা দ্বারা আমাদের ব্যক্তি হইতে জাতি জ্ঞান হয়, ব্যক্ত হইতে অব্যক্তের জ্ঞান হয়, স্থূল হইতে সূক্ষ্মের জ্ঞান হয়,—দ্রব্য হইতে সাধারণ গুণের জ্ঞান হয়। এক কথায় আমাদের শ্রাব্যশব্দের দ্বারা—ব্যক্ত বা অব্যক্ত শব্দের দ্বারা—আমরা প্রকৃত জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশের পথ পাই। ব্যক্ত বা অব্যক্ত শব্দ ব্যবহার করিয়াই আমরা চিন্তা করিতে পারি। শব্দ বা ভাষা না থাকিলে আমাদের চিন্তা বা জ্ঞান সম্ভব হইত না, পরের সহিত আলাপ করা—পরের ভাব বুঝিতে পারা ত স্বতন্ত্র কথা। অতএব এক দিকে চক্ষু আমাদিগকে 'রূপ'ময় জগৎ দেখাইয়া দেয়—আর অন্যদিকে কর্ণ আমাদিগকে 'নাম'ময় জগৎ ধারণা করায়। এই জন্য

জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে চক্ষু কর্ণই শ্রেষ্ঠ। যাহার চক্ষু কর্ণ আছে,তাহার রসনা স্পর্শ ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় না থাকিলেও—তাহার প্রকৃত জ্ঞান লাভের বিশেষ বাধা হয় না।

৮২। যখন আমরা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা কোন বিষয়জ্ঞান লাভ করি, তখন আমাদের হ্লাদিনী-বৃত্তিবশে সাধারণতঃ সেই বিষয় সম্বন্ধে আমাদের সুখ বা দুঃখানুভূতি জন্মে। নাসিকা, জিহ্বা বা ত্বক্‌গ্রাহ্য যে বিষয় আমাদের সুখ দেয় বলিয়াছি, তাহা আমরা গ্রহণ করিয়া সে সুখ ভোগ করি,—আর যে বিষয় আমাদের দুঃখ দেয়, তাহা পরিহার করিয়া সে দুঃখ দূর করি। এই নিম্নশ্রেণীর ইন্দ্রিয়বৃত্তিচরিতার্থতা-জনিত যে সুখ, তাহা প্রধানতঃ তামসিক। কিন্তু চক্ষু ও কর্ণের দ্বারা যে বিষয়জ্ঞান হয়—সে বিষয় যদি চক্ষু কর্ণকে পরিতৃপ্ত করে—তবে সে সুখ অনেকটা সাত্বিক। সেই চক্ষুকর্ণগ্রাহ্য বিষয় হইতেই আমরা সাত্বিক আনন্দ ভোগ করিতে শিক্ষা করি। চক্ষু ও কর্ণ গ্রাহ্য বিষয় মধ্যে যাহা সাধারণ, তাহা আমাদিগকে তত আকৃষ্ট করিতে পারে না। অথবা তাহা সামান্য ক্ষুদ্র ও হেয় বলিয়া আমাদের বোধ হয়। কিন্তু যাহা অসাধারণ, তাহার মধ্যে কতকগুলি সুন্দর, মহান্‌, বিরাট ও আশ্চর্য্যজনক বলিয়া আমাদের মনে হয়। এইরূপে চক্ষুগ্রাহ্য রূপে, আকারে ও বর্ণে এবং কর্ণগ্রাহ্য সুরে ও শব্দে অনেক স্থলে আমরা সৌন্দর্য্য,মহত্ব, বিরাটত্ব বা বিশালত্ব ও চমৎকারিত্ব অনুভব করিতে শিক্ষা করি। যখনই কোথাও কিছু অসাধারণ বা অলৌকিক আমরা দেখিতে বা শুনিতে পাই, তাহাই চমৎকার বোধ হয়,—তাহাই আমাদিগকে বিশেষরূপে আকৃষ্ট করিয়া মোহিত করে। তাহাতে আমাদের চিত্ত বিস্ময়ে ও আনন্দরসে আপ্লুত হইয়া যায়। আর শুধু যাহা অসাধারণ সুন্দর মহান্‌ বা বিরাট, তাহাই যে কেবল আমাদিগকে আকর্ষণ করে—তাহা নহে। যাহা সুন্দর মহৎ বিরাট বা উৎকৃষ্ট নহে—তাহাও অসাধারণ হইলে অনেক স্থলে আমাদিগকে আকর্ষণ করে। তাহারও মধ্যে কি একরূপ বিশেষত্ব অলৌকিকত্ব আমরা দেখিতে পাই। তাই যাহা অসাধারণ বিকট—বীভৎস—বা ভয়াবহ, তাহা এক অর্থে আমাদের দুঃখকর হইলেও, আমাদিগকে আকর্ষণ করে। তাহার মধ্যে কি অদ্ভুত কিছু থাকে বুঝি—বিশালও কিছু থাকে, যাহাতে আমাদের হ্লাদিনী বৃত্তি চরিতার্থ হয়। এইরূপে আমাদের হ্লাদিনী বৃত্তির বিশেষ বিকাশ হয়।

যখন বাল্যকালে ব্যক্তিমানবের বা মানব জাতিবিশেষের জ্ঞানের প্রথম উন্মেষ সময় প্রকৃতি তাহাদের সম্মুখে এই বিরাট জগতকে ক্রমবিস্তৃত করিতে আরম্ভ করেন, তখন তাহাদের কাছে প্রায় সকলই নূতন—সকলই সুন্দর—সকলই অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়। তখন তরুণ অরুণের নবোদ্ভাসিত সৌন্দর্য্যে—উষায় বা সন্ধ্যায় আকাশের কোলে নানাছটায় নানাবর্ণের আলোর খেলায় মন মোহিত হইয়া যায়। বালক পূর্ণশশীর অদৃষ্টপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া আনন্দে অধীর হয়। 'চাঁদ আয়—চাঁদ আয়' করিয়া চাঁদকে ডাকিয়া সারা হয়—চাঁদকে কাছে না পাইয়া কাঁদিয়া আকুল হয়। তখন সামান্য বাদ্যে তাহার শরীর তালে তালে নাচিয়া উঠে—সামান্য সুরে তাহার প্রাণ অধীর হইয়া যায়। সে ধূলাবালিতে ছাইমাটিতে যত আনন্দ পায়—বড় হইয়া তাহার কণা-

মাত্র আনন্দলাভ করাও অনেক সময় তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে। বালকের ন্যায় নবোদিত-জ্ঞান-সূর্য্যকিরণস্নাত জাতি বিশেষও আনন্দময়ের বুঝি বড় নিকটে থাকে—তাই তখন তাহারা বিভুগানে বা বেদগানে এত বিভোর, তাই তাহাদের তখন আনন্দময়ের সংস্পর্শে এত আনন্দ, তাই তাহাদের বালকের ন্যায় আনন্দ এত বিকাশিত। বাল্যকালে আমাদের জ্ঞানশক্তি কর্ম্মশক্তি হ্লাদিনী শক্তি—সমুদায় কি এক নব উদ্যমে স্ফুটনোন্মুখ নবকলিকার নব উল্লাসে উল্লাসিত থাকে,—বিকাশের অভিমুখে কি ত্বরিতগতিতে প্রধাবিত হয়! কিন্তু যতই আমাদের বয়স বৃদ্ধি হয়, যতই বাল্যের বা যৌবনের সে শক্তি শ্লথ হইয়া আইসে, ততই সে সৌন্দর্য্যোপভোগ-শক্তি ক্ষীণ হইয়া পড়ে। তখন সে সৌন্দর্য্যানুভূতিশক্তি আর ততদূর থাকে না। তখন বাহ্যবিষয়ের নূতনত্ব—অলৌকিকত্ব কমিয়া যায়,—তাহার অসাধারণত্ব দূর হয়—তাহা আর তত আমাদের আকর্ষণ করিতে পারে না।

তাহা হইলেও, যাহা প্রকৃত সুন্দর, মহান্ বা বিশাল, তাহা সাধারণ হয় না—তাহার নূতনত্ব অলৌকিকত্ব নষ্ট হয় না। তবে যে সৌন্দর্য্য-ভোক্তা—তাহার সৌন্দর্য্যানুভূতিশক্তির বিশেষ বিকাশ না হইলে, সে হয়ত সে সৌন্দর্য্য দেখিতে পায়না। যাহার সৌন্দর্য্য দেখিবার আন্তরচক্ষু যতই বিকাশিত হয়—সে ততই প্রকৃত আদর্শ সুন্দরকে দেখিয়া আনন্দ পায়—সে সৌন্দর্য্য দেখিয়া দেখিয়া তাহার পরিতৃপ্তি হয় না, তাহার কাছে সে সুন্দর 'নিতুই নব – নিতুই সুন্দর' থাকে,—তাহা সকল সময়ই চমৎকার অসাধারণ আশ্চর্য্যজনক থাকে। তাহার সৌন্দর্য্যে মহত্ত্বে আকৃষ্ট হইতে শিখিয়াই আমাদের হ্লাদিনী শক্তির বিকাশ হয়—তাহা হইতেই আমাদের প্রকৃত সৌন্দর্য্যজ্ঞানের—আদর্শ সৌন্দর্য্যজ্ঞানের বিকাশ হয়।

৮৩। এইরূপে আমাদের হ্লাদিনী শক্তির বিকাশ হইল, বাহ্যজগতে ব্যষ্টিভাবে বিশেষস্থলে সৌন্দর্য্য মহত্ত্ব প্রভৃতি ধারণা করিতে শিক্ষা করিয়া—আমরা সাধারণ (abstract) সৌন্দর্য্য মহত্ত্ব জ্ঞান—আদর্শ সৌন্দর্য্য মহত্ত্ব ধারণা লাভ করি। আমরা যেমন ইন্দ্রিয়জ বাহ্যবিষয় জ্ঞান হইতে বা প্রত্যক্ষ ব্যষ্টি বিষয় জ্ঞান হইতে— সামান্যের জ্ঞানলাভ করি, ব্যক্তি হইতে জাতি জ্ঞানে, দ্রব্য হইতে 'গুণ' জ্ঞানে, অনিয়ম হইতে নিয়মজ্ঞানে, বহুত্ব হইতে একত্ব জ্ঞানে, বিশেষ হইতে সামান্যের জ্ঞানে ক্রমে অগ্রসর হইতে থাকি; তেমনই বাহ্য বিষয়ের ব্যষ্টি সৌন্দর্য্য জ্ঞান হইতে আমরা সাধারণ সৌন্দর্য্যজ্ঞানে, আদর্শ সৌন্দর্য্যজ্ঞানে, শেষে এক বিরাট ভূমা সৌন্দর্য্যজ্ঞানে, ক্রমে ক্রমে আরোহণ করিতে থাকি। চক্ষুগ্রাহ্য বিষয়ের আকৃতি রূপ বর্ণ হইতে যেমন একদিকে হ্লাদিনীশক্তির ক্রমবিকাশে এইরূপ আদর্শ সৌন্দর্য্য মহত্ত্ব প্রভৃতির অনুভূতি জন্মে, তেমনই কর্ণগ্রাহ্য শব্দের মধ্যে মহা একত্ববাচক শব্দের ধারণায়—"ব্রহ্ম" "আত্মা" প্রভৃতি শব্দের অর্থ বা স্বরূপ ধারণায় বা ধারণার চেষ্টায় আমাদের আনন্দের বিকাশ হয়। আর কর্ণগ্রাহ্য সুরের বা সঙ্গীতের মনোমোহন সৌন্দর্য্য মধ্যে জগতের মহা সঙ্গীততত্ত্ব,—যে মূল শব্দময়ের বিকাশে জগতের বিকাশ, যে সঙ্গীতের তাললয়ের

সহিত জগতের মহাতানলয় গতির (rhythm) সৌসাদৃশ্য, যে সঙ্গীতের ঐক্যতানের (harmonyর) সহিত জগতের মহৈকত্বের সঙ্গতি, যে সঙ্গীতের বিভিন্ন রাগরাগিণীর বিকাশের সহিত ব্যক্তিজীবের আন্তরিক ভাব-বৈচিত্র্যের বিকাশের সমতা, যে সুরের বিভিন্ন গ্রামের বিকাশের সহিত ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন ভুবনের বিকাশের একরূপতা ও যে সুরের ক্রম-আরোহণের সহিত জগতের ক্রমোন্নতির আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য, তাহা আমরা যতই ধারণা করি,—ততই আমরা হ্লাদিনী শক্তি চরিতার্থ করিতে পারি। এই সুখের মধ্যে—সঙ্গীতের মধ্যে যে অস্পষ্ট প্রাণের ভাষা আছে—যে প্রাণের ভাব শব্দে প্রকাশ করা যায় না, যে হৃদয়ের ভাষা কথায় বুঝা বা বুঝান যায় না, তাহা বুঝাইবার যে শক্তি আছে—প্রাণের আনন্দ করুণা প্রেম-ভক্তি প্রকাশ করিবার যে আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে, সুর ও সঙ্গীতের ক্রমবিকাশে তাহা যতই বিকাশিত হইতে থাকে—যতই আমাদের সে সঙ্গীতের সে ভাব ধারণা করিবার শক্তি বিকাশিত হয়, ততই সঙ্গীত আমাদিগকে আকর্ষণ করিয়া লয়। সে মহাসঙ্গীত আমাদের অন্তরে সেই ভূমানন্দময়ের আনন্দ সুধার কণামাত্রের আস্বাদ দিয়া আমাদিগকে সেই আনন্দময়ের দিকে লইয়া যাইতে পারে। (১)

৮৪। বলিয়াছি ত, এই দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয়জ বিষয়জ্ঞান হইতে যে সৌন্দর্য্যানুভূতি বা আনন্দভোগ হয়, তাহা সহজে সাত্ত্বিক হইতে পারে। কেন না তাহাতে সাধারণতঃ আপনাকে বা পরকে দুঃখ দিয়া কোন কর্ম্ম করিবার প্রয়োজন হয় না। সে সাত্ত্বিক আনন্দ উপভোগের জন্য পরকে বাধ্য করিয়া, ত্যাগগ্রহণাত্মক কর্ম্ম দ্বারা কষ্ট দিয়া, বিষয় গ্রহণ করিতে হয় না। রসনাজ স্পর্শজ বা ঘ্রাণজ আনন্দ উপভোগ জন্য যেমন বিষয় গ্রহণ প্রয়োজন হয়—এই চাক্ষুষ ও শ্রবণজ আনন্দ ভোগ জন্য সেরূপ বিষয়গ্রহণ প্রয়োজন হয় না। তাহা দূর হইতে উপভোগ করিতে পারা যায়—তাহা 'আমার' করিতে না পাইয়াও উপভোগ করা যায়। প্রকৃত সাত্ত্বিক আনন্দ ভোগকালে সেই সুন্দর মহানের সহিত আমাদের ব্যক্তিগত সম্বন্ধের কথা মনে থাকে না। তাহার সহিত সম্বন্ধ হইলে আমাদের সুখ হয় কি দুঃখ হয়,—সৌন্দর্য্য উপভোগ কালে সে বিচারশক্তিও বড় থাকে না। যখন বিষধরের বাহ্য সৌন্দর্য্য আমা-

---

(১) Music is a great and exceedingly noble art, its effect on the inmost nature of man is very powerful, it is understood by [illegible] as a perfectly universal language, the dsitinctness of which surpasses even that of the perceptible world itself. In music the deepest recesses of our nature find utterance.

* '* * Music is a direct objectification and copy of the Will itself, whose objectivity the ideas are.

* * * Music expresses joy, sorrow, pain, horror, delight, peace of mind, merriment...in the abstract in their essential nature without their motives. * * This universality belongs exclusively to music and gives it high worth.

* * * We may regard the phenomenal world and music and two different expressions of the same thing. Music is an expression of the world, is in the highest degree a universal language.

* * * The unutterable depth of all music by virtue of which it floats through our consciousness is the vision of a paradise firmly believed in, but yet ever distant from us, rests on the fact that it restores to us, all the emotions of our inmost nature but entirely without reality and far removed from their pain.

Schopenheaur's—*World as Will and Idea,*—Vol. I. Sec. 52, পণ্ডিত হার্বর্ট স্পেন্সারের Essay on Musicও দ্রষ্টব্য।

দিগকে আকর্ষণ করে—তখন তাহার দংশনে যে আসন্ন মৃত্যু, তাহা পর্য্যন্ত মনে থাকে না। শুধু তাহাই নহে। এই আনন্দের সাত্বিক বিকাশ কালে আমাদের অহঙ্কারের বিকাশ থাকে না। অনেক সময় বাহ্য সৌন্দর্য্য—প্রকৃতির অপূর্ব্ব শোভা অনুভব কালেও আমাদের অহঙ্কার কোথায় চলিয়া যায়। আমাদের 'আমি' জ্ঞান তখন কোথায় লুকাইয়া থাকে। যখন আমরা বাহ্য বিষয়ের সৌন্দর্য্য মহত্ব বিরাটত্ব দেখিয়া চমৎকৃত হই—আত্মহারা হইয়া যাই—তখন সেই সৌন্দর্য্য মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া দিই, তখন 'ইদং' এর মধ্যে 'অহং' কোথায় গিয়া লুকাইয়া থাকে। তখন কি এক মহা-মন্ত্র-বলে 'ইদং' 'অহং' একীভূত হইয়া যায়। তখন মানুষের আমিত্ব বা মমত্ব জ্ঞান থাকে না—মানুষের নিজের কথা মনে থাকে না, নিজের সুখদুঃখানুভূতি মনে থাকে না—নিজের ক্ষতি বৃদ্ধির কথা মনে থাকে না—তখন অতীত ভবিষ্যতের কথা মনে থাকে না,—তখন স্থান কাল জ্ঞান থাকে না—তখন অস্তিত্বের জ্ঞান পর্য্যন্ত থাকে না। জ্ঞান বিশেষ বিকাশিত হইয়াও যে 'অহং' 'ইদং'এর মধ্যে পার্থক্য সহজে দূর করিয়া দিতে পারে না,—তাহা আমাদের এই হ্লাদিনী শক্তির বিকাশে—এই আনন্দময়ত্ব লাভ করিলে অতি সহজে সম্পাদিত হয়।

যখন মানুষ এই সৌন্দর্য্যানুভূতি শক্তির বিশেষ স্ফূর্ত্তিকালে, ঐ সুশোভিত রমণীয় উদ্যানে থরে থরে প্রস্ফুটিত অসংখ্য যূথি চামেলি মল্লিকা গোলাপের মনোহর সৌন্দর্য্য দেখিয়া—সে সৌন্দর্য্যের অন্তরালে ভূমা সৌন্দর্য্যময়কে চিনিতে পারিয়া সে সৌন্দর্য্য-সাগরে ডুবিয়া যায়; যখন ঐ বিশাল অনন্ত বিস্তৃত তুষারাবৃত হিমালয়ের অসংখ্য উত্তুঙ্গ শৃঙ্গে নবোদিত তরুণ অরুণের হেমাভ কিরণে প্রতিফলিত, নীল পীত হরিতাদি নানা রঙ্গে রঞ্জিত, অনন্ত শোভার অদ্ভুত লীলাবিলাসে—সেই ধারণার অতীত মহত্বের মহিমাময় গৌরবে মানুষ আত্মহারা হইয়া যায়; যখন নিদাঘের সায়াহ্নে সুনীল গগনতল আচ্ছাদিত করিয়া, বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত মেঘের কোলে মেঘকে স্তরে স্তরে সাজাইয়া, প্রকৃতিদেবী তাঁহার কল্পনারাজ্যের এক প্রান্তে কত পর্ব্বত অরণ্যানী সমাকীর্ণ নূতন জনপদ নূতন জীব মুহূর্ত্ত মধ্যে সৃষ্টি করিয়া, যাদুকরের যাদুমন্ত্রবলে এক অদ্ভুত দৃশ্যের পর আর এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখাইয়া মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করেন; আবার যখন তাঁহার কোলে বিজলী খেলাইয়া অথবা তাহাতে মুহূর্ত্ত জন্য অস্তগমনোন্মুখ রবির রক্তাভ কিরণ প্রভা ছড়াইয়া দিয়া, কোথাও বা রক্তগঙ্গা, কখন বা গলিত সুবর্ণনদীর বিকট শোভা দেখাইয়া দেন, অথবা আগ্নেয়গিরির অগ্নি উদ্গীরণের ভীষণ সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করেন, কিম্বা নিমিষের তরে পশ্চিমের মেঘদ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়া, মেঘরাজ্যের উপর সে অস্তাচলস্থ রক্তিম সূর্য্যের আলোক প্রতিফলিত করিয়া, কি এক অদ্ভুত সৌন্দর্য্যের সমাবেশ দ্বারা মানুষকে সেই সৌন্দর্য্যের মহা আকর্ষণে আকর্ষিত করিয়া লইয়া তাহাকে একেবারে মোহিত ও আত্মহারা করিয়া দেন; যখন অনন্ত গভীর জলধিবক্ষে ভীষণ বাত্যা-সংক্ষোভে উত্থিত উত্তাল-তরঙ্গ-দোলায় বিশালত্বের বিরাটত্বের ভয়ানকত্বের লীলা দেখিয়া মানুষ এমন চিত্তহারা হইয়া যায় যে, পোতমগ্নে আসন্ন মৃত্যুর সম্ভাবনা পর্য্যন্ত তাহার মনে থাকে না;—তখন মানুষের সৌন্দর্য্য

মহত্ব বা বিশালত্বের অনুভূতি এত অধিক হয় যে, তখন তাহার 'আমি' জ্ঞান একেবারে লোপ হইয়া যায়, তখন সে সেই বিরাটত্বের মধ্যে আপনার ক্ষুদ্রত্বকে একেবারে ডুবাইয়া দেয়। সে প্রকৃতিলয় অবস্থায় এ জ্ঞান একেবারে লোপ হইয়া যায়, তাহার 'অহং' 'ইদং' দ্বৈত বোধ থাকে না। সেইরূপ যখন মানুষ তাহার হ্লাদিনী শক্তির বিশেষ বিকাশে সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন অমৃতনিস্যন্দি সঙ্গীতের আনন্দে বিভোর হইয়া যায়,—যে মনোহর সঙ্গীতে পশু পক্ষী পর্য্যন্ত আকৃষ্ট হয়, যে সুললিত সঙ্গীতের মোহিনী শক্তিতে বনের হরিণীও আত্মহারা হইয়া গিয়া গায়কের কাছে আসিয়া তাহার হস্তস্থিত হার নিজকণ্ঠে ধারণ করে, যে অর্ফিয়সের বীণার মধুর ঝঙ্কারে বনের বৃক্ষলতাও উৎকর্ণ হইয়া গায়কের অনুগামী হইত বলিয়া প্রবাদ আছে, শুভাদৃষ্টবশে যখন মানুষ সে মহা সঙ্গীতের রসাস্বাদনে তন্ময় হইয়া যায়; অথবা অবশেষে যখন সেই তন্ময়তার পরিণামে মানুষ তাহার হৃদ্‌বৃন্দাবনে প্রেম যমুনাতটে ভগবানের বংশীধ্বনি শুনিয়া সর্ব্বত্যাগী হইয়া বিহ্বলচিত্তে সেই মহা সঙ্গীতের আহ্বানে ধাবিত হয়; কিম্বা যখন সেই সঙ্গীতের জগদ্রূপ মহা বিকাশ মধ্যে সেই সঙ্গীতমূল ওঙ্কার ধ্বনি অন্তরাকাশে শ্রবণ করিয়া মানুষ আনন্দে আপনা হারা হয়,— তখন তাহার 'অহং' 'ইদং' জ্ঞান থাকে না, তখন মানুষ তাহার মনোময়রূপ বিজ্ঞানময়রূপ অতিক্রম করিয়া কেবল আনন্দময়রূপে অবস্থান করে।

এইরূপে যখন এই হ্লাদিনীশক্তি শুধু বাহ্য বিষয়ানন্দভোগে আমাদিগকে আবদ্ধ না রাখিয়া, আমাদিগকে বাহ্য চক্ষু বা বাহ্য কর্ণের বাহ্য বিষয় হইতে ক্রমে আকর্ষণ করিয়া লইয়া আমাদের আন্তর চক্ষু ও আন্তর কর্ণ উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেয়, তখন সেই এক আদর্শ সৌন্দর্য্য মহত্ব বিরাটত্ব উপভোগ করিবার শক্তি আমাদের বিকাশিত হয়, তখন বিশেষ প্রতিভাবলে বা সাধনাবলে সে আদর্শকে আমরা মানসপটে চিত্রিত করিতে পারি। পরে ধ্যানবলে আমরা নিজের চিদাকাশে আন্তর চক্ষুগ্রাহ্য ও আন্তর কর্ণগ্রাহ্য সে আদর্শ আশ্চর্য্য পূর্ণসৌন্দর্য্যময় রূপ ও সঙ্গীতময় শব্দরাজ্য ধারণা করিয়া তাহাতে আত্মহারা হইয়া যাই। তখন মহাসমাধিবলে সেই মহানন্দময় মহাসাগরে আমরা ডুবিয়া যাই। সেখানে আমাদের আমিত্ব কোথায় লয় হইয়া গিয়া, তাহার স্থানে এক বিরাট 'জ্ঞাতা' সমস্ত 'জ্ঞেয়'কে তাহার অঙ্গীভূত করিয়া লইয়া "একমেবাদ্বিতীয়ং" হইয়া সচ্চিদানন্দময় হইয়া আবির্ভূত হন। সে মহা সমাধি অবস্থায় থাকে কেবল—এক ভূমা আনন্দসাগর। যখন মানুষ সে অবস্থা প্রাপ্ত হয়, যখন সে আনন্দের দেশকাল-পরিচ্ছিন্নত্ব দূর হয়, তখন মুক্তি হয়।

৮৫। কিন্তু জীব মাত্রেই পরিচ্ছিন্ন আনন্দস্বভাব। যতই তাহার প্রকৃতির ক্রমআপূরণ হইতে থাকে, ততই জীব সেই ভূমা আনন্দসাগরের দিকে ক্রমে অগ্রসর হইতে থাকে। তাহা হইলেও, যতদিন তাহার জীবত্ব একেবারে না লোপ হয়, ততদিন পর্য্যন্ত সে মহানন্দসাগরে একেবারে ডুবিয়া যাইতে পারে না। এই আনন্দ স্বভাব জন্য ইতর জীবও কিয়ৎপরিমাণে এই আনন্দভোগের অধিকারী। পশু পক্ষীরও সে আনন্দ উপভোগ করিবার কিঞ্চিৎ শক্তি

আছে। তবে তাহাদের জ্ঞানবৃত্তি যেমন অপরিস্ফুট,—তেমনই এই হ্লাদিনীবৃত্তিও তাহাদের অবিকাশিত। তথাপি পশু পক্ষী কখন কখন সঙ্গীতে মোহিত হয়—প্রকৃতির শোভা দেখিয়া বিহ্বল হয়। তাই শিখী প্রাবৃটে মেঘের খেলা দেখিয়া পুচ্ছ বিস্তার করিয়া নৃত্য করে, তাই চাতক জলধর শোভা দেখিয়া উধাও হইয়া আকাশ পানে ধাবিত হয়। তাই চকোর চাঁদের পানে আত্মহারা হইয়া উড়িয়া যায়। সে পশু পক্ষীর কথা এস্থলে প্রয়োজন নাই। মানুষেই এই সৌন্দর্য্যানুভবশক্তির বিশেষ বিকাশ হয়। তাই মানুষ সৌন্দর্য্যানুভবকালে একেবারে আত্মহারা হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু আমরা সাধারণতঃ যে বাহ্যিক আনন্দ উপভোগ করি, সে আনন্দ দেশকাল পরিচ্ছিন্ন —সে আনন্দ ক্ষণিক। সে চিত্তনিরোধ ক্ষণিক, সে আনন্দের মোহ শীঘ্র ভাঙ্গিয়া যায়। ফুল দেখিতে দেখিতে শুকায়, নিদাঘে মেঘের কোলে বিজলীর খেলা দেখিতে দেখিতে পলায়, গিরিশৃঙ্গে তরুণ অরুণের নৃত্য দেখিতে দেখিতে ফুরায়, দিব্য সঙ্গীতের মধুর স্বর শুনিতে শুনিতে অনন্তে মিলায়, রমণীর রূপ ও বালকের মধুরতা দেখিতে দেখিতে লুকায়। তাই সে আনন্দ অধিকক্ষণ ভোগ হয় না। তাই আবার সেই আনন্দসাগর হইতে আমিত্বের পুনরুত্থান হয়। সাধারণতঃ মানুষের আনন্দবৃত্তির বা সৌন্দর্য্যানুভূতি-শক্তির বিশেষ বিকাশ সহজে সম্ভব নহে। বলিয়াছি ত, আমরা প্রথমে শারীরিক দুঃখ দূর করিতে গিয়া যে নিম্নশ্রেণীর দৈহিক বা ইন্দ্রিয়জ সুখ পাই—তাহা হইতেই আমাদের আনন্দবৃত্তির বিকাশ হইতে আরম্ভ হয়। বাহ্য বিষয়জ্ঞান হইলে, যখন সেই বিষয় ত্যাগ বা গ্রহণের ইচ্ছার পরিবর্ত্তে কেবল সেই জ্ঞান হইতে তাহার সৌন্দর্য্যাদি অনুভব করিবার ক্ষমতা জন্মে, তখন হইতে আমাদের সাত্ত্বিক আনন্দবৃত্তির বা প্রকৃত হ্লাদিনী শক্তির বিকাশ হইতে আরম্ভ হয়। এই হ্লাদিনী শক্তির যত বিকাশ হয়, ততই আমরা প্রথমে বাহ্য বিষয়ে সৌন্দর্য্য মহত্ত্ব প্রভৃতি অনুভব করিয়া তাহা হইতে আনন্দভোগ করিতে শিক্ষা করি। কিন্তু বলিয়াছি ত, সকল বাহ্য বিষয়ই সুন্দর বা মহৎ নহে। জগৎ ক্রমবিবর্ত্তনশীল। সেই মহাপ্রকৃতি কালশক্তিবশে ক্রমে ক্রমে জগৎকে ভগবানের সেই আদর্শ কল্পনার অভিমুখে লইয়া যান। তিনি সেই ব্রহ্ম কল্পনায় স্থান কালরূপ 'টানা পড়েন' সূত্র দিয়া গঠিত চিত্রপটে বিশেষ স্থানে ও বিশেষ কালে সৌন্দর্য্যের, মহত্ত্বের, বিরাটত্বের নানারূপ অভিনব সৃষ্টি সেই মহাকল্পনা অনুসারে সদ্রূপে বিকাশ করিতে করিতে অনন্তের দিকে জগৎকে লইয়া যান। তাই নিত্য পরিবর্ত্তনশীল জগতে কোন ব্যষ্টি সৌন্দর্য্য মহত্ত্ব বিরাটত্ব কখন বুঝি পূর্ণরূপে বিকাশিত হয় না,—তাহা কখন নিত্য স্থায়ী হয় না। জগতে ব্যষ্টি সৌন্দর্য্যের মহত্ত্বের ক্রম-আপূরণ মাত্র হইতে থাকে। কাজেই জগতে আমরা অনেক স্থলে অপূর্ণত্ব, অসৌন্দর্য্য, অমঙ্গল প্রভৃতি দেখিতে পাই। সে কদর্য্যত্ব ক্ষুদ্রত্ব নীচত্ব দেখিয়া আমাদের আনন্দের পরিবর্ত্তে নিরানন্দ আসে—সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখ আসে। আমাদের জ্ঞানের বিকাশের সহিত, সৌন্দর্য্যানুভূতির বিকাশের সহিত, যতই আদর্শ-সৌন্দর্য্যজ্ঞানের বিকাশ হয়, যতই আদর্শ মহত্ত্ব বিশালত্বের ধারণার বিকাশ হয়, ততই তাহার পার্শ্বে বাহ্য

জগতে অসুন্দর অমহান্ দেখিয়া আমরা দুঃখ পাই। যাহা সৌন্দর্য্যানুভূতিশক্তির প্রথম বিকাশাবস্থায় আমাদের নিকট সুন্দর মনে হইত, তাহাই আমাদের সৌন্দর্য্যানুভূতির অপেক্ষাকৃত বিকাশে—আদর্শ সৌন্দর্য্য ধারণার ক্রমপরিণতিতে—অসুন্দর বলিয়া আমাদের মনে হয়। সুতরাং যতই আমাদের চিত্তরঞ্জিনী বা হ্লাদিনী বৃত্তির বিকাশ হয়, যতই সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য মহত্বের আদর্শ ধারণার ক্রমবিকাশ হয়, ততই আমরা জগতে অসৌন্দর্য্য অমঙ্গল দেখিতে পাই, ও সে অমঙ্গল দেখিয়া দুঃখ পাই।

৮৮। এই ব্যবহারিক সৌন্দর্য্যাসৌন্দর্য্যানুভূতি আমাদের কাল্পনিক আদর্শ সৌন্দর্য্যজ্ঞানের উপর নির্ভর করে। জড় বল জীব বল মানুষ বল—যাহার যেরূপ আদর্শ আমরা ধারণা করিতে পারি, তদনুসারে, যে যত সেই আদর্শের অনুরূপ—সে তত আমাদের নিকট সুন্দর বোধ হয়। বলিয়াছি ত, এই আদর্শজ্ঞান ক্রমবিকাশশীল। এজন্য প্রথম অবস্থায় যাহাকে আমরা আমাদের তদানীন্তন নিম্ন আদর্শ ধারণার অনেকটা অনুরূপ বলিয়া সুন্দর মনে করিতাম, তাহাকে আর এক অবস্থায়—আমাদের উচ্চতর আদর্শ কল্পনার অনেক দূরে দেখিয়া, অসুন্দর মনে করি। যাহা কাল্পনিক শ্রেষ্ঠ আদর্শ, তাহা প্রায় জগতে পাওয়া যায় না। তাহা সাধারণ হইতে পারে না। এজন্য যাহা সাধারণ, তাহাকে সে কাল্পনিক আদর্শের অনুরূপ সুন্দর বোধ হয় না। আমাদের প্রথম সৌন্দর্য্যজ্ঞান তামসিক—আমাদের স্বার্থ সংসৃষ্ট। যাহা আমাদের যত ব্যবহার্য্য—আমাদের ভোগবৃত্তি চরিতার্থের যত উপযুক্ত, তাহাকেই আমরা প্রথমে সুন্দর মনে করি। তাহার পর আমাদের নিজের সহিত সে সম্বন্ধের ভাবনা ত্যাগ করিয়া, যখন বাহ্য বিষয়ের কথা ভাবিতে শিখি—তখন তাহার সংসৃষ্ট অন্যের সহিত তাহার সম্বন্ধ যতটা ধারণা করিতে পারি—সেই সম্বন্ধের সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য সেই বিষয় বা সেই বস্তু যতদূর উপযোগী বলিয়া বুঝিতে পারি, অথবা এ বিরাট সংসার মধ্যে যাহার যে স্থান, এবং সে স্থান অধিকার করিবার জন্য—বা সে স্থানের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য যাহার যতদূর বিকাশের আবশ্যক, সেই বস্তুর তদনুযায়ী বিকাশ আমরা যতদূর ধারণা করিতে পারি—তদনুসারে সে বিষয় আমাদের কাছে সুন্দর বোধ হয়। আমাদের কাল্পনিক শ্রেষ্ঠ আদর্শ ধারণার অনুযায়ী যে যতদূর আদর্শ লাভ করিয়াছে—সে ততদূর আমাদের কাছে সুন্দর। মানুষ ও সাধারণ জীবের যে বাহ্য আকৃতির বা শারীরিক গঠনের আদর্শ আমরা ধারণা করিতে পারি—সেই জীবের নিজ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য, বাহ্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া তাহার পূর্ণ বিকাশের উপযোগী অথচ সুন্দর শরীরের যে আদর্শ আমরা ধারণা করিতে পারি,—তাহার শরীর সেই ধারণা অনুরূপ আদর্শের যত নিকটবর্ত্তী হয়—ততই তাহার বাহ্য আকৃতি আমাদের কাছে অসাধারণ ও সুন্দর বোধ হয়। অনেক স্থলে মানুষের আন্তরিক সৌন্দর্য্য তাহার বাহ্য আকৃতিতে বিকাশিত বা সংক্রামিত হয়। অনেকের প্রশান্ত সৌম্য মূর্ত্তিতে তাহার আন্তরিক সাত্ত্বিকতা ও নির্ম্মলতা প্রকাশ পায়। প্রতিভাশালী ব্যক্তির মুখে তাহার প্রতিভার জ্যোতি বিকিরিত হয়।

এজন্যও আমরা মানুষের বাহ্য সৌন্দর্য্য দেখিয়া অনেক স্থলে মোহিত হই। সে যাহা হউক, মানুষের বাহ্য শারীরিক সৌন্দর্য্য অপেক্ষা তাহার আন্তরিক সৌন্দর্য্য আমাদের অধিক পরিমাণে আকর্ষণ করে। মানুষের আন্তরিক সৌন্দর্য্যের, আদর্শ প্রকৃত মনুষ্যত্বের আদর্শ যতই আমাদের জ্ঞানে বিকাশিত হইতে থাকে, ততই আমরা মানুষের অন্তরে সে ধারণা অনুযায়ী আদর্শ মনুষ্যত্বের কতদূর বিকাশ হইয়াছে বুঝিয়া, তাহাকে সুন্দর বা অসুন্দর মনে করি।

৮৯। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, মানুষ জ্ঞাতা কর্ত্তা ও ভোক্তা। মানুষের জ্ঞানবৃত্তি, কর্ম্মবৃত্তি ও আনন্দবৃত্তি আছে। মানুষের সেই বৃত্তি ক্রমবিকাশশীল। সেই বৃত্তির পূর্ণ বিকাশে—ব্যক্তিত্বের পূর্ণ সম্প্রসারণে—জাতিত্বে ব্যক্তিত্বের পরিণতিতে—মানুষের মনুষ্যত্বের পূর্ণত্ব। মানুষের পূর্ণ কাল্পনিক আদর্শ—সাধনাবিহীন আমরা ধারণা করিতে পারি না। মানুষের যে পর্য্যন্ত আদর্শ আমরা ধারণা করিতে পারি, যাহাকে আমরা সেই আদর্শের যতদূর নিকবর্ত্তী দেখিতে পাই—তাহাকে ততদূর সুন্দর মনে করি। যে তামসিক প্রকৃতিসম্পন্ন চোর বা দস্যু—তাহার কাছে বোধ হয় রঘু ডাকাত শ্রেষ্ঠ আদর্শ। যে সামান্য ইন্দ্রিয়ভোগসুখই পরম পুরুষার্থ মনে করে, তাহার কাছে বোধ হয় ঐ নগরের প্রশস্ত পথ দিয়া আকাশ পাতাল বিকম্পিত করিয়া, প্রাণ ভয়ে পলায়নপর লোককে মথিত করিয়া ধাবিত চারি ঘোড়ার গাড়ী আরূঢ়,পারিষদ্‌মণ্ডলীশোভিত বিলাসী বাবুই প্রধান আদর্শ। যে কেবল ছলে বলে কৌশলে ধনার্জ্জনই পরমপুরুষার্থ মনে করে—ঐ কোটীপতিই বুঝি তাহার প্রধান আদর্শ। যে কর্ম্মী—কর্ম্মবীরই তাহার প্রধান আদর্শ,যে জ্ঞানী—পূর্ণজ্ঞানীই তাহার প্রধান আদর্শ।

যে যাহার আদর্শ—সে তাহার কাছে সুন্দর, তাহাকে সে ভালবাসে। সে সেই আদর্শ লাভ করিতেই চেষ্টা করে। মানুষ সাধারণতঃ স্বার্থপর আত্মসর্ব্বস্ব। মানুষ প্রায়ই তামসিক বা রাজসিক প্রকৃতি সম্পন্ন। মানুষ প্রায়ই প্রবৃত্তির দাস। মানুষে পশু প্রকৃতিও বিশেষ বিকাশিত। মানুষের মধ্যে অতি অল্প লোকেই উন্নত মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়। মানুষের মধ্যে দেবত্ব কদাচিৎ দেখা যায়। মানুষে জ্ঞানবৃত্তি ও আনন্দ বৃত্তির বিশেষ বিকাশ আমরা কদাচিৎ দেখিতে পাই। মানুষে প্রকৃত পরার্থবৃত্তির বিশেষ বিকাশ আমরা কদাচিৎ দেখিতে পাই। এই জন্য মানুষের উচ্চ আদর্শের ধারণা আমাদের যত বিকাশিত হইতে থাকে, ততই ধার্ম্মিক মানুষ—জ্ঞানী মানুষ—পরোপকারী কর্ম্মী মানুষ—দেবতুল্য মানুষ আমরা সুন্দর দেখি, ততই তাঁহাদিগকে আমরা ভক্তি করিতে শিখি। ততই সেরূপ মানুষ দেখিয়া আমরা আনন্দ পাই, ততই,সে শ্রেষ্ঠ মানুষের আদর্শে আমরা আপনাদিগকে উন্নীত করিতে চেষ্টা করি।

মানুষের পরার্থবৃত্তির যত বিকাশ হয়, সামাজিক বৃত্তির যত বিকাশ হয়, যতই স্বার্থপরতা দূর হইয়া পরার্থপরতার বিকাশ হয়—ততই সে মানুষ সুন্দর হয়। মানুষের ব্যক্তিত্ব অপেক্ষা জাতিত্ব বিকাশে, ব্যক্তিগত জ্ঞানবৃত্তি প্রভৃতি বৃত্তিবিকাশের অপেক্ষা পরার্থবৃত্তির বিকাশে মানুষকে অধিকতর সুন্দর দেখায়। মানুষের মধ্যে স্নেহ দয়া প্রেম

ভক্তি ধর্ম্ম প্রভৃতি বৃত্তির যতই বিকাশ হয় —ততই মানুষকে সুন্দর দেখায়। যে নিজের জন্য জ্ঞানার্জ্জন করে, তাহা অপেক্ষা যে জ্ঞান বিতরণ ব্রত গ্রহণ করে, যে নিজের উন্নতির জন্য বা জ্ঞান কর্ম্ম ও চিত্তবৃত্তির বিকাশের জন্য কর্ম্ম করে, তাহা অপেক্ষা যে পরের—সমাজের—মনুষ্যজাতির—সর্ব্বজীবের উন্নতির জন্য কর্ম্ম করে,—যে নিজে নিষ্কাম হইয়া লোকসংগ্রহার্থে, যজ্ঞার্থে, ঈশ্বরার্থে অবতীর্ণ মহাপুরুষদের অনুকরণ করিয়া কর্ম্ম করে—সে অধিক সুন্দর—সে আদর্শের অধিক নিকটবর্ত্তী।

৯০। এইরূপে জড়জগতে জীবজগতে বিশেষতঃ মনুষ্য জগতে যে মহত্বের আদর্শ, সৌন্দর্য্যের আদর্শ, বিরাটত্বের আদর্শ—তাহা শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীগণ প্রথমে ধারণা করিয়া মানব সমাজে প্রচার করেন, তাহা শ্রেষ্ঠ 'শিল্পী' বা কলাবিদ্‌গণ দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্যষ্টিভাবে চিত্রিত করিয়া আমাদিগকে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করেন। শ্রেষ্ঠ কবিগণ আশ্চর্য্য ঐশী শক্তিবলে সে মহা আদর্শ আমাদিগকে বুঝাইয়া দেন। যে ব্রহ্ম কল্পনার সৎরূপ বিকাশে জগতের বিকাশ—যাহা ব্যষ্টিভাবে বহু হইয়া দেশকাল পাত্র দ্বারা সীমাবদ্ধ হইয়া আংশিক অপূর্ণরূপে ব্যক্ত—সেই মূল কল্পনায় তাহার প্রকৃষ্ট আদর্শ—কবি আমাদিগকে দেখাইয়া দেন। জগতের অপূর্ণত্বের মধ্যে—নিয়ত পরিবর্ত্তন মধ্যে—তাহার পূর্ণ নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় রূপ আমাদের দেখাইয়া দেন। আর কবি যাহা ভাষার সাহায্যে পূর্ণরূপে পরিস্ফুট করিয়া দেখাইতে পারেন, তাহা সঙ্গীতাচার্য্য কলাবিদ্‌গণ বা শ্রেষ্ঠ চিত্রকর ও ভাস্করগণ আংশিক রূপে দেখাইতে চেষ্টা করেন। সে মহা আদর্শ—কবি কলাবিৎ চিত্রকর ভাস্কর—শব্দে সুরে পটে বা প্রস্তরে অঙ্কিত করেন। বলিয়াছি ত, বাহ্যজগতে আমাদের সে আদর্শ সুন্দরকে দেখিতে পাই না। আর যদিও কদাচিৎ কখন দেখিতে পাই, তবে তাহা দেশকালপরিচ্ছিন্ন-ক্ষণিক। তাহা মেঘের কোলে তড়িল্লতার মত সহসা দেখা দিয়া লুকায়—তাহা আর ভাল করিয়া প্রাণ ভরিয়া দেখা হয় না। তাই কৃতী শিল্পী সে সৌন্দর্য্য ধরিয়া রাখিতে—তাহাকে চির বর্ত্তমান করিয়া রাখিতে—কালের করাল কবল হইতে তাহাকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করে। যে প্রতিভাশালী পুরুষ যতদূর সৌন্দর্য্যদ্রষ্টা—সে ততদূর সৌন্দর্য্যস্রষ্টা হইতে চাহে। সে বুঝি বিধাতার সৃষ্টির অপূর্ণতাকে পূর্ণ করিতে চাহে। যে আদর্শ সৌন্দর্য্যকে—যে বিধাতার আদর্শ কল্পনাকে প্রকৃতি পূর্ণ সৎরূপে বিকাশিত করিতে চেষ্টা করিয়াও করিতে পারেন না—অথবা যাহা সৃষ্টি করিয়াও ধরিয়া রাখিতে পারেন না, কবি সে আদর্শ সুন্দরকে সৃষ্টি করিয়া ধরিয়া রাখিতে চাহেন। এই আদর্শ সৌন্দর্য্য সৃষ্টি ও রক্ষার চেষ্টা হইতে—এই সৌন্দর্য্যানুভূতির বিশেষ বিকাশ হইতে কলাবিদ্যা বা সুকুমার বিদ্যার বিকাশ হয়। (১)

(১) ইহা সাত্বিক উচ্চশ্রেণীর কথা—সাত্বিক হ্লাদিনীশক্তির বিশেষ বিকাশের কথা। ইহার রাজসিক ও তামসিক অথবা বিকৃত বিকাশে স্বর্গের সুধাময় সঙ্গীতও অবনত হইয়াছে। নৃত্য গীত বাদ্য প্রভৃতি আমাদের ইন্দ্রিয়বৃত্তির কদর্য্য চরিতার্থতা জন্য—কুৎসিত ভাব প্রকাশের জন্য অপব্যবহৃত হইয়াছে। সাধক যে শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতের দ্বারা ভগবানের আরাধনা করেন, প্রেমিক যে সঙ্গীতের সাহায্যে প্রাণের উচ্চভাব শ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা

শ্রেষ্ঠ কবি-শিল্পীগণ প্রধানতঃ মনুষ্যত্বের আদর্শ দেখাইতে চেষ্টা করেন। কবি মানবের অন্তরের সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলেন। অন্তরের প্রত্যেক ভাব, প্রত্যেক বৃত্তি, তাহার শক্তি স্থিতি গতি বিকাশ ঘাত-প্রতিঘাত—সব দেখাইয়া দিয়া কবি সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাবলে প্রকৃত মনুষ্যত্বের পূর্ণচিত্র আমাদের জন্য অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করেন। কখন বা মনুষ্যত্বের উচ্চ আদর্শের কাছে নিম্ন আদর্শ দেখাইয়া দিয়া মানুষের মনে উচ্চ আদর্শের প্রতি আকর্ষণ ও হেয় আদর্শের প্রতি ঘৃণা পরিস্ফুট করিয়া—মানুষকে সেই উচ্চ আদর্শের দিকে লইয়া যাইতে চেষ্টা করেন। মানুষের প্রত্যেক বৃত্তির আদর্শ পরিণতি কতদূর পর্য্যন্ত হইতে পারে, কবি তাহা আমাদের দেখাইয়া দেন। এবং সেজন্য কবি যতদূর পর্য্যন্ত মনুষ্যত্বের আদর্শ ধারণা করেন বা সে আদর্শ মানুষের মধ্যে যতদূর দেখিতে পান, বা কল্পনা করেন, তাহা কাব্যে অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করেন; তাহাতে একরূপ স্থায়ীভাব দিতে চেষ্টা করেন,—বাস্তব জগতে সে আদর্শের কদাচিৎ অভিব্যক্তিকে কালের ক্ষণিকত্ব হইতে স্থানের একদেশত্ব হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন। অথবা কবি তাঁহার কল্পনা চক্ষে মানুষের যে সৌন্দর্য্যময় আদর্শ দেখিতে পান, সেই ধারণাকে কল্পনা রাজ্য হইতে বাস্তব রাজ্যে অথবা নিজের সীমাবদ্ধ শক্তি অনুসারে সুন্দর করিয়া সৎরূপে পরিণত করিতে চেষ্টা করেন। কবি সে সুন্দর আদর্শের স্বরূপ সাধারণকে দেখাইয়া দিয়া—সাধারণকে সেই আদর্শের দিকে আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করেন। যে কবি যতদূর উচ্চ আদর্শ আমাদের দেখাইয়া দেন, সে কবি তত শ্রেষ্ঠ—সে কবি সমগ্র মানবজাতির মধ্যে তত পূজ্য। তাঁহার সে আদর্শ সার্ব্বজনিক, সার্ব্বকালিক। সে মহা আদর্শ—সমগ্র মানব সমাজকে তাহার অভিমুখে অলক্ষ্যে লইয়া যাইতে চেষ্টা করে। কবিগুরু বাল্মীকি ব্যাস প্রভৃতি যে সুন্দর মহান্ বিরাট মনুষ্যত্বের আদর্শ আমাদের সম্মুখে ধরিয়া রাখিয়াছেন, সে মহা আদর্শ ধরিয়া সমগ্র আর্য্যজাতি একদিন সে আদর্শের অনেক নিকটবর্ত্তী হইতে পারিয়াছিল। কিন্তু সে কথা এস্থলে আবশ্যক নহে।

৯১। যাহা হউক, মানুষের যেরূপ আদর্শের ধারণা আমাদের জ্ঞানে বিকাশিত হয়, বলিয়াছি ত, যে মানুষ সেই আদর্শের যতদূর নিকটবর্ত্তী হয়, সে আমাদের কাছে ততদূর সুন্দর দেখায়। তাহাকে দেখিয়া আমাদের ততদূর আনন্দ হয়। তাহার প্রতি আমাদের ততদূর প্রীতি ভালবাসা, ভক্তি বা অনুরাগের উদয় হয়। আমরা যাহাকে যত সুন্দর দেখি, তাহাকে তত

ব্যক্ত করেন, তাহাও অশ্লীল ভাব প্রকাশের উপকরণ হইয়াছে। এই কলাবিদ্যার বিকৃত বিকাশে শুধু সঙ্গীত বলিয়া নহে,—কবি চিত্রকর ভাস্কর ও তাহাদের উচ্চ দিব্য শিল্পেরও অবমাননা করিয়াছে। যেমন এই শ্রেষ্ঠ হ্লাদিনীশক্তির বিকৃত ও বীভৎস বিকাশে মানুষ পরকে অকারণ কষ্ট দিয়া সুখ পায়, জীবকে—এমন কি মানুষকে, পর্য্যন্ত হত্যা করিয়া—তাহার মৃত্যু যাতনা দেখিয়া সুখ পায়, মানুষ Gladiator's show, cock বা bull fight প্রভৃতি দেখিয়া সুখ পায়—তেমনই বিকৃত তামসিক কলা বিদ্যার অনুশীলনেও সুখ পায়। আমরা এস্থলে সে তামসিক হ্লাদিনীবৃত্তি চরিতার্থতার কথা বলিতেছি না। সেই আনন্দবৃত্তির বা হ্লাদিনী শক্তির ক্রমবিকাশতত্ত্ব ও সাত্ত্বিক বিকাশের কথা বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি মাত্র।

ভালবাসি। যাহাকে যত আদর্শের নিকট-বর্ত্তী দেখি, তাহাকে তত ভক্তি করি। এই-জন্য এই প্রেম ভক্তি প্রভৃতি বৃত্তিকেও চিত্তরঞ্জিনী বা হ্লাদিনী বৃত্তি বলে। সে যাহা হউক, আমাদের আদর্শ অনুযায়ী মানুষ দেখিলে যেমন আমাদের আনন্দ হয়,তেমনই যে মানুষ সেই আদর্শ হইতে যত অধিক দূরে গিয়া পড়ে—সে আমাদের কাছে তত অপূর্ণ অসুন্দর বা কুৎসিৎ দেখায়, তাহাকে তত ভালবাসিতে ইচ্ছা করে না,—তাহাকে দেখিয়া তত আমাদের দুঃখ হয়। অতএব আমাদের সৌন্দর্য্যানুভূতিশক্তির বা হ্লাদিনী শক্তির এই নূতন রূপ বিকাশে—আমাদের নূতন রূপ সুখদুঃখানুভূতির বিকাশ হয়। জগতের মধ্যে জীব জড় যাহার যে আদর্শ আমরা ধারণা করি—যাহাকে সেই আদর্শের যত নিকটবর্ত্তী দেখি, তাহাকে তত সুন্দর দেখিয়া তত আনন্দ পাই,—আর যাহাকে সেই আদর্শের যত দূরবর্ত্তী দেখি—তাহাকে তত কুৎসিৎ মনে করিয়া দুঃখ পাই। আমাদের জ্ঞানের বা কল্পনার যে আদর্শ ধারণা—সেই আদর্শ হইতে যে যত দূরে—সে তত অসুন্দর—সে তত দুঃখজনক। মানুষ এই হ্লাদিনী-বৃত্তিবশে সেই অসৌন্দর্য্যজনিত দুঃখ দূর করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করে। সে তাহার অণুপরিমাণ শক্তি লইয়াও তাহার সেই কাল্পনিক আদর্শকে সর্ব্বত্র সৎরূপে বিকাশিত করিতে চেষ্টা করে। সে সর্ব্বত্র নিরানন্দকে আনন্দে পরিণত করিতে, অসুন্দরকে সুন্দর করিতে,ক্ষুদ্রকে তাহার আদর্শ অনুযায়ী মহৎ করিতে কর্ম্মে রত হয়। তবে যাহার প্রকৃতি হেয়, সে সেই অসুন্দরকে ঘৃণা করে—তাহাকে পরিহার করে। কেবল যাহার প্রকৃতি উন্নত, যে নিজে প্রকৃত মনুষ্যত্বের আদর্শের দিকে কতক পরিমাণেও অগ্রসর হইতে পারিয়াছে,যে মহা সহানুভূতি বলে—সকল মানুষকে আপনার করিয়া লইয়াছে, সমস্ত জগৎটাকে আপনার করিয়া লইয়াছে, সে সেই অসুন্দরকে দেখিয়া দুঃখ পায়,—সেই অসুন্দরের প্রতি তাহার দয়া বৃত্তির বিকাশ হয়। যে নানাবিধ দুঃখে পড়িয়া কষ্ট পাইতেছে—আপনাকে আর উন্নত করিতে পারিতেছে না, আদৌ মনুষ্যত্বের অভিমুখে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না—তাহাকে দেখিয়া সে নিজে দুঃখ পায়। মানুষ দুঃখ পাইলেই দুঃখ নিবারণ চেষ্টা করে। তাই শ্রেষ্ঠ লোক সেই দুঃখ দূর করিবার জন্য তাহার দয়া বা সহানুভূতি বৃত্তিবশে অসুন্দর মানুষকে সুন্দর করিতে চেষ্টা করে, আদর্শ অপেক্ষা হেয় মানুষকে আদর্শে উন্নীত করিতে চেষ্টা করে। তাহার জন্য মানুষ পরার্থ কর্ম্ম করে। মানুষ যেমন আপনাকে তাহার কাল্পনিক আদর্শ অপেক্ষা হীন দেখিলে দুঃখ পায়—লজ্জিত হয়—অনুতপ্ত হয়—ও সেই আদর্শ অভিমুখে যাইবার জন্য চেষ্টা করে, তেমনই সে যে পরকে আপনার করিয়া লইয়াছে, সে পরকে সে আদর্শ অপেক্ষা হেয় দেখিলে দুঃখ পায়, ও সেই পরকেও সে আদর্শ অভিমুখে লইয়া যাইতে চেষ্টা করে। সে যেমন আপনার মধ্যে অসুন্দরকে দেখিয়া দুঃখ পায়—আপনাকে সুন্দর করিতে চাহে—তেমনি সে যে পরকে আপনার করিয়া লইয়াছে,সে পরকেও অসুন্দর দেখিয়া দুঃখ পায়, সে পরকেও সুন্দর করিতে চাহে।

জগতে কার্য্য কারণের ঘাতপ্রতিঘাত নিয়ম বড় আশ্চর্য্য। যাহা এক সময়ে কার্য্য—তাহাই অন্য সময় কারণরূপে কার্য্য-

কর হয়। আমরা দেখিয়াছি যে, যে সুন্দর, তাহার প্রতি স্বতঃই প্রেম ভালবাসা ভক্তি প্রভৃতির বিকাশ হয়। তেমনই যে আমাদের স্বাভাবিক সম্বন্ধ হেতু প্রীতি ভক্তি বা ভালবাসার পাত্র—তাহাকে আমরা সুন্দর দেখি, তাহাকে আমাদের আদর্শের অনুযায়ী সুন্দর দেখিতে চাহি। তাহাকে সুন্দর দেখিলে আমাদের আনন্দ হয়—অসুন্দর দেখিলে দুঃখ হয়। এই জন্য মানুষ তাহার স্বাভাবিক সহানুভূতিবশে—স্নেহ দয়া প্রীতি বশে—প্রথমে তাহার স্ত্রী পুত্র আত্মীয়দের সুন্দর দেখিতে—তাহাদের মধ্যে তাহার আদর্শ অনুযায়ী মনুষ্যত্বের বিকাশ দেখিতে চাহে। তাহার পর সে নিজের কুল, নিজের গ্রাম, ক্রমে নিজের জাতি, নিজের সমাজকে আদর্শের অনুযায়ী সুন্দর দেখিতে চাহে। তাহাদিগকে সেই আদর্শ হইতে বহুদূরে দেখিলে দুঃখ পায়। মানুষের শক্তি জ্ঞানের সহানুভূতির যত বিকাশ হয়, সমগ্র জগতের সম্বন্ধে এই আদর্শের ধারণা—সৌন্দর্য্যের ধারণা যত বিকাশিত হয়, ততই মানুষ ক্রমে সমগ্র মানবজাতিকে, সমস্ত জীবকে, শেষ সমস্ত জড়জীবময় জগতকে, তাহার আদর্শের অনুরূপ বা সে আদর্শের ন্যায় সুন্দর দেখিতে চায়। জগতের কোথাও অসৌন্দর্য্য দেখিলে সে দুঃখ পায়। কখন কখন সে দুঃখ এত তীব্র হইতে পারে—সে অসুন্দরকে দেখিয়া মনে এতদূর ক্লেশ হইতে পারে যে, তখন সে মানুষের যদি শক্তি থাকে, তবে সে সমগ্র শক্তি দিয়া ও তাহার নিজের যথাসর্ব্বস্ব দিয়াও এ জগৎকে তাহার কাল্পনিক আদর্শের অনুযায়ী সুন্দর করিয়া গড়িতে চেষ্টা করে। যেখানে যাহা কিছু অসুন্দর, অমহৎ বা ক্ষুদ্র দেখিতে পায়—যেখানে যাহা কিছু ভাল, যাহা কিছু মধুর সুন্দর মহৎ বা বিশাল হইতে পারিত, তাহা অসুন্দর মহৎ ক্ষুদ্র হইয়া আদর্শের অনেক নিম্নে পড়িয়া রহিয়াছে দেখিতে পায়, সে তাহার শ্রেষ্ঠ প্রকৃতি বশে ও বিকাশিত কর্ম্মশক্তি সাহায্যে সেই অসুন্দরকে কুৎসিৎকে তাহার আদর্শ সৌন্দর্য্য মহত্ত্বে লইয়া যাইতে চেষ্টা করে। যাঁহারা জগৎকে এইরূপ সৌন্দর্য্যময় করিতে চেষ্টা করেন, মানুষকে সুন্দর করিতে—আনন্দময় করিতে চেষ্টা করেন, সর্ব্বদা, সর্ব্বত্র অসুন্দরকে সুন্দর করিয়া তাঁহাদের আদর্শের অনুরূপ করিয়া লইবার জন্য কর্ম্ম করেন, তাঁহারাই যথার্থ কর্ম্মবীর। তাঁহারা আমাদের পূজনীয়। তাঁহাদের চেষ্টাতেই মানবসমাজের ও সমগ্র মানবজাতির ক্রমোন্নতি হয়। তাঁহাদের এই দুঃখানুভূতির ফল পরার্থ কর্ম্ম—তাহার ফল মানবের ক্রমোন্নতি।

৯২। এইরূপে মানুষের এই আদর্শ ধারণার ক্রমবিকাশে তাহার সৌন্দর্য্যানুভূতিরও যে ক্রমবিকাশ হয়, মানুষের অন্তরে সেই আদর্শ ধারণার—সেই সৌন্দর্য্যানুভূতি শক্তির যে কতদূর বিকাশ হইতে পারে, তাহা সাধনাবিহীন আমরা ধারণা করিতে পারি না। যখন এই সৌন্দর্য্যানুভূতির পূর্ণ পরিণতি হয়, তখন মানব এইরূপ ব্যষ্টি সৌন্দর্য্যানুভূতি ও তৎসংশ্লিষ্ট অসৌন্দর্য্যানুভূতি-জনিত সুখদুঃখভূমি অতিক্রম করিয়া, এক ভূমা পূর্ণ অদ্বিতীয় অভিনব অনন্ত অবিভক্ত সৌন্দর্য্যানুভূতিতে আপনাকে ডুবাইয়া দেয়। তখন সে আর উল্লিখিত সৌন্দর্য্যাসৌন্দর্য্যরূপ সুখ দুঃখানুভূতি বশে কর্ম্ম করে না। তাহার আর কর্ম্ম থাকে না। তখন সে সেই অদ্বিতীয়

সত্যশিবসুন্দরের মধ্যে আপনাকে বিলীন করিয়া দিয়া—ব্যক্তিত্ব ভুলিয়া 'সর্ব্বত্ব' লাভ করিয়া—সুখদুঃখভূমি অতিক্রম করিয়া মহা আনন্দময়ত্বে অবস্থান পূর্ব্বক জগতের ক্রমোন্নতিরূপ মহাকর্ম্ম ব্যাপারে—(বা কার্য্যব্রহ্মে)—একাত্মতা লাভ করে। তখন তাঁহার মুক্তি হয়। সে অবস্থায় সুখ দুঃখের অতীত আনন্দময় অবস্থায়, কোন গুরুতর দুঃখও আর তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না। তখন তাঁহার নিকট কুৎসিত বা অসুন্দর কিছু থাকে না। তিনি সকলের মধ্যেই সেই ভূমা সৌন্দর্য্যময়ের বিকাশ অনুভব করেন। যাহা আপাত দৃষ্টিতে কুৎসিত, অপবিত্র বা অসুন্দর বোধ হয়, তাহাতেও সেই পূর্ণ সৌন্দর্য্যের ও তাহার কাল্পনিক প্রকৃষ্ট আদর্শের, অপূর্ণ বিকাশ, ও ক্রম বিবর্ত্তন নিয়মে তাহার সেই আদর্শের দিকে গতি তিনি বুঝিতে পারেন। তিনি জীবের দুঃখতত্ত্ব মধ্যে ক্রমবিবর্ত্তন নিয়মে, সেই দুঃখের মধ্যে দিয়া সুখ দুঃখের অতীত সেই অপূর্ণ আনন্দময়ের রাজ্যের দিকে তাহার গতি ধারণা করেন। বলিয়াছি ত, এই মুক্ত বা সুখ দুঃখের অতীত অবস্থায়, তাঁহার আর নিজের কোন কর্ম্ম থাকে না বটে, কিন্তু তখনও তিনি জগতের পালন, রক্ষণ ও পোষণ বা ধর্ম্মরক্ষণ ও অধর্ম্ম দমন রূপ কর্ম্ম ব্যাপারে কার্য্যব্রহ্মের সহিত একাত্মতা হেতু আপনাকে ব্যাপৃত রাখিতে পারেন। সে কথা এস্থলে বুঝিবার প্রয়োজন নাই।

৯৩। এইরূপে মানুষ যে সৌন্দর্য্য ধারণা শক্তির পূর্ণ বিকাশে এক অদ্বিতীয় সত্য শিবসুন্দর মধ্যে আপনাকে বিলীন করিয়া দিতে উৎকট সাধনা করেন, সেই অদ্বিতীয় শান্ত শিবসুন্দর যিনি—আমাদের সৌন্দর্য্য ধারণার চরম আদর্শ যিনি—তিনিই আমাদের পূর্ণ সচ্চিদানন্দময় ভগবান। তিনি আমাদের পরম গতি—আমাদের পরম আশ্রয়। সেই ভূমা সৌন্দর্য্যময়ই জগতের সকল সৌন্দর্য্যের উৎস, আমাদের হৃদয়ে সৌন্দর্য্যানুভূতি শক্তির আকর। তিনিই আমাদের হ্লাদিনী শক্তির পূর্ণ চরিতার্থতার, পূর্ণ বিকাশের ও পরম বিশ্রামের স্থান। মানুষ সাধনা বলে যত উন্নীত হয়, তাহার হ্লাদিনী শক্তির ও আদর্শ সৌন্দর্য্য জ্ঞানের যতই বিকাশ হয়, ব্যষ্টি সৌন্দর্য্য হইতে সমষ্টি-সৌন্দর্য্যের—আদর্শ সৌন্দর্য্যের যতই ধারণা হয়, ততই সে সেই এক অনন্ত সৌন্দর্য্যের দিকে—পরম আদর্শ সৌন্দর্য্যের দিকে—সেই ভূমানন্দের অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে;—সেই ভূমানন্দ সাগরে অনন্ত সৌন্দর্য্য সাগরে আপনাকে চিরতরে বিলীন করিয়া দিতে চাহে। ক্ষুদ্র ব্যষ্টি ক্ষণস্থায়ী বাহ্য সৌন্দর্য্যে আপনাকে ক্ষণতরে বিলীন করিয়া দিয়া মানুষ যে আনন্দের, যে পরম সুখের আভাষ পায়, তাহা সেই নিত্য চিরনূতন সদা পূর্ণ এক অনন্ত অখণ্ড সৌন্দর্য্য মধ্যে—ভূমানন্দ সাগরের মধ্যে আপনাকে একেবারে বিলীন করিয়া দিয়া শ্রেষ্ঠ সাধনাসিদ্ধ মানুষ যে আনন্দ লাভ করেন, তাহার নিকট কিছুই কিছু নহে। তাই তিনি সে অমৃত ভূমানন্দ লাভ করিয়া যাহা কিছু অল্প ক্ষণিক মর্ত্ত্য বাহ্যিক আনন্দ, তাহা সমুদায় উপেক্ষা করেন।

সাধনার এই চরম অবস্থায়, মানুষের হ্লাদিনী শক্তির এইরূপ পূর্ণ বিকাশকালে মানুষ জগতে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সেই পরমানন্দময় ভগবানের বিকাশ দেখিতে পান। তখন তাঁহার মনুষ্যের অন্তরতম প্রদেশে যে ব্রহ্মা-

নন্দের বিকাশ হয়—যে ব্রহ্মের সংস্পর্শ-জনিত অত্যন্ত সুখের অনুভব হয়, তাহাই বাহিরে প্রতিবিম্বিত হইয়া তাঁহার নিকট সকলই আনন্দে পূর্ণ হইয়া যায়। তিনি জগতের যেখানে যে ব্যষ্টি সৌন্দর্য্যের—মহত্ত্বের—বিশালত্বের আংশিক বিকাশ অনুভব করেন, তাহার অন্তরালে সেই এক অখণ্ড অনন্ত সৌন্দর্য্যময়কে দেখিতে পান। বলিয়াছি ত, মানুষ যখন সেই ভূমানন্দ-সাগরে আপনাকে বিলীন করিয়া দিতে শিক্ষা করেন, তখন তিনি আর জগতে কোথাও অসৌন্দর্য্য দেখিতে পান না, তখন সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সেই মহা সুন্দরকে দেখিয়া সেই মহা আনন্দে তাঁহার সব একাকার, সব মধুময় হইয়া যায়—আনন্দ নিরানন্দ সব মিলিয়া তাহার উচ্চতর ভূমিতে উঠিয়া এক ভূমানন্দ মধ্যে সব বিলীন হইয়া যায়। তখন তিনি সর্ব্বত্র সেই পরম সৌন্দর্য্যময়ের বিভূতি দর্শন করেন। তখন তিনি "কুসুমে সেই ভূমা সৌন্দর্য্যময়ের কান্তি, সলিলে তাঁহার শান্তি, বজ্ররবে তাঁহার ভীম রুদ্ররূপ" দেখিতে পান; সূর্য্যে তাঁহার অনন্ত প্রেম ও শক্তির বাহ্য বিকাশ,(১) আকাশে তাহার অনন্তত্বের বিস্তার, অনন্ত স্থান কালে তাঁহার এতাদৃশ মহিমাময় ব্যাপকত্ব দেখিতে পান।

তখন আর তাঁহার ব্যষ্টি ক্ষুদ্র অসুন্দরকে দেখিবার অবসর কোথায়! এ পৃথিবীর ক্ষুদ্র ক্ষণিক সুখ দুঃখ অনুভব করিবারই বা অবসর কোথায়! তখন এ পৃথিবী তাঁহার কাছে কতটুকু! (২) এই পৃথিবী হইতে কত লক্ষ গুণ বড় গ্রহ উপগ্রহ সূর্য্য লইয়া এই সৌর জগৎ—কত নক্ষত্র হইতে ক্ষুদ্র! এরূপ কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড বা সৌর নক্ষত্র জগৎ লইয়া এ সংসার (৩) অনন্ত স্থান কালে এই অনন্ত সৌর নক্ষত্র জগতের বিকাশ বিনাশ ব্যাপারে সে মহা কবির মহাছন্দে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিলয় লীলায় তাহার বিশালত্বে, বিরাটত্বে, অনন্তত্বে, অনন্ত ব্যাপকত্বে এ পৃথিবীর কথা—ইহার ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সুখ দুঃখের কথা আর তাঁহার মনে আসে না। সকলই এই বিরাটত্বের মধ্যে অনন্তত্বের মধ্যে ডুবিয়া একাকার হইয়া যায়। যাঁহার সৌন্দর্য্যে, মহত্ত্বে ব্যাপকত্বে সব এইরূপে একাকার হইয়া যায়, যে ভয়ানকের ভয়ে রবি শশী তারা বায়ু বরুণ প্রভৃতি সকলে স্ব স্ব স্থানোচিৎ মহা ত্যাগাত্মক কর্ম্ম ব্যবহারে নিত্য নিরত, তাঁহার সৌন্দর্য্যে, অনন্তত্বে, মহত্বে, ভয়ানকত্বে তিনি তখন আশ্চর্য্য হইয়া, আত্মহারা হইয়া কি একরূপ অদ্ভুত ভক্তিতে ভয়ে, প্রেমে, আনন্দে বিভোর হইয়া, তাঁহাতেই একেবারে বিলীন হইয়া যাইতে ব্যাকুল হন।

(১) জর্ম্মাণ যোগীশ্রেষ্ঠ সুইডেন্‌বার্গ আমাদের এই কথা বুঝাইয়াছেন। তিনি এই স্থূল সূর্য্য মধ্য Spiritual sun ও তাহার আলোকে ঈশ্বরের প্রেমের বিকাশ ও উত্তাপে ঈশ্বরের শক্তির বিকাশতত্ব আলোচনা করিয়াছেন। বুঝি তিনি সূর্য্যমণ্ডলস্থিত নিয়ন্তা পুরুষকেও ধারণা করিয়াছিলেন।

(২) বিলাতী পণ্ডিত কার্লাইল বুঝি এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া এ পৃথিবী সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—"The ant-hill and its commotions."

(৩) এইরূপ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড বা সৌরনক্ষত্র জগতের ধারণা পুরাণের মধ্যে অনেক স্থানে আছে। যথা—

"অণ্ডানাং তু সহস্রাণাং সহস্রাণ্যযুতানি চ।
ইদৃশানাং তথা তত্র কোটি কোটি শতানি চ॥"
বিষ্ণুপুরাণ।

ব্রহ্মাণ্ড মেতৎ সকলং ব্রহ্মণঃ ক্ষেত্র মুচ্যতে।
সহস্র কোটয়ঃ সন্তি ব্রহ্মাণ্ডির্য্যগুর্দ্ধগাঃ।
সৌরপুরাণ।

এই জন্য মনুষ্যত্বের বিশেষ বিকাশে মানুষ সেই ভূমানন্দ লাভের জন্য এত লালায়িত হন। আর সে আনন্দ লাভ করিয়া যথাশক্তি সে আনন্দ জগতে বিলাইতে—সকল মানুষকে সে ভূমানন্দময়ের দিকে লইয়া যাইতে কর্ম্ম করেন, মানুষের মধ্যে তাহার হ্লাদিনী শক্তির এইরূপে পূর্ণ বিকাশ করিতে চেষ্টা করেন। আর তিনি নিজে যদি কখন সে মহা আনন্দ হইতে মুহূর্ত্ত জন্যও বিচ্যুত হন, তবে বড় দুঃখ পান। তাই বলিতেছি যে, মনুষ্যত্বের বিশেষ বিকাশাবস্থায়, মানুষ সে মহা আনন্দ লাভের জন্য পৃথিবীর সকল আনন্দ, সকল সুখ পরিত্যাগ করেন, আজীবন কঠোর সাধনা করেন। আর যখনই সে সাধনা করে, সেই মহা সৌন্দর্য্য-সাগরের—অনন্ত আনন্দ সাগরের কণা মাত্র ধারণা করিতে পারেন, তখন একেবারে আত্মহারা হইয়া যান। বলিয়াছি ত, তখন সকল ব্যষ্টি সৌন্দর্য্য, সকল ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ বোধ সেই ভূমানন্দ সাগরে চিরতরে বিলীন হইয়া যায়। বলিয়াছি ত, তখন 'অহং' 'ইদং' সব একাকার হইয়া গিয়া থাকে কেবল এক অনন্ত অখণ্ড আনন্দ সাগর। মানুষ যখন এই আনন্দময় অবস্থা লাভ করে, তখন তাঁহার হ্লাদিনী শক্তির এইরূপ চরম বিকাশ হয়, তখন তাঁহার মুক্তি হয়। কিন্তু সে কথা এখানে কেন ?(১)

শ্রীদেবেন্দ্র বিজয় বসু।

(১) সাংখ্য পাতঞ্জল দর্শন শাস্ত্র মতে ও বৌদ্ধধর্ম্ম মতে দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি বা নির্ব্বাণই পরম পুরুষার্থ। কিন্তু বেদান্ত মতে পূর্ণানন্দ লাভই পরম পুরুষার্থ। আনন্দ অবস্থা—সুখ দুঃখ এই দ্বৈতভাবের অতীত (Synthesis?) অবস্থা। ব্রহ্মই সচ্চিদানন্দময়—তিনিই সত্য শিবসুন্দর। ব্রহ্মে নির্ব্বাণ হইলেই আনন্দময়ত্ব লাভ হয়। সেই ভূমানন্দ কিরূপ, তৈত্তিরীয় উপনিষদে তাহার আভাষ আছে। তাহা এইরূপ ;—"(সেই ব্রহ্মের) আনন্দের এই মীমাংসা করা যাইতেছে। একজন বেদজ্ঞ ক্ষিপ্রকর্ম্মা দ্রঢ়িষ্ট ও বলিষ্ট যুবক আছে এবং এই বিত্তপূর্ণ সমস্ত পৃথিবী তাহার। ইহা এক (unit) আনন্দ। ইহার শতগুণ আনন্দ মানুষ গন্ধর্ব্বের এক আনন্দ। ইহার শতগুণ আনন্দ দেব গন্ধর্ব্বের এক আনন্দ। ইহার শতগুণ আনন্দ চিরলোকবাসী পিতৃদের এক আনন্দ। ইহার শতগুণ আনন্দ আজানজ দেবতার এক আনন্দ। ইহার শতগুণ আনন্দ কর্ম্ম দেবতার এক আনন্দ। ইহার শতগুণ আনন্দ দেবতাদের এক আনন্দ। ইহার শতগুণ আনন্দ ইন্দ্রের এক আনন্দ। ইহার শতগুণ আনন্দ বৃহস্পতির এক আনন্দ। ইহার শতগুণ আনন্দ প্রজাপতি ব্রহ্মার এক আনন্দ। ইহার শতগুণ আনন্দ ব্রহ্মের আনন্দ। এ সমুদায়ই কামনা-মুক্ত শ্রোত্রিয়ের আনন্দ।" অতএব সেই পৃথিবীপতির আনন্দ অপেক্ষা ব্রহ্মের আনন্দ দশলক্ষ কোটী গুণিত কোটী গুণ বা অনন্তগুণ অধিক।

"যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।"

শ্রুতিতে অন্যত্র আছে,

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি
আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসং বিশন্তি।

১৬ই শ্রাবণ।

রবিবার, ১৩১১ সাল।

নাই, নাই, শেফা নাই, মাহারা মা নাই,
মহা সুপ্তি মহা শান্তি দেছে তারে ঠাঁই,
সরলতা ঝরে পড়া যুগল নয়ন
গৃহাশ্রম আলোকরা মধুর আনন
বচনে অমিয়ক্ষরা মৃদুল ভাষিণী
অনসূয়া প্রকৃতিটী স্নেহ-উদ্ভাবিনী,
আছিল সে শকুন্তলা গৃহ-তপোবনে
তেজস্বিনী, বিলাসেরে ঠেলিয়া চরণে।

কৌমারে প্রবীণা পারা সুস্থিরা গম্ভীরা,
চম্পক-বরণ-স্নাতা, শিরীষ শরীরা,

মা আমার গৌরী মূর্ত্তি আনন্দ অপার,
সব লয়ে গেছে চলে রাখিয়া আঁধার,
চিতানলে দেহ তার হইয়াছে ক্ষার
কি বিপ্লব! কি গর্জ্জন! কত হাহাকার!!

এক রাশি শুভ পুষ্প, স্নিগ্ধ পরিমল,
বসন্তের কিশলয়, লাবণ্য নির্ম্মল,
শরত চাঁদের হাঁসি, তপন উল্লাস,
মধুযামিনীর প্রিয় মেদুর বাতাস,
অপ্রকাশ,—অপ্রকাশ,—লুকায়েছে তারা
বর্ষারূপা বুড়ী * বর্ষে শ্রাবণের ধারা,
শোকদগ্ধ পিতা মম তীব্র যাতনায়,
কাঁদেন শিশুর ন্যায়, পড়িয়া শয্যায়;
ছিঁড়ে গেছে চন্দ্র সূর্য্য তাই ভাবি মনে,
সহোদর কাঁদে তোর, অশ্রার্ত্ত নয়নে,
না বহে নয়নে জল, নির্ব্বাক নীরব
অর্দ্ধ ক্ষিপ্ত হারাইয়া উলালি বিভব।

শেফা নাই দেবী নাই, নাহি সে সুষমা,
নাহি সে সরলা মূর্ত্তি বিশ্বে নিরুপমা,
নাহি সে বিশ্বের মাঝে, ছেড়েছে সংসার,
চলে গেছে লয়ে তার, মাধুরী সম্ভার।
স্নিগ্ধ হস্তে, সহৃদয়, মরণ সুন্দর!
স্বর্গে তারে লয়ে গেছে করিয়া আদর;
স্বর্গে আজি বসিয়াছে বসন্ত উৎসব
চারিধারে ভুমানন্দ হর্ষ অকৈতব।

এস মৃত্যু; মা-র মত হস্ত প্রসারিয়া,
উদ্ভ্রান্ত বাসনা কাঁদে তোমার লাগিয়া,
মিথ্যা, চুরি, প্রবঞ্চনা, গর্ব্ব, অহঙ্কার
এ বিশ্বেরে করিয়াছে বিষের পাথার।
পারিজাত গন্ধ ভরা মোর শেফালিকা,
আছিল বন্ধুর নীতি পথ প্রদর্শিকা,
দূরে রেখে প্রতারণা, গর্ব্ব অহঙ্কার
যেতাম সাজিয়া শিশু মায়ের দুয়ার;

আর কেন? এস মৃত্যু সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর,
শ্রবণের দ্বারে কর রহস্য গুঞ্জর,
আমারে সুন্দর কর আমারে সরল
নিবাইয়া দেও বুকে চিতার অনল।

একা কেন,—একা কেন,—শেফা একা নয়
মিলেছে সেথায় তার মমতা অক্ষয়,
কঠোর পিতার স্নেহ অবিল, কঠিন
বলিত, পলিত, জীর্ণ নিষ্প্রভ, মলিন,
কিস্নেহ? হায় ধিক্! হায় ধিক্! এযে প্রবঞ্চনা
মা আমার ইথে কেন থাকিবে মগনা?
পারিজাত-হার পরা স্নেহ নির্ঝরিণী,
স্নেহ শিখরিণী-মায় পেয়েছে নন্দিনী,
পেয়েছে এখন সে যে আপন সোদরে,
ভাসিছে তাদের সাথে আনন্দ সাগরে,
মৃত্যু! তুমি, কি সম্পদ মিলায়েছ তায়,
সে দৃশ্যের প্রতিবিম্ব শোভে কল্পনায়:—
অমূল্য ধরেছে হাত, প্রেয়সী আমার
টেনে তারে লইয়াছে বুকের মাঝার,
অমৃত শীতল হস্তে হে মঞ্জু মরণ
এ মুহূর্ত্তে অভাগায় কর পরশন;
ওই স্বর্গে,—কল্পকুঞ্জে, স্নেহের আগারে
ওই মিলনের স্থানে মিলাও আমারে।

সৌন্দর্য্যের স্রষ্টা তুমি মাধুর্য্যের খনি
আমারে প্রদান বর নূতন লাবণি।

মিথ্যা, মিথ্যা, নহে দূর, স্বর্গ নহে দূর
ওই স্বর্গ, দেব-ভূমি, ওই মধুপুর
ওই শেফা শুচিস্মাতা ওই তো প্রেয়সী
তাপসী অমূল্য ওই বসন্তের শশী,
মৃত্যু! মৃত্যু সদাশয়, সতত সুন্দর
কোথা তুমি, কোথা এবে কোন দূরান্তর?
স্বর্গের স্বপনে এবে আছি মাতোয়ারা
কপোল বহিয়া ঝরে নির্ম্মাল্যের ধারা,
ওই স্বর্গ, চিন্ময়ের রম্য কুঞ্জবন
ওই স্থানে অভাগার কর নিক্ষেপন॥

শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী।

* স্বর্গীয়া শেফালিকা দেবীর ঠাকুর মা

পুরুষপ্রকৃতি-তত্ত্ব।

যদিও প্রকৃতির সাহায্য ভিন্ন পুরুষের পরিচয় পাওয়া যায় না, কিন্তু আগে পুরুষ, তাহার পর প্রকৃতি। কেন না, স্বাভাবিক জ্ঞানবলক্রিয়া এবং ইচ্ছাশক্তিসমন্বিত পরম পুরুষকে ছাড়িয়া প্রকৃতির অস্তিত্ব কল্পনা করা কেবল কল্পনা মাত্র। সাংখ্যদর্শনকার এই মূল সত্যের উপর নির্ভর করিয়া পঞ্চ বিংশতি তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রকৃতি প্রথমে অব্যক্ত, তদনন্তর পুরুষের সংস্পর্শ গুণে সে পরিব্যক্ত হইয়াছে। সেই পরিব্যক্ত প্রকৃতির সঙ্গদোষে আবার পুরুষ অবিবেকী হন, পরে বিবেক উপস্থিত হইলে তাঁহার কৈবল্য প্রাপ্তি হয়। এই প্রকৃতি অব্যক্ত বা বীজশক্তিরূপে পুরুষে নিত্য কাল অবস্থিতি করিত, পরে যথা সময়ে ক্রমশঃ তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে পরিব্যক্ত মূর্ত্তিমান আকার ধারণ করিয়াছে, এ ভাবে সৃষ্টিকে যদি কেহ নিত্য অজ বলেন, বলিতে পারেন; কিন্তু স্রষ্টা ভিন্ন সৃষ্টি এবং তাহার ক্রমাভিব্যক্তি, নিয়মশৃঙ্খলা এবং সেই নিয়ম সকলের পরস্পর উপযোগিতা কেবল প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন বিধির ফল বলিয়া যাঁহারা সিদ্ধান্ত করেন, তাঁহারা আপনাদের সহজ-জ্ঞান এবং বিজ্ঞানচক্ষুর দৃষ্টি শক্তিকে অন্ধ এবং বিকৃত করিয়া ফেলেন। মহা-বুদ্ধি কপিল স্রষ্টা ঈশ্বরকে অপ্রামাণ্য, এবং তাঁহার ব্যক্তিত্ব সত্তাকে অসিদ্ধ বলিয়া নাস্তিক অপবাদগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তথাপি তিনি সৃষ্টি প্রকাশ এবং বিকাশ যে পুরুষের আশ্রয় ভিন্ন হইতে পারে না, তাহা স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। পুরুষের প্রভাব বা সান্নিধ্য ব্যতীত প্রকৃতি মৃতবৎ অব্যক্ত, এ সত্য সহজেই তাঁহার দিব্যজ্ঞানে প্রতি-ভাত হইয়াছিল।

প্রকৃতির আদি তত্ত্ব অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া যতই আমরা তাহার গভীর মূলদেশে অবতরণ করি, ততই স্থূল হইতে সূক্ষ্ম, দৃশ্য হইতে অদৃশ্য, মহা সূক্ষ্মতম অবিভাজ্য এবং অনুমেয় নিরাকার উপাদান পরমাণু সন্নি-ধানে গিয়া উপনীত হই। পরমাণু স্বরূপতঃ কি? এক অব্যক্ত অগ্রাহ্য অস্পর্শ অদৃশ্য আশ্চর্য্য শক্তির আধার। সেই অদৃশ্য অনণুবীক্ষণীয় পরমাণু কণা যখন সংহত হইয়া কোন কার্য্যশক্তি প্রকাশ করে, তখনই কেবল তাহার গুণ এবং গতিশক্তির আমরা পরিচয় পাই। সেই সগুণ সত্তার পরিচয় লাভের পর অনুমান করি যে, এই ক্রিয়াশীল গতিশক্তিবিশিষ্ট পদার্থের মূল উপাদান নির্গুণ অদৃশ্য পরমাণু কণা। ইহারা সংখ্যায় সপ্ততি, এবং ইহাদের অন্তরনিহিত শক্তি ছয় প্রকার। আপাততঃ এই পর্য্যন্তই আবি-স্কৃত হইয়াছে। এই গুলির মিশ্রণে এবং বিশ্লেষণে বিচিত্র বিশ্বলীলা সম্পন্ন হইতেছে। ইহা ব্যতীত আরো অনেক গুণ রহস্য এবং শক্তি মৌলিক এবং যৌগিক উপাদানের ভিতর থাকা সম্ভব, তাহা অনেক নিরীশ্বর বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস করেন এবং পরমাণু তত্ত্ব যে অতিশয় গভীর রহস্যে পরিপূর্ণ, ইহা ভাবিয়া তাঁহাদের হৃদয় মন পুলকিত হয়। তথাপি ঐ অব্যক্ত রহস্যের গূঢ় অভ্যন্তরে বা তাহার ব্যক্ত ক্রিয়াপ্রণালীর সঙ্গে যে এক জন অপরিহার্য্য স্বতন্ত্র পরম পুরুষ স্রষ্টা পাতার জ্ঞানকৌশল, মঙ্গল উদ্দেশ্য এবং ইচ্ছাশক্তি লুকাইয়া কার্য্য করিতে পারে, এই সহজ

জ্ঞানের সিদ্ধান্ত তাঁহারা কিছুতেই সহ্য করিতে পারেন না। পরমাণু কণা এবং প্রকৃতির নিয়মবদ্ধ অন্ধগতি শক্তিকে হৃদয়ের শ্রদ্ধা বিশ্বাস এবং প্রশংসা দিবেন, কিন্তু তাহাদের সীমামধ্যে স্রষ্টাকে কিছুতেই আসিতে দিবেন না। মৃত পরমাণু, প্রাণপঙ্ক, নিয়মরাজী এবং তাহাদের গতি শক্তিকে পূজা করা হইবে, অথচ প্রাণদাতা সর্ব্বনিয়ন্তা পরম পুরুষের নামে উপেক্ষা। এই কি ক্রমবিকাশ বিজ্ঞানের শেষ সিদ্ধান্ত?—না ভ্রান্ত বিজ্ঞানের জ্ঞানান্ধতা?—অথবা অবিদ্যার লীলা খেলা?

পরমাণুবাদীরা প্রাকৃতিক নিয়মের কতিপয় ধারাবাহিক অব্যভিচারী কার্য্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া যাবতীয় বিশ্বব্যাপারের শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হন কোন্ সাহসে, আমরা বুঝিতে পারি না। তাঁহারা সত্যপ্রিয়তার অনুরোধে বলেন, বিজ্ঞানপরীক্ষিত প্রত্যক্ষ সত্য আমাদিগকে যাহা কিছু দেখাইয়া দিবে তাহাই মানিব, তদতিরিক্ত কোন আনুমানিক মত বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিব না। এই সঙ্গে তাঁহাদের এ জ্ঞানও আছে যে, বিশ্বব্যাপার সম্বন্ধীয় অনেক তত্ত্ব এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই, বিজ্ঞান শাস্ত্র এখনো অসম্পূর্ণ অবস্থায় আছে। ইহা তাঁহারা জানেন এবং স্পষ্টাক্ষরে বলেন, অথচ ভৌতিক এবং জীবজগতের আদি তত্ত্ব এবং কার্য্যকারণ সম্বন্ধ, ভাবী ফলাফল সমস্তই জানা হইয়াছে, এইটী মনে করেন। প্রকৃতির মধ্যে স্রষ্টা ঈশ্বরের অস্তিত্বের কোন যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ পাওয়া যায় না, কপিলের এই সিদ্ধান্তে যোগ দিয়া যদি ইহাঁরা বলিতেন, আমরা এ বিষয়ে কিছু বলিতে পারি না, তাহা হইলে শেষ সিদ্ধান্তটা হাতে থাকিত। কোটী কোটী বৎসরের সৃষ্টি ভবিষ্যতে কত কোটী কল্পের ভিতরে কত অভিনব বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব উদ্ঘাটিত করিবে, তাহা কে জানিতে সক্ষম? কত দিনই বা এই আধুনিক বিজ্ঞানের আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে এবং কতটুকুই বা তাহার আয়ত্তীকৃত বিজ্ঞাত রাজ্য! অনৈতিহাসিক যুগে মানবের জ্ঞান বুদ্ধির অগোচরে স্বভাবের নিয়মে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে এবং ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে, অল্প কালের অভ্যুদিত ক্ষীণ বিজ্ঞানালোক কি তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিয়াছে? বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে বিংশ শতাব্দীর জীব তুমি আমি যেমন এক একটী পরমাণু কণা বিশেষ,তেমনি বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অনন্ত জ্ঞানসমুদ্রের ভিতর একটু বিন্দু মাত্র। তবে তাহার উপর দাঁড়াইয়া এত তাড়াতাড়ি অতিসাহসিক শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কি সত্যপ্রিয়তার নিদর্শন? আরো কিছু কাল যাউক না! আরো অনাবিষ্কৃত দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ব সকল প্রকাশিত হউক না! যে বিজ্ঞানের উপর দাঁড়াইয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব উড়াইতে চাও, তাহাই যখন অপূর্ণ শৈশবাস্থায় রহিয়াছে বলিতেছ, তখন পণ্ডিত কালিদাসের মত স্বাবলম্বিত বৃক্ষশাখা পুনরায় কর্ত্তন করা কি আর উচিত হয়? যত দিন জ্ঞানপিপাসা সম্যক চরিতার্থ না হইতেছে, বুদ্ধি বিচার শক্তিকে যে পর্য্যন্ত ভালরূপ সন্তুষ্ট করিতে না পারিবে; তত দিন সুদূর ভূত কালের জ্ঞানীমহাত্মাদিগের সহজজ্ঞান এবং বিশ্বাসগত সত্য আমাদের এই পৈতৃক প্রাচীন দেবতাটীকে নির্ব্বাসিত নাই বা করিলে! প্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গে অনুপ্রবিষ্ট চিরপ্রতিষ্ঠিত পুরুষকে এতকাল পরে গোটাকতক পরমাণুর আঘাতে কি কেহ

বিদায় করিয়া দিতে পারিবেন? অসম্ভব! অসম্ভব!

নিরীশ্বর বৈজ্ঞানিকদিগের এক প্রধান যুক্তি এই যে, প্রকৃতি কেবল সংগ্রাম-ক্ষেত্র, ইহাতে ধর্ম্মনীতির সুবিচার সুশাসন বলিয়া কোন সামগ্রী নাই, কেবল বলবানের জয় আর দুর্ব্বলের ক্ষয় চারিদিকে দেখা যাইতেছে। তাই বুদ্ধিমান বলবান সভ্য জাতিরা অসভ্য বর্ব্বর জাতিকে ধ্বংস করিয়া ক্রমে আপনারা একাধিপত্য স্থাপন করিতেছে। তাই বলিষ্ঠ পশু পক্ষীরাও দুর্ব্বল জীব জন্তু কীট পতঙ্গ ধরিয়া খাইয়া ফেলিতেছে। চারিদিকে কেবল সংগ্রাম কাড়াকাড়ি মারামারি। ধর্ম্ম একটী পুরাতন বর্দ্ধমূল কুসংস্কার, নীতি কেবল দুর্ব্বলতা এবং ভীরুতার নাম মাত্র; প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন নিয়মের সীমামধ্যে তাহাদের কোন স্থান নাই। স্বভাবের নিয়ম সকল যদি সার্ব্বভৌমিক এবং অলঙ্ঘ্য হয়, তাহা হইলে সে নিয়মের ফল সর্ব্বত্র কেবল বলবানেরই জয় দেখিতে পাই। এ নিয়মের বিরুদ্ধে যে কেহ ধর্ম্ম নীতির মতে চলিবে,সে নিশ্চয়ই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। অতএব প্রাকৃতিক নিয়মের দৃষ্টান্তানুসারে কেবল বল প্রকাশ কর, আর স্বার্থপর হইয়া আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধ কর; ইহাই স্বাভাবিক। স্বভাবের নিকট যদি কিছু নীতি শিক্ষা করিতে হয়, তবে ইহাই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ নীতি।

বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার যুগে উন্নতির আদর্শ স্থল পাশ্চাত্য জাতিরা অদ্যাপি অপেক্ষাকৃত অল্প সভ্য এবং দুর্ব্বল দরিদ্র জাতির উপর আক্রমণ করিয়া যে লক্ষ লক্ষ নরহত্যা করিতেছে, প্রাগুক্ত বৈজ্ঞানিক নিয়ম বোধ হয় তাহার পক্ষ সমর্থনের এক মাত্র প্রধান সহায়। বস্তুতঃ আত্মরক্ষা এবং স্বার্থ চরিতার্থই আপাতদৃষ্টিতে জীবন-সংগ্রামের এক মাত্র লক্ষ্য বলিয়া মনে হয়। এ বিষয়ের দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। নিকৃষ্ট জীব জন্তু পশু পক্ষী হইতে সভ্যাসভ্য মানব সমাজ পর্য্যন্ত যে দিকে দৃষ্টিপাত কর, আত্মরক্ষা এবং স্বার্থ সাধনের জন্য সকলেই নিরন্তর সংগ্রাম করিতেছে দেখিতে পাইবে। ভীষণ শার্দ্দূল নিরীহ দুর্ব্বল মেষ ছাগ হরিণ গোবৎস ধরিয়া খাইতেছে। সর্পেরা দীনহীন গরিব ভেক বেচারীকে আস্ত গিলিয়া ফেলিতেছে। শিকারী বাজ পক্ষী ক্ষুদ্র পক্ষীদিগকে নখাঘাতে বিদীর্ণ করিতেছে। বিড়ালেরা ইন্দুর ধরিতেছে, কখন বা নিজ শাবককেও খাইয়া ফেলিতেছে। কুকুর কিম্বা ছাগল ছানার মধ্যে যেটা একটু বলবান, সে দুর্ব্বল ভ্রাতা ভগ্নীকে তফাৎ করিয়া দিয়া মাতৃস্তন্য পান করিতেছে। উদ্ভিদ্ রাজ্যেও যে সতেজ, সে নিস্তেজকে দাবাইয়া উপরে উঠিতেছে। মানুষের মধ্যেত কথাই নাই। রাজা জমিদার প্রজার রক্ত শোষণ করেন, ধনে জ্ঞানে পদে যিনি প্রবল, তিনি দরিদ্র অজ্ঞান দুর্ব্বলদিগকে মাথা তুলিতে দেন না, গুরু পুরোহিত আচার্য্যেরা শিষ্য যজমান ছাত্রদিগকে দাস করিয়া রাখিতে চান, এক দেশের সম্রাট এবং প্রজাগণ অপর দেশের সম্রাট এবং সাম্রাজ্যকে করতলন্যস্ত করিবার জন্য রক্তস্রোতে ধরাকে ভাসাইয়া দেন। অর্থাৎ যাহার শরীরে একটু বেশী বল, মস্তিষ্কে একটু প্রখর বুদ্ধি এবং যাহার অর্থবল, লোকবল প্রভুত্ব ক্ষমতা অধিক, সে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল অসহায়দিগকে দাস দাসী, গোলাম বাঁদী করিবার জন্য সর্ব্বদা উৎসুক। বিশেষতঃ ধর্ম্ম নীতি লইয়া

যাহারা অনেক আড়ম্বর আস্ফালন করিয়া বেড়ায়, অথচ হিংসা দ্বেষ লোভ দুরাচার অত্যাচার পরপীড়ন নিষ্ঠুর ব্যবহারে নাস্তিক অধার্ম্মিকদিগের অপেক্ষা একটু মাত্র পশ্চাৎপদ নহে, তাহাদের কুদৃষ্টান্ত এ পথের আরো ভয়ানক সহায়। আবার যাহারা উচ্চ ধর্ম্ম বিশ্বাসানুসারে বলে "ঈশ্বরই আমাদের সর্ব্বস্ব, আমরা নিজে কিছুই নই। তিনি যাহা বলেন, তাই আমরা বলি, যাহা করিতে আজ্ঞা করেন, তাহাই করি।" অর্থাৎ সুখে দুঃখে যাহাদের মহামন্ত্র "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক, আমার ইচ্ছা নহে।" অথচ ভিতরে ভিতরে ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্বে কিছুমাত্র বিশ্বাস করে না; সংসার পরিবার মধ্যে ব্যক্তিগত কিম্বা সামাজিক জীবনে তাঁহার যে কোন ক্ষমতা আছে, তাহা মানে না, কেবল আপনাদের বল বুদ্ধি কৌশল চাতুরী ষড়যন্ত্র ক্ষমতার উপর নির্ভর করিয়া চলে, কিন্তু বক্তৃতা উপদেশের সময় বলে "আমরা বিধাতার হস্তের যন্ত্র বিশেষ, নিজের কিছুমাত্র স্বাধীনতা আমাদের নাই" ইহাদের দৃষ্টান্ত এবং ব্যবহারে ধর্ম্মনীতির মূল পর্য্যন্ত কাটিয়া যায়। পশুজগৎ, সাধারণ মানবসমাজ এবং ধর্ম্মমণ্ডলীর এই সকল নিত্য ব্যবহার নাস্তিক বিজ্ঞানের পরম সহায় এবং ধর্ম্ম নীতির মূল উচ্ছেদক।

কিন্তু এখন কথা এই, কেবলই কি আত্মরক্ষার্থ স্বার্থ সাধনের জন্য সংগ্রাম? পারস্পারিক সাহায্যবিনিময়, স্নেহ সহানুভূতির কোন চিহ্ন কি প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে নাই? স্বার্থপরতা ও আত্মপ্রীতির পার্শ্বেই কি পরার্থপরতা, পরপ্রীতির অতি বিস্তীর্ণ রাজ্য পরিলক্ষিত হয় না? ভৌতিক প্রকৃতি এবং মানবস্বভাব উভয়ের মধ্যে সমান্তরাল ভাবে স্বার্থপরতা এবং পরার্থপরতার দুইটী স্রোত চিরদিন প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। উদ্ভিদ্ এবং নিকৃষ্ট প্রাণীর মধ্যেও পরার্থপরতা আত্মত্যাগের অঙ্কুর আছে। একদেশদর্শী বিজ্ঞানের এত দিন সে দিকে দৃষ্টি পড়ে নাই, এখন পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রকৃতির মধ্যে আত্মরক্ষার্থ স্বার্থপরতার ক্রিয়া অপেক্ষা পরার্থপরতা নীতির ভিত্তি যে অতি গভীর এবং বিস্তৃত, বিশ্বের স্থিতি এবং উন্নতিশীল শান্তি কুশল তাহার প্রমাণ। ক্রমবিকাশের ইতিহাসের ভিতর এই স্বজাতি-সহানুভূতি, আসঙ্গলিপ্সা এবং পারস্পারিক সাহায্য নীতির কার্য্য যদি এত প্রাধান্য লাভ না করিত, তাহা হইলে আত্মপোষণজন্য স্বার্থপরতার আক্রমণে এত দিন নিকৃষ্ট জীব জন্তু, কীট পতঙ্গ এবং নিম্নশ্রেণীর দুর্ব্বল মানবকুল কি ধ্বংস হইয়া যাইত না? বরং দিন দিন আত্মম্ভরী হিংস্রক জন্তু ও মানবের সংখ্যাই কমিয়া আসিতেছে। জগতের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আত্মত্যাগের শাস্ত্রের প্রতিই লোকের সমধিক আস্থা বাড়িতেছে। সমাজনীতি, রাজনীতি ও বিজ্ঞানের দৃষ্টি এখন সাধারণ মঙ্গল, ন্যায় নিরপেক্ষতা এবং আত্মত্যাগের দিকে। উচ্চ শ্রেণীর সভ্য মানবসমাজ এযাবৎ কাল আত্মস্বার্থে মত্ত ছিল; নিজ নিজ সুখ্য সৌভাগ্যের চরম সীমায় পৌঁছিয়া এখন দেখিতেছে, পরের সুখে সুখী হওয়াই চরম সুখ। পণ্ডিতবর জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলেরও ইহাই শেষ সিদ্ধান্ত। স্বার্থ প্রবৃত্তিই যদি মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়, তাহাও পরার্থপরতা ভিন্ন চরিতার্থ হইতে পারে না। অতএব স্বার্থের অনুরোধেও অন্ততঃ আত্মত্যাগী এবং সাধারণের মঙ্গলা-

কাঙ্ক্ষী হইতে হইবে। এ সিদ্ধান্ত ফলাফল-বিবেকী বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের, ভাবান্ধ বিশ্বাসী ধার্ম্মিকদিগের নহে।

প্রাণীতত্ত্ববিদেরা বহু অনুসন্ধানের পর স্পষ্ট দেখিতেছেন, পরার্থপরতা নীতির মূল স্বভাবেই নিহিত ছিল, বিশ্বাস বা কল্পনা করিয়া কাহাকেও তাহা আনিতে হয় নাই। যদিও ইহা প্রথম অবস্থায় সজ্ঞান নীতি নহে, "করা উচিত" এ জ্ঞানে ইহার কার্য্য প্রথমে আরম্ভ হয় নাই, কিন্তু ইহা যে চির-স্থায়ী নৈতিক সংস্কাররূপে অতি নিকৃষ্ট প্রাণীর ভিতর হইতে ক্রমে বিকশিত হইয়া আসিয়াছে, বহুদর্শী পণ্ডিত মহাত্মা ডারুইন স্বীয় রচিত "মানবজাতি" মধ্যে একটী স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। অধুনাতন অনেকানেক সুবিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকের গভীর গবেষণায় স্থিরীকৃত হইতেছে, কোন পশু বা পক্ষী স্বজাতির হিংসা বা সংহার করে না, বরং আপনাপন জাতির প্রতি কোন উপদ্রব ঘটিলে তাহারা দলবদ্ধ হইয়া শত্রুকে আক্রমণ করে। অনেক পক্ষী এক বৃক্ষে বা পর্ব্বত গাত্রে এক পরিবারের মত সদ্ভাবে থাকে। পশুরাও এক ক্ষেত্রে বিচরণ করে, তাহাতে কোন বিবাদ সংগ্রাম বা স্বজাতি বৈরভাব দেখা যায় না। এই সকল পশু পক্ষী দল বাঁধিয়া ভ্রমণ ও বাস করে। ইহারা এক অপরের সহবাস ও সাহায্য না পাইলে কেহই জীবন ধারণ করিতে পারিত না। তদ্ব্যতীত পক্ষীমাতা এবং গাভীমাতাদিগের জীবনে মাতৃত্বের কি সুন্দর প্রকাশ! বাঘিনীও সন্তানস্নেহহীনা নহে। বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম বিচারে এ সকল অপত্যস্নেহ এবং স্বজাতিপ্রীতিকে "নীতি" নামে অভিহিত কর না কর, কিন্তু নীতির অব্যক্ত মূল ভূমি যে এখানে দেখা যাইতেছে, তাহা কে অস্বীকার করিবে? একটী স্থায়ী এবং জাতীয় সংস্কার রূপে প্রথমে ইহা নিকৃষ্ট প্রাণীজগতে অভ্যুদিত হইয়াছিল, পরে ক্রমশঃ সামাজিক সংঘর্ষণে শিক্ষা সাহায্যে মানব স্বভাবে উহা নীতি নাম ধারণ করিয়াছে। সেই নীতিই এখন মূর্ত্তিমতী, এবং তাহা সভ্য জগতের নিয়ামক হইয়া আত্মত্যাগ এবং পরপ্রীতি শিক্ষা দিতেছে। পরিণামে এই নীতিবৃত্তি আপনার জন্য আর ভাবিবে না, পরপ্রেমে মত্ত হইয়া পরস্পরের সেবাতেই কৃতার্থতা লাভ করিবে। "বলবানের জয়, দুর্ব্বলের ক্ষয় কিম্বা স্বার্থই জীবন সংগ্রাম এবং ক্রমবিকাশের লক্ষ্য" নিকট ভবিষ্যতে এই একদেশদর্শী সিদ্ধান্তের দাঁড়াইবার আর স্থান নাই। নিরীশ্বর বিজ্ঞানের হটকারী মীমাংসা এতদ্দর্শনে এক্ষণে লজ্জিত হইয়া মৌনাবলম্বন করুক!

ক্রমবিকাশ বিজ্ঞানের প্রধান প্রবর্ত্তক মহাত্মা ডারুইন; বলবানের জয়, দুর্ব্বলের ক্ষয়, এবং প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন বিধি তিনিই বিস্তৃতরূপে প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তিনি সৃষ্টি হইতে স্রষ্টা বা প্রকৃতি হইতে পুরুষকে বিদায় করিয়া দেন নাই। তিনি এক জন ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি ছিলেন। এক স্থানে স্পষ্ট উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, "সৃষ্টি এমন এক স্রষ্টাকে চায়, যিনি প্রথমে ইহার ভিতরে জীবন নিঃশ্বসিত করিয়া দেন।" আশ্চর্য্যের বিষয় যে তাঁহার আধুনিক শিষ্যগণ এই বিশ্বাসটীকে ডারুইনের দুর্ব্বলতার প্রকাশ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই সকল শিষ্যদিগের মনের ভাব যতদূর আমরা বুঝিতে পারি, তাহাতে মনে হয়, তাঁহারা মৌলিক উপাদানের অসাধারণ

কার্য্য-কলাপ দর্শনে স্থির করিয়াছেন, প্রথম জীবন সঞ্চারের জন্য আর সৃষ্টিকর্ত্তার আবশ্যকতা কি? (সৃষ্টিকর্ত্তা যেন পরমাণুর দলে একটু স্থান প্রার্থী) পরমাণুর মধ্যে যে প্রসারণ, আকুঞ্চন, আকর্ষণ, বিকর্ষণ, এবং তড়িত উত্তাপাদির শক্তি ছিল, তাহা দ্বারাই প্রথম সৃষ্টির গতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। যে কার্য্য ইথার এবং অন্যান্য শক্তি দ্বারা সহজে সম্পন্ন হয়, তাহার জন্য একটী সৃষ্টিকর্ত্তার কল্পনার কি প্রয়োজন? ইথারের অনন্ত ক্রোড়ে পরমাণুগণ খেলা করিতে করিতে পরস্পর সংযোগ বিয়োগ সংঘর্ষণে এবং তদনন্তর প্রাণপঙ্কের জীবনীশক্তি প্রভাবে ক্রমোন্নতির নিয়মে জড় জীব মানব জন্মিয়াছে। ইহাত বেশ পরিষ্কার সিদ্ধান্ত! কপিল, কনাদ, গৌতম প্রভৃতি দার্শনিকেরা এত তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এই সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বগুণাকর পরমাণুর মহিমা কেহ এরূপে বুঝিতে পারেন নাই।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, গভীরদর্শী ডারুইন যে বলিলেন,—প্রথম জীবন নিঃশ্বসিত করিবার জন্য পুরুষকে চাই—ইহা কি একটী নাসিকার সামান্য নিঃশ্বাস বায়ু? সৃষ্টি সংগঠনের পূর্ব্বে সর্ব্বাগ্রে মৌলিক উপাদান গুলিকে একবার নাড়িয়া চাড়িয়া ঠেলিয়া দিবার জন্য একজন কুলিমজুরেরও কি প্রয়োজন হয় নাই? ইচ্ছা, জ্ঞান, মঙ্গল শক্তির অনন্ত স্রোত পরম পুরুষ যদি মূল উপাদানে অনুপ্রবিষ্ট করিয়া না দিতেন, তাহা হইলে কি এই কল্যাণকর বিশ্বব্যাপার সকল সম্পন্ন হইত? গতি, শক্তি, কার্য্যনিয়ম ও পরমাণুর পূর্ব্বে যে এক জন অপরিহার্য্য ইচ্ছাময় নিয়ন্তা জ্ঞানী পুরুষের ইচ্ছা জ্ঞান এবং মঙ্গল সংকল্প সর্ব্ব প্রথমেই নিতান্ত প্রয়োজন, তাহা কেন নিরীশ্বর বিজ্ঞানী বুঝিলেন না? যখন বুঝেন নাই, তখন না হয় স্বীকার করিলাম, সত্য সরলতার অনুরোধেই বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু পৃথিবীশুদ্ধ লোক যে চিরকাল এ সত্য বুঝিয়া আসিতেছে, তাহারা কি সরল সত্যপ্রিয় নহে? কিম্বা না বুঝিয়াও তাহারা বুঝিবার ভান্ করে? হার্ব্বার্ট স্পেন্সর মনে করিতেন, আদি কারণ যেমন বিজ্ঞানীর নিকট অজ্ঞেয় দুজ্ঞেয়, ধর্ম্মবিশ্বাসীদিগের নিকটেও তাই। তবে তাঁহারা না বুঝিয়াও বুঝিবার ভান্ করেন, আমরা তাহা করি না, যাহা সত্য তাহাই বলি। এই অজ্ঞেয়তাবাদের মূলে অবশ্য অনেক যুক্তি আছে, কিন্তু নাস্তিকতার ত কোন যুক্তি দেখা যায় না।

আমি ভাবি, এমন কেন হয়? অথবা মানব প্রকৃতি যখন এরূপ বিচিত্র, তখন আংশিক দর্শনজন্য এইরূপ বিচিত্র বিশ্বাস কেনই বা না হইবে? যাই হউক, বিজ্ঞান-আবিষ্কৃত সৃষ্টির মূল উপাদান এবং আদি শক্তির যোগাযোগ ক্রিয়া ও গতি শক্তির গুরুত্ব অপরিহার্য্য হইলেও তাহাদের নিয়ামক জ্ঞান ইচ্ছা মঙ্গল সংকল্প মূলে, না ফলে? মৌলিক উপাদান ও প্রাণপঙ্কের গতি, কি অন্ধগতি নহে? যদি বল অন্ধ কেন হইবে, তাহারা অভ্রান্ত নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হইয়া পরিণামে জ্ঞান প্রেম ইচ্ছা শক্তিবিশিষ্ট মানবে পরিণত হইয়াছে। যদি তাই হইয়া থাকে, তবে নিয়মগুলি কি জ্ঞান প্রেম ইচ্ছার আধার? কার্য্য সকলকে কারণানুগত করিয়া সুশৃঙ্খলার সহিত ব্যবস্থিত রাখা মাত্র নিয়মের প্রভুত্ব। তাহাও অন্ধ শক্তির প্রভুত্ব, ইচ্ছা জ্ঞান মঙ্গল

ভাবের জন্য সে দায়ী নহে। সে কেবল কার্য্যফলোৎপাদনের ব্যাপক প্রণালী মাত্র। অতএব নিয়ম সকল এক জন নিয়ন্তা পুরুষের অধীনে তাঁহারই অভিপ্রায় সাধন করে। কার্য্যফলের উপযোগী উপযুক্ত কারণগুলি মিলাইবার জন্য জ্ঞান ইচ্ছাসম্পন্ন ব্যক্তির কি প্রয়োজন হয় নাই? কার্য্যোৎপাদক কারণের মধ্যে জ্ঞানী পুরুষের কর্তৃত্ব কি মূল কারণ নহে? কর্ত্তার সেই অভিপ্রায়, জ্ঞান এবং নিত্য মঙ্গল ভাবে পূর্ণ। জড়শক্তি প্রভাবে পরমাণুর যোগাযোগ ফলে কোন নির্দ্দিষ্ট অলঙ্ঘ্য নিয়ম দ্বারা সে অভাব কখনই পূর্ণ হইতে পারে না। যদি বল প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন নিয়মে তাহা ক্রমে পরিণত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন আদিতে অন্য কোন কার্য্যশক্তি বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আসে নাই। তাহাই যদি হয়, তবে প্রকারান্তরে এই কথা বলা হইতেছে যে, আদিতে কেবল কতিপয় পরমাণু, তাহাদের গতিশক্তি এবং নিয়ম ছিল, তাহারা তিন জনে পরামর্শ করিয়া মানব দেহের যেখানে যে কর্ম্ম এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় হওয়া উচিত, বিচারপূর্ব্বক সেই সেই ইন্দ্রিয়ে উহারা পরিণত হইয়াছে। ক্রমবিকাশের নিয়মে আবার তারাই জ্ঞান বুদ্ধি বিবেক হৃদয় আত্মার রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। পরিশেষে এক বাণ্ডিল্ বোধশক্তি স্বরূপ যে মানবাত্মা, সেই আত্মাই ঈশ্বরত্বে পরিণত হইবে।

এত বড় বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের উন্নতি ও শাসন পালন, ইহার যাবতীয় জ্ঞান ইচ্ছা মঙ্গলভাবপূর্ণ কার্য্য গোটাকতক অদৃশ্য পরমাণু এবং প্রাকৃতিক অন্ধ শক্তি ও নিয়মের হাতে ছাড়িয়া দিতে কি সাহস হয়? জগতে যত কিছু বিস্ময়কর জ্ঞানকৌশল মঙ্গল অভিপ্রায় প্রকাশ পাইতেছে, তাহার মূল যদি ঐ মৌলিক উপাদানগুলি হয়, তবে তাহাদিগকেইতো ঈশ্বরত্ব প্রদান করা হইল। এইটী কল্পনা, না ঈশ্বরবিশ্বাস কল্পনা? অনন্ত আকাশে অগণ্য অসংখ্য চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারার গতি, একের সহিত অপরের মিলন; ভূতলে উদ্ভিদ্ প্রাণীর পরস্পর উপযোগিতা, এবং সমুদায়ের সহিত মানবের অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ এবং জ্ঞানী ধর্ম্মাত্মা নরনারীর দেবত্ব মহত্ব, সভ্যজাতির আশ্চর্য্য মহা উন্নতিশীল কীর্ত্তি কলাপ, এই সকলের মূল উৎপত্তি একজন জ্ঞানী সদাশয় পুরুষের মঙ্গল ইচ্ছা, উদার প্রেম এবং অগাধ জ্ঞান শক্তির উপর আরোপ করিলেই ঠিক হয়, তাহাতে জ্ঞানী বিদ্বান সভ্য শিক্ষিত মানবের মনুষ্যত্বও রক্ষা পায়। বলপূর্ব্বক বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া পরমাণুকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করা ভূতপূজক বর্ব্বর জাতির কার্য্য অপেক্ষাও কি অধিকতর অজ্ঞানতার পরিচায়ক নহে?

শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা।

ফুল ও মুকুল *

বঙ্গসাহিত্যে আজ কাল গীতি কবিতার অপ্রাচুর্য্য নাই। এখন বঙ্গভাষায় যাঁহারা গীতি কবিতা রচনা করেন, অধিকাংশ স্থলেই আমরা তাঁহাদের প্রশংসা করিতে পারি না। কেননা বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যে কবি ও সমালোচকগণের মধ্যে অহিনকুল

* কাব্য,—শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাস গুপ্ত ও ৺ নির্ম্মলাসুন্দরী দেবী প্রণীত। মূল্য ১৷০, শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য।

সম্বন্ধ অবগত থাকিয়াও তাঁহারা যে এরূপ কার্য্যে ব্রতী হন, ইহা তাঁহাদের ধৃষ্টতারই পরিচায়ক।

বিনা কারণে কবি ও সমালোচকগণের মধ্যে এই অভূতপূর্ব্ব সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি যখন কবিতা লিখিতেন, তখন সমালোচকগণ শিষ্যের ন্যায় তাঁহাদের কাব্য পাঠে ব্রতী হইতেন; এবং তাঁহাদের বিবেচনায় কাব্যের কোন ত্রুটী থাকিলে ভক্তি বিনম্র-মস্তকে কবিকে তাহা জানাইতেন। এখন সমালোচকগণ কবিতা পুস্তক দেখিলে প্রথমেই আরক্ত নেত্রে গ্রন্থ পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। গ্রন্থাধ্যয়ন সময়ে তাঁহাদের আরক্ত নেত্র যদি আরও আরক্ত না হয়, তবে আজি কালিকার দিনে কবিকে আমরা ভাগ্যবান্ পুরুষ বলিতে পারি।

কেন এমন হইল, তাহার কারণ অনুসন্ধান করা একটা দুরূহ ব্যাপার নহে। সকল বিষয়েই যতকাল উৎসাহ এবং উচ্ছ্বাস থাকে, প্রকৃত প্রাণের যোগ থাকে, ততকাল তাহা মধুর থাকে। কিন্তু একবার তাহার মধ্যে কৃত্রিমতা ও অবসন্নতা প্রবেশ করিলে, অচিরাৎ উহা তিক্ত হইয়া উঠে।

গৌরাঙ্গ যখন বাঙ্গালা দেশে নূতন ভক্তির গঙ্গা আনয়ন করিয়াছিলেন, তখন প্রেম-বিগলিত হৃদয়ে বৈষ্ণবগণ ছন্দোবদ্ধ ভাষায় যাহা বলিতেন, তাহার মধ্যে প্রকৃত আন্তরিকতা থাকিত, সুতরাং তাহার মধ্যে যথার্থ কবিত্ব থাকিত। কাল মাহাত্ম্যে যখন ঐ আন্তরিকতাটুকু দূরীভূত হইল, যখন বৈষ্ণবগণের হৃদয়দ্রবকারী ভক্তি ও প্রেমের অভাব হইল, যখন বৈষ্ণবধর্ম্ম মাত্র বাহ্য ব্যবহারিকতায় পরিণত ও পূর্ণ হইল, তখন বৈষ্ণবগণ যে ভাষা লিপিবদ্ধ করিতেন, কিম্বা সময়ে সময়ে যে ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতেন, তাহা "ধ্বন্যাত্মিকা" কিম্বা "ঝঙ্কারময়ী" হইতে পারে; কিন্তু খাঁটি ভক্তি, বিনয় ও কবিত্বের সহিত ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষের সম্পর্ক ছিল না। "রাধিকা নিতম্বাম্বর-ধূলি-কণা-দাস-দাস" ইত্যাকার সুদীর্ঘ সমাসবদ্ধ বাক্যবিন্যাসে যিনি কবিত্বের ঘ্রাণ পান, আমরা তাঁহার প্রখর ঘ্রাণ শক্তির প্রশংসা করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথা বলিতেও বাধ্য যে, তিনি অমানুষ কিম্বা অতিমানুষ, কেননা, এমন কবিতা সাধারণ মানুষের উপভোগ্য নহে।

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গসাহিত্যে কবিতার অবস্থা ঠিক এমনই হইয়াছে। একপাল কবি-খ্যাতি-লোলুপ সাহিত্য-চোর মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, এবং রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে কবিতা লিখিয়া বঙ্গসাহিত্য-কাননটীকে একেবারে কণ্টকাকীর্ণ করিয়াছেন। বিনামা, কুঠারী এবং অগ্নি ব্যতীত সহসা এখন একাননে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য। এই লঘুহৃদয় কবিগণ মধুসূদনের অনুকরণে বিশেষ্য পদগুলিকে ক্রিয়াপদে পরিবর্ত্তিত করিতে শিখিয়াছেন; হেমচন্দ্রের অনুকরণে সখের 'ভারত-বিলাপ' রচিতে শিখিয়াছেন; রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে শ্রুতিমধুর 'ঝঙ্কারময়' শব্দ বিন্যাস করিতে শিখিয়াছেন। কিন্তু ইঁহাদের কবিতায় যে উৎসাহ, সজীবতা এবং স্বচ্ছন্দ-গতিশীলতা আছে, এই ভৃঙ্গপালের ছন্দোনিবন্ধে তাহা অতি বিরল। দুই এক স্থলে কিছু কিছু কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু তাহা প্রায়ই চোরাই মাল। আমাদের একদেশদর্শী গবর্ণ-

মেণ্ট জুতা চোর, গরুচোর প্রভৃতির শাস্তির বিধান করিয়াছেন; কিন্তু সাহিত্যের বাজারে একপাল লোক যে অবাধে চুরির ব্যবসায় চালাইতেছে, তাহাদের বেত্রাঘাতের কোন ব্যবস্থা করেন নাই কেন, বলিতে পারি না।

কেহ মনে করিবেন না, আজ কাল যাঁহারা কবিতা লেখেন, তাঁহাদের সকলেরই সম্বন্ধে আমি এমন মত ব্যক্ত করিতেছি। তবে সাহস করিয়া বলিতে পারি, এখন বাঙ্গালা দেশের বারো আনা কবিই,—আমাদের গবর্ণমেণ্ট নিরপেক্ষ ও সর্ব্বদর্শী হইলে,—উল্লিখিত রাজসম্মানের যোগ্য বিবেচিত হইবেন।

প্যারীশঙ্কর বাবু প্রাচীন লেখক, বিজ্ঞ লোক। তিনি পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়সে কবি হইতে উদ্যত হইয়াছেন, ইহাতে আমরা প্রথমে বড় বিস্মিত হইয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম, যেমন দিন কাল পড়িয়াছে, কবিতা লেখাতো এখন একটা যৌবনের বিকার মাত্র। যৌবনের প্রারম্ভে যখন মনটা কেমন উদাস উদাস হয়, প্রাণটা কেমন খালি খালি বোধ হয়, জগৎটা প্রকৃতপক্ষে উপন্যাসবৎ জ্ঞান হয়, তখন যুবকগণের মুখমণ্ডল নব শ্মশ্রূদ্গমের সহিত তাঁহাদের মানসক্ষেত্রে কত রঙ বেরঙের কবিতা-কণ্টকের উৎপত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু এ বয়সে প্যারীবাবুর এ বিড়ম্বনা কেন, ভাবিয়া আমরা প্রথমে যত ব্যাকুল হইয়াছিলাম, তাঁহার কাব্যখানি পাঠ করিয়া আমরা ততোধিক প্রীত হইয়াছি;—"ফুল ও মুকুল" একখানি যথার্থ কাব্য গ্রন্থ।

এ কাব্যখানির একটী বিশেষত্ব এই যে, পিতা ও কন্যা উভয়ের রচনায় ইহা পূর্ণ। প্যারীবাবুর কন্যা শ্রীমতী নির্ম্মলা এখন অমরধামে। সপ্তদশ বৎসর বয়সে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। সতের বৎসর বয়সের বালিকার রচনা যে এত মধুর ও প্রাণস্পর্শী হইতে পারে, শ্রীমতী নির্ম্মলার কবিতা না পড়িলে তাহা বিশ্বাস করিতে পারিতাম না।

"রাজ যোগী অলর্ক"নামে সুদীর্ঘ একটী কবিতায় "ফুল ও মুকুলের" আরম্ভ। নানা কারণে আমরা এই দীর্ঘ কবিতাটীর যথেষ্ট প্রশংসা করিতে পারিলাম না। ইহাতে অতি উচ্চ দরের কবিত্ব আছে, কিন্তু শিল্প নাই; সুন্দর ফুল আছে, কিন্তু মালা গাঁথার তেমন নৈপুণ্য প্রকাশ নাই। "অলর্কের" কবিতা অতি গাঢ় ও গভীর ভক্তি রসাত্মক। কিন্তু উহার নবম পল্লবটী বড়ই তরল কবিতায় পূর্ণ। সুতরাং কাব্যের অন্যান্য অংশের সহিত ঐ পল্লবটী বড়ই বিরুদ্ধ-ভাবাত্মক হইয়াছে।

"ব্রহ্মযোগে মগ্ন হয়ে ব্রহ্মে সঁপি প্রাণ,
ব্রহ্ম সাগরের মাঝে লভেছে নির্ব্বাণ।"

ইহা অতি উচ্চ শ্রেণীর কবিতা। "অলর্কে" এমন অনেক সুন্দর পদ আছে, যে গুলিকে বাঙ্গালা ভাষার গীতা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। উল্লিখিত পদটী আমাদের মনে ভগবানের উক্তি সুন্দর ভাবে জাগাইয়া দেয়,—

"ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্ম সমাধিনা।"

গীতা ৪-২৪।

যিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যেও আমাদের মনে এরূপ ভাব জাগাইয়া দিতে পারেন, তিনি অসাধারণ কবি! কিন্তু এমন গভীর কবিত্বের পার্শ্বে নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলি বড়ই অশোভন বোধ হয়।

"পদাঘাতে যদি লোক লভে যমালয়,
প্লীহা ফাটা বলি' তাহা হয় উপেক্ষিত," ইত্যাদি।

প্রসঙ্গান্তরে আমরা ইহার প্রশংসা করিতে পারি, কিন্তু "অলর্কের" ন্যায় কবিতায় এমন তরল পদগুলি যেন নিতান্তই বিদ্রূপকর!

"ফুল ও মুকুলের" অধিকাংশ কবিতা-তেই যেন একটা প্রশান্ত বৈরাগ্যের ছায়া পতিত হইয়াছে। ইহার অধিকাংশ কবিতাতেই

"কোথা হ'তে এত আসে, কেই বা সকলে গ্রাসে,
কোথাই বা জীবজন্তু অন্তিমে লুকায়।"

এই কথাটার আলোচনা করা হইয়াছে। এমন প্রশ্নের বোধ হয় কেহই সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন না। প্যারী বাবুও স্বকৃত প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে না পারিয়া অবশেষে হতাশ প্রাণে বলিয়াছেন,

"কে করিবে উন্মোচন এ রহস্য আবরণ,
সকল ঢাকিয়া যাহা করে অন্ধকার!"

এরূপ প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইলে জটিলতা উত্তরোত্তর বাড়ে ভিন্ন কমে না। কিন্তু যিনি শ্রদ্ধাবান, ভক্ত ও বিশ্বাসী, তিনি জানেন, ইহজীবনে হউক পরজীবনে হউক, এমন একদিন আসিবে, যখন তাঁহার সমস্ত জটিলতা সরল হইয়া যাইবে, যখন তিনি সত্যই বলিতে পারিবেন "তিমির ডুবিল দীপ্তি-সাগরে!" ভক্ত প্যারী বাবুর মনেও বুঝি এরূপ উচ্চ আশার ক্ষীণালোক জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাই তিনি বলিতেছেন,

"পাইব কি হেন দৃষ্টি, ভেদ করি স্থূল সৃষ্টি,
যার কাছে খুলিবে এ রহস্যের দ্বার।"

কি মহান্ পবিত্র অভিলাষ! কি আশাব্যঞ্জক সারগর্ভ উক্তি! প্যারী বাবুর অনেকগুলি কবিতা এই ভাবের। ইহা তাঁহার জ্ঞান ও বর্ত্তমান বয়স,—উভয়ের সহিত এক সুরে গাঁথা। এরূপ কবিতা নব্য বঙ্গীয় যুবকের রুচির সহিত সঙ্গত হইবে কিনা বলিতে পারি না। কিন্তু যিনি ভক্ত ও ভাবুক; তাঁহার নিকট যে ইহা যথেষ্ট প্রীতিকর হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ করি না।

"বঙ্গ-মহিলা" নামক কবিতাটীতে স্থানে স্থানে সংযমের অভাব দৃষ্ট হইলেও, স্বদেশ ও সমাজের জন্য কবির প্রাণ কিরূপভাবে কাঁদিয়াছে, তাহার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। প্যারী বাবু যে একজন পরদুঃখ-কাতর সহৃদয় ব্যক্তি, সমালোচ্য কাব্য-খানিতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। তাঁহার অনেকগুলি কবিতা, বিশেষতঃ 'বঙ্গ-মহিলা" পাঠ করিলে তাঁহাকে কবিবর হেমচন্দ্রের একজন ভক্তশিষ্য বলিয়া মনে হয়। হেমচন্দ্রেরই ছন্দে এবং তাঁহারই ভাবের অনুকরণে "বঙ্গ-মহিলা" রচিত হইয়াছে। অনুকরণ মাত্রই দোষাবহ নহে, বরং স্থান বিশেষে উহা প্রশংসার্হ, সন্দেহ নাই। তবে হেমচন্দ্রের হৃদয়ের সে তর্ তর্ খর বেগ, ভাষার সে জ্বালাময় উচ্ছ্বাস এবং ছন্দের সে জলদ-নির্ঘোষ প্যারী বাবুর কবিতায় নাই। না-ই থা'ক, যেটুকু আছে, সেটুকু বড় সুন্দর। অনন্তায়ত নীলা-কাশে চন্দ্র সূর্য্যের উদয় মনোহর বলিয়া উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজির আবির্ভাব যে চিত্তা-কর্ষক নহে, এমন নহে। কিন্তু স্থানে স্থানে হেমচন্দ্রের এমনই অনুকরণ করা হইয়াছে যে, বোধ হয়, তাঁহারই ভাষা, ভাব ও চিন্তার পুনরাবৃত্তি করা হইতেছে মাত্র। দুই একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি।

১। "বিমুখ জনক, বিমুখ সোদর,
বিমুখ পতিও পাষণ্ড পামর,"
ফুল ও মুকুল।

"বিমুখ নিষ্ঠুর ধাতা, বিমুখ জনক ভ্রাতা;
বিমুখ নিষ্ঠুর তিনি পতি নাম যাঁর"
হেমচন্দ্র।

২। "জননী, ভগিনী দাসীর মতন
দলিতে চরণে দিবা শর্ব্বরী,"
ফুল ও মুকুল।

"চরণে দলিয়া মাতা, সুতা, জায়া,
এখনো রয়েছ উন্মত্ত হয়ে!"
হেমচন্দ্র।

৩। "যেই নারীকুলে হইলা সৃজিতা
খনা, লীলাবতী, দময়ন্তী, সীতা,
দ্রৌপদী, সাবিত্রী, আশ্রম দুহিতা
শকুন্তলা" —ফুল ও মুকুল।

"এই বঙ্গভূমে করেছিলা লীলা
আত্রেয়ী, জানকী, দ্রৌপদী সুশীলা,
খনা, লীলাবতী, প্রাচীন মহিলা,
সাবিত্রী ভারত পবিত্র করে?"—হেমচন্দ্র।

আমরা এরূপ অনুকরণের পক্ষপাতী নহি। যাঁহার অনুকরণ করিতে হইবে, তাঁহার নিজস্বটুকু রক্ষা করিয়া যতটুকু অনুকরণ করা যায়, ততটুকু করাই ভাল। প্যারীবাবু যদি এরূপ অনুকরণগুলি পরিহার করিতে পারিতেন, তবে আমরা আরও প্রীতিলাভ করিতাম।

"বসন্ত পঞ্চমী" নামক কবিতাটীতে জয়দেবের প্রতি যে কটূক্তি করা হইয়াছে, ইহা প্যারীবাবুর মত বিজ্ঞ লোকের উপযুক্ত কাজ হয় নাই। যে হিসাবে তিনি জয়দেবকে গালি দিয়াছেন, সে হিসাবে কালিদাস কেন বাদ যান, তাহা বলিতে পারি না। তথাপি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কালিদাসের গুণকীর্ত্তন করিয়া কবি জয়দেবকে কটূক্তি করিয়াছেন এবং পর মুহূর্ত্তেই আবার কালিদাসের প্রশংসা করিয়াছেন! এই কবিতাটীর উপসংহারে কবি যাহা বলিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালী মাত্রেরই হৃদয় পটে চির অঙ্কিত করিয়া রাখা উচিত। কবির মুখ হইতে যে কথাগুলি বিনির্গত হইয়াছে, উহাতে গভীর স্বদেশ-প্রেমের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

"নাহি ভাবে কেহ ভারতের কথা,
জাতীয় দুর্গতি নাহিক মনে।
অসারের প্রায় ভ্রমে যথা তথা,
মোহের ছলনে পাপের বনে।
লক্ষ জন মাঝে নহে এক নর,
মানব নামের সুযোগ্য যেই;
যাহাদের পরে ভরসা বিস্তর
অশিক্ষিতগণে জিনিল যেই।

শত শত সুত অনাহারে মৃত,
শত শত মরে বসন বিনা,
শত শত সুত শিক্ষায় বঞ্চিত,
শত শত সুতা বিষম দীনা।
ধন রত্ন তার সব বিলুণ্ঠিত,
স্বর্ণভূমি আজ ভিখারীবেশে।
দিনে দিনে দৈন্য হতেছে বর্দ্ধিত,
ক্রমেই কান্দিছে ভীষণ ক্লেশে।
পরমুখ চেয়ে, পরদাসী হয়ে,
পর পদ সেবি কাটিছে দিন।
পর পরসাদ শিরোপরে লয়ে
হাসে কাঁদে হয়ে আশ্রয় হীন।
হাসিবার দিন আছে কিরে আর,
শুনিতে মধুর বীণার ঝঙ্কার?
হাসিবার দিন আছে কিরে আর,
বারাঙ্গনা নৃত্যে দিতে সাঁতার?
আমোদের তরে কিবা অধিকার,
দাসেরি তনয় দাসের জাতি?
কর সবে আজি শোক ব্যবহার
পর সবে শোক-বসন পাতি।
এস মা ভারতী, দেও চক্ষে জল,
হৃদয়ে অনল প্রকাশ করি,
এ ঘোর দুর্দ্দিনে ফেলি অবিরল
নয়ন সলিল শোক-লহরী।"

ইহা পড়িয়া অনেকেরই পূর্ব্ববঙ্গ-গৌরব শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের নিম্নলিখিত কথাগুলি মনে জাগিবে;—"মর্ম্মে যার পীড়া, গাত্রে যার কষাঘাত, গৃহে যার অন্নকষ্ট, বাহিরে যার দণ্ডবিধি, মস্তকে যার অগ্নিবৃষ্টি, পদে পদে যার বিপদ, সে কেন আধ্ধার তালে ঝিঁঝিট রাগিণীতে প্রণয়ের গীত গাইয়া বেড়ায়। বঙ্গবাসি, একবার প্রগাঢ় ভাষায় কঠোর ভাব উদ্দীপন করিবার চেষ্টা কর দেখি।" *

এখন "মুকুল" সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। শ্রীমতী নির্ম্মলা নিজেই তাঁহার কবিতাগুলির "মুকুল" নাম দিয়া গিয়াছেন,—"নহে ফল, নহে ফুল, এ শুধু মুকুল।" বস্তুতই এ গুলি মুকুল। কিন্তু মুকুল দেখিয়া যদি তাহার ভবিষ্যৎ কল্পনা করিবার অধিকার আমাদের থাকে, তবে নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, বাঁচিয়া থাকিলে নির্ম্মলার পাকা হাত দিয়া যে কবিতা বাহির হইত, তাহা প্রফুল্ল গোলাপ হইতে কখনই হীনপ্রভ হইত না। "The child is father of the man"—মহাকবির একথা যদি সত্য হয়, তবে বলিতে পারি, এ মুকুলগুলি গোলাপের মুকুল। কিন্তু বঙ্গ সাহিত্যের দুর্ভাগ্য, সপ্তদশ বৎসর বয়সে নির্ম্মলা ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন!

"মুকুলের" কবিতাগুলিতে কোনরূপ কৃত্রিমতা নাই। সাদা প্রাণের সরল কথা বড় মধুর, বড় প্রাণস্পর্শী। ইহার অধিকাংশ কবিতাতেই ঈশ্বরের প্রতি গভীর ভক্তি, বিশ্বাস ও অনুরাগের যে প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা বালিকা নির্ম্মলার বিশেষ-গৌরবের কথা। কিন্তু হায়! সে যশের, সে গৌরবের যিনি অধিকারিণী, তিনি এখন কোথায়! পাঠকগণের তৃপ্তির জন্য আমরা "মুকুল" হইতে প্রার্থনা নামক একটী কবিতা উদ্ধৃত করিতেছি।

"জীবন-জীবন বিভো তোমারই চরণে
সঁপিব এক্ষুদ্র প্রাণ,
নাহি যদি পাই ত্রাণ,
তথাপি ও পদ যেন ভুলিনা এ জীবনে।
যদি গিয়ে থাকি ভুলে,
ব'লনা আমায় খুলে,
পরাণ-মধুপ যেন ও মধুর চরণে
ডুবে থাকে চিরকাল,
হয় যদি মিথ্যা জাল,
হোক না! কি কাজ মম সে বিচার শ্রবণে
সঁপিব আনন্দে প্রাণ তোমারই চরণে।

(২)

"যে করিবে অবিশ্বাস, করুক সে জানিয়া,
যে বলে বলুক ভুল,
আমি খুজিব না তুল,
আমি শুধু প্রাণ দিব তোমায় মা সঁপিয়া।
আমিত মা নিরজনে
প্রাণ দিব ওচরণে,
যে করে করুক নিন্দা সহিব তা হাসিয়া।
বিচারে কি কাজ মম,
আমিত পতঙ্গ সম,
তুমি মোর প্রিয় অগ্নি যাইব তা জানিয়া,
ও চরণ পানে শুধু বাঁচিয়া ও মরিয়া।

(৩)

"অভাগীর লক্ষ্যহীন শান্তিহীন জীবনে,
তুমিই শান্তির পথ,
তুমিই চালাও রথ,
গাঁথ প্রাণে প্রেম মালা কি নিপুণ গ্রন্থনে!
শিখাইয়া দেও সব,
অনভিজ্ঞ কন্যা তব,
নাহি জানে পাবে তোমা কোন্ পুণ্য সাধনে।
যে না জানে পুণ্য, পাপ,
কিসে পাপ, কিসে, তাপ,
হিতাহিত শিশু সম যেই জন না জানে,
মা হতে মঙ্গলা মাতা চালাও এ পরাণে।"

শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন সেন।

* বান্ধব, শ্রাবণ ভাদ্র সংখ্যা, ১২৮৩।

১।৬। ঋগ্বেদ

পনিষদের উপদেশ। (১৫)

অজাতশত্রু ও বালাকি।

পুরাকালে বালাকি নামে একটী ব্রাহ্মণ আপনাকে ব্রহ্মজ্ঞ ও ব্রহ্মতত্ত্ববিৎ বলিয়া মনে করিত এবং তজ্জন্য অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়া উঠিয়াছিল। বালাকি সর্ব্বত্র ও সর্ব্বপদার্থে ব্রহ্ম-সত্তার অনুভব করিলেও, তাহার পূর্ণ অভেদ জ্ঞান জন্মিয়াছিল না; কিন্তু তথাপি তাহার মনে হইত যে, তাহার ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি তৎকালে আর নাই। একদা বালাকি কাশীতে যাইয়া উপস্থিত হইল। তৎকালে অজাতশত্রু কাশীর রাজা ছিলেন। এই কাশীরাজ অজাতশত্রু ক্ষত্রিয় কুলের ভূষণ স্বরূপ, মহাজ্ঞানী নরপতি ছিলেন। ইনি ব্রহ্মবিদ্যায় এমন প্রধান ছিলেন যে, তৎকালে ব্রাহ্মণজাতির মধ্যেও তাঁহার ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি অতীব বিরল ছিল। অনেক ব্রাহ্মণ-সন্তানও তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া, বিনীত শিষ্যের ন্যায়, ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ লইয়া, নিজেরা কৃতার্থ হইত এবং সেই উপদেশ নিজ জাতির মধ্যে প্রচার করিত। বালাকিও এই নরপতির তাদৃশ কীর্ত্তির কথা নানা স্থানে ও নানা লোকের মুখে, না শুনিয়া ছিলেন, এমন নহে; তথাপি অদম্য অভিমানে দৃপ্ত হইয়া, বালাকি, সেই রাজাকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ প্রদান মানসে ও তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান কতদূর তাহা পরীক্ষা করিবার উদ্দেশে, কাশীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। অবিলম্বে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। বালাকি রাজাকে বলিতে লাগিলেন :—"হে রাজন্! আমার এই শরীরমধ্যবর্ত্তী আত্মা সমস্ত দৈহিক ক্রিয়ার কর্ত্তা এবং সুখদুঃখাদির ভোক্তা; ঐ পরিদৃশ্যমান সূর্য্যের মধ্যেও সেই আত্মা রহিয়াছেন। আমি নিরন্তর এই আত্মারই উপাসনা করিয়া থাকি। এই আত্মাকেই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের প্রেরক বলিয়া অবগত হউন্। এই উভয় আত্মাকে অভিন্ন ভাবে উপাসনা করুন্।" রাজা অজাতশত্রু বুঝিলেন যে, বালাকির এখনও মুখ্য ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে নাই; এই ব্রাহ্মণ ব্রহ্মপদার্থকে এখনও উপাধিবিশিষ্ট বলিয়া অনুভব করিতেছে; ইঁহার এখনও সর্ব্বোপাধিবিবর্জ্জিত আত্মজ্ঞান জন্মে নাই। তাই, রাজা বালাকির এই ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশে তত আনন্দলাভ করিতে না পারিয়া বলিলেন :—"মহাশয়! আপনি যে ব্রহ্মবিজ্ঞানের কথা আমাকে বলিতেছেন, উহা আমি অবগত আছি। কেবল এইরূপে মাত্র ব্রহ্ম পদার্থকে জানিলেই যথেষ্ট হয় না। ইহা অপেক্ষা যদি অন্য ভাবে ব্রহ্মকে বুঝিয়া থাকেন, তবে তাহাই বলুন।"

বালাকি, রাজার অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল :—"রাজন্! এই শরীরমধ্যবর্ত্তী আত্মাই এই পরিদৃশ্যমান্ চন্দ্রে বর্ত্তমান আছেন; এই চন্দ্র মধ্যবর্ত্তী আত্মা ও বুদ্ধি এবং মনের চালক আত্মা,—উভয়ই এক ও অভিন্ন। এই আত্মার উপাসনা করুন্। এইরূপে, যে আত্মপদার্থ আমার দেহে বর্ত্তমান, তাহাই আকাশস্থ বিদ্যুতের মধ্যেও বর্ত্তমান; এ উভয় আত্মাকে এক ও অভিন্ন বলিয়া বুঝিলে বিশেষ ফললাভ হয়। বহিঃস্থ

আকাশে যে পুরুষ বর্ত্তমান, আমার হৃদয়াকাশেও সেই আত্মাই অবস্থিত আছেন। বহিঃস্থ বায়ুতে এবং আমার শরীরমধ্যস্থ-প্রাণে একই আত্মা বাস করিতেছেন। আমার জ্ঞানরূপ অগ্নিতে যে আত্মা আছেন, তিনিই এই বাহিরের অগ্নিতে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। দেহের শুক্রে এবং বাহিরের জলে, একই আত্মা অবস্থিত; আবার বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে যে পুরুষ বিরাজিত, সেই পুরুষই বহিঃস্থ খড়্গাদি স্বচ্ছ পদার্থে বর্ত্তমান। এইরূপ, বাহিরের গাঢ় অন্ধকারে এবং অন্তঃকরণের অজ্ঞানান্ধকারে;—বাহিক ও আন্তরিক এই উভয়বিধ অন্ধকারে সেই একই আত্মা অবস্থিত আছেন। অতএব এই শরীরের সর্ব্বেন্দ্রিয়ের চালক আত্মাই বহিঃস্থ সর্ব্বপদার্থে এক ও অভিন্ন ভাবে অবস্থান করিতেছেন। আত্মাকে এই এই ভাবে উপাসনা করিতে হয়। রাজন্! এইরূপ অভিন্ন অনুভব আপনার জন্মিয়াছে ত? না জন্মিয়া থাকিলে, আমার উপদেশ মত, এই এই ভাবে উপাসনা করুন্। আপনার ক্ষত্রিয়জন্ম সার্থক হউক্।"

রাজা, বালাকির কথা শুনিয়া, মনে হাসিয়া, বলিলেন:—"মহাশয়! আপনার ব্রহ্মজ্ঞান কি এই টুকুই, না এতদপেক্ষাও অন্য কোনরূপে আপনার ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিয়াছে? যদি এই মাত্রই আপনার উপদেশের মর্ম্ম হয়, তবে আমি আর উহা শুনিতে ইচ্ছা করি না। এইরূপ অভেদ জ্ঞান জন্মিলেই যথেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইল, ইহা মনে করিবেন না। আপনি যে ব্রহ্মবিজ্ঞান বুঝিয়াছেন,তাহা অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্টাধিকারীর উপযুক্ত"*। বালাকি রাজার মুখে এই কথা শুনিয়া বুঝিলেন যে, তাঁহার যে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ে গর্ব্ব জন্মিয়াছে, এই গর্ব্ব নিতান্তই অনুপযুক্ত। বালাকি নিতান্ত লজ্জিত হইয়া, রাজার নিকটে বিনীতভাবে মুখ্যব্রহ্ম বিজ্ঞানের উপদেশপ্রার্থী হইল। রাজা হাসিয়া বলিলেন—"ক্ষত্রিয় জাতি ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মবিদ্যা শিখাইবে, ইহা ত দেখিতেছি বিপরীত ব্যবস্থা। তথাপি আমি অদ্য মহাশয়কে ব্রহ্মবিদ্যা বলিয়া দিব। আমার সঙ্গে সঙ্গে আসুন"। এই বলিয়া রাজা, সস্নেহভাবে, লজ্জিত বালাকিকে হাতে ধরিয়া তুলিলেন এবং উভয়ে সেই বিশাল রাজভবনের অন্ত এক প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইলেন।

ইহাঁরা উভয়ে সেই প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, একটী গৌরদেহ, পূর্ণায়তশরীরধারী, পুরুষ শয্যায় শুইয়া আছে। সেই পুরুষ শয্যোপরি গাঢ়-নিদ্রায় অভিভূত। রাজা তাহাকে নাম ধরিয়া

* পাঠক বোধ হয় দেখিয়াছেন যে, বালাকি উচ্চ অধিকারী হইতে এখনও পারেন নাই। সর্ব্বাতীত, নির্গুণ ব্রহ্মের ধারণা এখনও বালাকির অনুভব-গোচরে আইসে নাই। যে ব্রহ্ম সূর্য্য চন্দ্রাদি আধিদৈবিক পদার্থে প্রকাশিত, যে ব্রহ্ম চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গে প্রকাশিত, সেই ব্রহ্মকে, বালাকি আপনার আত্মারূপে অর্থাৎ শরীরান্তর্গত ইন্দ্রিয়াদির চালক, ক্রিয়ানির্ব্বাহক কর্ত্তা ও সুখদুঃখাদির ভোক্তা ব্যতীত অন্যরূপে, ধারণা করিতে পারেন নাই। বিশেষ বিশেষ উপাধিতে প্রকাশিত এবং জাগতিক শক্তিসমূহে ও প্রাণীবর্গের অন্তঃকরণে ও বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রকাশিতরূপে যে ব্রহ্ম, তাহা সোপাধিক। সর্ব্বাতীত, পরিপূর্ণ ব্রহ্মের স্বরূপ ইহা হইতে পৃথক্। তিনি কোন বিশেষ শক্তি বা বিশেষ পদার্থের স্বরূপভূত নহেন। তিনি সর্ব্বক্রিয়া, সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বজ্ঞান, সর্ব্বানন্দ স্বরূপ, পূর্ণস্বভাব, অতএব সর্ব্বাতীত। কিন্তু বালাকির এখনও এই পূর্ণস্বরূপের জ্ঞান উদিত হয় নাই। রাজা অজাতশত্রু তাই তাঁহাকে নিকৃষ্টাধিকারী বলিয়াছেন।

ডাকিলেন, তাহাতেও তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল না। অন্যান্য নাম ও সংজ্ঞা ধরিয়া ডাকিলেন, তাহাতেও তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল না। তখন রাজা তাহার গায়ে হাত দিয়া ডাকিতে লাগিলেন; তখন সেই পুরুষের নিদ্রাভঙ্গ হইল, সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল ও বিস্মিত হইয়া দেখিল, রাজা স্বয়ং একটী ব্রাহ্মণসহ উপস্থিত !!

অজাতশত্রু বালাকিকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন :—"এই পুরুষ যখন গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত ছিল, তখন ইহার বিজ্ঞানময় আত্মা * কোথায় ছিল? এবং যখন এই পুরুষ নিদ্রা হইতে জাগিয়া উত্থিত হইল, তখনই বা কোথা হইতে অকস্মাৎ সেই আত্মা পুনরায় দেহে আসিয়া উপস্থিত হইল?" বালাকি, রাজার এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে না পারিয়া, তুষ্ণীম্ভাবে রহিলেন। রাজা ব্রাহ্মণকে তদবস্থ দেখিয়া, বলিতে লাগিলেন :—

"এই পুরুষ যখন গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত ছিল, তখন ইহার আত্মা সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি উপসংহৃত করিয়া হৃদয়াকাশে লীন ছিল। গাঢ় সুষুপ্তির সময়ে আত্মা স্বকীয় স্বরূপে অবস্থিত থাকে এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ও প্রাণাদি শক্তির বিষয় প্রকাশ সামর্থ্য সেই আত্মায় উপসংহৃত হইয়া বিলীন অবস্থায় থাকিয়া যায়। ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণাদির বিশেষ বিশেষ সামর্থ্য তখন সাধারণ শক্তিতে লীন হয়। ইহাই আত্মার স্বরূপাবস্থা। ইহাকেই আত্মার সুষুপ্তির অবস্থা বলে। তখন চক্ষু, কর্ণ, বাক্য, প্রাণ, অন্তঃকরণ প্রভৃতি সমস্ত বিশেষ বিশেষ শক্তি একাকার হইয়া আত্মায় অবিভক্তরূপে অবস্থিত হয়।

পুরুষ যখন নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন সন্দর্শন করে, তখন সেই পুরুষ জাগ্রদবস্থায় নানা ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা যাহা যাহা অনুভব করিয়াছিল, সেই গুলিরই সংস্কার অন্তঃকরণে উদিত হয় এবং সেই সংস্কার বশতঃই স্বপ্ন সন্দর্শন করিতে থাকে। এই জন্যই স্বপ্নাবস্থায় বাহিক চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের কোন ক্রিয়া না থাকিলেও, জাগ্রদবস্থায় ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা যাহা অনুভব করিয়াছিল, তাদৃশ অনুভবের সদৃশ কর্ম্মময়ী বাসনা বা সংস্কার উদ্বুদ্ধ হয় এবং সেই জন্যই 'আমি এই রাজা হইয়াছি,' 'এই আমার প্রজাবর্গ এবং এই আমার রাজত্ব,'—এই প্রকার স্বপ্ন উপস্থিত হয়। এ গুলি অন্তঃকরণবদ্ধ সংস্কারের ফল মাত্র। জাগ্রদবস্থায়, ইন্দ্রিয় ও মনের দ্বার দিয়া পুরুষ যে রূপাদিদর্শন ও সুখদুঃখ অনুভব করে,—ইহা যেমন আত্মার প্রকৃত অবস্থা নহে; এইরূপ অন্তঃকরণে স্থিত সংস্কারের প্রভাবে যে স্বপ্নদর্শন সময়ে নানারূপ সুখ দুঃখাদির অনুভব হয়, তাহাও আত্মার প্রকৃত স্বরূপ নহে। আত্মা এই দুই অবস্থারই অতীত বস্তু। ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের নানাবিধ ক্রিয়া হইতে থাকে বলিয়াই, সেই সকল ক্রিয়াবশতঃই আত্মার প্রকৃত একরস, নিত্য চৈতন্য স্বরূপে আবৃত হইয়া যায়, এবং সেই সকল ক্রিয়ার সহিত একীভূত বলিয়া আত্মাকে বোধ হয়। কাজেই, কি জাগ্রদবস্থায়, কি স্বপ্নাবস্থায়,—উভয় অবস্থাতেই আত্মাকে সুখদুঃখাত্মক ও নানাক্রিয়াশীল বলিয়া বোধ জন্মে।

কিন্তু গাঢ় সুষুপ্তির অবস্থায় আত্মা নিজ-

* বিজ্ঞানময় আত্মা—সংকল্প বিকল্পাত্মক অন্তঃকরণকে বিজ্ঞান বলে। প্রকৃত আত্মচৈতন্য এই অন্তঃকরণের সাক্ষীরূপে অবস্থিত। জীবাত্মা এই অন্তঃকরণের সম্বন্ধবশতঃ বিজ্ঞানময় বলিয়া কথিত।

স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। তখন ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণাদি ক্রিয়ার দ্বার সকল বিলীন হইয়া থাকে বলিয়া, আত্মার প্রকৃত স্বরূপ তখন ফুটিয়া উঠে। সর্ব্বক্রিয়া-সাধারণ ও সর্ব্বজ্ঞান-সাধারণ রূপে তখন আত্মা অবস্থিত থাকেন, তখন আর কোন বিশেষ বিজ্ঞান ও বিশেষ ক্রিয়া থাকে না। কেন না তখন বিশেষ ক্রিয়া ও বিশেষ বিজ্ঞানের দ্বার স্বরূপ অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়গুলি একাকার হইয়া, পূর্ণশক্তি ও পূর্ণজ্ঞান স্বরূপ আত্মাতে বিলীন হইয়া গিয়াছে। ইহাই সুষুপ্তির অবস্থা, ইহাই আত্মার প্রকৃত স্বরূপ।

হৃদয় বা মেরুদণ্ড হইতে আবির্ভূত হইয়া, দ্বিসপ্ততি সহস্র শিরাজাল, অশ্বত্থপত্রের ন্যায়, দেহের চারিদিকে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। জাগ্রদবস্থায়, সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তির চালক ও অধিষ্ঠাতা বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়-শক্তিগুলিকে সেই সমস্ত শিরাপথে, দেহের বহির্দিকে, ইন্দ্রিয়গুলির বিশেষ বিশেষ প্রদেশে (গোলোকে) প্রসারিত করিয়া দেয়। বিজ্ঞানময় আত্মচৈতন্য সেই সকল ইন্দ্রিয়শক্তি দ্বারা নিজে প্রকাশিত হন। ইহাই জাগ্রদবস্থা। আবার ইন্দ্রিয়শক্তিগুলি পুনরায় যখন ঐ সমস্ত শিরাপথ বাহিয়া, হৃদয়ে প্রতিসংহৃত হয়, তখন আত্মচৈতন্যও সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কুচিত হন। ইহাই বুদ্ধির সহিত আত্মচৈতন্যের একীভবন। ইহাই জীবের স্বপ্নাবস্থা। তৎকালে বুদ্ধির সংস্কাররাশি আত্মচৈতন্যে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। সুষুপ্তিকালে বুদ্ধিবৃত্তিও বিলীন হয়। সুতরাং তখন আর আত্মচৈতন্যের কাহারও সহিত সম্বন্ধ থাকে না। সুতরাং তখন আর দেহ, ইন্দ্রিয়, ও অন্তঃকরণের সম্পর্ক শূন্য হওয়ায়, আত্মচৈতন্যে শোক, দুঃখ, বিশেষ কোন বিজ্ঞান বা বিশেষ কোন ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় না। তখন আত্মা পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণক্রিয়ারূপে, স্ব-স্বরূপ প্রাপ্ত হন। ইহা পূর্ণানন্দের অবস্থা। সেই আনন্দের বিকারভূত নানাবিধ বিশেষ বিশেষ সুখদুঃখাদির অনুভূতি তখন আর থাকে না। সুতরাং মুখ্য-ব্রহ্মে কোন বিকার নাই; তাঁহার কোন অবস্থাভেদ নাই।

যেমন উর্ণনাভ অন্য কোন সহায় ব্যতিরেকে তন্তুজাল বাহির করে, যেমন এক অগ্নি হইতে সহস্র সহস্র স্ফুলিঙ্গ আপনি বহির্গত হয়; তদ্রূপ এক চৈতন্য হইতে বিনাসহায়ে, সমস্ত ইন্দ্রিয়, সমস্ত লোক, সমস্ত পদার্থ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, স্থিতিকালে তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই ইহারা বর্ত্তমান থাকে, প্রলয়কালে ইহাঁরই পূর্ণশক্তিতে অন্তর্হিত হয়। অতএব বিশেষ কোন প্রকাশের সহিত মুখ্যচৈতন্যের কোন বিশেষ সম্পর্ক নাই। আত্মচৈতন্য সর্ব্বাতীত, সাধারণ ও পূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মচৈতন্যে দ্রষ্টা ও দৃশ্য ভেদ নাই।"

অজাতশত্রু ও বালাকির উপাখ্যান সমাপ্ত হইল। শঙ্করের মতে ব্রহ্মের দ্বিবিধ অবস্থা নিত্য। এক পূর্ণস্বরূপ, আর সেই পূর্ণস্বরূপের পরিচায়ক অপূর্ণ স্বরূপ। এই অপূর্ণ স্বরূপই জগদবস্থা। ইহা পূর্ণতার দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। সুতরাং পরমার্থতঃ এই দুই অবস্থার বাস্তবিক কোন ভেদ নাই। পরমাত্ম-চৈতন্য হইতে জগৎ নামরূপে অভিব্যক্ত। এই নামরূপ, সাধারণ ও বিশেষ,—এই দ্বিবিধ ভাবাপন্ন। যাহা সাধারণাত্মক তাহাই পূর্ণভাব, যাহা বিশেষাত্মক তাহাই অপূর্ণ। একথা শঙ্কর অন্য স্থলে সুস্পষ্ট উল্লেখ করি-

য়াছেন। তদ্দ্বারাই তাঁহার অভিপ্রায় বিলক্ষণ বুঝা যায়। অব্যাকৃত জগৎ ব্যাকৃত হইয়াছে। অব্যাকৃত অবস্থাটী সামান্যাবস্থা, ব্যাকৃত অবস্থাটী বিশেষাবস্থা। অব্যাকৃত অবস্থায় সমস্ত নামরূপের সাধারণ শক্তি বর্ত্তমান আছে। সেই সাধারণ শক্তিই বিশেষ বিশেষ শক্তিতে পরিণত হইতেছে। "বীজাবস্থং জগৎ প্রাগুৎপত্তেঃ। তদেব স্থূতং জগৎ (প্রাগুৎপত্তেঃ) অব্যাকৃতং সৎ নাম্না রূপে নৈবচ ব্যাক্রিয়ত। স্বয়মেবাত্মৈব ব্যাক্রিয়ত।" আনন্দগিরির টীকা এ স্থলে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। "নাম সামান্যং দেবদত্তাদিনা বিশেষনাম্না সংযোজ্য সামন্যে বিশেষবানর্থো নাম ব্যাকরণবাক্যে বিবক্ষিতঃ।" রূপ সম্বন্ধেও এই কথা বুঝিতে হইবে। যাহা সামান্যাত্মক, তাহাই বিশেষ ভাবাপন্ন হইয়াছে; ইহাকেই অব্যাকৃতের ব্যক্তীভাব বলে। এই অব্যাকৃত ভাবই ব্রহ্মের স্বরূপ। "পরস্যাত্মনোঽব্যাকৃতজগদাত্মত্বেন বিবক্ষিতত্বাৎ জগদব্যাকৃতং ব্যাক্রিয়েত ইত্যবোচাম।" আবার দেখুন, শঙ্কর কি বলিতেছেন—"জগদিদমব্যাকৃতং ব্যাকৃতঞ্চেতি অভেদবিবক্ষায়াং আত্মানাত্মনোর্ভবতি ব্যপদেশঃ। তথেদং জগৎ উৎপত্তি-বিনাশাত্মকমিতি কেবল জগদ্ব্যপদেশঃ, তথা মহানজ আত্মাঽস্থূলোঽনণুঃ ন এষ নেতি নেত্যাদি কেবল আত্মব্যপদেশঃ।" অতএব স্পষ্টই শঙ্করের অভিপ্রায় আমরা বুঝিতেছি। তাঁহার ব্রহ্ম একাধারে নির্গুণ ও সগুণ, সামান্য ও বিশেষ, পূর্ণ ও অপূর্ণ। অপূর্ণ পূর্ণেরই অভিব্যক্তি, পূর্ণেরই পরিচায়ক লিঙ্গ বা চিহ্ন মাত্র। শঙ্করের এই তাৎপর্য্য বিশেষরূপে মনে রাখিতে হইবে এবং এই অজাত-শত্রু ও বালাকির উপাখ্যান হইতে আমরা ব্রহ্ম সম্বন্ধে এই তত্ত্বই শিখিয়াছি।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

উপনিষদ-গ্রন্থাবলী

[ক্রমে প্রধান প্রধান উপনিষৎ সকল পয়ারাদি চির-প্রচলিত ছন্দে সহজ ভাষায় অনুবাদিত হইলে বঙ্গবাসীর প্রভূত উপকার সাধিত হয়, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া উপনিষৎ গ্রন্থাবলী নাম দিয়া ঐতরেয়োপনিষদের মর্ম্মানুবাদ প্রকাশ করিলাম। অন্যান্য উপনিষৎ সকল যথা সময়ে প্রকাশিত হইবে]।

ঐতরেয়।

প্রথম অধ্যায়।

কিছুই ছিল না পূর্ব্বে, আত্মা মাত্র ছিল;
"প্রকাশিব সর্ব্ব-লোক" সে আত্মা ভাবিল।
তখনি এ চারি লোক হইল সঞ্জাত,—
অম্ভ, মরীচি, মর, অপ নামে খ্যাত।
অম্ভ লোক প্রতিষ্ঠিত দ্যুলোক উপরে,
মরীচি হইল ব্যাপ্ত অন্তরীক্ষ যুড়ে।
পৃথিবী হইল মর, মৃত্যুর আধার;
পৃথিবীর নিম্নে স্থিত অপ্ নাম তার।
তখন হেরিলা আত্মা লোক চতুষ্টয়,
হেরিয়া চিন্তিলা আত্মা সেই সু-সময়।
"লোক সব সৃজিয়াছি; এবে লোক পাল
সৃজিব কি রক্ষিবারে লোক সুবিশাল?"
এত ভাবি জল হ'তে লয়ে উপাদান,
করিলেন পিণ্ডবৎ পুরুষ নির্ম্মাণ।
অতঃপর সে পুরুষে ধ্যান ক'রে ধাতা,
পিণ্ড ফাটি মুখ হয়, ডিম্ব ফাটে যথা।

মুখ হ'তে হৈল বাক্য, অগ্নি বাক্য হ'তে;
নাশারন্ধ্র হৈল দুটি, প্রাণ-বায়ু তা'তে।
তারপর অক্ষিদ্বয়, চক্ষু অক্ষি হ'তে,
আদিত্য জন্মিলা চক্ষে, নিমেষ মাঝেতে।
কর্ণদ্বয় হৈল জাত, তা'হতে শ্রবণ,
শ্রবণ হইতে দিক্ হইল জনম।
ত্বক হৈল অতঃপর, ত্বক হ'তে লোম,
লোম হ'তে বনস্পতি ওষধি জনম।
তখন হৃদয় হৈল, তাহা হ'তে মন,
মন হ'তে চন্দ্রমা হইল স্বজন।
নাভি-গর্ত্ত হৈল তবে; তা'হতে অপান,
সে বায়ু হইতে হয় মৃত্যুর নির্ম্মাণ।
শেষে হইল শিশ্ন জাত, শিশ্ন হ'তে রেতঃ,
রেত হ'তে জল হৈল,—যথা অভিপ্রেত।

ইতি প্রথম খণ্ড।

এ সব দেবতা সৃষ্ট হইয়া তখন,
সংসার অর্ণবে তাঁরা হইলা পতন।
ক্ষুধা তৃষ্ণা দিলা স্রষ্টা * সে পিণ্ড পুরুষে;
সে সব দেবতা † তাঁরে কহিলা হরষে;
"এ হেন আশ্রয় স্থান করুন প্রদান,
যেথা মোরা পারি অন্ন করিতে ভোজন।"
কথা শুনি স্রষ্টা তবে গো-মূর্ত্তি আনিয়া
উপস্থিত করিলেন দেবতা লাগিয়া।
গো-মূর্ত্ত পিণ্ডেরে হেরি সে সব দেবতা,
কহিলা, "পর্য্যাপ্ত নহে, অন্য দেহ ধাতা।"
তখন আনিয়া ধাতা দিলা অশ্বাকার
পিণ্ড এক, অন্ন হেতু দেবতা সবার।
অশ্বাকার পিণ্ড হেরি সে সব দেবতা
কহিলা, "পর্য্যাপ্ত নহে, অন্য দেহ ধাতা।"
অতঃপর নরাকার পুরুষ আনিয়া
দয়া করি দিলা ধাতা দেবতা লাগিয়া।
পুরুষে হেরিয়া হৃষ্ট দেবতা সকল,
"অতীব সুন্দর" বলি হইলা চঞ্চল।

* আত্মা। † মুখ নাসা চক্ষু কর্ণ আদি।

"অতীব সুন্দর স্থান" কহিলা দেবতা;—
"প্রবেশ' আপন স্থানে" কহিলেন ধাতা।
তাঁহার আদেশে সবে নিজ নিজ স্থানে
প্রবেশ করিলা অতি পুলকিত মনে।
বাক্‌রূপে প্রবেশিলা অগ্নি মুখদ্বারে,
বায়ু প্রাণরূপে গেলা নাসিকা ভিতরে।
চক্ষুরূপে অক্ষি মাঝে পশিলা আদিত্য,
কর্ণে দশদিক পশে শ্রোত্ররূপে, সত্য।
ত্বক মাঝে বনস্পতি পশে লোম হ'য়ে,
মন হ'য়ে চন্দ্রমা প্রবেশে হৃদয়ে।
অপান হইয়া মৃত্যু নাভিতে পশিলা,
রেতোরূপে শিশ্নে জল প্রবেশ করিলা।
ক্ষুধা তৃষ্ণা কহে, "স্রষ্টা, স্থান দেও মোরে"
তথাস্তু বলিয়া স্রষ্টা কহিলা দোঁহারে।
"এই সব দেব দেহে তোমাদের স্থান
দেব সহ ভাগী উভে করিনু বিধান।"
সে হেতু যে কোন দেবে হবি দান হয়,
ক্ষুধা তৃষ্ণা তার ভাগী, জানিবা নিশ্চয়।

ইতি দ্বিতীয় খণ্ড

তখন ভাবিলা ধাতা, "লোক লোকপাল
সৃজিনু; সৃজিব এবে অন্ন সুরসাল।"
এত ভাবি চিন্তে ধাতা জলের বিষয়,
তাহাতে সু-সূক্ষ্ম মূর্ত্তি উৎপন্ন হয়।
যেই মূর্ত্তি জনমিল, অন্ন ত তাহাই;
অন্ন আদিমূর্ত্তি স্থূল, অন্য কিছু নাই।
জনমিয়া অন্ন ঘোর চীৎকার করিলা,
চীৎকারি পশ্চাৎ মুখে দূরে পালাইলা।
প্রথম পুরুষ সেই জনমিলা যিনি
বাক্যে অন্নে ধরিবারে চাহিলেন তিনি।
বাক্যেতে নারিলা অন্নে করিতে গ্রহণ;
তাহ'লে বাক্যেই তৃপ্ত হ'ত সর্ব্বজন।
তা'র পর ঘ্রাণে অন্নে চাহিলা ধরিতে,
ঘ্রাণেতে নারিলা অন্নে গ্রহণ করিতে।
পারিতেন যদি ধাতা ধরিবারে ঘ্রাণে,

তাহ'লে ঘ্রাণেই তৃপ্ত হ'ত সর্ব্বজনে।
তখন চক্ষুতে ধাতা ধরিতে চাহিলা,
চক্ষুতে অন্নেরে তিনি ধরিতে নারিলা।
যদ্যপি চক্ষুতে ধাতা করিতা গ্রহণ,
অন্নে দেখিয়াই তৃপ্ত হইত ভুবন।
কর্ণে সেই অন্ন স্রষ্টা চাহিলা গ্রহিতে,
নারিলা ধরিতে ধাতা অন্নে কোন মতে।
স্রষ্টা যদি কর্ণে অন্ন ধরিতে পারিত,
অন্ন শুনিয়াই তৃপ্ত সকলে হইত।
তখন ত্বকেতে অন্ন চাহিলা লইতে,
বিফল হইল কিন্তু নারিলা ধরিতে।
স্রষ্টা যদি পারিতেন ত্বকে ধরিবারে
স্পর্শেই সকলে তুষ্ট হইত অন্তরে।
মনেও নারিলা ধাতা; কারণ তা' হ'লে
চিন্তা করিয়াই তৃপ্ত হইত সকলে।
স্রষ্টা চাহিলেন অন্ন শিশ্নে ধরিবারে,
নারিলা ধরিতে তাহে বিবিধ প্রকারে।
যদ্যপি পারিতা তিনি শিশ্নেতে ধরিতে,
শিশ্নে অন্ন ত্যজি লোক তুষ্ট হ'ত চিতে।
অবশেষে লীলাময় করিলা মনন
অপান বায়ুর দ্বারা করিতে গ্রহণ।
মুখ ছিদ্র হতে নিম্নে সেই বায়ু ধায়,
তাহে অন্ন ধরিবারে চাহিলা ত্বরায়।
অমনি গ্রহিলা অন্নে, করিলা ভক্ষণ;
অন্নের গ্রাহক বায়ু হইলা তখন;
অন্নায়ু অপান বায়ু হ'ল সেই হতে,
জীবন সে হেতু বিশ্বে মরণ সহিতে।

ভাবিলা স্রষ্টা সর্ব্ব দ্রষ্টা,
"কার্য্য-কারণ-ময়
এ মহা বিশ্ব হইছে দৃশ্য,
কেমনে বাঁচিয়া রয় *
আমা বিনা, কেমনে বাঁচিয়া রয়।
"পদ, মূর্দ্ধা, এই দুই প্রবেশের দ্বার,—
কোন্ পথে প্রবেশিব পুরীর মাঝার।
মুখ যদি কহে কথা, নাসা লয় ঘ্রাণ,
চক্ষু যদি নিজে দেখে, শুনে যদি কাণ,
ত্বক্ যদি স্পর্শ করে, চিন্তা করে মন,
অপান আপন কার্য্য করয়ে সাধন,
শিশ্ন যদি নিজ বেগে রেত ত্যাগ করে
তা হলে কে আমি?" বিভু ভাবিলা অন্তরে।
এত ভাবি শিরে কেশ বিভাগের স্থান †
বিদীর্ণ করিয়া মধ্যে করিলা প্রয়াণ।
সে হতে বিদৃতি নাম হৈল সেই দ্বারে,
সে পথ আনন্দকর সবার উপরে।
আত্মার প্রকাশ স্থান এই তিন হয়,—
জাগ্রত সুষুপ্তি স্বপ্ন তার পরিচয়।
তিনই হয় স্বপ্ন সম জ্ঞানের অভাবে,
তিন বাসস্থান ধাতা দেখাইলা তবে।
জাগ্রত সময় চক্ষু আত্মার আশ্রয়;
স্বপ্নে কণ্ঠ; সুষুপ্তিতে আবাস হৃদয়।
মূর্দ্ধা পথে পশি পুরে হেরি সর্ব্বভূতে,
ভাবিলা,—"এরা কি অন্যে চাহে প্রকাশিতে?
অন্য আত্মা ভূতচয় করে কি প্রকাশ?
স্বয়ংই সে ভূতগণ হয় কি বিকাশ?
চাহি সর্ব্বদিকে তিনি, চাহি ত্রিভুবনে,
আপনার রূপ মাত্র হেরিলা ইক্ষণে।
অন্য আত্মা, অন্য ভূত কিছু না হেরিলা,
সর্ব্ব ব্যাপ্ত রূপে নিজ বিভূতি দেখিলা।
হেরি কহিলেন হর্ষে "হেরিনু আমারে—
হেরিনু আমারে ব্যাপ্ত বিশ্ব চরাচরে।"
এ হেতু ইদন্দ্র নাম হইল আত্মার *;
যিনি নেহারেন সর্ব্ব, এ নাম তাঁহার।
ব্রহ্মজ্ঞ পরোক্ষভাবে ইন্দ্র বলে তাঁরে,
দেবতা পরোক্ষ-প্রিয় কহিনু তোমারে।
নিশ্চয় জানিও ইহা নির্ম্মল অন্তরে,
নিশ্চয় জানিও ইহা হৃদয় মাঝারে॥

ইতি তৃতীয় খণ্ড।

ওঁ তৎসৎ।
ইতি প্রথম অধ্যায়।

---

* রহে।

* পরমাত্মার। † পুরুষের।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

এ সংসার মাঝে আত্মা বীজ রূপে
পুরুষের দেহে রহে ;
সর্ব্ব অঙ্গ হ'তে হইছে সঞ্চিত
রেতো রূপে আত্মা দেহে।
রেতো রূপী আত্মা স্বদেহে পুরুষ
সতত ধারণ করে,
যথা কালে তিনি করেন সিঞ্চন
স্ত্রী-দেহ-ভাণ্ড ভিতরে।
সংসারী আত্মার প্রথম জনম
স্ত্রী দেহে সিঞ্চিত হ'লে
সে দেহ সহিত হইয়া মিলিত
এক হ'ন যেই কালে।
স্ত্রীর অঙ্গ সহ এক হ'ন তিনি,
না দেন তাহারে ব্যথা,
স্বামীর আত্মারে স্ত্রী আপন দেহে
পালেন,—এসার কথা।
স্ত্রী নিজ শরীরে স্বামীর আত্মারে
যতনে পালন করে,
সে হেতু স্বামীর পালনীয়া তিনি
সাদরে, সর্ব্ব প্রকারে।।
জনমের অগ্রে পিতা নিজ দেহে
করেন আত্ম-পোষণ,
জনমের পরে তিনিই কুমারে
করেন যত্নে পালন।
লোক রক্ষা হেতু নিজকেই পিতা
পুত্ররূপে রক্ষা করে ;
পুত্র জাত হ'লে আত্মাই তখন
দ্বিতীয় জনম ধরে।
পুত্ররূপী আত্মা সুকর্ম্ম সাধনে
পিতৃ-প্রতিনিধি হয়,
তা'ই বয়ো গতে ইহলোক হ'তে
পিতা যান সুসময়।
পুত্র রূপে আত্মা রহে ইহলোকে
পিতৃ রূপে যান চলে,
তিনিই আবার জনম গ্রহিয়া
আইসেন ভূমণ্ডলে।
ইহাই তাঁহার তৃতীয় জনম ;—
গতায়াত বারম্বার ;
তিনি পিতৃ রূপ তিনি পুত্র রূপ
অভিন্ন ব্যাপ্তি আত্মার।
ঋষি বামদেব কহিলা বচন,
এই তার সার মর্ম্ম :—
"গর্ভে থাকিয়া দেবতাদিগের *
জানিয়াছি আমি জন্ম।
শত-লৌহ-ময় পুরি মোরে রক্ষা
করেছিল সেই কালে,
নিম্ন দ্বার দিয়া হইনু বাহির,
শ্যেন পক্ষী সম বলে।
আত্মজ্ঞান বলে ভূমিষ্ট হইয়া
বামদেব বিদ্যাবান,
নিগূঢ় রহস্য জানিয়া সকল
স্বর্গে হৈলা অন্তর্ধান।
ঋষি স্বর্গে হৈলা অন্তর্ধান॥
ইতি চতুর্থ খণ্ড।

ওঁ তৎসৎ।
ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

যে আত্মা সাধনা করি, তিনি কোন্ জন ?
তিনি চক্ষু ? যাহে হয় রূপের দর্শন ?
তিনি কর্ণ ? যাহে হয় শ্রবণ শব্দের ?
তিনি নাসা ? যাহে ঘ্রাণ লইছি গন্ধের ?
সত্যই কি আত্মা তাহা, যাহা বাক্য কহে ?
আত্মা জিহ্বা ? মিষ্টামিষ্ট বোধ হয় যাহে ?

* পূর্ব্বে মনোবৃত্তি সকলকে দেবতা বলা হইয়াছে।

আত্ম কর্ত্তৃ ভাব কিম্বা মন কিম্বা ধৃতি,
বিজ্ঞান, প্রজ্ঞান, মেধা, হৃদয় কি মতি,
দৃষ্টি কি মনীষা কিম্বা সংকল্প কি স্মৃতি,
ক্রতু,* অসু†, কাম কিম্বা বশ আর জূতি,‡
এ সকল প্রজ্ঞানের নাম মাত্র হয়
ইহারা প্রজ্ঞান নহে, জানিবা নিশ্চয়।
প্রজ্ঞান-ই ত ব্রহ্ম, ইনি ইন্দ্র প্রজাপতি;
সকল দেবতা ইনি, পঞ্চভূত-স্থিতি ;
ইনি পঞ্চ মহাভূত, পৃথিবী, আকাশ,
বায়ু, জল, জ্যোতি রূপে ইনি স্বপ্রকাশ।
ইনি ক্ষুদ্র, ইনি মিশ্র¶ ইনি বীজরূপ,
জরায়ুজ কি অণ্ডজ, স্বেদজ স্বরূপ ;
উদ্ভিজ্জ ইনিই, ইনি হস্তী, গাভী, অশ্ব,
জঙ্গম, পতত্রি§ আর ইনিই মনুষ্য।
এই বিশ্বে সবই তাঁ'র প্রজ্ঞা-নেত্র হয়,
প্রজ্ঞানেই অবস্থিত, প্রজ্ঞা সর্ব্বময়।
প্রজ্ঞান-ই ত ব্রহ্ম বস্তু, সর্ব্ব সারাৎসার,
প্রজ্ঞান হইতে ভিন্ন অন্য নাহি আর।

জ্ঞানময় আত্মা;— ইহারে লভিয়া
বামদেব বিদ্যাবান,
লভি সর্ব্ব কাম, অমৃত হইয়া
স্বর্গে হৈলা অন্তর্ধান।
তিনি স্বর্গে হৈলা অন্তর্ধান ॥

ইতি তৃতীয় অধ্যায় ॥

ইতি ঐতরেয়োপনিষৎ। ওঁ তৎসৎ ॥
ওঁ তৎসৎ ॥

শ্রীশশধর রায়।

* অধ্যবসায়। † প্রাণ।
‡ চিত্তের দুঃখিত্বাভাব অর্থাৎ তুষ্টি।
¶ সর্পাদি উভচর।
§ পক্ষী।

চণ্ডীদাস।

(শেষকাল)

রাঢ় ও উৎকল রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী সুবিস্তৃত প্রদেশকে মল্লভূমি বলিত। পূর্ব্বকালে মল্লজাতি উহার অধীশ্বর ছিল। বর্ত্তমান মানভূমি, সিংহভূমি, শিখরভূমি, শূরভূমি প্রভৃতি প্রাচীন কালে মল্লভূমির অন্তর্গত ছিল এবং মল্লগণ দ্বারা অধ্যুসিত ও শাসিত হইত। মান, সিংহ, বীর, শূর, বরা, ধল প্রভৃতি আধুনিক মল্লগণের উপাধি দেখিয়াও তাহার উপলব্ধি হয়। মেগেস্থিনিস উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন যে, সমুদ্রের উপকূলে কলীঙ্গি জাতির বাস ; তদূর্দ্ধে মণ্ড ও মল্লী, যাহাদিগের গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত দেশে মল্লস নামক পর্ব্বত (Frag I. VI.) ইউল সাহেবের মতে উল্লস পর্ব্বত বর্ত্তমান দামোদর সন্নিকটবর্ত্তী পরেশনাথ গিরি (Ind. Ant. Vol VI, P. 127) ইহা পঞ্চকোটের শৈলমালা ও সুশুনীয়ার পাহাড় হওয়া অসম্ভব নহে। পরেশনাথ, পঞ্চকোট এবং সুশুনীয়া বর্ত্তমান মল্লভূমির বহির্ভূত। সুতরাং মেগেস্থিনিসের সমরভূমি প্রত্যয়ান্ত মানভূমি, বীরভূমি, ইত্যাদি প্রদেশ সমূহ মল্লদেশের অন্তর্গত ছিল, এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। (১)

বীরভূমের সর্ব্বপ্রথম হিন্দু নরপতি— বীরসিংহ, ইনি খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। হণ্টার সাহেব বলেন যে, বীরসিংহ নিজ বাহুবলে বীরভূমবাসিদিগকে পরাজিত করিয়া নিজের শাসনাধীনে আন-

(১) ঐতিহাসিক চিত্র।

য়ন করেন। রাজ্য দখল করার পর, তিনি নিষ্কণ্টক হইবার অভিপ্রায়ে স্বীয় ভ্রাতাকে বিতাড়িত করতঃ রাজশক্তির পরিচয় স্বরূপ 'বীরসিংহ' নগর প্রতিষ্ঠিত করেন। বীরসিংহ রাজধানীতে অভেদ্য দুর্গ, মনোরম প্রাসাদ, উপবন প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। শিউড়ির তিন ক্রোশ পশ্চিমে সেই সকলের ভগ্নাবশেষ এখনো ধরণীর বুকবক্ষে পতিত থাকিয়া অতীত কীর্ত্তির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। জীবন ও সুখ ক্ষণস্থায়ী,অধিকন্তু চিরদিন সমান থাকে না। বীরসিংহ এই শাশ্বতী নীতির অনুসরণ করিয়া মুসলমান-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন এবং স্বীয় অমূল্য জীবন ডালি দিয়া রণ-ক্ষেত্রে অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত হন। তাঁহার পত্নী যবনের অপবিত্র সংস্পর্শে কলুষিত হইবার আশঙ্কায় সরোবরনীরে আত্ম বিসর্জ্জন দিয়া পতীর অনুগমন করতঃ হিন্দু সতীর কর্ত্তব্য পালন করেন। এই সরোবর অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। আজিও লোকে উহাকে 'রাণীদহ" বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে। বীরসিংহ রাজধানীর অনতিদূরে কাননাভ্যন্তরে গোপাল নামক দেবমূর্ত্তি এবং উক্ত বিগ্রহের চতুঃপার্শ্বে পুরাণ-বর্ণিত বৃন্দাবন-কুঞ্জের ন্যায় একটী কুঞ্জ রচনা করিয়াছিলেন। উক্ত কুঞ্জের নাম বৃন্দাবন ছিল। উহা আজিও দীনদশায় অবস্থান করিতেছে। তৎপর চণ্ডীদাসের সময় অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বীরভূমি মগধ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

বিদ্যাপতির নান্নুর ত্যাগের পর হইতে চণ্ডীদাস জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া অন্য কোথাও গিয়াছিলেন কি না, তাহা জানা যায় না। শ্রীযুক্ত রমণীমোহন মল্লিক মহাশয় লিখিয়াছেন,—"চণ্ডীদাস জীবনের শেষ দশায় শ্রীবৃন্দাবন ধামে গমন করিয়া সেখানেই সমাধিস্থ হন। আজ পর্য্যন্ত তাঁহার সমাধি, শ্রীবৃন্দাবনে বিদ্যমান আছে জানিতে পারা যায়। রামমণিও ঐ পথ অনুসরণ করেন।" মল্লিক মহাশয়ের একথা কতদূর বিশ্বাস করা যায়, তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। চণ্ডীদাসের পদাবলীর কোন স্থানে তাঁহার বৃন্দাবনবাসের কথা পাওয়া যায় না। শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয়েরও মত যে, চণ্ডীদাস বৃন্দাবনে গতায়ু হন।

ইহার পরই আবার রমণীবাবু লিখিয়াছেন,—"চণ্ডীদাস নান্নুরের নিকটবর্ত্তী মতীপুরে কীর্ত্তন করিতে গিয়াছিলেন, তথায় নাটমন্দির পতিত হওয়ায় তাঁহার ও রামমণির মৃত্যু হয়।" উল্লিখিত ঘটনাগুলি কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য নহে। আমার নিকট এই ঘটনাগুলিই সত্য বলিয়া বোধ হয়। চণ্ডীদাস বৃন্দাবনে দেহ ত্যাগ করেন,শুনিতে পাইয়া রমণীবাবু তাঁহাকে বৃন্দাবনে সমাধিস্থ করিয়াছেন। আমার বিশ্বাস, চণ্ডীদাস পূর্ব্বোল্লিখিত রাজা বীরসিংহ স্থাপিত 'বৃন্দাবনে' সমাধিমগ্ন হন। বীরভূম জেলার কীর্ণাহার হইতে প্রকাশিত 'বীরভূমি পত্রিকায় প্রকাশ যে, "বীরভূমি" কার্য্যালয়ের অনতিদূরে একটী প্রকাণ্ড ইষ্টক স্তূপ আছে। তাহার শিরোদেশে নানা জাতীয় বৃক্ষ লতা অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে। স্তূপের পাদদেশে একটী বৈরাগীর আশ্রম। প্রবাদ এই যে, চণ্ডীদাস গান করিতে করিতে মন্দির পতনে ঐ স্থানেই সমাহিত হন। লোকে ঐ আশ্রমকে 'চণ্ডীদাসের আখড়া' বলিয়া থাকে। মূলে কিছু সত্য নিহিত আছে, কেন না 'নহ্যমূলা জনশ্রুতিঃ।"

চণ্ডীদাস সম্বন্ধে কবি গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন,—

চণ্ডীদাস চরণ, চিন্তামণিগণ
শিরে করি ভূষা।
শরণাগত জনে, হীন অকিঞ্চনে
করুণা করি পূরব আশা॥
হরি হরি তব মঝু আকুশল যাব।
রসিক মুকুট মণি, প্রেম-ধনেহি ধনী
কৃপা নিরমিল যব পাব॥ ধ্রু
হৃদয় শুধি মোহে, ঐছে প্রবোধিব
যেছে ঘুচেয়ে আঁধিয়ার।
শ্যামর গৌরী, বিলাস রস কিহৌত
মঝু চিতে করু পরচার॥
দুহুঁক চরিত, বদন ভরি গাওব
রসিক ভকতগণ পাশ।
ক্ষম অপরাধ, সাধু মঝু পূরহ
কহ দীন গোবিন্দ দাস॥

চণ্ডীদাসের আদর যে এই কালে হইয়াছে, তাহা নহে। তৎকালেও তিনি যশঃ সম্মানে মণ্ডিত হইয়াছিলেন এবং তিনি যে কেবল কবিতাই লিখিতেন, তাহাও নহে, গদ্য পুস্তকও তিনি রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহার রচিত কোন গদ্য পুস্তক আমাদের দৃষ্টির অধিকারে আসে নাই।

জয় জয়দেব কবি নৃপতি শিরোমণি বিদ্যাপতি রসধাম।
জয় জয় চণ্ডীদাস রসশেখর অখিল ভুবনে অনুপাম॥
যা কর রচিত মধুর রস নিরমল গদ্য পদ্যময়গীত।
প্রভু মোর গৌরচন্দ্র আস্বাদিলা রায় স্বরূপ সহিত॥
বৈষ্ণব দাস।

ইহাতে জানা যায়, চণ্ডীদাস গদ্য পদ্যময় গীত রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু গদ্য পদ্যময় গীত কিরূপ, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। ন্যায়রত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন যে, বৈষ্ণবদাসেরও লেখার উপর আস্থা স্থাপন করা যায় না। বিশেষতঃ ইহা এক সাধারণ নিয়ম বলিয়া বোধ হয় যে, সকল দেশেই গদ্যের পূর্ব্বে পদ্যই প্রথম রচিত হয়। গ্রীসদেশে লিনস্ আর্কিয়স্ মিউজিয়স্ হোমর এবং ইটালী অর্থাৎ রোমে লিবিয়স্ এণ্ড্রো-মিকস্ প্রভৃতি কবিগণ সর্ব্বপ্রথমে পদ্যেরই রচনা করিয়াছিলেন। সংস্কৃতে বেদ,* সংহিতা, রামায়ণ প্রভৃতি পদ্য গ্রন্থেরই প্রথম সৃষ্টি হয়। অতএব বাঙ্গালাতে যে সে নিয়মের ব্যভিচার হইবে, তাহার কোন কারণ নাই, পদ্যের মধ্যেও গীতই প্রথমে রচিত হয়। লোকে চিত্ত বিনোদনার্থ স্বর সংযোগে গান গাইতে প্রবৃত্ত হইয়াই কবিত্ব শক্তির প্রথম অঙ্কুর রোপণ করে। ঐ সকল গান প্রথমতঃ লিপিবদ্ধ থাকে না—বহুকাল পর্য্যন্ত জনগণের রসনাবাসীই থাকে। পরে ক্রমশঃ লিপিবদ্ধ হইতে আরম্ভ হয়। পূর্ব্বোক্ত লিনস্ হোমরাদির রচনা এবং বেদ রামায়ণাদি সকলই ঐরূপ গীতময়। অতএব বাঙ্গালারও আদ্যকালে পূর্ব্বোক্ত কবিদ্বয়ের অথবা তাদৃশ অন্য কোন কবির গীতময় রচনাই যে প্রথমে প্রকাশিত হইবে, তাহাই সম্ভবপর বোধ হয়। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মত সমীচীন বলিয়াই মনে হয়। বঙ্গ সাহিত্যের প্রথমাবস্থায় কাব্যেরই প্রাদুর্ভাব ছিল, তত শৈশবে গদ্য রচনা সম্ভবপর নহে। বৈষ্ণবদাস অতিরিক্ত মাত্রায় স্তুতি করিতে গিয়া ঐরূপ প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

যাহা হউক, চণ্ডীদাস গীত রচনা করিয়া কেবল স্বগ্রাম-বাসীগণেরই কর্ণের তৃপ্তিসাধন

* "বেদকে আপাততঃ গদ্য বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। উহাতে এক প্রকার ছন্দ আছে এবং উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত নামক তিন সুরের দ্বারা উহা উচ্চারিত হয়, অতএব উহাও পদ্য ও গীত গ্রন্থ মধ্যে পরিগণিত।'—বাঙ্গালা-সাহিত্য ও বাঙ্গালা ভাষা।

করিতেন না, তিনি সখের পালা বাঁধিয়া স্থানে স্থানে গান গাহিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার স্বর যে সুমিষ্ট ছিল, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। রামমণিও তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন, তিনিও সঙ্গীত বিদ্যায় অপটু ছিলেন না। রামমণি নিজে সঙ্গীত রচনা করিতে ও গাহিতে পারিতেন। আমরা ইতিপূর্ব্বে রামমণির রচিত একটী পদ উদ্ধৃত করিয়াছি।

চণ্ডীদাসই সর্ব্বপ্রথম সখের দল বাঁধিয়া গান গাহিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করেন, এরূপ অনুমান করা নিরাপদ নহে। তিনি রাধা-কৃষ্ণ লীলার আদি প্রণেতা হইতে পারেন, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি আদি গায়ক বা সঙ্গীতের সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন। তাঁহার পূর্ব্বেও ভারতবর্ষে, বঙ্গভাষায় না হৌক্, দেবভাষায় সঙ্গীতের প্রচলন ছিল, যথা সামবেদ। এবং বর্ত্তমান সময়ে হার্‌মনিয়াম, কাউণ্টার পইণ্ট প্রভৃতি যে সকল বিচিত্র ব্যাপার সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা ত, প্রকারভেদে, প্রাচীন-কালে বিদ্যমান ছিল।

'It is true that Hindu music abounds in melody but it is not oad of harmony. The following quotation from Naroda's work will best explain our meaning' :—

গানস্য দশাবিধগুণবৃত্তিস্তদ্ যথা রক্তং
পূর্ণমলঙ্কৃতং প্রসন্নং ব্যক্তং বিক্রুষ্টং শ্লক্ষ্ণং সমং
সুকুমারং মধুরমিতি গুণাঃ। তত্ররক্তং নাম
বেণুবীণাদি স্বরানামেকীবে রক্ত মিত্যুচ্যতে।

'But of all of them are not to our present purpose ; রক্তং only serves our purpose well, and its difination is as follows : রক্তং is that which is produced by a combination of the sounds of all stringed instruments, wind instruments, and those of other kinds.—This is harmony.' (১)

এদেশী সঙ্গীতের উৎপত্তির কারণ ও উহার সৃষ্টিকর্ত্তার অনুসন্ধান করিতে যাওয়া নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। পুরাণাদি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, দেবাদিদেব মহাদেব সর্ব্বপ্রথম সঙ্গীত সৃষ্টি করিয়া প্রজাপতি ব্রহ্মাকে শিক্ষা দেন। তিনি আবার নারদ ঋষিকে শিখান, এইরূপে ক্রমে ক্রমে সঙ্গী-তের প্রচলন হয়। পুরানের সকল কথা বিশ্বাস করিতে হইলে, একথাও বিশ্বাস না করিয়া গত্যন্তর নাই। কিন্তু মহাদেব সৃষ্টি-কর্ত্তা হইলেও, তাঁহার কিম্বা তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্য দ্বারা তাহার উৎকর্ষতা সংসাধিত হয় নাই। মুসলমান নরপতিগণের সময়েই সঙ্গীত পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

চণ্ডীদাসের পূর্ব্বে মার্জ্জিত ভাষায় রাধা-কৃষ্ণ লীলা বিষয়ক সংগীতাদি না থাকিলেও আমাদের দেশের নিরক্ষর কৃষকগণ ক্ষেত্রে কার্য্য করিতে যাইবার সময়ে স্কন্ধদেশে হল লইয়া ও এক হস্ত দ্বারা বলবর্দ্দীর লাঙ্গুল ধৃত করিয়া মনের আনন্দে গ্রাম্য সংগীতাদি গাহিতে গাহিতে যাইত এবং চাঁদিনী রাত্রিতে স্রোতস্বিনী-বক্ষে তরণী ভাসাইয়া মাঝিগণও সে আনন্দ উপভোগ করিতে পশ্চাৎপদ ছিল না। এই সকল গ্রাম্য সং-গীতই বাঙ্গালার আদি সংগীত। ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন সমাজের আচার ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়।

'I think most Europeans who take the whole trouble to compare (*i.e.* boatman's songs) with the best specimens in Sangitsara (সঙ্গীতসার) &c. will readily credit my statement in my letter of 17th may 1875. (addressed to the Director of Public Instruction) viz, that while all Hindu musicians speak with contempt and almost abhorrence of the boatman's songs, I have heard many Europeans declare that *the boatmen's chants are the only music in Bengal that can properly be called music.* ' (২)

(১) সঙ্গীত দর্শন and অদ্ভুত রামায়ণ। Vide Hindu Patriot, 7th September 1874.—quoted by Naba Prova.)

(২) Calcutta Review--Mr. C.B. Clarke.

যাহা হউক, সঙ্গীতের উৎপত্তি, বিস্তৃতি, রাগরাগিণী ও তাল সম্বন্ধে পরবর্ত্তী প্রস্তাবে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। এখানে কেবল ছন্দ ও ভাষা সম্বন্ধে দুই একটী কথা লিখিয়া এই অধ্যায় শেষ করিব।

চণ্ডীদাস কেবল পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় তিনি অক্ষর গণিয়া কবিতা রচনা করেন নাই বা মিলের দিকেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন নাই। সংগীতের মিষ্টতার জন্য তিনি আবশ্যক পদ দীর্ঘ বা হ্রস্ব করিয়াছেন এবং সুবিধাজনক স্থানে যতি দিয়াছেন। তিনি অনেকটা জয়দেবের অনুকরণে পয়ার ও ত্রিপদী রচনা করিয়াছেন। ত্রিপদী সংস্কৃত কথা, উহার তিনটী করিয়া পদ থাকে। "পয়ার" শব্দটী কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা নিশ্চয়রূপে বলিতে পারা যায় না, কিন্তু বোধ হয় 'পাদ' শব্দের অপভ্রংশে পায়া, বা পয়া শব্দ উৎপন্ন হয়—যথা সে পায়া খাটের পায়া ইত্যাদি। ঐ পয়া হইতেই পয়ার শব্দ সঙ্কলিত হইয়াছে। অতএব পয়ার শব্দের অক্ষরার্থ পাদ (চরণ) বিশিষ্ট। ক্রমশঃ উহা নির্দ্দিষ্টরূপে ছন্দোবোধার্থ যোগরূঢ় হইয়া উঠিয়াছে।" (১)

চণ্ডীদাস খুব সম্ভবতঃ ১৩০৮—১৫ শকের মধ্যে পরলোক গমন করেন। লোকে বীরভূম জেলার কীর্ণহার গ্রামের নিকট তাঁহার সমাধি স্থান নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

চণ্ডীদাসের কবিত্ব শক্তি অতুলনীয় ছিল। কবি প্রসাদ দাস লিখিয়াছেন,—

দ্বিজ কুল সুত, রসময় চিত
জয় জয় চণ্ডীদাস।
মধুর মধুর, শব্দে গাইলা
যুগল রসের ভাব।
কিবা অপরূপ, কবিতা মাধুরী
আখর পিরীতি মাখা।
অমিয়া ছানিয়া, দিলা বিতরিয়া
অনুপ বচন ডাখা॥
বরজ যুগল, পিরীতির খনি
সে মুখ শরদ শশি।
কবিতা পঠনে, হেন লয় মনে
চিত যায় যেন খসি॥
বাশুলি আদেশে, যুগল পিরীতি
গাইলা সে কবি চন্দ।
রস কবিকুল, মত্ত মধুকর
পিয়ে ঘন মকরন্দ॥
নিতাই আদেশে, পরসাদ দাসে
গাইবে ব্রজ বিলাস।
চরণ সরোজে, শরণ লইনু
সফল করহ আশ॥

কবি কানুদাস লিখিয়াছেন,—

কবিকুল রবি, চণ্ডীদাস কবি, ভাবুকে ভাবুকমণি।
রসিকে রসিক, প্রেমিকে প্রেমিক, সাধকে সাধক গণি।
উজ্জ্বল কবিত্ব, ভাষার লালিত্য, ভুবনে নাহিক হেন।
হৃদে ভাব উঠে, মুখে ভাষা ফুটে, উভয় অধীন যেন॥
সরল তরল, রচনা প্রাঞ্জল, প্রসাদ গুণেতে ভরা।
যেই পশে কাণে, সেই লাগে প্রাণে, শুনামাত্র
আত্মহারা॥
রামতারা ধনী, রাধা স্বরূপিনী, ইষ্টবস্তু যাঁর হয়।
যাঁহার দরসে, চণ্ডী রসে ভাসে, কবিতার স্রোত বয়॥
হয় নাই হেন, না হইবে পুনঃ, হেন রস-পদ ভবে।
দীন কানুদাসে, রাখ পদপাশে, নামের ঘোষণা রবে॥

শ্রীব্রজসুন্দর সান্ন্যাল।

১। বাঙ্গালা সাহিত্য।

দুটী কবিতা।

সুন্দরী।

ওগো সুন্দরী, রূপ-বিভবে
অতুলন তুমি এ ভবে।

তুমি মান্মথ রথ, ললনা।
রঙ্গ কেতন তুলিয়ে যাও,
অঙ্গ ভঙ্গে দুলিয়ে যাও,
রথের তলায় দলিয়ে যাও
পথের পথিক কত না!

তুমি চপলার মত, রূপসী।
চকিত চরণে চলিয়ে যাও,
চমকি চক্ষু ঝলিয়ে যাও,
নিদয় হইয়ে ছলিয়ে যাও
হৃদয়েতে তাপ বরষি।

তুমি সমীরণ, মনোমোহিনী।
আপন খেয়ালে খেলিয়ে যাও,
কাননে তরুটী হেলিয়ে যাও,
চরণে লুটিলে ঠেলিয়া যাও
গগনেতে ধাও যখনি।

তুমি গতি-বিলাসিনী বাহিনী।
আহ্লাদে যেন গলিয়ে যাও,
কল্লোলে তনু ফুলিয়ে যাও,
ভাঙি তীর-হৃদি ভুলিয়ে যাও
কাঁদি কহে সে যা কাহিনী।

তুমি সুরভির যেন সুষমা।
লুকায়ে মাধুরি ঢালিয়ে যাও,
জাগায়ে চেতনা পালিয়ে যাও,
হতাশচিত্তে ফেলিয়ে যাও
সুবাসে ক্ষিপ্ত বাসনা।

তুমি গরবিনী ওগো কামিনী।
রূপের নেশায় টলিয়ে যাও,
ছার আশা বাণী বলিয়ে যাও,
অবনী উপেখি তলিয়ে যাও
আপনা স্বপ্নে আপনি।

রহ সুন্দরী, রূপ-গরবে
অতুলন তুমি এ ভবে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

কুসুমের প্রেম।

শাখী কহে ডাকি: "কুসুম, তোর
"কাছে এল ওই প্রজাপতি।
"রূপের চমক বিষম ওর,
"রেস্ত নাহিক এক রতি।

"ওই দ্যাখ্ তোরে আসিছে খুঁজি
"কালো-রূপ বাছা মৌমাছি;
"ঢের মধু ঘরে কোরেছে পুঁজি;
"বর-রূপে ওরে লহ বাছি।"

লাজে রাঙা গালে কুসুম কয়:
"রূপ ধন নাহি সাধিরে।
"প্রেম যে পরাণ কাড়িয়া লয়
"বক্ষে তাহারে বাঁধিরে।"

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

স্মার্ত্ত রঘুনন্দন।

বঙ্গের রাজধানী, পুণ্যভূমি নবদ্বীপ রত্ন-প্রসবা। এক সময়ে এই স্থলে যে কত শত মহাত্মাগণ ও সুধীবর্গ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া নবদ্বীপের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া, জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি ও যশঃ সৌরভ বিস্তার করিয়া গিয়াছেন, তাহা নির্ণয় করা যায় না।

সাহিত্য, দর্শন, শিল্প, বাণিজ্য, জ্যোতিষ, ন্যায় প্রভৃতির আলোচনা ও সেই সকলের উন্নতির জন্য নবদ্বীপ সাধারণের নিকট চির-প্রসিদ্ধ। কালের প্রবলাবর্ত্তে পড়িয়া সে গৌরব, সে শ্রী যদিও এক্ষণে পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে, সেই সকল খ্যাতনামা মনীষিগণ যদিও এক্ষণে অনন্তের ক্রোড়ে বিলীন হইয়া গিয়াছেন, তথাপি তাঁহাদের সে সকল কীর্ত্তি প্রত্যেক হিন্দুর হৃদয়ে চির বিরাজমান থাকিবে; তাঁহাদের নাম ভারত-পূজ্য হইয়া চির আদৃত হইবে। এই সকলের মধ্যে স্মার্ত্ত-রঘুনন্দন অদ্য আমাদের আলোচ্যের বিষয়।

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রঘুনন্দন জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়, ভট্টাচার্য্য; তৎকালে ইনি একজন প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত পণ্ডিত ছিলেন। অবস্থা তাদৃশ ভাল না থাকা হেতু নিজের বাটীতে একটী টোল খুলিয়া কোন রকমে দিনপাত করিতেন। "সময়-প্রদীপ" নামক একখানি স্মৃতি গ্রন্থ ইনি প্রণয়ন করেন। ইঁহার দুই পুত্র রঘুনন্দন ও যদুনন্দন। যদুনন্দন অতি অল্প বয়সেই জীবলীলা সাঙ্গ করেন।

রঘুনন্দের জন্ম সম্বন্ধে প্রকৃত কাল নিরূপণ করা নিতান্ত দুরূহ। আমাদের দেশে সে সময় এমন কোন বিশেষ ইতিহাস ছিলনা, যদ্দারা এই সকল মহোদয়গণের প্রকৃত তত্ত্ব ও কাল অবগত হইতে পারা যায়। তবে ঐ সকল পণ্ডিতগণের স্বরচিত গ্রন্থে ও অন্যান্য বিশ্বস্ত গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থে যেরূপ লিপি-বদ্ধ হইয়াছে, তাহাকেই তাঁহাদের প্রকৃত সময় বলিয়া গ্রহণ করা হয়।

রঘুনন্দন, তাঁহার ষষ্টিবর্ষ বয়সে তৎ সংগৃহীত "জ্যোতিষ গ্রন্থে" যাহা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন,* তাহাতে বোধ হয়, ইনি ১৪২৯ শকাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি মহাত্মা চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন, অর্থাৎ প্রায় তাঁহার ২০।২২ বৎসর পরে অবতীর্ণ হন।

রঘুনন্দন অতি শৈশব কাল হইতেই অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন, তাঁহার প্রকৃতি অতিশয় ধীর ও শান্ত ছিল। তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও মেধা প্রভাবে তিনি অতি অল্প দিবসের মধ্যে ব্যাকরণ, কাব্য, অভিধান প্রভৃতি অধ্যয়ন করিয়া সাধারণের নিকট বিশেষ আদৃত হইয়া উঠিলেন। তিনি যে ভবিষ্যতে একজন বিশেষ গণনীয় ও জগৎপূজ্য হইবেন, তদ্বিষয়ে কাহারও কোন সন্দেহ ছিল না।

পিতার একান্ত ইচ্ছা ও অনুরোধে রঘু-নন্দন বিংশতিবর্ষ বয়ক্রমে বিবাহ করেন; কিন্তু তিনি সে সময় যৌবন-স্বভাব-সুলভ আমোদে মত্ত না হইয়া শাস্ত্রাদি অধ্যয়নে আরো অধিকতর মন দিলেন এবং কাব্যাদি স্মৃতি অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎ-পরে শ্রীনাথ আচার্য্য চূড়ামণির নিকটে মী-মাংসা ও দায়ভাগ শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

রঘুনন্দন যে সময়ে ন্যায়শাস্ত্র, কাব্য, অলঙ্কার ইত্যাদি পাঠ করেন, সে সময় মিথিলার গর্ব্বখর্ব্বকারী, অদ্ভুত ধীশক্তি-সম্পন্ন নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি নবদ্বীপে সর্ব্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন, অপর দিকে মহাত্মা চৈতন্যদেব সনাতন হিন্দুধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়া, আপামর সাধারণকে ধর্ম্মের পথে আনয়ন করিতেছেন, সুতরাং, সে স্থলে রঘুনন্দন ঐ সকল পথে প্রাধান্য

* "নবাষ্ট শক্রহীনেন শকাব্দাঙ্কেন পূরিতা"। (অর্থাৎ ১৪৮৯)

লাভ সুদূরপরাহত বিবেচনা করিয়া প্রাধান্য লাভের জন্য, হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র ও স্মৃতি শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

মনুষ্যের ভাগ্য যখন সুপ্রসন্ন হয়, তখন সকল দিক হইতে, দৈব আসিয়া তাহার সহায়তা করে। আমরা যে সময়ের আখ্যায়িকা বর্ণনা করিতেছি, সে সময় মুসলমান সম্রাট সৈয়দ হোসেন সা বাঙ্গালার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। বঙ্গদেশ প্রায় ৪ শত বৎসর হইতে মুসলমানের অধিকার ভুক্ত ছিল, সুতরাং তাহাদের সহিত হিন্দুদিগের এই বহুকালব্যাপী সংসর্গ হেতু, আচার ব্যবহার-রীতি নীতি অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত ও হ্রাস-হইয়া গিয়াছিল; ধর্ম্ম ও সামাজিক বন্ধন অনেক পরিমাণে শ্লথ হইয়া পড়িয়াছিল। এই সকলের নব সংস্কার এই সময় বিশেষ আবশ্যক; রঘুনন্দন কাল পাত্র ও অবস্থা ভেদে সেই সকলের নূতন ব্যবস্থা, সমাজ গঠন ও ধর্ম্মানুশাসনের জন্য কৃতসংকল্প হইলেন।

রঘুনন্দন যে সময়ে শ্রীনাথ আচার্য্যের নিকট মীমাংসা ও দায়ভাগ পাঠ করেন, সেই সময় হইতেই, নানা শাস্ত্রের নানা মত এবং সকল বিষয়েরই অসামঞ্জস্য দেখিয়া, সেই সকলের সংস্কার আবশ্যক বোধ করিয়াছিলেন; ঐ সকলের সামঞ্জস্য রাখিতে না পারিলে সমাজ ও ধর্ম্মের বন্ধন যে ক্রমে শিথিল হইয়া পড়িবে, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এক্ষণে উত্তম সুযোগ বুঝিয়া সংস্কারের ও ব্যবস্থার ভার তিনি স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। একান্ত অধ্যবসায়ের সহিত, ২৫ বৎসর কাল অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া, কাশী, মিথিলা, দ্রাবিড় প্রভৃতি নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া, সেই সেই দেশের রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার পর্য্যালোচনা করেন এবং শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্রাদি গ্রন্থ সকল মন্থন করিয়া ও তাৎকালিক পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত তর্ক ও যুক্তি দ্বারা সেই সকল মত খণ্ডন করিয়া দিয়া নিজের মত প্রচলিত করেন। এই সকলে তিনি যেরূপ অদ্ভুত বিচার শক্তির, অসামান্য বুদ্ধিমত্তার ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তিনি সাধারণের নিকট পূজনীয় হইয়া গিয়াছেন।

এই সকল সংস্কার করিতে গিয়া তিনি মলিম্লুচ (মলমাস তত্ত্ব) দায়ভাগ প্রভৃতি অষ্টবিংশতি স্মৃতিতত্ত্বের অবতারণা করেন। ইহাতে হিন্দুদিগের যে সকল নিত্য নৈমিত্তিক অবশ্যকর্ত্তব্য ধর্ম্ম কর্ম্মাদি প্রতিপাল্য, সে সকল তিনি একে একে বিশেষরূপে নিরূপণ করিয়াছেন। দায়ভাগে তিনি যে প্রভূত জ্ঞানের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রশংসনীয়। এই সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া তিনি এত দূর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন যে, অতি অল্প কালের মধ্যে তাঁহার যশঃরাশি চতুর্দ্দিকে গন্ধবহের ন্যায় বিস্তৃত হইয়া পড়িল; ক্রমে অনেকেই তাঁহার মতাবলম্বী হইয়া পড়িলেন। নানা দেশ হইতে ছাত্র সকল তাঁহার টোলে অধ্যয়ন করিবার জন্য দলে দলে আগমন করিতে লাগিল।

রঘুনন্দনও অতিশয় যত্ন সহকারে ঐ সকল ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। শিষ্যগণ তাঁহার উচ্চ প্রকৃতি ও সদ্গুণে সহজেই তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া ফেলিল এবং তাঁহার সুশিক্ষা প্রভাবে, তাহারা অতি অল্পকাল মধ্যে গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিয়া ফেলিল। ছাত্রমণ্ডলী দ্বারা রঘুনন্দনের একটী মহৎ উদ্দেশ্য ও উপকার

সাধিত হইয়াছিল; ইহাদের দ্বারা তাঁহার এই নব স্মৃতিতত্ত্ব ও মত ক্রমে বঙ্গের চারিদিকে প্রচার হইয়া পড়িল।

প্রাচীন রীতি, নীতি ও ধর্ম্মানুশাসন মতে, হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে সিদ্ধ চাউল, মুশুর দাল, মৎস্যাদি আহার করা নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে সে সময়ে গোপনে ঐ সকলের ব্যবহার দেখিয়া, রঘুনন্দন, সময়োপযোগী সংস্কার আবশ্যক বোধে, সেই সকলের ব্যবহার ব্যবস্থা করিয়া দেন।

তিথিতত্ত্ব ও একাদশীতত্ত্ব গ্রন্থে তাঁহার যে সকল মত, ধর্ম্মের সহিত বিবিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা একাল পর্য্যন্ত বঙ্গের (পূর্ব্ববঙ্গ ব্যতীত) প্রত্যেক হিন্দু সমাজে বিশেষরূপে আদৃত ও প্রতিপালিত হইতেছে। পূর্ব্বে বিধবাগণের একাদশীতে একেবারে নিরম্বু উপবাস বিধি ছিল না, যতক্ষণ একাদশী থাকিত, ততক্ষণ উপবাস করিলেই, একাদশী প্রতিপালন করা হইত; এবং অসমর্থ হইলে তাহাদের মধ্যে অনুকল্প (অর্থাৎ লঘু আহার) ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু রঘুনন্দন, ইহা দ্বারা সমাজের বন্ধন বিশৃঙ্খল হইবার সম্ভাবনা বোধ করিলেন, এবং ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র হইতে অকাট্য যুক্তি ও প্রমাণ সকল উদ্ধৃত করিয়া, ইহা যে অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা ও ইহা দ্বারা যে সমাজের কতদূর অনিষ্ঠ সম্ভব, তাহা প্রদর্শন করাইয়া, অনুকল্প বিধির প্রচলন রহিত করেন।

এই সকল ঘটনার অত্যল্প দিবস পরে রঘুনন্দন পিতৃপুরুষগণের শ্রাদ্ধাদির পিণ্ড দানের জন্য গয়া ক্ষেত্রে গমন করেন। শ্রাদ্ধ কার্য্যের পিণ্ডাদি দানের জন্য মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিবার সময়, পাণ্ডারা তাঁহার নিকট হইতে অসঙ্গত কর চাহিলে, তিনি তাহাতে স্বীকৃত না হওয়ায়, পাণ্ডারা তাঁহাকে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিতে নিষেধ করেন। তেজস্বী রঘুনন্দন এইরূপে বিতাড়িত ও অপমানিত হইয়া, ক্রোধে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন; এবং সত্বর তিনি যে ইহার প্রতিকার করিবেন, এরূপ ভয় প্রদর্শন করিয়া, গয়াক্ষেত্রের এক ক্রোশ পরিমাণের মধ্যে যে কোন স্থানে পিণ্ডদান শাস্ত্রসঙ্গত, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া, মন্দিরের কিছু দূরে, এক স্থানে পিণ্ডদান করিতে বসিলেন।

এদিকে পাণ্ডারা যখন পরম্পরা অবগত হইল যে, ইনি নবদ্বীপের প্রধান স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য,তখন তাহারা সকলে বিস্মিত ও বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িল। কারণ সে সময় তাঁহার নাম, অসাধারণ প্রভাব ও তাঁহার নানা শাস্ত্রাভিজ্ঞতার বিষয় কাহারও নিকট অবিদিত ছিল না। সুতরাং তিনি যদ্যপি স্বয়ং এইরূপ ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে অপর যে কেহ মন্দিরে আসিয়া পিণ্ডদান করিবে না, তাহা নিশ্চিত বুঝিতে পারিয়া বড়ই ভীত হইল। সকলে মিলিয়া তাঁহাকে পুনরানয়ন করিতে গেল। তাহারা তাহাদের কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ও অনেক স্তব স্তুতি করিলে রঘুনন্দন সন্তুষ্ট হইলেন, এবং পুনরায়, শ্রীমন্দিরে আসিয়া পিতৃকৃত্যাদি সম্পন্ন করিলেন।

রঘুনন্দনের অষ্ট বিংশতি স্মৃতিতত্ত্ব গ্রন্থ ব্যতীত আরও অনেকগুলি গ্রন্থ আছে; —"সঙ্কল্প-চন্দ্রিকা" "ত্রিপুষ্কর-শান্তিতত্ত্ব" "জ্যোতিষ" ইত্যাদি। তাঁহার প্রণীত গ্রন্থের অধিকাংশই এতাবৎ বঙ্গদেশে প্রচ-

লিত। এই সকল গ্রন্থে তিনি যেরূপ নিজের প্রভূত জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা, যাবৎ হিন্দু ধর্ম্মের অস্তিত্ব থাকিবে, সংস্কৃত সাহিত্য-শাস্ত্রগ্রন্থের আলোচনা থাকিবে, তাবৎ তাঁহার নাম প্রত্যেক হিন্দুর হৃদয়ে চির বিরাজিত থাকিয়া তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি ও মহিমা জগতে চিরঘোষিত করিবে।

স্বনামধন্য রঘুনন্দন, আজীবন শাস্ত্রগ্রন্থের আলোচনায় নিরত থাকিয়া, সপ্ততি বর্ষে—ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে মানব লীলা সম্বরণ করেন। নবদ্বীপ তদবধি একটী অত্যুজ্জ্বল রত্ন-হারা হইয়াছে।

শ্রীআনন্দগোপাল ঘোষ।

প্রাচীন ভারতে বাণিজ্য। (৬)

এইক্ষণ আমরা মহাভারতোক্ত কালের ভারতীয় বাণিজ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিব। মহাভারতে ভারতের যাদৃশী সুখ-সমৃদ্ধি-পূর্ণা অবস্থা বর্ণিত রহিয়াছে, তাহা পাঠ করিলে সহৃদয় পাঠকের হৃদয়ে যুগপৎ আনন্দ ও বিষাদের আবির্ভাব হইয়া থাকে; কারণ তৎকালে ভারতে ঐহিক সুখ-সমৃদ্ধির উন্নতি চরম সীমায় সমুত্থিত হইয়াছিল এবং সেই সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি আবার নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ-শিখার ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া কুরুক্ষেত্র-মহাসমরক্ষেত্রে চিরাবসান প্রাপ্ত হয়।

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় মহাযজ্ঞে যে সমস্ত স্বদেশীয় ও বিদেশীয় ক্ষত্রিয় এবং ম্লেচ্ছাদি রাজগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছিল, তাহাতে বিলক্ষণ প্রতীতি হয় যে, তৎকালে ভারতীয় জনগণ এবং ভারতবর্ষের পশ্চিম ও হিমালয়ের উত্তরবর্ত্তী দেশ সমূহ নিবাসী যবন ও ম্লেচ্ছগণ পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন দেশে গমনাগমন করিত এবং তাহাদের মধ্যে বাণিজ্য-ঘটিত বিশিষ্টরূপ সংস্রব ছিল (১)।

মহাভারতের সভাপর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় নানাজাতীয় ভূপালগণ মহারাজাধিরাজ যুধিষ্ঠিরকে যেরূপ বিবিধ মহার্হ দ্রব্যজাত উপহার প্রদান করিয়াছিল, তাহাতে বিলক্ষণ উপলব্ধি হয় যে, ঐ সময়ে ভারতবর্ষে এবং ভারতবর্ষের বহির্ভূত পশ্চিম প্রদেশবাসী ও পশ্চিম-দক্ষিণ ভূভাগ নিবাসী এবং হিমাচলের উত্তর-দেশাধিবাসী যবন, শক, দরদ, নাগ, পহ্লব, হূণ, হারহূণ, চীন, খশ, তুখার, বর্ব্বর, কিরাত, হারীত প্রভৃতি নানাজাতীয় লোকের সহিত হিন্দুদিগের বিলক্ষণরূপ বাণিজ্য-ঘটিত সংস্রব ছিল এবং তৎকালে ভারতবর্ষের ধন, সমৃদ্ধি, সুখ, সভ্যতা, শিল্প ও বাণিজ্যাদি উন্নতির চরম সীমায় উত্থিত হইয়াছিল।

মহারাজ যুধিষ্ঠির যাহাদিগের নিকট হইতে যে সমস্ত মহামূল্য দ্রব্যজাত উপহার পাইয়াছিলেন, সেইগুলি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা প্রয়োজনীয়; যথা—

কাম্বোজ-রাজ মেষলোমজ, কৌষেয়,

(১) "যত্র সর্ব্বান্ মহীপালান্ শাস্ত্রতে জোময়ার্দ্দিতান্।
সবঙ্গাঙ্গান্ সপৌণ্ড্রোড্রান্ সচোলদ্রাবিড়ান্ধকান্।
সাগরানুপজাংশ্চৈব যেচ পত্তনবাসিনঃ।
সিংহলান্ বর্ব্বরান্ ম্লেচ্ছান্ যেচ লঙ্কা-নিবাসিনঃ।
পশ্চিমানিচ রাষ্ট্রাণি শতশঃ সাগরান্তিকান্।
বাহ্লীকান্ দরদান্ সর্ব্বান্ কিরাতান্ যবনান্ শকান্।
হারহূণাংশ্চ চীনাংশ্চ তুখারান্ সৈন্ধবাংস্তথা।
জাগুড়ান্ রমটান্ হূনান্ স্ত্রীরাজ্যানথ তঙ্গণান্।
কেকয়ান্ মালবাংশ্চৈব তথা কাশ্মীরকা নপি॥"

মহাভারত—বনপর্ব্ব।

সুবর্ণ-মণ্ডিত বৃষদংশজাত দ্রব্য, শ্রেষ্ঠ প্রাবার এবং অজিন-সকল উপহার দিয়াছিলেন। মরু ও কচ্ছ নিবাসী নৃপতিগণ বহুসংখ্যক রাঙ্কব (শাল), অজিন এবং গান্ধারদেশীয় অশ্ব-সকল উপঢৌকন দিয়াছিলেন। যাহারা দেব-মাতৃক ও নদী-মাতৃক দেশজাত ধান্য দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে, তাহারা এবং যাহারা সমুদ্র নিকটবর্ত্তী বনে ও সিন্ধু পারে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, সেই বৈরাম, পারদ, আভীর, কিতব জাতীয় মানব-গণ নানাবিধ উপহার ও বিবিধ রত্ন, ছাগ, মেষ, গো, হিরণ্য, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, ফলজাত মধু, এবং বহুবিধ কম্বল লইয়া সভার দ্বারদেশে উপস্থিত ও দৌবারিকগণ কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া অবস্থিতি করিতেছিল (১)।

শূর, মহাবল ও মহারথ ম্লেচ্ছাধিপতি প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর রাজা ভগদত্ত যবনগণের সহিত বায়ুবেগগামী অশ্ব সকল ও বিবিধ উপহার লইয়া দ্বারদেশে উপনীত এবং দ্বারপালগণ কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতেছিল। প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপতি ভগদত্ত সুদৃঢ় প্রস্তরময় ভাণ্ড ও বিশুদ্ধ দ্বিরদরদ-নির্ম্মিত ৎসরু (বাঁট) যুক্ত অসি সকল উপহার দিয়া গমন করিলেন (২)।

সভাপর্ব্বের অন্যস্থানে লিখিত আছে যে, পূর্ব্বদেশবাসী ভূপালগণ মহামূল্য আসন, যান, শয্যা ও মণিকাঞ্চন-খচিত গজদন্তময় দ্রব্য, বিচিত্র বর্ম্ম, বিবিধশস্ত্র, সুবর্ণ-শোভিত ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিবারিত বিনীত হয়-সমন্বিত বিবিধাকার রথ সকল এবং বিচিত্র পৃষ্ঠাস্তরণ সমূহ, বিবিধরত্ন, নারাচ ও অর্দ্ধনারাচাদি শস্ত্র ও অন্যান্য মহৎদ্রব্য সকল উপহার প্রদান করিলেন। (‡)

চোল ও পাণ্ড্যদেশীয় রাজদ্বয় মলয় ও দর্দ্দুর পর্ব্বতজাত অগুরুচন্দনরাশি এবং দীপ্যমান মণিরত্ন, স্বর্ণ, ও সূক্ষ্ম বস্ত্র সহকারে উপনীত হইয়া দ্বারদেশে প্রবেশ লাভ করিতে পারিয়াছিলেন না। সিংহল দ্বীপবাসিগণ বৈদূর্য্যরত্ন ও অত্যুৎকৃষ্ট মুক্তা সকল এবং শতশত আস্তরণ বস্ত্র লইয়া আসিয়াছিল। মণিময় চীরবসন-পিহিত রক্ত-লোচন প্রান্ত শ্যামবর্ণ এবং আদি মধ্য ও অন্তকালে জাত বিবিধবর্ণ বিশিষ্ট বহুবিধ ম্লেচ্ছ জাতীয় মানবগণ রাজসূয় মহাযজ্ঞে সমাগত হইয়াছিল (১)।

অপিচ, সেই রাজসূয় মহাসত্রে শক, তুখার, কঙ্ক, রোম ও শৃঙ্গি প্রভৃতি অনার্য্য-

(১) "ঔর্ণান্ বৈলান্ বার্ষদংশান্ জাতরূপ—পরিষ্কৃতান্।
প্রাবারাজিন মুখ্যাংশ্চ কাম্বোজঃ প্রদদৌ বহূন্॥
———"রাঙ্কবাণি অজিনানি"———।
———"গান্ধারদেশজান্ হয়ান্"———।
"ইন্দ্রকৃষ্টৈ বর্ত্তয়ন্তি ধান্যৈর্যেচ নদী মুখৈঃ।
সমুদ্র নিষ্কুটে জাতাঃ পারেসিন্ধুচ মানবাঃ॥
তেবৈরামাঃ পারদাশ্চ আভীরাঃ কিতবৈঃ সহ।
বিবিধং বলিমাদায় রত্নানি বিবিধানিচ॥
অজাবিকং গোহিরণ্যং খরোষ্ট্রংফলজং মধু।
কম্বলান্ বিবিধাংশ্চৈব দ্বারিতিষ্ঠন্তি বারিতাঃ"॥
মহাভারত——সভাপর্ব্ব।

(২) 'প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপঃ শূরো ম্লেচ্ছানা মধিপোবলী।
যবনৈঃ সহিতো রাজা ভগদত্তো মহারথঃ॥
আজানেয়ান্ হয়ান্ শীঘ্রান্ আদায়ানিলরংহসঃ।
বলিঞ্চ কৃৎস্নমাদায় দ্বারিতিষ্ঠন্তিবারিতাঃ॥
অশ্মসারময়ং ভাণ্ডং শুদ্ধ দন্তৎসরূনসীন্।
প্রাগ্‌জ্যোতিষাধি পোদত্ত্বা ভগোদত্তোংব্রজত্তদা॥
মহাভারত——সভাপর্ব্ব।

‡ "আসনানি মহার্হাণি যানানি শয়নানিচ।
মণিকাঞ্চন চিত্রাণি গজদন্তময়ানিচ।
কবচানি বিচিত্রাণি শস্ত্রাণি বিবিধানিচ।
রথাংশ্চ বিবিধাকারান্ জাতরূপ পরিষ্কৃতান্।
হয়ৈ বিনীতৈঃ সম্পন্নান্ বৈয়াঘ্র পরিবারিতান্।
বিচিত্রাশ্চ পরিস্তোমা রত্নানি বিবিধানিচ।
নারাচানর্দ্ধনারাচান্ শস্ত্রাণি বিবিধানিচ।
এতদ্দত্ত্বা মহদ্দ্রব্যং পূর্ব্বদেশাধিপানৃপাঃ॥"

(১) "মলয়াদ্দর্দ্দুরাচ্চৈব চন্দনাগুরুসঞ্চয়ান্। মণি

লোকেরা মেষলোমজ, রঙ্কুলোমজ (শাল), কীটজ (কৌষেয়), পট্টজ এবং কুটীকৃত, নীল পদ্মাভ, কোমল ও অকার্পাস সূত্র-নির্ম্মিত সহস্র সহস্র বস্ত্র সহকারে কোমল মৃগচর্ম্ম, বিবিধরস, গন্ধ দ্রব্য, সহস্র সহস্ররত্ন এবং দূরগামী অর্ব্বুদ সংখ্যক মহাগজ, বহু শত সংখ্যক অশ্ব, পদ্ম সংখ্যক সুবর্ণ ও নানাবিধ উপহার লইয়া দ্বারে উপনীত ও নিবারিত হইয়া অবস্থিতি করিতেছিল। এমন কি, উক্ত মহাযজ্ঞে উষ্ণীষধারী সীমান্তবাসী, ও রোমক দেশনিবাসী এবং নরমাংস-ভোজী মানবগণেরও আগমন উল্লিখিত রহিয়াছে (২)।

ভীষ্মপর্ব্বের এক স্থানে উৎকৃষ্ট যুদ্ধাশ্ব সম্বন্ধে কথিত আছে যে, কাম্বোজ দেশোৎপন্ন, নদীজ, আরবদেশীয়, সিন্ধুদেশীয় ও পার্ব্বতীয় শুভ্রবর্ণ বহুসংখ্যক অশ্বদ্বারা রণভূমির চতুর্দ্দিক বেষ্টিত করিবে। হিমাচলের উত্তরবর্ত্তী তিত্তির দেশীয় বাতবেগগামী অশ্ব সকল যুদ্ধবিষয়ে সুনিপুণ (১)।

রাজসূয় মহা যজ্ঞ সম্পাদনার্থ দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে ভারত মধ্যস্থিত ও তদ্বহির্ভূত যে সকল দেশ ও প্রদেশের বিজয় সম্বন্ধে উল্লেখ আছে, তাহাতে ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত দিগ্বিজয়ের বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই ঐ সমস্ত স্থানে লোকের গমনাগমন ছিল এবং ভারতের সর্ব্বত্র যাতায়াত করিবার নিমিত্ত সুদৃঢ়, সমান সমান ও প্রশস্ত পথ সকল ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ছিল; কারণ, প্রাচীন ভারতে হয়, হস্তী, রথ ও পদাতি এই চতুরাঙ্গিনী সেনা লইয়া একজন বীরপুরুষকে যুদ্ধ যাত্রা করিতে হইত, সুতরাং তৎকালে তাদৃশ সৈন্য ও রথের গমনাগমন জন্য পথগুলি সমান ও সুপ্রশস্ত থাকাই নিতান্ত সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, প্রাচীন কালে সিন্ধুনদ পার হইয়া অথবা হিমালয়ের সঙ্কট পথ দিয়া ভারতের বহির্ভূত দেশ সমূহে যাইতে হইত। সাংযাত্রিকগণ পোত লইয়া বাণিজ্যার্থ ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে যাতায়াত করিত।

প্রাচীন ভারতে হিন্দুবীরগণ দিগ্বিজয় করিবার নিমিত্ত পৃথিবীর তৎকাল-প্রসিদ্ধ সমস্ত স্থানেই যাইতেন। সভাপর্ব্ব মহা-

রত্নানি ভাস্বন্তি কাঞ্চনং সূক্ষ্মবস্ত্রকম্। চোল পাণ্ড্যাবপি দ্বারং নলেভাতেহ্যুপস্থিতৌ"॥ "সমুদ্রসারং বৈদূর্য্যং মুক্তা সঙ্খাংস্তথৈবচ। শতশশ্চ কুথাংস্তত্র সিংহলাঃ সমুপাহরন্"॥ "সংবৃতা মণিচীরৈস্তু শ্যামাস্তাম্রান্তলোচনাঃ। সর্ব্বে ম্লেচ্ছাঃ সর্ব্ববর্ণা আদিমধ্যান্তজাস্তথা। নানাদেশ সমুত্থৈশ্চ নানা জাতিভিরেবচ। পর্য্যস্ত ইব লোকোঽয়ং যুধিষ্ঠির-নিবেশনে॥"
Ibid.

(২) "ঔর্ণঞ্চ রাঙ্কবঞ্চৈব কীটজং পট্টজং তথা। কুটীকৃতং তথৈবাত্র কোমলাভং সহস্রশঃ॥ শ্লক্ষং বস্ত্রমকার্পাস মাবিকং মৃদুচাজিনং। রসান্ গন্ধাংশ্চ বিবিধান্ রত্নানিচ সহস্রশঃ॥ শকাস্তুখারাঃ কঙ্কাশ্চ রোমাশ্চ শৃঙ্গিনোনরাঃ। মহাগজান্ দূরগমান্ গণিতানর্ব্বুদান্ হয়ান্। শতশশ্চৈব বহুশঃ সুবর্ণং পদ্মসম্মিতং। বলিমাদায় বিবিধং দ্বারি তিষ্ঠন্তি বারিতাঃ॥
Ibid.

"ঔষ্ণিকানন্তবাসাংশ্চ রোমকান্ পুরুষাদকান্"।
Ibid.

(১) "তথাকাম্বোজ-মুখ্যানাং নদীজানাঞ্চ বাজিনাম্। আরট্টানাং মহীজানাং সিন্ধুজানাঞ্চ সর্ব্বশঃ। বনায়ুজানাং শুভ্রগণাং তথা পর্ব্বত বাসিনাম্। বাজিনাং বহুভিঃসংখ্যৈ সমন্তাৎপর্য্যবারয়েৎ। যে চাকরে তিত্তিরজাজবনা বাতরং হসঃ॥"
মহাভারত— ভীষ্মপর্ব্ব।

বীর অর্জ্জুনের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে লিখিত আছে যে, বীর-শ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন কৈলাস, মৈনাক, গন্ধমাদন, শ্বেতপর্ব্বত এবং স্বচ্ছতোয় গিরি নদী সকল দর্শন করিতে করিতে সপ্তদশ দিনে হিমালয়ের পবিত্র পৃষ্ঠ ভাগে উপস্থিত হইয়াছিলেন *। মহাভারতীয় বিরাট-পর্ব্বের একস্থানে উল্লিখিত আছে যে, মহাবীর অর্জ্জুন সমুদ্রের পারস্থিত হিরণ্যপুরবাসী রথারূঢ় ষষ্টি সহস্র ধনুর্দ্ধারী বীরগণকে পরাজয় করিয়াছিলেন।(২)

এইরূপ আদিপর্ব্বের একস্থানে লিখিত আছে যে, সেই মহীরথ বীর-দ্বয় ভূমির অভ্যন্তরবাসী নাগ-গণকে জয় করিয়া সমুদ্র মধ্যবর্ত্তী দ্বীপবাসী সমস্ত ম্লেচ্ছজাতিকে জয় করিলেন। (৩)

এস্থলে একটী প্রশ্ন এই যে, এই অন্তর্ভূমিগত নাগগণ কে? ইহার উত্তরে যদি হিমালয়ের উত্তরবর্ত্তী প্রদেশবাসী নাগ-জাতীয় লোকগণ বলা যায়, তাহা হইলে তাহাদিগকে জয় করিয়াই সমুদ্রান্তবর্ত্তী দ্বীপ সমূহ নিবাসী ম্লেচ্ছজাতিকে জয় করা অসম্ভব হয়, কারণ, হিমালয়ের অব্যবহিত উত্তর-প্রদেশবাসী নাগজাতিকে জয় করিয়া তৎপরেই সমুদ্র পাওয়া যায় না। পরন্তু উক্ত-জাতিকে জয় করিয়া হিমালয়ের উত্তর প্রদেশস্থিত নানাদেশবাসী বিবিধ জাতিকে জয় করাই সভাপর্ব্বে উল্লিখিত আছে। অতএব এই নাগগণ হিমালয়ের উত্তরপ্রদেশ-বাসী নহে, তবে ইহাদের বসতি কোথায়, তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, জাতি-ভ্রষ্ট ক্ষত্রিয়গণ শাক, দরদ, নাগ, পহ্লব প্রভৃতি অনার্য্য আখ্যায় অভিহিত হইয়া হিমাচলের উত্তরবর্ত্তী ভূভাগে যাইয়া বাস করিয়াছিল এবং তাহাদিগের মধ্য হইতে নাগজাতীয় কতকগুলি লোক আমেরিকায় গিয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করে। সুতরাং শ্লোকোক্ত নাগগণ আমেরিকায় উপনিবেসিত অনার্য্যগণ বলিয়া আমাদিগের বোধ হয়; কারণ, "অন্তর্ভূমি-গতান্" এই পদটী দ্বারা বুঝাইতেছে যে, নাগেরা ভূমির মধ্যে বাস করিত। আমেরিকা ভারতবর্ষের তলদেশে অবস্থিত, তাইতে উহা ভারত-ভূমির অভ্যন্তরস্থিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অতএব উক্ত শ্লোকোক্ত বীরদ্বয় আমেরিকা-বাসী অনার্য্য নাগগণকে জয় করিয়াই নিকটবর্ত্তী প্রশান্ত মহাসাগরস্থিত দ্বীপ-সমূহ নিবাসী বিবিধ ম্লেচ্ছজাতীয় লোককে পরাজয় করিয়াছিল, ইহাই সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। বিশেষতঃ অন্যশ্লোকে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক সমুদ্র পারস্থিত হিরণ্যপুরবাসী ষষ্টি-সহস্র রথী ও ধনুর্দ্ধারীদের পরাজয়ের কথা উল্লিখিত আছে, সুতরাং ঐ শ্লোক দ্বারাও আমেরিকাবাসী নাগগণই সূচিত হইতেছে বলিলে অসঙ্গত হইবে না।

অমরকোষ অভিধানে পাতালবর্গের প্রথমেই লিখিত আছে যে, "অধোভুবন পাতাল বলি সদ্মরসাতলং। নাগলোকোঽথ—।"

---

* "অবেক্ষমাণঃ কৈলাসং মৈনাকনাম পর্ব্বতং। গন্ধমাদন পাদাংশ্চ শ্বেতঞ্চাপি শিলোচ্চয়ম্। উপর্য্যুপরি শৈলস্য বহ্বীশ্চ সরিতঃ শিরাঃ। পৃষ্ঠং হিমবতঃ পুণ্যং যযৌ সপ্তদশেঽহনি"॥

মহাভারত—সভাপর্ব্ব।

(২) "অহং পারে সমুদ্রস্য হিরণ্য পুরবাসিনাং। জিত্বা ষষ্টিসহস্রানি রথিনামুগ্রধন্বিনাং॥

ঐ—বিরাটপর্ব্ব।

(৩) অন্তর্ভূমি-গতান্ নাগান জিত্বা তৌচ মহারথৌ। সমুদ্রবাসিনীঃ সর্ব্বা ম্লেচ্ছজাতীর্বিজিগ্যতুঃ।

ঐ—আদিপর্ব্ব।

এই শ্লোকাংশ দ্বারা স্পষ্টই প্রতীতি হই-তেছে যে, আমেরিকারই সংস্কৃত নাম এই পাতাল; কারণ, আমেরিকা ভারতবর্ষের নিম্নদেশে অবস্থিত আছে বলিয়া উহার নাম "অধোভুবন" ও "রসাতল।" হিমালয়ের উত্তর দিগ্বাসী নাগজাতীয় লোকেরা তথায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল বলিয়া উহার অন্য নাম "নাগ-লোক" (১) এবং উহাতে বলি নামক কোন রাজার রাজধানী ছিল, তাইতে উহার অপর একটী নাম "বলি-সদ্ম"। অদ্যাপি বলিবিয়া নামে একটী দেশ দক্ষিণ আমেরিকার দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পুরাণে কথিত আছে যে, বলিরাজা ও পুরুবংশীয় কোন রাজা পাতালে যাইয়া বাস করেন। দক্ষিণ আমেরিকায় পেরু বা পেরুবিয়া এবং বলিবিয়া নামে যে দুইটী জনপদ দৃষ্ট হয়, বোধ হয়, পুরুবংশীয় রাজা অধিকৃত পুরুভূমি এবং বলিরাজার অধিকৃত বলি-ভূমি এই দুইটী রাজ্যের নাম যথাক্রমে অপভ্রংশবশতঃ পেরু বা পেরুবিয়া ও বলি-বিয়া হইয়া গিয়াছে। পেরুদেশীয় ইঙ্কা নামে প্রসিদ্ধ নরপতিগণ ও বলিবিয়া দেশীয় নৃপতিবর্গ আপনাদিগকে সূর্য্যবংশীয় বলিয়া পরিচয় প্রদান করিত। তাহাদের মধ্যে জাতি-ভেদপ্রথা বিদ্যমান ছিল এবং তাহা-দিগের ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় প্রধান মহোৎসব "রাম-সীতোয়া" নামে অভিহিত ছিল (২)।

রাজসূয় মহাযজ্ঞে পাণ্ডবগণ তৎকালে আবিষ্কৃত পৃথিবীর সমস্ত ভূভাগে গমন করিয়া দেশ ও প্রদেশাদি জয় করিয়া-ছিলেন। সভাপর্ব্বে অর্জ্জুনের উত্তর দিগ্ জয় প্রসঙ্গে লিখিত আছে যে, প্রাগজ্যোতি-ষেশ্বর ভগদত্ত কিরাত, চীন, পূর্ব্বসাগর মধ্যবর্ত্তী দ্বীপবাসী ও অনূপবাসী বহুসংখ্যক সৈন্যসহ মহাবীর অর্জ্জুনের সহিত ৮ দিন যুদ্ধ করিয়াছিলেন (১)। পরে পুরুবংশোদ্ভব রাজা বিশ্বগশ্বকে পরাজয় করিয়া হিমগিরি-বাসী দস্যুগণ ও উৎসব সঙ্কেত নামক সপ্ত-সম্প্রদায়বদ্ধ অনার্য্যগণকে জয় করিলেন (২)। তদনন্তর হিমালয়ের উত্তরবর্ত্তী ঋষিক দেশবাসীদিগকে জয় করিয়া আটটী শুকোদরবর্ণ অশ্ব এবং বেগগামী ময়ূরাকার বহুসংখ্যক অশ্ব কররূপে গ্রহণ করি-লেন (৩)।

পরে শ্বেতপর্ব্বত অতিক্রম করত হাটক-দেশবাসীগণকে জয় করিয়া মানস-সরোবর ও ঋষিকুল্যাগুলি দর্শন করিলেন।

তদনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় হাটকদেশের চতুর্দ্দিগ্বাসী গন্ধর্ব্বগণকে জয় করিয়া তাহা-দিগের নিকট হইতে তিত্তিরিকল্মাষ ও মণ্ডূক নামক উৎকৃষ্ট অশ্ব সকল কর স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন *। পরে মহাবীর পার্থ হরিবর্ষস্থ উত্তর কুরুদেশে গমন করিয়া তত্রত্য জনগণের সহিত যুদ্ধ করা শাস্ত্র-

(১) ."লোকস্তু ভুবনে জনে" ইত্যমরঃ—অর্থাৎ লোকশব্দে জন এবং ভুবন বুঝায়।

(২) Asiatic Researches Vol 1. P. 426.

(১) "সকিরাতৈশ্চ চীনৈশ্চবৃতঃ প্রাগজ্যোতিষোঽভবৎ। অন্যৈশ্চ বহুভির্যোধৈঃ সাগরানূপ বাসিভিঃ॥"

(২) "পৌরবং যুধি নির্জ্জিত্য দস্যূন পর্ব্বত বাসিনঃ। গণানুৎ সব সঙ্কেতান অজয়ৎ সপ্ত পাণ্ডবঃ॥"

(৩) "সবিজিত্য ততোরাজন ঋষিকান রণ মূর্দ্ধনি। শুকোদর সমাং স্তত্র হয়ানষ্টৌ সমানয়ৎ॥ ময়ূর সদৃশানন্যানুত্তরা ন পরা নপি। জবনা নাস্তপাং শ্চৈব করার্থে সমুপানয়ৎ॥" মহাভারত সভাপর্ব্ব।

(*) সরোমানস মাসাদ্য হাটকানভিতঃ প্রভুঃ। গন্ধর্ব্ব রক্ষিতং দেশমজয়ৎ পাণ্ডব স্ততঃ। তত্র তিত্তিরিকল্মাষান্ মণ্ডূকাখ্যান হয়োত্তমান্। লেভে সকরমত্যন্তং গন্ধর্ব্বনগরাত্তদা॥"

বিরুদ্ধ বলিয়া তথা হইতে অত্যুৎকৃষ্ট আভরণ অজিন, মহার্হক্ষৌমবস্ত্র এবং কর গ্রহণ পূর্ব্বক ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। (২) এই উত্তর কুরুবর্ষদেশে স্ত্রীগণের ব্যভিচার দোষা-বহ ছিল না। (৩)

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, এই উত্তর কুরুবর্ষ দেশের বর্ত্তমান নাম সাইবিরিয়া এবং এই দেশের উত্তরেই উত্তর মহাসাগর বিদ্যমান রহিয়াছে। মৎস্য পুরাণে লিখিত আছে যে, ইক্ষাকু বংশের অনেকে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক উত্তর কুরুবর্ষদেশে যাইয়া বাস করিয়াছিল।

সভাপর্ব্বে মহাবল ভীমসেনের পূর্ব্ব দিগ্‌বিজয় প্রসঙ্গে লিখিত আছে যে, ভীম-কর্ম্মা বৃকোদর দক্ষিণ কোশলাধিপতি বৃহদ্বল ও উত্তর কোশলাধিপতি গোপালক এই রাজ-দ্বয়ের নিকট করগ্রহণ পূর্ব্বক মগধ, অঙ্গ, ও পুণ্ড্রদেশ জয় করিয়া বঙ্গদেশাধিপতি সমুদ্র সেন ও চন্দ্রসেনকে জয় করিলেন। অনন্তর তিনি তাম্রলিপ্ত (তমলুক্) জয় করিয়া বঙ্গ সাগরস্থিত দ্বীপবাসীদিগকে জয় করিলেন। পরে সুহ্মদেশের (পূর্ব্বোপদ্বীপের) রাজা ও ম্লেচ্ছগণকে জয় করিয়া লৌহিত্য দেশ আক্রমণ করিলেন। এইরূপে তিনি দ্বীপ-বাসী ও সাগরতীর-নিবাসী ম্লেচ্ছ নৃপতি-গণকে পরাজিত করিয়া বিবিধ রত্ন, চন্দন, অগুরু, বস্ত্র, মণি, মুক্তা, কম্বল, কাঞ্চন, রজত ও মহামূল্য প্রবাল এবং শত কোটি ধন কর স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন (৪)।

সভাপর্ব্বে নকুলের দক্ষিণদিগ্‌বিজয় সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, মহাবীর নকুল চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে মৎস্য, অবন্তি এবং ভোজকটেশ্বর রুক্মিণী জনক ভীষ্মককে পরাজিত করিয়া কিষ্কিন্ধ্যাপতি বানররাজ মৈন্দ ও দ্বিবিদকে জয় করিয়া সুরাষ্ট্র, তাম্রদ্বীপ, ভারগ-দ্বীপ, তাম্রদ্বীপ, পাণ্ড্য, দ্রাবিড়, উড্র, কেরল, অন্ধ্র, কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশের অধিপতিগণের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মহাবীর সহদেব পশ্চিম দিগ্‌বিজয়ার্থ চতুরঙ্গিণী সেনাসহ মরুদেশ, দ্বারকা, ত্রিগর্ত্ত এবং পুষ্করারণ্যবাসী উৎসব সঙ্কেত নামক অনার্য্যগণ, সিন্ধুনদ তীরবাসী শূদ্র ও আভীর-গণ ও সরস্বতীতীরবাসী মৎস্যজীবিগণকে জয় করিলেন। অনন্তর সাগর (Caspian Sea) তীরবাসী পরম দারুণ ম্লেচ্ছ, পহ্লব, বর্ব্বর, কিরাত, যবন ও শকদিগকে জয় করেন (৫)।

এস্থলে বক্তব্য এই যে,—এই কাস্পীয়ান সমুদ্রের পশ্চিমে আর কোন দেশ বা প্রদেশ ছিল না, থাকিলে, সেই সেই দেশ বা প্রদে-শের নাম ও বিজয় সম্বন্ধে উল্লেখ থাকিত।

(২) উত্তরং হরিবর্ষন্তু স সমাসাদ্য পাণ্ডবঃ। ইয়েষ জেতুং তং দেশং পাক শাসন নন্দনঃ। উত্তরাঃ কুরবোহেতে নাত্রযুদ্ধং প্রবর্ত্ততে"॥

মহাভারত——সভাপর্ব্ব।

(৩) প্রমাণদৃষ্টোধর্ম্মোহয়ং (স্ত্রীণাং ব্যভিচারঃ) পূজ্যতে চ মহর্ষিভিঃ। উত্তরেষুচ রম্ভোরুকুরুষদ্যাপি পূজ্যতে"॥ Ibid.

(৪) "সুহ্মানা মধিপঞ্চৈব যেচ সাগর বাসিনঃ। সর্ব্বান্ ম্লেচ্ছ গণাংশ্চৈব বিজিগ্যে ভরতর্ষভ। এবং বহুবিধানদেশান্ বিজিত্য পবনাত্মজঃ। বসুতেভ্য উপাদায় লৌহিত্য মগমদ্বলী॥ সর্ব্বান ম্লেচ্ছনৃপতীন্ সাগরানূপবাসিনঃ। কর মাহারয়ামাস রত্নানি বিবি-ধানিচ॥ চন্দনাগুরুবস্ত্রাণি মণিমৌক্তিককম্বলম্। কাঞ্চনং রজতঞ্চৈব বিদ্রুমঞ্চ মহাধনম্। তে কোটি-শত সংখ্যেন কৌন্তেয়ং মহতা তদা। অভ্যবর্ষন্ মহাত্মানং ধন-বর্ষেণ পাণ্ডব"॥ Ibid.

(৫) "ততঃ সাগর কুক্ষিস্থান্ ম্লেচ্ছান্ পরম দারুণান্ পহ্লবান বর্ব্বরাংশ্চৈব কিরাতান যবনান্ শকান্"॥

সভাপর্ব্ব।

বস্তুতঃ, আরল্ সমুদ্র (Sea of Aral), কাস্পীয়ান্ সাগর (Caspian Sea) কৃষ্ণ সাগর (Black Sea) এবং ভূমধ্যসাগর (Mediterranean Sea) দেখিয়া বোধ হয় যে, এক সময় ঐ গুলির পৃথক্ পৃথক্ অস্তিত্ব ছিল না, ঐ সমস্ত এক মহা সাগরের অন্তর্গত ছিল, কালক্রমে সেই মহাসাগরের অংশ সকল মৃত্তিকাপূর্ণ হওয়ায় উল্লিখিত সমুদ্রগুলি পৃথক্ পৃথক্‌রূপে ভূমধ্যস্থ হইয়াছে এবং সেই মহা সাগরোত্থিত বৃহৎ ভূভাগ ইয়োরোপ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

ফলতঃ, ইয়োরোপ ভূভাগ যে ঐতিহাসিক যুগের শেষকালে উৎপন্ন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই ; কারণ, বাইবেলে উক্ত আছে যে, চারি হাজার চারি খ্রীষ্টাব্দ পূর্ব্ব বৎসরে ঈশ্বর পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এইক্ষণ কল্যব্দ ৫০০৪,তাহা হইলে কল্যব্দারম্ভের ৯০৪ বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছিল ! সুতরাং অনুমান হয় যে, ইয়োরোপ প্রভৃতির সৃষ্টি দেখিয়া বাইবেলে ঐরূপ লিখিত হইয়া থাকিবে।

শ্রীতারিণীকান্ত বিদ্যানিধি।

ভ্রমণকারীর ঐতিহাসিক বিবরণ

খুলনা ও যশোহর জেলার মধ্যে অনেক প্রাচীন ঐতিহাসিক ব্যাপার আছে। উহা দেখিবার জন্য একটী পিপাসা ছিল। উহাদের মধ্যে মহম্মদপুরে সীতারাম রায়ের, ঈশ্বরীপুরে প্রতাপাদিত্যের এবং বাগেরহাটে জাহান আলি খাঁর কীর্ত্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ইহাদের কাহারও সবিশেষ ইতিহাস নাই। তবে আজ কাল অনেকে রাজা সীতারাম রায় এবং মহারাজা প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে একটু সন্ধান আরম্ভ করিয়াছেন। এমন কি, ২।১ খানি পুস্তকও বাহির হইয়াছে। এই দুই মহাপুরুষ বঙ্গবাসীর মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। ইহারা প্রকৃত বাঙ্গালী বীর ছিলেন। কিন্তু বাগেরহাটের এই মুসলমান-কীর্ত্তি কেহই অদ্যাপি বিশেষ রূপে দর্শন পর্য্যন্ত করেন নাই।

খুলনা হইতে বাগেরহাট মাত্র ২০ মাইল দূর। (১)এই বাগেরহাটেই জাহান আলীর কীর্ত্তিস্তম্ভ সকল এক্ষণেও বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহার অসীম ক্ষমতা প্রকাশ করিতেছে। খুলনা জেলার প্রাচীন ঐতিহাসিক বিষয় সন্ধান করিতে হইলেই, বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থানের ন্যায়, অন্ধকারময় বিবরণ সকল লেখকের সম্মুখে উপস্থিত হইবে। উহা হইতে, সত্য বাহির করা, বড়ই কঠিন ব্যাপার। এই ইতিহাস-শূন্য দেশের ইতিহাস লিখিবার সময় এখনও উপস্থিত হইয়াছে কি না, তাহা বিচার করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। তবে পরম ভক্তিভাজন পরলোকগত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়কে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে না দেখিয়া মনে সন্দেহ হয়। অধুনা অনেকে দেশের

(১) নীলকর সাহেবদের অত্যাচার দমন করার জন্য ১৮৪২ সালে খুলনায় মহকুমা হয়। পূর্ব্বে এখানে নওয়াবাদ নামক একটী থানা মাত্র ছিল। বহুপূর্ব্বে সুন্দরবন অঞ্চলের লবণ বিভাগের প্রধান কার্য্যালয়, এই খুলনায়ই হইয়াছিল। ১৮৮২ সালের জুন মাসে, খুলনাকে জেলারূপে পরিণত করা হয় এবং সেই বৎসরই, কলিকাতাকে রেলওয়ে দ্বারা খুলনার সহিত সংযুক্ত করা হয়।

ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা করিতেছেন বটে, তবে নানা কারণে কৃতকার্য্য হইতেছেন না। নব্য শিক্ষিতদের মধ্যে প্রত্যেক স্থানের কয়েক জনে মিলিত হইয়া যদি চেষ্টা করেন, তবে কিছু তথ্য বাহির হইবার সম্ভব অন্ততঃ স্থানীয় ইতিহাস লিখিতে পারিলেও অনেকটা উপকার হয়। ক্রমে এই সকলের মিলনে জাতীয় ইতিহাস হইবার সম্ভাবনা পল্লীগ্রামের পক্ষে এ কার্য্যটী নিতান্ত দুরূহ ব্যাপার না হইতেও পারে। যে সকল স্থানে প্রাচীন কীর্ত্তি আছে, তথায় বিশেষ বন্দোবস্ত করার দরকার।

খুলনার (২) মধ্যে ঈশ্বরীপুরে (প্রাচীন যশোহরে) রাজা প্রতাপাদিত্যের কীর্ত্তি সমূহ ও বাগেরহাটের খান্‌জে আলির নগরাদির ধ্বংসাবশেষ, ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিকদেরও বিশেষ গবেষণার বিষয়। তবে এই যশোহর (৩) আধুনিক যশোহর নহে, উহা প্রাচীন যশোহরের নামানুকরণ মাত্র। আধুনিক যশোহরের পূর্ব্বতন নাম কস্‌বা হইতে বাগেরহাট বহু প্রাচীন। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে এই নগর অন্য নামে বর্ত্তমান ছিল, খ্রীষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীতে, বাঙ্গালাদেশের মধ্যে এইটী এক নগর হইয়াছিল। এখন সে সকল কিছুই নাই। এমন কি সেই নগরটীর নাম পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছে। দেশের ইতিহাস থাকিলে, এই বিরাট প্রভাব, একেবারে লোপ পাইত না। বাঙ্গালা দেশের অনেক প্রাচীন সহরের দুরবস্থা এইরূপ। এমন কি, অনেকের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়াও,ঐতিহাসিকগণ উহার প্রাচীন নাম (৪) ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন না।

এই নগর প্রাচীন কাল হইতে একটী সামুদ্রিক বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থান ছিল বলিয়া জনরব। কিন্তু এই জনরব সত্য কি না জানা যায় না, কারণ সুন্দরবনের নদীর সহিত সংযুক্ত দড়াটানা নদী বাগেরহাটকে সমুদ্রের নিকট আনিয়াছে বটে, তবে কিন্তু এই দড়াটানা অল্প দিন মাত্র সৃষ্ট হইয়াছে। মুসলমানদিগের সময় ইহার ফতেয়াবাদ বা ফয়তাবাদ নামকরণ হইয়াছিল।

বঙ্গোপসাগরের উত্তর তটে একটী বহু বিস্তৃত অরণ্যানী বর্ত্তমান আছে। পশ্চিমে গঙ্গা ও পূর্ব্বে মেঘনা, এই জঙ্গলের পরিখারূপে, উভয় পার্শ্বে বর্ত্তমান। এই জঙ্গলময় প্রদেশের স্থানীয় নাম সুন্দর বন। সুন্দরী নামক লাল রং যুক্ত বৃক্ষ এই বনের প্রধান বাহাদুরী কাষ্ঠ। এই জন্য "সুন্দর বন" নাম হইয়াছে। নিকটবর্ত্তী কৃষকেরা এই সুন্দর বনকে "বাদা" নামে অভিহিত করে। যখন কোন বাদার বন পরিষ্কার করিয়া কৃষিকার্য্যের উপযুক্ত করা যায় ও লোকালয় হয়, তখন তাহাকে আবাদ (অর্থাৎ জনাকীর্ণ) বলে। এই জন্য বাখরগঞ্জ, খুলনা ইত্যাদি

(২) খুলনা জেলা হওয়ার পূর্ব্বে এই প্রদেশ, যশোহর জেলার অন্তর্গত ছিল। যশোহরের পূর্ব্বে নবাবী ও কোম্পানীর প্রথম আমলে, ফৌজদারী ও দেওয়ানী কার্য্য কপোতাক্ষী নদীতীরবর্ত্তী মিরজানগরস্থ ফৌজদারের হস্তে ন্যস্ত ছিল।

(৩) যশোহর নগর রাজা বিক্রমাদিত্য রায় কর্ত্তৃক দায়ুদ খাঁর সময় স্থাপিত হয়। এই নগর গৌড়ের যশঃ হরণ করে বলিয়া উহার নাম যশোহর হয়। এখানকয় রাজা প্রতাপাদিত্য বিশেষ ক্ষমতাশালী ছিলেন। এই যশোহর, খুলনা জেলার কালীগঞ্জ থানার মধ্যে সুন্দরবনের নিকট।

(৪) বগুড়া জেলার "মহাস্থান," দিনাজপুর জেলার "ফুলবাড়ীগড়" এবং ময়মনসিং জেলার মধুপুরগড়" ইত্যাদি ইহার উদাহরণ।

অঞ্চলে অনেক স্থানের নামে "আবাদ" শব্দযুক্ত দেখা যায়। এই প্রদেশের অনেক স্থান যে পূর্ব্বে সুন্দরবনের অভ্যন্তরে ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। জনরব, ফতে আলি নামক জনৈক সৈনিক পুরুষ উক্ত নগর প্রথম মুসলমান-অধিকার-ভুক্ত (১) করেন বলিয়া, উহা তাহার নাম অনুসারে ফতেহাবাদ নামে অভিহিত হইয়াছিল। কিন্তু এই ফতে আলি কে এবং কোন্ সময়ে তিনি এই স্থান অধিকার করেন, তাহা অদ্যাপি জানা যায় নাই। যদি কেহ এ বিষয় জানিতে পারেন, তবে অনুগ্রহ করিয়া জানাইলে কৃতার্থ হইব।

ফরতাবাদ নগরটী প্রাচীন। এখানে অনেক অবস্থাপন্ন বণিক ও জমীদারের বাসস্থান ছিল। জমীদারদিগের মধ্যে রাম রায় ও শ্যাম রায় নামক দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। জনরব, ইহারা বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। বিষয়াদি লইয়া, দুইজনের মধ্যে ঘোর শত্রুতা উপস্থিত হইয়াছিল। উভয় পক্ষ হইতে এই বিবাদ মিটাইবার অনেক চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়।

আত্মীয় স্বজনগণ উভয় পরিবারের ঘোর শত্রুতা মীমাংসা করিতে কৃতকার্য্য না হইয়া নবাব দরবার হইতে আমীন আনাইয়া সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লওয়ার পরামর্শ দিলেন এবং সেই অনুসারে কার্য্য করিতে উভয় পক্ষ সম্মত হইলেন। উপযুক্ত সময়ে একজন বিচক্ষণ লোক গৌরে প্রেরিত হইলেন। এই ব্যক্তি তাৎকালিক নবাবের নিকট হইতে কোন সদুত্তর পাইলেন না। নবাব-দরবারে কার্য্য করা সময় সময় এতই কঠিন হইত।

রায় পরিবারের প্রেরিত লোকটী, কোন রূপে নিরুৎসাহিত না হইয়া, বরং দ্বিগুণ উৎসাহ সহ চেষ্টা আরম্ভ করিলেন এবং তিনি নবাবের প্রত্যাশা ত্যাগ করিয়া, দিল্লীতে গিয়া দরবার করা স্থির করিলেন। যথা সময়ে দিল্লী উপস্থিত হইলেন এবং আমীর ওমরাহদিগের নিকট, নিজের মনোরথ পূর্ণ করার মানসে, চেষ্টা আরম্ভ করিলেন।

কিশোর খাঁ নামক একটী যুবক এই সময় আমীন ছিলেন। তিনি বিশেষ চতুর ও আপন কার্য্যাদি অতি সুন্দরভাবে সমাধা করিতে পারিতেন, এইরূপ প্রকাশ পাইতেছিল। ফতেহাবাদের লোকটী এই সমস্ত জানিতে পারিয়া, তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, নিজের মনের ভাব প্রকাশ করিলেন। চতুর কিশোর খাঁ উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া, উক্ত লোকের সহিত পরামর্শ স্থির করিলেন যে, সম্রাট অনুমতি দিলেই, তিনি গিয়া সমস্ত জমীদারী ন্যায়মত বিভাগ করিয়া দিবেন। (২)

রায় পরিবার-প্রেরিত লোক, কিশোর খাঁর কৃতীত্ব সম্বন্ধে, বিশেষ সন্ধান করিয়া, জানিলেন, তিনি বাল্যকালে উত্তর বঙ্গ হইতে কোন একটী ধনী বণিকের সহিত দিল্লীতে আইসেন। তৎপর সম্রাটের লোক-নজরে পতিত হইয়া, তাঁহার পাংখা বরদারের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু নিজের বুদ্ধি এবং কৃতীত্ব দেখাইয়া, কয়েক বৎসরের

(১) প্রাচীন লোকের মুখে পূর্ব্বে গল্প শুনা যাইত যে, বহুদিন পর্য্যন্ত এই প্রদেশ অধিকার লইয়া হিন্দু ও মুসলমানে যুদ্ধ হইয়াছিল।

(২) এদেশে জনরব আছে, কিশোর খাঁ বাঙ্গালী হিন্দু সন্তান। বাল্যকালে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, দিল্লীতে নীত হয়েন এবং তথায় রাজপুরিতে অতি নীচ কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন।

মধ্যে আমীন পদ পাইয়াছিলেন। ইহাও তিনি জানিতে পারেন যে,এই আমীন বেশ লেখা পড়াও শিক্ষা করিয়াছেন। তিনি নিজেও অনেক চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে, উচ্চ শ্রেণীর আমীন লইয়া দেশে যাইতে তাঁহার অনেক সময় ও অর্থ নষ্ট হইবে।

যথা সময়ে কিশোরের জন্য প্রার্থনা করা হইল এবং কিশোরেরই চেষ্টায়, অবিলম্বে বাদসাহের সম্মতি পত্র প্রাপ্ত হইলেন। দিল্লী হইতে সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া কিশোর খাঁর রওনা হইতে মাসাধিক কাল সময়ের দরকার। তিনি বরাবরই স্থলপথে ফতেহাবাদে আসিবেন, এইরূপ ঠিক করিলেন। কিন্তু ফতেহাবাদের উদ্যোগী পুরুষ, এত দীর্ঘকাল বিলম্ব করা আবশ্যক মনে করিলেন না। কেবল মাত্র তাহার একজন সঙ্গীকে কিশোরের পথ প্রদর্শক রাখিয়া, তিনি জলপথে স্বদেশে আসিলেন। অতি শীঘ্র আমীন আসিবেন, এ কথাও প্রকাশ করিলেন।

কিশোর খাঁ দিল্লী হইতে জাহান আলি (অত্যন্ত ক্ষমতাশালী) নাম গ্রহণ করিয়া বহির্গত হইলেন। তাহার সঙ্গে বহুতর লোক বাঙ্গালায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল।

সুজলা সুফলা বাঙ্গালা চিরকালই ধন ধান্যে পূর্ণ। এই জন্যই বঙ্গদেশ যুগ যুগান্তর হইতেই বিদেশীয়দের একটী লুণ্ঠনের সামগ্রী রূপে আছে। যিনিই আসিতে পারেন, তিনিই এখান হইতে ঝোলা পূরিয়া লইয়া যাইতে চেষ্টা করেন। এই প্রলোভনে প্রাচীন আর্য্য, গ্রীক, মধ্যযুগের তাতার পারসিক এবং বর্ত্তমান যুগের পর্টুগীজ,দিনেমার, ওলন্দাজ, ফরাসী, বৃটিশ জাতির এই দেশের উপর এত প্রলোভন। এই জন্য এত যুদ্ধাদি। অনেক আক্রমণকারীরা কেবল ইহার অস্থি মজ্জা লেহন করিয়া ত্যাগ করেন নাই, চর্ব্বণ করিয়াও ছাড়িতে ইচ্ছুক না হইয়া এই দেশেই বাস করিতেছেন। তাহারা সেই প্রাচীন কাল হইতেই মিলিত হইতে ২ একটী বিশাল মিশ্রিত জাতিরূপে পরিণত হইয়াছেন। কিন্তু বঙ্গমাতার ঘোর অপকারী তাহারা, যাহারা এখানে আসিয়া কল্পতরুতে কোপ দিয়া, আজীবন নবাবী চলনের সুবিধা করিয়া, দেশান্তরে প্রস্থান করেন। যেখানে আসিলে উদরের চিন্তা নাই, অর্থের অভাব নাই, এমন স্থানে দিল্লীর অশিক্ষিত লোকেরা আসিবার জন্য নাচিয়া উঠিবে, এ আর আশ্চর্য্য কি?

প্রবাদ, কিশোর খাঁ বা জাহান আলি খাঁ, দিল্লী হইতে সহস্রাধিক নিম্ন শ্রেণীর বলিষ্ঠ লস্কার বা সৈন্য সঙ্গে লইয়া বঙ্গদেশের অভিমুখে রওনা হয়েন। আগ্রা হইতে আসিতে ২ তাহার বেশ বিশ্বাস হইয়াছিল, দেশে রাস্তার অবস্থা অতি শোচনীয়, অনেক চিন্তা করিয়া তিনি মনে মনে কল্পনা করিলেন, যতদূর পারি রাস্তা প্রস্তুত করিব। সর্ব্ব প্রথম আপন কল্পনা সম্বন্ধে তাহার লস্কারাধিপতি লোকনাথ দে মজুমদারের সহিত পরামর্শ করিলেন। মজুমদার মহাশয়ও আপন প্রভুর প্রস্তাব অতি উত্তম বলিয়া স্বীকার করিলেন। ক্রমান্বয় তাহারা রাস্তা প্রস্তুত করিতে ২ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রাস্তা প্রস্তুত ও তৎসঙ্গে মাঝে ২ পুষ্করিণী খনন করিয়া আসিতে তাঁহার দীর্ঘকাল কাটিল। ক্রমে সঙ্গীয় লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। প্রবাদ, যখন তিনি খুলনার মধ্যে আসিয়াছিলেন, তখন তাহার সহিত ৬০ হাজার লস্কার বা সৈন্য ছিল।

আমাদের পূর্ব্ব কথিত রায় পরিবারের একটী কাছারী বা বাগানবাড়ী জগৎপুর নামক গ্রামে ছিল। ঐ জগৎপুরের আধুনিক নাম কোঁড়ামারা। উক্ত কাছারীতে জাহান আলির থাকার সমস্ত বন্দোবস্ত হইয়াছিল। ভৈরব নদের যে ঘাটে এই সমস্ত লোক পার হইয়া জগৎপুরে প্রবেশ করে, এই ঘাটের নাম লস্কারী ঘাট। উক্ত ঘাট এখনও উক্ত নামে বর্ত্তমান আছে। ঘাটের উপর একটী প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষ দণ্ডায়মান থাকিয়া, উহার প্রাচীন সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই ঘাট হইতে জাহান আলি একটী সুপ্রশস্ত রাস্তা কাছারী পর্য্যন্ত প্রস্তুত করিয়া আপন বাসস্থানে উপস্থিত হয়েন। এই কাছারী বাড়ীর বর্ত্তমান অস্তিত্ব পাওয়া কঠিন। বিশাল অশ্বত্থ-বৃক্ষ-জড়িত অতি জীর্ণ একটী শিব মন্দির উক্ত কাছারী বাড়ীর সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে মাত্র। মন্দিরের নিকট উপস্থিত হইলে অনেক প্রাচীন কাহিনী মনে উপস্থিত হয়। এই স্থানে যে একটী প্রশস্ত বাটী ছিল, তাহা দর্শক মাত্রেরই নিশ্চয় ধারণা হইবে। স্থানটীর দৃশ্য বড়ই মনোহর। চতুর্দ্দিকে বিশাল বৃক্ষ সকল দণ্ডায়মান থাকিয়া অতীতের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। পূর্ব্বে বহু বিস্তৃত মাঠ, মাঠে নানা জাতীয় পক্ষী সকল দিবারাত্রি কলরব করিতেছে। মাঠের মধ্যে ক্ষুদ্র ২ অনেকগুলি খাল আছে। তাহাতে চাষের ও কৃষকদিগের যাতায়তের উপায় আছে। কিছু দিন পূর্ব্বে এই সমস্ত খালে বিস্তর মৎস্য পাওয়া যাইত। এই মন্দিরে এখন গ্রামবাসীরা মনসা দেবীর পূজা করে। কিন্তু মন্দিরের সংস্কার কে করে? এই বাড়ীর পূর্ব্বদ্বারে একটী বিস্তৃত জলাশয় বর্ত্তমান। উহার নাম চতুর্ভুজ। প্রবাদ, এটীও জাহান আলির কৃত। এই বাসা বাড়ী থাকিয়াই আমীন মহাশয় আপন কার্য্য আরম্ভ করেন।

বানরের রুটি ভাগ।

অনেকেই বানরের রুটি ভাগের গল্পটী জানেন। জাহান আলি নিয়মিত সময় জমীদারী মাপ করিয়া বিভাগ কার্য্য আরম্ভ করিলেন। একটী স্থান মাপ শেষ করিয়া, ইচ্ছা পূর্ব্বকই ২ টী অসমান ভাগ করিয়া উভয় পক্ষকে একটী ২ করিয়া লইতে বলিতেন। উভয়ই বড় ভাগটী লইবার জন্য চেষ্টা করিতেন। এইরূপ উভয়ের মধ্যে বিবাদ-অগ্নি দ্বিগুণ জ্বালিয়া উঠিত। এদিকে আমীনের লোক ফুৎকার দিয়া বিবাদ আরও ভীষণ করিয়া তুলিতেন। অবশেষে যখন ঘরে ২ রীতিমত যুদ্ধ আরম্ভ হইত, তখন জাহান আর কাল বিলম্ব না করিয়া সমস্ত জমীদারীর শাসন ভার নিজে লইয়া উভয়কে সামান্য কর দেওয়ার বন্দোবস্তে বাধ্য করিতেন। এদিকে উভয় পক্ষ হাঙ্গামাপ্রিয়, অত্যাচারী ইত্যাদি সদ্‌যুক্তি পূর্ণ রিপোর্ট সদরে পাঠাইয়া নিজের মনোরথ পূর্ণ করিতেন।

এইরূপে জমীদারী কাড়িয়া লইয়া ও একটী প্রাচীন পরিবার ধ্বংস করিয়া নিজের প্রাধান্য স্থাপন করিলেন।

জমীদারী হাতে পাইলেন, এ দিকে সঙ্গেও লোকের অভাব ছিল না। কাজেই নিকটবর্ত্তী অনেক ক্ষুদ্র ২ জমীদারের জমা জমিও ক্রমে জাহানের হস্তগত হইতে বড় বেশী বিলম্ব হইল না। যখন দেখিলেন, নিজের আধিপত্য ও অর্থের অভাব নাই, তখন তিনি বাড়ী করার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ জগৎপুরের কাছারীতে

খাড়ী করিবেন, মনস্থ করিয়াছিলেন, কিন্তু স্থানটী বিশেষ মনোমত না হওয়ায় ফয়তাবাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। প্রবাদ, জমি পরীক্ষা করিয়া ফয়তাবাদের মাটীই উৎকৃষ্ট বিবেচিত হইল। সেই স্থানেই তাহার পছন্দ মত প্রাসাদ প্রস্তুত করিলেন। পূর্ব্ব কথিত কাছারী বাড়ী হইতে, ফয়তাবাদ আসিবার পথে আরও কয়েকটী স্থানে বড় ২ জলাশয় খনন করেন। তাহার মধ্যে পরীক্ষা, বড় কালিকা, ও ছোট কালিকা প্রসিদ্ধ। এই পুষ্করিণী গুলির পাহাড় যথেষ্ট উচ্চ। দেখিলে বোধ হয়, এই জলাশয়গুলি বেশ গভীর ছিল, কিন্তু এখন গভীরতা অতি সামান্যই আছে। পাহাড়ীর উপর প্রাচীন অশ্বত্থ বৃক্ষ সকল অতীতের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। পরীক্ষা নামক জলাশয়টী মাটী পরীক্ষা করার জন্য খোদিত হইয়াছিল বলিয়া এই নাম দেওয়া হইয়াছে। এই জলাশয় হইতে একটী ক্ষুদ্র নালা পূর্ব্বদিকস্থ খালে পতিত হইয়াছে। এ খালের নাম "কোদাল ধোয়ার খাল।" মজুরেরা এই খালটী কাটিয়া জল আনিয়া কোদাল ধুইয়া দক্ষিণ মুখে গিয়াছিল, দক্ষিণদিকেই অন্যান্য জলাশয় আছে।

ফয়তাবাদে বিস্তৃত বাড়ী প্রস্তুত করিয়া তথায় বসবাস করিতে লাগিলেন। সেখানে আপন বৈঠকখানাটী সম্পূর্ণ হইয়াছিল। ইহা একটী প্রকাণ্ড হল বা দালান, ৬০ স্তম্ভের উপর খিলান। উপরে গুম্বজাকৃতি, এই জন্য ইহার নাম ৬০-গুম্বজ।(১) স্থানীয় চাষারা ইহাকে সাট গুমটে বলে। এই গুম্বজের সমুখে "ঘোড়া দীঘি" নামক বিস্তৃত দীঘি। এত বড় ও গভীর জলাশয় বঙ্গদেশে অতি অল্পই আছে। ইহার পাহাড়ী যথেষ্ট উচ্চ এবং এক্ষণে জঙ্গলে পরিপূর্ণ। একটী ঘোড়া অক্লেশে যতদূর দৌড়াইতে পারিয়াছিল, এটী নাকি তত লম্বা। ফল কথা এই, ইহা যে যথেষ্ট দীর্ঘ, তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। দীঘিতে এখন সামান্য ধাপ জন্মিয়াছে, কিন্তু কুম্ভীরে পরিপূর্ণ। কুম্ভীরগুলির একটী আশ্চর্য্য গুণ দেখিলাম। আয় ২ বলে ডাকিলেই নিকটে, এমন কি, ঘাটের বিস্তৃত সিঁড়ির ৫।৭ ধাপ পর্য্যন্ত উঠিয়া আইসে। কিন্তু যখন জানিতে পারে, দর্শকেরা কোন খাদ্য দ্রব্য দিবে না, তখন মন্থর গতিতে চলিয়া যায়। আমরা যে সময় ডাকিয়াছিলাম, তখন অনেক দূর হইতে ২টী কুম্ভীর তীরবেগে ছুটিয়া একেবারে কাছে আসিল। ঘাটে দুই জন নীচ জাতীয় স্ত্রীলোক জল তুলিতেছিল। আমরা উহাদিগকে উঠিতে বলিলে, এক জনে হাসিয়া বলিল, "ভয় নাই, ইহারা কখন মানুষকে কিছু বলে না"। অন্য স্ত্রীলোকটী কুম্ভীর ২টীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, 'তোরা আসিস না, বাবুরা তোদের জন্য কিছুই আনেন নাই।" কি আশ্চর্য্য, উহারা আর অগ্রসর হইল না। পরে আস্তে ২ চলিয়া গেল। ভগবান এমন ভয়ানক জন্তুকেও এই ভাবে শিক্ষা দিতে পারেন, ইহা কল্পনা করিলেও চমৎকৃত হইতে হয়। কিছু দিন পূর্ব্বে এই গুম্বজটী ভয়ানক জঙ্গলাবৃত ছিল। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এখন ইহা পরিষ্কার করিয়া মেরামত করিতেছেন। হলে ও দেওয়ালের অনেক স্থানে গর্ত্ত দৃষ্ট হইয়াছে। আমাদের সঙ্গের ভদ্র লোকটী বলিয়াছিলেন, এই সকল স্থান

(১) ৬০ গুম্বজ বাগেরহাট হইতে ৩ মাইল পশ্চিমে। ইহার ভিতরের হল ১৪৪´+৯৬´ ফুট। ছাদটী ৬০টী স্তম্ভের উপর আছে। ১০টী স্তম্ভের ৬ শ্রেণীতে স্তম্ভগুলি দণ্ডায়মান। কাজেই ছাদে ৭টী করিয়া ১১ শ্রেণীর ৭৭টী গুম্বজ বর্ত্তমান।

হইতে লোকে বিস্তর টাকা উঠাইয়া নিয়াছে। বস্তুত খাঁজে আলির টাকা ঘরে নাই, বা প্রাপ্ত হয়েন নাই, এমন লোক এ অঞ্চলে খুব কমই আছে। আমরা, অনেকের নিকট এই টাকা এখনও আছে, বিশেষ জানি। পরম্পরা শুনিয়াছি, স্থানীয়—কয়েকটী জমিদার এই সকল স্থানের অর্থেই ধনী হইয়াছেন। বাথরগঞ্জের কোন একটী পরিবার নাকি এই অঞ্চলে পাঁঠা বিক্রয় করিতে আসিয়া বিস্তর অর্থ পাইয়াছিলেন। অর্থ পাইয়া পাঁঠা ছাড়িয়া দিয়া টাকা দ্বারা নৌকা বোঝাই করিয়া দেশে ফিরিয়া যান। ইঁহারা এখন বিশেষ ধনী।

এই প্রশস্ত দালানটাকে একটী দুর্গ বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয়না। দেখিতে অনেকটা দুর্গের মতনই বটে। ছাদে কাঠের কাজ নাই। সমস্তই খিলান। সমস্ত ছাদটীতে ৭৭ টী গুম্বজ আছে। পশ্চাত দিকের একটী অপ্রশস্ত সিঁড়ি দিয়া, ছাদের উপর উঠা যায়। সিঁড়িটী একেবারে নষ্ট হয় নাই, সামান্য মেরামতেই, পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইবে। উপরে উল্লেখযোগ্য কিছুই নাই। চিলের ঘরটী এখন সামান্য জঙ্গলে আবৃত। সর্পের ভয়ে আমরা সে দিকে অগ্রসর হইতে পারি নাই। এস্থানে আমাদের বলিয়া রাখা উচিত যে, ইহার সমস্ত দেওয়াল ও স্তম্ভগুলির বিস্তার ঠিক্ পাঁচ হাত। ইট গুলিও ঠিক্ আধুনিক কালের ইটের ন্যায় নহে। আকারে অনেক ছোট ও দেখিতে অতীব লাল। এখন পূর্ত্তবিভাগে যে সকল উৎকৃষ্ট ইট দেখা যায়, এই ইট তাহা অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট। এ দিকে প্রবাদ, জাহান আলি, এই সকল ইট,রৌদ্রে শুষ্ক করেন নাই। কড়াতে ঘৃত দিয়া ভাজিয়াছিলেন। ফল যাহাই হউক, ইট্গুলি যে অতি উৎকৃষ্ট, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আধুনিক ইটের ন্যায় ইহা সহজে ধ্বংস হয় না। ইহার মালমসলা নিশ্চয়ই অনেক বেশী। ইটগুলি কারুকার্য্যযুক্ত। জাহান আলির যত ইষ্টকালয় আছে, তাহার সকল গুলিরই ইট এইরূপ। এবং দেওয়ালের বিস্তার পাঁচ হাত পরিমাণ।

এই গুম্বজ ত্যাগ করিয়া আমরা পূঃ দঃ দিকে একটী পাকা রাস্তা ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এ রাস্তাটীও আধুনিক পাকা রাস্তার ন্যায় নহে। আস্ত ইট্ মাটীতে বসাইয়া, একেবারে গাঁথিয়া এই রাস্তা প্রস্তুত করা হইয়াছে। কিছু দূর গিয়া দুটী মন্দির দৃষ্টিগোচর হইল। একই প্রাঙ্গণে মন্দির দুইটী পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আছে। প্রাঙ্গণটীও ঘেরা। সদর দরজায় প্রকাণ্ড গেট্। প্রাঙ্গণটী সমস্তই পাথরের গাঁথা। উভয় মন্দিরের চূড়ার উপর দুইটী কলসি বসান আছে। ফকিরেরা বলে, "কলসিতে টাকা আছে। আর সকল টাকাই চোরে চুরি করিয়াছে, কেবল ঐ কলসির এবং কবরের ভিতরের টাকা অদ্যাপিও কেহ লইতে পারে নাই। মন্দির নাকি ৩২ হাত উচ্চ।"

মন্দির দ্বয়ে দুইটী কবর, বাম দিকেরটীতে জাহান আলি এবং দক্ষিণ দিকেরটীতে, তাঁহার প্রধান দেওয়ান পীর আলির সমাধি। এই দেওয়ানকে কেহ মহম্মদ তাহের নামে অবিহিত করিয়া থাকেন।

জাহান জীবিত থাকিতে, নিজের মনোমত স্থানে ও আকারে, এই সমাধিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এবং তাঁহার জীবদ্দশায় উজীর পীর আলির মৃত্যু হইলে,

আপন পার্শ্বে অমাত্যের সমাধি নির্ম্মাণ করেন।

অধুনা এই গোরস্থানে, প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে সহস্র ২ হিন্দু মুসলমান স্ত্রী ও পুরুষ একত্র হইয়া, জাহান আলির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। চৈত্রমাসে জাহানের মৃত্যু দিনে এখানে একটী মেলা হয়, বাস্তবিক এই স্থানটী তখন হিন্দু ও মুসলমানের অপূর্ব্ব মিলন ক্ষেত্র হয়।

এই মন্দিরের সম্মুখে একটী প্রকাণ্ড দীঘি, দীর্ঘে ও প্রস্থে প্রায় সমান। এত বড় দীঘি বাঙ্গালা দেশে আর আছে কি না সন্দেহ। দিনাজপুরের মহীপাল দীঘি অপেক্ষায় বড় হইবে। মন্দিরের সম্মুখে একটী সুপ্রশস্ত বাঁধা ঘাট। সোপানাবলী যথেষ্ট প্রশস্ত। জলাশয়ের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সহজে অনুমান করা যায় না যে, ইহা পূর্ব্ব পশ্চিম কি উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত। চতুর্দ্দিকের পাহাড়ী, নিকটবর্ত্তী মাঠ হইতে দেখিলে, এক অনতিউচ্চ পাহাড় শ্রেণী বলিয়া অনুমান হয়। পাহাড়ীর উপর ঘন জঙ্গল। ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর আবাস স্থান। দীঘিটী পরিষ্কার জলে থৈ থৈ করিতেছে। অসংখ্য পক্ষী মনের আনন্দে তরঙ্গের সঙ্গে নৃত্য করিতেছে। অনেক স্থানে পাখীতে জল ঢাকিয়া ফেলিয়াছি। জলাশয়টী সর্ব্বদা পক্ষীসংগীতে পরিপূর্ণ। সে মনোরম পক্ষীসংগীত যাঁহারা শুনিতে পান নাই, তাঁহাদের নিকট বর্ণনা করা অসাধ্য। জলাশয় অতীব গভীর। জল স্বচ্ছ ও ঘাস ইত্যাদি বিবর্জ্জিত। তবে কিনারার নিকট অতি অল্প পরিমাণ ঘাস জন্মিয়াছে।

ঘোড়া দীঘির ন্যায় এই ঠাকুর দীঘিতেও বিস্তর কুম্ভীরের বাস। পূর্ব্বে "কালাপাহাড়" ও "ধলাপাহাড়" নামক কুম্ভীরদ্বয় এখানে বাস করিত। কিন্তু বহুকাল কেহ সেগুলিকে দেখিতে পায় না। তাহারা অবশ্য ভবলীলা সাঙ্গ করিয়াছে।

সমাধি-মন্দির হইতে বাহিরে আসার সময়, কয়েকটী ফকির আসিয়া, কিছু পয়সা লইয়া, জাহান আলি এবং পীরআলির সম্বন্ধে অনেক কথা বলিল। ফকিরেরা বলিল যে, এই দীঘির মধ্যস্থানে, জলের ভিতর একটী মন্দির আছে, যখন জল কিছু কমে, তখন তাহার চূড়া দেখা যায়। আরও প্রকাশ করিল যে, যখন এই দীঘি ১ম খনন করা হয়, তখন কুলীরা, এই মন্দিরের দ্বার বন্ধ দেখিয়া, আপনাদের প্রভুকে সংবাদ দেয়। জাহান ঘোড়ায় চড়িয়া মন্দিরের দরজার নিকট উপস্থিত হইলে, উহা আপনা হইতেই খুলিয়া যায় এবং ভিতর হইতে একটী ফকির বাহির হইয়া, জাহানকে পলায়ন করিতে আদেশ করে। জাহান দ্রুতবেগে ঘোড়া লইয়া প্রস্থান করিলে দীঘি জলে পূর্ণ হইয়া যায়। জলপান করিয়া লবণাক্ত বোধ হইলে, প্রচুর পরিমাণে পারদ গলাইয়া উহাতে দেওয়া হয়, সেই হইতে উহার জল মিষ্ট হয়।

এই জলাশয় হইতে একটী শিবলিঙ্গ বাহির হইয়াছিল। উহা এখন শিববাটী নামক স্থানে স্থাপিত আছে। শিবঠাকুর বাহির হইয়াছিল বলিয়াই এই জলাশয়টীর নাম "ঠাকুর দীঘি।"

সমাধি মন্দিরের মধ্যে, একখানি প্রস্তরনির্ম্মিত চৌকি দেখা যায়; ফকিরেরা বলে, ইহাই তাহাদের বাদসাহের সিংহাসন। চৌকিখানি যে অতি সুন্দর ও মূল্যবান

প্রস্তরের,তাহার কোন সন্দেহ নাই। সমাধি-মন্দির দুইটীর উপর যে দুইটী কলসী দৃষ্ট হয়, সম্ভবতঃ উহা পিত্তল-নির্ম্মিত।

এই বিস্তৃত স্থানের মধ্যে আরও অনেক মন্দির বা মস্‌জিদ আছে। সমস্ত গুলির আকার প্রায় একরূপ। তবে উচ্চতার তারতম্য আছে।

কাঠাল গ্রামে অতি সুন্দর দুইটী মন্দির, এবং দুইটী পুষ্করিণী আছে। এই বিস্তৃত স্থানের মধ্যে বিস্তর পুকুর আছে, তাহার মধ্যে কয়েকটী নাম সাদাত খাঁ, বক্তিয়ারখাঁ, ইক্তার খাঁ ইত্যাদি। জাহানের অনুচর-দিগের নামানুসারে এগুলির নামকরণ হইয়াছে। এই সকল পুষ্করিণী ব্যতীত আরও অনেক গ্রামে অনেক পুষ্করিণী ও রাস্তা আছে। সকলগুলিই জাহান আলি-কৃত বলিয়া খ্যাত।

পূর্ব্ব কথিত পাকা রাস্তাটী বাগেরহাটের নিকট ভৈরব নদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই রাস্তা একেবারে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত গিয়াছে বলিয়া শ্রুত হওয়া যায়। রাস্তা অনেক স্থানে কিছু বর্ত্তমান আছে। (১) চট্টগ্রাম অঞ্চল হইতে, প্রস্তরাদি আনার নিমিত্ত নাকি এই রাস্তাটী প্রস্তুত হইয়াছিল। এই রাস্তা প্রস্তুতের পর, জাহান আলি চট্টগ্রামের বিখ্যাত সাধু বায়েজ ফকিরের সহিত দেখা করিতে চাহেন। বায়েজ ফকির, জাহানের নিকট আসিতে অসম্মত হইলে, তিনি নিজে গিয়া দেখা করিতে মনস্থ করেন। কিন্তু গিয়া-ছিলেন কি না,তাহা জানা যায় না। বাগের-হাটে বাজারের নিকট মিঠাপুকুর নামে একটী পুষ্করিণী আছে, তাঁহার সুপ্রশস্ত সোপানাবলী, এখন কতকটা ভগ্নাবস্থায় আছে। উহাও জাহান আলির কৃত। নদীর নিকট জাহান একটী উদ্যান প্রস্তুত করিয়া-ছিলেন, এই উদ্যানের এখন কোন চিহ্নই দৃষ্ট হয় না। বাগের মধ্যে কালক্রমে একটী হাট স্থাপিত হয়, বলিয়া ইহার নাম বাগের হাট। কেহ ২ বলেন, পূর্ব্বে এইস্থানে, বিস্তর ব্যাঘ্র ছিল, সেই জন্য ইহার নাম "বাঘের হাট।"

সুন্দরবন অঞ্চলে জাহান আলির অনেক সম্পত্তি ছিল। তিনি যে এই অঞ্চলের অনেক স্থান আবাদ করিয়া চাষের উপযুক্ত করিয়া লোকালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বাগেরহাটের নিকট একটী কালীবাটী আছে,উহা প্রাচীন রায় পরিবারের স্থাপিত। জনরব, পূর্ব্বে এতদ্দেশে পাণিঘাটের কালী-বাটী ব্যতীত, অন্য কোন দেবালয় ছিল না। পাণিঘাটের পাণ্ডা পুরোহিতেরা সময় সময় বড়ই অত্যাচার করিতেন। রাম রায়ের কোন পূর্ব্বতন পুরুষ, এই অত্যাচার নিবা-রণের চেষ্টা করেন। কিন্তু কালীবাটী তাহার অধিকারভুক্ত ছিল না বলিয়া, অত্যাচার নিবারণে অপারক হয়েন। দক্ষিণ পূর্ব্বদিকের, অন্ততঃ নিজ জমীদারীর লোক, যাহাতে আর পাণিঘাটে না যায় এবং সুবিধা মত স্থানে পূজা আদি কার্য্য সম্পন্ন করিতে

(১) পচাদীঘি নামক একটী সরোবর পূর্ব্বে বর্ত্ত-মান ছিল। সেইটী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এক্ষণ উহাকে একটী বিস্তৃত বিল ব্যতীত অন্য কিছু বলা যায় না।

(১) ১৮৬৩ সালে বাগেরহাটে মহকুমা স্থাপিত হয়। এখানে আদালত ইত্যাদি স্থাপনের পূর্ব্বে ১ম ফকিরহাটে, পরে কোঁড়ামারায় মহকুমা স্থাপন হওয়ার প্রস্তাব হয়। এমন কি, ২।৪ দিন কোন ২ আফিস হয়, পরে বাগেরহাটের স্থাপনা।

পারে, সেইজন্ত এই নূতন কালী স্থাপিত হয়।

রায়ের এই কার্য্যে, পাণিঘাটের কালী কুপিতা হয়েন। বলা বাহুল্য, হিন্দুদের অনেক দেবদেবী ক্রোধের বশীভূত। কুপিতা হইয়া, বৃদ্ধকে একদিন স্বপ্নে দেখান "তোর বংশ মুসলমান হইবে।"

এই গল্পটী সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, রায়পরিবার, অন্ততঃ তাহাদের অনেকে, কালে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিকটবর্ত্তী কয়েক স্থানে, একটী হিন্দু ও একটী মুসলমান বংশ, পরস্পর জ্ঞাতি বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু উহার সত্যাসত্য বাহির করা একরূপ অসম্ভব।

জাহান চরিত্র।

জাহান আলি খাঁ কি প্রকৃতির লোক ছিলেন, পাঠকগণ এতক্ষণে, কিছু বুঝিতে পারিয়াছেন কি না, জানিনা। তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে অন্য কোন বিষয় আমরা জানিতে পারি নাই। তবে তিনি আজীবন অতিবাহিত ছিলেন, একথা কেহ২ বলিয়া থাকেন। কিন্তু একথা কতদূর সত্য, বলিতে পারি না।

উক্ত দরগায় যে সকল ফকির আছেন, তাহাদের কেহ কেহ জাহান আলিকে আদি পুরুষ এবং তাহা হইতে উহাদের বংশ নির্দ্দেশ করে। ফকিরেরা পূর্ব্বে অনেক পীরোত্তর সম্পত্তি ভোগ করিত। এখনও উহাদের ৩৬৮ বিঘা লাখিরাজ জমি আছে। (১) শেষ জীবনে জাহান আলি যে অতি সাধু প্রকৃতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অনেক মসজিদ প্রস্তুত করিয়া, ও অন্যান্য অনেক সৎকার্য্য করিয়া, তিনি তাঁহার সাধুতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

যে পরিবারের তিনি সর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন এবং যাহাদের ধ্বংস করার জন্য, এদেশে "মাঞে আনলাম কিশোর খাঁ, ধ্বংস করিল সোণার গাঁ" প্রবাদটার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাদের একজনকে শেষে তিনি নিজের দেওয়ান পদে নিযুক্ত করেন। এই ব্যক্তি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, পরে পীর-আলি নামে পরিচিত হয়েন। পীর আলির সহিত জাহানের বিশেষ বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। তিনি তাঁহার বিনা পরামর্শে কোন কার্য্যই করিতেন না। পীর আলির মুসলমান হওয়া সম্বন্ধে, নিম্নলিখিত গল্পটী প্রচলিত আছে।

একদা নমাজের দিন, জাহান আলি, পীর আলির বাটীতে গিয়া পাকশালার গন্ধ পাইয়া বলেন "দেওয়ানজী, আপনার খাদ্যদ্রব্যের অতিশয় মিষ্টবাস বাহির হইতেছে।" এই কথাতে দেওয়ানজী হাস্য করিয়া বলিলেন, "খোদাবন্ধ, আজ আপনার রোজার দিন, উপবাস করিয়া আছেন। আমাদের শাস্ত্রে আছে, ঘ্রাণে অর্দ্ধ ভোজন হয়। আপনি খাদ্যদ্রব্যের ঘ্রাণ লইয়া, অর্দ্ধ ভোজন করিয়াছেন। আপনার রোজা ভঙ্গ হইয়াছে।" জাহান একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন "তোবা তোবা, রোজা নষ্ট হওয়া মহাপাপ।" জাহান দেওয়ানজীকে একদিন

(১) এই স্থানে আমরা বলিয়া রাখি যে, এই সম্পত্তির সহিত হাবলি বা ফতেয়াবাদ পরগণার ৬ আনির জমিদার খোঁ-বেগমের কোন সম্বন্ধ ছিল না। খাঁবেগমের কাছারী বাসাবাড়ীতে ছিল এবং সম্পত্তি তাহার জায়গীর ছিল। তাহার মৃত্যু হইলে, গভর্ণমেণ্ট এই জায়গীর দখল করিয়া,বন্দোবস্ত করেন।

এইরূপে লজ্জা দিবেন, মনে মনে কল্পনা করিলেন। একদা একাদশীর দিন, দেওয়ানজী নিরম্বু উপবাস করিয়া আছেন। এমন সময় সংবাদ আসিল, অতি আবশ্যকীয় কার্য্যের জন্য, প্রভু তাঁহাকে ডাকিতেছেন। কাল বিলম্ব না করিয়া, দেওয়ানজী প্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়া দেখেন, জাহান আলি আহার করিতেছেন। জাহান রায় মহাশয়কে নিকটে বসিতে বলিয়া, আলাপ করিতে লাগিলেন। কিছু সময় আলাপ করার পর, দেওয়ানজী হঠাৎ নাকে কাপড় দিলেন। জাহান জিজ্ঞাসা করিলেন "দেওয়ানজী, নাকে কাপড় দিলেন কেন," রায় মহাশয় বলিলেন, "আপনার খাদ্যদ্রব্যের গন্ধ আইসে।" এই কথা শুনিয়া জাহান হাস্য পূর্ব্বক বলিলেন "তাহা হইলে আপনার একাদশী নষ্ট হইয়াছে, আপনাদের শাস্ত্রানুসারে ঘ্রাণে অর্দ্ধ ভোজন হয়, অতএব আপনি আমার খাদ্যের অর্দ্ধ ভোজন করিয়াছেন।"

এই হইতেই রায় মহাশয় জাতিচ্যুত হয়েন। সঙ্গে ২ অনেক আত্মীয় স্বজনও সমাজ-চ্যুত হয়েন। সমাজে নানারূপ গ্লানি ভোগ করিয়া, রায় মহাশয় শেষে মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া পীর আলি নাম গ্রহণ করেন। তাহার আত্মীয়গণ অনেকে পীরালি মুসলমান ও কেহ ২ পীরালি হিন্দুরূপে পরিণত হয়েন। এই হইতেই বাঙ্গালার পীরালি হিন্দুর সৃষ্টি। ইহারা সমাজ-চ্যুত। অধুনা অনেকে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

এই অঞ্চলে প্রায় সকল গ্রামেই জাহান আলিকৃত পুষ্করিণী ও রাস্তা দৃষ্ট হয়। আধুনিক যশোহর নগরের নিকট বড়বাজার নামক স্থানেও এইরূপ দৃষ্ট হয়। তবে সকল গুলিই যে জাহান আলি কৃত, তাহা বোধ হয় না। কোন কোনটী তাহার অনুচরদিগের কৃত হওয়ার সম্ভব। প্রাচীন যশোহরের নিকট আমাটিগ্রামে এইরূপ পুষ্করিণী ও মসজিদ আছে। তাহা জাহানের দুইটী অনুচরের কৃত। অযোধ্যা নামক গ্রামের প্রাচীন মন্দিরটী রঘুদেব নামক একজন অনুচরের প্রস্তুত। রঘুদেব বৌদ্ধ ছিলেন। মন্দিরটী অদ্যাপিও মঠ নামে খ্যাত এবং সুদৃঢ় অবস্থায় বর্ত্তমান। এই মঠ রঘুদেব উপাসনাদি ধর্ম্ম কার্য্যের জন্য প্রস্তুত করেন কোন একটী মুসলমান ধর্ম্মপুস্তক পাঠের সময় তাঁহাকে বিরক্ত করিয়াছিল। তাঁহাকে বিরক্ত করিয়াছিল বলিয়া তিনি চট্টগ্রাম অঞ্চলে চলিয়া যান। চট্টগ্রামে অনেক বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বীর বাসস্থান ছিল। এখনও বঙ্গদেশের অন্য সকল স্থান হইতে চট্টগ্রাম প্রদেশেই বুদ্ধদেবের সম্মান বেশী। রঘুদেব পরে প্রচারকরূপে ব্রহ্মদেশে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। এই স্থানে আমরা বলিয়া রাখি যে, এই মন্দিরের ন্যায় সুন্দর ও বৃহৎ মন্দির এ অঞ্চলে আর নাই।

জাহান আবশ্যকীয় প্রস্তরাদি চট্টগ্রাম অঞ্চল হইতে আনার জন্য, এ অঞ্চলে একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া পাঠান। এই কর্ম্মচারী চট্টগ্রাম অঞ্চলের কোন এক রাজার নিকট বরাতচিঠি দিয়া, প্রস্তর আনিবার প্রস্তাব করেন। উক্ত রাজা কর্ম্মচারীকে তুচ্ছ করিয়া, প্রস্তর না দিয়া বলিয়াছিলেন, "ঢেড় বুড়ির ভারানি, তার চাটিগাঁয় বরাত," অর্থাৎ সামান্য লোকের আবার বরাত চিঠি। এই কথার পর জাহান নগদ টাকা দিয়া, প্রস্তর খরিদ করাইতেন। প্রথমতঃ পূর্ব্ব কথিত রাস্তা

দিয়া, সমস্ত দ্রব্যাদি আনিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু অসংখ্য বৃহৎ নদীর জন্য এই ইচ্ছা ত্যাগ করেন। নৌকাযোগে ভারী দ্রব্যাদি আনার সুবিধা বিবেচনা করিয়া, তাহারই বন্দোবস্ত করেন।

নদীর ঘাট হইতে কার্য্যস্থানে পুনরায় নেওয়া অসুবিধা দেখিয়া তিনি একটী খাল খনন করান। এই খালটী ভৈরব নদ হইতে সর্প গতিতে, ৬০ গুম্বজ পর্য্যন্ত এখনও বর্ত্তমান। জাহানের যে অনুচরের তত্ত্বাবধানে এই খালটী খনিত হইয়াছিল, তাহার নাম রহিম। রহিম, নদী ও এই খালের মিলন স্থানে বাস করিতেন। ঐ স্থানে এখন একটী গ্রাম ও বাজার আছে। উহার নাম রহিমাবাদ এবং খালটীর নাম মহিমাবাদের খাল।

খালটীর আকৃতি দেখিলে ইহার খননে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া বোধ হয়, নৌকাপথে সহজে কোন শত্রু উপস্থিত হইতে না পারে, সেই নিমিত্ত খালটী এইরূপ ভাবে কাটা হয়। ৬০ গুম্বজে সৈন্য থাকিত, ইহাও তাহার একটী প্রমাণ বোধ হয়। এই খালের উপর, ঘোড়া দীঘির নিকট, যেস্থানে বোঝাই নৌকাদি রক্ষা করা হইত, তথায় একখানি * বৃহৎ প্রস্তর-স্তম্ভ প্রোথিত করিয়াছিলেন। প্রস্তর খানা এখনও সমভাবে দণ্ডায়মান। অজ্ঞ কৃষকেরা এই পাথরে, এখন, সিন্দুর মাখাইয়া পূজা করে। পাথর খানা গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ। এই প্রস্তর-স্তম্ভের নিকট এখন একটী হাট স্থাপিত হইয়াছে।

সময়।

জাহান আলি খাঁ বা খাঁ জাহান আলি কোন্ সময় কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা বলিবার বিশেষ কোন উপায় নাই। ঠিক্ কোন সময়ে তিনি প্রথম বাগেরহাটে আইসেন, তাহাও জানা যায় না। তবে তাঁহার গোরস্থানের শিলালিপি দৃষ্টে জানা যায়, যিনি ১৪৫৮ খ্রীঃ অব্দে মার্চ্চ মাসের শেষে বুধবারে (২৬ সে জিলহিজ্জা ৮৬৩ হিজিরা) দেহত্যাগ করেন। এই লিপি অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই।

ফতেয়াবাদের খ্যাতির সময় এখানে অনেক ধনী, বিদ্বান ও সৎলোকের বাস ছিল। ইহার ধ্বংসের সঙ্গে ২ তাহারাও স্থানান্তরে প্রস্থান করিয়াছেন। বঙ্গের ভারতী পরিবার অতি প্রাচীন। ইহারা সুপণ্ডিত বলিয়াও বিখ্যাত ছিলেন।

বিখ্যাত বৈষ্ণব-গুরু কেশব ভারতী এই বংশের এক প্রধান ব্যক্তি। এই ভারতীদের ফতেয়াবাদে একটী আবাস ছিল, বৈষ্ণব-প্রাধান্যের সময় ইহাদেরও প্রাধান্য হইয়াছিল।

সরস্বতী ভারতী নামক এক সাধু পুরুষ ফতেয়াবাদ ত্যাগ করিয়া, জগৎপুরে বাস করিতে আরম্ভ করেন। উক্ত গ্রামে উক্ত ভারতী বংশ এখনও বর্ত্তমান। তাহাদের বংশাবলীর প্রতি দৃষ্টি করিলে, দেখা যায়, জগৎপুরে উহাদের ১০ পুরুষের বাস। ১৭ পুরুষ গড় পড়তা ৩৪০ বৎসর ধরিয়া লইলে আমরা দেখিতে পাই, ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যবর্ত্তী কোন সময়, অর্থাৎ জাহান আলির মৃত্যুর প্রায় একশত বৎসর পরে, ইহারা ফতেয়াবাদ পরিত্যাগ করেন। সম্ভবতঃ এই সময় এই নগরটীর পতন আরম্ভ অথবা একেবারে ধ্বংস হইয়া যায়।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, জাহান

* এইরূপ কতগুলি প্রস্তর যে প্রোথিত ছিল, তাহা জানার উপায় নাই, তবে একখানি মাত্র বিদ্যমান আছে।

আলির সহিত লোকনাথ মজুমদার নামক এক ব্যক্তি আসিয়াছিলেন। তিনি ফতেয়াবাদ গমন না করিয়া, জগৎপুরে বৃহৎ পরিখা-বেষ্টিত বাড়ী প্রস্তুত করিয়া বাস করিতে থাকেন। এই বাটীর চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ইহার পূর্ব্বদ্বারে "বড় পুকুর" নামক বৃহৎ পুষ্করিণী, উচ্চ পাহাড়ী, বট তেঁতুল তাল বৃক্ষাদি সহ বর্ত্তমান থাকিয়া লোকনাথের নাম প্রকাশ করিতেছে।

এই লোকনাথ পরিবার অধুনা কোঁড়ামারার মজুমদার নামে খ্যাত। এই গ্রামে ইহাদের ২৪ পুরুষের বাস। তবে ইহাদের যে বংশাবলী প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা একেবারে বিশুদ্ধ না হইলেও অনেকটা যে ঠিক্, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই হিসাবে দেখিলেও বোধ হয়, লোকনাথ পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কোন্ সময়ে, জাহান আলির সহিত আসিয়াছিলেন। ইহাতে অনেকটা জানা যায় যে, জাহান আলি কোন্ সময়ের লোক এবং এই সময়ে কোন্ বাদসাহ সিংহাসনে আসীন ছিলেন।

এখন জাহান নাই, ফতেয়াবাদ নাই ও তাহাদের শৌর্য্যবীর্য্য, সুখ সৌভাগ্য বা গৌরব নাই, আছে কেবল অতীতের স্মৃতি। সামান্য স্মৃতি ইতিহাসের পক্ষে বিশেষ কিছুই নহে। কিন্তু যে দেশের ধারাবাহিক ইতিহাস বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহার পক্ষে ইহা সামান্য হইলেও কিন্তু একেবারে পরিত্যজ্য না হইতেও পারে।

শ্রীনকুলেশ্বর ঘোষ।

উপবাস।

দিব্য-চক্ষুষ্মান ও সুচেতস্মান পুরুষেরা হিন্দুশাস্ত্র এবং প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবেন, তত্ত্বদর্শী ও তত্ত্বজ্ঞানী ঋষি, মুনি ও মহাপুরুষেরা উপবাস-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ প্রকীর্ণভাবে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। স্বাস্থ্য-সুখে শরীর রক্ষা, সুদীর্ঘ জীবন লাভ, আনন্দময়ী শান্তি ভোগ, এবং যোগসাধনের পক্ষে উপবাস অন্যতম অত্যাবশ্যক উপাদান। শ্রীমদ্ভগবৎগীতায় শ্রীভগবান অমিত-বিক্রমী অর্জ্জুনকে কহিয়াছেন "শরীরকে কষ্ট দিয়া তপস্যা করা সম্পূর্ণভাবে আসুরিক।" একথা ধ্রুবসত্য; কিন্তু পরম দয়াল পরমেশ্বর জীবের কল্যাণার্থ ইহাও কহিয়া গিয়াছেন যে, সাত্বিক আহার যেমন তপস্বীর উপযুক্ত, তেমনি আহারের সংযমও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বস্তুতঃ আহারের সংযমের নামই প্রকৃত উপবাস। হিন্দু-ঋষিরা এই উপবাসের মাহাত্ম্য ও পুণ্যফল সম্বন্ধে ভূরি ভূরি উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। ধরণীতে ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তির পক্ষে এই ধ্রুব-সত্যময়ী কথাগুলি ধনবানের ধনভাণ্ডার হইতেও অধিকতর মূল্যবান। আইস, আমরা মহর্ষি মহাত্মাদিগের এই মনোজ্ঞ উপদেশের মধুরতা উপলব্ধি করিয়া সাধনের ও শান্তির একটী সারতত্ত্ব সংগ্রহ করিতে সচেষ্ট হই।

কেবল হিন্দুর হিরণ্ময় শাস্ত্রে এই হিতকরী কথার উল্লেখ আছে, এমত নহে, অন্যান্য প্রাচীন জাতির ধর্ম্মশাস্ত্রেও উপবাসের উপকারিতা অনুল্লিখিত হয় নাই। য়িহুদীদিগের পুরাতন গ্রন্থাবলী মধ্যে আহার,

সংযম বা উপবাসের সুফল সম্বন্ধে বিবিধ-প্রকার বিধি দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দু ও য়িহুদী অপেক্ষা পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠতর ধর্ম্মপ্রাণ জাতি আর কখনও জন্মগ্রহণ করে নাই। হিন্দু ভিন্ন য়িহুদীদিগের তুল্য প্রাচীনতর জাতি জগতের আর কোথাও বিদ্যমান নাই। পুরাতন বাইবেল (Old Testament) এবং "তালমুদ" গ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখা যায়, হিন্দু শাস্ত্রের প্রায় অধিকাংশ তত্ত্বকথা য়িহুদিদের ধর্ম্মশাস্ত্রে সন্নিবিষ্ট আছে। পার্শীকদিগের জেন্দাবস্তা, উপবাসের চিরপক্ষপাতী। মুসলমানদিগের "রোজা," "রমজান," "ফাকা" প্রভৃতি উপবাসের উৎকৃষ্ট প্রমাণ। মহামতি যিশু-খ্রীষ্টকে তাঁহার শিষ্যবর্গ একদা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"হে প্রভো! আপনি যেরূপ অদ্ভুত দৈবকার্য্য সমূহ সম্পন্ন করিতেছেন, এতাদৃশ আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিবার শক্তি কিরূপে লাভ করা যায়?" এতদুত্তরে যিশু বলিয়াছিলেন "উপবাস ও উপাসনা দ্বারা এবম্প্রকার অপূর্ব্ব দৈবশক্তি লাভ করা যায়।" (Mark's Gospel, 9th chapter, 29) মহামতি পল, উপবাসের নিতান্ত আবশ্যকতা সম্বন্ধে বাইবেলে অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন; য়িহুদী ঋষিরা পুনঃ পুনঃ লিখিয়াছেন "আমরা উপবাস ও উপাসনা দ্বারা ভগবানের প্রত্যাদিষ্ট বাক্য সমূহ শ্রবণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম।" বস্তুতঃ ধর্ম্মপ্রবণা নারী ও ধার্ম্মিক পুরুষেরা এবং চিত্ত-সংযমী ও ইন্দ্রিয়-সংযমী সাত্ত্বিক ব্যক্তিবর্গ, উপবাসের সুফল ভোগ করিয়া আনন্দময় অধ্যাত্ম-জগতে প্রবেশ করিতে শনৈঃ শনৈঃ সক্ষম হইয়া থাকেন। এই জন্য পৃথিবীর যে সকল জাতি স্বভাবতঃ ধর্ম্মপ্রবণ, ঈশ্বরভীরু, তত্ত্বানুসন্ধায়ী, সাত্ত্বিক-ভাব-সম্পন্ন ও বিশুদ্ধবীর্য্য-প্রাপ্ত, তাঁহারা প্রায়ই আহারের গুণাপগুণ ও সংযমা-সংযমের সুখ দুঃখ ইত্যাদির বিচার করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, এই জন্য ইহাদের জাতিত্ব, বংশমর্য্যাদা, বংশ-বিশুদ্ধতা, ধার্ম্মিকতা প্রভৃতি সুদৃঢ়রূপে বর্ত্তমান থাকে, এই জন্যই হিন্দু ও য়িহুদী জাতি এত পুরাতন কাল হইতে, অসংখ্যাসংখ্য বিপদ, বিপ্লব, আক্রমণ, ঘাত-প্রতিঘাতের সংঘর্ষণ প্রভৃতি সহ্য করিয়াও অটুট ও অবিকৃত ভাবে এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। যাহারা সংসারকে কেবল তামসিক ভোগলালসার স্থান বলিয়া বিবেচনা করে, বিলাসিতাই যাহাদের জীবনযাপনের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য, যাহাদের নিকট ইন্দ্রিয় চরিতার্থতাই জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হয়, অথবা যাহারা বর্ণবিচার, চর্ম্মবিচার, কর্ম্মবিচার, ধর্ম্মবিচার, সত্ত্বরজতমাদি গুণের বিভিন্নতা, ইহলোক ও পরলোকের সুখদুঃখ প্রভৃতি কখনই ভাবে না, সেই সকল হতভাগ্য লোক অবশ্য উপবাসকে ধর্ম্মের উপাদান বলিয়া বিশ্বাস করে না এবং করিবে না, ইহা সত্য; এই জন্য এই সকল ব্যক্তি এবং এই সকল ব্যক্তির সমাজ চিরদিনই শ্রীভ্রষ্টরূপে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। তবে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, লেখা পড়া শিখিয়াও যেমন অনেকে শিক্ষিত-পশু হয়, তেমনি শিক্ষিত ও শাস্ত্রাভিজ্ঞ হইয়াও অনেকে মহানির্ব্বোধের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকে। ইউরোপ ও আমেরিকান আসিস্টাণ্ট পুরুষেরা খ্রীষ্টোপাসক ও খ্রীষ্ট-শাস্ত্রে এতাদৃশ অজ্ঞ ও অবিশ্বাসী, অথবা অবাধ্য যে, তাহাতে অনেক সময়ে আমা-

দিগকে আশ্চর্য্য হইয়া থাকিতে হয়। বাইবেলে পদে পদে উপবাসের উপদেশ ও অনুজ্ঞা আছে, কিন্তু ভোগবিলাসী প্রটেশ-টাণ্ট্ পাদ্রীরা তাহা আদৌ পালন বা বিশ্বাস করে না, অথচ ইহারাই ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া বিখ্যাত এবং খ্রীষ্টের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ভক্ত শিষ্য! অবশ্য এ বিষয়ে রোমানকাথলিকেরা প্রটেশ্টাণ্ট হইতে শ্রেষ্ঠতর। যাহারা ইংরাজ-দিগের অনুকারী, তাহারাও ভাবিয়া দেখে না যে, তাহাদের গুরুগণের গ্রন্থেই এ কথা পুনঃপুনঃ উল্লিখিত আছে। বিদেশীয় ভাবা-চ্ছন্ন এবং ইংরাজীশিক্ষিত হিন্দু যুবার কৌতূহল বৃত্তি চরিতার্থ জন্য, বিশেষতঃ যে খ্রীষ্টানুরাগী বাঙ্গালী "খ্রীষ্টধর্ম্মে সংযম বা উপবাসের উপদেশ নাই" বলিয়া বৃথা আড়ম্বর করে, তাহাদের শিক্ষার জন্য, আমি বাইবেল হইতে কতকগুলি পদোদ্ধার করিয়া উপবাসের আবশ্যকতা দেখাইতে আকাঙ্ক্ষা করি।

১। "উপবাসের দিনকে পবিত্র বলিয়া বিবেচনা কর।"—Joel. 1. 14.

২। "উপবাস, আনন্দজনক।"—Zechariah. VIII. 19.

৩। "যোহন্নার শিষ্যগণ উপবাস করিতেন।" St. Mark. 2. 18.

৪। "আমি সপ্তাহে দুইবার উপবাস করি।" Luke. 18. 12.

৫। "আমরা উপবাস করি।" Isiah. 58. 3.

৬। যিশুখ্রীষ্ট চল্লিশ দিবস উপবাস করিয়াছিলেন।" Mathew. 4. 2.

৭। "তদনন্তর উপবাস করিয়া তাঁহারা আশীর্ব্বাদ করিলেন।" Acts. 13. 3.

৮। যিশু কহিলেন, উপবাস ও উপাসনা দ্বারা অদ্ভুত দেবশক্তি লাভ করা যায়।" Mark, IX. 29.

৯। উপবাসের দ্বারা আমার আত্মা পবিত্র হইয়াছে।" Psalms. 35. 13.

১০। "উপবাসের দিনে আমরা ব্রহ্ম বাক্য (ধর্ম্মশাস্ত্র) পাঠ করিয়াছি।" Jeremiah. 36. 6.

১১। ধার্ম্মিকা আনাই দেবী, উপবাস দ্বারা ঈশ্বরাধনা করিতেন।" Luke. 2.37.

১২। উপবাস করিয়া ঈশ্বরোপাসনা হইত।" Acts. 14. 23.

১৩। "সতত উপবাস করিবে।" I. Corinthians. 7. 5.

এই রূপে বাইবেলের আরও বহু স্থান হইতে শ্লোকোদ্ধার করিয়া দেখান যাইতে পারে, খ্রীষ্টান শাস্ত্র মতে উপবাস নিতান্তই আবশ্যক। বর্ত্তমানকালের খ্রীষ্টানেরা তাহাদের শাস্ত্রের এই সকল জ্ঞানগর্ভ ও কল্যাণকর উপদেশ অনুসরণ করে না বলিয়া ইউরোপ ও আমেরিকা আজিকালি ভয়ানক সাংসারিকতায় পরিপূর্ণ এবং সেই জন্যই খ্রীষ্ট-সমাজ দিনে দিনে তামসিক হইয়া উঠিতেছে।

হিন্দু সমাজে এমন অনেক সাত্বিক ক্রিয়া আছে, যাহা সম্পন্ন করিতে হইলে, ক্রিয়াকারীকে উপবাসী থাকিতে হয়। অথবা যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই পবিত্র ক্রিয়া নিষ্পন্ন না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার জলগ্রহণের অধিকার নাই। শ্রাদ্ধ, পূজা, সংকল্প, হোম, যাগ, যজ্ঞ, চণ্ডীপাঠ, বলিদান, তর্পণ, বৃক্ষ-প্রতিষ্ঠা, উপনয়ন প্রভৃতি বহুবিধ ক্রিয়ায় ক্রিয়াকারীর উপবাসী থাকা আবশ্যক, একাদশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা, ত্র্যহস্পর্শ, জন্ম দিবস, পিতার মৃত্যু দিবস, সংক্রান্তি প্রভৃতি অনেক তিথিতে অনেকে সম্পূর্ণ উপবাস অথবা অর্দ্ধ উপবাস করিয়া থাকেন। একা-

দশী তিথিতে উপবাসী থাকিবার উপদেশ হিন্দুশাস্ত্রে পুনঃপুনঃ উল্লিখিত আছে। পুরাণে, তিথিতত্ত্ব নির্ণয় গ্রন্থে, যোগ-শাস্ত্রে এবং বিশেষতঃ বৈষ্ণব সাহিত্যে ইহা লিখিত আছে যে, "একাদশীর উপবাস পালন করিলে মহাপুণ্য লাভ করা যায়। এই উপবাসের সুফল। ধর্ম্মপথাবলম্বী পুরুষ ও ধার্ম্মিকা রমণীর পক্ষে একাদশীর উপবাস নিতান্ত প্রশস্ত।" মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব্বে কাশীরাম দাস লিখিয়াছেন "যে ব্রাহ্মণ একাদশী ব্রত পালন না করিবে, রাজা তাঁহাকে দেশান্তর করিয়া দিবেন।"

একাদশী ব্রত যেই জন না করিবে।
সত্য কহিলাম এই দেশে না থাকিবে।
(অশ্বমেধ পর্ব্ব)

ফলতঃ প্রকৃত কথা এই যে, হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুশাস্ত্র ভোগ, লালসা, বিলাস, আকাঙ্ক্ষা অথবা কামনার কথনই প্রশ্রয় দেন নাই; সংযম, শাসন, দমন, পালন, ত্যাগ, সহিষ্ণুতা প্রভৃতিই হিন্দু ঋষির মধুর উপদেশ। "নিবৃত্তি স্তু মহাফলা।" ইহাই আদর্শ হিন্দুর আদর্শ জীবন মন্ত্র, সুতরাং উপবাস প্রথা হিন্দুশাস্ত্রের ধর্ম্মসংশ্লিষ্ট মহাকর্ত্তব্য; ইহা সাধনের একটা বিশিষ্ট এবং অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ।

সুবিশাল হিন্দুশাস্ত্রে উপবাস ও উপবাসীর বিবরণ এত বহুল যে, তাহার সম্পূর্ণ রূপে বর্ণনা করা যায় না; আপাততঃ হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বীর কথা পরিহার করিয়া অন্য দেশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও আমরা অসংখ্য দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হইতে পারি। বাইবেলে পাঠ করা যায়, যিশু খ্রীষ্ট চল্লিশ দিবস উপবাসী ছিলেন; সুবর্ণ কিরীটিনী লঙ্কাপুরীতে কুম্ভকর্ণ ছয় মাস কাল ব্যাপিয়া নিদ্রিত ও অনাহারী থাকিতেন। আর অতি অল্প দিনের কথা এই যে, লর্ড লরেন্স যখন ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল ছিলেন, তখন "হরিদাস" নামে এক পঞ্জাবী সাধু প্রায় দেড়মাস কাল মাটীর নীচে জলশূন্য, বায়ুশূন্য, আহারশূন্য স্থানে, সম্পূর্ণ উপবাসী হইয়া প্রোথিত ছিলেন। দেড় মাস কাল পরেও তিনি জীবিত ছিলেন; তিনি মরেন নাই; বরং সম্পূর্ণ অদ্ভুত ও অভিনব আধ্যাত্মিক তেজে তাঁহার বদনমণ্ডল শত সূর্য্যের জ্যোতিতে পরম রমণীয় বলিয়া শোভা পাইয়াছিল। তিব্বতে, ভারতে, ভারতপার্শ্বে এখনও অনেক গুপ্ত যোগী আছেন, যাঁহারা বায়ু মাত্র সেবন করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারেন, কেহ কেহ নির্ঝরণার সামান্য মাত্র জল গলাধঃকরণ করিয়া অথবা দুই একটা মাত্র ফল সেবন করিয়া জীবিত থাকিতে পারেন। কেহ কেহ বা সপ্তাহে বা পক্ষান্তরে সামান্য মাত্র আহার করেন। সাধারণতঃ যোগী পুরুষের আহারের পরিমাণ অতি সামান্য, সুতরাং যোগীগণ অনাহারে কাতর হয়েন না। সকল শাস্ত্রে যখন উপাদেয় সুফল সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট উপদেশ সমূহ পাঠ করা যায়, তখন ইহা কি অস্বীকার্য্য যে উপবাসের সুফল নিশ্চয়ই সত্য? তত্ত্বজ্ঞানী ও তত্ত্বদর্শী শাস্ত্রবেত্তা মহর্ষি মহাত্মারা যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের কেবল চিন্তা, ধ্যান বা তপস্যার ফল নহে, বস্তুতঃ ইহা তাঁহাদের স্ব স্ব সাধনার্জ্জিত ফলের পরীক্ষাও বটে।

উপবাস দুই প্রকার—সাধ্য ও অসাধ্য। যাহা সুখকর ও শান্তিপ্রদ তাহা সাধ্য; যাহা অসুখ ও অশান্তির উৎপাদক, তাহা অসাধ্য উপবাস নামে গণ্য। শেষোক্ত

উপবাসকে ভগবৎগীতায় ভগবান "আসুরিক উপবাস" বলিয়া গিয়াছেন। শরীরকে অযথা ক্লেশ দিয়া নির্ব্বোধ বা ভণ্ডের মত অনাহারী থাকা নিতান্ত পাপজনক; ইহা আত্মহত্যার সমতুল্য মহাপাপ। এরূপ উপবাসের নিন্দা সকল শাস্ত্রেই দেখা যায়। অসাধ্য উপবাস অনেক প্রকার; তাহা এস্থলে বর্ণনা করার আবশ্যক নাই, কারণ বর্ত্তমান প্রবন্ধের সহিত ইহার সম্পর্ক স্বল্প। সাধ্য উপবাস, সকল সময়ে আশু সুখকর না হইতে পারে, কিন্তু সত্বরে বা শেষে ইহার ফল নিশ্চয়ই সুখকর ও শান্তিপ্রদ হইয়া থাকে। সাধ্য উপবাসকে প্রধানতঃ নিম্ন-লিখিত কয়েক প্রকারে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

১। সমাধি অবস্থায় যোগীর সুদীর্ঘ উপবাস।

২। পীড়িতাবস্থায় উপবাস।

৩। পুণ্য ক্রিয়ায় উপবাস।

৪। তিথি বিশেষে উপবাস।

৫। বায়ু শোধনে উপবাস।

সমাধি অবস্থায় আহারের প্রয়োজন হয় না। পীড়িতাবস্থায় যথারীতি উপবাসী থাকিলে দৈহিক-বিকৃতি নষ্ট হয়। পুণ্য ক্রিয়ায় এবং তিথি বিশেষে উপবাস, দেহতত্ত্ব (anatomy) এবং মনতত্ত্ব (Psychology) শাস্ত্রের সহিত সম্পর্কীভূত। বায়ু-শোধনের উপবাস" কেবল সাধক এবং যোগীরাই অভ্যাস করেন; মধ্যে মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা, সুষম্না প্রভৃতি বায়ুস্থানকে শোধন করা আবশ্যক হয়, তাহা যথারীতি না করিলে যোগসাধনে ব্যাঘাত ঘটে, দেহ ও মনের ক্ষতি হয়, এই জন্য সাধুগণ আবশ্যক মত সময়ে সময়ে "বায়ু" শোধন করেন। হিন্দুর যোগ-শাস্ত্রে নাড়ী এবং নাড়ীর বায়ু শোধনের প্রসঙ্গ অনেক স্থানে বিবৃত হইয়াছে, কিন্তু সাধারণ পাঠকের পক্ষে তাহা বুঝিয়া উঠা সুকঠিন, এজন্য তাহা এস্থলে বিশেষরূপে উল্লেখ করিলাম না। যাঁহারা "গুরু" প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহার পক্ষে উপবাস ও উপাসনা নিতান্ত আবশ্যক। উপবাসী হইয়া দৃঢ়ভক্তি ও বিশ্বাসের সহিত মনুষ্য যখন গুরু-কামনা করেন, তখন

"তৎ পুরুষো অমানবঃ স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি।"
(ছান্দোগ্য উপনিষদ। পঞ্চম প্রপাঠক।)

সেই অমানবরূপ গুরুদেব উপাগত হইয়া মৃতজীবে (spiritually dead) ব্রহ্মপ্রাণ প্রাপণ করেন। সৎগুরু প্রাপ্ত হইলে মনুষ্য ব্রহ্মলোক গমন করিয়া কার্য্য কারণ সম্বন্ধাধীন মর্ত্ত্যজগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মোক্ষাধিকারী হয়েন।

"তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ।"
(ছান্দোগ্য উপনিষদ)

যোগ-শাস্ত্রে ঋষিরা লিখিয়াছেন—

দক্ষিণা পিঙ্গলা নাড়ী বহ্নি মণ্ডল গোচরা।
দেবযান মিতি জ্ঞেয়া পুণ্যকর্ম্মানুসারিণী॥
ঈড়া চ বাম নিশ্বাসঃ সোম মণ্ডল গোচরা।
পিতৃযান মিতি জ্ঞেয়া বামমাশ্রিত্য তিষ্ঠতি॥

যে নাড়ী দ্বারা দক্ষিণ নাসিকাতে বায়ু বাহিত হয়, তাহার নাম পিঙ্গলা। যে নাড়ীর দ্বারা বাম নাসিকাতে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহার নাম ঈড়া।

যাহা হউক, বায়ুশোধনের অনেক উপায় আছে, সাধকেরা তাহা সাধন-শিক্ষাকালে দীক্ষাগুরু বা শিক্ষাগুরুর নিকট শিক্ষা করিয়া থাকেন। কেবল পুস্তক পড়িয়া ইহা শিক্ষা করা যায় না। এই শোধনের বলে সাধন-ক্রিয়া সহজসাধ্য হইয়া উঠে, এবং

উপবাসাদি সত্বর সত্বর অভ্যস্ত হইয়া যায়। সাধ্য উপবাস প্রথমাবস্থায় কিঞ্চিৎ অসুবিধা, অস্বচ্ছন্দতা বা কষ্টদায়ক হইলেও ইহা শিক্ষণীয়; ক্রমে ক্রমে আহার সংযমের নিয়মানুসারে ইহা অভ্যাস করা কঠিন বলিয়া বোধ হয় না। এরূপ অভ্যাসকারীর পক্ষে তিক্ত দ্রব্যের ব্যবহার নিতান্ত প্রয়োজন; তিক্ত দ্রব্য মধ্যে এইগুলি প্রধান—কোমল নিম্বপত্র, হিংচিশাক (হেলচা বা হেলেঞ্চা), পলতা, পাটশাক (অপর নাম ললিতা), পিড়িংশাক, কলমীশাক, উচ্ছে (করলা), হরীতকী, সুনিয়া শাক, ব্রহ্মীশাক, জ্যোতিষ্মতী লতা, ইত্যাদি। এইগুলি দ্বারা দেহাভ্যন্তরস্থ বায়ু শোধিত হয়, নাড়ী পরিষ্কার হয়, মেধা শক্তিকে বৃদ্ধি করে, এবং পরিণামে নানাপ্রকার সুফলসহ মনুষ্যকে দীর্ঘায়ু সম্পন্ন করে। মধ্যে মধ্যে সুপক্ব বিল্বফল অথবা কাঁচা বেলের মোরব্বা কিম্বা অগ্নিদগ্ধ কাঁচাবেল ভক্ষণ করিলে আরও উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। আহার সংযমাভ্যাসকারীর পক্ষে সুপক্ব ফল, কাঁচা দুগ্ধ, অম্লমধুর দধি প্রভৃতির ব্যবহার প্রশস্ত। অভ্যাসের সময় নিত্য স্নান না করিয়া সপ্তাহে দুই তিনবার স্নান করিলেই যথেষ্ট হয়।

নূতন বাত, পুরাতন বাত, অম্লশূল, উদরী, বহুমূত্র, মদাত্যয়, স্থূলতা, একশিরা, কোষবৃদ্ধি, জলাতঙ্ক, গলগণ্ড, গোদ, প্রভৃতি নানাপ্রকার রোগের নিরাময়তা পক্ষে মধ্যে মধ্যে উপবাস বিশেষ উপকার সাধন করিয়া থাকে। ঋতু বিশেষেও সুস্থকায় ব্যক্তির পক্ষে উপবাস প্রয়োজন, ইহাতে দেহ আরও সুস্থ থাকে এবং দেহাভ্যন্তরে রোগের প্রবেশপথ প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু শীতকালে যে পরিমাণে উপবাস করা যাইতে পারে, অন্য ঋতুতে সে পরিমাণে পারা যায় না। অনেক সাধকার্থী প্রথমে প্রথমে রাত্রি-উপবাস শিক্ষা করিয়া দিবা-উপবাস অভ্যাস করেন। যোগী ও মহাপুরুষদিগের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু সাধারণতঃ মধ্যে মধ্যে উপবাসে সংসারী পুরুষেরাও বিশেষ সুফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। শাস্ত্রীয় প্রথামত উপবাস করিয়া কেহই তাহার সুফলে বঞ্চিত হয়েন নাই। শরীরের অপর নাম কলেবর, ইহা প্রকৃতই কল (machines) সমূহের বর (শ্রেষ্ঠ); মধ্যে মধ্যে ইহাকে বিশ্রাম দেওয়াই সুবুদ্ধিমানের কাজ। "অধিক আহার করিলে মনুষ্য দীর্ঘ জীবনলাভ করে বা অধিক সবল হয়" এরূপ সংস্কার অভ্রান্ত নহে, বরং সংযত আহারে মনুষ্যের দেহ সুস্থ, মন শান্তিময় এবং আয়ু দীর্ঘ হয়। রাজপুতানার লোকেরা বলে—

"থোড়া খুর্দা।
রং জর্দা"॥

অর্থাৎ আহারের শাস্ত্রীয় নিয়ম পালন করিয়া অল্প পরিমাণে সাত্বিক আহারে মানুষের দেহে সুন্দর বর্ণ ও জ্যোতি দেখা যায়। রাজপুতদিগের এই প্রাচীন প্রবাদ সত্য।

যাঁহারা সর্পজাতির জীবন-ক্রিয়া আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের বোধ হয় জানা আছে, প্রবল শীত ঋতুতে অধিকাংশ সর্পজাতি (বিশেষতঃ বিষাক্ত সর্প মাত্রেই) ভূগর্ত্ত হইতে বাহির হয় না, ইহারা গহ্বরে লুকায়িত থাকিয়া অনাহারে অবস্থান করে। তখন কেবল বায়ু উহাদের প্রাণ ধারণের উপাদান। এই জন্য সর্পের অপর নাম বায়ুভুক্। ঐ সময়ে সর্পেরা মহাযোগীর ন্যায়

সমাধিস্থ থাকে। শীতের অবসানে এবং বসন্তের প্রারম্ভে যখন তাহারা গর্ত হইতে বাহিরে আইসে, তখন বোধ হয় যেন ইহারা নূতন জীবন লাভ করিয়া নবতেজে পুনরাবির্ভূত হইল। সমাধিস্থ সাধকের অবস্থাও তাহাই। উপবাসের পরে সর্পেরা অধিক আহার করে না, ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প আহার করিয়া তদনন্তর যথা পরিমাণে আহার করিতে থাকে। সর্পজাতি সাধারণতঃ স্বল্পাহারী; শীত-ঋতুতে যে সকল জীব ভূগর্ভে অবস্থান করে এবং প্রায়ই বাহিরালোকে আইসে না, তাহারা সচরাচর স্বল্প আহার করিয়া থাকে। এইরূপ জীব কোনও সময়ে আহারের পরিমাণ বাড়াইয়া দিলে নিতান্ত কষ্ট পায়। ফলতঃ উপবাসের অল্প আহার প্রশস্ত। প্রথমে শর্করা কিম্বা কিঞ্চিৎ মিষ্ট দ্রব্য অথবা সামান্য ফলাদি কিম্বা কোনও সুমিষ্ট তরল পদার্থ (যথা মোহনভোগ, হালুয়া, সুমিষ্ট ক্ষীর ইত্যাদি) সেবন করিয়া অন্নাহার করা ভাল। উপবাস কালে স্ত্রীঅঙ্গ স্পর্শ, চন্দ্রালোকে উপবেশন, জলে সন্তরণ, শয্যায় পার্শ্বোপাধান (পাশ বালিশ) ব্যবহার, চিত্র অঙ্কন, লাল রংএর মসী দ্বারা লিখন, তীব্র মাদক দ্রব্যের সহযোগে প্রস্তুত কোনও প্রকার পদার্থের ধূমপান, ইত্যাদি নিষিদ্ধ। যাঁহারা বলেন, সাত্বিক উপবাসে দেহক্ষয় ও আয়ুক্ষয় হয়, তাঁহারা ভ্রান্ত, ইহা অনেকের জানা নাই যে একদিনের শাস্ত্রীয় সাত্বিক উপবাসে তিন দিনের সমতুল্য আয়ু পরিবর্দ্ধিত হয়। সমাধিস্থ মহাযোগীর একদিনের উপবাস, এক সপ্তাহকাল আয়ুবৃদ্ধির কারণ। এ দেশের উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুবিধবারা প্রায়ই মধ্যে মধ্যে উপবাসিনী থাকেন, অথচ তাঁহাদের মত সুস্থ দেহী, নিরাময়ী, সবলা ও দীর্ঘায়ুসম্পন্না স্ত্রীলোক প্রায়ই দেখা যায় না। আমি আমার নিজের জীবনে উপবাস দ্বারা অনেক আশ্চর্য্য সুফল প্রাপ্ত হইয়াছি। আর এক কথা এই যে, যাঁহারা উপবাস অভ্যাস করেন, তাঁহাদের সহিষ্ণুতাগুণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; সাধারণতঃ মনুষ্যেরা মল মূত্রের বেগ সম্বরণ করিতে সমর্থ হয় না; কিন্তু যাঁহাদের উপবাস অভ্যাস আছে, তাঁহারা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত মল মূত্রের বেগ সম্বরণ করিয়া রাখিতে পারে। আমি এইরূপ প্রকারের অনেক লোককে স্বচক্ষে দেখিয়াছি। ছয় দিবস পর্য্যন্ত মূত্র পরিত্যাগ করে না, এবম্প্রকার সুস্থকায় সাধক এখনও ভারতবর্ষে অনেক বর্ত্তমান আছে। অতি অল্প দিবস গত হইল, এক পঞ্জাবী পথিক দিল্লী রেলওয়ে ষ্টেশনে মূত্র পরিত্যাগ হেতু বাষ্পীয় শকট হইতে অবতরণ করিয়াছিল, কিন্তু নানা প্রকার অসুবিধায় সেখানে সে ব্যক্তি মূত্র ত্যাগ করিতে পারে নাই। এই সংযমী পুরুষ, হাবড়া রেলওয়ে ষ্টেশনে পৌঁছিয়া মূত্র পরিত্যাগ করেন!! প্রায় সপ্তদশবর্ষ কাল পূর্ব্বে গুজরাটের সুরাট জেলায় এক সধবা হিন্দু-স্ত্রীলোক প্রত্যূষে একমুষ্টি শুষ্ক চাউল এবং সূর্য্যাস্তের সময় একমুষ্টি তুলসীপত্র চর্ব্বণ করিয়া তিনমাস কাল যাপন করিয়াছিল। ইহার আকৃতি, প্রকৃতি, বর্ণ, দেহের লাবণ্য, শরীরের ওজন কিছুমাত্র কমে নাই; এই তিনমাস কাল তিনি জলপান অথবা অন্য কোনও দ্রব্য ব্যবহার করেন নাই। ঐ স্ত্রীলোক এখনও জীবিতা আছে। প্রায় ছয় মাস অতীত হইল, তাঁহার স্বহস্তে লিখিত এক পত্র পাইয়াছিলাম, তিনি ঐ পত্রে লিখিয়াছিলেন "আমি এখন সেই সামান্য

পরিমাণ চাউল এবং তুলসী পাতার উপর নির্ভর করিয়া ছয় মাস কাল জীবন ধারণ করিতে পারি।"

পাঠক! প্রকৃতির দিকে প্রকৃষ্টরূপে নয়ন নিক্ষেপ করিয়া দেখ, নিম্ন শ্রেণীর অনেক জীব অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত না হইয়া বরং প্রকারান্তরে দীর্ঘ জীবন ও নবোৎসাহ লাভ করে। রজত ভেক, নিম্বকীট, শশক, ভূমধ্যসাগরের মোদেন মৎস্য, ইহারা শীত ঋতুতে সম্পূর্ণভাবে অনাহারী থাকে। বেরিং-ষ্ট্রেটের জলে "হোর্দ্দা" নামক মীন বর্ষাকালে কিছুই আহার করেনা; পাঠকেরা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন, বর্ষার বৃষ্টিও ইহাদের উদরস্থ হইতে পায় না। গ্রীনলাণ্ডের অনেক জলচর জন্তু শীত ঋতুতে উপবাসী থাকে। তিন বৎসর পর্য্যন্ত জল পান না করিয়া ভারতের চাতক পক্ষী বাঁচিতে পারে, ইহা প্রত্যক্ষ সত্য কথা। হমুই নামক কীট গ্রীষ্মকালে কিছুই খায় না। আরবদেশের "হোমা" পাখী শরৎ ও হেমন্ত ঋতুদ্বয়ে সম্পূর্ণভাবে নিরম্বু উপবাস করে। বহুপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্তুকে বায়ুশূন্য ও জলশূন্য স্থানে অভোজী অবস্থায় বহুকাল পর্য্যন্ত আবদ্ধ বা প্রোথিত করিয়া রাখিলেও মরে না, ইহা পরীক্ষিত সত্য। ক্যাটা পোরশ্ (Cata Porus) এবং ডাইরশীনশ্ নামক পার্ব্বতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আগাছা, জলস্পর্শ মাত্রেই শুকাইয়া যায়, ইহারা জল বিনা জীবন ধারণ করে। য়িহুদী ঋষিদিগের কেহ কেহ লিখিয়া গিয়াছেন, "উপবাস, উপাসনা ও আহার সংযম দ্বারা আমরা ইন্দ্রিয় জয় করিতে সমর্থ হইয়াছি।" ডাক্তার ষ্টড্ তাঁহার এক গ্রন্থে লিখিয়াছেন "উপবাস বা অর্দ্ধাশন ব্যবস্থা করিয়া আমি শত শত রোগীকে দুশ্চিকিৎস্য রোগ হইতে নিরাময় করিয়া দিয়াছি।" কোরীশ্ জাতীয় মহাপুরুষ মুকুন্দবীণ বলেন "মধ্যে মধ্যে উপবাস করিয়া আমি আমার দেহে নূতন সামর্থ্য, মনে নূতন তেজ এবং আত্মায় নবীন শক্তি প্রাপ্ত হইতাম।" হিন্দুর চিকিৎসা শাস্ত্রে লিখিত আছে, উপবাস একটা মহৌষধি। চিকিৎসকদিগের মতে উপবাস কালে পদদ্বয় ও চক্ষুদ্বয় শীতল জলে প্রধৌত করা প্রশস্ত। উপবাস কালে অল্প অল্প কর্পূর আঘ্রাণ লওয়া ভাল। প্রখর গ্রীষ্মকালে উপবাসের দিনে গোলাপ জল দ্বারা নয়নদ্বয় দিবসে দুই তিন বার মুছিয়া ফেলিলে চক্ষের জ্যোতি বর্দ্ধিত হয়।

শীত ঋতু আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ভল্লুকের দেহে এক প্রকার মেদের উৎপত্তি হয়; অতি স্বল্পকাল মধ্যে ঐ মেদ প্রচুর পরিমাণে দেহের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া থাকে। শীত কালে ভল্লুকেরা উপবাসী থাকিলে তাহাদের দেহক্ষয় হয় না। মাজগাশ্কার দেশের মেষ ছুছুন্দর এবং পেরু দেশের কাষ্ঠবিড়াল শীতে কিছুই উদরস্থ করেনা, অথচ সুস্থ থাকিয়া জীবন ধারণ করে। পশ্চিম আফ্রিকার লংফিশ্ নামক মৎস্য সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত জল ও ভোজ্য বিনা বাঁচিয়া থাকে। সুপণ্ডিত রবার্ট লেড্কর্ সাহেব লিখিয়াছেন—

"The fact that a large number of species of mammals and other animals undergo more or less prolonged and continuous fasts during the period of their winter or summer steep is familiar to us all. During the periods of such slumbers the more active functions of the body are to a great extent suspended; whilst those that are carried on act slowly and entail comparatively little waste of tissue and energy."

আমাদের পাতঞ্জলাদি যোগশাস্ত্রেও ইহা লিখিত আছে যে, যোগীজন সমাধিস্থ অবস্থায় জল ও ভোজ্য বিনা যখন জীবন ধারণ

করেন, তখন তাঁহার কণ্ঠের উপরিভাগ হইতে এক প্রকার অবর্ণনীয় সুধা স্বতঃই নিঃসৃত হইতে থাকে, সেই সুমিষ্ট তরল অমৃত সেই সমাধিস্থ মহাপুরুষের কণ্ঠাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া পাকস্থলীতে উপস্থিত হয়; তদ্বারা তাঁহার জীবন রক্ষা হইয়া থাকে। নিম্ন-শ্রেণীর জীব জন্তু সম্বন্ধে লেড্‌কর্‌ সাহেব আরও লিখিয়াছেন—

"So long ago as the year 1880, Professor Ruesch published a report upon observations made on Rhine Salmon, which tended to show while in fresh waters these fish, contrary to popular opinion, seldom or never feed. In fact among two thousand salmon examined, no trace of food was found in their stomachs, which in most cases were wrinkled up for a long time. The net result of all these observations is to render it practically certain that from the time they leave the sea until the completion of the spawning operation, salmon as a rule, takes no food of any kind."

যাহা হউক, ইন্দ্রিয় সংযম ও সাত্ত্বিক ভাবের উদ্দীপন জন্যও উপবাসের অত্যন্ত-আবশ্যকতা দেখা যায়। উপবাস দ্বারা মনুষ্য কর্ম্মপটু, পরিশ্রমপরায়ণ, একাগ্র চিন্তাশীল হয়, ইহা প্রত্যক্ষ ধ্রুব সত্য। শীত-প্রধান দেশাপেক্ষা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোক সাধারণতঃ অধিকতর সাত্ত্বিকভাব সম্পন্ন হয়, এই জন্য গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোক শীতপ্রধান দেশের লোকাপেক্ষা অধিকতর বিনয়ী, ধার্ম্মিক, ঈশ্বরভীরু এবং সংযমী হইয়া থাকে। ভারতবর্ষ, পৃথিবীর সকল দেশের তুলনায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মক্ষেত্র এবং হিন্দুজাতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতম সাত্ত্বিক, এই জন্য পদে পদে উপবাস করিতে হিন্দু-সন্তান কাতর হয় না।

যাঁহারা ধর্ম্মপ্রচারক, উপদেষ্টা, শিক্ষক, সুবক্তা, লেখক এবং চিন্তাশীল বৈজ্ঞানিক, তাঁহাদের পক্ষে মধ্যে মধ্যে সাত্ত্বিক উপবাস নিতান্ত প্রশস্ত। উকিল, মোক্তার, বিচারপতি, ভ্রমণকারী, সম্পাদক, গভীর চিন্তাশীল পাঠক এবং চিকিৎসকেরা মধ্যে মধ্যে উপবাস করিলে বিশেষ সুফল প্রাপ্ত হইতে পারেন। অজীর্ণ, অম্লশূল, কোষবৃদ্ধি, উদরী প্রভৃতি রোগে লঘু আহার, অর্দ্ধাশন, উপবাস এবং আহারের নিয়ম পালন বিশেষ উপকারী। উপবাসের দিনে কঠিন কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা বিধেয় নহে; উপবাসকালে ধর্ম্ম চিন্তা ও ধর্ম্ম কর্ম্মেই নিযুক্ত থাকা উচিত। উপবাসী ব্যক্তির পক্ষে ধর্ম্মভাবোদ্দীপক মূর্ত্তিদর্শন, জলাশয়-তটে অল্প ভ্রমণ, সঙ্গীত অথবা শাস্ত্রপাঠ শ্রবণ কিম্বা হরিনাম জপ অত্যন্ত উপকারী। তৎকালে রমণীর সংস্রব একেবারে পরিত্যাগ করা প্রশস্ত। উপবাসে যাঁহাদের প্রথমে প্রথমে কষ্ট হয়, তাঁহারা ব্রহ্মরন্ধ্রে সুবাসিত তৈল প্রয়োগ এবং পুনঃ পুনঃ চক্ষুদ্বয় ধৌত করিলে অনেক উপকার প্রাপ্ত হইবেন। সংসারী (গৃহী) ব্যক্তির পক্ষে এক বৎসরে অন্ততঃ অর্দ্ধ শত দিবস উপবাসের প্রয়োজন। বিবাহিত অপেক্ষা অবিবাহিত ব্যক্তি অধিকতর উপবাসপটু এবং পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীলোকগণ উপবাসে অধিকতর সমর্থা। ঋতুকালে বা গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকের পক্ষে উপবাস প্রশস্ত নহে। বসন্তকাল উপবাসের পক্ষে ভাল নয়, এজন্য এই ঋতুতে উপবাস যত কম হয়, ততই মঙ্গল। ফলতঃ এদেশে আমাদের পূজ্যপাদ প্রাচীন ঋষিদিগের প্রবর্ত্তিত পবিত্র প্রথা সমূহ ক্রমে ক্রমে বর্ত্তমান যুগের যুবকেরা অবহেলা করিয়া ক্রমশঃ ক্ষীণদেহ, ক্ষীণায়ু, রুগ্ন, অকর্ম্মণ্য, নির্ব্বীর্য্য এবং গজভুক্ত কপিত্থবৎ অসার হইয়া পড়িতেছে, ইহা বিষাদের বিষয়; ভরসা করি, এদেশের

অনেক প্রাচীন সুপ্রথা ও হিতকর নিয়মাবলী পুনরায় প্রবর্ত্তিত ও পালিত হইয়া আমাদের সমাজকে নব তেজে, নবোৎসাহে ও নবীন উদ্দীপনায় প্রবল পরাক্রমী করিয়া তুলিবে। হিন্দুর ধর্ম্মবল ভবিষ্যতের ভরসা, আমাদের শাশ্বত ও সনাতন শাস্ত্র সমূহ সেই ধর্ম্মবলের আকর, সুতরাং শাস্ত্রবিধি অবশ্য অবশ্য পালনীয়। শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

বিশ্বকোষে "তিলি" জাতি।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে বিশ্বকোষের বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের বিশ্বকোষ মধ্যস্থ "তিলি" জাতি প্রস্তাবে, তিলি জাতি সম্বন্ধে ভ্রান্তমত ও অসামঞ্জস্যতা দর্শান, এবং তিলি জাতি "কলু" নহে প্রমাণ করাই উদ্দেশ্য। তিলি জাতি বর্ণ চতুষ্টয়ের কোন স্থানীয়, তাহাও বলা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে; সে সম্বন্ধে প্রবন্ধান্তরে বলিবার রহিল।

বোধ হয় সকলেরই "তিলি" জাতিকে নবশাখ বা নবশায়ক সম্প্রদায় ভুক্ত সচ্ছূদ্র বলিয়া ধারণা আছে; কিন্তু বিশ্বকোষের বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়, এই জাতির ইতিবৃত্ত সংগ্রহ না করিয়া কেবল কতকগুলি অমূলক প্রবাদ ও অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া, বিশ্বকোষে এ জাতিকে 'কিম্ভূত কিমাকার' রূপ বর্ণনা করিয়া রাখিয়াছেন। এবং কতকগুলি অযথা বাক্যব্যয় করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বর্দ্ধিত করিয়াছেন। কায়স্থদিগকে ক্ষত্রিয়ত্বে উত্থিত করিতে যত আয়াস, যত অর্থ ব্যয়, ও যত সময়ের ধ্বংস করিয়াছেন, তিলি জাতির বিষয় (বেশী না হউক) সামান্যরূপ, জাতিতে, বোধ হয়, তাঁর একদণ্ড সময় লাগিত কিনা সন্দেহ। কারণ এক সম্বন্ধনির্ণয় গ্রন্থে এ জাতি সম্বন্ধে যতটুকু লেখা রহিয়াছে, শুদ্ধ সেই অংশটুকু উদ্ধৃত করিয়া দিলেই যথেষ্ট হইত। 'নাই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল।' তিনি যে প্রমাণ ব্যতীত শুধুই প্রলাপ বকিয়াছেন, ইহাই দুঃখের বিষয়। এই অনায়াস-লভ্য সুপরিচিত গ্রন্থখানি যে তাঁহার হস্তগত হয় নাই, ইহা অসম্ভব। কারণ তিনি পূর্ব্বোক্ত "সম্বন্ধ নির্ণয়' গ্রন্থ হইতে প্রমাণ স্বরূপ প্রচুর অংশ তাঁহার বিশ্বকোষে গ্রহণ করিয়াছেন। যদি সম্বন্ধনির্ণয়ের মতের সহিত তাঁহার মতের অমিল ছিল, খণ্ডন করিলেই পারিতেন। তিনি এত "প্রবাদ" এত "খুটিনাটি' বিষয় তিলি জাতীয় প্রবন্ধে সংগ্রহ করিতে পারিলেন, আর শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের গ্রন্থখানি কি তাঁহার চক্ষে পড়িয়াছিল না? অবস্থা গতিকে মনে হয়, তিনি ইচ্ছা পূর্ব্বকই (বোধ হয় কোন কারণে তিলি জাতির উপর ঈর্ষা বশতঃ) ঐ সম্বন্ধ নির্ণয়ের মত গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু নগেন বাবুর ন্যায় একজন কর্ম্মবীরের পক্ষে উহা উপযুক্ত হয় নাই। ভ্রান্তি সকলেরই আছে, স্বীকার করি, কিন্তু এবিষয় যে তিনি (ইচ্ছা পূর্ব্বকই) ঈর্ষাহলাহল উদ্গীর্ণ করিয়াছেন, আমরা তাহা ক্রমে প্রমাণ করিতেছি। আমরা ইহাও প্রমাণ করিব যে, তিনি, তিলি জাতি কি, প্রকাশ করিতে ও তিলি জাতি সম্বন্ধে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারেন নাই।

তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদের প্রশ্ন গুলির সদুত্তর দিয়া বাধিত ও সন্দেহ দূর করিবেন।

বিশ্বকোষে "তিলি" শব্দ খুজিতে দেখিলাম, লেখা রহিয়াছে,—"তৈলজীবি জাতি বিশেষ [তেলী ও তৈলিক দেখ]" তখনই মনে সন্দেহ হইল। "তিলি" শব্দেই তাঁহার বক্তব্য শেষ করিলে বোধ হয়—মহাভারত অশুদ্ধ হইত না; ইহাতেই তাঁহার বিদ্বেষ-জ্ঞানের কতকটা পরিচয় পাওয়া গেল। তিলিকে তিনি কখনই "তিলি" বলিবেন না, তাই "তেলী" শব্দে তিলিদের মুণ্ডপাত করিয়া তবে ক্ষোভ মিটাইয়াছেন। যাহা হউক, তেলী শব্দ বাহির করিয়া দেখিলাম, —লেখা রহিয়াছে,—"**সাধারণতঃ যাহারা বীজ হইতে তৈল বাহির করে, তাহারাই তেলী নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বাঙ্গালায় কলু নামে এক—জাতি আছে * * তাহারাই প্রধানতঃ তৈল নিষ্কাশন ব্যবসায় করিয়া থাকে। বিহার, উড়িষ্যা, উঃ পঃ প্রদেশ এবং দাক্ষিণাত্যে তেলীরাই তৈল নিষ্কাশন করে। আজ কাল অনেক স্থলে তেলিরা অন্য ব্যবসায়ও অবলম্বন করিয়াছে। বাঙ্গালায়, তেলি, তিলি, ও কলু, এই ত্রিবিধ জাতিই—মূলতঃ তৈলক জাতি হইতে উৎপন্ন; তন্মধ্যে কলুজাতি পতিত। তেলির অপরাপর নাম—তৈলী, তৈলিক, তৈলকার, তৈলপান ও কলু।" "তৈলিক" শব্দে—লেখা আছে, "তৈলকার, তৈলবিক্রেতা ও কলু।"

* * *

নগেন বাবু বলেন, "ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের মতে—কোটক (ঘরামী) জাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে কুম্ভকার পুরুষের ঔরষে তেলী জাতির জন্ম হইয়াছে। আবার—কলু জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধেও উপরোক্তরূপ লেখা হইয়াছে। তবে কলুজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে অন্য একটীমত জাতিমালা হইতে দেওয়া হইয়াছে* *"কূপ জাতীয় পুরুষের ঔরষে, বেশ্যার গর্ভে তৈলকারের উৎপত্তি হইয়াছে।"

"তেলী" প্রস্তাবের একস্থানে লিখিত আছে,—"ইহারা বাঙ্গালায় সৎশূদ্র বলিয়া গণ্য ও নবশাখদিগের ন্যায় আচরণ সম্পন্ন। ইহাদের সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণ নাই। বিহারে তেলিরা সৎশূদ্র নহে,—বাঙ্গালার কলুদিগের ন্যায় অনাচরণীয়।"

পাঠক দেখিলেন,—তিলিদিগকে প্রাকারান্তরে কলু বলিতে কিছুই ত্রুটি করা হয় নাই। এ হেন খিচুড়ি হইতে তিলিকে বাছিয়া বাহির করিতে পারিবেন কি?

কিন্তু আমরা দেখাইব যে, "তিলি ও "কলু"র সহিত কোন বিষয়ই সম্বন্ধ নাই।

"ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াৎ সুতো মালাকার স্তথা মুনে।
বৈশ্যাত্তু দ্বিজ কন্যায়াং জাতৌ তাম্বুলি তৌলিকৌ॥

* * *

বৈশ্যায়াং গোপতো জাতো আভীর তৈলকারকৌ।
গোপাৎশূদ্রা গর্ভে জাতৌ পুত্রৌ ধীবরশৌণ্ডিকৌ॥"

(পূজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি প্রণীত সম্বন্ধ নির্ণয়ধৃত বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণের বচন। মূল পুস্তক ২য় সংস্করণ ১৮৫ পৃষ্ঠা)

"করণ, বৈদ্য, তিলি, মালী প্রভৃতি এই বিংশতি-সঙ্কর জাতির জল আচরণীয় অর্থাৎ আচমন-যোগ্য, ইহা আবালবৃদ্ধকে উপলক্ষ করিয়া বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণে উক্ত হইয়াছে। ঐ

আবার গোপাল ভট্ট-বিরচিত বল্লাল-চরিতের—জাতিপরিচয় নামক খণ্ডে, পরশুরাম সংহিতার যে বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

"গোপালিন্যাং বারজীবা তৈলিকস্য চ সম্ভবঃ।
(১০ পৃষ্ঠা ১২৮ শ্লোক)

* * *

কুম্ভকারস্য বীর্য্যেণ সদ্যঃ কোটকঃ যোষিতি।
তুব তৈলকারশ্চ পতিতঃ কুটিলঃ সদা॥'
(৪ পৃষ্ঠা ৮০ শ্লোক)

এই উভয় গ্রন্থেই "তৈলিক" ও "তৈলকার" দুই পৃথক জাতি বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

এইবার নগেন বাবুর অসামঞ্জস্যতা দেখুন।

বিশ্বকোষ ৪র্থ খণ্ড ৪৩১ পৃষ্ঠা "কৃষ্ণকান্ত নন্দী" প্রস্তাবে লিখিত হইয়াছে যে, কৃষ্ণ কান্ত বাবু প্রভূত বিষয় সম্পত্তি লাভ করিয়া পুরীধামে পুরুষোত্তম দর্শন করিতে যান। সেখানে "আটকে" বান্ধিতে চাহিলে পাণ্ডারা বলে যে, তিনি জাতিতে তেলি—অর্থাৎ তৈল ব্যবসায়ী কলু; অতএব তাঁহার দান গ্রহণ করা হইবেনা। কান্তবাবু বড়ই বিপদে পড়িলেন। কোন মতে বুঝাইতে না পারিয়া শেষে নদীয়া, ত্রিবেণী প্রভৃতি সমাজ হইতে ব্যবস্থা আনিতে লোক পাঠাইলেন। পণ্ডিতগণ ব্যবস্থা দিলেন যে, 'তুলাদণ্ডধারী তৌলিক, মান পত্র ওজন করিতে—তুলা (দাঁড়ি) ধরে বলিয়া তাহাদিগকে তৌলিক বলে। তেলী তৌলিকের অপভ্রংশ মাত্র, তেলীরা কলু নহে।" পুরুষোত্তমের পাণ্ডাগণ ব্যবস্থা দেখিয়া তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আট্‌কে বান্ধিতে দেন।

বিশ্বকোষ-সম্পাদক নগেন বাবু পাণ্ডাদের ন্যায় 'কোনমতে বুঝিতেছেন না' এইটাই গভীর দুঃখের বিষয়।

কিরূপ অসামঞ্জস্যতা দেখিলেন। যে বিশ্বকোষে তেলী শব্দে তিলিকে "কলু" বলা হইয়াছে, আবার সেই বিশ্বকোষেই "কৃষ্ণকান্ত নন্দী" শব্দে তিলিরা "কলু নহে" বলা হইয়াছে। মতদ্বৈত থাকিলে অবশ্যই মন্তব্য প্রকাশ করিতেন।

১। এক্ষণে বিশ্বকোষ-সম্পাদক নগেন বাবুর নিকট জিজ্ঞাস্য—নদীয়া, ত্রিবেণী, প্রভৃতি সমাজের ব্যবস্থা ও বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ এবং পরশুরাম-সংহিতা প্রভৃতির মত গ্রাহ্য করিতে তাঁহার আপত্তি আছে কি?

(ক) যদি থাকে, তাঁহার বক্তব্য কি, জানিতে চাই।

২। বিশ্বকোষে তেলী শব্দের প্রারম্ভেই লিখিত আছে,—"তেলীর অপরাপর নাম তৈলিক, তৈলকার, তৈলপান, ও কলু।"

(ক) তিনি উপরোক্ত কথা কোথা পাইলেন?

(খ) তিলি ও কলু যদি মূলতঃ একই জাতি হয়, তবে তিলিকে আচরণীয় ও কলুকে অনাচরণীয় বলেন কি মতে?

৩। বিহার, উড়িষ্যা, উঃ পঃ প্রদেশে এবং দাক্ষিণাত্যের তৈল-ব্যবসায়ী অনাচরণীয় জাতিকে কেন তেলী বা তিলি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন?

(ক) তাহারা যে কলু নহে, তাহার প্রমাণ কি?

তিলিগণকে কিঞ্চিৎ উচ্চাসন প্রদান করিতে—তিনি খড়্গহস্ত তো বটেনই, এমন কি—তিলিগণকে নবশাখ বা নবশায়কের অন্তর্গত করিতেও তিনি নিতান্ত নারাজ। কারণ তিনি "তেলী" প্রস্তাবের একস্থানে তিলিদিগের উদ্দেশ করিয়া লিখিয়াছেন,—"ইহারা বাঙ্গালার সৎশূদ্র বলিয়া গণ্য ও নবশাখদিগের ন্যায় আচরণ-সম্পন্ন।"

৪। নবশাখদিগের "ন্যায়" বলিবার

তাৎপর্য্য কি? তিনিই তো নবশায়ক প্রস্তাবে লিখিয়াছেন :—

"গোপ মালী তথা তৈলী তন্ত্রী মোদক বারুজী।
কুলাল কর্ম্মকারশ্চ নাপিতো নব শায়কা॥"
(বিশ্বকোষধৃত পরাশর সংহিতার শ্লোক)

আবার কেমন অসামঞ্জস্যতা দেখুন! বিশ্বকোষ তেলী শব্দে যে তিলিদিগকে 'নবশাখদিগের "ন্যায়" আচরণ সম্পন্ন' বলা হইয়াছে, আবার নবশায়ক শব্দে ঐ তিলি জাতিকে নবশায়কের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে বটে, কিন্তু নগেনবাবু ইহাতেও সন্তুষ্ট নহেন। নবশায়ক প্রস্তাবের একস্থানে তিনি লিখিয়াছেন যে, "কার্য্যতঃ কিন্তু এই নয় জাতির সকলকে সমান শুদ্ধ মনে করা হয় না। যেমন, তৈলিক, যদিও নবশায়কের অন্তর্ভুক্ত, তথাপি ইহারা মোদক বা নাপিতের ন্যায় শুদ্ধ নহে।" ইনি একথা জেদ করিয়াই লিখিয়াছেন। ঈর্ষা আর কাহাকে বলে!

৫। তিলি যে মোদক বা নাপিতের ন্যায় শুদ্ধ নহে, একথা উনি কোথা পাইলেন? এ কথার প্রমাণ করিতে পারিবেন কি?

৬। যে তিলিবংশে দাতাকর্ণ-রূপী মহাত্মা কৃষ্ণ পান্তি, অন্নপূর্ণা রূপিণী মহারাণী স্বর্ণময়ী C. I., বঙ্গের সুসন্তান রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর প্রভৃতি জন্মিয়া, তিলি বংশের উজ্জ্বলতা সাধন করিয়াছেন, এবং দানধর্ম্মের কল্পবৃক্ষস্বরূপ কাশিমবাজার রাজগণ, লক্ষ্মী সরস্বতীর বরপুত্র—রাণাঘাটের পালচৌধুরীগণ, দিঘাপাতিয়ার রাজপরিবার, ভাগ্যকুলের ধনকুবের রাজগোষ্ঠী, লৌহজঙ্গ, উলা, শান্তিপুর, নবদ্বীপ, কলিকাতা, শিবপুর, হাওড়া, শ্রীরামপুর, মৌরী, কুমারখালী, আমলাসদরপুর, মালদহ, বগুড়া, সেরপুর প্রভৃতি তিলি মহোদয়গণ এবং ইহাদের সমকক্ষ অনেক মহাত্মা যে তিলি সমাজের অলঙ্কার স্বরূপ বিদ্যমান আছেন,—বিশ্বকোষের বর্ত্তমান সংগ্রহকারের নিকট ইহাঁরা কি এতই হেয় যে, তিনি তিলি জাতীয় প্রবন্ধে ইহাঁদিগকে অসম্মানসূচক "ইহারা" "ইহাদের" প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় বটে!

(ক) কেন ওরূপ লিখিয়াছেন, জানাইবেন কি?

(খ) নিজ জাতির বেলায় ওরূপ হয় নাই কেন? তিলিরা স্বাধীন ব্যবসায়ী জাতি, দাসত্ব আদৌ পছন্দ করেন না, তিলিদের মধ্যে চাকুরে অতি বিরল। ব্যবসায়ী দোকানদার বসিয়া কি নগেনবাবুর নিকট ইহাঁরা এত হেয়?

এ হেন স্বার্থপরতা, পরন্তু পরগ্লানি নগেন বাবুর পক্ষে যারপর নাই নিন্দার বিষয়।

বিশ্বকোষে প্রকাশিত তিলিজাতি সম্বন্ধে ভ্রমাত্মক মত প্রচারে বাধা দেওয়া ও সংশোধন করা প্রত্যেক তিলি মহোদয়ের বিশেষ কর্ত্তব্য। কলিকাতাস্থ "তিলিজাতি সম্মিলনী"রও দৃষ্টিপাত প্রার্থনীয়।

সর্ব্বশেষে বিশ্বকোষ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু মহাশয়ের নিকট বিনীত অনুরোধ যে, হয় তিনি তাঁহার মতের সমর্থন জন্য যুক্তিমূলক প্রচুর প্রমাণ উপস্থিত করুন, নতুবা পূর্ব্বমত প্রকাশ্যে প্রত্যাহার করুন। ইতি

শ্রীহর গোপাল কুণ্ডু।

বংশমর্য্যাদা ও কুলমর্য্যাদা।

যেমন হিন্দুধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম এক কথা নহে, তেমন বংশমর্য্যাদা ও কুলমর্য্যাদা এক কথা নহে। যাঁহার বংশমর্য্যাদা আছে, তাঁহার কুলমর্য্যাদা না থাকিতে পারে; যাঁহার কুলমর্য্যাদা আছে, তাঁহার বংশমর্য্যাদা না থাকিতে পারে। বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ীয়ের অনেকে কুলমর্য্যাদা-সম্পন্ন; উত্তররাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র কুলমর্য্যাদা-শূন্য। তাহা বলিয়া উত্তর রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রের বংশমর্য্যাদা নাই, একথা বলা যাইতে পারে না।

কুল-মর্য্যাদার ভিত্তি হইয়াছে,—

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং
নিষ্ঠাবৃত্তি স্তপোদানং নবধা কুল লক্ষণং॥

এই যে নয়টী কুল-লক্ষণ রহিয়াছে, তন্মধ্যে বংশগৌরবের কোন কথা নাই। বিশেষতঃ ডোম-কন্যার পানি-পীড়ক রাজা বল্লাল সেন যখন এই কুলমর্য্যাদার উদ্ভাবয়িতা, তখন উহাতে উচ্চ বংশত্বের কথা থাকিবার কথা নহে। তিনি প্রথম জীবনে বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিলেন; বৌদ্ধেরা যেরূপ চারিত্র্য-বলই সামাজিক শ্রেষ্ঠত্বের মূলীভূত কারণ বিবেচনা করিতেন, কুল-লক্ষণ উদ্ভাবনে তিনিও সেই চরিত্রবলই মূল ভিত্তি করিয়া গিয়াছেন*।

পক্ষান্তরে বংশমর্য্যাদা স্বতন্ত্র কথা। ইহা অনেকটা আধুনিক অবলম্বিত ইংরেজ-নীতি সদৃশ। মর্য্যাদা নিরূপণ করার জন্য মাননীয় ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রমুখ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কলিকাতায় সে সভা গঠিত হইয়াছিল, তাহাতে স্থির হইয়াছে যে, বর্ত্তমান হিন্দু জাতিগণের মধ্যে কাহার কি মর্য্যাদা, তাহা নিশ্চয় করা কঠিন। তবে হিন্দুরীত্যানুসারে মর্য্যাদা এইরূপ হওয়া উচিত। ১। ব্রাহ্মণ, ২। ক্ষত্রিয়, ৩। বৈশ্য, ৪। শূদ্র।

সুতরাং বংশমর্য্যাদার অর্থ হইতেছে এই,—যে যত উক্ত বর্ণচতুষ্টয়ের অন্তর্গত বা নিকটবর্ত্তী তাহার মর্য্যাদা তদনুরূপ। বঙ্গ ও দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজ কুল মর্য্যাদা অর্থাৎ নিগূঢ় বৌদ্ধনীতির উপর সংস্থিত এবং বারেন্দ্র ও উত্তররাঢ়ীয় সমাজ অনেকটা প্রাচীন হিন্দুনীতির উপর সংস্থিত এবং অধুনাবলম্বিত ইংরেজ নীতির দ্বারা অনুমোদিত।

এই বংশমর্য্যাদা ও কুলমর্য্যাদার বিনি-

---

* ফলে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রন্থে চরিত্রোৎকর্ষের পর যে সকল লক্ষণ কৃতনির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, এই লক্ষণগুলি তাহারই অন্তর্গত,—

১। আচার—Right conduct (Mohavagga 1.6.)

২। বিনয়—Right speech *i.e.* to say truthfullness and gentleness must characterize every word that is uttered (Mahabagga 1.6)

৩। বিদ্যা—Seven kinds of wisdom. Mahaparinirban (3. 65)

৪। প্রতিষ্ঠা—Right exertion *i.e.* to say there must be a lifelong perseverance in doing good, in acts of kindness, gentleness and benificence (Mahavagga. 1.6)

৫। নিষ্ঠা—Right mindfulness *i.e.* to say the mind, the intellect must be active and watchful; a calm and tranquill meditation shall fill the life with peace. (Do)

৬। বৃত্তি—Right means of livelihood (do)

৭। তপঃ—Right meditation. (Do)

৮। দান—Right exertion এর অন্তর্গত

কেবল তীর্থদর্শনের সমতুল্য কিছু দেখিতেছি না। তীর্থদর্শন পরবর্ত্তী বৌদ্ধধর্ম্মের বিকাশ মাত্র। বোধ হয়, ইহা Right belief and Right aspiration এর অন্তর্গত (See Mr. Dutt's Ancient India.)

ময় চলিতে পারে কিনা, ইহাই বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার একটী আলোচ্য বিষয়। জঙ্গীপুর কায়স্থ সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণ বল্লভ রায় মহাশয় উক্ত সভার-তৃতীয় সাধারণ অধিবেশনে এই বিষয়ের প্রস্তাবকারক বক্তা নির্দ্দিষ্ট হইয়া 'বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ" নামে এক খানি সুন্দর পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। আমি যখন বঙ্গজ কায়স্থ সমিতির কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য দায়ী এবং রায় মহাশয়ের অব্যবহিত পাড়াবাসী, তখন ঐ পুস্তকের সংগ্রহ কাল হইতেই যে আমি উহার মর্ম্ম অনেকটা অবগত আছি, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু রায় মহাশয় যখন, জঙ্গীপুর কায়স্থ সমিতিতে বৈবাহিক সম্মিলন প্রস্তাব যে ভাবে গৃহীত হইয়াছে, তাহার অন্যথাচরণ পূর্ব্বক বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার বহিষ্করণ নীতির সমর্থন করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তখন আমার এই প্রবন্ধে তাঁহার পুস্তকের স্থান বিশেষের আলোচনা করিতে আমি কর্ত্তব্যতঃ বাধ্য।

কিন্তু এই সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আমাকে এ কথা বলিতে হইবে যে, রায় মহাশয়ের কায়স্থ-তত্ত্বজ্ঞতা সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধা কম নহে। বরঞ্চ এই চতুঃষষ্টি বর্ষবয়স্ক বৃদ্ধের অধ্যবসায় দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়াছি। তাঁহার ন্যায় অধ্যবসায়ী ও কায়স্থ-কার্য্যে অর্থব্যয়ে সোৎসুক ব্যক্তিগণের সংখ্যা অধিক থাকিলে আমরা এতদিনে গন্তব্য পথে অনেকদূর অগ্রসর হইতে পারিতাম।

পুস্তকের প্রথম তিন অধ্যায়ে কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন জন্য তিনি যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা সমীচীন না হইলেও, কায়স্থগণের পক্ষে তাহা ধন্যবাদার্হ, সন্দেহ নাই। বংশ মর্য্যাদার কথা উপলক্ষে যখন ক্ষত্রিয়ত্বও আসিয়া পড়িবে, তখন এ বিষয়ে দুই একটী কথা বলা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক নহে।

প্রথমতঃ তিনি কায়স্থ শব্দের ব্যুৎপত্তি লিখিতে গিয়া বলিতেছেন ;—

"ককারং ব্রাহ্মণং বিদ্যাদাকারং নিত্যসংজ্ঞকং।
আয়স্থ নিকটং জ্ঞেয়ং তত্র কায়ে হি তিষ্ঠতি।
কায়স্থোতঃ সমাখ্যাতঃ মশীশং প্রোক্তবাংশ্চায়ং।"

"অর্থাৎ ক শব্দে ব্রহ্মা, আদেশ নিত্য, য় শব্দে নিকট, স্থ অর্থে স্থিত, ব্রহ্মার নিত্য নিকটস্থ অর্থাৎ কায়স্থিত বলিয়া কায়স্থনামে খ্যাত হইয়াছেন।" বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ ৩ পৃষ্ঠা।

উপরোক্ত বচন সত্যপ্রকাশক নহে এবং ইতরোচিত সংস্কৃত। উহা উদ্ধৃত করিয়া পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করা উচিত হয় নাই।

তবে আমরা কায়স্থ পত্রিকায় কায়স্থ শব্দের যেরূপ একটী অর্থ দিয়াছি, তিনি সে অর্থও গ্রহণ করিয়াছেন।

"ক্ষত্র শব্দেন কায়ং স্যাদ ইয়েতি স্থিতিবাচকঃ।
ততঃ ক্ষত্রিয় শব্দেন কায়স্থ ইতি বোধ্যতে।

অর্থাৎ ক্ষত্র = কায় ; ইয় স্থিতিবাচক। অতএব ক্ষত্রিয় ও কায়স্থ শব্দ অভিন্নার্থে প্রযুক্ত।

(বঃ কাঃ ১ঃ ৪ পৃষ্ঠা)

হিন্দু জাতীয় দেহের সর্ব্বত্র হইতেই কায়স্থ জাতি সঙ্কলিত হইয়াছেন ; ক্ষত্রিয় জাতিও এইরূপেই সঙ্কলিত হইয়াছিল। ক্ষত্রিয়ই বল কায়স্থই বল, উভয়েই ব্রাহ্মণাদি ৪ বর্ণের মিশ্রণ আছে, এ কথা জানিয়াও বাচালতা করার কি প্রয়োজন ছিল ?

কায়স্থজাতির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাও নির্দ্দোষ নহে।

যাবন্মেরৌ স্থিতাদেবা যাবদ্ গঙ্গা মহীতলে।
চন্দ্রার্কৌ গগনে যাবৎ তাবৎ কায়স্থ কুলে বয়ং!
(ব কা স-১৭পৃ)

বাবা!! এ যে তিলকের Artic Home এর কথা আসিয়া পড়িল।

নৈশ অন্ধকার পারে এসেছি আমরা,
চেতনা দিলেন সবে উষা মনোহরা,

অতারিষ্ম তমসস্পার মস্যোষা উচ্ছন্তী বয়ুনা কৃণোতি
শ্রিয়ে ছন্দো ন স্ময়তে বিভাতী সুপ্রতীকা
সৌমনসায়াজীগঃ ।।৬
ঋগ্বেদ ১ম, ৯২ সূক্ত।

উপচ্ছন্দয়িতা যথা আঢ্যের সমীপে
হাসে, তথা হাসিছেন উষা স্বীয়রূপে;
আলো বিকশিত-অঙ্গে শোভন-শরীরে
করেন হর্ষিত মন হরিয়া তিমিরে।

বেদসংহিতা ২য় খণ্ড, অমুদ্রিত ঋগ্বেদ ১।৯২।৬

"নৈশ অন্ধকার-পারে আমরা আসিয়াছি" এই মন্ত্রাংশ প্রদর্শন করিয়া মহামতি তিলক বলিতে চাহেন যে, মেরু প্রদেশস্থিত কোন ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কেহ এ কথা বলিতে পারেন না। সচরাচর এ প্রদেশীয় ১২ ঘণ্টা রাত্রির পরে প্রভাত সময়ে এরূপ কথা বলা চলে না। ছয় মাস স্থায়ী রাত্রির পরে অর্থাৎ মেরু প্রদেশে থাকিয়া রহুগণের পুত্র গোতম ঋষি একথা বলিয়াছিলেন। সুতরাং মেরু প্রদেশে গোতমাদি ঋষিগণ দেব পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিতেন। দেব বংশীয় গোতম গোত্রীয় রায় মহাশয়ের লোলুপজিহ্বার নিকট হইতে এরূপ একখণ্ড উপাদেয় খাদ্য এড়াইয়া যাইবে কি প্রকারে? কাজেই তিনি কায়স্থোৎপত্তি ল্যাপল্যাণ্ড দেশে নিয়া ফেলিয়াছেন।

অথবা উদ্ধৃত শ্লোকের এও অর্থ হইতে পারে যে, যখন প্রাচীন আর্যাগণ মেরুদেশে থাকিয়া উষাদি দেবতার অর্চ্চনা করিতেন, সেই প্রাচীন কালেই ভারতবর্ষে কায়স্থোৎপত্তি হইয়াছিল। ইহাতে কায়স্থোৎপত্তির সহিত আর্য্যঋষিগণের কি সম্বন্ধ থাকে, রায় মহাশয় ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? আর একজন দেবত্বাভিলাষী (ভূপতি) রায় মহাশয় কায়স্থ জাতিকে সূত মাগধ প্রভৃতি সূত্রোক্ত প্রতিলোমজ সঙ্কর বর্ণের সদৃশ বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। উভয় রায় মহাশয়ই দেবত্বের আকর্ষণে কায়স্থ জাতিতে আর্য্যত্বের বহির্ভাগে ফেলিয়া যে চূড়ান্ত মূল্য প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাহা দখিয়া আমরা অবাক্ হইয়াছি।

আমরা জানি যে আমরাও বাল্যকালে "যাবন্মেরৌ স্থিতা দেবাঃ" ইত্যাদি শ্লোক আওড়াইতাম। উহা কায়স্থের পক্ষে একটুক বিশেষ রকমের ওকালতি। বোধ হয় কায়স্থ জাতিগণের পর, কায়স্থের আধুনিকত্ব সম্বন্ধে নানাদিক হইতে প্রশ্ন হইতে লাগিলে কোন মূর্খ কুলজীকার অথবা কোন কায়স্থ গুরু-মহাশয় কায়স্থ বালকগণকে উক্ত গর্ব্বিত বাক্য শিক্ষা দিতে থাকেন এবং তদবধি উহা কায়স্থ সমাজে কতকটা লব্ধপ্রবেশ হইয়া আসিয়াছে। রায় মহাশয়ের এমন একখানি প্রয়োজনীয় গ্রন্থে এরূপ অযথা গর্ব্বিত বাক্যের সমাবেশ হওয়ায় কায়স্থ কার্য্যের গাম্ভীর্য্যের ব্যাঘাত জন্মাইয়াছে।

তবে কায়স্থোৎপত্তি যে ক্ষত্রোৎপত্তির অনেক পরবর্ত্তী, ইহা তিনি অবিদিত নহেন। কেননা, তিনি ঋগ্বেদের ১০ মণ্ডলের ৯০ সূক্তের ১১।১২ ঋক্ উদ্ধৃত করিয়া বর্ণভেদের মূলতত্ত্ব উদ্ঘাটিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন;—

যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন।
মুখং কি মস্য কৌ বাহূ কা উরূ পাদা উচ্যেতে।।

ব্রাহ্মণ্য মুখমাসদ্বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূতদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥

আমি ইতঃপূর্ব্বে পুরুষসূক্তের সমালোচনায় এবং একটী কায়স্থ প্রবন্ধে বলিয়াছি, উহা বৈদিক সময়ে লিখিত হয় নাই এবং উহাতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের উল্লেখ দেখিয়া বেদবর্ণিত সময়ে চারিবর্ণ-ভেদ হইয়াছিল বুঝিতে হইবে না। সুতরাং ঐ দুই ঋক্ সম্বন্ধে অধিক কিছু বলার প্রয়োজন নাই। তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, দশ সহস্রাধিক ঋঙ্‌মন্ত্র মধ্যে "ব্রাহ্মণ" শব্দ ৫৬ বার ব্যবহৃত হইয়াছে। "ক্ষত্র" "সুক্ষত্র" ও "বিশ" শব্দের বহু ব্যবহার দেখা যাইতেছে। কিন্তু "শূদ্র" শব্দ উক্ত দুটী প্রক্ষিপ্ত ঋক্ মধ্যে ভিন্ন অন্য কুত্রাপি পাওয়া যাইতেছে না; সুতরাং বেদ-বর্ণিত সময়ে "শূদ্র" জাতির সংগঠন হয় নাই। অর্থাৎ বর্ণভেদই হয় নাই। যে জাতি হইতে ভবিষ্যতে শূদ্রোৎপত্তি হয়, সে জাতির সাধারণ নাম হইয়াছে "দাস"। বেদে "দাসবর্ণ" ও "আর্য্যবর্ণের" উল্লেখ আছে। কিন্তু তাহাও বর্ত্তমান সময়ের জাতিভেদের অর্থে নহে।

কিন্তু কৃষ্ণবল্লভ বাবু বেদবর্ণিত সময়ে ক্ষত্রোৎপত্তি এবং শুক্ল যজুর্ব্বেদ সংগ্রহের পূর্ব্বে কায়স্থোৎপত্তির ইঙ্গিত করিয়াছেন। যজুর্ব্বেদ সংগ্রহের অনেক পরে আশ্বালয়ন, পারস্কর, গৌতম, গোভিলাদির সূত্রসাহিত্য রচিত হইয়াছিল। এই সব সাহিত্যেও মূল ৪টী জাতি ও কয়েকটী করিয়া সঙ্করবর্ণের উল্লেখ আছে। কিন্তু তাহাতে কায়স্থের উল্লেখ নাই। মনুতেও করণের উল্লেখ থাকিলেও কায়স্থের উল্লেখ নাই। সুতরাং কায়স্থোৎপত্তির অযথা প্রাচীনত্ব প্রদর্শন করিতে যাওয়া তাঁহার ন্যায় একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির উচিত হয় নাই।

শুক্ল যজুর্ব্বেদের ২০ হইতে ২৭ কণ্ডিকার স্থানে স্থানে বিবিধ ব্যবসায় ও স্বভাবের লোকের উল্লেখ দেখা যায়। যথা অশ্বারোহী, রথারোহী, সূত্রধর, রথকর, কুম্ভকার, নিষাদ, নানা রকমের চোর ইত্যাদি। পরিশিষ্টে * ও বিবিধ রকমের ব্যবসায় ও অবস্থাপন্ন লোকের উল্লেখ আছে। যথা নৃত্যকর, বক্তা, বাণ-নির্ম্মাতা, লম্পট, কানীনপুত্র, জহরী, কৃষক, ধনুর্নির্ম্মাতা, বামন, খঞ্জ, অন্ধ, বধির, চিকিৎসক, গণক, অশ্বাদির মাহুত, ভৃত্য, পাচক, কাষ্ঠসংগ্রাহক, চিত্রকর, ভাস্কর, রজক, রঙ ব্যবসায়ী, নাপিত, বিদ্বান, অহঙ্কারী, ভিন্ন ভিন্ন রকমের স্ত্রীলোক, চর্ম্মকার, ধীবর, ব্যাধ, শিকারী, স্বর্ণকার, কবি ইত্যাদি। এই সকল ব্যবসায় বা লোকের অবস্থা বা স্বভাব জ্ঞাপক বিশেষণ মধ্যে কায়স্থ বা কায়স্থের ব্যবসায়েরও উল্লেখ নাই।

যখন এ সময়ে লেখ্য বৃত্তিরই সৃষ্টির প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না, তখন মসীজীবী ক্ষত্রিয়ের স্বতন্ত্র জাতিত্ব সংঘটিত হইয়াছিল, এ কথা বলা যাইতে পারে কি প্রকারে? তবে তিনি যে বঙ্গবাসী পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত করিয়া যজুর্ব্বেদের একটী প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা সমর্থনের অন্য কি প্রমাণ যজুর্ব্বেদে আছে এবং তাহা না থাকিলে উহা যে প্রক্ষিপ্ত নহে, ইহা বুঝাইয়া দেওয়ার কি উপকরণ আছে, তাহা কি আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি?

সে যাহা হউক, তিনি যখন কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দিহান এবং আমরাও

* পরিশিষ্ট অনেক পরে লিখিত।

যখন কায়স্থের ক্ষত্রোৎপত্তি সম্বন্ধে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছি, তখন তাঁহার পুস্তকের এ অংশ লইয়া তর্কবৃদ্ধি করিবার আবশ্যক নাই।

কিন্তু তিনি যে স্থানে বংশমর্য্যাদার সহিত কুলমর্য্যাদার বিনিময় প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন, সে স্থানে আমাদের গুরুতর আপত্তি আছে।

কুলমর্য্যাদার মূল্য নিরূপণ করার জন্যই যেন তিনি বলিতেছেন, তবে একটুক বক্র ভাবে—

"যাহার বিংশতি লোকে বল্লাল মর্য্যাদা।
নয়শ চৌরানব্বই শকে না ছিল একদা।"

(বঃ কাঃ স ৪৭ পৃঃ)

এই দুটী পংক্তি আমরা পূর্ব্বে নব্যভারতে উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। ইহার অর্থ হইতেছে এই যে, ৯৯৪ শকে অর্থাৎ ১০৭২ খ্রীষ্টাব্দে যে ২০ জন লোকের একদা মর্য্যাদা ছিল না, তাঁহারা বল্লালী মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১০৮৮ খ্রীষ্টাব্দে বল্লাল মর্য্যাদা বিতরণ করেন, ইহাও রায় মহাশয়েরই উক্তি।

রায় মহাশয়ের গস্পেল হইয়াছে ঢাকুর। ঐ পংক্তিদ্বয়ও ঢাকুরের। ঢাকুর ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল, অর্থাৎ উহা বর্ত্তমান সময়ের প্রায় ২৫০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ।

এই দুটী পংক্তি হইতেই ঢাকুরের অপর দুটী প্রসিদ্ধ পংক্তি আকৃষ্ট হইতেছে ;—

শূদ্রেরা পাইল কুল কায়স্থ নিন্দিত।
আপন প্রভুত্ব বলে করে অনুচিত।

পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে যে, কুল-লক্ষণের মধ্যে শূদ্রের বহিষ্করণ নীতি অবলম্বিত হয় নাই। বঙ্গজ আর্য্য জাতীয় আভিজাত্যের পুনরুদ্ভব অঙ্কুরে বিনষ্ট করিয়াই যেন কুল-লক্ষণ সংস্থিত হইয়াছিল এবং সেই লক্ষণানুসারে ডোম কন্যার পাণিপীড়ক কর্ত্তৃক মর্য্যাদা-সম্পন্ন ২০ জন লোক—তাঁহারা ব্রাহ্মণই হউন আর কায়স্থই হউন—শূদ্রত্ব বিরহিত ছিলেন, এ কথা কে বিশ্বাস করিবে? একাদশ শতাব্দীর কথা দূরে থাকুক, যখন ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে মহারাজ বঙ্গজ কুলীন কায়স্থ প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত বসন্তরায়ের পুত্র কচুরায়ের ভ্রাতা এবং তাঁহার একজন বয়স্য রূপরাম বসুর পুত্র ধীবর-কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন, তখন কৌলীন্য শূদ্রত্ব-শূন্যত্বের জ্ঞাপক, এ কথা বাতুল ভিন্ন বিশ্বাস করিতে পারে না।*

এই কথার সমর্থন প্রদর্শনের জন্যই যেন পুনশ্চ বক্রভাবে রায় মহাশয় উত্তররাঢ়ীয় কুলতত্ত্বের মূল প্রবাদ উদ্ধৃত করিয়াছেন ;

বিপ্র পঞ্চ করণ পঞ্চ ভৃত্য পঞ্চজন।
ত্রিপঞ্চতে উপস্থিত আদিশূরের ভবন॥

(বঃ কাঃ স—৮১ পৃঃ)

ব্রাহ্মণ বৈদ্য ও অন্যান্য জাতীয় কুল-গ্রন্থ গুলিতে আদিশূরের যজ্ঞাগত ব্যক্তিগণের মধ্যে কায়স্থ কুলীনগণের আদি পুরুষ পাঁচ ব্যক্তিকে পাঁচ ব্রাহ্মণের ভৃত্য বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। উত্তররাঢ়ীয়গণ বলিয়া আসিতেছেন যে, যে পাঁচ জন "করণ" আদিশূরের যজ্ঞে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের সন্তান তাঁহারাই ভৃত্য পাঁচ জনের সন্তান

---

* যশোহরের জিৎরায় অর্থাৎ কচুরায় বর্ত্তমানে তাঁহার ভ্রাতা চাঁদরায় এক ধীবরকন্যাকে পদ্মিনী ও পরম রূপবতী দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, তাহার প্রণয়ে বদ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করিলেন। তাঁহার বয়স্য রূপরাম বসুর পুত্র ঐ ধীবরের দ্বিতীয় কন্যার পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১ ✓ রামকুমার ঘোষের কায়স্থপুরাণ নির্ণয়।

৮৯ পৃষ্ঠা।

দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলীনেরা। রায় মহাশয় ইহার একটুক টিপ্পনী কাটিয়াছেন সত্য, কিন্তু উহা উত্তরাঢ়ীয়গণের বিশ্বাসানুমোদিত নহে।

এই প্রকারে বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ীয় বল্লালী কুলপ্রাপ্তগণের মর্য্যাদা হ্রাসের যে সকল উপকরণ বল্লালীকুলশূন্য সম্প্রদায়-দ্বয়ের গ্রন্থ মধ্যে পাওয়া গিয়াছে, তাহা তিনি কৌশল ক্রমে উপস্থিত করিয়াছেন। যদি সৎসাহসের সহিত তিনি এরূপ করিতেন, তবে কায়স্থ সভার বহিষ্করণ নীতি তাঁহার দ্বারাই অনেকটা নিবারিত হইত। কিন্তু তাহাই বা করেন কি প্রকারে? বারেন্দ্র-নেতৃগণ ইতঃপূর্ব্বে অতি নির্লজ্জভাবে তাঁহা-দের সহিত ক্রিয়া কর্ম্মে সংশ্লিষ্ট বহু কায়-স্থকে কায়স্থাখ্যার বহির্ভূত অন্ততঃ বারেন্দ্র কায়স্থের অন্তর্গত নহে বলিয়া কায়স্থ সভায় প্রকাশ করিয়াছেন, কাজেই তিনি কায়স্থ সভার বহিষ্করণ নীতিজালের মধ্যে মাকড়শার ন্যায় বিজড়িত হইয়া বক্রভাবে যতদূর সাধ্য, বঙ্গজ ও দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কুলীনগণের নিন্দাবাদ করত, তাঁহাদেরই নীতিসূত্রে ঝুলিতেছেন। এজন্যই যে ঢাকুরে তাঁহাদের কৌলীন্যের হানিজনক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, সেই গ্রন্থকে, তাঁহার গল্পেশকে, নাককাটা কাণ-কাটা করিয়া কায়স্থ পত্রিকায় পুনঃ মুদ্রিত করিতেছেন। ঢাকুরের সকল কথা যদি বিশ্বাসযোগ্য না হয়, তাহার কিয়দংশ অব-লম্বন করিয়া কোন কোন বংশের মর্য্যাদা-কাহিনী, যাহা নিনাদিত করা হইতেছে, তাহাই বা বিশ্বাস করা যাইবে কি প্রকারে?

বঙ্গজ ক্ষীণকুল অর্থাৎ কুলজগণের প্রতিও তাঁহার কটাক্ষ কম তীব্র নহে। যে যে কারণে বঙ্গজ কুলীনেরা কুলচ্যুত হইয়া ক্ষীণকুল বা কুলজ হইয়াছেন, তন্মধ্যে তিনি চারিটী প্রধান কারণ নির্দ্দেশ করেন।

(১) বিপর্য্যায় বিবাহ।

(২) রণ্ডা কন্যা বিবাহ।

(৩) পৌষ্যপুত্রে কন্যাদান।

(৪) ডেঙ্গরা কায়স্থের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন।

তাঁহার নিজের ভাষায়ই আমরা এ স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি।

"কুলীনগণ বিপর্য্যায় বিবাহ করিলে কি কন্যার বিবাহ দিলে কুল থাকিবে না। বাগ্দত্তা কন্যার নির্ব্বাচিত বরের সহিত বিবাহ না হইলে ঐ কন্যা রণ্ডা নামে খ্যাত হয়। বংশহীন ব্যক্তিকেও রণ্ডা বলে। ঐরূপ রণ্ডা কুল-কন্যাকেও বিবাহ করিলে কুল থাকিবে না। কুলীনের পৌষ্য-পুত্রে যদি অপর কুলীন কন্যা দান করেন, তবে তাঁহার কুল নষ্ট হইবে। শত কুলকার্য্য দ্বারাও তাহার খণ্ডন হইবে না। ডেঙ্গরা কায়স্থের লক্ষণ এই যে, প্রাচীন কালে প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত বংশীয়েরাই শূদ্র দাসীকে পরিবৃত্তি ভার্য্যারূপে ব্যবহার করিতেন। তাহাদিগের গর্ভজাত সন্তানেরাও বৈধ পুত্রের ন্যায় পিতার পরিবারভুক্ত হইত এবং পিতার উপাধি ও গোত্রে পরিচিত ও ভরণ পোষণ প্রাপ্ত হইয়া ঐ পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগের দাসত্ব কার্য্য সম্পাদন করি-তেন। পিতার মুখ্য উত্তরাধিকারী না থাকিলে ঐ সকল পরিবৃত্তি ভার্য্যাজাত অর্থাৎ দাসী গর্ভজাত সন্তানেরাই ধনাধিকারী হইত। রাজা চন্দ্রগুপ্ত ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। ঐরূপ দাসী গর্ভজাত সন্তানগণও ধনীর সম্পত্তি স্বরূপে গণ্য হইত। দায়ভাগ ও মিতাক্ষরা গ্রন্থে ইহার বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। গৌড়দেশীয় প্রাচীন কায়স্থ-গণের এই শ্রেণীর ভৃত্য অনেক ছিল

এবং এখনও বর্ত্তমান আছে। কিন্তু এক্ষণে তাহারা পূর্ব্বমত পরিবারবর্গ ভুক্ত না থাকিয়া স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছে। অধুনা এতদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত কায়স্থদিগের দাসত্ব কার্য্যে যে এক শ্রেণীর লোক নিযুক্ত আছে, তাঁহারা দেব,দত্ত,দাস, ইত্যাদি উপাধারী কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে, তাহারাই ঐ দাসী গর্ভজাত সন্তানের বংশধর। ইহাদিগকেই চন্দ্রদ্বীপ সমাজে ডেঙ্গরা কায়স্থ বলে।" বঃ কাঃ সঃ—৭৩ পৃষ্ঠা।

চন্দ্রদ্বীপের কুল-প্রথানুসারে চন্দ্রদ্বীপের সীমার বহির্ভাগে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহারা কুলীন হইলেও কুলজ বলিয়া উক্ত সমাজের নিকট হীনমর্য্যাদা-সম্পন্ন হইয়া থাকেন। কিন্তু একথাটী রায় মহাশয়ের গ্রন্থে দেখা যাইতেছে না। যে পঞ্চবিধ কারণে বঙ্গজ সমাজে ক্ষীণকুল বা কুলজগণের উৎপত্তি হইয়াছে, তন্মধ্যে "পৌষ্যপুত্রে কুলং নাস্তি" কারণে মিত্রবংশ কুলজ হইয়া পড়িয়াছেন। আর চতুর্বিধ কারণে যাঁহাদের কুলক্ষয় ঘটিয়াছে, তাঁহাদের একটী একটী পৃথক্ তালিকা না করিয়া কি প্রকারে তাঁহার সমীকরণ প্রস্তাব কাজে আসিবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। বিশেষতঃ এই সকল কুলজগণের মধ্যে "ডেঙ্গরা কায়স্থ সংশ্রবে যাঁহাদের কুল নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিম্বা রায় মহাশয়ের বিচারে হইবে, তাঁহাদের সংখ্যা বারেন্দ্র ৭ ঘর কায়স্থের জনসংখ্যার কত শত গুণ অধিক, তাহা কি রায় মহাশয়ের ধারণা আছে? (১) এই শ্রেণীর লোকের স্থান অন্যান্য শ্রেণীর কুলীন বা শ্রেষ্ঠবংশীয়গণের উচ্চে কি নিম্নে, কি তুল্য ভাবে নিরূপিত হইবে, ইহার বিচারেই রায় মহাশয়ের সমীকরণ স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইবে, এইরূপই আমরা মনে করিতেছি।

চারি শ্রেণীর সমীকরণ প্রস্তাব করিতে যাইয়া "ডেঙ্গরা কায়স্থ" সংশ্রবে যাঁহাদের কুল নষ্ট হইয়াছে, বক্রভাবে তাঁহাদের উল্লেখ করার কি প্রয়োজন ছিল,বুঝিতে পারি না। তবে একটা প্রয়োজন মনে এই হয় যে, তিনি গোত্র-প্রবরের সাম্যতা বশতঃ বারেন্দ্র শ্রেণীর ১নং দেববংশ (চাকি)কে বঙ্গজ বসু বংশের সমতুল্য করিতে চাহেন। কিন্তু বঙ্গজ সমাজে সেই গোত্র ও প্রবরের (২) কুলজ এমন কি ডেঙ্গরা বসুও আছে; ইহাদের উপর ১নং দেববংশের স্থান হওয়া তিনি আবশ্যক মনে করেন। বোধ হয়, এই কারণে তিনি "ডেঙ্গরা" কায়স্থের সংশ্রবঘটিত দোষের উল্লেখ করিয়াছেন।

লোকগণনার কাগজে বঙ্গজ কায়স্থগণের বসতি বিশিষ্ট প্রধান প্রধান জেলা গুলিতে কায়স্থ ও শূদ্র বলিয়া দুটী পৃথক্ জাতি সংখ্যাকরণ হইয়াছে। যদি ধরা যায়, এই শূদ্র জাতিই সেই "ডেঙ্গরা কায়স্থ," সম্ভ্রান্ত কায়স্থগণের দাসী গর্ভজাত সন্তান, তাহা হইলে বঙ্গজ কায়স্থগণের যে এক সময়ে কিরূপ দাস দাসী সমন্বিত গৌরবান্বিত অবস্থা ছিল, তাঁহারা যে কিরূপে বিজেতৃ বেশে আসিয়া এদেশের লোককে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নলিখিত,কয়েকটী জেলার কায়স্থ ও শূদ্রগণের জন-সংখ্যার অনুপাত দৃষ্টেই উপলব্ধি হইবে।

(১) রায় মহাশয় বলেন,বারেন্দ্র প্রথম তিনঘরে ১০০ পুরুষ ও পশ্চাদবর্ত্তী চারি ঘরে ১৫০ পুরু লোকের অধিক নাই।

(২) গৌতম গোত্র, প্রবর গৌতম, আঙ্গিরস, আপসার, নৈধ্রুব।

		কায়স্থ।	শূদ্র।
(১)	বরিশাল	৭৮১৬৮	৩৫,৭২৭
(২)	ঢাকা	৮৫৯৬৩	৩৭,১৬৭
(৩)	মৈমনসিংহ	১১০১৮০	১৮,৬৬০
(৪)	ফরিদপুর	৮৪৬২৪	১,২৯০
(৫)	ত্রিপুরা	৭০৪১৩	২১,২৭১
(৬)	নোয়াখালী	৩৪০১৮	১২,৮২৭
(৭)	চট্টগ্রাম	৭১৪২১	৫৭৫৯৩
		৫৩৪৭৮৭	১৮৪৪৬৪

ইহা দ্বারা দেখা যায় যে, উপরোক্ত ৭টী জেলায় কায়স্থ শূদ্রের অর্থাৎ প্রভু চাকরের কিম্বা জেতা বিজিত দাসের অনুপাত প্রায় ৩:১। এই সকল ব্যক্তিগণের অধিকাংশের উপাধি দাস। তবে দেব, দত্ত, দাম, বসু ও গুহ প্রভৃতি উপাধিও আছে। আমার স্বর্গীয় খুল্লতাত এতাদৃশ একজন দত্তকে কোন একটী আদালতের মোকর্দ্দমায় এজলাসে "গোলাম" বলাতে ফৌজদারী আইনানুসারে বিচারিত হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রমাণ প্রয়োগে তিনি অব্যাহতি পান। এই শ্রেণীর গৌতম গোত্রীয় একজন বসু আমার কন্যার বিবাহে "পাট" ধরিয়াছিল। আমি অন্যের কথা বলিতে পারি না, আমার নিজের কথা এই যে, আমরা পিতা পুত্রে গত ৪০ বৎসরে এই শ্রেণীর দাস ও দত্ত বংশীয় ৭।৮ ঘর লোকের সহিত বিবাদ করিয়া আসিতেছি; বিবাদের মূল কারণ, তাহারা দাসত্ব বৃত্তিতে অস্বীকৃত, আমরাও তাহা দাবি করিয়া আসিতেছি। বিবাদের ফলে তাহারা ৫।৬ ঘর বাস্তুশূন্য হইয়া উঠিয়া গিয়াছে এবং আমারও পৈতৃক গৃহগুলি ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। এজন্য আমি কায়স্থ সভাকে সানুনয়ে নিবেদন করিয়াছি যে, এই শ্রেণীর লোকের সহিত কুল-বিবাদে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহারা যে জাতীয়তার বৃহদ্‌ট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে রত হইতেছেন, অচির কাল মধ্যে তাহা ভস্মীভূত হইবার সম্ভাবনা আছে।

এই শ্রেণীর লোকের সহিত সহানুভূতি প্রকাশের আমার কোন ব্যক্তিগত কারণ নাই। কিন্তু তথাচ আমাকে বলিতে হইতেছে, ইহারা সকলে দাসীপুত্র নহে। হইতে পারে, তাহারা বঙ্গজ স্বাধীন দেব বংশীয় কায়স্থ ভূপতিগণের কর্ত্তৃক জিত সম্প্রদায়, হইতে পারে, তাহারা গোলাম বা ক্রীতদাস, কিন্তু এতগুলি লোককে দাসীপুত্র বলা সত্য-বিরোধী। রায় মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, বঙ্গজ কায়স্থগণ মধ্যে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের যদি এতগুলি দাস দাসী ছিল এবং এখনও আছে, বারেন্দ্র, দক্ষিণ-রাঢ়ীয় ও উত্তর রাঢ়ীয় সম্ভ্রান্ত কায়স্থগণের কি একটীও দাস দাসী ছিল না? এই তিন শ্রেণীর অধ্যুসিত জেলা গুলিতে একটীও "ডেঙ্গুরা কায়স্থের নাম নাই কেন? ইহারা ত গোত্র প্রবর বদল করিয়া উচ্চ শ্রেণী দাস দেবাদি ঘরের সঙ্গে মিশিয়া যায় নাই?*

ফলে বঙ্গজ শ্রেণীর অধিরোহণ ও অবরোহণ প্রণালী অনেকটা ব্রাহ্মণ সদৃশ। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে আজ যে পাচক, দ্বারবান্ কিম্বা অন্যবিধ ভৃত্যত্বোপজীবী, তাহার গোত্র প্রবর বদল করিয়া কোন দিন উচ্চ হইবার

* পাবনা ৩০৪৪৭, নদীয়া ৩০৫৭৮, রাজসাহী ৬৩৩১, রঙ্গপুর ৮৫৬৫, বগুড়া ৩৮০২, যশোহর ৫৫৪০৯, খুলনা ৩৯৩৮৫, ২৪ পরগণা ৩৪১৭৭, দিনাজপুর ৫৬১৭, জলপাইগুড়ী ১৯৪৫—মোট ২২৮৬৩৮ কায়স্থ জন সংখ্যা আছে। কিন্তু এই সকল জেলার কোথাও একটী শূদ্র নাই। সেইরূপ হুগলী, বর্দ্ধমান, মুরশিদাবাদ জেলারও শূদ্র দেখা যায় না।

আবশ্যক হয় না। এতাদৃশ কোন ব্যক্তির পুত্র বিদ্বান বা বিত্তবশালী হইলে তিনি উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণবংশের সহিত আদান প্রদান করিতে পারেন। বঙ্গজগণের মধ্যে আজ যে নাবিক বৃত্তি করিতেছে, অর্থ হইলে সে উৎকৃষ্ট কুলীনের সহিত আদান প্রদান করিতে পারে, এজন্য তাহার গোত্রাদি পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হয় না। কেন না বঙ্গজ কায়স্থের সীমা অনন্ত, তন্মধ্যে ব্যক্তিগত ও বংশগত স্বাধীনের সঙ্কোচ হওয়ার সম্ভাবনা কোথায়? বঙ্গজ কায়স্থ চট্টোগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশেই বাস করুন, আকীয়াবেই দোকানদারী করুন, কিম্বা আসাম-প্রান্তেই চাকরী করুন, তাঁহার অধিরোহণ বা অবরোহণ উপরোক্ত বিধানে নিয়মিত হয়। কিন্তু বারেন্দ্র ও উত্তরবাঢ়ীয় কায়স্থগণের মধ্যে যথাক্রমে ৭টী ও ৯টী ঘরে পটী বন্ধন হওয়াতে, এই ৭টী ও ৯টী ঘরের বহির্ভূত অন্যান্য কায়স্থেরা, অর্থ হইলে, আপনার ইচ্ছামত উক্ত ৭ বা ৯ ঘরের যে কোন ঘরের পদবী ও গোত্র গ্রহণ পূর্ব্বক আদান প্রদানের শৃঙ্খলাবলম্বনে বে-মালুম উচ্চ ঘরের কায়স্থ হইয়া বসেন। দক্ষিণরাঢ়ীয়ের নীতি বঙ্গজ ও এই দুই শ্রেণীর নীতির মধ্যবর্ত্তী।

এই প্রকারে বঙ্গজের মধ্যে অধিরোহণ ও অবরোহণের জন্য বংশ ও গোত্র-স্বাধীন্যের বিনাশ নাই, বক্র প্রণালী নাই। দাস দত্ত দাস কর, ধর, যেরূপ ঘরই হউক না, অর্থ হইলে তাহার বাটী কুলীনের আড্ডা হইয়া উঠে। পক্ষান্তরে বসু গুহও অবস্থাবৈগুণ্যে অবরূঢ় অবস্থায়ও বসু গুহই থাকে। দক্ষিণরাঢ়ীয়ের ত্রিসপ্ততি ঘরের মধ্যে অনেক গুলি ঘর বিলুপ্ত হইয়াছে বলিয়া কায়স্থ সভায় কাগজাদিতে প্রকাশ। বোধ হয়, এই এই সকল ঘরগুলি বহুদিন হইতেই উত্তরবাঢ়ীয় প্রণালী অবলম্বন করিয়া উচ্চ ঘর গুলিকে যেমন কলুষিত, তেমনি সম্ভার প্রাপ্ত করাইয়া মধ্যবর্ত্তী গুলিকে নিস্তেজ করিতেছেন এবং তাহা দেখিয়াই মহামতি পুরন্দর খাঁ সর্ব্ব অধস্তন ঘরের সহিত আদান প্রদান সঙ্গত বলিয়া বিধান করিয়াছেন, অথচ সেই বিধান সত্ত্বেও পূর্ব্বনীতি একেবারে পরিত্যক্ত হয় নাই। বারেন্দ্রের মধ্যে "দেব অপদেব" "নন্দীভৃঙ্গী" "বাড়ানাগ ডোরানাগ" প্রভৃতি কুল প্রবাদ প্রচলিত আছে। অর্থাৎ সকল দেব (চাকী) দেব নহে, সকল নন্দী নন্দী নহে, অনেকে ভৃঙ্গী, সকল নাগের বিষ নাই, কেহ কেহ "ডোরা" ইত্যাদি। ইহাতেই তাঁহাদের অধিরোহণ ও অবরোহণ প্রণালীর ব্যাখ্যা করিতেছে। উত্তররাঢ়ীয়গণের মধ্যে ঘোষ, সিংহ প্রভৃতি ঘরের ষোল আনা, চৌদ্দ আনা, বার আনা, প্রভৃতি যে ভাবের কথা আছে, তাহা কেবল বাহ্য ঘোষ সিংহাদির অন্তঃ প্রবেশেরই ফল।

এই প্রকারে বঙ্গদেশীয় যে শ্রেণীর কায়স্থের কথাই বল, তাহার নিম্নতম ব্যক্তি উচ্চতম ব্যক্তির সহিত রক্তসংস্রবে মিলিত হইয়া পড়িয়াছে। ঐ যে উত্তাল তরঙ্গমালার উপর দিয়া নাবিক নির্ভীকচিত্তে পদ্মানদীতে কর্ণহস্তে কাস্তানবৃত্তি সুসম্পন্ন করিতেছে, অনুসন্ধান কর, তাহার সহিত বঙ্গজ কায়স্থগণের অনেক কর্ণধারের সহিত রক্তসংস্রব ঘটিয়াছে। আর ঐ যে কৌলীন্যের অকটরলনী মনুমেণ্টের উপর দণ্ডায়মান হইয়া চসমা চক্ষে কলিকাতার বাবুটী আপনার উচ্চত্বে আপনি মুগ্ধ হইতেছেন, তুমি ধীরে ধীরে উঠিয়া দেখ, দক্ষিণ-

রাঢ়ার সিকদার (গোলাম) মহাশয় কমলালেবুর চুপড়ী মস্তকে লইয়া তাহার নিকটেই বসিয়া কুটুম্বিতার আলাপন করিতেছেন। আর এই যে তৈল-বীজ-প্রধান বারেন্দ্রভূমে কেহ কেহ দাসত্বের দেবত্বের আপাততঃ স্বর্ণোজ্জ্বল মাথাইল মস্তকে ধারণ করিয়া তৈল-বীজ নিক্ষেপের সহায়তা করিতেছে, জানিয়া রাখ, তাহার ব্যবসায়ে টাকা হইলে ঐ মাথাইল গুলি এমনই সুন্দর গিলটি করা হইবে যে, স্বর্ণকিরীটগুলি ফেলিয়া তুমি উহা মস্তকে ধারণ করিতে পার। আর এই যে জলতোলা কলে রাজপুত কায়স্থ উত্তররাঢ়ীয় জমিতে জল সেচন করিতেছে, উত্তররাঢ়ীয় অত্যুচ্চ ঘরের সহিত ইহার অভিন্ন ভাব ধারণ কিম্বা সংস্রববিশিষ্ট হওয়া অসম্ভব নহে।

কথাগুলি নিতান্ত কাল্পনিক নহে। উত্তররাঢ়ীয় রাজা সীতারাম রায়ের দশভুজালয়ের শিরোভাগে যে খুদিত লিপি ছিল, তাহাতে লিখিত ছিল,—"বিশ্বাস খাস কুলকমলে ভাসকো ভানুতুল্য" অর্থাৎ সীতারাম বিশ্বাস খাস বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিশ্বাস খাস বংশ সম্বন্ধে প্রবাদবাক্য এই ;—

হাল চষে তাল খায় গিধিনিতে বাস।
তাহাতে হইল বংশ বিশ্বাস খাস।

সুতরাং জল-তোলা কলে রাঢ়ী জমি সজল করিয়া সীতারামের পূর্ব্ব পুরুষ নিজ হাতে চাষ করিত। ইনি উৎকৃষ্ট উত্তররাঢ়ীয় বংশের সহিত আদান প্রদান করিয়াছিলেন। সীতারাম, মোহনলাল ও প্রতাপাদিত্যের পুনরুদয় যদি অসম্ভব হয়, তবে কায়স্থের ক্ষত্রিয় হওয়া আবশ্যক কি?

এক্ষণে ভাবিয়া দেখুন, কি কুলমর্য্যাদা কি বংশমর্য্যাদা, উভয়ই উচ্চতম ঘরের সহিত নিম্নতমের মিশ্রণ বশতঃ অনেকটা কলুষিত হইয়া পড়িয়াছে। কুলমর্য্যাদা মূলতই মিশ্রণের ফল, বংশমর্য্যাদাও এক্ষণ অমিশ্রিত নহে। সুতরাং বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা নিম্নলিখিত পাঁতি-ক্রয় করিয়া যে বহিষ্করণ নীতির সূচনা করিয়াছেন, এবং রায়মহাশয় যে তালে বেতালে তজ্জন্য বংশগৌরব করিতেছেন, তাহা আজ কাহার উপর খাটিবে, ভাবিয়া দেখিতে হয়।

পাঁতি বা ব্যবস্থাপত্র খানি এই ;—

"কায়স্থ পদংহি ন তাবৎ সর্ব্বেষাং কায়স্থ পদ ব্যবহার্য্যানামেক রূপেণ বোধনে ক্ষমং। কিন্তু চিত্রগুপ্ত সন্ততৌ চন্দ্রসেন সন্ততৌচ ক্ষত্রিয়ত্ব ব্যাপ্য জাতি বিশেষ পুরস্কারেণ প্রবর্ত্তমানম্।"

অর্থ—

"কায়স্থ বলিলে কায়স্থ বলিয়া ব্যবহৃত সমস্ত কায়স্থকেই যে একরূপ বুঝাইবে, তাহা নহে। কিন্তু ঐ শব্দটী ক্ষত্রিয়ত্ব ব্যাপ্য জাতি বিশেষ পুরস্কারে চিত্রগুপ্ত ও চন্দ্রসেনের সন্ততিতেই প্রবর্ত্তিত হইতেছে।"

কায়স্থসভার কার্য্যবিবরণী (১৩০৮।০৯)

এই পাঁতির আমরা যতদূর অর্থ বুঝিতে পারি, তাহাতে, বোধ হয়, অর্থ এই যে, সকল কায়স্থাখ্য ব্যক্তি যে কায়স্থ, তাহা নহে ; এমন অনেক কায়স্থ আছে, তাহারা কায়স্থ বলে, অথচ, তাহারা চিত্রগুপ্ত বা চন্দ্রসেনের সন্তান নহে,—এই সকল কায়স্থ নাম মাত্র কায়স্থ, ইহাদের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবি নাই।

এই যদি ইহার অর্থ হয়, তবে ত কলহ ক্রয় করা হইয়াছে। সম্প্রতিই যে সকল হীনাবস্থ কায়স্থকে ইহার দ্বারা ইঙ্গিত করা হইয়াছে, তাঁহারা অবশ্যই বলিতে পারেন, কুল-লক্ষণানুসারে এবং বঙ্গজ শ্রেণীর কুলগ্রন্থ ভিন্ন অন্যান্য কায়স্থের এবং ব্রাহ্মণাদি

অন্যান্য সকল জাতির কুল-গ্রন্থ এবং কুল-প্রবাদানুসারে সর্ব্বাগ্রেই বল্লালী কুলধারীগণ কায়স্থ বলিয়া ব্যবহৃত অথচ কায়স্থ নহে,এই বিশেষণের অন্তর্গত হইবেন। এরূপ প্রশ্ন কায়স্থ সভায় উঠিলে আমরা কি উত্তর দিব ?

এই জন্যই আমরা কায়স্থ সভার বহিষ্করণ নীতির তীব্র প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছি। এই জন্য আমাদের প্রিয়তম বাবু কৃষ্ণ বল্লভ রায় মহাশয়কে তৎসমর্থনে তৎপর দেখিয়া দুঃখিত হইতেছি।

সে যাহা হউক, এক্ষণে তিনি সমীকরণ প্রস্তাব কি প্রকারে উপস্থিত করিতেছেন, তাহা একবার দেখা যাউক।

তাঁহার সমীকরণ প্রস্তাবের মূল মন্ত্র হইয়াছে, উপনিবেশী কায়স্থকে গৌড়ীয় কায়স্থের উপরে স্থান দিতে হইবে যেন গৌড়ীয় কায়স্থ উপনিবেশী নহে এবং উপনিবেশী কায়স্থ গৌড়ীয় নহে। কথাটা আদবেই ভুল। তবে কথাটা একটুক সমাজে শিকড়াইয়া গিয়াছে, কাজেই তিনি এরূপ বলিতে সাহস করিয়াছেন।

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণ বলিতেছেন যে, পাঁচজন "করণ" আদিশূরের যজ্ঞে উপস্থিত হইয়াছিলেন,তাঁহাদের নাম হইয়াছে এই;--

১। সোমেশ্বর ঘোষ, অযোধ্যা হইতে
২। অনাদিবর সিংহ ঐ
৩। পুরুষোত্তম দাস মথুরা হইতে
৪। সুদর্শন মিত্র মায়াপুর (বৃন্দাবন) হইতে।
৫। দেবীদত্ত। ঐ

ইহাঁদের কেহই কোলঞ্চ (কান্যকুব্জ) হইতে আইসেন নাই। ইহাঁদের মধ্যে সোমেশ্বর ঘোষ-প্রতিষ্ঠিত সোমেশ্বর নামক একটী শিবমন্দির কাঁদি উপবিভাগে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই মন্দির স্থাপনের সন হইয়াছে, ১২০৩ শক (১২৮১ খ্রীষ্টাব্দ) অর্থাৎ ইহা আদিশূরের তথা-কথিত যজ্ঞের ৫০০ বৎসর পরবর্ত্তী।

এই মন্দির-লিপি সত্য হইলে, উত্তর রাঢ়ীয় কুলপ্রবাদ অমূলক। আদিশূরের যজ্ঞের সহিত তাঁহাদিগের আদিপুরুষগণের কোন সংস্রব ছিল না।

তবে যে প্রকারে প্রবাদটী দেখা যাইতেছে—কেহ অযোধ্যা, কেহ মথুরা, কেহ মায়াপুর হইতে আসিয়াছিলেন—তাহাতে আগমন বৃত্তান্তটী ঐতিহাসিক হইতে পারে ; কেননা উপনিবেশটী উপনিবেশের সাধারণ ধর্ম্মানুগত। আদিশূরের যজ্ঞের সহিত ইহাকে সংশ্রিত করা, পরবর্ত্তীকালের কুল-বিধাদের ফল।

বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলগ্রন্থানুসারে যজ্ঞাগত ব্রাহ্মণ সহচরগণ উভয় শ্রেণীর কুলীন কায়স্থ ও দত্তগণের আদিপুরুষ। ইহাঁদের মধ্যে বঙ্গজ ৩ ঘর ও দক্ষিণরাঢ়ীয় ৩ ঘরের পুরুষ গণনা বা পর্য্যায় প্রচলিত আছে ; আদান প্রদান কালে এই পর্য্যায়ের হিসাব করা হয়। রায় মহাশয় বলেন, আদিশূরের সময়াগত আরও চতুর্বিংশতি কায়স্থের নাম পাওয়া গিয়াছে। (বাঃ কঃ স ৫৫ পৃঃ) যদি এই সময় হইতে একটা পর্য্যায়-গণনারীতি প্রকৃত প্রস্তাবেই প্রচলিত হইয়াছিল, তবে এই ২৪ জনের বংশধরগণের মধ্যে সে রীতি থাকিল না কেন ?

দক্ষিণরাঢ়ীয় কুল-গ্রন্থে লিখিত আছে যে, আদিশূর কান্যকুব্জরাজ বীরসিংহকে "সপ্তপ্রান্ ভূমিদেবান্"পাঠাইতে অনুরোধ করেন ; কিন্তু বঙ্গজ কুলজীকারকেরা বলেন, তাহ নহে। তিনি "দশদ্বিজ" পাঁচ জন ব্রাহ্মণ ও

পাঁচজন কায়স্থ পাঠাইতে বলিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের মতে দ্বিজই আসিয়াছিলেন। এখন কাহার কথা সত্য?

মাননীয় বিচারপতি সারদা চরণ মিত্র মহাশয় অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন যে, তথা-কথিত যজ্ঞাগত ব্রাহ্মণগণের পুরুষ গণনার সহিত কায়স্থ বা শূদ্রগণের পুরুষগণনার সামঞ্জস্য করা যায় না। কেবল তাহা নহে। বল্লালের সময়েই সমাগত ব্যক্তিগণের পুরুষ গণনায় ঐক্য হয় নাই। বল্লালের সময়ে ব্রাহ্মণেরা ১২।১৪ পুরুষ, দক্ষিণরাঢ়ীয়েরা ৬।৮ পুরুষ এবং বঙ্গজেরা ১।৩ পুরুষে বিদ্যমান ছিলেন। এই সকল পরস্পর-বিরোধী কুল-কথা যে সকল পুস্তকে লিখিত আছে, তাহা কি কোন প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি বিশ্বাস করিতে পারেন? অথচ এই কথাগুলির উপরেই কৌলীন্য স্থাপিত, তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া বিরাট সম্মিলনের প্রস্তাব চলিতেছে!!

স্বনামবিখ্যাত বাবু নগেন্দ্র নাথ বসুর পাঠাগার যিনি অবলোকন করিয়াছেন, তিনিই জানেন যে, বহুসংখ্যক কুলপুঁথি দ্বারা তাঁহার গৃহ পরিপূর্ণ। এই সকল পুঁথির আলোচনা তাঁহার জীবনের মহাব্রত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বঙ্গীয় কায়স্থ-জাতির কুল-গ্রন্থগুলি কোন্ সময় হইতে উদ্ভূত হইল, এই সকল গ্রন্থ প্রণয়নের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক কারণ কি, তদ্বিষয়ে অদ্যাপি তাঁহার কোন গ্রন্থ প্রকাশ পায় নাই। বাবু কৃষ্ণ বল্লভ রায় মহাশয়ও কুল-গ্রন্থের একজন অদ্বিতীয় পাঠক। তিনিও কুলগ্রন্থগুলির আবির্ভাবের কোন কারণ ও সময় নির্দ্দেশ করিতে যান নাই।

আমরা যতদূর বুঝিতে পারি, তাহাতে মানসিংহ কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয়ের পূর্ব্বে কোন গ্রন্থের কথা শুনা যায় না। ইহাতে অনুভব করা যায়, পাঠান রাজত্বকালে কৌলীন্যের কোন প্রাদুর্ভাব ছিল না, কুলপুঁথিরও আবশ্যক হয় নাই। ইতঃপূর্ব্বে কি কায়স্থ কি ব্রাহ্মণ, কি নবশাখ, কোন আর্য্য সম্প্রদায়ই সম্পূর্ণরূপে শূদ্রত্বশূন্য হইতে পারে নাই। কেন না তখনও, বৌদ্ধধর্ম্ম, ম্লান হইলেও, কতক কতক প্রচলিত ছিল। রূপরাম বসুর পুত্রের ও বসন্ত রায়ের পুত্র কচু রায়ের ভ্রাতার ধীবর কন্যার পাণি গ্রহণ এই অবস্থার পরিচায়ক। ফলে বৌদ্ধধর্ম্মের কুক্ষিগত বঙ্গীয় জনসংখ্যা, ব্রাহ্মণ কায়স্থ নবশাখ যাহাই হউক, খ্রীষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত ক্রমশঃ উদ্গীর্ণ হইতেছিল এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের বিলোপ ও ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের উন্নতি সাধন হইতেছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ নির্ব্বাণের শতাবধি বৎসর পূর্ব্বে প্রশ্ন উঠিল যে, কায়স্থ ও নবশাখ সম্প্রদায় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য কি না? এই প্রশ্ন ইতঃপূর্ব্বেও কিছু কিছু প্রধূমিত হইতেছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য অপেক্ষাকৃত সবল হওয়াতে এ সময়ে ইহার একটা মীমাংসা অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। সময়টীও টলমলায়মান। একদিকে পাঠান রাজত্বের লীলা শেষ, মোগল রাজত্বের সূত্রপাত; অপরদিকে গৌরাঙ্গদেবের নবধর্ম্ম প্রচার। রঘুনন্দন এই সময়ে কায়স্থদিগের বর্ণ নির্ণয় করিয়া তাঁহাদিগকে সচ্ছূদ্র বলিলেন; আনন্দ ভট্টও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাঁহাদিগকে সচ্ছূদ্র ও বৈশ্যদিগকে শূদ্র বলিলেন, নবশাক-

কেও শূদ্রই বলিলেন। বঙ্গে ক্ষত্র বৈশ্য বলিয়া কেহকে স্বীকার করিলেন না।

কিন্তু ব্রাহ্মণক্রুবও যেরূপ ব্রাহ্মণ, সচ্ছূদ্রও সেইরূপ শূদ্র। এজন্য রাঢ়ীয় কায়স্থেরা যজ্ঞাদির পুনঃ প্রচলনে অগ্রসর হইলেন্ না। তাঁহারা বিবাহাদি আচার ব্যবহার শূদ্রবৎ করিতে লাগিলেন। তথাপি কি উত্তররাঢ়ীয় কি দক্ষিণরাঢ়ীয়, উভয় শ্রেণীতেই কোন সাগ্নিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান নাই ; বঙ্গের অবস্থা ঠিক এরূপ নহে ; তাঁহাদের কৌলীন্য এ সময়ে শূদ্রমিশ্রিত হইতে পারে, কিন্তু এ সময়ে বঙ্গের দেববংশীয় কায়স্থগণের রাজন্য-ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিলোপ হয় নাই। বারেন্দ্রও এ সময়ে জাত্যংশে (Ethnologically) বঙ্গেরই অঙ্গ। এজন্য বঙ্গজ ও বারেন্দ্র শ্রেণী মধ্যে সাগ্নিক কার্য্য, বিবাহে ক্ষত্রবৎ বর্ম্মচর্ম্মের ব্যবহার, কোন কোন গৃহে সরণ্যু বা উষা দেবীর ব্রত, যাহা বৌদ্ধবিপ্লবেও রক্ষিত হইয়াছিল, তাহা পরিত্যক্ত হইল না। ইহার রাজনৈতিক কারণ আমরা এই মনে করিতেছি যে, দক্ষিণরাঢ়ীয় প্রধান প্রধান কুলীন বসতিগুলি জঙ্গলবাদাল,বাগু-টিয়া ইত্যাদি, নলডাঙ্গায় ব্রাহ্মণরাজবংশ এবং নদীয়ার ভবানন্দ মজুমদারের ব্রাহ্মণ রাজবংশ দ্বারা অবনত হওয়াতে শূদ্র হইতে বিশ্লেষণ ক্রিয়া যথেষ্ট প্রবল হইতে পারে নাই। পক্ষান্তরে বঙ্গে কায়স্থ রাজন্যধর্ম্মের প্রাবল্য বশতঃ এবং কায়স্থ শূদ্রের পার্থক্য বশতঃ (যেমন এক্ষণও আছে) কতকগুলি ক্ষত্রিয়াচার প্রাবল্য লাভ করিতে পারিয়াছিল।

ফলে এই টলমলায়মান সময়ে রাঢ়ে ও বঙ্গে, যথাক্রমে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের রাজন্য ধর্ম্মের প্রভাব বশতঃ, কায়স্থের মৌলিক আভিজাত্য সম্বন্ধে বিলক্ষণ মতদ্বৈধ জন্মে। বোধ হয়, ব্রাহ্মণের আভিজাত্য সম্বন্ধেও সেইরূপ ঘটিয়াছিল। সে যাহা হউক, রঘুনন্দনের স্মৃতি অনুসারে কায়স্থ-গৃহের আনুষ্ঠানিক কার্য্য নিয়মিত হইতে চলিলে, সেই মতদ্বৈধতা প্রবলতর হইয়া উঠিল এবং অবিলম্বে দেবীবর ঘটক, পুরন্দর খাঁ, ধ্রুবানন্দ প্রভৃতি কতকগুলি কুলজীকারের উদ্ভব হইল। এই শ্রেণীর লোক আর পূর্ব্বে দেখা যায় নাই। ইহাঁরা উর্ব্বর মস্তিষ্কের কল্পনা-বলে প্রায় সহস্র বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী একটা যজ্ঞ কল্পনা করিয়া স্ব স্ব কিম্বা স্ব স্ব প্রভুগণের আত্ম-প্রশংসানীতি নিনাদিত করিতে লাগিলেন।

ইহাঁদের মধ্যে বঙ্গজ কুলজীকারকেরা কল্পিত যজ্ঞাগত পাঁচ ব্যক্তিকে "দ্বিজ" বলিয়াছেন। দক্ষিণরাঢ়ীয়েরা তাহা বলিতে পারেন নাই। বোধ হয় ইহার একটী বিশেষ কারণ এই যে,রাঢ়ে শূদ্র ও কায়স্থের এমনই ঘনীভূত অবস্থা হইয়া গিয়াছিল, কুলজী-কারকেরা কায়স্থ শূদ্রের বিশ্লেষণে কোন উপায় পান নাই। ধর্ম্মের অবস্থা ঠিক্ এরূপ নহে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

বারেন্দ্র ও উত্তররাঢ়ীয় শ্রেণী দুটী যথা-ক্রমে বঙ্গ ও রাঢ়ের কায়স্থগণের শাখা-ভেদ মাত্র। ফতেসিংহে কালক্রমে কতকটা কায়স্থ রাজন্যধর্ম্ম প্রবল হইয়া উঠিলে, তত্তৎস্থানীয় রাঢ়ীয়েরা অপেক্ষাকৃত দক্ষিণ প্রদেশীয় রাঢ়ীয়গণের শূদ্রত্ব-স্মৃতির প্রতি-বাদ করিয়া স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করেন, কিন্তু সমাজের কোন আভ্যন্তরিক বল না থাকায় কায়স্থ-শূদ্রের বিশ্লেষণ করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

বারেন্দ্র-ভূমে যাঁহারা সমাজ বন্ধন করেন,

তাঁহারা বঙ্গে উচ্চ-স্থানলাভে বঞ্চিত হইয়াই এরূপ করেন, তাঁহাদের কুল-গ্রন্থে প্রকাশ। কিন্তু ইহাঁদের মধ্যে রাজন্য-ধর্ম্মের সবিশেষ প্রভাব ছিল না। সুতরাং বঙ্গে যেমন শূদ্র-দিগকে দাসাবস্থায় রাখা গিয়াছে, বারেন্দ্রে তাহা ঘটে নাই। কেন না, বারেন্দ্রে রাজন্য-ধর্ম্মের দুর্ব্বলতা বশতঃ ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য তাহা করিতে দেয় নাই। তবে কয়েকজন অল্প-শক্তিশালী ব্যক্তি একটী ছোট খাট সমাজ-বন্ধন করিয়া অধস্তন জনসংখ্যা হইতে পৃথক্ থাকিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু এই অবস্থা আর থাকিতেছে না। বারেন্দ্র কায়স্থ অধ্যুষিত স্থানে কায়স্থ ও শূদ্র বলিয়া দুটী পৃথক্ জনসংখ্যা নাই।

এই সকল ঘটনাবলি পাঠ করিলে, বঙ্গের সকল কায়স্থকেই গৌড়ীয় মনে করিতে হইবে। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে যে সকল কায়স্থেরা বাস করেন, তাঁহারা কায়স্থজাতিকে দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করেন। (১) শ্রীবাস্তব, (২) ভাটনাগর, (৩) সকসেন, (৪) অম্বষ্ট, (৫) অহিষ্টান, (৬) বাল্মীক, (৭) মাথুর, (৮) সূর্য্যধ্বজ, (৯) কুল-শ্রেষ্ঠ, (১০) করণ, (১১) গৌড়, (১২) নিগম। বঙ্গ-দেশীয় কায়স্থগণকে তাঁহারা গৌড়ীয় ভিন্ন অন্য শ্রেণীর কায়স্থ বলিয়া স্বীকার করেন না। বঙ্গীয় ঘোষ, বসু, মিত্রাদি উপাধি পশ্চিমে আদপে নাই এবং একদিন যে ছিল, এরূপ প্রমাণও পাওয়া যাইতেছে না। বরঞ্চ গৌড়ীয় কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ কিম্বা অপর জাতি* যাঁহারা পশ্চিমাঞ্চলে গিয়া বাস করিয়াছেন, তাঁহাদের অস্তিত্ব পশ্চিমে জাজ্জল্যমান আছে। পশ্চিম প্রদেশীয় গৌড়ীয়-কায়স্থগণ অদ্যাপি উপবীতধারী। গৌড়ীয়-কায়স্থের শীর্ষস্থানে বল্লাল কর্ত্তৃক শূদ্র বা শূদ্রমিশ্রিত সম্প্রদায় স্থান পাওয়াতে, বঙ্গ-দেশীয় গৌড়ীয় কায়স্থগণ নিরুপবীত হইয়াছেন। তান্ত্রিক ধর্ম্মের সংস্রবে নিরুপবীততা ঘটিলে, ব্রাহ্মণগণেরও নিরুপবীততা ঘটিত।

পশ্চিমাঞ্চলে যে দ্বাদশ প্রকার কায়স্থের নাম শুনা যায়, তাঁহারা অনেকে প্রদেশ বিশেষের নামানুসারে অভিহিত হইয়াছেন। এই দ্বাদশ প্রকার কায়স্থকে চিত্রগুপ্তের সন্তানও বলা হইয়াছে। বোধ হয়, অতীত-কালে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের কায়স্থ সংখ্যাকে একীভূত করার উদ্দেশ্যেই তাঁহাদের সকলকে এক ব্যক্তির সন্তান বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। এজন্য, গৌড়ীয় কায়স্থগণ কোন একটী সাধারণ মূল-কায়স্থ জাতির শাখা এবং বঙ্গে উপনিবেশী।

পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে আর্য্যবাস পরিবর্ত্তন (colony) অতি প্রাচীনকাল হইতেই হইয়া আসিতেছে। অথচ এই পরিবর্ত্তনে যেন কিছু অপ্রবৃত্তি ছিল, বোধ হইতেছে : সরস্বতী তীরবাসী বশিষ্ঠ বলিতে-ছেন ;—

> ধন পাব বলে এই নমঃ সহ হব্য দেই
> সরস্বতী সেব স্তোম দেবি।
> বাস করি তব গৃহে যথা শ্রয়ি মহীরুহে
> রব তব কাছে তোমা সেবি।
> মৎকৃত ঋগ্বেদ ৭।৯৫।৫

ভরদ্বাজ-ঋষিও সরস্বতীকে বলিতেছেন —

> আমাদের সখ্য-গৃহ সেবা করি হেথা রহ
> অপকৃষ্ট স্থানে যেন না হই প্রেরিত।
> ঐ ৬।৬১।১৪

সুতরাং আর্য্য-জাতির প্রধান বসতিস্থান সরস্বতীতীর পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল না। এতৎসত্ত্বেও এই বাস-পরিবর্ত্তন ঘটিতেছিল।

* যোধে রত্নগিরি ডিক্‌ট্রীক্টেও গৌড়ীয় ধীবর আছে। Statesman, 20-2 04

শতপথব্রাহ্মণ (১.৪.১) অনুসারে বিদেঘ মাধব ও গৌতম রাহুগণ শতধারা (গণ্ডক) নদীর তীরে অগ্নি আনিয়াছিলেন। অর্থাৎ বিদেঘমাধবের নেতৃত্বে এবং পুরোহিত গৌতমের সমভিব্যাহারে একটা সাগ্নিক আর্য্য সম্প্রদায় শতধারা নদীর পূর্ব্ব তীরে ব্রাহ্মণ সাহিত্য রচনার পূর্ব্বে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ের গৌতম গোত্রীয় ব্রাহ্মণ কায়স্থের যদি এই গৌতম ঋষির সহিত কোন সম্বন্ধ থাকে, তবে তাঁহারা আদিশূরের যজ্ঞের বহুশতাব্দী পূর্ব্বে কান্যকুব্জের অনেক দূর পূর্ব্বদিকে বিহার-সীমায় আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ইহাঁদেরই একটী অগ্রবর্ত্তী সম্প্রদায় চণ্ডীকানে (যশোহরে) গিয়া বাস করিয়াছিলেন। এই সম্প্রদায়টী এক্ষণে বসু নামে খ্যাত। ভৈরব ও চিত্রানদীর তীরস্থ স্থান সমূহে এই বসু সম্প্রদায়ের বাস। জঙ্গম, বাঁদান, বাগুটিয়া, খাজুরা প্রভৃতি গ্রাম এই দুই নদীর তীরবর্ত্তী। সম্প্রদায়টী বৈশ্য হইতে পারে; কেন না বসু হইয়াছেন পুষা দেবতার ন্যায় পশুপালক ভ্রাম্যমান (nomadic) আর্য্যজাতির দেবতা বিশেষ। উভয়েই আদিত্য দেবতা। তবে পুষা ভ্রাম্যমান অবস্থারই দেবতা, বসু (বাসয়িতা) নিবাসপ্রদ অর্থাৎ বসবাসের দেবতা (God of Colonists)। এই গৌতম গোত্রীয়গণ পশুচারণ উপলক্ষ করিয়া অতি সুদূর অতীতেই ভৈরব ও চিত্রাতীরে আসিয়া বসবাস করিয়াছিলেন এবং ক্রমে কৃষিব্যবসায় অবলম্বনে ধনবান হইয়াছিলেন। যে ভৈরব ও চিত্রার তীরে বহু কায়স্থ সম্প্রদায়ের বাস, সেই ভৈরব ও চিত্রাতীরে বহুসংখ্যক বারুজীবী বৈশ্যজাতির বাস। এই বারুজীবীর মধ্যেও "বসু" আখ্যা বিশিষ্ট লোক আছে। সুতরাং এক সময়ে যে এই বসু কায়স্থ ও বসু বারুজীবী একটী অভিন্ন সাগ্নিক সম্প্রদায় ছিল, তাহাতে সন্দেহ করা যায় না।

বারেন্দ্র অষ্টমুনিশা নামক একটী স্থান আছে। ইহা কায়স্থগণের একটী বসতি স্থান। ইহা আত্রেয়ী নদীর তীরবর্ত্তী এবং এই নদীতীরে আরও অনেক প্রসিদ্ধ কায়স্থের বাস। বারেন্দ্র কায়স্থেরা বিশ্বাস করেন, অত্রি মুনির আশ্রম বারেন্দ্র ভূমে ছিল। কেন না, তাঁহার কন্যা আত্রেয়ী (বিশ্বাবারার) নামেই আত্রেয়ী নদীর নাম হইয়াছে। আরও এক কারণ এই যে, অত্রি গোত্রীয় দাস বংশ কেবল বারেন্দ্রই দেখা যায়, অন্যত্র নাই। এজন্য রায় মহাশয় সমীকরণ প্রস্তাবে বলিয়াছেন যে, এই দাস বঙ্গজ, দক্ষিণরাঢ়ীয় ও উত্তররাঢ়ীয় ঘোষ বংশের তুল্য মনে করিতে হইবে এবং তাঁহাদের তুল্য মর্য্যাদার যোগ্য; কেননা বারেন্দ্ররা ৪ শ্রেণীর কায়স্থ তুল্য মর্য্যাদা সম্পন্ন। একথা কায়স্থ সভাকে স্বীকার না করাইয়া সম্মিলনের মধ্যে আসিতেছেন না।

যে আর্য্যজাতি কালক্রমে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য তিন শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহারা এদেশের অনার্য্য জাতিকে "দাস" বলিতেন। ইহার শত শত প্রমাণ বেদের মন্ত্র হইতে উদ্ধৃত করা যায়। এই দাস জাতির মধ্যে অনেকে জাতিভেদ স্থাপনের পূর্ব্বেই আর্য্যধর্ম্মে ব্যাপ্তীকৃত (Baptized) হইয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নামধেয় আর্য্য জাতির ন্যায় সম্পূর্ণরূপেই সাগ্নিক ও যাজ্ঞিক হইয়াছিলেন। আমরা কায়স্থ-পত্রিকায় দেখাইয়াছি যে, সুদাস ও দিবোদাস এই শ্রেণীর আর্য্যান্বিত হিন্দু।

সুদাস অতি বিখ্যাত পাঞ্জাব দেশীয় যোদ্ধা, দিবোদাসের পুত্র পুরুচ্ছেপ ঋষি হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহঁাদের কাহার অত্রির সহিত সম্বন্ধ দেখা যায় না। সুদাসের যাজক বসিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র ছিলেন। দিবোদাসের বংশ স্বয়ং যাজকতা করিতেন। যদি বাস্তবিকই অত্রির সহিত বারেন্দ্র অত্রি-গোত্রীয় দাসের কোন সম্বন্ধ থাকে, তবে আমাদের ইহা বিশ্বাস করিতে হইবে যে, অত্রি ঋষি বারেন্দ্র দাসের পূর্ব্বপুরুষগণকে অযাজ্ঞিক হইতে যাজ্ঞিক অবস্থায় আনিয়াছিলেন। তথাপিও এই দাস বংশে যজ্ঞ প্রচলিত আছে।

কিন্তু এই বংশ উপনিবেশী নহে; গোড়ীয় কায়স্থ। বারেন্দ্র শ্রেণীর মধ্যেই গোড়ীয় কায়স্থের প্রাধান্য দেখা যায়। উপনিবেশীগণের উপকথার মধ্যে ইহঁাদিগকে অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া কি লাভ হইবে, বুঝিতে পারি না।

কত কষ্ট সহ্য করিয়া অত্রি ঋষি বারেন্দ্র দাসদিগকে আর্য্যায়িত করিয়াছিলেন, নিম্নলিখিত বেদ-মন্ত্রে তাহার আভাস পাওয়া যায়।

নিবারিলে দীপ্ত অগ্নি তোমরা হিমেতে উভে
অন্ন যুক্ত বল-প্রদ খাদ্য প্রদানিলে।
ছিলেন আঁধার গৃহে অবনত মুখে অত্রি,
সগণ সহিত তাঁকে তুলিয়া আনিলে। *
ঋগ্বেদ ১।১১৬।৮

* হিমেনাগ্নিং ঘ্রংসমবারয়েথাং পিতুমতীমূর্জমস্মা অধত্তম্
ঋবীসে অত্রিমশ্বিনাবনীতমুন্নিন্যথুঃ সর্ব্বগণং স্বস্তি॥
ঋগ্বেদ ১।১১৬।৮

এই মন্ত্রের টীকা লিখিতে গিয়া সায়ণ বলিতেছেন "অত্রের্মাপ্যানম—অত্রি ঋষিমসুরাঃ শত দ্বারে পীড়া যন্ত্র গৃহে প্রবেশ্য তুষাগ্নিনা অবাধিষত তদানীং তেন বহ্নিনাপ্তৌ অশ্বিনৌ উদকেনোপশময্য তস্মাৎ পীড়া গৃহাৎ অবিকলেন্দ্রিয় বর্গংসন্তং নিরগময়তাম্।"

সায়ণাচার্য্য বলেন, অসুরেরা (অনার্য্য দাসেরা) অত্রি ঋষিকে শত দ্বারে পীড়া যন্ত্রে গৃহে প্রবেশ করাইয়া তুষের আগুন জ্বালিয়া দিয়াছিল। অত্রি তখন অশ্বিদ্বয়ের স্তব করিলে অশ্বিদ্বয় হিম (জল) দ্বারা সেই অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া তাঁহাকে অবিকলেন্দ্রিয় বাহির করিয়া আনিয়াছিলেন। যাঁহারা বর্ত্তমান সময়ের ইউরোপীয় আর্য্য মিশনারীগণের ধর্ম্ম প্রচার বৃত্তান্তে তাঁহাদের অসাধারণ সহিষ্ণুতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া থাকেন; তাঁহারা অত্রির বারেন্দ্র দাসগণকে আর্য্যায়িত করার বৃত্তান্ত শুনিয়া কি বিস্মিত হইবেন না?

গোত্র প্রবরের ব্যবহারিক অর্থ বুঝা বড় কঠিন। বর্ত্তমান সময়ের কায়স্থ ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যের অনেকে, যাহঁারা সেই প্রাচীনকাল হইতেই গোত্র ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা সম্ভবতঃ সেই প্রাচীন ঋষিগণের সন্তান। এইরূপে বসিষ্ঠ ঋষির সন্তান কায়স্থ ব্রাহ্মণ ও ছত্রীর মধ্যে আছে। বৈশ্যের মধ্যে আছে কিনা, জানিতে পারি নাই। বিখ্যাত বেদভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য বসিষ্ঠ গোত্রীয় ছিলেন। পশ্চিমাঞ্চলেও বসিষ্ঠ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ আছেন। সায়ণ বিশ্বামিত্র নামীয় ৩য় মণ্ডলের কোন কোন বসিষ্ঠ-বিদ্বেষী ঋকের ভাষ্য লেখেন নাই। এই গোত্রীয় অন্যও কোন কোন পণ্ডিতের ঋগ্বেদের হস্তলিপি লণ্ডন পুস্তাগারে আছে। তাহাতেও বসিষ্ঠ-বিদ্বেষী ঋকগুলি একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

বসিষ্ঠ-গোত্রীয় ছত্রী গিরিয়া যুদ্ধক্ষেত্রের অদূরবর্ত্তী মিঠিপুর ও ভেঘরী গ্রামে বাস করিতেছেন। গিরিয়ার যুদ্ধোপলক্ষে আসিয়া যে সকল ছত্রী ভাগীরথী তীরস্থ উপরোক্ত

দুই গ্রামে বাস করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে দুটী গোত্র প্রধান, বশিষ্ঠ ও চান্দ্রায়ণ। ঠিক্ এইরূপে কোন যুদ্ধ উপলক্ষে আসিয়া সোঙ্কা নদীর * তীরে ইলুহার বাইসারী প্রভৃতি গ্রামে একটী বশিষ্ঠ ও চান্দ্রায়ণ গোত্রীয় ক্ষত্রিয় (এক্ষণে কায়স্থ) সম্প্রদায় উপনিবেশ স্থাপন করেন। এই উভয় গোত্রীয় কায়স্থ মধ্যে সাগ্নিক ক্রিয়া প্রচলিত আছে। এই প্রকারে গৌতম ও ভরদ্বাজাদি গোত্রও সমুদায় আর্য্য সমাজে প্রবেশ করিয়াছে। বশিষ্ঠ, গৌতম ও ভরদ্বাজ প্রভৃতি জাতিভেদশূন্য ঋষিগণের বংশধর আর্য্য জাতির সকল শাখায়ই থাকিবার সম্ভব। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের যে সকল কায়স্থ বংশ আর্য্যান্বিত ক্ষত্রিয়ের সন্তান, তাঁহারা অত্রি গোত্রীয় দাসের ন্যায় ব্যাপ্তীকারক ঋষিগণের নামানুসারে গোত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন।

গোত্র-প্রবরের বিস্তৃত সমালোচনা এ প্রবন্ধে সম্ভব হইবে না। আমরা এস্থানে এই বলিতে পারি যে,বিভিন্ন গোত্রীয় আর্য্যজাতি বর্ণভেদ প্রথা স্থাপিত হইবার পূর্ব্বেই অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের স্থানে স্থানে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। বেহারে গৌতম গোত্রীয়গণের, বারেন্দ্রভূমে অত্রি ঋষির এবং কলিঙ্গে দীর্ঘতমা ঋষির আগমনের বিবরণ বেদ পুরাণের যোগে সত্য বলিয়া বোধ হয়। এই প্রকারে যে আর্য্যজাতি অঙ্গে বঙ্গে ও কলিঙ্গে বৈদিক সময় হইতেই আসিতেছিলেন, তাঁহাদের সংখ্যা বাহুল্য ও শক্তি সঞ্চয় হইলে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ শতাব্দীর পূর্ব্বেই সুবা বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বৃহৎ বৃহৎ আর্য্য-নগর নগরী স্থাপিত হইয়া এ দেশে আর্য্যাধিপত্য বদ্ধমূল করিয়াছিল। চীন পর্য্যটকেরা তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন। ইহাঁদের মধ্যে রাজন্যসন্তানগণ যে সমধিক পরাক্রান্ত ও রাজ্য স্থাপনের মূল কারণ, তাহা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না। বৌদ্ধধর্ম্মের সহযোগে ইহাঁরাই ক্রমবিকাশ বশতঃ খ্রীষ্ট শতাব্দীর কিঞ্চিৎ পর হইতে বঙ্গে, যথা অন্যত্র, কায়স্থাখ্য নব্যজাতিতে পরিণত হইতেছিলেন। বঙ্গের অপর নাম গৌড়, এজন্য ইহাদিগকে গৌড়ীয় কায়স্থ বলাতে দোষ নাই, কিন্তু ইহাঁরা বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় জাতির সন্তান এবং প্রকৃত ঐতিহাসিক উপনিবেশী। ঘোষ বসু মিত্রাদি যদি প্রকৃত গৌড়ীয় এবম্বিধ কায়স্থ হন এবং "শূদ্রেরা পাইল কুল" এই কথার অন্তর্গত না হন, তবে তাঁহারাও প্রকৃত ঐতিহাসিক উপনিবেশী হইতে পারেন। ষোড়শ শতাব্দীর সমাজনৈতিক আন্দোলনের সময়ে তাঁহাদের উপর একটা নূতন উপনিবেশের টপ্পর বসান হইয়াছে মাত্র। বৌদ্ধ প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতিলাভ করার সময়ে যে যত ব্রাহ্মণের দাসত্ব বেশী স্বীকার করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার টপ্পরটী তত সোণালি কাজে বিজড়িত হইয়াছে। এই কারিকরগণের নাম কারিকাকার বা কুলজীকার। বারেন্দ্রে আবার এই উপনিবেশ-কাহিনী পঞ্চমে চড়িয়াছিল—সেখানে ঢাকঢোল বাজাইয়া ইহা জাহির করা হইত। সুতরাং এই সন্দিগ্ধ উপনিবেশীগণের ঐতিহাসিক উপনিবেশী কায়স্থের উপর স্থান পাইবার কোন কৈজমুনীর দাবি নাই। যাঁহারা এই দাবি করিতেছেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য স্পষ্ট। কিন্তু

---

* চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্র ৬৪ দাড় বিশিষ্ট নৌকায় যে নদী পার হইয়া গিয়া রাজা প্রতাপাদিত্যের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহারই নাম সোঙ্কা নদী।

যাঁহারা এই দাবি সন্দেহজনক বা অলীক বলিতেছেন, তাঁহারা যে কিছু বলিতেছেন না, ইহাই বিচিত্র। জাতীয় সংস্কার দুর্ব্বলতার সম্পন্ন হয় না; ক্ষত্রিয় জাতির সংস্কার ত নহেই। *

গোত্র প্রবরের সামঞ্জস্য বশতঃ যেরূপ সমীকরণ প্রস্তাব চলিতেছে, তাহার একটুক নমুনা দেখাই ;—

১নং দেব (চাকী)	বারেন্দ্র	গোত্র গৌতম,
বসু	বঙ্গজ	প্রবর গৌতম
বসু	দক্ষিণরাঢ়ীয়	আঙ্গিরস, অপ্সার ও নৈধ্রুব।

নন্দী	বারেন্দ্র	গোত্র কাশ্যপ
গুহ	বঙ্গজ	প্রবর কাশ্যপ;
গুহ	দক্ষিণরাঢ়ীয়	অপ্সার, নৈধ্রুব।

বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ীয়ের মধ্যে চাকী নন্দী অতি নিকৃষ্ট ঘর—দ্বিগপ্রতি ঘরের অন্তর্গত। রায় মহাশয় বলিতে চাহেন; এসময়ে উপাধির কোন মূল্য ধরিতে হইবে না। এসময়ে গোত্র প্রবরের সামঞ্জস্য দেখিয়া, ১নং দেব (চাকী) বংশকে বসু বংশের তুল্য কুলীন সকল শ্রেণীর কায়স্থেরই মনে করিতে হইবে। সেইরূপ নন্দীর নন্দীত্ব ভুলিয়া গিয়া গোত্র প্রবরের সামঞ্জস্য বশতঃ বারেন্দ্র নন্দীকে বঙ্গজ গুহের ন্যায় কুলীন বুঝিতে হইবে, কিন্তু দক্ষিণরাঢ়ীয় গুহের ন্যায় অকুলীন বুঝিতে হইবে না। স্বার্থ এমনি পদার্থ!

রায় মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, কাশ্যপ গোত্রীয় দেববংশও ত নন্দীগুহের ন্যায় কাশ্যপ গোত্র ও কাশ্যপ অপ্সার ও নৈধ্রুব প্রবর বিশিষ্ট; ইঁহারা কুলীন হইবেন না কেন? সেইরূপ পাল, চন্দ্র, অঙ্কুর, আঢ্য ও নন্দীগুহের প্রবরও গোত্রবিশিষ্ট। ইঁহাদেরই বা অপরাধ হইল কি? সেইরূপ গৌতম গোত্র ও গৌতম আঙ্গিরসাদি প্রবরবিশিষ্ট কুণ্ড, বিষ্ণু ও নন্দন প্রভৃতি বংশগুলি চাকী বসুর ন্যায় কুলীন হইবে না কেন?

এইরূপ কতকগুলি অসার ও যুক্তিশূন্য প্রস্তাবে তাঁহার পুস্তক পরিপূর্ণ। এগুলি যে সকল শ্রেণীর কায়স্থই উপেক্ষা করিবেন, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। তবে রায় মহাশয়ের বড় দোষ নাই। তাঁহাকে কুলমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া সমীকরণ প্রস্তাব উপস্থিত করিতে হইবে, ইহাই কায়স্থ সভার ইঙ্গিত ছিল। কাজেই তিনি স্বপ্রবৃত্তি গোপন পূর্ব্বক, সত্যানুরাগ পরিত্যাগ করিয়া, কি আশায় বুঝিতে পারি না, বারেন্দ্র শ্রেণীর পূর্ব্ব নেতৃগণের মস্তকে পদাঘাত করিয়া,

* কুলজীকারগণের সচরাচর নাম হইয়াছে ঘটক (match maker)। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা হইতে কথিত প্রতিবাদ নামক যে আবেদন পত্র বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরিত হইয়াছে,তাহাতেও ঘটকদিগের কথায় সভার আস্থা আছে, দেখা যাইতেছে। কিন্তু মাননীয় সারদাচরণ মিত্র তাঁহার "পুরন্দর খাঁ" নামক পুস্তিকার ২২ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন "আমরা ঘটকদিগের মতে বিশেষ আস্থাবান হইতে পারি না।" আমরাও তাহাই বলিতেছি। ঘটকদিগের গ্রন্থে ঐতিহাসিকতা অল্প। দুঃখের বিষয় এই, অলীকগ্রন্থ দ্বারা যাঁহাদের লাভ বেশী হইবার সম্ভব, তাঁহারা এগুলিকে বড়ই মূল্যবান বস্তু বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন এবং গবর্ণমেণ্টকেও জানাইতেছেন। যে সভায় মিত্র মহাশয়ের ন্যায় দুইজন অত্যুচ্চ বিচারপতি আছেন, সে সভা হইতে যে গ্রন্থে আস্থা নাই, তদ্বলম্বনে এত কৌলীন্যের প্রশংসাবাদ হইতেছে কেন? বিংশ শতাব্দীর কায়স্থ জাতি কি সজ্ঞানা অবিশ্বাস্য বাক্যের সমর্থন করিতে পারিবে?

অবজ্ঞাত কৌলীন্যের মধ্যে মাথা ঢুকাইতে চাহেন। জানি না, বারেন্দ্র শ্রেণীর জটাধর নাগ ও ভৃগু নন্দীর সন্তানেরা তাঁহার এই প্রস্তাবে কতদূর রাজি হইবেন।

তবে আমরা ইহা অস্বীকার করি না যে, ৪ শ্রেণীর কায়স্থ মধ্যে কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ আছে এবং ৪ শ্রেণীর মধ্যে আদান প্রদান হওয়া সঙ্গত। কিন্তু কোন্ শ্রেণীর কত মূল্য, বংশ মর্য্যাদা ও কুলমর্য্যাদার বিনিময়কালে সেই মূল্যের কিরূপে নিরূপণ হইবে, কোন্ বংশের সহিত কোন্ বংশের কিরূপ সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে, কে কাহার কাছে কি কুল-মর্য্যাদা পাইবে, সেই কুল মর্য্যাদা অর্থবাহুল্য, বিদ্যাবত্তা, ক্ষত্রিয়ত্ব কিম্বা বর্ত্তমান অবস্থা দৃষ্টে নিরূপিত হইবে কি না, এবিষয় সম্প্রতি স্থির করিতে যাওয়া কেবল অসাময়িক, তাহা নহে, বিঘ্নজনক। এজন্য আমরা কায়স্থ সভার বহিষ্করণ নীতির তীব্র প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছি। বর্ত্তমান সময়ে কৌলীন্য বহিষ্করণ নীতির নামান্তর মাত্র। লক্ষ লক্ষ কায়স্থ কৌলীন্য দ্বারা প্রপীড়িত হইয়াছেন, ইহার পুনরুত্থান ইহাঁরা কখনই সহ্য করিবেন না। বিশেষতঃ যখন আমরা ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতে চাহিতেছি, ক্ষত্রিয় জাতির দায়িত্ব ও গুরুত্ব আমাদের বোধ থাকা উচিত। ক্ষত্রিয় জাতিকে যাহাঁরা খর্ব্ব করিতে চাহেন, তাহাঁরা ক্ষত্রিয় জাতির গঠন-উপাদান সম্যক্ অবগত নহেন; তাঁহারা ক্ষত্রিয়জাতির দায়িত্বের মর্ম্মহীন হইবার জন্য জাতির আপাদ মস্তকের সহিত যেরূপ রক্ত-সংস্রবের প্রয়োজন, তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন নাই। অনার্য্য সংস্রবে যে ক্ষত্রিয়ত্বের বিনাশ হয়, তাহা নহে।

সোম পানে তোমা ইন্দ্র পুরুহূত।
অশ্বদয় বজ্রপ্রিয়গণস্তুত
সম্মুখে মোদের করুক বহন। ৪৫
পরশু তনয়-তিরিন্দিররাজে
যাদব গণের যে ধন বিরাজে,—
শতেক সহস্র করেছি গ্রহণ। ৪৬
তিন শত অশ্ব, গাভী দশ শত।
করিয়াছিলেন তাঁহারা প্রদত্ত।
পজ্র সাম নাম ঋষিযুগলে। ৪৭
দিলেন উন্নত চারি উষ্ট্রধন
করিলেন দিয়ে দাস যাদুজন
স্বর্গ দীপ্ত স্বীয় কীর্ত্তির বলে। * ৪৮
ঋগ্বেদ ৮ম ৬ সূক্ত।

এই সূক্তের ঋষি কণ্ব গোত্রীয় বৎস। যে বৎসের নামানুসারে সিংহবংশীয় কায়স্থের গোত্র হইয়াছে, বাৎস্য সেই বৎস ঋষি বলিতেছেন যে, পরশু-তনয় রাজা তিরিন্দির যাদবগণকে পরাজিত করিয়া তাহাদের যে ধন অপহরণ করিয়াছিলেন, তাহার শত সহস্র ধন আমিই গ্রহণ করিয়াছি। পজ্র ও সাম নাম দুইজন অন্য ঋষি তাঁহার নিকট হইতে ৩০০ অশ্ব, ১০,০০ গাভী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আর সেই ককুহ (উন্নত) তিরিন্দির ৪ উষ্ট্রধন ও যাদবগণকে দাস স্বরূপে প্রদান করিয়া কীর্ত্তি দ্বারা স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন।

উপরোক্ত মন্ত্র চতুষ্টয়ের মধ্যে "যাদ্ব" শব্দের ব্যবহার আছে। সায়ণ অর্থ করিয়া-

* অর্বাঞ্চং ত্বা পুরুষ্টুত প্রিয় মেধস্তুতা হরী।
সোমপেয়ায় বক্ষতঃ। ৪৫
শতমহং তিরিন্দিরে সহস্রং পর্শাবাদদে।
রাধাংসি যাদ্বানাম্। ৪৬
ত্রীণি শতান্যর্বতাং সহস্রাদশ গোনাম্
দদুঃ পজ্রায় সাম্নে। ৪৭
উদানট্ ককুহো দিবমুষ্ট্রান্ চতুর্যুজো দদৎ।
শ্রবসা যাদ্বং জনং। ৪৮
ঋগ্বেদ ৮ম মণ্ডল। ৬ সূক্ত।

ছেন যদুকুলজাত "(যাদ্বানাম যদুকুল জাতানাম্"—সায়ণ)। যে যাদবগণ মহাভারতের যুদ্ধের সময়ে অতি উৎকৃষ্ট ক্ষত্রিয়, তাঁহারা এক পুরুষ কি দুই পুরুষ পূর্ব্বে দাসত্বে আবদ্ধ হইয়া ঋত্বিক্‌গণের সেবায় নিযুক্ত হইয়াছিল। সুতরাং বঙ্গজ সমাজের এবং তথাবিধ অন্য সমাজের "দাস"গণকে ক্ষত্রিয়ত্বের সীমা রেখার বহির্গত করা শাস্ত্রসঙ্গত হইবে না, অসুবিধা ত বিস্তরই আছে।

এজন্য আমরা কায়স্থ সভার অশাস্ত্রীয় পথে গতি দেখিয়া দুঃখিত হইতেছি।(১)বংশের অর্থাৎ পুত্রাদির পণ নিরূপণ করিতে গিয়া (কৌলীন্য মর্য্যাদাই এই টাকার কথা) শুক্র বিক্রয় পাপে জাতিকে নিমজ্জিত করিতে চাহেন। (২) ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ প্রস্তাবে বহিষ্করণ নীতি অবলম্বন করিয়া অপৌরুষেয় মহাশাস্ত্রের ইঙ্গিত শুনিতেছেন না। এতদপেক্ষা গভীরতম দুঃখের আর কি কারণ হইতে পারে?

যাহাঁরা মনে করেন, অনার্য্য সংস্রবে কায়স্থ জাতির ভবিষ্যৎ ক্ষতি হইতে পারে, তাঁহারা একথা ভুলিয়া যান যে, বৌদ্ধধর্ম্মের কুক্ষি হইতে উদ্গীর্ণ, কি ব্রাহ্মণ কি কায়স্থ, কি নবশাখ, কেহই সেই বিশুদ্ধ আর্য্যরক্ত ধারণ করেন না। আর্য্যানার্য্য মিশ্রণ, এ দেশের জাতি গঠনের মৌলিক উপাদান। ইহা জানিয়াও যদি তাঁহারা অনার্য্য সংস্রবে কায়স্থের ম্লানতার আশঙ্কা করেন, তাহা হইলেও বহিষ্করণ নীতি তাহার প্রতিকার নহে। ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় কায়স্থ কতক শূদ্রভাবগ্রস্ত হইয়াছে, ইহা আমি অস্বীকার করি না; কিন্তু কায়স্থ জাতি ত জাতীয় দেহের সর্ব্বত্র হইতে সংগৃহীত হইতে ও পুষ্টি-লাভ করিতে পারে। যে সকল ব্রাহ্মণ বৈশ্য মসীজীবী ক্ষত্রিয়ের আচার ব্যবহার, বৃত্তি ব্যবসায় ধারণ করিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে কায়স্থায়িত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে ক্ষত্রজাতির গ্রহণ প্রণালী অবলম্বনে অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেই সেই ম্লানতার প্রতিবিধান হইতে পারে। ইহাও বরং কর্ত্তব্য, তথাচ বহিষ্করণ নীতি সঙ্গত নহে, কেননা ইহা শাস্ত্র ও স্বার্থ-বিরুদ্ধ।

আমরা এই সমালোচনা আর বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করি না। উপসংহারে মাত্র এই নিবেদন যে, যদিও কর্ত্তব্য জ্ঞানে বাধ্য হইয়া, আমরা কোন কোন বংশের উল্লেখ করিয়াছি, তথাচ আমাদের ইহা অভিপ্রেত নহে, কোন কায়স্থ বংশ বা ব্যক্তিকে, তাঁহারা কুলীন অকুলীন যাহাই হউন, নিন্দা করি। বিশেষতঃ বঙ্গজ কুলীন কুলজগণের নিন্দায় আমার ক্ষতি ভিন্ন লাভ নাই। তবে যে আমি তাঁহাদের নিম্নতম ঘর গুলির সহিত অবিছিন্ন সম্বন্ধের উল্লেখ করিয়াছি, তাহার এক মাত্র কারণ এই যে বহিষ্করণ নীত্যবলম্বনে কার্য্য আরম্ভ হইলে, আমরা কায়স্থবংশ পরম্পরগুলি পরস্পরে এতাদৃশ নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইতে বাধ্য হই। যেমন কুলীনগণের কুলীন গ্রন্থে ভূয়সী প্রশংসার কথা আছে, তেমন কুলীনগণের সহিত বিভিন্ন বংশের কায়স্থগণের ক্রিয়াকর্ম্মের অর্থাৎ দান গ্রহণের একখানি বঙ্গ-দেশব্যাপক মানচিত্র তৈয়ার হইতে পারে। আমার বিশ্বাস হয়, এরূপ মানচিত্রে বঙ্গদেশের কোন শ্রেণীর কোন উচ্চতম কুল বা মর্য্যাদা-সম্পন্ন ব্যক্তি কোন নিম্নতম কায়স্থ নামধেয় ব্যক্তির সংস্রব শূন্য বলিয়া দেখা যাইবে না। তবে এই হইতে পারে, কোন দুই উচ্চ-নিম্নতম ব্যক্তির হয়ত সাক্ষাৎ সম্বন্ধই স্থাপিত আছে,

কোথাও বা তন্মধ্যে ২।৪।১০।২০।৫০ ব্যক্তির নাম করিতে হইবে, এই মাত্র। আমি কুলীন, কিন্তু আমার মামার পিসার শ্যালকের বৈবাহিকের ভগ্নিপতি যে নিম্নতম ঘরে কাজ করিয়াছেন, তাঁহাকে আমি কায়স্থ বলিয়া স্বীকার করিব না, ইহা আমরা কি প্রকারে পারিব, আর ইহাতে আমাদের কি গৌরব আছে, ইহা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগোচর।

যদিও কৃষ্ণবল্লভ বাবুর পুস্তক দ্বারা কায়স্থ জাতির উপকার কি অপকার অধিক হইবে, একথা আজ বলা যায় না; তথাচ ইহা আমি সাহসের সহিত বলিতে পারি, কায়স্থ বিষয়ে তাঁহার গভীর গবেষণা বিস্ময়জনক এবং তাঁহার পুস্তক পাঠে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় জানা জাইতে পারিবে।

আর একটী কথা এই যে, এই পুস্তকখানি যেমন অজীপুর সমিতির মত নহে, তেমন এই সমালোচনার জন্য আমি নিজেই দায়ী।

শ্রীমধুসূদন সরকার।

চীনদেশের সন্তানচুরী। (৪)

মাঃ লুঃ রোদনস্বরে বলিতে লাগিল "দাদা, আমি তোকে ছাড়িয়া কিছুতেই থাকিবনা, তুই আমাকে অবশেষে বেচ্‌লি; আমার মা কোথায় গেল, বাবা কোথায় গেল, দাদারাই বা কোথায় গেল? তাহারা সকলেই আমাকেই ছাড়িয়া গেল, এখন বুঝি তুইও আমি ছাড়িবি মনে করিয়াছিস্, তা কিছুতেই হইবে না। আমার প্রাণ থাকিতে তোকে ছাড়িব না।" বৃদ্ধ একেত শোকে জর্জ্জরিত, তাহাতে আবার মা লুঃর করুণ রোদনে আরো অস্থির হইল, এবং হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিতে লাগিল—'মা লুঃ, কি উপায় করিব, আমি নিজে অচল ও অকর্ম্মা হইয়াছি, তোকে প্রতিপালন করিতে আমার সাধ্য নাই। হায়, আমার কেন মৃত্যু হইল না, হা মাথাম, "লাবামকাম" আমাকে কেন তোরা সঙ্গে করিয়া লইলি না, তোদের মনে কি এই ছিল, হায়! হায়! কি করি এখন! মা লুঃ, আমার কথা মান, আমি যখন বাড়ী ঘর শূন্য, তখন পথে ঘাটে কখন পড়িয়া মরিয়া যাইব, তখন তোমার উপায় কি হইবে? সেইজন্য আমি তাড়াতাড়ি তোকে ভাল লোকের আশ্রয়ে রাখিতে চাই। ইহারা অতি ভাল মানুষ, এরাই তোমার মা বাপ। মা লুঃ, তুই নিতান্ত অভাগিনী, তাই তোর এত দুঃখ। তোকে যে আমি ছাড়িয়া যাইতে চাহি, তাহা কি আমার প্রাণে সহ্য হয়। আমি সবংশে নির্ব্বংশ হইলাম, তবু এতদিন তোর মুখের দিকে তাকাইলে আমার প্রাণটা সময় ২ ঠাণ্ডা হইত, তোকে ছাড়িয়া গেলে আমার প্রাণের আগুন আরো দ্বিগুণ হইয়া জ্বলিবে''। বৃদ্ধ এই বলিয়া মা লুঃর মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল এবং বলিল যে, তোর কোন ভয় নাই, আমি প্রত্যহ কি একদিন অন্তরই আসিয়া তোকে দেখিয়া যাইব। মা লুঃ কিন্তু কিছুতেই ঠাকুর দাদার গলদেশ ছাড়িলনা এবং বলিতে লাগিল যে, দাদা আমার জন্য তোর কোন কষ্ট হইবে না। তোর অসুখ হইলে, আমি সেবা করিব, খাবার না থাকিলে আমি ভিক্ষা করিয়া

দিব। দাদা! তোর কোন কষ্ট হইবে না, তুই আমাকে বনবাস দিস্ না। ইত্যাদি কত হৃদয়বিদারক কথা করুণ স্বরে বিনয় করিয়া বলিতে লাগিল, তাহা বর্ণনার অতীত। যে ব্যক্তি এই দৃশ্য দেখিয়াছে, সে-ই বুঝিতে পারে যে, মা লুঃর মনের ভাব কিরূপ। মংকোতি ও মাশোয়ে এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখিয়া অবাক্ এবং রাস্তার লোকে স্থিরচিত্তে দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিয়া কেহ কেহ চক্ষের জল পর্য্যন্ত ফেলিতে লাগিল। মাশোয়ে বালিকাকে ধরিতে গেলে পদাঘাতে তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। বৃদ্ধ অবশেষে একটু ক্রোধ পরবশ হইয়া সজোরে আপন গলদেশ হইতে মা লুঃর হাত ছাড়াইয়া দুই খানি কোমল হস্ত দক্ষিণ হস্তে এবং বাম হস্ত দ্বারা তাহার পা দুখানি ধরিয়া নিষ্ঠুরের ন্যায় মাশোয়ের হাতে বালিকাকে দিয়া তাড়াতাড়ি আপন ঝুড়িটী পৃষ্ঠে করিয়া দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল। এদিকে মা লুঃ মাশোয়ের হাত ছাড়াইবার জন্য ছটফট করিতে লাগিল, এবং এমন জোরে মাশোয়ের হাতে কামড় দিল যে, মাশোয়ে সহ্য করিতে না পারিয়া ছাড়িয়া দিলে, বালিকা উচ্চ চীৎকার করিয়া বৃদ্ধের পশ্চাৎ দৌড়িয়া গিয়া তাহার দুখানি পা জড়াইয়া ধরিল। কিন্তু মংকোতি দৌড়িয়া গিয়া তাহাকে ধরিবা মাত্র মাটীতে গড়াগড়ি খাইতে লাগিল এবং চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "ওরে দাদা, একটু দাঁড়া, আমাকে নিয়ে যা। আমাকে ফেলিয়া যাস না"। বাস্তবিকই বালিকার মনে এমন আশঙ্কা হইয়াছিল যে, সে মনে করিতেছিল যে, তাহার প্রাণ বুঝি আর থাকিবে না। কি এক ভয়ানক স্থানে তাহাকে ফেলিয়া গেল। মংকোতি জোর করিয়া বালিকাকে তুলিয়া আনিল এবং হাত দুইখানি মাথায় রুমাল দ্বারা বাঁধিয়া খুঁটির সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিল। বালিকা বন্ধন দশাতেই ভূমিতে পড়িয়া চীৎকার করিতে লাগিল। বৃদ্ধ এই অবসরে সরিয়া পড়িল। এইরূপ ভাবে দুই তিন ঘণ্টা অতীত হইলে, বালিকার ক্রোধের অনেক শান্তি হইল। সে নিস্তব্ধে মাটীতে পড়িয়া রহিল। তখন মংকোতি তাহাকে নানা মিষ্ট বাক্যে তোষামোদ করিতে লাগিল। মাশোয়ে কিছু খাবার আনিয়া দিলে, মংকোতি তাহার বন্ধন খুলিয়া দিয়া তাহাকে ধরিয়া বসাইল এবং তাহার মুখে খাদ্য দিতে লাগিল। মা লুঃ লাথি মারিয়া ভোজনপাত্র দূরে নিক্ষেপ করিল এবং মংকোতিকে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া জর্জ্জরিত করিল। বালিকা আবার মাটীতে পড়িয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। এইভাবে সারাদিন গেল, কিছুই খাইল না। মাশোয়ে তাহাকে ধরিয়া লইয়া একটী কক্ষ মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিল। শীত কালীন রাত্রে বালিকা সারা রাত্রি ক্রোধের বেগে অনাবৃত ভাবে কাটাইল। অতি প্রত্যূষে মংকোতি ও মাশোয়ে যেই একটু আড়ালে গিয়াছে, মালুঃ সুযোগ পাইয়া দৌড়িয়া ঘরের বাহির হইয়া, যে রাস্তা দিয়া তাহার দাদা গিয়াছে, সেই দিকে বেগে ছুটিল। এবং "দাদা কোথায় আছিস্" বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল। এ দিকে মংকোতি ও মাশোয়ে ঘরে গিয়া দেখে মা লুঃ নাই। মংকোতি ও মাশোয়ে দুই জনে তাহার অন্বেষণে বাহির হইল। মংকোতি সমস্ত বাজার, চীনাবাজার ও কাছারীর নিকটস্থ রাস্তা দেখিয়া শেষে কেল্লার মাঠের মধ্য দিয়া যে রাস্তায় কাচিন

পাহাড়ে যাইতে হয়, সেই রাস্তায় দেখিতে পাইল, মা লুঃ দৌড়িয়া যাইতেছে, মংকোতি বেগে দৌড়িয়া গিয়া তাহাকে ধরিল। বলা বাহুল্য, বালিকা পূর্ব্বোল্লিখিত ভাবে ব্যবহার করিতে লাগিল। মংকোতি তাহাকে তুলিয়া বাটীতে আনিল। এবার বালিকার ক্রোধ অনেক শান্তি হইল। কেননা, তাহার মনে আশা ছিল যে,সে তাহার দাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারিবে। এবার সে বিষয় নিরাশ হইল। মংকোতি তাহাকে এবার রজ্জু দ্বারা বাঁধিল। এই ভাবে প্রায় দিন কাটিল। বালিকা অনাহারে ও মনের দুঃখে কাতর হইয়া পড়িল। মাশোয়ে তাহার ভাব বুঝিয়া কিছু খাবার আনিয়া তাহার মুখে দিল। এবার সে দুই একবার গলাধঃকরণ করিতে লাগিল। মংকোতি তাহাকে আবার নানা কথায় উপদেশ দিতে লাগিল যে, তাহার কোন ভয় নাই, কোন কষ্ট নাই, সে মহা-সুখে থাকিবে। তাহারাই তাহার মা বাপ স্বরূপ ইত্যাদি। তাহার বন্ধন খুলিয়া দিল, বালিকা ক্রমে শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মংকোতির সঙ্গে দুই চারি কথা বলিতে লাগিল। সে আর এখন পালাইতে চেষ্টা করিতেছে না। কেন না বুঝিল, তাহার আর অন্য উপায় নাই।

মা লুঃর পরিচ্ছদ চীন দেশীয়, সুতরাং বর্ম্মারা তাহা ঘৃণা করে। এইজন্য মা লুঃর জন্য একখানি থামেন বা কটিদেশ বক্ষ পর্য্যন্ত এক-খণ্ড কাপড়, পোয়া বা রেশমী রুমাল, এঞ্জি বা জামা, এক জোড়া ফালা বা ব্রহ্মদেশী চটি-জুতা খরিদ করিয়া আনিল এবং মা লুঃকে পরাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু মা লুঃ তাহা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। মাশোয়ে কাচিন কথা জানে না, সুতরাং তাহাকে বুঝান কষ্ট-কর হইল। কিছুকাল পরে মংকোতি আসিয়া আবার চেষ্টা করিল, কিন্তু মা লুঃ বলিল যে, বর্ম্মা পোষাক সে পছন্দ করে না এবং তাহা সে কখনও পরিবে না। বর্ম্মা পোষাক পরিলে ভাল দেখা যায় না। কিন্তু সর্ব্বদাই মাশোয়ে বর্ম্মা পোষাক পরাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল, এবং এক দিন রাগ করিয়া বালিকার মুখে দুই তিন বার চপেটাঘাত করিলে বালিকা মাশোয়ের ক্রোধ দেখিয়া কিছু ভীত হইল এবং এবার বিনা আপত্তিতে বর্ম্মাদেশী বেশ ধারণ করিল। তাহার কাচিন পোষাক সযত্নে গৃহে রক্ষিত হইল।

ইতিমধ্যে কাচিন বৃদ্ধ একদিন মা লুঃকে দেখিতে আসিয়াছিল। বালিকা তাহার দাদাকে দেখিয়া দৌড়িয়া গিয়া তাহার কোলে বসিল এবং গলা জড়াইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল,"দাদা তুই কোথায় থাকিস?" বালিকা চক্ষের জল ফেলিল, বৃদ্ধও অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না। বৃদ্ধ বলিল, "আমি" কাচিন ওয়াইল" অর্থাৎ কাচিন-গণের আড্ডায় থাকি। ভামোর সহরের পূর্ব্বোত্তর কোণে গবর্ণমেণ্ট কাচিনদিগের অবস্থিতির জন্য চীনের ঘর সকল তুলিয়া দিয়াছেন, যাহারা কাচিন পাহাড় হইতে আইসে যায়, তাহারা তথায় অবস্থিতি করে। ইহাকে সেই ভাষায় "কাচিন ওয়া-ইল"বলে। এই প্রকার শান জাতি লোকের জন্য "শান ওয়াইল" আছে। মা লুঃ জিজ্ঞাসা করিল "দাদা তুই সেখানে কি করিস, তোকে খেতে দেয় কে?" বৃদ্ধ বলিল, "সেখানে যত কাচিনগণ আছেন, আমি তাহা-দের কাজ করি, জল আনিয়া দিই, কাঠ সংগ্রহ করিয়া দিই, ভাত রাঁধি, তাই তাহারা আমাকে চারিটী খেতে দেয়। আমি এই

তাতে জীবন ধারণ করি।” তখন বালিকা বলিল “কেন দাদা, তুই আমাদিগের বাড়ী আয় না কেন? আমি তোকে খেতে দিব, তোর জল আনিতে ও ভাত রাঁধিতে হইবে না।” বৃদ্ধ তখন কাঁদিয়া বলিল,“হা কপাল, তুমি নিজে পরের কেনা দাসী, তুমি আবার আমাকে খেতে দিবে, সে দিন কি আমার হবে! মা লুঃ বলিল “আচ্ছা তুই আয়না কেন,আমি যা খাই নয় আই তোকে দিব।” এই বলিয়া সে ঘরের মধ্য হইতে একখানি চীনা মাটীর বাসনে করিয়া চারিটী ভাত, কিছু শূকরের মাংস এবং কিছু “নাপ্পি”* আনিয়া বৃদ্ধের মুখে তুলিয়া দিল। বৃদ্ধ কপালে করাঘাত করিয়া দুই চক্ষের জল ছাড়িয়া দিল। বালিকার হস্ত-প্রদত্ত খাদ্য গলাধঃকরণ করিতে লাগিল। মা লুঃও আবার চক্ষের জল ফেলিতে লাগিল। বৃদ্ধ অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছু আহার করিল। মাশোয়ে দূরে বসিয়া এই দৃশ্য দেখিতেছে এবং ঈষৎ হাস্যের ভাব প্রকাশ করিতেছে। বৃদ্ধ কিছু কাল পরে বলিল “মা লুঃ, আমি এখন যাই, আমি যাহাদের কার্য্য করি, তাহারা হয়ত আমার উপর নারাজ হইবে।” মালুঃ বলিল, “তবে আচ্ছা যাও, তুমি আবার কবে আসিবে?” বৃদ্ধ বলিল, “পাঁচ সাত দিন পরে আসিব।” মা লুঃ আজ আর তাহার দাদার সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল না এবং সহজেই দাদাকে বিদায় দিল। মা লুঃ এখন বুঝিতে পারিয়াছে যে, মংকোতির বাড়ী এখন তাহার বাড়ী। মা লুঃ এখন অত্যন্তশান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, সে এখন মাশোয়কে “আমে” বা মা বলে, এবং মংকোতিকে “আকে” বা বাবা বলে এবং মংকোতির ছেলেকে আকো বা দাদা বলে। এখন দুইজনে দিন রাত্রি খেলা করে এবং আমোদ করিয়া দিন কাটায়।

ক্রমশঃ।

শ্রীরামলাল সরকার।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা

গতজীবনের স্মৃতি।

নীরব দুপর বেলা, শাখীতলে শুয়ে যদি
চেয়ে রই আকাশের পানে,
দূরে শুভ্র মেঘমালা, কভু ধায় মিশে যায়,
কভু পুন বিকাশে নয়নে।
আকাশের অনন্ততা প্রাণে প্রাণে মিশে যেন
অনিমিষ চেয়ে রয় আঁখি।
মেঘের আড়াল হতে একি লুকাচুরি খেলে
অই দূরে দু চারিটী পাখী।
কেবলি চাহিয়ে রই আবিল নয়ন কোণে
কোথা হতে বহে অশ্রুধার?
রুদ্ধ শ্বাসে কেন আজি শুদ্ধ আকুলতা জেগে
পূর্ণ হিয়া করে তোল পাড়!
এ হেন বিহগ কভু অই দূর মেঘ মালা
দেখি নাই আরো কত দিন?
কখনো দেখেছি বুঝি মনে নাই তবু কেন
মনে পরে এ কি স্মৃতিহীন!
দেখি নাই তবে কেন নব স্বপনের মত
প্রাণে আনে অজ্ঞাত বিস্ময়।
কাহার গোপন ভয়ে এলোমেলো স্মৃতি আজি
তবে কি জ্ঞান বিস্মৃতিময়?

---

* ব্রহ্মদেশে কাঁচা মৎস লবণ সংযোগে মথিয়া বাকুটিয়া কর্দ্দমাকার করিয়া রাখে, রন্ধনকালে সমস্ত ব্যঞ্জনে এই নাপ্পি গুলিয়া দেয়, যেমন আমরা ঘৃত ব্যবহার করি। ইহা না হইলে বর্ম্মাদিগের কোন ব্যঞ্জন আস্বাদ-যুক্ত হয় না। নাপ্পির গন্ধ এমন বিকৃত যে, আমরা তাহা সহ্য করিতে পারি না।

পুরাতন সনে যদি মিশাই আপন হিয়া
জানি আমি অনাদি পুরাণ
তবু স্পষ্ট করে কভু বুঝিতে পারি না কেন
একি যাদু কুহক বিজ্ঞান।
নুতনের আলিঙ্গনে এত দৃঢ় রুদ্ধ হিয়া
ছেড়ে দূরে যেতে নাহি পারি।
আত্মহারা হয়ে কভু পুরাতন ধ্যানে একা
কাটি নাই পূর্ণ বিভাবরী।
বুঝিনে পুরাণে তাই তবু অই পাখী আজি
একি ভাব অন্তরে জাগায়।
চির পুরাতন আমি বুঝে বুঝে ভুলে যাই
নুতনের প্রমত্ত নেশায়।
অই দূরে মেঘ মালা দেখেছিও কত দিন
অজ্ঞানতা মগ্ন কেন স্মৃতি?
একি ছায়া আবরণে একি মোহ বিস্মরণে
আবৃত হৃদয়ে দিবারাতি।
আজি পুরাতন লয়ে কেবলি ভাবিব মনে
তবু জানিব না পুরাতন?
চকিত বাসনা প্রাণে অইত গোপন করে
নুতনের তরে আস্ফালন।
তবে কি পরাণ আর পারিব না জানিবার
তাই কি নিরাশা জাগে প্রাণে?
অভিনব দৃশ্যে কত পূর্ণ বিশ্ব অনিবার
করণ পূর্ণ শুধু নুতনে।
অই দেখ ফুল কত কলিকার পানে চাহি
হেসে হেসে কোথা ঝরে যায়।
গোপন সুরভি অই পরশিয়ে নাসা শুধু
অই দূরে পবনে লুকায়।
রাঙ্গা ছবি রেখে অই তপন ডুবিয়ে যায়
সহসা বিহগ করে গান।
পুরাতন জ্ঞান তাই এলো মেলো হয়ে যায়
নুতন কৌতুকে ভরে প্রাণ।
অস্ফুট পুরাণ জ্ঞান শৃঙ্খলে বাঁধিছে তবু
চঞ্চল নুতন তায় কত।
নুতনের খর স্রোতে ভেসে দূরে নাহি নাই
সমভাবে রহি অবিরত।
পুরাতন হতে স্রোতে নুতনে সুষমা এত
নুতন প্রেম—বিশ্ব জীবন।
পুরাতন জ্ঞান একা জাগিলে ভাঙ্গিয়ে যায়
মহা বিশ্ব-আত্মার স্বপন।
নুতন কেবলি তাই মরে মরে বেঁচে উঠে
জীবন মরণে একি খেলা।
নুতনের সনে সদা পুরাতন মিশে রহে
তাই বিশ্বে ফুরায় না বেলা।

শ্রীকুমুদকান্ত বসু।

অবসাদ।

(১)

কি হবে কাঁদিয়া।
ভুলে যাও সেই স্মৃতি, সেই পুরাতন গীতি,
সেই মূর্ত্তি ফেলগো ভাঙ্গিয়া—
ছি ছি ক্ষুদ্রতার ধ্যান,
প্রাণে যার ব্যবধান,
দারুণ অসূয়া, ঘৃণা, স্বার্থ, অভিমান,
তা'রে কি হবে ভাবিয়া?

(২)

এ ধরা যে কলঙ্কে স্কার,
ক্ষুদ্র বীণা ছিঁড়ে যায় তার।
নাহি প্রেম নাহি শিক্ষা, হৃদয়ের উচ্চ দীক্ষা,
সদা ঘাত প্রতিঘাত বয়।
সে মহা-মিলন আহা, মরতে কি মিলে তাহা,
তাই প্রাণ পুতিগন্ধময়!
তবু ইন্দ্রিয় লালসা,
প্রবল সৌন্দর্য্য তৃষা
প্রণয়-অঙ্কুরে ঘটে নানা ব্যভিচার!
অবসাদ, ঘোর হাহাকার!

(৩)

মত্ত সব মোহ মদিরায়,
শ্মশানের চিতাধুমে, ছবি মুছে যায় ক্রমে
দু'দিনের দুই ফোঁটা তপ্ত অশ্রু বয়
পুন জাগে ভালবাসা, অতৃপ্ত সৌন্দর্য্য তৃষা,
পাপিয়ার' মধুকণ্ঠে শুভ্র জো'ছনায়!
কত আবাহন-গীতি,
আদর চুম্বন প্রীতি,
বাহুপাশে বেঁধে আহা নবলতিকায়।
হৃদয়ের কত কি শুকায়।

(৪)

হের প্রাণ ভরিয়া,
সেই রাজ রাজেশ্বর, শুভ্র মূরতি সুন্দর,
প্রীতিমাখা প্রেমানন যাঁর,
শত সৌন্দর্য্যের রাশ, অধরে সুধার হাস
নিত্য প্রেমময় আহা করুণা নির্ঝর !
মরণের মহাপারে,
অভিষেকি নেত্রাসারে,
বসাও হৃদয়াসনে, সেই প্রাণারামে,
মহাপ্রেমে, যা'বে নিত্যধামে !
আহা সে মহা-মিলন,
দেবতার আকিঞ্চন,
রোগ, শোক, পাপ, তাপ, দরশনে ক্ষয় !
কত সুধা যাবে উছলিয়া,
জুড়াইয়ে,
এ দগধ হিয়া !

শ্রীনীলরতন মুখোপাধ্যায় ।

ভালবাসা-রহস্য ।

(মিসেস্ ব্রাউনীং অনুকরণ)

দাদা যে আমায় কত ভালবাসে কি আর বলিব তোরে,
নিশ্চয় জানি স্নেহখানি তার সব চেয়ে বেশী মোরে ।
এলো মেলো তার বইগুলি আমি নিত্য গুছাই গিয়ে,
শ্রান্ত হইয়া বাড়ী ফিরে এলে হাওয়া করি পাখা নিয়ে,
পশমের জুতো বুনিয়ে সেদিন হাতে দিতে গেনু, হাসি
দাদা কহিলেন—লক্ষ্মী বোনটী কত তোরে ভালবাসি।
নিশ্চয় সে যে খুবি ভালবাসে, সন্দেহ নাই কারো,
পাখা করা আর জুতো বোনা তবু ভালবাসেসে যেআরো ।
ছোট বোন মোর পেয়েছে মোদের মায়ের মুখের হাসি,
তাই মোরা সবে সকলের চেয়ে তাহারেই ভালবাসি ।
আমার খোঁপার সোণার ফুলটী সেদিন দিয়েছি তারে
ছোট আমার কাণের দুলটী রেখেছি তাহারি তরে
সেদিন যখন চুল বেঁধে দিই আমায় বলিল মেয়ে
দিদি তোরে আমি খুবি ভালবাসি বেশী সে সবারি চেয়ে।
নিশ্চয় সে যে খুবি ভালবাসে সন্দেহ নাই কারো,
কেশের ফুলটী, কাণের দুলটী ভালবাসে তবু আরো ।
বাবা যে আমায় কত ভালবাসে তুমি নাকি তাহা জান ?
তাই বোন মোরা অনেক ত আছি, আমাকেই বেশী কেন ?
খাওয়ার সময় কাছে না বসিলে হয় নাক খাওয়া তাঁর,
হেঁসে তাঁর সাথে কথা না কহিলে, মুখ খানি হয় ভার
সেদিন যখন পান দিতে যাই, বাবা বলিলেন হেসে,
গৃহটী আমার করেছিস আলো তুই মোর ঘরে এসে ।
নিশ্চয় তাঁর খুবি ভালবাসা সন্দেহ নাই কারো,
বিয়ে হলে যাবি পর-ঘরে তাই আদর করেন আরো।
হায় সে যে মোরে কত ভালবাসে কি আর বলিব বল?
মন ভুলাবার প্রাণ গলাবার কতই জানে সে ছল ।
আমি ছাড়া যেন আপন বলিয়া কেহ আর নাই তার,
আমায় দেখিতে আসি সে হেথায় কত ছলে কতবার ।
সেদিন যখন কথা না শুনিয়া তাড়াতাড়ি এনু চলে,
সজল নয়নে কত যে সাধিল, কেমনে বুঝাব বলে ।
সেই ভালবাসা চরম পরম সন্দেহ নাই কারো,
হৃদয়টী দিয়া দিও প্রতিদান, পার যদি দিও আরো।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী, বি-এ ।

উন্মাদিনী শক্তি ।

যিনি মহামায়া, আদ্যাশক্তি অন্নপূর্ণা, তিনিই সময়ান্তরে অসুরনাশিনী দুর্গা। বঙ্গ দেশে শরৎকালে কিসের উৎসব হয় ?—উন্মাদিনী মহাশক্তির জয়োল্লাসে ধরা প্রকম্পিত,—পৃথিবী উন্মাদিত। কিন্তু এ বঙ্গে যেন কেবল মৃতেরই উৎসব হয়! কতকাল ধরিয়া এদেশে মহামায়ার উৎসব হইতেছে, কিন্তু রাবণ-অসুর-বধের নব মহাশক্তি লাভ হইল কই ? এত উৎসব হইল, তবু আমরা চিরকালই আসুর-সংগ্রামে পরাজিত হইতেছি কেন ? কে বলিবে ?

মা যিনি, তিনি চিরকালই মা থাকেন

না কেন? মায়ের মূর্ত্তি ক্ষমা, শান্তি ও আনন্দের মূর্ত্তি। সংসারের সকল সন্তাপ দূর করিবার জন্য এ সংসারে মাতৃমূর্ত্তি। মায়ের কোলে সদা অমিয়ধারা। মা-হারা সন্তান সকল পাপের আশ্রয়। সন্তান যখন সংসার-ধূলি-মাটী মাখিয়া কদাকার হইয়াছে—পাপ সন্তাপে ম্রিয়মান, জ্বালা যন্ত্রণায় অস্থির, দুশ্চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত;—অহঙ্কার আত্মাভিমানের আগুনে পুড়িয়া ভস্মীভূত,—তখন সন্তানকে রক্ষা করিবে কে? এক মা ভিন্ন এজগতে আর কেহই নাই। সন্তানকে রক্ষা করিবার জন্য—বাঁচাইবার জন্য, জগজ্জননী এই ধরাধামে মাতৃমূর্ত্তি রচনা করিয়াছেন, আবার তিনিই সময়ান্তরে দুর্গতি-নাশিনী-রূপ ধরিয়া পাপাঙ্কুর দমন করিতেছেন। ভাবিলেও সুখ, দেখিলেও সুখ। যিনি গণেষ-জননী, তিনিই সময়ান্তরে অসুর-নাশিনী।

কেহ কেহ বলেন, ধরাতে এত পাপ কোথা হইতে আসিল? কেহ কেহ বলেন, পাপ বিধাতার সৃষ্টিতে কে রচনা করিল? নানা ধর্ম্মশাস্ত্র এ প্রশ্নের বিভিন্নরূপ মীমাংসা করিয়াছেন, কিন্তু কোনটীই দর্শন-বিজ্ঞান-সম্মত নয়। বিধাতা যদি অদ্বিতীয়, তবে পাপ কি তাঁহার বিধান-সম্মত নয়? দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতা, স্বাধীনতা—কোথা হইতে আসিল? একের সন্তানগণ কেন এক অদ্বিতীয়ের অনুগত হইয়া চিরকাল উন্নতির পথে চলিত পারিল না?

আমি ভাবিতেছিলেন, কেন আমি একবার সৎ, কেন আর একবার অসৎ হই? ভাবিতেছিলাম, বাল্যকাল হইতে সংযমের পথে, নিবৃত্তির পথে চলিবার জন্য কত কঠোর সাধনা করিলাম, তবুও কেন আমার পা পিছলিয়া যায়—তবুও কেন ঠিক থাকিতে পারি, পারি, পারি না? যাঁহারা আত্মতত্ত্ব-চিন্তনে সদা ব্যতিব্যস্ত, তাঁহাদের সকলের মধ্যেই এ প্রশ্ন কখনও কখনও উপস্থিত হইয়া থাকিবে যে, দেব এবং আসুরভাব মানব-প্রকৃতিতে কোথা হইতে আসিল? আমি কতবার উঠিলাম—আবার কতবার পড়িলাম। কত উত্থান, কত পতন মানব-ভাগ্যে নিয়ত ঘটিতেছে। কেন, হায়, কেন এরূপ হয়?

আমি এতদিন পর বুঝিতেছি, কি এক অবিনাশী শক্তি নিয়ত অবস্থা ও ঘটনার বিচিত্র চক্রে ফেলিয়া মানবকে ও আমাকে ঘুরাইতেছেন। উঠি যখন, সেই শক্তিতেই উঠি, পড়ি যখন সেই শক্তিতেই পড়ি!! আমি শক্তিহীন,—জ্ঞানহীন, বুদ্ধিহীন। কোথা হইতে আসিয়াছি, জানি না; কোথায় চলিয়াছি, তাহাও জানি না। কেন আছি, জানি না, মৃত্যুর পর কোথায় যাইব, তাহাও জানি না। তুমি যত বড় পণ্ডিতই হওনা কেন, তুমিও জান না। তোমার জ্ঞান বিজ্ঞান, দর্শন কাব্য সব এখানে নিরুত্তর। যে ব্যক্তি স্বাধীনতার বড়াই করিয়া বলে, আমি করি, আমি বলি, তাঁহার ন্যায় গণ্ড মূর্খ আর কেহই নাই।

একজন লোক জলে ডুবিয়া মরিতেছিল, আর একজন অমনি তাহাকে তুলিবার জন্য জলে ঝাঁপ দিয়া ডুবিয়া মরিল! কত কাদার দামিয়েন, কত হাওয়ার্ড, কত উইলবারফোর্স, কত ম্যাটসিনি, কত রবার্ট এমেট পরের চিন্তনে, পরের উদ্ধারের জন্য জীবন ঢালিয়া চলিয়া গিয়াছেন, কে না জানে? কত ঘরে ঘরে কত পিতা মাতা সন্তানের জন্য জীবন ঢালিয়া চলিয়া যাইতেছেন, কে না জানেন? কাহার ইঙ্গিতে এই

সংসারে নিত্য এইরূপ আত্মত্যাগ দেখি। আমি কত অপরাধ করিয়াছি, তবুও আমার ক্ষুধার সময় নিত্য আহার হাজির, পিপাসা নিবারণের জন্য জল হাজির—শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য বায়ু হাজির—উষ্ণতার জন্য সূর্য্য হাজির। এই পৃথিবীর কত মানুষ, কীট পতঙ্গ যেন কেবল আমারই জন্য সৃষ্ট—কত, কত জন কেবল আমারই জন্য খাটিতে-ছেন। যে হতভাগ্য নরাধম পাপী, তাহার জন্যই এত আয়োজন। কত কত জন আমারই জন্য প্রাণ দিতেছেন। কেন এরূপ হয়? অনেক ধার্ম্মিক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেন, জাপানের অসংখ্য লোক কেন জীবন মমতা পরিত্যাগ করিয়া সমরে আত্ম-বিসর্জ্জন করিতেছে? কেন জীবন ঢালিতেছে? হে তার্কিক, তুমি তোমার জননীকে জিজ্ঞাসা কর, কেন তিনি তোমাকে স্তন্য-দুগ্ধ পান করাইয়া পালন করিয়াছিলেন? তোমার পিতাকে জিজ্ঞাসা কর, কেন তিনি তিল তিল করিয়া তোমার জন্য শরীরের রক্ত জল করিতেছেন। তোমার জীবন ধারণের জন্য কত সৃষ্ট বস্তু বিনষ্ট হইতেছে, তাহা একবার ভাব। ঐ পতঙ্গকে জিজ্ঞাসা কর, কেন সে অগ্নি দেখিলেই তাহাতে ঝাঁপ দিয়া পুড়িয়া মরে? কেন পৃথিবীতে এত আত্মত্যাগ, সে রহস্য কে বুঝিবে? মৃত্যু, জীবনের পরিণাম, কিন্তু তাহা তোমারও ইচ্ছা-প্রসূত নয়, আমারও নয়। মৃত্যু, সৃষ্ট বস্তুর রূপান্তরের কারণ, ধ্বংস নয়। ইচ্ছা করিলেই আমি যেমন শ্বাস রোধ করিতে পারি না, তেমনি, ইচ্ছা করিলেই আমি অনন্তকাল সমভাবে অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় বাঁচিয়া থাকিতে পারি না। পরিবর্ত্তন, রূপান্তরপ্রাপ্তি, প্রকৃতির নিয়ম। মৃত্যু, তোমার, আমার সকলেরই জীবনের পরিণাম, কিন্তু উহাই ধ্বংস নহে। এক এক কাজের জন্য এক এক রূপ ধারণ, সে কাজ শেষ হইলেই সে রূপের পরি-বর্ত্তন। যাহার যে কাজ, তাহা সিদ্ধ হইলেই তাহাকে পরিবর্ত্তন-স্রোতে বা মৃত্যুমুখে পড়িতে হইবে। কে তাহার গতি প্রতিরোধ করিবে? কাহারও সে সাধ্য নাই। পরিবর্ত্তনের জন্যই জন্ম;—মরিবার জন্যই আগমন, আমরা মরি-বার জন্যই যেন সৃষ্ট। এত কষ্ট করিয়া জীবন ধারণ করিতেছি, কেবল যেন মৃত্যুর জন্য! ঐ মৃত্যু যদি জীবনের পরিসমাপ্তি হইত, তবে কি মানুষ শান্তি পাইত? না—কিছুতেই না। জন্ম মৃত্যুতে কেবল বিধাতার লীলাতত্ত্ব প্রকাশিত হই-তেছে, উহাতে আর কোন তত্ত্বই নাই। কেন আসিয়াছি, তিনিই জানেন, কেন রক্ত মাংসের উত্তেজনা দিয়া আমাকে অশেষ অবস্থায় নিষ্পেষিত করিতেছেন, তিনিই জানেন, আবার কেন বা আমাকে মৃত্যুর ভিতর দিয়া লইয়া যাইবেন, তিনিই জানেন। আমি আর কিছুই জানি না, জানি কেবল ইহা যে, আমি ইচ্ছাবর্জ্জিত পরাধীন জীব;—তরঙ্গাঘাতে উঠিতেছি, তরঙ্গাঘাতে পড়িতেছি—ইহাতে আমার কৃতীত্ব বা বাহাদুরী কিছুই নাই।

তবে কি পাপ এ জগতে নাই? এক অদ্বি-তীয় ইচ্ছা-শক্তি স্বীকার করিলে ঘটনা-প্রসূত পাপ উড়িয়া যায়। পাপ কি? উহা ঘটনা এবং অবস্থার রূপান্তর ভিন্ন আর কিছুই নয়। যাহার পক্ষে যখন যাহা বিবেক-নিষিদ্ধ, তখন তাহার পক্ষে তাহাই পাপ, অপরের পক্ষে নহে। বিবেকের আদেশ না শুনিয়া

মসুরির ডাইল খাইলে আমার অপকার হইতে পারে, আমার পক্ষে আজ অন্যায় হইতে পারে, তোমার পক্ষে পরম লাভ হইতে পারে। কাল আমার পক্ষেও অনুরূপ হইতে পারে। সকল ঘটনাই এরূপ। বিধি-নির্দ্দেশিত পথে চলিলে আর পাপের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় না। কিন্তু বিধি-নির্দ্দেশিত পথে চলি না কেন? না চলার শক্তি আমার আছে কি? কখনও আছে, আবার কখনও নাই। কখনও আমাকে শিক্ষা দিবার জন্য স্বাধীনতা দিয়া, মা যেমন কখনও কখনও ছেলেকে ছাড়েন, তেমনি, জগজ্জননী আমাকে ছাড়িয়া দিতেছেন, কিন্তু বিপথে গেলেই প্রেম-বংশী-ধ্বনিতে আকর্ষণ করিয়া ফিরাইয়া আনিতেছেন। কখনও বা কত তীব্র শাসন উপস্থিত করিয়া আমাকে দমিত করিতেছেন। আমি যাইতে চাই—আর যাইতে পারি না। পাপের পথ হইতে কে মানবকে ফিরায়? তুমি নও, আমি নই, কেবল তিনিই ফিরান। এক বই শক্তি নাই, নেতা নাই, রক্ষক নাই, গতি নাই; মুক্তি নাই,—কিছুই নাই। সেই শক্তি কখনও অসুর সৃষ্টি করেন,—আবার সময়ান্তরে অসুর বিনাশ করেন। অনন্ত-রূপিণী মা—অনন্তরূপে প্রকাশিত হইয়া কত কি করিতেছেন, আমি অবোধ ছেলে, কি জানি, কি বলিব? তিনি, কেবল তিনি, কখনও শান্তি-রূপিণী, কখন কেবল ক্ষমা করিতেছেন, কখনও উন্মাদিনী বেশে অসুর বিনাশ করিতে রণরঙ্গিণীবেশে আমাকে ভ্রুকুটীতে প্রকম্পিত করিতেছেন। কখনও স্নেহ-মমতা-মূর্ত্তিতে তিনি ধরাকে সুশীতল করিতেছেন, কখনও শাসন-অস্ত্র হস্তে লইয়া ভীষণ অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া সকলকে সন্ত্রাসিত করিতেছেন। কখনও তিনি অন্নপূর্ণা, কখনও তিনি অসুরনাশিনী। বলিব কি?—তিনি এক মাতৃমূর্ত্তিতে সকল শক্তির সমাবেশ করিয়া এই ধরাকে জীবের বাসের যোগ্য করিয়াছেন। দুষ্কৃতি এবং পাপ দমন করিবার জন্য নিত্য নববেশে আবির্ভূতা হইতেছেন।

জাপান আজ মাতিতেছে কেন? হায়, আমি মাতিতে পারিলাম না কেন? আমি বলিতেছি, জাপান অধর্ম্ম সঞ্চয় করিতেছে!! হায়, আমার এ মতি কেন হইল? জাপান যাঁহার সৃষ্ট, আমিও কি তাঁহার সৃষ্ট নই? জাপান যাহাকে ধর্ম্ম মনে করে, আমরা তাহাকে অধর্ম্ম কেন মনে করিতেছি? এ সকলই বিধাতার লীলা। বিধাতা জাপানের উন্মাদিনী শক্তির মধ্যে আজ রণরঙ্গিণী বেশে আবির্ভূতা, আর তোমার আমার মধ্যে মৃত্যুর করাল-জাল বিস্তার করিয়া উদাসীনতা, আলস্য, পরাধীনতা, নির্জ্জীবতার প্রকট লীলা খেলিতেছেন! অসুরের পদ লেহন আমাদের শান্তি এবং আরামের নিকেতন, বিশ বা শত মুদ্রার মধুর শব্দের মোহিনী শক্তিতে ভুলিয়া আমরা কত কত পদাঘাত সহ্য করিয়াও মানুষ বলিয়া অভিহিত হইতেছি! আর ঐ জাপ, ঘৃণিত, অসভ্য জাপ, আজ অম্লান চিত্তে, প্রমত্ত হইয়া স্বদেশের জন্য জীবন বিসর্জ্জন দিতেছে!! কত কত জন পতঙ্গের ন্যায় অগ্নিতে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। যাহার ভাগ্যে যাহা, আমরা বিচিত্র লীলাময়ী আদ্যাশক্তির বিভিন্ন লীলার তরঙ্গে আন্দোলিত হইয়া দেখিতেছি এবং মজিতেছি। কিন্তু আমরা ধন্য যে, স্বদেশের হিত-মন্ত্রে দীক্ষিত এ হেন জীবন্ত জাতির অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ-কাহিনী শুনিতে অবসর পাই

নাম। জয় মা আদ্যাশক্তি, তোমারই জয়। কবে মা তুমি আমাদিগকে এইরূপে মাতাইবে? অসুরনাশিনী শ্রীদুর্গার নৈষ্ঠিক পূজায় মত্ত হইয়াও এ জাতি কেন মা অধঃপাতে যাইতেছে? আর কি মা জীবন্ত অসুর-নাশিনীর ভীষণ মূর্ত্তিতে এ ভারত মাতোয়ারা হইবে না? আমাদের ভিতরে বাহিরে অসংখ্য অসুর নিত্য কত দুর্জ্জয় প্রভাব বিস্তার করিতেছে, মা, তুমি একবার তাহা দেখ! দেখিয়া যাহা করিতে হয়, কর। দোহাই মা তোমার, একবার উন্মাদিনী শক্তির মহা হুঙ্কারে আমাদিগকে মাতাইয়া তোল;—আমরা সর্ব্বপ্রকার অসুরনাশে সিদ্ধমনোরথ হইয়া অম্লান চিত্তে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে যেন অভ্যস্থ হই। তোমার ইচ্ছাই জয়যুক্ত হউক—তোমার মহীয়সী ইচ্ছার নিকট অবনত হই।

শিশু প্রকৃতি।

আমরা বড় হইয়াছি—বুড়া হইয়াছি, তথাপি পৃথিবীর বারো আনা রহস্য বুঝিতে পারি না। এখনও যদি এই, যখন শিশু ছিলাম, না জানি এ নূতন পৃথিবী তখন কেমন লাগিত! অতীত দৃষ্টি বৃদ্ধের মনোরঞ্জন করে, যুবার আশা-পূর্ণ দৃষ্টি সম্মুখ ভাগে। কল্পনার পথে দাঁড়াইয়া, যতই উচু হইয়া দাঁড়াই না কেন, যতই সাগ্রহ চক্ষে পশ্চাৎ ভাগে চাহিয়া দেখি না কেন—সে দূর অতীতের কথা মনে পড়ে না। অতীতের যে আবহাওয়ায় বর্ত্তমানের তীব্রতা হ্রাস করে, সে আবহাওয়া সুখের, কিন্তু তাহাতে তৃপ্তি হয় না,—তখন হরে দরে কাটিয়া জীবনটা সুখেরও নহে, দুঃখের নহে, এক রকম মোটামুটি ধরিয়া লইয়া পশ্চাতের চক্ষু সামনে আনিয়া বৈতরণীর পর পারে একটী সুখের স্থান খাড়া করি—"ঐ যে দেখা যায়, আনন্দধাম ভব-জলধির পারে।"

প্রকৃত পক্ষে এটা বিচারসিদ্ধ—কল্পনায় সত্যযুগ অতীতে,—শিশু তাই সকল সুখে সুখী বলিয়া ধরিয়া লই। শিশুর গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া আপন প্রাচীন জীবনের কাহিনী রচনা করিতে প্রয়াস পাই।

আপন জীবনের রহস্য গাঢ় হইলেও, শিশু-জীবনের রহস্য গাঢ়তর বলিয়া বোধ হয়; তাই শিশু কি ভাবে—কি করে, কি বুঝে—যে "নাম না জানি ঠিকানার" রাজ্য হইতে আসিল, সে রাজ্যের সঙ্গে এই ধুলী কাদার, এই বড় দুঃখের, এই জরামরণের রাজ্যের কি তুলনা করে, কি করিয়া কি ভাবে, তাহার মনে কি খেলে, জানিতে বড়ই ঔৎসুক্য হয়। তাহার দৃষ্টিতে অর্থ, গতিতে অর্থ, চলন বলন সকলই অর্থপূর্ণ—সে অর্থ বুঝিতে পারি না বলিয়া, অর্থটা বড় কঠিন বলিয়া মনে হয়, এবং বুঝিবার প্রয়াস আরও বাড়ে। তাহার হাসিতে অর্থ, কান্নায় অর্থ, অস্পষ্টকাকুতিতে অর্থ, সে দেবকুমার পূর্ব্ব রাজ্য হইতে নবাগত, তাহার দেহে এখন অরুণ রাগ, তাহার মনে এখন স্বর্গের ভাব, ধুলায় এখনও মলিন হয় নাই। যদি দুটা কথার অর্থ কিছু কিছু বোঝা যায়, কল্পনায় তাহার চতুষ্কোণ পুরাইয়া দেই, দিয়া পূর্ব্বজন্ম, পূর্ব্ব সংস্কার বা পূর্ব্ব রাজ্যের আভাস বলিয়া কৎকণ্ঠিত কণ্ঠে, নূতন সুধার আশায় অপেক্ষা করি। দুএকটী

কথা, দুই একটী ভাব আপাতঃ বিস্ময়কর। বিজ্ঞান জানা না থাকায়, অতীব বিস্ময়কর হইয়া পড়ে—তখন কল্পনা তাহা লইয়া কি চিত্রই না আঁকিতে বসে। আমার টুনু এক বৎসরের যখন শিশু ছিল, আমার মেয়েরা খেদের স্বরে গান ধরিবা মাত্র সে কাঁদিয়া উঠিত। মেয়েরা তামাসা দেখিবার জন্য ও দেখাইবার জন্য, যখন টুনু খুব প্রফুল্ল, সে গানটী ধরিয়াছে, অমনি মুখে বিষাদের ছায়া পড়িল, ক্রমে আঁখি মুদিয়া আসিল, শেষে সে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। অমনি লজ্জিত হইয়া মেয়েরা প্রফুল্ল স্বরে আনন্দের গান ধরিল, মুদিত কমল ফুটিয়া উঠিল, আবার টুনু হাসিতে লাগিল।

কত দেশে এইরূপ আকস্মিক ঘটনা লইয়া মনুষ্যে দেবত্ব আরোপিত হইয়াছে, স্বর্গ রাজ্য চিত্রিত হইয়াছে, শিশুজীবনের রহস্য দুর্ভেদ্য বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। সদ্যজাত শিশু মিটি মিটি চাহিতেছে ও আবার চক্ষু নিমীলিত করিতেছে। স্নেহঅন্ধ মাতৃহৃদয় বুদ্ধিকে প্রেমে রঞ্জিত করিয়া সে দৃষ্টির অনুসরণ করিল। ইংরাজীতে একটী প্রবাদ আছে যে, অভাব দ্বার দেশে উঁকি মারিলে ভাবনা জানালা দিয়া লাফাইয়া পড়িয়া চম্পট দেয়। শিশু প্রকৃতির পর্য্যালোচনা স্নেহময়ী জননীগণ কহিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের নিকট জগৎ শিক্ষা পায়। সে শিক্ষা কত অসম্পূর্ণ ও ভ্রমমূলক বিবেচনা করা যাইতে পারে। কল্পনার লূতাতন্তু বড় কোমল। কল্পনার গোলাপী নেশা বড় মধুর। কল্পনার মধুরতায় মানব জীবনের অনেক দুঃখ মানব সন্তান ভুলিয়াছে। তথাপি সত্য কঠোর অপ্রিয় হইলেও বিজ্ঞানের সত্য কল্পনার ছায়া অপেক্ষা আদরনীয়। শিশুর মন কল্পনাপূর্ণ। সে কল্পনা বহুব্যাপী, বিজড়িত কি দীর্ঘস্থায়ী নহে। জলের এক একটী অনাসক্ত বুদ্বুদ্। দু তিনটী মিলিয়া একটী নহে, বৃহৎ নহে, বহুস্থায়ী নহে। কিন্তু সেই একটীতে নানাবর্ণ, সেই একটীতে সে পূর্ণ, তাহাতে নিমগ্ন। শৈশব স্বপ্নের যুগ, অকপট বিশ্বাসের যুগ, সুখের যুগ। যে শিশু খেলায় উন্মত্ত হয় না, অসম্ভবে বিশ্বাস করে না, গল্পে মুগ্ধ হয় না, সে অসাধারণ শিশু। অনেকে তাহার মত নহে। কিন্তু সব শিশুর কল্পনা একরূপ নহে। কেহ বর্ণে, কেহ শব্দে, কেহ বা গতিতে আকৃষ্ট। কেহ ভয়, কেহ বিস্ময়, কেহ আনন্দের গল্প শুনিতে ভালবাসে। যাদুকরীর হাতে বনমানুষের হাড় অসম্ভবকে সম্ভব করে। মুহূর্ত্তে মানুষকে ঘোড়া ও কাঠকে মানুষ করে। শিশুর কল্পনা এই অসম্ভব-সম্ভাবী বনমানুষের হাড়। কি তাহা অপেক্ষাও অধিক। যাদুকর মানুষকে ঘোড়া করিলেও সে তাহাকে ঘোড়া বলিয়া বিশ্বাস করে না। কিন্তু শিশু অকপট হৃদয়ে তাহা বিশ্বাস করে।

এ বিষয়ে শিশুর মন পশুপক্ষী অপেক্ষা অব্যাবৃত। পাখী যখন খেলা করে, উড্ডীয়মান তৃণকে পতঙ্গ বলিয়া ধরিতে ধাবমান হয়, সেইরূপ উৎসাহ, সেইরূপ চেষ্টা, সেইরূপ আনন্দ। কিন্তু ধরিলে তাহাকে খাইতে চেষ্টা করে না। সে জানে সেটা পতঙ্গ নহে, তৃণ। কুকুর যখন বল আনিতে দৌড়াইয়া গিয়া বল হারাইয়া একটা পাতা কি মালা কুড়াইয়া আনিয়া প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত করে, প্রভু হাসিয়া তাহার পিঠে দুটা থাবড়া দিলে সে শুইয়া পড়িয়া দুই হাতে ধরিয়া

দাঁত দিয়া সে জিনিসটা ছিঁড়িতে আরম্ভ করে। সে জানে, সেটা বল নহে। বলকে সে ছিঁড়ে না।

কল্পনার ভিতর তুলনা আছে। শিশু যাহা জানে, তাহার সহিত যাহা জানে না, তাহার হঠাৎ একটা মিলন অনুভব করিয়া তাহাকে সেই শ্রেণীভুক্ত করিয়া লয়। ইহা বিচারসিদ্ধ কল্পনা। এ জন্য সে প্রজাপতিকেও পাখী বলে, ঘুড়ীকেও পাখী বলে, জেব্রাও ঘোড়া, গাধাও ঘোড়া। শিশু নিরাকার কিছু বুঝে না। বাতাস সোঁ সোঁ করিয়া বহিলে সে নিমেষ মধ্যে হাড় মাস রঙ্গ দিয়া ঝড়ের একটা চেহারা কল্পনা করিয়া তাহার মুখ চোখ সব ঠিক করিয়া রাক্ষস দেখিয়া ভীত হয়। ব্রহ্মার মত নিজের সৃষ্টিতে নিজে ভীত ও পলায়িত হয়।

ব্যক্তিত্ব বিধান নামরূপ কল্পনা শিশু প্রকৃতির বিশেষত্ব। তেমনি সঞ্জীবনী শক্তিও শিশুর অসাধারণ! মুহূর্ত্ত মধ্যে সে অচেতনকে সচেতন করিয়া কাষ্ঠখণ্ডকে সখা বানাইয়া, তাহাকে খাওয়াইয়া, পরাইয়া, তাহার সঙ্গে বসিয়া গম্ভীর ভাবে গল্প করিতে তাহার কিছু মাত্র কষ্ট হয় না, এবং তাহাতে তাহার আয়াস বা প্রতারণা নাই। নিভৃতে বসিয়া সে অকপট আনন্দে এইরূপ করে। তোমাতে সামান্য উপহাসের ভাব দেখিলে তাহার আকাশ-কুসুম উড়িয়া যায়। সে সঙ্কুচিত ও দুঃখিত হইয়া হয়ত কাঁদিয়া ফেলে।

মানব প্রকৃতির আলোচনায় বার বার বলিয়া আসিয়াছি, বানর, বর্ব্বর ও বালক এক জাতীয় জীব। অব্যাবৃত বর্ব্বর যুগে মানব প্রকৃতি পূজার সৃষ্টি করিয়াছে। বাতাস আগুন জলের নামরূপ সম্পাদন করিয়াছে, তৃণ-শিলাকে চৈতন্য দিয়া দেবতা করিয়াছে। শিশু-কাহিনী ও পৌরাণিকী আখ্যায়িকা এই বর্ব্বর যুগের—এই যুগে পক্ষীরাজ ঘোড়া ও ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমীর জন্ম। বর্ব্বর ও শিশু সমপ্রকৃতি বলিয়া শিশুও বর্ব্বরের ন্যায় কল্পনা করে এবং বর্ব্বর-কল্পিত শৈশব-কাহিনী তাহার এত মনোরম। এক একটী শিশু এক একটী বাল কবি, তাহার কার্য্য মাত্র অভিনয় লীলা। যদি অবসর থাকে, উপভোগ করিতে পার, এমন আনন্দ নাটক নভেলে পাইবে না। রাস্তার উপরে পাথরগুলি দিন রাত একভাবে পড়িয়া থাকে, রোদে পোড়ে, হিমে ভিজে, আহা, বেচারীদের কত কষ্ট, তাই দুই বোনে মিলিয়া সাঁঝের বেলা, অকাতর পরিশ্রমে সেগুলিকে জমা করিয়া কাপড় দিয়া ঢাকিতে শিশু ভিন্ন আর কে পারে? খোলাম কুচির টাকায় কাদার সুজি কিনিয়া সুরকীর চিনিতে মিষ্ট মোহনভোগ বানাইতে শিশু-কবি ভিন্ন শক্তি আছে আর কার?

শিশু-কল্পনায় নিরাকার নাই, অচৈতন্যতা নাই, শূন্যতা নাই। সে যেমন শব্দকে ও গতিকে নামরূপ দেয়, অচেতনকে সচেতন করে, অন্ধকারে রাক্ষস দেখে, আলোকে দেবতা, তেমনি শূন্যস্থান মাত্রকে সজীব পদার্থে পূর্ণ করিয়া ফেলে। তাহার নিকট অসম্পূর্ণতা নাই। সে অস্থিখণ্ড পাইলে কল্পনার সঞ্জীবনী মধ্যে তাহাতে রক্তমাংস সঞ্চারিত করিয়া ফুৎকারে প্রাণদান করে। তুলনার মিলনে নূতন মাত্রকে পুরাতনে, পুরাতন মাত্রকে নূতনে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিন রাত্রি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গঠন করে। সুতরাং তার নিতুই নব, নিতুই চির-আনন্দ। আমাদের কাছে সে আনন্দের

ভিত্তি সামান্য, জোছনা খাইয়া আমাদের প্রাণ ভরে না—কিন্তু আনন্দও আমরা পাই না। ভিত্তি সার বা অসার হউক, আনন্দেই প্রাণ। আনন্দে শ্রীবৃদ্ধি—আমরা তাই শ্রীহীন, বুদ্ধিহীন।

লোকে বৃদ্ধ হয় কেন? বার্দ্ধক্য মনে হইলে দেহে সঞ্চারিত হয়। মনে যৌবন থাকিলে দেহে যৌবন থাকে। অমৃত বা ইলিকসির আবিষ্কার প্রয়াস বিফল। মনের প্রফুল্লতাই দেহের অমৃত।

চন্দ্রমণ্ডলে যুবক যুবতী প্রেমিকদ্বয়কে প্রেমালাপে প্রবৃত্ত দেখিতে পান। বৃদ্ধ পাদরী সে প্রেমিকদ্বয়কে একটী গির্জ্জায় পরিণত করেন। কুয়াসার কল্পনার বিচিত্র লীলা, আলোকে উহা সঙ্কুচিত। চন্দ্রমণ্ডলে শৈশব কল্পনা খেলিতে পায় না। কুয়াসায় অস্পষ্টতায় একই পদার্থ কত বিভিন্নরূপে বিভিন্ন আকারে প্রতিভাত হয়। যাহা একবার মনুষ্য,তাহাই আবার হরিণী, তাহাই আবার লতা-গুচ্ছ বলিয়া অনুমিত হয়। যাহা একবার রাক্ষস হয়, তাহাই আবার শত্রু, তাই আবার আপনার ভ্রাতা বলিয়া বুঝা যায়। মেঘমণ্ডল চিরদিন শিশু-কল্পনার অনন্ত লীলাক্ষেত্র। কাছে নহে যে হাতে ধরিয়া বুঝিতে পারিবে। এত দূর নহে যে দৃষ্টির অতীত, এত উজ্জল নহে যে কল্পনা চকিত হইবে। নির্নিমেষে মেঘ-মণ্ডলে তাকাইয়া শিশু কি নিরূপম আনন্দ উপভোগ করে। কখন সাগরে জাহাজ ভাসিতেছে, কখন পর্ব্বতে অসুরগণ খেলি-তেছে, কখন সেখানে দস্যুগণের আশ্রয়স্থান নির্দ্দেশিত হইতেছে। এই মেঘমণ্ডলের অপর পারে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীতে দেবগণের বাসস্থান ও রঙ্গভূমি, স্বর্গরাজ্য, নন্দন বন, কল্পবৃক্ষ ও অমৃতনদী শিশুর পিতা আরোপ করিয়া থাকেন। পিতা বৃদ্ধশিশু—কিছু দৃঢ়দৃষ্টি, কল্পনার ভাব অপেক্ষা ভাবনা অধিক।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

পুতুল বিয়ে।—উপন্যাস, শ্রীজয়চন্দ্র দাস প্রণীত, মূল্য ॥•, ছাতক, শীহট, গ্রন্থ-কারের নিকট প্রাপ্য। এই পুস্তক খানি আমরা বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছি। ইচ্ছার জীবনকাহিনী অতি সুন্দর রূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইচ্ছার নিঃস্বার্থ প্রেম-কাহিনী পড়িতে পড়িতে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। পুস্তকের রুচি মার্জ্জিত, উদ্দেশ্য মহান। বঙ্গীয় বিবাহ-প্রণালী সংস্কার করিবার জন্য এ পুস্তক লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সফল হউক।

১৭। কুল-দর্পণ।—শ্রীকৃষ্ণনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক সংগৃহীত, মূল্য ।•, পোড়াদিয়া, কানাইপুর পোষ্ট, ফরিদপুর। এ পুস্তকে সং-ক্ষেপে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ,কায়স্থ,বৈদ্য, গন্ধবণিক, মাহিষ্য, নবশাক এবং সাহা প্রভৃতি বংশের সংক্ষিপ্ত প্রাচীন বৃত্তান্ত অতি সংক্ষেপ সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

১৮। আলিরাজা।—মুসলমান বৈষ্ণব কবি। শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল সম্পা-দিত, মূল্য ।৵•। শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদুল করিম লিখিত সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ। ব্রজ-সুন্দর বাবু পূর্ব্ব বঙ্গের এই প্রাচীন কবির গাথাগুলি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করায় বাঙ্গালা ভাষার উপকার হইল। লেখা বেশ সরল ও সরস।

হিতকথা। —শ্রীদিননাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত, মূল্য /•। ক্ষুদ্র ২ কবিতায় নানা হিতকথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পুস্তক খানি ভাল।

২০। A short Account of the life and Teachings of the Swami Vibekananda. বিবেকানন্দ এ দেশের একজন মহাপুরুষ,—চরিত্রগুণে তিনি সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছিলেন। এই জীবনীতে তাঁহার জীবনের অনেক কথা সুন্দর ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আশা করি, সর্ব্বত্র পুস্তক খানি আদৃত হইবে।

শৈশব-স্মৃতি।—শ্রীপ্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায়—সিলং আসাম। ক্ষুদ্র পুস্তক। কালে লেখকের কবিতা লিখিবার ক্ষমতা জন্মিতে পারে।

২২। সপ্ত-স্তুতি-হার।—শ্রীবনওয়ারী লাল সিংহ, বি-এল বিরচিত। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে গ্রন্থকারের ভক্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া গেল।

২৩। দক্ষিণাপথ ভ্রমণ। শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী প্রণীত, মূল্য ১।০। দ্বিতীয় সংস্করণ, নিউব্রিটেনিয়া প্রেস। চিত্র-সম্বলিত। এই পুস্তক খানি অতি সুন্দর হইয়াছে, আমরা প্রথম সংস্করণ পাঠে একথা লিখিয়াছিলাম। দ্বিতীয় সংস্করণ পরিবর্দ্ধিত আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকখানি সর্ব্ব বিষয়ে সুন্দর—কি ভাষা, কি রুচি, কি বিষয় সন্নিবেশ, সর্ব্ব বিষয়েই পুস্তকখানি চিত্তাকর্ষক। পুস্তকখানি উপন্যাসের ন্যায় মধুর। একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া উঠা যায় না। নানা স্থানের ঐতিহাসিক বিবরণ এমন সুশৃঙ্খলার সহিত লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে যে, এই পুস্তক খানিকে একখানি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বলিলেও চলে। আমরা আশা করি,সর্ব্বত্র এই পুস্তকের বিশেষরূপে আদর হইবে।

২৪। সরল-মুষ্টিযোগ-চিকিৎসা।—শ্রীরজনীকান্ত সরকার সংগ্রহকার, মূল্য ১৷০, ২০১ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দোকানে এবং পাবনার অধীন মথুরা, গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।

এ দেশের দুর্ভাগ্য যে, মুষ্টিযোগ-চিকিৎসা উঠিয়া যাইতেছে, এবং চিকিৎসা দিন দিন ব্যয়-সাধ্য হইয়া উঠিতেছে। দেশে এমন অনেক ঔষধ প্রচলিত আছে, যাহাতে অল্পেই কঠিন কঠিন পীড়া আরোগ্য হইতে পারে। ইহার পরিচয় অল্লাধিক পরিমাণে সকলেইপাইয়াছেন। কিন্তু দিন ২ সকল ঔষধ অজ্ঞাত ও অপরিচিত হইয়া যাইতেছে। এই পুস্তকে মুষ্টিযোগ চিকিৎসার বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। রোগের বিবরণ এমন প্রাঞ্জল ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে, সকলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। ঔষধ গুলিও সকলেই সংগ্রহ করিতে পারিবেন। প্রতি ঘরে ঘরে ইহার এক খানি পুস্তক রাখিলে অনেক পরিবার অযথা-ব্যয়-বাহুল্য হইতে রক্ষা পাইবে। পুস্তক খানি ডিমাই ৮ পেজি ২৯০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইয়াছে, পুস্তকের কলেবর বিবেচনায় মূল্য অতি সুলভ হইয়াছে। বহুদর্শী সুবিজ্ঞ চিকিৎসকগণ এই পুস্তক দেখিয়া বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। আমরা আশা করি, সকলেই ইহার এক একখানি ক্রয় করিয়া গ্রন্থকারের উপকার করিবেন।

২৫। ধম্মপদ। শ্রীচারুচন্দ্র বসু কর্তৃক সম্পাদিত, প্রণীত ও প্রকাশিত, মূল্য ১৷০। সংস্কৃতে যেমন গীতা, পালি ভাষায় তেমন ধম্মপদ। এতদিন পর এই অত্যাবশ্যকীয় পুস্তক খানি বাঙ্গালা ভাষায় অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়া আমরা যারপর নাই আনন্দিত হইলাম। বুদ্ধ তথাগত অমূল্য উপদেশ সকল সংক্ষেপে ইহাতে বিবৃত করিয়াছিলেন। পুরাকালে চীন, জাপান, সিংহল, ব্রহ্ম, তিব্বত, ভারত প্রভৃতি স্থানে ইহা ভক্তিভাবে অধীত হইত। বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবস্থার পরিবর্ত্তনে ভারতবর্ষ হইতে ইহার অধ্যাপনা এক প্রকার উঠিয়া গিয়াছিল। কয়েক বৎসর ভারতে আবার বৌদ্ধমত প্রচারের আয়োজন হইতেছে। কিন্তু রাজগৃহ এবং নালন্দা বিশ্ব বিদ্যালয়ের (আধুনিক বড়গাঁও) শ্মশান-ভূমির স্মৃতি-সংরক্ষণে আজও কাহাকেও যত্নবান দেখিতেছি না। সে যাহা হউক, বুদ্ধ তথাগতের অমূল্য উপদেশ সকল এতদিন বাঙ্গালীর নিকট অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল; চারু বাবুর চেষ্টায় সে অন্ধকার এতদিনে বিদূরিত হইয়াছে। আমরা এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া অত্যন্ত উপকৃত

হইয়াছি। বাঙ্গালা ভাষা ধন্য যে, ক্রমে ক্রমে নানা ভাষার রত্নভূষণে ইহা অলঙ্কৃত হইতেছে। প্রতি শ্লোকের অতি সংক্ষেপে টীকা ও অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। এ পুস্তকের এদেশে খুব আদর হইবে, আমরা আশা করি। চারু বাবুর লেখনীতে পুষ্প-চন্দন বর্ষিত হউক।

২৬। গার্হস্থ-স্বাস্থ্যরক্ষা ও সরল ধাত্রীশিক্ষা।—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ রায়, এল, এম, এস প্রণীত, মূল্য ১৲। প্রথমে স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও সাধারণ দেশ-প্রচলিত রোগ সকল সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া পুস্তকের শেষাংশে ধাত্রী শিক্ষার মূল তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গুরু শিষ্যার কথোপকথনে বিষয় সকল বিবৃত হইয়াছে। ভাষা প্রাঞ্জল, ছাপা সুন্দর; বহুচিত্রের দ্বারা বিষয় বিশদীকৃত হইয়াছে। পুস্তক খানি অতি সুন্দর হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক নব নব তত্ত্ব সকলও ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এতদিন পর কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন, দেখিলেও আনন্দ হয়। আমরা আশা করি, এ পুস্তক প্রচারে এদেশের প্রভূত উপকার হইবে।

২৭। গোপবালা।—শ্রীবিমল চন্দ্র দেব বর্ম্ম প্রণীত। রাজধানী আগরতলা। এই পুস্তকখানি পড়িয়া আমরা সুখী হইলাম। স্বাধীনতার লীলাক্ষেত্র আগরতলা বাঙ্গালা ভাষার একমাত্র সহায়। আর কোন স্বাধীন রাজ্যে আগরতলার ন্যায় বাঙ্গালা ভাষার আদর নাই। পুণ্যভূমি আগরতলা, তুমি উন্নত হইয়া, বাঙ্গালা ভাষাকে রক্ষা করিও।

এই পুস্তক বীর প্রেসে মুদ্রিত। মহারাজাধিরাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন; কত মিষ্ট সুন্দর কবিতা যে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। কোকিল যেমন বনে জঙ্গলে সুমধুর সুরে গাইয়া গাইয়া নিজে সুখী হয়, তিনিও তেমনি নিজে লিখিতেন, নিজে ছাপাইতেন, নিজে পড়িতেন, পড়িয়া পড়িয়া নিজেই আত্মহারা হইতেন। ফুলের সুবাস জঙ্গলেই বিলীন হইয়া যাইত। পাখীর মধুর তান নীরবেই পরিসমাপ্ত হইত। এই মহাপুরুষের বংশে বিমল চন্দ্রের অভ্যুদয়। তিনি পিতার আর কোন বস্তুর উত্তরাধিকারী না হইয়া থাকিলেও, আমরা দেখিতেছি তিনি দেবদুর্লভ কবিত্ব শক্তির অধিকারী হইয়াছেন। তাঁহার জীবন ধারণ সার্থক হইয়াছে—বংশের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে।

এই পুস্তক খানি তাঁহার পিতৃদেবের নামে উৎসৃষ্ট হইয়াছে। তাহা কত সুন্দর পাঠক দেখুন—

"পিতঃ—

এনেছিলে বাণী হ'তে
অমর-বাঞ্ছিত ধন—
কবিত্বের বীণা;
একাকী বিরলে বসি,
বাজাইয়া মন-সাধে,
ভুলিতে আপনা।
মধুর ঝঙ্কার তার,
শুনিবার যোগ্য নহে
মরতের জীব;
তাই সঙ্গোপনে বুঝি
নিয়ে গেলে সঙ্গে করি,
মোহিতে ত্রিদিব!
অলখিতে সেই রব
পশেছিল কোন্ দিন,
শ্রবণে আমার;
আজিও অন্তর মন,
ভুলিতে পারেনি সেই
মধুর ঝঙ্কার!!
শুনি সে বীণার রব।
দারুণ দুরাশা-মোহে
মজে ছিল মন;
শুধু সে আমার বলে
রচিনু এ গোপ-বালা
করিয়া যতন।
অকৃতীর যতনেতে
এ হ'তে অধিক পিতঃ
কি হইবে আর?
আমার, এ গোপ-বালা
তোমার উদ্দেশে দিনু
ভক্তি উপহার।
সফল হইল আজি
জনম আমার!!"

পুস্তক খানি পড়িয়া আমরা বিমল আনন্দ পাইয়াছি। সুতরাং উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত সন্তানের জনম যে সফল হইয়াছে, তাহার কোনই সন্দেহ নাই।

যিশু ও যাদব।

পুরাকাল হইতে পরিজ্ঞাত পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক প্রদেশে একটা প্রখ্যাত প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহার মর্ম্ম এই যে, সুধময় স্বর্গধামে যে সকল পবিত্র পাদপ পরিদৃষ্ট হয়, তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম পাদপের নাম কল্পতরু। ভক্তাধিক ভক্তগণ এই কল্পদ্রুমের সুশীতল ছায়ায় দণ্ডায়মান হইয়া ভগবানের নামে যাহা কিছু কামনা করেন, কল্পতরু তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে তাহা প্রদান করিয়া থাকে। সাত্বিক হিন্দুর সনাতন ধর্ম্মকে আমি স্বর্গের কল্পতরুর সমতুল্য বলিয়া বিশ্বাস করি। বাস্তবিক বিশুদ্ধ বিশ্বাস ও অবিচলা ভক্তির সহিত ভক্তেরা হিন্দুধর্ম্মের নিকট যাহা কিছু প্রার্থনা করেন, হিন্দুধর্ম্ম তাহাই দান করিয়া ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে সমর্থ। জ্ঞানী, কর্ম্মী, ভক্ত, উপাসক, যাজ্ঞিক, হোমিক, যোগী, ভোগী, গৃহী, উদাসী, আস্তিক, নাস্তিক, মৌনী, তার্কিক, স্ত্রী, পুরুষ, দ্বিজধর্ম্মী বা শূদ্র, আর্য্য অনার্য্য, মহাসাধু বা অতীব দুরাচারী প্রভৃতি যে কেহ হিন্দুধর্ম্ম-কল্পতরুর সুশীতল ছায়ায় আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন, তিনি শ্রান্তি হইতে বিমুক্ত হইয়া বিমল শান্তি পাইতে পারেন, ইহা জ্যামিতির সংজ্ঞার ন্যায় ধ্রুব সত্য। বাঞ্ছা-কল্পতরু হিন্দুধর্ম্ম সকলেরই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। এই প্রাচীন ও প্রধান ধর্ম্মের এক আশ্চর্য্য প্রকৃতি এই যে, ইহা কোনও ব্যক্তি, জাতি, মত বা ধর্ম্মের প্রতিকূলতা করিয়া নিজের দলপুষ্টি অথবা পারস্পরিক অসৌহৃদ্য সৃষ্টি করেন না। হিন্দুধর্ম্ম কাহাকেও বিঘ্ন দেন না, এজন্য ইহা কাহারও অরি বা বৈরী নহে। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন—

> ধর্ম্মং যো বাধতে ধর্ম্মো ন স ধর্ম্মঃ কুধর্ম্ম তৎ।
> অবিরোধী তু যো ধর্ম্মং স ধর্ম্ম শুভ বিষয়ে॥

হিন্দু কাহাকেও নিরাশা বা নিরানন্দের অন্ধকারে নিপাতিত করেন না; হিন্দু কাহাকেও সুখ ও শান্তি এবং আশা ও আনন্দ হইতে বঞ্চিত করেন না। যে ব্যক্তি মুক্তিধনাভিলাষী, হিন্দুধর্ম্ম অবশ্য তাহাকে মুক্তিধনে ধনবান করেন; যে তাহা চায় না, হিন্দুধর্ম্ম তাহাকেও মুক্তি দিতে কৃপণতা করেন না। একদিকে মুক্তিপ্রার্থী মহাতপস্বী ধ্রুব ও মহাভক্ত প্রহ্লাদের মোক্ষ, এবং অপর দিকে ভগবৎ-ভাব-বিবর্জ্জিত জগাই, মাধাই, রাক্ষস রাবণ এবং পাষাণময়ী অহল্যার মুক্তি, হিন্দুধর্ম্মের উদারতার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। হিন্দুর ধর্ম্মেতিহাস আলোচনা করিয়া দেখান যাইতে পারে, ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত, সাধু হইতে মহা তস্কর পর্য্যন্ত, এবং শাস্ত্রনিয়ম-পালনকারী স্বধর্ম্মপরায়ণ-বিশিষ্ট হিন্দুসন্তান হইতে আরম্ভ করিয়া অ-হিন্দু মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, যবন, হুণ, শাক, রাক্ষস, নিশাচর, বর্ব্বর জাতি প্রভৃতি পর্য্যন্ত সকলেই হিন্দুধর্ম্ম-দ্রুমের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অভূতপূর্ব্ব শান্তি উপভোগ পূর্ব্বক মোক্ষ-ধামের পথিক হইয়াছে। প্রেম হিন্দুধর্ম্মের শোণিত, সাত্বিকতা এই ধর্ম্মের মেদ, বিশ্বজনীন উদার ভাব ইহার হৃদয়, সহানুভূতি ইহার মজ্জা এবং সর্ব্বজীবে মোক্ষের পথ প্রদর্শন করা ইহার আত্মা।

"জীবে দয়া নামে রুচি আত্মার সন্তোষ।
সর্ব্বধর্ম্ম সার হয়, কহে শাস্ত্র-কোষ॥"

সকল প্রাণীর প্রতি দয়া, ভগবানের নামে অনুরাগ এবং যে কর্ম্মে আত্মার কল্যাণ হয়, তাহাই ধর্ম্ম। হিন্দুর হিন্দুত্ব এই ধর্ম্মের অভ্যন্তরে অবস্থিত।

শুনা যায়, স্বর্গস্থিত কল্প-পাদপের শাখা প্রশাখা সমুহ নানাদিকে প্রসারিত হইয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে। হিন্দুধর্ম্মও ঠিক তাহাই; ইহা প্রাচীনা পৃথিবীর নানা রাজ্যে প্রকীর্ণ হইয়া বহুপ্রকার শক্তি সামর্থ্য ও শোভার সৃষ্টি করিয়াছিল। নিরপেক্ষ এবং সুক্ষ্মদর্শী প্রত্নতত্ত্ববিদ প্রাড্‌বিবেকীরা প্রকৃষ্ট প্রমাণ দ্বারা দেখাইয়া দিয়াছেন যে, এক সময়ে হিন্দুশাস্ত্র, হিন্দুসাহিত্য ও হিন্দুধর্ম্মের আলোকে সমগ্র জগৎ আলোকিত হইয়াছিল। দক্ষালয়ে শিবাপমানে অপমানিতা হইয়া হরপত্নী "সতী" যোগবলে এবং ইচ্ছামৃত্যুর সহায়তায় কলেবর পরিত্যাগ করেন, তাঁহার পবিত্র শরীর ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যে যে স্থানে পতিত হইয়াছিল, সেই সেই স্থান পবিত্র ও মহাপীঠ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। হিন্দুর সনাতন ধর্ম্ম প্রকীর্ণ হইয়া পৃথিবীর যে কোনও রাজ্য বা যে কোনও জাতি মধ্যে আলোক বিস্তার করিয়াছে, সেই সেই সেই জাতির ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহা প্রবেশ করিয়া সেই ধর্ম্মকে নবতেজে তেজীয়ান করিয়া তুলিয়াছে। য়িহুদী, পার্শীক, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেই হিন্দু শাস্ত্রের অকাট্য সত্য সমূহ এখনও এরূপ ভাবে অবস্থান করিতেছে যে, তাহা আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, এই সত্য সমূহ হিন্দুর সনাতন শাস্ত্র হইতে গৃহীত বা অনুকৃত। প্রাচীনতম হিন্দুজাতি ও হিন্দুশাস্ত্র এবং হিন্দুধর্ম্ম হইতে অনেকে অনেক প্রকার সত্য গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব ধর্ম্মশাস্ত্রকে সারবান ও শোভাময় করিয়া তুলিয়াছেন। হিন্দুর সত্য যে কোন শাস্ত্রে গিয়া প্রবেশ করিয়াছে, সেই শাস্ত্রকে বিপুল তেজ এবং বিশিষ্ট শোভায় এক নূতন ভাবময় করিয়া তুলিয়াছে। কল্পতরুর মধ্যে যেমন সকলের মনোবাঞ্ছা পূরণের উপাদান আছে, হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র-সাগরে য়িহুদীর, পার্শীকের, খ্রীষ্টানের, বৌদ্ধের, জৈনের, মুসলমানের এবং জড়োপাসক বা নাস্তিকের সকল প্রকার ভাবোর্ম্মি সুস্পষ্টরূপে বিদ্যমান দেখা যায়। বৃত্তের মধ্য বিন্দুরূপে হিন্দুধর্ম্ম দণ্ডায়মান থাকিয়া সকল ধর্ম্মকে তাহার চারিদিকে কতকগুলি অবিনশ্বর সত্য দ্বারা আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। কুসংস্কারান্ধ পুরুষেরা স্বীকার করুন আর না করুন, ইহা ধ্রুব সত্য যে, প্রাচীনতম হিন্দুধর্ম্ম হইতে সার ও সত্য গ্রহণ করিয়া অনেকে সারবান হইয়া উঠিয়াছে। গ্রীশ, রোম, পালেস্তাইন, আরব্য, পারস্য, মিশর, চীন, তিব্বত প্রভৃতি অসংখ্য জনপদে হিন্দু ধর্ম্মের সত্য এখনও বর্ত্তমান আছে। এই শাশ্বত ধর্ম্মের সত্য যেখানে গিয়া পৌঁছিয়াছে, সেই স্থানই "সতী"র দেহাংশের ন্যায় পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন প্রচারক, বণিক, পরিব্রাজক প্রভৃতি দ্বারা নানা দেশে হিন্দু ধর্ম্ম প্রসারিত হইয়াছিল। পৃথিবীর অনেক দেশ এখন অ-হিন্দু; এক সময়ে এই সকল দেশ হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী ছিল, অথবা হিন্দু প্রভায় আলোকিত ছিল।

বস্তুতঃ বুদ্ধ বা খ্রীষ্ট, পার্শীক বা জৈন, য়িহুদী বা প্রাচীন গ্রীশ, রোমক বা কোরিশ,

মিশর বা মেরুদেশ, রামমোহন রায়ের ব্রাহ্ম-ধর্ম্মমত অথবা দয়ানন্দ সরস্বতীর "আরিয়া" মত, প্রভৃতি যাহা লইয়া আলোচনা করি, তাহাতেই হিন্দু শাস্ত্রের প্রভাব এবং প্রাচীন-তম হিন্দুধর্ম্মের জ্যোতি দেখিতে পাইয়া আশ্চর্য্য ও আনন্দ অনুভব করি। হিন্দু শাস্ত্রকে একদিকে এবং অন্যান্য শাস্ত্রগুলিকে অপরদিকে স্থাপন করিয়া নিরপেক্ষ ভাবে ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সহিত মিলাইয়া দেখিলে, মনে মনে স্বতঃই এই সন্দেহের উদয় হয় যে, যেন হিন্দুধর্ম্ম-গিরির গাত্র হইতে এই সকল মত নির্ঝরণীর ন্যায় নিঃসৃতা হইয়া ক্রমে ক্রমে "ধর্ম্ম" নাম ধারণ করিয়াছে। আমি হিন্দু শাস্ত্রের সহিত মিলাইয়া দেখাইতে পারি, পৃথিবীর কোনও ধর্ম্মশাস্ত্রে এমন কোনও বিশেষ নূতন বা বিশেষ প্রয়োজনীয় নীতি, উক্তি বা ঘটনা নাই, যাহা হিন্দুর নিকট অপরিচিত বা হিন্দু শাস্ত্রকারের নিকট অবিজ্ঞাত। বর্ত্তমান প্রবন্ধে হিন্দুশাস্ত্র ও খ্রীষ্টান শাস্ত্রের পারস্পরিক সামঞ্জস্য কিয়ৎ পরিমাণে দেখাইতে আকাঙ্ক্ষা করি। খ্রীষ্টা-নের সমুদয় বাইবেলে ৬৬ খানা পুস্তক আছে; সমুদয় বাইবেলের পরিচ্ছেদ সংখ্যা ১১৮৯। এই সকল পরিচ্ছেদের সহিত হিন্দুশাস্ত্র মিলাইয়া দেখান যাইতে পারে, বাইবেলের অভ্যন্তরে হিন্দুশাস্ত্রের সত্য সমূহ প্রবিষ্ট হইয়া যেন হিন্দুধর্ম্মের আদি-মত্ব ও প্রধানত্বের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে। যদুবংশাবতংস যাদব (শ্রীকৃষ্ণ) এবং য়ূদাবংশাবতংস যিশু (খ্রীষ্ট) এতদুভয়ের জীবনে ও উক্তিতে এত আশ্চর্য্য সমতুল্যতা আছে যে, তাহা আলোচনা করিতে করিতে মনে হয়, যেন একই সত্য, একই জীবন, একই ঘটনা, উভয় শাস্ত্রে কিঞ্চিৎ বিভিন্না-কারে অবস্থিত হইয়া রহিয়াছে। প্রধানতঃ গীতা ও ভাগবত এই দুইখানিকে অবলম্বন করিয়া আমি এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি; নিম্নের তালিকায় কৃষ্ণ ও খ্রীষ্টের অথবা হিন্দুশাস্ত্রের ও বাইবেলের সমতুল্যতা দেখাইতেছি। সুবুদ্ধি-মান পাঠকেরা নিরপেক্ষ ভাবে ইহা আলো-চনা করিয়া দেখুন, ইহাই আমার বিনীত প্রার্থনা। কোনও ধর্ম্মের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করা আমার উদ্দেশ্য নহে, আমি প্রথমেই কহিয়া রাখিয়াছি, হিন্দুধর্ম্ম বিশ্ব-জনীন উদারভাবে পরিপূর্ণ। খ্রীষ্ট ও কৃষ্ণের জীবনে যে আশ্চর্য্য সমতুল্যতা বর্ত্তমান, তাহাই দেখাইয়া দেওয়া এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। ১। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কুরুক্ষেত্র মধ্যে তাঁহার প্রিয় সখা ও শিষ্য অর্জ্জুনকে বিশ্ব-রূপ দেখাইয়া তাঁহাকে চমৎকৃত করিয়া-ছিলেন। পর্ব্বতোপরে যিশুখ্রীষ্ট তাঁহার প্রিয় সহচর ও শিষ্যগণকে (পিতর, জেমশ, যোহন্না প্রভৃতিকে) তাঁহার ঐশীরূপ দেখা-ইয়া বিস্মিত করিয়াছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের ঐশী শরীরে দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি বিদ্যমান ছিল; খ্রীষ্টের দেহ পার্শ্বে মূশা ও এলায়েস্ নামক স্বর্গীয় পুরুষ দণ্ডায়মান ছিলেন। কৃষ্ণ ও খ্রীষ্টের ঐশীরূপ দেখিয়া উভয়েরই শিষ্যদিগের চর্ম্মচক্ষু দেবশরীরের অপূর্ব্ব জ্যোতিতে শত সহস্র মধ্যাহ্ন সূর্য্যের তাপ দগ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল। ২। কৃষ্ণ ও খ্রীষ্ট এতদুভয়ের মস্তকের কেশ এবং বাহু, আজানুলম্বিত ছিল। ৩। কৃষ্ণের পরিচ্ছদ এবং খ্রীষ্টের পরিচ্ছদ লোহিত বর্ণ দেখা যাইত। (ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা এবং বাইবেলের "প্রকা-শিত বাক্য" (Revelation) নামক শেষ

গ্রন্থের ঊনবিংশ অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোক দেখুন। ৩। কৃষ্ণচন্দ্র গীতা মধ্যে অর্জ্জুনকে কহিয়াছেন, "আমিই আদি, মধ্য ও অন্ত।" বাইবেলের শত শত স্থানে, খ্রীষ্ট বলিয়াছেন, I am the Alpha and the Omega— আমিই প্রথম ও শেষ। ৪। কৃষ্ণচন্দ্র সামান্য শাক ও ফলসংগ্রহ করিয়া বহুসংখ্যক ক্ষুধিত ব্যক্তিকে এরূপে খাওয়াইয়াছিলেন যে, তাহাতে তাহাদের সকলের পাকস্থলী খাদ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ হইয়াছিল; কিন্তু যিশু-খ্রীষ্ট কয়েক খানা রুটি ও কয়েকটা মৎস্য দ্বারা কতিপয় সহস্র ক্ষুধিত ব্যক্তির ক্ষুধা দমন করিয়াছিলেন। ৫। বাইবেলে লিখিত আছে, মৃত্যুর পরে যিশুখ্রীষ্ট পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং তদনন্তর স্বর্গধামে গমন করেন। বৈষ্ণব শাস্ত্রে দেখা যায়, কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার ভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করিয়া ঐশী শরীরের অপূর্ব্ব জ্যোতি বিস্তার পূর্ব্বক অক্ষয় ও অব্যয় ব্রহ্মধামে গমন করেন। ৬। কৃষ্ণচন্দ্র সান্দিপনী মুনির মৃত সন্তানগণকে তদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেক মৃত ব্যক্তিকে জীবন দান করিয়া ঈশ্বরত্ব প্রতিপাদন করেন; বাইবেলে যিশুখ্রীষ্ট বহুসংখ্যক মৃত ব্যক্তিকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া "আমিই জীবের জীবন" বলিয়া আপনাকে ঘোষণা করিয়াছিলেন। ৭। কৃষ্ণ, গোকুল মধ্যে কন্যা নগরীতে প্রস্তরকে নবনীত রূপে পরিণত করেন; খ্রীষ্ট, কেন নগরীতে জলকে মদিরা রূপে পরিণত করেন। ৮। কৃষ্ণ কহিয়াছেন "যে যতই দুরাচার হউক, আমি তাহাকে পাপ হইতে মুক্ত করি।" খ্রীষ্টও শত শত বার তাহাই কহিয়াছেন। ৯। কৃষ্ণের পিতার নাম "বসু।" খ্রীষ্টের পিতার প্রকৃত নাম "জাশু" এই নাম ইংরাজীতে জোশেফ্, গ্রীকে আইশফ্, হিব্রুভাষায় ইয়াশুক্ এবং আরামাইকা ভাষায় "থসু" নামে প্রসিদ্ধ। ১০। কৃষ্ণের শৈশবাবস্থায় তাঁহার প্রধান শত্রু রাজা কংশ, খ্রীষ্টের শৈশবাবস্থায় প্রধান শত্রু রাজা হিরোদ। ১১। কংশ-ভয়ে কৃষ্ণচন্দ্রের পিতা শিশু কৃষ্ণকে লইয়া নন্দ গ্রামে পলাইয়া যান; হিরোদ-ভয়ে যিশু-খ্রীষ্টের পিতা যিশুকে লইয়া মিসরে পলায়ন করেন। ১২। কৃষ্ণের মাতা পিতার নিকটে স্বর্গীয় দেবদূতগণ দৈববাণী শুনাইয়াছিলেন, খ্রীষ্টের মাতা পিতা সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই হইয়াছিল। ১৩। খ্রীষ্টের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ সমূহে তাঁহার অবতার হইবার কথা পাঠ করা যায়; শ্রীকৃষ্ণের অবতার হইবার কথা বৈদিক শাস্ত্রেও উল্লিখিত আছে। ১৪। কৃষ্ণের নাম "ঈশঃ", "ঈশ্বর"; খ্রীষ্টের নাম "ঈশ"। ১৫। কৃষ্ণ ও খ্রীষ্ট এই উভয় শব্দ একার্থবাচক; উভয় শব্দের শ্রুতি-স্বর প্রায় এক। ১৬। খ্রীষ্টের অন্য নাম "ঈশু"; ব্রজধামে এবং পশ্চিমোত্তর প্রদেশে এখনও লক্ষ লক্ষ লোক কৃষ্ণকে "ঈশু" বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। ১৭। কৃষ্ণচন্দ্র, তাঁহার ভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করিবার উদ্দেশে মায়াদেহী ব্যাধকে সৃজন করিয়া তাহার ত্রিশূলাকৃতি শরে বক্ষস্থলকে বিদীর্ণ করাইয়াছিলেন; ত্রিশূলাকার ক্রুশোপরে অবস্থিত হইয়া যিশুর বক্ষস্থল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল, তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। ১৮। রাজা হিরোদের সহিত জ্যোতিষীদিগের সাক্ষাত, আলাপ, কথোপকথন ও পরামর্শ, কংশ রাজার সহিত জ্যোতিষ শাস্ত্র

বিং আচার্য্যদিগের কথাবার্ত্তা একই প্রকার। ১৯। কৃষ্ণের বহুসংখ্যক সখা, সহচর ও শিষ্য মধ্যে দ্বাদশ জন প্রসিদ্ধ ও প্রিয় ছিলেন, এখনও "দ্বাদশ গোপাল" শব্দ ভারতে গার্হস্থ্য শব্দ বলিয়া প্রচলিত। খৃষ্টের দ্বাদশ জন শিষ্যই বাইবেলে প্রখ্যাত। শ্রীদাম, সুদাম প্রভৃতি কৃষ্ণের দ্বাদশ রাখাল; পিতর, জেমস্, মাথু, যোহন্না প্রভৃতি খৃষ্টের দ্বাদশ সহচর। ২০। কৃষ্ণের অতি প্রিয় নাম "গোপাল", ইহার অর্থ গোপালক অথবা পশু পালক; খৃষ্টের মহা প্রিয় নাম "পশুপালক" "মেষপালক" (shepherd)। বাইবেলের শত শত স্থানে খ্রীষ্ট "মেষপালক" "পালক" "পশু-পালক" বলিয়া উল্লিখিত; ভাগবতে এবং সমুদয় বৈষ্ণব শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ "গোপালক" বলিয়া প্রসিদ্ধ। ২১। রাজা কংশের নিকট কর দিবার জন্য নন্দ ঘোষ গমন করিয়াছিলেন; রাজা হিরোদকে কর দিবার জন্য যিশু-পিতা ইয়াশুক্ উপস্থিত ছিলেন। ২২। কৃষ্ণ কহিয়াছেন, গোপালন এবং গোচারণ কার্য্য আমার অতি প্রিয়; খৃষ্ট কহিয়াছেন, মেষদিগের পালন, চারণ ও রক্ষা আমার ধর্ম্ম ও কর্ম্ম। ২৩। কৃষ্ণকে দেখিয়া বলরাম কহিয়াছিলেন, "ঐ দেখ গোপাল আগমন করিতেছেন।" (ভাগবত)। বাইবেলে লেখা আছে, খৃষ্টকে দেখিয়া বাপ্তিস্ম যোহন্না (John the Baptist) কহিয়াছেন, "ঐ দেখ ঈশ্বরের মেষ আসিতেছেন।" ২৪। কৃষ্ণের ঐশীত্ব প্রচারকের নাম বলরাম, খ্রীষ্টের অবতারত্বের প্রকাশকের নাম বাপ্তিস্ম যোহন্না। বলরাম ও যোহন্না এতদুভয়েই মধুপ্রিয় ছিলেন। (ভাগবত ও বাইবেল দেখ)। ২৫। কৃষ্ণের পাদচারণার প্রিয়স্থান যমুনা তট; খ্রীষ্টের পাদচারণার প্রিয়স্থান জর্দ্দন নদের তীর। ২৬। কৃষ্ণচন্দ্র, গীতায় অর্জ্জুনকে কহিয়াছেন, আমি মানুষ নহি, আমি মর্ত্ত্যধামের লোক নহি। খৃষ্ট তাঁহার শিষ্যগণকে ও যিহুদীদিগকে কহিয়াছিলেন, "আমি এই পৃথিবীর নহি।" ২৭। অর্জ্জুনকে কৃষ্ণ কহিয়াছেন "আমি অনাদি ও অমর। সূর্য্যের জন্মগ্রহণের পূর্ব্বেও আমি বিদ্যমান ছিলাম।" যিহুদীগণকে খৃষ্ট কহিয়াছিলেন, আমি নিত্য স্থায়ী—Before Abraham was I am—ইব্রাহিমের জন্মিবার পূর্ব্বেও আমি বর্ত্তমান। ২৮। শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশ হইতে উৎপন্ন। খৃষ্ট, যুদা বংশ হইতে সমুদ্ভূত, এইজন্য তাঁহার অপর নাম "যুদা-সিংহ" (Lion of the tribe of Juda))। ২৯। শ্রীমৎ ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ গোপগৃহে প্রতিপালিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। বাইবেলে দেখা যায়, যিশু তাঁহার পিতা ইয়াশুক্ কর্ত্তৃক প্রতিপালিত। খৃষ্টানদিগের মতে এই ইয়াশুক্ সূত্রধর ((Carpenter) ছিলেন, কিন্তু গ্রীকভাষায় "সূত্রধর" শব্দ কেবল কাঠের মিস্ত্রীকে বুঝায় না। "দোহক" (দুগ্ধ দোহনকারী) গোপালক, দুগ্ধবিক্রেতা, গোপ প্রভৃতিকেও বুঝায়।

(Read Strauss' life of Christ; Mosheim's Institutes of Ecclesiastical History; Murdock and Reid's Ancient and Modern Ecclesiastical History, &c. &c. &c.)

৩০। শ্রীকৃষ্ণ, ব্রাহ্মণের পদধৌত করিয়া দিয়াছিলেন; যিশুখৃষ্ট তাঁহার শিষ্যদিগের পদধৌত করিয়া দিয়াছিলেন। ৩১। খৃষ্ট কহিয়াছেন, আমার বাণী কদাপি মিথ্যা হয় না; কৃষ্ণ বলিয়াছেন, আমার উক্তি ও প্রতিজ্ঞা অসত্য হইবার নহে। ৩২। কৃষ্ণ কহিয়াছেন, আমার বাক্যে যে বিশ্বাস করে, আমার বাক্য অনুসারে যে চলে সে

মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া অনন্ত জীবন লাভ পূর্ব্বক অনন্তধামে গমন করে। খৃষ্টও অবিকল তাহাই কহিয়াছেন।

আর অধিক প্রমাণ দিবার প্রয়োজন নাই। কৃষ্ণ ও খ্রীষ্ট এতদুভয়ে এক অত্যাশ্চর্য্য সমতুল্যতা দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহা হইলেও এ কথা নিশ্চয়রূপে বলা যাইতে পারে যে, উভয়ের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা সমূহে অসাধারণ সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইলেও, পরস্পরের প্রকৃতিতে—বিশেষতঃ উভয়ের শিষ্য প্রশিষ্য পুঞ্জের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থায়—একটা বিস্ময়কর বৈপরীত্য বিশিষ্টভাবে দৃষ্ট হয়। অবকাশ থাকিলে সে কথা অপর প্রস্তাবে দেখাইবার আকাঙ্ক্ষা রহিল।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

"বংশমর্য্যাদা ও কুলমর্য্যাদা শীর্ষক প্রবন্ধের প্রতিবাদ।"

সংসারে নানা রকম লোক দেখিতে পাওয়া যায়, কতকগুলি লোক কোন বিষয় তলাইয়া না বুঝিয়াই একটা না একটা মত প্রকাশ করিয়া ফেলেন, আবার কতকগুলি লোক কোন বিষয় ভাল করিয়া না বুঝিয়া কোন মত প্রকাশ করেন না। আমাদের সরকার মহাশয় বহুদর্শী ও বিচক্ষণ হইলেও, উপরোক্ত প্রথম শ্রেণীর লোক, তাহা না হইলে তিনি এত তীক্ষ্ণ সমালোচক হইতে পারিতেন না, বঙ্কিম বাবু তাঁহার বুদ্ধি বৃত্তির প্রশংসা করিতেন? সরকার মহাশয় বলেন, "বংশমর্য্যাদা স্বতন্ত্র কথা, ইহা অনেকটা আধুনিক অবলম্বিত ইংরেজ নীতি সদৃশ।" অতএব সরকার মহাশয়ের প্রবন্ধের ভাবে বুঝা যায় যে, বংশমর্য্যাদা ধনসাপেক্ষ ও কুলমর্য্যাদা গুণসাপেক্ষ, বাস্তবিক বংশমর্য্যাদা ও কুলমর্য্যাদা আজকালকার অভিধান অনুসারে একার্থবোধক। ঐ দুই শব্দের ব্যুৎপত্তিগত পার্থক্য থাকিলেও অধুনা একই অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। অর্থ থাকিলেই যে বংশমর্য্যাদা লাভ করিতে পারা যায়, আমরা তাহা বিশ্বাস করি না। বংশমর্য্যাদা লাভ করিতে হইলে কুললক্ষণ নয়টীও থাকা আবশ্যক। যে বংশ এখন অর্থহীন, অথচ গৌরবান্বিত, বুঝিতে হইবে, হয় বর্ত্তমান কালে, না হয় অতীত কালে, ঐ বংশের উক্ত গুণগুলি বর্ত্তমান আছে কিম্বা ছিল। যে বংশের উক্ত গুণ গুলি আছে, তাহা চিরকালই সম্মানার্হ, বল্লালের পূর্ব্বেও তাহার মর্য্যাদা ছিল, তবে বল্লাল কৌলীন্য প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া ঐ মর্য্যাদার পুনর্জ্জীবিত করিয়াছেন মাত্র।

সরকার মহাশয় কায়স্থ শব্দের ব্যুৎপত্তি লইয়া বড়ই বাক্‌বিতণ্ডা করিয়াছেন। কৃষ্ণবল্লভ বাবু তৎকৃত বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ পুস্তকে—

"ককারং ব্রাহ্মণং বিদ্যাদাকারিং
নিত্য সঙ্ককং"

ইত্যাদি যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, সরকার মহাশয়ের মতে তাহা সত্য প্রকাশক নহে ও তাহা ইতরোচিত সংস্কৃত, তাহা উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থ কলেবর বৃদ্ধি করা উচিত হয় নাই। আমরা ত ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ঐ শ্লোকের সংস্কৃতের দোষ দেখিতে পাইলাম না, সরকার মহাশয়

দেখাইয়া দিলে উপকৃত হইতাম। উহার অন্যতর দোষ যে, উহা সত্য প্রকাশক নহে, কায়স্থ জাতি যে ব্রহ্মার কায়া হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, বহুকাল অবধি তাহার কীংবদন্তী এতদ্দেশে প্রচলিত আছে এবং এতদ্দেশীয় বহু প্রাচীন পুরাণ গ্রন্থ দ্বারা অনুমোদিত হইয়া আসিতেছে। কায়স্থোৎপত্তি সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ মানিতে হইলে ঐগুলির আবৃত্তি না করিয়া উপায় নাই, অতএব কৃষ্ণবল্লভ বাবু ঐ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া যে বিশেষ অপরাধের কার্য্য করিয়াছেন, এমত নহে। সরকার মহাশয় কায়স্থ পত্রিকায় প্রকাশিত যে শ্লোকটীর প্রশংসা করিয়াছেন, তাহা এই—

"ক্ষত্র শব্দেন কায়ংস্থাদিয়েতি স্থিতিবাচকঃ
অত ক্ষত্রিয় শব্দেন কায়স্থ ইতি বোধ্যতে।"

এই শ্লোকটীতে যে "কায়" কথাটী আছে, ঐ কায় কাহার? যদি ব্রহ্মার হয়, তবে পূর্ব্বের শ্লোকও যা, ইহাও তাহাই, তবে যদি অন্য কাহারও "কায়" হয়, তাহা বুঝিবার উপায় নাই, সুতরাং সরকার মহাশয় অনুমোদিত শ্লোকটীও সত্যপ্রকাশক নহে। বলা বাহুল্য, কৃষ্ণবল্লভ বাবুও তাঁহার পুস্তকের ৪ পৃষ্ঠায় ঐ শ্লোকটীও উদ্ধৃত করিতে ভুলেন নাই। সরকার মহাশয় বলেন "হিন্দু জাতীয় দেহের সর্ব্বত্র হইতে কায়স্থ জাতি সঙ্কলিত হইয়াছেন। ইহা তাঁহার দার্শনিক যুক্তি হইতে পারে। কিন্তু শাস্ত্রসম্মত নহে। কৃষ্ণবল্লভ বাবু তাঁহার পুস্তকের ঐ স্থানে শাস্ত্রীয় প্রমাণই দেখাইয়াছেন। বৈজ্ঞানিক যুক্তি দেখাইতে যান নাই। ইহাতে কৃষ্ণবল্লভ বাবুর "বাচালতা" কিছু মাত্র দেখা যায় না, বরং সরকার মহাশয়েরই বাচালতা প্রকাশ পাইতেছে।

কায়স্থগণের প্রাচীনতা সম্বন্ধে কৃষ্ণবল্লভ বাবু যে শ্লোকটীর উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাও বহু প্রাচীন কাল হইতে কায়স্থ বালকগণ কর্ত্তৃক অধীত হইয়া আসিতেছে। ঐ শ্লোকটী ব্রাহ্মণগণের কারিকা হইতে গৃহীত যথা—

"যাবন্মেরৌস্থিতা দেবাঃ যাবদ গঙ্গা মহীতলে।
চন্দ্রার্কৌগগনে যাবৎ তাবৎব্রহ্ম কুলেবয়ম্॥"

প্রত্যেক জাতিই স্বকীয় প্রাচীনত্বে গৌরবান্বিত মনে করে, সুতরাং তাহারা "তাবদ্ব্রহ্ম কুলেবয়ং" স্থানে স্ব স্ব জাতির নাম প্রক্ষিপ্ত করিয়া লইয়াছে, ঐ শ্লোকটী কৃষ্ণবল্লভ বাবুর কপোলকল্পিত নহে। অস্মদ্দেশীয় জনগণ বহুকাল হইতেই অতিশয়োক্তি অলঙ্কারপ্রিয়, তাহা না হইলে রামায়ণে বীর হনুমানের লম্ফ দ্বারা সমুদ্র পার হইবার এবং সূর্য্যদেবকে বগলে পুরিবার আখ্যায়িকা কি কেহ শুনিতে পাইতেন? পৃথিবী সৃষ্টির বহু পূর্ব্বকাল হইতে সূর্য্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। পৃথিবী সৃষ্টির সময়ে বা পরে চন্দ্রের সৃষ্টি হইয়াছিল। চন্দ্র সূর্য্য সৃষ্টির সময়ে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়া থাকিলেও, তাহা তখন অগ্নিপিণ্ডমাত্র ছিল, তখন তাহাতে "কায়স্থ" দূরে থাকুক, জীব মাত্র বাস করিতে পারিত না, তখন মেরু (পর্ব্বত) বা গঙ্গারও সৃষ্টি হয় নাই। এমতাবস্থায় কায়স্থ জাতি বা ব্রাহ্মণ জাতি যে চন্দ্র সূর্য্যের সম সাময়িক, একথা বাতুল ভিন্ন আর কে বিশ্বাস করিবে? কৃষ্ণবল্লভ বাবুও যে ইহা না জানেন, তাহা নহে, তবে যিনি ঐ শ্লোক রচনা করিয়াছেন, তিনি স্বজাতীয় প্রাচীনত্ব দেখাইতে গিয়া অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের দোষে বিশ্বাসের সীমা অতিক্রম করিয়াছেন মাত্র; ঐ শ্লোকে ঐরূপ আছে বলিয়াই যে ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ

জাতি চন্দ্র সূর্য্যের সম-সাময়িক; একথা কেহই বিশ্বাস করে না। তবে বহুকালের প্রাচীন জাতি, ইহাই বুঝা যায় মাত্র। ঐ শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া কৃষ্ণবল্লভ বাবু ইহা বলিতে চান না যে,লোকে জানুক যে কায়স্থ জাতি চন্দ্র-সূর্য্যের সমসাময়িক, বরং তিনি কায়স্থজাতি চন্দ্র সূর্য্যের সমসাময়িক নহে, তাহাই বলিয়াছেন। কায়স্থ জাতির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে যে শ্লোকটী বহুকাল যাবৎ প্রচলিত আছে, তাহাই উদ্ধৃত করিয়াছেন মাত্র। তাহাতে যে তাঁহার কি দোষ হইয়াছে, তাহা আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিতে পারিলাম না। রমেশ বাবু মোক্ষমুলার (Max Muller) কৃত ঋগ্বেদের যে বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন, সরকার মহাশয় পদ্যে তাহার চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিয়া সে অপূর্ব্ব গ্রন্থের সৃষ্টি করিয়াছেন,কৃষ্ণবল্লভ বাবুর উদ্ধৃত "যাবন্মেরৌ স্থিতা দেবা" কথাগুলি লইয়া সরকার মহাশয় স্বকৃত সেই অপূর্ব্ব গ্রন্থের বিজ্ঞা চটকাইবার অবসর খুজিয়া বাহির করিয়াছেন। সুতরাং তিলেকের (Arctic home) ইত্যাদির উল্লেখ করার আবশ্যকতা অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। কৃষ্ণবল্লভ বাবুর উদ্ধৃত শ্লোকটীর অর্থ এই যে, যতদিন হইতে দেবগণ মেরুতে(পর্ব্বতে) (সুমেরু বা Polar region এ নহে) বাস করিতেছেন, যতদিন গঙ্গা পৃথিবীতে আসিয়াছেন, যত দিন চন্দ্রসূর্য্য আকাশে বিরাজ করিতেছে, আমরা ততদিন কায়স্থকুলে আছি। পর্ব্বতে যে দেবতা থাকেন, তাহা বহুকাল হইতে অন্যদেশীয় লোকেরা বলিয়া আসিতেছেন। কালিদাস কুমারসম্ভবের বস্তু নির্দ্দেশে বলিয়াছেন—

অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।

এখানে দেবতা হইয়াছে, আত্মাতে (শরীরে বা দেহে) যার সে দেবতাত্মা। আত্মা জীবে ধৃতৌ দেহে স্বভাবে পরমাত্মানি ইতি বিশ্বঃ। তাই বলিয়া ল্যাপলাণ্ডদেশীয় পর্ব্বতে যে দেবগণসহ আর্য্যজাতি বাস করিতেন, একথা কৃষ্ণবল্লভ বাবু বলেন নাই। সরকার মহাশয় Arctic home লিখিতে গিয়া Arctic home লিখিয়া যে বিদ্যার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাও বিস্ময়জনক। সরকার মহাশয় স্বকীয় চর্ব্বিতচর্ব্বণের পদ্য চর্ব্বণ কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন ঃ—

"নৈশ অন্ধকার পারে এসেছি আমরা
চেতনা দিলেন সবে উষা মনোহরা।"

সরকার মহাশয় তাকাইয়া দেখিলেন কি, যে এখানে "নৈশ অন্ধকার পারে" অর্থে ল্যাপলণ্ডে নহে। ল্যাপলাণ্ড দেশকেও নৈশ অন্ধকারের পার বলা যায় না, যেহেতু সেখানেও ছয় মাস রাত্রি থাকে। এক বস্তুর অধিকার অতিক্রম করিয়া আসিবার নামই পারে আসে, পুনরায় যদি সেই বস্তুর অধিকার সেখানে হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহাকে পারে আসা বলা যায় না। সরকার মহাশয় যে ঋকের বিদ্যা ছড়াইয়াছেন, তাহা আর্য্য ঋষিগণের উষা কালীন স্তোত্র মাত্র। উহার তাৎপর্য্য এই যে, এখন নৈশ অন্ধকার বিদুরিত হইয়া উষার স্বর্ণ জ্যোতিঃ দিকমণ্ডল উদ্ভাষিত করিতেছে এবং জীবগণকে প্রবোধিত করিতেছে। সরকার মহাশয় যদি একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া তাহার পরের সূক্তটী পাঠ করিতেন, তাহা হইলে আর এরূপ ভ্রমে পড়িতেন না। তাহাতে আছে উষা তাহার (তেসাং) ভগ্নী রাত্রিকে বিতাড়িত করিয়া নিজের প্রভাব বিস্তার করিতেছে। ইহাতে Arc-

tic home নাম গন্ধও নাই, রাহুপুত্র গৌতমের ত কথাই নাই, তবে গরজ ত বলাই, Arctic home এর উল্লেখ না করিলে যে কলির বেদব্যাস মহাশয়ের স্বীয় চর্ব্বিত চর্ব্বণের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিবার সুযোগ হয় না, কাজেই তাঁহাকে ধান ভানিতে গিয়া মহীপালের গীতের আশ্রয় লইতে হইয়াছে। ধন্য বিদ্যার দৌড়।

সরকার মহাশয় কৃষ্ণবল্লভ বাবুর বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ পুস্তকখানি না পড়িয়া, না বুঝিয়াই তাহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা না হইলে আর বাহাদুরি কি? ভুঁইফোড় না হইলে সমালোচক হওয়া যায় না। তিনি তাঁহার প্রবন্ধের একস্থানে বলিতেছেন "বারেন্দ্রনেতৃগণ ইতঃপূর্ব্বে অতি নির্লজ্জভাবে তাঁহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট বহু কায়স্থকে কায়স্থাখ্যার বহির্ভূত, অন্ততঃ বারেন্দ্র কায়স্থের অন্তর্গত নহে বলিয়া কায়স্থ সভায় প্রকাশ করিয়াছেন, কাজেই তিনি কায়স্থ সভার বহিষ্করণ নীতিজালের মধ্যে মাকড়সার ন্যায় বিজড়িত হইয়া, বক্রভাবে যতদূর সাধ্য, বঙ্গজ ও দক্ষিণ রাঢ়ীয় কুলীনগণের নিন্দাবাদ করতঃ তাঁহাদেরই নীতি সূত্রে ঝুলিতেছেন। এ জন্যই যে ঢাকুরে তাহাদের কৌলীন্যের হানিজনক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, সেই গ্রন্থকে, তাঁহার গম্পেলকে, নাক কাণ কাটা করিয়া কায়স্থ পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত করিতেছেন।"

(১৩১১ সালের আশ্বিন ও কার্ত্তিক সংখ্যা নব্যভারত ৩৬৩ পৃষ্ঠা দেখ)

বারেন্দ্র কায়স্থগণের সহিত ক্রিয়া, কর্ম্মে সংশ্লিষ্ট ৭২ ঘরকে কৃষ্ণবল্লভ বাবু কখনই বারেন্দ্র কায়স্থের বহির্ভূত বলেন নাই, তিনি ঐসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা এই—"প্রথমতঃ ভৃগু নন্দী, নরদাস ও মুরারী চাকী, জটাধর নাগের আশ্রয়ে বারেন্দ্র পটী বন্ধন করেন। তদনুসারে কাশ্যপ গোত্রীয় ভৃগুনন্দী বংশজ নন্দী, অত্রি-গোত্রীয় নরদাস বংশীয় দাস ও গৌতম গোত্রীয় মুরারি চাকী বংশীয় চাকী সিদ্ধ অর্থাৎ কুলীন হইলেন ও সৌপাল গোত্রীয় জটাধর নাগের বংশ মৌদগল্য গোত্রীয় পুরুষোত্তম দত্তের বংশ, আলম্যান গোত্রীয় বুধদেবের বংশ, বাৎস্য গোত্রীয় অনাদিবর সিংহের বংশ সাধ্য অর্থাৎ মৌলিক হইলেন। ইহার বহুদিন পর রায় কাইলের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার পরাসর গোত্রীয় দেবঘর, উক্ত বারেন্দ্র সমাজভুক্ত হইয়া সাধ্যভাবাপন্ন হইয়াছেন। তৎপরে পুত্রের বিবাহে অর্থ লওয়া কুপ্রথা প্রচলিত হওয়ায় বরেন্দ্র দেশস্থ গৌড়ীয় দাস, নন্দী, চাকী, ধর, কর, সেন, ঘোষ চন্দ্র প্রভৃতি উপাধিধারী কায়স্থগণ বারেন্দ্র সমাজ ভুক্ত হইয়াছেন, কিন্তু এখনও তাঁহারা সমাজে সুপরিচিত হইতে পারেন নাই। ইহাতে উক্ত গৌড়ীয় দাস, নন্দী প্রভৃতি যে বারেন্দ্র সমাজ ভুক্ত নহে, এ কথা কৃষ্ণবল্লভ বাবু বলেন নাই, বরং তাহারা যে বারেন্দ্র সমাজ ভুক্ত ৭২ ঘরও সিদ্ধ ও সাধ্য ঘরের অপেক্ষা হীনমর্য্যাদা-বিশিষ্ট, ইহাই বলিয়াছেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, কৃষ্ণবল্লভ বাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহা কায়স্থ সভার বহিষ্করণ নীতির প্রতিপোষক নহে, বরং বিরুদ্ধে। কায়স্থ সভাও কখন বহিষ্করণ নীতির পক্ষপাতী নহে, সরকার মহাশয় ইহা কোথায় পাইলেন?

সরকার মহাশয় বলিয়াছেন, বারেন্দ্র কায়স্থগণের মধ্যে গৌড়ীয় নীচ কায়স্থগণ গোত্র প্রবরাদি ভাঁড়াইয়া কুলীনের মধ্যে

মিশিয়া গিয়াছেন, কিন্তু বঙ্গজগণ মধ্যে কুলীনগণের ক্রীতদাসীর গর্ব্ভজাত যে সকল সন্তান হইত, তাহারা পিতার গোত্র প্রবরাদি ব্যবহার করিত এবং তাহারা অদ্যাপিও গোলাম নামে অভিহিত হইতেছে। তাহারা অন্য গোত্র হইলে কখন কুলীনগণের সহিত মিশিতে পারিত না। বারেন্দ্র কায়স্থগণের যে সকল দাসীপুত্র ছিল, তাহারা অর্থবান হইয়া গোত্র ভাঁড়াইয়া কালক্রমে কুলীনের সহিত মিশিয়া গিয়াছে, এই জন্য বারেন্দ্র কায়স্থগণ মধ্যে গোলাম কায়স্থ নাই। কি যুক্তি? "আত্মবন্মন্যতে জগৎ" কথাটী চিরকালই আছে। দাসীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করা ভদ্রতা, নীতি ও ধর্ম্ম বিরুদ্ধ; বারেন্দ্র কায়স্থগণ ওরূপ নীচ প্রকৃতির লোক ছিলেন না। বারেন্দ্র কায়স্থগণের ঢাকুরে আছে, মুরারি চাকীর বংশীয় একজন সত্যবদ্ধ হইয়া তাহার খানসামার কন্যাকে বিবাহ করিয়া তাহার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিয়াছিলেন বলিয়া, তাহার প্রথম পক্ষের সন্তানগণ পিতাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। যে সমাজের এত শাসন, সে সমাজে ঐরূপ নীচ কার্য্য ঘটিবার সম্ভাবনা অতি অল্প। আর সরকার মহাশয়ের কি এ জ্ঞান নাই যে, ক্ষেত্রজ সন্তান পিতার সহিত এক গোত্র প্রবর থাকিলে ক্ষেত্রজ সন্তানের ঐ পিতৃকুলের সহিত মিলিত হওয়া যত সহজ, গোত্র ছাপাইয়া মিলিত হওয়া তত সহজ নহে। শাস্ত্রানুসারে দ্বিজগণের দাসীপুত্র উত্তরাধিকারী নহে, শূদ্রের বটে, সরকার মহাশয়ের স্বীকারোক্তি অনুসারে দাসীপুত্রেরা যখন তাঁহাদের উত্তরাধিকারী হয়, তখন তাহারা কি, তাহা সহজেই অনুমেয়।

সরকার মহাশয় ইহাও বলিয়াছেন যে, বারেন্দ্র কায়স্থগণের কুল নাই, একথা তিনি কোথায় পাইলেন? বারেন্দ্র কায়স্থের বল্লালী কুল নাই বটে, কিন্তু ভৃগুনন্দীকৃত কুল আছে। প্রকৃত পক্ষে দক্ষিণ রাঢ়ীয় ও বঙ্গজগণেরও এখন বল্লালী কুল নাই, যথাক্রমে পুরন্দর বসু ও দনুজ মর্দ্দন কর্ত্তৃক পরিবর্ত্তিত হইতেছে।

"আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্,
নিষ্ঠা শান্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্।

এই হচ্ছে সকাল কায়স্থের কুলের মূল মন্ত্র বা standard, ঐ সকল গুণ যে কুলের আছে, তাহাই চিরকাল কুলীন ছিল, ও থাকিবে। বল্লাল যে ঐ গুণ গুলি নূতন আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহা নহে। বল্লাল কৌলীন্য প্রথা সমর্থন কালে যে মূল মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, ভৃগুনন্দীও বারেন্দ্র পটী বন্ধন সময়েও ঐ standard অনুসারেই কৌলীন্য পটী বন্ধন করিয়াছিলেন।

সরকার মহাশয় আর একস্থানে বারেন্দ্র কায়স্থের অত্রি গোত্রীয় দাসেরা অনার্য্য দস্যু বা দাস ছিল, তাঁহার যুক্তির মূল হচ্ছে তাঁহার ঋগ্বেদের চর্ব্বিতচর্ব্বণ।

নিবারিলে দীপ্ত অগ্নি, তোমরা হিমেতে উভে,
অন্ন যুক্ত বলপ্রদ খাদ্য প্রদানিলে,
ছিলেন আধার গৃহে অবনত মুখে অত্রি,
সগণ সহিতে তাঁকে তুলিয়া আনিলে।

ঐ ঋঙমন্ত্রে বারেন্দ্র কায়স্থই বা কোথায়? বারেন্দ্র কায়স্থের অত্রি গোত্রীয় দাসই বা কোথায়? দস্যুগণ অত্রি ঋষিকে শত দ্বারযুক্ত যন্ত্রণা ঘরে আবদ্ধ করিয়া তুষের ধুনা দিয়াছিল, অশ্বিদ্বয় তাঁহাকে তুলিয়া আনিয়াছিলেন, ইহাতে যে উক্ত দস্যুগণ অত্রি গোত্রীয় দাস, তাহা সরকার মহাশয়

কোথায় পাইলেন? ইহা কি সরকার মহাশয়ের যেন তেন প্রকারেণ স্বকৃত: ঋগ্বেদের advertisement দেওয়া নয়। ক্রমে দেখছি, ঋগ্বেদের ছড়াছড়ি। আমরা যদি কবি হইতাম ত বলিতাম:—

"যে দিকে ফিরাই আঁখি
সে দিকে ঋগ্বেদ দেখি
বেদে বেদে ধূল পরিমাণ।

. নিজের কৃত চর্ব্বিত চর্ব্বণের নজীর বেনজীরে, তালে বেতালে, সুরে বেসুরে, স্থানে অস্থানে এত এক ঘেয়ে, কি লজ্জাজনক নহে?

এক গোত্র ও প্রবরবিশিষ্ট হইতে হইলে হয়, তদ্বংশীয় বা তদ্বংশীয় কাহারও যজমান হওয়া আবশ্যক। উক্ত দস্যুগণ অত্রিমুনির যজমান ছিল বা অত্রি মুনির বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, সরকার মহাশয় কি ইহাই বলিতে চান? অত্রি গোত্রীয় দাসের বীজ পুরুষ ছিলেন নরদাস ঠাকুর, তিনি উপনিবেশী ছিলেন, বারেন্দ্র কায়স্থ ঢাকুর বলিতেছেন:—

"কোলঞ্চ নগর ধাম, নরদাস ঠাকুর নাম
আসিলেন স্বরাজ্য আশ্রয়ে।
মাতামহ পৌরষ, পৃথিবীতে যার যশ
অদ্যাবধি মহিমা ঘোষয়ে।

পরন্তু বঙ্গদেশে অত্রি গোত্রীয় কোন ব্রাহ্মণ নাই, দাস ঘর যদি গৌড়ীয় হইতেন, তবে তাহার অত্রী গোত্র হইত না।

উত্তর বঙ্গেও আত্রেয়ী নদী আছে বলিয়া সরকার মহাশয় ঐ স্থানে অত্রিমুনির আশ্রম কল্পনা করিয়াছেন, তবে বলিভিয়াতে বলী রাজা ও পেরুতে পুরুরাজার বাড়ী ছিল বলিলে দোষ কি?

সরকার মহাশয় আর এক স্থানে বলিতেছেন "রায় মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, কাশ্যপ গোত্রীয় দেববংশ ও নন্দী গুহের ন্যায় কাশ্যপ গোত্র ও কাশ্যপ, আপসার, ও নৈধ্রুব প্রবর বিশিষ্ট, ইঁহারা কুলীন হইবেন না কেন? সেইরূপ পাল, চন্দ্র, অকুর, আঢ্য ও নন্দী গুহের গোত্র ও প্রবর বিশিষ্ট, ইহাদেরই বা অপরাধ কি হইল? সেইরূপ গৌতম গোত্র ও গৌতম আঙ্গিরসাদি প্রবর বিশিষ্ট কুণ্ডু বিষ্ণু ও নন্দন বংশগুলি, চাকী, বসুর ন্যায় কুলীন হইবে না কেন?" সরকার মহাশয় এ কথা কৃষ্ণবল্লভ বাবুকে জিজ্ঞাসা না করিয়া বল্লাল সেনকে জিজ্ঞাসা করিলে ভাল হইত। তিনি এক গোত্র প্রবর বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ মধ্যে যাহাকে যাহাকে নয়টী কুল লক্ষণে ভূষিত দেখিয়াছিলেন, তাহাদের সকলকেই কুলীন করিয়াছিলেন। ভৃগু নন্দীও তাহাই করিয়াছেন।

কৃষ্ণবল্লভ বাবু চারি শ্রেণীর সমীকরণ সম্বন্ধে যেরূপ বলিয়াছেন, তাহা সরকার মহাশয় তলাইয়া বুঝিয়াছেন কি? তিনি বলিয়াছেন যে, এক গোত্রপ্রবর বিশিষ্ট হইলেই যে সমান সম্মান বিশিষ্ট হইবে, তাহা নহে, ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর কায়স্থগণ মধ্যে যাঁহারা কুলীন পূর্ব্বাপর হইতে আছেন, তাঁহাদের মধ্যে এক গোত্র প্রবর বিশিষ্ট হইলে তাঁহাদিগকে এক বলা যাইতে পারে, সেইরূপ মৌলিকের মধ্যেও এক গোত্রপ্রবর বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ভিন্ন শ্রেণীর হইলেও এক বলা যায়, ঐরূপ দ্বিসপ্ততি ঘরের মধ্যেও মানিয়া লইতে হইবে। এ প্রস্তাব অতি যুক্তিমূলক ও সমীকরণ কার্য্যের সহায়। সরকার মহাশয় ঐরূপ কতকগুলি কুতর্ক তুলিয়া সমীকরণ কার্য্যের ব্যাঘাত ও বহিষ্করণ নীতির সমর্থন করিতেছেন, কৃষ্ণবল্লভ

বাবুকে বহিষ্করণ নীতির সমর্থক বলিয়া অযথা গালাগালি করিতেছেন।

সরকার মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধের ৩৬৪ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন:—"চন্দ্রদ্বীপের কুল প্রথানুসারে চন্দ্রদ্বীপের সীমার বহির্ভাগে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহারা কুলীন হইলেও কুলজ বলিয়া সমাজের নিকট হীন মর্য্যাদা-সম্পন্ন হইয়া থাকেন। কিন্তু এ কথাটী রায়মহাশয়ের গ্রন্থে পাওয়া যাইতেছে না।" সরকার মহাশয় বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ পুস্তক খানি ভাল করিয়া পড়িয়াছেন কি? ঐ পুস্তকের ১৩০ পৃষ্ঠায় কৃষ্ণবল্লভ বাবু রামানন্দ কৃত কুলদীপিকায় যে শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাই উক্ত প্রশ্নের যথেষ্ট শ্লোকটী এই:—

ভ্রষ্টস্থাননিবাসীচ সদ্বংশজো ভবেন্নরঃ।
পদচ্যুতোঽপি তৎকুলৈঃ কথ্যন্তে কুলভূষণৈঃ॥
কুর্য্যাচেৎ কুল কর্ম্মাণি তত্রকুলে ক্রমাগতঃ।
কুলজস্য সমাখ্যাতঃ কথ্যতে গ্রন্থকারকৈঃ॥

কুলীনগণও স্থানভ্রষ্ট হইলে মর্য্যাদা হীন হইবেন, কিন্তু ক্রমাগত কুলকার্য্য করিলে কুলীনগণ কর্ত্তৃক তাঁহারা কুলজ বা বংশজ আখ্যা প্রাপ্ত হইবেন।

আমাদের সরকার মহাশয় না পড়িয়া পণ্ডিত ও কোন বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনু-সন্ধান না করিয়াই সবজান্তা হইতে চান। এইরূপ ব্যক্তিই উপহাসাস্পদ হইয়া থাকে।

লোকে বলে, কাণাকে কাণা ও খোঁড়াকে খোঁড়া বলিও না, কারণ তাহাতে তাহার গায়ে বড় লাগে। কৃষ্ণবল্লভ বাবু বঙ্গজ-কুলগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়াই বলিয়া-ছেন, তেঙ্গর কায়স্থ শূদ্র, তাহাদের সংস্রবে কুল নষ্ট হয়। তোমাদিগের সহিত কি সরকার মহাশয় কোনরূপ সংস্থষ্ট আছেন? তাহা না হইলে গাত্রদাহ কেন?

সরকার মহাশয় বারেন্দ্র শ্রেণীর কুলীন নন্দীদিগকে ভৃঙ্গীর সহিত তুলনা করিয়া গালাগালি দিয়াছেন, সরকার মহাশয়দিগের বঙ্গজ শ্রেণীর মধ্যে যে ভূত, প্রেত, দৈত্য দানবাদির নাম দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কি সরকার মহাশয় ভুলিয়া গিয়াছেন?

সরকার মহাশয়ের বোধ হয় "লোষ্ট্রাৎ পাটকেলামিতি" নীতি জানা আছে, তাহা হইলে আর বাড়াবাড়ি না করিয়া সাম্য নীতি অবলম্বন করিবেন। মক্ষিকাবৃত্তি চিরকালই নিন্দনীয়। কোথায় কায়স্থ-গণের মধ্যে ক্রমশঃ পরস্পর ভ্রাতৃভাব, সহানুভূতি বৃদ্ধি হইবে, তাহা না হইয়া সর-কার মহাশয়ের প্রবন্ধগুলি কায়স্থগণের মধ্যে ক্রমশঃ বিদ্বেষ ভাব বর্দ্ধিত করিতেছে, এটী কি বাঞ্ছনীয়?

সরকার মহাশয় আর যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা বাতুলের প্রলাপ মাত্র, তাহার উত্তর দেওয়া আবশ্যক বোধ করি-লাম না।

শ্রীপ্রসন্ন নাথ রায়।

উৎকল যুবক সমিতি

১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯০৪।

বিষয়—প্রাচীন ভারতে ছাত্র জীবন।
কথক—শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী এম,এ।
লেখক—শ্রীমান সতোশচন্দ্র গুপ্ত।

ভাগীরথী কি আবার হিমালয়ের দিকে ফিরিয়া যাইতে পারে? সময়-স্রোতে আমরা যেথানে আসিয়া পড়িয়াছি, চেষ্টা করিলেও কি আবার সেই প্রাচীন বৈদিক যুগে ফিরিতে পারি? জানি না। আমাদের দেশে এখনও অনেক বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান, দূরদর্শী লোক আছেন, যাঁহারা বিশ্বাস

করেন যে, বৈদিক যুগ, প্রাচীন ভারতের সেই প্রাচীন অবস্থা, বর্ত্তমান ভারতে সংস্থাপিত করা যাইতে পারে। অপর পক্ষে এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা মনে করেন যে, প্রাচীন বৈদিক যুগের সকলই পুনঃ সংস্থাপিত হইতে না পারিলেও, সেই সময়ের যে সকল উপায়, আয়োজন, বর্ত্তমান যুগে প্রযোজ্য হইতে পারে, সে সকল সংগ্রহ করিয়া বর্ত্তমান ভারতের বর্ত্তমান জীবনে নিয়োগ করিতে পারিলে প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। যে শিক্ষা প্রণালীগুণে ভারত একদিন পৃথিবীতে অদ্বিতীয় ছিল, সাহিত্য ও ব্যাকরণ, দর্শন ও বিজ্ঞান, শিল্প ও স্বাস্থ্য বিদ্যার যে শিক্ষার গুণে ভারত একদিন এমন স্থান অধিকার করিয়াছিল যে, তেমনটী আর হইল না, সেরূপ আর হইবে কি না, ভগবান জানেন। সে শিক্ষা প্রণালী কি ছিল? যে শিক্ষা প্রণালীর গুণে প্রাচীন ভারতে মহাপুরুষগণের অভ্যুদয় হইয়াছিল, বর্ত্তমান প্রণালীতে তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে গেলে তাহা মনে আসিয়া পড়ে। এই জন্য প্রাচীন ভারতের শিক্ষা প্রণালী ও ছাত্র অবস্থার বিষয় অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

যাঁহারা মনে করেন যে, প্রাচীন বৈদিক শিক্ষা প্রণালী বর্ত্তমান ভারতে পুনঃ সংস্থাপিত হইতে পারে, তাঁহাদিগের চেষ্টা ও কার্য্য আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। সুতরাং প্রথমেই তাহার বিবরণ ও পরিচয় দিব।

চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীর উভয় পার্শ্বে পর্ব্বত মালা আছে, তাহার উত্তর পার্শ্বস্থ পর্ব্বত মধ্যে মহামুনি বুদ্ধদেবের মন্দির আছে। চৈত্র সংক্রান্তিতে তথায় মেলা হয়। আমি একবার সেই মেলা দেখিতে গিয়া, নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতোপরে, শৈল শিখরে জগৎপুর আশ্রম দেখিয়া আসিয়াছি। সেই আশ্রমে ২০।২৫ জন ছাত্র ও ছাত্রী দেখিলাম। ৬।৭ বৎসর বয়স্ক শিশু হইতে ২০।২৫ বৎসর বয়স্ক যুবক ও যুবতী এক সঙ্গে শিক্ষা লাভ করিতেছে; বৈদিক যুগে গৃহ্যসূত্র, ধর্ম্মসূত্র প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থে যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, দেখিলাম, তথায় সেইরূপ ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। আগন্তুক প্রভৃতির সঙ্গে সকলেই সংস্কৃতে কথোপকথন করে। তবে আগন্তুক যদি সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ হন, তাহা হইলে অন্য ভাষায়ও কথাবার্ত্তা করে। একটী বালিকা বোধ হয় ৫।৬ বৎসরের বড় হইবে না, আমাদিগকে দেখিয়া দাঁড়াইল; সে বাগানে কাজ করিয়া ফিরিতেছিল, আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম "কোথায় গিয়াছিলে?" বালিকা উত্তর দিল না। সংস্কৃতে ঐ প্রশ্ন করিলাম, বালিকা সংস্কৃতে উত্তর করিল, বাগানে, ক্ষেত্রে গিয়াছিলাম। আমরা প্রশ্ন করিলাম, তথায় কি করিতেছিলে? বালিকা পুনরায় সংস্কৃতে উত্তর করিল, 'আলবালে জলসিঞ্চন করিতেছিলাম। ১০।১১ বৎসরের বালিকা টোলের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত উপাধি পাইয়াছেন, এবং উচ্চতর পরীক্ষার জন্য শিক্ষা লাভ করিতেছেন। কুমারদিগের জন্য স্বতন্ত্র গিরিশিখরে স্বতন্ত্র গৃহ। কুমারীদিগের জন্য অন্য গিরি উপরে স্বতন্ত্র গৃহ। তাহাদিগকে পরস্পর মিশিতে দেওয়া হয় না। পর্ব্বতের সানুদেশে শিক্ষকের গৃহ।

ইহাদিগের আহার ব্যবহার বড় আশ্চর্য্যজনক। ইহারা কখনও অন্নগ্রহণ করে না। কখনও লবণ গ্রহণ করে না। চাতুর্ম্মাস্য সময়ে কেবল মাত্র ফল মূলাদি আহার

করিয়া থাকে। অন্য সময়ে সিদ্ধপক্ব, অর্থাৎ কচু, কুমড়া, লাউ, কাঁঠাল প্রভৃতি সিদ্ধ করিয়া লবণ সংযুক্ত না করিয়া আহার করে। এইরূপ আহার করিলেও তাহারা সুস্থ শরীরে আছে। আমরা সন্দেহ করিয়াছিলাম যে, তাহাদিগকে বোধ হয় কৃশ, রুগ্ন, পীড়িত বা দুর্ব্বল দেখিব। কিন্তু দেখিলাম, তাহারা সকলেই সুস্থ ও সবলকায়।

শিক্ষার্থীদের আহারের কোনও আড়ম্বর নাই, বিলাসের লেশ মাত্র নাই। সকলেই বিনীত ও সংযত, সকলেই নিরতিশয় স্নেহের পাত্র। তাহারা অত্যন্ত দারিদ্র। পরদ্বারে ভিক্ষাই তাহাদের উপজীবিকা। হুগলীর সরকারী উকীল শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মিত্রের মাতা তাঁহাদের ব্যয়ভার, অনেকাংশে, বহন করেন। তাহারা নিজেরাই চাষ করে। কন্দমূলের চাষই অধিক পরিমাণে হয়। ধানের চাষ হয় না। তাহারা নিজেরাই গরু চরায় এবং ক্ষেত্র ও গৃহের সকল কার্য্যই করে। এইরূপ নানাকার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়াও তাহারা সুন্দর বিদ্যা শিক্ষা করিতেছে। নিকটবর্ত্তী পল্লীসমূহে অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইলাম যে, তাহাদের সকলেরই অতি বিমল চরিত্র। বস্তুতঃ জগৎপুর আশ্রম দর্শন করিয়া মনে হয়, বুঝি প্রাচীন বৈদিক অবস্থা পুনঃসংস্থাপিত করা যাইতে পারে। ঠিক জানি না।

বৌদ্ধদিগের পূর্ব্বে ভারতে বোধ হয় বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না। বৌদ্ধযুগের দুইটী বিখ্যাত বিদ্যালয়ের বিষয় আমরা জানি। প্রথমটী বুদ্ধগয়ার সমীপবর্ত্তী নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়, যাহা বিখ্যাত চীন পরিব্রাজক হিয়েন্‌সাঙ্ পরিদর্শন করিয়া বলিয়াছেন যে; তথায় সহস্রাধিক ছাত্র শিক্ষা লাভ করিতেছিল; পরে কি হইয়াছিল, কথিত হয় নাই। আরও একটী উৎকৃষ্ট বিদ্যালয়ের বিষয় ইংরাজ লিখিত ইতিহাসে এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

নালন্দার পরে ইন্দ্রশীলা নামক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। তথায় লিখিত হস্তলিপি এখনও অনেক পাওয়া যায়। নেপাল হইতে আমি ১০।১৫ খানা পুঁথি, মূল্যবান পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছি—এমন কি, একখানি পুঁথি আমাকে আড়াই শত টাকা দিয়া ক্রয় করিতে হইয়াছিল। পুঁথিগুলি ইন্দ্রশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ে লিখিত। এই ইন্দ্রশীলা, আধুনিক লক্ষীসরাই, লুপ ও কর্ডলাইনের সংযোগ স্থানে অবস্থিত ছিল। এখনও কেহ সে স্থান বিশেষরূপে অনুসন্ধান করে নাই। সেখানে অনুসন্ধান করিলে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত অনেক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতে পারে। বৌদ্ধদিগের পূর্ব্বে বৈদিক যুগে ভারতে বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না। এখন ভট্টপল্লী, নবদ্বীপ, মিথিলা, বারাণসী ও দ্বারবঙ্গ প্রভৃতি স্থানে চতুষ্পাঠীতে যেরূপ কয়েকটী ছাত্র লইয়া শিক্ষা দেওয়া হয়, বৈদিক যুগে সেইরূপ কয়েকটী ছাত্র লইয়া এক এক জন শিক্ষক শিক্ষা প্রদান করিতেন। আমরা এখন জীবনকে সংগ্রাম বলি, সংসারকে সংগ্রামক্ষেত্র বলি, ইহাতে জয়লাভ করিবার জন্য আয়ুধসহায়ে সঞ্চয়ের জন্য শিক্ষালাভ করি। তাহা অধিকাংশ বণিকবৃত্তি। কিঞ্চিৎ ধনাগমের জন্য বা অন্য অভিপ্রেত সাংসারিক বা পার্থিব উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য পাঠে অভিনিবিষ্ট হই। প্রাচীনকালে এরূপ ছিল না।

জীবনের নশ্বরতা, পৃথিবীর অসারত্ব হিন্দু যেমন বুঝিয়াছিলেন, তাহা জগতের

অন্য কোনও জাতি বুঝে নাই। পৃথিবীর নাম জগৎ। যাহা সর্ব্বদাই যাইতেছে। বৌদ্ধেরা যেমন বলিতেন, সকলই হইতেছে, কিছুই হয় না। (Nothing is, every thing is being)। জগৎ, যাহা সর্ব্বদাই যাইতেছে, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। এক মুহূর্ত্ত একভাবে থাকে না। অথবা সংসার, যাহা সর সর করিয়া যাইতেছে, (সৃ ধাতু) যাহার কোনও স্থিরতা নাই। এই আছে, এই নাই। যেমন সমুদ্রতীরে বালুকারাশি স্নানেচ্ছুর পদতলে ক্রমশঃ সরিয়া যায়, সেইরূপ সংসারও ঘটনাচক্রভরে ক্রমশঃ সরিয়া যাইতেছে। হিন্দুগণ এ সংসারকে নশ্বর, অসার, অকিঞ্চিৎকর জানিতেন বলিয়া হিন্দুর জীবন সংগ্রাম নহে—ব্রত। সমস্ত জীবনকে একটী ব্রত, একটীর পরে একটী, পর্য্যায় ক্রমে, স্তরে স্তরে, এক একটী পার না হইলে অন্যটী আসে না, এইরূপে সমস্ত জীবন একটী ব্রতমালা বলিয়া বিবেচনা করিতেন। প্রথম স্তরে ব্রহ্মচর্য্য। তাহার উপরে গার্হস্থ্য, তাহার উপরে বাণপ্রস্থ, তৎপরে সন্ন্যাস। সন্ন্যাসের জীবনে জাতিভেদ নাই, ব্রহ্মচারীর জীবনে জাতিভেদ নাই, জগৎপুরে জাতিভেদ নাই। তথায় ব্রাহ্মণ শূদ্র ও ক্রিশ্চিয়ান এক সঙ্গে আহার ব্যবহার করিতেছে। জাতিভেদের আরম্ভ গার্হস্থ্য জীবনে। ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত না হইলে কাহারও গার্হস্থ্যে অধিকার হয় না। গার্হস্থ্য সমাপ্ত না হইলে বাণপ্রস্থ হয় না। বাণপ্রস্থ না হইলে সন্ন্যাস হয় না।

গার্হস্থ্য জীবন বিবাহ করিয়া। ব্রহ্মচর্য্যের শেষে গুরুদক্ষিণা দিয়া, অবভৃথ স্নান করিয়া, স্নাতক ব্রাহ্মণ হইয়া গুরুগৃহ হইতে আনীত গার্হপত্য অগ্নি গৃহে স্থাপন করিয়া বিবাহ করিতে হয়। ব্রহ্মচারী জীবন সম্পূর্ণ না হইলে কেহ বিবাহ করিতে পারিতেন না। আমি কিছুদিন যাবৎ স্কুল ও কলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে বিবাহের একটী তালিকা সংগ্রহ করিয়াছিলাম। তাহা হইতে দেখিলাম যে, সাধারণতঃ স্কুলে চারি আনা আন্দাজ, প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী মধ্যে আট আনা আন্দাজ এবং বি, এ ক্লাসের ছেলেদের মধ্যে বার আনা বিবাহিত। প্রাচীন ভারতে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার অবস্থা সমাপ্ত না হইলে বিবাহ হইত না।

সে শিক্ষা কতদিন? এক দুই বৎসর নহে—১২ বৎসরের ন্যূন নহে। পরন্তু ঊর্দ্ধে ৪৮ বৎসর পর্য্যন্ত। অষ্টম হইতে ষোড়শ বৎসর বয়ক্রমে ব্রাহ্মণ কুমার, একাদশ হইতে দ্বাবিংশতি মধ্যে ক্ষত্রিয় কুমার, দ্বাদশ হইতে চতুর্ব্বিংশতি মধ্যে বৈশ্য কুমার—এই বয়সের মধ্যে শিক্ষা আরম্ভ না করিলে—সে পতিত সাবিত্রিক হইত। তাহার বিবাহ হইবে না, তাহার সহিত কেহ আহার করিবে না, কেহ কথা কহিবে না। ইংলণ্ড ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে কঠোর আইন কানুন করিয়া যে নিয়মে প্রজাগণকে বিদ্যাশিক্ষা করিতে বাধ্য করা হইয়াছে, প্রাচীন ভারতে আর্য্যগণ এক পতিত সাবিত্রিকতার দ্বারাই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য সকলকেই বাধ্য করিয়াছিলেন। যে তিন পুরুষ গুরুগৃহে সন্তান সন্ততি পাঠাইত না, সে অনার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইত। প্রাচীন ভারতে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এত অধিক বলিয়া বিবেচিত হইত। এই ১২ হইতে ৪৮ বৎসর পর্য্যন্ত শিক্ষার অবস্থা। হিসাব করিয়া দেখা যায়, যদি অষ্টম বর্ষ বয়ক্রমে বিদ্যারম্ভ করিয়া ১২ বৎসর শিক্ষালাভ করেন, তাহা হইলে

বিংশতি বর্ষ বয়ক্রমে গৃহে সমাবর্ত্তন করিবেন—গার্হপত্য স্থাপন করিয়া বিবাহ করিবেন। তৎপূর্ব্বে ব্রাহ্মণের, ২৩ বৎসরের পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়ের, ২৪ বৎসরের পূর্ব্বে বৈশ্যের গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশের অধিকার ছিল না।

যিনি একখানি মাত্র বেদপাঠ সমাপন করিয়া অবভৃত স্নান করিতেন, তিনি ১২ বৎসর, ২ খানি মাত্র বেদে ২৪ বৎসর, ৩ খানিতে ৩৬ বৎসর, ৪ খানিতে ৪৮ বৎসর এই দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য করিতেন। শিক্ষার্থী বৈদিক নাম আর্ষেয় (কারণ তাঁহারা ঋষিদিগের ন্যায় কঠোর ব্রহ্মচর্য্য সাধন করিতেন)। বর্ত্তমান নাম বিদ্যার্থী, এই দীর্ঘকাল, সমস্ত ব্রহ্মচর্য্য কাল পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিতে পারিতেন না। ভিক্ষা করিয়া অশন বসন সংগ্রহ করিতে হইত। পিতা মাতার নিকট হইতে কিছু আনিবার উপায় ছিল না। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে গুরুদক্ষিণা দিতে হইত; ঋষিগণ দরিদ্র ছিলেন, ব্রহ্মচর্য্যের গুরুভার বহন করিতে পারিতেন না। ব্রহ্মচারীকে নিজের চেষ্টায় চালাইতে হইত। গুরুদক্ষিণা পরিশ্রমের পুরস্কার ছিল না। কিছু দিন পূর্ব্বে আমি কলিকাতায় এই ব্যবস্থা দেখিয়াছিলাম। একজন ধনী লোক সমস্ত খরচ দিয়া একজনকে বিলাতে পাঠাইলেন। তিনি কৃতবিদ্য হইয়া ফিরিয়া আসিলে রোজগার করিয়া নিজব্যয়ে দুইজনকে পাঠাইলেন। সে দুইজন আবার আরও দুইজনকে পাঠাইবেন। আমার দুই একজন মাননীয় বন্ধু, যাঁহাদের নাম অনেকেই অবগত আছেন—এইরূপে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। সেকালে গুরুদক্ষিণা এইরূপ ছিল। আপনারা রঘুবংশে বিবৃত কৌৎসের কথা জানেন। ধর্ম্মচর্য্য শেষ হইলে কৌৎস গুরুকে দক্ষিণা দিতে চাহিলেন, গুরু কহিলেন, 'বৎস, এতাবৎ তুমি যে স্নেহ দেখাইয়াছ, আমার পক্ষে সেই স্নেহই যথেষ্ট, গুরুদক্ষিণা অন্য কিছুর প্রয়োজন নাই।' কিন্তু কৌৎস পীড়াপিড়ী করাতে তিনি কহিলেন, "দিবে? আচ্ছা দাও, কিন্তু এত টাকা দিতে হইবে।' রঘুর নিকট হইতে তাঁহার বিশ্বজিৎ যজ্ঞ সমাপ্ত হইবার পর ঐ টাকা সংগ্রহ করিয়া কৌৎস গুরুদক্ষিণা দিয়াছিলেন। ঐ টাকা গুরুদক্ষিণা-লব্ধ ধন, গুরু নিজের গৃহ নির্ম্মাণে বা গৃহিণীর অলঙ্কার নির্ম্মাণে বা অন্য কোন বিলাস সাধনে ব্যয় করিতেন না। ব্যয় করিতেন, ছাত্রদিগের জন্য। কিন্তু ইহা কদাচিৎ হইত। অধিকাংশ সময় গুরুদক্ষিণা ছাত্রদের স্নেহে ও বাৎসল্যে দেওয়া হইত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভিক্ষা করিয়া ব্রহ্মচারীদিগকে আপনাদের ব্যয়ভার নির্ব্বাহ করিতে হইত। তখন ভিক্ষা ছিল অন্ন ভিক্ষা। আহারের নিয়ম একবার, বেলা ১০টা, ১২টা বা ২টার সময়। তাহার পূর্ব্বে গ্রামে বা নগরে দ্বারে দ্বারে কমণ্ডলু হস্তে উপস্থিত হইতে হইবে। বৌদ্ধ দেশে এখনও এ প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। কমণ্ডলু হস্তে বিদ্যার্থী গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া থাকে, গৃহস্থ ভাত, চাল, প্রভৃতি কমণ্ডলু মধ্যে দিয়া যান। ভিক্ষা আহরণ শেষ হইলে তাহা গুরুকে দেখাইবেন। গুরু আজ্ঞা করিবেন, বৎস খাও, তাহার পর ব্রহ্মচারী খাইবেন।

তৎপরে যখন ধর্ম্মসূত্রের দিন চলিয়া গিয়াছিল, ধর্ম্মশাস্ত্রের দিন আসিয়াছিল, তখন জাতিভেদ অল্পে অল্পে প্রবেশ করিতেছিল। তখন নিয়ম হইল, ভিক্ষাটা স্বজা-

তিতে হওয়া উচিত। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষা করিবেন। তাহার পর যখন জাতি-ভেদের প্রাধান্য সম্পূর্ণরূপে স্থাপিত হইয়াছিল, তখন অন্নের অর্থ হইয়াছিল তণ্ডুল। প্রাচীন গ্রন্থ সমূহে 'ব্রহ্মচারী রন্ধন করিবেন' এরূপ ব্যবস্থা কোথায়ও নাই। আমি গোভিল, সাঙ্খ্যায়ন, আশ্বলায়ন প্রভৃতি গৃহ্য সূত্র ও বশিষ্ট, আপস্তম্ব প্রভৃতি ধর্ম্মসূত্র সকল তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াছি,ব্রহ্মচারীর রাঁধিয়া খাইবার ব্যবস্থা কোথায়ও পাই নাই। সন্ন্যাসে ও ব্রহ্মচর্য্যে জাতিভেদ ছিল না। বিদ্যার্থী অন্ন ভিক্ষা করিয়া খাইবেন, স্বপাক করিয়া খাইবেন না। ব্রহ্মচারীর জাতি-ভেদ-নাই—সন্ন্যাসীর জাতিভেদ নাই। যাক্ এখন সে সব কথা।

ব্রহ্মচারীর বাস ছিল গুরুগৃহে, অথবা গুরু-নির্দ্দিষ্ট অন্য কোন গৃহে। ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিলে কখনও পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। এক স্কুল হইতে নাম কাটাইয়া লইয়া অন্য স্কুলে ভর্ত্তী হইবার রীতি সেকালে ছিল না। গুরু যতদিন না বলিতেন, "বৎস, আমার নিকট তোমার শিক্ষা শেষ হইয়াছে, তুমি এখন অন্যত্র যাইতে পার." ততদিন ব্রহ্মচারী অন্যত্র যাইতেপারিতেন না। গুরুর প্রতি শিষ্যের কর্ত্তব্য গুরুর মরণ পর্য্যন্ত। শুধু তাহাই নহে। গুরুর আজ্ঞা পালন অবশ্যকর্ত্তব্য ছিল। আজ্ঞা অযথা হইলেও তাহা পালন করিবেন। যে আজ্ঞা পালন করিলে জাতিচ্যুত হইতে হইবে—কেবল সেই আজ্ঞা পালন করিবেন না। অপর সমস্তই অবনত মস্তকে পালন করিবেন।

এখন ব্রহ্মচারীর বেশ ভূষা। তাহার দুইখানি বস্ত্র থাকিত। একখানি কাপড়, অপর খানি উত্তরীয়। ব্রাহ্মণের শোণের কাপড়, ক্ষত্রিয়ের পাট বা জুটের কাপড়, বৈশ্যের কম্বল বা লোমের কাপড় পরিধান করিতে হইত। ব্রাহ্মণের উত্তরীয় মৃগ-সারচর্ম্ম নির্ম্মিত, ক্ষত্রিয়ের যে কোনও মৃগ চর্ম্ম নির্ম্মিত এবং বৈশ্যের ছাগ বা গো চর্ম্ম নির্ম্মিত। ব্রাহ্মণের দণ্ড পলাশের, ক্ষত্রিয়ের বেলের, এবং বৈশ্যের ডুম্বুর কাঠের। ব্রাহ্মণের কাপড় রক্তবর্ণের,ক্ষত্রিয়ের গৈরিক বর্ণের, বৈশ্যের পীত বর্ণের। ব্রহ্মচারীর ক্ষৌর কর্ম্ম নিষিদ্ধ। সমস্ত চুল, সমস্ত নখ রাখিতে হইবে। যদি নিতান্ত আবশ্যক হয়,তাহা হইলে সমস্ত কেশ মুণ্ডন করিয়া শিখা রাখিতে হইবে, তাহাও আবার গ্রন্থীবদ্ধ থাকিবে। এ ব্যবস্থা বিশেষ আবশ্যক পক্ষে। ব্রহ্মচারীর বিলাসের কিছু মাত্র নাই। একঠোর ব্রত তাহাকে সংযতহৃদয়ে, দৃঢ় পণে পালন করিতে হইবে।

ক্ষৌর-কর্ম্ম নিষিদ্ধ, তৈল-মর্দন নিষিদ্ধ, মুখ প্রক্ষালন নিষিদ্ধ, বিশেষ আবশ্যক না হইলে পদ ধৌত করাও নিষিদ্ধ। জুতাব্যবহার নিষিদ্ধ, ছাতা ব্যবহার নিষিদ্ধ এবং গো-অশ্ব-চালিত শকটে আরোহণ করাও নিষিদ্ধ।

এই কঠোর ব্রতের সহিত আধুনিক ছাত্র জীবনের তুলনা কর। এইরূপ সাধনা না হইলে কি বীর পুরুষ হইতে পারা যায়? দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়া কি বীর পুরুষ হইতে পারিবে? টেরী কাটিয়া, রুমালে আতর দেল্‌খোস্‌,মুখে মুখরাগ লাগাইয়া, মোজার উপর ডশনের বুট্ পায় দিয়া, ফিন্ ফিনে শান্তিপুরে ধুতী পরিয়া, বক্ষঃস্থলে গোলাপ ফুল আঁটিয়া, রেশ্‌মী রুমালে মুখ মুছিলে কি বীর পুরুষ হইতে পারিবে? বীর পুরুষ হইতে গেলে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য সাধন করিতে হইবে। ব্রহ্মচারীর যজ্ঞে যাইতে

নাই, উৎসবে যাইতে নাই, সভা সমিতিতে যাইতে নাই, সুগন্ধ বা পুষ্প ব্যবহার নিষিদ্ধ। 'ভবতি ভিক্ষাং দেহি' ব্যতীত স্ত্রীলোকের সহিত অন্য কোনও কথা কহিতে নাই। ব্রহ্মচারীর উচ্চ পালঙ্ক বা খট্টার উপরে শয়ন করিতে নাই। তাহার শয্যা ভূশয্যা। কম্বল ভিন্ন আর কিছু পাইবেন না। ব্রহ্মচারীর দৌড়ান নিষিদ্ধ, সংযত হইতে হইবে, বৃক্ষে আরোহণ নিষিদ্ধ, নদীতে সন্তরণ নিষিদ্ধ, যে সন্তরণে অপরের গাত্রেজল লাগে। সন্তরণ করিতে হইলে কাষ্ঠদণ্ডের ন্যায় স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া করিতে হইবে। ব্রহ্মচারীর আহার্য্য সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ব্রহ্মচারীর মধু, চিনি, মাংস ও লবণ নিষিদ্ধ। তিনি একাহারী হইবেন। যেখানে গান্ বাজ্না হইতেছে, ব্রহ্মচারী সেখানে যাইবেন না। স্তোত্র পাঠ ভিন্ন সুর করিয়া কিছুই পড়িবেন না। ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম অতি কঠোর। সেই কঠোর নিয়মে নিয়োজিত হইয়াছিলেন বলিয়াই প্রাচীন আর্য্যগণ মহাপুরুষ হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

এখন বিনয়ের কথা বলিব। গুরু বসিয়া থাকিলে শিষ্য দাঁড়াইয়া থাকিবেন, বসিবেন না, ও তিনি শুইয়া থাকিলে তবে বসিবেন। শয্যা হইতে উঠিতে হইবে গুরুর পূর্ব্বে, শুইতে হইবে তাঁহার পরে। পথে রাজকর্ম্মচারী, বয়োবৃদ্ধ, বালক বা স্ত্রীলোক দেখিলে দাঁড়াইয়া থাকিবে। তাঁহারা চলিয়া গেলে যাইবে। প্রভাত ও সন্ধ্যার সময় গুরুকে দণ্ডবৎ করিবে। পণ্ডিতদিগকে দূর হইতে নমস্কার করিবে। নিকটে নমস্কার করিলে তাঁহারা অপমান করা হইল বলিয়া মনে করেন। সহপাঠী সতীর্থগণের সহিত আদর সম্ভাষণ ও নমস্কার করিবে, দুইবার প্রভাতে ও সন্ধ্যায়। অতি প্রভাতে ব্রহ্ম মুহূর্ত্তে উঠিয়া গুরুর হোম-বেদীতে গোময় লেপন করিবেন, তাহার পর স্নানে বহির্গত হইবেন, স্নানের পর আসিবার সময় সমিৎকাষ্ঠ, দূর্ব্বা, পুষ্প প্রভৃতি আহরণ করিয়া বেদীর উপর ধরিয়া দিবেন। গুরুর মুখ ধুইবার সমস্ত আয়োজন ঠিক করিয়া দিবেন। সমস্ত কার্য্য ভৃত্যের ন্যায় করিবেন। গুরু স্নানে যাইলে কমণ্ডলু, কাষ্ঠ বস্ত্র প্রভৃতি লইয়া তাঁহার অনুসরণ করিবেন। স্নানান্তে পূজার উপকরণ ঠিক করিয়া দিবেন। সমাপ্ত হইলে ভিক্ষায় বহির্গত হইবেন। গুরু শয়ন করিলে ব্যজন করিতে হইবে, গা টিপিয়া পা টিপিয়া দিতে হইবে। কিন্তু পড়িবার কথা এখনও গুরুকে জিজ্ঞাসা করিবেন না। গুরু ডাকিলে তবে যাইবেন। সাধারণতঃ পড়ার কাজটা দ্বিপ্রহরের নিদ্রা হইতে উঠিয়া ৪টার পরে হইত। সন্ধ্যার পরে গায়ত্রী সমাপ্ত হইলে আলোচনা হইত। এই আলোচনায় শিক্ষা যতদূর হইত, পুস্তক পাঠে ততদূর হইতনা। ইহাই ব্রহ্মচারীর নিত্যকর্ম্ম ছিল। ইহাই তাহার জীবনের কঠোর সাধন। এই কঠোর ব্রত সাধন ছিল বলিয়াই গার্গী, বেদব্যাস, পরাশর ও বিশ্বামিত্রের মত মহাপুরুষ ভারতে জন্মগ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। পড়িতে হইবে শুইয়া নহে, কোন জিনিষে ঠেক দিয়া নহে, দণ্ডের মত ঋজুভাবে উপবিষ্ট হইয়া। বিনয়, সাধনা ও চরিত্র, ব্রহ্মচারীর তিনই ছিল। ক্রোধ থাকিবে না। তাহা হইলে সমস্ত বিদ্যা পণ্ড হইবে। লোভ থাকিবে না, অহঙ্কার থাকিবে না, অন্যের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বীতা সূত্রে ঈর্ষা থাকিবে না। সুতরাং ষড়্‌রিপুকে সংযত

করিতে এখন হইতেই শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতে হইত।

একদিন হিন্দু-ঋষিদের ব্যবস্থার গুণে ব্রহ্মচারীর দৃষ্টি সংযত, পাদচারণা সংযত, বিনীত, শুক্ল, সমহিত-চিত্ত ছিল। বৈদিক যুগের ব্রহ্মচারীর ন্যায় বিলাসশূন্য, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও গুরুর আদেশ পালনে কর্ত্তব্য-পরায়ণ আর কোথায়ও দেখিতে পাওয়া যায় না।

ঋষি শিষ্যকে আদেশ করিলেন, "বৎস, বর্ষার জলে ক্ষেত্রের আল ভাসিয়া যাইতেছে, তুমি গিয়া আল বাঁধিয়া আইস।" শিষ্য গিয়া সাধ্যমত চেষ্টা করিল, মাটী তুলিয়া আল বাঁধিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। জলের স্রোতে মাটীর বাঁধ ভাসিয়া গেল। শিষ্য দেখিল যে গুরুর আদেশ ত প্রতিপালিত হয় না; সুতরাং আদেশ প্রতিপালনার্থ নিজে মাটী হইয়া আলের সঙ্গে মিশিয়া রহিল। সন্ধ্যা হইল, সে ব্যতীত সকলেই আশ্রমে উপস্থিত, সন্ধ্যার সময় আশ্রমে থাকিতেই হইবে। (সন্ধ্যার সময়েই বা কেন, ভিক্ষার জন্য কেবল ২।১ ঘণ্টা ব্রহ্মচারী বাহিরে যাইতে পাইত)। শিষ্যকে না দেখিয়া গুরু অনুসন্ধান করিলেন, কেহই বলিতে পারিল না। গুরু অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। অবশেষে সেই ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। তথায় শিষ্যকে তদবস্থায় দেখিয়া গুরু জিজ্ঞাসিলেন, 'বৎস, এখানে কি করিতেছ?' শিষ্য কহিল, জল রোধ করিতেছি, আমি চলিয়া গেলে জল রোধ হইত না।' এইরূপ তোমরা যদি গুরুর আজ্ঞানুবর্ত্তী, সংযত ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হও, তবেই আবার ভারতকে উদ্ধার করিতে পারিবে।

উদ্দীপনা।

"যো নাহং নামৃতাস্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্"

১

মরণ ডাকিছে প্রীতি সম্ভাষণে,
চল প্রাণাধিক! মরিগো' দুজনে;
বৃথা দেহ ভার, কেন বহি আর,
কি কাজ সংসারে, কি কাজ জীবনে?

২

কি কাজ জীবনে—কি করিনু হরি!
দেব-দত্ত-প্রাণ কেন পরিহরি?
এবে দুটী দেহ, করি কত স্নেহ,
গড়িলা বিধাতা, কেমনে পাসরি?

৩

তাইতো নয়নে আসে বারিধারা,
কেন মোরা ভ্রান্ত কেন দিশাহারা?
কি করিনু হায়, যেতেছি কোথায়,
আজিও চিনি না আমরা যে কা'রা;

৪

কোথা হ'তে আসা, যাব কোন্ থানে,
কি সুর বাঁধিব কোথাকার গানে;
এ দুটী জীবন, কেন বা মিলন,
যাবে নদ নদী কোন্ সিন্ধু পানে?

৫

জীবনের মাঝে যাহা কিছু পাই,
সবি সে যে হেয়, সবি ভস্ম ছাই,
মুকুতা মাণিক, তুচ্ছ, প্রাণাধিক!
প্রাণের পিয়াস কি দিয়া মিটাই?

খেলা ঘরে আর রহে না তো মন,
সত্যকার ঘর এবে প্রয়োজন,
ফেলি ভস্ম ছাই, এস চলি যাই,
দেখি কোথা পাই বাঞ্ছিত রতন।

৭

চল সেই দেশে, নাহি যথা পাপ,
মানবের বুকে নাহি অনুতাপ,
যথা চিরদিন, হিংসা দ্বেষ হীন,
নাহি জানে কেহ ছয় রিপু-তাপ।

৮

সবারি হৃদয় আনন্দ-নিলয়,
প্রেমেরি শাসন, নাহি দণ্ড ভয়,
সে সুখের রাজ্য, লোক হিত কার্য্য,
সবাই সবার, কেহ পর নয়।

৯

অন্য-সুখ-আশে খাটিছে সবাই,
আপনার কথা কারো মনে নাই,
তাই চিরসুখ, ভরা প্রতি বুক,
তাই মা কমলা অচলা সে ঠাঁই।

১০

সে যে রম্য স্থান পুণ্য তপোবন,
ঋষি তুল্য যত অধিবাসী জন;
পতিপ্রাণা সতী, দয়া মূর্ত্তিমতী,
বিশ্বহিতে রতা, গৃহলক্ষ্মীগণ।

১১

সে দেশের সব নবীনতা মাখা,
তপন-আতপে স্বর্ণরেণু আঁকা;
চাঁদের আলোকে, হীরক ঝলকে,
মেঘে মেঘে মণি নীলকান্ত রাখা।

১২

সে দেশের কবি নিজে কালিদাস,
নিতি বহে সেথা মলয়-বাতাস,
সে দেশের ফুল, পারিজাত তুল,
বিহগের কণ্ঠে অমিয়-উচ্ছ্বাস।

১৩

চল প্রিয়তম! চল সেথা যাই,
জনমের সাধ বাসনা মিটাই,
এই যুগ বক্ষ, বিভু প্রাপ্তি লক্ষ্য,
চল দোঁহে সেই কামনা পূরাই।

১৪

সে আনন্দ ধাম যদি নাহি পাই,
তবে এ জগতে কিছু নাহি চাই,
এসো গো মরণে, সঁপিয়া জীবনে,
ক্ষুদ্র সাধ আশা পলকে মিটাই।

শ্রীবীরকুমার-বধ-রচয়িত্রী।

ভারতে দুর্ভিক্ষ। (৩)

শিল্পবাণিজ্যের অবনতি।

আমাদের দেশে একটী প্রবাদ আছে, "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মনি তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ।" কথাটা খাঁটি সত্য। শিল্পবাণিজ্যের উৎকর্ষ ব্যতিরেকে কোন দেশের উন্নতি সম্ভব নহে। বাণিজ্যের বিস্তার জন্যই অতি ক্ষুদ্র হল্যাণ্ড পৃথিবীর মধ্যে অধিক ধনশালী প্রদেশ বলিয়া প্রথিত। জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য সকল জাতি প্রধানতঃ কৃষি ও বাণিজ্যের উপর নির্ভর করে। শুধু কৃষির উপর নির্ভর করার দোষ এই যে, কোন কারণে শস্য হানি ঘটিলে দুর্ভিক্ষ স্বতঃই আসিয়া উপস্থিত হয়। জাতীয় শিল্পনাশ ভারতীয় দুর্ভিক্ষের অন্যতম মুখ্য কারণ। শিল্পপ্রধান ও সু-সমৃদ্ধ দেশে

কৃষিজীবীর সংখ্যা অত্যধিক হয় না। কর্ম্মঠ লোকের মধ্যে ইংলণ্ডে শতকরা ১৩, স্কটলণ্ডে ১৭, আয়র্লণ্ডে ৪৩, ইটালিতে ৪৪, ফ্রান্সে ৪৬, গ্রীসে ৪৯ এবং যুক্ত আমেরিকায় ৪৪ জন কৃষক। ভারতবর্ষে শতকরা ৮০ জন কৃষক। বিবিধ কারণে শিল্পের অবনতি ঘটায় এ দেশের অধিবাসীবর্গ অধিক পরিমাণে কৃষির উপর নির্ভর করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভারতবর্ষের বহির্বাণিজ্যের অবস্থা অতি শোচনীয়। উন্নত ও সমৃদ্ধ প্রদেশের লক্ষণ এই যে, তথায় রপ্তানি অপেক্ষা আমদানি মালের মূল্য অধিক হয়। ইংলণ্ড, জর্ম্মানি, ফ্রান্স, বেলজিয়ম, হল্যাণ্ড আমেরিকার অবস্থা এইরূপ। ১৮৮৮—৮৯ অব্দের প্রধান প্রধান দেশের আমদানি ও রপ্তানির তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রদেশ	আমদানি কোটিটাকা	রপ্তানি কোটিটাকা
ইংলণ্ড	৪২৭	৩৩২
জর্ম্মানি	২৫১	২৪২
ফ্রান্স	২০২	১৮১
আমেরিকা যুক্তরাজ্য,	১৪৮	১৪৬
হল্যাণ্ড	১০	৯
তুরস্ক	১৬	১২
ভারতবর্ষ	৮০	৯৮
মিশর	৭	১০

ভারতবর্ষ ও ঋণগ্রস্ত মিশরের রপ্তানি মূল্য অধিক। ভারতবর্ষ পরাধীন দেশ, তাহার উন্নতি জন্য যাহা কিছু আবশ্যক, ইংলণ্ড তাহা প্রদান করে। ব্যবসার মূলধন, পণ্যবহনোপযোগী যান, বস্ত্র বয়ন প্রভৃতির কল, খনির কার্য্যের দ্রব্যাদি, সকলই বিদেশ হইতে আইসে, অর্থাৎ ভারতবর্ষকে রপ্তানি ও উৎপাদনক্ষম প্রদেশে পরিণত করিতে যাহা কিছু আবশ্যক, তাহা ইংলণ্ডের প্রদত্ত; ইহার পরিণাম আমদানি অপেক্ষা রপ্তানির আধিক্য। প্রতি বৎসর আমদানি অপেক্ষা রপ্তানি মূল্য যে পরিমাণ বৃদ্ধি হইতেছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। নিম্নে যে তালিকা প্রদত্ত হইল, তাহা হইতে এই উক্তির সত্যতা হৃদয়ঙ্গম হইবে।

	আমদানি	রপ্তানি
১৮৯৪-৯৫	৭৯·৭২৬	১১৩·৯৭৩
১৮৯৫-৯৬	৮২·৬৭৫	১১৮·৪৯৫
১৮৯৬-৯৭	৮৪·৮৬৯	১০৮·৮৪০
১৮৯৭-৯৮	৮৯·৭৪৩	১০৪·৬৭১
১৮৯৮-৯৯	৮৬·২৬৭	১২০·১২৯

ভারতবর্ষের রপ্তানি মালের মূল্য ১২০ কোটি টাকা। ইংরাজ বণিক শতকরা ১২½ টাকা লাভ করে, অতএব ১২০ কোটি টাকার উপর লাভ ১৫ কোটি টাকা পর্য্যন্ত হয়। Natural commerce বা বাণিজ্য স্বেচ্ছাবস্থ থাকিলে অর্থাৎ বহির্বাণিজ্যের টাকা ঘরে আসিলে আমদানি (১২০+১৫) ১৩৫ কোটি টাকা, তাহা না হইয়া ৮৬ কোটি, সুতরাং বার্ষিক ক্ষতি (১৩৫—৮৬) ৪৯ কোটি টাকা। বাণিজ্য-চেষ্টা না থাকায় আমরা বার্ষিক ১৫ কোটি টাকা লাভবান হইতে পারিতেছি না।

১৮৯৪খ্রীঃ হইতে ১৯০০ খ্রী পর্য্যন্ত ৬ বৎসরে আমদানি অপেক্ষা রপ্তানি ৩৪ কোটি টাকার অধিক হইয়াছে। ব্যয়-কমিশনের রিপোর্টে প্রকাশ, ভারতবর্ষের বার্ষিক রাজস্ব ৫৭ কোটি টাকা, সুতরাং সমস্ত রাজস্বের অর্দ্ধেকের বহু অধিক টাকা বৎসর বৎসর ভারত হইতে চলিয়া যাইতেছে। এই

টাকায় ৩৪ কোটি ভারতবাসীর সংবৎসরের আহারের সংস্থান হইতে পারে।

কলিকাতা শিল্পপ্রদর্শনী খুলিবার সময় লর্ড ডফরিণ যথার্থই বলিয়াছিলেন—"যাঁহারা এদেশের অর্থনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন, তাঁহারা জানেন, অধিক পরিমাণে কৃষিনির্ভরতাই ভারতীয় প্রজার দুঃখ দরিদ্রতার প্রধান কারণ।" কিন্তু চিরদিন ভারতবর্ষের অধিবাসিগণ কৃষিকার্য্যের উপর নির্ভর করে নাই। অতি প্রাচীন কাল হইতেই সিরীয়, রোমক প্রভৃতি দেশ সমূহের সহিত তাহাদের বাণিজ্য ব্যবসা প্রচলিত ছিল। ভারতবর্ষের শিল্প-নৈপুণ্যই পাশ্চাত্য বণিকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাঙ্গালার মসলীন, রেশমী বস্ত্রের কারুকার্য্য এসিয়া ও য়ুরোপের সমস্ত প্রদেশে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। সূত্র প্রস্তুত ও বস্ত্র বয়ন প্রণালী দ্বারা যে সকল লোক বহুশতাব্দী ধরিয়া ধনোপার্জ্জন করিত,এক্ষণে তাহারা কপর্দ্দকবিহীন। সার জেমস্ কার্ড (Sir James Caird) প্রকৃতই বলিয়াছেন—বৃটিশ শাসনে ভারতের তাঁতিকুল ও শিল্পী-সম্প্রদায় যেরূপ পীড়িত হইয়াছে, অন্য কোন শ্রেণীর লোক তদ্রূপ হয় নাই। অনুসন্ধান দ্বারা জানা যায়, ইংলণ্ডের সংকীর্ণ নীতিই ভারতীয় শিল্প নাশের প্রধান কারণ। পলাশীর যুদ্ধের জয়লাভের পর হইতে ইংরাজেরা এদেশে বাণিজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়া, প্রত্যেকেই স্ব স্ব ব্যক্তিগত ব্যবসা বিনাশুল্কে এদেশে চালাইবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। মীরকাশিম ইংরাজদিগের এই অবাধ বাণিজ্যে বাধা দিবার চেষ্টা করেন। বিফলপ্রযত্ন হইয়া তিনি দেশীয় বাণিজ্যেরও শুল্ক একবারে উঠাইয়া দিলেন। রাজস্বের বিপুল ক্ষতি স্বীকার করিয়া প্রজাবৎসল নবাব প্রজার হিতকল্পে ঐ ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইলেন; কিন্তু স্বার্থান্ধ ইংরাজ-বণিকেরা নবাবের এই সঙ্গত ব্যবস্থায় তীব্র প্রতিবাদ করিয়া শ্বেতাঙ্গ মাত্রেরই পক্ষে সর্ব্ববিধ পণ্যের অবাধবাণিজ্যে একাধিপত্যলাভ ও দেশীয় বণিকদিগের উপর গুরুতর শুল্ক স্থাপনের জন্য মিরকাশিমকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। নবাব সে অবৈধ অনুরোধ রক্ষা না করায়, ইংরাজদিগের সহিত তাঁহার যুদ্ধ বাধিল।(১)

১৭৬৫ খ্রীঃ ইংরাজেরা বাঙ্গালার দেওয়ানি গ্রহণ করিয়া রাজস্ব সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হন। ১৭৬৯ খ্রীঃ, ১৭ই মার্চ্চ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টরগণ বঙ্গের রেশম ব্যবসায়কে উৎসাহিত এবং রেশম বয়ন-শিল্পকে নিরুৎসাহিত করিবার আদেশ করিলেন।(২) এই আদেশের ফলে শিল্পজীবী ভারতবর্ষের সমগ্রমূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত হইয়া গ্রেট বৃটনের কলের জন্য উপকরণ দ্রব্যের উৎপাদন ক্ষেত্রে পরিণত হইল।

অবিলম্বে এই অবিচারপূর্ণ কূট নীতির ঈপ্সিত ফল ফলিল। যে ভারতবাসী পূর্ব্বে অন্যান্য জাতির বস্ত্র সরবরাহ করিত, তাহারা এক্ষণে স্বীয় লজ্জা নিবারণের জন্য ইংলণ্ডের শরণাপন্ন হইল। আবাহমান কাল হইতে ভারতবর্ষ সূতা ও রেশমী বস্ত্রের জন্য বিখ্যাত ছিল, ক্রমে ক্রমে এই জাতীয়

(১) A view of the Rise, Progress &c of the English Govt. in Bengal 1772 p 48—

(২) Ninth Report of the select committee of the House of Commons on Administration of Justice in India, 1783, Appendix 37.

শিল্পের অবনতি ঘটিল। ১৭৯৪ খ্রীঃ ইংলণ্ড হইতে ১৫৬ পাউণ্ড বা ১৫৬০্ টাকার, ১৮০০ খ্রীঃ ১৯৫৯৫০্ টাকার, ১৮১৩ খ্রীঃ ১০৮৮২৪০্ টাকার ও ১৮৮৯খ্রীঃ ৩১ কোটি টাকা মূল্যের বস্ত্র ভারতবর্ষে প্রেরিত হইয়াছিল। ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে প্রেরিত বস্ত্রের উপর শতকরা ৩॥ টাকা ও ভারতবর্ষের রপ্তানি বস্ত্রের উপর শতকরা ১০ টাকা এবং ভারতীয় রেশমী বস্ত্রের উপর শতকরা ২০্ টাকা ও ইংলণ্ডের রেশমী বস্ত্রের উপর শতকরা ৩॥০ টাকা শুল্ক বসান হইল। ইহার ফল স্বরূপ (১৮১৪—৩৫) ২৪ বৎসরে ভারত হইতে সূতার বস্ত্র রপ্তানি ১২ লক্ষ খণ্ড হইতে ৩ লক্ষ খণ্ডে পরিণত হইল। এ দিকে ইংলণ্ড হইতে আমদানি ১০ লক্ষ খণ্ড হইতে ৫০০ লক্ষ খণ্ডে উঠিল। ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ হইতে রেশমী বস্ত্র ফ্রান্সে রপ্তানি হইত। কারুকার্য্য ও শিল্পনৈপুণ্য হেতু ভারতীয় বস্ত্র ফরাসি বাজারে আদর প্রাপ্ত হইতে লাগিল। নিষেধসূচক শুল্ক দ্বারা তাহার পথ রুদ্ধ করা হইল। এইরূপে ভারতের দুইটী প্রধান শিল্পের সমাধি হইল। ডিরেক্টরদিগের কাগজ পত্রেই দেখা যায়, —'ভারতের রেশমী বস্ত্র ও রেশম ও তুলা মিশ্রিত বস্ত্রাদি বহুদিন আমাদের বাজার হইতে বিতাড়িত হইয়াছে। তুলার বস্ত্র কতদিন ভারতের একটী প্রধান শিল্প ছিল, তাহার উপর শতকরা ৬৭্ টাকা শুল্ক বসান হইয়াছে এবং উৎকৃষ্ট কলের সাহায্যে সুলভে মাল তৈয়ারি করিয়া আমরা ভারতে পাঠাইতেছি। এইরূপে শিল্পজীবী ভারতবাসী কৃষিজীবিতে পরিণত হইয়াছে।" (১)

ভারতবর্ষ পরাধীন না হইলে, তাহার শিল্প বাণিজ্যের এরূপ অধঃপতন হইত না। ইংরাজ আমাদের রাজা এবং ইংরাজ বণিক, রাজবৃত্তি ও বণিক বৃত্তি পরস্পর বিভিন্ন। ইংরাজ যদি বণিক না হইয়া শুধু রাজা হইতেন, তাহা হইলে ভারতকে এইরূপ হৃতসর্ব্বস্ব হইতে হইত না। বণিক বৃত্তির অনুরোধে রাজা যে অবিচার করিলেন, তাহা বিস্ময়কর। অধ্যাপক উইলসন বলিয়াছেন, ১৮১৩ খ্রীঃ সাক্ষ্যে প্রকাশ, সে সময় পর্য্যন্ত ভারতীয় তুলা ও রেশম বস্ত্র, লাভ রাখিয়াও, তৎশ্রেণীর বিলাতী মাল অপেক্ষা শতকরা ৫০।৬০্ টাকা নিম্নমূল্যে বিক্রয় হইত, সুতরাং বিলাতী মালকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ভারতীয় মালের উপর শতকরা ৭০।৮০ টাকা শুল্ক বসান হইল। এই নিষেধসূচক শুল্ক না বসাইলে পেস্‌লি, ম্যানচেষ্টারের কলগুলি প্রারম্ভেই বন্ধ হইয়া যাইত। ভারতীয় শিল্পের বলিদানে ঐ কলগুলির জন্ম। ভারত যদি স্বাধীন হইত, তাহা হইলে সেও বিলাতী মালের উপর নিষেধ-সূচক শুল্ক বসাইত। বিদেশীয় কারিকর রাজনৈতিক অবিচারের হস্ত ব্যবহার করিয়া প্রতিযোগীকে দমন করিয়া শেষে গলা টিপিয়া মারিল। ন্যায়যুদ্ধে তাহার জয় লাভের কোনই আশা ছিল না। (২) এক কার্পাস শিল্প নাশে কত ক্ষতি হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, ১৮৮৯ খ্রীঃ ৩১ কোটি টাকার বস্ত্র ভারতবর্ষে আমদানি হইয়াছিল। তুলার মণ ২০ টাকা, বিলাতী বস্ত্রের মণ ৬৩ টাকা প্রতি ২০্ টাকার তুলায়

(১) Memorials of the Indian Government, being a selection from the papers of Henry St. George Tucker. p 494 &c—

(২) Mill's History of India, Vol vii p 385.

প্রায় ৪০ টাকা বৈদেশিক শিল্পীর মজুরী ও মহাজনদিগের লাভ, সুতরাং ৩১ কোটি টাকার কাপড় আমদানিতে এদেশে ২০ কোটি টাকার ধনোৎপত্তি হ্রাস হইতেছে। কার্পাস, ধান্য, গোধুম প্রভৃতি দ্রব্যের আমদানি রপ্তানির কথা ছাড়িয়া দিলেও আমরা দেখিতে পাই, ভারতীয় স্বর্ণ রৌপ্যের দ্বারা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ডের বাণিজ্য ও শিল্পের কিরূপ বিস্তার ও উৎকর্ষ সাধন হইয়াছিল।১ ভারতীয় বাণিজ্য চিরকালই রাজনীতিক শৃঙ্খলে নিয়ন্ত্রিত। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট মুদ্রা-শাসনীর যে নব বিধান করিয়াছেন, তাহা দ্বারা ভারতীয় বাণিজ্য অল্প বিড়ম্বিত হয় নাই। ওকোনার সাহেবের বাণিজ্য সমালোচনা পুস্তক পাঠে(O'conor's Review of Trade. p 10) জানা যায় ১৯০১ খ্রীঃ সমগ্র ভারতে ৬১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার কৃষিজাত পণ্য উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৮৯৩ খ্রীঃ গবর্ণমেণ্ট যে আইন করেন, তাহার ফলে টাকার মূল্য এখন ১ শিলিং ৪ পেন্স হইয়াছে। সে হিসাবে ৬১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার মূল্য ৪০ কোটি ৮ লক্ষ ৭০ হাজার পাউণ্ড। কিন্তু ঐ আইন পাশ হইবার পূর্ব্বে একটাকার বিনিময়ে ১ শিঃ ২পে পাওয়া যাইত। আজও যদি টাকার সে দর থাকিত, টাকার কৃত্রিম মূল্য নির্দ্ধারিত না হইলে আমাদের কৃষকেরা পূর্ব্ববর্ণিত কৃষিজাত শস্য বিক্রয় করিয়া বিদেশীয় বণিকদিগের নিকট হইতে ৭০০৪৫৭০০০ টাকা অর্থাৎ ৮৭৪৫৭৯০০ টাকা অধিক পাইত; একণে প্রায় পৌণে নয় কোটি টাকা লোকসান হইতেছে।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, বাণিজ্য ব্যবসা ব্যতিরেকে কোন জাতির উন্নতি অসম্ভব। নানা কারণে আমাদের জাতীয় শিল্প নাশ ও বাণিজ্য কঠিন নিগড়ে নিবদ্ধ হওয়ায় দুরবস্থার একশেষ হইতেছে। কি উপায়ে জাতীয় শিল্প পুনর্জীবিত ও বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধি হয়, সে বিষয়ে প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির গভীর গবেষণা ও অনুসন্ধান আবশ্যক। মনস্বী হাজলিট যথার্থই বলিয়াছেন, 'যে কোন আলোচ্য বিষয়ই হউক, তাহার প্রকৃত তথ্য বা সত্য অবগত হইতে হইবে, সেই সত্য দ্বারাই বিষয়ের মীমাংসা হইবে।' এই মূল তথ্য নিষ্কাষণে অসমর্থ হইলে কোন যুক্তিই কার্য্যকরী হইবে না। লর্ড জর্জ্জ হামিলটন বলিয়াছিলেন—'ভারতের অগণিত অধিবাসীর অন্ন সংস্থান করিতে হইলে দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্যের বিস্তার আবশ্যক। কল কারখানা বসাইয়া দেশের অভাব, দেশীয় মূলধন দ্বারা দেশীয়গণের সাহায্যে দূর করিতে হইবে।' লর্ড জর্জ্জের এই উক্তির প্রতিবাদ করিয়া সেনসাস্ কমিশনার বেইনস্ বলিয়াছিলেন—'শিল্পাগারের নলনিঃসৃত ধূমরাশি দেশের আর্থিক উন্নতির একটা সুস্পষ্ট লক্ষণ বটে, কিন্তু সে ধূম নগরের উপরিভাগে উড়িয়া বেড়ায়, দেশের অধিকাংশ লোকের নিকট কোন সুখবার্ত্তা বহন করে না। বর্ত্তমান যুগে কল কারখানার কার্য্যাদির প্রসার বৃদ্ধি হইয়াছে, এবং দেশের সর্ব্বত্র যাতায়াতের সুবিধা হইলে আরও বাড়িবে, তথাপি এ পক্ষে আপাততঃ ভারতবাসীর লাভ বড় অল্প। প্রথমতঃ ভারতবর্ষে কলকারখানা বসাইবার উদ্যোগ

১ The influx of Indian treasure, by adding considerably to the nation's cash capital, not only increased its stock of energy, but added much to its flexibility and the rapidity of its movement—Adams Brook's Law of Civilisation and Decay.

উৎসাহ নিতান্ত আধুনিক, দ্বিতীয় কথা বিদেশীয় সুসভ্য জাতিগণ বহুপূর্ব্বে কল কারখানা বসাইয়া সকল দেশের বাজারে বেশ আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে অপসারিত করিয়া ভারতবর্ষের কল কারখানার অধিকারিগণ যে সহজে ও অল্প সময়ের মধ্যে লাভের ব্যবসা চালাইতে পারিবেন,এমন বোধ হয় না। এই প্রকারের ব্যবসার প্রতিযোগিতায় ভারতবাসীকে অনেক দিন পশ্চাৎপদ থাকিতে হইবে।' কথাটা নিতান্ত অলীক নহে, তাহার উপর আর একটী বিশেষ কথা আছে। ইংরাজের বণিক ও রাজবৃত্তির পরস্পর সামঞ্জস্য কঠিন। এই অসামঞ্জস্য হেতুই ভারতীয় প্রাচীন শিল্প-নৈপুণ্য জলবুদ্বুদের ন্যায় শূন্যে মিশাইয়া গিয়াছে। এ কালেও উদাহরণের অভাব নাই। গত ৫০ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বম্বে, সুরাট, গুজরাট প্রদেশে কতকগুলি বস্ত্রের ও অন্যান্য কল স্থাপিত হইয়াছিল, তুলা-শুল্ক-আইন পাশ হওয়ায় তাহার অনেকগুলি ইতিমধ্যে বিকল হইয়া গিয়াছে। এইরূপ কঠিন প্রতিযোগীতায় ভারতীয় শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি সহজসাধ্য নহে। বিদেশী বণিকের ক্ষমতা অপ্রতিহত, কারণ আইনে তাহাদের হাত আছে। তাহারা আইনের বলে প্রতিদ্বন্দ্বীকে দমন করে।

রাজার অনুকম্পা, ভারতীয় ধনীদিগের সাহায্য এবং জাতীয় কোন কবডেন বা ব্রাইটের অভ্যুত্থান ব্যতীত আমাদের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি সুদূরপরাহত।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে অধিকাংশ প্রাচীন শিল্পের অবনতি ঘটিয়াছে, তাহার পর রেল খুলিতে আরম্ভ হইল। রেল বিস্তার দ্বারা দেশের দুর্ভিক্ষ আশঙ্কা নিবারণ ও দুর্ভিক্ষ-পীড়িত প্রদেশের বহু উপকার সাধন হয়, এবং আমদানি রপ্তানি সুলভ ও অল্প সময়ে সম্পন্ন হয়, বাণিজ্য সুগম হওয়ায় দেশের ধন সম্পত্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। রেল না থাকিলে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে দ্রব্যাদি প্রেরণের অসুবিধা। কোন প্রদেশে সহসা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে আহার্য্য সামগ্রী দুষ্প্রাপ্য হয়, শীঘ্র দ্রব্যাদি না পাইলে দুর্ভিক্ষক্লিষ্টদিগের মৃত্যু ভিন্ন অন্য গতি নাই। ইহার দ্বারা অনেক অনিষ্টও ঘটিতেছে। অনেক সময় রাজকোষ হইতে নূতন রেল নির্ম্মিত হয়, যৌথ কারকাবের মহাজনেরা রেল খুলিলে, তাহাদের ক্ষতি গবর্ণমেণ্ট পূরণ করেন। দুর্ভিক্ষ কমিশনের রিপোর্টে যে আয় ব্যয়ের তালিকা ধরা হইয়াছে, তাহাতে প্রকাশ, ৫০ বৎসরে গবর্ণমেণ্টের একান্ন কোটি টাকা ঐ লোকসান পূর্ণ করিতে ব্যয় হইয়াছে। মোট ৫১ টী রেলপথের মধ্যে রাজপুতানা, মালয়ে প্রভৃতি ৬টী রেল পথের লাভ ৮.৫৬ কোটি টাকা, অবশিষ্ট ৪৫ পথে ৫১.৯১ কোটি টাকা লোকসান হইয়াছে, অর্থাৎ লাভ বাদে ক্ষতি ৪৩.৩৪ কোটি। ঐ সকল রেলপথ ১৮৭০ খ্রীঃ পর হইতে নির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়াছে, নির্ম্মাণ কার্য্যের সমাপ্তির ৫ বৎসর পর রেলে লাভ আরম্ভ হইয়াছে ধরিলে এবং পূর্ব্বতন ও নূতন পথের লাভের সময় যদি গড়ে ২০ বৎসর ধরা যায়,তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাই, ২০ বৎসরে গড়ে শতকরা ২০ টাকা অর্থাৎ বৎসরে শতকরা ১টাকা লোকসান হইয়াছে। নিম্নে কয়েকটী রেলপথের মূলধন ও ক্ষতির তালিকা দেওয়া গেল।

নাম	মূলধন	ক্ষতি
	কোটি টাকা	কোটিটাকা
১। নর্থ-ওয়েষ্টারণ	৫০.৭০	২৫.৩৩
২। অযোধ্যা-রোহিলখণ্ড	১২.৫৬	৩.৩৯
৩। সাউথ ইণ্ডিয়ান	৭.৬৩	২.৭৯
৪। নদার্ণ মারহাট্টা	৯.৮২	৪.৩৬
৫। ইণ্ডিয়ান মিডল্যাণ্ড	১০.১১	২.৮৬
৬। বেঙ্গল নাগপুর	১৭.৪১	২.০০

দেখা যাইতেছে যে, একমাত্র নর্থওয়েষ্টারণ রেলপথে ৫৭.৭০ কোটি মূলধনে ২৫.৩৩ কোটি টাকা ক্ষতি হইয়াছে। যুদ্ধ বিগ্রহের জন্য ঐ রেলপথের নির্ম্মাণ, কিন্তু তাহার ক্ষতি কর স্বরূপ দরিদ্র প্রজাকে বহন করিতে হইতেছে। মাল বহনের জন্য পূর্ব্বে লক্ষ লক্ষ গো-গাড়ী-চালক ও নৌকার মাঝী প্রতিপালিত হইত, তাহাদের ব্যবসা গিয়াছে। লভ্যাংশ ইংলণ্ডের অংশিদারগণের আয় বৃদ্ধি করিতেছে। রেলের সাহায্যে খাদ্য দ্রব্যের রপ্তানি সুলভ ও দ্রুত হইয়াছে, ভারতের নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে বিলাতি পণ্যজাত পৌছিতেছে,তদ্বারা জাতীয় শিল্পাদির অবনতির পথ খুবই প্রশস্ত হইতেছে।

শিল্প বাণিজ্যের অবনতি হওয়ায় এদেশের লোক ক্রমে ক্রমে কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছে। কৃষিই এক্ষণে আমাদের প্রধান অবলম্বন। যতদিন উন্নত কৃষি কার্য্যের উৎকর্ষ সাধন না হয়, ততদিন গোজাতি কৃষি কার্য্যের প্রধান উপায়। দরিদ্র ভারতে এক্ষণে বিজ্ঞানানুমোদিত কৃষি যন্ত্রের বহুল প্রচার আকাশ-কুসুম তুল্য। য়ুরোপে একটা হৃষ্ট পুষ্ট বলীবর্দ্দের দ্বারা কেবল মাত্র ৬ একর ভূমি কর্ষিত হয়। কিন্তু ভারতের কৃশ বলদের দ্বারা ১৫ একর জমি কর্ষিত হইয়া থাকে, অথচ গোজাতি পরিপোষণের নিমিত্ত এখানে কোন গোচর-ভূমি নির্দ্দিষ্ট নাই। ভারতে ৭৮ হাজার গোরা সৈন্যের জন্য বার্ষিক ৩৫ লক্ষ গোহত্যা করা হয়। ভারতে গোজাতির সংখ্যা, সর্ব্বশুদ্ধ ৪ কোটি ৯০ লক্ষ, তন্মধ্যে পুরুষ জাতির সংখ্যা ২০ কোটি ৪০ লক্ষ। তাহার মধ্য হইতে বৎস, বৃদ্ধ ও দুর্ব্বলের সংখ্যা বাদ দিলে অবশিষ্ট মোটামুটি ৮৫ লক্ষ বলদের সংখ্যা দাঁড়ায়। উহাদের দ্বারা ১২ কোটি ১০ লক্ষ একর ভূমি কর্ষিত হইয়া থাকে। বম্বে প্রদেশে এক জোড়া বলদে ১০২ বিঘা, মান্দ্রাজে ৫৫ বিঘা এবং সমগ্র ভারতে গড়ে ৫২ বিঘা জমি কর্ষণ করে।

কৃষিকার্য্যের উন্নতি কল্পে গোধন রক্ষা ও পালন সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। খাদ্য, উপযুক্ত চিকিৎসাভাব ও বিবিধ কারণে গোহত্যা ঘটায় প্রতি বৎসর যে পরিমাণ গোধ্বংস হইতেছে, তাহা বিদেশে চামড়া রপ্তানির মূল্য তালিকার প্রতি দৃষ্টি করিলেই প্রতীতি হইবে।

	কোটি টাকা
১৮৯৮-৯৯	৭.৪৩
১৮৯৯-১৯০০	১০.৪৬
১৯০০-১	১১.৪৬

এই প্রকারে গো বংশের হানি হইলে কৃষি কার্য্যের যে বিশেষ অন্তরায় ঘটিবে, তাহার সন্দেহ নাই। গোধন রক্ষার জন্য গোচর ভূমি নির্দ্দেশ, নানাস্থানে পশু চিকিৎসালয় স্থাপন, গো রক্ষা বিধান অবশ্য কর্ত্তব্য। বঙ্গের গভর্ণর লর্ড নর্থকোট গোরক্ষার যে সাধু সংকল্পের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যেক সহৃদয় ব্যক্তির চিন্তার বিষয়।

যে দেশের শস্য আকাশের বৃষ্টির উপর

নির্ভর করে, সেস্থানে নিত্য দুর্ভিক্ষ অসম্ভব নহে। কৃত্রিম উপায়ে জল সেচনের ব্যবস্থা করিলে প্রতি বৎসর শস্যহানি নিবারিত হয়, এবং আশানুযায়ী শস্য জন্মিলে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কাও থাকে না। কৃত্রিম পয়ঃপ্রণালী দ্বারা দুইটী উদ্দেশ্য সাধিত হয়, ১ম। ক্ষেত্রে জল সেচন। ২। পানীয় জলের সরবরাহ। কিন্তু খাল কাটা সম্বন্ধে দুইটী বিষয় বিশেষ বিবেচনা করা আবশ্যক। (ক) যে নদ বা নদী হইতে খাল কাটা হয়, তাহার ক্ষতি সম্ভব কিনা এবং (খ) ঐ খালের দ্বারা কৃষি কার্য্যের আশানুযায়ী ও স্থায়ী ফল হইতে পারে কিনা। বহু ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বলেন যে, নদী হইতে খাল কাটিলে নদীর জলের বেগ ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া তাহার গভীরতা কমিয়া যায় এবং নদীবক্ষ প্রায়শঃ পূর্ণ হইয়া উঠে। সে কারণে কৃষি বাণিজ্যের ক্ষতি অসম্ভব নহে। পয়ঃপ্রণালী দ্বারা বিশাল মরুময় উত্তর আফ্রিকায় প্রভূত উপকার সাধিত হইয়াছে। দক্ষিণ ভারতেও খালের দ্বারা বিশেষ উপকার হইয়াছে, কিন্তু অনেক স্থলে খাল খনন করা হইয়াছে যেখানে উহা অনাবশ্যক, কিন্তু ঐ খাল খনন করিতে যে বিপুল অর্থ ব্যয় হইয়াছে, তাহার সুদ বার্ষিক কর স্বরূপ দরিদ্র প্রজাকে বহন করিতে হইতেছে। বেহারের দক্ষিণাংশ ছাড়া বাঙ্গালা দেশে খালের কোনই উপকারিতা নাই। পার্ব্বত্য প্রদেশে বা উচ্চ ভূখণ্ডে কূপাদি খনন কর্ত্তব্য। আইন-আকবরীতে উল্লেখ আছে, আকবরের রাজত্বকালে জমিতে এক ক্রোশ অন্তর একটী ইঁদারা ও ১০০ বিঘা জমিতে একটী বড় দীর্ঘিকা খনন করা হইত, ইহা দ্বারা অল্প ব্যয়ে পানীয় জল সরবরাহ ও কৃষি কার্য্যের সুবিধা হইত, সন্দেহ নাই।

আজ কাল ভারতবর্ষে প্রায় ৪ হাজার মাইল খাল কাটা হইয়াছে, তাহাতে ব্যয় হইয়াছে ৩৬ কোটি টাকা। খালের দ্বারা উপকার হউক বা না হউক, তাহার কর ভার দরিদ্র প্রজা বহন করিতে বাধ্য। মান্দ্রাজে নিয়ম হইয়াছে, যাহার জমির নিকট দিয়া জলপ্রণালী গিয়াছে, তাহাকে কর দিতে হইবে। পূর্ব্বে এ নিয়ম ছিল না, জল লওয়া বা না লওয়া প্রজার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত। যাহার জমির নিকট দিয়া জল যাইবে, সে স্বেচ্ছাক্রমে জল লইবে ও খাজনা দিবে। খননাদিতে যে টাকা ব্যয় হইয়াছিল, শতকরা ৬।৴০ হিসাবে তাহার সুদ পোষাইয়াছে। ১৮৬৯ খ্রীঃ ভারত গবর্ণমেণ্ট সমস্ত ভারতবর্ষের জন্য ঐ প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু ষ্টেটসেক্রেটারি ডিউক অব আরগাইল তাহা মঞ্জুর করেন নাই। বম্বে গবর্ণমেণ্টেরও ঐরূপ প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই।

পয়ঃপ্রণালী দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে যেরূপ অর্থাগম হয়, রেলের দ্বারা সেরূপ হয় না। রেলের লাভ অপরোক্ষ ও সময় সাপেক্ষ। ভারতবর্ষের ন্যায় নিত্য দুর্ভিক্ষ-পীড়িত দেশে রেল বিস্তার অপেক্ষা বিবেচনা পূর্ব্বক পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মাণই অধিক সঙ্গত। কার্য্যক্ষেত্রে কিন্তু সেরূপ দেখা যায় না। রেলপথ নির্ম্মাণে বিলাতি মহাজনদিগের লাভ, পয়ঃপ্রণালীতে ভারতীয় প্রজার সুবিধা। এযাবৎ গবর্ণমেণ্ট রেলপথে ২৪৭ কোটি ও পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মাণে ৩৬ কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছেন। কিন্তু দুর্ভিক্ষ কমিশন স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন—

দুর্ভিক্ষ নিবারণ-কল্পে যে পরিমাণ রেল বিস্তারের আবশ্যক,* তাহা হইয়াছে, পয়ঃ-প্রণালী দ্বারাই এক্ষণে অধিক উপকার সাধন হইবে।

*It appears to us that most of the necessary protective railways have now been constructed on their merits as productive works or as feeders to the trunk lines of Railways without assistance from the famine grant and that under existing circumstances, greater protection will be afforded by the extension of irrigation works."

Report of the Famine Commission of 1898, p 230.

১৮৬৯ খ্রীঃ দুর্ভিক্ষ-কমিশনও বিশদ-রূপে বলিয়াছিলেন, 'অনাবৃষ্টি বশতঃ যে দুর্ভিক্ষ হইয়া থাকে, তাহা নিবারণ করিবার প্রধান উপায় পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মাণ।

শ্রীকুলদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

উপনিষদ গ্রন্থাবলী।

[ক্রমে প্রধান প্রধান উপনিষৎ সকল পয়ারাদি চির-প্রচলিত ছন্দে সহজ ভাষায় অনুবাদিত হইলে বঙ্গবাসীর প্রভূত উপকার সাধিত হয়, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া উপনিষৎ গ্রন্থাবলী নাম দিয়া তৈত্তিরীয় উপনিষদের মর্ম্মানুবাদ প্রকাশ করিলাম। অন্যান্য উপনিষৎ যথাকালে প্রকাশিত হইবে]

তৈত্তিরীয়।

প্রথম বল্লী।

মিত্র, বরুণ নিত্য করুন
মঙ্গল বরদান ;
ইন্দ্র তপন, বিষ্ণু করুন
মঙ্গল সু-বিধান।
ব্রহ্ম চরণে ভক্ত-ভবনে
লগ্ন হউক মতি,
বায়ু, তব পদে মূর্দ্ধা নমিছি,
তুমি হে জগৎপতি।
প্রত্যক্ষ দেবতা, বায়ু, তব কথা
কহিব গাইব আজি,
কহিব তথ্য, গাইব সত্য
শুনিবে ভুবন রাজি।
রক্ষ আমারে আচার্য্য সহিত,
রক্ষ বায়ু আশুগামী,
ত্রিতাপে দুর্জ্জনে শঙ্কট দিনে
রক্ষ জগৎ-স্বামী।

ইতি প্রথম অনুবাক্।

শুনাব শিক্ষা করিব ব্যাখ্যা,
শিখাব বর্ণমালা,
অকারাদি বর্ণ ত্রিবিধ (১) সুস্বরে
শিখাব কণ্ঠ-কলা।
হ্রস্বদীর্ঘ প্লুত মাত্রা-সংযুত
শিখাব কণ্ঠস্বর,
মধ্যম সুরে সংযোগ ক'রে
অকারাদি সর্ব্বস্বর।
এই ত শিখানু, এই ত কহিনু
শিক্ষার সু-কৌশল,
মাত্রা ক্রমে ক্রমে, সাধি তিন গ্রামে
লভ শিক্ষা বিনির্ম্মল।
স্বর ব্রহ্ম, স্বর ব্রহ্ম,
স্বর ব্রহ্ম, অচঞ্চল॥

ইতি দ্বিতীয় অনুবাক্।

আমাদের (২) ব্রহ্মতেজ, আর হ'ক যশঃ,
উপনিষদের কথা কহিব সু-রস।
লোক, জ্যোতি, বিদ্যা, প্রজা, আত্মা, পঞ্চবিধ
মহা সংহিতার কথা শুন শুদ্ধ চিত।
প্রথমে পৃথিবী আর দ্যুলোক তৎপর,
আকাশ সন্ধিরূপেতে (৩) ব্যাপ্ত চরাচর।

(১) উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিৎ।
(২) আমার এবং গুরুর।
(৩) সংযোগ স্থান।

বায়ু ইহাদের মাঝে করেন সংযোগ ;
লৌকিক দর্শন এই নাম অধিলোক।
জ্যোতিষ দর্শন কহি করহ বিচার,
প্রথমত অগ্নি আর আদিত্য তৎপর।
সন্ধিরূপে জল আর বিদ্যুৎ সন্ধান (৪)
অধি জ্যোতিষ দর্শন নামে এই জ্ঞান।
অধি বিদ্য দর্শনের আচার্য্য প্রথম,
পরে শিষ্য ; সন্ধি বিদ্যা, বেদ অধ্যয়ন
ইহাদের মাঝে করে সংযোগ সাধন।
সন্তান দর্শন এবে করহ শ্রবণ।
প্রথম জননী আর জনক তৎপর,
পুত্র সন্ধি, প্রজনন কারণ তাহার।
নিম্ন হনু (৫) পূর্ব্বরূপ (৬) অধ্যাত্ম দর্শনে
তৎপর উর্দ্ধ-হনু বুঝি লও মনে।
দুই হনু মাঝে বাক্য সন্ধিরূপে হয়,
জিহ্বা এ সংযোগ হেতু জানিবা নিশ্চয়।
এ পঞ্চ সংহিতা যিনি ধ্যান করে চিতে
সুখে থাকে অন্নপুত্র পশ্বাদি সহিতে,
ব্রহ্মতেজ লাভ করে ব্যতীত প্রয়াস,
অন্তিমে স্বর্গ লোকেতে সুখে করে বাস।

ইতি তৃতীয় অনুবাক্।

ছন্দের প্রধান যিনি, বিশ্বরূপ বিশ্বযোনি
স্বয়ং অমৃত যিনি, হেতু অমৃতের ;
ঐশ্বর্য্য মণ্ডিত যিনি, প্রজ্ঞার অনন্ত খনি
প্রজ্ঞাবলে বলীয়ান করুন মোদের।
হে দেব, ব্রহ্মের জ্ঞান লভিবারে ক্ষমবান
হই যেন কায়মন বাক্য ও বুদ্ধিতে ;
দেহে হোক স্বাস্থ্য যোগ, রসনা মধুর হোক
কর্ণ মোর যোগ্য হ'ক সে তত্ত্ব শুনিতে ;
সামান্য জ্ঞানেতে ব্রহ্ম অধিগম্য নহে,
শ্রবণে শুনি যে কথা, হৃদে যেন রহে।
আসুক চৌদিক হ'তে ব্রহ্মচারীগণ,
সকল ইন্দ্রিয়ে তাঁরা করুক দমন।
ব্রহ্মচারী স্থিরচিত্ত হউক অচল,
পাই যেন যশঃ নিত্য পবিত্র নির্ম্মল।
আমি যেন হই শ্রেষ্ঠ ধনবান হ'তে,
ধনরাশি তুচ্ছ অতি জ্ঞানের জগতে।
হে ঐশ্বর্য্য (১) হে বিভূতি, ব্রহ্মকোশ তুমি,
প্রবেশ আমাতে, তোমা প্রবেশিব আমি।
হে ঐশ্বর্য্য, বহুরূপ তুমি ইহলোকে,
পবিত্র হইব পশি তোমায় পুলকে।
জল যথা ধায় নিম্নে, যথা সম্বৎসর
অবিশ্রান্ত গতিশীল ধায় নিরন্তর,
সেইমত সর্ব্বদেশ হ'তে ব্রহ্মচারী
আসুন আমার পার্শ্বে অনুকম্পা করি।
জগন্নাথ, হৃদি মোর কর আলোকিত,
তব জ্ঞানে অধিকারী হয় যেন চিত।

চতুর্থ অনুবাক্।

ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এ তিন ব্যাহৃতি (২)
চতুর্থ ব্যাহৃতি মহঃ,
মহা চমস্যের তনয় ধীমান
শিখাইলা অহরহঃ।
ও তিনের মাঝে মহঃ ব্রহ্মসার,
তিনি আত্মা, তিনি আত্মা ;
অন্য দেবগণ তাঁহার শরীর,
তিনি আত্মা, তিনি আত্মা।
ভূঃ ইহলোক ভুব অন্তরীক্ষ
স্বব এই দ্যুলোক,
মহঃ সে আদিত্য, যা' হ'তে পালন
হইতেছে সর্ব্বলোক।

---

(৪) সংযোগ কর্ত্তা elec"trical theory of matter."

(৫) কপোলদ্বয়ের নিম্নস্থান, চোয়ালি।

(৬) প্রথম।

(১) ভগবানের বিভূতি।

(২) সংক্ষিপ্ত মন্ত্র।

ভূঃ, এই অগ্নি (৩) ভুবঃ এই বায়ু, (৪)
স্বুবঃ এই আদিত্য।
মহঃ সে চন্দ্রমা, যা হ'তে সকল
জ্যোতিষ্ক বর্দ্ধিত নিত্য।
ভূঃ ঋক্‌বেদ ভুবঃ সামবেদ
স্বুবঃ যজুর্ব্বেদ হয়,
মহঃ ব্রহ্মসার, যা' হ'তে বর্দ্ধিত
হয় বেদ সমুদায়।
ভূঃ, ইনি প্রাণ; ভুবঃ সে অপান;
স্বুবঃ, ইনি ব্যান হ'ন;
মহঃ সেই অন্ন, (৪) যা হ'তে বর্দ্ধিত
হয় সমুদায় প্রাণ।
এই চারি চারি ব্যাহৃতির মর্ম্ম
যে জন জানেন সার,
তিনি জানে সব তিনি জানে ব্রহ্ম
পরাৎপর সারাৎসার॥
ইতি পঞ্চম অনুবাক্।

হৃদয় আকাশে রহিয়াছে ব'সে
অমৃত পুরুষ দীপ্ত;
তালুদ্বয় মাঝে স্তনরূপে রাজে
ব্রহ্মপথ অতিগুপ্ত।
শীর্ষ কপালে, কেশ-ভাগ স্থলে,
মুর্দ্ধা-প্রদেশ হ'তে,
আত্মদর্শী জ্ঞানী ভূঃ রূপেতে তিনি
বাহিরান সূক্ষ্ম পথে।
বাহির হইয়া অগ্নিতে পশিয়া
বিরাজেন জ্যোতির্ম্ময়;
ভুবঃ রূপে তিনি, বাহিরি অমনি
বায়ু মাঝে প্রবেশয়।
স্বুবঃ রূপে তিনি, সেই আত্ম যোনি,
বাহিরি আদিত্য মাঝে
করেন প্রবেশ, মহঃ রূপে শেষ
প্রবেশি ব্রহ্মে বিরাজে।
পশিয়ে ব্রহ্মে, মিশিয়া ব্রহ্মে
স্বরাজ্য লভেন তিনি,
মনস্পতিরে, পূর্ণ গতিরে
আপনা লভে আপনি।
তিনি বাক্‌পতি, তিনি চক্ষুপতি
শ্রোত্রপতি, জ্ঞানপতি;
অথবা তা'হতে, তা'হ'তে, তা'হতে,
অধিক অধিক অতি।
তিনিই আকাশ, সূক্ষ্ম প্রকাশ
সত্য স্বরূপ তিনি;
প্রাণের আনন্দ, মনের আনন্দ,
শান্তি-পূর্ণ ব্রহ্ম তিনি।
পূর্ব্ব চারিরূপে * বাহিরি স্বরূপে
মূর্দ্ধা বিদীর্ণ করি,
আপনা লভিয়া তৃপ্ত হইয়া
বিরাজেন আত্মোপরি।
তিনি মৃত্যুহীন, তিনিই প্রাচীন,
ভজ তাঁরে অবিরাম;
আপনা ভুলিয়া তন্ময় হইয়া
লও হৃদে তাঁর নাম॥
ইতি ষষ্ঠ অনুবাক।

পৃথ্বী অন্তরীক্ষ স্বর্গ দিক আর কোণ,
লোক-পঞ্চ নামে পঞ্চ অভিহিত হন।
অগ্নি বায়ু চন্দ্রমা নক্ষত্র তপন,
দেব-পঞ্চ নামে পঞ্চ অভিহিত হন।
জল বনস্পতি আত্মা ওষধি গগন,
ভূত-পঞ্চ নামে পঞ্চ অভিহিত হন।
প্রাণ ও অপান ব্যান উদান সমান,
বায়ু-পঞ্চ নামে পঞ্চ অভিহিত হন।
নয়ন শ্রবণ আর বাক্ ত্বক মন,

(৩) তেজ।
(৪) উপাদান।

* ভূঃ ভুবঃ স্বুবঃ মহঃ।

ইন্দ্র (১) পঞ্চ নামে পঞ্চ অভিহিত হন।
চর্ম্ম মাংস স্নায়ু অস্থি মজ্জা পঞ্চধন,
ধাতু-পঞ্চ নামে তারা অভিহিত হন।
এই হেতু কহিলেন ঋষি পুরাকালে,
সর্ব্ব পঞ্চ পঞ্চভাগ এই ভূমণ্ডলে।
বাহ্য-পঞ্চে পুরাইবা পঞ্চ আন্তরিক,
পঞ্চ এক; আর সব প্রপঞ্চ অলীক॥

ইতি সপ্তম অনুবাক।

ওম্ ব্রহ্ম, ওম্ সর্ব্ব, ওম্ অনুকৃতি,
ওম্ কহি সামবেদী গায় সামগীতি।
ওঁ শোং বলি শস্ত্র (২) হয় উচ্চারিত,
ওঁ শব্দে যজুর্ব্বেদ হইছে ধ্বনিত।
ওঁ শব্দে ব্রহ্মা (৩) আজ্ঞা করেন প্রচার,
যজমান অগ্নিহোত্র আদি যজ্ঞ আর।
ওঁ শব্দে ব্রাহ্মণ করেন প্রার্থনা,
"পাই যেন পরমাত্মা, এ মোর সাধনা।"
সংযত একাগ্র চিত্তে চাহে ব্রহ্মে যদি,
পায় ব্রহ্ম, হয় ব্রহ্ম-লাভ নিরবধি॥

ইতি অষ্টম অনুবাক।

অধ্যয়ন অধ্যাপন জ্ঞানের ভাণ্ডার,
জীবনের সহচর হউক তোমার।
ন্যায় পথে হ'ক গতি,সত্য বাক্যে সদা মতি
একাগ্র সাধনা তাপ, যেন তব হয়;
ইন্দ্রির দমন কর, প্রশান্ত হ'ক অন্তর,
পঞ্চাগ্নি সেবায় কর পবিত্র হৃদয়।
অতিথিরে কর সেবা, লোক ব্যবহার সেবা
সদাচার অনুষ্ঠান কর অনুক্ষণ;
হও পুত্র-পৌত্রবান; কিন্তু হও জ্ঞানবান
জ্ঞানের লাগিয়া সদা কর অধ্যয়ন।
ন্যায়, সত্য, একাগ্রতা, শান্তি,ভক্তি,সরলতা
ইন্দ্রিয় দমন, ধীর পুত্র প্রজনন;

(১) ইন্দ্রিয়।
(২) গীতশূন্য ঋকমন্ত্র।
(৩) ঋত্বিক।

আতিথ্য,লৌকিক বৃত্তি,সামাজিক-প্রীতি,স্থিতি,
হ'ক তব কায়-মন-বাক্যের সাধন।
কিন্তু সাধু অধ্যয়ন, অধ্যয়ন অধ্যাপন
যেন তব জীবনের হয় মহাব্রত;
তাহা হ'তে চিত্তশুদ্ধি,হইলে মার্জ্জিত বুদ্ধি,
তত্ত্ব জ্ঞানে তাহা হতে হইবে উন্নত।
সত্যবচা রাথীতর কহেন, "নিয়ত
সত্যেরে আশ্রয় কর হইবে উন্নত।"
তপোনিত্য পৌরুশিষ্টি কহেন, "তপেরে:
আশ্রয় করিলে সিদ্ধি লভিবে অন্তরে।"
নাক মৌদ্গল্যের মতে পাঠও পঠন
হইতেই সর্ব্বসিদ্ধ হয় এ জীবন।
অধ্যয়ন অধ্যাপন সেই মহা তপঃ,
সেই সিদ্ধি মহাসিদ্ধি, সেই তপ'ই তপঃ।

ইতি নবম অনুবাক্।

কহিলা ত্রিশঙ্কু ঋষি এ সার বচন;
শুন, বুঝ, কর তার সারত্ব গ্রহণ।
আমিই রোপণ করি সংসার বৃক্ষেরে,
আত্ম-অনুভূতি ব্যক্ত হয় এ সংসারে। ১
মম কীর্ত্তি গিরি পৃষ্ঠ-সম প্রকাশিত,
মম অনুভূতি বাহে বিশ্বরূপে স্থিত।
ঊর্দ্ধ-পবিত্র আমি মহাতেজোময়,
নিত্য জ্ঞাতা, নিত্য জ্ঞেয়, অমৃত অব্যয়।
আমি মেধা, আমি দীপ্তি, আমি মহাধন,
আমার দর্শনে হয় সকলি দর্শন।
আমি জানি মোরে মাত্র, প্রত্যক্ষ জ্ঞানেতে,
আমা ছাড়া অন্য জ্ঞান, হয় আমা হ'তে।
বাহ্য জগতের জ্ঞান, অস্তিত্ব বিশ্বের,
বাহ্যিক প্রসার মাত্র আত্ম প্রত্যয়ের।
মম কীর্ত্তি, মম জ্ঞান, মম অনুভূতি,
ব্রহ্মাণ্ড তাহারই নাম, তাহারই বিস্তৃতি।
অহ! অহ! আমি ব্রহ্ম; অহ! অহ!
আমিই নিয়তি॥

ইতি দশম অনুবাক্।

১ সংসার রূপেতে

শিষ্যে শিখাইয়া বেদ, আচার্য্য কহিলা ভেদ
সত্য ভিন্ন মিথ্যা নাহি কহ কদাচন;
আচরণ কর ধর্ম্ম বেদের প্রকৃত মর্ম্ম
বুঝিবারে নিত্য কর বেদ অধ্যয়ন।
আচার্য্যে দক্ষিণা দিয়া ব্রহ্মচর্য্য সমাপিয়া
পুত্র লভিবারে গ্রহ গৃহস্থ আশ্রম;
প্রবেশি গার্হস্থ্য ধর্ম্মে সংসারের নানা কর্ম্মে
সত্য কভু নাহি তুমি হবে বিস্মরণ।
ধর্ম্মে হও দৃঢ়মতি যাহে সুমঙ্গল অতি,
তোমা হ'তে পর-পীড়া যেন নাহি হয়।
প্রত্যক্ষ দেবতা মাতা, প্রত্যক্ষ দেবতা পিতা,
পুজ পদ-যুগ তাঁর ঢালিয়া হৃদয়।
আচার্য্যে দেবতা সম, অতিথিরে দেবোপম
ভাবি সেবা কর, হবে চিত্ত বিনির্ম্মল।
অনিন্দ্য সু-কর্ম্ম কর, অন্য কর্ম্ম নাহি স্মর,
সুচরিত্র হও বৎস শান্ত অচঞ্চল।
শ্রেয়ঃ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণে যোগ্য সু-আসন দানে
শ্রান্তি দূর কর যত্ন করি সমাদরে;
শ্রদ্ধায় করিবে দান, তুচ্ছ দান অপমান,
বুদ্ধিযোগে কর দান প্রসন্ন অন্তরে।
কোন কর্ম্ম কি আচারে সংশয় হ'লে অন্তরে
ধর্ম্মপ্রাণ সহৃদয় ধীর বিচক্ষণ
ব্রাহ্মণ করেন যথা, তুমিও করিবে তথা,
তাঁহাদের আচরণ করিবে পালন।
এ আদেশ উপদেশ, বেদের শাসন
পালন করিয়া লভ অনন্ত জীবন।
লভ অনন্ত জীবন॥
ইতি একাদশ অনুবাক্।

মিত্র ও বরুণ, ভাস্কর অরুণ
মঙ্গল করুন উভে; ১
ইন্দ্র বৃহস্পতি বিষ্ণু বিশ্বপতি
মঙ্গল করুন সবে।

১ আমাকে ও আচার্য্যকে।

নমো নমো, বায়ু, নমো নমো বায়ু
প্রত্যক্ষ দেবতা তুমি;
তোমারে বলেছি সত্যই বলেছি
ব্রহ্ম জগৎ-স্বামী।
রক্ষিয়া মোরে আচার্য্য সহিত
পালিয়াছ এত দিন,
রক্ষিয়াছ তুমি, হে ত্বরিৎ-গামী,
রক্ষ যেন চিরদিন
রক্ষ উভে চিরদিন॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তি॥
ইতি দ্বাদশ অনুবাক্।
ইতি শিক্ষ্যাধ্যায় নাম প্রথমবল্লী।

দ্বিতীয় বল্লী।

ব্রহ্মা মোদের ১ করুন রক্ষা,
সম্ভোগ করুন দোঁহে;
বাড়ুক বীর্য্য স্বাস্থ্য শৌর্য্য,
দীপ্তি জ্বলুক দেহে।
জ্ঞান বৃত্তি হউক বৃদ্ধি
ব্যাপিয়া সর্ব্ব-লোক;
শুদ্ধ চিত্তে দ্বেষ কলহ
সুচির লুপ্ত হো'ক।
মোরা যেন হই
মোরা যেন হই
নিত্য—বীত—শোক।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥
ব্রহ্মজ্ঞ যে, তিনি লভেন ব্রহ্ম;
ঋক্ মন্ত্রে আছে এ সংসার মর্ম্ম:—
যিনি সত্য-রূপ, জ্ঞান-রূপ যিনি,
অনন্ত-স্বরূপ পরব্রহ্ম তিনি;
হৃদয় আকাশে আবাস তাঁহার,
বুদ্ধি গুহায় আলয় তাঁহার,
সে সর্ব্বজ্ঞে হৃদয়ে হেরিবে যে,
সে জ্ঞানময়ে জ্ঞানে জানিবে যে,

১ আমি ও আমার আচার্য্য।

কৃতার্থ সে, সফল জনম তার,—
ঘুচে যায় গতায়াত বারম্বার।
সে আত্মা হইতে আকাশ জাত,
আকাশ হইতে বায়ু উদ্ভূত,
বায়ু হ'তে অগ্নি, অগ্নি হ'তে জল,
জল হ'তে পৃথ্বী, নর-লীলা-স্থল;
পৃথিবী হইতে ওষধি সঞ্জাত,
ওষধি হইতে অন্ন, অন্ন হ'তে রেতঃ,
রেতঃ হ'তে হয় পুরুষ উদ্ভব,
অন্ন-রসময় এ হেতু মানব।
এই তার শির, দক্ষিণ বাহু,
এই মধ্য ভাগ, এই বাম বাহু,
এই পুচ্ছ ভাগ ১, জীব স্থিতি যাহে,
এই তার মর্ম্ম, এই মন্ত্রে কহে॥

ইতি প্রথম অনুবাক্।

অন্নময় কোশ।

স্থূল অন্নময়-কোশ দেহীর
গাইব আহার যশঃ গভীর।
যত সব প্রাণী পৃথিবী'পরে,
অন্ন হ'তে সবে জীবন ধরে।
অন্নেই জনম, অন্নে পালন,
অন্নে পরিণতি অন্ত যখন।
অন্ন সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, অন্ন প্রথম,
অন্ন দেহে সর্ব্ব—ওষধি সম।
অন্নে ব্রহ্ম বলি যে জন জানে,
সে জন সে অন্ন পায় জীবনে।
অন্ন হ'তে জাত ভূত সমস্ত,
অন্নেই উদয় অন্নেই অস্ত।
অন্ন খায় জীব; জীবেরে অন্ন
করিছে ভক্ষণ; নাহিক অন্য।
এ হেতু তাহার অন্নই নাম,
অন্নেই মৃত্যু, অন্ন পরিণাম।

১ নাভির অধোদেশ।

প্রাণময় কোশ।

অন্নময় কোশ হ'তে স্বতন্ত্র
আছে প্রাণময় কোশযন্ত্র।
প্রাণময় কোশে সে কোশ পূর্ণ
প্রাণ কোশ-বলে বলিষ্ঠ অন্ন। ১
অন্ন-রস-ময় কোশ যেরূপ
শিরঃ বাহু-পুচ্ছ-যুক্ত স্বরূপ, ২
প্রাণময় কোশে আছে তেমতি
শির বাহু পুচ্ছ, গূঢ় শকতি।
পুরুষ-আকার সে অন্ন কোশ,
তেমতি আকার প্রাণময় কোশ।
প্রাণ তা'র শিরঃ, উত্তম অঙ্গ,
সূক্ষ্ম দেহের সূক্ষ্ম-সঙ্গ।
ব্যান দক্ষিণ, অপান বাম,
ব্যান অপান দুই বাহু-নাম; ৩
আকাশ আত্মা, পৃথিবী পুচ্ছ,
অতীব সূক্ষ্ম, অতীব স্বচ্ছ।
এই তার শ্রুতি এ তা'র মর্ম্ম,
বুঝিলে জীবের নাহিক জন্ম॥

ইতি দ্বিতীয় অনুবাক॥

দেব কি মানব পশু নিচয়
প্রাণ-বলে সবে বাঁচিয়া রয় *।
সর্ব্ব জীবের আয়ুই প্রাণ,
তা' হ'তে সর্ব্বায়ু প্রাণের নাম।
প্রাণে যে বা করে ব্রহ্ম-জ্ঞান,
পূর্ণায়ু লভে সে ভাগ্যবান।
অন্নময় কোশে আত্মা যিনি
প্রাণময় কোশে আত্মা তিনি।

মনোময় কোশ।

প্রাণময় কোশ হ'তে স্বতন্ত্র
আছে মনোময় কোশ যন্ত্র।

১ অন্নময় কোশ।
২ প্রথম অনুবাক্ শেষাংশ।
৩ ব্যান বায়ু দক্ষিণ বাহু; অপান বায়ু বাম বাহু।
* রহে।

মনোময় কোশে সে প্রাণময় (১)
রহিয়াছে পূর্ণ, বুঝ নিশ্চয়।
প্রাণময় কোশ-রূপ যেমন,
মনোময় কোশ-রূপ তেমন।
পুরুষ আকার প্রাণময় কোশ,
তেমতি আকার মনোময় কোশ।
ঋক্‌বেদ তাঁর দক্ষিণ হস্ত,
সামবেদ তাঁর বাম হস্ত,
যজু তাঁর শিরঃ উত্তম অঙ্গ;
সূক্ষ্ম দেহের সূক্ষ্মসঙ্গ।
ব্রাহ্মণ অংশই আত্মা তাহার
অথর্ব্ব মন্ত্র পুচ্ছ তাঁহার,
বুঝিলে নাহিক জনম আর॥
ইতি তৃতীয় অনুবাক্

মন সহ বাক্ যাঁহার সন্ধান
না পাই, নিবৃত্ত হয়;
সেই ব্রহ্মানন্দ জানিয়া বিদ্বান
অতিক্রমে সর্ব্ব ভয়।
প্রাণময় কোশে আত্মা যিনি
মনোময় কোশে আত্মা তিনি।

বিজ্ঞানময় কোশ।

মনোময় কোশ হ'তে স্বতন্ত্র
আছে বিজ্ঞানময় কোশ যন্ত্র।
বিজ্ঞানময় কোশে সে মনোময়
রহিয়াছে পূর্ণ বুঝ নিশ্চয়।
মনোময় কোশ-রূপ যেমন
জ্ঞান-ময় (২) কোশ-রূপ তেমন।
পুরুষ আকার মনোময় কোশ;
তেমতি আকার জ্ঞান-ময় কোখ।
শ্রদ্ধা তা'র শির উত্তম অঙ্গ,
সূক্ষ্ম দেহের সূক্ষ্ম-সঙ্গ।
ঋতই তাঁহার দক্ষিণ হস্ত,
সত্যই তাঁহার বাম হস্ত;
এক-নিষ্ঠ যোগ আত্মা তাহার,
বুদ্ধিরূপ মহঃ পুচ্ছ তাঁহার।
এই তা'র শ্রুতি, এ তা'র মর্ম্ম
বুঝিলে জীবের নাহিক জন্ম।
ইতি চতুর্থ অনুবাক।

বিজ্ঞান করেন বিরাট যজ্ঞ,
তিনিই করেন কর্ম্ম;
সর্ব্ব দেবতা ব্রহ্মরূপে তাঁরে—
সর্ব্ব দেবতা জ্যেষ্ঠরূপে তাঁরে
পূজেন বুঝিয়া মর্ম্ম।
বিজ্ঞানে যিনি করে ব্রহ্মজ্ঞান,
না ছাড়ে কখনো সে আশ্রয় স্থান;—
শরীরের পাপ শরীরে ত্যজি
পূর্ণ হয় তাঁর কামনা রাজি।
কৃতার্থ সে, সফল জনম তার;
ঘুচে যায় গতায়াত বারম্বার।
মনোময় কোশে আত্মা যিনি,
জ্ঞানময় কোশে আত্মা তিনি।

আনন্দময় কোশ।

জ্ঞানময় কোশ হ'তে স্বতন্ত্র
আছে আনন্দময় কোশ যন্ত্র।
আনন্দময় কোশে সে জ্ঞানময়
রহিয়াছে পূর্ণ, বুঝ নিশ্চয়।
জ্ঞানময় কোশ-রূপ যেমন
আনন্দ-ময়েরও রূপ তেমন।
পুরুষ আকার জ্ঞানময় কোশ,
সেই মত সে আনন্দময় কোশ।
প্রীতি তা'র শির উত্তম অঙ্গ,
সূক্ষ্ম দেহের সূক্ষ্ম-সঙ্গ।
মোদ (১) হয় তার দক্ষিণ হস্ত,

(১) প্রাণময় কোশ।
(২) বিজ্ঞানময়।

(১) নিত্য সুখ।

প্রমোদ তাহার বাম হস্ত।
নিত্য আনন্দ আত্মা তাহার,
ব্রহ্ম বস্তু পুচ্ছ তাহার;
এই তার শ্রুতি, এ তা'র মর্ম্ম,
বুঝিলে জীবের নাহিক জন্ম।

ইতি পঞ্চম অনুবাক।

"ব্রহ্ম নাই" কহে যেই, সেই নাই হয়।
"আছে" যেই কহে, আছে সেই মহাশয়।

শিষ্য।—
বিদ্বান কি অবিদ্বান, জ্ঞানী কি অজ্ঞানী,
ইহলোক ত্যজি ঐ (১) লোকে, কহ শুনি,
যায় কি না যায় চলি? কহ দয়া করি।

গুরু।—
শুন ভক্তিভরে, বৎস, কহিব বিবরি।
ঐ লোক? তথা যায় ছাড়ি এই লোক?
কোথা, বৎস, অন্ধকার? কোথায় আলোক?
করিলা কামনা ব্রহ্ম, "হইব বহুধা";
"হব জাত"—এই ভাবে চিন্তিলা একদা।
সেই মহা তপঃ; তাহে বিশ্ব জনমিল।
এই ব্যক্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃজন হইল।
সৃজি (২) ব্রহ্মা প্রবেশিলা তাহার মাঝারে,
প্রবেশি বিভক্ত হৈলা এই চরাচরে।
মূর্ত্ত, অমূর্ত্ত কিম্বা উক্ত কি অনুক্ত,
আধার, আধেয়, জ্ঞান, অজ্ঞানে বিভক্ত
হইলা তখন ব্রহ্ম ব্যতীত প্রয়াস;
সত্য ও অসত্যরূপে সত্য পরকাশ।
অখণ্ড সে ব্রহ্মবস্তু বহু খণ্ড হয়,
তবুও অখণ্ড সত্য, জানিবা নিশ্চয়।
ইহলোকে ঐ লোকে সর্ব্বত্র তিনিই।
এই তার শ্লোক; বুঝি হও ব্রহ্ম-জ্ঞানী।

(১) অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করতঃ ব্যক্ত হইয়া।
(৪) সৃজি; অর্থাৎ এক আদি বস্তুরূপে ব্যক্ত হইয়া।

অব্যক্ত হইল ব্যক্ত গূঢ় শক্তি বশে,
অগ্রেতে অসৎ (১) কিন্তু সৎ (২) হইল শেষে।

শিষ্য।—অসৎ কভু কি সৎ হয় দয়াময়?

গুরু।—প্রকৃত অসৎ নহে, জানিও নিশ্চয়।
নাম-রূপ-ভেদ নাহি হয় যতক্ষণ,
গূঢ়রূপে আত্মলীন; অসৎ তখন।
সেই গূঢ়-সৎ হ'তে হয় ব্যক্ত-সৎ,
আপনারে সৃজি তিনি হইলা জগৎ।
সেই হ'তে তাঁর নাম হইল সুকৃত,
যিনি-ই সুকৃত তিনি রস নামে খ্যাত।
সেই রস পানে জীব হয় আনন্দিত;
আনন্দ জীবের জীব, জানিবা নিশ্চিত।
না রহিলে সে আনন্দ হৃদয় আকাশে
কে করে আপন-কার্য্য, প্রাণ কার্য্য কিসে?
না বহিত নিশ্বাস প্রশ্বাস কখন;
না রহে আনন্দ বিনা জীবের জীবন।
সকলি আনন্দময়, এই বিশ্ব মাঝে
তিনিই আনন্দ দান করেন সহজে।
অদৃশ্য, অ-দেহ, এই অভিন্ন পুরুষে,—
এই অনাধার ব্রহ্মে,—ব্রহ্মকৃপা বশে,
যখন সাধক হয় অতি প্রতিষ্ঠিত
তখন সকল ভয় হয় বিদূরিত।
তিল মাত্র এ ভাবের প্রভেদ হইলে,
জন্ম-মৃত্যু-ভয় জীবে পীড়ে সেই কালে।
ব্রহ্মের সহিত আত্মা অভেদ না জানি
ঐ ভয়ে ভীত হয় বিদ্যা-অভিমানী।
তত্ত্বজ্ঞানী জানে ব্রহ্মে আত্মাতে অভেদ,
ভয় শূন্য হয় তিনি বিনাশি প্রভেদ।

ইতি সপ্তম অনুবাক।

তাঁহার ভয়েতে বায়ু বহে সদা,
সূর্য্য উদিত হয়;

(১) যাহা নাই।
(২) যাহা আছে।

তাঁহার ভয়েতে অগ্নি, চন্দ্র আর
মৃত্যু সতত ধায়।*
অহো! তিনি ত আনন্দময়।
সেই আনন্দের আজি করিব বিচার।
বেদজ্ঞ যুবক এক সুকর্ম্ম তৎপর
বলিষ্ঠ সুদৃঢ় দেহ, সাধু সহৃদয়,
জ্ঞানে কর্ম্মে সমুন্নত, তিনি যদি হয়
বিত্ত-পূর্ণ সুবিশাল ধরার ঈশ্বর,
কি আনন্দ পূর্ণ হয় তাঁহার অন্তর!
মানবের আনন্দের পূর্ণ মাত্রা এই;
হেন শত মানবের যে আনন্দ, তাই
নর-গন্ধর্ব্বের পূর্ণ-আনন্দ সমান;
কাম-মুক্ত শ্রোত্রিয়েরও সেই পরিমাণ।
এর শতগুণ হয় দেব-গন্ধর্ব্বের,
সেই পরিমাণ কাম-মুক্ত শ্রোত্রিয়ের।
দেব-গন্ধর্ব্বের শতগুণ আনন্দের
মাত্রা চির পিতৃলোকবাসী পিতৃদের।
কাম-মুক্ত শ্রোত্রিয়েরও সেই পরিমাণ।
এ আনন্দ শতগুণ আনন্দ সমান
আনন্দ সে দেবলোক-জাত দেবতার;
কাম-মুক্ত শ্রোত্রিয়েরও তেমতি প্রকার।
ইহার শতেক গুণ, কর্ম্ম দেবতার,
শ্রৌত কর্ম্মগুণে বশ দেবতা যাঁহার।
কাম-মুক্ত শ্রোত্রিয়েরও সেই পরিমাণ।
শত কর্ম্ম দেবগণ আনন্দ সমান।
পূর্ণ মাত্রা আনন্দ এক দেবতার; (১)
কাম-মুক্ত শ্রোত্রিয়েরও তেমতি প্রকার।
দেবের যে পূর্ণানন্দ, তা'র শতগুণ
ইন্দ্রের আনন্দ; আর তা'র সমগুণ
কাম-মুক্ত শ্রোত্রিয়ের আনন্দ প্রমাণ;
এর শত গুণ বৃহস্পতির সমান।

* স্ব স্ব কার্য্য করে।

(১) দেবলোক জাত দেবতা, কর্ম্মদেবতা, এবং দেবতা; এই তিনের পৃথক পৃথক উল্লেখ লক্ষ্য করুন।

কামমুক্ত শ্রোত্রিয়েরও তেমতি প্রকার।
বৃহস্পতি শতগুণ সে প্রজাপতির;
আর কামনা বর্জ্জিত শ্রোত্রিয়ের, স্থির।
শতেক প্রজাপতির আনন্দ সমান
ব্রহ্মের আনন্দ; বৎস, কর অবধান।
কামমুক্ত শ্রোত্রিয়ের তেমতি প্রকার;
আনন্দ তাঁহার উর্দ্ধে কার'ও নাহি আর।
মানবে যে আত্মা, বৎস, আদিত্যে তাহাই,
বিন্দুমাত্র সন্দেহ কখনও নাই।
এই ভাবে এক আত্মা অদ্বিতীয় যিনি
জানিবেন বুঝিবেন, আত্মবান তিনি।
তিনি লভিবেন সেই আত্মা অন্নময়,
প্রাণময়, মনোময়, আর জ্ঞানময়;
আনন্দময় সে আত্মা লভিবেন তিনি;
তিনি মুক্ত, নির্ভীত, শান্ত, শুদ্ধ, জ্ঞানী॥
ইতি অষ্টম অনুবাক॥
বাক্যে নাহি মিলে যাঁরে, মন নাহি পায়,
সেই পূর্ণানন্দে জানি হওরে নির্ভয়।
তাঁরে যেই জন জানে, সেকি কভু ভাবে
"কেন করি নাই পুণ্য, কেন ডুবি পাপে?"
সাধু ও অসাধু কর্ম্ম, পাপ পুণ্য তার'
দুই-ই তুল্য আত্মীয়, দুই-ই আপনার।
আত্মভাবে দ্বন্দে সম হেরি সেই জন
আনন্দে মগন হ'য়ে পরিতৃপ্ত হন।
তিনি পরিতৃপ্ত হন॥
ইতি নবম অনুবাক।
ইতি ব্রহ্মানন্দ নাম দ্বিতীয় বল্লী॥

তৃতীয় বল্লী।

ব্রহ্ম মোদের করুন রক্ষা,
সম্ভোগ করুন দোঁহে;
বাড়ুক বীর্য্য স্বাস্থ্য শৌর্য্য
দীপ্তি জ্বলুক দেহে।
জ্ঞানবৃত্তি হউক বৃদ্ধি
ব্যাপিয়া সর্ব্বলোক;

শুদ্ধ চিত্তে দ্বেষ কলহ
সুচির লুপ্ত হো'ক।
মোরা যেন হই
মোরা যেন হই
নিত্য-বীত-শোক।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

বরুণ তনয় ভৃগু আসিয়া পিতার আশু
ভক্তি-ভাবে কহিলেন পিতার গোচরে;
"ভগবন্ আজি মোরে দেও শিক্ষা দয়া করে,
"ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করি বাসনা অন্তরে।"
পিতা কহিলেন, "পুত্র, অন্ন,প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র
আর মন, এই পঞ্চ ব্রহ্ম-জ্ঞান-পথ;
যা'হ'তে জীবের জন্ম, যা'হ'তে জীবন-কর্ম্ম,
প্রলয়-মরণ অন্তে যাহে জীব গত,
বিশেষ জানিতে তাঁরে যত্ন কর অন্তরে,
তা'হলে হইবে বৎস ব্রহ্ম তত্ত্ব লাভ।"
শুনিয়া পিতার বাণী ভৃগু অতি শুদ্ধজ্ঞানী,
আরম্ভিলা মহাতপঃ ত্যজি পরিতাপ।
ইতি প্রথম অনুবাক।

তপস্যা করিয়া তবে ভৃগু মনে মনে ভাবে,
"অন্নব্রহ্ম, অন্নব্রহ্ম, ব্রহ্ম সুনিশ্চিত;
অন্নেই জীবের জন্ম, অন্নেই জীবন-কর্ম্ম,
প্রলয় মরণে জীব অন্নে হয় স্থিত।"
এই হেতু পিতৃ বাক্য হৃদয়ে করিয়া ঐক্য,
অন্নে ব্রহ্ম ভাবি আইলা পিতৃ সন্নিধান।
আসিয়া পিতার আশু আনন্দে কহেন ভৃগু
"এখন করুন মোরে ব্রহ্ম বিদ্যা দান।"
পিতা কহিলেন তাঁরে "তপঃ কর ব্রহ্মতরে,
তপঃই ব্রহ্ম, তপে ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞান হয়।"
পিতার বচন শুনি ভৃগু পিতৃভক্ত জ্ঞানী
বিধিমত আরম্ভিলা তপঃ পুনরায়।
ইতি দ্বিতীয় অনুবাক।

তপস্যা করিয়া তবে ভৃগু মনে মনে ভাবে,
"প্রাণ ব্রহ্ম, প্রাণই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম সুনিশ্চিতঃ
প্রাণেই জীবের জন্ম প্রাণেই জীবন কর্ম্ম
প্রলয় মরণে জীব প্রাণে হয় স্থিত।"
এত ভাবি মতিমান্ আসি পিতৃ সন্নিধান
কহিলেন, "পিতঃ, দেন ব্রহ্মবিদ্যা মোরে।"
পিতা কহিলেন তাঁরে, "তপঃ কর ব্রহ্মতরে,
তপঃই ব্রহ্ম, তপে জ্ঞান উদিবে অন্তরে।"
ইতি তৃতীয় অনুবাক।

পিতার বচন শুনি ভৃগু পিতৃভক্ত জ্ঞানী
আরম্ভ করিলা মহাতপঃ পুনরায়;
তপঃ করি সুবিধানে, ভৃগু মনে মনে জানে
"মন ব্রহ্ম, মনই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম সুনিশ্চিতঃ
মনেই জীবের জন্ম, মনেই জীবন কর্ম্ম,
প্রলয় মরণে জীব মনে হয় স্থিত।"
এত ভাবি আয়ুষ্মান আসি পিতৃ সন্নিধান
কহিলেন, "পিতঃ, দেন ব্রহ্ম বিদ্যা মোরে।"
পিতা কহিলেন তায় "তপঃকর পুনরায়
তপঃই ব্রহ্ম, তপে তত্ত্ব উদিবে অন্তরে।
ইতি চতুর্থ অনুবাক।

তপঃ করি পুনর্ব্বার, ভৃগু জানিলেন সার,
"জ্ঞান ব্রহ্ম, জ্ঞানই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম সুনিশ্চিতঃ
জ্ঞানেই জীবের জন্ম জ্ঞানেই জীবন কর্ম্ম
প্রলয় মরণে জীব জ্ঞানে হয় স্থিত।"
এতেক ভাবিয়া ভৃগু আসিয়া পিতারআশু
কহিলেন, "পিতঃ, ব্রহ্মবিদ্যা কর দান।"
পিতা কহিলেন তাঁরে "তপঃ কর ভক্তি ভরে
তপঃই ব্রহ্ম, তপে তত্ত্ব পাইবে সন্ধান।"
এত শুনি তপে ভৃগু ডুবিলা আবার
দৃঢ়ব্রত ব্রহ্ম তত্ত্বজ্ঞান লভিবার ॥
ইতি পঞ্চম অনুবাক্।

তপঃ করি বিধিমতে ভৃগু জানিলেন চিত্তে
"আনন্দই ব্রহ্ম সত্য, ব্রহ্ম সুনিশ্চিতঃ
আনন্দে জীবের জন্ম, আনন্দে জীবন-কর্ম্ম
প্রলয় মরণে জীব আনন্দেই স্থিত।"
বরুণ কহিলা তত্ত্ব বুঝিলা তাঁহার পুত্র
এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হৃদয় আকাশে;

এইরূপে এই জ্ঞান লভে যেই ভাগ্যবান্
ব্রহ্মে যুক্ত হয় সেই জ্ঞানী অবশেষে।
ইতি ষষ্ঠ অনুবাক্।

অন্ন ১ নিন্দা জীব বৃন্দ
কভু যেন নাহি করে;
অন্ন প্রাণ প্রাণ অন্ন,
ব্রত রূপ অন্ন ধরে।
দেহ ভোক্তা, দেহ প্রাণে
প্রাণ দেহে যুক্ত;
অন্ন অন্নে, অন্ন অন্নে
অন্ন অন্নে ভুক্ত।
এই ভাবে অন্নে যিনি বুঝিবেন সার,
ব্রহ্ম যুক্ত হ'য়ে মুক্তি হইবে তাঁহার।
ইতি সপ্তম অনুবাক্।

অন্ন ত্যজ্য জীব রাজ্যে
কেহ যেন নাহি করে;
অন্ন আপঃ আপঃ অন্ন
ব্রতরূপ অন্ন ধরে।
জ্যোতি ভোক্তা, আপঃ জ্যোতি
জ্যোতি আপঃ ভুক্ত,
অন্ন অন্নে অন্ন অন্নে
অন্নে অন্ন যুক্ত।
এই ভাবে অন্নে যিনি বুঝিবেন সার,
ব্রহ্ম-যুক্ত হ'য়ে মুক্তি হইবে তাঁহার।
ইতি অষ্টম অনুবাক্।

অন্নকে করিবে বহু, সেই মহাব্রত;
এই যে বিপুল পৃথ্বী ব্যোমে প্রতিষ্ঠিত,
অন্ন ইহা; ভোক্তা তা'র অনন্ত আকাশ;
পৃথ্বী মাঝে ব্যোম, ব্যোমে পৃথ্বীর আবাস।
উভে উভ, অন্নে অন্নে, ভুক্ত, যুক্ত, এক,—
এই ভাবে বুঝ যদি উদিবে বিবেক।
বিবেক উদয়ে তত্ত্ব জ্ঞানের উদয়,
ব্রহ্ম যুক্ত হ'য়ে মুক্তি লভিবে নিশ্চয়।
ইতি নবম অনুবাক্।

বাস চাহে যেই তা'রে বিমুখ না কর;
এই ব্রত ধর্ম্ম পথে যেরূপেই পার,
লাভ কর বহু অন্ন। সাধু যিনি হন,
"প্রস্তুত করেছি অন্ন," বলি নিবেদন
করেন অতিথি জনে। উত্তম অধম
নীচ, যে ভাবে প্রস্তুত করিয়া যখন
অতিথি জনেরে অন্ন করিবা প্রদান,—
সে ভাবে আসিবে অন্ন তব সন্নিধান।
এই ভাবে জানি ব্রহ্মে কর উপাসনা,—
বাক্ বায়ু হস্ত, পদ গুহ্যের সাধনা।
লোভ ত্যজি, প্রাপ্ত বস্তু শুধু রক্ষা তরে
বাক্যের প্রয়োগ কর সত্য লক্ষ্য ক'রে;
প্রাণ অপান বায়ু নিয়োগ করিবে
প্রাপ্তরক্ষা হেতু, আর অপ্রাপ্ত লভিতে;
হস্ত বৈধ-কর্ম্মে, পদ গমন কারণ,
গুহ্যদ্বার ত্যাগ কার্য্যে করিবে যোজন।
এ ভাবে বাগাদি ১ পঞ্চে করিলে যোজনা,
শরীরী ভাবেতে সেই মহা উপাসনা।
দৈবীভাবে উপাসনা তৃপ্তি আদি ল'য়ে,
পঞ্চে পঞ্চ প্রকরণে প্রশান্ত হৃদয়ে।
তৃপ্তিরূপে জলদের হের বারিধারা,
শক্তিরূপে সৌদামিনী, বলদর্প হরা;
জ্যোতিরূপে নক্ষত্রেতে; আনন্দ স্বরূপ
অনন্ত প্রবাহ মত্র উপস্থের রূপ;
সর্ব্বরূপে হের ব্যক্ত আকাশ মণ্ডল;—
প্রতিষ্ঠারূপেতে ব্রহ্মে হের অচঞ্চল।

১ যে এক অদ্বিতীয় বস্তুতে পরিণামে সমস্ত জগৎ লীন হইবে, যেন উহা বিশ্ব গ্রাস করিবে অথবা বিশ্বই উহাকে গ্রাস করিয়া দুই-এ এক হইবে, সেই আদি সত্তাকে "অন্ন" শব্দে বুঝিতে হইবে। অন্ন ব্রহ্ম, অন্ন আদিভূত; এইরূপ নানা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে।

১ বাক-আদি।

মহঃ, মন, নম কিম্বা ব্রহ্মরূপে তাঁর,
যে ভাবে যে জন পুজে তা'ই পূর্ণ হয়।
মহঃ রূপে উপাসনা মহত্ত্বের হেতু,
মনঃ রূপে উপাসনা মননের সেতু,
নমোরূপে উপাসিলে কাম্য ফল লাভ;—
ব্রহ্মরূপে উপাসিলে ঘুচে পরিতাপ;
নিত্য ব্রহ্মপদ লাভ হয় অন্তকালে,
বারিবিন্দু মিশে যথা অনন্ত সলিলে।
আকাশ রূপেতে ব্রহ্মে উপাসনা কর, বৎস,
অসীমের সেইত মূরতি
যে আত্মা মানব দেহে, আদিত্য মণ্ডলে তাই
সর্ব্বভূতে তাঁহার বিস্তৃতি।
এই ভাবে বিশ্বব্যাপ্তে জানিলে সাধক বর,
ইহলোক ফুরাইবে যবে,
অন্ন-প্রাণময় কোশে, মনো জ্ঞানময় কোশে,
আনন্দ-ময়েতে যুক্ত হবে।
তখন সফল অন্ন তখন সফল রূপ
সর্ব্ব কাম তখন সফল;
অহো! কি আনন্দ হ'বে, কি মহা আনন্দ, অহো
অনন্ত আনন্দ মোক্ষফল।

আনন্দ, আনন্দময়, ব্রহ্মে আত্মা হবে লয়,*
আমি অন্ন, আমি ভোক্তা, অহো!
আমি অন্ন আমি অন্ন আমি ভোক্তা আমিভোক্তা,
আমি ব্রহ্মা; অহো! অহো! অহো!
আমি শ্লোককৃৎ,
আমি হিরণ্য গর্ভ,
দেব-অমরের আমি নাভি,—
আমিই কারণ সর্ব্ব।
অহো! অহো! অহো! আমি ব্রহ্ম,
আমি সংহারি ভুবন দর্প।
আমি জ্যোতির্ম্ময় শত সূর্য্য।
অহো! আমি জ্যোতির্ম্ময় শত সূর্য্য।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।
ইতি দশম অনুবাক।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।
ইতি ভৃগুবল্লী নাম তৃতীয় বল্লী।
ইতি তৈত্তিরীয়োপনিষৎ
সমাপ্ত।

শ্রীশশধর রায়।

* জীবাত্মা।

প্রাচীন ভারতের বাণিজ্য। (৭)

পাঠক, আমরা প্রাচীন ভারতের বাণিজ্যাবস্থা প্রদর্শনার্থ রাজসূয় মহাযজ্ঞে উপাহৃত দ্রব্যজাত, তাৎকালিক ভারত ও ভারতবহির্ভূত প্রদেশাদির সমৃদ্ধি এবং পাণ্ডবগণের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে তৎকালাবিষ্কৃত পৃথিবীর আয়তন ও সংস্থান সম্বন্ধে যাহা যাহা উল্লেখ করিয়াছি, সেই সমস্ত দ্বারা স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, প্রাচীনকালে ভারতের সুখ সমৃদ্ধি চরম সীমায় সমুত্থিত, ভারতের শৌর্য্য ও বীর্য্য ভুবনে অতুলিত এবং পৃথিবীর অন্যান্য ভূভাগ ভারতের পদে নতমস্তক হইয়াছিল। পরন্তু, মহাভারতে অর্জ্জুনাদির উত্তর কুরু বর্ষাদি দেশ জয় করিবার যে সকল বর্ণনা আছে, সেই সকল স্থানে গমনাগমনের বিধি ও প্রথা না থাকিলে সেই সমস্ত বিষয় উক্ত গ্রন্থে উল্লিখিত হইত না। অপিচ দিগ্বিজয়ে আমরা কয়েকটী বিষয় বিশেষ রূপে অবগত হইলাম যে, দিগ্বিজয় কালে ভীমপরাক্রম ভীমসেন দক্ষিণ কোশলাধিপতি রাজা বৃহদ্বল এবং উত্তর কোশলাধিপতি রাজা গো-পালকের নিকট হইতে

অনায়াসে বিনা যুদ্ধে কর গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তৎকালে কোশলাধিপতি সূর্য্যবংশীয় রাজগণের তাদৃশ শৌর্য্য বীর্য্য ছিল না। ঐ সময়ে বঙ্গদেশে দুইজন নরপতি ছিলেন, একের নাম সমুদ্র সেন, অপরের নাম চন্দ্রসেন। তৎকালে তাম্রলিপ্ত (বর্ত্তমান তমলুক্) সুপ্রসিদ্ধ মহানগর ছিল। ভীষ্মপর্ব্বে লিখিত আছে যে, বঙ্গদেশাধিপতি কার্ম্মুকে শর সংযোগ করিয়া মুহুর্মুহু সিংহনাদ করত মদবারিযুক্ত পর্ব্বতাকার দশ সহস্র হস্তী লইয়া ঘটোৎকচের পশ্চাৎ ধাবন করিলেন। পরে তিনি ঘটোৎকচ-প্রেরিত মহাশক্তি নামক অস্ত্র দর্শন করিয়া অতি সত্বর পর্ব্বতাকার হস্তীকে ঘটোৎকচের প্রতি চালাইলেন এবং হস্তী দ্বারা ভীম নন্দনের রথখানিরও গতিরোধ করিলেন *।

যে বঙ্গদেশ মহাভারতীয় কালে এতাদৃশ শৌর্য্য বীর্য্য সম্পন্ন, যে বঙ্গদেশীয় ক্ষত্রিয় বিজয় সেন সিংহল জয় করিয়াছিলেন, যে বঙ্গদেশ ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে রাজা মানসিংহের আগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এক প্রকার স্বাধীন ছিল, যাহার নৌ-বলের নিকট ক্ষত্রিয়, বৌদ্ধ ও মুসলমান নৃপতিগণ নতমস্তক ছিল, আজি সেই বঙ্গদেশ হীনবীর্য্য দাসত্ব শৃঙ্খলাবদ্ধ ভীরু বাঙ্গালীর আবাস ভূমি বলিয়া জগতে পরিচিত!

তৎকালে পুষ্করারণ্যে (বর্ত্তমান পুষ্করতীর্থে) উৎসব সঙ্কেত নামক অনার্য্য লোকেরা বাস করিত। সিন্ধুনদ তীরে শূদ্রগণ ও আভীর (আহীর)গণ বাস করিত এবং প্রভূত সলিলা সরস্বতীর তীরে মৎস্যজীবীগণের বাস ছিল।

মহাভারতীয়কালে ভারতের আভ্যন্তরিক যাদৃশী সুখসমৃদ্ধি-পূর্ণা অবস্থা ছিল, তাহা রাজসূয় মহাযজ্ঞে সমাহৃত ও উপাহৃত দ্রব্যজাত দ্বারাই সম্যক্ প্রদর্শিত হইয়াছে, তথাপি আমরা তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিন্মাত্র উল্লেখ করিয়া তৎকালীন ভারতের অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য সম্বন্ধে যথাযথ আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

এক সময় মহাসত্ব সত্যপ্রতিজ্ঞ অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞাভঙ্গ-জনিত পাপক্ষয়ার্থ তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হইয়া দ্বাদশবর্ষ ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গস্থিত যাবতীয় তীর্থ ও অন্যান্য দর্শনীয় স্থান সকল দর্শন করিলেন এবং কলিঙ্গদেশ অতিক্রম করিয়া বহুবিধ স্থান ও ধনিগণের রমণীয় অট্টালিকা সকল দেখিতে গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর তিনি তাপসগণ-শোভিত মহেন্দ্র পর্ব্বত দর্শন করিয়া দক্ষিণ সমুদ্র তীরস্থির পথে ধীরে ধীরে মণিপুরে গমন করিলেন।*

অর্জ্জুনের এই ভ্রমণ বৃত্তান্তটী দ্বারা জানা যাইতেছে যে, কেবল রাজধানী সমূহে নহে,

* "সঙগৃহ্য সশরংচাপং সিংহবদ্ব্যনদম্মুহুঃ। পৃষ্ঠতোঽন্বযযৌ চৈনং দ্রবদ্ভিঃ পর্ব্বতোপমৈঃ॥ কুঞ্জরৈর্দশসাহস্রৈ র্ব্বঙ্গানামধিপঃ স্বয়ং। তামুদ্যতামভিপ্রেক্ষ্য বঙ্গানামধিপস্ত্বরন্॥ কুঞ্জরং গিরিসঙ্কাশং রাক্ষসং প্রত্যচোদয়ৎ। রথক বারয়ামাস কুঞ্জরেণ সুতস্যতে॥
vide ভীষ্মপর্ব্ব।

* "অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গেষু যানি তীর্থানিকানিচিৎ। জগাম তানি সর্ব্বাণি তথাস্যায়তনানিচ॥ সকলিঙ্গানতিক্রম্য দেশানায়তনানিচ। হর্ম্ম্যাণি রমণীয়ানি প্রেক্ষমাণোযযৌ প্রভুঃ॥ মহেন্দ্র পর্ব্বতং দৃষ্ট্বা তাপসৈরূপ শোভিতং। সমুদ্রতীরেণ শ্চর্ন্যে মণিপুরং জগাম হ॥"
Vide মহাভারত—আদিপর্ব্ব।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও ধনিগণের রমণীয় অট্টালিকা সকল বিরাজিত ছিল এবং দক্ষিণ সমুদ্রতীরবর্ত্তী পথ দ্বারাও ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে গমনাগমন করা যাইত। পরন্তু যৎকালে অযোধ্যাপতি মহারাজ রঘু দিগ্বিজয় করেন, তিনিও এই সমুদ্র তীরবর্ত্তী পথদ্বারা চতুরঙ্গিণী সেনাসহ ভারতের পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে পশ্চিম প্রান্তে গমন করিয়াছিলেন *।

মহাভারতের বনপর্ব্বে লিখিত আছে যে, অযোধ্যাপতি ঋতুপর্ণ, দময়ন্তী স্বয়ম্বরে আহূত হইয়া বিকৃতবেশ সারথিরূপী নলের সাহায্যে তিন দিবসে অযোধ্যা হইতে বিদর্ভ দেশের (বর্ত্তমান বেরার) রাজধানী কৌণ্ডিন্য নগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ফলতঃ, প্রাচীন কালে রথের গমনাগমন জন্য ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত মার্গ সকল বর্ত্তমান ছিল। এই সকল পথের সাহায্যে প্রাচীন ভারতে বাণিজ্যকার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইত।

ভারতের আভ্যন্তরিক অবস্থা সম্বন্ধে মহাভারতীয় আদিপর্ব্বের একস্থানে লিখিত আছে যে, ভারতীয় নগর সকল বণিকগণ ও শিল্পিগণ দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। অধিবাসিগণ কৃতবিদ্য, শূর, সাধু এবং সুখী। ধর্ম্মকার্য্যরত ও যজ্ঞশীল, সত্যপরায়ণ, পরস্পর প্রীতি-সংযুক্ত প্রজাবর্গ উন্নতিশালী হইয়াছিল। জনগণ মান ও ক্রোধ বিবর্জ্জিত, লোভবিহীন, ধর্ম্মোত্তর এবং পরস্পরকে অভিনন্দন করিত †।

বেদে ও রামায়ণে যে সকল দেশ, প্রদেশ, নদ, নদী ও পর্ব্বতাদি উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সমস্ত তত্তৎকালীয় বাণিজ্য প্রসঙ্গে যথাপ্রাপ্ত লিখিত হইয়াছে। মহাভারত হিন্দুদিগের শেষ প্রমাপক গ্রন্থ, সুতরাং আমরা মহাভারতোক্ত কালে প্রসিদ্ধ দেশ ও প্রদেশাদি যথাযথ লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিব। দেশ ও প্রদেশ সকল যথা—

সিন্ধু, কাশ্মীর, মদ্র, কেকয়, ত্রিগর্ত্ত, বাহ্লীক, কুলিন্দ, আনর্ত্ত, কালকূট, সুমণ্ডল, শাকল দ্বীপ, প্রাগ্‌জ্যোতিষ, অন্তর্গিরি, বহির্গিরি, উপগিরি, উলূক, মোদাপুর, কামদেব, সুদামা, পঞ্চগণ, দেবপ্রস্থ, লোহিত, দার্ব্ব, কোকনদ, অভিসারী, উরগা, সিংহপুর, সহ্ম, সুমাল, দরদ, কাম্বোজ, লোহ, পরম কাম্বোজ, ঋষিক, হাটক, মানস সরোবর প্রদেশ, ঋষিকুল্যা, গন্ধর্ব্বদেশ, উত্তর কুরুবর্ষ, পাঞ্চাল, গণ্ডক, বিদেহ, দশার্ণ, পুলিন্দ, চেদি, কুমারদেশ, দক্ষিণ কোশল, উত্তর কোশল, মল্ল, ভল্লাট, কাশী, রাজপতি, মৎস্য, মলদ, পশুভূমি, বৎসভূমি, ভর্গ, নিষাদ, দক্ষিণমল্ল, শর্ম্মক, বর্ম্মক, বৈদেহক, সুহ্ম, প্রসুহ্ম, মগধ, গিরিব্রজ, অঙ্গ, মোদাগিরি, পুণ্ড্র, কৌষিকীকচ্ছ, বঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, কর্ব্বট, লৌহিত্য, শূরসেন, অধিরাজ, পটচ্চর মৎস্য, নবরাষ্ট্র, কুন্তিভোজ, সেক, অপরসেক, অবন্তি, ভোজকট, কান্তারক, প্রাক্‌কোশল, নাটকেয়, হেরম্বক, মারুধ, মুঞ্জগ্রাম, নাচীন, অর্ব্বুক, আটবিক, কিষ্কিন্ধ্যা, মাহিষ্মতী, ত্রৈপুর, সুরাষ্ট্র, শূর্পারক, তালাকট, দণ্ডক, মারগদ্বীপ, কোল-

* Vide রঘুবংশে রঘুর দিগ্বিজয়।

† "বণিগ্‌ভিশ্চাপকীর্ণাস্তু নবারাণ্যথ শিল্পিভিঃ। শূরাশ্চকৃত বিদ্যাশ্চ সন্তশ্চ সুখিনোং ভবন্‌॥ ধর্ম্মক্রিয়া যজ্ঞশীলাঃ সত্যব্রত পরায়ণাঃ। অন্যোন্য প্রীতি সংযুক্তা ব্যবর্দ্ধন্ত প্রজা স্তদা॥ মানক্রোধ-বিহীনাশ্চ নরালোভবিবর্জ্জিতাঃ। অন্যোন্যমভ্যনন্দন্ত ধর্ম্মোত্তরা॥" Vide আদিপর্ব্ব।

গিরি, সুরভিপট্টন, তাম্রদ্বীপ,পাণ্ড্য, দ্রাবিড়, উড্র, কেরল, অন্ধ্র, তালবন, কলিঙ্গ, উষ্ট্র-কর্ণিক, কচ্ছ, রোহীতক, মরুদেশ, শৈরীষক, মহেত্থ, অম্বষ্ঠ, মালব, পঞ্চকর্পট, মধ্যমকেয়, যাটধান, দ্বিজ, পুষ্করারণ্য, পঞ্চনদ, উত্তর জ্যোতিষ, দিব্যকট,দ্বারপাল, রামঠ, হারহুণ, দ্বারকা, কুরুজাঙ্গল, বোধ, সুকুট্য, সৌবল্য, কুন্তল, করূষ, উত্তম, মেখল,কৌঙ্গিজ, নৈক-পৃষ্ঠ, ধুরন্ধর, সোধ, ভুজিঙ্গ, কাশর, অপর কাশর, জঠর, কুকুর, কুন্তি, অপরকুন্তি, গোহ্লুত, মন্ধক, ষণ্ড, বিদর্ভ, রূপবাহিকা, অশ্মক, পাংশুরাষ্ট্র, গোপরাষ্ট্র, করীত, অধি-রাজ্য কুলাথ, কেবর, মল্লরাষ্ট, বারপাস্থ্য-পবাহ, চক্র, বক্রাতপ, শক, শ্বক্ষ, মলয়, বক্রলোম, সুদেষ্ণ, মাহিক, শাঙ্গিক, আভীর, বাহীক, প্রহার, অপরান্ত, পরান্ত, পহ্লব, চর্ম্মমণ্ডল, শিখর, মেরুভূত, মারিষ, উপাবৃত্ত, স্বরাষ্ট্র, কুট্ট, পরান্ত, মাহেয়, সামুদ্রনিষ্কুট, অঙ্গমলজ, মানবর্জক, মহ্যুত্তর, ভার্গব, ভার্গ, কিরাত, যামুন, নৈঋত, নিষাধ, দুর্গল, প্রতিমাস্য, তীরগ্রহ, ঈজক, কন্যকগুণ, সৌবীর, মধুমন্ত,সুকন্দক,সিন্ধুসৌবীর, গান্ধার, দর্শক, উতুল, শৈবাল, বানব, দর্ব্বী, জাত-জাম, রথোরগ, বাহুবাধ, কৌরব্য, সুমল্লিক, বন্ধ্রু, করীষক, বাতায়ন, রোমা, কুশবিন্দু, কক্ষ, গোপালকক্ষ, বর্ব্বর, কুরুবর্ণক, সিদ্ধ, সৈসিতক, পার্ব্বতীয়, প্রাচ্য, মূষিক, বন-বাসক, কর্ণাটক, মাহিষক, বিকল্য, ঝিল্লিক, সৌহৃদ, নলকানন,কৌকুট্টক, চোল, কোঙ্কণ, মালবানক, সমঙ্গ, করক, কুক্কুর, মারিষ, ধ্বজিনি, শাম্বসেনি, বরু, কোকরক, প্রোষ্ঠ, সমবোহবশ, বিন্ধ্যচুলক, বল্কল, মল্লব, অপর-বল্লভ, কাল, কুণ্টক, করট, স্তনবাল, সনীয়, ঘটসৃঞ্জয়, অলিন্দ, পাশিবাট, তনয়, সুনয়, দশী, কাণ্ডীক, তঙ্গণ, পরতঙ্গণ, উত্তরম্লেচ্ছ, অপরম্লেচ্ছ, ক্রূর, অপগণ, পারসীক, বনায়ু, চীন, মহাচীন (১)।

নদ ও নদী সকল :—

সিন্ধু, সরস্বতী, গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, নর্ম্মদা, বাহুদা, মহানদী, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, দৃশদ্বতী, বিপাশা, বিপাপা, স্থূলবাহুকা, বেত্রবতী, কৃষ্ণবেণী, ইরাবতী, বিতস্তা, পয়োষ্ণী, দেবিকা, বেদস্মৃতা, বেদবতী, ত্রিদিব, ইক্ষুমালিনী, করীষিণী, চিত্রবহা, চিত্রসেনা, গোমতী, ধুতপাপা, গণ্ডকী, কৌশিকী, নিশ্চিন্তা, কৃত্যা, নিচিতা, লোহতারিণী, রহস্যা, শতকুম্ভা, সরযূ, চর্ম্মন্বতী, চন্দ্রভাগা, হস্তিসোমা, দিক্, শরাবতী, পয়া, ভীমরথী, কাবেরী, চুলুকা, বীণা, শতবলা, নীবারা, মহিতা, সুপ্রয়োগা, পবিত্রা, কুণ্ডলা, রজনী, পুরমালিনী, পূর্ব্বাভিরামা, বীরা, ভীমা, ওঘবতী, পলাশিনী, পাপহরা,মহেন্দ্রা,পাটলী-বতী, অসিক্নী, কুশচীরা, মকরী, প্রবরা, মেনা, হেমা, ধৃতবতী, পুরাবতী, অনুষ্ণা, শৈব্যা, কাপী, সদানীরা, অধৃষ্যা, কুশধারা, সদাকান্তা, শিবা, বীরবতী, বাস্তু, সুবাস্তু, গৌরী, কম্পনা, হিরণ্বতী, বরা, বীরঙ্করা, পঞ্চমী, রথচিত্রা, জ্যোতিরথা, বিশ্বামিত্রা, কপিঞ্জলা, উপেন্দ্রা, বহুলা, কুচীরা, মধু-বাহিনী, বিনদী, পিঞ্জলা, তুঙ্গবেণা, বিদিশা, কৃষ্ণবেন্না, তাম্রা, কপিলা, শলু, সুবামা, বেদাশ্বা, হরিস্রাবা, শীঘ্রা, পিচ্ছলা,ভারদ্বাজী, কৌশিকী, নিম্নগা, শোণা, বাহুদা, চন্দ্রমা, দুর্গা, অন্তঃশিলা, ব্রহ্মবোধ্যা, বৃহদ্বতী, যবক্ষা, রোহী, জাম্বুনা, সুরসা, তমসা, দাসী, বসা, বরুণা, অসী, নালা, ধৃতিমতী, পূর্ণাশা, তামসী, বৃহতী, ব্রহ্মমেধ্যা, সদানীরাময়া,

(১) vide সভাপর্ব্ব ও ভীষ্মপর্ব্ব।

মন্দগা, মন্দবাহিনী, ব্রহ্মাণী, মহাকেতা, চিত্রোপলা, চিত্ররথা, মঞ্জুলা, বাহিনী, মন্দাকিনী, বৈতরণী, কোশা, মুক্তিমতী, অলিঙ্গা, পুষ্পবেণী, উৎপলাবতী, লৌহিত্য, করতোয়া, বৃষকা, কুশরী, ঋষিকুল্যা, মারিষা, পুণ্যা, মন্দাকিনী (১)।

পর্ব্বত সকল—হিমালয়, কৈলাস, মৈনাক, মন্দর, গন্ধমাদন, ইন্দ্রপর্ব্বত, অমর পর্ব্বত, মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান্, ঋক্ষপর্ব্বত, বিন্ধ্য, পারিপাত্র, গোশৃঙ্গ, ভোগবন্ত, নীলাচল, রৈবতক, বিন্ধ্যাচল ইত্যাদি। এই সকল পর্ব্বতে মদমত্ত হস্তি সকল ধৃত হইত এবং সুবর্ণ, রজত, হীরক, পদ্মরাগ, নীলকান্ত, বৈদূর্য্য প্রভৃতি মণির আকর ছিল। (২)

এইক্ষণ আমরা মহাভারতোক্ত কালীন ভারতের অন্তর্বাণিজ্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিব।

মহাভারতোক্তকালে যে ভারতের অন্তর্বাণিজ্যের ভূয়সী উন্নতি হইয়াছিল, তাহা উহার আভ্যন্তরিক অবস্থা সম্বন্ধীয় বিবরণ সকল পাঠ করিলেই বিলক্ষণ উপলব্ধি হইয়া থাকে। কারণ, বাণিজ্যের বিশিষ্ট শ্রীবৃদ্ধি না থাকিলে তাৎকালিক ভারতের তাদৃশী সমৃদ্ধি হইতে পারিত না।

সভাপর্ব্বে লিখিত আছে যে, দেবর্ষি নারদ ময়দানব-নির্ম্মিত অভূতপূর্ব্ব মহা সভা পরিদর্শনার্থ ইন্দ্রপ্রস্থে সমাগত হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা বিলক্ষণ উপলব্ধি হয় যে, তাৎকালিক ভারতে শৌর্য্য, বীর্য্য, বাণিজ্য, ঐশ্বর্য্য এবং রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি ও সমাজনীতি প্রভৃতি উন্নতির শেষ সীমায় সমুত্থিত হইয়াছিল। দেবর্ষি নারদ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, আপনি কি লাভের জন্য দূরদেশ হইতে সমাগত বণিকদিগের নিকট হইতে শুল্ক-সংগ্রাহক কর্ম্মচারিগণ দ্বারা যথোক্তরূপ শুল্ক আদায় করাইয়া থাকেন? আপনি কি সূত্রগ্রন্থ সকল এবং হস্তিসূত্র, অশ্বসূত্র, রথসূত্র সকল পাঠ করিয়া থাকেন? হে ভরতর্ষভ! আপনি কি গৃহে ধনুর্ব্বেদ-সূত্র, নগররক্ষার্থ যন্ত্র-সূত্র সকল অভ্যাস করিয়া থাকেন? আপনি কি সমস্ত অস্ত্র, ব্রহ্মদণ্ড ও শত্রুনাশক বিষযোগ সকল জ্ঞাত আছেন? ইত্যাদি ইত্যাদি ১।

বণিকগণ অশ্ব, অশ্বতর, হস্তী, উষ্ট্র, গর্দ্দভ প্রভৃতি পশুর পৃষ্ঠোপরি পণ্যদ্রব্যজাত সমারোহিত করিয়া স্থল-পথে ভারতের মধ্য ও প্রান্তস্থিত এবং তদ্বহিস্থিত বিবিধদেশ প্রদেশে যাইয়া বাণিজ্য কার্য্য সকল নির্ব্বাহিত করিত।

বণিকেরা পোতযোগে পূর্ব্বোক্ত নদ নদী সকল বাহিয়া ভারতের নানাদেশ প্রদেশ যাইয়া বাণিজ্য কার্য্য সকল নির্ব্বাহিত করিত। তৎকালীন ভারতে যে সুবৃহৎ পোতের ব্যবহার ছিল, তাহার নিদ-

(১) vide ভীষ্মপর্ব্ব।

(২) "বিন্ধ্যপর্ব্বতজৈর্ম্মত্তৈঃ পূর্ণা হৈমবতৈরপি। মদান্বিতৈরতিবলৈর্মাতঙ্গৈঃ পর্ব্বতোপমৈঃ।"

রামায়ণ—বালকাণ্ড ৬।২৭।

১। "কচ্চিদভ্যাগতা দূরাদ্ বণিজো লাভকারণাৎ। যথোক্তমবহার্য্যন্তে শুল্কং শুল্কোপজীবিভিঃ॥ কচ্চিৎ সর্ব্বাণি সূত্রাণি গৃহ্নাসি ভরতর্ষভ। হস্তি সূত্রাশ্ব সূত্রাণি রথ সূত্রাণিবা বিভো॥ কচ্চিদভ্যস্যতে সম্যক্ গৃহেতে ভরতর্ষভ। ধনুর্ব্বেদস্য সূত্রংবৈ যন্ত্র-সূত্রঞ্চ নাগরং॥ কচ্চিদস্ত্রাণি সর্ব্বাণি ব্রহ্মদণ্ডশ্চ তেঽনঘ। বিষযোগাস্তথা সর্ব্বে বিদিতাঃ শত্রু-নাশকাঃ॥"

Vide মহাভারত—সভাপর্ব্ব।

র্শন মহাভারতেই উল্লিখিত আছে। যৎকালে বারণাবতনগরস্থিত জতুগৃহ হইতে পলায়িত সমাতৃক পাণ্ডবগণ গঙ্গা পার হইবার নিমিত্ত ভাগীরথী-তীরে উপনীত হইলেন, তৎকালে মহামতি বিদুর কুন্তীদেবীকে একখানি বৃহৎ পোত দেখাইয়া বলিলেন যে, এই নৌকা বাতসহা, অর্থাৎ প্রবল বাত্যা ইহার কোন অনিষ্ট করিতে পারে না, ইহা যন্ত্র-যুক্তা, অর্থাৎ ইহা কলের সাহায্যে চলে, ইহা পতাকা-বিশিষ্টা অর্থাৎ ইহা পাইলের সাহায্যে চলে, উহা জলপথে উপযুক্তা,ঝটিকা ও তরঙ্গ উহার কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। হে কল্যাণি! আপনি এই নৌকা দ্বারা (গঙ্গা পার হইয়া) পুত্রগণের সহিত মৃত্যু-পাশ হইতে রক্ষা পাইবেন। ১

স্থল-পথে বৈদেশিক বাণিজ্য, যবন ও শকাদিজাতীয় জনগণের সহিত চালিত। মহাভারতের অনুশাসনিক পর্ব্বে কথিত আছে যে, যবন, শক, কাম্বোজ, মেকল, দ্রবিড়, লাট, পৌণ্ড্র, কোম্বশিবা, শৌণ্ডিক, দরদ, দর্ব্ব, চৌর, শবর, বর্ব্বর, কিরাত প্রভৃতি অনার্য্য জাতীয় লোকেরা পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় ছিল, ভারত হইতে বিতাড়িত হইয়া ব্রাহ্মণের অদর্শনহেতু শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। ২

উল্লিখিত যবনাদি অনার্য্য জাতীয় লোকদিগের সহিত ভারতীয় বাণিজ্য কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। ভারতবর্ষ হইতে বিবিধ ভোজ্য দ্রব্য, গন্ধদ্রব্য, কার্পাস বস্ত্র, সূক্ষ্মবস্ত্র, হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত দ্রব্য, অজিন, গো, বর্ম্ম, (ঢাল) বিবিধশস্ত্র ও অস্ত্র, চন্দন, শূক্ষ্মবস্ত্র, সুবর্ণ, রজত, হীরক, বৈদূর্য্যাদি মণি বিদেশে বাণিজ্যার্থ প্রেরিত হইত।

গান্ধার, পারসীক এবং বনায়ু দেশ সমূহ হইতে শুভ্রবর্ণ উৎকৃষ্ট অশ্ব সকল বাণিজ্য যোগে ভারতবর্ষে আনীত হইত। ১ হিমালয়ের উত্তরদিগ্‌বর্ত্তী হাটকাদি দেশ সকল হইতে তিত্তিরিকল্মাষ ও মণ্ডূক নামক উৎকৃষ্ট ঘোটক সমূহ ক্রীত হইয়া ভারতে আনীত হইত। শক প্রভৃতি অনার্য্য জাতীয় লোকদিগের সহিত বাণিজ্য-যোগে মেষলোমজ, বভ্রুমৃগ লোমজজাত (শাল) কীটজ ও পট্টজ বিবিধবস্ত্র এবং কোমল মৃগচর্ম্ম, বিবিধ রস ও রত্ননিচয় ভারতে আনীত হইত। বাহ্লীকাদি প্রদেশ হইতে বাণিজ্যযোগে ভারতে আনীত যুদ্ধাশ্ব সকল অত্যুৎকৃষ্ট। মহাভারতের সভাপর্ব্বে ঐ সকল অশ্ব সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, তাহারা "কৃষ্ণগ্রীব, মহাকায়, দূরপাতী, বঙক্ষুতীর সমুদ্ভূত, ইন্দ্রগোপবর্ণাভ (সিঁদুরে পোকাররং), শুকবর্ণ, মনোজব, ইন্দ্রায়ুধ-নিভ, সন্ধ্যাভ্র সদৃশ ও নানাবর্ণ বিশিষ্ট।"

সিংহল দ্বীপ হইতে বৈদূর্য্যরত্ন, মুক্তা এবং আস্তরণপট ভারতে আনীত হইত।

বাস্তবিক, মহাভারতোক্তকালে বৈদেশিক জাতি নিচয়ের সহিত ভারতীয় বাণি-

---

১ "ততো বাতসহাং নাবং যন্ত্রযুক্তাং পতাকিনীং। ঊর্ম্মি-মালাং দৃঢ়াং কৃত্বা কুন্তীমিদমুবাচহ। ইয়ং বারিপথে যুক্তা তরঙ্গ পবন ক্ষমা। মৌর্যয়া মৃত্যুপাশাত্ত্বং সপুত্রা মোক্ষ্যসে শুভে॥"
vide মহাভারত—আদিপর্ব্ব।

২"শকা যবনকাম্বোজা স্তাস্তাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ। বৃষলত্বং পরিগতা ব্রাহ্মণানামদর্শনাৎ॥' "মেকলা দ্রবিড়ালাটাঃ পৌণ্ড্রাঃ কোম্বশিবা স্তথা। শৌণ্ডিকা দরদাদর্ব্বাশ্চৌরাঃ শবর বর্ব্বরাঃ। কিরাতা যবনাশ্চৈব তাস্তাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ। বৃষলত্ব মনুপ্রাপ্তা ব্রাহ্মণানদর্শনাৎ।'
vide—মহাভারত—অনুশাসনিক পর্ব্ব।

১কাম্বোজ বিষয়ৈ জাতৈ র্বাহ্লীকৈশ্চ হয়োত্তমৈঃ। বনায়ুজৈর্নদীজৈশ্চ পূর্ণা হরিহয়োত্তমৈঃ
রামায়ণ—বালকাণ্ড ৬।১২

জ্যের যৎপরোনাস্তি উন্নতি হইয়াছিল এবং বৈদেশিক যবন ম্লেচ্ছাদি জাতি-সমূহের সহিত বিলক্ষণ সংমিশ্রণও ঘটে। কুরুক্ষেত্র মহাসমরে যবন ও ম্লেচ্ছ ভূপতিগণ রাজা দুর্য্যোধনের পক্ষাবলম্বী হইয়াছিল। এমন কি, রাজা দুর্য্যোধনের পুরোচন নামক ম্লেচ্ছ জাতীয় এক মন্ত্রী ছিলেন, তিনি জতু-গৃহে দগ্ধ হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। ১ তৎকালে ভূপালবর্গকে বিশেষতঃ রাজমন্ত্রিগণকে ম্লেচ্ছাদি নানাবিধ ভাষা জানিতে হইত। মহাত্মা বিদুর ম্লেচ্ছভাষায় রাজা যুধিষ্ঠিরকে পুরোচন-নির্ম্মিত জতুময় গৃহের কথা সঙ্কেতে জানাইয়াছিলেন। ১ ম্লেচ্ছ ও যবনগণ মহাবল ও পরাক্রান্ত ছিল। কথিত আছে যে, সৌবীর, বিতুল বা সুমিত্র নামে এক যবন নৃপতি অতিশয় বল-সম্পন্ন ও কৌরব-গণের প্রতি সদা অভিমান-যুক্ত ছিল। মহাবীর পাণ্ডুও তাহাকে বশে আনিতে পারিয়াছিলেন না, ধনঞ্জয়-প্রমুখ পাণ্ডু-নন্দনেরা তাহাকে সমরে নিহত করিয়াছিলেন। ৩

হিমালয়ের উত্তরভূভাগবাসী শকাদি জাতীয় লোকেরা পুরাণাদি শাস্ত্রে অসুর দৈত্য ও দানব ইত্যাদি অনার্য্য নামেও অভিহিত হইয়াছিল।

১ "সচ ম্লেচ্ছাধমঃ পাপী দগ্ধস্তত্র পুরোচনঃ।"
মহাভারত—আদিপর্ব্ব।

২ "কিঞ্চিচ্চ বিদুরেণোক্তো ম্লেচ্ছবাচাসি পাণ্ডব। ত্বয়াচ তত্তথেত্যুক্ত মেতদ্বিশ্বাস কারণম্।
Ibid.

৩ সো(সৌবীরঃ—বিতুলঃ—সুমিত্রঃ)হর্জ্জুনেন বশংনীতো রাজাসীদযবনাধিপঃ। অতীববল-সম্পন্নঃ সদামানী কুরুন্‌প্রতি। অর্জ্জুনপ্রমুখৈঃ পার্থৈঃ সৌবীরঃ সমরে হতঃ। নশশাক বশে কর্ত্তুং যঃ পাণ্ডুরপি বীর্য্যবান্।"
Ibid.

তাহারা যেমন মহাবল পরাক্রান্ত, তেমনি আবার ধনী ও সমৃদ্ধিশালী ছিল। মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব্বে লিখিত আছে যে, পাণ্ডবগণ কুরুক্ষেত্র মহাসমরের পর পাপ-ক্ষয়ার্থ অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছুক হইয়া হিমালয়ের উত্তরদেশবর্ত্তী ভূভাগ হইতে অসংখ্য হয়, হস্তী, হস্তিনী, উষ্ট্র, গর্দ্দভ, শকট, রথ, ও ভৃত্যলোক এবং বহু সহস্রভার ধন রত্নাদি আনয়ন করিয়াছিলেন (১)।

পরন্তু ইন্দ্রপ্রস্থে (বর্ত্তমানদিল্লি) মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যে অভুতপূর্ব্বা মহতী সভা শিল্পি-প্রবর ময়দানব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেই মহা সভার সমস্ত উপকরণই হিমালয়ের উত্তর দিগ্‌বর্ত্তী প্রদেশ হইতে আনীত হইয়াছিল। মহাভারতের সভাপর্ব্বে লিখিত আছে যে, ময় নামক দানব শিল্প-নৈপুণ্যে দক্ষ ছিলেন। তিনি ধর্ম্মাবতার যুধিষ্ঠিরের সভা প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, কৈলাস পর্ব্বতের উত্তরে মৈনাক পর্ব্বতের সম্মুখে পূর্ব্বকালে অসুরেরা যজ্ঞ করিতে অভিলাষী হইলে আমি সত্যসন্ধ বৃষপর্ব্বা নামক অসুরের সভায় বিচিত্র মণি-ময় রমণীয় ভাণ্ড বিন্দু নামক সরোবরের নিকট প্রস্তুত করিয়াছিলাম, হে ভারত! যদি সেই ভাণ্ড এইক্ষণ তথায় থাকে, তবে আমি উহা লইয়া আসিব। ২

১ "ষষ্টিরুষ্ট্র সহস্রাণি শতানিদ্বিগুণাহয়াঃ। বারণাশ্চ মহারাজ সহস্রশত সম্মিতাঃ॥ শকটানি রথাশ্চৈব তাবদেব করেণবঃ। খরাণাং পুরুষাণাঞ্চ পরিসংখ্যা নবিদ্যতে। এতদ্বিত্তং তদভবদ যমুদ্ধদ্ধে যুধিষ্ঠিরঃ। ষোড়শাষ্টৌ চতুর্বিংশ সহস্রং ভার-লক্ষণম্।"
vide মহাভারত—অশ্বমেধপর্ব্ব।

২ উত্তরেষুচ কৈলাসং মৈনাক পর্ব্বতং প্রতি। যিযক্ষ মাণেষু পুরা দানবেষু ময়াকৃতম্। চিত্রং মণিময়ং

অনন্তর ময়দানব সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দানবরাজ বৃষ পর্ব্বার অধিকৃত স্ফটিকময় সভা নির্ম্মাণোপযোগী সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী, মহতী গদা, দেবদত্ত শঙ্খ ও কিঙ্করগণ-রক্ষিত ধনরত্নাদি লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন।

যিনি কৌরবগণের জলবিহার, অস্ত্রশিক্ষা, পরীক্ষার্থ রঙ্গভূমি, রাজসূয় যজ্ঞীয় সভা, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভা, দ্বারকাপুরী এবং ইন্দ্রপ্রস্থ নগরের সুখসমৃদ্ধি সম্বন্ধীয় বর্ণনাগুলি পাঠ করিয়াছেন, তিনি বিলক্ষণ অবগত আছেন যে, মহাভারতোক্তকালে ভারত কি ধনরত্নে, কি শিল্প-বাণিজ্যে, কি জ্ঞান বিজ্ঞান, কি শৌর্য্য বীর্য্যে ও ঐশ্বর্য্যে, পৃথিবীতে অদ্বিতীয় ছিল। এস্থলে কেবল মাত্র ইন্দ্রপ্রস্থ নগরের অতি সংক্ষিপ্ত বর্ণনাটী প্রদত্ত হইল, এতদ্বারা তৎকালীয় ভারতে রাজধানীর সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য বিলক্ষণরূপে প্রকটিত হইবে।:—

সেই ইন্দ্রপ্রস্থ নগর তীক্ষ্ণ অঙ্কুশাস্ত্র ও শতঘ্ন সমূহ (তোপ) দ্বারা এবং বিবিধ যন্ত্র ও লৌহময় মহাচক্র-নিচয় দ্বারা পরিশোভিত ছিল।১

হে রাজন্! সমগ্র বেদ বিদগ্রগণ্য এবং সর্ব্বভাষাভিজ্ঞ দ্বিজগণ সেই নগরে বাস করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছিলেন। নানাদিক্ হইতে ধনার্থী বণিকেরা সেই স্থানে আসিয়াছিল। সমস্ত শিল্পপারদর্শী লোকেরা সেই নগরে বাস করিবার জন্য সমাগত হইয়াছিল *।

তৎকালে সমস্ত নগরেই শিল্পী ও বণিক্-গণ বাস করিত। যৎকালে রাজা ধৃতরাষ্ট্র চরমকালে বনে গমন করেন, তৎকালে হস্তিনাপুর হইতে শিল্পী, বণিক, বৈশ্য এবং কর্ম্মোপজীবী লোকেরা তাঁহাকে অগ্রে করিয়া নগর বহির্গত হইল P।

পূর্ব্বে যে সকল বিষয় প্রদর্শিত হইল, ঐ সমস্ত দ্বারা ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, মহাভারতোক্তকালে, ভারতে স্থল-পথে ও জলপথে অন্তর্বাণিজ্য এবং স্থলপথে বহির্বাণিজ্য উন্নতির শেষ সীমায় উত্থিত এবং তৎকালে ভারত, ধনধান্যে, ঐশ্বর্য্যে, শৌর্য্য ও বীর্য্যে পৃথিবী মধ্যে অতুলনীয় হইয়াছিল।

পরে প্রবন্ধে আমরা দেখাইব যে, মহাভারতোক্ত কালে জলপথে বহির্বাণিজ্যেরও ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল।

শ্রীতারিণীকান্ত বিদ্যানিধি।

জাতি।

যাঁহারা মনে করিবেন, আমি প্রত্নতত্ত্ব বা সৃষ্টি বিবরণ লিখিতে বসিয়াছি, তাঁহারা ভ্রমে পতিত হইবেন। আমি কোন গবেষণা করিতে বসি নাই, কারণ এ বিষয়ে আমার গভীর গবেষণা নাই, থাকিলেও আমি তাহা

ভাণ্ডং রম্যং বিন্দুসরঃ প্রতি। সভায়াং সত্যসন্ধস্য যদাসীদ বৃষপর্ব্বণঃ। আগমিষ্যামি সংগৃহ্য যদি তিষ্ঠতি ভারত।' Vide মহাভারত—সভাপর্ব্ব।

১ "তীক্ষ্ণাঙ্কুশ শতঘ্নীভির্যন্ত্র জালৈশ্চ শোভিতং। আয়সৈশ্চ মহাচক্রৈঃ শুশুভে তৎ পুরোত্তমং। তত্রাগচ্ছন্ দ্বিজা রাজন্ সর্ব্ববেদ বিদাম্বরাঃ। নিবাসং রোচয়ন্তিস্ম সর্ব্বভাষাবিদ স্তথা।।

Vide মহাভারত—আদিপর্ব্ব।

P "শিল্পিনো বণিজোবৈশ্যাঃ সর্ব্বে কর্ম্মোপজীবিনঃ। তে পার্থিবং পুরস্কৃত্য নির্যযুর্নগরাদ্বহিঃ।।"

Vide মহাভারত—স্ত্রী পর্ব্ব।

খরচ করিতে প্রস্তুত নই। কিম্বা হালুইকার বড়, না কুম্ভকার বড়, চাষা বড়, না ধোপা বড়, ইহা লইয়া আলোচনা করাও আমি ভাল মনে করি না।

জাতি চেতন কি অচেতন, এবিষয়ে আমি বরং আলোচনা করিতে পারি যে বস্তু যাতায়াত করিতে পারে, তাহা চেতন। হিন্দুর জাতি চেতন, কারণ শুনিতে পাই, অমুকের জাতি গিয়াছে। কিন্তু কাহার জাতি আসিয়াছে কি না, শুনি নাই। সুতরাং জাতি কেবল যাইতে পারে, আসিতে পারে না, অতএব ইহা অৰ্দ্ধ সচেতন। মুসলমান ও খ্রীষ্টানের জাতি যায়ও না, আইসেও না, সুতরাং তাহা অচেতন। আবার হিন্দুজাতির মধ্যে উদ্ভিদও অনেক আছে; কেহ কেহ বলেন, অমুক ভূঁইফোড়।

এ প্রবন্ধে আমার উদ্দেশ্য, এই অৰ্দ্ধচেতন জাতিটাকে একেবারে অচেতন করিয়া ফেলা, যেন জাতি আর না যায়, ও না আসে। জাতি যে যায়, তাহার কোন প্রমাণ নাই। যাহার জাতি গিয়াছে, তাহার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ, ওজন কিছুই কমে না। নাক মুখ কোন অঙ্গের বিকৃতি হয় না। স্বভাব চরিত্রের পরিবর্ত্তনও হয় না, সুতরাং কি বস্তু তাহার শরীর হইতে গেল, তাহা কেহ আমায় বলিতে পার? যদি বল, বিদ্যুৎ চলিয়া যায়, তাহার কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দেখাইতে পার কি? কারণ, তাহাতে কোন শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি হইতে দেখি নাই।

গত শতাব্দীতে একজন মহাপুরুষ নেতৃস্থানীয় ছিলেন। তাঁহার ন্যায় সুন্দর অবয়ব, গভীর বুদ্ধি, মনোহর চরিত্র, ওজস্বিনী, বাগ্মীতা, ও চিত্তমুগ্ধকর আচার ব্যবহার অন্য কাহারও মধ্যে দেখি নাই, অথচ শুনিয়াছি, তাঁহার জাতি গিয়াছিল। আমি ভাবিতাম, তাঁহার কি গিয়াছে? তবে ইহা বুঝিয়াছি যে, তাঁহার যাহা গিয়াছে, তাহা অতি সামান্য, কিন্তু তাঁহাতে যাহা আসিয়াছে, তাহার তুলনা নাই। সুতরাং এরূপ জাতি যাওয়া ভাল কি মন্দ, কেহ আমাকে বুঝাইতে পারেন কি? আমি এই অনুভব করিলাম, যদি তেমন লোক আমাদের সমাজে ও জাতি মধ্যে থাকিতেন, তবে আমাদের জাতির গৌরব বাড়িত, বরং তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া আমরা অতি হীন হইয়া পড়িয়াছি। একজনের কথা বলি কেন? আমাদের জাতির মধ্যে যাঁহারা মহাপুরুষ, তাঁহাদের সকলেরই জাতি গিয়াছিল। রামমোহনের জাতি গিয়াছিল, দেবেন্দ্রনাথের জাতি গিয়াছে, কেশবচন্দ্রের জাতি গিয়াছিল, কৃষ্ণবন্দ্যো ও মাইকেলের জাতি গিয়াছিল, কালীচরণের জাতি গিয়াছে, সুরেন্দ্রনাথের জাতি গিয়াছে। স্মরণীয় লোকের মধ্যে এক বঙ্কিমচন্দ্রের জাতি ছিল, কিন্তু প্রায় যাদশাপন্ন। সংহিতাকার বিদ্যাসাগরের জাতি কেহ বলে ছিল, কেহ বলে, গিয়াছিল।

তবে বল দেখি, জাতি যাওয়াই ভাল, না থাকা ভাল। তুমি রামমোহন, কেশবচন্দ্র, বিদ্যাসাগর হইতে চাও, না ঐ কুটীরনিবাসী, সৰ্ব্বদা জড়সড়, ওকে ছুঁইওনা, ওর খাইও না, ওস্থানে যাইও না, ওকথাটী মুখে আনিও না, ঐ তুমি অমুকের ছায়া মাড়াইলে, যা সর্ব্বনাশ হইল, এইরূপ ছুতছুতে খুৎখুতে হতে চাও? তুমি হয়ত ভাবিতেছ, এ তিন মহাত্মার মত হইবে। কিন্তু ঐ দেখ, ঐ যে জন্মান্ধ চলৎ-শক্তি-

বিহীন, ভীরু, সদাশয়, কে কি বলে, এই ভয়ে আড়ষ্ট, যে অচল সমাজের দাস, সে বলিবে তুমি নরাধম, তোমার ঐরূপ ছুৎছুতে হওয়াই উচিত। কারণ, উহাদের জাতি নাই। যাঁহারা জাতীয় উন্নতির সোপান, দেশ দেশান্তে গমন করিয়া অমূল্য রত্নে যাঁহারা এ জাতিকে, এ সমাজকে বিভূষিত করিতে চাহিয়াছিলেন, যাঁহারা রঙ্গভূমির দুঃখ দুর্দ্দশা দেখিয়া তাহার দুঃখ দূর করিতে প্রাণোৎসর্গ করিয়াছিলেন, যাঁহারা ধর্ম্ম ধনে জাতি ও দেশকে অলঙ্কৃত করিতে চাহিয়াছিলেন, সংক্ষেপে যাঁহারা দেশের গৌরব, দুর্দ্দিনের অবলম্বন, সৌভাগ্যের নেতা, পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার আকর, যাঁহাদের নামে লোকে আমাদিগকে চিনে, যাঁহাদের পাণ্ডিত্যে আমাদের জাতি দেশ দেশান্তরে গৌরবান্বিত, তাঁহাদের সকলেরই জাতি গিয়াছিল।

সুতরাং ইহাই সিদ্ধান্ত যে, জাতি নামক একটী পদার্থ সাধু, ধার্ম্মিক, কর্ম্মবীর, স্বদেশহিতৈষীর থাকে না, হীন কাপুরুষের সম্বল, এবং কাপুরুষই জাতির একমাত্র অবলম্বন। তাই বলি ভাই, যদি বড় হতে চাও, দেশোদ্ধার করিতে চাও, মাতৃভূমির দুঃখ দূর করিতে চাও, দেশ বিদেশে গমন করিয়া শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন, রাজনীতি সমাজনীতিতে মাতৃভূমির মুখ উজ্জ্বল করিতে চাও, তবে জাতি ছাড়। জাতি থাকিতে কিছু হবে না। কবে কোন্ সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্ম্মনৈতিক সংস্কার হইয়াছে, অথচ জাতি যায় নাই? হায়, যাঁহাদের মনে মনে পূজা করি, আদর্শ বলিয়া মনে করি, যাঁহাদের কলম স্পর্শ করিয়া জীবনকে ধন্য মনে করি, যাঁহাদের নাম উচ্চারণ করিলে আত্মাকে উন্নত বলিয়া মনে করি, তাঁহাদের কাহারও জাতি নাই। সুতরাং আমরা জাতি চাই না, তাঁহাদের চাই।

আর ভাই জাতি, তোমার অক্ষয় স্বর্গ লাভের পূর্ব্বে তোমাকে একটী সদুপদেশ দিতে চাই। তুমি ওরূপ খুৎখুতে ছুৎছুতে অবস্থা ছেড়ে দাও। বহুপুরুষ পর্য্যন্ত তুমি ও আমরা একত্র আছি, ছাড়িতে একটু মমতা জন্মে। তাই বলি, একটু উদার হও, কুম্ভকারের মেটে-হাঁড়ির ন্যায় পড়িলেই ভাঙ্গিও না। রবরের ন্যায় স্থিতি-স্থাপক হও, যেন সহস্র আঘাতেও তোমার কিছু না হয়। আমাদের পাকা জাতি হও, যেন ইংলণ্ড, আমেরিকা, যাপান, কোথা গেলেও না ভাঙ্গে। যেন খাদ্য, বিবাহ, মত, ধর্ম্ম, কিছুতেই না যাও। ভাই, একটী কথা ভেবে দেখ, যদি দেশের গৌরব সকলেই চ'লে যায়, তবে তুমি কি নিয়ে থাকিবে? তাই বলি, একটু স্থিতিস্থাপক হও। তোমার মধ্যে ত শাক্ত, বৈষ্ণব, দুই বিপরীত সম্প্রদায় আছে, একজন মদ মাংস খায়, একজন শাকপাতা খায়, এক জন নারী জাতিকে মা বলে, আর একজন বলে, নারী মাত্রেই প্রেমময়ী রাধা, পুরুষ মাত্রেই শ্রীকৃষ্ণ। অথচ সব একজাতি, তুমি সবকে এক করে রেখেছ। তবে ব্রহ্মপন্থী, খ্রীষ্টপন্থী, আল্লাপন্থীকে কেন ছাড়িয়া দেও? বল না কেন যে, কৃষ্ণবন্দ্যো, কালীচরণ খ্রীষ্টপন্থী ব্রাহ্মণ, কেশবচন্দ্র, রামমোহন, শিবনাথ, ব্রহ্মপন্থী বৈদ্য ও ব্রাহ্মণ, গিরিশকান্ত আল্লাপন্থী ব্রাহ্মণ, আমারই আপনার। এমন শক্ত হও যে, আহার বিহারে না যেতে হয়। একজন ব্রাহ্মণ খ্রীষ্টানের

মেয়ে বিবাহ করিল, তথাপি সে ব্রাহ্মণ, একজন হিন্দু মুর্গী থাইল, তথাপিও সে হিন্দু। তুমি এমনি করে আমাদের হাতে চিরদিন থাকৃতে পারবে কি? যদি পার, ভাই চিরদিন সঙ্গে থাক, বাস্তবিক তোমার গৌরব, পূর্ব্ব পুরুষের গৌরব, সেই অতীত স্মৃতি আমরা ছাড়িতে চাইবনা। আর যদি না পার, তবে হে কুম্ভকারের মৃণ্ময় কলসী, ঐ চির পরাধীনতার সুশৃঙ্খল রূপ দড়ী দিতেছি, গলায় দিয়া অতল জলে ডুবিয়া মর। আমরা তোমার সপিণ্ডকরণ করিয়া উদ্ধার করিয়া দেই।

শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত।

উপেক্ষা ও পিপাসা।

টাকা ও যশ, মানবের নিয়ন্তা,—মনুষ্যের পরিচালক। কিসে টাকা বাড়িবে, কিসে যশ অর্জ্জিত হইবে, মানুষের সদা এই চেষ্টা। টাকা ও যশ, মানুষকে ভেড়ার পালের ন্যায় সদা চালাইতেছে। এই দুই শক্তির নিকট মানুষ চির-অবনত-মস্তক।

আমি কত লোকের কথা জানি, তাঁহারা আর কিছু চান না, চান কেবল টাকা ও যশ। আমি কত লোকের কথা জানি, তাঁহারা অর্থের দ্বারা ধার্ম্মিক, হিতৈষী, নেতা, কত কত জনকে ক্রয় করিয়া পদতলে রাখিতেছেন। টাকার জন্য যাহা করিতে বল, তাঁহারা অম্লানবদনে তাহা করিবেন এবং যশের কুহক দেখাইয়া তাঁহাদিগকে যে পথে লইয়াযাইতে চাও, তাঁহারা উল্লাসে সেপথে যাইবেন, সুনীতি, কুনীতি, ধর্ম্ম অধর্ম্ম কিছুই গণনা করিবেন না। দিন দিনই পৃথিবীর গতি এই দিকে অধিকতর ধাবিত হইতেছে। দিন দিনই পৃথিবী দুর্নীতিতে ডুবিতেছে। পৃথিবীর অবস্থা কেন এই রূপ হইল, ধর্ম্ম কর্ম্ম সব লোপ পাইতেছে কেন, সে তত্ত্ব কেহই রাখিতে চান না, চান কেবল, কিসে টাকা বাড়িবে, কিসে যশ বাড়িবে। বড়ই শোচনীয় অবস্থা!!

যাহার ঘরে যত টাকা, তাহার তত অপরাধ উপেক্ষিত। টাকায় ব্যভিচারী সমাজে পূজ্য ও গণ্য, টাকায় নরহন্তা মহা গরীয়ান ধার্ম্মিক, টাকায় পৃথিবীর সকল কুকর্ম্ম, সুকর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। তুমি যত কেন ইহার বিরুদ্ধে বল না কেন, কেহই তোমার কথা শুনিবেন না, তোমার ধর্ম্মের কথা, পুণ্যের কথা চির-উপেক্ষিত, চির-নিন্দিত। সকল লোক এক পক্ষে, তুমি একাকী কতক্ষণ যুদ্ধ করিতে পারিবে? বাইবেল, কোরাণ, গীতা, ভাগবতের অমূল্য উপদেশ এখন বিস্মৃতিতে নিমগ্ন, এখন চতুর্দ্দিকে কেবল "টাকা টাকা" রব ধ্বনিত হইতেছে। ধার্ম্মিক বল, প্রচারক বল, টাকায় ক্রীত হন না, আপন মত পরিত্যাগ করেন না, এরূপ লোকের সংখ্যা বড় কম। দিন দিন তাঁহাদের সংখ্যা আরো কমিয়া যাইতেছে। চিন্ময়ের রাজ্যে জড়বাদিতার প্রাধান্য সর্ব্বত্র ঘোষিত হইতেছে। দুর্দ্দিন ঘনাইয়া আসিতেছে।

চাকচিক্যময় আসুর শক্তির নিকট চিরদিনই দেবশক্তি এজগতে পরাস্ত হইয়াছে। যত ধর্ম্ম, তত জয়, মহাভারতের এই অমূল্য কথা চিরদিনই উপেক্ষিত। মহা-

পুরুষেরা চিরদিনই স্বদেশে নিন্দিত এবং পরিত্যক্ত হইয়াছেন। ধর্ম্মেতিহাসের প্রধান বিশেষ ঘটনা এই--মহাপুরুষদিগকে চিরদিনই জীবিত কালে স্বদেশে উপেক্ষিত, অনাদৃত থাকিতে হইয়াছে। ঈশা ধনীর নিন্দা করিতেন, ধনীরা তাঁহার শত্রু হইল, চৈতন্য ধনী দেখিতে পারিতেন না, তাঁহাকে স্বদেশ পরিত্যাগ করিতে হইল। মহাপুরুষ ঈশা, শ্রীচৈতন্য ধনীর বিরুদ্ধে কত কথা বলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের অমূল্য কথা শূন্যে মিলাইয়া গিয়াছে, পৃথিবীতে কোন স্থায়ী ফল ফলে নাই। ঈশার শিষ্যেরা আজ অম্লান চিত্তে ধনের অনুসরণ করিয়া কত অন্যায় কাজ করিতেছেন। চৈতন্যের উপাসকেরা সন্ন্যাসের স্থলে এখন কত কি করিতেছেন, সকলেই জানেন। দেবশক্তি কোন্ অন্ধকারে লুকায়িত,—পৃথিবীর ইতিহাস পাঠে তাহার খোঁজ পাওয়া বড়ই কঠিন। সাম্যবাদীর দুর্জ্জয় নেতা বুদ্ধ, রুসো ও ভল্টেয়ারের প্রচারিত মহাসত্য সকল কোথায়, কোন্ অন্ধকারে বিলীন হইয়াছে,কে বলিতে পারে? আভিজাত্য দুর্জ্জয় প্রভাবে সব পরাস্ত করিয়াছে।

জোর যার মুলুক তার, এদেশের প্রাচীন প্রবাদ; এখন পৃথিবীর প্রবাদ এই—ধন যার হস্তগত, পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ সে। এই জন্যই লোক দিবারাত্রি এই পথে প্রধাবিত। কু বা সু—গণনার যোগ্য নয়—যেন তেন প্রকারে অর্থাগম হইলেই হইল!

অনেকে বলেন, অর্থ ভিন্ন পৃথিবীর কোন কাজই হয় না;—ব্যবসা বল, বাণিজ্য বল, সংসারের সুখ বল, শান্তি বল, সকল বিনিময়ের মূল অর্থ। উন্নতি বল, শ্রী বল, অর্থ ভিন্ন কিছু হয় কি? এই কথা অনেকে বলেন। উন্নতি এবং শ্রী কাহাকে বল? অন্তরশূন্য বাহিরের চাকচিক্য যদি উন্নতি ও শ্রী হয়, তবে অর্থ ভিন্ন তাহা হয় না সত্য, কিন্তু যদি পুণ্য পবিত্রতা, প্রেম ধর্ম্ম, শান্তি একতা এই সকলকে উন্নতি ও শ্রী বল, তাহার সহিত ধনের কোনই যোগাযোগ নাই। তুমি সংসার চাও, না স্বর্গ চাও? গার্গী বলেন, "যাহা দু দশ দিনের, তাহা লইয়া কি করিব, যাহা চিরদিনের, তাহাই চাই।" সংসার দু-দশ দিনের—আজ আছে, কাল নাই—যেন পদ্মপত্রের জল, যেন মেঘের কোলে সৌদামিনী, যেন ফুল্ল-কুসুমে ক্ষণিক সৌরভ—এই আছে, এই নাই। যাহা এই আছে, এই নাই, তাহা লইয়া কি হইবে? মহাপুরুষেরা এই কথা বলেন, কিন্তু সে কথা শুনে কে? পতঙ্গ যেমন ক্ষণিক সুখের লালসায় অগ্নিতে ঝাপাইয়া পড়িয়া প্রাণ হারায়, তেমনি মানুষ, কি জানি কি ক্ষণিক সুখের জন্য, চিরকালের ধর্ম্মকে উপেক্ষা করিয়া টাকা টাকা করিয়া মাতিতেছে, ডুবিতেছে, মরিতেছে। এইরূপে খাটী ধর্ম্ম চিরদিন উপেক্ষিত হইতেছে।

আমি ভাবিতেছিলাম,উপেক্ষাই কি ভাল নহে? ভাবিতেছিলাম, আত্মার নির্জ্জন একাকীত্বের অন্তঃপুরে মৃতবৎ পড়িয়া থাকাই কি ভাল নহে? ভাবিতেছিলাম, মরিয়া, মরিয়া,অণু অণু হইয়া জগতের হইয়া যাওয়া ভাল নহে কি? আহা, তাহার অপেক্ষা কি সুখ অধিক, উপেক্ষায় যে সুখ! সে আমাকে চায় না;—ঘৃণা করে, নিন্দা করে, তুচ্ছ করে, আমি তাহার চক্ষের শূল, আমাকে গালাগালি না দিলে তাহার দিন যায় না,মুহূর্ত্ত যায় না, সে আমার অনিষ্টের

জন্য কতই উপায় উদ্ভাবন করিতেছে, কত রূপে, কত ভাবে আমার দোষ খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহির করিতেছে! আহা, সে আমার কি বন্ধুর কাজ করিতেছে গো! সে যদি এই রূপ না করিত, আমিত অন্ধ হইয়া—নিজের দোষের প্রতি চির-অন্ধ হইয়া থাকিতাম, আমার প্রাণে উন্নতির পিপাসা জাগিয়া উঠিত না। আহা, সে যদি আমার কলঙ্ক না খুঁজিত,—কলঙ্ক না রটাইত, হায়, আমি যে অহঙ্কারে আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া মরণের পথে চলিতাম! সে আমার যশের পথে যেদিন কালী ঢালিল—সেই দিন হ'তে বুঝিলাম যে, সে আমার পরম বন্ধু। সে যেদিন আমার অর্থলাভের পথে কণ্টক রোপণ করিল, আমি সেইদিন বুঝিলাম, সে আমার পরম সুহৃদ্। যে টাকা ও যশের পথে যাইয়া কত কত লোক মারা গিয়াছে, আমিও ত সেই পথেই অবিচারিত ভাবে যাইতেছিলাম! যে পথে যাইয়া যাইয়া কত লোক মারা যাইতেছে,আমিও ত সেই পথই খুজিতেছিলাম! মধ্যপথে হে নিন্দুক, তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল, তুমি আমার যশের পথে কালী ঢালিলে,ঐশ্বর্য্যের পথে কণ্টক রোপণ করিলে, আমার গতি ফিরাইয়া দিলে। আমি পূর্ব্বে বুঝি নাই, এখন বুঝিতেছি, তোমার ন্যায়, এ জগতে আমার হিতৈষী বন্ধু আর নাই। তোমাকে শত শত নমস্কার। তুমি আমার মনের গতি ফিরাইয়া দিলে—আমাকে এমন একটা অনন্ত পথ দেখাইলে—যে পথে যাইয়া দেখিলাম, অনন্ত-সুখ-সোপানের দ্বার উন্মুক্ত। সুতরাং হে নিন্দুক, তুমিই ধন্য, তুমিই ধন্য। উপেক্ষাই আমার প্রাণে উন্নতির পিপাসা জাগাইয়া দিয়াছে।

খ্রীষ্টধর্ম্ম জগতে এত আদর লাভ করিতে পারিত না, যদি নিন্দুকের নিন্দা-বাণে ক্ষত বিক্ষত হইয়া খ্রীষ্ট প্রাণত্যাগ না করিতেন। নিন্দুকের প্রতি খ্রীষ্টের ভৎর্সনা পাঠ করিলে কষ্ট হয়, কিন্তু শেষে তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাহারাই তাঁহার ধর্ম্মের সহায়। বুঝিতে পারিয়াছিলেন, যাঁহারা সহায়,—তাঁহাদিগের মধ্যেই যুডাস স্কেরিয়ট ছিলেন। যুডাস্ স্কেরিয়টের নিন্দায় জগৎ প্লাবিত বটে, কিন্তু তুমি বলত, খ্রীষ্টের দেহত্যাগ না হইলে তাঁহার "সত্য" জয়যুক্ত হইত কি? সুতরাং তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে, যুডাস্-স্কেরিয়ট এজগতের পরম বন্ধু। পাষাণ-স্তূপ সম্মুখে রাখিয়া, যেমন বিশ্বপতি, ঝরণার বল বৃদ্ধি করেন, তেমনি, পাপ অসুরদিগকে সম্মুখ-সমরে প্রেরণ করিয়া সাধকের বল পরীক্ষা করিয়া অজেয় শক্তিতে তিনি তাহাকে দীক্ষিত করেন। প্রতিরোধ—উপেক্ষাই প্রকৃত উন্নতির সোপান।

আমি কি ছাই কথা লিখিতেছি?—আমার নিন্দুক, তুমি নও, সে নয়, আমার নিন্দুক আমার অন্তরাত্মা। আমার অন্তরাত্মা—অতিশ্রান্ত ভাবে আমাকে তিরস্কার করিয়া অস্থির করিয়া তুলিতেছে এবং বলিতেছে—"তুই হলি কি?" আমার কোন কাজেই সে সন্তুষ্ট নয়।

আমি কি ছাই কথা লিখিতেছি?—আমার প্রধান নিন্দুক, তুমি নও, সে নয়,—আমার অন্তরাত্মা নয়, আমার প্রধান নিন্দুক আমার বিবেক। সে প্রতিনিয়ত আমার মাথায় কলঙ্কের মুকুট পরাইয়া ঘোষণা করিতেছে, এবং বলিতেছে—"তুই হলি কি?"

আমি কি অসার ছাই কথা লিখিতেছি?

—আমার প্রধান নিন্দুক তুমি নও, সে নয়, আমার অন্তরাত্মা নয়—আমার বিবেক নয়,আমার প্রধান শত্রু—আমার অন্তরদর্শিনী আদ্যাশক্তি মা! মা আমাকে প্রতিনিয়ত তিরস্কার করিয়া বলিতেছেন, "তুই হলি কি?"

আমার মা আমার কোন কার্য্যেই পরিতুষ্ট নহেন। আমি আজীবন সংযমের পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইলাম—আমার মা বলেন,—"তোর কিছুই সংযম-শিক্ষা হয় নাই, আরো অগ্রসর হ।" আমি বাল্যকাল হইতে সেবাব্রত গ্রহণ করিয়া কত খাটিলাম, যাহাকে পাইলাম, তাহারই কিছু উপকার করিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তবু আমার মা বলেন, "তোর কিছুই সেবা-ব্রত পালন করা হয় নাই, তাই আমি, তুই যার উপকার করিয়াছিস্, তাকেই তোর বিরুদ্ধে লাগাইয়া দিয়া দেখিতেছি,তুই সেবা-ব্রত লইয়া অগ্রসর হইতে পারিস্ কি না? কিন্তু কই পারিলি?" আমি সারাদিন খাটিয়া খাটিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া মায়ের নিকট যখন উপস্থিত হই, আমার মা অমনি বলেন, "না—তুই কিছুই খাটিতে পারিস্ নাই।" আমি কঠোর হইতেও কঠোর হইয়া পবিত্রতা অর্জ্জন করিতে চেষ্টা করিলাম—আমার মা কিছুতেই সন্তুষ্ট হন না, তিনি বলেন—"তোর কিছুই হয় নাই?" আমি ঘোর বিপাকে পড়িয়াছি। আমার জীবন শেষ হইয়া আসিল—এখন করি কি? আমি ভালবাসার বাজারে ঢুকিয়া অবিভেদে যাহাকে পাইলাম, কোল দিবার জন্য চেষ্টা করিলাম, কিন্তু যখনই মায়ের কাছে গিয়াছি, তখনই আমার মা বলিয়াছেন, —"তোর কিছুই প্রেমসাধন হয় নাই?" আমি মহা অশান্তির মধ্যে পড়িয়াছি। যত চেষ্টা করি, যত অগ্রসর হই—আমার মা বলেন—"তোর কিছুই হয় নাই।" এ এক মহা সমস্যার মধ্যে পড়িয়া গিয়াছি! আমি তাঁহার কৃপায় যে ধন পাইয়াছিলাম,সব বিলাইয়া, অন্যের সেবার জন্য ঢালিয়া দিয়াছি। আমি যে যশ পাইয়াছিলাম, ইচ্ছা করিয়া সব নিবাইয়া দিয়া পরনিন্দাকে অঙ্গের ভূষণ করিয়া ফকীরি লইয়াছি;—আমার মা তবুও বলেন—"তোর ধন ও যশ-স্পৃহার সমাপ্তি হয় নাই—কিছুই হয় নাই।" অনন্তের অন্বেষণে বাহির হইয়া আমি অনন্ত পিপাসার আবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছি। মহাত্মা কেশবচন্দ্র বলিতেন, "যত অগ্রসর হইবে, ততই পাপ বোধ বাড়িবে, ততই দেখিবে, চতুর্দ্দিকে পাপ কিলবিল করিতেছে।" বাস্তবিকও তাহাই হইয়া থাকে। যত অগ্রসর হওয়া যায়, ততই অনন্তের পিপাসা বাড়ে—ততই আরো ভাল, আরো ভাল হইতে সাধ যায়। আমার মা আমাকে কি হইতে বলেন, আমি জানিনা, কিন্তু আমার সকল সাধনা পরাস্ত হইয়াছে, আমার বাসনা শেষ হয় না, পিপাসার নিবৃত্তি হয় না। দিবারাত্রি যতই তাঁহার পরিতুষ্টির জন্য চেষ্টা করিতেছি, আমার মা যেন ততই অসন্তুষ্ট। তুমি সন্তুষ্ট নও, সে নয়, ও নয়—তাহাতে আমার কি? তিনি যদি সন্তুষ্ট হইতেন, আমি ডঙ্কা মারিয়া ভবপারে চলিয়া যাইতে পারিতাম। বন্ধু, তুমি আমায় বলিতে পার কি, কিসে মায়ের পরিতুষ্টি পাওয়া যায়?

আমার মা বলেন,—"তুই ছুটে আয়, তুই ছুটে আয়, আমার বুকের ধন, ধনমানের মায়া ছাড়িয়া আমার বুকের মধ্যে আয়। এ সংসার তোর লক্ষ্য নয়, তুই যশ নিন্দার

হট্টগোলে পড়িয়া বৃথা মারা যাইতেছিস্—ঐ কুহক পরিত্যাগ করিয়া ছুটে আয়, ছুটে আয়। তোর বাসনা কামনা এখনও ধনের দিকে, মানের দিকে—এখনও ভেদময় অহঙ্কার-আত্মাভিমানময় রাজ্যে তুই পড়িয়া রহিয়াছিস্—ওসব ছাড়িয়া, সব নির্ব্বাণ করিয়া, খোলা প্রাণে আমার বুকের ভিতর চলে আয়? তোর ভয় কি, চিন্তা কি? তুই জগতের নিকট কিছু প্রত্যাশা না রাখিয়া আজও জগতের জন্য প্রাণ দিতে শিখিস্ নাই, তাই আমি অতি দুঃখে তোকে ডাকিতেছি, তুই চ'লে আয়? যে প্রত্যাশা রাখে, সে আমার পরিতুষ্টি পাইবে না—যে কামনা রাখিয়া ধর্ম্মসাধন করে, সে কখনও আমার পরিতুষ্টি পাইবে না; যে পৃথিবীর ধনৈশ্বর্য্য, যশ মান লাভ করিয়া বড় হইতে চায়, সে কখনও আমার অহেতুকী প্রেমময় উন্নতির রাজ্যে পৌছিতে পারিবে না,—তুই কামনা-বর্জ্জিত, বাসনা-বর্জ্জিত, নির্লিপ্ত, অনাসক্ত, নির্ব্বাপিত হইয়া আমার বুকের ভিতরে আয়। মা বলেন, তোর শরীর পুড়ে যা'ক, কামনা পড়ে যা'ক, বাসনা পুড়ে যা'ক—সর্ব্ববিসর্জ্জিত-হওয়া তোকে আমি চাই। একটু, একটু, একটুতে হইবে না, আমি তোকে সম্পূর্ণ চাই।"

তাঁহার যে আদেশ আমার সম্বন্ধে, তাহা তোমার সম্বন্ধে, তাহা ভারতের সকলের সম্বন্ধে খাটে। মায়ের এই মহা আদেশ শুনিয়া আমি বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছি, এখন করি কি, উপায় কি? দিনে দিনে দিন শেষ হইয়া আসিতেছে, ক্রমেই দারুণ পিপাসা বাড়িতেছে, ছটফট করিতেছি—এখন করি কি, উপায় কি? এতদিন পরে বুঝিয়াছি, উপেক্ষা, অনন্ত শক্তি বাড়াইবার অব্যর্থ মহৌষধ; এতদিন পরে বুঝিয়াছি, উপেক্ষা, অনন্তের পথের একমাত্র সোপান;—এত দিন পর বুঝিয়াছি, উপেক্ষাই অনন্ত চিন্ময়ের প্রেম-পিপাসা জাগাইবার মূলমন্ত্র। এত দিন পর বুঝিয়াছি, উপেক্ষাই বিবেকের গুপ্তচর। উপেক্ষা—নিয়ামক, চালক, রক্ষক, বোধ হয়, সকলই। উপেক্ষা ভিন্ন মানবের মনুষ্যত্ব, জীবের জীবত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না।

মানুষ শত সহস্র বার মরিলে, তবে নবজীবন, অনন্ত জীবন পায়। মৃত্যুর রাজ্য অতিক্রম করিয়া মৃত্যুঞ্জয়ের রাজ্যে পৌছিতে হয়। খ্রীষ্ট মৃত্যুকে চুম্বন করিয়া অমর হইয়াছেন, শ্রীচৈতন্য আত্মবিসর্জ্জন দিয়া অমৃতে পৌছিয়াছেন, শাক্যসিংহ নিরঞ্জন-তীরে নির্ব্বাণ লাভ করিয়া তবে নিত্যানন্দ লাভ করিয়াছেন। ভাই তুমি মরিতে ভয় পাও কেন? ভাই, উপেক্ষিত হইলে তোমার চক্ষে জল আসে কেন? আকাশে ঘন মেঘ, বায়ূত্তোলিত ভীষণ তুফানে জীবন-তরী ডুবুডুবু হইয়াছে—ভয় কি? ভবকাণ্ডারী সম্মুখে, তিনি সহায়, ভয় কি?

ইটালির নবজীবনের কারণ, অষ্ট্রিয়ার উপেক্ষা এবং ম্যাটসিনি গ্যারিবল্ডির জীবন-ত্যাগ; জর্ম্মাণির নবজীবনের কারণ ফ্রান্সের উপেক্ষা এবং বিসমার্কের আত্মবিসর্জ্জন; এমেরিকার নবজীবনের কারণ ইংলণ্ডের উপেক্ষা ও গারফিল্ডের আত্মবিসর্জ্জন; আর আজ কাল জাপানের নবজীবনের কারণ, রুসিয়ার উপেক্ষা এবং দেবমূর্ত্তি মিকাডোর আত্মত্যাগ মন্ত্র। ভারত বড়ই উপেক্ষিত—আত্মত্যাগ-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া হে বীর, তুমি একবার উত্থিত হও ত দেখি, এ ভারত জাগে কি না? ভারত আজ কাল সর্ব্বত্র যেরূপ উপেক্ষিত, লাঞ্ছিত, নিষ্পেষিত

হইতেছে,—এ ভারত কি অনন্ত উন্নতির পিপাসায় পিপাসিত হইয়া আত্মত্যাগ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া নবজীবন পাইবে না? ভবিষ্যতের অন্ধকারময় রাজ্যে কি আছে, কে জানে! উপেক্ষা এদেশের যথেষ্ট হইয়াছে—এখন বাকী কেবল অনন্ত পিপাসা। আয় অনন্ত উন্নতির পিপাসা, তুই এই জাতিকে মরণের ভিতর দিয়া অনন্ত নবজীবনের পথে লইয়া যা। সামান্য পিপীলিকা আঘাত পাইলে জাগিয়া উঠে, আর এত উপেক্ষিত ভারত জাগিবে না?

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

২৮। চিকিৎসা-বিধান।—শ্রীচন্দ্রশেখর কালী প্রণীত। হোমিওপেথিক মতে প্রাকটিস অব মেডিসিন, ৫ খণ্ড। আমরা এই সুবৃহৎ গ্রন্থখানি উপহার পাইয়া যারপর নাই আনন্দিত হইয়াছি। চিকিৎসা রাজ্যে হোমিওপেথি যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। ডাক্তার চন্দ্রশেখর এদেশের একজন প্রতিভাশালী, চরিত্রবান চিকিৎসক, একাধারে প্রতিভা, অমায়িকতা, ও বহুদর্শিতা, কাপট্য-বিহীনতা তাঁহাকে অলঙ্কৃত করিয়াছে। তাঁহার রচিত পুস্তক সকল বাঙ্গালা ভাষার অমূল্য সম্পত্তি বিশেষ। ভাষার উপর তাঁহার প্রভূত অধিকার। চিকিৎসা-বিধান ৫ খণ্ড অতি সুন্দর পুস্তক। এরূপ বিস্তৃত ভাবে বিষয় বিবৃত হইয়াছে যে, সকলেই এই পুস্তক সাহায্যে চিকিৎসা করিতে পারিবেন।

২৯। যজ্ঞভস্ম।—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রণীত, মূল্য ১৲। বিজয় বাবু নব্যভারত-পাঠকের নিকট সুপরিচিত; বিশেষতঃ এই পুস্তকের কোন কোন কবিতা নব্যভারতে প্রকাশিত হইয়াছিল, এইজন্য, আমরা অধিক কথা লিখিতে সঙ্কুচিত; কিন্তু একথা না লিখিলে সত্য গোপন করা হয় যে, বাঙ্গালা-ভাষা আজ কাল যাঁহাদিগকে লইয়া গৌরব করিয়া থাকেন, বিজয় বাবু তাঁহাদের মধ্যে একজন। তাঁহার প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী, যে বিষয়ে তিনি লিখিতে চেষ্টা করেন, তাহাতেই কৃতকার্য্য হন। কিন্তু তাহা হইলেও, কবিতাই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য। তাহাতেই তিনি বিশেষ পারদর্শী। তাঁহার মধুময়ী কবিতা যে বাঙ্গালা ভাষায় অক্ষয় হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই পুস্তকের যে কবিতা নব্যভারতে প্রকাশিত হয় নাই, এমন দুটী কবিতা ইহাতে তুলিয়া দিলাম,—তাহাতেই পাঠকগণ তাঁহার ক্ষমতার পরিচয় পাইবেন।

মুষ্টিভিক্ষা।

১

মুষ্টি ভিক্ষা চাই রাণী-মা, মুষ্টি ভিক্ষা চাই।
হাজার রাজা উজীর ধোরে
দয়া এনে ভিক্ষা কোরে
করেছ যে গরীবখানা, সেথা নাহি যাই।
কোথা সেথা করুণ আঁখি?
মা বলিয়ে কারে ডাকি?
মাইনে-করা দাতা সেথা বিষম বালাই।
মুষ্টিভিক্ষা চাই রাণী-মা মুষ্টি ভিক্ষা চাই।

২

ওমা তোমার পুণ্যদৃষ্টি
অন্ন দুটী বড় মিষ্টি।
রাঙ্গা হাতে অন্নপূর্ণা, দানা দেহ খাই।
ছেলের সাথে চাল সুধা,
আধপেটাতে মেটে ক্ষুধা,
দয়া মাখা অন্নখেয়ে ধন্য হোয়ে যাই।
মিষ্টি-ভিক্ষা চাই রাণী-মা, মুষ্টি ভিক্ষা চাই।

৩

হাড় জিরজির্ গায়ে ধূলো
ঐ যে আমার ছেলে গুলা,
তোমার যত সোণার চাঁদ, ওদেরে দেখাই;

বড় খুসী হয়গো দেখে,
কত গল্প করে ডেকে।
তোমার সুখে মাগো মোরা দুঃখ ভুলে যাই।
দৃষ্টি-ভিক্ষা চাই রাণী-মা, মুষ্টি ভিক্ষা চাই।

৪

তোমার গৃহ-কানন খানি
চক্ষু জুড়ায় দেখ্‌লে রাণী!
প্রাণের টানে নিত্য আমি ছুটে আসি তাই।
বাসি রাঙ্গা ফুলে নানা
পূর্ণ আছে কাঙাল খানা।
টাট্‌কা তোলা দয়া-তরুর কুসুম হেথা পাই।
তুষ্টি ভিক্ষা চাই রাণী-মা, মুষ্টি ভিক্ষা চাই।

৫

দুঃখের উপর দুঃখ নানা,
গড়ো না তায় দয়াখানা।
ঘুরে ঘুরে তোমার দোরে বড় সুখ পাই।
সোনার ঘরে লক্ষ্মী মাগো,
ধন-পুত্র নিয়ে থাকো।
ভিক্ষা নিতে এসে দুটী চক্ষে দেখে যাই।
ইষ্ট ভিক্ষা চাইনা তোমার, মুষ্টি ভিক্ষা চাই।

এই কবিতাটীতে বিজয় বাবু দয়া-জগতের যে অমৃতময় ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন, বাঙ্গালা ভাষায় তাহার তুলনা নাই।

রমণী।

অঙ্গে তরল কাঁচা সোণা, চোখে মাণিক জ্বলে,
দুধে মাজা হীরার ঝলক্ কোমল কণ্ঠ-তলে
পরি সোণা মাণিক হীরা, দেখায় যেন রাণী—
সবার চেয়ে সেরা তারি উজল দেহখানি।
অধরে সিঁদুরে মেঘ, ভোরের অরুণ গালে,
নোখে ফুটি নবরবি ভাতে করজালে।
মুখে জ্বলে পূর্ণ ইন্দু, চোখে সাঁঝের তারা;
আলো করে দীপ্তিময়ী আঁধার মাথা ধরা।
হাসিতে বসন্ত তার, নিদাঘ তারি মান,
দৃষ্টি ঢালে বৃষ্টি, যাহে স্নিগ্ধ তপ্ত প্রাণ;
গরবেতে শরৎ ফোটে, হেমন্তটী গীতে,
বিষাদে তার অবশ দেহে বিশ্ব কাঁপে শীতে।
সন্তাষণে নিঝর ধারা বহে কলকলে,
আদরে তার মন্দাকিনী কূল ছাপিয়ে চলে;
প্রেমেতে তার, অপার সিন্ধু,—স্বয়ং নারায়ণ
অমৃতের উৎস-তলে করেন শয়ন।
চাও কি তুমি সোণামাণিক,চাও কি মধুর আলো?
চাও কি তুমি ষড়ঋতুর যে টুকখানি ভালো?
চাও কি তুমি মুক্তি নর, নারায়ণে লভি?
লভহ রমণী-প্রেম পাবে তুমি সবি।

এত অল্প কথায় এত সুন্দর এবং গভীর ভাব অতি অল্প বঙ্গকবির কবিতায় দেখা যায়। বিজয় বাবুর কাব্য ঘরে ঘরে আদৃত হউক।

৩০। বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজ।—

শ্রীকৃষ্ণবল্লভ রায় প্রণীত, মূল্য ॥০। আমরা পুস্তকখানি বিশেষ মনোযোগ সহকারে আদ্যন্ত পাঠ করিয়াছি। কায়স্থ বৈদ্য জাতির বিচার লইয়া বঙ্গ প্রদেশে কয়েক বৎসর যে আন্দোলন চলিয়াছে, তাহার সহিত আমাদিগের কোন সহানুভূতি নাই। এদেশের বিভিন্ন জাতি সমূহের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ যতই বাড়িবে, ততই এদেশের অকল্যাণ হইবে। সকল জাতি,সকল দেশীয় লোক এক-প্রাণতায় আবদ্ধ না হইলে এদেশের মঙ্গল নাই। সুতরাং রিজ্‌লি সাহেবের উত্তেজনায় বঙ্গদেশে জাতি-সাধারণের মধ্যে, শ্রেষ্ঠত্ব, অশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য যে বিদ্বেষ-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল,তাহাতে দেশের বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। কিন্তু একথা আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, জাতি সকলের ইতিহাস সংগ্রহের জন্য কয়েক বৎসর এদেশে যে প্রভূত চেষ্টা হইয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালা ভাষার কলেবর পুষ্টি হইয়াছে। বঙ্গীয়কায়স্থ সমাজ-পুস্তক খানি পড়িলে আমাদের উপরোক্ত কথার

সত্যতা সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবে। কৃষ্ণবল্লভ বাবু একজন পণ্ডিত ব্যক্তি, তাঁহার গবেষণা অসাধারণ, ভাষা সরল এবং সুমিষ্ট। এ গ্রন্থ খানি কায়স্থ জাতির ইতিহাস বিশেষ; কিন্তু ইতিহাস বলিলে যে প্রকার কর্কশভাব ও নীরসতার কথা মনে উদয় হয়, ইহাতে তাহা নাই। পুস্তক খানি পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া উঠা যায় না।

এই পুস্তকে যে সকল মত লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা লইয়া মধুসূদন বাবু এবং প্রসন্ন বাবুর মতানৈক্য হওয়ায় বাদ প্রতিবাদ চলিতেছে। এ সকল বিষয়ে সকল মত একরূপ হইবে, আশা করা যায় না। ব্যক্তিগত প্রাধান্য ও হীনতা প্রতিপাদনের অনিবার্য্য চেষ্টার সহিত যদি ভদ্রতা ও শিষ্টতা বজায় থাকে, ভাব সংযত হয়, ব্যক্তিগত বিদ্বেষ প্রকাশ না পায়, তবেই সুখের হয়। দুঃখের বিষয়, তাহা সব সময়ে হয় না। যাহা হউক, সত্য-প্রতিষ্ঠার-ক্ষেত্রে মত-সংঘর্ষণ হওয়া অনিবার্য্য। আমরা, তাহা অসঙ্গত না হইলে, বাধা দিতে ইচ্ছা করি না। সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় মত-সমীকরণের চেষ্টা না করাই ভাল বলিয়া আমরা নিরস্ত হইলাম। পাঠকগণ উভয়ের প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সত্য বুঝিতে চেষ্টা করিবেন। এই পুস্তক বঙ্গীয় কায়স্থসমাজের একখানি অতি সুন্দর ইতিহাস। আশা করি, এ পুস্তকের সর্ব্বত্র আদর হইবে। আশা করি, সকলে ইহা পড়িয়া সুখী হইবেন। সুবৃহৎ পুস্তকের মূল্য ॥০, অতি সস্তা।

৩১। প্রসাদী।—শ্রীকরুণা নিদান বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ।৵০। এখানি একখানি ক্ষুদ্র কাব্য পুস্তক। লেখকের সহিত আমাদের পরিচয় নাই। তিনি যিনিই হউন, তাঁহার কবিতা লিখিবার বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে। কাব্য চর্চ্চা করিলে কালে তিনি সুলেখক হইতে পারিবেন। পাঠকগণের অবগতির জন্য তাঁহার প্রার্থনা কবিতাটী এস্থলে তুলিয়া দিলাম।

প্রার্থনা।

কোথা মৃত্যুঞ্জয়,
এই শ্রান্ত জীবনের অন্তিম আশ্রয়?
ক'দিন এ ভব-কূলে ভ্রমিব তোমারে ভুলে'
হে প্রভু হে বিশ্বরূপ, হে করুণাময়।

যাই যাই করি'
দিন যে ফুরায়ে যায় দয়াময় হরি;
দিয়াছ কাজের ভার, কিছুই হ'ল না তার,
শুধু দুটি শূন্য কর উঠেছে শিহরি'।

দেখিয়াছি আমি
তোমার অমূর্ত্ত মূর্ত্তি দীর্ঘ দিবাযামী।
কম্পিত কলাপ-রাগে ঝিল্লুকের দাগে দাগে
অক্ষয় বরণে আঁকা হে আমার স্বামী।

আমারে ভুলায়
শ্যামল শাখায় ঢাকা সহস্র কুলায়;
ওইখানে মোর ঘর, খুঁজি নে আপন পর,
ফিরি হোথা গোধূলির বিদায়-ধূলায়।

খুলিছি দুয়ার,
সমস্ত অখিলখানি হয়েছে আমার,
খোলা হাওয়া, ফাঁকা মাঠ, বালুকায় ঢাকা ঘাট,
উদার নদীর ধারা সোদর আমার।

এসেছে আলোক,
পড়্ তোরা 'অপরাধ-ভঞ্জনে'র শ্লোক;
প্রক্ষরার ছন্দে ছন্দে হৃদয়ের মৃদুস্পন্দে
জাগুক্ তাপিত প্রাণে অক্ষয় পুলক।

ভারতের রাজা ও প্রজা।

মহাভারতে বর্ণিত আছে যে, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় ক্ষেত্রে সম্মিলিত রাজন্যবর্গের শৌর্য্য বীর্য্য ও ঐশ্বর্য্য দেখিয়া লোকমণ্ডলী যখন ভারতের মহা সমৃদ্ধিতে নিরতিশয় হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল, তখন সুদূরদর্শী ব্যাসদেব দেবর্ষি নারদকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "মহর্ষে, যে সমৃদ্ধি দেখিয়া লোকমণ্ডলী এত আনন্দিত হইতেছে, অচিরাৎ তাহা ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে।" বিনা মেঘে অকস্মাৎ বজ্রাঘাতের আশঙ্কায় নারদ অত্যন্ত সন্দিগ্ধমনা হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মানুষের স্বভাবই এই যে, তাহার চিন্তা যে প্রণালীতে চিরদিন আবদ্ধ, সে সে প্রণালী পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র বিচরণ করিতে চায় না, অথবা সাহস করে না। কি এক অনির্দ্দিষ্ট অনিষ্টের আশঙ্কায় সে ভীত হয়। তাই সূক্ষ্ম-দৃষ্টি-সম্পন্ন মনিষীগণের ভবিষ্যৎ বাণীতে সে সহসা আস্থা স্থাপন করিতে পারে না, বাতুলতা বলিয়া মনে করে। যে প্রধূমিত বিদ্বেষ-বহ্নি কুরুক্ষেত্রে মহাদাবানলে পরিণত হইয়া প্রকৃতির রম্যোদ্যান ভারতকে মহা শ্মশানে পরিণত করিয়াছিল, রাজসূয়ের এই মহা সমৃদ্ধি ও বাহ্য একতার মধ্যেও ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা ব্যাসের সূক্ষ্ম দৃষ্টিকে তাহা অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই! তাই সকলে যখন মহা সমৃদ্ধির স্বপ্নে উৎফুল্ল, দূরদর্শী ব্যাস তখন দেশের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া নীরবে অশ্রুপাত করিতেছিলেন। পাঠক, বর্ত্তমান ভারতের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিবার কি সময় আসে নাই? তবে কই কাহাকেও তো অশ্রুপাত করিতে দেখিতেছি না। সময় আসিয়াছে, কিন্তু হায় ব্যাসের ন্যায় দূরদর্শী মনিষী কোথায়? যখন দেখি, দিল্লীদরবার রূপ রাজসূয় ক্ষেত্রে ভারতের রাজন্যবর্গ নিরন্ন প্রজার শোণিতরূপ অর্থরাশি এক মুহূর্ত্তে ভস্মীভূত করিতেছেন, ভারতের কোষাধ্যক্ষ গৌরবে বুক ফুলাইয়া বলিতেছেন "আমরা এমন ভাবে ভারতীয় সৈন্যদল পুনর্গঠন করিয়াছি, যাহা করিতে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনশালী জাতিও সমর্থ হইবে না," যখন দেখি কন্‌গ্রেস্, কন্‌ফারেন্সে ধর্ম্ম, নীতি, রাজনীতি, সমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য, কৃষিশিল্প ও বাণিজ্যের নব নব আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা লইয়া ভারত সন্তান মাতিয়া উঠিয়াছেন, তখন মনে হয়, আমাদের আবার অভাব কি? আবার যখন বাষ্পীয়যানে এক মাসের পথ একদিনে অতিক্রম করি, যখন দেখি, স্বর্গের সৌদামিনী আসিয়া আমাদের কুলি মুজুরের কাজ করিয়া দিতেছে, যখন ভাবি, বিদেশের সঙ্গে আমাদের কোটী কোটী টাকার বাণিজ্য চলিতেছে, তখন মনে হয়, বর্ত্তমান ভারত সমৃদ্ধিতে যুধিষ্ঠিরের ভারতকেও বুঝি অতিক্রম করিয়াছে। কিন্তু যখন একবার ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখি, কি মূল্য দিয়া এই সমৃদ্ধি ক্রয় করিয়াছি, তখন হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। যখন ভাবি, ভারতের বিশ কোটী প্রজা অনাহারে ও অর্দ্ধাহারে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া অকালে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর করাল কবলে

পতিত হইতেছে, তখন কি এই অন্তঃসার-শূন্য সমৃদ্ধিকে শতবার ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয় না। ভারতের প্রজা দৈন্যের শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছে। ২৮ কোটীর মধ্যে বিশ কোটী চিরদিনই দুর্ভিক্ষ-নদীর কিনারায় বাস করিতেছে, কখন যে নদীর উত্তাল তরঙ্গে পতিত হইয়া প্রাণ হারাইবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই। অথচ রাজপুরুষগণ রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া জগতের সম্মুখে অন্তঃসার-বিহীন সমৃদ্ধির ঘোষণা করিতেছেন, গর্ব্বে বুক ফুলাইয়া জগৎকে বলিতেছেন— 'এই দেখ, আমরা যাহা করিয়াছি, তোমাদের তাহা করিবার সাহস হইবে না।'

পাঠক, যদি কোন গৃহস্থ পরিবারবর্গকে অনাহারে রাখিয়া বাহিরে বাবুয়ানা চাল চালে, তবে তুমি তাহাকে কি বলিবে? ভারত-গবর্ণমেন্ট কিন্তু তাহাই করিতেছেন। কর-ভার-প্রপীড়িত কোটী কোটী প্রজা অনাহারে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেছে, কিন্তু গবর্ণমেন্ট বাহ্যাড়ম্বরে ও ইংলণ্ডের সাম্রাজ্য বিস্তারে করের উপর করভার বৃদ্ধি করিয়া এই দুর্ভিক্ষ-জর্জ্জরিত দেশের অর্থরাশি উড়াইয়া দিতেছেন। প্রজার অন্নকষ্ট দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে, কিন্তু বাহিরের ঠাট্ বজায় রাখিবার জন্য গবর্ণমেন্ট খাজানা বৃদ্ধি করিতে বিরত হইতেছেন না। কি শোচনীয় অবস্থা! অন্নকষ্টে প্রজার গৃহে বারমাস হাহাকার লাগিয়াই আছে, রাজা সেদিকে দৃষ্টি না করিয়া ক্রমাগত ব্যয়-বৃদ্ধি করিতেছেন। এরূপ বিসদৃশ ব্যাপার জগতে আর কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় কি? বিদেশীর শাসনে ভারত ছারখারে যাইতে বসিয়াছে। বৎসর বৎসর ৫০ কোটী টাকা বিদেশে চলিয়া যাইতেছে, তাহার বিনিময়ে এক কপর্দ্দিকও দেশে ফিরিতেছে না। ইহাতে যদি দৈন্য না বাড়ে, তবে বাড়িবে কিসে? দেশ যতই ধনী হউক, দেশে মণিরত্নের যতই খনি থাকুক্ না, দেশ যতই উর্ব্বর হউক না, দেশের লোক শিল্প বাণিজ্যে যতই মনোযোগ দিক্ না, যে দেশ হইতে প্রতিবৎসর ৫০ কোটী টাকা বাহির হইয়া যায়, সে দেশের কি আর নিস্তার আছে? বিগত সার্দ্ধ শতাব্দীর এইরূপ শোষণে আজ ভারত দৈন্যের শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছে। তাই যে দুর্ভিক্ষ পূর্ব্বে শতাব্দীর ঘটনা ছিল, সোণার ভারতে আজ তাহা লাগিয়াই আছে। দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসী মুখব্যাদান করিয়া কিরূপ নির্ম্মম ভাবে ভারতীয় প্রজামণ্ডলীকে গ্রাস করিতেছে, তাহা ভাবিলে শরীর কণ্টকিত হয়। বিগত একশত সাত বৎসরে সমগ্র পৃথিবীতে যুদ্ধে সর্ব্বশুদ্ধ ৫০ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, কিন্তু ভারতে কেবল দুর্ভিক্ষে ১০ বৎসরে ২ কোটী লোকের মৃত্যু হইয়াছে। পাঠক মহাশয় বিচলিত হইবেন না। ভারতের অবস্থা দিন দিন কি শোচনীয় আকার ধারণ করিতেছে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখুন। এ অবস্থা আর ২৫ বৎসর চলিলে ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলকেই এই দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসীর করাল কবলে পতিত হইতে হইবে। আজ যাঁহার ২০০৲ টাকা আয়, তিনিই একটী পরিবার প্রতিপালন করিতে ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিতেছেন, ২৫ বৎসর পরে অবস্থা যে কি দাঁড়াইবে, তাহা বর্ণনা করিতে লেখনী সাহসী হইতেছে না।

ভারতের দুর্ভিক্ষের ইতিহাস যখন পাঠ করি, তখন স্তম্ভিত হইয়া যাই। দিন দিন এই দুর্ভিক্ষের প্রকোপ যেরূপ

বাড়িতেছে, তাহাতে মনে হয়, পঁচিশ বৎসর পরে জীবন ধারণ করা একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠিবে। পাঠক মহাশয় ভারতের দুর্ভিক্ষ-চিত্র একবার দেখুন।—একাদশ শতাব্দীতে দুইবার স্থানীয়, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে একবার—দিল্লীর চতুপার্শ্বে, চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে তিনবার, পঞ্চদশ শতাব্দীতে দুইবার ও ষোড়শ শতাব্দীতে তিনবার—উহা স্থানীয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে তিনবার দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, কিন্তু ব্যাপ্তির প্রসার নির্ণীত হয় নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে চারিবার দুর্ভিক্ষ হইয়াছে—উত্তর পশ্চিম প্রদেশে একবার, দিল্লীতে একবার ও সিন্ধুদেশে দুইবার। সুতরাং ১১শ হইতে ১৮শ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতে মোট ১৮ বার দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। (মনে রাখিতে হইবে, এই সকল দুর্ভিক্ষের অধিকাংশই যুদ্ধ বিগ্রহের ফল)। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ শাসনে ভারতের দুর্ভিক্ষের ইতিহাস পাঠ করিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন, ভারতের অবস্থা দিন দিন কি শোচনীয় অবস্থা ধারণ করিতেছে। ১৮০১ হইতে ১৮২৫ খ্রীঃ পর্য্যন্ত ভারতে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে ৫ বার। ১৮২৬ হইতে ১৮৫০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত ২ বার; ১৮৫০ হইতে ১৮৭৫ পর্য্যন্ত ৬ বার। এই শেষ বারে প্রায় ৫০ লক্ষ প্রাণী অনাহারে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে। পাঠকের যদি ইহার পরেও ভারতের দুর্ভিক্ষ কাহিনী শুনিবার সহিষ্ণুতা থাকে, তবে তিনি অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন যে, একাদশ হইতে অষ্টাদশ পর্য্যন্ত অষ্ট শতাব্দীতে ভারতে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, মোট ১৮ বার, কিন্তু এক উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে প্রবল প্রতাপ ইংরেজ রাজ্যে মহা শান্তির সময়েও ১৮৭৬ হইতে ১৯০১, এই ২৬ বৎসরেই ভারতে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে ১৮ বার। শেষের দিকে দুর্ভিক্ষ যে কি ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিতে লেখনী সমর্থ নহে। এই শেষ দশ বৎসরে ইংরেজ রাজ দুর্ভিক্ষ-যজ্ঞে প্রায় ২ কোটী প্রজার প্রাণ আহুতি প্রদান করিয়াছেন। আমরা ভাবিয়াছিলাম, নরমেধ যজ্ঞ উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহা ভুল। পৃথিবীতে কিছুই মরে না, নরমেধ যজ্ঞও মরে নাই। বৃটিশ রাজ্যে হোমচার্জ্জ, সৈনিক ব্যয় প্রভৃতি আকারে অতি নির্ম্মম ভাবে নরমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতেছে। দুর্ভিক্ষের প্রকোপ দিন দিন যেরূপ বাড়িতেছে, তাহাতে ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আমাদের শরীর কণ্টকিত হইতেছে। আর ২৫ বৎসর এইরূপ অবস্থা চলিলে ভারতের যে কি ভীষণ দশা হইবে, তাহা চিন্তা করিতেও সাহসে কুলাইতেছে না।

ভারতের এই শোচনীয় অবস্থার জন্য দায়ী কে? গভর্ণমেণ্ট বলিবেন, অনাবৃষ্টি। ভারতেই এত অনাবৃষ্টি কেন? অনাবৃষ্টির ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া গভর্ণমেণ্ট হিন্দুর হস্ত হইতে নিস্তার পাইতে পারেন না, হিন্দুর বিশ্বাস, প্রজার দুর্দ্দশা রাজার অনাচারের ফল।

কালো বা কারণং রাজ্ঞো রাজা বা কালকারণম্।
ইতি তে সংশয়ো মাভূৎ রাজা কালস্য কারণম্॥
রাজা কৃত যুগস্রষ্টা ত্রেতায়াঃ দ্বাপরস্য চ।
যুগস্য চ চতুর্থস্য রাজা ভবতি কারণম্॥

সুতরাং সত্যযুগের কর্ত্তাও রাজা, কলিযুগের কর্ত্তাও রাজা। কাজেই অনাবৃষ্টি দুর্ভিক্ষের কারণ হইলেও হিন্দুর নিকট রাজাই সে জন্য দায়ী। কিন্তু ভারতীয় দুর্ভিক্ষের কারণ দৈব নহে, উহা রাজার

প্রত্যক্ষ অত্যাচারের ফল। অতিরিক্ত কর ভারই এই সর্ব্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষের একমাত্র মূল কারণ। এই করভার যে কিরূপ, তাহা ভারতবাসী ও ইংলণ্ডবাসীর আয় ও করভারের তুলনা করিলে বিশেষ ভাবে হৃৎগম্য হইবে।

প্রত্যেক ভারতবাসীর আয় বার্ষিক ত্রিশ টাকা। কিন্তু সে প্রতি ১৫৲ টাকায় ১৸৹ টাকা কর দেয়। প্রত্যেক ইংরেজের আয় ৬৩০৲ টাকা, কিন্তু সে প্রতি ১৫৲ টাকায় ১৹ টাকা মাত্র কর দেয়। অর্থাৎ ইংলণ্ডবাসী ভারতবাসী হইতে ২১ গুণ ধনী, কিন্তু তাহার করভার ভারতবাসীর অপেক্ষা প্রায় ⅓ অংশ কম। ভারতবাসী যেরূপ করভার নীরবে সহ্য করিয়া অনাহারে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেছে, ইংলণ্ডে সেরূপ ব্যাপার এক বৎসর হইলে তুমুল বিপ্লব উপস্থিত হইত। ভারতের কেউ মা বাপ নাই, তাই শান্তির সময়েও লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে মৃত্যু মুখে পতিত হইতেছে! আর কর্ত্তারা দরবার করিয়া সৈন্য ব্যয় বৃদ্ধি করিয়া রাজকোষ শূন্য করিতেছেন। যাহা হউক, এই তুলনায় দেখা যাইতেছে যে, বিদেশীয় রাজা দরিদ্র ভারত প্রজার উপর করভার সম্বন্ধে কিরূপ অবিচার করিতেছেন। অন্যদিকে আবার ভূমির রাজস্বের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে পাঠক দেখিতে পাইবেন যে, রাজস্ব বৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষের প্রসার, এই দুইয়ের মধ্যে একটা কার্য্যকারণ সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে। ভূমিকর ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই শতকরা ৫৫৲ টাকা আয় করে পরিণত হইয়াছে। বৃটনন্দনকে যদি তাহার দেশে শতকরা ১০৲ টাকা আয় কর দিতে বলা হয়, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই এক চাপটাঘাতে গভর্ণমেণ্টের মাথা উড়াইয়া দেয়। অথচ ভারতীয় প্রজা ৫৫৲ টাকা দিতেছে, তবুও তাহার কথা বলিবার অধিকার নাই। তাহার গায়ের রক্ত কিসে অপব্যয় হইতেছে, তাহা শুনিবার অধিকার নাই, তাহাকে একবার জিজ্ঞাসাও করা হয় না।

পাঠক মহাশয় যদি ভারতে রাজস্ব বৃদ্ধির ইতিহাস শ্রবণ করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই স্তম্ভিত হইবেন। আপনি কেন, গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী ও অর্দ্ধসরকারী পত্র সকলও এ অত্যাচারে স্তম্ভিত হইয়াছেন। মানুষের উপর মানুষ এরূপ অত্যাচার করিতে পারে, ইহা অশ্রুতপূর্ব্ব। পাঠক মহাশয় একটু শুনুন। মাহারাষ্ট্রা রাজ্য ১৮১৭ খ্রীঃ ইংরেজাধীন হয়। সে সময়ে তাহার রাজস্ব ছিল ৮০ লক্ষ টাকা। পর বৎসরেই হইল ১১৫ লক্ষ, তৎপরে ১৮২৩ খ্রীঃ হইল ১৫০ লক্ষ। ইহাতে ইংরেজ রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে যদি ভারতে দুর্ভিক্ষ আসিয়া থাকে, তবে সেজন্য কি অনাবৃষ্টি দায়ী? কিন্তু এইখানেই শেষ নয়। ১৮২৫ খ্রীঃ নূতন করিয়া প্রজার সঙ্গে বন্দোবস্তের আয়োজন হইল, এই বন্দোবস্ত সম্বন্ধে বম্বে গভর্ণমেণ্ট ৭০ বৎসর পরে ১৮৯২-৯৩ খ্রীঃ যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এই—

"Every effort was made—lawful and unlawful—to get the utmost out of the wretched peasantry who were subjected to torture in some instances, cruel and revolting beyond description, numbers abandoned their homes and fled into neighbouring native States."

আর উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। প্রজার ভিটা মাটী যে অনাবৃষ্টিতে উচ্ছন্ন যায় নাই, তাহা প্রমাণ করিতে ইহাই যথেষ্ট। তবে প্রমাণ দৃঢ় করিবার জন্য আরও একটু শুনাইব। অর্দ্ধ-সরকারী Pioneer বলিয়াছেন—

"The enhancements made at the recent revision were, judging by all known standards, excessive, viewed in conjunction with the statics of those on whom they were imposed, they were ruinous. × × × ×. Stupidity, blindness, indifference, greed—inability in a word in all its thousands forms—settled down like the fabled harpies, on the ryot's bread and bore off with them all that he subsisted upon."

আরও একজনের কথা শুনুন। Sir William Hunter বড়লাটের সভায় ১৮৬৯ খ্রীঃ বলিয়াছিলেন—

"The Covernment assessment does not leave enough food to the cultivàton to support himself and his family throughout the year."

ইহাই কি দুর্ভিক্ষ নহে? এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, জমী নিলামে উঠিলে আর কেহ কিনিতে চাহে না। Honourable Mr. G. Rogers of the Bombay Coounci ১৮৯৩ খ্রীঃ বলিয়াছেন—

"In the eleven years from 1879—80 to 1889—90 there were sold by auction for the collection of land revenue the occupancy rights of 1963364 acres of land held by 840713 defaulters in addition to personal property of the value of rupees 2965081 of the 1963364 acres, 1174143 acres had to be bought in on the part of the Covernment for want of bidders, that is to say, very nearly 60 per cent of the land supposed to be fairly and equitably assessed could not find purchasers."

অর্থাৎ ১১ বৎসরে ৮॥ লক্ষ প্রজার ভিটা মাটী ঘটী বাটী সব নিলাম হইয়া গেল এবং ইংরেজের ন্যায় শাসনের এরূপ বিশ্বাস যে, অর্দ্ধেকের বেশী জমির কেহ ক্রেতা জুটিল না। হায়! প্রজার কি শোচনীয় অবস্থা! ইংরাজ-শাসনের কি ভীষণ পরিণাম!! প্রজার কি লোমহর্ষণ দুর্দ্দশা!!! ইহার পরও যদি কেহ বলিতে চান, দুর্ভিক্ষের কারণ অনাবৃষ্টি, তবে তাঁহার পক্ষপাতিতার যথেষ্ট প্রশংসা করিতে আমাদের লেখনী অক্ষম। আবার যখন ভাবি, এই একাদশ বার্ষিক প্রজার রক্তশোষণ ১৮৭৭—৭৮ খ্রীঃ মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষের অব্যবহিত পরেই ঘটিয়াছিল, যে দুর্ভিক্ষে মান্দ্রাজে প্রায় ৩০ লক্ষ লোক অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল, তখন মনে হয়, এ রাজ্যে বাস করা অপেক্ষা মৃত্যু শতগুণে শ্রেয়। কিরূপ নির্ম্মমভাবে রাজস্ব আদায় করা হয় এবং এইরূপ আদায়ই যে দুর্ভিক্ষের কারণ, তাহা একজন রাজকর্ম্মচারী অতি বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন এবং এই অপ্রিয় সত্য বলার জন্য কার্জ্জনের ন্যায় বিচারে তিনি ব্রহ্মদেশের ছোট লাটের পদ হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। বড়লাটের গত পূর্ব্ব বজেট্ সভায় Hon. Donald Smeaton বলিয়াছিলেন—

"According to the accounts of 1900-01 over 60 lakhs of land revenue and rates were realised from Bombay, the Panjab, and Madras in excess of the collections of 1899-1900, the year of famine and these 60 lakhs were largely arrears in provinces where there had been either famine or deficient rainfall—arrears which apparently should not have been demanded at all and this brings to my mind a very vital question lately raised whether the intensity of recent famines is or is not largely due to poverty caused by the opperation of our land revenue system as a whole?"

কিন্তু এই যে প্রজার হৃদয়ের রক্ত অর্থরাশি, তাহা কোথায় যায়? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিদেশীয় শাসনের নিষ্পেষণে ভারতের ৫০ কোটী টাকা বছরের পর ইংলণ্ডে চলিয়া যাইতেছে, যাহার এক কপর্দ্দকও ফিরিয়া আসিতেছে না। ভারতের লক্ষ লক্ষ প্রজা অনাহারে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেছে, কিন্তু ভারতের অর্থে ইংলণ্ডের সৈন্য প্রস্তুত হইতেছে, ইংরেজ-সৈন্যের বৈদ্যুতিক আলো, বৈদ্যুতিক পাখা চলিতেছে। ভারতে এই সৈন্যের কোনও

প্রয়োজনীয়তা নাই। এইতো সেদিন, তিন বছর ধরিয়া ভারতের দশ হাজার ইংরেজ-সৈন্য দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থিতি করিল, কই, তাহাতে তো ভারতের কোন বিশৃঙ্খলা হইল না? তবে অন্ততঃ ওই দশ হাজার সৈন্য বাদ দিলেও কত নিরন্নপ্রজা অন্নের মুখ দেখিতে পায়, কত প্রজা অকাল-মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পায়। এই তো দেশের অবস্থা, যে প্রজার গৃহে অর্থ নাই, সে এক মুঠা অন্ন কোথা হইতে সংগ্রহ করে; যদি বা দেশের শস্য দেশে থাকিত, তবুও সে এক মুঠা অন্ন খাইয়া বাঁচিতে পারিত, কিন্তু সে পথও রুদ্ধ।

বছরে প্রায় বিশকোটী টাকার চাউল বিলাতে রপ্তানি হইতেছে। এই চাউলে কোটী কোটী লোকের অন্ন সংস্থান হইত। আমরা না খাইতে পারিয়া মরিয়া যাই, আর বিলাতের লোক মদ ও কাপড়ে মাড় লাগাইবার জন্য আমাদের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া যায়। ইহাতে বাধা দিবার কেহ নাই, বলিবারও কেহ নাই। বিদেশীর রাজত্ব বলিয়া না এই লাঞ্ছনা, একথা কাহাকেই বা বলি, কেই বা শুনে। ভারতের অর্থের কেউ মা বাপ নাই, প্রজার প্রাণের কোন মূল্য নাই, তাই এত অবিচারেও কাহারও চৈতন্য হয় না। আমরা সুখে নিদ্রা যাইতেছি। হায়! ভারতবাসি, কত কাল আর এই মোহনিদ্রায় অভিভূত থাকিবে? তোমার কি এই মোহনিদ্রা ভাঙ্গিবে না? একবার উঠ, উঠিয়া দেখ, দেশের কি দুর্দ্দশা হইয়াছে। যে দেশের ত্রিশকোটীর মধ্যে বিশকোটী অনাহারে, অর্দ্ধাহারে সম্বৎসর কাটায়, সে দেশের নিদ্রা কি মহানিদ্রা নহে? তাই বলি, ভারতবাসী জাগ। কেহ বলিতে পারেন যে, ইংরেজ রাজ না হয় কৃষিরই সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, তোমরা কেন শিল্প বাণিজ্যে মনোনিবেশ কর না। হায়, সে পথও যদি খোলা থাকিত! এদেশে ইংরেজের মুখ্য উদ্দেশ্য বাণিজ্য, রাজত্বটা গৌণ মাত্র। বাণিজ্যের সুবিধার জন্যই রাজত্ব। লর্ড কার্জ্জন সেদিন এদেশীয় ইংরেজ-ব্যবসায়ীদিগকে ঠিকই বলিয়াছেন—"তোমাদের কার্য্য exploitation, আমার কার্য্য (তোমাদের সুবিধার জন্য!) administration. হে ভারতবাসি, তুমি শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি করিবে? ভেবে দেখ সে গুড়েও বালি। যে পরিমাণে তোমার শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি হইবে, সেই পরিমাণে ইংরেজের শিল্প বাণিজ্যের ক্ষতি। তুমি কি মনে করিয়াছ, ইংরেজরাজ তাহা চুপ করিয়া বসিয়া দেখিবেন? ম্যানচেষ্টারের তাঁতীরা কিম্বা বারমিংহামের কামারেরা তাহা বসিয়া দেখিতে দিবে? একটু আঁতে ঘা পড়িবে, আর অমনি পারলামেণ্টের ভিতর দিয়া ভারত-গভর্ণমেণ্টের টুঁটী ধরিয়া শ্বাসরোধ করিবে। তোমার ত আর পারলামেণ্টে ক্ষমতা নাই, সুতরাং তুমি কি করিবে? যতদিন না তুমি অসট্রেলিয়া, ক্যানাডা বা দক্ষিণ আফ্রিকার ন্যায় স্বায়ত্ব শাসন পাইতেছ, যতদিন ভারত ইংলণ্ডের কামধেনু (dependency) ততদিন শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির কথা শিকায় তুলিয়া রাখ। ইংরেজ-রাজ যদি তোমার শিল্পবাণিজ্যের উন্নতির জন্যই ব্যস্ত হইবেন, তবে আর মহানুভব তাতার Research scheme লইয়া এত ভুগিতে হইত না, তবে আর লর্ড কার্জ্জন ভারতের উন্নতি-কল্পে ওই সদাশয় মার্কিন প্রদত্ত টাকায় Pasteur Institute খুলিতে

যাইতেন না। যাহারা মনে করেন, ইংরেজজাতি নিজের স্বার্থ বলি দিয়া পরের উপকারের জন্য দেবদূতরূপে জগতে অবতীর্ণ, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। আমাদের সে বিশ্বাস নাই, সুতরাং আমরা নিরাশ হইয়াছি। দৃষ্টান্তের অভাব নাই। ম্যানচেষ্টার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হারিয়া যায় বলিয়া সেদিন শুল্ক স্থাপন করতঃ বঙ্গের কাপড়ের কল গুলির যে দুর্দ্দশা করা হইয়াছে, তাহা ভাবিলে কে আর বিশ্বাস করিবে যে, বণিকের রাজত্বে আমাদের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি সম্ভব? বঙ্গের কাপড়ের কল গুলি মাথা তুলিতেই অমনি বজ্রাহত হইয়া মরিয়া যাইতেছে। দেশীয় মূলধনে একটী খনির কার্য্য আরম্ভ হইতে না হইতেই অমনি খনি-আইন (Mining Regulation) তাহাদের মুণ্ডপাত করিতে উদ্যত। যাঁহারা সব দিক দেখিবেন না, তাঁহারা শিল্প-বাণিজ্য লইয়া মাতিয়া উঠিতে পারেন, কিন্তু যাঁহারা কার্য্যক্ষেত্রের অসুবিধার কথা ভাবিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিয়াছেন, আর উপায় নাই। আমরা ইংরাজের দোষ দিই না। মানুষের স্বভাব, সে আপনার স্বার্থ অন্বেষণ করিবে। ইংরেজও ভারতে স্বীয় স্বার্থ অন্বেষণ করিতেছে, ইহাতে দোষ কি? আমরা কেবল ভারতবাসীকে বলি, তুমিও তোমার পথ দেখ, আর মোহান্ধ থাকিও না। যেখানে রাজায় প্রজায় অহি নকুল সম্বন্ধ, খাদ্য খাদক সম্বন্ধ, সেখানে প্রজার আর উপায় নাই, অন্য পথ নাই। কেবল একটা মাত্র পথ আছে, ভারত সেই পথেই যাইতে বসিয়াছে—ত্রিশকোটী সন্তানের মা হইয়াও ভারতমাতা সেই পথেই যাইতেছেন, সে পথে মান্‌চেষ্টারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই, রাজস্ব বৃদ্ধির ভয় নাই। সেই সোজাপথ আর কিছুই নয়--মৃত্যু!!

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

সমাজ-চিন্তা। (৩)

সমাজের প্রবাহ বা গতি।

পরিবার ও সমাজ।—আমরা যখন মানুষকে পরিবার বদ্ধ দেখিতে পাই, তখন মানুষ অনেক উন্নত হইয়া আসিয়াছে। তাহার লক্ষ অতীত বৎসরের পাশব ইতিহাস তখন তাহার স্মৃতি পথাতীত হইয়া গিয়াছে।

ইতর জন্তুর মধ্যে পরিবার নাই। সেখানে শিশুর শিক্ষা-নবীশির কিম্বা অসহায় অবস্থার সময় অতি স্বল্প, মাতার দায়িত্ব অত্যল্পকাল স্থায়ী; পিতার দায়িত্ব এত সামান্য যে তাহা নগণ্য। অধিকাংশ স্থলে গর্ভাধান-কালের পর হইতেই ইতর জন্তুদের স্ত্রী পুরুষের সর্ব্ব প্রকার সম্পর্ক রহিত হইয়া যায়, কোথাও বা পুরুষ জাতির মধ্যে সন্তান-প্রীতির একান্ত অভাব, এমন কি, সন্তান-হিংসা-বৃত্তিও লক্ষিত হইয়া থাকে। মাতৃ-স্নেহ সৃষ্টি রক্ষার আদি কারণ। মাতৃস্নেহের সমুচিত সম্প্রসারণেই মনুষ্যত্বের বিকাশ, এবং ইহার ফলেই মানুষের দল হইতে পরিবারে উন্নতি।

মানুষের প্রথম পরিচয় রমণীর সঙ্গে। এই পরিচয়েই সে আত্ম-বিস্মৃতির এবং পরানুবর্ত্তিতার আদি প্রেরণা মনে অনুভব

করিয়াছে। অপর পক্ষে শিশুর অক্ষম এবং অসহায় অবস্থাও পারিবারিক জীবনের প্রধান হেতুভূত হইয়াছে। শিশুর প্রতিপালন ও শিক্ষাদান অপরিহার্য্য হওয়াতে দাম্পত্য সম্বন্ধ ঘনিষ্টতর হয় এবং নারী জাতির পক্ষ হইতেই উহার স্থায়িত্ব বিধানে আবশ্যকতা জন্মে। ইহার ফলে, বিশেষ ভাবে পতি পত্নীর দায়িত্ব এবং কার্য্য বিভাগ ঘটিয়া যায়।

সুতরাং বলিতে হয়, নারী জাতি হইতেই মানুষ পরিবার বন্ধনের প্রথম প্রেরণা পাইয়াছে ; উহাতে মানুষের যৌন সম্বন্ধ স্থিরতর, প্রীতি গাঢ়তর ও সম্প্রসারী হইয়াছে ; ভবিষ্যৎ চিন্তা জাগ্রত ও সংস্থান চেষ্টা বলবতী হইয়াছে। পুরুষের উদ্দাম গতি এবং স্বার্থপরতা নিয়ন্ত্রিত ও পরার্থ পরতা প্রস্ফুট হইয়াছে। এই সমস্তই পারিবারিক জীবনের অপরিহার্য্য উপাদান।

দলের মধ্যে আত্মরক্ষাস্পৃহাই বলবতী সন্তান-রক্ষা গৌণ ভাবে সমাহিত। পরিবারে ইহা প্রস্ফুটিত হইয়া ক্রমে পরার্থপরতায় পরিণত হইয়াছে।

সৃষ্টির মধ্যে পরার্থপরতা বৃত্তি মাতৃভাবেই প্রথম দেখা দিয়াছে, বিচেতনের মধ্যেও ইহা অগোচর নহে। উদ্ভিদের বীজ-প্রসব, বীজ-রক্ষা, বীজৈকান্তিকতা অনুধাবনের যোগ্য। বিবর্ত্তবাদী ডার্বিন বলিতে চাহেন, এক আত্মরক্ষা বৃত্তি হইতেই অন্য সমস্ত বৃত্তির বিকাশ এবং জগতের বর্ত্তমান পরিণতি ঘটিয়াছে। কিন্তু অনুসন্ধান ও ভূয়োদর্শন বলে পরবর্ত্তী বিবর্ত্ত বিজ্ঞান ডার্বিনের উক্ত মতের একদেশদর্শিতা প্রমাণ করিতে চাহিতেছেন। সৃষ্টির সর্ব্বত্র আত্মরক্ষণী বৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে সন্ততিরক্ষণী অর্থাৎ পররক্ষণী বৃত্তিও ন্যূনাধিক প্রচলিত আছে, ইহা প্রদর্শন পূর্ব্বক পূর্ব্ব মতের একটা বিশেষ ভ্রম নিরাকৃত করাই উহার উদ্দেশ্য। যাহোক, অন্ততঃ জীব-প্রবাহের আদি হইতে আরম্ভ করিয়া মাতৃস্নেহ যে অক্লান্ত পক্ষপুট বিস্তার করিয়া শিশু জগৎকে রক্ষা করিতেছে, তাহার মুখে ক্ষুধার অন্ন এবং পিপাসার জল উপস্থিত করিতেছে, ইহা একরূপ স্বীকার্য্য।

এই মাতৃ-স্নেহ হইতেই গৌণ বা মুখ্য ভাবে পররক্ষণী বৃত্তির বিকাশ।

পিতা মাতা ও সন্তান, ইহারা আদি পরিবারের আদি উপাদান। তৎপর শোণিত-সোদর অথবা লৌকিক সম্পর্কেও অবশ্য উহার দেহপুষ্টি ঘটিয়াছে। পিতা পরিবারে আসিয়া পর রক্ষা বৃত্তি ধারণ করিতে বিশেষ ভাবে শিখিয়াছেন। পুরুষ যেই বৃত্তির প্রেরণায় যৌন সম্বন্ধ স্থাপন এবং পরিবার সংঘটন করেন, তন্মধ্যে আত্ম চিন্তাই প্রবল ছিল। স্ত্রী জাতির সম্পর্কে আসিয়াই পুরুষ সবিশেষে আত্মবিস্মৃত হইতে শিখিয়াছে। স্ত্রী জাতির সর্ব্ব প্রধান গুণ, তাহার গৌরবমণি মাতৃভাব। উহার সংস্পর্শে পশুত্ব মানবত্বে পরিণত হইয়াছে ও দেবত্বের আভাষ পাইয়াছে। এইরূপে রমণী পুরুষ জাতিকে বর্ত্তমান অবস্থায় উত্তোলিত করিয়া ধারণ করিতেছে ও তাহাকে উন্নততর স্থানে উপনীত করিবার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করিতেছে।

আবার জীব বিজ্ঞান বলিতেছেন, স্ত্রী পুরুষ একটা দ্বিদল বীজ ; উহারা এককালে একত্র অবস্থিত ছিল। পরে গতিবেগে বিশ্লিষ্ট হইয়া ও কথঞ্চিৎ ভিন্নাকৃতি ধার

করিয়া স্বতন্ত্র পরিণাম প্রবাহে ছুটিয়া চলিয়াছে। যেই-যেই স্থলে উভয়ে সম্মিলিত হইতেছে, সেই সেই স্থলেই উৎপত্তি। উৎপত্তির এই প্রাচীন নিয়ম এ যাবৎ অক্ষুণ্ণ আছে।

মাতৃত্ব কি পিতৃত্ব, অথবা আত্মার রক্ষণী, কি পররক্ষণী বৃত্তি, এতদুভয়ের কোন্‌টা সর্ব্ব প্রাচীন বা সর্ব্ব সাধারণ, তাহার উপযুক্ত আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয় নহে, তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে, কিন্তু প্রতিবারেই যে ইহাদের যথোচিত প্রকাশ এবং সমাবেশ হইয়াছে এবং এই সমস্তের স্ফুরণেই যে মানব পশু সাধারণ অবস্থা হইতে উন্নততর গ্রামে পরিবারে উপনীত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বকার সমাজতত্ত্বানুধ্যায়ী পণ্ডিতগণ পরিবারকেই সমাজের প্রথম সোপান বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন, সৃষ্টির প্রারম্ভেই মনুষ্যের স্ত্রীপুরুষের সৃষ্টি হইয়া গেল, আর তাহারা ঈশ্বরদত্ত পরিণত বৃত্তি-সামর্থ্যে পরিচালিত হইতে লাগিল, এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া প্রাচীন পণ্ডিতগণ সমাজ-তত্ত্বালোচনা করিয়া গিয়াছেন, পৃথিবীতে মানবত্বের সৃষ্টি কিম্বা বিকাশ হইতে যে অগণিত বৎসরের আবশ্যক হইয়াছে, মানব যে সৃষ্টিকাণ্ডের উচ্চ-শাখোপশাখায় বিশিষ্ট ফলস্বরূপ প্রসূত হইয়াছে, আধুনিক বিজ্ঞানের এই নব আবিষ্কার প্রাচীনগণ অবগত না থাকায় প্রাচীন সমাজ-বিজ্ঞানের অনেক সিদ্ধান্ত যথাযথ হইতে পারে নাই।

সমাজের ভিত্তি যেই স্থান হইতে প্রত্যক্ষ হইতেছে, মানুষ যেই স্থান হইতে দৃষ্টতঃ বাঁধাবাঁধির মধ্যে আসিয়াছে, সেই স্থান পরিবার, তৎসম্বন্ধে কোন তর্ক নাই। কিন্তু তদূর্দ্ধে জিজ্ঞাসাবাদ বিস্তারিত করিলে মানুষের প্রাক্‌সামাজিক বা প্রাক্‌পারিবারিক অবস্থা অনুধাবন করিতে বসিলে, আমরা এমন একটা স্তর দেখিতে পাই, যেখানে মানুষ পরিবার-বন্ধনও জানিতেছে না; ইতর জাতীয় প্রাণীর ন্যায় ন্যূনাধিক স্বতন্ত্রভাবেই বিচরণ করিতেছে। এই অবস্থাকেই আমরা দল কিম্বা পশুধর্ম্মাশ্রিত অবস্থা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। বিবর্ত্তবিজ্ঞানের সাহচর্য্যে জীবপর্য্যায়ে মানবের ক্রমবিকাশ বা অভিব্যক্তি অনুচিন্তন করিতে গেলেও উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়।

বিবর্ত্তনীতি ও সমাজ।—এই বিবর্ত্তবিজ্ঞান এখনও এতদ্দেশে সম্যক আলোচিত কিম্বা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, সুতরাং উহার গুরুত্ব বিষয়ে প্রসঙ্গক্রমে কিঞ্চিৎ বলিতে হইতেছে। বিবর্ত্তবিজ্ঞানের প্রতিপাদ্য বিষয় এই দেশের প্রচলিত ধর্ম্ম কিম্বা সামাজিক মতের বিরোধী। উহার নাম শুনিলে দেশের এক শ্রেণীর লোক ভীত হয়, আলোচনা নিভৃত রাখিতে চাহে; ইতরেরা উপহাস করে। এই পর্য্যন্ত এই দেশের কোন ব্যক্তি ইহার আলোচনায় অগ্রগামিতা দেখান নাই; কিম্বা স্বাধীন অনুধাবনের যশোভাগী হইতে পারেন নাই। য়ুরোপ বিবর্ত্তনীতির সন্ধান করিয়াছে ও বিশ্বসংসারের অবগুণ্ঠন খুলিয়া ফেলিয়া সর্ব্বত্র তাহাকে প্রত্যক্ষ করিতে চেষ্টা করিতেছে।

এই বিবর্ত্ত-নীতিকে সর্ব্ব প্রথম প্রাণিতত্ত্বের অনুশীলন করিতে করিতে মানুষ দেখিতে পায়; এখন ইহাকে সর্ব্বত্র দেখিতেছে। শত শত মনীষী এই কার্য্যে চিরজীবন উদ্‌যাপন করিতেছেন। 'সমস্ত জগৎ

সংসার বিবর্ত্তনীতির বশুতায় চলিতেছে' এই নবাবিষ্কৃত সত্যকে মানব আপনার সমগ্র জ্ঞানের কষ্টিপ্রস্তরে পরীক্ষা করিয়া লই-তেছে। য়ুরোপেও সহজে ইহার প্রতিষ্ঠা হয় নাই, প্রথম প্রথম বিবর্ত্তবাদ য়ুরোপের ধর্ম্মবিশ্বাস এবং প্রচলিত সংস্কারকে এইরূপ আঘাত করিয়াছিল যে, সর্ব্ব সাধারণ ইহাকে প্রচলিত ধর্ম্মতন্ত্রের বিরুদ্ধে কূটকৌশলপূর্ণ বিদ্রোহ মনে করিয়া ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল। 'পৃথিবী ঘুরিতেছে' এই সত্য অকুতোভয়ে প্রকাশ করিতে গিয়া গ্যালিলিউকে যে নির্য্যাতন ভোগ করিতে হয়, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ডার্বিনকে প্রকৃতপ্রস্তাবে তদপেক্ষা কম ভোগ করিতে হয় নাই। নিরক্ষর মুর্খ লোকের কথা দূরে থাকুক, (কারণ, মূর্খগণ স্বভাবতঃই স্বাভিমানী) বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ পর্য্যন্ত বিনা বিচারে তাঁহাকে পরিহাস করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। কিন্তু এখন উক্ত শ্রেণীর পণ্ডিতগণের কণ্ঠ নীরব হইয়াছে, সত্যের নিকট সমস্ত অহমিকা, অসত্য-নিষ্ঠা দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। এখন য়ুরোপের ধর্ম্মযাজকগণও বিবর্ত্তবাদকে শিরোধার্য্য করিয়া, তাহারই আলোকে ধর্ম্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা ও সমর্থন করিতে চেষ্টিত হইয়াছেন।

বিবর্ত্তবাদ অবলম্বন করিয়া দেশে দেশে যত গ্রন্থ প্রণীত ও যত অনুসন্ধান আরব্ধ হইয়াছে, তদ্বারা প্রতি পদে কেবল প্রমাণিত হইতেছে যে, সমস্ত জগৎ সংসার (দেহ ও মনো-জগৎ) উহারই অধীনে চলিতেছেন, মানুষের 'সত্যযুগ' অতীত হইতে উৎখাত হইয়া অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যতে স্থাপিত হইয়াছে ও তৎসঙ্গে সঙ্গে মনুষ্য সমাজের গতি এবং লক্ষ্য যুগপৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।

বিবর্ত্তবাদ মানবের জ্ঞানরাজের মধ্যে মহাবিপ্লব উপস্থিত করিয়াছে। এই বিপ্লবকে মানুষ প্রথমে নিহিলিষ্টজাতীয় মনে করিয়া-ছিল, এখন ইহা প্রকাশ্য ভাবে ধ্বংস ও গঠন এতদুভয় কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছে, মানুষ অনেক কথা এত কাল সত্য বিশ্বাসে বলিয়া আসিতেছিল। তাহার ধর্ম্ম, তাহার পরিবার ও সমাজের আদর্শ অনেক অলীক কথার উপর স্থাপিত ছিল। সহস্র সহস্র বৎসর যাবৎ মানব আকাশে যেই অভেদ্য দুর্গ নির্ম্মাণ করিতেছিল, বিজ্ঞানের আলোক তাহাকে মুহূর্ত্তে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়াছে। এখন দেশে দেশে পুরাতন ধর্ম্মবিশ্বাসে সামাজিক নীতিনিয়মে এবং পারিবারিক আদর্শে অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, বিবর্ত্ত-নিয়মের সঙ্গে সন্ধি বা সামঞ্জস্য বিধান করিতে উহার আলোকে সমস্ত বিশোধিত কিম্বা ব্যাখ্যা করিয়া লইতে মানুষ ব্যস্ত হইয়া গিয়াছে। পৃথিবীর সৃষ্টি, মানবের উৎপত্তি এবং সমাজের আদর্শ বিষয়ে মানবের পূর্ব্ব ধারণা উঠিয়া গিয়াছে। মানব কোথা হইতে আসিল, কোন্ পথ অতিবাহন করিয়া আসিল, কোথায় চলি-য়াছে, সে কি পরিমাণ অর্জ্জন করিয়াছে ও কি পরিমাণ অর্জ্জনের জন্য তাহার আভ্যন্তরীণ ক্ষমতা জন্মিয়াছে, বিবর্ত্তবাদ এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তরে মানবের নয়ন সমক্ষে যেই বিভূতি বিস্তার করিয়াছে, ইতিপূর্ব্বে কোন বিজ্ঞান, কোন দর্শন তাহা পারে নাই।

পূর্ব্বে দেশে দেশে সাধকগণ, কবিগণ বিবর্ত্তনীতির পরিকল্পনা করিয়া গিয়াছেন, বৈজ্ঞানিকগণ ইহার স্বপ্ন দেখিয়াছেন; কিন্তু কেহ তাহা প্রমাণিত করিয়া দেখাইতে পারেন নাই। যতকীর্ত্তন বিজ্ঞান নহে,

বিজ্ঞানাভাস মাত্র। ডার্বিনের পূর্ব্বে এইরূপ বিজ্ঞানাভাস অনেকে পাইয়াছিলেন, লক্ষ্যহীন শরের ন্যায় মানবের দৃষ্টি কখন বা সত্যেও পতিত হইয়াছে, সমুদ্রকূলে উপলখণ্ড খুজিতে খুজিতে যদি বা প্রকৃত স্পর্শমণি হাতে পড়িয়াছে, চিত্তে স্থিরবুদ্ধির অভাবে মানুষ পরক্ষণেই তাহা দূরে ফেলিয়া দিয়াছে, অপরিচয়ের রাজ্য হইতে চিরদিন এইরূপ সঙ্কেত, সংবাদ, আমন্ত্রণ আসিতেছে, কদাচিৎ দুই একটা জাগ্রত ব্যক্তি তাহা গ্রহণ করিতেছেন।

কোন প্রসিদ্ধ খ্রীষ্টধর্ম্ম যাজক বলিয়াছেন, ইতিপূর্ব্বে ভূতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, পদার্থ-তত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি বিদ্যা প্রত্যেকে স্ব স্ব প্রধান থাকিয়া আপন বিষয় চিন্তা করিতেছিল, সহস্র সহস্র বৎসর মানব এই চিন্তায় নিমগ্ন ছিল, হঠাৎ সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল; পরস্পরে ঠারাঠারি করিল, একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, একটা বিশাল সত্য পাইয়াছি—তাহা জগতের বিবর্ত্তন, মনুষ্যের ক্রমবিকাশ।

সুতরাং বিবর্ত্তবাদের প্রমাণ পরম্পরা বহুব্যাপিনী ও কোন অবান্তর নিবন্ধে তাহার প্রকৃত আলোচনা অসম্ভব। বিবর্ত্তনীতির নির্ণায়ক গ্রন্থাবলী মানবের প্রধান শাস্ত্র মধ্যে পরিগণিত হওয়া উচিত; এবং উহার আলোচনার এইরূপ সৌন্দর্য্য সম্পাদন করা আবশ্যক, যাহাতে আপামর সকলেই উহার মূল বিষয়ে এবং সিদ্ধান্তে লব্ধপ্রবেশ হইতে পারে। বিষয়ান্তরের আলোচনায় যেন উহার স্বতন্ত্র আলোচনা অনাবশ্যক হইয়া যায়; বিষয়ানুরূপ সঙ্কেতই যেন যথেষ্ট হয়। উহাপেক্ষা অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয় মানবের আর নাই। এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের প্রকৃত তথ্য মানব এতদিনে খুঁজিয়া পাইয়াছে, ও তাহার সূত্র ধারণ করিয়া মানব এই বিশাল ব্যূহচক্রের মধ্যে গতি পথ নিশ্চিত করিতে পারিতেছে। এখনো এই বিজ্ঞান পূর্ণতা লাভ করে নাই, সত্য, মানব জগতের জড়াংশকে যতদূর ধরিতে পারিয়াছে, অজড় অংশকে ততদূর পারে নাই। ভবিষ্যতে মানব তাহা জ্ঞানাধীন করিবে, তখন সৃষ্টির গুপ্ত রহস্য তাহার নিকট স্পষ্ট প্রকাশিত হইবে, জড় হইতে বিচেতনে, বিচেতন হইতে জীবে, জীব হইতে বিদেহ সত্তায় যে স্রোত প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, মানব তাহার তত্ত্ব ও পরমার্থ কালে সম্যক্ আয়ত্ত করিয়া আপন জাতি পরিচালিত করিতে পারিবে, সেই আশা জন্মিয়াছে।

কথা উঠিতে পারে যে, বিবর্ত্তবাদ জল্পনা মাত্র, উহাই যে সত্য, তাহার নিশ্চয় কে করিয়াছে। প্রত্যুত্তরে এইমাত্র বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, কার্য্যকারণের অটল ভিত্তিভূমির উপর বিবর্ত্তবাদ স্থাপিত, মানবের নিকট কার্য্য কারণ বিচারই সত্যের একমাত্র নিরূপক। মানবের এই কার্য্য কারণ জ্ঞান যেই পর্য্যন্ত স্থির আছে, সেই পর্য্যন্ত উহা সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে।

বিবর্ত্তন ও সমাজ।—প্রসঙ্গত বিবর্ত্তবিজ্ঞান বিষয়ে এইমাত্র বলিয়া আমরা প্রস্তুতানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতেছি। ভাষা মানবের সর্ব্বপ্রধান সম্পত্তি, কেন না, উহা জ্ঞানের আধার; এবং জ্ঞানই মনুষ্যত্বের প্রধান উপাদান। ভাষার উৎপত্তি ও পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে মানবত্বের উৎপত্তি, পরিপুষ্টি ও পরিণতি ঘটিয়াছে, সুতরাং উহার ভিতরেই মানবের গত ইতিহাসের

অনেক ঘটনার নিদর্শন প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। ভূস্তরস্থ বা প্রস্তর-নিহিত নিদর্শনের সঙ্গে তুলনায় উহার অবজ্ঞা উচিত নহে। সমাজের ইতিহাস পর্য্যালোচনায় ভাষার নিদর্শন অধিকস্থলে অন্য প্রমাণের সহকারী, সময় সময় অগ্রগামী হওয়াও দৃষ্ট হয়, অবিরাম স্রোতের মধ্যে নদীর অস্তিত্ব স্থির আছে, সেইরূপ ভাষা-বিজ্ঞান পূর্ণাঙ্গ না হইলেও, আমরা দেখিতে পাইব, ভাষা সমূহের চির-চাঞ্চল্যের মধ্যেও ভাষার মূল স্বরূপ স্থির আছে। ভাষা পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই, কিরূপে অত্যল্প সংখ্যক মূল শব্দের সমাসে শত সহস্র যৌগিক শব্দ উৎপন্ন হইয়া ভাষাকোষ পূর্ণ করিয়া দিয়াছে, পূর্ব্বকালে এই সমস্ত মূল শব্দই অপরিণত-মস্তিষ্ক মানবের ভাবপ্রকাশের অসামান্য উপকরণ ছিল।

শ্বাপদ বা কৃষক জীবনের নিত্যকর্ম্মের ও গৃহ-ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির বাচিক সঙ্কেতই প্রাচীনকালে মানবের যথা সর্ব্বস্ব ভাষা ছিল। য়ুরোপীয় ও ভারতীয় আর্য্যজাতি যৎকালে একত্র অবস্থান করিতেছিলেন, তৎকালে তাঁহাদের ভাষা-সম্পদ এতদপেক্ষা সমৃদ্ধ ছিল না। ভাষার দ্বারা জাতীয় জ্ঞান বিস্তার এবং বুদ্ধি-বৃত্তির প্রসার সহজেই অনুমিত হয়, প্রাচীন আর্য্যজাতির নিতান্ত সরল সহজ ভাষা যে কালে বহু-প্রসারী হইয়াছিল, তাহার বড় বড় স্তরগুলি সহজেই অনুমেয়, ভাষার ক্রমিক অভিব্যক্তি মানসিক অভিব্যক্তির সহচরী।

উচ্চারিত ভাষার ন্যায় লিখিত ভাষা অর্থাৎ লিপিপ্রণালীও সামান্য বিকাশলাভ করে নাই। ভাষা আবিষ্কার করিয়া মানব মনোভাবকে স্থায়িত্ব এবং দূরাপনয়ত্ব প্রদান করিতে উৎসুক হইয়াছিল, উচ্চারিত সঙ্কেতের পূর্ব্বে মানব মুখমণ্ডল, চক্ষু ও হস্ত-পদাদির বিকৃতি ও ভঙ্গ্যাত্মক এক অপরূপ দৃশ্য ভাষার সাহায্যেও মনোভাবে ব্যক্ত করিত, উহাকেও মানুষ লিপিগত করিতে চেষ্টা করে, প্রথম মানুষ যে অক্ষর ব্যবহার করিত, তাহা এক একটা শব্দ ও উদ্দিষ্ট পদার্থের কাল্পনিক প্রতিকৃতি। এইরূপ বস্তুরূপী অক্ষরলিপি প্রাচীন মিশরে ব্যাবিলোনিয়ায় এবং অসুরিয়ায় প্রচলিত ছিল। চৈনভাষায় এখনো ইহার দৃষ্টান্ত আছে। চৈন ভাষায় এক একটা অক্ষরই স্বতন্ত্র শব্দ। শব্দের বর্ণবিভাগ ও প্রত্যেক বর্ণের স্বতন্ত্র স্বরূপ সংঘটন করিয়া লিপিপ্রণালীর সৌকর্য্য সম্পাদন বহুকালে ঘটিয়াছিল। বিভাগের পরও বর্ণমালা বস্তুপ্রতিবিম্ব পরিহার করিতে পারে নাই, অনেক প্রাচীন ভাষায় প্রত্যেক বর্ণের স্বতন্ত্র অর্থ অভিধানে দেখিতে পাওয়া যায়। একবর্ণ উচ্চারণে একটা বিশেষ বস্তু সঙ্কেতিত হয়। সংস্কৃত ভাষাকোষে প্রায় প্রত্যেক বর্ণের এইরূপ অর্থ আছে, এই সব অর্থ বৈদিক। বৈদিক সূক্ত ও মন্ত্রাদিতে পূর্ব্বোক্ত ব্যবহার ভূরি ভূরি প্রাপ্ত হওয়া যায়; পরবর্ত্তী সংস্কৃত ভাষায় তাহা বহুপরিমাণে অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে।

আবার বেদের অপর নাম শ্রুতি। তাহার ব্যঙ্গ্যার্থ এই যে, যাঁহারা বেদমন্ত্র রচনা (অথবা দর্শন) করিয়াছিলেন, তাঁহারা তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া যাইতে পারেন নাই, লিপিপ্রণালী পরে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

এইরূপে ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় দেখিতে পাই, মানব প্রথমে সামান্য মাত্র প্রজ্ঞা ও বুদ্ধির অধিকারী ছিল, উত্তরোত্তর

তাহা ব্যাপিনী এবং শক্তিশালিনী হইয়া মানবকে বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত করিয়াছে ও নানাদিক হইতে বিশ্বজগৎকে অধিকার করিবার চেষ্টা করিতেছে। মানবের বুদ্ধির ক্রমবিকাশ তাহার সামাজিক অবস্থার প্রবাহের সহগামী।

যৌন সম্বন্ধের পরিণাম স্বরূপ যেই পরিবার গঠিত হইয়াছিল, উহা একটা ক্ষুদ্র সমাজ—ক্ষুদ্র রাজ্য।—মানুষ তাহার সম্পর্কে আসিয়া স্বার্থত্যাগ করিতে, পরার্থের অনুধাবন করিতে, স্নেহ মমতা উপার্জ্জন সঞ্চয় করিতে শিখিল। একক মানব জীবন পথে দোসর পাওয়ায়, তাহার ভয় ব্যাকুলতা বহু পরিমাণে হ্রাস পাইয়া গেল। শ্রম বিভাগের দরুণ সে বিশ্রামের অবসর প্রাপ্ত হইল। কৃষি কার্য্য সুখসাধ্য হইয়া উঠিল ও কৃষি সাধন জন্ত ও ভূমি বিশেষ সম্পত্তি হইয়া দাঁড়াইল। পারিবারিক সম্পত্তি প্রথার প্রচলন হইল।

প্রাচীন সমাজের আলোচনায় দেখা যাইবে, পরিবারের প্রধান যিনি, যিনি পিতা, যিনি কর্ত্তা, তিনি একাধারে পালক, শাসক এবং পুরোহিত। দৃষ্ট ও অদৃষ্ট উভয় জগতের শাসন রজ্জু তাঁহার হাতে; তাঁহার প্রভুতা সর্ব্বোতোমুখী, পরিজনবর্গের মৃত্যু দণ্ড বিধান পর্য্যন্ত তাঁহার ক্ষমতাধীন। তখনও রাজশক্তি কিম্বা সমাজশক্তি বিকাশ লাভ করে নাই।

এক পরিবার গোত্র অথবা গোষ্ঠী পূর্ব্বে অপর পরিবারের সঙ্গে সন্ধি বিগ্রহ যানাসনে নিযুক্ত হইয়াছে, দেখা যায়। ঋক্‌বেদে দেখিতে পাই, বৃহস্পতিগণ, অঙ্গিরাগণ দস্যুদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছেন। ইঁহারা এক এক পরিবারভুক্ত লোক। তাঁহাদের সম্পত্তি, স্বার্থ, দায়িত্ব সমস্তই পারিবারিক। তখনও বোধ করি রক্ত-সম্বন্ধের বহিস্থিত বহু লোকের একনিষ্ঠতা কিম্বা একক্রিয়তা প্রকৃত প্রস্তাবে ঘটিয়া উঠে নাই।

সোলন কিম্বা পব্লিকোলার নীতি কিংবদন্তী কিম্বা বেদান্তান্তর্ভুক্ত হিরণ্যযোগী কিম্বা গোভিলের গৃহ্যসূত্র আলোচনা করিলে দৃষ্ট হইবে, তখনও প্রকৃত সমাজ শক্তি কিম্বা রাজশক্তি জন্মলাভ করে নাই। বিশৃঙ্খলার মধ্যে মানবের পরিচালন দণ্ড কখন বা কর্ত্তার উপর, কখন বা রাজার উপর অর্পণ করা হইয়াছে। এমন কি, পরবর্ত্তী সংহিতাদিতেও কর্ত্তার কি সমাজপতির কিম্বা রাজার বা পুরোহিতের অধিকার উত্তমরূপে বিভক্ত, নির্দ্দিষ্ট অথবা পরিচ্ছিন্ন হইতে পারে নাই। এতদ্বারা বুঝা যায় যে, প্রাচীন পারিবারিক স্তরের অনেক নীতি নিয়ম বহু পরবর্ত্তী কালেও যাইতে যাইতে বিলম্ব করিতেছিল। এখন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে প্রাচীন পারিবারিক প্রথা নানা মূর্ত্তিতে অবস্থান করিতেছে।

পরিবারের প্রধান লক্ষণ এই যে, মানুষ ভাল মন্দের জন্য কেবল তাহার পরিবারের নিকট, তাহার গোত্র গোষ্ঠীর নিকট দায়ী। গোত্রের বাহিরে বসুন্ধরাকে সে যথেচ্ছ ভোগোপদান রূপে ব্যবহার করিতে পারে। কিন্তু এই ভাবে বেশীকাল চলা যায় না, কারণ চারিদিকে আরও শত শত পরিবার আছে।

তখন বন্ধনের তৃতীয় সোপানে অর্থাৎ প্রকৃত সমাজে উপনীত হই। দেখিতে পাই, সমষ্টীকৃত পরিবার গুলির স্বার্থ রক্ষার্থে

এক একটী পরিবার আপনার ক্ষুদ্র স্বার্থ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছে। এই রূপে শত শত পরিবারের সম্মিলিত ইচ্ছার উপর যে বৃহৎ পরিবার, যে ভাবপদার্থ গঠিত হইল, তাহাই সমাজ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশঃ—

বুলা—My Dog

১

আয় বুলা, পায়-পড়া রঙ্গ ভঙ্গ করি
বুক্কনে, কুর্দ্দনে, তোর প্রভু ভক্তি ভরা,
বিশ্বাসী, লেহন কর বিশ্বাসের তনু
আস্বাদিতে সোমরস সুধার মাধুরী।
উপতাপ ভরা তোর—নাহি উচ্চ আশা,
বিংশতি বর্ষের প্রেমে, দিয়ে জলাঞ্জলি,
কেন পুষ্ট নাম তরে নহ লালায়িত,
প্রকৃতিতে নাহি জাগে Otus জল্পনা।

২

সারমেয়! নহ তুমি পুরুষ গণিকা,
সংসারেরি বড় হ'তে নহ অভিলাষী,
হেয় তুমি, ঘৃণ্য তুমি। ঘৃণ্য শুধু নহে
তমোস্ফীত অতি ক্ষুদ্র জাতীয়তা হীন
ওই নরকুল; সরমের রক্ত ভাতি
কপোলে যাদের নাহি হয় প্রতিভাত
পাপস্পৃহী প্রসাধিত সুজনের সাজে।

৩

পশু নাহি পশু আর, মনুষ্য স্ববলে
অধিকার করিয়াছে পশুত্ব-সম্ভার,
অসূয়ার প্রখরতা, ক্রমোন্নতি বলে
পশু হ'তে মানুষের শ্রেষ্ঠ শতধার।
পশুতে ভণ্ডামি নাই, সভ্যতা বারিধি
মথিয়া বিপদপ্রাণী, ভণ্ডামির সুধা
এনেছে শ্যামল বঙ্গে, নিরবধি পান
করিছে ও সুধারাশি উকিলে হাকিমে
ফুলোদরে, বুকোদরে, নকলে নকিবে।
শত ওকা ধনীর দুয়ারে অহর্নিশ
করিতেছে, অশরীরী, পুচ্ছ বিধুনন;
আত্মাদের হৃদয়েরে করিয়া কাঙ্গাল
অবসাদে কোন্ বনে করিছে প্রস্থান।
করি পান অপমান, সুপের ভাবিয়া
হার্দ্দ নীচতার দেহ করিছে বর্দ্ধিত
সুকুমারী আর্য্যরুচি বিলাসের দাসী।

৪

রতিমদা গণিকার নৃত্যপরা ভাবে
হইতেছে মুগ্ধ ওই পাঠার্থী যুবক
বাঞ্ছা তার উপভোগ। রূপের প্লাবনে
প্রেমের মরালে তার, ভাসাইয়া দিয়া,
নিবিড় আনন্দ রাশি—সঞ্চয়ন করি
সুখেরে স্থাপিতে চায়, বিলাসী হৃদয়ে।

৫

আশালুপ্ত। নীতি প্লুষ্ট। দীপ্ত ব্যভিচার
সত্যমুখী মিথ্যা আজ রাজ রাজেশ্বরী
ক্ষুদ্র আজ ক্ষুদ্র নহে, তুলেছে মস্তক,
ঘোষে দম্ভে, হিতবাদ পৈতৃক পিশুন।
এসছে ইংরেজ রবি, সুজন কর্জ্জন,
দাস-নাগ পাশ দিয়া বাঁধ সর্ব্বজনে,
দাম্ভিকে নিরেফ কর, লুপ্ত করে দাও
নরাধম বাঙ্গালীরে উগ্র প্রতিভার।
শত প্রাণ ইংলণ্ডের নৈতিক পরাণ
ভারতের সংঘর্ষণে, আজি ম্রিয়মাণ,
নাহি বার্ক, নাহি পিট, নাহি সেরিডন্
যা করিবে তারি গন্ধে "পূত শুভ্র ভূমি"

মুগ্ধ হ'য়ে বাখানিবে গরিমা তোমার,
প্রতি অঙ্গে দাসত্বের কণ্টক পরশ
দেও দেও অনুভব করিতে সবার।

৬

দীর্ণ, জীর্ণ বেদাঙ্কিত, উত্তরীয় ধারী
স্থবির ভারত ওই, দাঁড়ায়ে সম্মুখে
কি দেখিছ লোল চক্ষে পরিত্যক্ত পিতঃ ?
বৈদেশিক দাসত্বের মদির বন্ধন
নহে ও কঠোর গ্রন্থি—মসৃণ কোমল !
বহ্নিমুখ ভয়ঙ্কর দুর্দ্দ 'পাতক'
কঠোর প্রারব্ধি দিয়া বেঁধেছে সবায়,
কাড়িয়া ল'য়েছে নীতি, ল'য়েছে ছিনায়ে
আগম পুরাণ তন্ত্র সংযোগ বিশ্বাস।

৭

কে করিছে ক্রীতদাস ? কে ল'য়েছে হরি
হৃদয়ের সুষমায় মার্জ্জিত রুচিরে ?
নহে পিতা তমস্ফীত—উদাসী সংযত
সরল, নির্ম্মল, সৌম্য—প্রতি নিকেতন !!
স্নিগ্ধ দৃষ্টি দিয়া ঝরে তপোবন আভা
যোগারূঢ় সেই পিতা সজল নয়নে
সন্তানের প্রেতকীর্ত্তি করেন দর্শন।

৮

হে কর্জ্জন !
তোমার প্রতীক্ষা করি আছিল সময়,
এস দেব, বজ্র দিয়া গঠিয়া হৃদয়,
প্রচারিয়া নববিধি আমাদের হ'তে
কেড়ে লও 'হ্যাট' 'কোট' ব্যর্থ 'নেকটাই,
পাশ্চাত্য কুসুমভঙ্গী—সম্মুখে দীঘল
পশ্চাতে ক্রমশঃ ক্ষীণ, ক্রমে হীয়মান।

রম্য আর্য্য সরলতা বনবল্লী সম
স্নিগ্ধ পরিমল দান করে নাত আর,
বপুঃস্রবে সাত্ত্বিকতা শক্তি সঞ্চারিয়া,
বিচ্ছুরিয়া বিপ্লাবিয়া কম প্রসন্নতা,
মানুষেরে করিছে না দেব কণা দান।

১০

জ্বলিয়াছে বহ্নিরাশি, জ্বলুক জ্বলুক
অষ্টম বর্ষীয় শিশু দলিয়া চরণে
পূত শুভ্র গৌরবের, মধুর সম্মান
টানিতেছে "সিগারেট," যত্নে শিখিতেছে
বিনাশের আরাধনা স্বার্থের মন্তর।

১১

তৃষ্ণিক তৃষিত যুবা উদ্ভ্রান্ত হইয়া,
প্রেম বলি ব্যভিচারে, হ'তেছে মগন।
রম্য মূর্ত্তি গৃহলক্ষ্মী, কুলবধূটীরে
শিখাইছে যত্ন করি নিবিড়-বিলাস,
রূপমুগ্ধ, প্রেম বলি ভ্রান্তির অঞ্জন
নেত্রদ্বয়ে বিলেপিয়া, কৌশল-নির্ম্মিত
মদনের সম্মোহন মরীচিকা মাঝে
তৃষ্ণা নিবারণ তরে, মৃগের মতন
ছুটিতেছে তীব্র বেগে মহত্ত্বে উপেখি।
গৃহ পানে চেয়ে দেখ, নাহিক দেবতা,
মাতা নাই, দেবী নাই, কাঠিন্য কাঠিন্য।
'বুলা' 'বুলা' অতি প্রিয় কুকুট আমার,
তুই শুধু যা আছিলি তাই ল'য়ে সুখী,
যাষ্টিকের অঙ্গভঙ্গী একদিন তরে
করিলি না অন্নপুষ্ট দেহেতে প্রকাশ।

শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী।

উদ্ভিদ্ কি সচল ?

জগতের সমস্ত পদার্থ পর্য্যালোচনা করিলে জীবনী-শক্তির যেরূপ আভাস পাওয়া যায়, তাহাতে উদ্ভিদগণকে সজীব-শ্রেণী ভুক্ত করিতে হয়। উহার জন্ম, বৃদ্ধি, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু, সকলই আছে। সুতরাং উহা সজীব। উহার দেহ-পুষ্টির জন্য আহারের আবশ্যকতা আছে। আহার, মৃত্তিকা ও বায়ু হইতে গ্রহণ করে। উহার মূল মৃত্তিকায় প্রবিষ্ট থাকায় এবং শাখা-পত্র বায়ুমণ্ডলে বিস্তৃত থাকায়, আহার অন্বেষণ জন্য ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে হয় না। সুতরাং সাধারণত, গতি-শক্তি উহার বিশেষ উপকারে আসে না। সেই জন্য সাধারণত উদ্ভিদ গতিহীন। কিন্তু উহা কি সম্যক্ প্রকারেই গতিহীন ?

হাইড্রোজোয়া (Hydrozoa) * প্রভৃতি অতি নিম্নশ্রেণীর প্রায় উদ্ভিদবৎ জীবগণের জীবনবৃত্তান্ত পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, যাহারা জলস্থ, তাহারা সাধারণত এক স্থানেই ভাসিয়া থাকে। কিন্তু উহাদিগের দেহ হইতে সূক্ষ্ম তন্তুবৎ আঁস্ বাহির হইয়া এদিকে ও দিকে আহার অন্বেষণ করে এবং যে মুহূর্ত্তে আহার প্রাপ্ত হয়, সেই মুহূর্ত্তেই ঐ সূক্ষ্ম তন্তুবৎ আঁস গুটাইয়া গিয়া দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। কোন কোন সময়ে ঐ জীবের যে অংশ দেহ হইতে আহার অন্বেষণে বাহির হয়, তাহা নিতান্তই তন্তুবৎও নহে, কথঞ্চিৎ স্থূল। ঐ স্থূলাংশ আহার পাইলেই দেহভুক্ত করিয়া লয়। তবেই দেখা গেল, অতি নিম্ন শ্রেণীস্থ জীব, (Hydrozoa) যাহাকে আমি জল-জোয়া নাম দিতে ইচ্ছা করি, এবং যাহা দেখিতে প্রায় শেওলা শ্রেণীর উদ্ভিদের মত—তাহা অচল হইলেও তাহার ক্ষুদ্রাংশ সকল আহার অন্বেষণ সময়ে সম্পূর্ণ সচল। যদিও ঐ ক্ষুদ্রাংশের এক দিক জল-জোয়ার দেহ-সংলগ্ন, কিন্তু অন্য দিক এদিক ওদিক ভ্রমণশীল; এবং একবার জল-জোয়ার দেহ হইতে বাহির ও পরে দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

তাহার পর, ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর জীবের বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে। মৎস্য;—ইহারা ডিম্ব প্রসব এবং আহার অন্বেষণ উভয় কারণেই একা কিম্বা দলে দলে নদী বাহিয়া চলিয়া যায়। পক্ষী;—ভ্রমণকারী (migratory) পক্ষী অথবা অন্য-বিধ পক্ষী, সকলেই আহার অন্বেষণ কিম্বা ডিম্ব প্রসব জন্য একা এবং দলে দলে দূর দূরান্তরে ভ্রমণ করে। চতুষ্পদ-প্রাণীগণও প্রথমতঃ এই নিয়মের সম্পূর্ণ অনুসরণ করে। সর্ব্ব শেষে মনুষ্য; ইহারাও প্রথমত আহার অন্বেষণ জন্য নানাস্থানে ভ্রমণ করিত। অদ্যাপি ভ্রমণ-জীবী (nomadic) মনুষ্যের অস্তিত্ব লোপ হয় নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রধানতঃ আহার অন্বেষণের আবশ্যক হওয়াতেই জীবগণ প্রথমত স্থান হইতে স্থানান্তরে গতিবিশিষ্ট হয়। কখন বা সমস্ত শরীর গতি-যুক্ত হইয়াছে, কখন বা অংশ বিশেষ মাত্র। তাহা হইলে এ

* ইহাকে জলজোয়া বলা যাইতে পারে।

কথা বিশ্বস্ত ভাবে বলা যাইতে পারে যে, যাহার যে পরিমাণে একস্থানে আহার লাভ করা কঠিন হইয়াছে, সে জীব সেই পরিমাণে গতিশীল হইয়াছে; এবং যাহার যে পরিমাণে এক স্থানে আহার লাভ করা সহজ হইয়াছে, সে সেই পরিমাণে গতিহীন হইয়াছে।

এই কারণেই পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, উদ্ভিদগণের মূল মৃত্তিকায় এবং দেহ বালুতে থাকায়, এবং উহাদিগের আহার ঐ দুই স্থান হইতে সহজলভ্য হওয়াতেই, উহারা স্থূল দৃষ্টিতে অচল-বৎ বোধ হয়। অর্থাৎ আমাদিগের ন্যায় স্থান হইতে স্থানান্তর যায় না। কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, উহারাও প্রকৃত পক্ষে অচল নহে।

এ প্রবন্ধে লতা গাছের কথাই বিবেচনা করা যাউক। কুষ্মাণ্ড শ্রেণীর গাছ (cucurbitaceœ) অতি সহজেই পরীক্ষা করা যায়। ইহাদের যে সকল আঁকড়া বাহির হয়, তাহারা নিজ অগ্রভাগের বিন্দুকে কেন্দ্র করত তাহার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে। এই গাছের গাঁইট-গুলিও নিজের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে। ইহার লতাভাগের সর্ব্বাগ্র বিন্দুও বৃত্তাকারে ভ্রমণশীল। মহাত্মা ডারউইন লিখিয়াছেন * যে—

"I observed 35 revolutions of the internodes and tendrils; the slowest rate was 2 hours and the average rate 1 hour —40 min.

আমি যে লাউগাছের লতাগ্র পরীক্ষা করিয়াছি, তাহা ৩ ঘণ্টার উপর সময়ে একবার বৃত্ত সম্পূর্ণ করিয়াছিল। আর একটী জঙ্গলা লতা, যাহা খেজুরগাছের উপরে ছিল, তাহার অগ্রভাগ বোধ হয় ৫ ঘণ্টাতে একটী প্রায় ১॥০ হাত লম্বা বৃত্তাভাস অঙ্কিত করিয়া স্বস্থানে ঘুরিয়া আসিয়াছিল। এইটী আমি ও আমার ঐতিহাসিক বন্ধু অক্ষয় কুমার উভয়ে পরীক্ষা করি, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত কেহই সময়ের ঠিকানা রাখি নাই। ফলত যে সকল লতা জড়াইয়া উঠে(Twining plants) ও যাহারা আঁকড়া যুক্ত (Tendril-bearers)তাহাদিগের সকলেরই লতাগ্রভাগ, অথবা আঁকড়ার অগ্রভাগ, ও গাঁইট ন্যূনাধিক ভ্রমণশীল। ছিমগাছের লতার অগ্রভাগ লাউ অপেক্ষা শীঘ্রগামী। গতিশক্তি অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবে, ইহারা কখনও বা পূর্ণ বৃত্তাকার পথে, কখনও বা বৃত্তাভাগে ভ্রমণ করে। আর কখনও বা সূর্য্যের গতির সমদিক, কখনও বা বিপরীত দিকে ভ্রমণ করে। কিন্তু প্রায়ই সূর্য্যের গতির দিকে, অর্থাৎ পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে ভ্রমণ করে। ঐ পথ বদ্ধ করিলে সমতল ভাবে বৃত্ত অঙ্কিত করে।

এই গেল অগ্রভাগ ও গাঁইটের ভ্রমণবৃত্তান্ত। এক্ষণে সমস্ত গাছটীর ভ্রমণের বিষয় আলোচনা করিলেও দেখা যায় যে, লতা শ্রেণীর গাছ কোন একটী আশ্রয় কি অবলম্বন পাইলে সকল দিকেই অনায়াসে যাইতে পারে। মাচা অথবা কাঠির উপর নানাবিধ লতা উঠাইয়া দিয়া ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আমি একবার একটী লতার ব্যবহার দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলাম। তাহার উঠিবার জন্য একটী কাঠি একটু দূরে পুতিয়া রাখি। ঐ লতা কোন্ চক্ষে ঐ কাঠি দেখিতে পাইয়াছিল, তাহা জানি না; কিন্তু সে নিশ্চয় দেখিয়াছিল।

* Movements and habits of climbing Plants, P 128.

ঐ কাঠির দিকে লতাটী যাইতেছে, এমন সময় আমি উহাকে অন্য দিকে ফিরাইয়া দেই। কিন্তু সে নিতান্ত অবাধ্যের ন্যায় পুনঃ২ সেই দিকেই যাইতে উদ্যত হয়। তখন আমি পরাজিত হইয়া উহার গমন পথে এত উচ্চ করিয়া ইষ্টক সাজাইয়া রাখিলাম যে, ইষ্টক-স্তূপের উপর দিয়া কাঠিতে পৌঁছিতে হইলে অধিক পথ ভ্রমণ করিতে হয়। লতা তখন ইষ্টক-স্তূপের পার্শ্ব দিয়া সোজা পথে গেল। পরে আবার স্তূপকে অল্প উচ্চ করায় সেই পথই সহজ বুঝিতে পারিয়া স্তূপের উপর দিয়াই গিয়াছিল। ইহাতে কেবল গতিশীলত্ব নহে, জ্ঞান পূর্ব্বক গতিশীলতারও পরিচয় পাওয়া যায়।

যাহা হউক, দৃষ্টান্ত নানা গ্রন্থ হইতে এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা অনেক সংগ্রহ করা যাইতে পারে। তদ্দারা এক কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, উদ্ভিদ কখনই অচল নহে, তবে যখন গতিতে তাহার কোন উপকার নাই,তখন সে অচল; আর যখন গতিতে উপকর লাভ করে, তখন সে স-চল। ডারুউইন এবিষয়ে যেরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"It has often been vaguely asserted that plants are distinguished from animals by not having the power of movement. It would rather be said that pants acquire & display this power only when it is of some advantage to them ; This being of comaratively rare accurrence, as they are affixed to the pound and food is brought to them by the air and rain.

Darwin's Climbing Plants, P 206.

শ্রীশশধর রায়।

উপনিষদের উপদেশ। (১৬)

যাজ্ঞবল্ক্য ও পণ্ডিতমণ্ডলী।

পূর্ব্বকালে সুপ্রসিদ্ধ বিদেহ নগরে জনক নামে একজন সম্রাট ছিলেন। তৎকালে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র এই বিশ্রুত-যশাঃ সম্রাটের নাম ও কীর্ত্তিকলাপ উদ্‌ঘোষিত হইত এবং প্রত্যেক জনপদে, প্রতি শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকের মুখে, এই ভূপতির কথা অহরহঃ আন্দোলিত এবং প্রীতি ও ভক্তির সহিত কীর্ত্তিত হইত। এই নরপতির কেবল যে ক্ষত্রিয়োচিত ভুজবীর্য্য ও রাজনীতিকুশলতা এবং প্রজাপালননীতির যশঃ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তাহা নহে; ইহাঁর ন্যায় ব্রহ্মতত্ত্ববিৎ মহাজ্ঞানী পুরুষ তৎকালে ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যেও অতি বিরল ছিল। এই নরপতি ব্রহ্মবিদ্যার চর্চ্চা যাহাতে জাগরূক থাকে, তজ্জন্য একটী চমৎকার পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারাই আবার ইহাঁর যশঃ সর্ব্বত্র বিশেষভাবে প্রচারিত হইয়াছিল। ইনি প্রতি বৎসর, কোন এক যজ্ঞানুষ্ঠান উপলক্ষ করিয়া, আপন রাজধানীতে একটী প্রকাণ্ড সভার উদ্‌যোগ করিতেন এবং তৎকালে ভারতের যে কোন প্রদেশে যে কোন ব্যক্তি প্রধান জ্ঞানী বলিয়া খ্যাত ছিলেন, এরূপ সহস্র সহস্র পণ্ডিতবর্গকে অতি সমাদরের সহিত নিমন্ত্রণ করিয়া সেই সভাস্থলে আহূত করিয়া আনিতেন। সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলী ব্রহ্মবিদ্যা ও দার্শনিক নানাবিধ তত্ত্ব লইয়া বিচার করিতেন। নরপতি জনক স্বয়ং বিশেষ মনোযোগ সহকারে, সেই বিচার শ্রবণ করিতেন।

এইরূপে তিনি যে ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাহার ফলে আপামর সাধারণ দার্শনিক অনেক তত্ত্ব বুঝিতে পারিত, এবং পণ্ডিতদিগের মধ্যেও অনেক কঠিন কঠিন সমস্যা ও তত্ত্ব অতি সহজে মীমাংসিত হইয়া যাইত। জনক-প্রবর্ত্তিত এই বিদ্বদ্-গোষ্ঠী ভারতে বড়ই প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল এবং সর্ব্বদা ইহার ফলস্বরূপ গৃহে গৃহে ব্রহ্মনাম উচ্চারিত ও ব্রহ্মকথা গীত হইত।

মহারাজ জনক এইরূপ এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া, সমুদয় আয়োজন সংগ্রহ করিলেন। কুরু ও পাঞ্চাল নামক জনপদ হইতে সেই যজ্ঞ দর্শনার্থ বহুতর বিদ্বান্ ব্যক্তি ঐ যজ্ঞস্থলে সমবেত হইয়াছিলেন। বহু সংখ্যক পণ্ডিতমণ্ডলীকে একত্র উপস্থিত দেখিয়া, তাঁহাদের মধ্যে প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞ কে, ইহা জানিবার জন্য, রাজা জনকের নিতান্ত ঔৎসুক্য জন্মিল। যিনি এই সমবেত পণ্ডিত-মণ্ডলীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ, তাঁহাকে প্রতিগ্রহ করাইবার জন্য, রাজা জনক, এক সহস্র গো একত্র সংগ্রহ করিয়া, তাহাদের শৃঙ্গ ও ক্ষুর সুবর্ণ দ্বারা মণ্ডিত করিয়া রাখাইয়াছিলেন। কিন্তু দেখা গেল, ঐ সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে কেহই নিজকে সর্ব্বাপেক্ষা ব্রহ্মবিদ্ বলিয়া মনে করিতে সাহসী হইলেন না। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য নামে একজন ব্রাহ্মণ, তাঁহার সঙ্গীয় এক শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "বৎস! তুমি এই সুবর্ণমণ্ডিত সহস্রটী গাভীকে মদীয় আশ্রমে লইয়া যাও।" শিষ্য গুরু-বাক্যে প্রণোদিত হইয়া, তাহাই করিতে আরম্ভ করিল। সমবেত পণ্ডিত-মণ্ডলী যাজ্ঞবল্ক্যের এই দারুণ অহঙ্কার-জনিত ব্যবহার অবলোকন করিয়া অতীব ক্রুদ্ধ হইলেন এবং যাজ্ঞবল্ক্যের ব্রহ্মবিদ্যার পরীক্ষা লইবার জন্য, একে একে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

১। আর্ত্তভাগ নামে এক ব্রাহ্মণ অগ্রসর হইয়া যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিতে লাগিলেন:— "যাঁহার উত্তমরূপে ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিয়া গিয়াছে, এরূপ ব্যক্তির মৃত্যুকালে, তাঁহার প্রাণ ও মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-শক্তি কোথায় চলিয়া যায়? ইহারা কি তখন ঊর্দ্ধে উৎক্রান্ত হইয়া অন্যদেহ আশ্রয় করে?"

যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিলেন,—"না, তাদৃশ ব্যক্তির ইন্দ্রিয়শক্তি ঊর্দ্ধে উৎক্রমণ করে না। ঊর্ম্মিমালা যেমন সমুদ্রে লীন হইয়া যায়, তদ্রূপ উহারাও উহাদের কারণীভূত আত্মপদার্থে বিলীন রহিয়া যায়। আর সেই বিলীন শক্তির পুনরাবির্ভাব সাধিত হয় না; কেন না সে গুলি সে ভাবে আর ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা বিশুদ্ধ পুরুষকে আশ্রয় করিতে পারে না; তাঁহার পক্ষে উহারা ধ্বংস হইল, ইহাই বলা যাইতে পারে। বন্ধনগুলির বিনাশ হইলে, মুক্ত পুরুষের আর কোথাও যাইতে হয় না।"

আর্ত্তভাগ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তাদৃশ ব্রহ্মজ্ঞানীর মৃত্যুর পর কি কেবল তাহার ইন্দ্রিয়াদিরই ধ্বংস হয়, না ইন্দ্রিয়াদির প্রযোজক কর্ম্ম বাসনাদিরও ধ্বংস হয়? যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন —মহাশয়! তাদৃশ ব্যক্তির কেবল যে প্রাণাদি শক্তিরই ধ্বংস হয়, এরূপ নহে, তৎপ্রযোজক কর্ম্ম বাসনাদিরও একান্ত ধ্বংস সাধিত হয়। নাম ও রূপ (জাতি ও ব্যক্তিশক্তি), উভয়েই ব্যবহারিক ভাবে নিত্য। কেননা নাম, অনন্ত ব্যক্তি সমূহের আকৃতিতে নিবদ্ধ,

এবং অনন্ত বলিয়াই তাহা নিত্য। প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলে, এই নামরূপেরও ধ্বংস হয়। *

আর্ত্তভাগ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই ইন্দ্রিয়াদির প্রযোজক কে? কাহার বলে এবং কিরূপ উপাদান হইতে উৎপন্ন হয়? যাজ্ঞবল্ক্য! জীবের মৃত্যুর সময়ে যখন বাক্য তেজে, প্রাণ বায়ুতে, চক্ষু সূর্য্যে, মন চন্দ্রে, শ্রোত্র দিক্ সকলে, শরীর পৃথিবীতে, শুক্রশোণিতাদি জলে এবং সূক্ষ্মদেহ বুদ্ধিতে,—এইভাবে যে যাহার উপাদান, তাহাতে তাহা বিলীন হইয়া যায়, সেই অবস্থায় মৃত জীব কোথায় থাকে? জীব তখন কোন্ আশ্রয় অবলম্বন করিয়া থাকে? পুরুষ আবার কোথা হইতে কিরূপে সেই ইন্দ্রিয়-শক্তিগুলি পুনঃপ্রাপ্ত হয় এবং সংসারে আসিয়া বন্ধন দশা প্রাপ্ত হয়?"

যাজ্ঞবল্ক্য, আর্ত্তভাগের প্রশ্নগুলি শুনিয়া, একটী নিভৃত স্থানে তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া উত্তর দিলেন :—

"কেহ কেহ স্বভাব, যদৃচ্ছা, কাল, দৈব ও কর্ম্ম,—এই কয়েকটীকে ইন্দ্রিয়াদির উৎপত্তির হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। বাস্তবিক পক্ষে, ইহাদের মধ্যে কর্ম্মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হেতু। জীব দ্বারা আচরিত কর্ম্মগুলি শক্তিরূপে,—সংস্কাররূপে,—থাকিয়া যায়। তাহারাই ইন্দ্রিয়াদির শক্তি-বীজ। সেই সূক্ষ্ম শক্তি থাকে বলিয়াই, তাহার বলে পুনরায় ইন্দ্রিয়শক্তি উপযুক্ত ক্ষেত্রে স্থূলভাবে দেখা দেয়।" † (ক্রমশঃ)।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

* এই তত্ত্বটীর ভাবার্থ এই যে, বিলোমভাবে জীবের সমুদয় শক্তি তত্তৎকারণে লয় পাইতে পাইতে, জীবও ঈশ্বরে বিলীন হয়। কিন্তু তখন ঈশ্বরে শক্তিরূপে নাম ও রূপ বিলীনভাবে অবস্থিত থাকে, কেননা ঈশ্বর জগতের সর্ব্বশক্তির বীজস্বরূপ। নাম ও রূপ শক্তির সহিত সম্বন্ধ বশতঃই ব্রহ্মের 'ঈশ্বর' সংজ্ঞা। অতএব ঈশ্বর যে ভাবে নিত্য, নামরূপও (Percept and concept) সেই ভাবে নিত্য। ঈশ্বরে লীনভাবে অবস্থিত এই জীব যখন তৎপরে পরিপূর্ণ, সর্ব্বাতীত ব্রহ্ম-পদার্থে পতিত হয়, তখন তাহার প্রকৃত মুক্তি হইল। আর তাহাকে অবিদ্যা আক্রমণ করিতে পারে না, কেননা তখন তাহার ব্যবহারিক নাম ও রূপ ধ্বংস হইয়াছে। এ সকল কথা ক্রমে আমরা পরিস্ফুট করিব।

† আমরা এই "উপনিষদের উপদেশ" নামক বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিগত এক সংখ্যায় এই ইন্দ্রিয়াদির উৎপত্তি সম্বন্ধে বেদান্তের প্রকৃত মর্ম্ম কিরূপ, তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। তজ্জন্য এস্থলে পুনরুল্লেখ করিলাম না। সহৃদয় পাঠক সেই সংখ্যাটী এই উপলক্ষে একবার দেখিয়া লইলে, তাহা বুঝিতে পারিবেন।

কবিওয়ালা।

কেন্দুবিল্বের প্রেমিক কবি কোমলকান্ত পদময়ী তরল সংস্কৃতে রাধাকৃষ্ণ-লীলা গাহিয়া নীরব হইলে, তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণ রাধাশ্যামের লীলা বর্ণনা ছলে প্রেমময়ী ভাষায় হর্ষ-বিষাদ-অশ্রু-মিশ্রিত, ভক্তি-নির্ম্মাল্যের সমাহারে বৈষ্ণবীয় প্রেমকাহিনী প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। বৈষ্ণব কবিদিগের সুধা-সিক্তকণ্ঠের কাব্যরাগিণী নিঃশেষ হইবার অব্যবহিত পর হইতে বৈষ্ণবধর্ম্ম হইতে এক অভিনব শাখা বহির্গত হইয়া বঙ্গবাসীদিগকে

প্রেমতরঙ্গে ভাসাইয়াছিল। এই শেষোক্ত ব্যক্তিরাই সাধারণতঃ কবিওয়ালা নামে সুপরিচিত। প্রায় দুই শত বর্ষ পূর্ব্বে এদেশে কবি সংগীতের সূত্রপাত হয়। তৎকালে বিরচিত কবি-সংগীতেও ভাবের গাম্ভীর্য্য, ভাষার লালিত্য, শব্দ-পারিপাট্য প্রভৃতির অভাব ছিল না। কোন কোন গানে কবি দার্শনিক ভাবেরও সমাবেশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ এই প্রাচীন কবি সংগীত পাঠ করিলে প্রতীতি হইবে যে, কবিওয়ালাগণ যথার্থই কবিত্ব-শক্তি লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রকৃতি-দত্ত কবিত্ব শক্তিতে মহোচ্চ ছিলেন।

কবিওয়ালাদিগের মধ্যে গোঁজলা গুঁই সর্ব্বাদিম প্রাচীন কবি। "১৪০ এক শত চল্লিশ বৎসরের এ দিকে নহে, বরং অধিক হইবে, গোঁজলা গুঁই গান প্রস্তুত করেন।"* তৎপর রাসু নৃসিংহ, হরু ঠাকুর, রামবসু, কেষ্টা মুচী (কৃষ্ণচন্দ্র চর্ম্মকার), ভোলা ময়রা, নিত্যানন্দ বৈরাগী, গোর কবিরাজ, নবাই পণ্ডিত, মহেশ কাণা, নীলমণি পাটনী, নীলু-ঠাকুর, ভবানী বেণে, মোহন সরকার, আণ্টনি ফিরিঙ্গি, রামসুন্দর রায় প্রভৃতি বহুতর কবির আবির্ভাব হয়। ইহাদের সকলেরই যশঃ সৌরভ দিগ্‌দিগন্ত বিস্তারিত না হইলেও, রাসু নৃসিংহ, হরুঠাকুর, নিত্যানন্দ বৈরাগী প্রভৃতির ভাগ্যে যশঃমাল্য লাভ ঘটিয়াছিল। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা রামবসু সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার দ্বারাই কবি-সংগীতের চরমোৎকর্ষ সংসাধিত হয়। "যেমন সংস্কৃত কবিতায় কালিদাস, বাঙ্গালা কবিতায় রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র, সেইরূপ কবিওয়ালাদিগের কবিতায় রাম বসু। যেমন ভৃঙ্গের পক্ষে পদ্মমধু, শিশুর পক্ষে মাতৃস্তন, অপুত্রের পক্ষে সন্তান, সাধুর পক্ষে ঈশ্বর-প্রসঙ্গ, দরিদ্রের পক্ষে ধনলাভ, সেইরূপ ভাবুকের পক্ষে রামবসুর গীত।"*

বিগত অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত,—এই কালটাকে 'গানের যুগ' এই আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। এই সময়ের মধ্যে নানা শ্রেণীর সংগীতকারের আবির্ভাব হইয়াছিল। আমাদের আলোচ্য কবিওয়ালাগণও এই সময়ের মধ্যে, সাধারণে পরিচিত হইয়া উঠে। তাঁহাদের অনেকেরই জীবনচরিত নিবিড় কুহেলিকাচ্ছন্ন। গুপ্ত কবি বহু চেষ্টাতেও সকলের জীবন বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। আমিও যে পারিয়াছি, তাহা সাহস করিয়া বলিতে পারি না। তবে দশ জনের সহানুভূতি লাভ করিতে পারিলে যে, বিশেষ কষ্টসাধ্য হইবে, তাহা আমি বিশ্বাস করি না। কবিওয়ালা-দিগের কাহারো সম্পূর্ণ গীতগুলি পাওয়া যায় নাই, বা সুসম্পাদিত হয় নাই। আমি প্রত্যেক কবিওয়ালার জীবন বৃত্তান্ত ও গান সমূহ সংগ্রহে ব্যাপৃত আছি। আমার অন্বেষণ শেষ হইলে সে গুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে। পাঠকগণের মধ্যে যদি কেহ আমাকে এ বিষয়ে সাহায্য করিতে পারেন,

* গুপ্ত কবির 'সংবাদ প্রভাকর'—১লা অগ্রহায়ণ, ১২৬১ সাল। কিন্তু দীনেশ বাবু 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' লিখিয়াছেন,—'কবিগণ প্রথমে 'দাঁড় কবি' নামে পরিচিত ছিলেন, আসরে দাঁড়াইয়া কবিতা প্রস্তুত করিতেন বলিয়াই বোধ হয় তাঁহারা এই খেতাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রঘু, যত্তে, নন্দ এই তিন জনই সর্ব্ব প্রথম কবিওয়ালা বলিয়া পরিচিত হন। ইহাঁরা বাঙ্গালা একাদশ শতাব্দীর লোক।"

* সংবাদ প্রভাকর।

তবে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিব। আমি যাহা সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা ক্রমে ক্রমে 'নব্যভারতে' প্রকাশিত হইবে। যদি কাহারও নিকট কবিওয়ালা-দিগের কাহারও কোনও গান থাকে, তবে অনুগ্রহ করিয়া তিনি তাহা নব্যভারত সম্পাদক মহাশয়ের নিকট বা আমার নিকট পাঠাইয়া দিলে বাধিত হইব।

অদ্য আমি রাম বসুর সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। অন্যান্য কবিওয়ালা-দিগের সম্বন্ধে যথাক্রমে আলোচনা হইবে।

১। রাম বসু।

কবি রাম বসুর নাম রাম মোহন বসু। কিন্তু তিনি আপামর-সাধারণের নিকট রাম বসু বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। জনসমাজের হৃদয়ের উপর তিনি যে প্রভূত আধিপত্য বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, ইহাই তাহার প্রমাণ। রাম বসু বাঙ্গালা ১১৯৩ সালে, ইংরেজি ১১৮৬ খ্রীষ্টাব্দে, কলিকাতার অপর পারে পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর তীরস্থিত শালিখা গ্রামে ভদ্রবংশোদ্ভব কুলীন কায়স্থ কুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রামলোচন বসু ও মাতার নাম নিস্তারিণী ছিল। রামলোচনের দুই পুত্র,—জ্যেষ্ঠ রামমোহন বা রাম বসু এবং কনিষ্ঠ কৃষ্ণমোহন। কৃষ্ণমোহন শৈশবেই পিতামাতার স্নেহ-ঋণ পরিশোধ করিয়া ইহকালের পরপারে গমন করে। এই অকস্মাৎ বিপদ্-শেলে রবিলোচন ও নিস্তারিণীর বক্ষঃপঞ্জর চূর্ণ বিচূর্ণ হইলেও বালক রামলোচনের মুখ চাহিয়া ক্রমে ক্রমে শোকে শান্তি লাভ করেন। অতঃপর রামমোহন পিতৃমাতৃ স্নেহাদরের একমাত্র কেন্দ্রস্থল হইল, তাহাদের পুঞ্জীভূত বাৎসল্যরসে তাহার ভাগ্য-জীবন গঠিত হইতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে রামমোহন চারি বৎসরের হইল। পঞ্চম বর্ষে রবিলোচন শুভ দিনে পুত্রের হাতে খড়িমাটী দিয়া পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের নিকট বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন। আমাদের অনেকেরই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে, কবিওয়ালারা সকলেই সরস্বতীর বরপুত্র। কিন্তু এ ধারণা কত দূর ন্যায়সঙ্গত, তাহা আমরা অনেকেই তলাইয়া দেখি না, বা দেখিবার ক্ষমতা নাই। আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সকলেই কবিওয়ালা নাম শুনিলে নাসিকা কুঞ্চিত করেন, যেন উহারা অশ্লীলতার এক একটী মূর্ত্তিমান সজীব চিত্র! হায় রে শীলতা! বর্ত্তমান সময়ের নব্যভব্যের মতন প্রাচীন কবিওয়ালাগণের বিদ্যালয়ে শিক্ষা-লাভ না ঘটিতে পারে,—তোতাপাখীর ন্যায় পুঁথিগত কতকগুলি পাঠ মুখস্থ না করিয়া থাকিতে পারে, অধুনাতন কালের অনুরূপ তাহারা অল্প-বিদ্যা-ভয়ঙ্করীরূপে বাহাড়ম্বর প্রকাশের চেষ্টা না করিয়া থাকিতে পারে, পরতোষামোদ, পরপদলেহনে প্রভৃতি বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজের ব্যবহার শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ হইতে পারে, কিন্তু তাহারা যে অশিক্ষিত, অসভ্য, কুরুচির জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি ছিল, তাহা কি প্রকারে প্রমাণিত হয়?

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ না করিতে পারিলে কি শিক্ষিত হওয়া যায় না? শ্বেতাঙ্গ-পদলেহন না করিতে পারিলে কি সভ্য হওয়া যায় না? বর্ত্তমান সময়ের এই সকল স্পৃহনীয় গুণাবলীতে তাহারা মণ্ডিত না হইলেও, তাহারা প্রকৃত শিক্ষিতের চির-পূজ্য, জ্ঞানী সমাজ ও জন সাধারণের চির-

স্তুন শ্রদ্ধা ও প্রীতিভাজন। কবিসংগীতে যে সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও স্নিগ্ধতা পাওয়া যায়, একালে তাহার উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী কোথায়? লোকালয় হইতে সুদূরে গিরিকান্তারে বিজন অরণ্যে, কুসুমরাজি যেমন স্বাভাবিক অনুশাসনে প্রস্ফুটিত হইয়া,আপন সৌন্দর্য্যে আপন সৌরভে আপনি মোহিত হয়, অপরকে সে মাধুরী দর্শনের অবকাশ না দিয়া আপন গৌরবে আপনি গৌরবান্বিত হইয়া যেমন ঝরিয়া পড়ে; এই সকল কবিওয়ালারাও তদ্রূপ স্বভাব-প্রদত্ত কবিত্ব প্রভাবে আপনিই বিকশিত হইয়া, আপন গৌরবে আপনি গর্ব্বানুভব করতঃ স্বর্গাদপী গরীয়সী জননী ও জন্মভূমির জয় ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, আপনার প্রকৃতি-প্রদত্ত অতুলনীয় কবিত্ব-শক্তি প্রভাবে আপামর সাধারণের হৃদয়ের উপর একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন। পরপ্রদত্ত শিক্ষার উপর, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির উপর তাহাদিগকে নির্ভর করিতে হয় নাই। তাঁহারা আপন গৌরবে আপনি অতুলনীয়। তাঁহারা এইরূপে প্রকৃতির মনোহর রাজ্যে—চিরশ্যামল কাননে স্বচ্ছন্দ গতিতে বিচরণ করিয়া যে কবিতা-মধু সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন, তাহার এক এক কণা সাহিত্য-ভাণ্ডারের এক এক কোহিনূর। যাঁহারা সরল অন্তরে সেই কবিতা-মধুর রসাস্বাদনে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন, কবি-সংগীতে কি অনাস্বাদিতপূর্ব্ব প্রীতিরসের প্রস্রবণ বিদ্যমান আছে, তাঁহারাই বলিতে পারেন, কবি-সংগীত পাঠে কি অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দ-উৎসে অভিসিঞ্চিত হইতে হয়।

কবিওয়ালাদিগের মধ্যে রাম বসু [illegible] সন্দেহে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিভা ঈশ্বর প্রদত্ত, সুতরাং সর্ব্বত্র অপ্রতিহত। পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম কালে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় অধ্যয়নকালে শিশু রামমোহন যে কাব্যরসের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা প্রায় সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। বর্ণপরিচয়ের অল্প দিন পর হইতেই রামমোহন কলা ও তালপাতে কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করেন। স্বভাবের প্রিয় শিষ্য সরলহৃদয় বালক রামমোহন সেই সকল কবিতার কার্য্যকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত না। আপন উচ্ছ্বাস ভরে কলার পাতে কবিতা লিখিয়া কখনও ফেলিয়া দিত, কখনও বা সমপাঠিদিগকে শুনাইয়া তাহাদের মধ্যেই বিতরণ করিত। বালক জানিত না, কালে তাহার কবি-প্রতিভায় বঙ্গদেশ বিমুগ্ধ হইবে।

রামমোহন পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের নিকট মোটামোটী ভাষা-জ্ঞান লাভ করিলে, তাহাকে কলিকাতায় রাখিয়া পড়াইবার জন্য শালিখা-গ্রামবাসীগণ রবিলোচনকে পরামর্শ দিলেন। পাঠশালার গুরুমহাশয় বালকের কবিত্ব-উন্মেষের পরিচয় পাইয়া, তাহার ভাবী সাফল্যের কথা প্রতিবাসী ও রবিলোচনের নিকট প্রকাশ করেন। কলিকাতায় থাকিলে নানারূপ দেখিয়া শুনিয়া অধিক জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে এবং সৎ সংসর্গে পড়িলে অধিকতর কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা ইত্যাদি ভাবিয়া রবিলোচন গ্রামবাসীগণের পরামর্শানুযায়ী অধ্যয়নার্থ পুত্রকে কলিকাতায় প্রেরণ করিলেন।

[illegible] নৃসিংহ, হরুঠাকুর প্রভৃতি কবিগণ [illegible] বিভিন্ন সংসর্গে পড়িয়া পড়াশুনার প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করেন। তাঁহারা [illegible] হইতেই গান বাজনার

প্রতি অনুরক্ত হন, এবং তাহার আলোচনাতেই প্রমত্ত হইয়া উঠেন। রামবসু তাহাদিগের পথানুসরণ না করিয়া মনোযোগের সহিত লেখাপড়া করিতে থাকেন। কলিকাতার যোড়াসাঁকোর নিজ পিসা মহাশয়ের আবাসে থাকিয়া দ্বাদশবর্ষ বয়সে তিনি যে সকল কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, ভবানী বণিক নামক এক কবিওয়ালা তাহা অতি আদরের সহিত গ্রহণ করতঃ নিজদলে গাওনা করিতেন। ভবানী একদা যোড়াসাঁকোর পথে যাইতেছিলেন, দৈবক্রমে কয়েকটী গান তিনি পথিমধ্যে কুড়াইয়া পান। গানগুলি অত্যন্ত শ্রুতিমধুর ও উচ্চ ভাবাত্মক দেখিয়া তিনি তাহার রচয়িতার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া জানিতে পারেন যে, রামবসুই তাহার রচয়িতা। তৎপর ভবানী, রাম বসুর গান সংগ্রহ করিতে প্রয়াস পান। কিন্তু তাঁহার পক্ষে প্রথমতঃ ঐ সকল গান সংগ্রহকরা সহজসাধ্য হয় নাই। তিনি প্রথমতঃ রাম বসুর সহাধ্যায়ীদিগের শরণাপন্ন হন, তাহাদিগকে নানারূপ অনুনয় বিনয়ে বাধিত করিয়া, তাহাদের সাহায্যে গান সংগ্রহ করিতে থাকেন। কিছু দিন এই ভাবে যায়, তাহার পর ভবানীর অনুরোধে রামবসু প্রত্যক্ষভাবে তাঁহাকে কবিতা প্রদান করিতে আরম্ভ করেন। একদা তাঁহারই নির্ব্বিন্ধাতিশয্যে রামবসু কলিকাতার কোনও এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ভবনে ভবানীর দলে প্রথম গান করেন। রবিলোচন পুত্রের এবম্বিধ আবরণে নিতান্ত দুঃখিত হন এবং নানারূপ অনুযোগ সহকারে তাঁহাকে পত্র লিখেন। রামবসু, ভবানীর অনুরোধে ও সা[illegible]-রতায় ঐরূপ তাঁহার দলে গাওনা করি[illegible] ছিলেন মাত্র, তদতিরিক্ত [illegible]হার চরিত্র কলুষিত হইয়াছিল না। তিনি যে পাঠ্যাবস্থায় কবির দলে গাওনা করিয়া অতি গর্হিত কার্য্য করিয়াছেন, তাহা পিতার অনুযোগে বুঝিতে পারিলেন এবং অতঃপর আর বয়েটেদিগের সংসর্গে না মিশিয়া প্রাণপণ যত্নে বিদ্যাধ্যয়নে মনঃসংযোগ করিলেন। কিন্তু ইহার অল্প দিন পরে তাঁহার পিতা পরলোক গমন করিলে তাহার সকল কামনা সেই ত্রয়োদশ বা চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সেই বিফল হইল। তাঁহার পিতার আর্থিক অবস্থা উন্নত ছিল না, কাজেই পিতৃবিয়োগের পর তাঁহাকে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া উদরান্ন সংস্থানের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতে হইল। এইরূপ অবস্থা-বিপর্য্যয়ে পড়িয়া সুকুমার-মতি বালকের পাঠ্যাবস্থা শেষ হইল।

রাম বসু স্বাধীনচেতা পুরুষ ছিলেন। সংসারের সর্ব্ব প্রকার চাপ স্কন্ধে পড়িলেও তিনি উদরান্নের জন্য দাসত্বশৃঙ্খলে নিজকে নিপতিত করিতে প্রস্তুত হইলেন না। গ্রামের সকলেই তাঁহাকে চাকুরীর অন্বেষণ করিতে পরামর্শ দিলেন, কিন্তু সে পরামর্শ তাঁহার মনঃপুত হইল না। পরপদলেহন অপেক্ষা স্বাধীন ভাবে যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতে পারা যায়, তাহাই যথেষ্ট বিবেচনা করিয়া তিনি কবি-সংগীত রচনা করিবার সংকল্প করিলেন। কিন্তু পিতৃবিয়োগের পর, উপস্থিত দায়সমূহ হইতে মুক্ত হইবার অভিপ্রায়ে, তিনি কিছু দিনের জন্য একটী কেরানিগিরি কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। বেশি দিন তাঁহাকে মাছিমারাদিগের দলপুষ্ট করিয়া থাকিতে হইল না। শীঘ্রই তিনি [illegible] হইয়া স্বীয় গন্তব্য পথে অগ্রসর [illegible]ন। তৎকালে সর্ব্বত্র কবি-সংগীতের

আদর ছিল।* বড় বড় রাজা মহারাজাগণ পূজা পার্ব্বণে বা অন্য কোন প্রকার সামাজিক উৎসব উপলক্ষে স্বভবনে কবির গান দিতেন। তৎকালে অনেকে এই ব্যবসাতে প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। তাই রামবসু এই ব্যবসার দ্বারা স্বাধীনভাবে জীবিকা সংগ্রহের চেষ্টায় নিযুক্ত হইলেন। তিনি প্রথমতঃ ভবানী বেনে, নীলু ঠাকুর, মোহন সরকার প্রভৃতির কবির দলে গান বাঁধিয়া দিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে তাঁহার বেশ দুই পয়সা রোজগার হইতে লাগিল এবং তাঁহার নামও ক্রমে ক্রমে জন সাধারণে প্রচারিত হইতে লাগিল। শেষে তিনি সাধারণে এতই পরিচিত হইয়াছিলেন যে, লোকে তাঁহাকে সংক্ষিপ্ত করিয়া রামবসু বলিয়া ডাকিতে লাগিল। ভবানী বণিক প্রভৃতি কবিওয়ালাগণও রামবসুর রচিত গান শুনাইয়া প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করেন এবং দেশ বিদেশে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠেন।

পিতৃ বিয়োগের পর হইতেই রামবসুর কবির দল করিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ইংরেজি স্কুলের পড়ার গুণেই হোক্ বা আর কোনও কারণেই হোক্, আসরে নামিয়া গান গাহিতে তৎকালে তাঁহার লজ্জাবোধ হইল, তাই তিনি গান রচনা করিয়া ভবানী বণিক, হরুঠাকুর প্রভৃতি কবিওয়ালাদিগকে দিয়া যাহা কিছু পাইতেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতেন। কিন্তু প্রথম যখন তাঁহার যশঃ সুখ্যাতি ইতস্ততঃ বিঘোষিত হইতে লাগিল, লোকে যখন তাঁহার গান শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল, তখন তিনি স্বহস্তে লজ্জার বাঁধ ভাঙ্গিয়া এক সখের দল খাড়া করিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই এই সখের দল পেশাদারী দলে পরিণত হয়।

আমরা এ পর্য্যন্ত রাম বসুর গান সম্বন্ধে কোনও কথাই বলি নাই, এক্ষণে তাহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। কবি-সম্প্রদায়ের মধ্যে রামবসু যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছু মাত্র কারণ নাই। তাহার রচিত বিরহ, সখীসম্বাদ, লহর সপ্তমী প্রভৃতি সঙ্গীতগুলি সাহিত্য-ভাণ্ডারের এক একখানি অত্যুজ্জ্বল হীরকখণ্ড। বিশেষতঃ তাঁহার বিরহ সংগীতগুলির যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় না। প্রেমিক বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাসের পর অন্য কোনও কবির লেখনী হইতে রামবসুর ন্যায় বিরহ গীতি নিঃসৃত হয় নাই। তাঁহার প্রত্যেক বিরহ সংগীত পাঠে বোধ হয়, যেন কোনও বিরহ-বিধুরা, কান্ত-সন্দর্শন-বিমুখা নারী, দুঃসহ বেদনায় নিপীড়িত হইয়া, নয়ন জলের সহিত মরমের কথাগুলি অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। আমরা ক্রমে ক্রমে এ কথার সত্যতা সপ্রমাণ করিতেছি, পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন, আমার এ বর্ণনার এক কণাও অতিরঞ্জিত বা কল্পিত নহে।

কবিওয়ালাগণকেও বৈষ্ণব কবি বলা যাইতে পারে। ইহাদের গানেরও প্রধান অঙ্গ —রাধাকৃষ্ণ লীলা। মান, মাথুর, বিরহ, গোষ্ঠ, সখীসম্বাদ প্রভৃতি বিষয়

---

* "কবি, যাত্রা, পাঁচালী প্রভৃতি সেকালের প্রধান আমোদ ছিল। তাহার মধ্যে কবি প্রধান। হরুঠাকুর, নিতে বৈষ্ণব, রাসু, নৃসিংহ, রামবসু, ভবানী বেনে, ইহাদের কবিতা সর্ব্বত্র বড় আদরের বস্তু ছিল।" রাজনারায়ণ বসু প্রণীত 'সেকাল আর একাল' ১৩ পৃষ্ঠা।

ইহাঁরাও পাওনা করিতেন। তবে সাধারণতঃ বৈষ্ণব কবি বলিলে আমরা যাহা বুঝি, ইহাঁরা সে শ্রেণীর নহে। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের তিরোভাবের পর বঙ্গীয় সাহিত্য-কুঞ্জে আর এক শ্রেণীর কবির ঝঙ্কার উত্থিত হয়। এই শ্রেণীতে মুকুন্দরাম, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র প্রভৃতির নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। তৎপর আর এক শ্রেণীতে বিহারী লাল, মধুসূদন, হেমচন্দ্র আসীন। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে আর এক শ্রেণী আছে। রামবসু, হরুঠাকুর, রাসু, নৃসিংহ প্রভৃতি কবিগণ তাহারই অন্তর্ভুক্ত। এই শ্রেণীর কবিকে লোকে কবিওয়ালা বলিয়া অভিহিত করিত। সার্দ্ধ ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে এই সকল কবির গান ভদ্র সমাজে প্রচলিত ছিল। বিবাহ, দোল, দুর্গোৎসব প্রভৃতি উপলক্ষে ধনাঢ্য বক্তির ভবনে কবির গান গীত হইত। ভদ্র সমাজের নরনারী সকলেই তাহা শ্রবণ করিত, কাহারো পক্ষে নিষিদ্ধ ছিলনা। তৎপরে ইংরেজি সভ্যতার ভূরি প্রচলনে লোকের রুচি পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল, কবির গান ভদ্রসমাজ হইতে বিতাড়িত হইয়া ইতর লোকের আসরে অবতীর্ণ হইল। সমাজের নিম্নশ্রেণীর নিরক্ষর নরনারী প্রকৃত বৈষ্ণব ধর্ম্মের ব্যাখ্যা বুঝিবার মত শক্তি ধরে না, মান, মাথুর, বিরহ প্রভৃতির ভাব তাহাদের বুদ্ধির অগম্য, কাজেই তাহারা খেউড় শুনিবার জন্য লালায়িত হইল। কবিওয়ালাদিগকে ভদ্র সমাজই প্রতিপালন করিতেছিল, তথা হইতে অর্দ্ধচন্দ্র প্রাপ্ত হইয়া তাহারা [illegible]ের জন্য ইতর সমাজের শরণাপন্ন হইল এবং তৎসমাজের রুচি অনুযায়ী খেউড় গাইতেই প্রবৃত্ত হইল। এখনকার শিক্ষিত ব্যক্তি কবির গানের নাম শুনিলেই নাসিকাতে রুমাল দেন, তাহার ঐরূপ দশাবিপর্য্যয়ের প্রধান কারণ—সমাজ, ভদ্রসমাজের সহানুভূতির অভাবেই তাহাদের ঐরূপ রূপান্তর সংঘটিত হইয়াছে।

যাহা হোক্, এক্ষণে আমরা রামবসুর কবি-প্রতিভা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করিব। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, রাম বসুর বিরহের ন্যায় প্রেমের নিখুঁত ছবি চণ্ডীদাসের পর আর কোন কবির বিরহে পাওয়া যায় না। ইদানীন্তন কালে রামবসুই বিরহের রাজা বলিলেও হয়। এক ব্যক্তি তাঁহার বিরহ শুনিয়া এতই বিমুগ্ধ ও বিমোহিত হইয়াছিল যে, গান শুনিতে শুনিতে তিনি বলিয়া উঠেন যে, আমার যদি টাকা থাক্‌তো তবে রামবসুকে লাখ্ টাকা দিতাম। পাঠকগণ তাঁহার একটী বিরহ-সংগীত শ্রবণ করুন,—

দৈবযোগে যদি প্রাণনাথ।
হ'ল এ পথে আগমন;
কথা কও,—একবার কও কথা,
তোল ও বিধুবদন।

প্রেমিকা বহুদিন প্রেমিকের দর্শন পায় নাই, দৈবযোগে একদিন উভয়ের মিলন হইল। প্রেমিক অতিশয় লজ্জিত হইয়া অধোবদন হইল, লজ্জা আসিয়া তাহার মস্তক অবনত করিল। কেকি বলিয়া প্রেমিকাকে সম্বোধন করিবে, তাহা ঠিক ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছে না। তাহাকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া প্রেমিকা কষ্ট অনুভব করিল। সে প্রেমিককে সঙ্কোচ পরিত্যাগ করাইবার জন্য, তাহার [illegible] বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিবার অভিপ্রায়ে বলিল,—

প্রণয় ভেঙেছে, ভেঙেছে তায় লজ্জা কি ?
এখনতো প্রেম ভাঙ্গাভাঙ্গি অনেকের দেখি !
আমার কপালে নাই সুখ,
বিধাতা হ'লো বিমুখ,
আঁখি সাগর ছেঁচেও সখা !
মাণিক পেলাম না !
দাঁড়াও—দাঁড়াও—দাঁড়াও
প্রাণনাথ ! বদনঢেকে যেও না।
তোমায় ভালবাসি তাই,
চোখের দেখা কেবল দেখ্‌তে চাই,
কিছু—থাকো থাকো ব'লে ধ'রে রাখ্‌বো না।
শুধু দেখা দিলে তোমার মান যাবে না,—
তুমি যাতে ভাল থাক, সেই ভাল,
গেল গেল বিচ্ছেদে প্রাণ আমার গেল,—
তোমার পরের প্রতি নির্ভর,
আমি তো ভাবি না পর,
তুমি চক্ষু মুদে আমায় দুঃখ দিও না।

পাঠক, দেখিবেন, কি নিষ্কাম ভালবাসা, ভোগ বিলাস-লালসা হইতে বহুদূরে প্রতিষ্ঠিত। কবির গানের নাম মাত্র শুনিলে যাহারা ভাবেন, কি একটা বিতিকিচ্ছি বীভৎস কাণ্ড, তাহারা একটু মনোযোগের সহিত গানগুলি পাঠ করিবেন।

রামবসুর আর একটী বিরহ-সংগীত এইরূপ,—

মনে রৈল সই মনের বেদনা,
প্রবাসে যখন যায়গো সে,
তারে বলি, বলি, আর বলা হল না।
শরমে মরমের কথা কওয়া গেল না।
যদি নারী হয়ে সাধিতাম তাকে,
নির্লজ্জা রমণী বলে হাসিত লোকে।
সখি, ধিক্ থাক্ আমারে, ধিক্ সে বিধাতারে;
নারী জনম যেন করে না। (মহড়া)
একে আমার এ যৌবন কাল,
তাহে কাল বসন্ত এলো।
এ সময় প্রাণনাথ, প্রবাসে গেল।
যখন হাসি হাসি, সে 'আসি বলে',
সে হাসি শুনিয়া ভাসি নয়ন জলে।
তারে পারি কি ছেড়ে দিতে, মন চায় ফিরাইতে,
লজ্জা বলে—ছি, ছি ছুঁইও না! (চিতেন।)
তার মুখ দেখে, মুখ ঢেকে কাঁদলেম স্বজনী।
অনাসে প্রবাসে গেল সে গুণমণি।
একি সখি, হ'ল বিপরীত,
মদন দহিছে এখন এ অবলার প্রাণে।
প্রাণের জ্বালায় এখন প্রাণ বাঁচানো দায়,
লজ্জা পেয়ে লজ্জা বুঝি না রহে আমার,—
কারে এ দুঃখ কব সই! কত আর প্রাণে সই,
হ'ল গো একি সখি যন্ত্রণা।

এইরূপ মনোহর প্রেম কাহিনী রামবসুর সংগীতে সর্ব্বত্র পরিদৃশ্যমান হইবে। বসুর বিরহ-গীতি প্রেমের উচ্চ আদর্শ, তাহার নায়িকা প্রেমশালিনী। পূর্ব্বোদ্ধৃত গানটীর সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন,—"কি বিশুদ্ধ দাম্পত্য প্রেম! সাধ্বী কুলকামিনীদিগের লজ্জার কি মোহন চিত্র।" প্রকৃতই কি ইহাতে বঙ্গীয় ললনার সলাজ সপ্রেম হৃদয়টী চিত্রিত হয় নাই? কিন্তু শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই গানটীতে কেবল ইন্দ্রিয়-লালসার খরস্রোত প্রবহমান দেখিতে পাইয়াছেন! ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ।

মুখোপাধ্যায় মহাশয় 'সারস্বত-কুঞ্জের' চতুর্থ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, রামবসুর বিরহ সংগীতে আদর্শ প্রেমের পরিচয় কিছুমাত্র নাই। তাঁহার নায়ক নায়িকার প্রেম ভোগ-বিলাসে কলুষিত, আত্মোৎসর্গে একান্ত কুণ্ঠিত, আত্ম বিসর্জ্জনে পরাঙ্মুখ। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মতের সহিত আমরা একমত হইতে পারিলাম না। তাঁহার ওরূপ লেখার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে আমি একান্ত অক্ষম। একাল পর্য্যন্ত অনেকানেক সাহিত্যরথী রামবসুর 'বিরহ'কে কবি গানের মধ্যে প্রথম আসন দিয়া আসিতেছেন।

চন্দ্রশেখর বাবু কি দেখিয়া ও ভাবিয়া যে ঐরূপ মন্তব্য প্রকটিত করিয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন। রামবসুর বিরহসংগীতে প্রেমের নানাভাব বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে সকাম প্রেম, নিষ্কাম প্রেম, পরার্থে প্রেম, বিশ্বজনীন প্রেম—সব রকম প্রেমের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

এ কি অকস্মাৎ ব্রজে বজ্রাঘাত,
কে আনিল রথ গোকুলে ?
রথ হেরিয়ে ভাসি অকূলে !
অক্রুর সহিতে কৃষ্ণ কেন রথে,
বুঝি মথুরাতে চলিল।
রাধারে চরণে ত্যজিলে রাধানাথ—
কি দোষ রাধার পাইলে ?
শ্যাম ! ভেবে দেখ মনে, তোমারি কারণে
ব্রজাঙ্গনাগণ উদাসী ;
নাহি অন্য ভাব, শুনহে মাধব,
তোমার প্রেমের প্রয়াসী।
নিশাভাগ নিশি, যথা বাজে বাঁশী,
তথা আসি গোপী সকলে,
দিয়ে বিসর্জ্জন কুলে শীলে !
এতেই হলেম দোষী, তায় তোমায় জিজ্ঞাসি,
এই দোষে কিহে ত্যজিলে ?
শ্যাম ! যাও মধুপুরী, নিষেধ না করি,
থাক হরি যথা সুখ পাও ;
একবার সহাস্য বদনে, বঙ্কিম নয়নে
ব্রজগোপীর পানে ফিরে চাও।
জনমের মত শ্রীচরণ দু'টি
হেরি হে নয়নে শ্রীহরি।
আর হেরিব না আশা করি।

আমরা চন্দ্রশেখর বাবুকেই জিজ্ঞাসা করি, তিনিই কুটিলতার আইগ্লাসখানা চক্ষু হইতে নামাইয়া বলুন দেখি, এই বিরহ-গীতের কোন্ স্থানটী ভোগ-বিলাসিতায় কলুষিত ? ইহাতে কি পতিব্রতা নারীর বিশুদ্ধ পতিপ্রেম, সরল হৃদয়ের উদারভাব পরিব্যক্ত হইতেছে না ?

রামবসুর সমস্ত গীতই এইরূপে উদ্ধৃত করিয়া প্রেম-বৈচিত্র্য দেখান যাইতে পারে, কিন্তু সেরূপ স্থান ও সুযোগ আমাদের নাই। তাই আমরা সংক্ষেপে তাঁহার প্রত্যেক বিষয়ের একটী করিয়া গান তুলিয়া পাঠক-গণকে উপহার দিব। দুঃখের বিষয়, তাঁহার সমগ্র পদাবলী প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় বহু চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়াও কবিওয়ালাদিগের সমস্ত কাব্য সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। কেহ এখানে ওখানে সেখানে দু'চারিটা করিয়া গান লিখিয়া রাখিয়াছেন, আবশ্যক মত তাহাই উদ্ধৃত করিয়া স্বকার্য্য সাধন করিতেছেন।

আমরা এস্থলে রামবসুর সপ্তমী গান উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠকগণ দেখিবেন, কবি মাতৃ হৃদয়ের অনাবিল বাৎসল্য স্নেহ কেমন সুন্দর ভাবে পরিব্যক্ত করিয়াছেন।

মহড়া।

তবে নাকি উমার তত্ত্ব ক'রেছিলে ?
গিরিরাজ ! ওহে শুন শুন, তোমার মেয়ে কি বলে
* * *
তুমি গিয়াছিলে কই, উমা ব'লে ঐ হে,
আমি আপনি এসেছি জননী ব'লে॥

চিতেন।

তারা হারা হ'য়ে নয়নের, তারা হারা হ'য়ে রই।
সদা কই উমা কই, আমার প্রাণ উমা কই॥
আমার সেই হারা তারা, ত্রিজগতের সারা,
বিধি এনে মিলালে।
উমা চন্দ্র বদনে, ডাক্‌ছে সঘনে, মা মা মা ব'লে।
উমা যত হেসে কথা কয়, ততো হাসি নয়হে,
যেন অভাগীর কপালে অনল জ্বলে॥

অন্তরা।

ভাল হোক্ হোক্ ওহে গিরি,
যাই আমি নারী, তাই ভুলি বচনে।

তোমার কি মনে, হ'তো না হে সাধ,
হেরিতে উমার চন্দ্রাননে ॥

চিতেন।

আশা বাক্যে আমার পাপ প্রাণ,
রহে বল কত দিন।
দিনের দিন তনু ক্ষীণ, বারিহীন যেন মীন।
যারে প্রাণ পাব দেখে, সম্বৎসরে তাকে
আস্তে তো যেতে হয়।
যেন মা হীনা কন্তে, তিন দিনের জন্তে
এলো হে হিমালয়।
মুখে করি হাহারব, ছিলেন যেন শবহে,
গৌরী মৃত দেহে এসে জীবন দিলে ॥

এই সপ্তমী রামবসু যখন নিজের দলে গাইতেন, তখন শ্রোতারা নির্ব্বাক ও নিস্পন্দ ভাবে জড়পুত্তলিকার ন্যায় বসিয়া একাগ্রভাবে শ্রবণ করিত। বর্ষা সমাগমে নদী যেমন কাণায় কাণায় ভরিয়া উচ্ছ্বাসিত হইয়া উঠে, সম্বৎসর পর দুহিতাকে পাইয়া মেনকারও তেমনি স্নেহাতুরা মাতৃবক্ষঃ উদ্বেল হইয়া উঠিল। শাবক-নাশাশঙ্কায় বিহঙ্গী যেমন ছানাকে স্বীয় চঞ্চুপুটে ঢাকিয়া রাখিতে চায়, মেনকাও তেমনি উমাকে বুকে টানিয়া অপূর্ব্ব বাৎসল্য রসে ডুবাইয়া ফেলিলেন। রামবসুর এবম্প্রকার অন্যান্য উমা-বিষয়ক সংগীতগুলিও মাতৃস্নেহরসে উদ্বেলিত।

রামবসু যেমন একদিকে বিরহ, সখী সম্বাদ, মান, মাথুর, সপ্তমী প্রভৃতি বিবিধ রস-ভক্তি-বিষয়ক গান রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন, অন্যদিকে তেমনি শ্লেষকর সংগীতেও পরিপক্ক ছিলেন।

দেখ্‌বো কেমন সুন্দরী কুব্জা।
তোদের রাজা যে, নিজে বাঁকা সে,
নূতন রাণী যে হোয়েছে, বাঁকা কি সোজা।

এবম্বিধ শ্লেষকর প্রভৃতি গান তাঁহার লেখনী মুখ হইতে বহির্গত হইয়াছে। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, তৎকালে ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের ভবনে উৎসবাদিতে কবির গান হইত। রামবসু খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভের সহিত চতুর্দ্দিক হইতে গানের বায়না পাইতে লাগিলেন। বড় বড় রাজার আলয়ে সর্ব্বদাই তাঁহার গান হইত। একদা মহারাজ নবকৃষ্ণের ভবনে রামবসু, নিতাই বৈরাগী ও আরও দুই একজন কবির গান হয়। তৎকালে হরু ঠাকুর বৃদ্ধ হওয়ায় দল ভাঙ্গিয়া মহারাজের সভাসদ্ হইয়াছিলেন। রাজবাটীতে যে সকল কবির গান হইল, তাহাদের কাহার গাওনা ভাল হইয়াছে, হরু ঠাকুর তাহা বিচার করিয়া ফতুয়া দিতেন। এইবার হরুঠাকুর, রাম বসুর পরাজয় সাব্যস্ত করিয়া অপরের জয় ঘোষণা করেন। রামবসু ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া গান ধরেন,—

ঠাকুর বাঁচ্‌বেন না আর বিস্তর দিন।
তোমায় চক্রে ধরেছে পোকা, স্বর্ণরেখা অতি ক্ষীণ ॥

শুনিতে পাওয়া যায়, হরুঠাকুর ইহাতে অত্যন্ত রোষাবিষ্ট হন এবং রামবসুকে নানা প্রকার ভৎর্সনা করিতে করিতে আসর ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করেন।

আর এক যাত্রায় শোভাবাজারের রাজবাটীতে রামবসু ও নীলু ঠাকুরের কবির গান হয়। নীলু ঠাকুর তখন জীবিত ছিলেন না। রামপ্রসাদ ঠাকুর নামক এক ব্যক্তি তাঁহার দলে 'একটান' করিত। সেই-ই তখন তাঁহার দলের অধিকারী হইয়াছিল। উভয় দলের গান হইতেছে, এমন সময় রামপ্রসাদ অপর পক্ষকে পরাস্ত করিবার মানসে গান ধরিল,—

নাইকো রামবোসের এখন সেকেলে পৌরষ।
এখন দল ক'রে হয়েছেন রামবোস—রাম কামারের*॥

রামবসু হটিবার লোক নন, তিনি তৎক্ষণাৎ পাল্টা গাহিলেন,—

তেম্‌নি এই নীলুর দলে রামপ্রসাদ একটীন্।
যেমন ঢাকের পীটে বাঁয়া থাকে,
বাজে নাকো একটী দিন॥
যেমন রাতভিখারীর ধামা বওয়া থাকে এক একজন,
হরিনাম বলে না মুখে পেছু থেকে চাল কুড়ুতে মন,
কর্ম্মে অকর্ম্মা, ঐ রামপ্রসাদ শর্ম্মা,
মন কাজের কাজী ঠাটের বাজী,—(ভাইরে)।
ঠিক যেন ধোপার বিশকর্ম্মা—
যেমন বিদ্যে শূন্য বিদ্যেভূষণ, সিদ্ধিরস্তু বস্তুহীন॥
নীলমণি ম'লে, নীলমণির দলে,
ঢুক্‌লো সিংভাঙ্গা এঁড়ে বাছুরের পালে।
যেমন নবাব ম'লে নবাব হ'ল উজীরালি আড়াই দিন।
যেমন * * কাছে পেগের বড়াই ঘরে করেন জাঁক,
দুনিয়ার কর্ম্মেতে কুড়ে, ভোজনে দেড়ে—
বচমে পুড়িয়ে করেন খাক্
তেম্‌নি শ্রীছাদ, এই পেটকো মুলুকচাঁদ
তরেন রামপ্রসাদ, ধরে কৃষ্ণপ্রসাদ,
যেমন জম্মে কভু হাত পোরে না,—
দোলে নবেদার আস্তীন॥

পত্র পাঠ প্রতি পক্ষকে এইরূপ জবাব দেওয়া কম কবিত্বশালী ব্যক্তির কর্ম্ম নহে। কবির দলে এইরূপ লড়াই ছিল বলিয়াই তাহা জন সাধারণের হৃদয়ের উপর এত আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিয়াছিল। কিন্তু ইহা যে একবারে অশ্লীলতা-বিবর্জ্জিত, তাহা আমি বলিতে পারি না। পূর্ব্বোক্ত গানটীর স্থানে স্থানে আমি (* *) তারকা চিহ্ন দিয়া গেলাম,—ঐ সকল স্থান অশ্লীল। রামবসু, নীলু ঠাকুর প্রভৃতি কবিগণ অস্তগত হইলে যখন কবিওয়ালাদের অন্তিম দশা উপস্থিত হয়, তখন এই কবির লড়াই সুরুচির সু পর্য্যাস্ত ত্যাগ করিয়া জীবন্ত খেউড়ে পরিণত হইয়াছিল। এইরূপ পরিবর্ত্তনের আমি দুইটী কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছি।—(১) ভদ্র সমাজের সহানুভূতির অভাব, (২) সমাজের নিম্নস্তরের ব্যক্তি সমূহের সুরুচির বিপর্য্যয়। ইহারা কবির লড়াইতে অভদ্রোচিত ভাষায় গালাগালি পছন্দ করিতে লাগিল, কাজেই কবিওয়ালাগণ পেটের দায়ে খেউড় ধরিতে বাধ্য হন।

রামবসুর সখী সম্বাদের একটু পরিচয় গ্রহণ করুন। তাঁহার একটী গানের কিয়দংশ এইরূপ,—

মনে ক'রে মান রাখ্‌তে পারিনে।
আমি যে দিকে ফিরে চাই,
সেই দিকেই দেখ্‌তে পাই—
সচলে আঁখি জলধর বরণে।
অতএব অভিমান মনে করিনে।
আমি কৃষ্ণপ্রাণা রাধা, কৃষ্ণপ্রেম ডোরে প্রাণ বাধা,
হেরি ঐ কালো রূপ সদা।
হৃদয় মাঝে শ্যাম বিরাজে
বহে প্রেমধারা দুনয়নে॥ (মহড়া।)

প্রেমের কি গভীর মন্ত্র—কি বিশুদ্ধ পবিত্র ভাব।

কলিকাতার পশ্চিমে গঙ্গার পরপারে হাবড়া জেলার অন্তর্গত বাঁ্যাটরা গ্রামে প্রসিদ্ধ পাঁচালীকার কবি ঠাকুর দাসের জন্ম হয়। ঠাকুর দাসের পিতা রামমোহন দত্তের সহিত রামবসুর বিশেষ সৌহৃদ্দতা ছিল, উভয়ের নামে নামে মিল হওয়ায়,

এসে এদেশে এবেশে
তোমার গায়ে কেন কুর্ত্তি নাই?

তদুত্তরে আণ্টুনি গাহিলেন,—

এই বাঙলায় বাঙ্গালীর বেশে আনন্দে আছি।
হয়ে ঠাকুরে সিঙ্গীর বাপের জামাই কুর্ত্তি টুপী ছেড়েছি।

আণ্টুনির সহিত রামবসুর আর একবার লড়াই বাধে। সেবার তিনি নিজের দলে থাকিয়াই বলেন,—

সাহেব! মিথ্যে তুই কৃষ্ণপদে মাথা মুড়ালি।
ওতোর পাদরী সাহেব শুন্‌তে পেলে গালে দিবে
চূণ কালি।

সাহেব তাহাতে উত্তর দিলেন,—

খৃষ্ট আর কৃষ্ণ কিছু প্রভেদ নাইরে ভাই।
শুধু নামের ফেরে মানুষ ফেরে এও কোথা শুনি নাই॥
আমার খোদা যে,হিন্দুর হরি সে, ঐ দেখ শ্যাম দাঁড়িয়ে
রয়েছে,
আমার মানব জনম সফল হ'বে—যদি রাঙ্গা চরণ পাই॥

ফিরিঙ্গি সাহেবের হিন্দুচিত ভক্তি-প্রবণতাও ভাবিবার বিষয়।

রামবসু অনুপ্রাস যোজনাতেও পরিপক্ক ছিলেন। তাঁহার অনেকগুলি গানে সুন্দর অনুপ্রাস প্রয়োগ দেখা যায়। একটী যথা—

এতো ভৃঙ্গ নয়, ত্রিভঙ্গ বুঝি এসেছে, শ্রীমতীর কুঞ্জে।
গুন্ গুন্ স্বরে কেন অলি, শ্রীরাধার শ্রীপদে গুঞ্জে॥
ইত্যাদি।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, অন্যান্য কবি ওয়ালাদিগের ন্যায় রামবসু অশিক্ষিত ছিলেন না। তিনি বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করিয়াছিলেন এবং বাঙ্গালা ও ইংরেজির সঙ্গে সংস্কৃতও কিছু কিছু শিক্ষা করিয়াছিলেন। আমি নিম্নে একটা পদ উদ্ধৃত করিতেছি, তাহাতেই পাঠকগণ জানিতে পারিবেন যে, রামবসু সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ ছিলেন না এবং তিনি সংস্কৃত সাহিত্য হইতে ভাব লইয়া বাঙ্গালায় গান রচনা করিতেন।

হর নই হে, আমি যুবতী
কেন জ্বালাতে এলে রতিপতি?
ক'রো না আমার দুর্গতি।
বিচ্ছেদে লাবণ্য, হ'য়েছে বিবর্ণ,
ধরেছি শঙ্করের আকৃতি।
ক্ষীণ দেখে অঙ্গ, আজ অনঙ্গ,
একি রঙ্গ হে তোমার!
হর ভ্রমে শরাঘাতে, কেন করিতেছ বারে বার
ছিন্ন ভিন্ন বেশ, দেখে কত মহেশ,
চেন না পুরুষ প্রকৃতি।
হায় শুন শম্ভু-অরি, ভেবে ত্রিপুরারি,
বৈরী হ'য়ো না আমার।
বিচ্ছেদে এ দশা, বিগলিতা কেশা,
নহে এত জটাভার।
কণ্ঠে কালকূট নহে, দেখ পোরেছি নীল-রতন,
অরুণ হ'ল নয়ন, করে পতি বিরহে রোদন।
এ অঙ্গ আমার, ধূলায় ধূসর,
মাখি নাই মাখি নাই বিভূতি।

জয়দেবের বিরহ-খিন্ন কৃষ্ণ বলিতেছেন,—

হৃদি বিষলতা হারো নায়ং ভুজঙ্গ মনায়কঃ
কুবলয় দল শ্রেণী কণ্ঠে ন সা গরল দ্যুতিঃ।
মলয়জরজোনেদং ভস্ম প্রিয়া বিরহিতে ময়ি,
প্রহরণ হর ভ্রান্ত্যানঙ্গ! ক্রুধা কিমু ধাবসি॥

সংস্কৃত গীতটিতে বিরহীকৃষ্ণের সহিত শঙ্করের সমতা দর্শান হইয়াছে, রামবসুর গীতটিতে হর ও হরির সাদৃশ্য দেখান হইয়াছে। কিন্তু উভয়েরই লক্ষ্য সেই—রতিপতি অনঙ্গ।* আমি এ কথা বলিতেছি না যে,রামবসু জয়দেবের ঐ গানটীরই অনুবাদ

* বিদ্যাপতিরও এই ভাবের একটী পদ পাওয়া যায়;—

কতি হুঁ মদন তনু দহসি হামারি।
হাম নহ শঙ্কর হঁ বর নারী॥
নাহি জটা ইহ বেনী বিভঙ্গ।
মালতীমাল শিরে নহ গঙ্গ॥
মোতিম বন্ধমৌলি নহ ইন্দু।
ভালে নয়ন নহে সিন্দুর বিন্দু॥
কণ্ঠে গরল নহে মৃগমদ সার।
নহ ফণিরাজ উরে মণিহার॥
নীল পটাম্বর নহ বাঘ ছাল।
কেলি কমল ইহ না হয় কপাল॥
বিদ্যাপতি কহে, এ হেন সুছন্দে।
অঙ্গে ভস্ম নহ মলয়জ পঙ্ক॥

এই পদটীতে শঙ্করের সহিত বিরহ-কাতরা নারীর তুলনা করা হইয়াছে।

বাঙ্গলায় রচনা করিয়াছেন। তাঁহার ভাব সংস্কৃত মূলক, ইহাই আমার বলিবার তাৎপর্য্য। জয়দেব তাহার আদর্শ নহে।

প্রাচীন কবির গান চিরস্মরণীয় বলিয়া এতদিন আমরা তাহা দেখিতে পাইতেছি, দেখিতেছি বলিয়াই পাঠ করিতেছি এবং পাঠ করিয়া মজিতেছি। কিন্তু কোন্ গান কাহার, তাহা নিশ্চয় করা বড় কঠিন। অনেকে এ সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। কখনও রামবসুর কোনও গান হরু ঠাকুরের নামে চলিয়া গিয়াছে, কখনও রাম্ নৃসিংহের কোনও গান রামবসুর নামে চলিয়া গিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে দুইটী গান উদ্ধৃত করিলাম।

সকল ভণ্ড কাণ্ড ভোলা তোর
তুই পাষণ্ড নচ্ছার!
তুই ভজিস ঢেঁকি,
বলিস্ কি না গৌর অবতার! ইত্যাদি

এই গানটী আমি এবং আরও অনেকে রামবসুর বলিয়া নির্দ্দেশ করি ও করেন। আবার কেহ কেহ উহা ভোলা ময়রার রচিত বলিয়া থাকেন। ভোলার সহিত নীলুঠাকুরের প্রায়ই লড়াই বাধিত। ভোলা নাকি ঐরূপ এক দিনের লড়াইতে এই গানটী রচনা করেন। আমি একথা বিশ্বাস করি না। উহা রামবসুর প্রণীত এবং নীলুঠাকুরের দলে গীত হইত। ভোলা ইহার কোনও উত্তর দেয় না। পরাজয় মানিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। রামবসু কিন্তু তাহাতেও পাল্‌টা গান। তাহা এই,—

এখন বুঝ্‌লিতো এই হর নয়
সেই হরি সারাৎসার।
পূর্ণব্রহ্ম সেই হরি
ইনি প্রকাণ্ড অসার॥ ইত্যাদি

আর একটী গানের কিয়দংশ এইরূপ,—

বালিকা ছিলাম, ছিলাম—ভাল ছিলাম
সই। ছিল না সুখ-অভিলাষ।
পতি চিন্‌তাম না ও রস জান্‌তাম না,
হৃদ-পদ্ম ছিল অপ্রকাশ॥

এ গানটীও আমরা রামবসুর বলিয়া জানি। 'প্রাচীন কবি সংগ্রহ' ও 'গুপ্তরত্নোদ্ধার' গ্রন্থেও তাহাই লিখিত হইয়াছে। কিন্তু 'সমীরণ' পত্রে এক ব্যক্তি লিখিয়াছিলেন যে, ঐ গানটী কবি-মহেশ- কাণা বিরচিত। সমীরণের লেখক তাঁহার এ যুক্তির পোষকতায় কোনও প্রমাণ প্রয়োগ করেন নাই, সুতরাং আজিও আমরা তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি।

আমরা রামবসুর চরিত্র সম্বন্ধে কোনও কথাই বলি নাই,—বেশি কিছু জানাও যায় না। তবে শুনিতে পাওয়া যায়, যজ্ঞেশ্বরী নাম্নী এক রমণীর সহিত তাঁহার গুপ্ত প্রণয় ছিল। এ কথা কতদূর সত্য, তাহা আমি বলিতে পারি না। কবিদিগের প্রায়ই এই দোষটী দেখিতে পাওয়া যায়। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবিকুল শিরোভূষণগণও এ কলঙ্কের হস্ত হইতে অব্যাহতি পান নাই। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া রামবসুর এ কলঙ্কও সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রবৃত্তি হয়। যজ্ঞেশ্বরীও সংগীত রচনা করিতেন। নীলুঠাকুর প্রভৃতির দলে তাহার রচিত সংগীত অতি সমাদরে গীত হইত।*

* কর্ম্মক্রমে আশ্রমে সখা
হলে যদি অধিষ্ঠান
হেরে মুখ গেল দুখ,
দুটো কথার কথা বলি প্রাণ॥
আমায় বন্দী ক'রে প্রেমে
এখন ক্ষান্ত হ'লে হে ক্রমে ক্রমে
দিয়ে জলাঞ্জলি এ আশ্রমে। ইত্যাদি।

যজ্ঞেশ্বরী প্রণীত গানের কিয়দংশ। এই গানটী নীলু ঠাকুরের দলে গীত হইত।

রাম বসুর বৈষ্ণবপদগুলিই বিশেষ হৃদয়-গ্রাহী, তাহার প্রশংসা বাক্যে শেষ করা যায় না। যিনি পড়িবেন, তিনিই মজিবেন। মান, মাথুরে তিনি বঙ্গ-বধূর যে প্রেমপূর্ণ সমাজদৃষ্টি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাও কম প্রাণস্পর্শী নহে। আমরা নিম্নে আর দুইটী মাত্র পদের কিয়দংশ করিয়া উদ্ধৃত করতঃ রাম বসুর প্রসঙ্গ করিতেছি।

(মহড়া।)

বসন্তেরে সুধাও সখি।
আমার নাথের মঙ্গল কি?
নিবাসে নিদয় নাথ, আসিবে নাকি?
তার অভাবে ভেবে তনুক্ষীণ,
দিনে শতবার গণি দিন,
আসার অশায়ে আছি, আশা পথ নিরখি॥

(চিতেন।)

সে যদি ভুলেছে আমারে, মনে না করে।
আমি কেমনে ভুলিব তাকে?
পতি গতি, মুক্তি অবলার—
সুখ, মোক্ষ সেই গো আমার,
তাহার কুশল শুনে, কুশলে কুল রাখি॥

অন্যটীর কিয়দংশ এই,—

(মহড়া।)

প্রাণ তুমি আপনার নহ, আমার হ'বে কি?
মনে মনে মনাগুনে,
আমি জ্বল্‌বো বই আর বল্‌বো কি?
অনেক দিনের আলাপ ব'লে আদরে ডাকি।
কেমন আছ তুমি প্রাণ, শুনি শ্রবণে।
প্রাণ গেলে প্রাণ, নিজ দুখ তোমায় বলিনে।
ফলহীন বৃক্ষের কাছে, সাধ্‌লে কাঁদ্‌লে ফলবে কি?

"যিনি এই সকল সঙ্গীতের সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি যে প্রকৃতি-দত্ত ক্ষমতায় অসামান্য পুরুষ ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সতীর কোমলতায় যে অপার্থিব সৌন্দর্য্য আছে, স্নিগ্ধ-ভাবে যে অপূর্ব্ব মহত্ত্ব আছে, সর্ব্বোপরি পাতি-ব্রত্য ধর্ম্মে যে অনির্ব্বচনীয় পবিত্রতা আছে, তাহা কবির কল্পনা-কৌশলে সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। একটী সংগীতে কোমলতা-ময়ী পতিব্রতার, পতিভক্তির সহিত হৃদয়ের অসাধারণ কোমল ভাব পরিস্ফুট হইতেছে। অপরটীতে উন্মার্গগামী ও সুনীতিভ্রষ্ট-স্বামীর জন্য পতিপ্রাণার ব্যাকুলতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। "পতি গতি, মুক্তি অবলার" এইএকটী বাক্যে কবি পতিভক্তির অতি সুন্দর ভাব পরিব্যক্ত করিয়াছেন। পক্ষান্তরে "প্রাণ, তুমি আপনার নহ, আমার হবে কি" কথাটীতে যে কিরূপ কবিত্বকৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা বলিবার নহে। উৎপথবর্ত্তি-স্বামীর প্রতি এইরূপ উক্তিতে সাধ্বী নারীর পতিপ্রেম, পতিভক্তি ও পতির উচ্ছৃঙ্খল ভাবের জন্য হৃদয়গত গভীর বেদনার অভিব্যক্তি হইতেছে। "ফলহীন বৃক্ষের কাছে সাধ্‌লে কাঁদ্‌লে ফলবে কি" এই উক্তি অতি মনোহর। মহাকবি কালিদাস "প্রবৃত্তিভেদীব ইব প্রদীপাৎ" এই কথায় উপমাকৌশলের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। রাম বসুর কবিতা পাঠে ঐ সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবিতাটী মনোমধ্যে উদিত হয়। উভয়ই লোকপ্রসিদ্ধ বিষয় হইতে পরিগৃহীত, উভয়ই উৎকট কল্পনার বহির্ভূত এবং উভয়ই জন সাধারণের সহিত সুপরিচিত। কবিত্ব-কৌশলে উভয়েরই গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে। স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে উভয়েই কবির সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে।" *

রামবসু বঙ্গদেশের প্রায় সকল ধনাঢ্য ব্যক্তির গৃহেই কবি-গাহিতে যাইতেন।

* সাহিত্য-পারিষৎ-পত্রিকা, ১৩০২।

ঐ সকল স্থানে গাওনা করিয়া তিনি প্রভূত অর্থ পুরস্কার পাইতেন। কোনও কোনও স্থানে শাল দোশালা প্রভৃতি মূল্যবান বস্ত্র সমূহও উপঢৌকন পাইতেন। শৈশবাবস্থায় তিনি পিতার এক মাত্র পুত্ররূপে বিশেষ আদর যত্নে লালিত পালিত হন। কেবল কৈশোর কালে পিতৃ বিয়োগে কিছু দিনের জন্য সামান্য কষ্টে পতিত হইয়াছিলেন। কারণ পিতা পরলোক গমনের সময় কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। তৎসময় হইতে পেশাদারী কবির দল করা পর্য্যন্ত ২।৩ বৎসর কাল মাত্র তিনি কিছু অভাবগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তাহার পরই তিনি একরূপ লক্ষ্মীর বরপুত্র হন।

মহারাজ নবকৃষ্ণ প্রভৃতি ধনাঢ্য ব্যক্তি-দিগের গৃহে যেমন তাঁহার আদর ছিল, মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কাশীমবাজারের রাজা হরিনাথ কুমার বাহাদুরের ভবনেও তাঁহার তদ্রূপ আমন্ত্রণ হইত। রামবসু তথায় প্রতি বৎসর দুর্গোৎসবের সময় যাইয়া কবি গাইতেন। বাঙ্গালা ১২৩৫ সালে মুর্শিদা-বাদে তাঁহার শেষ যাওয়া। সেইবার আশ্বিন মাসে তথায় গিয়া তিনি রোগাক্রান্ত হন এবং গৃহে ফিরিয়া আসিয়া ৪২ বৎসর বয়সে অনন্তধামে গমন করেন। স্বর্গীয় প্রসূনটী অকালে ঝরিয়া পড়ে। মৃত্যু সময় তাঁহার কোনও সন্তান সন্ততি ছিল না। কবির বংশে বাতি দিবার এখন কেহই নাই। একদিন যাহার গান শ্রবণ করিয়া বঙ্গদেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতা অশ্রু বর্ষণ করিত, আজ সেই মহা কবিকে স্মরণ করিয়া কেহ দীর্ঘ নিঃশ্বাসও ত্যাগ করে না। আমরা এমনি গুণগ্রাহী ও স্বদেশহিতৈষী! কবিতা অমর বলিয়া আজিও তাঁহার নাম পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হয় নাই।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্ন্যাল।

সমাজ-ব্যাধির চিকিৎসা

সমগ্র মানবজাতি যদি একটী বিরাট দেহরূপে পরিকল্পিত হয়, তাহা হইলে অন্ততঃ আপনাপন জাতি, দেশ, ধর্ম্মমণ্ডলীকে নিজ শরীরের ন্যায় আত্মীয় অন্তরঙ্গ রূপে অনুভব করিতে হইবে। নিতান্ত কল্পনা বা কবিত্বের হিসাবে নহে, বাস্তবিক প্রত্যেক দেহধারী জীবের সঙ্গে যেমন চতুর্দ্দিকস্থ পঞ্চ ভূতের অতীব প্রাণগত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তেমনি পরিবার, প্রতিবাসী, স্বজাতি ও স্বদেশীর সঙ্গে তাহার অতিশয় নিকট সম্বন্ধ আছে। পৃথিবীর সমগ্র মানব জাতির সঙ্গেও আমাদের প্রতি-জনের কি ঘনিষ্ঠতর ব্যক্তিগত সম্বন্ধ আমরা অনুভব করিতেছি না? জল স্থল, আকাশ বায়ু, তড়িৎ ইথারের আলিঙ্গন পাশে এবং চন্দ্র সূর্য্যের কিরণজাল যাবতীয় নরনারী ও প্রাণি-পুঞ্জকে এক দুশ্ছেদ্য বন্ধনে চিরকাল বাঁধিয়া রাখিয়াছে; স্বার্থান্ধ অল্পমতি আত্মম্ভরী কোন মনুষ্য কি তাহা অস্বীকার করিতে পারে? কেবল ভৌতিক প্রকৃতি এই মহাযোগের একমাত্র প্রশস্ত ভূমি নহে, প্রাচীন ও আধু-নিক যুগের রাজনীতি, সমাজ ও ধর্ম্ম-নীতি, অন্তর্জাতীয় স্বাধীন ব্যবসায় বাণিজ্য, বিভিন্ন দেশের ভিন্ন জাতীয় সাধু মহাজনদিগের উদার হৃদয়ের মঙ্গল কামনা, সার্ব্বভৌমিক বিশ্বাস ভক্তি প্রেম, সত্যজ্ঞান, এবং তাঁহা-দের নিঃস্বার্থ পবিত্র চরিত্রের জীবন্ত দৃষ্টান্ত

ইত্যাদি দৃশ্যাদৃশ্য শক্তিসূত্রে বিচ্ছিন্ন মানব সকল এক পরিবারে বিধৃত রহিয়াছে। কেবল তাহা নহে, সর্ব্বদেশীয় গভীর চিন্তাশীল বুধগণের দার্শনিক সিদ্ধান্ত, আধুনিক সভ্যজাতির আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এবং তাহার কার্য্যফল স্বরূপ রেলপথ, বাষ্পীয় পোত, টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোনের তার ও নিত্য ব্যবহারিক পদার্থ দেশ কালের উচ্চ নীচ, দূর নিকট সমস্ত প্রভেদ বন্ধুরতাকে এক সমতল ক্ষেত্রে আনিয়া এই বিশাল ভূমিগুলিকে এক সূত্রে গাঁথিয়া ফেলিয়াছে। আর এখন কাহারও স্বতন্ত্র নির্লিপ্ত থাকিবার কোন উপায় নাই। বর্ত্তমান সময়ে যেমন বৈদ্যুতিক তারযোগে দিবা নিশি দেশবিদেশের দৈনিক সংবাদ সকল অবাধে কর্ণে কর্ণে ফিরিতেছে, এবং সমগ্র পৃথিবীর ন্যায় সত্য দয়া ধর্ম্মের ঘটনারাজি বজ্রনাদে হৃদয়ে হৃদয়ে ধ্বনিত হইতেছে, তেমনি দেশ কালের ব্যবধান ছিন্ন করিয়া প্রাচীন কালের নব নববিধান বংশ বংশান্তরে স্রোতের ন্যায় চলিয়া আসিতেছে। কেবল তাহা নহে, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মের সত্তায় নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিমগ্ন এবং অনুপ্রবিষ্ট; এবং তাহাতে চিরজীবিত জ্ঞান প্রেম পুণ্যের অবতার স্বরূপ লোকগুরু অমরাত্মাগণ স্বীয় স্বীয় আত্মার শীতল ছায়াতলে বিশ্বপরিবারকে রক্ষা করিতেছেন। উঁহাদের অমর চরিত্রের দেবপ্রভাব দেশ কাল পাত্রে বদ্ধ নহে, অনন্তের অমর সন্তান হইয়া তাঁহারা আধ্যাত্মিক দিব্য জ্ঞান ও ভগবৎ প্রেম ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালত্রয়ের হৃদয়ে সঞ্চার করিতেছেন। বর্ত্তমান বংশের মনুষ্য সন্তানগণ তাঁহাদেরই শিষ্য, ছাত্র, দাস, প্রজা এবং দেহজাত ও আত্মজাত পুত্র কন্যা। সঙ্কীর্ণবুদ্ধি, অনুদার-চিত্ত সাম্প্রদায়িকেরা এই চিরপ্রবাহিত মহাশক্তির অপ্রতিহত গতি রোধ করিতে পারে না। কোন রাজা বা রাজপুরুষ প্রধান জাতীয় একতার বলক্ষয়ের জন্য যদি একের সহিত অপরের জ্ঞান ইচ্ছা ভাব বিনিময় করিতে না দেয়, উচ্চ শিক্ষার দ্বার রুদ্ধ করেন, তথাপি জল বাতাস রবিকিরণের ভিতর দিয়া অজ্ঞাতসারে বিধাতাপ্রেরিত জ্ঞান ও নৈতিক বিধান সর্ব্বত্র সংক্রামিত হইবে। প্রজাপতি বিধাতা যাহাদিগকে এক পরিবারে প্রেমবন্ধনে বাঁধিতেছেন, কোন নরাধম তাহা যেন ছিন্ন করিতে সাহসী না হয়। আমরা এখন সেই শুভ সময়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছি, যখন জ্ঞানে, অজ্ঞানে, ইচ্ছায়, অনিচ্ছায়, প্রত্যক্ষ পরোক্ষ ভাবে দেশজাতিনির্ব্বিশেষে এক পরিবার এবং এক শরীর।

কেহ যদি চিরপরিব্রাজক কাবুলীদিগকে ভুলিয়া কাবুল কান্দাহার কাশ্মীরজাত আঙ্গুর পেস্তা বেদানা আপেল গুলি ভোজন করেন, আর সাল আলোয়ান গায়ে দিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে চাহেন থাকুন। ইয়োরোপ আমেরিকা চীন জাপান প্রভৃতি হইতে সমাগত বিবিধ ব্যবহার্য্য সামগ্রী দ্বারা ঘর সাজাইয়া স্বার্থসুখে অন্ধ হইয়া যদি কেহ থাকিতে চাহেন, থাকিতে পারেন। ভারতের আর্য্য অনার্য্য জাতির প্রাচীন কাহিনী গাইয়া বা শুনিয়া চিরকাল যদি কেহ বংশগৌরব এবং বিদ্যা পাণ্ডিত্য চরিতার্থ করিতে চাহেন, তাহাও করিতে পারেন। কিন্তু নিজ নিজ শরীর রক্ষার্থ যেমন স্নান ভোজন নিদ্রা এবং পরিবার পালনের জন্য যেমন যত্ন পরিশ্রম স্নেহ দয়া প্রদর্শন একটী অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য, অন্ততঃ বঙ্গীয় সমাজের মজ্জাগত

ব্যাধি সকলের প্রতিকারার্থ তেমনি শিক্ষিত কৃতবিদ্য চিন্তাশীল বঙ্গকুলাবতংস সমাজ-ধুরন্ধরদিগের তেমনি দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য বোধ থাকা উচিত। দেহের কোন একটী ক্ষুদ্রতম অঙ্গ কিম্বা পরিবারস্থ কোন একটী আত্মীয় প্রিয় যদি পীড়িত, ব্যথিত হয়, তদ্দর্শনে কেহ কি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? এবং এমন আত্মঘাতী পাষাণহৃদয়ই বা কে আছে যে, ঐ রোগ সমূলে বিনাশের চেষ্টা না করিয়া দুইপাঁচ দিনের জন্য কেবল উপরে উপরে ঔষধ দিয়া রাখিবে? অঙ্গ বিশেষের ভিতরে দিন দিন ক্ষত গভীর হইতেছে এবং তাহা অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিতেছে,সে দিকে না চাহিয়া কেবল আপাততঃ যাহাতে কার্য্যোদ্ধার হয়, নিজ নিজ জীবদ্দশায় কোনরূপ উপদ্রব উপসর্গ না ঘটে, এই মাত্রই অনেকের চিন্তা ও চেষ্টা। কিন্তু তাহা হইলে কি অচিরে সবংশে নির্ব্বংশ হইতে হইবে না? অবশ্য সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিজ শরীরের এবং পরিবারের প্রতি এরূপ ঔদাসীন্য অন্ধতা কাহারো দেখা যায় না, কিন্তু সমাজরূপ বৃহৎ শরীরের ব্যাধির প্রতি উপেক্ষা করিলে কি তাহা রক্ষা পাইবে? কদাচ না। সমষ্টিতে যাহা হয় হউক, ব্যষ্টিগত আপাততঃ স্বার্থ সুখের কোন ব্যাঘাত না হইলেই হইল, সাধারণতঃ ইহাই লোকের ধারণা; কিন্তু এ স্বার্থ-বোধ অনর্থের মূল।

এক্ষণে স্থিরচিত্তে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে, নিজ জীবন এবং পারিবারিক নৈতিক স্বাস্থ্য নিরাপদে রাখিতে গেলে সমাজশরীরের প্রতি উদাসীন থাকা যায় কি না। প্রতিবাসী, পুরবাসী এবং সমাজের শারীরিক উৎকট ব্যাধি যেমন সংক্রামক, সমাজের নৈতিক ব্যাধিও সেই রূপ। সমাজের সুখ দুঃখ, ভাল মন্দ, রোগ স্বাস্থ্য, নীতি অনীতির উপর প্রত্যেক ব্যক্তিগত জীবন এবং পরিবারের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিতেছে। স্বার্থপরের ন্যায় নয়ন মুদ্রিত করিয়া উদাসীনভাবে একা একা স্বতন্ত্র থাকিলে এ সাংঘাতিক সংক্রামক রোগের হস্ত হইতে কেহই নিস্তার পাইতে পারেন না। বরং প্লেগ, কলেরা এবং বসন্ত রোগীকে স্বতন্ত্র করিয়া দিলে সুস্থ শরীরকে নিরাপদে রাখা সম্ভব, কিন্তু সমাজের নৈতিক ব্যাধির প্রভাব অনতিক্রমণীয়। চাপা চুপি দিয়া যতই উহাকে ঢাকিবার চেষ্টা করিবে, ততই ভিতরে ভিতরে ফোপরা হইয়া যাইবে। মূল রোগের প্রতিকার এবং তৎসঙ্গে সুপথ্যের ব্যবস্থা যত দিন না হইবে, ততদিন আধুনিক বঙ্গসমাজের হাড়ের মধ্যে ঘুন প্রবেশ করিয়া, সমাজ-দেহকে একেবারে জরাজীর্ণ করিয়া ফেলিবে।

এই সমাজব্যাধির প্রকোপ কেমন প্রবল, ইহার স্রোত সম্প্রতি শিক্ষিত সমাজের স্বেচ্ছাচারিতা-প্রভাবে কেমন বেগে ছুটিতেছে, তাহার স্বরূপাবস্থা কি দিব্যচক্ষে আমরা দেখিতেছি না? শারীরিক, পারিবারিক এবং বৈষয়িক জীবনের সঙ্গে যেমন মানবাত্মার পারমার্থিক নিকট যোগ, সামাজিক জীবনের সহিতও ততোধিক। শেষোক্ত জীবন যদি বিশুদ্ধ রীতি এবং পবিত্র ধর্ম্মনীতির দ্বারা নিয়মিত না হয়, যাহার পক্ষে যাহা আপাততঃ সুবিধাজনক এবং স্বার্থপূরক তাহাই যদি সে করে, তাহা হইলে জীবসাধারণের পারমার্থিক কল্যাণ কি কেবল চিন্তা কল্পনার লীলা মাত্র? ব্যবহারিক জীবনকে যদি অবিদ্যার কার্য্য

জানিয়া কেহ উড়াইয়া দিতে না পারেন, প্রত্যুত তাহা যদি পারমার্থিক শ্রেয় সাধনের একমাত্র ক্ষেত্র বলিয়া পরিগৃহীত হয়, তবে সমাজসম্বন্ধে এতাধিক স্বেচ্ছাচারিতা চলে না। বর্ত্তমান সভ্যসমাজের এখন বড়ই ইচ্ছা হইয়াছে যে, ধর্ম্মকে একবারে বাদ দিয়া কেমন করিয়া সামাজিক সুখ শান্তি রক্ষা করা যায়। কারণ, ধর্ম্মমতগুলি সামাজিক অশান্তি ও হিংসা দ্বেষ দলাদলির নিদান। অতএব ধর্ম্মহীন সামাজিকতাই কল্যাণকর। ধর্ম্মমত বিশ্বাসের এবং অনুষ্ঠানের অত্যাচার, অন্ধতা এবং বিকৃতিও যথেষ্ট, সন্দেহ নাই, তাঁহার উপর আবার দলপতি, সমাজনেতা এবং পুরোহিতদিগের অত্যাচার। সুতরাং এই সকল উৎপাত হইতে বাঁচিবার জন্য যে চেষ্টা, তাহা এক দিকে স্বাভাবিক এবং অপব্যবহারের প্রতিক্রিয়া। কিন্তু এই দুক্রিয়ার প্রতিক্রিয়ার প্রবল প্রবাহে যদি জনসমাজ নাস্তিকতা, স্বেচ্ছাচারের এক সীমায় গিয়া উপনীত হয়, সেইটী কি প্রার্থনীয়? প্রকৃত জন-হিতৈষী কখন ইহা অনুমোদন করিতে পারেন না; তিনি সামঞ্জস্য নীতিরই চিরপক্ষপাতী। যদিও উচ্চ ধর্ম্ম, অবিমিশ্র পূর্ণ নীতি অনুসারে বিচিত্র প্রকৃতি, বিচিত্র গতি মানবসমাজকে পূর্ণ সত্যের পথে ধরিয়া রাখা যায় না, প্রত্যেক জীবন যেমন আলোক অন্ধকার, পাপপুণ্যে বিজড়িত এক একটী প্রকাণ্ড রাজ্য, সমষ্টি মানবজীবন তদপেক্ষা বহু পরিমাণে জটিল, কুটিল এবং বিস্তৃত, তথাপি অরাজকতার মধ্যে শাসন বিধি, বিশৃঙ্খল অনিয়ম স্বেচ্ছাচারের মধ্যে সুনিয়ম সুব্যবস্থা সংস্থাপন সমাজনিয়তির শেষ লক্ষ্য। অতএব সমাজমণ্ডলীর প্রতি উপেক্ষা করিয়া, বিশুদ্ধ লোকানুশাসন বিধির প্রতি উদাসীন হইয়া, সামাজিক ধর্ম্মানুষ্ঠান, ব্যবহারিক ক্রিয়াগুলিকে আমোদ পরিহাস কিম্বা, সাময়িক স্বার্থ সাধনের উপলক্ষ মাত্র জানিয়া যাঁহারা স্বেচ্ছাচারিতার পথে চলিতেছেন, তাঁহাদিগকে ভাবীবংশের মহাশত্রু সমাজবিদ্রোহী বলিয়া জানিতে হইবে। কিন্তু কে কাহাকে শাসন নিয়মের বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিতে পারে? সকলেই আপনাপন স্বার্থের অধীনে স্বাধীন। রাজবিধি, প্রাচীন প্রচলিত শাস্ত্রীয় শাসন এবং সামাজিক প্রথা কতক পরিমাণে উপরে উপরে জনসমাজকে দৃশ্যতঃ শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু ইহা কেবল দৃশ্যতঃ, প্রকৃত পক্ষে নহে। ইহার চারিধারে স্বেচ্ছাচার স্বাধীনতার এমন এক বিস্তৃত ভূমি আছে যে, তথায় অবাধে নিরঙ্কুশভাবে সকলে সুখে বিচরণ করিতে পারে। এখানে প্রতিজন প্রতিজনকে সাহায্য করিতেছে, আর মনে মনে হাসিতেছে; অথচ সময় বিশেষে এক অপরকে ভয়ও দেখাইতেছে। এখানে কোনরূপ বিচার চিন্তা গাম্ভীর্য্য নাই, প্রকৃত ধর্ম্মভয়ও নাই, পরস্পর পরস্পরকে ঠকাইয়া শেষ উভয়েই হাস্যামোদ করে। সব যেন ছেলে খেলার ব্যাপার। সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘনকারীকে যিনি ভয় ভ্রুকুটি সহকারে দণ্ডবিধান করিতে যান, তিনি নিজেই আবার সেই দোষে দণ্ডার্হ হন। তখন উভয়ে হাস্য মুখে কোলাকোলি করিয়া বলেন, "ভাই রে, এইরূপই জানিবে ভবের খেলা! সবই ফাঁকি, কেবল কার্য্যোদ্ধার করিয়া চলিয়া যাও। যত দিন আমরা এক অপরকে চিনিতে পারি না, তত দিন লুকোচুরি, ভয় ভাবনা, প্রকাশ হইলে সব

একাকার।" বস্তুতঃ গম্ভীর ভাবে চিন্তা করিলে সামাজিক ধর্ম্ম এবং ব্যবহারিক নীতির কার্য্য গুলিকে ক্রীড়া কৌতুকের মত মনে হয়। লোকের ভিতরকার অভিপ্রায় এবং বাহিরের আচরণ দেখিলে হাসি পায়। যে দোষ ত্রুটির জন্য এক অপরকে উৎপীড়ন নির্য্যাতন করিতেছে, সময়ে সেই ব্যক্তিই আবার নিজদোষ দর্শনপূর্ব্বক হাস্য মুখে বলে, "তাইত! ঠক বাছতে যে গাঁ উজাড় হয় দেখি!"

বর্ত্তমান সমাজবিপ্লবের ভীষণ স্রোতের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়া যাঁহারা বিশুদ্ধ নৈতিক শাসন স্থাপনপূর্ব্বক কুৎসিত দেশাচার সংস্কারে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাদের অবস্থা যেন ঠিক রাখাল বালকের মত। একটাকে ধরিয়া বাঁধিতে গেলে আর দশটা দশ দিকে ছুটিয়া পালায়। সমাজগতি, জীবনগতি অতি বিচিত্র। প্রতি জনের নিজ জীবনে, বিশেষতঃ ভাবীবংশের জীবনে কত অদ্ভুত পরিবর্ত্তনই দেখিতে পাই! প্রবল স্রোত-স্বতীর গতি যেমন কখন কোন্ দিকে ধাবিত হয়, কেহ নির্ণয় করিতে পারে না, সুতরাং তাহার গতিকে একটী নির্দ্দিষ্ট সীমামধ্যে বদ্ধ রাখা যায় না, তেমনি সমাজের গতি। যুগে যুগে ইহার কিরূপ ঘোর পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহা প্রাচীন ইতিহাস পাঠে আমরা জানিতে পারি এবং বর্ত্তমান অবস্থাতেও তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। দশবৎসর পূর্ব্বে যাহাকে দেখিয়াছিলাম, জাতি কুল দেশাচার ও প্রচলিত ধর্ম্ম নিয়ম ভাঙ্গিয়া সমাজ ও ধর্ম্মসংস্কারকদিগের মধ্যে এক জন প্রধান, এক্ষণে সে সপরিবারে পুনরায় পরিত্যক্ত সেই পুরাতন আচার ব্যবহার পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিয়া পরিত্যক্ত ধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলে বলে, "এইতো ঠিক, পূর্ব্বে না বুঝিয়া জাতি কুল পৈতৃক ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছিলাম। আমরা আর্য্যবংশ, আর্য্যধর্ম্মাবলম্বী, এমন স্থিতিস্থাপক অধিকারোপযোগী সনাতন ধর্ম্মকে যাহারা নিন্দা করে, তাহারা নিতান্ত নরাধম পাষণ্ড।" কিছু দিন পরে যখন সে গোঁজা মিলন দিয়া সদলে মিশিয়া জাতিকুল পুনপ্রাপ্ত হয়, তখন হাসিয়া হাসিয়া গোপনে বন্ধুদিগকে বলে,—"ভাই, তুমিও যেমন, ধর্ম্ম টর্ম্ম সবই মিথ্যা, জাতি কুল রক্ষা কেবল ভণ্ডামি; কি করি, লোকদেখান একটু আড়ম্বর চাই, নতুবা বিষয় সম্পত্তিগুলি হস্তান্তর হইয়া যায়। সত্যের জন্য কি বিষয় হইতে বঞ্চিত হইতে পারি? পিতৃ পিতামহের কৃত উইল, দলিল পত্র, আইন কানুন সব প্রচলিত ধর্ম্মের আচার ব্যবহারের সঙ্গে এমনি গাঁথা আছে যে, এখানে আর কোন চালাকি চলে না, কাজেই লোকাচার সমস্ত না মানিয়াও মানিতে হয়।" এই বলিয়া দলে মিশিয়া যায়, কিন্তু ভিতরে যাহা ছিল, তাহাই থাকে। একজন গৃহস্বামী নিজে চিরদিন পরম বৈষ্ণবের মত হবিষ্যান্ন নিরামিষ ভোজন করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার খাওয়া পরা সব সাদা সিধা রকম, দেশীয় ভাবের তিনি বড়ই পক্ষপাতী, কথায় কথায় হরেকৃষ্ণ, হরিনাম, বিজাতীয় বেশ ভূষা, পান ভোজন, ম্লেচ্ছরীতির প্রতি চিরদিন খড়্গহস্ত, কিন্তু ছেলেটীকে ভালরূপে ইংরাজি বিদ্যা শিক্ষা দিতে হইবে, নতুবা অর্থোপার্জ্জনের সুবিধা নাই, মান সম্ভ্রমও বাড়ে না। ক্রমে সেই ছেলে বড় হইয়া, বি, এ, এম, এ, পাস করিয়া সাহেবী পোষাক ধরিল, ম্লেচ্ছের

খাদ্য খাইতে লাগিল। তখন গৃহস্বামী পিতা মাতা আর তাহাকে জাতীয় ধর্ম্মের কৌলিক প্রথার গণ্ডীমধ্যে আটকিয়া রাখিতে পারেন না। উপার্জ্জনক্ষম পুত্র সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন, সে কাহাকেও গ্রাহ্য করে না। মেয়েগুলিকে কোন প্রকারে মহাকালী পাঠশালায় পাঠাইয়া দেশীয় এবং জাতীয় আকারে গঠন করা হইয়াছিল। কিন্তু তাই বা কত দিনের জন্য? শিক্ষিত উপার্জ্জনক্ষম জামাতার হস্তে তাহাকে নিশ্চয়ই অর্পণ করিতে হইবে, তদ্ভিন্ন পরিণামে তাহার মহাকষ্টে পড়িবার সম্ভাবনা। এইরূপ পুরাতন বাহ্য রীতি নীতির সঙ্গে নূতন বিধ শিক্ষা সংস্কার মিলাইয়া পুত্র কন্যাদিগকে অভিভাবকেরা ভবের পথে, আধুনিক সভ্যতার স্রোতে ছাড়িয়া দিলেন। পরিশেষে কিছুদিন পরে তিনি স্বচক্ষে দেখিতে পাইলেন, সেই মহাকালী পাঠশালায় শিক্ষিতা কন্যা বিবি সাজিয়া সাহেব স্বামীর সহিত হাত ধরা ধরি করিয়া দুই চারিটী ছোট ছোট বাবা বেবিকে লইয়া বাড়ীতে উপস্থিত। কেবল তাহাই নহে, ছেলেটীও ইঙ্গবঙ্গ রূপিনী এক স্বদেশজাত বিবি বধূর সহিত ইংরজি পোষাক পরা দুই পাঁচটী বাবুলোক ও বেবি, তৎসঙ্গে আরো খানসামা বাবুর্চিকে লইয়া কর্ম্মস্থান হইতে পিতৃগৃহে উপস্থিত। তাঁহাদের সঙ্গে বুল্‌ডগ্, গ্রে হাউণ্ড, ল্যাপ ডগেরা আসিয়া রান্না ঘরে, শয়নের বিছানায়, কর্ত্তার আহ্নিকের স্থান এবং ঠাকুর দালানের মধ্যে ছুটাছুটি আরম্ভ করিল। গৃহস্বামী ভক্তবৃন্দের গাত্রে রঙ্গীন নামাবলী দেখিয়া তাঁহাকে উহারা পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিতেও ছাড়িল না। তখন কর্ত্তা গিন্নী মর্ম্মান্তিক ক্লেশে ব্যথিত হইয়া মৃদুস্বরে বিরক্ত ভাষায় বলিতে লাগিলেন, "আঃ কি পাপ! রান্না ঘরে, ঠাকুর ঘরে ইংরাজি কুকুর? গঙ্গাজল দ্বারা শুদ্ধ করিতে হইবে, নৈলে আর উপায় কি?" বাস্তবিক আর কোন উপায়ই এস্থলে নাই। যাহারা বিদ্বান, পদস্থ, এবং অনেক টাকা আনে, অধিকন্তু যাহারা আপনার ছেলে মেয়ে, জামাই পৌত্র দৌহিত্রী, তাহাদিগকে ছাড়িলে কি চলে? একদিন দেখি যে সেই প্রাচীন বৈষ্ণব ভক্ত হগ সাহেবের বাজার হইতে মুর্গি হাঁস পেরু এবং শেয়ালদহের রেল হইতে তাজা ভেটকি মাছ ক্রয় করিয়া আনিতেছেন। জিজ্ঞাসা করায় সলজ্জ হাস্যমুখে বলিলেন,—"কি করি, বাড়ীতে ছেলে জামাই। তাহারা আরতো শাক, সুখতনি, মোচাঘণ্ট খায় না, খাইলে পেটব্যথা করে; কাজেই কালধর্ম্মের অনুসরণ করিতে হইতেছে। পৌত্র দৌহিত্রীরা আবার কুক্কুট ডিম্ব ভিন্ন প্রাতে কিছুই খাইতে চাহে না, জানেও না। এ সব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল, অদৃষ্টের লিখন। প্রাক্তন কর্ম্মভোগ করিতেই হইবে। ভাগ্যলিপিতে যাহা আছে, তাই হউক!" এই বলিয়া নিরামিষভোজী সাত্ত্বিকাচারী বৃদ্ধ ইঙ্গবঙ্গ পুত্র কন্যার সেবায় অবশিষ্ট জীবন ক্ষয় করেন। তাহাতে কি মনে কর, তিনি নিতান্ত অসন্তুষ্ট? না, তাহাত বোধ হয় না। বরং একটু বেশ প্রসন্ন এবং উৎসাহিত। হরিনামের মালা লুকাইয়া রাখিয়া স্বেচ্ছাচারী ভাবী বংশের যাহাতে পূর্ণ মাত্রায় বৈদেশিক পানাহার বিলাসিতা চরিতার্থ হয়, তজ্জন্য এখন তিনি সর্ব্বদাই ব্যস্ত। উহাই এখন তাঁহার চিন্তা, ধ্যান, জপমালা এবং প্রসঙ্গ। আহা! বিষ্ণুমায়াতে মোহিত জগত, জগতা

স্নেহ জীব কেমনে ছাড়িবে? কাজেই কাল স্রোতে ভাসিয়া তিনি এই ভাবেই শেষ ভবসিন্ধুতেই গিয়া উপস্থিত হন। দুহিতা জামাতা, পুত্র কন্যা, পুত্রবধূ, নাতি নাতিনীরা কলির দেবতা ইংরাজি সাহেব মেমের মত সুন্দর সভ্য মূর্ত্তি ধরিয়া বেড়াইতেছে, এই অপরূপ দৃশ্য দর্শন করিলে এখন বিমূঢ় পিতা মাতা আজ কালের দিনে কে আছে, আত্ম গৌরবে যাহার বক্ষ স্ফীত হইয়া না উঠে? নশ্বর হৃষ্ট পুষ্ট গৌরবর্ণ দেহ, আর সভ্য পরিচ্ছদ আভরণ, ইহাতে মায়াবদ্ধ জীবের মন সহজেই মোহিত হয়। কিন্তু আত্মীয় প্রিয় সন্তানগণের অমর আত্মা অনাচার অধর্ম্মে বিকৃত, পাপে মৃতপ্রায়, তাহার দিকে দৃষ্টি করিবার কাহারও অবসর নাই। মদ্য মাংস চুরুট ইত্যাদি অভ্যস্ত পদার্থগুলি ছাড়িলে পাছে তাহাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়, এজন্য তাহাতেও পিতা মাতার যথেষ্ট উৎসাহ। এই গেল এক মূর্ত্তি। আর এক মূর্ত্তি অবলোকন কর। একজন প্রকাশ্য সভায় কেবলই বক্তৃতা করেন যে "হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা পৈতৃক ঠাকুর দেবতা গুলকে জলে ফেলিয়া দাও, জাতি ভাঙ্গ, বালবৃদ্ধ বিধবা বিবাহ কর, বিধবা থাকিতে কদাপি কেহ কুমারী বিবাহ করিও না, অসবর্ণ বিবাহ দ্বারা একটা মিশ্র বর্ণসঙ্কর জাতির সৃষ্টি না করিলে ভারতোদ্ধার হবে না; কেহ তোমরা গলায় মালা কি কাঁধে পৈতা ইত্যাদি জাতিভেদের কোন চিহ্ন রাখিও না, যার তার হাতে যা তা খাইয়া বেড়াও, আহার বিহার ভয়ানক কুসংস্কার, পৌত্তলিকতা এবং জাতিভেদের নাম গন্ধ যে দেশে আছে, সে দেশে যাইবে না, কেবল এক নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মকে ভালবাস, আর নর নারীকে প্রেম দান কর।" নিজ জীবনের দৃষ্টান্ত সহকারে তিনি এইরূপ মতামত প্রচার করিয়া বেড়ান এবং অন্যকে নিজের মতে আনেন। তাহারাও ঐরূপ কার্য্য করিত এবং ঐ সকল কথা বলিয়া বেড়াইত। মহাবিপ্লব উপস্থিত। কিছুদিন পরে দেখি, তাহারাই আবার নাকে তিলক কাটিয়া, কৌপীন, বহির্ব্বাস মালা উপবীত পরিয়া গম্ভীর স্বরে বলিতেছে,—

"আঃ দেখ দেখ, আমাকে ছুঁইও না, আমরা কাহারও ছোঁয়া কিছু খাই না।" এইরূপে কেহ পুনরায় বৈরাগী বাবাজী সাজিল, কেহ সন্ন্যাস বেশ এবং ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিল, তার সঙ্গে পরিবার সন্তানদিগকেও একটা কিম্ভূত কিমাকার গঠন করিয়া তুলিল। অন্য আর এক মূর্ত্তি অবলোকন কর। পিতা একজন ধর্ম্ম এবং সমাজ সংস্কারক, এক একটু গুরুবাদ, কর্ত্তাভজার ভাবও তাঁহার জীবনে দেখা যাইত। একদিন হঠাৎ তিনি দেখিলেন যে, নিজের ছেলেটী গলায় পৈতা দিয়া মাথায় টিকি রাখিয়া পিতার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সেই রাজ্যের ঠাকুর দেবতা আনিয়া একটা ঘর বোঝাই করিয়াছে, সেখানে নিত্য পূজা আরতি ভোগ কতই সমারোহ। জিজ্ঞাসা করিলে বলে, আমি গুরুর নিকট মন্ত্র লইয়াছি, এইরূপে কেহ খ্রীষ্টান, কেহ বৈষ্ণব, কেহবা নবহিন্দু, কেহবা মুসলমান মূর্ত্তি ধারণ করিল। ধর্ম্মসংস্কারকগণ শেষ জীবনে দেখিতে পাইলেন, তাঁহাদের পরিশ্রমের ফলে একটা বর্ণসঙ্কর দল উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারা ধর্ম্মফল জানে না, মানে না, কেবল বিবাহ করে, আর বিবাহ দেয় এবং বর্ণসঙ্করের দল বাড়ায়। আদের কাহারো সাথে কাহারো রক্তের ও

সম্বন্ধ নাই, প্রাণ মন মানে না। আত্মারও যোগ নাই; এমন কি, আসঙ্গলিপ্সাও নাই। কেহ গুরুজনকেও মানে না দেখিয়া প্রাচীন সমাজসংস্কারক বলিতেছেন, "হা! এ কি হইল? ঠাকুর গড়িতে হনুমান গড়িলাম?"

তৃতীয় মূর্ত্তিটী আরও অপরূপ। ইহাঁরা স্বদেশেজাত সাহেব বিবি বা ইঙ্গবঙ্গ। মানবসমাজে বিবাহটা চিরকালই অপরিহার্য্য, সুতরাং ইহাঁদেরও পুত্র কন্যার বিবাহ প্রয়োজন। কিন্তু এস্থলে বিবাহে যে কোন ধর্ম্মানুষ্ঠান ব্যবহৃত হইতে পারে, আবার উহা ধর্ম্মহীন হইলেও কাজ বন্ধ হয় না। প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম এবং দেশীয় আচার ব্যবহারের যদি কেহ মহাশত্রু থাকে, তবে সে শত্রু ইহাদিগকে বলিতে হইবে। তথাপি ইহারা এক প্রকার অভিনব বিলাতি হিন্দু ভাব ধারণপূর্ব্বক বহুরূপী আধুনিক হিন্দুধর্ম্মের নামে বিবাহাদি করেন এবং দেন। সেজন্য আমোদ এবং কৌতুক উপহাসচ্ছলে দেব দেবীর প্রতিমা, সালগ্রামের সম্মুখে মৌখিক পূজা প্রায়শ্চিত্ত করেন এবং অম্লান মুখে প্রকাশ্যে বলেন, "সনাতন হিন্দুধর্ম্মের মত কি আর ধর্ম্ম আছে? আমরা হিন্দুসন্তান, হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী।" তরলমতি যুবার দল তচ্ছ্রবণে বিলাতি হিন্দু ভ্রাতাদিগকে অভিনন্দন পত্র প্রদান করে। এ বিষয়ে সাত্বিক সদাচারী ইষ্টনিষ্ঠ প্রকৃত বিশ্বাসী হিন্দু মহাত্মাদিগের কত দুর অনুমোদন আছে, না আছে, আমরা জানি না, কিন্তু সমাজমধ্যে এ প্রকার ধর্ম্মাবমাননা দিন দিন বেশ চালিত হইতেছে। কারণ, আধুনিক নবহিন্দুর দল ইহার পৃষ্ঠপোষক। বর্ত্তমান সময়ে ভারতের রাজনীতি এবং সমাজসংস্কারক দেশ-হিতৈষীর দলের অগ্রণী মহাশয়েরা প্রায় সকলেই এই বিলাতি হিন্দু এবং নবহিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। দেশের যাবতীয় ভাবী কল্যাণের আশা ভরসা এখন ইহাদেরই উপর নির্ভর করিতেছে। এই ত্রিমূর্ত্তি এখন সমাজ পরিচালক এবং আদর্শ নেতা এবং গুরু আচার্য্য উপাস্য দেবতা।

যে সমাজের ভিত্তি মূলে কোন প্রাচীন নৈতিক অনুশাসন বিধি, পৈতৃক সমাচার, সত্যনিষ্ঠা, ধর্ম্মগৌরব নাই, তাহা আমেরিকার মিশ্র জাতির ন্যায় সর্ব্বদা চঞ্চল অস্থির। একবারে যদি পূর্ব্বকার সমস্তব্যবহারিক নীতি, ধর্ম্মজ্ঞান বিশ্বাস এবং সাধন প্রণালীর মূল উৎপাটন পূর্ব্বক সমাজবিপ্লব ঘটাও এবং অপ্রতিষ্ঠিত অভিনব নিয়মে ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে একটী স্বেচ্ছাচারী নাস্তিকবৎ বর্ণসঙ্কর সমাজের সৃষ্টি করিবে। পক্ষান্তরে নিত্য ব্যবহারিক সমাজ ধর্ম্মকে একবারে ধর্ম্মহীন বা বিশ্বাসহীন কপট ধর্ম্মের একটা বৈষয়িক ব্যাপার করিয়া আপনাপন আন্তরিক অবিশ্বাস ও বিশ্বাসকে যদি হৃদয়গুহা মধ্যে লুকাইয়া রাখ, তাহা হইলেও মহাব্যাধিতে সমাজ পরিবার এককালে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। অনেকে মনে করেন, সামাজিক এবং পারিবারিক গৃহানুষ্ঠান এবং বাহ্য ধর্ম্ম ক্রিয়া যেমন চলিয়া আসিতেছে, তদনুসারে কার্য্য সম্পাদিত হউক, এ সকল আমরা বিশ্বাসও করি না, মানিও না; এখনকার কালের মেয়ে ছেলেরাও মনে মনে বুঝিয়াছে, এ সব মিথ্যা; তথাপি উহা যত দিন চলে চলুক; আমরা ভাবেতে এবং সত্যেতে অন্তরে যে যাহা পারি ইষ্ট দেবতার ধ্যান চিন্তা করিব। এইটী কিন্তু ভয়ানক সাংঘাতিক কথা। ইষ্ট দেবতা কি

কেবল ধ্যান চিন্তার বিষয়? তাঁহার ইচ্ছা পালনের জন্য কি মানুষ দায়ী নহে? যদি সে তজ্জন্য দায়ী হয়, তাহা হইলে কি সে ঈশ্বরের দ্বারে প্রার্থনা করিবে না? যদি জগবদিচ্ছা পালনের জন্য সে আপনাকে দায়ী মনে করে, তাহা হইলে পরিবার এবং সমাজক্ষেত্রে দৈনিক জীবন কি একমাত্র তাহার সাধন স্থান নহে? অতএব ভিতরকার জ্ঞান বিশ্বাস বিশুদ্ধ সংস্কৃত এবং যুক্তিসঙ্গত, অথচ পারিবারিক এবং সামাজিক ব্যবহারিক ক্রিয়া তাহার বিপরীত, ইহা চলে না; ইহা আত্মবঞ্চনা এবং আত্মহত্যা। নিষ্ক্রিয় বিশ্বাস ভক্তি পরিশেষে কল্পনা, তদনন্তর ক্রমে শূন্যবাদে পরিণত হয়। উৎকট ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তি যেমন বিবাহ করে না, কেননা তাহা হইলে তাহার বংশও চিররুগ্ন হইবে, এইরূপ ভয় থাকে; তেমনি সন্তানাদি প্রথম হইতে যদি মিথ্যাকে সত্য এবং সত্যকে মিথ্যা বলিয়া বুঝে, তাহা হইলেও বিবাহ করা উচিত নহে। কপট নাস্তিক ভাবীবংশ না জন্মানও ভাল।

এতক্ষণ যাহা কিছু বর্ণিত হইল, সমস্তই প্রায় রোগের কথা, চিকিৎসা প্রণালী কি? এই যে সকল বিচিত্র গতি, অভিনব বিকাশ সমাজের চারিদিকে দেখা যাইতেছে, কাহারো সাধ্য নাই যে ইহার গতি রোধ করে। সমাজশক্তির ইহা স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। ভঙ্গশক্তি, বিপ্লাবক গতি না থাকিলে গঠন ক্রিয়া আরম্ভ এবং সামঞ্জস্য স্থাপিত হয় না; সুতরাং এজন্য আশ্চর্য্য হইয়া বসিয়া ভাবিলেও চলিবে না, অনির্দ্দিষ্ট গতি স্রোতে অবশভাবে ভাসিয়া যাওয়াও উচিত নহে। নূতন পুরাতন, পৈতৃক আধুনিক বিশ্বাস অনুষ্ঠানের মধ্যে জ্ঞান ভক্তির মিলন স্থান খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। এই যে আন্দোলন, পরিবর্ত্তন, আবর্ত্তন, আলোড়ন, ইহার কি কোন অভিপ্রায় নাই? মঙ্গলময় বিধাতার রাজ্যে অরাজকতা, বিদ্রোহিতা চিরস্থায়ী হইতে পারে না। পরিণামে সামঞ্জস্যের সুনীতি এবং সার্ব্বভৌমিক সদ্ধর্ম্মের জয়। ইহাই জীবগণের এবং মানবসমাজের নিয়তি। তাহার দিকে চাহিয়া সংযত ভাবে ঔষধ অন্বেষণ করিতে হইবে। এ মহারোগ যেমন স্বভাবসম্ভূত, ইহার জন্য মহৌষধও অবশ্য আছে, বিশ্বাস করিতে হইবে। মহা উন্নতিশীল সংস্কারক এবং স্থিতিশীল সময়মুখাপেক্ষী অবস্থার দাসগণ আপনাপন ভুল বুঝিয়া যদি সামঞ্জস্য নীতির পথ ধরেন, এবং সর্ব্বাগ্রে যদি স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ করেন, তাহা হইলে উচ্ছৃঙ্খল-মতি স্বেচ্ছাচারী এবং গতানুগতিক লোক সংখ্যা তাঁহাদের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইবে। আর্য্যসন্তানগণ পৈতৃক ধর্ম্মনিষ্ঠার অধিকারী হইয়া আধুনিক বিদ্যা সভ্যতা লাভ না করিলে জাতীয় গৌরব রক্ষা পাইবে না।

গুটি কয়েক মুষ্টিযোগের কথা উল্লেখ করিয়া আমি এ প্রস্তাব উপসংহার করিব।

১। পিতা মাতারা যদি ভাবীবংশের যথার্থ কল্যাণ-প্রার্থী হয়েন, তবে সর্ব্বাগ্রে আপনারা সরলহৃদয়, সত্যনিষ্ঠ হইয়া উহাদিগকে সরল সত্যপ্রিয় করুন; কেবল সত্যানন্দ, জ্ঞানানন্দ, প্রেমানন্দ নাম রাখিলে সন্তানের প্রতি যথা কর্ত্তব্য করা হয় না। প্রথম হইতে গৃহে ও সমাজমণ্ডলীতে যদি তাহারা কপট ধর্ম্মক্রিয়া দেখিয়া তাহাই শিক্ষা পায়, ভবিষ্যতে কি ধরিয়া দাড়াইবে? মহাব্যাধি যক্ষ্মাকাশের ন্যায় এই সকল কুশিক্ষা। যাহা মানি না, বিশ্বাস করি না,

করিতে পারি না, তাহা নিজে করিব, সন্তানদিগকে তাহা শিখাইব, ইহা যে সন্তান-হত্যা রূপ মহাপাপ! অতএব যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস জন্মে, তাহারই আচরণ করিতে হইবে, গড়িয়া পিটিয়া নহে। অসত্যপ্রিয় বংশের দ্বারা পূর্ব্বপুরুষ, দেশ, জাতি, সমস্তই নরকে গমন করে। আহা! সুকুমারমতি বালক বালিকার অন্তরে আর মিথ্যা গরল ঢালিয়া দিও না। উহারা দেব-শিশু।

২। পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত ব্যবহারিক অনুষ্ঠান মধ্যে যাহা কিছু সত্য ও সুনীতি সদ্ভাব আছে, তাহা বাছিয়া লইতে হইবে। ব্রত নিয়ম, গৃহানুষ্ঠান, সামাজিক ক্রিয়া, ইষ্টনিষ্ঠা, বিস্তৃত কর্ম্মকাণ্ড, সমস্ত সংশোধিত ও পুনর্জ্জীবিত হউক! অর্থহীন মন্ত্রতন্ত্র, অবোধ্য প্রণালী এবং অবান্তরিক বাহাড়ম্বর উঠিয়া যাউক! বেদ বেদান্তপ্রতিপাদ্য আদিদেব পরব্রহ্মের নামে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সমস্ত কার্য্য মহিমান্বিত হউক। তিনি এক অনন্ত সত্য, অখণ্ড পদার্থ, তাঁহাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করিলে মনও ছোট হইয়া যাইবে। তিনি খুব বড়, নিজেরাও বড় হও।

৩। নূতন ভাবে জ্ঞান বিশ্বাস সহকারে সংক্ষেপে বা বাহুল্যরূপে পারিবারিক এবং সামাজিক ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে হইবে। ইহাতে কোনরূপ অস্বাভাবিক কঠোরতা, অজ্ঞানতা, অসারতা, অন্ধভক্তি স্থান পাইবে না। মূল সত্যের প্রতি বিশ্বাস ভক্তি নিষ্ঠা স্থির থাকিলে যাবতীয় বিষয়ে সামঞ্জস্য রক্ষা পাইবে।

৪। ভাবীবংশের চরিত্রের প্রতি চাহিয়া, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সময়ের অবশ্যম্ভাবী ঘটনা ও চিহ্ন দেখিয়া, যাহা স্বাভাবিক এবং সঙ্গত, সহজজ্ঞানে তাহা বুঝিয়া লইয়া, জাতীয় নীতির নিয়তি এবং স্বদেশীয় বিশেষ ব্যক্তিত্বকে স্বয়ং বিধাতা বিশ্বনিয়ন্তার কার্য্য জানিয়া সমাজ ও ধর্ম্ম সংস্কারের পথ ধরিতে হইবে। হাজার২ বৎসর হইতে জাতীয় ইতিহাসের মধ্যে যে সকল জ্ঞান এবং নীতির স্রোত বহিয়া আসিতেছে, তাহা কি সকলই ভ্রম কল্পনা কুসংস্কার? অথবা আদ্যোপান্ত অক্ষরে অক্ষরে সে সমুদয় কি অভ্রান্ত সত্য হইতে পারে? ক্রমবিকাশশীল সমাজনীতির উন্নতির পথ বন্ধ করিয়া যদি ক্রমাগত পশ্চাতের দিকেই যাও, জাতীয় জীবনীশক্তি বিনষ্ট হইবে। কিন্তু তাহা কেহ করিতে পারিবেন, এরূপ সম্ভব নহে। অথবা পুরাতন যাবতীয় রীতি নীতির অপব্যবহার দেখিয়া যদি নূতন বিধ উদ্ভট একটী শাস্ত্র তন্ত্র বিধি নিয়মের গোড়া পত্তনে এখন প্রয়াসী হও, তাহাতেও কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না। সে কেবল গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালা হইবে। মাতৃভূমির জল বায়ু এবং স্বদেশীয় স্বজাতীয় দৈহিক প্রকৃতির আমূল পরিবর্ত্তন এবং তাহাদের স্থানে নূতনের আবির্ভাব যেমন স্বভাববিরুদ্ধ,—কেবল তাহার সংশোধন এবং উন্নতির পথ মুক্ত থাকিবে।—তেমনি সমাজ দেহের মৌলিকতাকে রক্ষা করিয়া নবভাবে তাহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে হইবে। এরূপ সামঞ্জস্য একটী প্রহেলিকা নহে, স্বভাব এবং সহজজ্ঞানের অনুমোদিত।

শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা।

প্রাচীনভারতের বাণিজ্য। (৮)

যাঁহারা বলেন যে, হিন্দুরা কোন কালেই সমুদ্রযাত্রা করে নাই—তাহারা পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গমের ন্যায় কেবল স্বদেশ মধ্যেই চিরকাল আবদ্ধ থাকিত, তাঁহারা হিন্দুদিগের শাস্ত্র সম্যক আলোচনা করেন নাই বলিলে অনুচিত হইবে না। আমরা ইতঃপূর্ব্বে যথাক্রমে বৈদিককালে ও রামায়ণোক্তকালে হিন্দুদিগের সমুদ্রপথে গমনাগমন দেখাইয়াছি, এইক্ষণ মহাভারতোক্তকালেও যে হিন্দুরা সমুদ্রযাত্রা করিতেন, তাহার নিদর্শন-সকল নিম্নে প্রকটিত হইল :—

১। দ্রোণপর্ব্বের একস্থানে লিখিত আছে যে, হে পুরুষ-শ্রেষ্ঠ মহারাজ! যেমন নাবিকগণ সমুদ্রে নৌকা ভগ্ন হইলে সময়ে কোন দ্বীপ পাইয়া সুখী হয়—।১

২। দ্রোণপর্ব্বের অপর একস্থানে উক্ত আছে যে, যেমন মহাসমুদ্রে নৌকা চতুর্দ্দিক্ হইতে প্রবলবাত্যা দ্বারা আহত হইয়া ভগ্ন হয়—।২

৩। যেমন বণিকগণ নৌকা ভগ্ন হইলে ক্ষুদ্র তরণি-বিহীন হইয়াও অপার জলধি-পার হইতে ইচ্ছা করে, তেমনি অর্জ্জুন কর্তৃক হস্তী হত হইলে—।৩

৪। যেমন ভগ্ন-তরণীর বণিকগণকে অপর নৌকা সকল দ্বারা সমুদ্র হইতে উদ্ধার করিতে হয়, তেমনি দ্রৌপদী-নন্দনেরা কর্ণ-রূপ-সাগরে নিমগ্ন নিজ মাতুলগণকে সুকল্পিত রথ সমূহ দ্বারা উদ্ধার করিলেন। ৪

৫। বণিক যেমন সমুদ্র হইতে যথার্থ ধনলাভ করিয়া থাকে, তেমনি নর-সাগরে কর্ম্মের বিশিষ্ট জ্ঞান হইতে জীবের মুক্তি হইয়া থাকে। ৫

আমরা অতি সংক্ষেপে স্থল ও জলপথে ভারতীয় বাণিজ্যের বিষয়মাত্র উল্লেখ করিব।

স্থলপথে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য তিনটী পথ দ্বারা সম্পাদিত হইত। (১) ভারতীয় বণিকগণ সিন্ধুনদ পার হইয়া বাহ্লীক, হাটক, চীন, মহাচীন, উত্তরকুরু-বর্ষ প্রভৃতি দেশে বাণিজ্য করিতে যাইত। (২) বণিক্‌গণ সিন্ধুনদ পার হইয়া বঙক্ষু (Oxus) নদীতীরস্থিত ও কাস্পীয়ান সমুদ্রের তীরবর্ত্তী দেশ সমূহে বাণিজ্য করিতে যাইত। (৩) বণিকগণ সিন্ধুনদ পার হইয়া পারসীক, বনায়ু প্রভৃতি দেশে পণ্যদ্রব্য-জাত লইয়া বাণিজ্যকার্য্য নির্ব্বাহ করিত। যে সকল পণ্যদ্রব্য লইয়া উক্তরূপ বাণিজ্য নির্ব্বাহিত হইত, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

---

১ "ভিন্ননৌকা যথারাজন্ দ্বীপমাসাদ্য নির্বৃতাঃ।
ভবন্তি পুরুষব্যাঘ্র নাবিকাঃ কালপর্য্যায়ে॥" ঐ
Vide দ্রোণপর্ব্ব।

২ "বিষমবাতহতা রুগ্না নৌরিবাসীন্মহার্ণবে।"

৩ "বণিজোনাবিভিন্নায়া যথাগাধেহপ্লবা যথা।
অপারে পারমিচ্ছন্তো হতে দ্বিপে কিরীটিনা॥"
Vide কর্ণপর্ব্ব।

৪ "নিমজ্জত স্তানথ কর্ণ-সাগরে
বিপন্ননাবো বণিজো যথার্ণবাৎ॥
উদ্দধ্রিরে নৌভিরিবার্ণবা দ্রথৈঃ
সুকল্পিতৈর্দ্রৌপদীজাঃ স্বমাতুলান্॥ ঐ

৫ "বণিক্ যথা সমুদ্রাদ্বৈ যথার্থং লভতে ধনম্।
তথা মর্ত্ত্যার্ণবে জন্তোঃ কর্ম্মবিজ্ঞানতো গতিঃ॥
Vide শান্তিপর্ব্ব।

এই সকল অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য দ্বারা তৎকালীন ভারতের যে কীদৃশ উন্নতি হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত হইলেও, যেমন শ্রীরামচন্দ্র অরণ্যাগত মহাত্মা ভরতকে দেখিয়া রাজ্যশাসনাদি সম্বন্ধে প্রশ্নাদি করণ দ্বারা তৎকালীন ভারতের সমগ্র উন্নতির বিষয় জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, তেমনি দেবর্ষি নারদ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সভায় আগমন করিয়া প্রশ্নচ্ছলে তাৎকালিক ভারতের রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি এবং ভারতের আভ্যন্তরিক সুখ সমৃদ্ধির বিলক্ষণ আভাস প্রদান করিয়াছিলেন।

জলপথে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য তিনটী পথদ্বারা সম্পাদিত হইত। (১) সাংযাত্রিকেরা ভারত হইতে পণ্যদ্রব্য-জাত লইয়া সমুদ্রপথে পারসীক ও বনায়ু প্রভৃতি দেশে এবং শোকত্রদ্বীপে ও সূর্য্যারিকা (Africa) মহাদেশস্থিত মিশ্র (মিশর) প্রভৃতি দেশে বাণিজ্য করিতে যাইত (২) পোত-বণিকেরা সিন্ধুনদ বাহিয়া ভারত-সাগরোপকূলবর্ত্তী সৌরাষ্ট্র, গুর্জ্জর, চোল, কেরল, পাণ্ড্য, কোঙ্কণ, কাঞ্চী প্রভৃতি দেশে বাণিজ্যার্থ যাইত এবং এই সকল দেশ হইতে আবার বাণিজ্য দ্রব্য সকল উক্ত-পথে প্রথমতঃ সিন্ধুনদ-তীরস্থিত দেশ সমূহে ও তথা হইতে ভারতের মধ্যবর্ত্তী দেশ সকলে আনীত হইত। (৩) বণিকেরা ভারত-মহাসাগরোপকূলবর্ত্তী দেশ-সমূহ হইতে পোতযোগে পণ্যদ্রব্য সকল লইয়া সিংহল, মল্ল প্রভৃতি দ্বীপে ও পূর্ব্বোপদ্বীপে এবং ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরস্থিত দ্বীপ পুঞ্জে বাণিজ্যার্থ গমন করিত।

এইক্ষণে আমরা মহাভারতোক্ত কালের শিল্পাদি বিষয়ের কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়া মহাভারতীয় কালের বাণিজ্য বিষয়ক প্রস্তাবটী শেষ করিব; কারণ, বাণিজ্য-তরুর মূল কৃষি, উহার পুষ্প ও ফলাদি শিল্পাদি বিদ্যা। মহাভারতোক্ত কালে ভারতে স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও শিল্পাদি বিদ্যার যৎপরোনাস্তি উন্নতি হইয়াছিল। এমন কি, তৎকালে ভারত-বহির্ভূত দেশসমূহবাসী অনার্য্য জাতীয় লোকেরাও শিল্পাদি বিদ্যায় সুদক্ষ ছিল। শিল্পি-প্রবর ময়দানবের শিল্প-নৈপুণ্য মহাভারতের সভাপর্ব্বে বিশেষরূপে বর্ণিত রহিয়াছে। হিমালয়ের উত্তর দেশবাসী বৃষপর্ব্বাদি দানবগণের সভাগৃহ প্রভৃতিতে এতাদৃশ চমৎকারজনক শিল্প-সম্ভার ছিল যে, শিল্পাচার্য্য ময়দানব সেই সমস্ত উপকরণ দ্বারা মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অতুলনীয় ও অভূতপূর্ব্ব সভাগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ সভাগৃহ এরূপ চমৎকারজনক হইয়াছিল যে, দেবর্ষি নারদ উহা দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন, মনুষ্যলোকে এতাদৃশী মণিময়ী সভা কখন কেহ দর্শন করে নাই বা শ্রবণ করে নাই ১।

মহাভারতের সভাপর্ব্বে ময়দানব-নির্ম্মিত সভাগৃহের শিল্পচাতুর্য্য সম্বন্ধে যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহার কিঞ্চিৎ নিদর্শন নিম্নে প্রদর্শিত হইল:—

মহারাজ দুর্য্যোধন রাজসূয়-সভায় এক স্ফটিকময় স্থলে উপস্থিত হইয়া জলভ্রমে আপনার পরিহিত বস্ত্র উৎক্ষিপ্ত করিয়া উত্তরণ মানসে উহাতে পদবিক্ষেপ করিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইয়াছিলেন, এবং দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিষণ্নমনে তথা হইতে

১ মানুষেষু ন মেতাত! দৃষ্টপূর্ব্বা নচশ্রুতা।
সভা মণিময়ী রাজন! যথেয়ং তব ভারত।
Vide সভাপর্ব্ব।

ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি সভার কোন স্থানে স্থলভ্রমে স্ফটিক-বৎ নির্ম্মল জলপূর্ণ ও বিকসিত শতদল-শোভিত সরোবর-জলে নিপতিত হইলে ভীম-সেন অট্টহাস্য করিয়াছিলেন। পরে মহা-রাজ যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে ভৃত্যেরা তাঁহাকে পরিধানার্থ উৎকৃষ্ট বস্ত্র আনিয়া প্রদান করিল। তিনি পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় স্থলভাগে জলের আশঙ্কা এবং জলভাগে স্থলের আশঙ্কা করিয়া অতি সাবধানে পাদবিক্ষেপ করিতেছেন দেখিয়া পাণ্ডবেরা উপহাস করিতে লাগিলেন। তিনি উপ-হাসে মর্ম্মাহত হইয়া তাঁহাদের প্রতি আর দৃষ্টিপাত করিলেন না।

এইরূপে রাজা দুর্য্যোধন স্ফটিকময় সভা-কুট্টিমে প্রতারিত হইয়া স্ফটিক ভিত্তিতে দ্বার বিবেচনায় প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে মস্তকে কঠিন আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। স্থানান্তরে উদ্ঘাটিত স্ফাটিক-কপাট-যুক্ত দ্বার দেশে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় বিড়ম্বনা বোধে প্রবেশ করিতে বিরত হইলেন। *

রাজসূয়-সভার এই বর্ণনাটী অতিরঞ্জিত নহে; কেননা, রাজা দুর্য্যোধন স্বয়ংই মনো-দুঃখে পিতার নিকট বলিয়াছিলেন যে," আমি সেই রাজসূয় সভা মধ্যে ময়দানব নির্ম্মিত বিন্দু সরোবরানীত রত্ন-খচিত এক স্ফটিকময় স্থলে পদ্মযুক্ত বারিপূর্ণ সরোবর ভ্রমে পরি-হিত বসন উৎকর্ষণ করিলে ভীমসেন অট্ট-হাস্য করিয়াছিল। †

* Vide সভাপর্ব্ব।

† "কৃতাং বিন্দু সরোরত্নৈর্ময়েন স্ফটিকচ্ছদাম্। অপশ্যৎ নলিনীং পূর্ণাং উদকস্যেব ভারত। বস্ত্রমুৎকর্ষতিময়ি প্রাহসৎ স বৃকোদরঃ।"
সভাপর্ব্ব।

যৎকালে পাণ্ডবেরা মাতার সহিত বারণাবত নগরে পুরোচন-নির্ম্মিত-জতুময় গৃহে বাস করিতেছিলেন, তৎকালে মহামতি বিদুর কর্তৃক প্রেরিত শিল্প-প্রবর একজন খনক সেই জতুগৃহে একটী অনতিবৃহৎ সুরঙ্গ এমন কৌশল ক্রমে নির্ম্মাণ করিয়াছিল যে, রাত্রিকালে জননীর সহিত পাণ্ডবগণ ঐ সুরঙ্গ মধ্যে বাস করিতেন, এবং পরিশেষে সেই সুরঙ্গ পথে পাণ্ডবেরা মাতৃ সমভি-ব্যাহারে অদৃষ্টভাবে গঙ্গাতীরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। ঐ সুরঙ্গটী জতু-গৃহ-মধ্যস্থিত ও কপাটযুক্ত এবং ভূমির সহিত সংলগ্ন ছিল। উহা সমাতৃক পাণ্ডব-গণ ভিন্ন অন্য কেহ জানিতে পারিয়া-ছিল না *।

হায়, ভারতে আর সে কারুকার্য্য কোথায়! কোথায় সে শিল্পচাতুরী! কোথায় সে শিল্পী! "তেহিনো দিবসা গতাঃ"—সে দিন আমাদের চলিয়া গিয়াছে! এখন ভারতবাসী সামান্য দ্রব্য দেখিয়াই বিমো-হিত ও স্তম্ভিত! ভারতবাসী অন্ন-চিন্তায় সূক্ষ্মশিল্প ভুলিয়া গিয়াছে!

প্রাচীন ভারতে সম্ভ্রান্ত জাতীয় লোকেরা শিল্পকার্য্য করিতেন। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত শিল্পবিষয়ক অনেক গ্রন্থ অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। শিল্পশাস্ত্রের অধ্যয়ন এদেশ হইতে বহুকাল হইল তিরোহিত হইয়াছে। বাণিজ্যের বাহুল্যেই শিল্পের প্রাচুর্য্য আবশ্য-কীয়, সুতরাং ভারতে বাণিজ্য লোপের সঙ্গে সঙ্গে শিল্প চর্চ্চাও উঠিয়া যায়। এদেশে মুসলমানগণের আগমনের বহু পূর্ব্ব হই তে বাণিজ্য লোপ আরব্ধ হয়।

* "চক্রে চ বেশ্মনস্তস্য মধ্যে নাতি মহাবিলং। কপাটযুক্ত মজ্ঞাতং সমং ভূম্যাশ্চ ভারত।"
আদিপর্ব্ব।

অতিপূর্ব্বকালে এই ভারতবর্ষে যে সমস্ত শিল্প উন্নতি লাভ করিয়াছিল, ইয়োরোপীয় আধুনিক সভ্যজাতীয় লোকেরা সেই সকল শিল্পের পুনরুদ্ধার বা পুনঃসংস্কার করিতেছেন মাত্র। ইদানীন্তন কালে ইয়োরোপীয়েরা বাষ্পীয় যন্ত্র, ঘটিকা যন্ত্র, দূরবীক্ষণ প্রভৃতি যে সকল যন্ত্র প্রস্তুত করিতেছেন, ঐ সকল যন্ত্র এক সময় এই ভারতবর্ষে উৎকৃষ্টরূপে প্রস্তুত হইত। বিশ্বকর্ম্মাপ্রণীত "শিল্প-সংহিতা" নামক গ্রন্থ হইতে ঐ সকল বিষয়ের প্রমাণ ক্রমে উদ্ধৃত করা গেল :—এস্থলে বক্তব্য এই যে, "বিশ্বকর্ম্মা" কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম নহে, উহা শিল্পশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির উপাধি মাত্র। বোধ হয়, দেব-শিল্পী-বিশ্বকর্ম্মার নামানুসারে ঐ উপাধিটী পরিগৃহীত হইয়া থাকিবে। শিল্প-সংহিতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, বিধি-নন্দন বাষ্পযোগে বায়ুর ন্যায় দ্রুতগামী যান নির্ম্মাণ করিলেন। ইহা আকাশমার্গে ইচ্ছামত গমন করিতে পারে। ইহা দীপ্তিমান্ ও নানা উপকরণ-যুক্ত। উহাই পুষ্পকরথ নামে বিদিত *।

শাল্বরাজা ময়দানব হইতে লব্ধকামগামী ধূমযুক্ত দুর্ল্লভ যান আরোহণ করিয়া বৃষ্ণি-বংশীয়দিগের বৈর স্মরণ করতঃ অর্থাৎ তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত দ্বার-কাভিমুখে গমন করিয়াছিলেন। ঐ যান স্থলে, আকাশে, পর্ব্বতশৃঙ্গে ও জলে, যে কোন স্থানে চালান যাইতে পারে ¶।

শিল্প-সংহিতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্ম্মাণ সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, মনুর বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা সহসা দূরদৃষ্টি জন্য স্বায়ী দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সৃষ্টি করিলেন। প্রথমতঃ পলাশাগ্নিতে দগ্ধ মৃত্তিকা দ্বারা অধ্বংশী কাচ প্রস্তুত করিয়া তাহা পুনঃপুনঃ অগ্নি সংস্কারে শোধন করিলেন। ঐ কাচকে নির্ম্মল জলবৎ স্বচ্ছ ও পাতন করিয়া বংশ পর্ব্বের ন্যায় এক সচ্ছিদ্র ধাতু-নলের মধ্যে ও উভয় প্রান্তে পূর্ব্ব প্রস্তুত মুকুর বসাইয়া দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্ম্মাণ করিলেন *।

সূর্য্যসিদ্ধান্তের লিখনানুসারে জানা যায় যে, পূর্ব্বকালে গ্লোব দ্বারা ভূগোল শিক্ষা প্রদান করা হইত। সময়নির্ণয়ের জন্য নানাবিধ ঘটিকা-যন্ত্র ব্যবহৃত হইত। কেহ কেহ বলেন যে, থার্ম্মোমেটার, ব্যারোমেটার প্রভৃতি যন্ত্রও পূর্ব্বকালে প্রচলিত ছিল। দিগ্‌ নির্ণয় করিবার নিমিত্ত দিগদর্শন যন্ত্র হিন্দুগণই প্রথম প্রস্তুত করিয়াছিলেন। †

রামায়ণ ও মহাভারতে শতঘ্নী নামক অস্ত্রের বহুল উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। যদ্দ্বারা শতজনকে এককালে হত করা যায়, তাহাকে শতঘ্নী অস্ত্র কহে। গঙ্গার খাল কর্ত্তন করিবার সময় বিহাট নামক গ্রামের নিকট ভূগর্ভে নিহিত যে একটী গ্রামের ভগ্নাবশেষ

* "বাষ্পযোগেতুবৈ যানং চকার বিধি-নন্দনঃ। অবিচ্ছেদ গতির্যস্তু বায়ুবৎ কামগামিনম্। নানোপকরণৈর্যুক্তং ভাবন্তং পুষ্পকং বিদুঃ।

শিল্পসংহিতা—১৮শ অধ্যায়।

¶ "সলব্ধা কামগং যানং তমোধাম দুরাসদম। যযৌ দ্বারাবতীং শাল্বো বৈরং বৃষ্ণিকৃতং স্মরণ্। কচিদ্ভূমৌ কচিদ্ব্যোম্নি গিরি-শৃঙ্গে জলে কচিৎ।"ঐ

* "মনোর্বাক্যং সমাধায় দেবশিল্পীন্দ্র শাশ্বতম্। যন্ত্রং চকার সহসা দৃষ্ট্যর্থে দুরদর্শনং। পলাশাগ্নে দগ্ধ মৃদা কৃত্বা কাচ মনশ্বরম্। শোধয়িত্বা শিল্পীন্দ্র নৈর্ম্মল্যং ক্রিয়তে চ তৎ। চকার জলবৎ স্বচ্ছং পাতনং সুপরিষ্কৃতম্। বংশ পর্ব্বসমাকারাং ধাতু দণ্ডং প্রকল্পিতম। তৎপশ্চাদগ্রমধ্যেষু মুকুরঞ্চ বিবেশ সঃ।"

শিল্পসংহিতা—১৮শ অঃ।

† "অভীষ্টং পৃথিবী গোলং কারয়িত্বাতু দারবম্।

হয়, তাহা খৃষ্টের বহুশতাব্দী পূর্ব্বের বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ঐ গ্রামে যে মুদ্রা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা পাঁচশত খৃঃ পূঃ প্রচলিত অক্ষরে লিখিত ছিল *।

সেই স্থানে শতঘ্নী নামক অস্ত্রও পাওয়া যায় †। এই শতঘ্নী অস্ত্রই বর্ত্তমান তোপ ইহা বর্ত্তমান ভাবে না হইয়া অতি সামান্য ছিল। অগ্নিপুরাণে বারুদ, গুলি গোলা ও আগ্নেয়াস্ত্র প্রভৃতির উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। বারুদের প্রসঙ্গে মহাত্মা প্রিন্‌সেপ্ সাহেব বলিয়াছেন যে,বারুদ ভারতবর্ষেই প্রথমে প্রস্তুত হইয়াছিল ‡। শ্রীতারিণীকান্ত বিদ্যানিধি।

ভারত দুর্ভিক্ষ। (২)

জাতীয় ধনের হ্রাস।

বিবিধ কারণে ভারতীয় প্রজাপুঞ্জের অবস্থা এতদূর হীন হইয়াছে যে, সামান্য বিপদপাতেই দুর্ভিক্ষ আশঙ্কা ঘনীভূত হয়। আমরা দেখিয়াছি, বৃটিশ-শাসিত প্রদেশ সমূহের মধ্যে ভারতবর্ষের সঞ্চিত ধন সর্ব্বাপেক্ষা অল্প। শস্যশ্যামলা ভারতভূমির উর্ব্বরতা শক্তি কমে নাই, জল বায়ুর পরিবর্ত্তন হয় নাই, কিন্তু প্রজাবৃন্দের অবস্থা মন্দ কেন? শাসন প্রণালীর দোষে জাতীয় ধনের হ্রাস হওয়ায় এই বিপদ ঘটিতেছে। ভারতে দুর্ভিক্ষের পৌনঃপুন্য দেখিয়া মহাত্মা জনব্রাইট John Bright ঠিক্ এই কথাই বলিয়াছিলেন:—

I must say that it my belief that if a country be found possessing a most fertile soil and capable of bearing every variety of production and that notwithstanding, the people are in a state of extreme destitution and suffering, the chances are there is some fundamental error in the Government of that country.

মুসলমান শাসনকর্ত্তৃগণ সহস্র অত্যাচারী হইলেও তাঁহারা ভারতবর্ষের অধিবাসী ছিলেন। ভারতবাসীর নিকট গৃহীত কর ভারতবর্ষের কল্যাণেই ব্যয় হইত। একদেশের টাকা অন্য দেশে চলিয়া যাইত না। এক দেশের গৃহীত কর অন্য দেশে খরচ হইলে করদাতাগণের সমূহ ক্ষতি। ইংরাজ রাজত্বে ভারতবর্ষের রাজস্বের অবস্থা ঐ রূপ! ভারতবর্ষের রাজকার্য্যে বিভিন্ন বিভাগে বহু ইংরাজ কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন, এদেশের প্রতি তাঁহাদের কোন মমতা বা স্বার্থ নাই। তাঁহাদের পেনসন ও ভাতা, রেল-মহাজনদিগের লভ্যাংশ, ঋণকৃত অর্থের সুদ প্রভৃতি বিষয়ে অজস্র অর্থ বৎসর বৎসর এ দেশ হইতে চলিয়া যাইতেছে। শোষণের অবধি নাই, প্রতিনিয়ত শোষিত হইলে মহাসমুদ্রও শুকাইয়া যায়। সামরিক ব্যয়, হোমচার্জ্জ, মুদ্রা-বিভ্রাটের

বস্ত্রাচ্ছন্নং বহিশ্চাপি লোকালোকেন বেষ্টিতম্। তোয়যন্ত্রঃ কপালাদ্যৈর্ময়ূর নরবানরৈঃ। সসূত্র রেণুগর্ভৈশ্চ সম্যক্ কালং প্রসাধয়েৎ। পারদাম্বু সূত্রাণি শুক্ল তৈল জলানিচ। বীজানি পাংশব স্তেষু প্রয়োগাস্তে পিদুর্লভা। যায়াচ্ছদমুখো নিত্যময়স্কান্তশলাকবৎ। সূর্য্যসিদ্ধান্ত।

* Princep's Indian Antiquities, Vol I. p. " There are some other things, one bearing in some respects a resemblance to a small cannon, another to a button hook :"

C.ol. Canby's report quoted by Princep.

‡ " I am more than ever inclined to accede to the opinion of those, who believe that gun-powder was invented in India."

" The use of it (cannon) in war was forbidden in the sacred books, the Viedam or Vede "

Preckman's History of Inventions and discoveries, Vol II.

জালায় ভারতবর্ষ অস্থিকঙ্কাল সার। এ বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক।

মুদ্রাবিভ্রাট—এদেশে রৌপ্য মুদ্রা প্রচলিত আছে। রাজকর প্রভৃতি রৌপ্য মুদ্রায় আদায় হয়। ১৮৭২ খ্রীঃ পর্য্যন্ত একটাকায় বিলাতি ২ শিলিং বা ১০ টাকায় ১ পাউণ্ড পাওয়া যাইত। সোণা রূপার দর সর্ব্বদা এক থাকে না, খনি হইতে ঐ দুই ধাতুর প্রাপ্তির আধিক্য ও অল্পতা অনুসারে সোণা রূপার বাজার কম বেশী হয়। খ্রীষ্টীয় ৫ম হইতে ১৪শ শতাব্দী পর্য্যন্ত একটী স্বর্ণ মুদ্রার মূল্য ১৬ টাকা ছিল। আমেরিকা আবিষ্কারের পর স্বর্ণের দর এত হ্রাস হইল যে, ১৫শ ১৬শ শতাব্দী পর্য্যন্ত মোহরের দাম ১০।১১ টাকা হইয়াছিল। তাহার পর হইতে স্বর্ণের মূল্য বৃদ্ধি ও রৌপ্যের মূল্য হ্রাস হইতে লাগিল। ১৮৭০ খ্রীঃ পূর্ব্বে পৃথিবীতে বৎসরে ১০ কোটি টাকা মূল্যের অধিক রৌপ্য খনি হইতে বাহির হয় নাই। এক্ষণে এক আমেরিকা যুক্তরাজ্য হইতেই বার্ষিক ৮।৯ কোটি টাকার রৌপ্য বাহির হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে আমেরিকা হইতে অনূ্যন ৪ লক্ষ টাকার রৌপ্য পাওয়া যাইত। রৌপ্যের দর হ্রাস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই য়ুরোপীয় রাজ্য সমূহে রৌপ্য মুদ্রার আবশ্যকতা কমিয়া গেল। নরওয়ে, সুইডেন, জর্ম্মানি রাজ্যে রৌপ্য মুদ্রার পরিবর্ত্তে স্বর্ণ মুদ্রার প্রচলন হইল। ফ্রান্স, ইতালি, গ্রীস, বেলজিয়ম প্রভৃতি রাজ্যেও রৌপ্য মুদ্রার আদর রহিল না। ইংলণ্ডে স্বর্ণ মুদ্রার চলন। তথায় কাহাকে ৪০ শিলিংয়ের উপর দিতে হইলে আইন অনুসারে স্বর্ণমুদ্রায় দিবার নিয়ম। ভারতপ্রবাসী ইংরাজগণের সহিত ইংলণ্ডের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। ভারত হইতে ইংলণ্ডে মুদ্রা পাঠাইতে হইলে স্বর্ণ মুদ্রার আবশ্যক। কিন্তু রৌপ্য মুদ্রা স্বর্ণ মুদ্রায় বিনিময় করিতে গেলেই বাটা লাগে, কাজেই রৌপ্যের মূল্য কম হওয়ায় ভারতবর্ষে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইল। ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ আপত্তি তুলিলেন, পূর্ব্বে এক টাকায় ২ শিলিং মিলিত, এক্ষণে ১$\frac{১}{৩}$ শিলিংয়ের অধিক পাওয়া যায় না, এজন্য তাহাদের সমূহ ক্ষতি হইতেছে এবং সেই ক্ষতি গবর্ণমেণ্টের পূরণ করা উচিত। ইংরাজ সওদাগরগণও এই আন্দোলনে যোগ দিলেন। সেই আন্দোলনের ফলে Exchange compensation allowance বা বাটাজনিত ক্ষতিপূরণ। গবর্ণমেণ্ট এই বিভ্রাটের মীমাংসা জন্য ১৮৯৩খ্রীঃ এক মুদ্রাশাসনী প্রচার করিলেন, তাহার ফলে ১ টাকার মূল্য ১$\frac{১}{৩}$ শিলিং স্থিরীকৃত হইল। এই বাটাজনিত ক্ষতিপূরণ জন্য ভারতের বার্ষিক ১৮ কোটি টাকা লোকসান হইতেছে। নব মুদ্রা শাসনীর দ্বারা আমাদের পণ্যদ্রব্যজাত ও জাতীয় ধনের মূল্য বহু পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে।

সামরিক ব্যয়—আভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষার জন্য সৈন্যের আবশ্যকতা। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় সুবিপুল সেনা পোষণের কোন আবশ্যকতা নাই। ভারতবাসীর অর্থে পুষ্ট সৈন্য ইংরাজের রাজ্য বিস্তারের নিমিত্ত পৃথিবীর নানা স্থানে ব্যাপৃত হইয়া থাকে। ঐ বিশাল সেনা কেবল মাত্র ভারতবর্ষের আত্ম রক্ষার জন্য আবশ্যক হইলে কদাচ অন্যত্র প্রেরিত হইত না। ইংলণ্ডের রাজ্য বিস্তার, বাণিজ্য বিস্তার চীনে, আফ্রিকায় সর্ব্বত্র, ইংলণ্ডের আত্ম প্রয়োজন জন্য তথায় যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, সে স্থানে ভারতীয়

সৈন্য প্রেরণ বা সেই যুদ্ধের ব্যয়ভার ভারতের স্কন্ধে সংস্থাপন কদাচ উচিত নহে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তাহাই ঘটিয়া থাকে। আবিসিনীয় ও পিরাক অভিযান, মিসর, সুদন (Soudan) প্রভৃতি যুদ্ধের ব্যয় ভারতবর্ষকেই বহন করিতে হইয়াছে। বিবিধ বিভাগে ভারতবর্ষের সামরিক ব্যয় ২৮.৪৫ কোটি, ইংলণ্ডের সামরিক ব্যয় ৬ কোটি পাউণ্ড। ভারতবর্ষের আয়-কর ২ কোটি টাকা,ইংলণ্ডের আয়-কর ১½ কোটি পাউণ্ড, অতএব দেখা যাইতেছে, ভারতবর্ষের সামরিক ব্যয় আয়করের অনুপাতে ১:১৪, ইংলণ্ডে ১:৪ অর্থাৎ জাতীয় ধনের অনুপাতে দেশ রক্ষাকল্পে ভারতবাসীকে ইংলণ্ডবাসী অপেক্ষা ৩½ গুণ অর্থ অধিক ব্যয় করিতে হয়। য়ুরোপীয় প্রদেশ সমূহের সহিত তুলনা করিয়া আমরা দেখিতে পাই, ভারতবর্ষের সামরিক ব্যয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। রাজস্বের অনুপাতে রুশিয়ার সামরিক ব্যয় শতকরা ২৩, ফ্রান্স ২৫.৯, জর্ম্মানি ২৪, ভারতবর্ষের শতকরা ৩২। (১)

মুদ্রা কমিশনের সমক্ষে সাক্ষ্যদান কালে ল্যান্সডাউন, রিপণ, ব্যাকেনবারি (Sir Henry Brackenbury)প্রভৃতি বিশদভাবে এই সামরিক গুরুভারের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ভারতবর্ষের বহু সংখ্যক ইংরাজ সৈন্য রক্ষার কোনই আবশ্যকতা নাই। ইংলণ্ডের জন্য ঐ সৈন্য রক্ষার প্রয়োজন হইলে, বৃটিশ রাজকোষ হইতে তাহার ব্যয় বহন করা কর্ত্তব্য। ওয়েলবি কমিশনের (Welby Commission) সুপারিশে ইংলণ্ড রাজকোষ হইতে বার্ষিক ২৫০০০০ পাউণ্ড বা ৩৭৫০০০০ টাকা দিবার নিয়ম হইয়াছে। ইহাকে মন্দের ভাল বলা যাইতে পারে। এ দেশে সামরিক ব্যয় এত অধিক যে, স্বয়ং ভারতগবর্ণমেণ্টকেও বিচলিত হইতে হইয়াছে। ১৮৯০ খ্রীঃ ভারতগবর্ণমেণ্ট লিখিয়াছিলেন—"প্রাচ্য ভূখণ্ডে বৃটিশ ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষের রক্ষা ব্যপদেশে দুর্গাদি নির্ম্মাণ কল্পে বহু অর্থ ব্যয় হইয়াছে।" বলা বাহুল্য, ভারতবর্ষের অন্ত বা বহিঃশত্রুর আক্রমণ নিবারণার্থ ঐ বিপুল অর্থের এক পয়সাও ব্যয় হয় নাই। বিশাল বৃটিশ সেনার কিয়দংশ হ্রাস করিলে কোন ক্ষতি নাই। বিগত বুয়র যুদ্ধে দশ সহস্র বৃটিশসৈন্য ট্রান্সভালে প্রেরিত হওয়ায় কোন ক্ষতি দূরের কথা, রাজকোষের এক কোটি টাকা বাঁচিয়া গিয়াছে। ভারতের গুরু সামরিক ব্যয়ব্যবস্থা প্রত্যেক রাজনীতিকের চিন্তার বিষয়, সন্দেহ নাই।

রাজকার্য্যে বহুপরিমাণে ভারতবাসীর নিয়োগ—দেশের অর্থ বিদেশে চলিয়া গেলে দেশের দুরবস্থা অবশ্যম্ভাবী। ভারতবর্ষে উচ্চ ও লাভজনক রাজকার্য্যে যে সকল বিদেশীয় কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন, এদেশের প্রতি তাহাদের কোন মমতা থাকা সম্ভব নহে। গ্রীষ্মপ্রধান ভারতবর্ষে অর্থ সঞ্চয় করিয়া তুষার-শীতল ইংলণ্ডে ঐ অর্থের দ্বারা সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন অতিবাহিত করাই তাহাদের জীবনের আকাঙ্ক্ষা ও লক্ষ্য। বিভিন্ন বিভাগে ঐ সকল কর্ম্মে এ দেশীয় লোক নিযুক্ত হইলে গবর্ণমেণ্ট Exchange compensation allowance হইতে বহু পরিমাণে মুক্তি পান এবং ভারতবর্ষেরও কিছু শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে।

১৮৫৮ খ্রীঃ ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত আছে

১। Statesman's year Book of facts 1896—97.

জাতি ও ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে এবং পারদর্শিতানুসারে ভারতবাসী রাজকর্ম্মে নিযুক্ত হইবে। দুঃখের বিষয়,ইদানী উক্ত প্রতিশ্রুতি পালিত হয় না। বঙ্গদেশের রাজকর্ম্মচারীর তালিকায় আমরা দেখিতে পাই—

বিভাগ	য়ুরোপীয়	দেশীয়
বনবিভাগ	২২	২
চুঙ্গি	৩১	১
সর্ভে	১৩	০
পুলিস	১০৩	৬
টেলিগ্রাফ	৭৫	৪

প্রত্যেক বিভাগেই য়ুরোপীয় কর্ম্মচারীর আধিক্য। এদেশে গড়ে বার্ষিক বেতনের হার য়ুরোপিয়ান ৯১০৫ (৬০৭পা), ইউরিশিয়ান ১২১৫(৮১পা) দেশীয় ৫৪০টাকা(৩৬পা) পৃথিবীর কোন সভ্য দেশে কোন জাতি স্বদেশের রাজকর্ম্ম হইতে এরূপভাবে বঞ্চিত হইয়াছে? ভারত সংক্রান্ত পার্লামেণ্টের কাগজ পত্রে দেখা যায়, যে সকল কর্ম্মে বার্ষিক আয় হাজার টাকার উপর, ঐকার্য্যে গবর্ণমেণ্ট বার্ষিক ১৭ কোটি টাকা ব্যয় করেন, ইহার মধ্যে ১৪ কোটি ইংরাজ কর্ম্মচারী পাইয়া থাকেন। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় ইংরাজ কর্ম্মচারীর বাহুল্য কদাচ অভিপ্রেত নহে। রাজনীতির হিসাবে ইহা দূষ্য হইলেও স্বজাতি-প্রীতি গবর্ণমেণ্টকে অবিচলিত রাখিয়াছে। পাবলিক সার্ভিস কমিশন (Public service commission) এই দূষণীয় নীতির উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন—"অর্থ ও রাজনীতি উভয় হিসাবেই ভারতবর্ষে য়ুরোপীয় কর্ম্মচারীর সংখ্যা হ্রাস করা কর্ত্তব্য।' ১৮৮৬ খ্রীঃ উক্ত কমিশন ভারতীয় পূর্ত্ত বিভাগে ১০১৫ কর্ম্মচারীর মধ্যে ৮৬ জন দেশীয় কর্ম্মচারী দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১। "Considerations of policy and economy alike require, that so far as is consistent with the ends of good government, the recruitment of the official staff in England should be curtailed and advantage taken of qualified agency obtainable in India."

জাতীয় ঋণ হোমচার্জ্জ—ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী বৃটিশরাজকে বার্ষিক ৪ লক্ষ পাউণ্ড দিয়া ভারতবর্ষে শাসন দণ্ড পরিচালন করিতেন। কোম্পানির রাজ্য বিস্তার ও দুরাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত জন্য এদেশে যে পৈশাচিক অভিনয় হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

কোম্পানি রাজ্য বিস্তারে ব্যাপৃত হওয়ায় ব্যয় বাহুল্য হইতে লাগিল। অধিকৃত প্রদেশ সমূহের রাজস্ব হইতে ঐ বিপুল ব্যয়ের সংকুলান না হওয়ায় কোম্পানির ডিরেক্টরগণ ভারতের দায়ীত্বে বিলাতে স্বর্ণ মুদ্রা ঋণ করিতে লাগিলেন। ভারতবাসীর অদৃষ্টদোষে সেই জাতীয় ঋণের সূত্রপাত হইল। কোম্পানির দেনা, বিলাতি অংশীদারগণের লভ্যাংশ, যুদ্ধের ব্যয় ইত্যাদি বিবিধ কারণে এক্ষণে জাতীয় ঋণ পুঞ্জীকৃত হইয়া উঠিয়াছে। ইণ্ডিয়া অফিস নির্ম্মাণ, তথায় বহু অর্থ ব্যয়ে সুলতান আবদুল আজিজের জন্য বলনাচ, আফগানিস্থানের আমির পুত্রের ইংলণ্ডে সম্বর্দ্ধনা, এইরূপ অসংখ্য অযথা ব্যয়ভারে ভারতবাসী প্রপীড়িত। গত ৪০ বৎসরে মহাত্মা গ্লাডষ্টোনের চেষ্টায় ইংলণ্ডবাসী তাহাদের সরকারী ঋণের ২৬২॥ কোটী টাকা শোধ করিয়াছে, এইকাল মধ্যে ভারতবর্ষের জাতীয় ঋণ ১৫০ কোটী টাকা অধিক হইয়াছে, এক্ষণে ভারতবর্ষের সরকারী ঋণ ২২০ কোটি টাকা। কত দিনে, কি উপায়ে এই বিপুল ঋণের

পরিশোধ হইবে, তাহা ভবিতব্যতাই জানেন।

ভারত-সচিবের বেতন ও ইণ্ডিয়া অফিসের জন্য বার্ষিক ১৩১০০০ পাউণ্ড বা ১৯৬৫০০০ টাকা ব্যয় হয়। ইংলণ্ডে ভারত-শাসনের তত্ত্বাবধান করিবার জন্য একজন মন্ত্রীর প্রয়োজন হইলে তাহার ব্যয়ভারও ইংলণ্ডের অর্দ্ধেক বহন করা কর্ত্তব্য। একজন ঔপনিবেশিক মন্ত্রী আছেন, তাঁহার অফিসের ব্যয়ও বড় কম নহে। কিন্তু ইংলণ্ড তাহার সমস্ত ব্যয় বহন করেন, উপনিবেশ সমূহকে এক পয়সাও খরচ করিতে হয় না। ভারতবর্ষের জন্য ইংলণ্ডে যাহা ব্যয় হয়, তাহাকে হোমচার্জ্জ (Home-charge) বলে। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে হোমচার্জ্জের জন্য ৫ কোটি টাকার অধিক ব্যয় হইত না, ১৮ বৎসর পূর্ব্বে এই জন্য ১৮॥ কোটি টাকা ব্যয় হইত, এক্ষণে ব্যয় হইতেছে ৩০ কোটি। গত ৩০ বৎসরে বার্ষিক গড়ে ৩ কোটি পাউণ্ড হিসাবে ৯০ কোটি পাউণ্ড বা ১৩৫ কোটি-টাকা ভারতবর্ষ হইতে চিরনির্ব্বাসিত হইয়াছে। এই জন্যই এদেশে নিত্য দুর্ভিক্ষ, নিত্য প্রাণীক্ষয়। ভারত-দুর্ভিক্ষের জনৈক ফরাসি সমালোচক এম, জুডেট M, Judet সত্যই বলিয়াছেন—"জাতীয় ধনের হ্রাস ভারতবর্ষের দুর্ভিক্ষের মুখ্য কারণ।"

শ্রীকুলদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৌ।

(১)

উলুধ্বনি কর্‌লো সবে বাদ্যি বাজা শাঁখে।
আমার মাণিক সোণা—
বৌটি চাঁদের কোণা
আকাশ থেকে পড়ে এনে দিচ্চে তুলে মাকে।
বরণ ডালা হাতে,
আয়লো সাথে সাথে ;
লক্ষ্মী এল সাগর থেকে সুধার কলস কাঁকে।
ঘরে এসো ; মরি,
লক্ষ্মী পূজা করি ;
সিঁদুর দিয়ে সীঁথি ভোরে তুলি বুকের তাকে।

(২)

পরের মেয়ে? ওমা! তোরা বলি কথা কাকে?
পরের বাছা হোলে,
তুলে নিতে কোলে—
উঠত কিরে সুখের ঢেউ বুকের থাকে থাকে?
আঁখি-পদ্ম-দলে
শিশির কেন ঝলে?
মা ফেলে যে এলে তাই ভাব্‌ছ কি গো তাকে?
আমায় বল মা,
আমি বলি মা ;
মুখ ভোরে যাক্ বুক ভোরে যাক্ দুজনেরি ডাকে।

(৩)

আমিও মা ফেলে এসে আজ পেয়েছি মাকে ;
তুমিও পাবে মা,
দুঃখ রবে না ;
বাঁধ্‌বে যবে ঘরখানি গো প্রেমের সুতার পাকে।
এস বাছা ঘরে!
আপন কর পরে।
উলুধ্বনি দেলো সবে বাদ্যি বাজা শাঁখে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

বর্ণাশ্রমতত্ত্ব।

সৃষ্টির বিচিত্রতায় সৃষ্টির সৌন্দর্য্য। বিশ্বমণ্ডলের প্রত্যেক জীব ও প্রত্যেক পদার্থ যদি একই প্রকার আকৃতি, প্রকৃতি, গুণ ও ক্রিয়া বিশিষ্ট হইত, তাহা হইলে সৃষ্টির

সৌন্দর্য্য দেখিয়া আমরা বিস্মিত বা বিমোহিত হইতাম না। সৃষ্টির বিচিত্রতায় বিশিষ্ট ও বিবিধ সৌন্দর্য্য আছে বলিয়া, আমরা সেই বিচিত্রতার কৌশলে এবং সৌন্দর্য্য সুখে পরমেশ্বরের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া থাকি। সৃষ্টির বিচিত্রতায় সেই অনাদি অব্যয় পরব্রহ্মের সর্ব্বশক্তিমানত্ব, সর্ব্বত্র বিদ্যমানত্ব, সর্ব্বাভিজ্ঞতা, সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, করুণা, বিশ্বপ্রেম, ন্যায়, নিষ্কলঙ্কতা প্রভৃতি বুঝিতে ও জানিতে পারিয়া তাঁহার শরণাগত হই। বিশ্বমণ্ডলের যেদিকেই নয়ন নিক্ষেপ কর, কোথাও বিচিত্রতা ভিন্ন "সৃষ্টি" দেখিতে পাইবে না; কুসুমের কোমলতা, বজ্রের কঠোরতা,অগ্নির তাপ, জলের শৈত্য, সূর্য্যের উষ্ণতা, চন্দ্রের শীতলতা, লৌহের কৃষ্ণত্ব, সুবর্ণের হরিদ্রাবর্ণ, রজতের শুভ্রতা, তৈলের তরলত্ব, কাষ্ঠের কাঠিন্য প্রভৃতি সৃষ্টির বৈচিত্র্য। এই বিচিত্রতায় সৃষ্টি এবং এই বিচিত্রতা সৌন্দর্য্যের আকর। এই বিচিত্রতা না থাকিলে বিশ্বমণ্ডল এক দিনের জন্যও অবস্থান করিতে সমর্থ হইত না। এইজন্য সেই নিরবদ্য সুন্দর পরব্রহ্মের অপর নাম "বিচিত্র"। উদ্ভিদ-জগতের দিকে লোচনদ্বয় নিপতিত করিয়া দেখ, একটী বৃক্ষ আর একটী বৃক্ষের সমান নহে। এবম্প্রকার অসংখ্য তরুলতা গুল্ম ফল ফুল মূল প্রভৃতি প্রত্যেক বিষয়ে পরস্পর বিভিন্ন। গো, মহিষ, উষ্ট্র, গর্দ্দভ, ছাগ, শশক, ব্যাঘ্র, সিংহ প্রভৃতি অগণ্য পশু এবং কাক কোকিল হংস চক্রবাক চাতক চকোর প্রভৃতি অসংখ্য বিমানবিহারী বিহঙ্গবর্গ, অথবা কৃমি কীট পতঙ্গপুঞ্জ প্রভৃতির দিকে নয়ন নিক্ষেপ করিয়া দেখ, কোথাও কেহ কাহারও সহিত এক নহে, সমগ্র প্রকৃতি-সুন্দরী যেন বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণা। ধাতু-জগতেও ঠিক তাহাই। অনন্ত কোটি জীবশ্রেষ্ঠ মানবের মুখের দিকে তাকাইলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। এত অসংখ্য মানব, কিন্তু কাহারও মুখ কাহারও সহিত এক নহে; যেন বিভিন্নতাই সৃষ্টির প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি। মানুষের হাতের পাঁচটা আঙ্গুলও সমান নহে। ইহাতে কি বুদ্ধিমান ব্যক্তি সহজে বুঝিতে পারেন না যে, এবম্প্রকার বিভিন্নতা ঐশ্বরিক। এই বিভিন্নতা মানব-বুদ্ধি, মানব-কল্পনা বা মানব-কৌশলের ফল নহে, ইহা সেই পরমস্রষ্টার ইচ্ছা বা নিয়মের অধীন। সৃষ্টির এই মহাসুন্দর ও অনির্ব্বচনীয় বিচিত্রতা চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ জগতের সর্ব্বত্র বিদ্যমান। তবে মানব মধ্যে বিভিন্নতা না থাকিবে কেন? বিভিন্নতা আছে বলিয়াই মানব "মানব," নতুবা পশু বা জড় হইয়া যাইত।

অসীম আকাশের দিকে তাকাইয়া দেখি, অসংখ্য গ্রহ জগৎ, উপগ্রহ জগৎ, নক্ষত্র জগৎ ভিন্ন ভিন্ন উপাদানে প্রস্তুত হইয়াছে। বৃহস্পতির যাহা ভাব, শনির তাহা নহে; কৃত্তিকার যাহা ভাব, রোহিণীর তাহা নহে; সৌরজগতের যে প্রকৃতি, চন্দ্রজগতের প্রকৃতি তাহা হইতে বিভিন্ন। এইরূপে অয়ন ও ঋতু সমূহও ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি ও গুণ বিশিষ্ট। নিম্নের বিশ্বমণ্ডলের দিকে নয়ন নিক্ষেপ করিয়া দেখি, এক দেশের জল বায়ু অন্য দেশের সলিল বা সমীরণের সমতুল্য নহে। এই অসমতায় মনুষ্যের আকৃতি, প্রকৃতি, গুণ ও বর্ণের পার্থক্য জন্মিয়া থাকে। স্থানভেদে উত্তম জন্ম বা অধম জন্ম অস্বীকার করা যায় না, কারণ বংশ-মাহাত্ম্য, কুল-মাহাত্ম্য, কর্ম্ম-মাহাত্ম্য,

সংসর্গ-মাহাত্ম্য প্রভৃতির তুলনায় স্থান-মাহাত্ম্য কোনও অংশেই কম নহে। এই জন্যই পবিত্র তীর্থ স্থান দর্শন, ভ্রমণ অথবা সেই সকল স্থানে বাস করা কিম্বা তথায় দেহপাত করার জন্য ধার্ম্মিকেরা বিশেষ আকাজ্ক্ষা প্রকাশ করিয়া থাকেন। গীতা পাঠ করিয়া দেখ, ক্ষত্রিয়াধিক ক্ষত্রিয়, বীরাধিক বীর শ্রীমৎ অর্জ্জুন, যুদ্ধকাম হইয়া সশস্ত্রে ও মহোৎসবে আহবক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু পবিত্রতা হইতেও পবিত্রতর কুরুক্ষেত্র তীর্থের স্থান মাহাত্ম্য বশতঃ তাঁহার হৃদয়াভ্যন্তরে সাত্বিকভাব উপজয় হওয়ায় তিনি পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে কহিলেন "আমি আর যুদ্ধ করিতে আকাজ্ক্ষা করি না।" মহাভারত পাঠ করিয়া দেখ, প্রখ্যাত চন্দ্রবংশীয় নরপতি পুষ্পরাজ তাঁহার সহধর্ম্মিণী রাণী চারুবংশীকে সঙ্গে লইয়া তীর্থোদ্দেশে নৈমিষারণ্যাভিমুখে গমন করিতেছিলেন, পথিমধ্যে কর্ম্মনাশা নামক নদী তীরবর্ত্তিনী পাপিষ্ঠা পল্লীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ঐ অধম স্থানের দোষ বশতঃ এমনই তামসিক হইয়া পড়িলেন যে, অবশেষে কুষ্ঠ ব্যাধিতে মৃতবৎপ্রায় হইয়া মহাদরিদ্র ও অধার্ম্মিক ব্যক্তির ন্যায় স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হয়েন। তাহাতেই বলিতেছি, স্থান-মাহাত্ম্য সততই স্বীকার্য্য।

অনেকে বলেন, পরমপিতা পরমেশ্বর মনুষ্য সৃষ্টিকালে সর্ব্ব প্রথমে একটী মনুষ্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আমি এই কথায় বিশ্বাস করি না; বিজ্ঞান, যুক্তি এবং শাস্ত্রও তাহা বলে না। একটী মনুষ্য পিতার বংশ হইতে সমগ্র পৃথিবী মনুষ্যাচ্ছন্ন হইয়াছে, ইহা অসম্ভব, অযৌক্তিক ও অপ্রামাণিক। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভগবান মনুষ্য সৃষ্টি করেন। দেশের জলবায়ুর প্রভাব হইতে প্রকৃতির সৃষ্টি হয়, প্রকৃতি এবং সত্বঃ রজঃ তমঃ নামক ত্রিগুণের সমবায়ে মানবের আকৃতি, বর্ণ, স্বভাব প্রভৃতির উৎকর্ষাপকর্ষ হইয়া থাকে। মনুষ্য সতত কর্ম্মফলাধীন, স্ব স্ব কর্ম্মফলানুসারে মানবগণ গুণের অধিকারী হয়, এই জন্য কেহ সাত্বিক, কেহ রাজসিক, কেহ বা তামসিক, অথবা মিশ্র গুণাবলম্বী হইয়া থাকে। কর্ম্মফলে যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার নাম "গুণ"; দেশের জলবায়ুর দোষ গুণ, স্থান মাহাত্ম্য, সংসর্গ, অভ্যাস, ইত্যাদি দ্বারা যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার নাম "প্রকৃতি' বা স্বভাব। এই গুণ ও প্রকৃতি অনুসারে মনুষ্য সমাজ, আর্য্য, উদার্য্য, বর্ণার্য্য, ও অনার্য্য এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। যাঁহারা আর্য্য তাঁহাদের নাম এই—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য। ব্রাহ্মণগণ দেবার্য্য, ক্ষত্রিয়গণ হংসার্য্য এবং বৈশ্যগণ সনাতনার্য্য, ইহাই ইহাদের প্রকৃত আর্য্যত্বের পরিচয়। উদার্য্যগণের তালিকা—জর্ম্মণ, তিব্বত, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, প্রাচীন মিশর, পার্শীক জাতি, আরবীয়গণ, য়িহুদী, তুর্কী, আর্ম্মানিয়, ফিনিশীয় এবং সীরীয়া। বর্ণার্য্যগণ—জর্ম্মণী ব্যতীত সমগ্র ইউরোপ, এবং মধ্য আসিয়ার কিয়দংশ। অনার্য্য—জাপান, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, তাতার, মরকো, আফ্রিকার বহুদেশ, সামেরিয়া, অগণ্য অসভ্য জাতি প্রভৃতি। এইরূপে পৃথিবীর নানা দেশীয় মানব সমাজ আর্য্য, উদার্য্য, বর্ণার্য্য ও অনার্য্য নাম চতুষ্টয়ে বিভক্ত হইয়াছে। আর্য্যদিগের মধ্যে ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয় এবং উরু হইতে বৈশ্য নিঃসৃত হইয়াছে। এই তিন বর্ণ দ্বিজধর্ম্মী। ব্রহ্মার পদ হইতে শূদ্রের জন্ম। যুক্তি শাস্ত্র বিজ্ঞান

ও সাধারণ বুদ্ধির দ্বারাও এই চারি বর্ণের জন্মোৎপত্তি বুঝা যায়। শাস্ত্রের এই চিরপ্রচলিত উক্তিতেও স্থান-মাহাত্ম্য বুঝা যায়। মস্তিষ্ক হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত দেহের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অংশ, ইহা জ্ঞানের স্থান। তন্ত্রশাস্ত্রে ও যোগশাস্ত্রে ইহাই জ্ঞানের আকর বলিয়া লিখিত হইয়াছে। "মুখ" এই অংশের মধ্য স্থান, সুতরাং এই অংশ হইতে নিঃসৃত ব্রাহ্মণ জাতি কেবল জ্ঞানাধিকারী এবং জ্ঞানই ইহাদের মুখ্য বৃত্তি। ব্রাহ্মণের অপর নাম "জ্ঞানী"। হৃদয় হইতে দুই বাহুভাগ এবং বাহু ভাগদ্বয় হইতে কটিদেশ পর্য্যন্ত বল-স্থান, ক্ষত্রিয় জাতি এই অংশ হইতে নিঃসৃত, এই জন্য ক্ষত্রিয়ের অপর নাম "বলী"। কটি হইতে পাদ দেশ পর্য্যন্ত যে অংশ, তাহা সাংসারিক কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। বৈশ্য ও শূদ্র, এই অংশের ভিন্ন ভিন্ন ভাগ হইতে সমুৎপন্ন। যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, ধর্ম্ম চিন্তা, ধর্ম্ম প্রচার, ধর্ম্মালোচনা প্রভৃতি ব্রাহ্মণের কর্ম্ম ও ধর্ম্ম; দেশরক্ষা, সমাজরক্ষা, রাজ্য রক্ষা, ধর্ম্মরক্ষা, রাজ্যপালন, শাসন, বিদ্রোহ দমন ইত্যাদি ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম ও ধর্ম্ম; কৃষি বাণিজ্য ব্যবসা, পশু রক্ষা পশু পালন, ধন বৃদ্ধি, রত্ন পরীক্ষা, ধাতু পরীক্ষা, মান পরিমাণ বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ ইত্যাদি বৈশ্যের ধর্ম্ম ও কর্ম্ম, এবং উপরিউক্ত তিন জাতির বিবিধ সেবা দ্বারা সমাজের কল্যাণ সাধন করা শূদ্রের পরম ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মার উৎকৃষ্ট স্থান হইতে নিঃসৃত হইয়া সত্ত্বগুণে সর্ব্ববর্ণ-শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন। এবম্প্রকারে ক্ষত্রিয়াদি অপর তিন বর্ণ যথাক্রমে উৎকর্ষাপকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া স্ব স্ব অধিকার লাভ করিয়াছে। এইরূপে যেমন সনাতন, শাশ্বত, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্ব প্রাচীন হিন্দুসমাজে বর্ণভেদের সৃষ্টি হইয়াছে, তদ্রূপ অন্যান্য দেশেও বর্ণভেদ (অর্থাৎ জাতিভেদ) বর্ত্তমান রহিয়াছে। পৃথিবীতে বিদ্যা ধন মান যশ প্রভুত্ব বিবেক শক্তি সামর্থ্য শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য প্রভৃতির যতদিন তারতম্য থাকিবে, ততদিন পৃথিবীর কোনও অংশ হইতেই জাতিভেদ প্রথা উঠিয়া যাইতে পারে না। অসভ্য ও বর্ব্বর জাতির মধ্যে এ সকলের তারতম্য প্রায়ই অল্প, সুতরাং সে সকল জাতির মধ্যে এ প্রথাও সুশৃঙ্খলাবদ্ধ নহে, তথাপি তাহাদের মধ্যেও ইহা বর্ত্তমান। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই মানবসমাজে জাতিভেদ আছে, কিন্তু জ্ঞানময় ও গুণময় পবিত্র ভারতবর্ষে পুরাকাল হইতে যেমন ইহা সুন্দররূপে বিধিবদ্ধ, অপর দেশে তাহা নাই। ভারতে গুণ লইয়া জাতিভেদ, অন্য দেশে পার্থিব প্রভুত্ব লইয়া জাতিভেদ, সুতরাং ভারতের জাতিভেদ প্রথা সর্ব্বাপেক্ষা বৈজ্ঞানিক ও সুসিদ্ধ।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, স্থানভেদে গুণ ভেদ হয়। ব্রহ্মা হইতে চারি জাতির জন্ম প্রসঙ্গে ইতিপূর্ব্বে তাহা বুঝান গিয়াছে, এবারে তাহা আরও পরিষ্কার রূপে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। অশেষ জ্ঞান ও গুণের আকর-স্বরূপা সুপ্রাচীনা ও সুপবিত্রা ভারতভূমি সর্ব্ববিষয়ে সমগ্র পৃথিবী হইতে শ্রেষ্ঠতমা। নৈসর্গিক শোভা, ঋতু সমূহের সুন্দর প্রকার আবির্ভাব ও তিরোভাব, নানাপ্রকার ধন ধান্য, বিদ্যা, জ্ঞান, সভ্যতা, ধর্ম্ম, গুণ, চরিত্র, সামর্থ্য প্রভৃতি সমুদয় বিষয়ে প্রাচীন ভারতভূমি মর্ত্ত্যে ত্রিদিবপুরী বলিয়া প্রসিদ্ধা ছিল। এই পুণ্যময়ী ভূমিতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও

শূদ্রেরা প্রথমে জন্মগ্রহণ করেন। ভারত-ভূমিই আর্য্যের বাসভূমি। ইহাই মনুষ্য সৃষ্টির আদিস্থান। এই পুণ্যময় দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া, ভারতের লোক জগৎকে আলোকিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, এই জন্যই ভারতবর্ষ সমগ্র জগতের জ্ঞান, গুণ, ধন, ধর্ম্ম ও বিদ্যার আকর স্বরূপ। পাঠক মহাশয়েরা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, "শূদ্রেরাও ত ব্রহ্মার দেহ হইতে নিঃসৃত এবং পবিত্র ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু ভারতীয় শূদ্রের অবস্থা চিরকালই সমান কেন ?" ইহার উত্তর এই যে, ব্রহ্মার পাদ দেশ হইতে শূদ্রের জন্ম এবং তম গুণে তাহার উৎপত্তি। কিন্তু তথাপি তুলনায় ভারতীয় শূদ্র অন্যান্য দেশের উদাষ্য, বর্ণার্য্য ও অনার্য্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভারতের একজন নীচ শূদ্রের মধ্যে যে বিনয়, সততা, ধর্ম্মভাব, দয়া, দাক্ষিণ্য, ঈশ্বর ভয়, দেবভক্তি, প্রেম, সহানুভূতি, সেবাপরায়ণতা প্রভৃতি গুণ আছে, অন্যান্য দেশের নীচ শ্রেণীর মধ্যে তাহা নাই বটে, কিন্তু অপরাপর দেশের অনেক শিক্ষিত লোকের মধ্যেও তাহা সহসা দেখা যায় না। ভারতের সাঁওতাল যেরূপ সত্যবাদী, ভীলরমণী যেরূপ সতী, মালাবার উপকূলের প্রাচীন অসভ্য শূদ্র যেমন ভক্তিপরায়ণ, বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানালোকিত ইউরোপ ও আমেরিকার সুসভ্য ও সুশিক্ষিত সমাজেও তাহা দুর্লভ। ভারতের শূদ্রেরা কর্ম্মফলে, তপস্যা বলে, পুণ্যপ্রভায় উচ্চতর আসন গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছে, ইহার বহুল বিধি ও প্রমাণ আছে। * আর্য্য হইতে বিবাহবিভ্রাট বা ব্যভিচারে অনার্য্য সন্তান অথবা অনার্য্যের ঔরসে ও অনার্য্যার গর্ভোৎপন্ন সন্তান, পুণ্যবলে ব্রাহ্মণাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহারও শত শত দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

আর এক কথা এই যে, মনুষ্য সৃষ্টি কালে সর্ব্ব প্রথম শূদ্রের ও অনার্য্যের জন্ম হয়। ব্রহ্মার পাদদেশ হইতে প্রথমে শূদ্রের জন্ম, তদনন্তর বৈশ্য, তদনন্তর ক্ষত্রিয় এবং তাহার পরে ব্রাহ্মণের জন্ম হইয়াছিল। এই কারণে জগতের আদিম অধিবাসীরা অসভ্য ও শূদ্রোচিত। পৃথিবীর ইতিহাসও তাহাই সাক্ষী দেয়। ভারতেরও আদিম অধিবাসী সাঁওতাল, ভীল, কোল, গারো, খন্দ, টোড়া প্রভৃতি অসভ্য। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বেই করুণানিধান পরমেশ্বর মাতৃস্তনে যেরূপ দুগ্ধ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদির সেবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই, সেইরূপ, শূদ্রের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। মানবের মনে (মনুষ্য সমাজে) প্রথমে সাংসারিকতার উৎপত্তি হয়, এজন্য শূদ্র, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় ক্রমান্বয়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অবশেষে অধ্যাত্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণের জন্ম হইয়াছিল।

আর এক কথা এই যে, বঙ্গদেশে হিন্দুর মধ্যে বৈশ্যের সংখ্যাই অধিক, শূদ্রের সংখ্যা কম। বঙ্গদেশ নূতন দেশ; "নূতন" দেশ বলায় ইহাকে সম্পূর্ণ নূতন কহা উদ্দেশ্য নহে, কারণ মহাভারত ও রামায়ণের সময়েও বঙ্গদেশের অস্তিত্ব ছিল। বঙ্গদেশের অন্য আদি নাম "সমতত"। হিয়ংসাং নামক সুপ্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক মহাশয় তাঁহার সমসাময়িক বঙ্গদেশকে পঞ্চ অংশে বিভক্ত দেখিয়াছিলেন, তদ্যথা—উত্তরে পুণ্ড্র রাজ্য, কামরূপ উত্তর পূর্ব্ব, সমতত পূর্ব্ব, তাম্রলিপ্ত

* জাতোনার্য্যা মনার্য্যায়ামার্য্যাদার্য্যো ভবেদ্‌ গুণৈঃ।—মনু।

দক্ষিণ পূর্ব্ব এবং কর্ণসুবর্ণ পশ্চিম। পূর্ব্ববঙ্গ (East Bengal) বাঙ্গালার প্রথম বাসস্থান ও সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। প্রথিত আছে, ভূমিকম্প দ্বারা বঙ্গদেশ উৎপন্ন হয়। কবি-রামের "দিগ্বিজয় প্রকাশ" পুস্তকে এই ভূমিকম্পের উল্লেখ আছে। রামায়ণের সময়ে জনকপুর বাঙ্গালার রাজধানী ছিল, এজন্য ইহার পার্শ্বস্থ স্থান দ্বারবঙ্গ নামে খ্যাত। ইহার পরে গৌড় এবং তদুত্তর ঢাকা নগরী (১৬০৪) এবং তাহার পরে মুর্শি-দাবাদ (১৭০৪) রাজধানী হইয়াছিল। সপ্তগ্রাম বাঙ্গালার সর্ব্ব প্রথম ও প্রধান বন্দর। বরাহমিহিরের বৃহৎ সংহিতায় "সমতত" উল্লিখিত আছে। সে সময়ে খুলনা, যশোহর ও সুন্দরবনে মনুষ্য বসতি ছিল না, সপ্তমশতাব্দীর পরে এ সকল স্থানে বসতির সূত্রপাত হয়। কলিকাতা বনময় ছিল, বিপ্রদাস পিপলাই কৃত "মনসা" কাব্যে কলিকাতা নাম সর্ব্বপ্রথম লিখিত হইয়াছে। উপরিউক্ত প্রবল ভূমিকম্পের ফলে নবদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ, সুকচর, চাকদহ, দামুরদহ, খড়দহ, এড়েদহ, হালিসহর, বরানগর, শিয়ালদহ প্রভৃতির উৎপত্তি হয়। বঙ্গদেশ সমুদ্র গর্ভ হইতে উত্থিত, এদেশে প্রথমে বন্য জাতি স্থান পায় নাই। এজন্য শূদ্রের সংখ্যা কম। প্রাচীন ও আধুনিক বঙ্গের ধন, ধান্য, বাণিজ্য, ব্যবসা, বিভব, কৃষি, পশু, ধনবনের প্রচুর সংখ্যা প্রভৃতি এদেশের বিশেষত্বের অর্থাৎ বৈশ্য প্রধানত্বের প্রধান প্রমাণ। পুরাকালে এদেশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও শূদ্র কম ছিল, বৈশ্যের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধি-কতম ছিল।

যাহা হউক, আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, ভারতে আর্য্যের জন্ম এবং ভারতই আদর্শ মনুষ্যের জন্মদাতা। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, ধন্য সেই মানুষ, ভারতে যাহার জন্ম। বাস্তবিক ভারতবর্ষই পৃথিবীর মধ্যে এক-মাত্র সর্ব্বাদর্শ এবং এই জন্যই কেবল ভার-তেই আদর্শ মনুষ্য জন্মিয়াছিল এবং এখনও জন্মিতে পারে। জ্ঞানময় ও গুণময় ভারত-বর্ষ পৃথিবীর মধ্যে অতি পবিত্র, অতি পুরা-তন, অতি প্রসিদ্ধ ও অতীব শ্রেষ্ঠ।

"যো বৈ ভারতবর্ষেঽস্মিন্ ক্ষেমায় স্বস্তয়ে ন্ণাম্।
ধর্ম্ম জ্ঞান শনোপেতমাকল্পাদাস্থিত স্তপঃ॥"

এই ভারতের লোকেরা সেকালে ইউ-রোপ ও আমেরিকা পর্য্যন্ত গমন করিয়া তদ্দেশবাসীগণকে জ্ঞানোপদেশ দিয়াছিলেন। আমেরিকার আলাশকি নগরী প্রভৃতি বহুল-স্থানে আজি পর্য্যন্ত তদ্দেশে হিন্দুর গমনা-গমনের চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায়। বেদে "হরূপ' শব্দের অর্থাৎ ইউরোপের উল্লেখ আছে। শ্বেতদ্বীপে (ইংলণ্ডে) ঋষিদিগের গতিবিধির প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শ্বেতদ্বীপং গতবতি ত্বয়িদ্রষ্টুং তদীশ্বরম্।
তত্র হায়মভূত প্রশ্ন স্তং মাং যমনুপৃচ্ছসি।

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক থরন্টন সাহেব লিখিয়াছেন—

"Ere yet the pyramids looked down upon the valley of Nile, when Greece and Italy, those cradles of European civilisation, nursed only the tenants of the wilderness, India was the seat of the wealth and grandeur".—History of the British empire in India By E. Thornton, vol. 1. Page 3.

অর্থাৎ ইউরোপের সভ্যতার প্রসূতি ইটালী ও গ্রীশ যখন বনচর জীবে পরিপূর্ণ ছিল, ভারতবাসী তখন ধন ও বিভবে জগ-তের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া-ছিল।

যাহা হউক, ভারতের জাতিভেদ প্রথা কখনও নির্ম্মূল হইবে না, ইহা ধ্রুবসত্য।

এবিষয়ে কয়েকজন চিন্তাশীল পণ্ডিতের অভিমত উদ্ধৃত করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করি। কিন্তু এই সকল অভিমত পাঠ করিবার পূর্ব্বে পাঠক মাত্রেরই একটী প্রয়োজনীয় কথার দিকে দৃষ্টিপাত করা উচিত। জাতি বা সমাজ এক ব্যক্তিকে লইয়া গঠিত হয় না, প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রত্যেক জাতি ও সমাজের হিতাহিতের জন্য অনেক সুবিজ্ঞ ইউরোপীয় পণ্ডিত লিখিয়াছেন—

"The individual is the product of society, both as regards his bodily growth and his mental development; consequently his life does not belong to himself alone, but also to society. Hence the highest good for the individual is a common good, being shareable with all men and being capable of satisfying the larger self called society, which self is realised through self sacrifice on the part of the individual. Therefore the duties one owes to himself, he also owes to society."—

অতঃপর জাতিভেদ প্রথা সম্বন্ধে কয়েক জন চিন্তাশীল প্রাজ্ঞের অভিমত উদ্ধৃত করিতেছি—

(১) "It shall be impossible to blot the caste system out of India any more than out of any other country in the world, where natural divisions of society into teachers, rulers, producers of wealth and servants and labourers are found." *

(২) "Caste system, an institution of immemorial antiquity, which has made its impression upon every nerve and fibre of our social organism will continue to exist." †

(৩) "An open crusade against caste can end only in disaster; for I consider it nothing short of disaster that the Hindu community should by the action of an aggressive and reckless radicalism be driven into the arms of the reactionary movements which have of late created so much stir and unrest in the country. ... ... the old does not die without a struggle the new is not born without travail." ‡

পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী কখনও জাতিভেদের পক্ষে একটী কথাও উচ্চারণ করেন নাই। এই প্রথার প্রতিকূলে তিনি বিশেষ আন্দোলন না করিলেও, অনেকবার তিনি সুস্পষ্টভাবে কহিয়াছিলেন "শিক্ষিত লোকেরা যতই আন্দোলন করুক, আসিয়া মহাদেশে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষে জাতিভেদ প্রথা কখনই একেবারে নির্ম্মূল হইবে না। ইহা ধ্রুব সত্য। জাতিভেদ প্রথা বর্ত্তমানকালে অনেক অসুবিধার কারণ হইয়াছে, ইহা স্বীকার্য্য, কিন্তু তথাপি ইহা বিবিধ উপকারের মূল।"

সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন, বিশেষ চিন্তাশীল, প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও সমাজ-সংস্কারক, মহানুভব রানাডে বলিয়াছেন—

"Similarly there is no doubt that men differ from men in natural capacities, and aptitudes, and that heredity and birth are factors of considerable importance in our development."

মহামতি বর্ক লিখিয়াছেন,—

"It has pedigree and illustrating ancestors. It has its bearings and its ensigns armorial. It has its gallery of portraits; its monumental inscriptions; its records, evidences, titles." (Reflections on the revolution in France).

ভগবদ্গীতায় ভগবান বলিয়াছেন, মনুষ্য স্ব স্ব গুণ ও প্রকৃতির বশবর্ত্তী। গুণ ও প্রকৃতির তারতম্যতায় জাতিভেদের উৎপত্তি, চিরকালই এই পার্থক্য ছিল এবং চিরকালই ইহা থাকিবে, সুতরাং জাতিভেদ প্রথা নির্ম্মূল হইতে পারিবে না। মহামতি মহর্ষি মনু লিখিয়াছেন—

যো যদেষাং গুণো দেহে সাকল্যে নাতিরিচ্যতে।
সদা তদগুণ প্রায়ং তং করোতি শরীরিণম্।

মানুষের কার্য্যের সহিত এই সকল গুণের নিত্য সম্বন্ধ, সুতরাং তেজস্বকে তুচ্ছ

* "Fusion of subcastes in India" by Rai Bahadur Lala Baij Nath.

† "Foreign Travel"—by Pandit Bishan Narain Dhar.

‡ Narayan Dass;—Barrister-at-law, Lucknow.

করিতে সমাজ অশক্ত। আর একজন চিন্তাশীল ইউরোপীয় লেখক লিখিয়াছেন—

The caste system is the inalienable birthright of mankind. There must be division and diversity among men, as there are throughout the rest of creation. Those that talk of equality of men, are idle dreamers, who are delirious of the plainest lessons taught by Nature. Even among the people who recognise no caste system based on Hindu principles, there is still that system, inevitably making its presence felt, based on some other, but meaner principles. Birth, wealth, occupation, education, natural talents and such other considerations have always drawn a sharp line of demarcation when between man and man in the same society, but none but the Hindus have boldly grasped this difference among men, enunciated it plainly, and turned it to the best possible advantage. The great law of Karma and rebirth fully sustains the classification of all men into the four great castes, leaving nothing to any of the classes to envy in any other. Your own Karma has determined your own birth, you have nothing to complain of against your society, if it, in an outspoken fashion assigns you the position you deserve therein and then tell you to endeavour to make progress towards the salvation of the soul. The special occupation of your caste need not hamper this spiritual progress; you were born to it, go on performing it, taking it as a mandate from the supreme being, doing His will as a servant, keeping your eyes always fixed upon Him and trying constantly to follow, as far as your weak powers will enable you, to do so in the footsteps of those who are divine in nature, the Brahmans.

জাতি শব্দের ব্যাখ্যায় দার্শনিক, নৈয়ায়িক ও আভিধানিকেরা লিখিয়াছেন—

(১) "সমান প্রসবাত্মিকা জাতিঃ।

ন্যায়দর্শন,—২।২

(২) "ভাবোঽনুবৃত্তেরেব হেতুত্বাৎ সামান্যমে

বৈশেষিকদর্শন,—১।২।৪।

(৩) "প্রাদুর্ভাব বিনাশাভ্যাং সত্বস্য যুগপৎ গুণৈঃ।

অসর্ব্বলিঙ্গাং বহ্বার্থাং তাং জাতিং কবয়োবিদুঃ।

মহাভাষ্য।

(৪) "নিত্যৈকানুগত প্রত্যয়হেতুরনেক সমবায়িনী

জাতিঃ।"—দশমী।

(৫) "সম্বন্ধিভেদাৎ সত্বৈব বিদ্যমানা গবাদিষু।

জাতিরিত্যুচ্যতে তস্যাং সর্ব্বে শব্দা ব্যবস্থিতাঃ।"

বাক্যপদীয়।

(৬) "সত্যং তত্তত্র সা জাতিরসত্যা ব্যক্তয়োমতাঃ।"

কল্পসূত্র।

(৭) জাত্যন্তর পরিণামঃ প্রকৃত্যা পূরাৎ।—

পতাঞ্জলি।

তাহা হইলেই বুঝা গেল, জাতিতত্ত্ব রক্ষায় অর্থাৎ জাতির শুদ্ধতা রক্ষায় রক্তের শুদ্ধতা, গুণের দৃঢ়তা এবং বংশের ঔজ্জ্বল্য স্থায়ী হয়। "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু জাতি রূপেন সংস্থিতা।" ইউরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক হার্বার্ট স্পেনসারেরও তাহাই মত।

পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সর বলিয়াছেন,—

"An ideal social being may be conceived as so constituted that his spontaneous activities are congruous with the conditions imposed by the social environment formed by such other beings."

H. Spencer's—Data of Ethics. P. 275.

বাস্তবিক, বর্ণাশ্রম প্রথার আদি উদ্দেশ্য অতীব মহান ছিল, এই উদ্দেশ্য বৈজ্ঞানিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক। ইউরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতা প্রাপ্ত হইয়া অথবা জাতিভেদের উপকারিতা ও সুমহৎ উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হইয়া বর্ণাশ্রম প্রথার বিরুদ্ধে অনেকে অনেক কথা লিখিতে বা কহিতে পারেন, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, পৃথিবীর সকল দেশে এবং সকল সমাজে জাতিভেদ ছিল, এখনও আছে এবং চিরকাল থাকিবে।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

অজয় কুমার।

জীবনের পঞ্চমাঙ্কে, হে নট নবীন,
কি নূতন অভিনয় দেখাইবে আর!
ঘনায়ে আসিছে সন্ধ্যা, অদৃষ্ট কঠিন,
টানিছেন কর্ম্মসূত্র প্রকৃতি তাঁহার।
নড়ে নীল যবনিকা, আকাশ মলিন,
নেপথ্যে পিনাকে বাজে 'সংহার—সংহার।'
প্রণয় বন্ধুত্ব স্নেহ আস্বাদ-বিহীন,
সুখদুখ পাপপুণ্য শূন্য—শূন্যাকার।

কেন এ কাতর দৃষ্টি মায়ার বন্ধন,
মুমূর্ষু জীবনে তীব্র-মদিরা তাড়না!
কেন এ অস্ফুট ভাষা, করুণ ক্রন্দন,
বিয়োগান্ত নাটকের অব্যক্ত বেদনা!
কেন এ সরল হাসি, সহাস চুম্বন,—
সেই ভ্রম, সেই তমঃ, সে স্বর্গ-কল্পনা!

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

ব্রহ্ম ও জীব।

এই পৃথিবীতে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রের মত, জীব সৃষ্ট বস্তু। ঈদৃশ বহুজনতৃপ্ত চির বিশ্বাসের প্রতি কোন কথা না থাকিলেও ইহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া নিষ্ফল-প্রযত্ন নহে। এ সম্বন্ধে এ কথা অবশ্যই বলিতে পারা যায় যে, সত্য কোনও প্রকার শাস্ত্রের গণ্ডী মধ্যে চিরবদ্ধ ভাবে থাকেনা। বস্ত্রাবৃত অগ্নি যেমন অল্প সময়েই, প্রধূমিত ও প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে, সত্যও তেমনি বিবিধ মতের আবরণকে ভেদ করিয়া অতি নিরক্ষর সামান্য মানবহৃদয় হইতেও প্রকাশ পায়। কেননা সত্যের অব্যাহত গতি বাধা দিয়া কেহ রাখিতে পারে না। যাহা হউক, আলোচ্য বিষয়ের যতটুকু অনুসন্ধান করা সম্ভব হয়, তাহা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া মনে হয় না।

জীব স্বয়ং, জীবই জীবের ধাতু। নিরাকার জীবশক্তি আত্মা, চৈতন্য, ব্রহ্ম * ইত্যাদি বিবিধ নামে অভিহিত হইলেও পূর্ণ এবং অনাদি অনন্ত নিত্য। এই অদ্বিতীয় অনাদি ব্রহ্ম চৈতন্যই আবার, জীবভাবের মহাভাবে একত্ব তত্ত্ব প্রকাশ করেন, ইচ্ছাদির ব্যাপারও সম্পন্ন করিয়া থাকেন। যদি বলেন, পূর্ব্বোক্ত (অভেদাত্মা) মহাচৈতন্য হইতে প্রভেদ ভাব উদ্দীপিত হওয়ার কারণ কি? যখন এক চিচ্ছক্তিই জীবভাবে অখণ্ড নিত্য, তখন ঐ ভেদ-বিধায়িনী চিন্তাই বা কেন আসিল? এ বিষয়ে একটুকু গভীর ভাবে বুঝিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, ইহার মূলতত্ত্ব বস্তুতঃই একমাত্র চিৎ। সেই অনন্তব্যাপিনী মহাশক্তির ইচ্ছার ভিতরে ভেদ-তত্ত্ব নিত্য বিদ্যমান আছে, এবং উহা দ্বারা বিশ্বলীলার ব্যাপার সমুদয় বিকাশ পাইতেছে। অথচ একই চৈতন্য কারণরূপী হইয়া শান্তি, প্রেম, আনন্দের অমৃতরস দৈহিকাধারে উদ্‌যাপন করেন। কেননা,

* ইহা বৃহ ধাতুতে সিদ্ধ—বৃহৎ শব্দটীকে কেহ কেহ সীমা বাচক ভাবে গ্রহণ করেন। কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে। বৃহৎ শব্দে বড় অর্থাৎ মহৎ বা শ্রেষ্ঠ। সুতরাং উহা অসীমাত্মক নাম বাচক শব্দেই প্রতিপাদ্য।

বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার পরিচালনার পথে উপস্থিত হইলে এক ভিন্ন দ্বিতীয় কিছু নাই।

ঋষিরা দর্শনিক চিন্তার পরিণতির স্থলে একই চৈতন্যকে জীব চৈতন্য ও ব্রহ্ম-চৈতন্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই প্রভেদ ভাবেও অখণ্ড চৈতন্যের কোন ব্যত্যয় করেন নাই। ব্রহ্ম-চৈতন্য—জীব-চৈতন্য—এই নাম ভেদাত্মক জ্ঞানটীকেই জীবভাবে উপাধি দিয়া উপাসনার পথ উন্মুক্ত করিয়াছেন, ইহাই যেন মনে করি। কিন্তু এ কথাও মনে হয়, জীব ও ব্রহ্ম উভয়ই যখন একই চিৎ-রূপী অনাদি নিত্য, তখন ব্রহ্মই ব্রহ্মকে উপাসনা, আরাধনা, প্রার্থনাদির দ্বারা প্রীতি সম্ভোগ করেন, এ কথাটাও ত বড় সহজ কথা নহে! আবার ইহাও বুঝিতেছি, অনন্ত আধার ব্যতীত অনন্ত পুরুষের স্থিতিও সম্ভবে না। তবেই বুঝা যায়, যেমন জ্ঞেয়, জ্ঞাতা, জ্ঞান (জ্ঞা) ধাতুতে সিদ্ধ—একই চৈতন্য রূপে ত্রিবিধ ভাবের বিকাশ ও ভোগ, তেমনই, ব্রহ্ম-চৈতন্য ও জীব-চৈতন্যের মধুরতত্ত্বও অন্তঃপ্রবিষ্ট দেব দৃষ্টিতে অসীম ভাবেই অনুভূত হয়। ইহাতে ব্রহ্মই ব্রহ্মকে ভোগ করেন, এ বিষয়ে সন্দেহ কি? অভ্রান্ত সরল বিশ্বাসের মূলে ইহার গূঢ় মর্ম্ম নিহিত আছে—ধীর গম্ভীর ভাবে বুঝিয়া দেখিলে অখণ্ড জীবতত্ত্বের সংশয় থাকিবে না। জীবতত্ত্বের একত্ববাদ সম্বন্ধে সরল ভাবে বুঝিয়া লইলে কোন আপত্তির কথা উঠিতে পারে না। কারণ, ব্রহ্মনিষ্ঠ ঋষিগণ নিরাকার চিচ্ছক্তিকে দর্শন শাস্ত্রে খণ্ড ভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তজ্জন্যই জীবকে অখণ্ড বলিয়া স্বীকার করেন। বোধ হয়, পুরাণতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরাই জীবকে বহুদেহীর ভিতরে বহুরূপে বিভক্ত করিয়াছেন। যাহা হউক, জ্ঞানের দিকে উপনীত হইলে জীবত্বের সঙ্কীর্ণতা কিছুতেই প্রমাণ হইতে পারে না।

জীবতত্ত্বের মীমাংসা কি এইরূপ হইতে পারে না যে, জীবও একই চৈতন্যের প্রকার ভেদ মাত্র--আত্মা অর্থাৎ জ্ঞাতৃরূপী অনন্তব্যাপী ব্রহ্ম। নিরাকার নিত্যতত্ত্ব কেমন করিয়া স্থূল তত্ত্বের যোগ বিয়োগের অধীন হইবে? তবে যে পশুপক্ষী মানব প্রভৃতির শরীর ভাব ধরিয়া জীবকে অনেকে পৃথক পৃথক ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, ঐ ভাবটী বুঝিয়া লওয়া উচিত যে, যেমন শ্বেত, পীত, লোহিতাদি কাচ-নির্ম্মিত মন্দিরের অভ্যন্তরে কোন একটী বস্তুকে শতধা রূপেও বহুবর্ণে দৃষ্ট হয়। স্থূলের বিচিত্রতার ভিতরেও জীবকে তেমনই বিবেচনা হইয়া থাকে। তাই বলিয়া কি উহাকে পৃথক পৃথক বলিতে হইবে? যখন অসীম আত্মশক্তি সর্ব্বাধারে একই ভাবে প্রতিপন্ন হইতেছে, তখন নিরাকার শক্তির বহুবাদ—এটা কি ভ্রমের কথা নহে? অশীতিবর্ষ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও কি ঐ চন্দ্র সূর্য্যকে রাহুতে গ্রাস করিল বুঝিবে—পৃথিবীর ছায়ায় ঐরূপ হইয়া থাকে, এটা কি বুঝিবে না?—তাহা হইলে যে স্বাধীনতার উজ্জ্বল স্বভাবকে কলঙ্কে কলুষিত করে, হৃদয়ের বিশুদ্ধ শুভ প্রবৃত্তি সমূহ কিছুই থাকে না। নীচ প্রবৃত্তির অনুসরণে অসার হইতে হয়।

যাহা হউক, উপরিউক্ত জীবতত্ত্বের বহুত্ববাদের আপত্তির কথাটী বুঝিতে গেলে যখন মূলে নিরাকার আত্মা বা জৈবিক তত্ত্বের স্বাতন্ত্র্যের কি খণ্ডত্বের কোন তৃপ্তিজনক প্রমাণ পাওয়া যায় না, তখন ব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তিতে উপাস্য উপাসকের অখণ্ডভাবের যোগ অসম্ভব কি? ব্রহ্মই যে

জীবভাবে উপাসনা দ্বারা ভোগ, সুখ, ইচ্ছা পূর্ণ করেন, ইহাও বিরোধী মতের উপযোগী নহে। চিন্তাশক্তির গভীর প্রদেশে প্রবেশ করিলে একটীও স্বতঃসিদ্ধ সত্য যে অনন্তব্যাপী জ্ঞান, যাহা আত্মা বা জীব, তাহা পৃথক ভাবে কিরূপে অবস্থিতি করিবে? তবে ইহার মূলে এই প্রত্যক্ষ হয়, যতক্ষণ আমিত্বের প্রখর দৃষ্টি প্রবল থাকে, ততক্ষণ ভেদবিধায়িনী উন্মাদিনী ভক্তির সাহায্যে ব্রহ্মকে একবারে দূর দুরান্তরে অদৃশ্য করিয়া দেয় এবং প্রখরা ভক্তি ও মত্ততা প্রমত্ত প্রেমের আবর্ত্তে পড়িয়া মহত্তত্ত্ব হইতে বঞ্চিত করে। জীব-শক্তিকেও ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রভাবে আনিয়া ফেলে। ভেদ বুদ্ধির আতিশয্য বশতঃ পশু-পক্ষী মানবাদির ভিতরে যে একই অসীম জীব-চৈতন্যের বিকাশ, তাহা বুঝিতে দেয় না। এই কারণে, পৃথিবী মানবীয় ভাবে অহং জ্ঞানের দুর্জ্জয় প্রভাবে সকল প্রকার শরীর-ভেদী পূর্ণ চৈতন্যের অখণ্ড দর্শনে বঞ্চিত হইতেছে। এবং বাহ্যিক স্থূল দৃষ্টিতে জীব চৈতন্যতত্ত্বকে স্বষ্টবস্তু বুঝিয়া বিশ্বাস করিতেও বীতস্পৃহ হয় না। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়, এই ঘোর অন্ধতা অনুদারতার একমাত্র ভিত্তিই পরিমিত স্থূল চিন্তা। সুতরাং ভেদ কলুষিত আমিত্বের তীব্রশাসনে সতত লাঞ্ছিত হইতে হয়।

এখন সেই আমিত্ব তত্ত্বেরই চিন্তা করা আবশ্যক হইতেছে। আমিত্বও দুইটী ভাবে গতিশীল। প্রথম ভাবটীর জড়ীয়শক্তি আকর্ষণ, দ্বিতীয় ভাবটীর ঐশীশক্তির আকর্ষণ। কিন্তু ঐ আমিত্বের উভয় গতি প্রদেশের একই মনচ্ছক্তির ইচ্ছা সাপেক্ষ। চিত্ত স্বতঃই জগতের বিচিত্র চারুসৌন্দর্য্যে ও অহমিকামিত্বে * আকৃষ্ট হইয়া মোহভ্রান্তি অহঙ্কারাদির বশীভূত হইয়া পড়ে। মানুষ তখন কুপ্রবৃত্তির দ্বারা পাপানুষ্ঠানেও বিরত হয় না। নিয়তকাল আত্মগরিমায় স্ফীত হইয়া ঐ আমার স্ত্রী-পুত্র অতুল ঐশ্বর্য্য, ঐ আমার বিবিধ কারুকার্য্য-বিশিষ্ট উপাধান-শয্যা, ঐ আমার মর্ম্মর-প্রস্তর-মণ্ডিত আদরের নাট্যশালা ইত্যাদি বৈভব গৌরব ভাবিতে থাকে,ক্রমে ক্রমে এইরূপ আসক্তির শক্তি প্রবলা হইয়া একেবারে অধীর করে, কিছুতেই পার্থিব ভোগ-সুখের লালসা যায় না। ঐ অহমিকামিত্বই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান হইতে পৃথক করিয়া দেয়। তাহার তীক্ষ্ণ শাসনে মানুষ আপনাকে অদ্বিতীয় মহাবীর্য্য-শালী ভাবিয়া অবিশ্রান্ত হুঙ্কার ছাড়িতে থাকে। দ্বেষ, হিংসা, স্বার্থপরতা প্রভৃতির অনুবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধাদি দ্বারা রক্তস্রোতে পৃথিবীকে সিক্ত করিয়াও নিবৃত্ত নহে। হায়! জগদ্বৈচিত্র্যবিহারী অহমিকামিত্বের কি ভীষণ ভাব! সহসা কিছুতেই নিষ্কলঙ্ক নির্ম্মল স্বভাবে আসিতে দেয় না। "ঈশ্বরে আমি —ঈশ্বর আমাতে," এই যে বিশুদ্ধ মুক্তজ্ঞান, ইহা হারাইয়া, "আমি স্ত্রীপুত্র ঐশ্বর্য্যে,—স্ত্রীপুত্র ঐশ্বর্য্য আমাতে,' ইহাই শ্রেষ্ঠতর বুঝে। বলিতে কি, পিতার কারাদণ্ড, ভ্রাতার শিরশ্ছেদ, মাতার অন্নাভাব সত্ত্বেও ঐশ্বর্য্যভোগের স্পৃহা মিটে না। ঈদৃশ লোম-হর্ষণ ব্যাপারকেও তুচ্ছ বোধ করে।

অহমিকামিত্বের এইত একভাব দেখিলেন। আবার ঐ আমিত্বের আশ্রয়ে কোনও সুযোগে যদি একটুকু ধর্ম্মসাধনের ইচ্ছা হয়, তাহা সকাম কর্ম্মের অধীন। ধনং দেহি, জনং দেহি, পুত্রং দেহি, ইত্যাদি পার্থিব আশীপ্রদ আবদার মাত্র। মানুষ আমিত্বের মোহ প্রবৃত্তিতে মুগ্ধ হইয়া অসার

* অহঙ্কারযুক্ত আমিত্ব।

বস্তুকেই সারভাবে গ্রহণ করে এবং কূপমগ্ন মণ্ডূকের ন্যায় আপনাকে সুখী বলিয়া ভাবে। প্রকৃত মহাজ্ঞানের আলো ভ্রান্তির অন্ধকারে কিরূপে দেখিবে? স্থূল দৃষ্টির দ্বারা কি কখনও বিশুদ্ধ দেবতত্ত্ব বুঝা যায়? তবেই বলিতে হয়, সকাম ধর্ম্ম সাধনের চরম ফল, বাহ্যিক অনিত্য তৃপ্তির কারণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহা বুঝিয়াও অহমিকামিত্বের তর্জ্জন গর্জ্জনে কিঞ্চিল্‌কের মত অবস্থিতি করিতে হয় এবং ধাতু-প্রস্তরাদি অচেতন বস্তু মধ্যে বদ্ধ হইয়া জীব-চৈতন্য তত্ত্বকে বুঝিতে শক্তি জন্মে না। উন্মাদিনী ভক্তির আবেগে অশ্বত্থ বৃক্ষটী ঈশ্বর—সুমিষ্ট ফলপ্রদ আম্র বৃক্ষটী কিছুই নয়। ক্ষুদ্র শিলাখণ্ড শালগ্রামটী ঈশ্বর—অত্যুচ্চ ওঁকারনাথ পার্ব্বতটী কিছুই নয়। গোপরাখাল কিষণজী ঈশ্বর—মহা বিজ্ঞান-বিদ্ নিউটন কিছুই নয়। হিমালয় পর্ব্বত-প্রসূতা গঙ্গা পতিতপাবনী ঈশ্বরী হইলেন—ঐ কজ্জলনিভা তুঙ্গ তরঙ্গিণী যমুনা জাতি নির্ব্বিশেষে স্পর্শদোষে দূষিতা থাকিলেন। সংসারে অধিকাংশ ব্যক্তিকেই দেখা হায়, এইরূপ ঈশ্বর-ঈশ্বরীর ভেদভাব ও কার্য্য-কর্ম্ম লইয়া নিরাকার অনন্তব্যাপী অনন্তকেও বিবিধ মূর্ত্তিরূপে নিজ নিজ ইচ্ছার অধীনে রাখিতেছে। অসার ভ্রমভাবে যজ্ঞাদির বিধানে নররুধির পর্য্যন্তও প্রবাহিত করতঃ সকাম কর্ম্মের অনুষ্ঠানে আপনাকে ধন্য বোধ করিতেছে। বলা বাহুল্য যে, অহমিকা-মিত্বের স্থূলাধিকারে বড় বড় উপাধিকারী দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতগণও ললাটে রক্তের ফোঁটা পরিয়া ধর্ম্মের হুঙ্কারে পৃথিবী কাঁপাইতে-ছেন।

অহমিকামিত্বের কি বীর্য্যশক্তি! ঐ আমিত্বই আবার ঐশী শক্তিতে আকৃষ্ট হইলে পবিত্র স্বভাব পাইয়া উপযুক্ত বিকার বিষয়িণী চিন্তার কার্য্য সমূহ স্পর্শও করে না। ধ্যানী যেমন ধ্যানাবস্থায় ভয়ানক অন্ধকারের ভিতরে অবস্থিতি করিতে করিতে হঠাৎ অনন্ত আলোকে ডুবিয়া যায়, তেমনই চিত্তের কার্য্য কর্ম্মের ইচ্ছা চলিয়া গেলে, অহমিকামিত্ব ভেদ-নির্ম্মুক্ত সিদ্ধামিত্বভাবে জীবে বিকাশ পায়। তখন ব্রহ্মচৈতন্য সেবক ভাবে জীব হন। জীবচৈতন্য সেব্য ভাবে ব্রহ্ম হন। বস্তুতঃ "ব্রহ্ম ও জীব" উভয়ই অখণ্ড শক্তির সমষ্টি।

মানুষ ইন্দ্রিয় নিরোধাদি দ্বারা সিদ্ধামিত্বের বিশুদ্ধ আশ্রয় গ্রহণ করিলে, পশু পক্ষী মানবাদির প্রত্যেক শরীরাধারে একই চৈতন্য ব্যতীত আর কিছু বুঝে না। জীবে ব্রহ্মে একত্ববাদেও উপাসনা ও প্রার্থনা তত্ত্ব ফুটিয়া উঠে। কারণ, জীব-জড়িত সিদ্ধা-মিত্বই মহাজ্ঞানের অমৃতময় কিরণে উদ্ভাষিত হইয়া থাকে। এবং দেবদত্ত প্রেম, অহেতুকী ভক্তি, অনাসক্ত বৈরাগ্য, এই সকল স্বর্গীয় তত্ত্বের জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও ব্যাকুল হয়—নিষ্কাম প্রার্থনার গূঢ়মর্ম্ম বুঝিতে সংশয় থাকে না। তবেই দেখুন, একই আমিত্ব আবার সিদ্ধামিত্ব ভাবে ব্রহ্ম চৈতন্য ও জীব চৈতন্যের উপাস্য উপাসকের ভিন্নতা অনুভব করিতেছে। "ব্রহ্ম ও জীব" এই প্রভেদ ইচ্ছাটী, এটীও ঐ সিদ্ধামিত্বই জীবে আশ্রয় পাইয়া প্রকাশ করে। তবে যে দৈহিকের স্বাতন্ত্র্যতা প্রযুক্ত "আমি ও তোমরা" এই যে এক ও বহু ভাব প্রত্যক্ষ হয়, তাহাতে কি বুঝিব, ঐ একত্বভাবটীর ব্যত্যয় ঘটিল? কখনই নহে। ক, আমি—ইহাতেও যেমন অখণ্ড পূর্ণ চৈতন্যই বিরাজ করিতেছেন;

খ, গ, ঘ ইঁহাদের মধ্যেও সেইরূপ নিরাকার অনন্ত চৈতন্য রহিয়াছেন। উহাতে ত কোনই বিভিন্নতা দেখা যায় না। এরূপ স্থলে নিরেট স্থূল জ্ঞানের অন্ধকারে ব্রহ্ম হইতে পৃথক হইব কেন? কেনই বা ভেদ দৃষ্টির অন্তরালে দূরে অবস্থিতি করিব! নিত্যযুক্ত সিদ্ধামিত্বই যে সাধকের তৃপ্তির বস্তু। ইহাকে আশ্রয় করাইত যোগীর প্রার্থনীয়!

আচ্ছা, তাই যেন বুঝিলাম, ভাল, জিজ্ঞাসা করি, ব্রহ্ম ও জীবভাবের স্বাতন্ত্র্য সত্বেও যদি অসীমত্বের কোন সন্দেহ রহিল না, তবে নিরাকার জীবচৈতন্যকে পৃথিবী প্রভেদ দেখিতেছে কেন? ইহার উত্তরে স্পষ্টই বলিতে পারা যায়, উহা কেবল পরিমিত স্থূল চক্ষুর ভেদ দৃষ্টি! জ্যোতিশ্চক্ষুর অভেদ উজ্জল দৃষ্টি নহে। সকল প্রকার দেহীর অভ্যন্তরে যেমন এক অসীমাকাশই স্থিতি করিতেছে, পরিমিত ঐ দৈহিক বস্তুর ভাব অন্তর্হিত হইলেও তাহার অবস্থার কোন ব্যত্যয় হয় না, তেমনই মহাজ্ঞানের প্রকাশে মানবাদির শরীর ভাব ঘুচিয়া গেলে একই জীবচৈতন্য অবস্থিতি করেন। তখন আর আমার আত্মা, তোমার আত্মা, এই পার্থক্য ভাব থাকে না, একাত্মময় হইয়া যায়। ইহাই ত প্রকৃত ব্রহ্ম জ্ঞানের কথা! চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন যে,জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, ইহাও এক মহাশক্তির অভেদ ভাবের মহা মিলন। এটী বিশ্বাস করিতে দোষ কি? পূর্ণশক্তিমান পরমেশ্বর কি জীবভাবে আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারেন না? তাঁহার ইচ্ছা যে বৈচিত্র্যতার মূলেও অসীম ও নিত্য! কাহারও সাধ্য নাই যে, এই জীব ভাবের মহাভাব পৃথক রাখিতে পারে।

অখণ্ড জীবত্বের কথা ত এই গেল। এখন একবার জীবের সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করা যাক্। শাস্ত্রে সৃষ্টি বিষয়ের অনেক প্রকার মতভেদ দেখা গেলেও, কোন্‌টী সত্য, কোন্‌টী অসত্য, এরূপ বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া উদ্দেশ্য নহে। এখানে কেবল জীব সৃষ্ট কি অসৃষ্ট, ইহারই আলোচনা প্রয়োজনীয়। এই আলোচ্য বিষয়ের মূলেই ব্যক্ত হইয়াছে, জীব অর্থে ঈশ্বর। মানুষ প্রপঞ্চময় শরীর প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই জীবকে সৃষ্ট বস্তু বলিয়া বিশ্বাস করে। এমন কি, ঐ নিরাকার অখণ্ড জীব চৈতন্যকে দৈহিক তত্বের আবরণে জন্ম মৃত্যুর অধীনে আনিয়াছে। ইহার গূঢ়তত্ব এই যে, দেহীর বিকার-নির্ব্বিকার দেখিয়া জীবের স্বাতন্ত্র্য অনুভব হয়, সুতরাং অন্ধজ্ঞানের আতিশয্যবশতঃ জীবের সৃষ্টি বিশ্বাস হইয়া থাকে। বস্তুতঃ উহা যে জগতের বিকার বিচিত্রভাব—তাহা অনেকেই মনে করেন না। ঐ ভূত পঞ্চময় ক্ষুদ্র শিশুর কোমল কলেবরটীর মধ্যে শিশুরূপে জীবেরও সৃষ্টি হইল। শরীরের অবস্থাভেদে জীবচৈতন্যও বাল্য-যৌবন ও বৃদ্ধাবস্থায় পক্ক-শ্মশ্রু-গলিত-কপোল, স্খলিত দন্ত আবার স্থবির ভাবে পরিণত দেখিতে দেখিতে কালের ভীষণ কবলে নিপীড়িত হইতেও হয়। এইরূপে কোটি কোটি জীব সৃষ্টি হইয়া, মৃত্যুর পর সপ্তদশাদি ইন্দ্রিয়-সঞ্জাত সূক্ষ্ম ও অসামান্য ক্লেষ-সহ্য-সুদৃঢ় শরীরে কর্ম্মফল-জনিত কোন জীব অসহ্য যম যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে। কোন জীব পরলোকের উৎকৃষ্ট গৃহে বাস করেন। একথা গুলি এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও একটুকু বলিবার বিষয় আছে। এইরূপ সিদ্ধান্তে কি জীবশক্তিকে জড়ীয় শরীরভাবে বিজড়িত

করা হয় না? যদি জীবকে নিরাকার বলিয়া বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা হইলে নিরাকার জীব খণ্ডদেহে যমের কঠোর দণ্ড ভোগ করে কিরূপে? অবিনাশী জীব সূক্ষ্মদেহরূপে কঠিন শাস্তি অর্থাৎ তীক্ষ্ণ শূলাদির আঘাতেই বা যন্ত্রণা পায় কেন?

বাস্তবিকই ইহার গূঢ় প্রদেশে প্রবেশ করিলে বুঝা যায়, ঐ প্রভেদ জ্ঞানই ইহার কারণরূপী উপদেষ্টা হইতেছে। উহারই তীব্রশাসনে অনেকেই স্থূলভাবে পরিমিত দর্শনই তৃপ্তির পরাকাষ্ঠা ভাবিয়া বিবিধ দেহীর অন্তঃপ্রবিষ্ট জীবচৈতন্যকে প্রত্যেক শরীরাধারে পৃথক পৃথক দর্শন করেন। স্পষ্টই বলিয়া ফেলেন যে, এটী আত্মা, ওটী কীটাত্মা, ওটা মানবাত্মা, ইত্যাদি রূপান্তর-ভাবে অনন্তব্যাপী জীবকে জীবগণ বহুশব্দে ব্যাখ্যা করিতে কুণ্ঠিত হন না। সকল প্রকার শরীরাধারে যে একই জীবশক্তি প্রকাশ পাইতেছে, তাহা স্থূলদৃষ্টিতে বুঝিতে পারেন না। দেহীর বিকার বিকৃতবুদ্ধির তারতম্য দেখিয়া জীবের একত্ববাদতত্ত্ব বুঝিতে চান না। আবার দেখি, শাস্ত্রেও পশু পক্ষী মানবাদিতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আত্মারই গতিস্থিতি বিহার করিতেছে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, পশ্বাদি নিকৃষ্ট প্রাণীর ত আদবে আত্মাই নাই—তবে উহারা চলে ফিরে কথা বলে কার বলে? নিশ্চয়ই তাহাদের মধ্যে জ্ঞাতৃরূপী আত্মা আছেন। যাহা হউক, এ বিষয় এখানে বলিবার কোন প্রয়োজন নাই। তবে একথা অবশ্য বলিব যে, উপরিউক্ত পার্থিব দৈহিকের স্থূল-দৃষ্টির ভাবে ঐরূপ খণ্ডাবস্থায় ক্ষুদ্ররূপী এক একটী জীবের সৃষ্টি হইয়াছে। এমন কি, স্থূলজ্ঞানের মীমাংসার মূলে একটী চুলের শতাংশের এক অংশরূপ জীবের স্বরূপ—ইহাও গ্রন্থ বিশেষে দেখিতে পাওয়া যায়। হায়! আমরা যখন ঐ পরিমিত সূর্য্যের ভূতল-ব্যাপ্ত স্থূল জ্যোতিকেই পৃথকভাবে দেখিতে পাই না, তখন নিরাকার জীব-শক্তির ত কোন কথাই নাই। তাহাকে আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্ররূপে কিরূপে দেখিব? অনন্তের ভিতরে জড় ও অজড় যে কোন তত্ত্বই কেন থাকুক না, তাহা সৃষ্টির ব্যাপারে আসিতে পারে না। অসীম পরম পুরুষে কোন বস্তু বা শক্তিতত্ত্বের অভাব থাকিলেই ত সৃষ্টির প্রয়োজন। একথা যখন স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত, তখন নিরাকার জীবতত্ত্বকে কোথা হইতে আনিয়া পৃথক পৃথক রূপে সৃষ্টির ছাঁচে ঢালিবেন? বিশেষতঃ জীবতত্ত্ব অখণ্ড অব্যয় অনাদি নিত্য, ইহার আবার গঠন হয় কি প্রকারে?

তবেই বুঝিতেছি, অন্ধ বিশ্বাসের ঘনিষ্ট সম্বন্ধে অহমিকামিত্ব ও অন্ধজ্ঞানে মানুষ, মানবীয় ভাবে আকর্ষিত হইলে, অনন্তের অনন্তগর্ভে যে পার্থিব বস্তু সকল বিচিত্ররূপে প্রকাশ পাইতেছে, তাহার নিত্য স্থিতির ভাব বুঝিতে পারে না। ঐ বিকাশ ভাব-কেই সৃষ্টিভাবে বিশ্বাস করিয়া নিত্যতত্ত্বের বিঘ্ন ঘটাইতেছে। স্থূলদৃষ্টিতে ঐ পিপীলিকাটী অতি ক্ষুদ্রজীব—মানবটী অত্যুচ্চ মহজ্জীব। এই ভেদবিকারে জীবের অভেদ সম্বন্ধে অবিশ্বাস করিতেছে। বস্তুতঃ ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায়, এক সূর্য্যকেই যেমন শত শত পাত্রে পৃথক পৃথক দৃষ্ট হয়, কিন্তু ঐ সকল ছায়াময় সূর্য্য ভ্রম মরীচিকা বা ঐন্দ্রজালিকবৎ বৃথা, তেমনই, কোটি কোটি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জন্তু সকলের ভিতরে অখণ্ড জীবশক্তিকেও ভ্রান্তির প্রশ্রয়ে বিভিন্ন

দেখা যায় বটে, তাই বলিয়া কি আপনি মনে করিতে পারেন, জন্তু সকলের শরীরাধারে নিরাকার জীবচৈতন্য বহু খণ্ডে অবস্থিত ? তাহা হইলে ত ব্রহ্মজ্ঞান কিছুতেই টিকে না! অভেদ সার্ব্ব-ভৌমিক উদার ভাব পরিহার করিয়া কখনই বলিবেন না যে, উহা অখণ্ড ব্রহ্মজ্ঞানের কথা। এক বিন্দু ভেদ থাকিতেও হৃদয়ে মহা চৈতন্যের স্ফূর্ত্তি অসম্ভব। আত্মার বিভিন্ন জ্ঞানে কি আত্মজ্ঞান পরিস্ফুট হইয়া নির্ব্বিকার ভাব আসিতে পারে ? হায়! একথাই বা কেন বলিতেছি—সংসারে অধিক ব্যক্তিকেই দেখা যায়, যখন অসার জাতিভেদ প্রকোপে চাটুর্য্যের কন্যা ভাদুড়ী গ্রহণ করেন না, তখন পশ্বাদি মানব মধ্যে জীবকে একত্বজ্ঞানে কেমন করিয়া দেখিবেন ? আমি অস্পৃশ্য ম্লেচ্ছায় ভোজন করিয়াই যদি নির্ব্বিকার ও অভেদদর্শী হইলাম, মনে করি, তাহা হইলে ত এই বিংশ শতাব্দীতে সকলেই ব্রহ্মজ্ঞানী। বস্তুতঃ এটী কিছুই নয়। সকল প্রকার শরীরাধারে জীবতত্বকে যিনি অভেদ ভাবে দর্শন করেন, তিনিই প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী এবং জীবের অস্পষ্ট ভাব বুঝিতে সক্ষম হন।

এখন দেখা যাক্, সকল প্রকার দেহী মধ্যে যখন একই জীবশক্তি বিকাশ পাইতেছে, তখন ভেদবৈচিত্র্যভাব দেখা যায় কেন ? কেহ বা স্বীয় স্বার্থসাধনের নিমিত্ত অনায়াসে অন্যের রুধিরপাত করিতেও কুণ্ঠিত হইতেছে না; কেহবা সাধুভাবে ঐ আহত ব্যক্তির শুশ্রূষায় হৃদয় ঢালিয়া দিয়া জগৎকে সমভাবে আলিঙ্গন করিতেছে। ইহার মীমাংসা ইহা কি হইতে পারে না যে, কুতর্ক্য-কলুষিত বীজশক্তি প্রভাবে ক্রোধাদি রিপু প্রবল হয়—আবার ঐ বীজশক্তিই বিশুদ্ধ বস্তুর সংস্পর্শে মানব প্রকৃতিতে ক্ষমা প্রভৃতির পরাকাষ্ঠা দেখায়। সুতরাং এক বীজশক্তিই অবস্থাভেদে ঐরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। অহমিকামিত্বও নিষ্কলঙ্ক নির্ম্মল ভাবে আসিলে, স্বতঃই জীবের অনন্তভাব প্রকাশ পায়। তবেই বুঝুন, ভেদ-বৈচিত্র্য মধ্যেও জীবের অভেদ সম্বন্ধ নিহিত রহিয়াছে; একত্ববাদের কোন ব্যত্যয় দেখা যায় না। আরও দেখুন, একটী মৃন্ময় শতছিদ্র বিশিষ্ট ঘটে সূর্য্যকান্ত মণির অত্যুজ্জ্বল জ্যোতি প্রত্যেক ছিদ্রে বাহির হইতেছে দেখিয়া কি বুঝিব—সেই মণিটীর অঙ্গীভূত পূর্ণালোক বহুত্বে পরিণত হইয়াছে ? ইহা যেমন সম্ভব নহে, তেমনি জানিবেন যে, ভ্রান্তি মোহাদির আবরণে জীবেরও স্বাতন্ত্র্যভাব অসম্ভব। আপনি ঐ চিন্তাশক্তির মূলপ্রদেশে একবার গিয়া দেখুন ত! পরস্পর দেহীর সহিত ভেদাত্মক বুদ্ধি-জড়িত হইয়া জীবের সৃষ্টি প্রমাণ করিতেছে কি না ? ইহা কি ভ্রান্তি-বিষয়িণী চিন্তার কার্য্য বলিয়া স্বীকার করিবেন না ? অবশ্যই বলিব, এ বিশ্বাসটী ব্রহ্মজ্ঞানের বিরোধী, সন্দেহ নাই। কেন না, মোহাবৃত মনচ্ছক্তি, ভেদ-বিভীষিকা হইতে ভস্ম-নির্ম্মুক্ত অগ্নিবৎ প্রকাশ পাইলে ঈদৃশ ভেদজ্ঞান আর থাকে না। স্থূলের খণ্ড দৃষ্টি বিনষ্ট হইয়া সাম্যদৃষ্টিতে জীবের অখণ্ডভাব পরিলক্ষিত হয়। সিদ্ধাবস্থায় অহমিকামিত্বও ভেদবুদ্ধির অধীন অথবা কোন প্রকার বস্তু মধ্যে আকৃষ্ট হয় না। দেবভাবে অভিন্ন সাম্যতত্বের অনুসরণে নিয়ত ব্যস্ত থাকে। তখনি বহির্মুখচিন্তা অন্তর্মুখের দিকে চলিতে আরম্ভ করে। স্থূলের বিঘ্ন-বিড়ম্বনা প্রভৃতির উত্তেজনায় কিছুই করিতে পারে না।

যুক্তি তর্কের বিচার সমূহ পরাস্ত হইয়া যায়।

বাস্তবিকই মানবীয় ভাব হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া দেবভাবে উপনীত হইলে বাহ্যকর্ম্মের সাহায্য ইচ্ছা থাকে না। ক্রমে ক্রমে অন্তর্মুখীন নিষ্কাম কর্ম্মের—নির্ম্মল চিন্তা জাগ্রত হয়। এবং তত্ত্বজ্ঞানের উজ্জ্বল জ্যোতি ফুটিয়া উঠে। তখন আর বিবিধ দেহীর পার্থক্য ভাবগত প্রজ্ঞার হ্রাস বৃদ্ধি বিবেচনা হয় না। পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ প্রভৃতির মধ্যে জীবের খণ্ড ভাবও দেখা যায় না। বাহ্য-বস্তু ভেদাত্মক চিন্তা অন্তর্হিত হইয়া অন্তরে অনন্তের আভা বিকাশ পাইতে থাকে। চকিত মধ্যে ভ্রান্তি-ধ্বান্তারি বিশুদ্ধ মহালোকে মানবহৃদয়কে আলোকিত করে। শম দম তিতিক্ষাদি সদ্গুণ সমূহ সাম্য সাধনের সহায় হয়। মুহূর্ত্ত সময়ে আশ্রম-অনাসক্ত বৈরাগ্য আবির্ভূত হইয়া জগতের বৈচিত্র্য চিন্তা হইতে ঊর্দ্ধে তুলে। তখনি উদ্ভিজ্জাদি প্রচ্ছন্ন চৈতন্য—মানবাদি জাগ্রত চৈতন্য—একই চৈতন্যরূপী আত্মার পূর্ণভাব প্রত্যক্ষীভূত হইতে থাকে। সেই সময় মানব দেবভাবে স্বার্থপ্রক্ষিপ্ত শাস্ত্র-শৃঙ্খলাবদ্ধ দুর্ব্বহ কষ্ট হইতে মুক্ত হইয়া অনাদি নিত্য সত্যের অসীম প্রকাশ ভাবের দিকেই চলিতে আরম্ভ করে। বিচিত্র প্রাণী মধ্যে ক্ষুদ্র জীবরূপী ভাবটী ঘুচিয়া যায়। তখন শান্তির অমিয় রসাস্বাদনের শক্তি জন্মে। একাত্মময় মহচ্চিন্তায় মোহাদির ভাব সকল বিন্দুমাত্রও অধিকার করিতে পারে না,—কেনই বা পারিবে? ভেদ-বিকার-সঙ্কুল ভ্রান্তির ভীষণ শাসন চলিয়া গেলে, ব্রহ্ম-প্রদত্ত স্বাভাবিক জ্ঞানে আর কিছু থাকে না। সকলইত একই জীব ভাবে পরম চৈতন্য যোগে ডুবিয়া আছে।

এই একত্ববাদ মহত্তত্ত্বকে উপেক্ষা করিলে যে শাস্ত্র-প্রক্ষিপ্ত-ভাবের আবরণ ভেদ করিতে অসমর্থ হইয়া পতন পথ অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়, ইহা অনেকেই চিন্তা করে না। অনেকেই জড়জড়িত মানবীয় ভাব লইয়া যুক্তির তীব্র শাসনে বন্ধুর পথে ভ্রমণ করিতেছেন, এবং পুনর্জন্মের আশ্বাসে যথেষ্ট সময় আছে বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। একথা অবশ্যই বলিতে পারা যায় যে, নিরাকার জীব-চৈতন্যকে স্থূলাভিধানের জীবশব্দ খণ্ডরূপে বিশ্বাস করিয়া মহাভিধানের অখণ্ড জীবতত্ত্ব কেহ ভাবিয়াও দেখেন না, পার্থিব ভাবের আড়ম্বরে পৃথিবীকে কাঁপাইতেও ক্রটী করেন না। বলা বাহুল্য যে, জাতিভেদ এই নিকৃষ্ট প্রথাতেও জীবকে বদ্ধ করিয়া, চণ্ডালাদি অতি নিকৃষ্ট জীব—একথা বলিয়াও হৃদয়কে স্ফীত করিতেছেন! কি ভয়ানক অন্ধ বিশ্বাস! কি ভীষণ অসার চিন্তার কুয়াসা! কি ভ্রান্তির আধিপত্য! অনেকেই আপাতমধুর ভাবে মুগ্ধ হইয়া অজ্ঞানতার গভীর অন্ধকার প্রদেশে ক্রমেই প্রবেশ করিতেছেন, তাহা একবারও চিন্তা করেন না। কল্পিত বিধান পদ্ধতির দায়, দিয়া কেবল মাত্র সময় পাত করিতেছেন। কিন্তু কোথায় যে যাইতেছেন, ভুলেও ভাবেন না। সুতরাং প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানের উজ্জ্বল জ্যোতির সম্মুখে তিষ্ঠিতে শক্তি জন্মে না।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, উদ্ভিজ্জাদি প্রচ্ছন্ন চৈতন্য এবং জাগ্রত চৈতন্য একই চৈতন্য বলিয়া যাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে, উদ্ভিজ্জাদি অর্থাৎ তরুবল্লীর বিবিধ প্রকার ভাব অভাব হইলে তৎস্থিত আচ্ছাদিত

চৈতন্য অবশ্যই অবিকৃত। কেননা, উহা ভ্রান্তি-মোহাদির অতীত। কিন্তু পশ্বাদি সমূহ জান্তবভাব মধ্যে অবস্থিতি করিয়াও যখন ষড়বিধ জ্ঞান ব্যতীত উন্নত জ্ঞানে চলিতে পারে না, নিকৃষ্ট বৃত্তির অধীনে পরিচালিত হয়, উহাদের সিদ্ধামিশ্বের অবস্থা নিতান্ত অসম্ভব, কোন প্রকার সাধন বলের কারণ দৃষ্ট হয় না, পরস্পর দ্বেষ-হিংসা স্বার্থপরতাদি ঘৃণিত কার্য্য সমূহই দেখা যায়, তখন কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে যে, পশ্বাদির মধ্যে একত্ব জীবতত্ব বুঝা যাইবে?

প্রশ্নোত্তরে একটুকু চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহার মূলতত্ত্বের মীমাংসা সহজেই হইবে। গো মেষ সিংহ শার্দ্দুল প্রভৃতির মধ্যেও একই চৈতন্য স্থিতি করিতেছে। মানবগণ উন্নত জ্ঞানের অধিকার পাইয়াছেন বলিয়াও তাঁহাদের ভিতরে পাশবিক কার্য্য সমূহ বিকাশ পায়, এ কথাও নিঃসন্দেহ। তবে এই মাত্র প্রভেদ দেখা যায় যে, তাঁহারা বহু সাধন ও নিষ্কাম কর্ম্মযোগে উন্নতির পথে উপনীত হইতে পারেন। ফলতঃ পশ্বাদিরা সেরূপ সাধন-কঠোরতার ব্যাপারে বদ্ধ নহে। উহারা নিয়মিত জ্ঞানেই পরিচালিত হইয়া পাপ ভোগাদির দায়িত্বে মুক্ত। কেননা, ব্রহ্ম-নির্দ্ধারিত পরিমিত জ্ঞানের অধীন থাকিয়া একমাত্র আনন্দস্বরূপেই অবস্থান করে। দ্বেষ হিংসা স্বার্থপরতা প্রভৃতির কার্য্য সম্পন্ন করিয়াও পাপের দায়ী নহে। এটী উহাদের স্বাভাবিক বিধান। অনুতাপ বুঝিলেইত পাপের অপরাধের ব্যবস্থা! তাহা যখন তাহাদের নাই, তখন ঐ ষড়বিধ জ্ঞান দ্বারা যে কার্য্যই করে, তাহাতেই উহারা সুখী। ব্যাঘ্র কি কখন ঐ বীরপুরুষটীকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া তাহার জন্য অনুতপ্ত হয়?—না, কোন প্রকার ঔষধাদির ব্যবস্থা করে? সুতরাং উহারা পাপাধিকার হইতে বিরত। পশুরা ষড়বিধ জ্ঞানেই নিয়ত নিমগ্ন থাকিয়া বিধিনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করে। মানব জাতির মত এই ধরি কি ঐ ধরি—এটা হয়, ওটা নয়—এ ভাবেত হৈ, রৈ, চৈ করিয়া বেড়ায় না। সাংখ্য এই উপদেশ দিতেছেন, পাতঞ্জল ঐ কথা বলিতেছেন, মীমাংসা আবার অন্য প্রকার মীমাংসা করিতেছেন। ঐরূপ শাস্ত্র বিচার লইয়া উহারা বিবাদ বিসম্বাদ ত করে না। বরং অধিক সময় আনন্দস্বরূপে চিত্তকে মগ্ন রাখিয়া কৃতার্থ হইতে থাকে। আমরা স্থূলভাবে শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্টভাব ধরিয়া "আত্মতত্ত্ব" হইতে বঞ্চিত হইতেছি। সকল প্রকার প্রাণী মধ্যে একই আত্মশক্তির প্রকাশ—তাহা বুঝিব না! প্রজ্ঞা চক্ষু প্রকাশিত হইলে পরস্পর শরীরপাত সত্ত্বেও ঐ জীবচৈতন্য ব্যতীত কিছু দেখা যায় না। তবে কেমন করিয়া বলিব যে, অখণ্ড জীব সৃষ্ট বস্তু? "ব্রহ্ম ও জীব," স্বরূপ ভাবেও অনাদি অনন্ত নিত্য—একমাত্র অদ্বিতীয় মহা চৈতন্য ভিন্ন আর কি আছে?

শ্রীকমলাকান্ত ব্রহ্মদাস।

মাঘে।

মাঘের মধ্যাহ্ন মেঘে শুভ্র অন্ধকার;
শীত যেন পাতিয়াছে শ্বেত সিংহাসন,
দাপটে দক্ষিণে সূর্য্য হেলিয়া তাহার,
নমিয়া সহস্র করে বন্দিছে চরণ!

জড়সড় বিশ্বরাজ্য—আড়ষ্ট সকল,
জীব জন্তু পশু পাখী তরু গুল্মবন,
স্ফূর্ত্তিহীন মৌনমূর্ত্তি ম্লান অনুজ্জ্বল,
আলস্য জড়তাপূর্ণ অবশ জীবন!

৩

সুকোমল পরিষ্কার শ্বেত শয্যাতল,
আকণ্ঠ আবরি লেপে শুইয়াছে নারী;
ক্ষীরোদে ফুটেছে যেন হেম শতদল,
বিমল উজ্জ্বল গৃহ লাবণ্যে তাহারি!

৪

শীত-ভীত মৃদুতাপ আনন্দ উল্লাস,
লুকায়ে তাহারি কোলে লয়েছে আশ্রয়,
অধরে অমৃত তপ্ত মধুর উচ্ছ্বাস,
চিরপূর্ণ অফুরন্ত চির মধুময়!

৫

লইয়া নূতন স্বাস্থ্য নূতন উদাম,
বিরলে বসন্ত বক্ষে আছে অপেক্ষায়,
প্রসন্ন নয়ন পদ্ম নীল নিরুপম,
শত পদ্মবন শোভা হেমপদ্ম গায়!

৬

মজ্জাগত লজ্জানত শয্যাগত নারী,
শশব্যস্ত রোধে হস্ত মৃদু কম্পমান,
অলঙ্কার রত্নাগার যক্ষ রক্ষাকারী,
যার জন্য সে ত ধন্য সে ত পুণ্যবান্!

৭

এই মোহ এই ভ্রান্তি এই শান্তি যার,
বিধির বিধানে যার এই কর্ম্মভোগ,
প্রেমের প্রয়াসে আজি কোন্ পুণ্যে তার—
কিসে লাগে পুণ্য মাঘে হেম কুম্ভযোগ?

৮

পাপী যায় তীর্থে নাকি তীর্থ যদি টানে,
দেবতার এমনই দয়া অনুগ্রহ,
সরল বিশ্বাস ভক্তি থাকে যদি প্রাণে,
দেবতা তাহাই চায় শত পাপ সহ!

৯

সে আমার পুণ্যময়ী প্রিয় ভাগীরথী,
সহস্র যোজনে থাকি নিলে তার নাম,
হৃদয় নির্ম্মল হয়, শান্ত হয় মতি,
অনায়াসে জয় করি পাপের সংগ্রাম!

১০

স্মরণে অনন্ত সুখ মরণে উল্লাস,
আমি পাপী, আমি আর কিছুই না জানি,
দগ্ধবুকে শতমুখে বহে বারমাস,
তোমরা বৈকুণ্ঠ লহ, আমি পা দুখানি!

শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাস।

বৈষ্ণবকবি শ্রীমালাধর বসু

আমরা এপর্য্যন্ত যে কয়জন মহানুভব বৈষ্ণব কবির প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়াছি, তাঁহারা প্রায় সকলেই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী। প্রভুর অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে, যাঁহাদের পবিত্র করস্পর্শে এই দীনা বঙ্গভাষার দুরবস্থা কতক মোচিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণবিজয়-গ্রন্থকার মালাধর বসুর নামও বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার সম্বন্ধে জানিতে অবশ্যই আমাদের পাঠক-মণ্ডলীর বিশেষ কৌতূহল উপস্থিত হইবে। সেই কৌতূহল কিয়ৎ পরিমাণে পরিতৃপ্ত করার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

শকাব্দা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রাঢ় দেশান্তর্গত কুলীন গ্রামে, কায়স্থকুলে, শ্রীমালাধর বসু জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ভগীরথ বসু, মাতার নাম ইন্দুমতী। এই ভগীরথ বসুও একজন পরম ভাগবত ছিলেন।

মহারাজ আদিশূরের আনীত ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে পাঁচজন কায়স্থও গৌড়ে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে দশরথ বসু তাঁহার আত্মপরিচয় এই প্রকার প্রদান করেন—

কাশ্যপেচৈব গোত্রেচ দক্ষনামা মহামতিঃ।
সস্য দাসো গৌতমস্য গোত্রে দশরথো বসুঃ॥

শ্রীপাট কুলীনগ্রামে বসু মহাশয়গণের নিকট যে তাঁহাদের কুর্শীনামা আছে, তদ্দৃষ্টে জানা যায়—এই দশরথ বসু হইতে মালাধর বসু ত্রয়োদশ পর্য্যায়। আর মালাধর হইতে বর্ত্তমানের বসু ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ পর্য্যায় হইবেন। মালাধর নিজ পরিচয় সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

বাপ ভগীরথ মোর মাতা ইন্দুমতী।
যাঁহার পুণ্যেতে হইল মোর কৃষ্ণচন্দ্রে মতি॥
* * *
কায়স্থকুলেতে জন্ম কুলীনগ্রামে বাস।
* * *
গুণ নাহি, অধম মুঞি, নাহি কোন জ্ঞান।
গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজ খান॥

গৌড়েশ্বর-প্রদত্ত উপাধি প্রাপ্ত হইলে, পরবর্ত্তী সময়ে তিনি "গুণরাজ খাঁন" এই উপাধিগত নামেই সর্ব্বত্র বিশেষরূপে পরিচিত হইয়াছিলেন। নিজেও গ্রন্থের প্রত্যেক পরিচ্ছেদের পরিসমাপ্তি স্থলে, কোন কোন স্থানে নাম,আর কোন কোন স্থানে উপাধির উল্লেখ করিয়াছেন—

হেন সে অদ্ভুত কথা শুন এক মনে।
মালাধর বসু কহে গোবিন্দ চরণে॥
* * *
শ্রীকৃষ্ণবিজয় নর শুন একমনে।
গুণরাজ খাঁন ভনে গোবিন্দ চরণে॥

পণ্ডিতগণের নিকট শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া, ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধ অবলম্বনে ১৩৯৫ শকাব্দাতে শ্রীকৃষ্ণবিজয় প্রণয়ন আরম্ভ করেন। ১৪০২ শকে এই গ্রন্থ রচনার পরিসমাপ্তি হয়। যথা—

ভাগবত শুনিল আমি পণ্ডিতের মুখে।
লৌকিকে কহিয়ে সার বুঝ মহাসুখে॥
* * *
তেরশ পাঁচানব্বই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।
চৌদ্দশত দুই শকে হৈল সমাপন॥

গ্রন্থমধ্যে মালাধর নিজ পরিচয় যাহা লিখিয়াছেন, ইহা দ্বারা আরও এই কয়টী বিষয় অবগত হওয়া যায়—নিজকে নিজে "গুণহীন, অধম" বলিয়া উল্লেখ করিলেও তিনি যে একজন অসাধারণ গুণবান ব্যক্তি ছিলেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাহা না হইলে গৌড়ের সম্রাট্ তাঁহাকে "গুণরাজ খাঁন" এই উপাধিতে ভূষিত করিবেন কেন? সুধু উপাধি নহে, তাহার গড় ও দেবালয়াদি দর্শন করিলে বর্ত্তমান সময়েও তাঁহার রাজশ্রীর যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বিবিধ সদ্গুণের অধিকারী হইয়া গুণরাজ বৈষ্ণবোচিত বিনয়গুণ হইতে বঞ্চিত ছিলেন না, তাহা তাঁহার এই উক্তিতেই বেশ প্রকাশ পায়—

দন্তে তৃণ ধরি বলি সকলের ঠাঁই।
যদি দোষ থাকে গ্রন্থে, ক্ষমা ভিক্ষা চাই॥

আর এই গ্রন্থ তাঁহার প্রাচীন বয়সের রচনা। কারণ সেই সময় তাঁহার পুত্র লক্ষ্মীনাথ বসুও "সত্যরাজ খাঁন" এই উপাধি প্রাপ্ত, প্রাপ্তবয়স্ক যুবক। মালাধর এই প্রিয়তম সন্তানটীর কল্যাণ কামনা করিয়া আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়াছেন—

সত্য রাজ খাঁন হয় হৃদয় নন্দন।
তারে আশীর্ব্বাদ কর যত সাধু জন॥

ইহার কিছুকাল পরে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকাশ হইলে, এই সত্যরাজ খাঁন ও তৎপুত্র রামানন্দ বসু এবং বসু পরিবারস্থ যদুনাথ, পুরুষোত্তম, শঙ্কর, বিদ্যানন্দ, বাণীনাথ, প্রভৃতি অনেকেই প্রভুর কৃপালাভ করিয়া অশেষ প্রকারে কৃতার্থ হইয়াছিলেন। যথা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ে—

গুণরাজ খাঁনবংশে রামানন্দ আদি।
প্রভুর সুহৃদ্ তারা গৌড় দেশাবধি।

প্রভু পাদ পদ্ম আসি দেখে নীলাচলে।
পূর্ব্ব হৈতে প্রেমে বদ্ধ, পাশরিতে নারে।
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—
কুলীন গ্রামবাসী সত্যরাজ, রামানন্দ।
যদুনাথ, পুরুষোত্তম, শঙ্কর, বিদ্যানন্দ॥
বাণীনাথ বসু আদি যত গ্রামীজন।
সবেই চৈতন্য ভক্ত, চৈতন্য প্রাণধন॥

আবার ইঁহাদের সৌভাগ্য ও পবিত্র সঙ্গ বলে কুলীন-গ্রামবাসী আপামর সকলেই যে কি প্রকার ভাগ্য লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাও চরিতামৃতে উক্ত আছে—

কুলীন গ্রামীর ভাগ্য কহন না যায়।
শূকর চরায় ডোম, সেহ চৈতন্য পায়॥

সেই সময় বাঙ্গালা ভাষার যে প্রকার অবস্থা ছিল, তাহাতে এই শ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থের ভাষার প্রাঞ্জলতা ও বর্ণনার পারিপাট্য দর্শনে, মালাধর যে বঙ্গসাহিত্যে এক জন বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন, তাহা সকলকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। আর এ বিষয় ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গ যাহা বলিয়াছেন—

গুণরাজ খাঁন কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়।
তাহে এক বাক্য তার আছে প্রেমময়॥
"নন্দ নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ"॥
সেই বাক্যে বিকাইনু তার বংশের হাত॥
তোমার কি কথা তোমার গ্রামের কুক্কুর।
সেহ মোর প্রিয় অন্য জন রহু দূর॥

তাহাতে এই গ্রন্থের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রামাণ্য সম্বন্ধে বর্ত্তমানে আর অধিক কি বলা যাইতে পারে?

শ্রীতরণীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

ফরিদপুরের প্রাকৃতিক বিবরণ। *

তিনটী জেলার আংশিক সমবায়ে ফরিদপুর জেলার পূর্ণ বিকাশ। তন্মধ্যে ১ম ঢাকা, ২য় যশোহর, ৩য় বাখরগঞ্জ। প্রাচীনত্ব হিসাবে ঢাকার অংশই শ্রেষ্ঠ; অতএব উহার বিবরণই প্রথম উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। ঢাকা জেলা হইতে যে সকল স্থান বিচ্ছিন্ন হইয়া ফরিদপুরান্তর্গত হইয়াছে, তন্মধ্যে বিক্রমপুরের দক্ষিণাংশ অতি প্রাচীন স্থান। এতৎসম্বন্ধে জানা যায় যে, ঐ ভূভাগ পূর্ব্বে সমতট বঙ্গের অন্তর্গত ছিল; পরে রাজা বিক্রমাদিত্য কতক কাল ঢাকার দক্ষিণাংশে অবস্থান করায় ঐ অংশ বিক্রমপুর আখ্যা প্রাপ্ত হয়। † কেহ কেহ বলেন যে, বিক্রমশালী সেন রাজগণই তাঁহাদের প্রিয় নিকেতনটীকে "বিক্রমপুর" নাম প্রদান করেন। যাহা হউক "বিক্রমপুর" নাম যত দিবসেরই হউক না কেন, সমতট বঙ্গের অন্তর্গত থাকায়, উহা যে খ্রীষ্টীয় শকারম্ভের পূর্ব্বেই স্থলভাগে পরিণত হইয়াছিল, তৎবিষয়ে সন্দেহ নাই।

অতঃপর যশোহর হইতে যে ভূভাগ বিভিন্ন হইয়া ফরিদপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, তাহাও কম প্রাচীন নয়। ভূষণা ও ফতেয়াবাদের বিবরণ আমরা মোগল রাজত্বের পূর্ব্ব হইতেই প্রাপ্ত হই। আকবরনামা ও আইন-ই-আকবরিতে ফতেয়াবাদের নাম উল্লেখ আছে। (‡) তবে ঐ ভূভাগ কত কালের, তাহা স্পষ্ট অনুমান করা যায় না। কোটালীপাড়ার অন্তর্গত পিঞ্জরী গ্রামের পরিচয় সেনরাজগণের সময় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

* ফরিদপুরের ইতিহাসের জন্য লিখিত। ভরসা করি, যদি ইহাতে কোন ভ্রম লক্ষিত হয়, অথবা ফরিদপুরের অন্যান্য অবস্থা কেহ কিছু পরিজ্ঞাত থাকেন, তাহা লেখককে অনুগ্রহ করিয়া জানাইবেন।

† ষ্টেটেসটিক একাউণ্ট অব ঢাকা ৭০ পৃষ্ঠা।

‡ ইলিয়ট হিষ্টরী অব ইণ্ডিয়া—৬৭ পৃষ্ঠা এবং আকবরনামা ৩য় ভলুম ৪২০ পৃষ্ঠা।

ইহাতে অনুমান হয় যে, ফতেয়াবাদ বিভাগ ও তন্নিকটস্থ কতক স্থান সহস্র বৎসর পূর্ব্বে নিশ্চয় স্থল ভাগে পরিণত হইয়াছিল।

"সমতট বঙ্গের নিম্ন দিয়া পূর্ব্বে সাগর-স্রোত প্রবাহিত হইত,ক্রমে চড়া পড়িয়া উহা বহুশত ক্রোশ পর্য্যন্ত ভূভাগরূপে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু সম্যকরূপে উহার জল নিঃসরণ না হওয়ায়, কোথাও বা হ্রদাকারে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। এ সকল হ্রদ সাধারণতঃ "বিল" নামে অভিহিত। এইরূপ বহু বিলের সমষ্টিতে ফতেয়াবাদ বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছে। আরিয়ল-খাঁ নদীর পশ্চিম প্রান্ত হইতে মধুমতী নদীর পূর্ব্ব তট পর্য্যন্ত যে কোন স্থানে খাল বা পুষ্করিণী খনন করা যায়,সেই স্থানের মৃত্তিকার কিছু নিম্নেই একটা কাল স্তর দৃষ্ট হইয়া থাকে। উহা সাধারণতঃ,ভীট দাম পচিয়া যেরূপ মৃত্তিকার সৃষ্টি হয়, ঠিক তদনুরূপ। এ জন্য বোধ হয়, বিস্তৃত বিলের উপর যে সকল ভীট দাম ছিল, কালক্রমে উহাই পচিয়া এইরূপে মৃত্তিকা রাশি হইয়াছে এবং উহাতে ক্রমে স্থলভাগের উদ্ভব হইয়া থাকিবে। এইরূপ বহু বিলের বিলয়ে ফতেয়াবাদ বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছে। ফতেয়াবাদের অধিকাংশ অধুনা ফরিদপুর বিভাগের অন্তর্গত, বোধ হয়,ফরিদপুর পূর্ব্বে এই ফতেয়াবাদের অন্তর্ভূত ছিল" (৩)।

"প্রবাদ আছে, পূর্ব্বে এইস্থান বহু জলা ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ থাকায়, কেহই আবাদ করিয়া উঠিতে পারে নাই, পরে ফতে আলি নামে এক মুসলমান বহু আয়াসে, এই স্থানে মনুষ্য-বাসোপযোগী করিয়া উঠাইলে, উহার নাম হয়, ফতেয়াবাদ।

পরে বাখরগঞ্জ জেলা হইতে যে স্থান গুলি খারিজ হইয়া ফরিদপুরের অন্তর্গত হইয়াছে, উহার ঐতিহাসিক তত্ত্বও ঐরূপ। কারণ বাখরগঞ্জের অধিকাংশ স্থান পূর্ব্বে সাগর জলে নিমজ্জিত ছিল, পরে ব্রহ্মপুত্রাদি ও গঙ্গাদি কর্ত্তৃক উচ্চ ভূপৃষ্ঠ হইতে পঙ্কিল মৃত্তিকা ও প্রস্তররাশি বিধৌত হইয়া স্রোতবেগে যেস্থানে আসিয়া কথকটা স্থির হইয়া থাকিতে পারিয়াছে, তথায়ই চড়া বা দ্বীপবৎ স্থানের সৃষ্টি হইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালার "দ্বীপ" "ডাঙ্গা" "কূল" প্রভৃতি যে সকল স্থানের সহিত সংযোগে দেখা যায়, তাহাদের উদ্ভব প্রায়ই এইরূপ উপায়ে সংঘটিত হইয়াছে।

আবার ভূকম্প বা অত্যধিক জল-প্লাবন দ্বারাও অনেকরূপ প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। উহাতে কোন স্থানের অধঃপতন ও কোন স্থানের উন্নয়ন ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। ভাগীরথী ও পদ্মার মধ্যবর্ত্তী "ব" দ্বীপবৎ ভূভাগে নদীর বিপর্য্যয়ে সময় সময় নানারূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। সমুদ্রোপকূলেই সাধারণতঃ ঘন ২ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়।

পূর্ব্ব-দক্ষিণ বঙ্গের নিকট মহাসমুদ্র থাকায় অনেক বড় নদী উহার বক্ষ ভেদ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে,এজন্য বন্যাদি দ্বারা সমুদ্র-নীর-বৃদ্ধির সহিত ও নদীর গতি পরিবর্ত্তন সহকারে এ ভূভাগের বিপর্য্যয় প্রত্যেক শতাব্দীতে কিছু না কিছু অবশ্যই হইয়া থাকে। পদ্মার তীরস্থ স্থানগুলির প্রতি দৃষ্টি

(৩) ১৫৮২ খ্রীঃ অব্দে আকবর বাদসাহের শাসন সময়ে সমস্ত বাঙ্গালা দেশ ৩৩টী সরকারে বিভক্ত হয়। ফরিদপুর মহম্মদ আবুদের সরকারের অন্তর্গত ছিল বলিয়া বোধ হয়। হান্টার ষ্টেটেসটিকাল একাউণ্ট অব ফরিদপুর, ২৫৬ পৃষ্ঠা।

করিলেই ইহা পরিলক্ষিত করা হয়। চাঁদ রায় ও কেদার রায় যখন বিক্রমপুর শাসন করিতেন, তখন উহা কতকগুলি দ্বীপসমষ্টি ছিল মাত্র। (৪) কোন বৃহৎ নদী বিক্রমপুরের মধ্যে ছিল না, এখন কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমরা এ স্থলে নদীর গতি পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ প্রদান করিলাম।

প্রবাদ অনুসারে জানা যায়, পদ্মানদী ফরিদপুরের ২৫ মাইল উত্তরে "সেলিমপুর" গ্রামের দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া কানাইপুরের নিকট দিয়া পূর্ব্ব মুখে প্রবাহিত হইত। পরে ফরিদপুরের নিম্নস্থ ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী সহ সম্মিলিত হইয়াছিল, পরিণামে ঐ ক্ষুদ্র নদীই প্রবল পদ্মারূপে পরিণত হইয়া উহার পূর্ব্বতন প্রবল খাতটীকে মরা পদ্মা রূপে অভিহিত করিয়াছে। ৬০।৭০ বৎসর গত হইল মধুখালি বন্দরটী চন্দনা নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত ছিল, ক্রমে নদীর গতি পরিবর্ত্তন হইয়া বন্দরের দক্ষিণ দিক দিয়া প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইলে, বন্দরটী আবার উঠিয়া নদীর দক্ষিণ পারে সংস্থাপিত হয়।

৪৮।৪৯ বৎসর পূর্ব্বে বৈকুণ্ঠপুর চন্দনা নদীর উত্তর পারে অবস্থিত ছিল। কিন্তু নদীর গতি পরিবর্ত্তন হইয়া এখন ঐ গ্রাম নদীর দক্ষিণ পার হইয়া পড়িয়াছে।

পদ্মার পরিবর্ত্তন সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক, অতি পূর্ব্বকালে পদ্মা নদীর মোহনা ঘুরিয়া ফিরিয়া নানা স্থান অতিক্রম করতঃ মেঘনার সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল। মিঃ রেনেল ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব্ববঙ্গের যে মানচিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন,* তাহাতে দেখা যায়, পদ্মা বিক্রমপুরের বহু পশ্চিম দিক দিয়া প্রবাহিত হইয়া, ভুবনেশ্বর নামক একটী নদীর সহিত মিলিত হইয়া বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত মেহেদিগঞ্জ থানার মধ্য দিয়া মেঘনার সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল। এখন ভুবনেশ্বরের সম্পূর্ণ অস্তিত্ব লোপ পাইয়া "আড়িয়ল খাঁ" নাম ধারণ করিয়াছে। সাধারণতঃ ফুললতার মোহনাই পূর্ব্বে পদ্মা ও মেঘনার সম্মিলন স্থান ছিল। তখন "কীর্ত্তিনাশা বা নয়াভাঙ্গনী" নামে কোন নদীর পরিচয় ছিল না, বিক্রমপুরের অন্তর্গত রাজনগর ও ভদ্রেশ্বরের গ্রামের মধ্যে একটা অপ্রশস্ত জলপ্রণালী বর্ত্তমান ছিল। উহা প্রাচীন কালীগঙ্গার শেষ চিহ্ন মাত্র। শ্রীপুর, নওবাড়ী, এই দুই প্রসিদ্ধ গ্রাম, কালীগঙ্গার তটেই বিদ্যমান ছিল।* পরে শত বৎসরের মধ্যে কীর্ত্তিনাশা উদ্ভব হইয়া বিক্রমপুরের মধ্য ভেদ করিয়া এবং নয়াভাঙ্গনীর আবির্ভাব হইয়া ইদিলপুরের প্রান্ত দিয়া, পদ্মা ও মেঘনাকে পরস্পর সংযুক্ত করিয়াছে।

মূল কথা, ব্রহ্মপুত্র মেঘনার সহিত মিলিত হইয়া যখন প্রবাহিত হইত, তখন উহার স্রোতবেগ অতি প্রবল থাকায়, পদ্মাকে বহু পশ্চিম দিকে রাখিয়াছিল। পরে আবার যখন ব্রহ্মপুত্রের সহিত মেঘনার তত টা সম্বন্ধ রহিল না, ব্রহ্মপুত্র যমুনার সহিত মিলিত হইয়া গোয়ালন্দের নিকট পদ্মার সহিত

(৪) হার্টন রেইলি রালফ ফিচ ১১৮।১১৯ পৃষ্ঠা।

* হার্টন রেইলী রালফ ফিচ ১১৮। ১১৯ পৃষ্ঠা—রালফ ফিচ এই নদীটীকে কেবল মাত্র গঙ্গা বলিয়া যাওয়ায় শ্রীযুক্ত নিখিল নাথ রায় মহাশয় এটীকে পদ্মা বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। বাস্তবিক তাহা নয়। তৎকালে পদ্মা অপেক্ষা বরং মেঘনা নদী শ্রীপুর গ্রামের নিকটবর্ত্তী ছিল। চরকালীগঙ্গা বলিয়া যে একটা মহালের পরিচয় ফরিদপুরের কালেকটরের তৌজীতে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এই কালীগঙ্গাভরটী মহাল। কালীগঙ্গার অধিকাংশ এখন কীর্ত্তিনাশার অঙ্কে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

সম্মিলিত হইল, তখন পদ্মার বেগই প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়া ক্রমে পশ্চিমদিক পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, তাহার ফল স্বরূপই কীর্ত্তিনাশার ও নয়াভাঙ্গনীর উদ্ভব।

পদ্মার গতি পরিবর্ত্তন অতি বিচিত্র। উহার মধ্যে হঠাৎ এমন সকল চর উৎপন্ন হয় যে, কোন ষ্টিমার এক সপ্তাহ পূর্ব্বে যে জল অতিক্রম করিয়া গিয়াছে,পর সপ্তাহে আর সে স্থান অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না, যে স্থানে পূর্ব্বে অল্প জল বিদ্যমান ছিল, উহাই আবার গভীরতর হইয়া পড়িয়াছে, দেখা যায়। তীরস্থ গ্রামগুলি ভগ্ন করিয়া এমন শ্রীভ্রষ্ট করে যে, বৎসরান্তে গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নদী-তীর হইতে পরিচিত স্থান ঠিক করিয়া লওয়া সুকঠিন হয়।

পদ্মা নদী বর্ত্তমান সময়ে মধুমতী ও হরিণঘাটার সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য, একটী প্রধান শাখা অবলম্বন করিয়াছে। ইহাতে নদীয়া ও যশোহর জেলার নদীগুলি প্রায়ই বন্ধ হইয়াছে, নৌকাযোগে পূর্ব্বে এই সকল নদী বাহিয়া পশ্চিম বঙ্গে, এমন কি, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশেও যাতায়াত করা যাইতে পারিত, ষ্টিমার চলাচলেরও বাধা ছিলনা। এখন মধুমতী ও হরিণঘাটা অবলম্বনে সুন্দরবনের মধ্যে অথবা নিম্নদিয়া পশ্চিম বঙ্গে হইতে হয়।

১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে কুষ্টিয়ার নিকট গড়াই-নদীর বিস্তারমাত্র ৬০০ শত ফুট ছিল; ১৮৫৪।৫৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন মিঃ লেম্বারটন রেভিনিউ আফিসার কর্ত্তৃক উহা পরিমাপ হয়, তখন তদ্রখালী হইতে মীরপুর পর্য্যন্ত ইহার প্রসার ১৩২০ ফুট হইয়াছিল। দেখা যায়, ২৭ বৎসর মধ্যে উহার শক্তি দ্বিগুণ লাভ করিয়াছিল। এখন আবার গড়াই নদীর উপর দিয়া ইষ্টারণ-বেঙ্গল রেলওয়ে-কোম্পানী কর্ত্তৃক লৌহসেতু নির্ম্মিত হওয়ায়, উহার আকার খর্ব্ব হইয়া আসিতেছে।

পূর্ব্বে গড়াই আকারে অত্যন্ত ক্ষুদ্র ছিল; পদ্মা হইতে মধুমতী যাইতে হইলে চন্দনা নদী হইয়া যাইতে হইত। এখন চন্দনার মোহনা সময় সময় একেবারে শুষ্ক হইয়া যায়। চন্দনা গড়াই নদীর ২৬ মাইল নিম্নে পদ্মা হইতে বাহির হইয়াছিল।

ফরিদপুর জেলার উত্তর পূর্ব্বাংশে যেরূপ নদী কর্ত্তৃক নানাবিধ পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছে, পশ্চিম-দক্ষিণ-ভাগেও তদনুরূপ বিলের সমষ্টিতে ভিন্ন রূপ দৃশ্য প্রতিফলিত করিয়াছে। জেলার উত্তরাংশ হইতে দক্ষিণাংশ ক্রমশঃই ঢালু হইয়া চলিয়াছে। পরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বিলের সমষ্টিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। এই সকল বিলের মধ্যে বাঘিয়া, চাঁদা, রামশীল দিঘী, ঝনঝনীয়া, বড়ুয়া,বারজোরা, কাজলীয়ার বিল প্রসিদ্ধ। এই সকল বিলের অধিকাংশ প্রায় জলপূর্ণ থাকিত, অধুনা কতকটা উচ্চ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিলের মধ্যে দিয়া অসংখ্য খালের চিহ্ন দৃষ্ট হওয়ায় প্রতীত হয় যে, এই সকল খাল দিয়া পূর্ব্বে নদীর জল নিঃসৃত হইত, পরে প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে, নদীর গতি ভিন্নদিকে পরিবর্ত্তিত এবং খালের মোহনাগুলি উচ্চ হওয়ায় নদীর সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। বর্ষার সময়ে এই সকল বিলগুলি প্রায় সাগর শাখাতে পরিণত হয়। যে সকল বিলে একেবারেই শস্য অথবা ধাপ থাকে না, প্রবল বাতাসের সময় নৌকা যোগে ঐ সকল স্থান অতিক্রম করিতে বড়ই কষ্ট পাইতে হয়।

চণ্ডালগণ সাধারণতঃ এই সকল বিলে বাস করিয়া থাকে, খালের বেকে যথায় জমি কিছু উচ্চ, তথায়ই তাহারা বাস করিয়া থাকে। কোথাও বা বহু মৃত্তিকা উত্তোলন করিয়া টীলার মত স্থান করিয়া তথায় বাস করিয়া থাকে। বর্ষার সময় গ্রামান্তরে, এমন কি, একবাড়ী হইতে অন্য বাড়ী যাইতে হইলেও নৌকা বা ভেলার সাহায্য ব্যতীত কোন ক্রমে পারিবার উপায় নাই। গৃহ-পালিত পশুগুলি এই সময় প্রায় জলে দাঁড়াইয়াই সময় অতিবাহিত করে।

নদীর তীরস্থ স্থানগুলিই সাধারণতঃ উচ্চ, তথায় অনেক ভদ্র লোক বাস করিয়া থাকেন। নানাবিধ অসুবিধা সত্বেও অনেক ভদ্র লোক বিলের মধ্যে কয়েকটী কারণে বাস করিয়া থাকেন, উহার মধ্যে প্রথম কারণ ধান্য, ২য় মৎস্য, ৩য় দুগ্ধ প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

চণ্ডালগণ ঐ সকল দ্রব ব্যতীতও বিলোৎপন্ন নল, হোগলপাতা, ঘাস ইত্যাদি দ্বারাও প্রচুর পরিমাণে লাভবান হইয়া থাকে।* ১৮৭১.৭২সালে ফরিদপুরের তাৎকালীন কালেক্টর মহোদয় যে রিপোর্ট করেন, তাহাতে তিনি বলেন যে, যদি গবর্ণমেণ্ট অর্দ্ধ ও জমিদারগণ অর্দ্ধ খরচ বহন করিয়া কতকগুলি খাল এই বিলের মধ্য দিয়া কাটিয়া দেন, তবে এই সকল বিল উত্থিত হইয়া বহু শস্যের আকর হইতে পারে। পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বিল এখন জাগিয়া উঠিয়াছে, দেখা যায়। তাহাতে প্রচুর শস্য জন্মিয়া থাকে।

জেলার উত্তরাংশের প্রাকৃতিক অবস্থা দৃষ্টে বোধ হয়, অধিকাংশ পদ্মা নদীর বেগ-পরিবর্ত্তনে চড়া পড়িয়া উদ্ভব হইয়াছে। উত্তর পশ্চিমাংশের কতক স্থান বোধ হয় অনেক কাল যাবত স্থলভাগে পরিণত হইয়াছে, আবার কতকগুলি স্থানকে বারনদী ভগ্ন করিয়া পুনরায় নগর বাড়ী গড়িয়াছে। কতকগুলি স্থান বা একেবারেই নদী গর্ভে বিলীন হইয়া রহিয়াছে। সাধারণতঃ বিক্রমপুর, ইদিলপুর, জালালপুর, প্রভৃতি স্থানই ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল।

অতিপূর্ব্বে বহুজনপূর্ণ শ্যামল-শস্যরাজি-পরিবৃত জনপদ সকল লোক লোচনের যথেষ্ট আনন্দ বর্দ্ধন করিত। স্বচ্ছ বারিপূর্ণ ঝিল ও বিলগুলি নানাবিধ মৎস্য দানে রসনার তৃপ্তিবিধানে সতত নিযুক্ত থাকিত। বিলোৎপন্ন দাম ও তৎপার্শ্বস্থিত প্রশস্ত ক্ষেত্রোৎপন্ন ঘাসগুলি ভক্ষণ করিয়া গাভীগুলি যথেষ্ট হৃষ্ট পুষ্ট হইয়া অমৃত-নিভ সুস্বাদু দুগ্ধ প্রদান করিয়া জনগণকে পরিপোষণ করিত। দেশবাসী তৎকালে চাউল, মৎস্য, দুগ্ধ যথেষ্ট পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়া, স্ব স্ব পরিজন লইয়া যার পর নাই মহা সুখে কাল কর্ত্তন করিত। পদ্মা, মেঘনা, মধুমতী প্রভৃতি নদী প্রবাহিত থাকায় ইলিশ, ঠাইন, রোহিত প্রভৃতি সুস্বাদু মৎস্যের অভাবই ছিলনা। এখন প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে সেই সুখ-নিকেতনগুলি নানা প্রকারে অভাবজনক হইয়া পড়িয়াছে। একদিকে কীর্ত্তিনাশার প্রাদুর্ভাবে কতকগুলি রমণীয় স্থান চির অন্তরিত হইয়া বিক্রমপুরকে শ্মশানে পরিণত করিয়াছে; অপর দিকে বিল উত্থানের সহিত প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইয়া কতকগুলি স্থানকে উন্নত করিয়া তুলিয়াছে। বর্ষাকালের অবস্থা এ জেলায় বড়ই ভয়ানক হইয়া পড়ে। তখন সমুদয় দেশ সাগর-শাখাতে পরিণত হয়, বিলের

* কর্ণেল গেষ্টলের রিপোর্ট ২১ পৃষ্ঠা।

অধিবাসী ভিন্ন সময় সময় নদীতীরের স্থানগুলিও একেবারে ডুবিয়া যায়, এই সময়ে বহু হতভাগ্য লোক মাচা বাঁধিয়া গৃহভিত্তির কাষ্ঠ সমাধান করে, গৃহের মৃত্তিকানির্ম্মিত ভিটি সকল এই সময় অধিকাংশ স্থলে স্রোতের বেগে ধসিয়া যায়। গৃহমধ্যে নানাবিধ সরীসৃপ আশ্রয় গ্রহণ করিয়া গৃহস্তের যথেষ্ট অনিষ্ট সম্পাদন করিয়া থাকে। কত মনুষ্য এই সময়ে সর্প দষ্ট হইয়া মানব লীলা সম্বরণ করে। দরিদ্রেরা গৃহ বহির্গমনে অসমর্থ হইয়া সময় সময় অনশনব্রত অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। সুখপূর্ণ দেশের এই অশুভ পরিবর্ত্তনের কথা কয়জন লোকে ভাবিয়া থাকে? এই জেলায় বহু সংখ্যক কৃতবিদ্য, ধনী ও গুণী মনুষ্য আছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের সহিত দেশের বড়ই অল্প সম্বন্ধ। কার্য্যানুরোধে তাঁহারা অধিকাংশ সময় বিদেশে অতিবাহিত করেন, দেশের দুর্দ্দশা বড় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন না, কাজেই তৎপ্রতিকারেও কখন কোনরূপ আয়াস স্বীকার করা দূরে থাকুক, একবারও সময় পান না। স্থানীয় সুখ স্বচ্ছন্দতার বিষয় অল্প লোকেই ভাবিয়া থাকেন। যাহা হউক, আমাদের সুহৃদ্ সভা এই সকল বিষয়ের অনেকটা আলোচনা করেন বলিয়া কোন কোন স্থানে কতকটা সংস্কার হইতে পারিতেছে। ভরসা করি, দেশহিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেই দেশের সুখ স্বচ্ছন্দতার প্রতি একটুক দৃষ্টিপাত করিবেন। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এই জেলার চন্দনা, বারাশীয়ার মুখ খনিত না হইলে এবং পদ্মার সহিত মধুমতী পর্য্যন্ত আরও কতকগুলি খাল কর্ত্তিত না হইলে, এ দেশের জলপ্লাবনের এবং নদী গুলির ভগ্নপ্রবণতা কমাইবার অন্য উপায় নাই। আমাদের নদীমাতৃক দেশে রাস্তা হইতেও উহা সমধিক প্রয়োজনীয়।

শ্রীআনন্দনাথ রায়।

সংস্কৃত কবিতা।

শৈশবে যখন সংস্কৃত কাব্য অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হই, সেই সময় হইতেই বাঙ্গালা ও সংস্কৃত কবিতা রচনায় বাসনা জন্মে। ঐ বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া সময়ে সময়ে অন্যূন পাঁচশত বাঙ্গালা ও সংস্কৃত কবিতা রচনা করি। উহার অধিকাংশই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়াও বিশেষ বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে কতকগুলি সংস্কৃত কবিতা লিখিয়াছিলাম। রচিত কবিতাসমূহের মধ্যে "লণ্ডন প্রদর্শনী" "লর্ড রিপণের স্বদেশে প্রতিগমন" "অধ্যাপক মোক্ষমূলরের অভিনন্দন' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ঐ সমস্ত কবিতার মধ্যে কেবল পণ্ডিত মোক্ষ মূলরের অভিনন্দন সংক্রান্ত কবিতা কয়টি শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি,আই,ই, মহোদয়ের প্রযত্নে আমার তৃতীয় সহোদর শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, কর্ত্তৃক সম্পাদিত "লঙ্কাবতারসূত্র' নামক বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থের ভূমিকায় মুদ্রিত হইয়াছে। অন্যগুলি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

কলিকাতাস্থ রাজকীয় হিন্দুবিদ্যালয়ের অন্যতম সংস্কৃতাধ্যাপকের কার্য্যে আসার পর হইতে কয়েক বৎসরের মধ্যে আমাদের সহকর্ম্মী, কতিপয় শ্রদ্ধাস্পদ শিক্ষকের অবসর

গ্রহণ উপলক্ষে বিদ্যালয়স্থ ছাত্রগণের অনুরোধে, সেই সময় উক্ত ছাত্রগণের যে-প্রকার মানসিক ভাব হইয়াছিল, উহার স্মৃতি-রক্ষার্থ জন্য কতিপয় সংস্কৃত কবিতা প্রণয়ন করি। নিম্নে উক্ত কবিতা কয়টি ও তাহার বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইল। আশা করি পাঠকগণ অনুকম্পা পূর্ব্বক ইহা একবার পাঠ করিবেন।

বিগত ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট তারিখে তদানীন্তন দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু অভয়াচরণ পাল বি, এ, মহোদয় অবসর গ্রহণ করেন। সেই সময় তাঁহার প্রিয় ছাত্রবর্গ নিম্নলিখিত কবিতা-সমূহ উপহার প্রদান করিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিল।

ভক্ত্যুপহারঃ। *

কথং গুরো! স্নেহবিবর্দ্ধিতাংস্তে,
শিষ্যাংশ্চিরায় প্রবিহায় সর্ব্বান্।
সংপ্রস্থিতঃ স্বং ভবনং মহাত্মন্,
আগস্কৃতং কিং তব দেব! শিষ্যৈঃ॥ ১॥

(১)

হে গুরো! আবাল্য স্নেহরসে বিবর্দ্ধিত এই সকল শিষ্যকে চিরকালের জন্য ত্যাগ করিয়া কেন স্বীয় ভবনে প্রস্থান করিতেছেন? হে দেব! শিষ্যেরা আপনার সমীপে কি কোন অপরাধ করিয়াছে?

নহি প্রকোপস্ত্বয়ি সম্ভবেদ্বা,
সুধাংশুবিম্বে কথমুষ্ণতা স্যাৎ।
হিমাদ্রিশাঙ্গে নৌ নমু তপ্ততা চেৎ,
কারুণ্যমূর্ত্তৌ নহি কোপলেশঃ॥২॥

(২)

অথবা আপনাতে কদাচ কোপ সম্ভব নহে, সুধাংশু-বিম্বে কখনও কি উষ্ণতা থাকিতে পারে? হিমালয়ের সেই তুষার ধবল উন্নত শৃঙ্গেও বরং উষ্ণতা সম্ভব, তথাপি করুণার অবতার আপনাতে কোপের লেশও সম্ভব নহে।

জ্ঞাতং গুরো! ত্বন্নু যাসি যস্মাৎ,
বিয়োগখিন্নাং স্তব শিষ্যবর্গান্।
প্রসহ্য মুক্ত্বা সবিতেব সায়ম্,
পদ্মাকরান্ উৎপলবান্ধবোঽসৌ॥৩॥

(৩)

হে গুরো! পঙ্কজ-বান্ধব সবিতা সহসা পদ্মবনকে পরিত্যাগ করিয়া যেমন প্রস্থান করেন, সেই রূপ কেন যে আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিয়াছি।

কালো নিয়ন্তা জগতাং গুরো ত্বম্,
কালে প্রপন্নে সবিতেব বিশ্বম্।
উদ্ভাস্য বিজ্ঞানময়ূখজালৈ
লব্ধুং পরং শান্তি-সুখং গতোঽসি॥৪॥

(৪)

কালই জগতের নিয়ামক। হে গুরো! আপনি আপনার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যকাল পূর্ণ হওয়ায়, সবিতা যে প্রকার কিরণরাশি দ্বারা জগৎকে উদ্ভাসিত করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে স্বস্থানে গিয়া অদৃশ্য হন, সেইরূপ আপনিও জ্ঞানরূপ আলোক দ্বারা আমাদের হৃদয়কে আলোকিত করিয়া শান্তিসুখ উপভোগের নিমিত্ত স্বগৃহে যাইতেছেন।

ত্বং নো গুরুস্ত্বং পরিরক্ষিতা চ,
ত্বমেব দেব! প্রিয়বন্ধুরাসীঃ।
নিত্যং প্রমোদে ব্যসনে চ দেব!
ত্বং নঃ শরণ্যঃ শরণাগতানাম্॥৫॥

(৫)

তুমি আমাদের গুরু এবং রক্ষক, হে দেব! তুমি আমাদের প্রিয়বন্ধুও ছিলে। নিরন্তর কি উৎসবে, কি বিপদে, সর্ব্বদা আমরা তোমারই শরণাগত হইতাম।

অতঃ পরং কং শরণং ব্রজামঃ,
কৃতাপরাধং সুগতাপরাধাঃ।

* এই কবিতা কয়টি "উপজাতি" ছন্দে রচিত।

কো বা প্রসন্নঃ স্মিতশোভিতাস্যঃ,
ক্ষমিষ্যতে শিষ্যচয়ান্ প্রপন্নান্ ॥৬॥

(৬)

অতঃপর অপরাধ করিয়া আমরা কাহার শরণাগত হইব ? শিশুজনের অপরাধ অতি সুলভ। কে আবার প্রসন্ন এবং ঈষৎহাস্য-যুক্তমুখে শরণাগত শিষ্যগণকে ক্ষমা করিবেন ?

গৃহং ব্রজন্তং প্রতিরুদ্ধনেত্রাঃ,
বাষ্পাম্বুভিঃ প্রাঞ্জলয়ো গুরো ত্বাম্।
যাচামহে স্নেহরসার্দ্রচিত্ত !
স্মর্য্যা বয়ং তে ভবনেঽপি দীনাঃ ॥ ৭ ॥

গৃহগমন-কালে নয়নজলে রুদ্ধনেত্র হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিতেছি। হে স্নেহময় গুরো ! আপনি গৃহে অবস্থান কালেও এই দীন শিষ্যদিগকে ভুলিবেন না।

ক্ষমস্ব দেব ! কৃপয়া গৃহাণ,
শিষ্যৈস্তবোৎসৃষ্টমিদং সুদীনৈঃ।
তবাঙ্ঘ্রিপঙ্কেরুহ-সন্নিবিষ্টম্।
বাষ্পাম্বুদিগ্ধং ত্বয়ি ভক্তিপুষ্পম্ ॥ ৮ ॥

হে দেব ! আমরা যে সকল অপরাধ করিয়াছি, তাহা ক্ষমা করুন। এই দীন শিষ্যদের কর্তৃক আপনার পাদপদ্মে ন্যস্ত নয়ন-জলে সিক্ত এই ভক্তিপুষ্প কৃপাপূর্ব্বক গ্রহণ করুন।

১৯০২ খ্রীঃ ১লা অগষ্ট { হিন্দুস্কুলের তৃতীয়শ্রেণীর প্রথম বিভাগের ছাত্রবর্গ।

বিগত ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের ২২ শে. তারিখ তদানীন্তন প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বিদ্যাবিনোদ মহোদয়ের অবসর গ্রহণ উপলক্ষে তাঁহার প্রিয় ছাত্রবর্গ তাঁহাকে নিম্নলিখিত কবিতা কয়টি উপহারস্বরূপ অর্পণ করিয়া ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিল।

(ভক্ত্যুপহার *)

অহ কিংনু গুরো ! নিশম্যতে,
প্রিয়শিষ্যান্ বিরহাতুরাংশ্চ নঃ।
প্রবিমুচ্য চিরায় গম্যতে,
স্বনিশান্তং ননু শান্তিলিপ্সয়া ॥১॥

(১)

হে গুরো ! আমরা কি শুনিতেছি ? আপনি নাকি এই বিচ্ছেদভয়ে কাতর প্রিয় শিষ্যদিগকে চিরকালের জন্য ত্যাগ করিয়া শান্তি লাভের আশায় স্বগৃহে যাইতেছেন ?

অধুনা গমনোৎসুকে গুরো !
ভবতি স্নেহরসার্দ্র-মানসে।
কুমুদানি যথা বিধুং বিনা,
হৃবিকাশং নিতরাং গতা বয়ম্ ॥২॥

(২)

হে স্নেহময় গুরো আপনি সংপ্রতি গমনে কৃতসংকল্প হওয়ায় কুমুদপুষ্প সকল যেমন কুমুদবান্ধব বিনা ম্লান হয়, সেইরূপ আমরাও একান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছি।

গুরুদেব ! ভবন্মুখাচ্চ তদ্,
অবকীর্ণং বচনং সুধোপমম্।
ন পুনঃ পরিপীয় সাদরাঃ,
খলু যাস্যাম ইতঃ কৃতার্থতাম্ ॥ ৩ ॥

(৩)

হে গুরুদেব ! আর এখানে আপনার মুখনির্গত সুধা-তুল্য বাক্য সাদরে শ্রবণ করিয়া কৃতার্থতা লাভ করিতে পারিব না।

ন চ তে বিরহেণ কেবলম্,
বয়মেবং গুরুণাক্রমিষ্যহি।
ননু পশ্য নিসর্গসম্ভবং,
সকলং ভাতি সবেদনং গুরো ! ৪ ॥

(৪)

হে গুরো ! আমরাই যে শুধু আপনার এই গুরুতর বিরহে নিতান্ত আক্রান্ত হইয়াছি, তাহা নহে। দেখুন এই যে নিসর্গ-

* এই কবিতা কয়টি বিয়োগিনী ছন্দে বিরচিত।

সম্ভব পদার্থসকল, তাহাদিগকেও বেদনা-যুক্ত দেখা যাইতেছে।

স্মুকতামভজন্ বনপ্রিয়াঃ,
প্রবিলুপ্তঃ খলু ষট্পদ-স্বনঃ।
তরবোঽপি বিশুষ্কপত্রকাঃ,
শুচমেতে বিনিবেদয়ন্তি তে * ॥৫॥

(৫)

কোকিলেরা নীরব, ভ্রমর ঝঙ্কার বিলুপ্ত হইয়াছে। তরুগণও বিশুষ্ক-পত্র হইয়া আপনার জন্য শোক প্রকাশ করিতেছে।

ননু জহ্নুসুতাপি সব্যথা,
কৃশতাং প্রাপ্তবতীব দৃশ্যতে।
প্রখরঃ সবিতাপ্যসৌ গুরো!
মৃদুরশ্মিং বহতে বতাধুনা ॥৬॥

(৬)

আহা জহ্নুসুতা গঙ্গা ও আপনার শোকে কৃশাঙ্গী হইয়াছেন। প্রখরকিরণ সবিতা ও সংপ্রতি শোকে মৃদু কিরণ বহন করিতে-ছেন।

অপরাধ শতান্যনেকশঃ,
কৃতবন্তঃ শিশবস্তবান্তিকে।
কৃপয়া ক্ষমতাং গুরোঽধুনা,
ত্বয়ি বদ্ধাঞ্জলিভিঃ প্রযাচ্যতে ॥৭॥

শিশুগণ আপনার নিকট শত শত বার কত অপরাধ করিয়াছে। অতএব হে গুরো! সংপ্রতি কৃপাপূর্ব্বক তাহা ক্ষমা করুন। আমরা কৃতাঞ্জলি হইয়া আপনার সমীপে প্রার্থনা করিতেছি।

গৃহমেত্য গুরো তবৈব তৎ,
সুমনোজ্ঞং সুখ-শান্তি-সংশ্রয়ম্।
শিশুভিঃ সমমন্তরান্তরা,
হৃদি চিন্ত্যা ভবতা বয়ং পুনঃ ॥৮॥

(৮)

হে গুরো! আপনি সুখ শান্তির আশ্রয় স্বীয় মনোজ্ঞ নিকেতনে অবস্থানকালে ও নিজ সন্তানদের সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে ও মধ্যে মধ্যে স্মরণ করিবেন।

ছাত্রাশ্চৈতে গমনসময়ে ব্যাকুলাঃ শোকভারৈঃ,
আমুঞ্চন্তো নয়নসলিলং পাদয়োরর্পয়ন্তি।
অস্রৈঃসিক্তান্ মনসি রচিতান্ ভক্তিপুষ্পোপহারান্
গৃহ্ণীষ্বৈতান্ করুণ! কৃপয়া প্রার্থিতো দীনশিষ্যৈঃ॥৯॥ *

(৯)

ছাত্রেরা গমনকালে শোকভারে আক্রান্ত হইয়া নয়ন জল পরিত্যাগ করিতে করিতে মনে মনে রচিত বাষ্প বারিতে পরিষিক্ত এই ভক্তি-পুষ্পোপহার আপনার চরণে অর্পণ করিতেছে। হে দয়াময় গুরো! দীন শিষ্যদের প্রার্থনায় কৃপা পূর্ব্বক ইহা গ্রহণ করুন।

১৯০৩ খ্রীঃ ২২শে ডিসেম্বর } হিন্দুস্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর দ্বিতীয় বিভাগের ছাত্রবর্গ।

বিগত ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই আগষ্ট তারিখে হিন্দুস্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত রামযদু ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অবসর গ্রহণ উপলক্ষে তাঁহার প্রিয় ছাত্র-বর্গ নিম্নলিখিত কবিতা কয়টি উপহার অর্পণ করিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিল।

(ভক্তি-কুসুমম্ †)

সিক্ত্বা চিরায় হৃদয়ে ননু সেবকানাম্,
জ্ঞানামৃতং হৃতমিবাত্র গুরো দ্যুলোকাৎ।
দীর্ঘাধ্বনি প্রবিচরন্নিব পান্থঃ,
শ্রান্তিং বিনেতুমথ শান্তিপুরং প্রয়াসি ॥১॥

(১)

চিরকাল সেবকদিগের হৃদয়ে সুরলোক হইতে আনীত অমৃতের ন্যায় জ্ঞানামৃত বর্ষণ করিয়া, দীর্ঘপথ পরিভ্রমণের পর শ্রান্ত পথিক যেমন শ্রান্তি দূর করিবার জন্য পাদপতল

* শীতকালে নিসর্গের অবস্থা দর্শনে কবিতা কয়টি লিখিত হয়।

* এই কবিতাটী "মন্দাক্রান্তা" ছন্দে বিরচিত।

† এই কবিতা কয়টি "বসন্ততিলক ছন্দে বির-চিত।

আশ্রয় করে; সেইরূপ আপনিও জীবন-ব্যাপী সুদীর্ঘ কার্য্য জনিত অবসন্নতা পরিহারের জন্য শান্তিপুরে স্বীয় ভবনে গমন করিতেছেন।

হা হন্ত নো হৃদি সদা সমুদীয়মানা,
সন্তাপিনী তব বিয়োগকথা দুরন্তা।
সংভিদ্য শৈলনিচয়ং ভুবমাপতন্তী,
স্বর্গাপগেব হৃদয়ং সততং ভিনত্তি ॥ ২ ।

(২)

আহা অতীব সন্তাপজনক আপনার দুরন্ত বিচ্ছেদ কথা সর্ব্বদা আমাদের হৃদয়ে সমুদিত হইয়া ভূতলে অবতরণ কালে সুরনদী গঙ্গা যেমন শৈলসমূহকে ভেদ করেন, তদ্রূপ আমাদের হৃদয়কে ভেদ করিতেছে।

আলোক্য তিগ্মকিরণং নলিনানি নিত্যং
সংফুল্লতামধিগতানি যথা নিশান্তে।
ত্বাং বীক্ষ্য দীপ্তহৃদয়ং গুরুদেব তদ্ব-
চ্চেতাংসি নো বিকসিতান্যভবন্ সদৈব ॥ ৩ ॥

(৩)

প্রভাতে পঙ্কজসকল সূর্য্যকে অবলোকন করিয়া যেমন বিকসিত হয়, হে গুরুদেব জ্ঞানদীপ্ত আপনাকে সন্দর্শন করিয়াও প্রত্যহ আমাদের হৃদয় তদ্রূপ প্রফুল্ল হইত।

অস্তংগতা ননু চিরায় প্রফুল্লতা সা,
হা হন্ত হন্ত রজনী সমুপৈতি ঘোরা।
সংবীক্ষ্য শোক-বিধুরাং বসুধামিবাভ্রাৎ
মুঞ্চন্ত্যজস্রমমরা অপি বাষ্পধারাম্ * ॥ ৪ ॥

(৪)

আমাদের সে প্রফুল্লতা অস্তমিত হইয়াছে, হায় হায় ঘোর বিভাবরী সমাগত হইতেছে, আপনার জন্য বসুধাকে শোক-বিধুরা অবলোকন করিয়া দেবগণও অজস্র বাষ্পবারি বিসর্জ্জন করিতেছেন।

পীযূষসারশিশিরানমৃতাংশুপাদান্,
পাতুং পিপাসুহৃদয়াইব জীবজীবাঃ।
উৎকণ্ঠিতা বয়মহো বিমলোপদেশান্,
শ্রোতুং গুরো! বদনপঙ্কজনির্গতাংস্তে ॥ ৫ ॥

(৫)

অমৃতের সার ভাগের ন্যায় সুশীতল চন্দ্রকিরণ পানের নিমিত্ত চকোরেরা যে প্রকার উৎকণ্ঠিত হয়, হে গুরো! আমরাও প্রত্যহ আপনার মুখপদ্ম-বিনির্গত বিমল উপদেশ সকল শ্রবণের জন্য তদ্রূপ ব্যাকুল হইতাম।

ভূয়শ্চ তচ্ছ্রুতিসুখং মধুরং হিতং বা,
দৃষ্ট্বা ন বক্ষ্যসি গুরো! বিহিতাপরাধান্।
দণ্ডং বিধায় সহসা প্রণতেষু ভূয়ঃ,
প্রত্যাহরিষ্যসি ন বা কৃপয়া পুনস্তৎ ॥৬॥

হে গুরো! অপরাধ করিতে দেখিয়া পুনরায় আর সেইরূপ শ্রুতি সুখকর হিতবাক্য মিষ্ট মিষ্ট করিয়া বলিবেন না। দণ্ডিত অপরাধী ছাত্র প্রণত হইলে পূর্ব্বের ন্যায় আর তাহার দণ্ড প্রত্যাহার ও করিবেন না।

কালোহি সর্ব্ব জগতাং নিয়তং নিয়ন্তা,
তস্মাৎ ত্বয়া বিরহিতা অপি বোধিতাঃ স্মঃ।
শিষ্যৈঃ সমাহৃতমিদং গমনাবকাশে
বাষ্পার্দ্র-ভক্তি-কুসুমং কৃপয়া গ্রহাণ ॥ ৭ ॥

কালই সকল জগতের নিয়ত নিয়ামক, তজ্জন্য আপনার বিচ্ছেদে কাতর হইয়াও আমরা হৃদয়কে প্রবোধ দিতে পারিতেছি। হে গুরো! শিষ্যেরা (আর কি করিবে ?) বাষ্পজলে পরিষিক্ত কতকগুলি ভক্তিকুসুম আহরণ করিয়া আনিয়াছে; আপনি গমন কালে কৃপা পূর্ব্বক তাহাই গ্রহণ করুন

এই উপলক্ষে কতকগুলি বাঙ্গালা ইংরাজি কবিতা উপহার প্রদত্ত হইয়াছিল। উহার অধিকাংশই ছাত্রদের রচিত। বাহুল্য বিবেচনায় সে সমুদয় এখানে উদ্ধৃত হইল না।

শ্রীশরচ্চন্দ্রশাস্ত্রী।

* ইনি যে সময় অবসর গ্রহণ করেন, তাহার তিন চারি দিন পূর্ব্ব হইতে অনবরত বৃষ্টি হয়।

চীনদেশে সন্তানচুরি। [৫]

মা-লুর জীবনের পরিবর্ত্তন।

মংকোতি মা-লুর জন্ত ব্রহ্মদেশীয় স্ত্রী-লোকের পোষাক খরিদ করিয়া আনিয়াছিল। ব্রহ্মদেশী স্ত্রীলোকেরা গাত্রে একটী ব্রহ্মদেশী জামা, পরিধানে একখানি থামেন কি লুঙ্গি, পায়ে ব্রহ্মদেশী ফান বা চটিজুতা, এবং গলদেশে একখানা লম্বা পোয়া বা রেশমী রুমাল ব্যবহার করিয়া থাকে। ব্রহ্মদেশী লোকে রেশমী কাপড় ভিন্ন সুতার কাপড় বিশেষ ব্যবহার করে না—তবে নিতান্ত গরিব লোকদিগের কথা স্বতন্ত্র। থামেনগুলি কোমরে বেড় দিতে যতটুকু লম্বা কাপড়ের প্রয়োজন হয়, ততটুকু লম্বা এক-খণ্ড ডুরিয়া বা ফুলদার রেশমী বস্ত্র। ইহার ভিতর পিঠে একখণ্ড সুতার কাপড় সেলাই করিয়া রাখিয়া ইহার পুরুত্ব ও স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করা হইয়া থাকে। কোমরের সঙ্গে যে প্রান্ত থাকে, তাহাতে অর্দ্ধ হস্ত পরিসর এক-খণ্ড রঙ্গিণ সুতার কাপড় গাথা থাকে। আবার পদতলের দিকে যে প্রান্ত থাকে, তাহাতে অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত আর একখান বস্ত্র সেলাই করিয়া রাখিয়া তাহার পরিসর আরো বৃদ্ধি করা হয়। কারুকার্য্যের তার-তম্যানুসারে এই থামেনের মূল্য অত্যন্ত অধিক হইয়া থাকে। ইহা পরিধান করিয়া রাস্তায় চলিবার সময় দক্ষিণ উরুদেশ পর্য্যন্ত দেখা যায়। এইজন্য রাস্তা চলিবার কালে অনেকে বামহস্ত দ্বারা উহা ধরিয়া চলিতে বাধ্য হয়। পায়ের দিকের অংশ মেমদের গাউনের মত কতকটা মাটী ঘুরিয়া চলা একটা বিলাসীতার চিহ্ন। লুঙ্গিগুলি এক একটা বড় তাকিয়ার খোল বিশেষ। তিন কি ৩½হাত পরিমাণ লম্বা এক খণ্ড রেশমী বা সুতার কাপড়ের দুই প্রান্ত একত্র সেলাই করিলেই লুঙ্গি হইল। লুঙ্গি অপেক্ষা থামে-নের চলাচল অধিক। কোন পর্ব্ব উপলক্ষে কিম্বা নাচ তামাসায় যাওয়া হইলে রমণীগণ এই থামেন পরিয়া থাকে, কিন্তু গৃহকার্য্য করিবার সময়ে অনেকে ঘরে লুঙ্গি ব্যবহার করে। আজকালকার শিক্ষিত লোকের মধ্যে লুঙ্গির চলটা বৃদ্ধি হইয়াছে। অনেকে থামেনটা অসভ্যতার চিহ্ন মনে করে। এই লুঙ্গি স্ত্রী-পুরুষে উভয়ই ব্যবহার করিয়া থাকে।

রমণীগণের যেমন থামেন পরিধান করা সম্মানের কার্য্য, তেমনি পুরুষগণের পছো বা ধূতি গৌরবের বিষয়। পছোগুলি নানা রঙ্গের রেশমী বা সুতার দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। একখানি ভাল পছোর মূল্য আড়াই শত তিনশত টাকা পর্য্যন্ত আছে। জামা-গুলি স্ত্রী-পুরুষের প্রায় এক প্রকার। জামা সকল কোমরের নীচে নামে না। আস্তানি গুলি ঢোলা। দেখিতে অর্দ্ধ-চাপকানের মত কতকটা। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই ৩ কি ৩½ হাত লম্বা রেশমী রুমাল ব্যবহার করে। প্রভেদ এই যে, পুরুষগণ রুমাল মাথায় বাঁধে এবং স্ত্রীগণ গলার সঙ্গে ঝুলাইয়া রাখে। পায়ে উভয়েরই চটিজুতা। সৌখীন স্ত্রীলোকেরা আর এক প্রকার ক্ষুদ্র চটিজুতা ব্যবহার করে, তাহার মধ্যে পায়ের সমস্ত অঙ্গুলি প্রবেশ করিতে পারে না।

মাশোয়ে মা-লুর কাচিন পোষাক ছাড়া-

ইয়া বেশ পরিপাটী করিয়া ব্রহ্মদেশী বালিকার পোষাক পরাইয়া দিল, কিন্তু মা-লূ তাহা তৎক্ষণাৎ খুলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া আবার তাহার জাতীয় পোষাক পরিল। সে কিছুতেই বর্ম্মা পোষাক পরিতে রাজি হইল না। মাশোয়ে ক্ষুর দ্বারা মা-লূর মাথার চতুর্দ্দিকে বেশ করিয়া মুড়িয়া মাথার মধ্যস্থলে ব্রহ্মদেশী বালিকাগণের ন্যায় এক ঝুঁটি রাখিয়া দিল। প্রায় ১৪।১৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাহাদের মাথায় এই প্রকার ঝুঁটি রাখে। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, এই প্রকার করিলে মাথার চুল খুব লম্বা হয়। কেবল যে বালিকাগণের এই মত মাথা মুড়িয়া মধ্যস্থলে ঝুঁটি রাখা হয়, তাহা নহে, বালকদিগের ঠিক সেই মত রাখা হয়।

মাশোয়ে প্রত্যহ মা-লূকে প্রহার করিয়া বর্ম্মিণীর পোষাক পরায়, সে আবার তৎক্ষণাৎ তাহা ফেলিয়া দেয়, কিন্তু ক্রমে মা-লূর স্বভাবের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিচ্ছদেরও পরিবর্ত্তন হইল। সে ব্রহ্মদেশী পোষাক পরিতে এমন অভ্যস্ত হইল। মা-লূর বর্ম্মা নাম রাখা হইল মাপু।

ব্রহ্মদেশে স্ত্রী বাচক তিনটী শব্দ আছে, তাহাই স্ত্রী-লোকের নামের পূর্ব্বে ব্যবহৃত হয় যথা,—মে, মা এবং ড। পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা থাকিলে, একে অন্যকে ডাকিতে হইলে, অথবা তুচ্ছার্থে তাহার নামের পূর্ব্বে মে শব্দ ব্যবহার করে। মা শব্দ সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বভাবে চলে, আমাদের দেশে যেমন শ্রীমতী শব্দটী। ইহা যুবতী ও প্রৌঢ়াগণের নামের পূর্ব্বে ব্যবহৃত হয়। কোন স্ত্রীলোকের সম্মান অধিক হইলে অথা সচরাচর বৃদ্ধ-রমণীগণকে ডাকিতে হইলে তাহার নামের পূর্ব্বে ড শব্দ ব্যবহার করা হয়, যথা ক্রমান্বয়ে মে পু, মা পু, ও ড পু (Daw Poo),

পুরুষগণের নামের পূর্ব্বে (Nga) ঙা, মং, কো, এবং উ শব্দ ব্যবহার করা হয়। ঙা শব্দ অতি তুচ্ছ বোধক। কুলিদিগকে বা জেলের কয়েদীগণকে ডাকিতে হইলে ঙা শব্দ তাহাদের নামের পূর্ব্বে ব্যবহার করা হয়। জেলে যত ভদ্রলোক কয়েদী থাকে, তাহাদিগের নামের পূর্ব্বেও কখনও মং ব্যবহার করা হয় না। মং শব্দটী সদা সর্ব্বদা সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। ইহা সম্মানসূচক। কো শব্দটী স্ত্রী-লোকের নামের পূর্ব্বে মে শব্দটীর ন্যায়, পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা থাকিলে ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন ব্যক্তিগণের বা অতি সম্মানিত ব্যক্তিগণের নামের পূর্ব্বে উ শব্দ ব্যবহার করা হয়, যথা ঙা কোতি, মংকোতি, কো কোতি এবং উ কোতি। আমাদের দেশের শ্রী বা শ্রীমান শব্দের সঙ্গে এবং সাহেবগণের মিষ্টার শব্দের সঙ্গে মং শব্দটীর তুলনা কতকটা করা যায়। আবার সাহেবগণের যেমন এস্কোয়ার, আমাদের বাবু * ও পণ্ডিত শব্দের সঙ্গে ব্রহ্ম-

* বাবু শব্দটীর অর্থে বর্ত্তমান সময় সাহেব মহলে প্রায়ই কেরাণী বুঝায়, হিন্দুস্থানী ও পঞ্জাবীগণও কেরাণীগণকেই বাবু বলিয়া প্রায় বোঝে, হিন্দুস্থানী ও পাঞ্জাবীগণ কোন বর্ম্মা কেরাণির কথা বলিতে হইলে বলে যে অমুগ আফিসের "বর্ম্মা বাবু অথবা মংকোতি বাবু।" একদা ভামো অবস্থান কালে পল্টনের এক জন শিখ সেপাহি এক খানা সরকারী চিঠি আনিয়া আমাকে দিলে আমি বলিলাম, ইহা তোমাকে কে দিল? সে বলিল যে, কেল্লার গোরা বাবু দিয়াছে। আমি প্রথম বুঝিতে পারিলাম না, গোরা বাবুকে পরে শ্রম করিতে করিতে প্রকাশ পাইল যে, কেল্লার একজন গোরা কেরাণী (Soldier clerk) দিয়াছে, কেহ কেহ বাবু বলিলে বাঙ্গালীদিগকে বুঝিয়া

দেশের 'উ' শব্দটীর কতকটা তুলনা করা যায়। কিন্তু সূক্ষ্ম বিচার করিতে গেলে কোনটীর সঙ্গে কোনটীর বিশেষ মিল নাই। সর্ব্বাগ্রে এই সকল বিভিন্ন দেশীয় শব্দ সকলের ব্যবহারের একত্র মিল হওয়াও অসম্ভব, তাই বলি পরস্পর কতকটা সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। কাচিনগণের স্ত্রী-পুরুষের উভয়ের নামের পূর্ব্বেই মা শব্দটী ব্যবহৃত হয়। চীনদেশে মা শব্দটী অনেক পরিবারের উপাধি স্বরূপ নামের পূর্ব্বে ব্যবহার করা হয়।

উপরে উল্লেখ করিয়াছি যে, মা-লূর নাম পরিবর্ত্তন করিয়া মা-পু রাখা হইয়াছে। সুতরাং এখন হইতে আমরা তাহাকে মাপু বলিয়া ডাকিব। মাপুর বেশ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার চেহারারও পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। যাহারা তাহাকে পূর্ব্বে না দেখিয়াছে, তাহারা আর তাহাকে কাচিন বলিয়া চিনিতে পারে না, ঠিক যেন একটী খাটী বর্ম্মা বালিকা। প্রত্যহ স্নান করায় এবং সর্ব্বদা তানাখা নামক চূর্ণ (Powder) সর্ব্বশরীরে লেপন করায় তাহার রংও অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার হইয়াছে। নাম ও পোষাক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার চালচলনও পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। আবার পাঠকগণের অবগতির জন্য তানাখা জিনিষটা কি, তাহা বলিতে হইল। ব্রহ্মদেশের পাহাড়ে এবং জঙ্গলে এক বৃক্ষ জন্মে, সেই বৃক্ষের ছাল ও কাষ্ঠ-চূর্ণই তানাখা। ইহা চন্দনের মত সুগন্ধ-বিশিষ্ট না হইলেও শ্বেতচন্দনের সঙ্গে ইহাকে তুলনা করা যাইতে পারে। ইহা চূর্ণরূপে ব্যবহার করা হয় এবং ইহার বাকল ও কাঠ পাটায় ঘষিয়া চন্দনের মত ব্যবহার করা হয়। প্রতি বাড়ীতেই চন্দনের পাটার মত পাটা আছে এবং যাহাদের বাটীতে বালিকা এবং অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোক আছে, তাহাদের বাড়ীতে সর্ব্বদাই ইহা ঘষিয়া মজুত রাখা হয়। শিশুকাল হইতে বর্ম্মিণীগণ বালিকাগণের গায়ে এই তানাখা মালিশ করিতে থাকে এবং বৃদ্ধ কালে সেই মালিশের বিরাম হয়। ইহারা বলে যে, তানাখা লেপন করিলে শরীরের বর্ণ সুশ্রী হয় এবং নানা প্রকার চর্ম্ম-রোগ আরাম হয়। বর্ম্মিণীগণ কোথাও বাহির হইলে হইতে ইহা মুখে না লেপিয়া কোথাও যায় না। বাস্তবিক ইহা দালানের চূণকামের মত। চূণের প্রলেপ না থাকিলে যেমন দালানটী সুন্দর দেখায় না, ইহাদের মুখে তানাখা না দিলে তাদৃশ সুন্দরী বলিয়া বোধ হয় না।

মা-শোয়ে মাপুকে লেখাপড়া শিক্ষার জন্য ব্যস্ত হইল। তাহাকে মঙ্গলা চাঁও বা মঙ্গল টোলনামক ফুঁঙি চাঁয়ের পাঠশালায় লইয়া গিয়া তথায় তাহাকে ভর্ত্তি করাইয়া দিল। কারণ ব্রহ্মদেশে সাধারণ লোকের মধ্যেও লেখাপড়ার খুব চলন, এমন কি, গাড়োয়ান ও কুলি মজুর প্রভৃতি সকলেই অল্পাধিক লিখিতে পড়িতে পারে। বাল্যকালে লেখাপড়া না শিক্ষা করা একটা দোষের কার্য্য। মা-পুর পক্ষে এই পাঠাভ্যাস প্রথমত অতি কষ্টদায়ক হইল, সে মাঝে মাঝে পাঠশালা হইতে পালাইয়া গিয়া অপর বালিকাগণের সঙ্গে খেলা করিয়া দিন কাটাইয়া বাড়ী ফিরিত। মা-শোয়ে তাহা জানিতে পারায়, কয়েকবার বেশ উত্তম মধ্যম দেওয়ায়, তাহার পাঠাভ্যাসের প্রতি মনোযোগ আকর্ষিত হইল। সে ক্রমে নানা

থাকেন। * ব্রহ্মদেশে আবদুল রহিম বাবু কগুলা বাবু সচরাচর শুনা যায়।

বালক বালিকাগণের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া বেশ উৎসাহের সঙ্গে লেখাপড়া করিতে লাগিল। সে এখন আপন ইচ্ছায় পাঠশালায় যাইতে আরম্ভ করিল, যদি কোন কার্য্যোপলক্ষে মা-শোয়ে তাহাকে কোন দিন পাঠশালায় যাইতে নিষেধ করিত, সে তখন তাহা মানিত না। কিছুতেই সে বাটীতে থাকিতে রাজি হইত না। মা-পু এখন বর্ম্মা কথা বেশ শিখিয়াছে। আচার ব্যবহার ও আদব কায়দা, কথা বার্ত্তায় আর কেহ তাহাকে বলিতে পারেনা যে সে কাচিন। মা-পু এখন মহাসুখী। লেখাপড়া বাদেও সে এখন নানা শিল্প কার্য্য শিক্ষা করিতে লাগিল। সেলাইয়ের কার্য্যে এবং উলের কার্য্যে এখন তাহার পটুতা প্রকাশ পাইতে লাগিল। গৃহকার্য্যেও সে মাশোয়েকে সময় সময় সাহায্য করিতে লাগিল। ময়ূর শাবক ছোট বেলায় দেখিতে কদর্য্য থাকে, তখন একটী কুক্কুট শাবকে ও ময়ূর শাবকে বড় পার্থক্য থাকে না, কিন্তু যতই বড় হইতে থাকে, তাঁহার অঙ্গের গঠন ও শরীরের চাকচিক্য বৃদ্ধি হইতে থাকে। আমাদের মা-পুকে ময়ূর শাবকের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। বাল্যবস্থায় কাচিনের মত সে এক ময়লা কদর্য্য জন্তু বিশেষ ছিল, এখন তাহার বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানা যত্নে ও পরিচ্ছদের শোভায় তাহার রূপ লাবণ্য ক্রমে বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সে এখন পনের বৎসর অতিক্রম করিয়া ষোল বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। কিছু দিন হইল সে পাঠশালায় যাওয়া পরিত্যাগ করিয়াছে। সে এখন ষোল কলায় পূর্ণ। পাঠশালা পরিত্যাগ করিয়া মা-পু এখন ব্রহ্মদেশী রীতি অনুসারে দোকান পাতিয়া বসিয়াছে। তাহার দোকান রাস্তার ধারে। দোকানে বর্ম্মা ও বিদেশী চুরুট, নানা ফল, এবং পান সুপারিরই আমদানি দেখা যায়।

প্রতি দিন অপরাহ্নে সে বেশ বিন্যাসে ব্যস্ত থাকে। মা পুর মাথার কেশ খুব লম্বা না হইলেও তাহা গোছে মোটা। পরচুলার সাহয্যে সেই কেশগুচ্ছ দ্বারা মস্তকের শির্ষভাগে দোলমঞ্চ সদৃশ এক বৃহৎ খোঁপা বাঁধিয়া, অর্দ্ধ বৃত্তাকৃতি হাড়ের চিরুণী এক খানা তাহাতে সংলগ্ন করা হয় এবং তাহার খোঁপার দক্ষিণ পার্শ্বে নানা কৃত্রিম ও স্বাভাবিক ফুলের গুচ্ছ শোভা পায়। মুখে তানাখা লেপন করিয়া, গাত্রে এক কাল সাটিনের জামা পরিয়া, পরিধানে রেশমি থামেন, গলায় রেশমি রুমাল এবং পায়ে লাল মকমল আচ্ছাদিত চটিজুতা পরিয়া, যখন মা-পু যুবতীসুলভ গর্ব্বে দণ্ডায়মান হইয়া একবার দর্পণের মধ্যে আপন চেহারা দেখিতে থাকে, আবার পায়ের দিকে ও কোমরের দিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া কোথায় কি ত্রুটি আছে, তাহার ইনস্পেক্‌শন করিতে থাকে, তখন বাস্তবিকই সে দৃশ্য চিত্তাকর্ষক। মসি-দ্বারা ভ্রুযুগল কাল করিয়া তাহাদের শোভা আরো বৃদ্ধি করা হয়। মাপুর গহনা বিশেষ কিছু নাই। হাতে দুগাছা সোণার বালা এবং কাণে দুইটী সোণার নাডাউ বা ইয়ারিং। গলায় কিছুই নাই। হাতের অঙ্গুলিতে একটী রুবির আঙ্গটী মাত্র।

মাপুর শরীরের বর্ণ উত্তম গৌরবর্ণ, দেহ মধ্যমাকার, চক্ষের উপরপাতা দুইটী কিঞ্চিৎ স্ফীত, নাসিকার মধ্যভাগ কিঞ্চিৎ চাপা হইলেও তাহার অগ্র ভাগ মোটা নহে। চক্ষু দুইটী সম্পূর্ণ গোলও নহে, আকর্ণ লম্বাও বলা যায় না, মাঝামাঝি এক প্রকার।

কোমর সরু। মূল কথা, মাপু খুব প্রথম শ্রেণীর সুন্দরী না হইলেও, সুন্দরীর হাটে সে আসন পাইবার যোগ্যা। মাশোয়ের চক্ষে কিন্তু মাপুর মত সুন্দরী তৎকালে ভামোতে ছিল না, মাপু প্রতি দিন নিয়ম মত ঐ প্রকার বেশ বিন্যাশ করিয়া হেলিতে দুলিতে এবং পথিকের প্রতি কটাক্ষপাত করিতে করিতে ধীরে২ আপন দোকানে গিয়া উপবেশন করে। মাশোয়ে পূর্ব্বাহ্ণেই দোকানটী সাজাইয়া রাখে। মাপু বসিয়া সুদীর্ঘ সেলাই (চুরট) টী টানিতে থাকে এবং উভয় পার্শ্বের সমবয়স্ক দোকান-দারগণের সঙ্গে নানা খোষগল্প করিতে থাকে। মাপু এখন ভুল ক্রমেও তাহার দাদার কথা মনে করে না।

কুমারী ও যুবতীগণের দোকান করা ব্রহ্মদেশের একটা জাতীয় ফ্যাশন বা রীতি। সমস্ত ব্রহ্মদেশের সহরে সহরে এই কুমারী ও যুবতীগণের দোকান আছে। কেহ সেলাইর কল চালাইয়া অর্থ উপার্জ্জন করে, কেহ কাপড়ের দোকান করে, কেহবা মনোহারী দোকান খুলিয়া বসিয়া আছে। যত প্রকার বেচা কেনা,তাহাতে বাজারে পুরুষ দোকান-দার বিশেষ দেখা যায় না। এইত গেল সাধারণ দোকানদারের কথা। আবার আর এক দল যুবতীগণ, যাহাদের অর্থের বিশেষ অনাটন নাই, কিম্বা যাহাদের বড় দোকান করিবার মূলধন নাই, তাহারা দুই চারিটী ফল ফুলারি ও চুরুট লইয়া আপন বাটীর সম্মুখে সামান্য একটী দোকান খুলিয়া বসিয়া থাকে। ইহারা নৈশবাজার করিয়া থাকে। বেলা ৪টা কি ৫টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত ইহারা এই দোকানে থাকে। খুব সম্ভ্রান্ত বা উচ্চরাজ কর্ম্মচারিগণের কন্যাদের এরূপ দোকান করিতে দেখা যায় না। মাপুও নৈশ বাজার করিয়া থাকে। এইরূপ দোকান করা স্ত্রীলোকদিগের একটী গুণের মধ্যে গণ্য।

ব্রহ্মদেশের সর্ব্বত্রই দেখা গিয়াছে যে, যুবতীগণের দোকানে পাঞ্জাবী সেপাহী-গণের অত্যন্ত ভিড় হইয়া থাকে। এই সকল সেপাহীগণের মধ্যে পাঞ্জাবী মুসলমান ও পাঠানগণের কথাই বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। ইহারা যেখানেই যুবতীগণের দোকান দেখিতে পায়, তথায়ই নানা দ্রব্য খরিদের ভাণ করিয়া দোকান ঘেরিয়া বসে। ইহাদের অনেকে ভাল বর্ম্মা কথা জানে না। সুতরাং ভাঙ্গা ভাঙ্গা বর্ম্মা কথায় সুন্দরী-গণের সঙ্গে নানা অবৈধ প্রেমালাপ করিতে থাকে। বর্ম্মিণীগণ এইজন্য পাঞ্জাবীগণকে দুই চক্ষে দেখিতে পারেনা। কোন সেপাই হয়তঃ একটু গল্প করিবার মানসে এক আনার জিনিস দুই আনা দিয়া খরিদ করে। বর্ম্মিণীগণ ইহাদের বেয়াদবি দেখিলে "হে কালা খোয়ে, তোয়া তোয়া" বলিয়া গালি দেয়? ইহার অর্থ এই যে "হে বিদেশী কুত্তা, দূর হও"। সেপাহীগণ কিন্তু নিতান্ত নির্লজ্জ, তাহারা গালি খাইয়া হাসিতে হাসিতে অন্য দোকানে গিয়া উৎপাত আরম্ভ করে।

বর্ম্মারা ভারতবাসীকে "কালা" বলিয়া উল্লেখ করে। "কালা" শব্দটী অনেক সময় অবজ্ঞার্থে ব্যবহার করিয়া থাকে। "কালা" শব্দ আমাদের দেশের লোকে সচরাচর বর্ণবাচক বলিয়া বুঝিবেন। ভারত-বাসীর বর্ণ কাল বলিয়া"কালা' শব্দ ব্যবহার করে না। বর্ম্মা ভাষায় "কালা" শব্দ লিখিতে হইলে "কু-লা" লেখে এবং বলিবার সময় কথাটা "কু-লা" না বলিয়া "কালা" বলিয়া

থাকে। কু শব্দের অর্থ সাঁতার দেওয়া, এবং লা শব্দের অর্থ আইসা বা আইসে। কু-লা শব্দের অর্থ, যে সাঁতরাইয়া আইসে এবং তাহা হইতে অর্থ হইয়াছে, যে সমুদ্র পার হইয়া আইসে। এই বিষয়ে এই কিম্বদন্তী আছে যে, যখন সমস্ত ব্রহ্মদেশ বর্ম্মা রাজার অধীন ছিল, তখন সমুদ্রে পর্ত্তুগীজদিগের এক খান জাহাজ ডুবিয়া যায়। সেই জাহাজের কয়েক জন লোক সাঁতারাইয়া ব্রহ্মদেশের সমুদ্র তীরে উপস্থিত হয়। সেই সকল লোককে বর্ম্মারা প্রথম "কুলা" বা কালা আখ্যা দিয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে সমুদ্র পার হইয়া যত বিদেশী ব্রহ্মদেশে আইসে, সকলকেই কালা বলে। বর্ম্মা রাজার সময় সমস্ত ইংরেজ ফরাসী প্রভৃতিকেও ইহারা কালা বলিত। এখন পল্লী গ্রামের বর্ম্মারা কথায় কথায় বলিয়া থাকে, কালা এ দেশে আসিবার পুর্ব্বে আমাদের এরূপ অবস্থা ছিল না। তাহার অর্থ, ইংরেজ আসিবার পূর্ব্বের সময় বুঝায়। কিন্তু এখন এই শব্দটী কেবল ভারতবাসীর স্কন্ধে চাপিয়াছে। সাহেবগণ বা চীনাগণ বর্ম্মাদের সঙ্গে কথা বার্ত্তায় ভারতবাসীর কথা উল্লেখ করিতে হইলে কালা বলিয়া উল্লেখ করেন। ক্রমশঃ।

শ্রীরামলাল সরকার।

মহামিলনের ক্ষেত্রে।

"মিলিত হইলে আমরা উত্থিত হই, বিভক্ত হইলে আমরা পতিত হই" এই সাধু বাক্যের সুফল কি ব্রাহ্মসমাজে এবং এদেশে ফলিবে না? ব্রাহ্মসমাজ এবং এদেশ একত্রিত হইয়া আবার কি দিগ্বিজয়ে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইবে না? আবার কি ভাই ভাই মিলিত হইয়া জগৎকে স্তম্ভিত করিবে না? বহু সদাশয় এবং সহৃদয় ব্যক্তি আমাদিগকে এই প্রশ্ন করিয়া থাকেন। আমরা তাঁহাদিগকে বলিয়াছি এবং বিশ্বাস করি, যে ব্রাহ্মসমাজ জগৎকে একতায় বদ্ধ করিবে, সে ব্রাহ্মসমাজ বহুদিন আর বিভক্ত থাকিতে পারে না, নিশ্চয় বিভক্ত থাকিবে না। এমন দিন নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, যখন সকল সমাজ একতায় আবদ্ধ হইয়া আবার মাতিয়া উঠিবে। সেই আদর্শ এদেশে একতা ও মহাপ্রাণতার এক মধুর যুগ উপস্থিত করিবে।

এমন এক সময় ছিল, যখন মত-সংঘর্ষণের তীব্রতায় সকলে অস্থির হইতেন। প্রথম যখন এদেশ ওদেশ, এ সমাজ ওসমাজের পাত্র পাত্রীর মধ্যে বিবাহ হইল, তখন আমরা সাদরে মত দিয়া বিধাতার নিকট বিশেষ প্রার্থনা করিয়াছিলাম। সেই সূত্র ধরিয়া ক্রমে দুই সমাজ, দুই সমাজে কেন, তিন সমাজে অনেক বিবাহ হইয়া গিয়াছে। মহর্ষির পরিজনের সহিত ব্রহ্মানন্দের পরিজনের বৈবাহিক সম্বন্ধ হইয়া গিয়াছে:— ব্রহ্মানন্দের কন্যার সহিত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পাত্রের বিবাহ হইয়াছে, প্রচারকগণের পুত্র কন্যাগণও অন্য সমাজের পাত্রীপাত্রের সহিত পরিণীত হইয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ভূতপূর্ব্ব সভাপতির কন্যার সহিত নববিধান সমাজের পাত্রের পরিণয় হইয়াছে। আরো কত কত মধুর সম্বন্ধ হইয়া গিয়াছে, দিন দিন আরো হইবার আয়োজন হইতেছে। আদি ব্রাহ্মসমাজে আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মের সংখ্যা কম, কিন্তু যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের কন্যা সকল

অবাধে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে পরিণীতা হইয়াছেন। এইরূপে দেখা যাইতেছে, বৈবাহিক সম্বন্ধ দ্বারা ভিন সমাজ ক্রমে ক্রমে ঘনিষ্ঠ হইতে ঘনিষ্ঠতর হইয়া আসিতেছে। ব্রাহ্ম সমাজের লোক সংখ্যা অতি অল্প, মুষ্টিমেয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহাদের মধ্যে আবার দূরত্ব রাখিলে, দূরত্ব থাকিলে সমাজের নিশ্চয় অধোগতি হইবে। বিধাতার কৃপায় অনেক সঙ্কীর্ণতা চলিয়া গিয়াছে—এখন স্থির এবং ধীরভাবে শান্তির রাজ্যে অগ্রসর হইবার জন্য সকলে প্রয়াসী হইতেছেন। এখনও যে সঙ্কীর্ণতা আছে, আমাদের বিশ্বাস, অচিরে তাহা বিদূরিত হইয়া যাইবে।

হিন্দুসমাজ জাতিভেদের প্রাচীর দ্বারা আবদ্ধ থাকায়, বিবাহের সম্বন্ধ অতি সঙ্কীর্ণ স্থানে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। পাল্টাপাল্টি কুটুম্বিতায় এ দেশ ডুবিয়া গিয়াছে। তাহার অতি শোচনীয় ফল ফলিয়াছে। রক্ত-নির্ম্মাল্যের অভাবে বঙ্গদেশের উচ্চ-জাতি-সাধারণ ক্রমেই ধ্বংসের পথে চলিয়াছে,—দিন দিন তাহাদের সংখ্যা হ্রাস হইয়া যাইতেছে। সকলেরই এবিষয়ে প্রণিধান করা অসঙ্গত।

ব্রাহ্মসমাজে প্রকাশ্য জাতিভেদ নাই বটে, কিন্তু গোপনে নানা প্রকার জাতিভেদের অঙ্কুর দেখা যাইতেছে; এ-সমাজ-ও সমাজ-ভেদ, ধনী-দরিদ্র-ভেদ, জ্ঞানী-মূর্খ-ভেদ, এ সকল বাদে, হিন্দুসমাজের আবাহমান-প্রচলিত বর্ণভেদগত জাতিভেদ ও সংক্রামিত হইতেছে। এ সকলের মূলোচ্ছেদ না করিতে পারিলে সঙ্কীর্ণ স্থানে আদান প্রদান চলিতে থাকিবে, এবং হিন্দুসমাজের শোচনীয় শ্রেষ্ঠ২ বংশ-ধ্বংসের পৌনঃপুনিক অভিনয় ব্রাহ্মসমাজকেও গ্রাস করিবে। এ জন্য প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিকে আমরা সতর্ক হইতে অনুরোধ করিতেছি। মিলন—মহা মিলন এ দেশের উন্নতিপ্রয়াসী সর্ব্ব শ্রেণীর একমাত্র মূল মন্ত্র হওয়া উচিত।

যে কারণে এই ভেদবোধের অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহার ধারাবাহিক ইতিহাস আমরা লিখিতে চাই না। কোন্ সমাজের কি দোষ, তাহারও উল্লেখ করিতে চাহি না। মতগত পার্থক্য থাকা, বিধাতার বিশেষ নিয়ম। সৃষ্টির সৌন্দর্য্যই বৈচিত্র্য—অনন্ত রূপিণী অনন্ত প্রকৃতিতে প্রকাশিতা। সকলই ভিন্ন ভিন্ন, সকলই বিশেষত্বময় নবভাব সম্পন্ন, এক-রূপ-সম্পন্ন কিছুই সৃষ্টিতে দেখিতে পাইবে না। পিতা শ্রেষ্ঠ, কি মাতা শ্রেষ্ঠ? আপন২ বিশেষত্বে সকলেই শ্রেষ্ঠ। এক মায়ের দশটী সন্তান দশ প্রকার। সময়ের তারতম্যে, বয়সের তারতম্যে, শিক্ষার তারতম্যে—এক মা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শোভা-রুচি-মতি-গতি সম্পন্ন বিভিন্ন সন্তান উৎপন্ন করিতেছেন। এই রূপ বিধান সৃষ্টির সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন রুচি-মতি-গতি-বিশিষ্ট হইলেই কি সকল ভাই—পর পর? এক মায়ের সকল সন্তান যেমন প্রাণের ভাই, বিশ্বপতি পরম পিতার সকল সন্তান কি সেইরূপ প্রাণের ভাই নহে? ব্রাহ্মজীবনের লক্ষ্য—সকল জীবজন্তু, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ, নরনারী সকলকে আপন করিয়া লইবে; সকলের ভিতর বিশ্বব্যাপী অনন্তের স্বরূপাভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইবে। আর যাহারা এক ঈশ্বরের সেবক, উপাসক, তাহারা ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হইয়া থাকিবে? সকল সাধনাই সীমাবদ্ধ স্থান হইতে আরম্ভ হয়, পিতামাতা, স্বামী স্ত্রী, সহোদর সহোদরার সীমাবদ্ধ ভালবাসা হইতে অনন্ত প্রেম

সাধনা যেমন আরম্ভ হয়, সেই রূপ, সীমা-বদ্ধ এক সমাজস্থ নরনারীর সেবা, পরিচর্য্যা, ভালবাসার সাধনা হইতে বিশ্ব-প্রেম-সাধনা আরম্ভ হওয়া উচিত। উহার এই দোষ, তাঁহার এই দোষ, এই সকল গরলপূর্ণ নিন্দা পরিত্যাগ করিয়া, ভাই, তুমি নিজের দোষ নিজে অনুধ্যান করিয়া আপনি সংশোধিত হও না কেন? আমরা প্রত্যেকে যদি আপন আপন দোষ সংশোধন করি, তবে কি সমাজের সকল লোক ভাল হইতে পারে না। আমরা যদি অন্য সমাজের নিন্দা না করিয়া, আপন সমাজের দোষ সংশোধন করি, তবে কি দেশের মঙ্গল হয়না? অন্য কথা—এক পরিবারে যাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে যেমন বিধাতার বিশেষ বিধান বিদ্যমান, এক সমাজে যাহারা আসিয়াছি, তাহাদের মধ্যেও কি, সেইরূপ, বিধাতার বিশেষ বিধান বিদ্যমান নাই? সর্ব্বদেহের হস্ত পদাদির কাহাকেও যেমন বাদ দিয়া জীবন ধারণ করা অসম্ভব, সমাজস্থ, পরিবারস্থ, কাহাকেও বাদ দিলে, সেইরূপ, সমাজ বা পরিবারের মঙ্গল নাই। হাত যদি বলে, পায়ের দরকার নাই, পা যদি বলে মুখের দরকার নাই, তাহা যেমন অযৌক্তিক; আমি যদি বলি, তোমার দরকার নাই, এবং তুমি যদি বল, আমার দরকার নাই, তাহাও, তেমনই, অযৌক্তিক, অসার কথা। যেখানে যাহার প্রয়োজন, বিধাতা সেখানে তাহাই সৃজন করিয়াছেন; পরিবারে, সমাজে যেখানে যে সময়ে যাহার প্রয়োজন, সেখানে সে সময়ে তাহারই আয়োজন করিয়াছেন। কাহাকেও তুচ্ছ করিলে, পরিত্যাগ করিলে বিধাতার বিধানকে অগ্রাহ্য করা হয়। এইরূপ, পরস্পরকে অগ্রাহ্য করিয়া চলাতেই সমাজের ও দেশের অধোগতি হইয়াছে। ঢের হইয়াছে—আর না। এখন সকলে সতর্ক হউন। আমরা নিঃসন্দেহে লিখিতেছি. যে মতগত পার্থক্য আছে, তাহা মারাত্মক নহে, বিভিন্ন প্রকৃতিক লোকের মধ্যে তাহা থাকিবেই, তাহাতে কিছুই আসিয়া যাইবে না। এখন সকলে সকলের মনোমালিন্য দূর করিয়া সম্মিলন ক্ষেত্রে এক হইয়া দণ্ডায়মান হউন। সকল সমাজ এবং সমগ্র দেশ একতায় আবদ্ধ হইয়া যাক্।

ধনী-দরিদ্র-ভেদ — সকল সাধক বলিয়া গিয়াছেন, ধন যেখানে, ধর্ম্ম সেখানে থাকিবে না। এ কথা সত্ত্বেও ব্রাহ্মসমাজ সকলকে একাকার করিবেন, এই মহাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা অতি কঠিন সাধন। ধনীর পদলেহন করা অন্যায়, তাহা স্বীকার করি, দরিদ্রের প্রতি ধনীর ঘৃণা আরো অন্যায়। ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ এই—ধনী ধনৈশ্বর্য্যের মধ্যে থাকিয়াও সাধন বলে নির্লিপ্ত, অনাসক্ত থাকিবেন, বিষয়-স্পৃহাকে বিষের ন্যায় পরিত্যাগ করিবেন, নিজ অর্থ অভাবগ্রস্তের অভাব-মোচনে ঢালিয়া দিবেন, এবং অন্তরে গভীর বৈরাগ্য-যোগে যুক্ত হইয়া মনে করিবেন, এ সংসার দু দিনের, সব পড়িয়া থাকিবে, কিসের মান অভিমান? যদি তাহা না পারেন, ধিক তাহার অর্থে। আর দরিদ্র—দারিদ্র্য-সংগ্রামে প্রপীড়িত হইয়াও মনে করিবেন,—সুখ দুঃখ সব সমান, কেবল ধর্ম্ম সাধনই সার, তাহাতেই মজিয়া যাইবেন; এবং ধনীর পদলেহনের জন্য ধনীর নিকটস্থ হইবেন না, ধনী-দরিদ্র সকলের ভিতরে ব্রহ্ম-স্ফূর্ত্তি দেখিয়া চিন্ময়ের দাসত্বে নিমগ্ন হইবেন। ধনী কে, দরিদ্রই বা কে? ধনীও তাঁহার সৃষ্ট, দরিদ্রও

তাঁহার সৃষ্টি। তাঁহারই ইঙ্গিতে কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র। তিনিই সকল ঘটে বিদ্যমান। ধনী দরিদ্র তাঁহারই বিধানের দুইরূপ,—দয়া চরিতার্থ করিবার সুন্দর-ক্ষেত্র। যে কয়দিন তাঁহার ইচ্ছা, তাহার অতীত এক দিনও আমরা এ সংসারে থাকিতে পারি না। তবে কিসের অহঙ্কার বা কেন বা ঘৃণা? সব কি সমান নয়? বিধাতার ইচ্ছায় কেহ দান করে, কেহ গ্রহণ করে, ইহার মধ্যে ভেদ কোথায়? ঐ মৃত্যুর দিনে সব কি একাকার নয়? যে দিয়াছে, সেও মরিতেছে, যে নিয়াছে, সেও মরিতেছে। সকলেরই গতি এক, লক্ষ্য এক; তবে কেন আর ভেদাভেদ-বোধ? কেনবা, পরিত্যাগের শাস্ত্র? কেন বা মনোমালিন্যের বেদ? এক হও, এক হও, এক হও,—এক ধ্যান, এক জ্ঞানে মত্ত হও। বিধাতা ধনীকে ধনের বোঝা বহিতে দিয়াছেন, তিনি তাহা বহিতে থাকুন, দান করিতে থাকুন; দরিদ্রকে দুঃখ কষ্টের বোঝা বহিতে আদেশ করিয়াছেন, তাহা বহিতেই হইবে। কিন্তু এ সকলের কিছুই মানুষের লক্ষ্য নয়—এ সকলই এই সংসারের জিনিস, সংসারেই পড়িয়া থাকিবে। এই সকল অবস্থার ভিতরে চিন্ময়ের বিধান দেখিতে দেখিতে একাকারের রাজ্যে, এস ভাই, আমরা চলিতে অভ্যাস করি। অহঙ্কার বা ঘৃণা, তিরস্কার বা পুরস্কার, যশ বা প্রশংসা—সব সমান হইয়া যাক্, আমরা সব আসক্তি বা বিরক্তি নির্ব্বাণ করিয়া কেবল তাঁহার পুণ্যময় নাম গাইতে গাইতে, পুণ্যময় হইয়া একে যুক্ত, একে লিপ্ত, একে লীন, একে ক্ষীণ, একে নির্ব্বাপিত, একে সমাপ্ত হইয়া যাই;—পড়িয়া থাকুক, কেবল তাঁহার অক্ষয় ধর্ম্ম। এই এক মন্ত্রে আবার ব্রাহ্ম-সমাজ, এবং তৎসঙ্গে ভারতবর্ষ জাগিয়া উঠুক।

জ্ঞানী-মূর্খ-ভেদ।—দশ বিশখানা পুস্তক কণ্ঠস্থ করিয়া যিনি মনে করেন যে, তিনি বড় পণ্ডিত, তাঁহার কি ভ্রান্তি! নিউটনের ন্যায় মহাজ্ঞানী যখন মনে করিতেন,—অনন্ত জ্ঞান-সমুদ্র সম্মুখে, তিনি তীরে বসিয়া উপল খণ্ড সংগ্রহ করিতেছেন মাত্র, কিছুই তাঁহার জ্ঞানপ্রাপ্তি হয় নাই; তখন, তুমি আমি কি আর জ্ঞানের বড়াই করিব? ছি, উহা কি শোভা পায়? বিধাতা প্রতি জনকেই অনবরত শিক্ষা দিতেছেন, যাহার যে শিক্ষার প্রয়োজন, সেই শিক্ষা দিতেছেন। পুস্তক না পড়িয়াও ঈশা মহাজ্ঞানী হইয়াছিলেন, সে দিন দেখিয়াছি, কলেজে না পড়িয়াও রামকৃষ্ণ পরমহংস কি মহাজ্ঞানের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। সাধনার রাজ্যের প্রাপ্ত বস্তু যিনি আত্মস্থ করিতে না পারেন, তাহার সকল শিক্ষা ব্যর্থ। গাধার শর্করা বহনের ন্যায়, পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য তুচ্ছ, যদি তাহা সাধনায় আত্মস্থ না হয়। জ্ঞান কিসের জন্য? স্বর্গে লইয়া যাইবার জন্য। বিধাতাকে পাওয়ার জন্য। জ্ঞান চর্চ্চা করে, অথচ যে বিধাতাকে পায় নাই, তাহার জ্ঞানের পুরস্কার বা গরিমা কি? তাহা অসার, তাহা তুচ্ছ। সে জ্ঞান-গরিমা যত শীঘ্র বিলুপ্ত হয়, ততই মঙ্গল। ব্রাহ্মসমাজ—সাধন-ক্ষেত্র;—সাধন-ক্ষেত্রে সকলের বিশেষত্ব স্বীকার করিয়া কেবল চরিত্রেরই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করা উচিত। জ্ঞানী মূর্খের তারতম্য, প্রকৃতপক্ষে কিছু থাকে না—যদি মূর্খ না পড়িয়াও ব্রহ্মজ্ঞান পায়, এবং জ্ঞানী পড়িয়াও ব্রহ্মজ্ঞান না পায়। মূর্খ ব্রহ্ম-জ্ঞান পাইলে না পড়িয়াও জ্ঞানী, আর

জ্ঞানী ব্রহ্ম-জ্ঞান না পাইলে, অনেক পড়িয়াও চির মূর্খ। ঐরূপ ভেদাভেদ-বোধ কখনও মনুষ্য-হৃদয়ে বদ্ধমূল হইতে দেওয়া উচিত নয়; সাধন-রাজ্যে সকলের বিশেষত্ব স্বীকার করিয়া, সাধন-শ্রেষ্ঠত্বে সকলের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা উচিত; এবং সকল অহঙ্কার এবং ঘৃণা বিদ্বেষ পরিহার করিয়া দিগ্বিজয়ী সাধনমন্ত্রে দীক্ষিত হওয়া উচিত।

বর্ণ-ভেদগত-জাতিভেদ। বর্ণগত জাতিভেদ এ দেশের কি সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে,সকলেই জানেন। সুতরাং সে সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনার প্রয়োজন নাই। সুখের বিষয়, আহার বিহারে বর্ণগত জাতিভেদ আর বড় একটা লক্ষিত হইতেছে না, যাহা আছে, কেবল আদান প্রদানে। আদান প্রদানে যে জাতিভেদ আছে, তাহা উঠিয়া না গেলে, ভারতে বলবীর্য্যসম্পন্ন নব জাতির উত্থান সম্ভব হইবে না। আমাদের বিশ্বাস, রক্ত-মিশ্রণ ভিন্ন প্রকৃত সম্মিলন অসম্ভব। প্রতি দেশের যেমন কতকগুলি বিশেষত্ব আছে, প্রতি জাতির মধ্যেও, সেইরূপ, কতকগুলি বিশেষত্ব আছে। বাণিজ্যের দ্বারা যেমন দেশে দেশে মহামিলনের সূত্রপাত হয়, পণ্য দ্রব্যের বিনিময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রতি জাতির বিশেষত্বের বিনিময় হয়, সেই প্রকার, রক্ত-মিশ্রণের দ্বারা এক জাতির বিশেষত্ব অন্য জাতিতে সংক্রামিত হয়। পরস্পরের গুণ গ্রহণে পরস্পরের উন্নতি হওয়া অপরিহার্য্য। অন্যের মহত্ব নিজের মধ্যে সংক্রামিত না হইলে, বদ্ধজলের ন্যায়, উন্নতি-স্রোত বদ্ধ হইয়া পঙ্কিল আকার ধারণ করে। মিলন ভিন্ন জাতি-সাধারণের উন্নতি সুদূর-পরাহত। এই জন্য আমরা মহামিলনের একান্ত পক্ষপাতী। এ জাতি সে জাতি, এ দেশ সে দেশ—সকলের সহিত ঘনিষ্ঠ সূত্রে আবদ্ধ হইতে হইবে; রক্তে রক্তে মিলিয়া যাইতে হইবে। নচেৎ এদেশে জাতীয়ত্বের উদয় হইবে না। অনেকে এখন বঙ্গ, উৎকল, বেহার, বোম্বে, পঞ্জাবকে পৃথক পৃথক করিয়া দিতে চাহেন। গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা,ভেদনীতির শৃঙ্খলে এ দেশকে আবদ্ধ করিয়া সকল উন্নতির স্রোত রুদ্ধ করিবেন; এজন্য বিভাগ-নীতির মহা অস্ত্র শাণিত করিতেছেন। হায়, আমাদের দেশের কোন২ শিক্ষিত লোকও এমনই আত্মহারা যে, এই ভেদনীতির গূঢ়মর্ম্ম ভেদ করিতে না পারিয়া, আপন আপন দেশ লইয়া মত্ত হইয়া উঠিতেছেন। এই দারুণ দুঃসময়ে, আমাদের একান্ত উচিত যে, সকল বিবাদ বিসম্বাদ দূরে নিক্ষেপ করিয়া—সকলে এক হই। কাহার মধ্যে মহত্ব নাই, বলত? কোন্ জাতি মহত্বে হীন বল ত? কোন্ দেশ নিকৃষ্ট, বলত? সকলই বিধাতার সৃষ্টি, সকলের মধ্যেই বিশেষত্ব আছে। সে মহা অন্ধ, যে নিজের মহত্বে আত্মহারা হইয়া অন্যের মহত্ব দেখিতে কুণ্ঠিত। সে-ই প্রকৃত চক্ষুষ্মান, যে আপনার দোষ এবং অন্যের মহত্ব সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে পারে। অন্যের মহত্বানুপ্রাণন ভিন্ন মনুষ্যের মহত্বের উদয় হয় না। দোষ ত্রুটী দেখিতে হয়ত, নিজের দোষ ত্রুটী দেখ;—মহত্ব স্মরণ করিতে হয়ত, অন্যের মহত্ব স্মরণ কর। এই নীতির মধ্যে মহা মিলনের বীজমন্ত্র নিহিত। প্রেমের মূল মন্ত্র—আত্ম-বিসর্জ্জন। আপনাকে ভুলিতে না পারিলে, অন্যকে কখনও হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। হায়, কবে আমরা অহং ভুলিয়া পরকীয় শক্তিতে অনুপ্রাণিত

হইতে পারিব, কবে, অন্যের মহত্ত্বের অনুপ্রাণনে প্রকৃত মহত্ত্বে উন্নীত হইতে পারিব! বর্ণভেদ আর কিছুই নয়—উহা বিধাতার বিশেষত্বের নিদান। প্রতি জনকে বিশেষত্বে ভূষিত করিয়া বিধাতা পরস্পরকে একতার পথে টানিতেছেন। তুমি আমার, আমি তোমার। তোমার বিশেষত্ব আমি লইব, আমার বিশেষত্ব তুমি লইবে। এইরূপে সকলের বিশেষত্বে আকৃষ্ট হইয়া সকলে সকলের সহিত অভিন্ন হৃদয়ে আবদ্ধ হইবে। তুমি জ্ঞানী, আমাকে জ্ঞান দিবে, সে কর্ম্মী আমাকে কর্ম্ম শিখাইবে, ঐ ভক্ত আমাকে ভক্তির পথে লইয়া যাইবে, ঐ প্রেমিক আমাকে প্রেমে মাতাইবে। সকলে পৃথক পৃথক কার্য্য-ক্ষেত্রে, সাধন-ক্ষেত্রে,—আবার মায়ের চরণে সকলে একাকার। এইরূপে মহামিলন হইবে। এই মহামিলনের মহাবীজ রক্ত মিশ্রণে নিবদ্ধ। যদি ঐ মহামিলনে মিলিত হইতে চাও, হে হিতৈষী, তোমাকে জাতিভেদের মস্তকে পদাঘাত করিয়া পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদান করিতেই হইবে। যদি তাহা না পার, তুমি যতই বড় বড় কথা বল না কেন, যতই সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে ব্রতী হওনা কেন, তোমার সকল কর্ম্ম পণ্ড হইবে, কিছুতেই মহামিলন পাইবে না। মহামিলন ভিন্ন এ দেশের উদ্ধারের আর পথ নাই। যদি মহামিলন চাও, আদান প্রদানের জন্য উদার বক্ষ পাতিয়া দেও।

ব্রাহ্মসমাজ জাতিভেদ তুলিয়া দিবার মহামন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, সাধনায় অসিদ্ধ হইয়া এখন স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া কি যেন ভাবিতেছেন! ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। সংখ্যায় ব্রাহ্মসমাজের শক্তি নয়,—প্রকৃত শক্তি, আদর্শের নির্ম্মাল্যে। আদর্শকে ধারণ করিয়া অল্প সংখ্যক লোকও যদি বীরের ন্যায় অগ্রসর হইতে পারেন, সেই অল্প সংখ্যকের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াই এদেশ আবার জাগিয়া উঠিবে। আর আদর্শকে বিসর্জ্জন দিয়া, বা খর্ব্ব করিয়া লক্ষ লক্ষ লোকও যদি কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করে, তাঁহাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। আমরা কাতর হৃদয়ে সকলের চরণ ধরিয়া মিনতি করিতেছি, মৃত জাতিভেদকে আবার জাগাইয়া তুলিতে কেহ সচেষ্ট হইবেন না। যদি হন, নিশ্চয় লিখিয়া দিতে পারি, এ ভারতের উদ্ধারের আর উপায় নাই।

কেহ কেহ বংশগত মহত্ত্বের কথা তুলিয়া আবার জাতিভেদকে দাঁড় করাইতে বলেন। বংশগত মহত্ত্ব যদি কিছু থাকে, তবে তাহা বিতরণ করিতে, ভাগ করিয়া দিতে আমরা পরামর্শ দেই। উচ্চনীচ জাতিতে আদান প্রদানে প্রথম পুরুষে কোন২ উচ্চজাতির কিছু অনিষ্ট হইতে পারে বটে, কিন্তু উচ্চ জাতির মহত্ত্ব নিম্নজাতিতে সংক্রামিত না হইলে নিম্নজাতির উদ্ধারের আর উপায় নাই। সঙ্কীর্ণতার ন্যায় মিলনের শত্রু আর দ্বিতীয় নাই। সঙ্কীর্ণতাকে বিসর্জ্জন দিয়া, মহা উদার ভিত্তিতে সকলকে দাঁড়াইতে হইবে। স্বার্থত্যাগ, আত্মত্যাগ ভিন্ন কোন সার্ব্বভৌমিক জাতির অভ্যুত্থান হইয়াছে কি? আপন আপন শক্তির মাহাত্ম্য ভুলিয়া উদার সার্ব্বজনিক প্রেমের ক্ষেত্রে সকলে একবার বীরের ন্যায় দণ্ডায়মান হউন, নচেৎ আর উপায় নাই। এই ব্রত পালনে বিধাতা ভারতের সহায় হউন।

উপনিষদ গ্রন্থাবলী। *

[ক্রমে প্রধান প্রধান উপনিষৎ সকল পয়ারাদি চির-প্রচলিত ছন্দে সহজ ভাষায় অনুবাদিত হইলে বঙ্গবাসীর প্রভূত উপকার সাধিত হয়, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া উপনিষৎ গ্রন্থাবলী নাম দিয়া প্রশ্নোপনিষদের মর্ম্মানুবাদ প্রকাশ করিলাম। অন্যান্য উপনিষৎ যথাকালে প্রকাশিত হইবে]

প্রশ্ন।

প্রথম প্রশ্ন।

গার্গ্য † আদি ছয় জন ব্রাহ্মণ তনয়
ব্রহ্মপর ব্রহ্মনিষ্ঠ পবিত্র হৃদয়,
ভাবিলা একদা ;—"ভগবান পিপ্পলাদ
কহিবেন আমাদের ব্রহ্মতত্ত্ব বাদ।"
এত ভাবি সবে হস্তে সমিৎ লইয়া
ভগবান পিপ্পলাদ গোচরে আসিয়া
যাচিলেন ব্রহ্মজ্ঞান প্রণত অন্তরে।
ঋষি কহিলেন, "বৎস, আজি যাও ফিরে।
ব্রহ্মচর্য্য শ্রদ্ধা তপ এক বর্ষ ধ'রে
আচরণ কর গিয়া একাগ্র অন্তরে।
তা'র পর পুনরায় আসিও এস্থানে,
জিজ্ঞাসিও ব্রহ্মবিদ্যা যদি লয় মনে।
আমার থাকিলে জানা কহিব তখন,
তখন তোমরা বৎস, করিও শ্রবণ।"
কাল গতে একদিন আসি কাত্যায়ন
জিজ্ঞাসিলা ঋষিবরে ; "কহ ভগবন্
প্রাণীগণ কোথা হইতে হইল 'উদ্ভব' ?"
পিপ্পলাদ কহিলেন, "শুন বৎস, সব।

প্রজাপতি সংকল্প করিলেন মনে,
"করিব প্রজার সৃষ্টি নিখিল ভুবনে।"
এই দুই আদি সত্ত্বা করিব সৃজন,
এ উভয়ে বহু প্রজা হইবে জনম।'
মনে এই তপ করি প্রজাপতি তবে,
অন্ন (১) আর চৈতন্য সৃজিলেন ভবে।
আদি-ভূত অন্ন নামে হৈল পরিচিত,
চৈতন্য জীবের প্রাণ হইলা কথিত।
আদিত্যই প্রাণ, তিনি বিশ্বের জীবন,
অন্ন হ'তে মূর্ত্ত আর অমূর্ত্ত গঠন।
মূর্ত্ত অমূর্ত্ত সব হৈলা অন্ন হ'তে
অরূপ হইতে রূপ চৈতন্য সহিতে।
আদিত্য প্রবেশি পূর্ব্বে পশ্চিম উত্তরে,
দক্ষিণে, অন্তর (২) দিকে, অধঃ ঊর্দ্ধপরে,
এ বিশ্বের সর্ব্ব স্থল প্রকাশ করিয়া
রশ্মিযোগে সর্ব্বপ্রাণ দেন জাগাইয়া ;
আত্ম মহাপ্রাণ সহ মিশাইয়া তারে।
সর্ব্বপ্রাণে আত্মভূত করেন স্ব-করে।
সে হেতু আদিত্য বিশ্বরূপ বৈশ্বানর,
তিনি প্রাণ ; ঋক্ মন্ত্র ঘোষিছে সুন্দর।

'বিশ্বরূপ অদ্বিতীয় জ্যোতি,
বিশ্বের আশ্রয়, জ্ঞান, মতি,
দীপ্ত রশ্মিমান্ তাপ-ধারী,
প্রাণিভেদে বহুরূপ-ধারী ;—
ঐ উদিছেন বিশ্বপ্রাণ,
এ বিশ্বের চৈতন্য-নিধান।'

সম্বৎসর প্রজাপতি ; উত্তর দক্ষিণ
এ দুই অয়ন তাঁর আছে চিরদিন।

* পৌষসংখ্যায় উদ্ভিদ কি সচলের একস্থানে "জল-জোয়া (Hydrozoa)" এইরূপ লিখিত আছে, উহা "প্রথমজ (Protozoa)" হইবে।

† ভরদ্বাজ, সত্যকাম, গার্গ্য, আশ্বলায়ন, ভার্গব, কাত্যায়ন।

(১) রয়ি।

(২) ঈশান, বায়ু, নৈঋত, অগ্নি কোণ চতুষ্টয়।

ইষ্ট (৩) পূর্ত্ত (৪) সৎকর্ম্ম করেন যাঁহারা।
সবে চন্দ্রলোক লাভ করেন তাঁহারা।
কিন্তু সেই লোক হ'তে পুনঃ আবর্ত্তন
হইয়া তাঁদের হয় আবার পতন।
প্রজাকাম ঋষিগণ প্রজা হেতু সবে
দক্ষিণ-অয়ন-গতি প্রাপ্ত হন ভবে।
পিতৃমান এই রয়ি, কহিলাম সার,
শুন শ্রদ্ধা সহ, বৎস, করিয়া বিচার।
কিন্তু ইষ্টাপূর্ত্ত কিম্বা প্রজার কামনা
ত্যজি, ব্রহ্মচর্য্য শ্রদ্ধা বিদ্যার সাধনা
করিয়া যাহারা করে আত্মা অন্বেষণ,
তা' সবে উত্তরায়নে আদিত্যে গমন।
সূর্য্যলোক পরাগতি, প্রাণের আশ্রয়,
মহান্ বিরাট সূর্য্য অমৃত অভয়।
এ লোকে হইলে গতি নাহি আবর্ত্তন,
ঋক্ মন্ত্রে আছে তার এই বিবরণ।
　'সম্বৎসররূপী সে তপনে
　পঞ্চপাদ, (১) দ্বাদশ আকৃতি (২)
　কহে কালবিৎ সুধী জনে।
　অন্যে তাঁরে সপ্ত চক্র রথী
　কহে, ষট-ধুর-রথাসীন;
　কহে তারে মহান্ প্রবীণ।'
মাসরূপ প্রজাপতি; কৃষ্ণপক্ষ তার'
অন্নের স্বরূপ, প্রাণ শুক্লপক্ষ আর।
কৃষ্ণপক্ষে অন্যে করে মাস অনুষ্ঠান,
শুক্লপক্ষে ঋষিগণ করেন বিধান।
অহোরাত্র প্রজাপতি; অহো প্রাণ তার,
অন্নের স্বরূপ রাত্রি, বুঝ সমাচার।
অন্নই ত প্রজাপতি, তাহা হতে রেত,
তা' হ'তে উদ্ভব প্রাণী, যথা অভিপ্রেত।
ব্রহ্মচর্য্য তপোনিষ্ঠা আছে সেই জনে,
সদা সত্য প্রতিষ্ঠিত যাহাদের মনে,
পবিত্র সরল যারা, মায়া-হীন চিত,
তাহারাই ব্রহ্মলোকে হন প্রতিষ্ঠিত॥
　ব্রহ্মলোকে হন প্রতিষ্ঠিত।
　　ওঁ হরি ওঁ॥
　　ইতি প্রথম প্রশ্ন॥

শ্রীশশধররায়।

বংশী ও প্রেম।

বংশীধ্বনির যে কি সম্মোহনী শক্তি, কি অনির্ব্বচনীয় গুণ, আর তাহাতে যে কি প্রেমপূর্ণ পীযূষধারা ক্ষরিত হয়, তাহা জানিতেন সেই বৃন্দারণ্য-চারিণী, শ্যাম-বিলাসিনী শ্রীরাধা, আর জানিতেন, তাঁহার চির-সঙ্গিনী, বৃন্দাবনের সেই গোপাঙ্গনাগণ। প্রকৃত প্রেমিকা ভিন্ন, এই পবিত্র প্রেম-লীলার, এই মধুর বংশীরবের মর্ম্ম কে বুঝে?

একে শারদীয় কৌমুদী-বিধৌত নিশা, তদুপরি বিকশিত কুসুমনিচয়-সুশোভিত, শ্যামসুন্দর বনরাজি-বিরাজিত তটশালিনী যমুনা, মৃদুল পবন সঞ্চালনে ধীরে ধীরে সঞ্চালিত হইতেছে। জগত নিস্তব্ধ। এমন সময়, প্রকৃতির এই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মনোবিমোহন বংশীধ্বনি উত্থিত হইল, ভাবুকের চক্ষের সমক্ষে, সে ধ্বনিতে যমুনা উজান বহিল, পরম পূত মারুতের ভিতর দিয়া সেই ধ্বনি প্রত্যেক গোপবালার হৃদয়-

(৩) যাগযজ্ঞ।

(৪) জলাশয় খননাদি সৎকর্ম্ম।

(১) ষড় ঋতু মধ্যে হেমন্ত ও শিশিরকে এক গণ্য করা হইত। সুতরাং পঞ্চপাদ।

(২) দ্বাদশ মাস।

তন্ত্রীতে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল! আর কি তাঁহারা স্থির থাকিতে পারেন? কৃষ্ণ-প্রেমানুরক্তা গোপাঙ্গনাগণের মন তখন বংশী-নিঃস্বনে নিতান্ত উদ্বেলিত। গোপপুর-নারীরা অহরহঃ ভগবৎ প্রেমে মাতোয়ারা, তাহাতেই তাঁহারা নিরন্তর আত্মহারা। প্রিয়তম সম্মিলন চিরদিন কল্যাণভাজন। সেই প্রয়াস, অশেষ আশাপ্রদ। সেই আশার আহ্বানের নিকট পতি, পুত্র, আত্মীয় স্বজন বর্জন, অতি অকিঞ্চিৎকর কথা।

গোপীগণের, শ্রীকৃষ্ণ প্রেম বিশুদ্ধ, সেই প্রেমে তাঁহাদের বিশেষ বিশ্বাস ছিল—দৃঢ় আস্থা ছিল। সাত্বিক-প্রেম-বিমূঢ়ের নিকট কিন্তু সেই বিশ্বাস,—সেই আস্থা অপ্রগাঢ়। তদ্ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণ নামে কেমন এক আকর্ষণী শক্তি ছিল। তাঁহার শ্রীমুখের বংশীধ্বনি শুনিলে, ভজন-সাধন-পরায়ণ পথিকের মন একেবারে উচাটন হইত।

প্রেম-বিহ্বলা গোপবালা লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া, আশঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া, একে একে যমুনা পুলিনে আসিয়া উপস্থিত। ভক্ত-বৎসল লীলাময় ভগবান, সহসা তাঁহাদিগকে তথায় অবলোকনে বিস্ময়ের ভাণ দেখাইলেন—আপন ভাব গোপন করিলেন। (সেটী কিন্তু আন্তর ভাব নয়—বাহ্যভাব) ভগবান বলিলেন,—"অয়ি বাম-লোচনাগণ! এই গভীর নিশীথে, পতি পুত্রাদি ত্যাগ করিয়া এখানে কি নিমিত্ত আসিয়াছ? এরূপ সময়ে, এস্থলে তোমাদের আগমন করা যুক্তিসিদ্ধ হয় নাই; অতএব সুমধ্যামাগণ! তোমরা স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন কর।" ভগবান গোপীদিগের হৃদয়-সর্ব্বস্ব; কিন্তু অচ্যুতের ঈদৃশ বাক্যে গোপীগণের ঈষৎ কোপ জন্মিল। তাঁহারা ভগবানের সেই ফুল্লেন্দীবর কান্তি-ইন্দুবদন, বক্রিমভাবে অবলোকন করিতে লাগিলেন। যমুনা জল-সংস্পৃষ্ট শীতল ও মৃদুল পবন সঞ্চালিত পল্লবের ন্যায় অভিমানে তাহারা ধীরে ধীরে দুলিতে লাগিলেন। এইরূপে উপেক্ষিত প্রেমোন্মাদিনী গোপাঙ্গনাগণের হৃদয়, নিদারুণ যন্ত্রণা উপভোগ করিতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ-শ্রীপদে তাঁহাদের সর্ব্বস্ব সমর্পিত ছিল, শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাদের মন প্রাণ। সমস্ত জগৎ তাঁহাদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণময়, কৃষ্ণ ভিন্ন তাঁহারা আর কিছুই জানিতেন না। নিষ্ঠুরতায় কেই বা বিচলিত না হয়? শ্রীকৃষ্ণের কঠোর বাক্য, সুতরাং গোপীদিগের নিতান্ত মর্ম্মাহত করিল। রোরুদ্যমানা গোপাঙ্গনারা কাতরকণ্ঠে বলিলেন,—"সর্ব্বমঙ্গলময় মাধব! আজ তুমি আমাদের উপর এত নির্দ্দয় কেন? আমরা যে তোমা ভিন্ন অন্য কিছুই জানি না; পিতা মাতা, পতি পুত্র, পরিজনগণের সমষ্টি, আর একমাত্র তুমি—এই দুই একই বস্তু। তোমার পদবন্দনা, নিষ্কামভাবে তোমায় অযাচিত আত্মদান—তোমার প্রেমসঙ্গই আমাদের একান্ত বাসনা, তোমার ঐ প্রেমপূর্ণ হাস্যময় সুন্দর আনন ও তোমার ঐচিত্তবিমোহনকারী মধুর বংশীধ্বনিতে আমাদের হৃদয় বিরহাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে, সেই জন্যই বলি—কমললোচন! এক্ষণে তোমার ঐ সর্ব্ব-সন্তাপনাশক শ্রীকর আমাদের অঙ্গে প্রদান করিয়া, আমাদের সন্তপ্ত অন্তর শীতল কর।"

লীলাময় ভগবান তাঁহাদের অন্তরের ভাব সম্যক অবগত হইলেন; তাঁহাদের বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহার অভিলাষ হইল। নক্ষত্র-পরিবৃত শশাঙ্ক সদৃশ তিনি সকলের মধ্যে শোভা পাইতে লাগিলেন;

গোপীগণ পরিবৃত হইয়া শ্রীবাসুদেবের মুখ-মণ্ডল, কুন্তল-মণ্ডিত গণ্ডে, এবং স্মিত-সুধা-বিরাজিত অধরে যেন মাধুর্য্যের প্রবাহ ছুটিতে লাগিল। মোহন মুরলীর বংশী-ধ্বনিতে কি যেন এক অমৃতময় পীযূষধারা বহিতে লাগিল। তাঁহার সেই তেজঃপুঞ্জ লাবণ্যরাশি যেন চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। গোপিণীগণ তাঁহার সেই সুন্দর মনোমোহনরূপে, ও মধুর বংশীধ্বনিতে মোহিত হইয়া ঈষৎ কটাক্ষে তাঁহাকে অবলোকন করিতে লাগিলেন; কোন কোন গোপসুন্দরী প্রেম-সংরম্ভ-বিহ্বলা

"আপীন স্তন কুট্মলাভিরভিতো,
গোপীভিরারা ভিধিতম্।"

অচ্যুতকে প্রেমালিঙ্গন দানে তুষ্ট করিতে লাগিলেন। প্রকৃতির সহিত পুরুষের সম্মিলনে প্রেম বাসনার পরিপূরণ; এখানেও সেই তত্ত্বের সমাপ্তি। মাধবের উপর ইন্দ্রিয় ক্ষমতা বিস্তারের শক্তি কোথায়? জিতেন্দ্রিয় মাধব তখন প্রেমানুরতা গোপীগণের তৃপ্ত্যার্থে 'আত্মন্য-বরুদ্ধ সৌরত" হইয়া তাহাদের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন।

"এবং শশাঙ্কাংশু বিরাজিতা নিশাঃ
স সত্য কামোঽনুরতা বলাগণঃ
সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধ সৌরতঃ
সর্ব্বা শরৎকাব্য কথা রসাশ্রয়াঃ"॥
(শ্রীমদ্ভাগবতম্)

অনেকে ভগবানের এই রহঃকেলীর ভাব বিপরীতার্থে গ্রহণ করিয়া অনেক নিন্দাবাদ করিয়া থাকেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপ-যোষিদ্গণের প্রেম সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত এবং নিষ্কাম বলিয়া অভিহিত।

"যো হিবৈ অকামেন কামান্
কাময়েত সোঽকামী ভবতি।"

আর নিত্যসিদ্ধ গোপনন্দিনীগণের বিশুদ্ধ প্রেমলীলা, নিত্যসিদ্ধত্ব ও আনন্দ-চিন্ময় রসাত্মক প্রেমভাবের বর্ণনা, সেই অনন্ত মাধুর্য্যময়, শ্যামসুন্দরের হ্লাদিনী-শক্তির পরিচায়ক মাত্র। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ পরমপুরুষ; সুতরাং তাঁহার এই পবিত্র ও নিষ্কাম প্রেম-ব্যবহারে এবং তাঁহার সুমধুর বংশীরবে ব্রজকিশোরীদিগের মনপ্রাণ একবারে মুগ্ধ হইয়া যাইত। প্রেমে তন্ময় হইয়া, এমন কি, নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়া আমি "কৃষ্ণ" এইরূপ ধারণা করিতেন।

বাস্তবিকই আত্মবিস্মরণ, প্রকৃতি পুরুষের অভেদ-জ্ঞান, প্রকৃত প্রেমের মুখ্য পথ। ব্রজসুন্দরীগণের নিজের আত্মপ্রিয় কোন বস্তুই ছিল না, সমস্তই গোকুলচন্দ্রের পদে সমর্পণ করিয়াছিলেন; তাঁহার সন্তোষ সাধন করাই তাঁহাদের একমাত্র কামনা। পার্থিব ইন্দ্রিয়-বৃত্তি চরিতার্থ করা তাহাদের অভিপ্রেত নহে; প্রেম দ্বারা সেই বৃত্তির উচ্ছেদ সাধন ও তদ্বারা কন্দর্প তাপ দূর করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। ব্রজগোপনীগণের এই প্রেমলীলা অতীব বিচিত্র। তাঁহারা জানিতেন, প্রেমেই তাঁহাদের মুক্তি, প্রেমেই তাঁহাদের চতুঃবর্গ।

অনেকে হয়ত এস্থলে বলিতে পারেন, ভক্তি ব্যতিরেকে কামজ প্রেমে মুক্তি কিরূপে সম্ভবে? এজন্য প্রমাণ স্বরূপ নিম্নলিখিত শ্লোকটী উদ্ধৃত করা গেল,—

"কামাৎ গোপ্যঃ ভয়াৎকংসঃ
দ্বেষাৎ চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ
সম্বন্ধাৎ বৃষ্ণয়ো, স্নেহাৎ যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো।"

অর্থাৎ গোপীরা কাম হইতে, কংসভয় হইতে, দেবকী যশোদা প্রভৃতি স্নেহের দ্বারা ইত্যাদি, মোক্ষলাভ করিয়াছিল। অতএব

জীবের যে কোন বিষয়ে তন্ময়তা আসে, জীব যাহার বিষয় ঐকান্তিক ধ্যানপরায়ণ হয়, কি ভয়ে, কি ক্রোধে, কি কামে, যাহাতে তাহাদের মনে একাগ্রতা সর্ব্বদা জাগরুক থাকে, তাহাতেই তাহাদের নিবৃত্তি হয়। কাঁচপোকা-ভয়ভীত তৈল-পায়িকাও ভয় দ্বারা, চিত্ত তন্ময়তা হেতু, এমন কি, তৎ-সারূপ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কংসরাজ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে চিরবৈরী জ্ঞানে, সতত তাঁহার চিন্তায় নিমগ্ন থাকিত; কিসে তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইবে, এই চিন্তায় তাঁহার মন সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিত; তথাপি এই আশঙ্কাজনক চিন্তা হইতেও তাঁহার মুক্তি-সাধন হইয়াছিল। অতএব এস্থলে বিশেষ-রূপে প্রতীয়মান হইতেছে যে, ভক্তিদ্বারা তন্ময়তা হেতু জীবের যেরূপ মোক্ষসাধন হইয়া থাকে, তদ্রূপ কামাদি কল্প তন্ময়তা দ্বারাও মোক্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। একথা শাণ্ডিল্য সূত্রেও আছে যে,—"গোপীকাগণ প্রেমে আত্মহারা হইয়াছিল এবং সেই অনু-রাগেই তাহারা মুক্ত হইয়াছিল।' সুতরাং চিত্ত-তন্ময়তাই ঐরূপ ২ স্থলে মোক্ষ কারণ হয়। গোপ-কিশোরীগণের মন গোকুল-চন্দ্রের চিন্তায় সর্ব্বদা নিয়োজিত থাকিত এবং শ্রীগোবিন্দের বিশুদ্ধ প্রেম ব্যবহারে তন্ময়ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা ইহাও জানিতেন যে, এই বিশুদ্ধ পবিত্র আদর্শ-প্রেমিক পুরুষ সর্ব্ব মঙ্গলময় মাধব। বংশীধ্বনিই তাঁহাদের সেই প্রেমপথের সোপান, এবং সেই বংশীধারীর সহিত প্রেমসম্মিলন, আর তাঁহাতে আত্মসমর্পণ—তাঁহাদের মুক্তি। তাই তাঁহারা আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ করিয়া সুমধুর বংশীরস্বরে মুগ্ধ হইয়া,—প্রেমে বিভোর হইয়া অচ্যুতের পদে আত্ম-বিসর্জ্জন করিতে সমৎসুক ছিলেন। জ্যোতির্ম্ময় বংশীবদন শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাদের সর্ব্বস্ব ও মুক্তির একমাত্র আশ্রয়স্থল।

শ্রীআনন্দগোপাল ঘোষ।

শ্মশান।

(১)

মত্ত ধূমরাশি হুঙ্কার ছাড়িয়া
উঠিছে গগন পরশি,
প্রদীপ্ত রুধিরে পরিপ্লুত কায়,
প্রদীপ্ত অরুণ নয়নচ্ছটায়,
গর্ব্বিত অনল জাগ্রত প্রভায়
নাচিছে নয়ন ঝলসি।

(২)

মর্ত্ত্য বাসনার তীব্র শিখা-রাশি
হাসিছে অনল গরাসি,
গগনে নির্ম্মিত কত হর্ম্ম্যরাজি,
প্রলুব্ধ প্রাণের কত ভোজবাজী,
উদ্ভ্রান্ত আশার কুহকেতে সাজি
ছিল যাহা, তারে বিনাশি।

(৩)

মর্ত্ত্য জীবনের ক্ষণেকের হাসি
ক্ষেপিছে কতই কবলে,
মর্ত্ত্য উদ্যানের পরিমলময়,
প্রেম-সুষমায় প্লাবিত-হৃদয়,
মধুসিক্ত কত কুসুম-নিচয়
তাপে শুষ্ক করি সদলে।

(৪)

বক্ষে বহ্নিধারী অনন্ত শ্মশান,
বলহে আমারে, কেমনে

আপাদ মস্তক নর-কলেবর,
ছিন্ন হৃদয়ের অনুভূতি-স্তর
গ্রাসি তব চিতা পূরিয়া উদর
লভেছে আরাম জীবনে।

(৫)

বক্ষে বহ্নিধারী অনন্ত শ্মশান,
কতকাল তুমি, বলরে,
আছ উগ্র ভাবে ভ্রূকুটি বিকাশি,—
অনন্তের ক্রোড়ে অনন্ত পিয়াসী—
স্পর্দ্ধিত মানবে বিদ্রূপের হাসি
দেখায়ে বিকট অধরে।

(৬)

মানব কঙ্কালে পুষ্ট হে শ্মশান,
ডাকিছ কি তুমি আমারে?
তব বহ্নি-ভয়ে নহিহে কম্পিত,
তব ভ্রূকুটিতে নহিহে শঙ্কিত,
বিনা অভ্যর্থনে ব্যগ্র মোর চিত
দিতে আলিঙ্গন তোমারে।

(৭)

শুন তোমা আজি বলিহে শ্মশান,
গিয়াছে তোমাতে মিশিয়া
কত এ প্রাণের গুপ্ত অভিলাষ,
অস্ফুট স্বপন, অব্যক্ত প্রয়াস;
আকাঙ্ক্ষারে তুমি করেছ উদাস
অমৃতে গরল ঢালিয়া।

(৮)

কত এ প্রাণের মধুর আবেগ
দিয়াছি তোমারে সঁপিয়া,
তুচ্ছি আমি অই বদন-ব্যাদান,
বক্ষে বহ্নিধারী অনন্ত শ্মশান,
নিরাশা কেনহে হবে ম্রিয়মাণ
ও বঙ্কিম গ্রীবা হেরিয়া?

(৯)

তবু দণ্ড দুই, তবু দুটো দিন
নিও না এ দেহ ও দেহে,
সাজিতেছি আমি স্মৃতি-পরাজয়ে,
সারিতেছি পর্ণে এ জীর্ণ নিলয়ে,
দিতেছি যে গ্রন্থি এ ভগ্ন হৃদয়ে,
মানব যেমন করে হে।

(১০)

তবু দণ্ড দুই, তবু দুটো দিন,
ক্ষমরে, শ্মশান, আমারে,
দেখি মূর্ত্তি তব পড়িতেছে মনে,
কত কম্ম এই নশ্বর ভুবনে
ডাকিছে আমায় সতৃষ্ণ নয়নে,
ডাকিছে কতই প্রকারে।

(১১)

অর্পিলে এ তনু তোমারে, শ্মশান,
(বলিবে কি মোরে গোপনে),
কার কৃপাবারি সিঞ্চিবে আমায়,
পাব কিহে আমি পুন নবকায়,
কোন দিবাকরে কেমন প্রভায়
হেরিব আবার নয়নে?

(১২)

চিরদিন তুমি জ্বলিছ শ্মশান
সধুম অনলে সাজিয়া,
ভুলিতাম আমি আস্তিত্ব তোমার,
ভুলিতাম আমি তব হুহুঙ্কার,
ভুলিতাম অই দৃপ্ত পারাবার
বাসনার স্রোতে ভাসিয়া।

(১৩)

তাই দণ্ড দুই, তাই দুটো দিন
ক্ষমরে, শ্মশান, আমারে,
শেষ করি, আছে বাকী যেই কাজ,
হইহে প্রস্তুত নিতে নব সাজ,
ছেড়ে দাও তবে তুমি মোরে আজ,
ভুলিব না আর তোমারে।

(১৪)

অন্তিমে তুমিই সম্বল নরের
তারিতে দুস্তর সাগরে,
তবু শুনি তব সদর্প আহ্বান,
তবু দেখি তব বদন-ব্যাদান,
বক্ষে বহ্নিধারী অনন্ত শ্মশান,
কেন ক্ষুদ্র প্রাণ শিহরে?

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

রাজা—জন্ম, রাধানগর, ১৬৯৫ শকের শেষ ভাগে, ১৭৭৪ খ্রীঃ।
মৃত্যু—ব্রিষ্টল ১৮৩৩ খ্রীঃ, ২৭শে সেপ্টেম্বর, শুক্রবার।

মহর্ষি—জন্ম, কলিকাতা,৩রা জ্যৈষ্ঠ,১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ,
মৃত্যু কলিকাতা ৬ই মাঘ, ১৩১১, ১৯শে জানুয়ারি ১৯০৫।

ব্রহ্মানন্দ—জন্ম কলিকাতা, ১৮৩৮, ১৯শে নবেম্বর।
মৃত্যু কলিকাতা, ১৮৮৪, ৮ই জানুয়ারি, সোমবার।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, সাধুদিগের উদ্ধার, পাপীদিগের বিনাশ এবং ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে আমি ধরায় অবতীর্ণ হইয়া থাকি। এই কথাটার প্রতি যতই আমরা প্রণিধান করি, ততই এই কথার সারত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া মোহিত হই। পৃথিবীর ইতিহাস একথা প্রতিপন্ন করিয়াছে যে, জগতের উদ্ধারের জন্য মধ্যে মধ্যে মহাত্মাদিগের অভ্যুদয় হইয়াছে। মহাত্মাদিগের অভ্যুদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা স্মরণ করিয়া অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি, আশু দুষ্কৃতি নিবারণের জন্য লোক আগমন সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ বাণী প্রচার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের উদয় বিধাতার বিধান কি না, এ বিষয়ে লোকের সন্দেহ থাকিতে পারে, কিন্তু ইহাতে কাহারও সন্দেহ নাই যে,ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে এদেশে যে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে এদেশের সুখ শান্তি অনেক অন্তরিত হইয়াছে। খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের গতি রোধ না হইলে এদেশের যে কি সর্ব্বনাশ হইত, আমরা লিখিতে অক্ষম। বহির্মুখ ধর্ম্ম-সাধনে সিদ্ধ খ্রীষ্টসমাজ অন্তরঙ্গ সাধনে ক্ষীণ হইয়া দিন দিন পাপের লীলাক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছে;—যে সকল দুর্নীতি আজ কাল ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া প্রচারিত হইতেছে, তাহা ভাবিলে হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়। বলিলে সত্যের অপলাপ হয় না যে, খ্রীষ্টের মহামূল্য উপদেশ সকল এখন সর্ব্বত্রই উপেক্ষিত, অবহেলিত হইতেছে।

আধুনিক খ্রীষ্ট-সেবক সভ্যজাতি-সাধারণের ব্যবহারিক জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন,ধর্ম্ম এখন অনেক স্থলে পোষাক পরিচ্ছদের ন্যায় গণ্য হইয়াছে,—মানুষের অকর্ত্তব্য যেন কোন ঘৃণিত কাজই নাই। এদেশে যদি সভ্যতা-মূলক খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচার বাধা না পাইত, তবে ভারতের যে কি সর্ব্বনাশ হইত, ভাবিলেও প্রাণ অধীর হয়। গবর্ণমেণ্টের সাহায্য পাইয়া যখন পাদ্রীগণ এ দেশের আবাহমান-কাল-প্রচলিত ধর্ম্ম-সংস্কারে আঘাত করিতে লাগিলেন, তখন তাহার প্রতিরোধ করার একান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছিল। সেই প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য তিন মহাপুরুষকে তিনি অক্ষয় শক্তি-সম্পন্ন করিয়া বঙ্গে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেই তিন মহাপুরুষ—রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ এবং কেশবচন্দ্র। যদি ভারতের নরনারী বিদ্বেষ-বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া এই মহাপুরুষদিগের আর সকল গুণ বিস্মৃত হন, আমরা বলিতে পারি, ভারতকে খ্রীষ্টধর্ম্মের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য এই তিন মহাপুরুষ যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা কখনও বিস্মৃত হইবেন না। অন্তত এই এক মহা কাজের জন্যও এই

তিন মহাপুরুষ এ দেশে অমরত্ব লাভ করিবেন। আমরা এস্থলে এই তিন মহাপুরুষের জীবন-চরিত হইতে এ সম্বন্ধীয় একটু একটু বিবরণ এস্থলে তুলিয়া দিলাম। যাঁহারা অধিক জানিতে চাহেন, তাঁহাদের বিস্তৃত জীবন-চরিত অধ্যয়ন করিবেন।

"ব্রাহ্মণসেবধি'তে রাজা রামমোহন রায় বলিতেছেন যে, ইংরেজেরা এদেশ অধিকার করিলে প্রথম ত্রিংশৎ বৎসর কাহারও ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। তৎপরে তাঁহারা হিন্দু ও মুসলমানদিগকে ধর্ম্মচ্যুত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

রাজা বলিতেছেন যে, ইংরেজেরা প্রথম ত্রিংশৎ বৎসর কাহারও ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। কেবল বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই, এমন নহে, এদেশে পাদ্রিগণ যে দেশীয় লোকের বিরুদ্ধে কথা বলেন, গবর্ণমেণ্ট তাহা ভালবাসিতেন না। গবর্ণমেণ্ট আশঙ্কা করিতেন, পাছে উক্তরূপ ধর্ম্ম প্রচারদ্বারা প্রজারা বিদেশীয় রাজশাসনের প্রতি অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হয়। এমন কি, এই জন্য একবার একজন পাদ্রি সাহেবকে, গবর্ণমেণ্টের আদেশে, ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল।

রাজা বলিতেছেন যে, ইংরেজেরা এদেশ অধিকার করিয়া ত্রিংশৎ বৎসরের পর, এদেশীয় লোককে খ্রীষ্টিয়ান করিবার উদ্দেশে তিন প্রকার উপায় অবলম্বন করেন। প্রথম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তকপ্রচার। উহা হিন্দুদেবতা ও ঋষিদিগের কুৎসা, এবং মুসলমান ধর্ম্মের নিন্দাতে পরিপূর্ণ। দ্বিতীয়, রাজপথে দণ্ডায়মান হইয়া আপনার ধর্ম্মের উৎকর্ষ এবং অন্যের ধর্ম্মের অপকৃষ্টতাসূচক উপদেশ দান। তৃতীয়, সামান্য দুঃখী লোককে চাকুরী দিয়া এবং প্রতিপালন করিবার লোভ দেখাইয়া খ্রীষ্টিয়ান করা। এই তিন উপায় সম্বন্ধে রাজা বলিতেছেন যে, নিন্দা ও তিরস্কারদ্বারা অথবা লোভ দেখাইয়া ধর্ম্মপ্রচার করা কখনই যুক্তি ও বিচারসঙ্গত নহে। আপনার ধর্ম্ম যে সত্য, এবং অন্যের ধর্ম্ম যে মিথ্যা, ইহা বিচারবলে সংস্থাপন করাই ধর্ম্মপ্রচার করিবার যুক্তিযুক্ত প্রণালী। এই প্রকারে এক ধর্ম্ম হইতে অন্য ধর্ম্মে লোককে লইয়া গেলে কোন দোষ হয় না।

বিজ্ঞ ও ধার্ম্মিক লোক, দুর্ব্বল ব্যক্তির মনঃপীড়া দিতে সর্ব্বদা সঙ্কুচিত হন। বিশেষতঃ যদি সেই দুর্ব্বল ব্যক্তি তাঁহাদের অধীন হয়, তাহা হইলে তাঁহারা বিশেষ সাবধান হন, পাছে সে মনে কষ্ট পায়। বাঙ্গালী প্রজা দুর্ব্বল, দীন ও ভয়ার্ত্ত। ইংরেজের নাম মাত্রে ভীত হয়। তাহাদের ধর্ম্মের উপর দৌরাত্ম্য করা, কি লোকতঃ কি ধর্ম্মতঃ কখনই প্রশংসনীয় নহে। যদি খ্রীষ্টিয়ান প্রচারকগণ তুর্কি ও পারস্য প্রভৃতি দেশে গমন করিয়া ঐরূপ ধর্ম্মোপদেশ ও পুস্তক বিতরণ করেন, তাহা হইলে অবশ্য বলিব যে, তাঁহারা নির্ভয়ে ধর্ম্মপ্রচার করিতেছেন,—তাঁহারা প্রকৃতরূপে তাঁহাদের আচার্য্যের দৃষ্টান্তানুসরণ করিতেছেন। কিন্তু রাজশক্তির সাহায্য লইয়া দুর্ব্বল প্রজার উপরে এরূপ দৌরাত্ম্য করা একান্ত নিন্দনীয়।" নগেন্দ্র বাবুর কৃত জীবনচরিত, তৃ-সং। ২০২ ও ২০৩ পৃষ্ঠা।

"১৭৬৭ শকের বৈশাখ মাসের একদিন প্রাতঃকালে সংবাদ-পত্র দেখিতেছি, এমন সময় আমাদের হাউসের সরকার রাজেন্দ্র নাথ সরকার আমার নিকট কাঁদিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল যে, "গত রবিবারে আমার স্ত্রী ও আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা উমেশ চন্দ্রের স্ত্রী, দুই জনে একখানা গাড়ীতে চড়িয়া নিমন্ত্রণে যাইতেছিলেন, এমন সময় উমেশ চন্দ্র আসিয়া তাহার আপনার স্ত্রীকে গাড়ি হইতে জোর করিয়া নামাইয়া লয় এবং উভয়ে খৃষ্টান হইবার জন্য ডফ-সাহেবের বাড়ীতে চলিয়া যায়। আমার পিতা অনেক চেষ্টা করিয়া তাহাদিগকে সেখান হইতে ফিরিয়া আনিতে না পারিয়া অবশেষে সুপ্রীম কোর্টে নালিশ করেন। নালিশে এবার আমাদের হার হয়। কিন্তু আমি ডফ-সাহেবের নিকট গিয়া অনুনয় বিনয় করিয়া

বলিলাম যে, আমরা আবার কোর্টে নালিশ আনিব। দ্বিতীয় বার বিচারের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত আমার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূকে খ্রীষ্টান করিবেন না। কিন্তু তিনি তাহা না শুনিয়া গত কল্যই সন্ধ্যার সময়ে তাহাদিগকে খ্রীষ্টান করিয়া ফেলিয়াছেন।" এই বলিয়া রাজেন্দ্রনাথ কাঁদিতে লাগিল। ইহা শুনিয়া আমার বড়ই রাগ হইল ও দুঃখ হইল। অন্তঃপুরের স্ত্রীলোক পর্য্যন্ত খ্রীষ্টান করিতে লাগিল। তবে রোস্, আমি ইহার প্রতিবিধান করিতেছি। এই বলিয়া আমি উঠিয়া পড়িলাম। আমি তখনি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তের লেখনীকে চালাইলাম এবং একটি তেজস্বী প্রবন্ধ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশ হইল "অন্তঃপুরস্থ স্ত্রী পর্য্যন্ত স্বধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পরধর্ম্মকে অবলম্বন করিতে লাগিল। এই সকল সাংঘাতিক ঘটনাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কি আমাদের চৈতন্য হয় না! আর কতকাল আমরা অনুৎসাহ নিদ্রাতে অভিভূত থাকিব! ধর্ম্ম যে এককালীন নষ্ট হইল, এ দেশ যে উচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম হইল এবং আমাদিগের হিন্দুনাম যে চিরকালের মত লুপ্ত হইবার সম্ভব হইল। * * * * * * অতএব যদি আপনার মঙ্গল প্রার্থনা কর, পরিবারের হিত অভিলাষ কর, দেশের উন্নতি প্রতীক্ষা কর এবং সত্যের প্রতি প্রীতি কর, তবে মিশনরিদিগের সংস্রব হইতে বালকগণকে দূরস্থ রাখ। তাহাদিগের পাঠশালাতে পুত্রদিগকে প্রেরণ করিতে নিবৃত্ত হও এবং যাহাতে স্ফূর্ত্তির সহিত তাহারা বুদ্ধিকে চালনা করিতে পারে, এমত উদ্যোগে শীঘ্র কর। যদি বল, পাদ্রিদিগের পাঠশালা ব্যতীত দরিদ্র সন্তানদিগের অধ্যয়ন জন্য অন্য স্থান কোথায়? কিন্তু ইহাই বা কি লজ্জার বিষয়। খ্রীষ্টানেরা অতলস্পর্শ সমুদ্র তরঙ্গকে তুচ্ছ করত আপনাদিগের ধর্ম্ম প্রচার জন্য ভারতবর্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পাঠশালা সকল স্থাপন করিতেছে, আর আমাদিগের দেশের দরিদ্র সন্তানদিগকে অধ্যাপন করিবার নিমিত্তে একটিও উত্তম পাঠশালা নাই। সকলে একত্র হইলে তাহাদিগের পাঠশালার তুল্য বা তাহার অপেক্ষা দশগুণ উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় কি স্থাপিত হইতে পারে না? ঐক্য থাকিলে কোন্ কর্ম্ম না সিদ্ধ হয়?" শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার দত্তের প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশ হইল, আর আমি তাহার পরে প্রতিদিন গাড়ি করিয়া প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কলিকাতার সকল সম্ভ্রান্ত ও মান্য লোকদিগের নিকটে যাইয়া তাহাদিগকে অনুরোধ করিতে লাগিলাম যে, হিন্দু সন্তানদিগের যাহাতে পাদ্রিদের বিদ্যালয়ে যাইতে আর না হয় এবং আমাদের নিজের বিদ্যালয়ে তাহারা পড়িতে পারে, তাহার উপায় বিধান করিতে হইবে। এদিকে রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা সত্যচরণ ঘোষাল, ওদিকে রাম গোপাল ঘোষ; আমি সকলের নিকট গিয়া সকলকেই উত্তেজিত করিতে লাগিলাম। আমার এই উৎসাহে সকলেই উৎসাহিত হইলেন। ইহাতেই ধর্ম্মসভা ও ব্রাহ্মসভার যে দলাদলি এবং যাহার সঙ্গে যাহার যে অনৈক্য ছিল, সকলি ভাঙ্গিয়া গেল। সকলেই একদিকে হইলেন এবং যাহাতে খ্রীষ্টানদিগের বিদ্যালয়ে আর ছেলে পড়িতে না পায়, যাহাতে খ্রীষ্টানেরা আর খ্রীষ্টান করিতে না পারে, তাহার জন্য সম্যক্ চেষ্টা হইতে লাগিল। ১৩ই জ্যৈষ্ঠ আমাদের একটা মহা সভা হইল। এই সভাতে প্রায় সহস্র ব্যক্তি একত্র হইয়াছিলেন। স্থির হইল যে, পাদ্রিদের বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে যেমন ছেলেরা পড়িতে পায়, তেমনি আমাদেরও একটা বিদ্যালয় হইবে, তাহাতে বিনা বেতনে ছেলেরা পড়িতে পাইবে। আমরা চাঁদার পুস্তক লইয়া তাহাতে কে কি স্বাক্ষর করেন, তাহার অপেক্ষা করিতেছি, এমন সময় আশুতোষ দেব ও প্রমথ নাথ দেব আমাদের নিকট হইতে চাঁদার বহি চাহিয়া লইয়া তাহাতে দশ হাজার টাকা স্বাক্ষর করিলেন। রাজা সত্যচরণ ঘোষাল তিন হাজার টাকা, ব্রজনাথ ধর দুই হাজার টাকা। রাজা রাধাকান্ত দেব

এক হাজার টাকা। এইরূপে সেই দিনই চল্লিশ হাজার টাকা স্বাক্ষর হইয়া গেল। তখন জানিলাম, আমাদের পরিশ্রমের ফল হইল। এই সভা হইতে হিন্দুহিতার্থী নামে একটী বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইল এবং তাহার কর্ম্ম সম্পাদন জন্য শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর সভাপতি হইলেন। আমি ও হরিমোহন সেন সম্পাদক হইলাম। এই অবৈতনিক বিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষক শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় নিযুক্ত হন। সেই অবধি খ্রীষ্টান হইবার স্রোত মন্দীভূত হইল—একেবারে মিশনরিদিগের মস্তকে কুঠারাঘাত পড়িল।" মহর্ষির আত্মজীবনী, ৫০, ৫১, ৫২ পৃষ্ঠা।

"কেশবচন্দ্র যখন প্রচলিত উপধর্ম্ম সকলের প্রতিকূলে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন, তখন হিন্দুসমাজ তাঁহার বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করে নাই। হিন্দুদিগের যাহা কিছু আক্রমণ রাজা রামমোহন রায়ের উপর দিয়াই তাহা গিয়াছিল। তাঁহার লোকান্তর গমনের পর ব্রাহ্মসমাজ খ্রীষ্টবিদ্বেষী হয়; সুতরাং হিন্দুসমাজের সহিত তৎসম্বন্ধে কিছু সহানুভূতি জন্মে। পাদরী সাহেবদিগকে অপদস্থ করিবার জন্য ব্রাহ্ম মহাশয়দের বিশেষ উৎসাহ ছিল। এ জন্য সমাজ হইতে কিছুদিনের জন্য এক জন ইংরাজ লেখককে নিযুক্ত করা হয়। অক্ষয় বাবুর যোগে তিনি খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি ভয়ানকরূপে আক্রমণ করিতেন। পূর্ব্ব হইতেই এইরূপ বিবাদ চলিয়া আসিতেছিল, তদনন্তর কেশবচন্দ্র যখন ব্রাহ্মধর্ম্মকে সহজজ্ঞান-ভূমিতে স্থাপন করিলেন, তখন পাদরী মহাশয়দিগের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ভাব জ্বলিয়া উঠিল। ব্রহ্মানন্দজী ইতঃপূর্ব্বে ব্রহ্মবিদ্যালয়ে এবং অপরাপর প্রকাশ্য সভায় সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের যে সকল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা দ্বারা ধর্ম্মপুস্তক, মধ্যবর্ত্তী, অনন্ত নরক, বাহ্য প্রায়শ্চিত্ত-বিধি, এ সমস্ত ভ্রান্তি বলিয়া প্রমাণিত হয়। জীবের সহিত ঈশ্বরের সাক্ষাৎসম্বন্ধ, ধর্ম্মপুস্তক সহজজ্ঞান, অনুতাপই প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদি যুক্তিসঙ্গত মত যখন তাঁহারা শুনিলেন, তখন তাঁহারা এই বলিয়া উপহাস করিতে লাগিলেন যে ব্রাহ্মধর্ম্মের কোন ভিত্তিভূমি নাই, ইহা শূন্যমার্গে দোদুল্যমান। কেশবের প্রচারিত ধর্ম্মমত যে ভিতরে ভিতরে খ্রীষ্টধর্ম্মের হৃদয়শোণিত শোষণ করিয়া লইতেছিল, সে দিকে তখন কাহারো দৃষ্টি পড়ে নাই।

প্রথমে পাদরী ডাইসনের সঙ্গে কৃষ্ণনগরে বাদানুবাদ আরম্ভ হয়। তৎকালে কেশব বাবু বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য তথায় বাবু মনোমোহন ঘোষের ভবনে কিছু দিন ছিলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম তেইশ বৎসর মাত্র, কিন্তু বক্তৃতার তেজে বিপক্ষদিগকে তিনি অস্থির করিয়া তুলিতেন। চারি পাঁচ ঘণ্টাকাল ক্রমাগত অনর্গল বলিয়া যাইতেন। এক দিন বক্তৃতা করিতে করিতে গলা ভাঙ্গিয়া গেল। ডাক্তার কালী লাহিড়ী তদ্দর্শনে ভীত হইয়া তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে লাগিলেন। পাদরী সাহেবদের সঙ্গে বঙ্গীয় যুবাকে ইংরাজি বাক্‌যুদ্ধে দণ্ডায়মান দেখিলে তখন হিন্দুরা বড় সন্তুষ্ট হইতেন। বিদ্যালয়ের ছেলেদেরত কথাই নাই। খ্রীষ্টিয়ানদিগের শত্রু বলিয়া তাঁহার প্রতি হিন্দুসমাজের যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল। তাঁহারা বলিতেন, এদের দ্বারা আর কিছু হউক না হউক, হিন্দুসন্তানদিগের খ্রীষ্টিয়ান হওয়ার পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কেশবচন্দ্র এক জন অসাধারণ বক্তা, সে জন্য দেশের লোকের অনুরাগ তাঁহার প্রতি যথেষ্ট বাড়িল। যখন তিনি তর্কযুদ্ধে ডাইসনকে পরাস্ত করিলেন, তখন আর লোকের আহ্লাদের সীমা রহিল না। নবদ্বীপস্থ কয়েকজন অধ্যাপক ইহা শুনিয়া বক্তাকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। এই বাক্‌যুদ্ধে ডাইসেন সাহেবেরও নাম বাহির হইয়া গেল। ইহার পূর্ব্বে তিনি এক জন সামান্য ব্যক্তি ছিলেন। ইহাতে কেশবের সাহস বীর্য্য বক্তৃতাশক্তিও অনেক স্ফূর্ত্তিলাভ করে।" কেশবচরিত ৩১ ও ৩২ পৃষ্ঠা।

লর্ড কর্জ্জন সে দিন কনভোকেশনে (১১ই ফেব্রুয়ারি, ১৯০৫) নানা অপ্রিয় ভাষায় এ দেশীয়দিগকে প্রকারান্তরে

গালাগালি দিয়াছেন। তিনি যদি এ দেশের মহাপুরুষদিগের জীবনচরিত অধ্যয়ন করিতেন, তবে তিনি নিশ্চয় একটু সংযত হইতেন। তিনি যে সময়ে এই বঙ্গে পদার্পণ করিয়াছেন, সে সময়েও বঙ্গের বায়ু কলুষিত হয় নাই। সূর্য্য অস্তমিত হইলেও যেমন তাহার শেষ রশ্মির উত্তাপ বহুক্ষণ থাকে, ফুল শুষ্ক হইলেও যেমন তাহার সৌরভ বহুসময় থাকে, বঙ্গের অসাধারণ মহাপুরুষগণের স্বর্গারোহণের অব্যবহিত পরেও, সেইরূপ, বঙ্গে তাঁহাদের প্রভাব বহু সময় থাকিবে। রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষের প্রভাব মন্দীভূত হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল, কৃষ্ণদাস, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, রামতনু, রাজনারায়ণের প্রভাব কি এত শীঘ্রই তিরোহিত হওয়া সম্ভব? লর্ড কর্জ্জন সুচতুর হইতে পারেন, কিন্তু তিনি সংযতবাক্ নহেন, তিনি বিচক্ষণ হইতে পারেন, কিন্তু তিনি বুদ্ধিমান নহেন। যে যুগে তিনি ভারতে পদার্পণ করিয়াছেন, বঙ্গের সে যুগ সামান্য যুগ নহে, সে যুগ মহাত্মা দেবেন্দ্র নাথের যুগ। এরূপ পুণ্যশ্লোক মহাত্মা যে দেশে, যে জাতিতে জন্মগ্রহণ করেন, সে দেশ এবং সে জাতি তুচ্ছ এবং নগণ্য নহে। মহাত্মা গ্লাডোষ্টোন সাহেবের স্বর্গারোহণের পর মহামতি লর্ড রোজবেরি বলিয়াছিলেন "যে দেশ ও যে জাতি গ্লাডোষ্টোনকে উদ্ভূত করিয়াছে, সে দেশ ও সে জাতি তুচ্ছ নহে;—আমরা আশা করি, সেই দেশ এবং সেই জাতি আবারও এহেন মহাপুরুষের অভ্যুদয়ের কারণ হইবে।" আমরাও লর্ড কর্জ্জনকে, অন্য সকলকে বাদ দিয়া, যে মহাত্মা তাঁহার সম্মুখে জীবনত্যাগ করিয়াছেন, কেবল তাঁহার জীবনের সত্যপ্রিয়তার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলিতে পারি, যে দেশ ও যে জাতি এহেন মহাপুরুষকে প্রসব করিয়া ধন্য হইয়াছে, সে দেশ এবং সে জাতি তুচ্ছ এবং অবহেলার যোগ্য নহে। যদি তাহার প্রমাণ চান, তবে আমরা খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রভাব হ্রাসের কারণ উল্লেখ করিতে পারি। জীবন্ত ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে, মহাত্মা রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ এবং কেশবচন্দ্রের উত্থানে এদেশে খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম-প্রচারের পথে কণ্টক পড়িয়াছে। এই এক কারণে ভারতবর্ষকে চিরকাল কৃতজ্ঞতার সহিত এই তিন মহাপুরুষকে পূজা করিতে হইবে।

কেবল ইহাও নহে। দেশকে উদ্ধার করিতে হইলে, কেবল পরকীয় ধর্ম্মের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিলে দেশের মঙ্গল হয় না; দেশকে এমন কিছু সময়োপযোগী ধর্ম্ম দিতে হয়, যাহাতে সকলের তৃষ্ণা মিটিতে পারে। মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "ধর্ম্ম সময়ানুসারিণী না হইলে দেশের মঙ্গল হয় না। প্রাচীন আর্য্যঋষিগণ বর্ত্তমান থাকিলে তাঁহারা ধর্ম্মকে সময়ানুসারিণী করিয়া প্রচার করিতেন।" আর্য্যঋষিগণ কি ভারতে নাই? তাঁহাদের প্রভাব কি বিলুপ্ত? তাঁহাদের প্রভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া মহাত্মা রামমোহন হিন্দুশাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিয়া সময়ানুসারিণী ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। খ্রীষ্টধর্ম্মের পরাক্রম হইতে দেশকে কখনও রক্ষা করা যাইত না, যদি সময়ানুসারিণী নূতন ধর্ম্মবিধান প্রচারিত না হইত। রামমোহন তাহা বুঝিতেন;—তাই তিনি অত্যাচারিত, পরিত্যক্ত, প্রপীড়িত হইয়াও একেশ্বরবাদ প্রচার করিলেন। ধন্য তাঁহার সূক্ষ্মদৃষ্টি, ধন্য তাঁহার জীবন। তিনি এদেশের উদ্ধারের কারণ।

পৃথিবীর ইতিহাস মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, ধর্ম্মের অভ্যুদয় ভিন্ন কখনও কোন দেশের উন্নতি হয় নাই। হিন্দুধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, মুসলমান ধর্ম্মের ইতিহাস একথার প্রমাণ রূপে জাগরিত রহিয়াছে। ভারতবর্ষ মৃত ধর্ম্মের দ্বারা কখনও উত্থিত হইতে পারে না—কেননা, পৃথিবীতে এখন বৈজ্ঞানিক যুগের আবির্ভাব হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক ধর্ম্ম ভিন্ন নূতন জাতি নবভাবে গঠিত হইতে পারে না। এজন্য প্রাচীন বিধান সকল মলিন, নিষ্প্রভ, ক্ষমতাশূন্য হইয়া পড়িতেছিল। রাজা ইহা বুঝিয়া, ভারতের উদ্ধারের বীজ রোপণ করিলেন;—তিনি সমস্ত শাস্ত্র-সিন্ধু মন্থন করিয়া অমূল্য ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিলেন। আমাদের মনে হয়, এমন এক সময় আগমন করিবে, যখন রাজা রামমোহন রায়কে উনবিংশ শতাব্দীর প্রধান ধর্ম্মসংস্কারক বলিয়া জগতের লোকেরা পূজা করিবে।

এহেন রামমোহন রায়ের জীবনের মহত্ত্ব কি লোপ পাইবার জিনিস? তাঁহার মত হৃদয়ে ধারণ করিবার জন্য কি লোক ছিল না? বিধাতার বিধান কে বুঝিবে? রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ তাঁহার তিরোধানের পর ব্রাহ্মসমাজের শেষ প্রদীপে তৈল সিঞ্চন করিতেছিলেন বটে, কিন্তু বিধাতা আর একজন মহাপুরুষের ভিতরে রামমোহন রায়ের অমূল্য জীবন ঢালিয়া দিতেছিলেন। মহর্ষির জীবনের এই অংশ কত সুন্দর, দেখুন;—

"যখনই আমি বুঝিলাম যে ঈশ্বরের শরীর নাই, তাঁহার প্রতিমা নাই, তখন হইতে আমার পৌত্তলিকতার উপর ভারি বিদ্বেষ জন্মিল। রাম মোহন রায়কে স্মরণ হইল—আমার চেতন হইল, আমি তাঁহার অনুগামী হইবার জন্য প্রাণ ও মন সমর্পণ করিলাম।

শৈশব কাল অবধি আমার রাম মোহন রায়ের সহিত সংস্রব। আমি তাঁহার স্কুলে পড়িতাম। তখন আরো ভাল স্কুল ছিল, হিন্দু-কালেজ ছিল। কিন্তু আমার পিতা রাম মোহন রায়ের অনুরোধে আমাকে ঐ স্কুলে দেন। স্কুলটী হেদুয়ার পুষ্করিণীর ধারে প্রতিষ্ঠিত। আমি প্রায় প্রতি শনিবার দুইটার সময় ছুটী হইলে রমাপ্রসাদ রায়ের সহিত রাম মোহন রায়ের মাণিকতলার বাগানে যাইতাম। অন্য দিনও দেখা করিয়া আসিতাম। কোন কোন দিন আমি তথায় গিয়া বড়ই উপদ্রব করিতাম। বাগানের গাছের নিচু ছিঁড়িয়া, কখনও কড়াইশুঁটি ভাঙ্গিয়া মনের সুখে খাইতাম। রাম মোহন রায় একদিন কহিলেন, ব্রাদার! রৌদ্রে হুটা পাটি করিয়া কেন বেড়াও, এইখানে বোসো। যত নিচু খেতে পার এখানে বসিয়া খাও। মালিকে বলিলেন, যা, গাছ থেকে নিচু পেড়ে নিয়ে আয়। সে তৎক্ষণাৎ এক থালা ভরিয়া নিচু আনিয়া দিল। তখন রাম মোহন রায় বলিলেন, যত ইচ্ছা নিচু খাও। তাঁহার মূর্ত্তি প্রশান্ত ও গম্ভীর। আমি বড় শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত তাঁহাকে দেখিতাম। বাগানে একটা কাঠের দোলা ছিল। রামমোহন রায় অঙ্গ চালনার জন্য তাহাতে দোল খাইতেন। আমি বৈকালে বাগানে গেলে তিনি আমাকে সেই দোলায় বসাইয়া আপনি টানিতেন, ক্ষণেক পরে আপনি তাহাতে বসিয়া বলিতেন, ব্রাদার! এখন তুমি টান।

আমি পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র। কোন কার্য্যোপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য আমাকেই বাড়ী বাড়ী যাইতে হইত। আশ্বিন মাসের দুর্গোৎসব। আমি এই উপলক্ষে রামমোহন রায়কে নিমন্ত্রণ করিতে যাই। গিয়া বলিলাম—রামমণি ঠাকুরের নিবেদন, তিন দিন আপনার প্রতিমা দর্শনের নিমন্ত্রণ। শুনিয়াই তিনি বলিলেন, ব্রাদার! আমাকে কেন? রাধাপ্রসাদকে বল। এত দিন পরে সেই কথার অর্থ ও ভাব বুঝিতে পারিলাম। এই অবধি আমি মনে মনে সংকল্প করিলাম যে, রাম মোহন রায় যেমন কোন

প্রতিমা পূজায় ও পৌত্তলিকতায় যোগ দিতেন না, তেমনি আমিও আর তাহাতে যোগ দিব না। কোন প্রতিমাকে পূজা করিব না, কোন প্রতিমাকে প্রণাম করিব না; কোন পৌত্তলিক পূজায় নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিব না। সেই অবধি আমার এই সংকল্প দৃঢ় হইল। তখন জানিতে পারিলাম না যে, কি আগুনে প্রবেশ করিলাম।" মহর্ষির আত্মজীবনী, ১৬ ও ১৭ পৃষ্ঠা।

খ্রীষ্টধর্ম্ম জীবনে ধারণ ও জগতে প্রচার করিবার জন্য যেমন সেণ্টপলের অভ্যুদয়, রাজা রাম মোহন রায়ের ধর্ম্মকে ধারণ ও প্রচার করিবার জন্যও তেমনি দেবেন্দ্রনাথের অভ্যুদয়। খ্রীষ্টধর্ম্ম-জগতে যদি সেণ্টপলকে অদ্বিতীয় লোক বলিয়া ধারণা হইয়া থাকে, মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথকেও সেইরূপ ব্রাহ্মসমাজে অদ্বিতীয় লোক বলিয়া ধারণা হইবে। রামমোহন রায় যখন ঘোর ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত, তখন কি সুন্দর প্রণালীতে বিধাতা মহর্ষিকে রচনা করিতেছেন, দেখুন—

"যে শাস্ত্রে দেখিতাম পৌত্তলিকতার উপদেশ, সে শাস্ত্রে আমার আর শ্রদ্ধা থাকিত না। আমার তখন এই ভ্রম হইল যে, আমাদের সমুদায় শাস্ত্র পৌত্তলিকতার শাস্ত্র, অতএব তাহা হইতে নিরাকার নির্ব্বিকার ঈশ্বরের তত্ত্ব পাওয়া অসম্ভব। আমার মনের যখন এই প্রকার নিরাশ ভাব, তখন হঠাৎ এক দিন সংস্কৃত পুস্তকের একটা পাতা আমার সম্মুখ দিয়া উড়িয়া যাইতে দেখিলাম। ঔৎসুক্য বশতঃ তাহা ধরিলাম। কিন্তু তাহাতে যাহা লেখা আছে, তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য আমার কাছে বসিয়াছিলেন, আমি তাঁহাকে বলিলাম, আমি ইউনিয়ান ব্যাঙ্কের কর্ম্ম সারিয়া শীঘ্র বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতেছি, তুমি ইহার মধ্যে এই পাতার শ্লোক গুলানের অর্থ করিয়া রাখ, কুঠী হইতে আইলে আমাকে সব বুঝাইয়া দিবে। এই বলিয়া আমি ইউনিয়ান ব্যাঙ্কে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলাম। ঐ সময়ে আমি ইউনিয়ান ব্যাঙ্কে কর্ম্ম করিতাম। আমার ছোট কাকা রমানাথ ঠাকুর তাহার ধনরক্ষক। আমি তাঁহার সহকারী। ১০টা হইতে যতক্ষণ না কাগ নিকাশ হয়, ততক্ষণ তথায় আমার থাকিতে হইত। ক্যাশ বুঝাইয়া দিতে রাত্রি দশটা বাজিয়া যাইত। কিন্তু সে দিন শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্যের নিকট হইতে পুঁথির পাতা বুঝিয়া লইতে হইবে, অতএব ক্যাশ বুঝাইয়া দিবার গৌণ আর সহ্য হইল না। আমি ছোট কাকাকে বলিয়া কহিয়া দিন থাকিতে থাকিতে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম। আমি আমার বৈঠক খানার তেতালায় তাড়াতাড়ি যাইয়াই শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, সেই ছাপার পাতাতে কি লেখা আছে, আমাকে বুঝাইয়া দাও। তিনি বলিলেন, আমি এতক্ষণ এত চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তাহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমি আশ্চর্য্য হইলাম। ইংরাজ পণ্ডিতেরা তো ইংরাজি সকল গ্রন্থই বুঝিতে পারে। তবে সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিতেরা সকল সংস্কৃত গ্রন্থ বুঝিতে পারেন না কেন? আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তবে কে বুঝিতে পারে? তিনি বলিলেন, এতো সব সব ব্রহ্ম-সভার কথা— ব্রহ্ম-সভার রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বুঝিতে পারেন। আমি বলিলাম, তবে তাঁহাকে ডাক। বিদ্যাবাগীশ খানিক পরেই আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি পাতা পড়িয়া বলিলেন, এ যে ঈশোপনিষৎ। "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাংজগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মাগৃধঃ কস্য সিদ্ধনং।" যখন বিদ্যাবাগীশের মুখ হইতে "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং" ইহার অর্থ বুঝিলাম, তখন স্বর্গ হইতে অমৃত আসিয়া আমাকে অভিষিক্ত করিল।" আত্মজীবনী, ১৭, ১৮ ও ১৯পৃষ্ঠা।

বিধাতা কি সূত্রে কাহাকে কোন্ পথে লইয়া যান, সংসারের লোকেরা তাহা ধারণা করিতে অক্ষম। সামান্য এক টুকরা কাগজের লেখা হইতে দেবেন্দ্রনাথের অতি সুন্দর ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ হইল। ধনীর পুত্র, বিষয়-বিলাসিতার সেবা করিয়া জীবন কাটাইবেন, না তাঁহাকে বিষয় বিভবের মধ্য হইতে ধরিয়া বিধাতা কাণে কাণে

কি মন্ত্র প্রদান করিলেন। যুবা বিস্মিত হইলেন—স্বর্গ হইতে বিধাতা প্রাণে অবতরণ করিলেন। পত্নী থাদিজার সহিত ভ্রমণের সময় যেমন মহম্মদের নিকট ঈশ্বরবাণী হইয়াছিল, দেবেন্দ্র নাথের জীবনেও, সংসার-ভ্রমণ করিবার সময়, সেই প্রকার হইল। বিধাতা এই সব ঘটনার ভিতরে নিত্য-প্রত্যক্ষ,জীবন্তরূপে প্রকাশিত। খ্রীষ্টের নিকট যেমন জন-দি-বাপ্টিষ্ট, দেবেন্দ্র নাথের নিকট তেমন রাম চন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। খ্রীষ্টের জীবনের সহিত জন-দি-বাপ্টিষ্টের নাম জগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছে, আর দেবেন্দ্র নাথের জীবনের সহিত কি রাম চন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নাম এ দেশে অমরত্ব লাভ করিবে না ?

খ্রীষ্টের বাল্য জীবনের কথা যেমন বড় কেহ জানে না, দেবেন্দ্র নাথের বাল্য জীবনের কথাও বড় কেহ জানে না। ১৮ বৎসরের পর হইতে তিনি তাঁহার জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সেই সময় হইতে তাঁহার ধর্ম্ম-জীবনের আরম্ভ। অথবা, সেই সময়ই তাঁহার নব জন্ম। সে আত্মজীবনের অমূল্য কাহিনী পাঠ করিতে করিতে চক্ষে জলধারা প্রবাহিত হয়, প্রাণে স্বর্গীয় প্রভাব বিস্তৃত হয়। কেশব চন্দ্রের জীবনবেদ এবং মহর্ষির আত্মজীবনী ধর্ম্মজগতের অত্যাশ্চর্য্য সম্পত্তি।

এই রূপে,রাম মোহনের ধর্ম্মকে ধারণ ও জগতে রক্ষা করিবার জন্য দেবেন্দ্র নাথের উদয় হইল। তিনি প্রাণ মন, ঐশ্বর্য্য সম্পদ সমস্ত ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতির জন্য ঢালিয়া দিলেন। তন্ত্র, পুরাণ, বেদ ও উপনিষদ-সিন্ধু মন্থন করিয়া ধর্ম্মকে ব্যাখ্যাত করিলেন। শেষে তাহাতেও যখন ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় না বুঝিলেন, তখন আদেশ পাইয়া তিনি নিজে ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজমন্ত্র লিখিলেন।

"হে নাথ! তোমার দর্শন পাইয়াছি, তুমি আরো জাজ্বল্যমান হইয়া আমাকে দর্শন দাও। আমি তোমার বাণী শুনিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। তোমার আরো বাণী আমাকে শুনাও।" আত্মজীবনী ৪৮ পৃষ্ঠা।

"এই উপনিষৎ তো আমাদের সকল অভাব দূর করিতে পারে না—হৃদয়কে পূর্ণ করিতে পারে না। তবে এখন আমাদের কি করিতে হইবে? বেদে তাহার পত্তনভূমি হইল না—উপনিষদেও তাহার পত্তন-ভূমি হইল না। কোথায় তাহার পত্তন দিব? দেখিলাম যে, আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়ই তাহার পত্তনভূমি। পবিত্র হৃদয়েতেই ব্রহ্মের অধিষ্ঠান। পবিত্র হৃদয়ই ব্রাহ্মধর্ম্মের পত্তন ভূমি। সেই হৃদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যেখানে উপনিষদের মিল, উপনিষদের সেই বাক্যই আমরা গ্রহণ করিতে পারি। আর হৃদয়ের সহিত যে বাক্যের মিল নাই, সে বাক্য আমরা গ্রহণ করিতে পারি না।" আত্মজীবনী ১০৩ পৃষ্ঠা।

"আমার এখন ভাবনা হইল যে, ব্রাহ্মদের ঐক্য স্থান তবে কোথায় হইবে? তন্ত্র, পুরাণ, বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, কোথাও ব্রাহ্মদিগের ঐক্যস্থান, ব্রাহ্মধর্ম্মের পত্তন-ভূমি দেখা যায় না। আমি মনে করিলাম যে, ব্রাহ্মধর্ম্মের এমন একটী বীজমন্ত্র চাই যে, সেই বীজমন্ত্র ব্রাহ্মদিগের ঐক্যস্থান হইবে। ইহাই ভাবিয়া আমি আমার হৃদয় ঈশ্বরের প্রতি পাতিয়া দিলাম। বলিলাম,আমার আঁধার হৃদয় আলো কর। তাঁহার কৃপায় তখনই আমার হৃদয় আলোকিত হইল। সেই আলোকের সাহায্যে আমি ব্রাহ্মধর্ম্মের একটী বীজ দেখিতে পাইলাম। অমনি একটী পেন্‌সিল দিয়া সম্মুখের কাগজ খণ্ডে তাহা লিখিলাম এবং সেই কাগজ তখনি একটা বাক্সে ফেলিয়া দিলাম ও সেই বাক্স বন্ধ করিয়া চাবি দিয়া

রাখিলাম। তখন ১৭৭০ শক, আমার বয়স ৩১ বৎসর।" আত্মজীবনী, ১০৮ পৃষ্ঠা।

রামমোহন রায়ের পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম এই-রূপে আকার প্রাপ্ত হইল। অথবা রাম-মোহন দেবেন্দ্রনাথের জীবনে অভিব্যক্ত হইলেন। মহাত্মা অক্ষয়কুমার এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথের প্রধান সহায় হইলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সহানুভূতি দেখাইতে লাগিলেন। ইহার পর কলুটোলার সেনবংশে আর এক মহাপুরুষের অভ্যু-দয় হইল, যিনি অগ্নিস্ফুলিঙ্গে মাতো-য়ারা হইয়া উঠিলেন। জীবনবেদে আছে—"যখন কেহ সহায়তা করে নাই, যখন কোন ধর্ম্মসমাজের সভ্যরূপে প্রবিষ্ট হই নাই, ধর্ম্মজীবনের সেই উষাকালে "প্রার্থনা কর" এই ভাব, এই শব্দ হৃদয়ের ভিতরে উত্থিত হইত। আদেশের মত বড় তখন ভাবিতাম না। প্রার্থনা করিলে উত্তর পাওয়া যায়, এই জানিতাম। বুদ্ধি এমনি পরিষ্কার হইল, প্রার্থনা করিয়া যেন দশ বৎসর বিদ্যা-লয়ে ন্যায়শাস্ত্র, বিজ্ঞানশাস্ত্র, কঠোর শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিয়া আসিলাম। আমাকে ঈশ্বর বলিতেন, "তোর বইও নাই, কিছুই নাই, তুই কেবল প্রার্থনা কর। প্রার্থনা করিয়া আদেশের জন্য প্রতীক্ষা করিতাম।" তৎপর একদিন হঠাৎ মহাত্মা রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বক্তৃতা তাঁহার হস্তাগত হয়। পুস্তক পাঠ করিয়া তিনি দেখিলেন, তাহার মত মিলে। তখন ভাবিলেন, এ প্রকার যদি ব্রাহ্মধর্ম্মের মত হয়, তবে আমার সঙ্গে কোন বিভিন্নতা নাই। পরে ক্রমশঃ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের নিকট যাইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ১৮৫৭ কি ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে এই ঘটনা ঘটে। কি আশ্চর্য্য সূত্রে বিভিন্ন স্থান হইতে আর একটী দেবশিশুকে বিধাতা কুড়াইয়া আনিলেন, ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়, সব যেন প্রহেলিকাময় বলিয়া মনে হয়।

রামমোহনের ধর্ম্মের অভিব্যক্তির জন্য মহর্ষির উদয়, এবং মহর্ষির ধর্ম্মের অভি-ব্যক্তির জন্য, এইরূপে, কেশবচন্দ্রের উদয় হইল। উভয়েই ধনীগৃহে প্রতিপালিত, সুতরাং পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিবার সময় উভয়কেই অনেক তাড়না, নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল। মহর্ষি যে আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ জ্ঞান বা আদেশের উপর ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, তাহার পূর্ণ অভিব্যক্তি কেশবচন্দ্রের জীবনে পরিস্ফুট হয়। মহর্ষির আত্মজীবনীর ১৯২ ও ১৯৩ পৃষ্ঠায় আছে—"এই প্রকার ভাবিতেছি, এই সময়ে হঠাৎ আমি আমার অন্তর্যামী পুরু-ষের গভীর আদেশবাণী শুনিলাম—"তুমি এ উদ্ধত ভাব পরিত্যাগ করিয়া এই নদীর মত নিম্নগামী হও। তুমি এখানে যে সত্য লাভ করিলে, যে নির্ভর ও নিষ্ঠা শিক্ষা করিলে, যাও পৃথিবীতে গিয়া তাহা প্রচার কর।" আমি চমকিয়া উঠিলাম! ঈশ্বরের আদেশ বাড়ীতে ফিরিয়া যাওয়া, সে আদে-শের বিরুদ্ধে কি মানুষের ইচ্ছা টিকিতে পারে?"

এই আদেশের উপর ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তিকে অটল, অচল করিয়া কেশবচন্দ্র ধর্ম্মবিজ্ঞান-বীজ রোপণ করিলেন। তিনি জগতের সকল শাস্ত্রের সার গ্রহণ করিয়া শ্লোক সংগ্রহ প্রচার করিলেন। শেষ জীবনে সর্ব্ব ধর্ম্ম সম-ন্বয় করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে নববিধানরূপে ব্যাখ্যাত করিলেন। এইরূপে রামমোহনের

ধর্ম্ম দেবেন্দ্রের জীবনে, এবং দেবেন্দ্রের ধর্ম্ম কেশবচন্দ্রের জীবনে অভিব্যক্তিবাদের দ্বারা পরিস্ফুট ও শোধিত হইয়া নব আকারে প্রচারিত হইল। কিন্তু সে সকল কথার বিস্তৃত ধারাবাহিক ইতিহাসের কথা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব। তবে এইমাত্র বলি, এই তিনে এক, একে তিন। তিনেরই এক উদ্দেশ্য,এক লক্ষ্য, এক গতি, এক মন্ত্র। রামমোহন—দেবেন্দ্রনাথে পারস্ফুট, দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রে পরিস্ফুট। বিচ্ছিন্ন হইয়াও পরস্পরের শক্তিকে পরস্পর অনুপ্রাণিত। এই তিনের দ্বারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন রূপ ধর্ম্মবিধানের কাজ করিয়া মিলাইয়াছেন সেই অদ্বিতীয় ঈশ্বর, যিনি যুগে যুগে ধরার উদ্ধারের জন্য মহাপুরুষদিগকে উত্থিত করিয়া থাকেন। ধন্য তাঁহার কৃপা,ধন্য তাঁহার লীলা। এইরূপে দেশের উদ্ধারের মূল ধর্ম্মসংস্কারের কার্য্য আরম্ভ হইল। এই ধর্ম্মসংস্কারে সমাজ-সংস্কার, রাজনীতি-সংস্কার, ভাষা-সংস্কার যুক্ত হইল। এখানেও একে তিন, তিনে এক। ধর্ম্ম-সংস্কার,সমাজ-সংস্কার, রাজনীতি-সংস্কার, ভাষাসংস্কার রামমোহনের জীবনের লক্ষ্য, কেশবচন্দ্রের জীবনেরও লক্ষ্য, মহর্ষির জীবনেরও লক্ষ্য। ধর্ম্ম যখন উত্থিত হন,তখন সকল আসিয়া তাহাতে যুক্ত হয়। মহর্ষি খ্রীষ্ট এই জন্য বলিতেন, "তোমরা স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ কর, আর সকল তোমরা পরে পাইবে।" ধর্ম্ম ভিন্ন যে সমাজ, তাহা অনাচার ব্যভিচারের লীলাক্ষেত্র, ধর্ম্ম ভিন্ন যে রাজনীতি, তাহা অত্যাচার ও প্রভুপরায়ণতার প্রকট লীলা,ধর্ম্ম ভিন্ন যে ভাষা-সংস্কার, তাহা দুর্নীতি দুরাচারের প্রস্ফুট কাহিনী। ধর্ম্মকে বাদ দিয়া আজ কাল যে রাজনীতির চর্চ্চা,সমাজনীতির উত্থান ও ভাষার শ্রীবৃদ্ধির চেষ্টা হইতেছে, আমাদের বিবেচনায়, তাহা কখনও ফলপ্রসূ হইবে না। পৃথিবীর ইতিহাসে তাহা কখনও হয় নাই। কিন্তু সে সকল কথা অদ্য থাকুক।

এই তিন মহাত্মার অভ্যুদয় হইতে এ দেশে ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রচার বন্ধ হইয়াছে, এ কথা আমরা লিখিয়াছি; এ জন্য এ দেশের সর্ব্ব শ্রেণীর লোককে এই তিন মহাত্মার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

ইঁহাদের দ্বিতীয় মহৎ কাজ—ভাষা সংস্কার। রাজা রামমোহন রায় আধুনিক গদ্যের আদি পিতা বলিলে অধিক কিছু বলা হয় না। ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন ভিন্ন কখনও কোন দেশের উদ্ধার হয় নাই। ভারতবর্ষে যদি এক ধর্ম্ম এবং ভাষা না হয়,ভারতের উদ্ধারও সুদূর-পরাহত হইবে। প্রতিভার অবতার রামমোহন ইহা বুঝিয়াছিলেন। বুঝিয়াই বাঙ্গালা ভাষার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিয়াছিলেন। মহর্ষির জীবনব্যাপী চেষ্টায় বাঙ্গালা ভাষার যে কি পর্য্যন্ত শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে, তাহা কৃতী এবং বিজ্ঞ সকল ব্যক্তিই জানেন। মহর্ষির পরিবার—ভাষা-সংস্কারের জীবন্ত মূর্ত্তি। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা হইতে এদেশে শাস্ত্র-ব্যাখ্যা-প্রচারের আরম্ভ। মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্ত, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহাত্মাগণ মহর্ষির অন্তরঙ্গরূপে বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্য যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহা এ দেশ কখনও ভুলিতে পারিবে না। রামমোহন রায়ের বাঙ্গালা মহর্ষির সময়ে সংস্কৃত হইল, সেই ভাষা ব্রহ্মানন্দের সময়ে আরো সংস্কৃত হইল। একেশ্বরবাদী প্যারীচাঁদ মিত্র, রাজনারায়ণ বসু মহোদয়গণ এই ভাষাকে মধুর করিয়া প্রচার করিলেন। এ ক্ষেত্রে পরে মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্রের নাম

বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু তিনিও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, বর্ত্তমান বাঙ্গালা গদ্যের প্রধান সংস্কারক প্যারীচাঁদ মিত্র এবং কেশবচন্দ্র সেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা, অক্ষয়কুমারের ধর্ম্মনীতি, মহর্ষির ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান ও আত্মজীবনী এবং ব্রহ্মানন্দের ব্রহ্মগীতোপনিষৎ, জীবন-বেদ, সেবকের নিবেদন, বাঙ্গালা ভাষায় অক্ষয় কীর্ত্তি। যতদিন বাঙ্গালা ভাষা থাকিবে, ততদিন এই সকল পুস্তকের নাম বিলুপ্ত হইবে না। বঙ্গ প্রদেশ আর কোন কারণেও যদি এই মহাত্মাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞ না হয়, ভাষা-সংস্কারের জন্য কৃতজ্ঞ হইবেনই হইবেন। ইহাঁরা বাঙ্গালা ভাষার মূল প্রবর্ত্তক। ভাষা ভিন্ন জাতির উদ্ধার অসম্ভব; সুতরাং ইহাঁরাই জাতির উদ্ধারকর্ত্তা।

আমরা যে তিন মহাপুরুষের নাম করিয়াছি, তাঁহাদের জীবন আদর্শ জীবন কিনা, এ সম্বন্ধে নানা জনে নানা কথা বলিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের পরিবারে যখন তাঁহাদের জীবনের আদর্শ প্রতিবিম্বিত ও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তখন তাঁহাদের জীবন আদর্শ জীবন ছিল না। একজন মহাত্মা বলিয়াছিলেন—'অমুক ব্যক্তি সৎ কি না, তাহার ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিও ?—কেন না, ভৃত্য প্রভুর দোষ দেখিতে অবসর পায়।" একথার কোন মূল্য নাই। মহাপুরুষেরা এত উপরে বিচরণ করেন যে, নিকটস্থ সাধারণ লোকেরা তাঁহাদের প্রকৃত মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। খ্রীষ্টের প্রকৃত মহত্ত্ব সেই সময়ের নিকটস্থ ব্যক্তিরা সম্যক ধারণা করিতে পারে নাই,—শ্রীচৈতন্যের প্রকৃত মহত্ত্ব ধারণা করিতে পারে নাই, মহম্মদের প্রকৃত মহত্ত্ব সম্যক ধারণা করিতে পারে নাই, ম্যাট্‌সিনির মহত্ত্ব ধারণা করিতে পারে নাই এবং বিদ্যাসাগরের মহত্ত্বও যথাযথ ধারণা করিতে পারে নাই। ধারণা করার অর্থ তাঁহাদের মহত্ত্বে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহাদের ন্যায় কার্য্য করা। ধারণা করিতে পারিলে খ্রীষ্ট, শ্রীচৈতন্য, মহম্মদকে কখনও তাঁহাদের জীবিত কালে দেশে উপেক্ষিত হইতে হইত না এবং পরবর্ত্তী লোকেরা তাঁহাদিগকে অবতার করিতে পারিত না, কেননা, তাঁহারা সকলেই তীব্র ভাষায় অবতারের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। ধারণা করিতে পারিলে, ম্যাট্‌সিনির দেশে আবার রাজতন্ত্র শাসন প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইত না এবং তিনি নির্ব্বাসিত হইতেন না, এবং বিদ্যাসাগরের কীর্ত্তি সকলও লোপ পাইত না। বাঙ্গালার মহাপুরুষদিগের পরিবারবর্গ তাঁহাদিগের প্রকৃত আদর্শ ধারণা করিতে না পারিলেও, এ দেশে অনেক হৃদয়ে তাঁহাদের আদর্শ ক্রীড়া করিতেছে এবং আমরা বিশ্বাস করি, সময়ে তাঁহাদের ব্রত লইয়া দেশোদ্ধার-ক্ষেত্রে অনেক বীরের অভ্যুত্থান হইবে। এক সময়ে তাহা হইবেই হইবে।

মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ কে ছিলেন এবং কি ছিলেন, তাহার প্রকৃত পরিচয় দিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। যাঁহার প্রতিভার একটু স্ফুলিঙ্গে স্বর্ণকুমারী এবং রবীন্দ্র নাথের উদয়, জ্ঞানের এক কণিকায় দ্বিজেন্দ্র নাথের উদ্ভব, কর্ম্মের একটু অনুপ্রাণনে সত্যেন্দ্র নাথের অভ্যুদয়, তাঁহার প্রকৃত পরিচয়ের এখনও সময় হয় নাই। উঁহাদের এবং এ দেশের অনেক, অনেক, অনেক জীবনের ইতিহাসে তাহা পরিস্ফুট ও পরিব্যক্ত হইবে। তিনি জাতিভেদ রাখিয়া-

ছিলেন কি ভাঙ্গিয়াছিলেন, তিনি হিন্দু কি অহিন্দু ছিলেন,—তিনি রক্ষণশীল কি উদারনৈতিক ছিলেন—এ সকল বিষয়ের কে মীমাংসা করিবে? যাঁহারা মুখে সত্যের মহিমা বলেন, কিন্তু জীবনে পালন করেন না, তাঁহারা যেমন সত্যের মাধুর্য্য বুঝিতে অক্ষম, যাঁহারা মহর্ষির মহত্বে অনুপ্রাণিত না হইয়া কেবল মুখে মুখে তাঁহার কথা বলিতে চাহেন, তাঁহারাও তাঁহার প্রকৃত মহত্ব বুঝিতে, সেই প্রকার, অক্ষম। প্রকৃত পরিচয় কে পায়? দেখা হইলেই বালক বালকের পরিচয় পায়, জ্ঞানী জ্ঞানীর পরিচয় পায়, প্রেমিক প্রেমিকের পরিচয় পায়, ধার্ম্মিক, ধার্ম্মিকের পরিচয় পায়। যে কখনও সাগর দেখে নাই, সে কি সাগরের সৌন্দর্য্য গাম্ভির্য্য বুঝিতে পারে? যে কখনও সন্দেশ খায় নাই, সে কি সন্দেশের মিষ্টত্ব বুঝিতে পারে? মহর্ষির মহত্বের প্রকৃত পরিচয় তিনিই পাইবেন, যিনি মহর্ষির অনুপ্রাণনে নবজীবন লাভ করিবেন। তিনি, তুমি, আমি, তাঁহার মহত্ব ধারণা করিতে অক্ষম—নিতান্তই অক্ষম।

তবে জিজ্ঞাস্য এই—তিনি ঋষি ছিলেন কি না? এ কথার উত্তরও এক কথায় দেওয়া অসম্ভব। পৌত্তলিকতা পরিত্যাগের জন্য তিনি যে কঠোর সংগ্রাম করিয়াছিলেন, তাহাতে ঋষিত্বের কতক পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু ঋষিত্বের প্রকৃত পরিচয় তখনই পাওয়া যায়, যখন তিনি বিষয়-মমতা পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন এবং যখন তিনি ওয়ারেণ্টে গ্রেপ্তার হইয়াও সত্য পরিত্যাগ করিলেন না। তাঁহার জীবনের এ কথার গভীরতায় যাঁহারা অনুপ্রাণিত না হইবেন, তাঁহারা তাঁহার ঋষিত্ব বুঝিতে পারিবেন না। আমাদের বিশ্বাস, রাজনারায়ণ ও রামতনু ঋষি ছিলেন, দেবেন্দ্র নাথ মহর্ষি ছিলেন। এযুগে তাঁহার ন্যায় স্বার্থত্যাগী, অনাসক্ত, নির্লিপ্ত পুরুষ আর জন্মগ্রহণ করে নাই। জনক যেমন রাজা হইয়াও ঋষি ছিলেন, দেবেন্দ্র নাথ ধনৈশ্বর্য্যের মধ্যে থাকিয়াও, তেমনি, ঋষি ছিলেন। যে ধর্ম্মরক্ষার জন্য অম্লান চিত্তে ট্রাষ্ট সম্পত্তির সকল মমতা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সময়ে সেই ধর্ম্মই তাঁহাকে আবার সকল সম্পত্তি ফিরাইয়া দিয়াছিল, ইহা এক আশ্চর্য্য ঘটনা। গৃহ পরিবারে থাকিয়া ধর্ম্ম সাধন করিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের সৃষ্টি, এই সাধনে তিনি সিদ্ধি লাভ করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন যে, ধর্ম্ম সাধনের জন্য অরণ্যবাসী হইবার প্রয়োজন নাই;—নির্লিপ্ত হইতে পারিলে সংসারেই অরণ্য সৃজিত হয়। আসক্তি পরিত্যাগ করিতে না পারিলে অরণ্যও সাধনের অনুপযোগী, আর আসক্তি ছাড়িতে পারিলে সংসারই সাধনার উপযোগী। ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মসুধারস-পানে বিভোর হইয়া দেবেন্দ্র নাথ সংসারকে ভ্রূকুটী দেখাইতেন, পাপ প্রলোভন তাঁহার ধারেও ঘেঁসিতে পারিত না। তিনি নেতা হইয়াও নেতৃত্ব করেন নাই, দলপতি হইয়াও দল বাঁধেন নাই, গণ্ডিবদ্ধ হন নাই। সর্ব্ব বিষয়ে নিষ্কাম, সার্থত্যাগী হইয়া, মহাযোগে সদা তিনি যুক্ত থাকিতেন। ব্রহ্মনাম শুনিবামাত্র, ব্রহ্মনাম করিবামাত্র, তাঁহার মস্তকের কেশ খাড়া হইত, বদন রক্তাভ হইত,—ভক্তির সকল লক্ষণ ফুটিয়া উঠিত। তিনি কখনও কোন বুজরুকি বা ধার্ম্মিকতার ভাণ করিয়া জগৎকে আকর্ষণ করেন নাই। আপনি সদা মহা সাধনায় ডুবিয়া থাকিতেন। ব্রহ্মসাধনে জয় লাভ করিয়া, সংসারেই ধর্ম্ম সাধন সম্ভব, ইহার অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। এরূপ মহজ্জীবন এ দেশের এবং সর্ব্বদেশের আদর্শ। অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও তিনি কিরূপে ধর্ম্ম রক্ষার জন্য তাহার মমতা ছাড়িয়াছিলেন, সে দৃষ্টান্ত অতুলনীয়,তাহা কেবল জনক ঋষিতে সম্ভব হইয়াছিল। দেখুন,তাহা কত সুন্দর—

"আমি কাশী হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখি যে, আমাদের হাউসকার ঠাকুর কোম্পানি টলমল করিতেছে। হুণ্ডী আসিতেছে, তাহা পরিশোধ করিবার টাকা সহজে জুটিতেছে না। অনেক চেষ্টায়, অনেক কষ্টে, প্রতিদিন টাকা যোগাইতে হইত। এমন করিয়া আর কতদিন চলে। এই সময়ে এক দিন একটা ত্রিশ হাজার টাকার হুণ্ডী আসিল। সে টাকা আর দিতে পারা যাইতেছে না। সে দিন সন্ধ্যা হইল, টাকা জুটিল না। হুণ্ডীওয়ালা টাকা না পাইয়া হুণ্ডী লইয়া ফিরিয়া গেল। কার-ঠাকুর কোম্পানির হাউসের সম্ভ্রম চলিয়া গেল—আফিসের দরজা সকল বন্ধ হইল। ১৭৬৯ শকের ফাল্গুন মাসে কার-ঠাকুর কোম্পানির বাণিজ্য ব্যবসায় পতন হইল। তখন আমার বয়স ৩০ বৎসর। প্রধান কর্ম্মচারী ডি, এম, গর্ডন সাহেবের পরামর্শে সমস্ত পাওনাদারদিগকে ডাকিয়া একটা সভা করা গেল। ব্যবসায় পতনের তিন দিবস পরে হাউসের তৃতীয় তল গৃহে উহাঁরা সকলে সমবেত হইলেন। ডি, এম, গর্ডন আমাদের দেনা পাওনার একটা হিসাব প্রস্তুত করিয়া এই সভাতে উপস্থিত করিলেন। সেই হিসাবে দেখান হইল যে, আমাদের হাউসের মোট দেনা এক কোটি টাকা—পাওনা সোত্তর লক্ষ টাকা—ত্রিশ লক্ষ টাকার অসংস্থান। তিনি সভার সম্মুখে বলিলেন যে, "হাউসের অধিকারীরা আপনার আপনার নিজের যে কিছু সম্পত্তি আছে, তাহাও ইহাতে দিয়া ইহার অসংস্থান পূর্ণ করিতে প্রস্তুত আছেন। এই হাউসের পাওনা ও সম্পত্তি এবং ইহাঁদের জমীদারীর স্বত্ব, সকলি আপনারদের অধীনে আনিয়া আপন আপন পাওনা পরিশোধ করুন; কিন্তু একটি ট্রষ্ট-সম্পত্তি আছে, তাহাতে তাঁহারা অধিকারী নহেন, কেবল সেই সম্পত্তির উপরে আপনারা হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না"। গর্ডন এইরূপ বক্তৃতা করিতেছেন, আমি গিরীন্দ্র নাথকে বলিলাম—"গর্ডন সাহেব পাওনাদারদিগকে ভয় দেখাইতেছেন যে, আমাদের ট্রষ্ট সম্পত্তিতে কেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। এ সময় আমাদের নিজে অগ্রসর হইয়া বলা উচিত, যদিও আমাদের দেনার দায়ে ট্রষ্ট-সম্পত্তি কেহ হস্তান্তর করিতে পারেন না, তথাপি আমরা এই ট্রষ্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া ঋণ পরিশোধের জন্য ইহাও ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত আছি। যাহাতে আমরা পিতৃ-ঋণ হইতে একেবারে মুক্ত হইতে পারি সেই পথই অবলম্বন করা শ্রেয়। যদি অন্যান্য সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধ না হয়, তবে ট্রষ্ট-সম্পত্তিও বিক্রয় করিতে হইবে"। এদিকে পাওনাদারেরা কতকগুলা সম্পত্তির উপরে তাঁহাদের হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা নাই শুনিয়া বড় সন্তুষ্ট হইতেছেন না। কিন্তু যখন তাঁহারা অনতিবিলম্বেই শুনিলেন যে, কোন আইন আদালতের মুখাপেক্ষা না করিয়া আমরা স্বেচ্ছাক্রমে অকাতরে ট্রষ্ট-সম্পত্তির সহিত আমাদের সকল সম্পত্তিই তাঁহাদের হস্তে দিতে প্রস্তুত আছি, তখন তাঁহারা স্তম্ভিত হইলেন। দেখিলাম,আমাদের এই প্রস্তাব শুনিয়া অনেক সহৃদয় মহাজনের চক্ষু হইতে অশ্রুপাত হইল। আমাদের এই আসন্ন বিপদ দেখিয়া তাঁহারাও বিষণ্ণ হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন যে এই হাউসের উত্থান ও পতনে আমাদের কোন হস্ত নাই। আমরা নির্দ্দোষ ও নিরীহ। আমাদের মস্তকে এই অল্প বয়সে এই দারুণ বিপদ পড়িল। আজ আমাদের এ ঐশ্বর্য্য বিভব, কাল আর ইহার কিছুই আমাদের থাকিবে না, ইহাই ভাবিয়া তাঁহারা দয়ার্দ্র হইলেন। কোথায় তাঁহাদের ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া ক্রুদ্ধ হইবেন, না, তাঁহারা দয়ার্দ্র হৃদয় হইলেন। এই সময়ে

তাঁহাদের হৃদয়ে কোথা হইতে দয়া আইল? তিনিই ইহাঁদের মনে দয়া প্রেরণ করিলেন, যিনি আমার চিরজীবন সখা। তাঁহারা প্রস্তাব করিলেন যে, যখন, ইহাঁরা সকলি ছাড়িয়া দিলেন, তখন ইহাঁদের সম্পত্তি হইতে ভরণ পোষণের জন্য ইহাঁরা প্রতি বৎসর ২৫০০০৲ পচিশ হাজার টাকা করিয়া পাইবেন। দেনাদার পাওনাদারদিগের মধ্যে এইরূপ একটা সদ্ভাব রহিয়া গেল। কেহ আর তখন আপনার পাওনার জন্য আদালতে নালিশ আনিলেন না। আমাদের সকল সম্পত্তি তাঁহারা আপন হাতে গ্রহণ করিলেন এবং সেই বিষয় চালাইবার জন্য তাঁহাদের মধ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে লইয়া একটি কমিটি সংগঠিত করিলেন। সেই কমিটির একজন সম্পাদক হইলেন, তাঁহার বেতন এক হাজার টাকা হইল। তাঁহার অধীনে আরও কর্ম্মচারী থাকিল। এখন হইতে কার-ঠাকুর কোম্পানী "ইন্ লিকুইডেশন" নামে তাঁহাদের কার্য্য চলিতে লাগিল।

আমাদের সকল সম্পত্তির উপরে পাওনাদারেরা আপন কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করিয়া সভাসঙ্গ করিলেন। আমরা দুই ভাই বাড়ী চলিলাম। গাড়ীতে যাইতে যাইতে আমি গিরীন্দ্র নাথকে বলিলাম—"আমরা তো বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিয়া সকলি দিলাম"। তিনি বলিলেন—হাঁ, এখন লোকে জানুক, আমাদের জন্য আমরা কিছুই রাখি নাই—তাহারা বলুক যে, ইহাঁরা সকল ধন দিলেন, "সর্ব্ববেদসং দদৌ"। আমি বলিলাম যে, "লোকে বলিলে কি হইবে? আদালত তো শুনিবে না। আদালতে যে কেহ একজন নালিশ করিলেই আমাদের শপথ করিয়া বলিতে হইবে যে, আমরা সকলি দিলাম, আমাদের আর কিছুই নাই। নতুবা আদালত আমাদিগকে ছাড়িবে না। কিন্তু যাবৎ অঙ্গে একটি চীর পর্য্যন্ত থাকিবে, তাবৎ রাজদ্বারে দাঁড়াইয়া শপথ করিয়া বলিতে পারিব না যে, সব দিলাম।—এমনি সকলি দিব, কিন্তু শপথ করিতে পারিব না। ঈশ্বর ও ধর্ম্ম আমাদিগকে রক্ষা করুন। যেন ইন্‌সলবেণ্ট আইনে আমাকে মস্তক দিতে না হয়। এই সকল কথা বার্ত্তায় আমরা বাড়ী পঁহুছিলাম।

আমি যা চাই তাই হইল—বিষয় সম্পত্তি সকলি হাত হইতে চলিয়া গেল। যেমন আমার মনে বিষয়ের অভিলাষ নাই, তেমনি বিষয়ও নাই, বেস মিলে গেল— * *

"সেই অভিলাষে, বিদ্যুতের প্রার্থনা ছাড়া আর কোন প্রার্থনা না থাকুক—যদি বিদ্যুৎ পড়িয়া ধনধান্য জ্বলিয়া যায়, তবে সে বড় আশ্চর্য্য নহে।" বিদ্যুৎ পড়ুক, বিদ্যুৎ পড়ুক, বলিতে বলিতে যদি বিদ্যুৎ পড়িয়া সব জ্বলিয়া যায়, তবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আমি বলি যে, "হে ঈশ্বর আমি তোমা ছাড়া আর কিছু চাই না।" তিনি প্রসন্ন হইয়া এ প্রার্থনা গ্রহণ করিলেন। গ্রহণ করিয়া আমার নিকটে প্রকাশ হইলেন এবং আর সব কাড়িয়া লইলেন। "তুমড়ীকি ঠুডডা মরেসসর নহী কে চিবাকে পানি পিয়ু"। যাহা প্রার্থনাতে ছিল, তাহা পূর্ণ হইয়া এখন কার্য্যে পরিণত হইল। সে শ্মশানের সেই এক দিন, আর অদ্যকার এই আর এক দিন। আমি আর এক সোপানে উঠিলাম। চাকরের ভিড় কমাইয়া দিলাম, গাড়ি ঘোড়া সব নিলামে দিলাম—খাওয়া পরা খুব পরিমিত করিলাম—ঘরে থাকিয়া সন্ন্যাসী হইলাম। কল্য কি খাইব, কি পরিব, তাহার আর ভাবনা নাই। কাল এ বাড়ীতে থাকিব, কি, এ বাড়ী ছাড়িতে হইবে, তাহার ভাবনা নাই। একেবারে নিষ্কাম হইলাম। নিষ্কাম পুরুষের যে সুখ ও শান্তি, তাহা উপনিষদে পড়িয়াছিলাম, এখন তাহা জীবনে ভোগ করিলাম। চন্দ্র যেমন রাহু হইতে মুক্ত হয়, আমার আত্মা তেমনি বিষয় হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোককে অনুভব করিল। "হে ঈশ্বর, অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে তোমাকে না পাইয়া প্রাণ আমার ওষ্ঠাগত হইয়াছিল—এখন তোমাকে পাইয়া আমি সব পাইয়াছি।" আত্মজীবনী। ৮৫,৮৬,৮৭,৮৮ পৃষ্ঠা।

এই রূপ নিষ্কাম জীবনও যদি আবিষ্ট না

পাইয়া থাকে, তবে আর কে কবে পাইয়াছে? শুনিতেছি মহর্ষির স্বর্গারোহণ হইয়াছে;—মাটীর জিনিষ অগ্নিতে ভস্ম হইয়া থাকিতে পারে, তাঁহার জীবনে কোন অসার জিনিষ থাকিলে তাহাও বিলীন হইতে পারে;—বিলীন না হইয়া থাকে, কালে হইবে; কিন্তু মহর্ষির নির্ম্মল অমৃতময় জীবন চিরকাল স্থায়ী, তাহা চিরকাল মানবকে ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত করিবার জন্য জগতের হইয়া রহিল। ঠাকুর বংশ ধ্বংস হইতে পারে, কলিকাতা ধ্বংস হইতে পারে, কিন্তু মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথের অমূল্য ধর্ম্মজীবন চিরকাল পুনঃকথিত হইয়া মানব-জাতিকে উন্নত করিবে। "অদ্যাপিও লীলা করে ভক্ত গৌর রায়, মর্ত্ত্যধামে ভক্তজন দেখিবারে পায়—" এতদার্থক ব্যাকের সারত্ব ঘোষণার জন্য দেবেন্দ্র নাথ অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। সে পুনঃজীবন যদি বিলুপ্ত হয়, বাঙ্গালী জাতির অস্তিত্বও বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, পুণ্যময়ের নাম ধরা হইতে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। কিন্তু তাহা বিধাতার বিধান নয়। বিধাতার বিধানের জয় হইবেই হইবে। মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ এ সংসারে চিরজীবিত থাকিবেন।

দুটী কবিতা

বন্য কুসুম।

নীরবে ফুটেছে বনের কুসুম,
নীরবে বিতরে সৌরভ রাশি,
নীরবে মলয় চুমিছে তাহারে
নীরবে গুঞ্জরে ভ্রমর আসি।

প্রভাত বেলায় শিশিরাক্ত দেহে
যখন কুসুম ফুটিয়া রয়,
তপনের নব বিমল কিরণে
তখন কতই সুষমাময়।

সারাটী দিবস একেলা বসিয়া
না জানি নীরবে কি গীত গায়,
কখন (ও) বা কোন প্রজাপতি আসি
আদরে অধরে চুমিয়া যায়।

সান্ধ্য পবনের মৃদুল পরশে
দেহখানি তার ভাঙ্গিয়া পড়ে,
প্রকৃতির কোলে নীরবে লুটায়
বুঝিবা মরমে শুকায়ে মরে।

মূর্খ মানবেরা চাহেনা ফিরিয়া
বন-কুসুমের পানেতে কভু,
বন মাঝে থাকি নীরবে ফুটিয়া
নীরবেতে দেয় সৌরভ তবু।

তা'রা শুধু চায় গোলাপ চামেলী
মন মাতোয়ারা যে সব ফুলে,
তাই—বনের কুসুমে করে অনাদর
চাহেনা [illegible] নয়ন তুলে।

শ্রীহিরণ্ময়ী সেন

আসিও সেদিন।

তুমি—আসিও সেদিন শারদীয়া নিশি!
যখন ফুটিবে জ্যোছনা ধারা,
হাসিবেক শশী পুলকে মাতিয়া
এ প্রাণ হইবে আপনা-হারা।
ওই—সরসে ফুটিবে সোণার কুমুদ
ঢুলুঢুল ঢুলুল ঢুলিবে যবে,
সে সৌন্দর্য্যে মাতি হরষে ভরিয়া
মৃদুল মৃদুল হিল্লোল ব'বে।
যখন—উছলি উছলি, ছুটিবে তটিনী
গাইয়া মধুর আনন্দ গাথা,
তখন—এ প্রাণে খেলিবে সুখের লহরী
ভুলিয়া যাইব সকল ব্যথা।
যখন—জগত হাসিবে তোমারে হেরিয়া,
বিমল সৌন্দর্য্য অঙ্গেতে মাখি,
ওই—শূন্য নীলিমায় দাঁড়াবে প্রকৃতি
শুভ্র বসন আননে ঢাকি।
তরল জ্যোছনা পড়িবে কাননে
হাসিবে যখন কুসুম বালা,
তখন—সে হাসি মাধুর্য্যে কানন হাসিবে
এ প্রাণ হইবে আপনা-ভোলা।
আর—আসিও সেদিন,—যেদিন আমার
ভাঙ্গিয়া এদেহ পিঞ্জর খান,
প্রাণ-পাখী মোর যাইবে উড়িয়া
গাহিবে যখন অন্তিম গান।

শ্রীহিরণ্ময়ী সেন।

রাজভক্তি

পাঠ্য পুস্তকে দেখিতে পাই, রাজা ও দেবতায় বিভেদ নাই, তবে দেবতা অপেক্ষা রাজা বড়, কারণ রাজা প্রত্যক্ষ ফলদাতা, দেবতা পরোক্ষ ফলদাতা। ইংরাজ প্রথমে আমাদের বাইবেল শিখাইতেন, তাহাতে লিখিত আছে, সাধু মুশাকে তিনি বলিয়াছিলেন, আমার পরিবর্ত্তে কোন মূর্ত্তি কি মানব, কি সৃষ্ট জীবকে পূজা করিবে না, বা আমার সমকক্ষ মনে করিবে না, ইত্যাদি। সেই ইংরাজ-গঠিত Text Book Committee, যাহাতে পাদরী সভ্যও আছেন, বিনা আপত্তিতে ঐরূপ সকল পুস্তক নির্ব্বাচন করেন। লোকে যখন স্বার্থপর হইয়া আত্মবিস্মৃত হয়, তখন তাহাদের এইরূপ অধোগতি হয়। কেবল একখানি পুস্তক নহে। আজি কালি ছেলেদের পড়ার ভূগোলে কয়েকটী দেশ মাত্র উল্লেখ আছে, ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, আয়র্লণ্ড, জিব্রালটার, সুএজ, এডেন, ভারতবর্ষ,সিংহল, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা। ইহাতেই ভূগোল সমাপ্ত, তবে পরিশিষ্টে আরও দুই একটী দেশের নাম অনুগ্রহ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে ৪ মহাদেশের নাম নাই, রুসিয়া, ফ্রান্স, জর্ম্মেনি, প্রভৃতি দেশের বিবরণ ৪।৫ লাইনে লিখিত। অর্থাৎ ছাত্রগণ তোমরা চক্ষে ঠুলি বাঁধিয়া রাখ, সাবধান, অন্য জাতির মহত্ত্ব দেখিওনা, দেখিবার অধিকার নাই, কারণ "ভারতবর্ষ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ পরাধীন দেশ।"

সাহিত্য-জগতের যাঁহারা সম্রাট, তাঁহারা কোথায় গিয়াছেন? বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব, মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, তাঁহাদের কথা পড়িও না, কারণ তাঁহাদের চিন্তা ও লেখা মনুষ্যত্ব বৃদ্ধি করে, পড় ম্যাকমিলান কোম্পানির বড় বাবুর তর্জমা করা পুথি, তাহার মধ্যে দুই একটা পদ্যও থাকে। তাহা বঙ্গবাসী-প্রদত্ত নাম "বিশ্ববিদ্যালয়ী বাঙ্গালায়" লিখিত মহারাণী ও মহারাজার গুণগান। রাজার গুণগান পুস্তকে থাকিলে হয় না, পঞ্জিকায় লেখা থাকে ২০ আড়া জল, কিন্তু নিংড়াইলে এক ফোঁটাও বাহির হয় না, সুতরাং এ লেখার ফল কি? ছেলেরা জানে যে,তাহাদের উচ্চশিক্ষা রাজা বন্ধ করিবেন, তাহাদের বৃত্তি সংখ্যারও মূল্য কমিতেছে, শিক্ষার উপর শনির দৃষ্টি পড়িতেছে। এস্থলে কেমন করিয়া তাহারা রাজভক্তিতে উৎফুল্ল হইবে?

ছেলেদের পুস্তক মধ্যে ভারতের যাহা যাহা তোষামোদকারীর জীবনচরিতে দেওয়া হইতেছে, গবর্ণমেণ্টের উচ্চপদস্থ একজন কর্ম্মচারী আমাদের দেশের সর্ব্বোচ্চ এক মহাত্মার জীবনচরিত লিখিতে গিয়া কেবল তাঁহার ২টা দোষই উল্লেখ করিয়াছেন, যেন এই দুই দোষের সমষ্টিই জগতে তাহাকে এত বড় করিয়াছে। এইরূপে আমাদের প্রকৃত মহাত্মাগণকে হীনপ্রভ ও অপদার্থগণকে উজ্জ্বল করিতে চেষ্টা হয়, অথচ আমাদের একথা বলিবার সাধ্য নাই যে,

চাঁড়ালের হাত দিয়া পোড়াও পুস্তকে,
ভস্ম করি ফেলি দাও কর্ম্মনাশা জলে।

ধরিয়া বান্ধিয়া রাজভক্তি হয় না, আমরা

শিশু নহি যে, গবর্ণমেণ্ট যাহা বলিবেন, তাহাতেই বিশ্বাস করিব। আমরা দেখিতেছি, একটী মহান জাতি দিন দিন নিরন্ন ও হীনতেজ হইয়া আসিতেছে, যে দেশ রত্নের ভাণ্ডার, সে দেশে নিত্য দুর্ভিক্ষ। তাহার ধনরত্ন কৌশলে লুণ্ঠিত, তাহার শারীরিক ও মানসিক তেজ চক্রান্তে তিরোহিত, তাহাদের সকল গৌরব ক্রমশঃ অপহৃত, তবুও তোমরা বল, "তথাপি গৌরাঙ্গ মোরে রাখ রাঙ্গা পায়।"

ভারতবাসী এক্ষণে কার্য্য পাবে না, তৎপরিবর্ত্তে উপহাস পাইবে। প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণীর প্রতিজ্ঞা পত্রের সম্মান তিরোহিত হইয়াছে, প্রজার প্রতি জাতিবর্ণ ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সাম্য রক্ষিত হইতেছে না। ভারতবাসী কুলি হইয়াছে, সমস্ত গৌরাঙ্গ জাতি যাহাতে আমাদের রাজা বলিয়া পরিগণিত হয়, এই কৌশল অবলম্বিত হইতেছে, তোমরা দেখ, আর উচ্চৈঃস্বরে বল "প্রণমি গৌরাঙ্গ আমি তব রাঙ্গা পায়।" যে ভাল চায়, সে ভাল পায়। তুমি যদি শস্য রোপণ কর, প্রচুর শস্য পাইবে, আর যদি বাতাস রোপণ কর, ঝড় পাইবে। ভারতবাসীকে গরিব করিতে চাও, কুলি করিতে চাও, জীবন-সংগ্রামে শ্বেতজাতির সংস্রবে নিধন করিতে চাও, আমেরিকার আদিমবাসীদের ন্যায় উৎসন্ন করিতে চাও, ভারতবাসী কি পশু যে রাজভক্তিতে উৎফুল্ল হইবে?

যতদিন রাজা প্রজার হিতাকাঙ্ক্ষী, প্রজা ততদিন রাজভক্ত থাকিবে, কিন্তু যখন প্রজার সর্ব্বনাশ করিয়া রাজা বড় হইতে চাহেন, রাজার নবাবির জন্য প্রজার হাঁড়ির শেষ মুষ্টি তণ্ডুল লুণ্ঠিত হইবে, তখন রাজভক্তি কোথা হইতে আসিবে? বঙ্গদেশ একটু মস্তক উন্নত করিয়াছিল। বাঙ্গালা ভাষা একটু তেজস্বী হইতেছিল। অমনি কূটচক্রী নেপোলিয়নের ন্যায় তাহার অঙ্গচ্ছেদ করিলে, বাঙ্গালী তোমরা কোন্ গুণে রাজভক্তি দেখাইবে?

মহামতি কটন রাজা প্রজায় সাম্য ভাব দেখাইতেন, তাঁহার কর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইল; তোমার ইচ্ছা যে "জাহাজী গৌরাঙ্গ কি বা ভেকধারী" সকলই আমাদের রাজপূজা পাইবে। এ নীতিতে রাজভক্তি কেমন করিয়া উছলিয়া উঠিতে পারে?

পূর্ব্বে ভারতবাসী রাজভক্তিতে পরিপূর্ণ ছিল, আবার রাজাও তেমনি প্রজার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতেন। রাজা প্রজার মনস্তুষ্টির জন্য আপন মহিষীকে পরিত্যাগ করিতেন, তাই আমরা রামকে দেবতা বলিয়া পূজা করি, কিন্তু জরাসন্ধ, শিশুপাল, কংসও রাজা ছিল, তাহাদিগকে কে পূজা করিত, বা দেবতা বলিত?

ইতিহাস বলিয়া দিতেছে যে, ভারতবাসী অদৃষ্টবাদী হউক, কৃষ্ণবর্ণ হউক, ধর্ম্মপরায়ণ হউক, কিন্তু মানব-চরিত্র সর্ব্বত্র এক ধাতুতে গঠিত। বাঙ্গালী অত্যাচার সহিতে অসমর্থ হইয়াই সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিয়া ইংরাজকে ডাকিয়া আনিয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয়গণ আরঙ্গজীবের অত্যাচারে উত্তেজিত হইয়াই শিবজীর ন্যায় মহারত্ন শিরে ধারণ করিয়াছিল, নানক-শিষ্যগণ প্রবল হইয়াছিল। যদি প্রেম দাও, তৃপ্তি দিব, যদি পদাঘাতে প্লীহা ফটাইয়া বিচার না কর, নিরুপায় হইয়া ভগবানের নিকট কাঁদিব। কিন্তু অকারণ রাজভক্তি দেখাইব না। ভক্তির পাত্রকে চিরদিন ভারত-

বাসী ভক্তি করিতে জানে, অকৃতজ্ঞ নাম তাহার নাই। আমরা মুসলমান রাজত্ব ভাল না বাসিলেও আকবরকে ভক্তি করি, লর্ড রিপনকে প্রাণের সহিত ভক্তি করি, আমরা গরিব বলিয়া তাঁহার মূর্ত্তি গড়ের মাঠে প্রস্তুত করিতে পারি নাই, কিন্তু ভারতবাসীর প্রাণে তাঁহার নাম স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে। তেমনই যাহারা আমাদের অনিষ্টকারী, ক্ষমাশীল ভারতবাসী তাহার অনিষ্ট না করিতে পারে, কিন্তু ত্রিংশতি কোটী ভারতীয় নরনারীর উষ্ণ শ্বাস ও অশ্রু ভগবানের নিকট গমন করিবে, সন্দেহ নাই। যাঁহার নিকট রাজা প্রজা সমান, নিঃশ্বাসে কোটী সাম্রাজ্যের উত্থান পতন, তাঁহার নিকট ক্রন্দন কখনও বিফল হয় না, হইবে না। তাই বলি, যদি ভারতবাসীর প্রাণে কৃতজ্ঞতা সঞ্চার করিতে না পার, রাজভক্তি চাহিও না। ধরিয়া বাঁধিয়া কখনও হরিভক্তি হয় না।

শ্রীপ্যারীশঙ্কর দাস।

উপনিষদ গ্রন্থাবলী।

প্রশ্ন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন

[ক্রমে প্রধান প্রধান উপনিষৎ সকল পয়ারাদি চির-প্রচলিত ছন্দে সহজ ভাষায় অনুবাদিত হইলে বঙ্গবাসীর প্রভূত উপকার সাধিত হয়, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া উপনিষৎ গ্রন্থাবলী নাম দিয়া প্রশ্নোপনিষদের মর্ম্মানুবাদ প্রকাশ করিলাম। অন্যান্য উপনিষৎ যথাকালে প্রকাশিত হইবে]

ভৃগুপুত্র পিপ্পলাদে, জিজ্ঞাসিলা "ভগবন
কি সংখ্যক শক্তি আছে দেহের ভিতরে ?
সে সব শক্তির মাঝে, কি সংখ্যক স্বপ্রকাশ,
কোন শক্তি শ্রেষ্ঠতম ? কহ দয়া করে।"
উত্তরিলা ঋষিবর, "পৃথিবী, আকাশ, বায়ু
অগ্নি, জল, বাক্, মন, লোচন, শ্রবণ
এ সব শক্তি নিচয় স্পর্দ্ধা করি একদিন,
কহিলা 'আমরা করি শরীর রক্ষণ।'
শ্রেষ্ঠতম শক্তি প্রাণ; কহিলা তা সবে লক্ষি,
'মোহবশে বৃথা বাক্য না কহিও আর ;
আমি পঞ্চ ভাগ হ'য়ে, রক্ষা করি জীব দেহ',
আমি রক্ষা করি, এই কথা বুঝ সার।
আকাশ অনিল অগ্নি ইত্যাদি সকল দেব
প্রাণের এ বাক্য নাহি করিল প্রত্যয়।
অভিমানে প্রাণ তবে, বাহির হইলা ঊর্দ্ধে
উহারাও ঊর্দ্ধে উঠি গেলা সে সময়।
প্রাণ যবে হৈলা স্থির, উহারাও স্থির হৈলা ;
মধুকর-রাজে সেবে মক্ষিকা যেমন,
উড়ি গেলে উড়ে সবে, স্থির হৈলে হয় স্থির,
তেমতি উহারা সেবে প্রাণেরে তখন।
বাক্ মন চক্ষু নেত্র আদি যত শক্তিচয়,
পরিতুষ্ট হ'য়ে স্তব করিলা প্রাণের।
'ইনি অগ্নি সূর্য্য মেঘ, ইন্দ্র বায়ু পৃথ্বী চন্দ্র,
সাকার কি নিরাকার ইনিই সকল।
রথ চক্র নাভি ছিদ্রে অর যথা থাকে লগ্ন,
প্রাণে সর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত আছে অবিকল।
প্রাণ, তুমি প্রজাপতি, তুমি গর্ভে হও জাত,
পিতৃ মাতৃ অনুরূপ সন্তান রূপেতে।
ইন্দ্রিয়াদি সহ তুমি দেহ মাঝে করি বাস
বিষয় গ্রহণ কর নিখিল জগতে।
দেবগণে হরিবহ পিতৃগণে স্বধাপ্রদ
তুমি সত্য-আচরণ-হেতু ঋষিগণে,
অঙ্গিরসের অথর্ব্ব, ইন্দ্র তুমি বল দর্পে
রুদ্র তুমি, এ বিশ্বের রক্ষণ সাধনে।
অন্তরীক্ষে ভ্রম তুমি, তুমি জ্যোতিষ্মান সূর্য্য,
সেইরূপে যবে তুমি বর্ষ বারিধারা
তব সৃষ্ট প্রাণীগণ, প্রচুর অন্নের আশে

আনন্দিত হ'লে সবে হয় আত্মহারা।
স্বভাবত শুদ্ধ তুমি, অথর্ব্বগণের অগ্নি,
একর্ষি তোমার নাম, তুমি সৎ-পতি
বিশ্বের ভক্ষক তুমি, মোরা তব ভক্ষ্যদাতা
তুমিই বায়ুর পিতা, তুমি বিশ্বগতি।
তবরূপ মহা বাক্যে, যাহা শ্রোত্রে,নেত্রে মনে
সেইরূপ কর শান্ত, না হও চঞ্চল,
যাহা ইহলোকে, স্বর্গলোকে আছে যাহা,
সকলই তোমার বশ, তুমিই অ-চল।
মাতা সেইরূপে পুত্রে করেন রক্ষণ,
তুমি সেইরূপে মোরে করহ পালন।
মোরে দেও শ্রী, মোরে প্রজ্ঞা কর দান ;"
এরূপে ইন্দ্রিয়গণ স্তুতিলেন প্রাণ।

ওঁ হরি ওঁ

ইতি দ্বিতীয় প্রশ্ন।

শ্রীশশধর রায়।

বিবাহের উপদেশ।

২রা ফাল্গুন, মঙ্গলবার, ১৩১১।

বাবা * * *, মা * * * তোমরা এই পবিত্র সময়ে, পবিত্র দেবতাকে সাক্ষী করিয়া, অতি গুরুতর ব্রত গ্রহণ করিলে, আশীর্ব্বাদ করি, তোমাদের জীবন মধুময় হউক, তোমরা এ ব্রত পালনে সক্ষম হইয়া মধুর দাম্পত্য জীবনের সুস্নিগ্ধ জ্যোতিতে ব্রাহ্মসমাজের মুখ উজ্জ্বল করিতে সক্ষম হও। আজ স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল মধুময় হইয়া যাক্।

বিবাহের উপদেশ তোমরা অনেক শুনিয়াছ, অনেক পাঠ করিয়াছ, নূতন কথা তোমাদিগকে কি বলিব? তোমরা যে সকল উপদেশ পাইয়াছ, যুগলজীবনে নববলে বলীয়ান হইয়া তাহা পালন করিবে। উপদেশ জীবনে প্রতিপালিত না হইলে তাহার কোনই মূল্য নাই, তাহা নীরস কথামাত্র। তোমরা পরস্পরের প্রতি ক্ষমাশীল হইবে, সংযত হইবে, প্রতিদিন একত্রে ব্রহ্মোপাসনা করিবে, অতিথি সেবা করিবে, গুরুজনদিগকে ভক্তি এবং দাসদাসীদিগের প্রতি সস্নেহ ব্যবহার করিবে—এ সকল অবশ্য-প্রতিপাল্য নিত্য কার্য্য, এ সকল অবশ্য তোমরা প্রতিপালন করিবে। কিন্তু এ সকল পুরাতন কথা বলিয়া আজ আমি তোমাদিগকে বিরক্ত করিতে চাই না। তোমাদিগকে আজ আর একটী গুরুতর কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া দিতেছি, তোমরা তাহা সর্ব্ব প্রযত্নে প্রতিপালন করিবে। বিধাতা তোমাদিগকে অযাচিত ভাবে লালন পালন করিয়াছেন, অযাচিত ভাবে শিক্ষিত করিয়াছেন, অযাচিত ভাবে এই মধুর মিলনে মিলিত করিলেন কেন, বল ত? তোমরা নিজেরা তাঁহার নাম করিয়া ধন্য হইবে, সেই জন্য; না—অন্যকে তাঁহার নাম শুনাইবে, সেই জন্য? প্রেমের পথে নিজের জন্য কিছুই নয়—সকলই অন্যের জন্য, সকলই ত্যাগের জন্য। স্বামীর সুখ পত্নীর, পত্নীর সুখ স্বামীর—নিজস্ব কিছুই নাই, সবই অন্যের। এজগতে দাম্পত্য-জীবন শ্রেষ্ঠ এই জন্য যে, ইহা কেবল দানের লীলাক্ষেত্র—কেবল আত্মত্যাগের মহাপুণ্যধাম বলিয়া। তোমরা ভাবিতেছ কি?—সুখ, সুখ, সুখ? আমি বলিতেছি, তাহা তোমরা পাইবে না, যদি ব্রহ্মার্পণ তোমাদের না হয়। যাহা পাইবে, সকল তাঁহার চরণে ঢালিয়া দিবে। ধন জন, বিদ্যাবুদ্ধি, সহায় সম্বল—সকল তাঁহার চরণে অর্পণ করিবে। তিনি

কোথায় প্রকাশিত, জান কি? তিনি তাঁহার সৃষ্টিতে প্রকাশিত। সৃষ্ট নরনারীকে তোমাদের ভালবাসা ঢালিয়া দিলেই তিনি তাহা পাইবেন। কেবল কি তাহাই?—না, তাহা নয়, সকল তাঁহাকে অর্পণ তাহা করিয়া সর্ব্বাঙ্গে ব্রহ্মনাম লিখিবে—সর্ব্বক্ষণ ব্রহ্ম-কথা শুনিবে, সর্ব্বকালে ব্রহ্মরূপ দেখিবে, সকল অবস্থায় ব্রহ্মের ভাবে তন্ময় হইবে। স্বামীর মুখে পত্নী পরম স্বামীকে দেখিবেন, পত্নীর মুখে স্বামী পরম সতীর দিব্য-মূর্ত্তি দেখিবেন। দেখিয়া, দেখিয়া, তন্ময়ভাবে মজিবেন। যদি এইরূপ ঘটনা তোমাদের জীবনে ঘটে, তবেই দাম্পত্য-জীবনের প্রকৃত সুখের আস্বাদন তোমরা পাইবে; নচেৎ সংসারে আর যত প্রকার সুখ দেখিবে, তাহা বিষ-মাখা, তাহা কণ্টক-ময়, তাহা ক্ষণবিদ্যুৎবৎ নিমেষে আইসে, চকিতে চলিয়া যায়। তাহা মানবজীবনকে কখনও অমৃতধামে লইয়া যাইতে পারে না। যৌবন দুদিনের, রূপ দুদিনের, সম্পদ দুদিনের, যশ দুদিনের,—চিরস্থায়ী কি, জান কি?—ধ্রুব, অটল, অচল, নিত্য কেবল সেই অবিনশ্বর বস্তু, যাহা পাইলে আর কিছুরই অভাব থাকে না। তোমরা সর্ব্ব প্রযত্নে, সেই ধনে ধনী হইতে চেষ্টা করিবে। খ্রীষ্ট বলিতেন, "তোমরা সর্ব্বাগ্রে স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ কর, পরে আর সকল পাইবে।" তোমরাও সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে অন্বেষণ করিবে, যিনি সকলের নিয়ন্তা ও বিধাতা। যদি সেই মহাধন পাও, তবে তাহা না বিলাইয়া কখনও থাকিতে পারিবে না। তোমাদের চোকমুখ, আচার ব্যবহার দেখিয়া লোকেরা সে ধনের আস্বাদন পাইবে, এবং তোমাদের নিকট হইতে তাহা কাড়িয়া লইবে। ব্রাহ্মসমাজের গুরু কে? নেতা কে? প্রচারক কে? গুরু তিনিই নেতা তিনিই, প্রচারকও তিনিই। একগুরু তিনি, আর গুরু তিনিময় জগতের সকল নর নারী। এমারসন বলিতেন, "যাঁহাকে দেখি, তিনিই কোন না কোন বিষয়ে আমার গুরু।" এক প্রচারক তিনি, আর প্রচারক বিশেষত্বময় জগতের সকল নর নারী। তিনি অনন্ত প্রকৃতিতে অনন্তরূপে ফুটিতেছেন। অনন্ত প্রকৃতি তাঁহার অনন্ত প্রচারক। গুরু সকলেই, প্রচারক সকলেই। সকলে মিলিয়া তাঁহাকে প্রচার না করিলে দুই একজনে সেই অনন্তের কিছুই প্রচার করিতে পারে না। তাঁহারা আজ কাল ব্রাহ্মসমাজে আবার একটা পৌরোহিত্যের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য লালায়িত হইয়াছেন! তোমরা দাম্পত্য-জীবনে, জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া ইহার প্রতিবাদ করিবে। তোমরা প্রেমভক্তিতে মাতিয়া জগৎকে প্রেমভক্তিতে মাতাইতে ধাবিত হইবে। তোমরা ব্রহ্মের দাস দাসী, সেবক সেবিকা, প্রচারক, প্রচারিকা হইবে; সকলকে ডাকিয়া বলিবে, আমরা আর গুরু মানি না, নেতা মানি না, আমরা এক প্রভুকে মানি, এক কর্ত্তাকে জানি; আমরা তাঁহারই দাস দাসী, তাঁহারই বিধানকে, তাঁহারই নামকে গৌরবান্বিত করিতে আসিয়াছি। এক সময়ে একটী কি মধুর কথা শুনিয়াছিলাম,—"নিতাই যারে পায়, দেয় কোল, কোল দিয়া বলে হরি বল।" আমার বড় ইচ্ছা হয়, তোমরাও যারে পাও, তাহাকে প্রেমাকর্ষণে কোল দিয়া "হরি বল" বলিতে মাতাইবে। এ ব্রত কি মধুর ব্রত, তোমরা একবার ভাব। যাঁহার দ্বারা জীবন পাইয়াছ, তাঁহার নাম যদি প্রচার না কর, তবে তোমাদের জীবন

বৃথা। আমি দেখিতে চাই, প্রতি সাধু সাধ্বী কেবল তাঁহারই নাম প্রচারের জন্য জীবন ধারণ করিবেন। আমি দেখিতে চাই, ব্রাহ্মসমাজের সকল নর নারী প্রচার ব্রত গ্রহণ করিয়া মধুর জীবন যাপন করিতে অভিলাষী হইবেন। হায়, এই ব্রাহ্মসমাজে কত পরিবার, কিন্তু জীবনে এবং কথায় প্রভুর নাম প্রচার করে কয়জন? কাজে কর্ম্মে, আহারে বিহারে, কথায় লেখায়—তোমাদের দ্বারা যেন প্রভুর নাম গৌরবান্বিত হয়, এবং তাঁহার নাম যেন প্রচারিত হয়। সহস্র কণ্ঠ সম্মিলিত হইয়া যদি প্রভুর নাম প্রচারে নিযুক্ত হইত, না জানি কি সুন্দর চিত্র জগতে আবির্ভূত হইত!! বিধাতা কি তোমাদের দ্বারা তাহা করিবেন না?

দেখ, প্রেমের পথে অগ্রসর হইয়া কখনও তোমরা গণ্ডিতে আবদ্ধ হইবে না। জাতিভেদের প্রাচীর ভঙ্গ করিয়া যদি তোমরা এই মধুর মিলনে সম্মিলিত হইলে, দেখিও, আবার যেন জাতিভেদের অঙ্কুর হৃদয়ে পোষণ করিও না। আমার বড় ভয় হয়, যে জাতিভেদ পুনঃ ব্রাহ্মসমাজকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে, তোমরাও সেই জাতিভেদের আবর্ত্তে পড়িয়া মারা যাইবে। এ দল, সে দল, এ ভাল, সে মন্দ, এ সকল বিচার কখনও করিবে না। সকলই মায়ের হাতের জিনিস, সকলকেই আদর করিবে। তোমরা ভেদবোধের রাজ্য হইতে সদা পলায়ন করিবে। ধনী দরিদ্রের ভেদাভেদ করিবে না, জ্ঞানী মূর্খের তারতম্য করিবে না, বর্ণ বৈষম্য গণিবে না, বংশগত আভিজাত্যের পূজা করিবে না—সকল ভেদবোধের অঙ্কুরকে অন্তর হইতে তুলিয়া ফেলিবে। সকল সঙ্কীর্ণতা তুলিয়া ফেলিয়া হৃদয়ে কেবল বিশ্ববিজয়িনী মাতৃ-শক্তিকে ধারণ করিবে। মা যেমন সকলের, তোমরাও তেমনি সকলের হইবে। অবিভেদে সকলকে কোল দিবে, এবং মধুর হরি মন্ত্র সকলের কর্ণে প্রদান করিবে। যদি তোমরা এই ব্রত পালন করিতে পার, তোমাদের মধুর দাম্পত্য-জীবন দেখিয়া আমরা ধন্য হইব, ব্রাহ্মসমাজের মুখ উজ্জ্বল হইবে।

বাবা * *, আমি যে সব কথা বলিলাম, আশা করি, তুমি যে সকল কথার গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছ। * * বালিকা, তুমি সুশিক্ষিত, সচ্চরিত্র, ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি, বাবা, তোমার নিকট আমাদের অনেক আশা ভরসা। পিতৃহীনা বালিকা **কে তুমি ধীরে ধীরে সংযমের পথ দিয়া মহাপ্রেম-সাধনের ক্ষেত্রে লইয়া যাইবে, এবং উভয়ে মিলিয়া নিষ্কাম ধর্ম্ম সাধন করিবে। প্রেমপুণ্য যেমন পাইবে, তেমনই বিলাইয়া দিবে। "যে ক্ষমা করে, সে পায় না, যে দেয় সে পায়"—বাবা, একথাটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। ধর্ম্ম পাইয়া যে অন্যকে ধর্ম্ম না দেয়, সে আর ধর্ম্মধন পাইবে না। এইরূপ সকল জানিবে। যত দিবে, তত পাইবে। দিতে—দিতে—দিতে অগ্রসর হইবে, পাইতে পাইতে পাইতে অমৃতরাজ্যে চলিয়া যাইবে। দিবে সান্ত,—পাইবে অনন্ত, তুমি একা বিতরিত হইবে,—পাইবে অনন্ত মানব-পরিবার,—অনন্ত ভাই বোন,—সেই অনন্ত পুণ্যময় দেবতা। সামান্য দিয়া যদি অনন্ত পাও, তবে কেন তাহা ছাড়িবে? বাবা, এই জন্য বলিতেছি,—আত্মত্যাগ-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া আজ অনন্ত প্রেমের পথে ধাবিত হও।

মা * * কি শুনিলে, কি বুঝিলে,—এবং

কি করিলে? যে গুরুতর কার্য্য করিয়া ফেলিলে, তাহার গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম কর। এই ব্রত পালনের জন্য আজ তোমার স্বর্গগত পিতাকে স্মরণ কর। তিনি আজ তোমাকে সেই পুণ্যময় রাজ্য হইতে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, চাহিয়া দেখ। তিনি তোমার জননীর হস্তে তোমাকে সমর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন—চাহিয়া দেখ, তোমার জননী তোমাকে কত কষ্টে লালন পালন করিয়া আজ বিশ্বজননীর অনন্ত প্রেমের হস্তে অর্পণ করিতেছেন। আজ প্রেমের জয় হইতেছে, তুমি কৃতজ্ঞ চক্ষে তাহা দেখ, এবং অবনত মস্তকে বিধাতার চরণে প্রণিপাত কর। তুমি তোমার স্বামীর হাত ধরিয়া আজ প্রেমময়ের নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে অভিন্ন প্রেম-নিকেতনের দিকে অগ্রসর হও। দেখিও মা, কখনও কাহাকে পর ভাবিও না, দেখিও মা, কখনও কাহারও দোষ স্মরণ করিও না, দেখিও মা, কখনও পরনিন্দার দ্বারা কণ্ঠকে কলুষিত করিও না। সর্ব্বঘটে, সকল হৃদয়ে প্রেমময়ী বিশ্বজননীর প্রকট লীলা দেখিবে এবং সকলকে মায়ের ন্যায় কোলে তুলিয়া "নাম-মন্ত্র" কর্ণে প্রদান করিবে। স্বামীর সহিত অভেদাত্মিকা হইয়া জগতের সহিত মিলিয়া যাইবে। স্বামীর আত্মীয় আত্মীয়াদিগের সহিত মিলিতে মিলিতে অনন্ত মানব পরিবারের সহিত একাত্মিকা হইয়া যাইবে। এই গভীর প্রেম-ব্রত-পালনে বিশ্বজননী তোমাদের সহায় হউন। তাঁহারই মঙ্গল ইচ্ছা তোমাদের দাম্পত্যজীবনে পূর্ণ হউক। আজ তোমাদের মধুর মিলনে চতুর্দ্দিক হইতে, সর্ব্বোপরি স্বর্গ হইতে শুভ আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক, আজ সব মধুময় হইয়া যাক্।

"শঙ্খাসুর-বধ কাব্য"

শ্রীযুক্ত ফকিরচাঁদ গোস্বামি-বিরচিত।—আমরা এই নব-কবি-বিরচিত 'শ্রব্য'-কাব্যাধ্যয়নে কতই পুলকিত ও আনন্দিত, তুষ্ট ও তৃপ্ত, সন্তোষ-প্রাপ্ত ও আহ্লাদিত, লেখনীমুখে তদ্‌বৃত্তান্ত, বিস্তারিত ভাবে অথচ সুচারুরূপে ব্যক্ত করিতে, একান্ত পক্ষেই অশক্ত। তাহার কারণ, এক দিকে সময়াভাব, অন্য দিকে স্থানাসম্ভাব। গ্রন্থ-বর্ণিত সুন্দর এবং সুমনোহর ব্যাপার-বাহুল্য-সঙ্কুল বিষয়-নিচয়ের গুরুত্বও, অপর অথবা ৩য় (তৃতীয়) হেতু। ফলতঃ, এক কথায় কহিতে গেলে ইহাই নির্দেশিত হওয়া অত্যন্ত উচিত যে, "শঙ্খাসুর-বধ"-গ্রন্থ, বিদ্যমান স্তূপীকৃত বঙ্গীয় পুস্তক-রাশির মধ্যে একতম প্রধানতম সুকাব্য—তৎপক্ষে কণাপ্রমাণও সন্দেহাভাব। উপরিলিখিত মতামত, বিস্তৃতরূপে অনুশীলিত করিতে হইলে, বঙ্গীয় পাঠক-পুঞ্জকে গ্রন্থান্তর্গত অশেষ-সুষমাবলীর আলোচনায় আগ্রহ-সহকারে অগ্রসর হইতে হইবে। তাহা হইলেই, পাঠকগণ, আমাদের প্রোক্ত অভিমতি, শিরোধার্য্য না করিয়া, পৃথক্ পথে প্রধাবিত হইতে সমর্থ হইবেন না। অস্মদীয় মতামতের গুরুত্ব ও যাথার্থ্য-প্রতিপাদনে এখানে এখন আমাদিগকে গুরুতর জনগণের মতামতের মুখাপেক্ষী হইতে হইতেছে। মতান্তর হইলেও, সেগুলি, সদ্‌ভাবমূলক।

স্ব-স্ব-নাম-সুধন্য, অগণ্য গুণগণান্বিত, গণনাতীতবৎ প্রতীত, সু-সমালোচকাগ্রগণ্য,

মনীষী, তেজস্বী, মনস্বী বাবু চন্দ্রনাথ বসু, এম্,এ, বি, এল্ (১)—নিজ-নাম-গুণগ্রথিত "বেঙ্গলী" ("Bengalee") নাম্নী ইংরাজি সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ-সম্পাদক (২)—বাঙ্গালা-সাহিত্য সমাজের আজ-কালিকার বিশ্বাসী মনস্বী ইংরাজ-রাজপুরুষ-পুঙ্গব-বর্গ সমাদৃত ও বহুলসম্মানিত মহারাজ স্যার্ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর, কে, সি, এস্, আই (৩) ("K. C. S. I,") পবিত্র "গঙ্গাস্তোত্র-সংগ্রহ"-কার "সুবর্ণবণিক্" প্রভৃতি গণনীয় পুস্তক-প্রণেতা শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জলাল মল্লিক (ভুতি) বি, এ (৪)—প্রসিদ্ধ বঙ্গীয় ভাষার বাগ্মী শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী (৫)—"স্বনাম-খ্যাত "বসুমতী" পত্রিকার সম্পাদক (৬) নিজ-গুণ-ধন্য "জন্মভূমি" (মাসিক পত্রিকা) সম্পাদক (৭) ইত্যাকার কত কত সম্ভ্রান্ত ও সদ্‌গোত্র-সম্ভূত, সৎশিক্ষিত এবং সুপণ্ডিত ব্যক্তি সমস্তই, শত মুখে যে গ্রন্থ-প্রধানের মাহাত্ম্যবর্ণনবিবরণে মুক্তকণ্ঠ, তদীয় সুগুণগান যে, অতিরিক্ত মাত্রায় অতি-মাত্রেই সুন্দর শোভমান, সুতরাং সুশোভন, তাহাতে আর সংশয় হয় কি ? (৮)

আলোচ্যমান নব্য ও সুভব্য কাব্য সর্গ-পঞ্চকে সংবিভক্ত। উল্লিখিত "পঞ্চ সর্গ"—যেমন কান্ত-কানন-বিরাজমান, কমনীয়-গুণবান্ "নন্দন" সমান পঞ্চ 'স্বর্গ'। আহা! ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, জনঃ ও তপঃ—বিশ্বের এই 'লোক'পঞ্চকে, যেন একত্র একতা-সূত্রে সংগ্রথিত! মরি—মরি! কিবা অপরূপ মাধুরী! ভূলোকের ও দ্যুলোকের এমন অভাবনীয় সম্মিলন, সাধারণ্যে সাধারণতঃ অসম্ভাবিতা। স্বপ্নেও প্রশ্ন করিতে পারা যায় কি, ত্রিদিবের কবেই বা কুৎসিত কুৎসা সম্ভবে? অলোক-সামান্য অলৌকিক সুর-লোকে প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, অহিতৈষণা, অথবা অ-গুণবত্তার অস্তিত্ব-কল্পনাই, কি অতীব অলীক ও অমূলক বলিয়া বিবেচিত ও বিচারিত হয় না? নিরয়ের পূতিগন্ধি, নিরানন্দ জন্য দোষ,ত্রুটি অসম্পূর্ণতা, অভাবনিচয়-নিদর্শন ত্রিদশালয়ে নিয়তই অ-বিদ্যমান। অতএব 'স্বর্গোপম' সমালোচ্য কাব্যে অ-গুণের সম্ভাবনা কিংবা সমাবেশ, অশেষ প্রয়াসেও কাহারই দৃষ্টিগোচর হইবার বিষয় নয়। তবে, দোষদর্শীদের বা ছলগ্রাহি-নিবহের কথা, প্রকৃষ্টরূপেই পৃথক্। মহাকাব্যকার-বর্গ, গণিতবিদ্যাবিদ্‌বৃন্দ, অথবা শাস্ত্র-শস্ত্রাস্ত্রাচার্য্য বর্গাদি ব্যক্তি বৃহাদি মহামহোপাধ্যায়নিচয় যথাঃ—বাল্মীকি-বেদব্যসদেব, কালিদাস মাঘ, ভবভূতি, ভারবি, ভর্ত্তৃহরি-ভট্টি, কর্ণপুর-ভাস, বাণভট্ট, ময়ূরভট্ট, কুমারিলভট্ট, আর্য্যভট্ট, কুল্লভট্ট প্রাজ্যভট্ট, রঘুনাথভট্ট, শঙ্করাচার্য্য, মাধবাচার্য্য, গোবর্দ্ধনাচার্য্য, মধ্বাচার্য্য, সায়ণাচার্য্য ভাস্করাচার্য্য—দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য প্রভৃতিরও কৃতাকৃত ক্রিয়া-নিচয়ের একটী না একটী ত্রুটি—বিশেষাবিশেষ দোষসমূহও—বহুযত্নে, যথেষ্ট ও প্রকৃষ্ট চেষ্টায়—উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়ে। তৎসম্পর্কে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের

(১) ১৩১১ সাল, ১৫ই আশ্বিনের লিপি।

(২) "Bengalee" 1st nov, 1904.

(৩) ১৩১১ ৫ই আশ্বিনের পত্র।

(৪) ১৩১১।১৫ই আশ্বিনের চিঠি।

(৫) ১৩১১।১৮ই আশ্বিনের লিপি।

(৬) "বসুমতী"—১৩১১।২২শে আশ্বিন।

(৭) "জন্মভূমি"—১৩১১ কার্ত্তিক।

(৮) গ্রন্থকারোক্তি 'নিত্যানন্দ প্রভু "কৃত্তিবাস পণ্ডিতের" বংশধর'—এই কথাগুলি ইতিবৃত্ত-বিরুদ্ধ বাক্য।

'ভারতীর' বচনের ও কবি-বিশেষের উৎকৃষ্ট উদ্ভট শ্লোকের ও গুণশালিতাময়ী কবিতাবলীর স্মরণই, কি পর্য্যাপ্ত নয়?

"সর্ব্বঃ সর্ব্বং ন জানাতি,
সর্ব্বজ্ঞো নাস্তি কশ্চন।
নৈকত্র পরিনিষ্ঠাস্তি,
জ্ঞানস্য পুরুষে কচিৎ॥" (৯)

"মক্ষিকা ব্রণমিচ্ছন্তি,
মধু চেচ্ছন্তি (১০) ষট্পদাঃ।
সজ্জনা গুণমিচ্ছন্তি,
দোষমিচ্ছন্তি পামরাঃ॥" (১১)

ফলে—"শঙ্খাসুর-বধ-কাব্য" সুন্দর-সৎকাব্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইবার পক্ষে সর্ব্বথা সর্ব্বতোভাবেই—সম্যগ্রূপেই—সতত উপযুক্ত, তদ্বিষয়ে বিন্দু-প্রমাণও সন্দেহ বিদ্যমান আছে কি? এই গ্রন্থ, সকলের সমীপে না হউক, অধিকসংখ্যক সাহিত্যসেবকেরই নিকট আশ্চর্য্য বস্তু ও শিরোধার্য্য পরম পদার্থ। যাঁহারাই যত্ন-শ্রমাধ্যবসায়-সহায়তায় এতৎপুস্তকাধ্যয়নে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাদিগের পক্ষেই এতৎ পুস্তক উত্তম, উপাদেয়, উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে।

আদ্যন্তদোষ বিবর্জিত গ্রন্থ, জগতের ইতিবৃত্তে সুদুর্ল্লভ। ইহার অধিকাংশ স্থলই, রচনা-মাধুর্য্য-বহুল। স্থলবিশেষে মনোহর বীর-করুণাদি রসের আধিক্য, অবলোকিত হয়। বিশেষতঃ, শেষ অধ্যায়ে (৫ম সর্গে) বীর-রস-বর্ণনার প্রাচুর্য্যে, পাঠকপাঠিকাদিগকে পদে পদেই পরম পুলকিত করিয়া তোলে। পবিত্র 'ধর্ম্মক্ষেত্র' "কুরুক্ষেত্রের" সমর-প্রারম্ভোন্মুখকালে স্বজনগণ-নিধনাশঙ্কী ধনঞ্জয়ের অ-ক্ষত্রোচিত যে মোহসমূহ, সমুপস্থিত হইয়াছিল—তদপনোদননিবন্ধন ভগবান্ নারায়ণদেব,—'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়' দ্বিতীয় (২য়) অধ্যায়োক্ত জীবাত্মার অনশ্বরত্বের সদুপদেশ-শিক্ষামূলক বাক্যের অবতারণা করেন—ভবিষ্যতে পরাভব-বিভীষিকায় অ-কৃতাপরাধ, গর্ভস্থ শিশুর বিনাশার্থ অভিশপ্ত দেবেন্দ্রের প্রতি উপদেশপ্রদান—অতিবুদ্ধি সুরগুরু বৃহস্পতির পক্ষে অ-সমীচীন কার্য্য হইয়াছিল—একশ্রেণীর দোষদ্রষ্টা-উৎকট, কূট-সমালোচক-দলের এবম্ভূত অভিমতি। আমরা আদ্যোপান্ত যথেষ্ট অভিনিবিষ্ট অধ্যয়নেও, উল্লিখিত অভিপ্রায়ে সায় দিতে, একান্তই অশক্ত।

কাব্য-কবিতা-রচনা, অনেকের সন্নিকটে কষ্টকল্পনা। বর্ত্তমান সমালোচ্যমান সৎ-কাব্যকারের পক্ষে উহা, কিন্তু, দুষ্কর দুরূহ ভয়ঙ্কর ব্যাপার না হইয়া, বরঞ্চ সুগম ও সরল, সুসাধ্য ও সহজ কাজই হইয়া পড়িয়াছে! ফকিরচাঁদ বাবুর কাব্যখানি, তদীয় কবিত্ব-রচনায় নিদর্শন-পক্ষে অনুকূল সাক্ষ্য দান করিতেছে। ধন্য—গোস্বামী মহাশয়! আপনি সুধন্য—আপনি অগণ্য ধন্যবাদ-ভাজন! শত মুখেও আপনার সুখ্যাতিবাদের পরিসমাপ্তি হইতে পারে কি?

এক্ষণে কাব্যের নামকরণ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, "তুলসী-দেবীর" স্বামীর নাম "শঙ্খাসুর" ছিল বটে, তৎপ্রসঙ্গের সঙ্গে কিন্তু

(৯) "মহাভারত"—'বনপর্ব্ব'।

(১০) 'মধু বাঞ্ছন্তি ষট্পদাঃ'—দ্বিতীয় পাঠ। হোমিওপ্যাথিক সুচিকিৎসক, 'বৈদ্যক'-চিকিৎসায় উত্তমপারদর্শী, সৎকবি, সুন্দরগদ্যলেখক, বঙ্গীয় ও ইংলণ্ডীয় গ্রন্থাবলী-প্রণেতা ডাক্তার শ্রীযুক্ত কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (Dr K. P. Banerji) মহাশয়ের সুসম্পাদিত "মহাশক্তি"-নাম্নী মনোহর সমাচার পত্রে এই দ্বিতীয় পাঠ, সমুদ্ধৃত হইয়াছে, দৃষ্ট হইবে।

(১) উদ্ভট কবিতা।

এই কাব্যের সম্বন্ধাভাব। এটি একটি কবি-কল্পনা-মাত্র। ইনি 'শঙ্খাসুরকে' "বলি" রাজার একতম পুত্ররূপে পরিচিত করিতে চাহিয়াছেন। ইহা কিন্তু পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক-অভিমত-সিদ্ধ নহে। কেন না, পুরাণে "বলির' "বাণ" প্রভৃতি যে ১০০ (এক শত)সুতের উল্লেখ দৃষ্ট হয়—"শঙ্খসুর" সেই সুত-শতকের অন্যতম নহেন। এই বিষয়ে ফকিরচাঁদ বাবু, নজির দেখাইয়া বলিতে পারেন যে মধুসূদন, মাইকেল, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দামোদর মুখোপাধ্যায় বিদ্যানন্দ, নবীনচন্দ্র সেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাধানাথ মিত্র, রায় সাহেব হারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রভৃতিও,ঐরূপ করিয়াছেন। আর—শাস্ত্রেই আছে—"নিরঙ্কুশাঃ কবয়ঃ"—(কল্পনামত্ত কবিকুল, মদ-মত্ত মাতঙ্গবৎ অঙ্কুশের বশীভূত নহেন)।

আলোচ্যমান কাব্যে ৫ (পাঁচ) সর্গে যে যে ৫ (পাঁচ) বিষয়, বিবৃত আছে—তত্তাবৎ, নিম্নে নিবদ্ধ করা গেল :—

১।—১ম (প্রথম) সর্গে "আশ্রম-প্রবেশ"।
২।—২য় (দ্বিতীয়) „ "তুষরু-পতন"।
৩।—৩য় (তৃতীয়) „ "শঙ্খাসুর-জন্ম"
৪।—৪র্থ (চতুর্থ) „ "শঙ্খাসুরের বর-প্রাপ্তি"।
৫।—৫ম (পঞ্চম) „ "ইন্দ্রনিগ্রহ"।

পশ্চাৎ কতিপয় স্থল, উদ্ধৃত হইল :—

(১) "বিশাল-বারিধি-সম-চন্দ্রাতপ-তলে
শয়িত প্রকৃতি-দেবী, শান্তির শয়নে—
পূর্ণিমার শশী, শোভি' গগন-মণ্ডলে
ছড়ায় কৌমুদীর ছটা, পর্ব্বত-কাননে।"
২য় সর্গ।

(২) "প্রেয়সীর গর্ভ, রাজা দেখিয়া তখন—
'পঞ্চগব্য' দিয়া কৈল, গর্ভের শোধন।
মৃত্তিকাতে সুগন্ধিত রাণীর আনন,
করেন আঘ্রাণ করি'—নির্জ্জনে গমন॥"
৩য় সর্গ।

(৩) "প্রণমি কবীন্দ্র-মুনি! তোমার চরণে,
'দ্বৈপায়ন'! জগতের কবি-কুল-মণি!
অসীম-কবিত্ব-কীর্ত্তি—সাগর-সমান
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপি রহিয়াছে তব॥"
১ম সর্গ।

(৪) "আনিল শতাঙ্গ সুত সম্মুখে তাহার—
রথ-অশ্ব গর্জে তথা,
হরের কুমার যথা—
লাগি'ছে দেখা'তে বীরপণা আপনার॥"
৫ম সর্গ।

(৫) "হেথায় সাগর-তীরে বলির নন্দন—
করি'ছে কঠোর তপঃ, ইন্দ্রের কারণ।
শঙ্খাসুর, করে তপঃ—বড়ই দুষ্কর,
হেঁট-মাথে ঊর্দ্ধপদে রহে নিরন্তর।"
৪র্থ সর্গ।

সর্গ-পঞ্চক হইতে যথেচ্ছভাবে যথেষ্ট স্থলসকল, এস্থলে উপরে উদ্ধৃত করিয়া তুলিয়া দিলাম। এখন গুণজ্ঞ, অভিজ্ঞ বিজ্ঞবর্গ, প্রকৃষ্টরূপ অনুধ্যান দ্বারা ও প্রণিধান-পূর্ব্বক অনুচিন্তন করিয়া বুঝুন,এই নবকবি, কি শব্দ-বিন্যাসে, কি সুন্দর-ঝঙ্কারময়ী অনুপ্রাসাদি মনোহারিণী আলঙ্কারিক বর্ণনায়, —আর, কি সরল, প্রাঞ্জল, প্রসাদ-গুণাত্মক বিশদ-পদ-প্রয়োগে, রচনা-চাতুর্য্যে—সংক্ষেপতঃ,সর্ব্ব-বিষয়েই সিদ্ধহস্ত কি না। এই সমালোচ্য অভিনব-মনোরম-কাব্যকার, বয়সে নবীন হইলেও, কার্য্যতঃ, সুপরিপক্ক-লেখনী ধারণে যোগ্য পাত্র, তাহাতে সংশয় কোথায়?

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

প্রাচীন ভারতের বাণিজ্য। [৯]

যে প্রাচীন কালে ভারত ভিন্ন পৃথিবীর অধিকাংশ ভাগ অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন ছিল, তৎকালে ভারতাকাশে জ্ঞান-সূর্য্য প্রদীপ্ত। ভারত জ্ঞানে বিজ্ঞানে, শৌর্য্য-বীর্য্যে ও ঐশ্বর্য্যে পৃথিবীতে অতুলিত। পুরাতন সময়ে আর্য্য মনস্বিগণ গণিত, জ্যোতিষ, জড়-বিজ্ঞান, ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের চরম উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। আমরা ক্রমে কয়েকটী বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি:—(১) আর্য্যেরা যেমন দশ গুণোত্তর সংখ্যা নিয়মের উদ্ভাবয়িতা হইয়াছিলেন, তেমনি আবার গণনার চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। বনপর্ব্বের নলোপাখ্যানে কথিত আছে যে, যৎকালে অযোধ্যাপতি ঋতুপর্ণ বাহুক নামক বিকৃত বেশধারী নলকে সারথি করিয়া দময়ন্তীর দ্বিতীয় স্বয়ম্বরে বিদর্ভদেশে রথারোহণে গমন করেন, পথিমধ্যে রাজা ঋতুপর্ণ বিভীতক বৃক্ষ (বহেড়া) লক্ষ্য করিয়া নলকে বলিয়াছিলেন যে, "সকল লোকে সকল বিষয় জানে না, কেহই সর্ব্বজ্ঞ নহে, কোন লোকেরই সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান নাই। অতএব আমার অন্য বিষয়ে জ্ঞান না থাকিলেও গণনা বিষয়ে বিলক্ষণ জ্ঞান আছে, দেখ, এই বিভীতক বৃক্ষে যতগুলি পত্র ও ফল আছে এবং যতগুলি পত্র ও ফল এই বৃক্ষ হইতে ভূতলে পতিত রহিয়াছে, আমি সে সমস্তই গণনা করিয়া বলিতে পারি।" এই বলিয়া তিনি গণনা করিলেন এবং নল ঐ সকল বুঝিয়া লইয়া অতীব চমৎকৃত হইলেন *।

(২) কথিত আছে নিষধাধিপতি নল, অগ্নি ব্যতিরেকে ফুৎকার দ্বারা ইন্ধনে অগ্ন্যুৎপাদন রন্ধন করিতে এবং শূন্যকুম্ভ স্পর্শ দ্বারা জলে পরিপূর্ণ করিতে পারিতেন ¶।

(৩) কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের শেষে মহারাজ দুর্য্যোধন ভীত হইয়া আত্ম রক্ষার্থ পলায়ন পূর্ব্বক তত্রত্য দ্বৈপায়ন হ্রদ মধ্যে জলস্তম্ভ করিয়া লুক্কায়িত হইয়াছিলেন *।

(৪) ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, প্রাচীন কালে পারস্য, মিশর, গ্রীস, রোম এবং ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ সমূহে সৈনিকগণ রথারোহণ পূর্ব্বক ধনুর্ব্বাণ লইয়া যুদ্ধ করিত। তাহারা বর্ত্তমান তীরন্দাজদিগের ন্যায় যুদ্ধ করিত, কিন্তু প্রাচীন ভারতে ধনুর্ব্বিদ্যা এক অসাধারণ বিস্ময়কর বিষয় ছিল।

অথর্ব্ববেদে দুইটী অধ্যায় আছে, একটী গন্ধর্ব্ববেদ অর্থাৎ সঙ্গীতবিদ্যা সম্বন্ধীয় বেদ, ইহা সামবেদের উপবেদ। অপরটী ধনুর্ব্বেদ অর্থাৎ যে বিদ্যা পাঠ করিলে ধনুর্বিদ্যার সম্যক্ জ্ঞান জন্মে, ইহা যজুর্ব্বেদের উপবেদ †। অগ্নিপুরাণে ধনু ও বাণ সম্বন্ধে

---

* নলং প্রতি ঋতুপর্ণঃ—"সর্ব্বঃ সর্ব্বং ন জানাতি সর্ব্বজ্ঞোনাস্তি কশ্চন। নৈকত্র পরিনিষ্ঠাস্তি জ্ঞানস্য পুরুষে কচিৎ। বৃক্ষেস্মিন্ যানি পর্ণানি ফলান্যপিচ বাহুক। পতিতান্যপি যান্যত্র—ইত্যাদি।

Vide মহাভারত বনপর্ব্ব।

¶. Ibid.

* "দ্বৈপায়ন হ্রদং খ্যাতং যত্র দুর্য্যোধনোঽভবৎ। শীতামল জলং হৃদ্যং দ্বিতীয়মিব সাগরম্। মায়য়া সলিলং স্তম্ভ্য যত্রাভূত্তে স্থিতঃ সুতঃ।"

মহাভারত—শল্যপর্ব্ব।

† "ঋগ্বেদস্যায়ুর্ব্বেদোপবেদো যজুর্ব্বেদস্য ধনুর্ব্বেদোপবেদঃ।

সবিশেষ বর্ণনা রহিয়াছে। অথর্ব্ববেদের যে সকল অংশে চিকিৎসা সম্বন্ধীয় প্রকরণ লিখিত আছে, সেই সকল সিন্ধুনদ ও কাস্পীয়ান্ সাগর পারবাসী যবনগণ শিক্ষা করিয়াছিল। উক্ত সাগর-পারস্থিত অনেক উদ্ভিদ্ ও ফল মূলের বিবরণ অথর্ব্ববেদে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

প্রাচীন ভারতে 'আয়ুধিকঃ' নামে এক জাতি অস্ত্র নির্ম্মাণ করিত।

ধনুর্ব্বেদাদি পাঠে জানা যায় যে, বর্ত্তমান কালীয় তীর ও ধনু অপেক্ষা ধনুর্ব্বেদাদিতেও, উক্ত তীর ও ধনুর আকার প্রকার ও আয়তনাদি ভিন্নরূপ ছিল না, কিন্তু ঐ বাণ মন্ত্রপূত হইয়া শরাসনে নিয়োজিত হইলে উহা এক অপূর্ব্ব বিস্ময়-জনক আকার ধারণ করিয়া অমানুষিক কার্য্য-সকল সম্পাদন করিত।

কুরু পাণ্ডবদিগের অস্ত্র শিক্ষা প্রদর্শনী সভায় যে সকল অস্ত্র শস্ত্র প্রয়োগ কৌশল প্রদর্শিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা অগ্নি, বারুণাস্ত্র দ্বারা জল ও বায়ব্যাস্ত্র দ্বারা বায়ু এবং পর্জ্জন্যাস্ত্র দ্বারা মেঘ সকল সৃষ্ট হইয়াছিল *।

(৫) আর্য্যগণ যোগশিক্ষা দ্বারা অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন হইয়া অমানুষিক ক্রিয়া সকল সম্পাদন করিতেন। কান্যকুব্জাধিপ গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র সত্যই বলিয়াছিলেন যে, "ধিগবলং ক্ষত্রিয়-বলং ব্রহ্মতেজোবলং বলম্"—ক্ষত্রিয়বলে ধিক্, ব্রহ্মতেজো-বলই প্রকৃত বল। দ্বিজগণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ যোগবলে অতীন্দ্রিয় গুণনিধি, অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন এবং ত্রিকালজ্ঞ ইচ্ছামৃত্যু অথবা অমরত্ব লাভ করিতেন। যোগবলে মহাত্মা ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ান হইয়াও স্বেচ্ছাক্রমে দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং যোগবলে অশ্বত্থামা ও ব্যাসদেব প্রভৃতি অমরত্ব লাভ করেন।

যোগবলে ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ঋষি গান্ধারী প্রভৃতিকে দুর্য্যোধনাদির প্রেতাত্মা দর্শন করাইয়াছিলেন। যোগবলে যে কি অলৌকিক কার্য্য সকল সম্পাদিত ও অসাধারণ শক্তি প্রলব্ধ হইত, তাহা পুরাণাদি শাস্ত্রে সবিশেষ বর্ণিত রহিয়াছে।

আমরা এতক্ষণ যে সকল বিষয়ের উল্লেখ করিলাম, এই সমস্ত বিষয় সাধন করিতে এ পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য বিজ্ঞান অসমর্থ রহিয়াছে। কবে যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান দ্বারা ঐ সকল বিষয় সম্পাদিত হইবে, তাহা কে বলিতে পারে?

হা ভারতবর্ষ, তুমি সেই স্থানেই অবস্থিত রহিয়াছ! হা ভারতীয় আর্য্যগণ, তোমরা সেই পবিত্র ঋষিবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া এবং চন্দ্র ও সূর্য্য দেবের বংশধর হইয়া এতাদৃশ হীনদশায় পতিত রহিয়াছ? আর তোমাদিগেরই বা দোষ কি? ভাগ্য-চক্রের বিপর্য্যয় ও কালের পরিবর্ত্তন-ধর্ম্ম অনিবার্য্য।

হে ভারতীয় আর্য্যগণ, তোমাদিগের নিকট হইতে লইয়া সে দিবস অর্থাৎ খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে আরবদেশীয় মহম্মদ বেন্ মুসা আরবদেশে প্রথম বীজগণিত প্রচার করিয়াছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইটালীদেশীয় লিওনার্ডো উহা স্বদেশীয় ভাষায়

সামবেদস্য গন্ধর্ব্ববেদোপবেদোঽথর্ব্ববেদস্ত শাস্ত্র মিত্যাদি।

ইতি শৌনকোক্ত চরণব্যূহঃ।

* "আগ্নেয়েনাসৃজদ্বহ্নিং বারুণেনাসৃজৎ পয়ঃ।

বায়ব্যেনাসৃজদ্বায়ুং পর্জ্জন্যেনাসৃজদ্ঘনান্"।

মহাভারত—আদিপর্ব্ব।

অনুবাদ করিয়া ইয়োরোপে বীজগণিতের প্রথম প্রচার করেন। উক্ত বেন্‌মুসাই ভারতীয় জ্যোতিঃ শাস্ত্রের সার সঙ্কলন করেন ও ভারতবাসীর নিকট সংক্ষিপ্ত গণনা প্রণালী শিক্ষা করেন।

৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে আরবদেশীয় গণিতবেত্তা ভারতীয় গণিতগ্রন্থ আরব্য ভাষায় অনুবাদিত করিয়াছিল। গ্রীসদেশবাসী দিওফান্তস্ নিজ গ্রন্থে ভারতীয় গণিতের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন।

আর্য্যভট্ট পৃথিবীকে সচলা বলিয়াছেন।*

প্রথমতঃ বেদে পরে ভাস্করাচার্য্যের গ্রন্থে ভূমণ্ডলের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির (Centre of Gravity) উল্লেখ রহিয়াছে।

আরব সম্রাট হরুণ-আল্-রসিদ ভারতবর্ষ, হইতে দুই জন চিকিৎসককে নিজ দেশে লইয়া গিয়া চরক ও সুশ্রুত গ্রন্থদ্বয় পারস্য ভাষায় অনুবাদ করেন। আরবীয় লোক হইতে আবার ইয়োরোপীয়গণ চিকিৎসা শাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করে। পূর্ব্বে ইয়োরোপীয় যাবতীয় চিকিৎসা গ্রন্থে চরক ও সুশ্রুতের নাম দৃষ্ট হইত।

ইয়োরোপীয় সভ্যতার মূল যে ভারতবর্ষ তাহা পরিদর্শনার্থ যৎকিঞ্চিৎ উল্লিখিত হইল, এইক্ষণ আমরা প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করিব।

আমরা রামায়ণের সময়ে দেখিয়াছি যে, আর্য্যাবর্ত্ত বহুতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত। প্রত্যেক রাজ্যে এক এক জন রাজা আপন অধিকার মধ্যে যথা সম্ভব স্বাধীন ভাবে রাজ্য শাসন করিতেন। সেই সেই রাজ্য মধ্যে বনভূমি সকলও দৃষ্ট হইত। রাজ্যস্থিত গ্রামগুলির সীমাস্থ ভূভাগ বিশিষ্টরূপে কৃষিকার্য্যার্থ কর্ষিত এবং পুষ্পিত বনরাজীতে সুশোভিত ছিল। গ্রাম সকল উদ্যান ও আম্রকানন-যুক্ত এবং বিবিধ জলাশয়-সমন্বিত ছিল। হৃষ্ট পুষ্ট প্রজাগণ সুখে বাস করিত এবং গো-সমূহ স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিত*। গ্রাম গুলির নিকট দিয়া তটিনীকূল কল কল নাদে প্রধাবিত হইত। তীর ভূমিতে গো সকল চরিত এবং ময়ূর ও হংসগণ সুখে কেকা ও কলরব করিত ¶।

মহাভারতীয় সময়ে আর্য্যাবর্ত্তের গ্রামগুলি যে অপেক্ষাকৃত সুন্দর ও সমৃদ্ধ এবং গ্রামবাসীদিগের সর্ব্বাঙ্গীণ অবস্থা উন্নত ছিল, তাহার নিদর্শন সন্ধিপ্রার্থী হস্তিনাপুরগামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গমন পথে অবস্থিত উপপ্লব্য নামক গ্রামে বাস কালে সম্যক্ দৃষ্ট হইয়াছে।

রামায়ণের সময়ে দাক্ষিণাত্য অরণ্যময় ও অসভ্য জাতি-নিচয়ের নিবাসভূমি, কেবল দুই একটী ঋষির আশ্রম দেখা যাইত মাত্র, কিন্তু মহাভারতের সময়ে দাক্ষিণাত্যের অধিকাংশ ভূভাগ বৃহৎ বৃহৎ সমৃদ্ধিশালী ও পরাক্রান্ত রাজ্য সমূহে বিভক্ত ছিল †।

চিত্রকূট পর্ব্বতাগত ভরতকে শ্রীরামচন্দ্র যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহাতে রামায়ণের সময়ে ভারতের আভ্যন্তরিক অবস্থা

* "ভূরেবাবৃত্যাবৃত্য প্রাতিদৈবসিকৌ উদয়াস্তৌ সময়তি গ্রহ-নক্ষত্রাণাম্।" আর্য্যভট্টঃ।

* গ্রামান্ বিকৃষ্ট সীমান্তান্ পুষ্পিতানি বনানি চ।"' "উদ্যানাম্রবণোপেতান্ সম্পন্ন সলিলা শয়ান্। তুষ্ট পুষ্ট জনাকীর্ণান্ গোকুলাকুল—সেবিতান্।" vide রামায়ণ।

¶ "গোযুতাং ময়ূর হংসাভিরুতাম্ Ibid.

† Vide রামায়ণ and মহাভারত।

যে উৎকৃষ্ট ও সমুন্নত ছিল, তাহা বিলক্ষণ প্রতীত হইয়া থাকে। তৎকালে কি রাজনীতি, কি ধর্ম্মনীতি, কি সমাজনীতি, সমস্ত বিষয়েই ভারত সমুন্নত হইয়াছিল। রামায়ণের দ্বিতীয় কাণ্ডের একস্থানে শ্রীরামচন্দ্র ভরতকে বলিতেছেন যে, "কৃষক ও পশুপালকেরা ত তোমার প্রিয়পাত্র হইয়াছে, এবং তাহারা কৃষি বাণিজ্য দ্বারা ত সুখে কালযাপন করিতেছে?" "অরাজক জনপদে দূরগামী বণিকগণ পণ্যদ্রব্য-জাত লইয়া দূরদেশে গমন করিতে ভীত হয়" ইত্যাদি *।

এইরূপ মহাভারতের সভাপর্ব্বে দেবর্ষি নারদ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে তাৎকালিক ভারতের কৃষি বাণিজ্যাদি-ঘটিত রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি ও সমাজনীতি সম্বন্ধীয় যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহাতে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, রামায়ণে বর্ণিত ভারত অপেক্ষা মহাভারতোক্ত ভারত অধিকতর সমৃদ্ধ, পরাক্রান্ত ও উন্নত ‡। আমরা বাহুল্য ভয়ে মহাভারত হইতে তৎসম্বন্ধীয় শ্লোকাবলী উদ্ধৃত করিলাম না।

এইরূপ আমরা অন্যান্য শাস্ত্র, নাটিকা ও আখ্যায়িকা ইত্যাদি হইতে প্রাচীন ভারতের বাণিজ্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিতে চেষ্টা করিব।

চরক সুশ্রুতাদি আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থানুসারে যে সকল ঔষধ প্রস্তুত করিবার প্রয়োগ আছে, তাহাতে জৈত্রী, জায়ফল, ও দারুচিনি প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্যের আবশ্যকতা হয়। যাবা, মলাকা, বোর্ণিয়ো প্রভৃতি দ্বীপ সমূহে ঐ সকল দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ সমস্ত দ্রব্য আনয়ন করিবার নিমিত্ত সেই সেই দ্বীপে যাইতে হইলে সমুদ্র যাত্রা স্বীকার করিতে হয়, সুতরাং প্রাচীনকালে আর্য্যগণ পোতারোহণে তত্তদ্দ্বীপে গমন করিয়া যে ঐ সকল দ্রব্য ভারতে আনয়ন করিতেন, তদ্বিষয়ে আর কোন সংশয় নাই।

রত্নাবলী নাটিকায় সমুদ্র গমন এবং সমুদ্র মধ্যে সিংহলাধিপতি বিক্রমবাহুর রত্নাবলীর পোতভঙ্গ এবং কৌশাম্বী নগরবাসী কোন বণিকের সিংহল হইতে প্রত্যাগমন কালে তাহাকে সঙ্গে আনয়ন করা, এই সমস্ত কথায় স্পষ্টই জানা যায় যে, পূর্ব্বকালে সিংহলের সহিত ভারতীয় বাণিজ্য কার্য্য পোতযোগে নির্ব্বাহিত হইত।

এতদ্ভিন্ন অনেক উপকথা মধ্যেও হিন্দুদিগের সমুদ্র যাত্রা সম্বন্ধে বিস্তর উল্লেখ রহিয়াছে।

কথাসরিৎসাগর নামক গ্রন্থের অলঙ্কারবতী নামক নবম লম্বকের প্রথম তরঙ্গে লিখিত আছে যে, পৃথ্বীরূপরাজা এবং তৎপ্রেরিত চিত্রকর পোতযোগে মুক্তিপুর দ্বীপে গমন করিয়াছিলেন। উহার দ্বিতীয় তরঙ্গে উক্ত আছে যে, এক বণিক ভার্য্যাসহ বাণিজ্যার্থ সুবর্ণভূমি দ্বীপে যাত্রা করিয়াছিলেন, পথিমধ্যে ঝটিকায় পোতভঙ্গ হওয়ায় ভার্য্যার সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ সংঘটিত হইয়াছিল। উহার চতুর্থ তরঙ্গে কথিত আছে যে, সমুদ্রশূর নামক কোন ব্যক্তি অন্য এক বণিকের সহিত বাণিজ্যার্থ সুবর্ণদ্বীপে যাত্রা করিয়াছিলেন, পরে সমুদ্র মধ্যে তাঁহাদের

* "কচ্চিত্তে দয়িতাঃ সর্ব্বে কৃষি গোরক্ষ জীবিনঃ।
বার্ত্তায়াং সংশ্রিতস্তাত লোকোহয়ং সুখ মেধতে।"
"নারাজকে জনপদে বণিজো দূরগামিনঃ।
গচ্ছন্তি ক্ষেম মধ্বানং বহুপণ্য সমাচিতাঃ॥"
Vide রামায়ণ।

‡ Vide মহাভারত—সভাপর্ব্ব।

পোত ভগ্ন হইয়াছিল। উহার ষষ্ঠ তরঙ্গে উল্লিখিত আছে যে, চন্দ্রস্বামী নিজ-পুত্রের অনুসন্ধানার্থ অনেক পোতবণিকের পোতারোহণ করিয়া সিংহলাদি বহুতর দ্বীপে গমন করিয়াছিলেন।

উহার চতুর্থাম্বিক নামক পঞ্চম লম্বকে শক্তি দেবের উপাখ্যানে লিখিত আছে যে, সমুদ্রমধ্যে কোন বণিকের তরণি ভগ্ন হওয়ায় সে এক কাষ্ঠফলক অবলম্বন করিয়া অন্য এক নৌকায় তাহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করে এবং সেই নৌকায় পিতা ও পুত্র উভয়েই স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিল।

দশকুমার-চরিতের পূর্ব্ব পীঠিকায় লিখিত আছে যে, রত্নভব নামক কোন বণিক কালযবন দ্বীপে গমন করে এবং তথায় এক বণিক্-কন্যাকে বিবাহ করিয়া তাহার সহিত প্রত্যাগমন কালে তাহাদিগের পোত সমুদ্র গর্ভে নিমগ্ন হয়।

উহার উত্তর পীঠিকায় উক্ত আছে যে, মিত্রগুপ্ত নামক কোন ব্যক্তি পোতারোহণ করিয়া প্রবল বাত্যায় বিপথগামী হইয়া দ্বীপান্তরে অবতরণ করিয়াছিলেন। কবি-কঙ্কণোক্ত বাঙ্গালা দেশীয় ধনপতি সওদাগর ও শ্রীমন্ত সওদাগর সিংহল দ্বীপে বাণিজ্যার্থ গমন করিয়াছিলেন। পরন্তু দুই সহস্রাধিক বৎসরের প্রাচীন অভিজ্ঞান শকুন্তলা নামক গ্রন্থোক্ত ধনবৃদ্ধ নামক বণিকের গল্প এবং চতুর্দ্দশ শত বর্ষাধিক পুরাতন হিতোপদেশ গ্রন্থের কন্দর্পকেতুর আখ্যান * পাঠ করিলে স্পষ্টই জানা যায় যে, পূর্ব্বকালে হিন্দুগণ সমুদ্র যাত্রা করিতেন। বিশেষতঃ কাব্যাদি গ্রন্থোল্লিখিত বণিক ও বাণিজ্য-দ্রব্য বিবরণাদি দ্বারা বিলক্ষণ প্রতীতি হয় যে, প্রাচীন কালে হিন্দুগণ বাণিজ্যপ্রিয় ছিলেন এবং পোতযোগে বাণিজ্যাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

যৎকালে হিন্দুগণ সমুদ্রযাত্রী ও সামুদ্রিক বণিক ছিলেন, তৎকালে তাঁহারা যে পোত-নির্ম্মাতাও ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। নিষ্পদ যানোদ্দেশ নামক গ্রন্থে নানাবিধ নৌকানির্ম্মাণ, তাহাদের লক্ষণ ও গুণাদি সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ আছে, তন্মধ্যে সমুদ্রযানেরও নির্দ্দেশ রহিয়াছে। এই সমস্ত পাঠ করিয়া প্রতীতি হয় যে, উক্ত গ্রন্থ রচনার পূর্ব্বেও ভোজ-কৃত এবং অন্যান্য মুনি-কৃত অনেকানেক গ্রন্থ প্রচলিত ছিল (১)।

অতি প্রাচীন কালে কর-দান ও বাণিজ্য-বিনিময় কিরূপ উপায় দ্বারা সাধিত হইত, তাহা নিরূপণ করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। প্রাচীনকালে যেমন দ্রব্য বিনিময়ে বাণিজ্য কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত, তেমনি আবার এক প্রকার মুদ্রারও প্রচলন ছিল। পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদের বহুস্থানে মুদ্রা সম্বন্ধে উল্লেখ রহিয়াছে। আমরা উহার একস্থান হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম ; যথা—

"দশো হিরণ্য পিণ্ডান্ দিবোদাসাদ অসানিষম্"।

ঋগ্বেদ—৬।৪৭।২৩।

দিবোদাস হইতে দশটী হিরণ্যপিণ্ড পাইলাম। বাইবেল শাস্ত্রোক্ত সেক্লের ন্যায় এই হিরণ্যপিণ্ডের পরিমাণ কি, তাহা জানা যায় না। তবে পরোক্ত সুবর্ণ বা

* "অস্তি সিংহলদ্বীপে ভূপতি জীমূতকেতোঃ পুত্রঃ কন্দর্পকেতুর্নাম। একদা কেলিকাননাবস্থিতেন ময়া পোতে বণিক মুখাৎ শ্রুতং যৎ" ইত্যাদি।

হিতোপদেশঃ।

(১) See শব্দকল্পদ্রুম নৌকাশব্দ।

নিষ্কের সহিত উহার আকারগত পার্থক্য থাকিলেও পরিমাণ গত সমতা থাকা নিতান্ত সম্ভাবিত।

রামায়ণ ও মহাভারতের কালে সুবর্ণ ও নিষ্ক নামক মুদ্রার প্রচলন দৃষ্ট হয়। ভগবান্ মনু লিখিয়াছেন যে,—

"সর্ষপাঃ ষট্ যবোমধ্য স্ত্রিযবস্থেক কৃষ্ণলম্।
পঞ্চকৃষ্ণলকো মাষ স্তে সুবর্ণস্তু ষোড়শ॥" ১৩৪
"চতুঃ সৌবর্ণিকো নিষ্কঃ"। ১৩৭
৮ম অধ্যায়।

অর্থাৎ ৬ সর্ষপ = ১ যব, ৩ যব = ১ কৃষ্ণল, ৫ কৃষ্ণল = মাষ, ১৬ মাষ = ১; সুবর্ণ, ৪ সুবর্ণ = ১ নিষ্ক।

টীকাকার রামানুজ রামায়ণের ২।২৩। ১০ শ্লোকের টীকায় নিষ্কের অবস্থা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, "এই শ্লোকের মধ্যে যে নিষ্কের নাম উক্ত হইয়াছে, উহা "স্বনামাঙ্কিত নিষ্ক"—এতদ্দ্বারা নিষ্ক যে যে মুদ্রাঙ্কিত ছিল, তাহা অনুমিত হয়। বিহাটের নিকট প্রাপ্ত যে সকল মুদ্রার চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রথম সংখ্যক মুদ্রা খ্রীষ্টের পাঁচশত বৎসরাধিক কালের বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। ঐ মুদ্রার উভয় পার্শ্ব ও পৃষ্ঠ ছবিও অক্ষরে অঙ্কিত। বাস্তবিক, ঐ মুদ্রার এরূপ ভাব উহার মুদ্রাঙ্কন দিবস হইতে প্রচলিত হয় নাই, তাহার বহু পূর্ব্ব হইতে যে চলিত ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

রাজাদিগের মধ্যে উপহার দিবার নিমিত্ত কিরূপ দ্রব্য সকল ব্যবহৃত হইত, তাহা রামায়ণে কেকয়-রাজ কর্ত্তৃক ভরতকে প্রদত্ত দ্রব্যজাত দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়। কেকয়-রাজ "উৎকৃষ্ট হস্তী, বিচিত্র কম্বল, মৃগচর্ম্ম, অন্তঃপুর-পালিত ব্যাঘ্রের ন্যায় বলসম্পন্ন করাল-বদন কুকুর, দুই সহস্র নিষ্ক এবং ষোড়শশত অশ্ব ভরতকে উপহার দিলেন।"

এইরূপ মহাভারতে উক্ত আছে যে, "হে ভারত, অভিমন্যু জন্মগ্রহণ করিলে মহাতেজা কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণদিগকে অযুত সংখ্যক গো এবং নিষ্ক প্রদান করিয়াছিলেন *।

প্রাচীন কালে ভারতের যে কত সুখসমৃদ্ধির বৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা করা অসম্ভাবিত। ইতঃপূর্ব্বে প্রাচীন ভারতের ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে বিবিধ বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। যৎকালে ভারত-বহির্ভূত দেশবাসিগণ গিরিগহ্বরে বা মহারণ্যে বাস করে, তৎকালীন ভারতীয় রাজার রাজধানীর বহিঃ শোভা সমৃদ্ধি আর পাঠক-মহাশয় কি দেখিবেন, একবার উহার অন্তঃপুরের শোভাই সন্দর্শন করুন।

রামায়ণের দ্বিতীয় কাণ্ডে ১০ম সর্গে বর্ণিত আছে যে, মহারাজ দশরথের অন্তঃপুর শুকগণ ও ময়ূরগণ সমাযুক্ত এবং ক্রৌঞ্চ ও হংসের কলরবে পরিপূর্ণ। তথায় উৎকৃষ্ট বাদিত্র সকল বাদিত হইতেছে এবং কুব্জা ও বামনাকারা দাসীগণ রহিয়াছে। কোন স্থানে লতাগৃহ ও চিত্রগৃহ, কোন স্থানে বা চম্পক এবং অশোক বৃক্ষশ্রেণী বিরাজিত। কোথাও বা গজদন্ত, রজত এবং সুবর্ণ নির্ম্মিত বেদী সকল শোভা পাইতেছে। স্থানান্তরে নিত্য পুষ্পফলশালী তরুরাজি এবং বাপী সকল অবস্থিত রহিয়াছে। বিবিধ ভোজ্য, পানীয় ও ভক্ষ্যদ্রব্য পরিপূরিত এবং মহা-

* "যস্মিন্ (অভিমন্যৌ) জাতে মহাতেজাঃ কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ। অযুতং গাদ্বিজাতিভ্যঃ প্রাদান্নিষ্কাংশ্চ ভারতঃ।"

মূল্য রত্ন ও ভূষণাদি-সমাযুক্ত স্বর্গসদৃশ সমৃদ্ধিশালী সেই অন্তঃপুরে মহারাজা প্রবেশ করিলেন ১।

হায়, ভারতের সে সুখ-সমৃদ্ধি কোথায়? এখন নির্ধন ভারত অন্তঃসারশূন্য হইয়া শোচনীয় দশায় পরিণত!

যৎকালে ভারত নিজ সুসন্তান মহাবীর্য্য পরাক্রমশালী হিন্দু নৃপতি-বৃন্দ কর্তৃক সংরক্ষিত ও প্রতিপালিত হইত, তৎকালে ভারতীয় শক্তিমান্ লোক সকল বহুদূরদেশে যাতায়াত করিয়া দুঃসাধ্য কার্য্য সমূহ সম্পন্ন করিতেন; যে কালে হিন্দু বণিকেরা স্বদেশীয় ও বিদেশীয় বিবিধ বেশধারী নানা জাতীয় বণিক্‌দিগের সহিত নানা ভাষায় কথোপকথন করিতেন; যৎকালে হিন্দু সাংযাত্রিকগণ পোতারোহণে সমুদ্রস্থ দ্বীপপুঞ্জবাসী ও সাগরপারস্থিত দেশবাসিগণের সহিত বাণিজ্য ব্যাপার সম্পাদন করিতেন; যে কালে হিন্দুধর্ম্ম ভারতবাসীর চিত্তে দৃঢ় বিশ্বাস সংস্থাপিত ছিল, উহা তাদৃশ দুর্ব্বল ছিল না যে, ম্লেচ্ছ বা যবনের ছায়া স্পর্শে বা জলস্পর্শে বিকম্পিত ও দূষিত হইবে! যৎকালে ভারতবাসিগণ "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"—এই মূল মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন, যাঁহারা অষ্টমবর্ষীয়া কন্যার বিবাহকে মহা পাপ মনে করিতেন। যাঁহারা পতিব্রতা ও বিদুষী গৃহলক্ষ্মীগণ লইয়া এবং অকাল জরামৃত্যু-বর্জ্জিত হইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন; যে কালে দেবতা-বাঞ্ছিত পুণ্যভূমি ভারত সৌভাগ্য-তরঙ্গে তরঙ্গায়িত, সেকালে আমাদের সম্বন্ধে কি পরম সৌভাগ্যের কালই ছিল!

তৎকালীয় মহোৎসাহ, দৃঢ়ব্রত, মহাবল হিন্দুগণের সহিত অধুনাতন নিরুৎসাহ, নিরুদ্যম, দুর্ব্বল হিন্দুদিগের তুলনা করিলে আমাদিগকে সেই আর্য্য হিন্দুসন্তান বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা হয়!

এইক্ষণ আমরা এতই দুর্ব্বল ও ক্ষুদ্রাশয় হইয়াছি যে, পোতারোহণে বিদেশে গমন করা শাস্ত্র-নিষিদ্ধ, সুতরাং পাপ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ভ্রমক্রমে ভারতবাসিগণ বিশেষতঃ বঙ্গদেশবাসিগণ স্মার্ত্ত রঘুনন্দনধৃত আদি পুরাণীয় বচনটী কলিযুগে সমুদ্র যাত্রা নিষেধক বলিয়া থাকে। বাস্তবিক উক্ত বচনটী সমুদ্র যাত্রার নিষেধক নহে। যেমন সত্যাদি যুগত্রয়ে অগ্নি-পরীক্ষা, জল-পরীক্ষা, ভৃগু-পতন, মহাপ্রস্থান এবং প্রায়োপবেশন ইত্যাদি দ্বারা লোকে দেহত্যাগ করিত, তেমনি আবার লোকে সমুদ্র যাত্রা অর্থাৎ সঙ্কল্প পূর্ব্বক সমুদ্রে দেহ ত্যাগ করিবার নিমিত্ত গমন করিত। তত্তৎকালে এরূপ শাস্ত্রীয় আত্ম হত্যায় পাপ হইত না। উক্ত বচন দ্বারা কলিযুগে সেই "সমুদ্র-যাত্রা" অর্থাৎ সমুদ্রে দেহ ত্যাগার্থ গমনটী নিষিদ্ধ হইয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে অধুনা ভারতবাসীগণ "সমুদ্র যাত্রা" অর্থে সমুদ্রপথে গমন অর্থাৎ পোতারোহণ পূর্ব্বক সমুদ্র-পথে দেশান্তরে গমন নিষিদ্ধ, ইহাই বুঝিয়াছে! উক্ত বচনের এই ভ্রমাত্মক অর্থটী সার জ্ঞান করিয়া তাহারা বাটীতে বসিয়াছে!

১ "শুকবর্হিসমাযুক্তং ক্রৌঞ্চহংসরুতা যুতম্। ১২ বাদিত্ররব সংঘুষ্টং কুব্জা বামনিকা যুতম্। লতাগৃহৈশ্চিত্রগৃহৈশ্চম্পকাশোক শোভিতৈঃ॥ ১৩ দান্তরাজত সৌবর্ণ বেদিকাভিঃ সমাযুতম্। নিত্য পুষ্পফলৈর্বৃক্ষৈর্বাপীভিরুপশোভিতম্॥ ১৪ দান্ত রাজত সৌবর্ণৈঃ সংবৃতং পরমাসনৈঃ। বিবিধৈরন্ন পানৈশ্চ ভক্ষ্যৈশ্চ বিবিধৈরপি॥১৫ উপপন্নং মহার্হৈশ্চ ভূষণৈস্ত্রিদিবোপমম্। স প্রবিশ্য মহারাজঃ স্বমন্তঃপুর মৃদ্ধিমৎ॥ ২৬।

রামায়ণ—২য় কাণ্ড, ১০ সর্গ।

বোধ হয়, ভারতের সর্ব্বাঙ্গীন পতনের পর ভারতবাসিগণ উক্ত বচনের ভ্রমাত্মক অর্থটী গ্রহণ করিয়াছে। যেমন পাঠান রাজত্বকালীয় মুসলমানগণের অত্যাচার সময়ে "অষ্টবর্ষা ভবেদ্গৌরী নববর্ষাচ রোহিণী" ইত্যাদি বচন কল্পিত ও উদ্বাহ তত্ত্বে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল; তেমনি মুসলমান রাজ্যকালে ভারত যখন নিস্তেজ ও নির্ব্বীর্য্য এবং সর্ব্বাঙ্গীন ভাবে পতিত, তখনই বোধ হয় আদি পুরাণীয় উক্ত বচনস্থ "সমুদ্র যাত্রা'' পদটীর ভ্রমাত্মক অর্থটী জন সমাজে পরিগৃহীত হইয়া থাকিবে; কারণ, কলিযুগের বহুকাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ ভারতে মুসলমানাধিকারের পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত যে ভারতবাসী হিন্দুগণ অন্তঃর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য কার্য্য সম্পাদন করিতেন এবং তাঁহারা যে সাংযাত্রিক ছিলেন, তদ্বিষয়ে ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রয়োগ প্রদর্শিত হইবে।

এইক্ষণ আমরা বৌদ্ধ কাল হইতে ভারতে যবনাধিকারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সময়ের ভারতীয় বাণিজ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধটী সমাপ্ত করিব। ক্রমশঃ।

শ্রীতারিণীকান্ত বিদ্যানিধি।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত। *

(শ্রীম—কথিত)

বিদ্যাসাগর ও ঠাকুর রামকৃষ্ণ

[কলিকাতায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মিলন—ভক্তসঙ্গে।]

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আজ শনিবার, শ্রাবণের কৃষ্ণষষ্ঠী তিথি, ৫ই আগষ্ট, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ। বেলা ৪ টা বাজিবে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতার রাজপথ দিয়া ঠিকা গাড়ী করিয়া বাদুড়বাগানের দিকে আসিতেছেন। সঙ্গে ভবনাথ, হাজরা, ও মাষ্টার। বিদ্যাসাগরের বাড়ী যাইবেন।

ঠাকুরের জন্মভূমি হুগলি জেলার অন্তঃপাতী কামারপুকুর গ্রাম। এই গ্রামটী বিদ্যাসাগরের জন্মভূমি বীরসিং নামক গ্রামের নিকটবর্ত্তী। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বাল্য কাল হইতে বিদ্যাসাগরের দয়ার কথা শুনিয়া আসিতেছেন। দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীতে থাকিতে থাকিতে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও দয়ার কথা প্রায় শুনিয়া থাকেন। মাষ্টার বিদ্যাসাগরের স্কুলে অধ্যাপনা করেন শুনিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, আমাকে বিদ্যাসাগরের কাছে কি লইয়া যাইবে? আমার দেখিবার বড় সাধ হয়। মাষ্টার বিদ্যাসাগরকে সেই কথা বলিলেন। বিদ্যাসাগর আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে একদিন ৪টার সময় সঙ্গে করিয়া আনিতে বলিলেন। একবার মাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, কি রকম "পরমহংস?" কি তিনি গেরুয়া কাপড় প'রে থাকেন? মাষ্টার বলিয়াছিলেন, আজ্ঞা না, তিনি এক অদ্ভুত পুরুষ, লালপেড়ে কাপড় পরেন, জামা পরেন, বার্ণিসকরা চটি জুতা পরেন, রাসমণির কালীবাড়ীতে একটী ঘরের ভিতর বাস করেন, সেই ঘরে তক্তাপোষ পাতা আছে—তাহার উপর বিছানা,

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত। প্রভাস গুপ্ত, ১৩।২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন।

মশারি আছে, সেই বিছানায় শয়ন করেন। কোন বাহ্যিক চিহ্ন নাই—তবে ঈশ্বর বই আর কিছু জানেন না, অহর্নিশি তাঁহারই চিন্তা করেন।

গাড়ী দক্ষিণেশ্বরের কালী বাড়ী হইতে ছাড়িয়াছে। পোল পার হইয়া শ্যামবাজার হইয়া ক্রমে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে আসিয়াছে। ভক্তেরা বলিতেছেন, এইবারে বাদুড়বাগানের কাছে আসিয়াছে। ঠাকুর বালকের ন্যায় আনন্দে গল্প করিতে করিতে আসিতেছেন। আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে আসিয়া হঠাৎ তাঁহার ভাবান্তর হইল; যেন ঈশ্বরাবেশ হইবার উপক্রম হইয়াছে।

গাড়ী রামমোহন রায়ের বাগানবাটীর কাছ দিয়া আসিতেছে। মাষ্টার ঠাকুরের ভাবান্তর দেখেন নাই; তাড়াতাড়ি ঠাকুরকে বলিতেছেন, এইটী রাম মোহন রায়ের বাটী। ঠাকুর বিরক্ত হইলেন, বলিলেন, এখন ও সব কথা ভাল লাগছে না। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইতেছেন।

বিদ্যাসাগরের বাটীর সম্মুখে গাড়ী দাঁড়াইল। গৃহটী দ্বিতল, ইংরাজ পছন্দ। জায়গার মাঝখানে বাটী ও জায়গার চতুর্দ্দিকে প্রাচীর। সদর দরজা ও ফটক বাড়ীর পশ্চিম ধারে। ফটকটী দ্বারের দক্ষিণ দিকে। পশ্চিমের প্রাচীর ও দ্বিতল গৃহের মধ্যবর্ত্তী স্থানে, মাঝে মাঝে পুষ্প বৃক্ষ। পশ্চিম দিকের নীচের ঘর হইয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে হয়। উপরে বিদ্যাসাগর থাকেন। সিঁড়ি দিয়া উঠিয়াই উত্তরে একটী কামরা, তাহার পূর্ব্বদিকে হল ঘর। হলের দক্ষিণ পূর্ব্ব ঘরে বিদ্যাসাগর শয়ন করেন। ঠিক দক্ষিণে আর একটী কামরা আছে—এই কয়টী কামরা বহুমূল্যপুস্তকপরিপূর্ণ। দ্যালের কাছে সারি সারি অনেকগুলি পুস্তকাগারে অতি সুন্দররূপে বাঁধান বইগুলি সাজান আছে। বিদ্যাসাগর যখন বসিয়া কাজ করেন, তখন হল ঘরের পূর্ব্ব সীমান্তে টেবিল্ ও চেয়ার আছে, সেইখানে তিনি পশ্চিমাস্য হইয়া বসেন। যাঁহারা দেখা শুনা করিতে আসেন, তাঁহারাও টেবিলের চতুর্দ্দিকের চেয়ারে উপবিষ্ট হন। টেবিলের উপর লিখিবার সামগ্রী—কাগজ, কলম, দোয়াত, ব্লটিং; অনেকগুলি চিঠি পত্র; বাঁধান হিসাব পত্রের খাতা; দুচার খানি বিদ্যাসাগরের পাঠ্য পুস্তক রহিয়াছে—দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ কাষ্ঠাসনের ঠিক দক্ষিণের কামরাতে খাট বিছানা আছে—সেই খানেই ইনি শয়ন করেন।

টেবিলের উপর যে পত্রগুলি চাপা রহিয়াছে—তাহাতে কি লেখা রহিয়াছে? কোন বিধবা হয় ত লিখিয়াছে—আমার অপোগণ্ড শিশু অনাথ, দেখিবার কেহ নাই, আপনার দেখিতে হ'বে। কেহ লিখিয়াছেন, আপনি খরমাতার চলিয়া গিয়াছিলেন, তাই আমার মাসোহারা ঠিক সময়ে পাই নাই; বড় কষ্ট হইয়াছে। কোন গরীব লিখিয়াছে, আপনার স্কুলে ফ্রি ভর্ত্তি হইয়াছি, কিন্তু আমার বহি কিনিবার ক্ষমতা নাই। কেহ লিখিয়াছেন, আমার পরিবারবর্গ খেতে পাচ্ছে না—আমাকে একটী চাকরী করিয়া দিতে হ'বে। তাঁর স্কুলের কোন শিক্ষক লিখিয়াছেন—আমার ভগিনী বিধবা হইয়াছে, তাহার সমস্ত ভার আমাকে লইতে হইয়াছে! এ বেতনে আমার চলে না। হয়ত কেহ বিলাত হইতে চিঠি লিখিয়াছেন, আমি এখানে

বিপদগ্রস্ত, আপনি দীনের বন্ধু, কিছু টাকা পাঠাইয়া আমার আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করুন। আবার কেহ হয়ত লিখিয়াছেন, অমুক তারিখে সালিসির দিন নির্দ্ধারিত হইয়াছে, আপনি সেই দিন আসিয়া আমাদের বিবাদ মিটাইয়া দিবেন।

ঠাকুর গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন। মাষ্টার পথ দেখাইয়া বাটীর মধ্যে লইয়া যাইতেছেন। উঠানে ফুল গাছ, তাহার মধ্য দিয়া আসিতে আসিতে ঠাকুর বালকের ন্যায় বোতামে হাত দিয়া মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "জামার বোতাম খোলা রহেছে—এতে কিছু দোষ হবে না?" গায়ে একটী লাংক্লথের জামা, পরনে লাল পেড়ে কাপড়, তাহার আঁচলটী কাঁধে ফেলা। পায়ে বার্ণিশ করা চটী জুতা। মাষ্টার বলিলেন, আপনি ওর জন্য ভাববেন না। আপনার কিছুতে দোষ হইবে না; আপনার বোতাম দেবার দরকার নাই। বালককে বুঝাইলে যেমন নিশ্চিন্ত হয়, ঠাকুরও তেমনি নিশ্চিন্ত হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[পূজা ও সম্ভাষণ]

সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া একবারে প্রথম কামরাটীতে (উঠিবার পর ঠিক উত্তরের কামরাটীতে) ঠাকুর ভক্তগণ সঙ্গে প্রবেশ করিতেছেন। বিদ্যাসাগর কামরার উত্তর পার্শ্বে দক্ষিণাস্য হইয়া বসিয়া আছেন; সম্মুখে একটী চারকোণা লম্বা পালিস করা টেবিল। টেবিলের পূর্ব্বধারে একখানি পেছন দিকে হেলান দেওয়া বেঞ্চ। টেবিলের দক্ষিণ পার্শ্বে ও পূর্ব্বপার্শ্বে কয়েকখানি চেয়ার। বিদ্যাসাগর দু একটী বন্ধুর সহিত কথা কহিতেছিলেন।

ঠাকুর প্রবেশ করিলে পর বিদ্যাসাগর দণ্ডায়মান হইয়া অভ্যর্থনা করিলেন। ঠাকুর পশ্চিমাস্য হইয়া টেবিলের পূর্ব্ব পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন; বামহস্ত টেবিলের উপর, পশ্চাত দিকে বেঞ্চখানি। বিদ্যাসাগরকে পূর্ব্ব পরিচিতের ন্যায় একদৃষ্টে দেখিতেছেন ও ভাবে হাসিতেছেন!

বিদ্যাসাগরের বয়স আন্দাজ ৬৪।৬৫ হইবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ অপেক্ষা ১৬।১৭ বৎসর বড় হইবেন। পরনে থান কাপড়, পায়ে চটিজুতা, গায়ে একটী হাত কাটা ফ্ল্যানেলের জামা। মাথার চতুষ্পার্শ্ব উড়িষ্যাবাসীদের মতন কামানো। কথা কহিবার সময় দাঁতগুলি উজ্জ্বল দেখিতে পাওয়া যায়;—দাঁতগুলি সমস্ত বাঁধান। মাথাটী খুব বড়। উন্নত ললাট ও একটু খর্ব্বাকৃতি। ব্রাহ্মণ, তাই গলায় উপবীত।

বিদ্যাসাগরের অনেক গুণ। প্রথম, বিদ্যানুরাগ। একদিন মাষ্টারের কাছে এই বলতে বলতে সত্য সত্য কেঁদে ছিলেন, 'আমার তো খুব ইচ্ছা ছিল যে পড়াশুনা করি; কিন্তু কৈ তা হোলো! সংসারে পড়ে কিছুই সময় পেলাম না!' দ্বিতীয়, দয়া সর্ব্বজীবে। বিদ্যাসাগর দয়ার সাগর। বাছুররা মায়ের দুধ পায় না দেখিয়া নিজে কয়েক বৎসর ধরিয়া দুধ খাওয়া বন্ধ করিয়াছিলেন, শেষে শরীর অতিশয় অসুস্থ হওয়াতে অনেক দিন পরে আবার ধরিয়াছিলেন। গাড়ীতে চড়িতেন না—ঘোড়ারা নিজের কষ্ট বলিতে পারে না। একদিন দেখিলেন একটী মুটে কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া রাস্তায় পড়িয়া আছে, কাছে ঝাঁকাটা পড়িয়া আছে। দেখিয়া নিজে কোলে করিয়া তাহাকে বাড়ীতে আনিলেন ও সেবা

করিতে লাগিলেন। তৃতীয়, স্বাধীনতা-প্রিয়তা। কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে একমত না হওয়াতে, সংস্কৃত কলেজের (প্রিন্সিপালের) প্রধান অধ্যক্ষের কাজ ছাড়িয়া দিলেন। চতুর্থতঃ, লোকাপেক্ষা করিতেন না। একটী শিক্ষককে ভালবাসিতেন; তাঁহার কন্যার বিবাহের সময় নিজে আইবড় ভাতের কাপড় বগলে করে এসে উপস্থিত! পঞ্চম, মাতৃভক্তি ও মনের বল। মা বলেছিলেন, ঈশ্বর তুমি যদি এই বিবাহে (ভ্রাতার বিবাহে) না আসো তাহলে আমার ভারি মন খারাপ হবে;—তাই কলিকাতা হইতে হাঁটিয়া গেলেন। পথে দামোদর নদী; নৌকা নাই, সাঁতার দিয়া পার হইয়া গেলেন। সেই ভিজা কাপড়ে, বিবাহ রাত্রেই মার কাছে গিয়া, উপস্থিত! বলিলেন মা, এসেছি!

ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইতেছেন ও কিয়ৎক্ষণ এই ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। ভাব সংবরণ করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে বলিতেছেন, আমি জল খাবো; দেখিতে দেখিতে বাড়ীর ছেলেরা ও আত্মীয় বন্ধুরা আসিয়া দাঁড়াইলেন।

ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া বেঞ্চের উপর বসিতেছেন। একটী ১৭।১৮ বছরের ছেলে সেই বেঞ্চে বসিয়া আছে—বিদ্যাসাগরের কাছে পড়া শুনার সাহায্য প্রার্থনা করিতে আসিয়াছে। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট; ঋষির অন্তর্দৃষ্টি; ছেলের অন্তরের ভাব সব বুঝিয়াছেন। একটু সরিয়া বসিলেন ও ভাবে বলিতেছেন, 'মা! এ ছেলের বড় সংসারাশক্তি! তোমার অবিদ্যার সংসার!'

যে ব্যক্তি ব্রহ্মবিদ্যার জন্য ব্যাকুল নয়, শুধু অর্থকরী বিদ্যা উপার্জ্জন তাহার পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র, এই কথা কি ঠাকুর বলিতেছেন?

বিদ্যাসাগর ব্যস্ত হইয়া একজনকে জল আনিতে বলিলেন; ও মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ইনি কিছু খাবার আনিলে খাবেন কি? মাষ্টার বলিলেন, আজ্ঞা আসুন না। বিদ্যাসাগর ব্যস্ত হইয়া ভিতরে গিয়া কতকগুলি মিঠাই আনিলেন ও বলিলেন, এ গুলি বর্দ্ধমান থেকে এসেছে। ঠাকুরকে কিছু খাইতে দেওয়া হইল, হাজরা ও ভবনাথও কিছু পাইলেন। মাষ্টারকে দিতে আসিলে পর বিদ্যাসাগর বলিলেন, ও ঘরের ছেলে, ওর জন্য আটকাচ্ছে না। ঠাকুর একটী ভক্ত ছেলের কথা বিদ্যাসাগরকে বলিতেছেন। সে ছোকরাটী ঐখানে ঠাকুরের সম্মুখে বসে ছিল। ঠাকুর বলিলেন, এ ছেলেটী বেশ সৎ; আর অন্তঃসার, যেমন ফল্গুনদী; উপরে বালী, একটু খুড়লেই ভিতরে জল বইছে দেখা যায়!

মিষ্টি মুখের পর ঠাকুর সহাস্যে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। দেখিতে দেখিতে এক ঘর লোক হইয়াছে, কেহ উপবিষ্ট, কেহ দাঁড়াইয়া।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আজ সাগরে এসে মিললাম। (সকলের হাস্য) এতদিন খাল, বিল, হদ্দ নদী দেখেছি; এইবার সাগর দেখছি। (সকলের হাস্য।)

বিদ্যাসাগর (সহাস্যে)। তবে নোনা জল খানিকটা নিয়ে যান (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ। নাগো! নোনা জল কেন? তুমিত অবিদ্যার সাগর নও; তুমি যে বিদ্যার সাগর! (সকলের হাস্য)। তুমি ক্ষীর সমুদ্র। (সকলের হাস্য)

বিদ্যাসাগর। তা বলতে পারেন বটে।

এই বলিয়া বিদ্যাসাগর চুপ করিয়া রহিলেন। ঠাকুর আবার কথা কহিতে-

ছেন। তোমার কর্ম্ম সাত্ত্বিক কর্ম্ম। সত্ত্বের রজঃ। সত্ত্বগুণ থেকে দয়া হয়। দয়ার জন্য যে কর্ম্ম করা যায়, সে রাজসিক কর্ম্ম বটে—কিন্তু এ রজো গুণ—সত্ত্বের রজোগুণ, এতে দোষ নাই। শুকদেবাদি লোকশিক্ষার জন্য দয়া রেখেছিলেন—ঈশ্বর শিক্ষা করাবার জন্য। তুমি বিদ্যা দান, অন্ন দান ক'রছো এও ভাল। নিষ্কাম ক'রতে পারলেই এতে ভগবান লাভ হয়। কেউ করে নামের জন্য, পুণ্যের জন্য, তাদের কর্ম্ম নিষ্কাম নয়।

(দয়া ও সিদ্ধপুরুষ।)

"আর সিদ্ধ তুমিত আছই"

বিদ্যাসাগর। মহাশয়! কেমন ক'রে?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। আলু পটল সিদ্ধ হ'লে ত নরম হয়, তা তুমি ত খুব নরম। তোমার অত দয়া (সকলের হাস্য)।

বিদ্যাসাগর (সহাস্যে) কলাই বাটা সিদ্ধ তো শক্ত হয়। (সকলের হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ। তুমি তা নও গো; শুধু পণ্ডিত গুলো দরকোচা পড়া! না এদিক, না ওদিক!

"শকুনি খুব উঁচুতে উঠে, কিন্তু তার নজর ভাগাড়ে! যারা শুধু পণ্ডিত, শুনতেই পণ্ডিত, কিন্তু তাদের কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি। শকুনির মত পচা মড়া খুঁজছে। তাদের আসক্তি অবিদ্যার সংসারে। দয়া, ভক্তি, বৈরাগ্য এ সব বিদ্যার ঐশ্বর্য্য।

বিদ্যাসাগর চুপ করিয়া শুনিতেছেন। সকলেই একদৃষ্টে এই আনন্দময় পুরুষকে দর্শন করিতেছেন ও তাঁহার কথামৃত পান করিতেছেন।

বিদ্যাসাগর মহাপণ্ডিত। যখন সংস্কৃত কলেজে পড়িতেন, তখন নিজের শ্রেণীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন। প্রতি পরীক্ষায় প্রথম হইতেন ও স্বর্ণপদকাদি (medal) বা ছাত্রবৃত্তি পাইতেন। ক্রমে সংস্কৃত কলেজে প্রধান অধ্যাপক হইয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সংস্কৃত কাব্যে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। অধ্যবসায় গুণে নিজে চেষ্টা করিয়া ইংরাজী শিখিয়াছিলেন।

ধর্ম্ম বিষয়ে বিদ্যাসাগর কাহাকেও শিক্ষা দিতেন না। তিনি দর্শনাদি গ্রন্থ পড়িয়াছিলেন। মাষ্টার একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আপনার হিন্দু দর্শন কিরূপ লাগে? তিনি বলিয়াছিলেন, 'আমার তো বোধ হয় ওরা যা বুঝাতে গেছে, তাহা বুঝাতে পারে নাই।' হিন্দুদের ন্যায় শ্রাদ্ধাদি ধর্ম্ম কর্ম্ম সমস্ত করিতেন; গলায় উপবীত ধারণ করিতেন; বাঙ্গালায় যে সকল পত্র লিখিতেন, তাহাতে "শ্রীশ্রীহরিশরণম্" ভগবানের এই বন্দনা আগে করিতেন।

মাষ্টার আর এক দিন তাঁহার মুখ হইতে শুনিয়াছিলেন, তিনি ঈশ্বর সম্বন্ধে কিরূপ ভাবেন। বিদ্যাসাগর বলিয়াছিলেন "তাঁকে তো জানবার যো নাই। আমাদের এখন কর্ত্তব্য কি? আমার মতে কর্ত্তব্য, আমাদের নিজের এরূপ হওয়া উচিত যে, সকলে যদি সেরূপ হয়, পৃথিবী তাহলে স্বর্গ হ'য়ে পড়বে, প্রত্যেকের চেষ্টা করা উচিত যাতে জগতের মঙ্গল হয়।

বিদ্যা ও অবিদ্যার কথা কহিতে কহিতে ঠাকুর ব্রহ্মজ্ঞানের কথা কহিতেছেন। বিদ্যাসাগর মহাপণ্ডিত। ষড় দর্শন পাঠ করিয়া দেখিয়াছেন, বুঝি ঈশ্বরের বিষয় কিছুই জানা যায় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ব্রহ্ম;—তিনি বিদ্যা ও অবিদ্যার পার।—তিনি মায়াতীত।

[The problem of Evil]

"এই জগতে বিদ্যামায়া অবিদ্যামায়া দুইই আছে; জ্ঞান, ভক্তি আছে, আবার কামিনী কাঞ্চনও আছে; সৎও আছে, অসৎও আছে, ভালও আছে, আবার মন্দও আছে। কিন্তু ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। ভাল মন্দ জীবের পক্ষে; সৎ অসৎ জীবের পক্ষে; তাঁর ওতে কিছু হয় না।

"যেমন প্রদীপের সম্মুখে কেউ বা ভাগবত পড়ছে; আর কেউ বা জাল করছে। প্রদীপ নির্লিপ্ত!

"সূর্য্য শিষ্টের উপর আলো দিচ্চে, আবার দুষ্টের উপরও আলো দিচ্চে।

"যদি বল দুঃখ, পাপ, অশান্তি এ সকল তবে কি? তার উত্তর এই যে, ওসব জীবের পক্ষে। ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। সাপের ভিতর বিষ আছে, অন্যকে কামড়ালে ম'রে যায়। সাপের কিন্তু কিছু হয় না।

[ব্রহ্ম অনির্ব্বচনীয়; অব্যপদেশ্যম্]

The Unknown and Unknowable.

"ব্রহ্ম যে কি, মুখে বলা যায় না। সব জিনিস উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে; বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, ষড়্দর্শন সব এঁটো হ'য়ে গেছে! মুখে পড়া হ'য়েছে, মুখে উচ্চারণ হয়েছে, তাই এঁটো হয়েছে। কিন্তু একটী জিনিস কেবল উচ্ছিষ্ট হয় নাই! সে জিনিসটী ব্রহ্ম। ব্রহ্ম যে কি, আজ পর্য্যন্ত কেহ মুখে বলতে পারে নাই!

বিদ্যাসাগর (বন্ধুদের প্রতি) বা! এটীতো বেশ কথা! আজ একটী নূতন কথা শিখলাম। ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হন নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ। এক বাপের দুটী ছেলে। ব্রহ্ম বিদ্যা শিখিবার জন্য ছেলে দুটীকে বাপ আচার্য্যের হাতে দিলেন। কয়েক বৎসর পরে তারা গুরুগৃহ থেকে ফিরে এলো, এসে বাপকে প্রণাম করলে। বাপের ইচ্ছা দেখেন, এদের ব্রহ্ম জ্ঞান কিরূপ হইয়াছে। বড় ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাপু! তুমি ত সব পড়েছ, ব্রহ্ম কিরূপ বল দেখি? বড় ছেলেটী বেদ থেকে নানা শ্লোক বলে বলে ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝাতে লাগলো। বাপ চুপ করে রইলেন। যখন ছোট ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, সে হেঁট মুখে চুপ ক'রে রইল! মুখে কোন কথা নাই! বাপ তখন প্রসন্ন হ'য়ে ছোট ছেলেটীকে বললেন, বাপু! তুমিই একটু বুঝেছ, ব্রহ্ম যে কি, মুখে বলা যায় না।

"মানুষে মনে ক'রে আমরা তাঁকে জেনে ফেলেছি। একটা পিপড়ে চিনির পাহাড়ে গিছলো। এক দানা খেয়ে পেট ভ'রে গেল, আর এক দানা মুখে ক'রে বাসায় যেতে লাগ্‌লো, যাবার সময় ভাবছে,—এবার এসে সব পাহাড়টী নিয়া যাবো। ক্ষুদ্র জীবেরা এই সব মনে ক'রে। জানেনা ব্রহ্ম বাক্যমনের অতীত।

"যে যত বড়ই হউন না কেন, তাঁকে কি জানবে? শুকদেবাদি না হয় ডেও পিপড়ে—চিনির আট দশটা দানা না হয় মুখে করুক।

"তবে বেদে পুরাণে যা ব'লেছে—সে কি রকম বলা জান? একজন সাগর দেখে এলে যদি কেউ জিজ্ঞাসা ক'রে, কেমন দেখ্‌লে, সে লোক মুখ হাঁ ক'রে বলে—ওঃ! কি দেখলুম! কি হিল্লোল কল্লোল! ব্রহ্মের কথাও সেই রকম। বেদে আছে—তিনি আনন্দস্বরূপ—সচ্চিদানন্দ। শুকদেবাদি এই

ব্রহ্ম সাগরের তটে দাঁড়িয়ে দর্শন স্পর্শন করে ছিলেন। এক মতে আছে—তাঁরা এ সাগরে নামেন নাই। এ সাগরে নামলে আর ফির্‌বার যো নাই!

[নির্বিকল্প সমাধি ও ব্রহ্মজ্ঞান।]

"সমাধিস্থ হ'লে ব্রহ্মজ্ঞান হয়—ব্রহ্ম-দর্শন হয়—সে অবস্থায় বিচার একেবারে বন্ধ হ'য়ে যায়;—মানুষ চুপ হ'য়ে যায়! ব্রহ্ম কি বস্তু মুখে বল্‌বার শক্তি থাকে না।

"লুণের ছবি (লবণ পুত্তলিকা) সমুদ্র মাপ্‌তে গিছ্‌লো! (সকলের হাস্য)। কত গভীর জল তাই খপর দেবে! খপর দেওয়া আর হ'ল না। যাই নামা অমনি গলে যাওয়া! কে আর খপর দিবেক?

একজন প্রশ্ন করিলেন "সমাধিস্থ ব্যক্তি,—যাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান হ'য়েছে, তিনি কি আর কথা কন না?

শ্রীরামকৃষ্ণ। (বিদ্যাসাগরাদির প্রতি)। শঙ্করাচার্য্য লোকশিক্ষার জন্য বিদ্যার 'আমি' রেখে ছিলেন। ব্রহ্মদর্শন হ'লে মানুষ চুপ হ'য়ে যায়। যতক্ষণ দর্শন না হয়, ততক্ষণই বিচার। ঘি কাঁচা যতক্ষণ থাকে, ততক্ষই কল্‌কলানি। পাকা ঘির কোন শব্দ থাকে না। কিন্তু যখন পাকা ঘিয়ে আবার কাঁচা লুচি পড়ে—তখন আর এক-বার ছোঁক কল্‌কল্‌ করে। যখন কাঁচা লুচিকে পাকা ক'রে, তখন আবার চুপ্‌ হ'য়ে যায়। তেমনি সমাধিস্থ লোক লোক-শিক্ষা দিবার জন্য আবার নেমে আসে; আবার কথা কয়।

"যতক্ষণ মৌমাছি ফুলে না বসে, ততক্ষণ ভন্‌ ভন্‌ করে ফুলে ব'সে। মধু পান কর্‌তে আরম্ভ করলে চুপ হয়ে যায়। মধুপান করবার পর মাতাল হ'য়ে আবার কখনও কখনও গুণ্‌ গুণ্‌ করে।

"পুকুরে কল্‌সীতে জল ভরবার সময় ভক্‌ ভক্‌ শব্দ হয়। পূর্ণ হ'য়ে গেলে আর শব্দ হয় না। (সকলের হাস্য)। তবে আর এক কলসীতে যদি ঢালাঢালি হয় তা হ'লে আবার শব্দ হয়। (সকলের হাস্য)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

[জ্ঞান ও বিজ্ঞান; অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ এই তিনের সমন্বয়।]

Reconciliation of Non-dualism, Qualified Dualism and Dualism.

"ঋষিদের ব্রহ্মজ্ঞান হ'য়েছিল। বিষয় বুদ্ধির লেশ মাত্র থাকলে এই ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। ঋষিরা কত খাট্‌তো, সকাল বেলা আশ্রম থেকে চলে যেত। একলা সমস্ত দিন ধ্যান চিন্তা করত; রাত্রে আশ্রমে ফিরে এসে কিছু ফলমূল খেত। দেখা, শুনা, ছোঁয়া এ সবের বিষয় থেকে মনকে আলাদা রাখ্‌তো; তবে ব্রহ্মকে বোধ বোধ কর্‌তো।

"কলিতে অন্নগত প্রাণ, দেহ বুদ্ধি যায় না। এ অবস্থায় 'সোঽহং' বলা ভাল নয়। সবই করা যাচ্চে, আবার 'আমিই ব্রহ্ম' এ বলা ঠিক্‌ নয়!

যারা বিষয় ত্যাগ করতে পারে না, যাদের 'আমি' কোন মতে যাচ্চেনা, তাদের 'আমি দাস' 'আমি ভক্ত' এ অভিমান ভাল। ভক্তি পথে থাকলেও তাঁকে পাওয়া যায়।

"জ্ঞানী 'নেতি' 'নেতি' ক'রে, বিষয় বুদ্ধি সব ত্যাগ ক'রে, তবে ব্রহ্মকে জান্‌তে পারে। যেমন সিঁড়ির ধাপ ছাড়িয়েং ছাদে পৌঁছান যায়। কিন্তু যিনি বিশেষরূপে তাঁর সঙ্গে আলাপ করেন, তিনি আরও

কিছু দর্শন করেন। বিজ্ঞানী দেখেন, ছাদ যে জিনিসে তৈয়ারি, সেই জিনিসেই—সেই ইট, চুন, সুরকিতেই,—সিঁড়িও তৈয়ারি। 'নেতি' 'নেতি' করে যাঁকে ব্রহ্ম ব'লে বোধ হ'য়েছে, তিনিই জীব জগৎ হয়েছেন। বিজ্ঞানী দেখে, যিনি নির্গুণ, তিনিই সগুণ।

"ছাদে অনেকক্ষণ লোকে প্রায় থাক্‌তে পারে না, আবার নেমে আসে। যাঁরা সমাধিস্থ হ'য়ে ব্রহ্ম দর্শন করেছেন, তাঁরাও নেমে এসে দেখেন যে, জীব জগৎ তিনিই হয়েছেন। সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি। কিন্তু 'নি'তে অনেকক্ষণ থাকা যায় না। 'আমি' যায় না। তখন দেখে, তিনিই আমি; তিনিই জীব জগৎ সব হ'য়েছেন।

"জ্ঞানীর পথও পথ। জ্ঞান-ভক্তির পথও পথ; আবার ভক্তির পথও পথ। জ্ঞান-যোগও সত্য, ভক্তি পথও সত্য; সব পথ দিয়ে তাঁর কাছে যাওয়া যায়। তিনি যতক্ষণ 'আমি' রেখে দেন, ততক্ষণ ভক্তিপথই সোজা।

"বিজ্ঞানী দেখে ব্রহ্ম অটল, নিষ্ক্রিয়; সুমেরুবৎ। এই জগৎ সংসার তাঁর সত্ত্ব রজঃ তম তিন গুণে হ'য়েছে। তাঁতে বিদ্যা অবিদ্যা দুই আছে; কিন্তু তিনি নির্লিপ্ত।

"বিজ্ঞানী দেখে যিনিই ব্রহ্ম তিনিই ভগবান্; যিনিই গুণাতীত, তিনিই ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ ভগবান। এই জীব জগৎ, মন, বুদ্ধি, ভক্তি, বৈরাগ্য, জ্ঞান, এ সব তাঁর ঐশ্বর্য্য।

(সহাস্যে) "যে বাবুর ঘর দোর নাই, হয়তো বিকিয়ে গেলো, সে বাবু কিসের বাবু! (সকলের হাস্য)। ঈশ্বর ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ। সে শ্লালার যদি ঐশ্বর্য্য না থাকতো তাহ'লে কে মানতো (সকলের হাস্য)।

"দেখনা এই জগৎ কি চমৎকার। কত রকম জিনিস—চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র! কত রকম জীব! বড়, ছোট; ভাল, মন্দ, কারু বেশী শক্তি কারু কম শক্তি।

বিদ্যাসাগর। তিনি কি কারুকে বেশী শক্তি, কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি বিভুরূপে সর্ব্বভূতে আছেন। পিঁপড়েতে পর্য্যন্ত। কিন্তু শক্তি বিশেষ। তা না হ'লে একজন লোকে দশজনকে হারিয়ে দেয়। আর কেউ একজনের কাছ থেকে পালায়। আর তা না হ'লে তোমাকেই বা সবাই মানে কেন? তোমার কি সিং বেরিয়েছে দুটো? (হাস্য)। তোমার দয়া আছে, তোমার বিদ্যা আছে—অন্যের চেয়ে; তাই তোমাকে লোকে মানে, দেখতে আসে। তুমি এ কথা মানো কি না?'

বিদ্যাসাগর মৃদু ২ হাসিতে লাগিলেন।

[পাণ্ডিত্য, পুঁথি ও বিদ্যাসাগর]

শ্রীরামকৃষ্ণ। শুধু পাণ্ডিত্যে কিছু নাই। তাঁকে পাবার উপায়, জানবার জন্যই বই পড়া। একটী সাধুর পুথিতে কি আছে; একজন জিজ্ঞাসা করলে। সাধু খুলে দেখালে। পাতায় পাতায় 'ওঁ রাম' লেখা রয়েছে—আর কিছুই লেখা নাই!

"গীতার অর্থ কি? দশবার বল্লে যা হয়। 'গীতা' 'গীতা' দশবার বল্‌তে গেলে 'ত্যাগী' 'ত্যাগী' হয়ে যায়। গীতায় এই শিক্ষা দিচ্ছে, হে জীব সব ত্যাগ করে ভগবানকে লাভ করবার চেষ্টা কর। সাধুই হোক, আর সংসারী হোক, মন থেকে সব আসক্তি ত্যাগ কর্‌তে হয়।

"চৈতন্য দেব যখন দক্ষিণে তীর্থ ভ্রমণ করছিলেন—দেখলেন, একজন গীতা পড়্‌ছে। আর একজন একটু দূরে বসে শুনছে, আর

কাঁদছে—কেঁদে চোখ ভেসে যাচ্ছে। চৈতন্য দেব জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এ সব বুঝতে পারছো? সে বল্লে ঠাকুর! আমি এ সব শ্লোক কিছু বুঝতে পাচ্চি না। তিনি জিজ্ঞাসা কর্‌লেন "তবে কেন কাঁদ্‌ছো?" ভক্তটী বল্লে, আমি দেখছি অর্জ্জুনের রথ; আর তার সামনে ঠাকুর আর অর্জ্জুন কথা কচ্চেন। তাই দেখে আমি কাঁদ্‌ছি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

[ভক্তিযোগের রহস্য]

(The Secret of Dualism)

"বিজ্ঞানী কেন ভক্তি নিয়ে থাকে?

"এর উত্তর এই যে 'আমি' যায় না। সমাধি অবস্থায় যায় বটে, কিন্তু আবার এসে প'ড়ে। আর সাধারণ জীবের 'অহং' যায় না। অশ্বথ গাছ কেটে দাও, আবার তার পর দিন ফেক্‌ড়ি বেড়িয়েছে। (সকলের হাস্য।)

"জ্ঞান লাভের পরেও আবার কোথা থেকে 'আমি' এসে পড়ে! স্বপনে বাগ্‌ দেখেছিলে; তার পর জাগ্‌লে; তবুও বুক দুড় দুড় করছে!

"জীবের 'আমি' নিয়েই ত যত যন্ত্রণা। গরু 'হাম্বা' (আমি) 'হাম্বা' (আমি) করে; তাইত অত যন্ত্রণা। লাঙলে যোড়ে, রোদ, বৃষ্টি গায়ের উপর দিয়া যায়; আবার কশাইয়ে কাটে; চামড়ায় জুতো হয়, ঢোল হয়; —তখন খুব পেটে। (হাস্য)। তবুও নিস্তার নাই! শেষে নাড়ীভুড়ি থেকে তাঁত তৈয়ার হয়। সেই তাঁতে ধুনুরীর যন্ত্র হয়। তখন আর 'আমি' আমি ব'লে না, তখন বলে 'তুঁহু', 'তুঁহু' (অর্থাৎ 'তুমি', 'তুমি')। যখন 'তুমি' 'তুমি' বলে তখন নিস্তার। হে ঈশ্বর, আমি দাস, তুমি প্রভু; আমি ছেলে, তুমি মা।

"রাম জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, হনুমান, তুমি আমায় কি ভাবে দেখো? হনুমান বল্লে, রাম! যখন আমার 'আমি' বলে বোধ থাকে, তখন দেখি তুমি পূর্ণ, আমি অংশ; তুমি প্রভু, আমি দাস; আর রাম! যখন তত্ত্বজ্ঞান হয়, তখন দেখি, তুমিই আমি, আমিই তুমি।

"সেব্য সেবক ভাবই ভাল। 'আমি' তো যাবার নয়। তবে থাক্ শালা 'আমি' দাস হ'য়ে।

('আমি' ও 'আমার' ও বিদ্যাসাগর।)

"আমি ও আমার, এই দুটী অজ্ঞান। 'আমার বাড়ী', 'আমার টাকা', 'আমার বিদ্যা', 'আমার এই সব ঐশ্বর্য্য', এই যে ভাব, এটী অজ্ঞান থেকে হয়। হে ঈশ্বর, তুমি কর্ত্তা, আর এ সব তোমার জিনিষ— বাড়ী, পরিবার, ছেলেপুলে, লোক জন বন্ধু বান্ধব, এ সব তোমার জিনিষ।

"মৃত্যুকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত। মরবার পর কিছুই থাক্‌বে না। এখানে কতকগুলি কর্ম্ম কর্‌তে আসা। যেমন পাড়াগেঁয়ে বাড়ী—কলকাতায় কর্ম্ম করতে আসা। বড় মানুষের বাগানের সরকার, বাগান যদি কেউ দেখতে আসে, তো বলে 'এ বাগানটী আমাদের' 'এ পুকুর আমাদের পুকুর'। কিন্তু কোন দোষ দেখে বাবু যদি ছাড়িয়ে দেয়, তখন তার আমের সিন্দুকটী লয়ে যাবার যোগ্যতা থাকে না; দরওয়ানকে দিয়ে সিন্দুকটী পাঠিয়ে দেয়। (সকলের হাস্য)

"ভগবান দুই কথায় হাসেন, কবিরাজ যখন রোগীর মাকে বলে, মা! ভয় কি? আমি তোমার ছেলেকে ভাল করে দিব। তখন একবার হাসেন; এই ব'লে হাসেন,

মারি মারছি, আর এ কিনা বলে আমি বাঁচাব! কবিরাজ ভাবছে, আমি কর্ত্তা; ঈশ্বর যে কর্ত্তা এ কথা ভুলে গেছে। তার-পর যখন দুই ভাই দড়ি ফেলে জায়গা ভাগ করে, আর বলে 'এ দিকটা আমার ও দিকটা তোমার' তখন ঈশ্বর আর একবার হাসেন; এই মনে করে হাসেন, আমার জগৎ ব্রহ্মাণ্ড কিন্তু ওরা বল্‌ছে এ জায়গা 'আমার' আর 'তোমার'!

(উপায়;—বিশ্বাস ও ভক্তি।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁরে কি বিচার করে জানা যায়! তাঁর দাস হ'য়ে, তাঁর শরণা-গত হয়ে তাঁকে ডাক।

(বিদ্যাসাগরের) প্রতি, সহাস্যে আচ্ছা, তোমার কি ভাব?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

[ঈশ্বরকে ভালবাসা জীবনের উদ্দেশ্য]
(End of Life)]

"বিশ্বাস আর ভক্তি। তাঁকে ভক্তিতে সহজে পাওয়া যায়। তিনি ভাবের বিষয়।

"এই কথা বলিতে ২ ঠাকুর রামকৃষ্ণ আবার গান ধরিলেন:—

গান।

মন কি তত্ত্ব কর তাঁরে যেন উন্মত্ত আঁধার ঘরে।
সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত,
অভাবে কি ধরতে পারে।
অগ্রে শশী বশীভূত কর তব শক্তি সারে।
ওরে কোটার ভিতর চোর কুটারী,
ভোর হলে সে লুকাবে রে।
ষড়দর্শনে না পায় দরশন, আগম নিগম তন্ত্রসারে।
সে যে ভক্তি রসের রসিক,
সদানন্দে বিরাজ ক'রে পুরে।
সে ভাব লোভে পরম যোগী যোগ করে যুগ যুগান্তরে
হলে ভাবের উদয় লয় সে যেমন,
লোহাকে চুম্বুকে ধরে।
প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যাঁরে।
সেটা চাতরে কি ভাঙবো হাঁড়ি বোঝ না রে মন
ঠারে ঠোরে।

[ঠাকুর সমাধি মন্দিরে।]

"গান গাইতে গাইতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছেন। হাত অঞ্জলিবদ্ধ; দেহ উন্নত ও স্থির। নেত্রদ্বয় স্পন্দহীন! সেই বেঞ্চের উপর দক্ষিণাস্য হইয়া পা ঝুলাইয়া বসিয়া আছেন। সকলে উপগ্রীব হইয়া এই অদ্ভুত অবস্থা দেখিতেছেন। পণ্ডিত বিদ্যাসাগরও নিস্তব্ধ হইয়া এক দৃষ্টে দেখিতেছেন।

"ঠাকুর প্রকৃতিস্থ হইতেছেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আবার সহাস্যে কথা কহিতেছেন।

"ভাব ভক্তি, এর মানে—তাঁকে ভাল-বাসা। যিনিই ব্রহ্ম" তাঁকেই 'মা' বলে ডাক্‌ছে।

"প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যারে।
সেটা চাতরে কি ভাঙবো হাড়ি বোঝনারে মন
ঠারে ঠোরে।

[ব্রহ্ম নির্গুণ কি সগুণ।]

"রামপ্রসাদ মনকে বল্‌ছে—'ঠারে ঠোরে' বুঝতে। এই বুঝতে বলছে যে, বেদে যাঁকে ব্রহ্ম বলেছে—তাঁকেই আমি মা বলে ডাক্‌ছি। যিনিই নির্গুণ, তিনিই সগুণ; যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি। যখন নিষ্ক্রিয় বলে বোধ হয়, তখন তাঁকে 'ব্রহ্ম' বলি। আবার যখন ভাবি তিনি সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করছেন, তখন তাঁকে আদ্যা-শক্তি বলি, কালী বলি।

"ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। যেমন অগ্নি আর দাহিকা শক্তি, অগ্নি বল্লেই দাহিকা শক্তি বুঝা যায়; দাহিকা শক্তি বলিলেই অগ্নি বুঝিয়া যায়। একটীকে মানলেই আর একটীকে মানা হয়ে যায়।

"যার আলো বোধ আছে, তার অন্ধকার বোধও আছে, যার অন্ধকার বোধ আছে, তার আলো বোধও আছে। যার লীলা বোধ আছে, তার নিত্য বোধ আছে। তাই যার শক্তি বোধ আছে, তার ব্রহ্ম বোধ আছে। আবার যার নিত্য বোধ আছে, তার লীলা বোধ আছে; তাই যার 'ব্রহ্মবোধ আছে, তার 'শক্তি বোধ আছে।

"এটী অতি গুহ্য কথা। তাই রামপ্রসাদ বল্‌ছে;—

সেটা চাতরে কি ভাঙ্‌বো হাঁড়ি।
বোঝনারে মন ঠারে ঠোরে।

বিদ্যাসাগর। (একজন বন্ধুর প্রতি) চাতরে কি ভাঙবো হাঁড়ি; চাতর মানে কি, বুঝেছ? (সহাস্যে) 'চাতর' কি না চত্বার।

বন্ধু (সহাস্যে)। 'চত্বার' মানেতো উঠান্।

বিদ্যাসাগর। রামপ্রসাদ বল্‌ছে, 'উঠানে কি হাঁড়ি ভাঙবো?' যেমন বলে হাটে হাঁড়ি ভাঙবো?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে বিদ্যাসাগরের প্রতি)। ওঃ তুমি কি না পণ্ডিত, তাই এ সব জানো। (সকলের হাস্য)।

বিদ্যাসাগর মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। বলিতেছেন, আচ্ছা সে কথা আপ্‌নাকে একলা একলা এক দিন ব'লবো। (সকলের হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। তাঁকে পাণ্ডিত্য দ্বারা বিচার ক'রে জানা যায় না।

এই বলিয়া ঠাকুর প্রেমোন্মত্ত হইয়া গান ধরিলেন।

[ঈশ্বর অগম্য ও অপার]

গান।

কে জানে কালী কেমন?
ষড় দর্শনে না পায় দরশন।
কালী পদ্মবনে হংস সনে, হংসীরূপে করে রমণ।
মূলাধারে সহস্রারে সদা যোগী করে মনন।
আত্মারামের আত্মা কালী প্রমাণ প্রণবের মতন।
তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন।
মায়ের উদরে ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড প্রকাণ্ডতা জান কেমন॥
মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম্ম,
অন্য কেবা জানে তেমন।
প্রসাদ ভাসে লোকে হাসে, সন্তরণে সিন্ধু তরণ।
আমার মন বুঝেছে প্রাণ বুঝে না,
ধর্ব্বে শশী হ'য়ে বামন।

"দেখলে, কালীর উদরে ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড প্রকাণ্ডতা জান কেমন"। আর বলেছে 'ষড়দর্শনে না পায় দরশন,'—পাণ্ডিত্যে তাঁকে পাওয়া যায় না।

"বিশ্বাস আর ভক্তি চাই—বিশ্বাসের কত জোর শুন। এক জন লঙ্কা থেকে সমুদ্র পার হ'বে, বিভীষণ বল্লে "এই জিনিষটী কাপড়ের খুটে বেঁধে লও'। তা হলে নির্ব্বিঘ্নে চলে যাবে; জলের উপর দিয়ে চলে যেতে পারবে। কিন্তু খুলে দেখো না; খুলে দেখতে গেলেই ডুবে যাবে।" সে লোকটী সমুদ্রের উপর দিয়া বেশ চলে যাচ্ছিল। বিশ্বাসের এমনই জোর! খানিক পথ গিয়া ভাব্‌ছে, বিভীষণ এমন কি জিনিষ বেঁধে দিলেন যে, জলের উপর দিয়ে চলে যেতে পাচ্ছি। এই ব'লে কাপড়ের খুটটী খুলে দেখে, যে শুধু 'রাম' নাম লেখা একটী পাতা রয়েছে। তখন সে ভাব্‌লে, এঃ এই জিনিষ! ভাবাও যা অমনি ডুবে যাওয়া!

"কথায় বলে হনুমানের রাম নামে এত বিশ্বাস যে, বিশ্বাসের গুণে সাগর লঙ্ঘন কর্‌লে! কিন্তু স্বয়ং রামের সাগর বাঁধতে হ'ল।

(ঈশ্বরে বিশ্বাস ও মহাপাতক।)

শ্রীরামকৃষ্ণ। যদি তাঁতে বিশ্বাস থাকে,

তা হ'লে পাপই করুক, আর মহাপাতকই করুক, কিছুতেই ভয় নাই।

এই বলিয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণ ভক্তের ভাব আরোপ করিয়া ভাবে মাতোয়ারা হইয়া বিশ্বাসের মাহাত্ম্য গাহিতেছেন—

গান।

আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি।
আখেরে এ দীনে না তারো কেমনে জানা যাবে গো
শঙ্করী।

তাঁকেই 'মা' ব'লে ডাকা হ'চ্চে। 'মা' বড় ভালবাসার জিনিস কি না। ঈশ্বরকে ভালবাস্‌তে পারলেই তাঁকে পাওয়া যায়। ভাব, ভক্তি, ভালবাসা আর বিশ্বাস। আর একটা গান শোন।

[ভাব ও বিশ্বাস]

গান।

ভাবিলে ভাবের উদয় হয়।
(ও সে) যেমন ভাব, তেমনি লাভ
মূল সে প্রত্যয়॥
কালীপদ সুধা হ্রদে চিত্ত যদি রয়.
(যদি চিত্ত ডুবে রয়,)
তবে পূজা, হোম, যাগ. যজ্ঞ কিছুই কিছু নয়।

'চিত্ত তদ্গত হওয়া, তাঁকে খুব ভালবাসা। 'সুধা হ্রদ', কিনা অমৃতের হ্রদ। ওতে ডুব্‌লে মানুষ ম'রে না। অমর হয়। কেউ কেউ মনে করে, বেশী ঈশ্বর ঈশ্বর কর্‌লে মাথা খারাপ হ'য়ে যায়। তা নয়। এ যে সুধার হ্রদ! অমৃতের সাগর। বেদে তাঁকে 'অমৃত' বলেচে, এতে ডুবে গেলে মরে না—অমর হয়।

(নিষ্কাম ধর্ম্ম বা কর্ম্মযোগ,
ও 'জগতের উপকার'।)

"পূজা, হোম, যাগ, যজ্ঞ কিছুই কিছু নয়। যদি তাঁর উপর ভালবাসা আসে, তা-হলে আর এ সব কর্ম্মের বেশী দরকার নাই। যতক্ষণ হাওয়া পাওয়া না যায়, ততক্ষণই পাখার দরকার; যদি দক্ষিণে হাওয়া আপনি আসে, তা হলে পাখা রেখে দেওয়া যায়। আর পাখার কি দরকার!

"তুমি যে সব কর্ম্ম কর্‌ছো, এ সব সৎকর্ম্ম। যদি 'আমি কর্ত্তা' এই অহঙ্কার ত্যাগ করে নিষ্কাম ভাবে কর্‌তে পারো, তা-হলে খুব ভাল। এই নিষ্কাম কর্ম্ম কর্‌তে কর্‌তে ঈশ্বরেতে ভক্তি ভালবাসা আসে। এইরূপ নিষ্কাম কর্ম্ম কর্‌তে কর্‌তে ঈশ্বর লাভ হয়।

"কিন্তু যত তাঁর উপর ভক্তি ভালবাসা আস্‌বে, ততই তোমার কর্ম্ম কমে যাবে। গৃহস্থের বউ, তার পেটে যখন ছেলে হয়—শাশুড়ী তার কর্ম্ম কমিয়ে দেয়। যতই মাস বাড়ে, ততই শাশুড়ী কর্ম্ম কমায়। দশ মাস হলে আদপে কর্ম্ম কর্ত্তে দেয় না, পাছে ছেলের কোন হানি হয়, পাছে প্রসবের কোন ব্যাঘাৎ হয়—(সকলের হাস্য)।

"তুমি যে সব কর্ম্ম কর্‌ছ,এতে তোমার নিজের উপকার। নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম কর্‌তে পার্‌লে ঈশ্বরের উপর তোমার ভালবাসা আসবে। ভালবাসা এলেই তাঁকে লাভ করতে পারবে। জগতের উপকার মানুষ করে না; তিনিই কর্‌ছেন; যিনি চন্দ্র সূর্য্য করেছেন, যিনি মা বাপের ভিতর স্নেহ দিয়াছেন, যিনি মহতের ভিতর দয়া দিয়েছেন, যিনি সাধু ভক্তের ভিতর ভক্তি দিয়েছেন। যে কামনা শূন্য হয়ে কর্ম্ম করবে, সে নিজেরই মঙ্গল কর্‌বে।

[নিষ্কাম কর্ম্মের উদ্দেশ্য ঈশ্বর দর্শন।]

"অন্তরে সোণা আছে, এখনও খপর পাও নাই। একটু মাটী চাপা আছে।

যদি একবার সন্ধান পাও, তাহলে অন্য কাজ কমে যাবে। গৃহস্থের বৌর ছেলে হলে ছেলেটীকেই নিয়ে থাকে, এটীকে নিয়েই নাড়াচাড়া, সংসারের কাজ শাশুড়ী করতে দেয় না। (সকলের হাস্য)

"আরো এগিয়ে যাও। কাটুরে কাট কাট্‌তে গিছিল—একজন ব্রহ্মচারী বল্লে এগিয়ে যাও। এগিয়ে গিয়ে দেখে চন্দন গাছ! আবার কিছুদিন পরে ভাবলে তিনি এগিয়ে যেতে বলেছিলেন, চন্দন গাছ পর্য্যন্ত তো যেতে বলেন নাই।

এগিয়ে গিয়ে দেখে রূপার খনি! আবার কিছু দিন পরে এগিয়ে গিয়ে দেখে সোণার খনি! তার পর কেবল হীরা মাণিক! এই সব নিয়ে এক আণ্ডিল হয়ে গেল!

"নিষ্কাম কর্ম্ম করতে পারলে ঈশ্বরে ভালবাসা হয়, ক্রমে তাঁর কৃপায় তাঁকে পাওয়া যায়। ঈশ্বরকে দেখা যায়, আবার তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া যায়, যেমন আমি তোমার সঙ্গে কথা কচ্ছি! (সকলে নিঃশব্দ)।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

[ঠাকুর অহেতুক কৃপাসিন্ধু।]

সকলে অবাক্ ও নিস্তব্ধ হইয়া এই সকল কথা শুনিতেছেন। বোধ হইতেছে যেন সাক্ষাৎ বাগ্বাদিনী ঠাকুর রামকৃষ্ণের জিহ্বাতে অবতীর্ণ হইয়া বিদ্যাসাগরকে উপলক্ষ করিয়া জীবের মঙ্গলের জন্য এই সকল কথা বলিতেছেন। রাত্রি হইতেছে; প্রায় ৯টা বাজে। ঠাকুর এইবার বিদায় গ্রহণ করিবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিদ্যাসাগরের প্রতি, সহাস্যে) এ যা বল্‌লুম, বলা বাহুল্য, আপনি সব জানেন—তবে খপর নাই (সকলের হাস্য) বরুণের ভাণ্ডারে কত কি রত্ন আছে! কিন্তু বরুণ রাজার খপর নাই।

বিদ্যাসাগর (সহাস্যে) তা আপনি বলতে পারেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। হাঁ গো অনেক বাবু চাকর বাকরের নাম জানে না (সকলের হাস্য)—বাড়ীর কোথায় কি দামী জিনিস আছে, তা জানে না। কথাবার্ত্তা শুনিয়া সকলে আনন্দিত হইয়াছেন। সকলে একটু চুপ করিয়াছেন! ঠাকুর আবার বিদ্যাসাগরকে সম্বোধন করিয়া কথা কহিতেছেন!

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। একবার বাগান দেখ্‌তে যাবেন; রাসমণির বাগান। ভারি চমৎকার জায়গা!

বিদ্যাসাগর। যাবো বই কি! আপনি এলেন আর আমি যাবো না!

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমার কাছে! ছি! ছি!

বিদ্যাসাগর। সে কি! এমন কথা আপনি বল্‌লেন কেন? আমায় বুঝিয়ে দিন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (সহাস্যে) আমরা জেলেডিঙ্গি (সকলের হাস্য) আমরা খাল, বিল আবার বড় নদীতেও যেতে পারি। কিন্তু আপনি জাহাজ; কি জানি যদি যেতে গিয়ে চড়ায় লেগে যায় (সকলের উচ্চহাস্য)।

বিদ্যাসাগর সহাস্যবদন; চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। তার মধ্যে এ সময় জাহাজও যেতে পারে।

বিদ্যাসাগর (সহাস্যে)। হাঁ এটী বর্ষাকাল বটে (সকলের হাস্য)

মাষ্টার (স্বগতঃ)। নবানুরাগের বর্ষা। নবানুরাগের সময় মান অপমান বোধ থাকে না বটে।

ঠাকুর গাত্রোত্থান করিলেন; ভক্তসঙ্গে। বিদ্যাসাগর আত্মীয়গণ সঙ্গে দাঁড়াইয়াছেন। ঠাকুরকে গাড়ীতে তুলিয়া দিবেন।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ এখনও দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন কেন? ঠাকুর মূল মন্ত্র করে জপিতেছেন; জপিতে ২ ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন। অহেতুক কৃপাসিন্ধু! বুঝি যাইবার সময় মহাত্মা বিদ্যাসাগরের আধ্যাত্মিক মঙ্গলের জন্য মার কাছে প্রার্থনা করিতেছেন!

এইবার ঠাকুর ভক্তসঙ্গে সিঁড়ি দিয়া নামিতেছেন। একজন ভক্তের হাত ধরিয়া আছেন। বিদ্যাসাগর স্বজন সঙ্গে আগে ২ যাইতেছেন। বিদ্যাসাগরের হাতে বাতি, পথ দেখাইয়া আগে ২ যাইতেছেন। আজ শ্রাবণ কৃষ্ণাষষ্ঠী, এখনও চাঁদ উঠে নাই, তমসাবৃত উদ্যান ভূমির মধ্য দিয়া সকলে বাতির ক্ষীণালোক লক্ষ্য করিয়া ফটকের দিকে আসিতেছেন।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে ফটকের কাছে যাই পৌঁছিলেন, তখন সকলে একটী সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। বাঙ্গালীর পরিচ্ছদধারী সম্মুখে একটী গৌরবর্ণ শ্মশ্রুধারী পুরুষ, বয়স আন্দাজ ৩৬।৩৭; মাথায় শিখদিগের ন্যায় শুভ্র পাগড়ী; পরণে কাপড়, মোজা ও জামা; চাদর নাই। তাঁহারা দেখিলেন, এই পুরুষটী ঠাকুর রামকৃষ্ণকে দর্শন করিবা মাত্র মাটীতে উষ্ণীষ সমেত মস্তক অবলুণ্ঠিত করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া রহিয়াছেন। তিনি দাঁড়াইলে ঠাকুর বলিলেন, বলরাম! তুমি? তুমি এত রাত্রে?

বলরাম (সহাস্যে)। আজ্ঞা, আমি অনেকক্ষণ এসেছি; এখানে দাঁড়াইয়ে ছিলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ভিতরে কেন যাও নাই?

বলরাম। আজ্ঞা, সকলে আপনার কথাবার্ত্তা শুনচেন; মাঝে গিয়া বিরক্ত করা। এই বলিয়া বলরাম হাসিতে লাগিলেন।

ঠাকুর ভক্তসঙ্গে গাড়ীতে উঠিতেছেন।

বিদ্যাসাগর (মাষ্টারের প্রতি, মৃদুস্বরে) ভাড়া কি দেব?

মাষ্টার। আজ্ঞা না, ও হয়ে গেছে।

বিদ্যাসাগর ও অন্যান্য সকলে ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন।

গাড়ী উত্তরাভিমুখে হাঁকাইয়া দিল। গাড়ী দক্ষিণেশ্বর কালী বাড়ীতে যাইবে। এখনও সকলে গাড়ীর দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। বুঝি ভাবিতেছেন, এ মহাপুরুষ কে? যিনি ঈশ্বরকে এত ভালবাসেন, আর যিনি জীবের ঘরে ঘরে ফিরছেন; আর বলছেন ঈশ্বরকে ভালবাসাই জীবনের উদ্দেশ্য!

বসন্তে।

অই ডাকে পিকবধূ অই ডাকে পিক,
চ্যুত মুকুলগন্ধে, মুগ্ধ দশদিক!
মাঝিক তরণী বাহি সুরভি সাগরে,
ব্যাকুল হৃদয় চলে, মিলনের তরে,

শশী ঢালে মধুরাশি মঞ্জুল সঙ্গীত
বর্ত্তমান হ'য়ে আসে পালান অতীত।

মিলন প্রেমের সুরা, প্রেম সুরাপায়ী
বিচ্ছেদে এলায়ে প'ড়ে হয় ধরাশায়ী,

মাতাল, সুরার লাগি চলেছে কোথায়
অধীর উন্মত্ত সেজে, তরুণ তৃষায় ;
মলয়ে মিশায়ে আছে মরমের ভাষা,
শব্দ হয়ে তাই যেন মিটাইবে আশা,
সর্ব্বাঙ্গ শ্রবণ হতে তাই যেন চায়,
'বউ কথা কহ বুলি মলয় ফুটায়।

সুরভিত বায়ুসনে সঙ্গীতের ধারা,
বিজড়িত হয়ে প্রাণে, করে মাতোয়ারা;
মূর্ত্তি হয়ে স্বপ্ন যেন ঢুলায় চামর,
প্রেমে মাখা, প্রাণে দেখি পরম সুন্দর।
কাণে পশে অমুখরা প্রেয়সীর বাণী
মৃদুতায় বিজড়িত আনন্দের রাণী,
সংসারের সুষমায় করিয়া মন্থন,
চুম্বন অধরে সুধা. করে বরিষণ,
কার যেন পুষ্প স্পর্শ করি অনুভব
আমা ল'য়ে বসন্তের এ নব উৎসব।

চারি ধারে প্রকৃতির যৌবন উচ্ছ্বাস,
চারিধারে লাবণ্যের বিনোদ বিকাশ,
রজতের সুপ্ত কান্তি, মলয় কম্পন,
শ্রীযুক্ত করিতে বিশ্ব বিলায় জীবন,
প্রেম আজি পূর্ণ নগ্ন সৌন্দর্য্য কিরণ
বিকাশিছে নিখিলের বিচিত্র কেমন
পরাণে বাসন্ত রস লয়ে লালসায়,
কোন্ রাঙা চরণেতে ঢেলে দিতে চায়

কোথা স্নিগ্ধা ? কোথা প্রিয়া ? প্রিয়ার মতন.
নয়নের কোণে জাগে রূপের স্বপন,
কবে কার বেণুয়ার ধৈবত নিক্কণ,
ভাঙা রেশে করিতেছে শ্রবণ রঞ্জন ;
অক্ষয় জ্যোছনা রাশি ঢালে চন্দ্রমায়,
শক্তি এসে ধরণীরে কুসুমে সাজায়,
আকাঙ্খার সমুজ্জ্বল কুসুম মালায়,
এস প্রিয়ে, প্রসাধিতে কবি তোমা চায়,
বসন্তের সৌন্দর্য্যের অনন্ত পাথারে,

অবগাহি এস মুগ্ধে ! আমার দুয়ারে,
নিক্কণ রণনে হংস না করিবে রব,
বসন্তের হবে তুমি, অতুল বিভব
মূর্খী-ঝরা হাসি রাশি কুসুম যৌবন
তুলিবে সৌন্দর্য্য মাঝে সৌন্দর্য্য প্লাবন,
দেখ প্রিয়ে চিরস্নিগ্ধ এই বঙ্গভূমি
এস মায় পূজা করি আমি আর তুমি—
হে বসন্ত !
রোগক্লিষ্ট জরাজীর্ণ নর নারী-চিতে,
নবীভূতা শক্তিরাশি আজি প্রকাশিতে,
যুগ্ম মূর্ত্তি, করজোড়ি করে অনুনয়,
হে মধু করহ আজি নব অভিনয়।
ঢাল তব শক্তি রাশি ; শোণিত মাঝার,
নবপ্রীতি, নবপ্রেম করহ সঞ্চার,
মাধুরীর স্নিগ্ধ-বহ্নি ক্ষীণ হীনতায়,
ভস্ম করি প্রস্ফুটিত, করুক সবায়।
মরমের উপবনে, স্নিগ্ধ কিশলয়
হৃদয়ে রাখুক করি শ্যামলতাময়
প্রীতি দাও, প্রেম দাও, দাও ভালবাসা,
হ'রে লও অশান্তির দারুণ পিপাসা।
হে বসন্ত বর্ণে তব মাধুরী বিকাশ,
পর্ণে পর্ণে বিকীরিত অলকার হাস,
নিশ্বাস সুরভি ভরা পরশ শীতল
স্পর্শে নির্ব্বাপিত হয় নীচতা অনল
সুরভিত পুষ্প ভাষা হ'য়ে সমীরিত
সুধাছন্দে পিক-মুখে হতেছে ধ্বনিত,
চঞ্চল মাধুরী স্রোতে অভিষিক্ত মন
গাঢ় মাধুর্য্যের স্বাদ করে আস্বাদন ;
হে অদ্বৈত গৃহী-যতি দাঁড়ায়ে সকাশ
আমারে অপূর্ব্ব ভাবে করহ বিকাশ
আজ মধু—মধু ঢেলে দিয়াছে ভুবনে
দ্বিবাঞ্জন লাগিয়াছে যুগল নয়নে,
মধু ঝরা চাঁদিমায় মনোহরা ভাষা
হরিয়াছে প্রাণ হতে অশান্তি তিয়াষা।

অক্ষয়, গিরিজা, রবি, প্রিয় শশধর,
গোবিন্দ, রমণী, দেব * মধুর অন্তর
এসো দেখো, খুলে গেছে স্বর্গের দুয়ার!
ফলে ফুলে, জলে স্থলে হর্ষের বিস্তার,
প্রিয় জাগ † প্রিয়ে জাগ, জাগ বন্ধুগণ
দেখ দেখ সৌন্দর্য্যের উত্থান পতন!
পুষ্প গায় মধুভরা মধুর সঙ্গীত
সমীর ছুটিয়া চলে হ'য়ে পুলকিত,
স্ত্রীসঙ্গে লাবণ্য লীলা খেলে চন্দ্রমায়
আনন্দে উঠিছে অঙ্গ কাঁপি বসুধার,
যাও নিদ্রা যাও স্বপ্ন এসো জাগরণ
বসন্তের মধুমূর্ত্তি করি দরশন।

বেণোয়ারীলাল গোস্বামী।

স্ত্রী-পুং ভেদ।

এই প্রভেদ চির দিন ছিল না। জীব রাজ্যে নিম্নতম জীবগণের এই প্রভেদ দেখা যায় না। উদ্ভিদ ও জন্তুগণের মধ্যে এমন অনেক জীব আছে, যাহাদিগের স্ত্রী পুং চিহ্ন নাই, ‡, তাহাদিগের কাহারও বা এক অংশ দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথক জীবরূপে পরিণত হয়; কাহারও বা দেহের স্থান বিশেষ স্ফীত হইয়া খসিয়া পড়ে এবং তাহাতেই পৃথক জীব উৎপন্ন হয়।¶ প্রথমজ (Protozoa) শ্রেণীস্থ জীবগণের দেহাংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথক জীব হয়। অচিহ্নিত উদ্ভিদগণেরও জীবকোষ (Spore) বিক্ষিপ্ত হইয়া পৃথক জীবে পরিণত হয়। ইহাদিগের জীবকোষ একই প্রকার ভেদ-চিহ্নযুক্ত নহে। উহা উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত পোষণ প্রাপ্ত হইলে স্বয়ংই বর্দ্ধনশীল। পুংকীট $ এবং স্ত্রীডিম্বের সংমিশ্রণ আবশ্যক হয় না। একাই স্বতন্ত্র এবং পূর্ণ দেহে পরিণত হয়।

কিন্তু কালক্রমে সমস্তই পরিবর্ত্তিত হয়। এই এক অচিহ্নিত অবস্থাও চিরস্থায়ী হইতে পারে নাই। ইহা কারণাধীনে ক্রমে ঈষৎ পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে; এবং সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবর্ত্তন পুঞ্জীকৃত হইয়া অবশেষে বর্ত্তমান বিশেষ প্রভেদ উৎপন্ন করিয়াছে। একাধিক অচিহ্নিত জীবকোষ জলে অথবা স্থলে বিক্ষিপ্ত হইবার সময় কতকগুলি অবশ্যই পরস্পরের উপর পতিত হইয়াছে। এবং রস, বায়ু, আলো প্রভৃতি প্রাকৃতিক উপকরণ সমভাবে সকলে কখনই প্রাপ্ত হইতে পারে নাই। তাহাদিগের পক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবস্থা ভেদ হইবেই, না হওয়া অসম্ভব। এই হেতু, অথবা মৌলিক কারণ বশতঃ এক জাতীয় কোষ বিভিন্ন ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া অবশেষে বর্ত্তমান প্রভেদে উপনীত হইয়াছে। ফলতঃ জীবকোষের প্রভেদই স্ত্রী-পুং ভেদের মূল কারণ *। কিন্তু এই প্রভেদ চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী নৈসর্গিক

* দেব কুমার

† প্রিয়নাথ সেন

‡ ইহাদিগের জীবকোষ স্ত্রী পুং চিহ্ন বিরহিত হওয়ায় অতঃপর ইহাদিগকে অচিহ্নিত বলা যাইবে।

¶ Fission ; Gemmation.

$ কীট ও ডিম্ব পরে বুঝা যাইবে।

* Differentiation of minute active sparmatozoids and large stationary ovum which took place far back in the history of both animals and plants, laid the foundation of sex. Nature, Vol, 68, P, 378.

কারণে উৎপন্ন? কি, জীবকোষ-নিহিত মৌলিক হেতু জন্য? আমার বিবেচনায়, যাঁহারা কোষ-নিহিত মৌলিক হেতুকে এই প্রভেদের কারণ বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদিগের মতই অধিকতর আদরণীয়। নতুবা চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী রস, বায়ু, আলোক, উত্তাপ প্রভৃতিকে এই প্রভেদের মূল কারণ স্বীকার করিতে হইলে দ্বিবিধ প্রকার ভেদ চিহ্ন উৎপন্ন না হইয়া বহুবিধ প্রকার হইবার সম্ভাবনাই অধিকতর ছিল। কারণ ঐ সকলের বিভিন্নতা অসংখ্য প্রকার হইতে পারে। কিন্তু ঐ তর্কে প্রবেশ না করিয়া ইহা বলা যাইতে পারে যে, এক অচিহ্নিত জীবকোষই যে কালে ভেদ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার প্রক্রিয়া কি? এই প্রবন্ধে তাহাই কিঞ্চিৎ আলোচিত হইবে।

অনেকেই জানেন, কীটের* মূর্ত্তি বেঙাচির ন্যায়; একটী বৃত্তাভাস এবং তৎসংলগ্ন একটী সূক্ষ্ম লম্বা লেজ। এবং ডিম্বের মূর্ত্তি o এইরূপ; লেজহীন, কেবল বৃত্তাভাস মাত্র। ভেদ প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে অচিহ্নিত জীবকোষের মূর্ত্তিও o এইরূপ, অর্থাৎ অনেকটা বৃর্ত্তের ন্যায়। সুতরাং অচিহ্নিত জীবকোষ এবং স্ত্রীধর্ম্মযুক্ত জীবকোষ প্রায় এক প্রকার। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, অচিহ্নিত কোষ স্বয়ং বর্দ্ধনশীল। স্ত্রীধর্ম্মযুক্ত কোষও কতকটা সেইরূপ, অর্থাৎ স্বয়ং কথঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইতে পারে। যাহাকে বাওয়া ডিম বলে, অথবা হাওয়া ডিম বলে, তাহা হংসীপালকগণের অবিদিত নাই। উদ্ভিদ মধ্যেও কোন কোন বৃত্ত,* কীট† কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত না হইলেও কিছুকাল স্বয়ং বর্দ্ধিত হইতে পারে; তৎপর মরিয়া যায়। মনুষ্যগণ মধ্যেও বৃত্তের এ শক্তি একবারে নষ্ট হয় নাই। কোন কোন নারী স্বয়ং জরায়ু মধ্যে বৃত্তকে ঈষৎ বর্দ্ধিত করিয়াছেন; কিন্তু অনুপ্রাণনের অভাবে উহা মৃত হইয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। এরূপ অবস্থা প্রকৃত পক্ষে সংঘটিত হওয়া বিশ্বস্তরূপে লিপিবদ্ধ আছে। তবে অচিহ্নিত কোষ যেমন সম্পূর্ণরূপে বর্দ্ধিত হইয়া পৃথক জীবদেহ গঠিত করে, এবং ঐ জীব স্বতন্ত্র জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে; স্ত্রী-পুং ভেদ প্রাপ্ত হওয়ার পর স্ত্রীবৃত্ত ততদূর সক্ষম হয় না; কেবল কতকটা পরিমাণে স্বয়ং বর্দ্ধিত হইতে পারে, এই মাত্র। পূর্ণ মাত্রায় বর্দ্ধিত হইয়া স্বতন্ত্র জীবন-ব্যাপারযুক্ত পূর্ণ জীবদেহ গঠিত করিতে হইলে, স্ত্রীবৃত্ত কীট কর্ত্তৃক অনুপ্রাণনের অপেক্ষা করে। তথাপি অচিহ্নিত কোষের শক্তি ও বৃত্ত-শক্তি যে মূলতঃ এক এবং অচিহ্নিত কোষ ও বৃত্ত যে এক মূর্ত্তিবিশিষ্ট, তাহা দেখা গেল। কিন্তু পুংধর্ম্ম জীবকোষে কিরূপে উৎপন্ন হইল? তাহা বুঝিলেই স্ত্রীধর্ম্মও বুঝা যাইতে পারে। এই বিষয় অদ্যাপি সাহস করিয়া কিছুই বলা যাইতে পারে না; তবে জীবকোষের কেন্দ্রশক্তি, মূলশক্তি কি, দেখা যাউক। জীবকোষের কেন্দ্রস্থলে অতীব ক্ষুদ্র বিন্দু‡ বিদ্যমান আছে। কোষের জীবনী শক্তি তাহাতেই নিহিত। কোষের অপর অংশ

* এই প্রবন্ধে পুং বীজ (Spermatozoa কিম্বা Pollen)কে কীট; এবং স্ত্রীবীজ (Ovum)কে ডিম্ব অথবা বৃত্ত নামে অভিহিত করিব।

* গর্ভকোষস্থ ডিম্ব।

† পরাগ রেণু।

‡ The nucleus.

ঐ জীব বিন্দুকে পোষণ করে, উহার প্রধান কার্য্যই পোষণ। ঐ অপর অংশের জীবন শক্তি নাই, উহা জীববিন্দুর আহার্য্য বস্তু এবং অন্তর্নিহিত বায়ুর আধার। এই কেন্দ্র-বিন্দু কুঞ্চন-প্রসারণ শক্তি যুক্ত। ইহাই জীবন। এই কুঞ্চন প্রসারণের অভাবেই কোষের মৃত্যু হয়। এক্ষণে, এতদুভয় শক্তিতে তারতম্য আরোপ করুন। স্বীকার করিয়া লউন যে, ঐ উভয় শক্তি মূলতঃ সমান নহে। প্রথমতঃ কুঞ্চন শক্তি অপেক্ষা প্রসারণ শক্তির আধিক্য থাকা বিবেচনা করিলে, জীবকোষের অবস্থা এইরূপ হইবে যে, প্রথম শক্তি বশতঃ উহা যে পরিমাণ সঙ্কুচিত হইবে, দ্বিতীয় শক্তি বশতঃ উহা তদপেক্ষা অধিক বিস্তৃত হইবে। তাহা হইলে কোষস্থ বস্তুপদার্থ পূর্ব্বে যে পরিমিত স্থানে ছিল, তদপেক্ষা অধিক স্থান অধিকার করিবে। এই বিস্তৃতি উৎপাদন করিতে যে পরিমাণ শক্তি ব্যয় হইয়াছে, তাহা বিস্তৃতি উৎপাদন করিয়াই গূঢ় হইল। কোষের আকৃতি পূর্ব্ববৎই থাকিল; অর্থাৎ অচিহ্নিত অবস্থা ও বৃত্তাবস্থাতে কোষের মূর্ত্তি একই রূপ। ইহা আমরা পূর্ব্বেও দেখিয়াছি। কিন্তু, ঐ কোষের প্রসারণ শক্তি অপেক্ষা যদি কুঞ্চন শক্তির আধিক্য বিবেচনা করা যায়, তাহা হইলে উহার অবয়ব, অবশ্যই পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সঙ্কুচিত হইবে। সুতরাং কোষস্থ বস্তু পদার্থ পূর্ব্বে যে পরিমিত স্থানে ছিল, এক্ষণে তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতর স্থানে থাকিতে হইবে; অথবা ক্ষুদ্রতর স্থানে থাকিবার স্থান না পাইয়া কোষের এক দিক দিয়া ঠেলিয়া বাহির হইবে। তাহাতেই ব্যাঙাচির লেজের মত একদিক লম্বা হইয়া যাইবে। এস্থলে আয়তনের খর্ব্বতা হেতু গূঢ়শক্তি ব্যক্ত হইয়া এইরূপে জীবকোষকে খণ্ডিত করিয়া লেজ বাহির করিল; ইহা কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলেই প্রতীয়মান হইবে। কোষের অন্তর্নিহিত শক্তি বিস্তৃতি উৎপাদন করতঃ গূঢ় (potential) অবস্থা প্রাপ্ত হয়, কোষ সঙ্কুচিত হইলে আবার সেই গূঢ় শক্তিই ব্যক্ত হইয়া (Kinetic) এক দিক দিয়া কাটাইয়া লেজ বাহির করিয়া দেয়। এইরূপে জীবকোষের কেন্দ্র বিন্দুর কুঞ্চন প্রসারণ শক্তির তারতম্য থাকা বিবেচনা করিলে, আমরা কীটের ও বৃন্তের আকৃতি একরূপ বুঝিতে পারি। এবং এক পক্ষে স্ত্রীজাতির সাধারণ দুর্ব্বলতা ও স্থিতিশীলতা, এবং অপর পক্ষে পুং-জাতির সাধারণ সবলতা ও চঞ্চলতার অর্থ কতকটা হৃদয়ঙ্গম করা যায় †। অতএব দেখা গেল যে, কুঞ্চন শক্তির আধিক্য বশতঃই জীবকোষ পুং অবয়ব প্রাপ্ত হয়, আর প্রসারণ শক্তির আধিক্য হেতুই উহা স্ত্রী অবয়ব ধারণ করে কিন্তু পুং অবয়ব প্রাপ্ত হইতে কোষের এক অংশ বিভক্ত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া লেজ উৎপন্ন হইল। এই হেতু এই বিভাগ শক্তিই পুং শক্তি (Katabolism)। কিন্তু স্ত্রী শক্তি রক্ষণশীলা; এই জন্য উহাকে স্থিতি শক্তি (anabolism) বলা যাইতে পারে।

এই আলোচনা বিশদরূপে হৃদয়ঙ্গম করিলে দেখা যায় যে, অচিহ্নিত অবস্থা

† Starting from the amœboid cell, if Katabolism be in increasing preponderance, the increasing liberation of Kinetic energy thus implied finds its outward expression in increased activity of movement and in diminished size; the more active cell becomes modified in form by passage through its fluid environment, and the flagellate form of the spermatozoon is thus natural enough.
Ency. Brit. 9th Ed. Vol. 21 P. 724.

জীবকোষের কেন্দ্রবিন্দুর এক প্রকার সাম্যাবস্থা; পরে ঐ সাম্য হইতে ভেদ উৎপন্ন হইয়াছে। এই ভেদের প্রধান কারণ, কেন্দ্র-বিন্দুর স্পন্দন, (Rhythmic movement), যখন এই স্পন্দন গূঢ়াবস্থ, মোহাবস্থ ছিল, তখন বিকৃতি উৎপন্ন হয় নাই; কোষও এক-ধর্ম্মযুক্ত ছিল। আর যখন ঐ স্পন্দন "কুঞ্চন" "প্রসারণ" এই দ্বিবিধ রূপে ব্যক্ত হইলে, তখন হইতে ঐ দুই শক্তির মৌলিক তারতম্য হইল। তদনুসারে উহা স্ত্রী পুং কোষ উৎপাদন করিল। কিন্তু এই শক্তি প্রথমতঃ অর্থাৎ নিম্ন শ্রেণীস্থ জন্তুগণের দেহে সর্ব্বত্রই প্রকাশিত হইতে পারিত। পুরভুজ (Hydra)* ইত্যাদির দেহে এইরূপ হয়। কিন্তু কাল সহকারে এই শক্তি নির্দ্দিষ্ট স্থানগত হইয়াছে। উচ্চ জন্তুগণে ও উচ্চ শ্রেণীস্থ উদ্ভিদগণে, তাহা লক্ষিত হয়।

প্রকৃত পক্ষে এই দ্বিবিধ শক্তিই মূলে এক। স্ত্রীদেহ ও পুংদেহ, বাস্তবিক পার্থক্য শূন্য। দেহ রক্ষক যন্ত্র সকল, দেহের গঠন ইত্যাদি একরূপ। বংশ-রক্ষক যন্ত্র সকলও মূলতঃ এক। পুংদেহের এই শ্রেণীস্থ উপকরণ প্রকার-ভেদে স্ত্রীদেহে বিদ্যমান, এবং স্ত্রীদেহের যন্ত্র সকলও পুংদেহে বর্ত্তমান। ব্যবহার ভেদে, এক দেহে একের প্রাধান্য, অন্য দেহে অন্যের প্রাধান্য এই মাত্র। এক দেহে এক রূপে পুষ্ট, অন্য রূপে অপুষ্ট; অপর দেহেও তাহাই। যেন স্ত্রীও পুরুষ, পুরুষও স্ত্রী। স্ত্রী ও পুরুষ, একে অন্যের পরিণতি মাত্র। ডারুইন্ স্ত্রীকেই মূল, এবং পুরুষকে তাহার পরিণতি মনে করিতেন।*

জীব-কেন্দ্রের যে স্পন্দন শক্তির পরিণামে দ্বিবিধ শক্তি উৎপন্ন হইয়া স্ত্রী পুং ভেদ সাধিত করিল, তাই জীবনী-শক্তি। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ঐ শক্তি থাকিলেই সজীব, না থাকিলেই জীবন-হীন। এই শক্তির স্বতঃপ্রবৃত্ত বিকাশেই বিশ্ব-সংসারে (চেতন) পদার্থের † উদ্ভব হইয়াছে। সুতরাং বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্ত্রী পুং ভেদ এক জীবনী-শক্তিরই পরিণাম মাত্র ‡।

ঐ এক শক্তির দুই ভাগে বিভক্ত হইবার কারণ আর কিছুই নহে, উহাই ঐ শক্তির লীলা; দুইএ-ই এক, একেই দুই। এক বিনা অন্য অপূর্ণ ও অসমাপ্ত।

শ্রীশশধর রায়।

* Cœlenterata.

* Darwin's man is as it were an evolved woman.
Ency. Brit. 9th Ed. Vol. 21 P. 722.

† প্রকৃত পক্ষে চেতন অচেতন ভেদ স্বীকার্য্য নহে। বিশ্ব-সংসারে সকল বস্তুই স্ব স্ব কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে। ঐ প্রস্তর খণ্ডের প্রত্যেক অণু গতিশীল ও ক্রিয়াবান। আমরাও ক্রিয়াবান। সকলেই কর্ম্ম করিতেছে। যাহাকে এতক্ষণ জীবনী-শক্তি বলিলাম, তাহাই আত্মা, উহা ব্রহ্ম; উহাই জগতে এক মাত্র বস্তু। অন্য সমস্তই উহার বিভূতি মাত্র। ঐ আত্মার বিভক্ত হওয়া অথবা ব্যক্ত হওয়া এবং জগত রূপে পরিণত হওয়া তাঁহারই অবোধগম্য লীলা, আর কিছুই নহে।

‡ Given the conception of the cellular life-rhythm as capable of thus passing into a distinctly anabolic and katabolic habit of diathesis, the explanation of the Phenomena of reproduction becomes only a special field within a more general view of structure and function, nay even of variation * *.
Eccy. Brit, 9th Ed. Vol, 21 P. 724.

কবিওয়ালা। [২]

সন ১৩০২ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের 'সাধনায়' এক লেখকের 'কবির গান' শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটীতে অপরিণামদর্শিতার ও ঈর্ষাপরতন্ত্রতার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত এস্থলে উক্ত প্রবন্ধ হইতে একটুকু উদ্ধৃত হইল ;—

"বাঙ্গালার প্রাচীন কাব্য সাহিত্য এবং আধুনিক কাব্য-সাহিত্যের মাঝখানে কবিওয়ালাদের গান। ইহা এক নূতন সামগ্রী এবং অধিকাংশ নূতন পদার্থের ন্যায় ইহার পরমায়ু অতিশয় স্বল্প। এক এক দিন হঠাৎ গোধুলির সময়ে যেমন পতঙ্গে আকাশ ছাইয়া যায়, মধ্যাহ্নের আলোকেও তাহাদিগকে দেখা যায় না এবং অন্ধকার ঘনীভূত হইবার পূর্ব্বেই তাহারা অদৃশ্য হইয়া যায়—এই কবির গানও সেইরূপ এক সময়ে বঙ্গ সাহিত্যের স্বল্পক্ষণ স্থায়ী গোধুলি আকাশে অকস্মাৎ দেখা দিয়াছিল, তৎপূর্ব্বেও তাহাদের কোন পরিচয় ছিল না, এখনও তাহাদের কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না।

গীতিকবিতা বাঙ্গালাদেশে বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং গীতিকবিতাই বঙ্গ সাহিত্যের প্রধান গৌরব স্থল। বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী বসন্তকালের অপর্য্যাপ্ত পুষ্পমঞ্জরীর মত ; যেমন তাহার ভাবের সৌরভ, তেমনি তাহার গঠনের সৌন্দর্য্য। রাজসভা-কবি রায় গুণাকরের অন্নদামঙ্গল গান, রাজকণ্ঠের মণিমালার মত ;—যেমন তাহার উজ্জ্বলতা, তেমনি তাহার কারুকার্য্য। আমাদের বর্ত্তমান সমালোচ্য এই কবির গানগুলিও গান কিন্তু ইহাদের মধ্যে সেই ভাবের গাঢ়তা এবং গঠনের পারিপাট্য নাই।

না থাকিবার কিছু কারণও আছে। পূর্ব্বকালের গানগুলি হয় দেবতার সম্মুখে, নয় রাজার সম্মুখে গীত হইত—সুতরাং স্বতই কবির আদর্শ অত্যন্ত উচ্চ ছিল। সেই জন্য রচনায় কোন অংশেই অবহেলার লক্ষণ ছিল না, ভাব ভাষা ছন্দ রাগিণী, সকলেরই মধ্যে সৌন্দর্য্য এবং নৈপুণ্য ছিল। তখন, কবির রচনা করিবার এবং শ্রোতাগণের শ্রবণ করিবার অব্যাহত অবসর ছিল—তখন গুণী সভায় গুণাকর কবির গুণপণা প্রকাশ সার্থক হইত।"

উক্তাংশ পাঠে পাঠক বুঝিতে পারিবেন, লেখকের অধিকাংশ উক্তি প্রলাপ ভিন্ন আর কিছু নহে। তিনি প্রথমেই লিখিয়াছেন যে, কবির গান এক নূতন সামগ্রী। ইহাতে আপত্তির বা বিস্মিত হইবার কি কারণ আছে? যখন যে বস্তু প্রথম সৃষ্ট হয়, তাহাই তখন নূতন। জয়দেব যখন "ললিত লবঙ্গলতা পরিশীলন মলয় সমীরে" প্রভৃতি সংগীত গাহিতে আরম্ভ করেন, বা চণ্ডীদাস যখন "সখী, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম" প্রভৃতি প্রথম রচনা করেন, তখন কি উহা এক নূতন সামগ্রী ছিল না? জয়দেব বা চণ্ডীদাসের পূর্ব্বে কি উহার অস্তিত্ব ছিল? জয়দেব ও চণ্ডীদাসের যে পদাবলী শ্রীগৌরাঙ্গ এবং তৎপরেও বহুদিন অনেকের কণ্ঠে উচ্চারিত হইয়াছিল, যে সংগীতের তালে তালে যমুনা উজান বাহিয়া যাইত, সেই প্রাণমনোন্মাদকারী প্রেম-ভক্তি-বিমিশ্রিত আবেগময়ী সংগীতের তান আজ কয় জনের কণ্ঠে নিনাদিত হয়? তাই বলিয়া কি আমরা বলিব, জয়দেবের বা চণ্ডীদাসের গান অল্পক্ষণস্থায়ী গোধুলি আকাশে অকস্মাৎ দেখা দিয়াছিল, তৎপূর্ব্বেও তাহার কোন পরিচয় ছিল না, এখনও কোন সাড়া শব্দ নাই? বাল্মীকির রামায়ণ, ব্যাসদেবের মহাভারত, ভারত-

চন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, ইংরেজদের ইলিয়ড, প্যারাডাইস্‌লষ্ট, হ্যামলেট—সকলিত একদিন নূতন সামগ্রী ছিল। তা বলিয়া কি উহাদের মাহাত্ম্য কিছু হ্রাস হইয়াছে? কবির গান নূতন সামগ্রী হওয়ায় কি ভাগবত অশুদ্ধ হইয়াছে? পুরাতন সামগ্রী হইলেই কি উহার আদি অন্ত মধ্য সমস্তই ভাল হইত? যতদিন লোকে পাশ্চাত্য কু অভ্যাসাদিতে অনভ্যস্ত ছিল, ততদিনই কবি গানের আদর ছিল। গতবারে আমরা স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসুর 'একাল ও সেকাল' হইতে দেখাইয়াছি, সার্দ্ধ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে কবি গানের যথেষ্ট সমাদর ছিল। দোল, দুর্গোৎসব, রথ প্রভৃতি উৎসবে ধনাঢ্য ব্যক্তির ভবনে কবির গান হইত। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সরকার মহাশয় 'পিতাপুত্র' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—'রথের আটদিন দিবারাত্রি একদিকে যেমন নাচ, গাওনা, যাত্রা, কবি হইত, অন্য দিকে সেইরূপ মধ্যাহ্ন হইতে মধ্য রাত্রি পর্য্যন্ত 'দীয়তাং ভুজ্যতাং' শব্দে ভূরি ভোজন চলিত।' সরকার মহাশয় যে সময়ের কথা লিখিয়াছেন, তৎকালে কবির গান প্রৌঢ়াবস্থা পাইয়াছিল। তিনি বলেন,—'হরু, নিলু প্রভৃতি ঠাকুরেরা,—চিন্তে, ভোলা প্রভৃতি ময়রারা—বলাইচাঁদ, উদয়চাঁদ, কৃষ্ণদাস প্রভৃতি আমাদের নিকটস্থ বৈরাগী কবিওয়ালারা—সকলেই প্রায় অস্তগত। একদিকে চিন্তামণি, অন্যদিকে পরাণচন্দ্র, বাদ-বিবাদ করিয়া কোনরূপে বাঙ্গালার আসর রক্ষা করিতেছিলেন।" এই ২৫।৩০ বৎসর মধ্যে কবিওয়ালাদিগকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইতে হইয়াছে। একবারে না হোক্ অধিকাংশই গিয়াছে। বর্ত্তমান কালে দুই, এক জায়গায় পূজার সময় কবি গানের কথা শুনা যায়। শুনিতে পাই, বর্দ্ধমান রাজবাটীতে এখনো পূজার সময় কবির গান হইয়া থাকে। নাটোর পুঁঠিয়ার রাজবাটীতেও রথ, দোল, দুর্গোৎসব প্রভৃতি উপলক্ষে কবির গানের বায়না হয়। 'সাধনার' প্রবন্ধ লেখক যে ঠাহর করিয়াছেন, দেবতার সম্মুখে গীত হইত না বলিয়াই কবি গানের আদর্শ উচ্চ ছিল না,—এ কথা নিতান্ত অলীক এবং পিঙ্গলী-গন্ধদুষ্ট! কবিগান জন্মাবধিই দেবতার পদে উৎসর্গীকৃত এবং দেশের কৃতবিদ্য সকলের দ্বারাই উহার উচ্চ আদর্শের বিষয় স্বীকৃত হইয়াছে। কে না বলিবে 'কবির গান' লেখকের উক্তি সর্ব্বৈব অলীক ও বিদ্বেষ ভাব জর্জ্জরিত? বস্তুতঃই যদি বঙ্গ সাহিত্যের গোধূলি আকাশে অকস্মাৎ দেখা দিয়া ইন্দ্রধনুর ন্যায় কবির গানের অন্তর্হিত হইবার সম্ভাবনা থাকিত, উহা যদি রং মাটীর গিল্টী করা হইত, তবে আজিও কেন আমরা উহার নাম শুনিতেছি? কবি গান শুনিতে পাইতেছি? কবির গান জীব দেহের ন্যায় কেবল মাংস পিণ্ড নহে, উহাতে আন্তরিকতা আছে,—প্রাণ আছে। প্রাণ যে অমর, সেই জন্যই কবির গান তিমির গর্ভে ডুবিয়া যায় নাই।*

* গত সংখ্যায় 'নব্যভারতে' আমার লিখিত 'কবিওয়ালা' বাহির হইলে, 'নব্যভারতের' একজন পাঠক নাম না দিয়া আমাকে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, উপযুক্ত বিবেচনায় তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল। "আমি এক্ষণি 'কবিওয়ালা' প্রবন্ধটী 'নব্যভারতে' (পৌষের) পাঠ করিলাম। বিষয়টী প্রীতিকর। আপনার উদ্দেশ্য ভাল। এরূপ আলোচনা আজ্ কালি বড়ই প্রয়োজনীয়; কেননা আজ কালকার সাহিত্য মহলে নব্য কবিদিগের একটা অহঙ্কার দাঁড়িয়েছে যে, প্রাচীন কবিওয়ালারা ও পাঁচালী গায়কেরা

২। হরুঠাকুর।

হরু ঠাকুরের পূর্ণ নাম হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাড়ি। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া সাধারণতঃ হরু ঠাকুর নামে অভিহিত হইতেন। বাঙ্গালা ১১৪৫ সালে, ইংরেজি ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে, অগ্রহায়ণ মাসে কলিকাতার সিমুলিয়ায় ইহাঁর জন্ম হয়। ইহাঁর পিতার নাম কল্যাণ চন্দ্র দীর্ঘাড়ি ছিল। (১) কল্যাণচন্দ্রের অবস্থা তাদৃশ স্বচ্ছল ছিল না, তজ্জন্য তিনি পুত্রের বিদ্যাভ্যাসের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে পারেন নাই, যে টুকু করিয়াছিলেন, তাহাও পুত্রের নিতান্ত অনাসক্তি বশতঃ বিফল হইয়াছিল।

সিমুলিয়ার তৎকালে ভৈরবচন্দ্র সরকার নামক এক ব্যক্তির একটী পাঠশালা ছিল। হরেকৃষ্ণ সেই খানেই অধ্যয়নার্থ নবম বর্ষ

কিছুই নহে। তাঁহাদের (প্রাচীন) লেখা, বলা, ছন্দ, গাহিবার প্রণালী—সমস্তই যেন তাহাদের (নব্যদের) নিকট অপদার্থ বলিয়া বোধ হয়! কিন্তু মানবের মন ও আত্মা সংযোগে—সংঘাতে যে জীব,তাহার জন্মতত্ত্ব মধ্যে যদি তাহারা প্রবেশ লাভ করিতে পারিতেন, তবে নিজেদের কবিত্ব জীবনের উৎপত্তি কোথা হইতে জানিতে ও বুঝিতে পারিতেন। ওদিকে 'ক্রমবিকাশ' তত্ত্ব লইয়া সাহিত্য ক্ষেত্রে ধুমধাম চলিয়াছে, অথচ নিজেদের একটুক্ শক্তি ও প্রতিভা—তাহার যে বিকাশ কোথা হইতে,তাহার ঠোর ঠিকানা, খোজ খবর নাই। এখনকার সভ্যতার দিনে একটা মহা কাপট্য ভাব এই দাঁড়াইয়াছে যে, কবিত্ব-তত্ত্ব ও শক্তির পরিচয়ে পূর্ব্বতন কবিদিগের আব ভাবকে অশ্লীল (obscene) বলিয়া তাহাকে একবারে উড়াইয়া দেওয়া কিম্বা তাহাদের নিকট না যাওয়া! ইহার মধ্যেকার ব্যাপারটা কি জানেন? তবে বলি শুনুন, বঙ্গে নব্যকবিরা (দুই চারি জন ছাড়া) সকলেই বড়ই অনুকরণপ্রিয়, অথচ মৌলিক ভাব originality বোধ আছে, এই ভাণে ছন্দবন্দ লেখা হয়, তাহাদের নিজের রুচিকেই আসল রুচি মনে করেন। অন্য ব্যক্তিদের যে স্পৃহা, রুচি, রস বোধ আছে, সে দিকে নজর নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষা এই স্বার্থজ্ঞান ও হীনতর ভাব বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে আনিয়াছে এবং European, especially German goods যেমন চক্‌চকে ও সাচ্ছা, সেই ভাবে আবার অনেক ফড়ে দোকানদার মতন বঙ্গে অনেক কবি ও লেখক দেখা যায়, তাঁহারা প্রাচীন কবি ও লেখকদিগকে বড়ই ঘৃণা করেন। কখন কখন ঘৃণাটা চাপিয়া রাখিয়া গোলে হরিবোল দিয়া নিজেদের লেখা যা বইচালাইবার চেষ্টা করা হয়। বঙ্গ সাহিত্য-ক্ষেত্রে অনেক পাশ্চাত্য ব্যাধি প্রবেশ করিয়াছে, আপাততঃ কিছু বলিলাম। এখন কথা হচ্ছে এই যে, নিদান ঠিক না হইলে ঔষধ ঠিক হবে না এবং যে সকল সাংঘাতিক পীড়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে ও কতক কতক পীড়া সংক্রামক হইয়া পড়িয়াছে, তাহার প্রতিকার হওয়া দুঃসাধ্য। আপনি যেরূপভাবে প্রাচীন ভাব রক্ষার হেতু প্রাচীন কবিওয়ালাদের বিষয়ে লিখিয়াছেন, তাহাতে আপনার রসাল হৃদয়কে বেশ সুপ্রসঙ্গ ভাবিয়া ধন্যবাদ দিতেছি। কিন্তু ঔষধির কথাতে তত ফল হইবে না, নিদান ভাল করে করুন, দেখিবেন, রোগের নিরাকরণ হইবেক। এবং প্রাচীন বৈদ্য শাস্ত্রের তত্ত্ব লুপ্ত হইয়া যেমন 'সত্যমেবজয়তে' কথার সারসত্য প্রকাশে এখন বৈদ্য চিকিৎসার ক্রমে আদর বাড়িতেছে, তেমনি কবিদিগের আদর বাড়িবেক। তখনকার চিকিৎসার ভুল ভ্রান্তিতে কখনও লোক মরিত,এখনও তাহা কিছু বন্ধ হবে না, কিন্তু হাতুড়ে বদ্দির দল (Quacks) কমিবেক। 'নবীন' ভাল, কিন্তু যেখানে প্রাচীনের আদর নাই, সেখানে নবীন গরলবৎ জানিবেন। ইতি"

(১) বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত "বঙ্গভাষার লেখক' নামক পুস্তকের প্রথম খণ্ডের ৩৬৭ পৃষ্ঠায় হরুঠাকুর' প্রসঙ্গে এবং কেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের রচনায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, হরুঠাকুরের পিতার নাম—কালীচন্দ্র দীর্ঘাড়ি ছিল। কিন্তু এ লেখকের প্রতি এ প্রবন্ধ লেখকের আস্থা নাই। সে নিজে অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছে—কল্যাণচন্দ্রই হরুঠাকুরের পিতার নাম ছিল।

বয়সে প্রেরিত হন। কিন্তু লেখা পড়ার প্রতি মনোযোগ না থাকায় বিশেষ কিছু উন্নতি হয় না। তথাপি হরেকৃষ্ণের কবিত্ব শক্তির প্রথম উন্মেষ এই পাঠশালাতেই পরিদৃষ্ট হয়।

পাঠশালায় প্রবেশের দুই বৎসর মধ্যে কল্যাণচন্দ্র পরলোক গমন করেন। এই ঘটনার পর হইতে হরেকৃষ্ণের স্বভাব একবারে বিগড়াইয়া যায়। পিতার জীবদ্দশায় যে একটু লেখা পড়া করিত, এখন তাহাও ছাড়িয়া দিল, দিন রাত সঙ্গীদিগের সহিত আমোদ প্রমোদে বিভোর থাকিত। জননী পুত্রকে সৎপথে আনিতে বিধিমতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন সত্য, কিন্তু উন্মার্গগামী পুত্র কিছুতেই সৎপথে ফিরিল না। সমস্ত চেষ্টা বিফল হইলে, তিনি পুত্রকে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু পুত্র তাহাতেও—কেয়ার নাদারৎ।

এই ভাবে ৫।৬ বৎসর কাটিয়া গেল। হরেকৃষ্ণের বয়স এখন পনর ষোল। পিতার সঞ্চিত যে কিছু ধন সম্পত্তি ছিল, তদ্দ্বারা জননী এতদিন তাহার ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিলেন। কিন্তু এখন আর চলে না, মাতা দিন রাত অশ্রু বর্ষণ করেন। পাড়া প্রতিবাসী সকলেই হরুকে তিরস্কার করে, কাজেই তাহাকে বাধ্য হইয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা দেখিতে হইল। কিন্তু তাহার যে বিদ্যা, তাহাতে ভাল চ মিলিবে কেন? বাল্যকাল হইতেই গান বাজনার প্রতি তাহার অত্যন্ত ঝোঁক ছিল, এই ঝোঁকেই তাহার মাথা খাওয়া যায়। সুতরাং গানই তাহার যৌবনকালে একমাত্র সম্বল হইল। ইতঃপূর্ব্বে হইতেই তিনি গান রচনা করিতে শিখিয়াছিলেন। ভগবান সকলেরই একটা উপায় করিয়া দেন। কথায় বলে, "জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দিবেন তিনি।' তাই ভগবান সুনীতিভ্রষ্ট, উচ্ছৃঙ্খল এই বালকের গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত তাহাকে কবিত্ব শক্তির আধার করিয়া ভূতলে পাঠাইয়াছিলেন। অবশেষে নানারূপ চিন্তা করিয়া হরুঠাকুর এক সখের দল খাড়া করিলেন। তন্তুবায় জাতীয় রঘুনাথ দাস নামক এক কবিওয়ালার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া তাহার দ্বারা স্বরচিত সংগীত সংশোধন করাইয়া লইয়া নিজের সখের দলে গাওনা করিতে লাগিলেন। ইহাতে তিনি জনসমাজে পরিচিত হইতে লাগিলেন সত্য, কিন্তু অভাব যে পূর্ণ হয় না। একদা রাজা নবকৃষ্ণের ভবনে এক কবির দলের গাওনা হইতেছিল, হরুঠাকুর সখ করিয়া সেই দলে আসরে দাঁড়াইয়া গান ধরিলেন। উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী সকলেই বালকের সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর ও সঙ্গীতনৈপুণ্য দৃষ্টে একবাক্যে ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। রাজা বাহাদুর বিশেষ প্রহৃষ্ট হইয়া তাহাকে পেশাদারী কবিরদল বাঁধিতে পরামর্শ দিলেন। হরুঠাকুরের এখন বড়ই অভাব, যে কোন প্রকারেই হোক্ তাহাকে অর্থ উপার্জ্জন করিতেই হইবে। কাজেই রাজা বাহাদুরের পরামর্শ তাহার বর্ত্তমান অবস্থার বিশেষ উপযোগী মনে হইল। এইরূপে হরুঠাকুরের কবি-যশের সূত্রপাত হয়।

হরুঠাকুর পেশাদারী দল লইয়া বাহির হইলেন, প্রথমেই রাজা নবকৃষ্ণের ভবনে গাওনা করেন। রাজা তাহার গাওনায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং বিশেষরূপে পুরস্কৃত করিয়া বিদায় দেন। এইরূপে তাঁহার

সুযশ প্রচারিত হইতে লাগিল এবং তৎসঙ্গে তাঁহার সংগীত শ্রবণের প্রতি জনসাধারণের আগ্রহও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বর্দ্ধমান কৃষ্ণনগর প্রভৃতি রাজবাটী হইতে বায়না আসিতে লাগিল, সর্ব্বত্রই তিনি সুনামের সহিত অর্থোপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অভাব প্রভূত পরিমাণে মন্দীভূত হইল, স্নেহাতুরা জননীর চক্ষের জল এত-দিনে শুষ্ক হইল। কিন্তু বেশিদিন পুত্রের উপার্জ্জিত অর্থদ্বারা দেহপুষ্ট করা তাঁহার অদৃষ্টে ছিল না, তাই পুত্র মাথা তুলিতেই জননীর কাল হইল।

বলিয়াছি যে, হরুঠাকুর স্বরচিত সংগীত রঘুনাথ দাসের দ্বারা সংশোধন করিয়া লই-তেন। ক্রমে ক্রমে শিষ্যের প্রতিভা ও ক্ষমতা গুরুকে অতিক্রম করিল, শিষ্যের অমানুষিক প্রতিভা ও দেশব্যাপী প্রতিষ্ঠার মধ্যে গুরুর গৌরব ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িল। তত্রাচ শিষ্য কোন দিনের তরেও গুরুর প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন নাই, আজীবন গুরুর নিকট মস্তক অবনত করিয়াছিলেন। যে সকল সংগীত গুরুর দ্বারা সংশোধন করাইয়া লইতেন, হরু ঠাকুর সে সকলের ভণিতি গুরুর নামেই দিতেন। অদ্যাপিও হরুর অনেকানেক গান রঘুনাথের নামে চলিয়া যাইতেছে। মধ্যাহ্ন সৌরকরের ন্যায় হরুর যশঃসম্মান যখন মধ্যপথবর্ত্তী, সেই মহা গৌরবের দিনেও তিনি গুরুর প্রতি ভক্তি প্রদর্শনার্থ আত্মগোপন করিয়া নিজের যশঃমাল্য গুরুদেবের গলে তুলিয়া দিতে কাতর ছিলেন না। যে বালক বাল্যকালে সুনীতিভ্রষ্ট, কুপথগামী ছিল, যে বালকের পেটে "কালজল" একবারে পড়ে নাই বলিলেই হয়, এক কথায় যে সম্পূর্ণ অশিক্ষিত, তাহার এতাদৃশ গুরুভক্তি প্রকৃতই কি ভাবিবার বিষয় নহে? কে বলে, কবির দল কুরুচির প্রতিমূর্ত্তি? এই অশিক্ষিত বাঙ্গালী কবিওয়ালার এই একটী মাত্র কার্য্যে আমরা যে শিক্ষালাভ করিতে পারি, তাঁহার এই একটী কার্য্যে হৃদয়ের যে মহত্ত্ব প্রকটিত হইতেছে, তাহা এই বিংশ শতাব্দীর অসংখ্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কয় জনের নিকট আশা করিতে পারা যায়?

হরুঠাকুর স্বভাবকবি ছিলেন, ভারতী দেবী যেন তাঁহার জিহ্বাগ্রে সদা সর্ব্বদাই বিরাজ করিতেন। তিনি মুখে মুখেই সংগীত রচনা করিতে পারিতেন। উপ-স্থিত রচনা তাঁহার একটী প্রধান ক্ষমতা ছিল, এই অংশে তিনি রামবসুকেও পরাস্ত করিয়াছিলেন। কেহ কোন পদ পূরণ বা সমস্যা পূরণ করিতে দিলে, হরুঠাকুর তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তর দিতেন। এস্থলে দুই একটী উদাহরণ উদ্ধৃত হইল।

একজন তাঁহাকে এই পদটী পূরণ করিতে অনুরোধ করেন।

'তোমার আশাতে এ চারিজন।'

হরুঠাকুর একটু চিন্তা করিয়া পূরণ করিলেন,—

তোমার আশাতে এ চারিজন।
মোর মনো প্রাণো শ্রবণো নয়ন
আছে অভিভূত হয়ে সর্ব্বক্ষণ।
দরশ পরশ, শুনিতে সুভাষ,
করিতেছে আরাধন। (মহড়া)।
অঙ্গ রূপো আখি না হেরে আর।
শ্রবণো প্রাণো তুমি জুড়াবার।
শয়নে স্বপনে, মনোভাবে মনে,
কবে হইবে মিলন। (চিতেন।)
প্রাণ, ইহার কি বল উপায়?
আমি যে ঠেকিলাম বিষমো দায়।
(অন্তরা)। ইত্যাদি।

একদা মহারাজ নবকৃষ্ণের সভায় বহু-পণ্ডিতের সমাবেশ হইয়াছে, মহারাজা উপস্থিত সভ্যমণ্ডলীকে বলিলেন যে, আমার এই সমস্যাটী আপনারা পূরণ করিয়া দিন;—'বঁড়শী লেগেছে যেন চাঁদে।' পণ্ডিতমণ্ডলী বহুক্ষণ চিন্তা করিয়াও ইহার কোন সদুত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না। হরুঠাকুর মহারাজের অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। অবশেষে তাঁহার তলব হইল। হরু তৎকালে স্নানার্থে বহির্গত হইয়াছিলেন, পথিমধ্যে সংবাদ পাইয়া তদবস্থাতেই রাজ-সভায় উপস্থিত হইলেন। মহারাজা তাঁহাকে ঐ সমস্যাটী পূরণ করিতে বলিলেন। যেমন আদেশ, অমনি হরুঠাকুর পূরণ করিলেন,—

একদিন শ্রীহরি, মৃত্তিকা ভোজন করি,
ধূলায় পড়িয়া বড় কাঁদে।
রাণী অঙ্গুলি হেলায় ধীরে, মৃত্তিকা বাহির করে,
বড়শী বিঁধিল যেন চাঁদে॥

উত্তর শুনিয়া মহারাজা মহা সন্তুষ্ট হইয়া হরুকে প্রচুর পরিমাণ পুরস্কার প্রদান করিলেন।

আর একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসিত হয়,—'পীরিতি নাহি গোপনে থাকে।' হরুঠাকুর উত্তর দেন।

পীরিতি নাহি গোপনে থাকে।
শুনলো সজনি বলি তোমাকে॥
শুনেছ কখনো জ্বলন্ত আগুন,
বসনে বন্ধনো করিয়ে রাখে? (মহড়া)
প্রতিপদের চাঁদ হরিষে বিষাদ,
নয়নে না দেখে উদয় লেখে।
দ্বিতীয়ের চাঁদ কিঞ্চিত প্রকাশ,
তৃতীয়ের চাঁদ জগতে দেখে॥ (চিতেন)

এইরূপে প্রত্যহ তিনি বহুতর পদ ও সমস্যা পূরণ করিতেন। উপরোক্ত গান কয়টী ভাব-সম্ভারে কিরূপ আমোদিত! শেষোক্ত গানটীর সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই, গুপ্ত কবি বহু চেষ্টাতেও বিফল-মনোরথ হন। তাই তিনি 'প্রভাকরে' লিখেন, "এমত চমৎকার কবিতা, এমত আশ্চর্য্য ভাব, প্রায় কখনই শ্রবণ করি নাই, যিনি ইহার সম্পূর্ণ প্রদান করিবেন, তিনি আমাকে বিনা মূল্যে ক্রয় করিবেন। 'তৃতীয়ের চাঁদ জগত দেখে' এ কথার মূল্য নাই, অতি অমূল্য ধন।"

সংক্ষিপ্ত স্থানের মধ্যে কবির সম্পূর্ণ কাব্যের সমালোচনা করা সম্ভবপর নহে। আমি বর্ত্তমানে কেবল কাব্য-সৌন্দর্য্য দেখাইতে চেষ্টা করিব। পূর্ব্ব প্রস্তাবে বলিয়াছি যে, রাম বসু বিরহের রাজা, সে কথা খাঁটি সত্য। কিন্তু হরুঠাকুরের সখীসম্বাদ রাম বসুর সখীসম্বাদ হইতে উচ্চস্থান পাইবার যোগ্য। হরুর সখী সম্বাদ এক সময় বঙ্গদেশে কিরূপ সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা বর্ত্তমান কালে ধারণাতেই আসে না। একদা মহারাজা নবকৃষ্ণ তাঁহার সখীসম্বাদ শ্রবণে এতই বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, নিজের গাত্র হইতে একজোড়া বহুমূল্য শাল উন্মোচন করতঃ হরুর গায়ে জড়াইয়া দেন। হরু ইহাতে অপমান বোধ করিয়া তৎক্ষণাৎ উহা তাঁহার দলের ঢুলীর মাথায় ফেলিয়া দেন! এইরূপ আত্ম-সম্মান-জ্ঞান আজ কাল কয়জনের আছে? হরু ঠাকুরের একটী সখীসম্বাদ,—

"শ্যাম, তিলেক দাঁড়াও, হেরি চিকণ কাল বরণ।
শ্যাম, তিলেক দাঁড়াও, এ অধিনীর মনের মানস পূরাও।
সাধ মম বহুদিনের, আজ পেয়েছি অঙ্গনে।
চন্দ্রাননে হাসি হাসি, বাঁশীটি বাজাও।
নির্জ্জনে এমন না পাব দরশন,
যায় নিশি যাক্, জানুক গুরুজন।
তাহাতে নহি খেদিত, শুন ওহে ব্রজনাথ,
ও বংশীরো কত গুণ, বিশেষে শুনাও॥
শ্যাম, শুন, শুন, যাও কেন? রাখ হে বচন।
তোমার বাঁশীর গান আমি করিব শ্রবণ।
কোন্ রন্ধ্রে পূরে ধ্বনি, কুলবতীর মান,
কুল সহিতে হে করিলে হরণ?
কোন্ রন্ধ্রে পূরে ধ্বনি, রাধায় কর উদাসিনী?
সাক্ষাতে বাজাও শুনি, আমার মাথা খাও॥"

এ সংগীতে কি ভোগ বিলাসিতার আবিলতাময় খরস্রোত প্রবহমান আছে?

এ যে নিঃস্বার্থ প্রেমের সুন্দর অভিব্যক্তি! হরুঠাকুরের এই সকল সখীসম্বাদ এককালে সমগ্র দেশের মন চঞ্চল করিয়াছিল। রামবসুর বিরহের ন্যায় হরু ঠাকুরের সখীসম্বাদ এককালে দেশব্যাপী প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। হরুঠাকুরেরও অনেক গান বিভিন্ন কবিওয়ালার নামে চলিয়া গিয়াছে, এখন তাহা বাছিয়া বাহির করা বিশেষ আয়াসসাধ্য, দুঃসাধ্য বলিলেও হয়।

হরুঠাকুরের প্রেম-সংগীতগুলি কম প্রশংসার যোগ্য নহে।

"তোমার ভাব দেখে করি অনুভব, ভাব বুঝি ফুরাল,
দিন দিন রসহীন হ'লে প্রাণ।
তুমি আছ সেই—তোমার প্রেম লুকাল।
একি ভাব! গেছে পূর্ব্বের সে ভাব,
অভাব ভাব মিশাল।
তোমায় লোকে কয় রসময়—মিথ্যা নয়,
সে রস পরের কাছে,
ঘরে এলে মুখ যেন সে মুখ নয়।
তোমার আমায় আছে ভ্রান্তি—হয় শিরে সংক্রান্তি,
যেন শান্তিশতকেতে পাঠ এ গুলো।
সেই তুমি সেই আমি সেই প্রণয়, নূতন নয় পরিচয়,
তবে প্রাণ হ'লে রসের অনুষ্ঠান।
বিরস বদন কেন হয়, পেলেন ব্যাভারে পরীক্ষে,
তোমার অযাচক ভিক্ষে,
চক্ষে রেখে চাওনা পোড়া চক্ষে।
তোমার সদাই বদন বাঁকা, হয় যখন দেখা,
সে সব শশিমুখের হাসি কমনে গেল।
যেমনে ভুলালে এমন, তোমার কোথা সে মন,
কেমন কেমন দেখ্‌তে পাই।
বলনা কোন্‌ খানে মন হারালে রে প্রাণ!
না হয় আমিও সেই পথে যাই।
নাই এখন তোমার সে সুদৃশ্য সুহাস্য সুবচন,—
কোথা হয় যেন কে কারে কি হয়, এমনি অন্ত মন,
তুমি রসিক নও—তা নয় প্রাণ!
রাখ স্থান বিশেষে মান,
কোন্‌ রাজ্যে বাস্‌, কোন্‌ রাজ্যে ধান্‌?
আমি হাজা প্রজা বলে জলে প্রাণ,
আমার সুখের সময় তোমার রস শুকালো।"

বিরহ-খিন্ন নায়িকার এ কাতর উক্তিতে প্রাণ কি আর্দ্র হয় না? এমন কোন্‌ পাষণ্ড নায়ক ধরাধামে বিদ্যমান আছে যে, শোক দুঃখে মুহ্যমানা বিরহিণীর এ কাতরতা উপেক্ষা করতঃ চরণে দলিয়া যাইতে পারে? ইহাতে হা হুতাশের কি একটা নির্লজ্জ ভাব আছে? এতো মুক্ত প্রাণের সরল অভিব্যক্তি!

হরুঠাকুর একদিকে যেমন প্রেম-চিত্র অঙ্কনে সুদক্ষ ছিলেন, অন্যদিকে তেমনি ভক্তিরসাশ্রিত করুণ সংগীত গাহিয়া শ্রোতার হৃদয় স্পর্শ করিতেও পারিতেন। তাঁহার রচিত কীর্ত্তন সংগীতগুলিতে যে প্রগাঢ় তত্ত্বজ্ঞান ও ভগবানে অটল বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা ভাবুকের ভাবিবার বিষয়, লেখকের লেখনীর অনুপযুক্ত। স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি ঐ সকল সংগীতের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াও শেষে বলিয়াছেন যে, প্রশংসা কিছুই হইল না—ভাষা যে অক্ষম হইল! স্বর্গীয় রাজা নবকৃষ্ণের নগর সংকীর্ত্তনের প্রতি অতিশয় অনুরাগ ছিল। এই সকল সংকীর্ত্তনে হরুঠাকুরের রচিত সংগীত কীর্ত্তিত হইত।

নাম প্রেম তার সাকার নহে সে নিরাকার।
জীবন, যৌবন, ধন কিবা মন, প্রাণ বশীভূত তার।
মুখে লোক বলয়ে পীরিতি সুখের সার।
প্রাণের বাহির হয় সে যখন, জীবনে যেন ম'রে রই।

এই কয় পংক্তিতে কি কোনও গভীর তত্ত্ব নিহিত নাই? রাজনারায়ণ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন,—"কি চমৎকার ভাব!

ইহা প্লেটো অথবা কোল্‌রিজের উপযুক্ত। কোল্‌রিজ এক স্থানে বলিয়াছেন,—

All thoughts, all passions, all delights,
Whatever stirs this mortal frame,
Are all but ministers of love,
And feed his sacred flame.

হরু ঠাকুরের কবিতাটী ইহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট বোধ হয় না।"

"হরিনাম লইতে অলস ক'রোনা রসনা,
যা হবার তাই হ'বে।
ঐহিকের সুখ হ'লনা ব'লে কি,
ঢেউ দেখে তরী ডুবাবে॥"

এই গানটী সম্বন্ধে স্বর্গীয় গুপ্ত কবি লিখিয়াছেন,—

"কি মনোহর! কি মোহকর! কি মোহকর! শ্রবণ অথবা কীর্ত্তন মাত্রেই অশ্রুপতন বা রোমাঞ্চ হইতে হয়! অতি দৃঢ় পাষণ্ড ব্যক্তিরও হৃদয় আর্দ্র হয়। আবাল বৃদ্ধ বনিতা মাত্রেই মুগ্ধ হইয়া থাকেন। সকলেরই অন্তঃকরণে প্রেমের উদয় হয়, সকলেই চমকিত হইয়া মরণ স্মরণ করে; মনের সমুদায় মোহ বিকার হরণ পূর্ব্বক ভাব ভক্তি জ্ঞানের প্রভাবে মরণ-হরণ-চরণ স্মরণ করিতে থাকে। যেখানে যে বাঙ্গালী মহাশয় বিরাজ করিতেছেন, তিনি সেই থানেই বিশেষ বিবেকের অবস্থায় ঐ নাম সংকীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ঐ নাম কত ভিক্ষুকের উপজীব্য হইয়াছে, তাহার সংখ্যা হয় না। কি ইতর, কি ভদ্র, তাবতেই এতৎ গানে প্রেমিক হইয়া থাকেন। ইহার মধ্যে কি এক মধুরত্ব আছে, তাহা আমি বচনে প্রকাশ করণে অশক্ত হইলাম।"

হরুঠাকুর বিদ্যালয়ে বেশী দিন অধ্যয়ন না করিলেও, পূর্ণ বয়সে ঘরে বসিয়া লেখা পড়া করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ তদীয় গীতেই বিদ্যমান আছে। 'তোমার ভাব দেখে করি অনুভব'—বলিয়া যে গানটী পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে,তাহাতে শিহ্লন মিশ্র প্রণীত শান্তিশতকের উল্লেখ আছে। শান্তিশতক চারি সর্গে বিভক্ত, বৈরাগ্য ভাবোদ্দীপক একখানি ক্ষুদ্র সংস্কৃত গ্রন্থ। মায়ামোহাভিভূত জীবগণ ক্ষণিক সুখের বাঞ্ছা করিয়া নানা প্রকার অসৎকর্ম্মে পরিলিপ্ত হয়। ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র হইয়া জীব, জীবন ধারণের উদ্দেশ্য, কোন্ কার্য্য পরকালে সুখাবহ, কোন্ কার্য্য অবশ্য কর্ত্তব্য, কোন্ কার্য্য পরিত্যজ্য, ইত্যাদি বিষয় একবারও চিন্তা করে না। এইরূপে কদাচারের ফল স্বরূপ জীব পরিণামে যুগ যুগান্তর ধরিয়া অশেষ বিশেষে ক্লেশ সহ্য করে। শিহ্লন মিশ্র তাহাই জীবগণকে বুঝাইয়া পরকালের কার্য্য কি, শান্তিশতকে সুন্দর সংস্কৃতে পরিব্যক্ত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত হরুঠাকুরের হরি সংকীর্ত্তনগুলি পাঠ করিলে, তিনি যে প্রগাঢ় তত্ত্বদর্শী ছিলেন, তাহা বেশ বুঝা যায়। তিনি নারী-চরিত্র বেশ অনুধাবন করিয়াছিলেন। নিম্নলিখিত গীতটীতে তিনি স্ত্রী-চরিত্রের একটী উজ্জ্বল আলোক-চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন;—

"আর নারীরে করিলে প্রত্যয়।
নারীর নাই কো কিছু ধর্ম্ম হয়॥
নারী দিতে যেমন, ভুলতে তেমন, দুই দিকে তৎপর।
মজিয়ে পরে চায়না ফিরে আপনি হয় অন্তর।
উত্তমেরে ত্যজ্য করে, অধমে যতন।
নারী চারি দু'জনারি নীচ পথে গমন॥
তার প্রমাণ বলি প্রাণ,—নলিনী তপনে ত্যজিয়ে।
বনের পতঙ্গ সে ভৃঙ্গ—তারে মধু বিতরণ।

কবির উপমা-কৌশলটী ব্যর্থ হইলেও, নারী চরিত্রের যে ভাব তিনি অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা ধ্রুব সত্য।

হরু ঠাকুর প্রসার প্রতিপত্তি লাভের পর হইতে দেশের গণ্য মান্য ব্যক্তিগণের ভবনে গান গাইতে যাইতেন। বয়স বেশী হইলে তিনি নিজে দলের সংশ্রব ত্যাগ

করেন। ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব রামপ্রসাদ ঠাকুর নামে এক ব্যক্তির উপর দলের ভার অর্পণ করিয়া তিনি রাজা নবকৃষ্ণের পারিষদ্ শ্রেণীভুক্ত হন। এই সময়ে রাজভবনে যে সকল কবির গাওনা হইত, হরুঠাকুর তাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করিতেন এবং তাঁহার রায় অনুসারে রাজা কর্তৃক দলপতি পুরস্কৃত হইতেন। মরণ পর্য্যন্ত তিনি এই কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন। বাঙ্গালা ১২১৯ সাল, ইংরেজি ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে ৭৪ বৎসর বয়সে তাঁহার অমর আত্মা অমরাপুরে প্রস্থান করে। কবির বংশ বর্ত্তমান আছে কি না, তাহা আমরা অনুসন্ধানে জানিতে পারি নাই।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্ন্যাল।

খ্রীষ্টশিষ্যের প্রতি জাপানী যুবক।

"হীদেন" অর্থাৎ কৃপাপাত্র অখ্রীষ্টানকে অন্ধকার হইতে আলোক আনিবার পক্ষে খ্রীষ্ট-শিষ্যগণের কোন দিনই আলস্য নাই। বিশেষ ইদানীং দেখা যাইতেছে, এশিয়াবাসীকে ভবসাগর পার করিয়া স্বর্গরাজ্যের প্রজা করিবার জন্য তাঁহারা যেমন আড়ে হাতে লাগিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের সিদ্ধি লাভের আর অধিক বিলম্ব ছিল না, কিন্তু বিধাতার লীলা বোঝা ভার, বুদ্ধশিষ্যরূপে একটা "শয়তান" সহসা গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়াছে, যার সঙ্গে তাঁহারা কিছুতেই আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছেন না—সে জাপান।

বুদ্ধশিষ্যটীর স্বভাব এই, খ্রীষ্টশিষ্যগণ যখনই অখ্রীষ্টান জগতের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন, তখনই সে পরম নিশ্চিন্ত ভাবে তাঁহাদের সেই দুঃখ নিবারণের জন্য বুদ্ধ দেবের উপদেশ ব্যবস্থা করে। তাঁহারা তাহার প্রতি আর একটী দোষারোপ করেন যে, সে তার স্বধর্ম্মই বা সর্ব্বথা পালন করে কোথায়? কারণ বুদ্ধের "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" ভারতের বুদ্ধশিষ্যেরা যেমন মান্য করিয়া আসিতেছে, সে তাহা করে না। কিন্তু হায়, কি বিড়ম্বনা, তদুত্তরে বুদ্ধশিষ্য কহে, "এক গণ্ডে চপেটাঘাত করিলে আর এক গণ্ড ফিরাইয়া দিবার নিজের উপদেশটা মহাশয়েরা যে একেবারে বেমালুম ভুলিয়া গিয়াছেন, সুতরাং সংসর্গের গুণে আমরাও, আপনাদের উপদেশ অপেক্ষা, দৃষ্টান্তের অধিক অনুকরণ করিয়া ফেলিয়াছি।"

আসল কথা এই, যে সকল খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারকেরা তাঁহাদের স্বর্গ রাজ্য বিস্তারের জন্য নব রবির দেশে যাইয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে, বুদ্ধশিষ্যগণকে তাঁহাদেরই শিষ্য করিয়া ফেলিবেন, ফলে কিন্তু বিপরীত তাঁহারাই সেই বিচিত্র রাজ্যবাসিগণের শিষ্য হইয়া পড়িয়াছেন। জাপানে একজন ইংরেজ-ভ্রমণকারী দীর্ঘ কাল সে দেশের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া অবশেষে সরল ভাবে স্বীকার করিয়াছেন—"The Empire he has sought to convert has converted him. He does not say so, perhaps he does not know, but it is a fact." (১) "যে সাম্রাজ্যটীকে তিনি দীক্ষিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সে-ই তাঁহাকে দীক্ষিত করিয়া ফেলিয়াছে। তিনি সে কথা বলেন না, হয়ত তিনি জানেন না, কিন্তু এটা সত্য কথা।"

(১) "The heart of Japan." By Clarence Ludlow Brownell. P, 217

কারণ খ্রীষ্টান মিশনরীগণ যখন জাপানী-দিগের নিকট যীশুখ্রীষ্টের অলৌকিক জীবন-চরিত কীর্ত্তন করেন, আধুনিক জাপানীরা তাহা শুনিয়া ভ্রমেও অশ্রদ্ধা করে না, কিন্তু তখনই তাহারা খ্রীষ্ট-শিষ্যের নিকট বুদ্ধ-দেবের স্বর্গীয় চরিত্রের কথা প্রচার করিতে ভোলে না। পরন্তু খ্রীষ্টান মিসনারীগণ জাপানীদিগের মধ্যে খ্রীষ্টের দশ-অনুশাসন প্রচার করিতে যাইয়া যখন জাপানের ধনী গৃহ হইতে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক, দরিদ্র কৃষক ও শ্রমজীবীর গৃহে গৃহে পারিবারিক শান্তি ও সন্তোষ প্রত্যক্ষ বিরাজিত দেখিতে পান, যাহা খ্রীষ্টীয় জগতে দুর্লভ বলিলে অত্যুক্তি হয় না, তখন মিসনারী সাহেবের অন্তরস্থিত বিবেক স্বাভাবিক রূপে তাঁহার লোকশিক্ষকতার প্রচ্ছন্ন অভিমানের প্রতি আঘাত করিতে থাকে, তখন তাঁহারা নিজ মুখে এ কথা স্বীকার করেন যে,"They have such gentle natures that it is hard to believe they need instruction in humility and meekness. They are themselves living lessons in these virtues." "তাহাদের এমন স্বৎস্বভাব যে, বিনয় নম্রতা প্রভৃতি গুণ সম্বন্ধে আমাদের নিকট উপদেশ গ্রহণ করা যে তাহাদের বড় আবশ্যক আছে, এমন বোধ হয় না, তাঁহারা নিজেরাই এই সকল নীতি ধর্ম্মের জীবন্ত আদর্শ।"

ভ্রমণকারী মিঃ ব্রাউনেল, তাঁহার সহিত একটী জাপানী কৃতবিদ্য যুবকের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আলাপের বৃত্তান্ত অবিকল তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে শ্রদ্ধার সহিত লিখিয়াছেন। এই উদারচেতা ইংরেজ-ভ্রমণকারী উল্লিখিত জাপানী যুবকের সুযুক্তিপূর্ণ ধর্ম্ম মত শুনিয়া যে অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন,তাহার প্রধান কারণ, তিনি ইহাই বলেন যে, সেই জাপানী যুবকটী সর্ব্ব প্রকার Riligious narrow mindedness অর্থাৎ সর্ব্ব প্রকার ধর্ম্ম-মত-বাদের গোঁড়ামী হইতে বিমুক্ত। এইরূপ উদার ভাব তিনি জাপানের বর্ত্তমান কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষরূপে প্রত্যক্ষ করেন এবং ইহাতে তিনি বিস্ময় প্রকাশ পূর্ব্বক লিখিয়াছেন যে, পৃথিবীর অন্যান্য সুসভ্য দেশেও এই রূপ ভাব অতি বিরল, বরং সেই সকল দেশে সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধি পূর্ণ তেজে বিরাজ করিতেছে।

জাপানী যুবক তাঁহাকে বলিয়াছেন, "খ্রীষ্টান মিসনারীদিগের প্রতি আমরা সদ্ভাবই পোষণ করি, কেন না জনসমাজে তাঁহারা নীতি ও ধর্ম্ম-প্রচার ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। এই অংশে তাঁহাদিগের সহিত আমাদের সহানুভূতি আছে, আমাদের দেশের পুরোহিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রকৃত অভিজ্ঞতা লাভ করিবার অভিপ্রায়ে ইদানীং ইউরোপের অনেক স্থলের ধর্ম্ম বিদ্যালয় সমূহে পাঠ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। আমরা অনুমান বলে কাহারও সম্বন্ধে কোন বিচার করিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু আমরা প্রত্যক্ষ আলোচনা দ্বারা দেখিতেছি যে, ইউরোপ যেমন খ্রীষ্টের চরিত্র দ্বারা রক্ষা পাইয়াছে, তেমনই আমাদের এই বিশাল প্রাচ্যভূমি বুদ্ধদেবের চরিত্র দ্বারা জীবিত ও অনুপ্রাণিত। তারপর আমরা দেখিতেছি, খ্রীষ্টধর্ম্মের মধ্যে পরস্পর বিরোধী সম্প্রদায়ের সংখ্যা বৌদ্ধধর্ম্মের সম্প্রদায় সমূহ অপেক্ষা অপেক্ষা, অনেক অধিক। পরন্তু খ্রীষ্টধর্ম্মসম্প্রদায় সকলের পরস্পর বিরোধ কলহ অপেক্ষা বৌদ্ধসম্প্রদায় সকল যে অনেক শান্তভাবে স্ব স্ব ধর্ম্মমতে বিশ্বাসবান থাকিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ

করিতেছে, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ বর্ত্তমান। আপনারা যদি শুধু নিজেদের মধ্যে পরস্পর কলহ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন, তাহা হইলে আমাদের অধিক দুঃখিত হইবার আবশ্যক ছিল না, কিন্তু আপনারা যাহাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, অথবা অতি অল্পই জানেন, তাহাদের ধর্ম্মকে সর্ব্বদাই আক্রমণ করিতেছেন, ইহা দেখিয়া আমরা বাস্তবিকই দুঃখ বোধ করি। খ্রীষ্টান মিশনারীগণকে আমরা জাপান হইতে বিতাড়িত দেখিতে ইচ্ছা করি না। আমরা তাঁহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতে পারি, কারণ নীতিবান ও ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া আমরা অনেক শুভ কার্য্যে জীবনকে ব্যাপৃত রাখিতে পারি; কিন্তু যাঁহারা আমাদিগকে ধর্ম্মহীন মনে করিয়া খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যেই আগমন করেন, তাঁহারা যদি পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্ম উত্তমরূপে আলোচনা করিয়া পরে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা হইলেই সঙ্গত হইত। তাঁহারা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেন যে, যে নীতিধর্ম্ম তাঁহারা জাপানবাসীকে শিক্ষা দিতে প্রয়াসী হইয়াছেন, তাহা এই প্রাচ্যদেশে বিলক্ষণ আছে। কদাচিৎ কোন খ্রীষ্টান মিশনারী বৌদ্ধধর্ম্ম আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু যে সমুদায় খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারক নরনারী আমাদের দেশে আসিয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই এ সম্বন্ধে কিছু জানেন না বলিলেই হয়। অতএব যাঁহারা জাপানবাসীকে বুঝিতে অক্ষম, তাঁহারা তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার প্রত্যাশা কিরূপে করিতে পারেন? যে পর্য্যন্ত না তাঁহাদের জাতীয় ধর্ম্মতত্ত্ব তাঁহারা উত্তমরূপে আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহারা এদেশবাসীকে যথার্থরূপে বুঝিতেই বা প্রত্যাশা করেন কিরূপে? কিন্তু আমাদের স্বভাব কিরূপ, তাহা আপনারা সুস্পষ্ট দেখিতেছেন। আমাদের বৈদেশিক কার্য্য-সম্পর্কিত সমুদায় কর্ম্মচারীগণ ইউরোপে যাইবার পূর্ব্বে, প্রথমেই উত্তমরূপে খ্রীষ্টধর্ম্ম আলোচনা করিয়া থাকেন। এমন কি, এটা আমাদের দেশে রাজনৈতিক শিক্ষার একটা আদিরূপে গণ্য। অতএব আপনারা অবশ্য বুঝিতে পারিতেছেন, শুধু বৈদেশিক কার্য্য-সম্পর্কিত জাপানী রাজপুরুষগণ ইউরোপে যাইবার পূর্ব্বে যদি খ্রীষ্টধর্ম্ম আলোচনা করা তাঁহাদের শিক্ষার একটা প্রধান অঙ্গরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে স্বধর্ম্ম-প্রচারোদ্দেশ্যে এদেশে আসিবার পূর্ব্বে খ্রীষ্টান-মিশনরীগণের প্রাচ্য-ধর্ম্ম সম্বন্ধে কতখানি অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া তবে আসা উচিত?

"জাপানবাসী খ্রীষ্টান মিশনরীগণ যে এদেশে আসিয়া কোন মন্দ কার্য্য করেন, তাহা নহে। বরং যদ্যপি তাঁহারা বৌদ্ধ-ধর্ম্ম ও নীতি উত্তমরূপে আলোচনা করিয়া দেখিতেন এবং সেই ধর্ম্ম প্রাচ্য জাতির জীবনে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহা যদি বুঝিতে পারিতেন, তাহা হইলে কোন কোন বিষয়ে তাঁহারা এদেশবাসী জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের পক্ষে যে কার্য্য করিতেছেন, তাহাতে বিধায় সুফল উৎপাদন করিত। অখ্রীষ্টান বিষয়ে কিঞ্চিৎ কৃপার পাত্র মনে করিয়া যে সকল বৈদেশিকেরা জাপানবাসীকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন, অভিমানী জাপানবাসী স্বকার্য্য উদ্ধারের স্বার্থ ব্যতীত তাঁহাদের প্রতির কখনই অন্তরে প্রীতি

পোষণ করিবে না। মহাশয়! সরলভাবে প্রকাশ করিয়া বলি, আমাদের মতে আজকাল ও সব ধর্ম্ম বিশেষের প্রতি গোঁড়ামীর কোনই মূল্য নাই। নিজের মতটাই ভাল, আর সব ভ্রমাত্মক, একথাটা একজন বুদ্ধিমান লোক কিরূপে বলিতে পারে, আমরা বুঝিতে পারি না। আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহ আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি, কতকগুলি অবান্তরিক কথা ছাড়া, মানব হৃদয়ের আবশ্যকীয় যথার্থ নীতিধর্ম্ম সম্বন্ধে পৃথিবীর ধর্ম্মগ্রন্থ সকলের পরস্পর মূলতঃ কোন বিরোধ নাই। বিশ্বজনীন সত্যগুলির সহিত পরস্পর এরূপ ঐক্য দেখিয়া বোধ হয় যে, বিরোধ তো দূরের কথা, যেন পরস্পর একতায় আলিঙ্গন করিতে পারে। ইউরোপ ও আমেরিকার ধর্ম্ম এবং জাপানের ধর্ম্ম কেন যে পরস্পর সহানুভূতির সহিত সম্মিলিত হইতে পারিবে না, বুঝিনা। ধর্ম্মানুরাগী বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টান কেন যে উভয়ে শত্রুতা করেন, ইহা সরল বুদ্ধির অগোচর। যথার্থ পক্ষে যে, দুইটী ধর্ম্মপিপাসু খ্রীষ্টান ও বৌদ্ধের অন্তরে অন্তরে কোন প্রকার বিদ্বেষ ভাব থাকিতে পারে, ইহা আমার বোধ হয় না। শুধু আপনাপন সম্প্রদায়ের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়াই যত বিরোধ বিপত্তি উপস্থিত হইয়াছে ও হইতেছে। সর্ব্বপ্রকার পাপ ও দুর্নীতি নিবারণ চেষ্টা ও নীতি ধর্ম্মের প্রচার সকল সম্প্রদায়েরই উদ্দেশ্য, অথচ কার্য্যকালে মূল উদ্দেশ্য সাধন করা অপেক্ষা এক সম্প্রদায় আর এক সম্প্রদায়ের দোষ কীর্ত্তন-ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। হায়, বুদ্ধিমান শিক্ষিত মানবের কর্ম্মক্ষেত্র অসীম, কিন্তু জীবন অতি ক্ষণস্থায়ী, এইরূপ অবস্থায় আমরা আমাদের শক্তির যদি অপব্যবহার করি, তজ্জন্য আমাদিগকেই সম্পূর্ণ দায়ী হইতে হইবে।

"আমার এই বিনীত সমালোচনার সত্যতা প্রমাণের জন্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ চীনসাম্রাজ্যের বর্ত্তমান অবস্থার কথা উল্লেখ করিব। আমরা সকলেই সেখানে বিদেশী বলিয়া পরিচিত। এই বিদেশী-বিদ্বেষ ক্রমশঃ সেখানে অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইতেছে। এই ভাবের প্রধান কারণ, ইউরোপীয় শক্তি সকলের পররাজ্যলোলুপতা এবং কতকটা খ্রীষ্টান মিসনারীগণের প্রচার-বিভ্রাট। অতি দুর্ভাগ্যবশতঃই ঐ সকল পররাজ্যে আপনারা আপনাদের ধর্ম্মকে রাজনীতির মসল্লা দ্বারা প্রস্তুত করিয়া তাহার ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছেন। চীনাম্যানের নিকট আজকাল খ্রীষ্টান মিসনারী অর্থ, যুদ্ধ, পোতের অগ্রবর্ত্তী দূত। অগ্রে দয়াল মিসনারীগণ আগমন করেন, পরে রাজ্যগুলি যায়। সুতরাং চীনাম্যানেরা মিসনারীগণের আগমন ও তাহাদের রাজ্যগুলি পরহস্তে গমন, এই উভয় ব্যাপারের মধ্যে যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ বিদ্যমান, তাহা বিলক্ষণ বুঝিয়া লইয়াছে। "It is unfortunate that religion and statecraft should be mixed together, but to many Chinese to-day the foreign missionary is a sort of advance agent of the gun-boat. Missionaries came and provinces go. The Chinese look upon this as cause and effect."

"আমাদের আয়াসু, সপ্তদশ শতাব্দীর আরম্ভে স্প্যানিশ ও পোর্টুগিস্ মিসনারীদিগকে ঠিক চীনাম্যানদের ন্যায় ঐরূপ সন্দেহের চক্ষে দেখিয়াছিলেন এবং অবিলম্বে তাঁহাদিগকে জাপান পরিত্যাগ করিতে আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু মিস-

নারীগণ তাঁহার অবাধ্যতাচরণ করার ফলে কি ভীষণ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা আপনারা জানেন। আমাদের বিদেশীয় জাতির আক্রমণ হইতে তাহার স্বদেশকে রক্ষা করিতে সম্পূর্ণভাবে সক্ষম ছিলেন, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এশিয়া ও ইউরোপের সামরিক ক্ষমতা তুল্য ছিল। কিন্তু চীন আজ ইউরোপের তুলনায় অতি দুর্ব্বল, সে আত্মরক্ষা করিতে অক্ষম। মিসনারীগণ চীনের "আধ্যাত্মিক কল্যাণ" সাধন করিতে গিয়াছেন, অথচ তাঁহারা সে দেশের সামাজিক নীতি ধর্ম্ম কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন না। ফলে তাঁহারা সে দেশে এক মহা বিপ্লবের সূত্রপাত করিয়া তুলিয়াছেন। চীনাম্যানেরা তাঁহাদের পরলোকগত পিতা মাতা ও পূর্ব্ব পুরুষকে যে নানা রূপ বিচিত্র জাতীয় বিশেষত্ব দ্বারা সম্মান প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহা ইউরোপীয়ান্‌দিগের অনভ্যস্ত চক্ষুতে অদ্ভুত বোধ হইতে পারে, কিন্তু চীনাম্যান কখনই তাহার প্রতিবাদ সহ্য করিতে পারিবে না। আপনাদের পঞ্চম অনুশাসনটী প্রকৃত প্রস্তাবে সে যেমন প্রতিপালন করিয়া থাকে,তেমন খ্রীষ্টানগণ কিন্তু করে না। চীনাম্যান তাঁহার পিতা মাতার মৃত্যুর পরেও যে তাঁহাদের উদ্দেশে ভক্তি প্রকাশ করিতে ক্ষান্ত হয় না, তাহার কারণ, সে যুগযুগান্তর হইতে শিক্ষা পাইয়া আসিয়াছে যে, মানুষ দেহত্যাগ করিলেও তাহার আত্মা বিনষ্ট হয় না এবং ইহলোকস্থ সম্মান ভক্তিপ্রকাশ দ্বারা তাহার পরলোকস্থ আত্মীয়গণকে সন্তুষ্ট করিতে পারে। সে কোন প্রকার স্বার্থের উদ্দেশ্যে এইরূপ করে না, পরলোকস্থ আত্মার নিকট নিজের কোন প্রকার মঙ্গল প্রার্থনা করে না, তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য প্রার্থনা করে না, বা পূজা করে না; শুধু নানারূপ বিচিত্র প্রাচ্য প্রথায় পরলোকস্থ আত্মার প্রতি সম্মান প্রকাশ করে মাত্র। ইহাই তাহাদের চিরন্তন শিক্ষা। ইহারা অতি প্রাচীন জাতি, অদ্যাপি সেই বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বের ভাবের মধ্যেই বাস করিতেছে। দুই সহস্র বৎসরের ন্যূনবয়স্ক কোন কিছুর সহিত তাহাদের পরিচয় নাই।

"খ্রীষ্টান মিসনারীগণ এইরূপে বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মভাব এবং সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া, তাহার বিরুদ্ধে যে সমস্ত মত প্রকাশ করেন, তাহা অতি স্বাভাবিকরূপে জন সাধারণের মর্ম্মস্থান স্পর্শ করিয়া, খ্রীষ্টান ধর্ম্মের নাম মাত্রে তাহাদিগকে উত্তেজিত করিয়া তোলে। আপনাদের তথাকথিত হীদেন বিশেষণ চীনাম্যানকে আগ্নেয়গর্ভা করিয়া তুলিয়াছে। হইবারই কথা, কারণ আপনার জননী ভগ্নীকে যদি কোন মিথ্যাবাদী ব্যক্তি নীতিহীন ও চরিত্রহীন বলে, তাহা হইলে তাহাকে আপনার কিরূপ শাস্তি দিতে ইচ্ছা হয়? সেই লোকটাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিতে ইচ্ছা হয় না কি? হাঁ, তাহাই হওয়া সাধারণ মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক এবং বর্ত্তমানে খ্রীষ্টানদিগের প্রতি চীনাম্যানদের এইরূপ ভাবই দাঁড়াইয়াছে। ইহার দেশব্যাপী বিষময় ফল কিছু দিনের মধ্যেই আপনারা বুঝিতে পারিবেন।

"তবে এখানে, জাপানে, মিসনারীদের প্রতি আজ কাল লোকের মনের ভাব ঠিক চীনাম্যানের মতন নহে। শিক্ষিত জাপানীগণ মিসনারীদের অনধিকার-চর্চ্চাকে অনেকটা উপেক্ষার চক্ষেই দেখিয়া থাকেন, কারণ, জাপানের কি সামাজিক কি রাজনৈতিক, কোন অংশে দন্তস্ফুট করা তাঁহাদের সাধ্য নহে, ইহাই তাঁহারা জানেন। আর চীনাম্যান নিরুপায়, তাই মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। আমরা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী, নীতিধর্ম্মের জীবন্ত আদর্শ দ্বারা যে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত লোক মানব সমাজের কল্যাণ ইচ্ছা করেন, আমরা তাঁহারই সহিত অভিন্ন হৃদয়ে পবিত্র কর্ম্মক্ষেত্রে কাজ করিতে প্রস্তুত আছি। মিসনারীগণ যদি প্রাচ্য জাতির ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করিতেন এবং নিজের ধর্ম্ম ধীর ভাবে আপন জীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রচার করিতেন, তবে জাপানে

অধিকতররূপে তাঁহাদের ধর্ম্ম প্রচার করিতে পারিতেন। আসল কথা, চিরন্তন সংস্কারের প্রভাব মোচন করিয়া নির্ব্বিরোধী সত্যের উদার ভূমিকে আশ্রয় করা মানুষের পক্ষে বড় কঠিন। জন্মাবধি যে সংস্কার পুরুষ-পরম্পরাক্রমে বদ্ধমূল হইয়া আসিয়াছে, তাহা অসার হইলেও, তাহার নিকট অতি বড় বিদ্বানেরও বিচার শক্তি পরাভব স্বীকার করে, ইহা স্বাভাবিক। যে কারণ বশতঃ একজন খ্রীষ্টান বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধে যথাসাধ্য চেষ্টা করে, ঠিক সেই কারণের বশীভূত হইয়াই একজন বৌদ্ধ খ্রীষ্টধর্ম্মের দোষোদ্ঘাটন ব্যবসায় অবলম্বন করে। তাহারা উভয় পক্ষই যে ধর্ম্মকে বিশ্বাস করিতেছে, তাহা তাহাদের বহু বহু পূর্ব্ব পুরুষ হইতে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে, তাহা তাহাদের পিতা পিতামহ, মাতা মাতামহের ধর্ম্ম, তাহাদের আত্মীয় অন্তরঙ্গ বন্ধু বান্ধবগণের ধর্ম্ম। তাহারা চিরকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছে, তাহাদের স্বদেশীয় সমুদায় জ্ঞানীগণ সেই ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতার কথা প্রচার করিয়াছেন, তাহারা বাল্যকাল হইতে শিক্ষকের নিকট শুনিয়া আসিতেছে যে, সেই ধর্ম্মই সত্য, এইরূপে সেই স্বধর্ম্মের প্রতি তাহাদের অতি স্বাভাবিক রূপে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সঞ্চার হয়। যদি কাহারও সেইরূপ না হয়, তবে তাহাকে আমি বরং অস্বাভাবিক বলিব। বৌদ্ধধর্ম্ম আমাদের নিকট ঠিক এই ভাবেই আসিয়াছে। খ্রীষ্টধর্ম্মও আপনাদের নিকট এই ভাবেই আসিয়াছে। উভয় জাতিই প্রাচীন সংস্কার ও গতানুগতিকের প্রভাব হ্রাস করিতে সক্ষম হয় না। উভয় জাতিই সর্ব্ব প্রথমে স্বদেশের ধর্ম্ম ছাড়া অন্য দেশীয় ধর্ম্ম নীতির সহিত পরিচিত হয় নাই। কিন্তু এখন আমরা সকলেই দেখিতে পাইতেছি, কতকটা বাহিরের অনাবশ্যকীয় রীতি পদ্ধতি ছাড়া পৃথিবীর মানব জাতি মাত্রেরই নীতি ধর্ম্মের চরম লক্ষ্য এক এবং অবিরোধী, অতএব পরস্পরকে শুধু নিজের সাম্প্রদায়িক মতে দীক্ষিত করিবার চেষ্টা করা অপেক্ষা, বরং আমরা সমগ্র মানব জাতির কল্যাণের জন্য সাধারণ সর্ব্বভৌমিক ক্ষেত্রে পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া অগ্রসর হইতে পারি। বিংশ শতাব্দীর সভ্যতা যদি আমাদিগকে এই নীতি-মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে পারে, তাহা আমাদের পক্ষে অশেষ গৌরবের বিষয় হইবে। সাম্প্রদায়িক খুঁটি নাটি লইয়া প্রাণে ঘৃণা-বিদ্বেষ-পাপ পোষণ করার কোনই সার্থকতা দেখা যাইতেছে না। সে সব ধরিতে গেলে একজন খ্রীষ্টান যেমন বৌদ্ধসম্প্রদায়ের সমালোচনা করিতে চেষ্টা করিলে অনেক দোষ ধরিতে পারিবেন, তেমনই, একজন খুঁত-ধরা-ব্যবসায়ী বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-প্রচারকও খ্রীষ্টধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের অনেক দোষ দেখাইতে পারেন। সুতরাং আমরা এই ভাব হইতেই বলিতেছি যে, এই দেশে খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারকগণ যেরূপে ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, তাহা যে পৃথিবীর কল্যাণের পক্ষে কিছু মাত্র সহায়তা করিতেছে, ইহা আমরা বিশ্বাস করি না।

"এক জনের প্রতি অকারণ দোষারোপ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিবার আশা করিতে যাইবার পূর্ব্বে, নিজের ছিদ্রটার কথা স্মরণ করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। আপনারা কিন্তু সেই দিকটায় তাকাইয়া দেখেন না। নির্ব্বাণ-মুমুক্ষু প্রাচ্য জাতি আমরা শিক্ষা পাইয়াছি যে, লৌকিক পারলৌকিক কোন প্রকার পুরস্কারের প্রত্যাশায় যে পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান, তাহা অধর্ম্ম, তাহা মানব আত্মার চরম গৌরব এবং চরম বাঞ্ছিত নহে। ইহা আমরা অন্তরের সহিত বিশ্বাস করি। কাজে কাজেই, ক্ষমা করিবেন, খ্রীষ্টানের বর্ণিত স্বর্গকে আমাদের নিকট যেন মস্ত একটা ঘুষের লোভ দেখান বলিয়া বোধ হয়। নিষ্কাম ধর্ম্মের এই আদর্শের কথাটা যে আমাদের দেশের মৌলিক সম্পত্তি, আমি তাহা বলিতেছি না, কিন্তু ধর্ম্মের এই উচ্চ আদর্শ যে প্রাচ্য পৃথিবীর প্রদর্শিত, ইহা নিশ্চয় জানিবেন।"

"সমুদায় খ্রীষ্টান মিসনারিগণকেই বলিতে শুনি যে, খ্রীষ্টধর্ম্মই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, আর সব

অসার। শুধু তাই নয়, আবার চল্লিশ কি পঞ্চাশ রকম বিভিন্ন মতের খ্রীষ্টধর্ম্মের মধ্যে তাঁহার মতটাই বেশী ভাল!

"আর এই কথাটা আমরা বুঝিতে পারি না, যীশুর উপদেশ এবং খ্রীষ্টানগণের কার্য্য পরস্পর এত বিপরীত ভাবাপন্ন? কেন যীশু বলিয়াছেন "তোমার শত্রুকে প্রেম কর" কিন্তু খ্রীষ্টানগণ কোন স্থানে না কোন স্থানে অবিশ্রান্ত কাটাকাটি কর্ম্মে লাগিয়াই আছেন! পরন্তু, খ্রীষ্টানে যত খ্রীষ্টান হত্যা করিয়াছে, পৃথিবীর অন্য কোন জাতি কিন্তু সমধর্ম্মাবলম্বীর রক্তে ততটা হস্ত কলুষিত করে নাই! ইহার কারণ কি? হায়, যীশুর উপদেশে কিন্তু আমরা ইহার সদুত্তর পাই না! অতএব, আপনাদের এই সব কাণ্ড দেখিয়া শুনিয়া যদি কোন "কৃপাপাত্র অখ্রীষ্টান" মনে করে যে, বুঝিবা বাইবেল জিনিষটাই এমন কিছু, যাহার আলোচনা করিলেই মানুষ ঐ রকম অমানুষিক হয়, তাহা হইলে তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না।"

শ্রীকিশোরীমোহন রায়।

অশ্বঘোষ।

প্রথমতঃ এ দেশে আলঙ্কারিক সাহিত্য বা ললিত সাহিত্যের উৎপত্তি কখন হইল, তাহা জানিতে পারা যায় না। বৎসভট্টি, কালিদাস, ভারবি প্রভৃতি কবির রচনায় পূর্ব্বেও যে ঐ প্রকার সাহিত্য সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা প্রাচীন প্রস্তরলিপির রচনা পাঠ করিলে প্রতীত হয়। গুপ্ত-যুগের লিপিতে হরি সেন প্রভৃতির রচনায় যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে ঐ সময়ে সুবিস্তৃত ললিত সাহিত্যের অস্তিত্ব সূচিত হয়।

মহর্ষি পতঞ্জলির ১৪০ খৃঃ পূর্ব্বের মহাভাষ্যে "অধিকৃত্য গ্রন্থে"র দৃষ্টান্তে বাসবদত্তা এবং সুমনোহরা নাম পাওয়া যায়। সুবন্ধুর বাসবদত্তার বহু পূর্ব্বের এই বাসবদত্তা সম্ভবতঃ আলঙ্কারিক সাহিত্য ছিল। কিন্তু গ্রন্থগুলি একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে বলিয়া তাহাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন কথা বলা চলে না।

বৌদ্ধকবি অশ্বঘোষ, কুষণ রাজা কনিষ্কের সমসাময়িক বলিয়া চীন-লিপিতে উল্লিখিত *। তাহা হইলে অশ্বঘোষ খ্রীষ্টাব্দের তৃতীয় শতাব্দীর শেষ ভাগে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন ‡। বীল সাহেবের গ্রন্থে ইহাও দেখিতে পাই যে, কবি অশ্ব ঘোষ প্রণীত বুদ্ধ-চরিত-কাব্য, ৪১১ খ্রীষ্টাব্দে চীন ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল।

অশ্বঘোষ কালিদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী; এবং কালিদাসের কুমারসম্ভবে এবং রঘুবংশে বুদ্ধ-চরিত-কাব্যের কয়েকটী ভাব এবং কথা পাওয়া যায়। অশ্বঘোষের ঐ ভাবগুলি কালিদাসের কল্পনায় এমন উজ্জ্বল হইয়াছে যে, কালিদাসকে ভাব গ্রহণ দোষে দোষী করা যায় না। কবিত্ব শক্তির হিসাবে কালিদাসের সহিত অশ্বঘোষের তুলনা করা চলে না; তবে অশ্বঘোষ পূর্ব্ববর্ত্তী কবি বলিয়া যাহা কিছু আদর পাইতে পারেন। বুদ্ধ-চরিত অতি প্রাচীন কাব্য বলিয়া উহার রচনা প্রণালী এবং অলঙ্কার সমাবেশের ত্রুটি উপেক্ষা করিতে হয়।

সম্ভবতঃ বৌদ্ধসাহিত্য বলিয়াই কবি অশ্বঘোষ এ দেশে অপরিচিত। স্বনামখ্যাত কাউয়েল সাহেব অনেক দিন পূর্ব্বে বুদ্ধ-চরিতের একটী সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু এ দেশে উহার প্রচলন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। বৌদ্ধ হউক, হিন্দু হউক, সকল সাহিত্যই আমাদের সাহিত্য ও কাজেই উহার সহিত কাব্যপ্রিয় পণ্ডিতদিগের পরিচয় হওয়া প্রার্থনীয়। এই পরিচয় প্রদানের জন্যই এই পত্রিকায় সানুবাদ বুদ্ধ চরিত প্রকাশ করিতেছি। প্রথম

* Beal's Si-yu-ki vol. I.
‡ J. B. R. A. S. vol XX 9. 385.

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

৩২। স্ত্রীরোগ।—শ্রীগিরীশচন্দ্র বাগচী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত, সান্যাল কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ৬৲। গিরীশ বাবু কলিকাতা পুলিস হস্পিটালের সুযোগ্য ডাক্তার, কিন্তু ইহা তাঁহার একমাত্র পরিচয় নহে; তিনি সুচিকিৎসার গুণে যেমন সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছেন, নির্ম্মল চরিত্র প্রভাবে, তেমনি সকলের পূজ্য। কিন্তু ইহাও তাঁহার প্রকৃত পরিচয় নহে, তিনি একজন বাঙ্গালা ভাষার হিতৈষী, প্রেমিক ব্যক্তি। তিনি দীর্ঘকাল ভিষকদর্পণ নামক মাসিক পত্রিকা সুচারুরূপে সম্পাদন করিয়া বাঙ্গালা ভাষার প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন। পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানকে সরল ভাষায় অনুবাদিত করিয়া দেশের তিনি বিশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। ইহার সঙ্গে সঙ্গে, তাঁহার বহুদর্শিতার ফল তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া যে সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। তাঁহার এই স্ত্রীরোগ গ্রন্থ তাঁহার অসাধারণ বহুদর্শিতার ফল। পুস্তক খানি অতি সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। এই সুন্দর পুস্তকখানি পাঠ করিলে সকলেই বিশেষরূপ উপকৃত হইবেন।

৩৩। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত। দ্বিতীয় ভাগ, শ্রীম-কথিত, মূল্য ১৷৹। রামকৃষ্ণ-কথামৃতের বিশেষ পরিচয় আমরা আর কি দিব, নব্যভারতের পাঠকগণ তাহা বিশেষ রূপ জানেন। তাঁহার সকল কথা যেন অমৃতের সমান, যতবার পাঠ করা যায়, ততবারই প্রাণ শান্তিতে পূর্ণ হয়। শ্রীযুক্ত মঃ—মহাশয়,এই সকল কথা সংরক্ষণ করিয়া, এদেশের,শুধু এদেশের কেন, সকল দেশের, নরনারীর যে উপকার করিয়াছেন, তাহা আমরা ভাষায় ব্যক্ত করিতে অসমর্থ। আমরা যখনই পড়ি, তখনই যেন সংসারের উপর উঠিয়া যাই। আমাদের বিশ্বাস, রামকৃষ্ণ-কথামৃত এক সময়ে বাইবেল,গীতা, ভাগবতের ন্যায় পঠিত হইবে।

কথামৃতের ভাণ্ডার যেন অফুরন্ত—দুই খণ্ড বাহির হইল, এখনও ভাণ্ডার শূন্য হইল না। সব দিনের সব কথাই যে নূতন, তাহা আমরা বলিতেছি না, অনেক স্থানে একই রূপ কথা হওয়ায় এবং একই রূপ গীত হওয়ায়, সময় সময় পুনরুক্তি দোষ লক্ষিত হয় বটে, কিন্তু, তাহা প্রতিকারের আর উপায় নাই। প্রতি দিনের সকল কথা নূতন না হইলেও,এমন কোন ঘটনার উল্লেখ নাই,যাহাতে কিছু না কিছু নূতন কথা পাওয়া যায় না। এজন্য পুনরুক্তি দোষ মার্জ্জনীয়। মুক্তা অন্বেষণ করিয়া বাহির করিতে হইলে যেমন অনেক পরিশ্রম করিতে হয়, সেই প্রকার, রত্ন পাইতে হইলে, পৌনঃপুনিক ঘটনার উষর ভূমি অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইবার সময় কষ্ট হইলেও, তাহা ধৈর্য্যসহ সহ্য করা উচিত। এমন অমৃত, বিনা কষ্টে কি পাওয়া যায়? মঃ—বাবু সঞ্চয় করিয়া না রাখিলে, এই মধুর ভাণ্ডার চিরদিনের জন্য লুপ্ত হইয়া যাইত। ধন্য মঃ—বাবুর ধৈর্য্য, চেষ্টা, অধ্যবসায় ও গুরুভক্তি। পূজ্যপাদ মঃ—বাবু যে অসাধ্য সাধন করিয়াছেন, কোন মহাপুরুষের জীবিত কালে এরূপ হয় নাই। আমরা যতদূর জানি, অন্যান্য মহাপুরুষদিগের কথা সকল পরে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তিনি মহাত্মা রামকৃষ্ণের কথা সকল সম-সময়েই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি অনেক সময়ে মহাপুরুষের সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতেন। তিনি একজন ভক্ত, বিশ্বাসী ব্যক্তি। তাঁহার লেখায় একটুও অতিরঞ্জিত ভাব নাই। রামকৃষ্ণ-কথামৃত ঘরে ঘরে ভক্তির সহিত পঠিত ও আদৃত হউক।

৩৪। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ।—শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত, মূল্য ২৲। এ পুস্তকখানি আমরা বহুদিন হইল পাইয়াছি। ধীরে ধীরে সম্ভোগ করিয়া পাঠ করিতেছিলাম বলিয়া, এ পুস্তক সম্বন্ধে এত দিন কিছু লিখি নাই। মহাপুরুষের জীবন কথা অমৃতের সমান। এপুস্তক রামতনুর সুযোগ্য পুত্রগণের পিতৃভক্তির অক্ষয় কীর্ত্তি।

রামতনু যখন দেহধারী হইয়া আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন, তখন তাঁহার কথা বার্ত্তা শুনিলে, আচার ব্যবহার দেখিলে সময় সময় মনে হইত, তিনি মানুষ না দেবতা? তাঁহার জীবনের কত কথা জানি, যাহা স্মরণ করিলে, এখনও, নিরাশার দিনে শান্তি, দুর্ব্বলতার সময়ে নব বল পাই। আমরা প্রচলিত মতের অবতার মানি না—কিন্তু একথা না বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয় যে, চরিত্রের নির্ম্মালা এবং বিনয়ের সৌন্দর্য্য এই বঙ্গভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই বিধাতা নিজ শক্তিতে অনুপ্রাণিত করিয়া রামতনুকে যেন প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি—তিনি আমাদের ন্যায় আসুর-সমাজে দেবদূত ছিলেন। তাঁহার পুণ্যময় জীবন-কাহিনী যে শুনে, সেই ধন্য হয়, যে লেখে সেও ধন্য হয়।

জীবনচরিত লেখা বড় শক্ত কাজ। অনুরাগী লোক লিখিলে তাহা অতিরঞ্জিত হয়, বিরোধী লোক লিখিলে তাহা কলুষিত হয়। ভাল মন্দ—সকল জীবনেই প্রতিবিম্বিত। সকলেই বহুরূপী। বহুরূপীর রূপ সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তিত হয়। যে তাহার যে রূপ দেখে, সে তাহাই ব্যাখ্যা করে। যে মন্দটুকু দেখিয়াছে, সে মন্দটুকুই প্রকাশ করে, যে ভালটুক দেখিয়াছে, সে লিখিলে ভালটুকুই লেখে। ভাল-মন্দ-নিরপেক্ষ হইয়া এ জগতে অতি অল্প লোকে অল্প লোকের জীবন-কাহিনী প্রচার কবিতে পারিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, এই শক্ত কাজ করিতে সদা-অন্যমনস্ক শাস্ত্রী মহাশয় অগ্রসর না হইলেই ভাল হইত।

এক শ্রেণীর জীবনচরিত-লেখক ব্যবসাদারী, আর এক শ্রেণীর জীবনচরিত-লেখক অনুরাগী। কেহ অনুরোধ বা পয়সার খাতিরে লেখেন, কেহ না লিখিয়া পারেন না, তাই কর্ত্তব্যের অনুরোধে লেখেন। শাস্ত্রী মহাশয় ইহার মধ্যের কোন্ শ্রেণীর লেখক, আমরা নির্দ্দেশ করিতে অক্ষম। আমাদের মনে হয়, রামতনু-চরিত্রের অভ্যুদয় ও অসাধারণত্ব বিশ্লেষণ করিতে যে অনুরাগ এবং কর্ত্তব্যপরায়ণতার প্রয়োজন ছিল, এ পুস্তকে তাহার যথেষ্ট অভাব আছে। এ পুস্তক পাঠ করিয়া কেহ তাঁহাকে প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিলে যে অপরাধী হইবেন, আমরা তাহা মনে করি না।

জগতের এক শ্রেণীর লোক মনে করে, তাহারা যাহা করে, তাহাই সর্ব্বত্র প্রশংসিত হইবে। ধর্ম্মসমাজের প্রচারকগণ সাধারণত এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ধামাধরা লোকেরা সর্ব্বদাই চাটুকারিতা বহন করিয়া ফিরিতেছে, অবসর, অনবসর বুঝে না, তাহারা তাহাদের নেতাদিগকে কেবল স্বর্গে তুলিয়া দিতেই লালায়িত। হায়রে চাটুকারিতা!

শাস্ত্রী মহাশয়ের ক্ষমতা নাই, এ কথা আমরা মনে করি না। জীবনচরিত কিরূপে লিখিতে হয়, তাহা তিনি জানেন না, তাহাও মনে করি না। বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার দখল নাই, এ কথাই বা কিরূপে ভাবিব? ব্রাহ্মসমাজের উৎসবের সময় অনেক সাধু মহাজনের জীবনচরিত সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনিয়াছি। বক্তারা এমনই বিবেচনা-শূন্য যে, একটী বিস্তৃত জীবনের সকল ঘটনাগুলি ২।৩ ঘণ্টার মধ্যেই বলিয়া ফেলিতে চাহেন। তাহা কি কখনও সম্ভব? তাঁহারা কত কথা বলিয়া যান, কিন্তু কোন কথার সহিত কোনটা গ্রথিত নহে। এইজন্য, দেখিয়াছি, কত কত অমূল্য জীবনকাহিনী নীরস হইয়া গিয়াছে। বক্তা, যে জীবনের অনন্তমুখী বিশেষত্বের যে কথা বলিবেন, সেই জীবনের সেই বিশেষত্ব-জ্ঞাপক ঘটনার উল্লেখ করিলেই ভাল হয়। কিন্তু বলিতে লজ্জা হয়, এ দেশের অনেক বক্তাই তাহা করেন না। অনেক বক্তাই মনে করেন, ৩।৪ ঘণ্টা চীৎকার করিয়া বকিয়া গেলেই প্রশংসার যোগ্য হইল। এই জীবনচরিত বা বঙ্গসমাজের কথা পাঠ করিবার সময়েও আমাদের মনে বারম্বার সেই কথা জাগিয়াছে। যখনই অবসর পাইয়াছেন, শাস্ত্রী মহাশয়, কত, কত, কত অবান্তরিক কথা আনিয়া পুস্তক বাড়াইয়া ফেলিয়াছেন। এই এক দোষে তাঁহার এই পুস্তক এ দেশে তেমন আদর পায় নাই,—কখনও পাইবে বলিয়া আশা নাই।

কেহ তাঁহার ভাষার দোষ ধরিয়াছে;—ধরিবেই ত! এ পুস্তকে অনেক ভাষায় দোষ আছে। জীবনী বিশ্লেষণে তিনি এদেশের অন্যান্য জীবনচরিত-লেখকদিগের, বিশেষতঃ যোগীন্দ্রনাথের পশ্চাতে পড়িয়াছেন, একথা লোকে বলিয়াছে;—বলিবেই ত! তিনি অনেক ফুল সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু মালা গাঁথিতে পারেন নাই। তাঁহার অনুরাগী লোকেরা যতই বিরক্ত হউন না কেন, সত্যের অনুরোধে এ কথা বলিতে আমরা বাধ্য যে, রামতনু লাহিড়ীর ন্যায় প্রেম-পুণ্য চরিত্রের আদর্শ পুরুষকে সম্যক প্রকারে তিনি প্রকাশ করিতে পারেন নাই। কিরূপে এই সাধুর অভ্যুদয় হইল, কিরূপে তাঁহার নির্ম্মল চরিত্র ফুটিল, অনেক খুঁজিয়াও তাহা পাইলাম না। তিনি কত কথা বলিয়াছেন, কত কত কাহিনী ব্যাখ্যাত করিয়াছেন, কিন্তু সবই যেন উদ্দেশ্য-শূন্য হইয়াছে।

এক দোষে শাস্ত্রী মহাশয় এ দেশের কৃতীগণের পশ্চাতে পড়িয়া যাইতেছেন, আমরা দেখিতেছি। তাঁহার মধ্যে কিছু অহংজ্ঞান প্রবল হইয়াছে, তিনি কিছু প্রশংসা-পিপাসু হইয়াছেন। তিনি সকলের স্বাধীনতা-মূলক বিশেষত্ব ভাঙ্গিয়া চূরিয়া সমাজ গড়িবেন, তিনি সকলকে খর্ব্ব করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবেন, এইরূপ নানা আবিলতা তাঁহাতে সংক্রামিত হইয়াছে। পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। এই দোষ না থাকিলে তিনি আরো সংযত হইতেন, আরো শিল্পনৈপুণ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিতেন, সর্ব্ব বিষয়ে আরো হিসাব করিয়া কলম চালাইতেন। এ দেশের চতুর্দ্দিকের লোকেরা যে উপরে উঠিয়া যাইতেছেন, সে কথা বুঝিবার ও ভাবিবার তাঁহার অবসর নাই। বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের কিছু পড়েন কি না, সন্দেহের বিষয়। যদি অবসর থাকিত ও যদি অন্যান্য বাঙ্গালা গ্রন্থ পড়িতেন, তবে এরূপ জীবন-চরিত তাঁহার হাত দিয়া বাহির হইত না। অনেক ভাল ভাল কথা ইহাতে আছে, কিন্তু শৃঙ্খলার অভাবে সকলই মলিন ও নিষ্প্রভ হইয়াছে। তাঁহার কোন অনুরাগী ভক্ত বলিতে পারেন, "এ সকল কথার প্রমাণ কি? আমরা তাঁহার পায়ের যোগ্য নই, এমন শক্ত কথা বলিতেছি?" আমরা ত তাঁহার পায়ের যোগ্য নই-ই;—এরূপ সত্য কথা বলিলে আমাদিগের কোন ক্ষোভ হয় না। পায়ের যোগ্য নই বলিয়া, তাঁহার কিম্বা তাঁহার কৃতকার্য্যের কোন ত্রুটী বা দোষ দেখিলে তাহা বলিতে পারিব না কেন, বুঝি না। এমন অন্ধ-প্রভু-পরায়ণতা, এমন আত্ম-বর্জ্জন-স্পৃহা, এমন অযথা-গুরুভক্তি-মূলক খোসামুদীকে আমরা চির-কাল ঘৃণা করিয়াছি, এখনও ঘৃণা করি-তেছি। আমাদের কথার প্রমাণ দিতে হইলে, তিনি যেমন ৩৫০ পৃষ্ঠার একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন, আমাদিগকেও সেই প্রকার আর একখানি পুস্তক লিখিতে হয়। বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা তাহা করিতে অক্ষম। ইচ্ছা আছে, বিধাতা যদি কৃপা করেন, অযোগ্য হইলেও, ভক্ত কেশবচন্দ্র, ঋষি রামতনু ও রাজনারায়ণ এবং মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথ প্রভৃতি যুগ-অবতারদিগের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। কিন্তু সে ইচ্ছা পূর্ণ হইবে কি না, কে জানে?

বঙ্গসমাজের যে যুগের কথা শাস্ত্রী মহাশয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিখিয়াছেন, সে যুগের তুলনা নাই, তাহা বঙ্গের অত্যুজ্জ্বল যুগ। মহারাজা ক্ষিতীশচন্দ্রের ন্যায় ব্যক্তি-গণের কথা লইয়া অনেক আলোচনা না করিয়া, সে যুগ-মাহাত্ম্য কত সুন্দর করিয়া তিনি লিখিতে পারিতেন! কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট আমা-দের আশা কিছু বেশী;—সে আশা পূর্ণ না হওয়ায় আমরা বেশী মাত্রায় বিরক্ত হই-য়াছি। তাহা যে না হইতে পারে, আমরা তাহা বলি না। আমরা কবিত্বের রাজ্যে তাঁহার যে পরিচয় পাইয়াছিলাম, উপন্যাস ও জীবন-চরিত লেখায় তাঁহার সেই প্রকার পরিচয় পাইতেছি না বলিয়া বড়ই দুঃখিত। তাঁহাকে পিতার ন্যায় শ্রদ্ধা করি, গুরুর ন্যায় ভক্তি করি, আশা করি, এই অপ্রিয় সমালোচনার জন্য তিনি আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

পাতা মুড়বেন না

ভারতের রাজভক্তি।

"Human nature is not a machine to be built after a model and set to do exactly the work prescribed for it, but a tree, which requires to grow and develop itself on all sides, according to the tendency of the inward forces which make it a living thing." John Stuart Mill.

জাতিভেদের স্তাবকগণ যাহাই বলুন না কেন, ইহা একটী স্বতঃসিদ্ধ সত্য যে মানুষ মাত্রেই সমান। সকল মানুষেরই কতকগুলি প্রকৃতি-নির্দ্দিষ্ট অধিকার আছে। এবং এই অধিকার গুলিও সকল মানুষের সমান। এই অধিকারগুলি তাহার জীবনধারণ, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির চেষ্টা। তাহাকে এই গুলি হইতে বঞ্চিত করিবার অধিকার কাহারও নাই। এই অধিকারগুলি পরিপুষ্ট ও অব্যাহত রাখিবার জন্যই জগতের শাসন প্রণালী সকলের সৃষ্টি। মানুষ যাহাতে পরস্পরের অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ না করিয়া আপনার অধিকারগুলি সম্ভোগ করিতে পারে, তাহাই এই শাসন প্রণালী সমূহের উদ্দেশ্য। যে শাসন প্রণালী যে পরিমাণে এই উদ্দেশ্য সাধনের সহায় বা অন্তরায়, তাহা সেই পরিমাণে শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট। সুতরাং শাসন-কর্ত্তৃগণ তাহাদিগের ক্ষমতা কোন দৈব শক্তির নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া ধরাতলে অবতীর্ণ হন নাই। তিনি বংশানুক্রমিক রাজাই হউন অথবা প্রজার প্রতিনিধি হউন, তিনি যদি প্রজামণ্ডলীর এই স্বাভাবিক অধিকারগুলি রক্ষা ও সম্প্রসারণকেই আপনার একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া মনে না করেন, তবে তিনি সম্পূর্ণরূপে শাসনকর্ত্তৃপদের অযোগ্য। তাঁহারা আপনাদিগের ক্ষমতা প্রজার নিকট হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছেন। সুতরাং প্রজামণ্ডলী মনে করিলে তাহাদের প্রদত্ত অধিকার পুনরায় ফিরাইয়া লইতে পারে। যে শাসনকর্ত্তা প্রজামণ্ডলীর নিকট হইতে আপনার শাসন কর্ত্তৃত্বাধিকার প্রাপ্ত হন নাই, শাসন করিবার অধিকার তাঁহার আদৌ নাই। সুতরাং প্রজামণ্ডলী যে শাসন প্রণালী নিজে অনুমোদন করে এবং গ্রহণ করে, কেবল সেই শাসন প্রণালী তাহাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। নতুবা আর যাহা কিছু বাহির হইতে জোর করিয়া তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা তাহার পূর্ব্বোল্লিখিত প্রকৃতি-নির্দ্দিষ্ট অধিকারগুলির সংহারক সুতরাং অস্বাভাবিক। যদি এমন হয় যে, প্রজামণ্ডলী কোন এক বিশেষ অবস্থায় একরূপ শাসন প্রণালী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলে বা গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু অবস্থা বিপর্য্যয়ে সে প্রণালী আর কার্য্য সাধনে সক্ষম হইতেছে না, তবে তাহার পরিবর্ত্তন করিবার অধিকার প্রজামণ্ডলীর হস্তে নিশ্চয়ই ন্যস্ত রহিয়াছে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কেননা, প্রজামণ্ডলীর সুখ স্বাধীনতা রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্যই শাসন প্রণালী, শাসন প্রণালীর জন্য প্রজামণ্ডলী নহে। যে শাসনকর্ত্তা প্রজারঞ্জনে অক্ষম, তাঁহার রাজভক্তি দাবী করিবার কোনই অধিকার নাই, রাজভক্তি প্রজারঞ্জন-বৃক্ষের ফল মাত্র। যে রাজা প্রজারঞ্জন-রত, তাহাকে রাজভক্তি সংগ্রহে ব্যস্ত হইতে হয় না। প্রজার সুখ সুবিধার জন্যই রাজার হস্তে কতকগুলি ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে। যে রাজা সেই সমস্ত ক্ষমতার অপব্যবহার না করিয়া সে গুলিকে সুপথে পরিচালিত

করেন এবং যে উদ্দেশ্যে সে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা সংসিদ্ধ করিতে সক্ষম হয়েন, তাঁহার পক্ষে রাজভক্তি প্রাপ্ত হওয়া জলের নিম্নগমনের ন্যায় স্বাভাবিক। প্রজা যখন দেখিতে পায় যে, তাহার প্রদত্ত ক্ষমতা উদ্দেশ্যানুরূপ ফল প্রদান করিতেছে, তখন যে তাহার ভক্তিক্ষমতাপরিচালকের অনুসরণ করিবে, এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। সুতরাং যে রাজা যে পরিমাণে প্রজার সুখ সমৃদ্ধির জন্য স্বীয় ক্ষমতা নিয়োজিত করিবেন, তিনি সেই পরিমাণে রাজভক্তি উপার্জ্জনে সক্ষম হইবেন, এবং যে পরিমাণে সেই ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া স্বীয় ব্যক্তিগত সুখ সুবিধা সাধনে রত হইবেন, তিনি সেই পরিমাণে রাজভক্তি হইতে বঞ্চিত হইবেন। ইহাও একটী স্বতঃসিদ্ধ সত্য। প্রজা মুখ ফুটিয়া আপনার অসন্তোষের কথা বলিতে সাহস করুক আর না করুক, এমন কি, ভয়ে রাজভক্তির কথা মুখে বলিলেও তাহার হৃদয়ে সে ভাব থাকে না এবং থাকা সম্ভবও নহে। প্রজারঞ্জন ও রাজভক্তি দুইটী আপেক্ষিক সত্য। একটীকে ছাড়িয়া আর একটীর অস্তিত্ব সম্ভব নহে। এ সম্বন্ধে কিন্তু একটী অতি ভ্রান্ত ধারণা সর্ব্বত্রই প্রচলিত আছে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষে এবং বর্ত্তমান সময়ে সকলের মধ্যে না হইলেও অনেকেরই মধ্যে। ধারণা আছে যে, রাজা প্রজারঞ্জকই হউন অথবা প্রজাবঞ্চকই হউন, রাজভক্তি তাঁহার অবশ্যই প্রাপ্য। ওটা তাঁহার মৌরুষিপাট্টা। কুশাসনের ফলে প্রজা যদি অনাহারে প্রাণ বিসর্জ্জনও করে, তবুও রাজভক্তি তাহার দেয়। ইহা অপেক্ষা ভ্রান্ত ধারণা আর কিছুই হইতে পারে না। কেন না, প্রজারঞ্জনে প্রজার যতটা দাবী, রাজভক্তিতে রাজার দাবী তাহার শতাংশের একাংশও নহে। কেন না, রাজা প্রজা-প্রদত্ত শক্তিতে শক্তিমান, সে শক্তি তিনি যদি সুপথে পরিচালিত করেন, তবে কৃতকার্য্যতার জন্য—কর্ত্তব্যনিষ্ঠার জন্য—পুরস্কার প্রত্যাশা করিতে পারেন, কিন্তু দাবী করিতে পারেন না। কিন্তু প্রজা স্বকার্য্য সাধনের জন্য একজনকে যে শক্তি প্রদান করিয়াছে, তাহার সফলতা দাবী করিবার অধিকার তাহার রহিয়াছে। রাজা যদি সে কার্য্য সাধনে অক্ষম হয়েন, তবে রাজার হস্ত হইতে প্রদত্ত ক্ষমতা পুনর্গ্রহণে প্রজা সম্পূর্ণ অধিকারী। সেই জন্যই বলিয়াছি, প্রজারঞ্জনের উপর প্রজার যে দাবী, রাজভক্তির উপর রাজার সে দাবী নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, স্বাধীনতা মানবের একটী স্বাভাবিক অধিকার, ইহার উপর হস্তক্ষেপ করিবার কাহারও অধিকার নাই। মানব কেবল স্বীয় ব্যক্তিত্বের পূর্ণ স্ফূর্ত্তির জন্যে নিজে নিজে এই স্বাধীনতা খর্ব্ব করিতে সমর্থ। বাহিরের কোন শক্তির ইহা খর্ব্ব করিবার অধিকার নাই। যে অবস্থায় বাহিরের কোন শক্তি আমার ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করে, তাহা মানবাত্মার পক্ষে অতি অস্বাভাবিক অবস্থা। এমন কি, যে ঈশ্বর বাহির হইতে আমার ভক্তির দাবী করেন, সে ঈশ্বরও অত্যাচারী কুষ জার মাত্র। তাই বলিতেছিলাম, মানব কেবল নিজেই নিজের স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করিতে পারে এবং যে ক্ষমতার নিকট সে অবনত হইবে, সে ক্ষমতা তাহার আমিত্বের বহিপ্রকাশ হওয়া চাই। অর্থাৎ যে ক্ষমতা আমার নিকট হইতে আসে নাই, সে ক্ষমতার নিকটে আমার

অবনত হওয়াটা আমার পক্ষে অ অপঘাত মাত্র। সুতরাং যে রাজার ক্ষমতা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমার নিকট হইতে প্রাপ্ত নয়, অর্থাৎ যে রাজাকে আমি নিযুক্ত করি নাই, অথবা পূর্ব্ব পুরুষগণের যে নিয়োগ আমার বলিয়া আমি গ্রহণ করি নাই, সে রাজার আমার উপর রাজভক্তির কোনই দাবী নাই। যে রাজশক্তিকে নিয়মিত করিবার আমার কোনও হাত নাই, যে শাসন প্রণালীর গঠনে বা পরিবর্ত্তনে আমার কোনও মতামত নাই, যে বিধি ব্যবস্থার পোষাক আমাকে পরাইয়া দেওয়া হয়, অথচ আমার শরীরের মাপ নেওয়া হয় না, তাহা বাহিরের বস্তু, তাহার হস্তে আত্মসমর্পণ আত্মার সম্প্রসারণ নহে, আত্মহত্যা মাত্র। আমার মঙ্গলেই যাহার মঙ্গল এবং আমার মঙ্গলসাধনে যাহার ক্ষমতা নিয়োজিত, কেবল তাহারই হস্তে আমি আত্মসমর্পণ করিতে পারি। অর্থাৎ যিনি আমার অন্তর্নিহিত মঙ্গল আদর্শের বাহ্য প্রকাশ, তিনিই আমার একমাত্র পূর্ণ ভক্তি ও বিশ্বাসের পাত্র। একমাত্র তাঁহাতেই আমি আত্মসমর্পণ করিতে পারি। আমার আত্মার আত্মা পরমাত্মা যিনি, কেবল তাঁহাতেই এই আত্মসমর্পণ সম্ভব। কেননা, তিনি সর্ব্বশক্তিমান ও পূর্ণ মঙ্গলময়। কেবল তাঁহার সম্বন্ধেই আমার এই পূর্ণ বিশ্বাস আসিতে পারে যে, তিনি আমার পূর্ণ মঙ্গল সাধনে সক্ষম। আর যা কিছু মানবীয় শক্তি, ব্যক্তি বিশেষই হউক বা মণ্ডলী বিশেষই হউক, তাহার উপর এই পূর্ণ নির্ভর চলে না; কেন না, তাহা ভুলভ্রান্তির অধীন ও তাহার শক্তি পরিমিত। সুতরাং যে রাজশক্তির পরিচালনে—নিয়োগ ও পরিবর্ত্তনে আমার অপ্রতিহত কর্ত্তৃত্ব নাই, তাহার নিকট আত্মসমর্পণ একেবারেই অসম্ভব। মানব স্বীয় স্বাভাবিক অধিকারগুলিকে একেবারে ধ্বংস না করিয়া এরূপ করিতে পারে না। স্থূলতঃ বলিতে গেলে, যে রাজশক্তি প্রজাশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, তাহার সঙ্গে প্রজার কোন বাধ্য বাধকতা নাই। যে মানব অবহেলায় আপনার প্রকৃতিদত্ত অধিকার হারায়, সে যে কেবল ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহা নহে, সে দানের অপব্যবহারের জন্য ঈশ্বরের নিকটেও ঘোর অপরাধী হয়। ভারতবাসী এই তত্ত্ব বিশেষ ভাবেই অবগত ছিলেন। ভারতের প্রজার ইহা অবিদিত ছিল না যে, রাজা তাহার শক্তিতেই শক্তিমান্, প্রজার শক্তিই রাজার একমাত্র শক্তি। এই তত্ত্ব বুঝাইবার জন্যই ভারতে দাবা * খেলার সৃষ্টি হইয়াছিল। ইংলণ্ড বা ফ্রান্স একবার মাত্র রাজমস্তক ভূলুণ্ঠিত করিয়া জগতে প্রজা শক্তির মহিমা ঘোষণা করিয়াছে, কিন্তু ভারতের প্রজা রাজার অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া, একবার নয় দুবার নয়, কুঠারাঘাতে "নিঃক্ষত্রিয় কৈল ধরা তিন সপ্তবার।" ভারতের প্রজার নিকট রাজার রাজ্য করিবার দাবী প্রজারঞ্জনের উপর প্রতিষ্ঠিত। সে অন্য দাবী মানে না। আইন কানুন শাস্ত্র ঘাটিবার তাহার প্রয়োজন নাই। যিনিই কেন রাজা হন না, আয়ের ষষ্ঠভাগ দিতেই হইবে। এই ষষ্ঠভাগ লইয়া যদি তিনি সন্তুষ্ট হন্, প্রজার ধনমানের উপর যদি হস্তক্ষেপ না করেন, তবে তিনিই রাজা, তা তিনি যে রূপেই

* To admonish kings that they are strong only in the strength of their subjects, the Indians invented the game of chess." Gibbon.

রাজ্য লাভ করিয়া থাকুন না কেন। রাজার যে রাজ্য করিবার দাবীটা ঐশী নয়, প্রাচীন বংশ গৌরবরূপ কুসংস্কারের হস্তে ন্যস্ত নয়, তাহা ভারতীয় প্রজা বিশেষ ভাবেই অনুভব করিয়াছিল। এখনও ইউরোপে এ জ্ঞান বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয় নাই। এখনও স্থানে স্থানে প্রাচীন বর্ব্বরতা ও কুসংস্কারের পূর্ণ প্রতাপ রহিয়াছে, যাহার বলে রাজার হস্ত হইতে সমস্ত ক্ষমতা প্রজার প্রতিনিধিদিগের হস্তে চলিয়া গেলেও একটা রাজার পুতুল স্থাপন করিয়া পূজা করা হইতেছে। জগতের পার্লামেণ্ট সকলের জননী ব্রিটিশ পার্লামেণ্টও রাজা পরিবর্ত্তন করিতে যাইয়া কত সময় কাগজ পত্র ঘাটিয়া মরিয়াছেন, যেন একজন ইতিপূর্ব্বে—রাজা ছিলেন বলিয়া তাহার বংশেরই রাজা হইবার একটা দাবী জন্মিয়া গিয়াছে। অত্যাচারীকে রাজ্যচ্যুত করিয়া প্রজাগণ যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকেই তৎস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে, সে জন্য প্রজাশক্তির উপর কোনও চাপ থাকিতে পারেনা। কার্য্যের সুবিধার জন্য কোন নিয়ম থাকা অন্যায় নহে, কিন্তু একথা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, "The Sabbeth was made for man, and not man for the Sabbeth & the son of man is Lord also of the Sabbeth."

ব্রাহ্মণের পুত্রের পক্ষে ব্রাহ্মণত্বের দাবী যদি কুসংস্কার-মূলক হয়, তবে রাজপুত্রের দাবীটা তাহা অপেক্ষা শতগুণে বেশী কুসংস্কার-মূলক। দেশে রাজপুত্র অপেক্ষা সহস্রগুণে জ্ঞানী ধার্ম্মিক নিঃস্বার্থ বুদ্ধিমান, অভিজ্ঞ ও কর্ম্মঠ লোক থাকিতে রাজার পুত্র বলিয়া উঁহাকেই রাজা বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য হওয়ার ন্যায়, প্রজাশক্তির অধিকতর অবমাননাকর আর কিছুই হইতে পারে না। বাস্তবিক রাজত্বের দাবী কেবল প্রজারঞ্জনের উপরই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। তাই, যখন কংস স্বীয় পিতা উগ্রসেনকে রাজ্যচ্যুত করিয়া মথুরার সিংহাসন দখল করিলেন, তখন প্রজাগণ কিছুই বলে নাই। ও ঘরাও কথায় তাহাদের মন দিবার প্রয়োজন কি? কিন্তু কংস যখন অত্যাচারী হইলেন, প্রজার ধন মান প্রাণ আর নিরাপদ রহিল না—কংস যখন প্রজারঞ্জনে অক্ষম হইলেন, তখনই প্রজার বিচার করিবার সময় আসিল। রাজ্যময় ষড়যন্ত্র আরম্ভ হইল, দেশের গণ্যমান্য লোক তাহাতে যোগ দিলেন এবং কংসরাজের রাজত্বের অবসান হইল। সহস্র সহস্র প্রজা-বেষ্টিত হইয়া কংসরাজ ক্রীড়া দর্শন করিতেছিলেন, এমন সময়, তাঁহার মস্তক দেহচ্যুত হইয়া ভূমি স্পর্শ করিল, ষড়যন্ত্র সার্থক হইল। প্রজাগণ তাহা দেখিল, এবং দেখিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। কেহ উচ্চবাচ্য করিল না।

ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ, সুতরাং তাঁহার রাজ্যে অধিকার ছিল না। সেই জন্যই পাণ্ডুর জন্ম প্রয়োজনীয় হইয়াছিল। এ সব আইন কানুনের কথা। কিন্তু প্রজার বিচার অন্যরূপ। পাণ্ডবগণের পক্ষে আইনের জোর যতই থাকুক না কেন, তাঁহারা চির-নির্ব্বাসিত। প্রজার সঙ্গে তাঁহাদের সম্বন্ধ বড়ই কম। অন্ধের পুত্র দুর্য্যোধনের হস্তেই রাজ্যভার। শাস্ত্রের আইন, যাহাই হউক, প্রজার আইনে যিনি প্রজারঞ্জক তিনিই রাজা। দুর্য্যোধন ভ্রাতৃবঞ্চক হইলেও প্রজা পীড়ক ছিলেন না। যদিও মহাভারতের পাঠক মাত্রেই যুধিষ্ঠিরের পক্ষপাতী, মহাভারতের প্রজা কিন্তু দুর্য্যোধনের পক্ষ

সমর্থন করিয়াছে। দুর্য্যোধন প্রজারঞ্জনের দ্বারা রাজ্যের উপর স্বীয় দাবী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, যুধিষ্ঠিরের আইনের দাবী, প্রজা স্বীকার করিল না। প্রজারা হয়তো ভাবিয়াছিল, রাজা ধার্ম্মিক হইলেই যে প্রজা-রঞ্জনকারী হইবেন, তাহার নিশ্চয়তা কি? বরং নিত্য নূতন রাজসূয় অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করিয়া প্রজার অর্থ শোষণ করিবেন। প্রজারা হয় তো "যোঞ্রবানি পরিত্যজ্য" ইত্যাদি নীতির অনুসরণ করাই নিরাপদ মনে করিল। পাণ্ডব তাহা বুঝিয়াই আপোষের প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু প্রজাবলে বলীয়ান্ দুর্য্যোধন দৃঢ়ভাবে বলিলেন, "বিনাযুদ্ধে নাহি দিব সূচাগ্র মেদিনী।" যুদ্ধ বাধিল। বিরাট পাঞ্চাল একত্রিত হইয়াও ৭ অক্ষৌহিণীর বেশী হইল না, কিন্তু ১১শ অক্ষৌহিণী প্রজা দুর্য্যোধনের পতাকার নিম্নে দণ্ডায়মান হইল। রাজ্যের সমস্ত পুরুষ দুর্য্যোধনের জন্য প্রাণ দিতে আসিলে যুধিষ্ঠির কত নরক ভয় দেখাইলেন, কত স্বর্গের প্রলোভন দেখাইলেন, একজনের বেশী কেহ বিচলিত হইল না। সকলে দুর্য্যোধনের জন্য প্রাণ দিল। তারপর মৃত্যুর প্রাক্কালে বিদ্রুপের হাসি হাসিয়া দুর্য্যোধন প্রতিপক্ষকে বলিয়া গেলেন "বিধবা লইয়া রাজ্য কর যুধিষ্ঠির"। আর দৃষ্টান্ত বাড়াইবার প্রয়োজন নাই। যাঁহারা বেণ রাজার উপাখ্যান পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে ভারতের প্রজা চিরদিন অত্যাচারী রাজার প্রতি কিরূপ ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছে।

বাস্তবিক সর্ব্বত্রই প্রজার মনের ভাব এই যে, যিনি প্রজা রঞ্জক, তিনিই রাজা। মুখে এ কথা প্রকাশিত হউক, আর না হউক, কার্য্যে সর্ব্বদাই একথা প্রমাণিত হয়। এমন কি, রাজার অত্যাচার সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া এমন যে শান্তশিষ্ট সহিষ্ণু ভারবাহী বলীবর্দ্ধ রুষিয়া, সেও আজ সিং নাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। ভারতবর্ষের তো কথাই নাই। এখানকার প্রজা, রাজা দেশীকি বিদেশী, তাহাও ভাবিয়া দেখে না। যিনিই রাজা হউন, প্রজারঞ্জক হইলেই হইল,—প্রজার সুখ স্বার্থের ব্যবস্থা হইলেই হইল। বর্ত্তমান সময়ে যে দেশে অসন্তোষের প্রাবল্য দেখা যাইতেছে, তাহার কারণ—রাজা প্রজারঞ্জন করিতে পারিতেছেন না; রাজা বিদেশী বলিয়া তত নহে। বণিকরাজ নিজ সুখ স্বার্থ লইয়া এত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন যে, প্রজার সুখ স্বার্থের প্রতি কিছুই মনোযোগ দিতে পারিতেছেন না। সুতরাং আইনের উপর আইন করিলে কি হইবে, ভয় দেখাইয়া রাজভক্তি আদায় করিতে চেষ্টা করিলে কি হইবে, বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতবাসীর পক্ষে রাজভক্তি অসম্ভব। রাজভক্তির প্রথম প্রতিবন্ধক এই যে, শাসন প্রণালীর উপর প্রজার কোনই হাত নাই। দেশের বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ বিদেশী রাজপুরুষ প্রজার ন্যায্য দাবী পদদলিত করিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিতেছেন,—"We are to dictate the principles of administration" সুতরাং প্রজারা কে? তাহারা hewers of wood & drawers of water. এরূপ রাজশক্তির প্রতি প্রজার ভক্তি নিতান্তই অস্বাভাবিক। তাই দেশ চায় আমূল পরিবর্ত্তন। তাই দেশে এত অসন্তোষ ও আন্দোলন। রাজভক্তির অর্থ যদি এই হয় যে, প্রতিষ্ঠিত শাসন প্রণালীকে গ্রহণ ও তাহার স্থিতি কামনা, তবে ভারত কখনও রাজভক্ত হইতে পারে না, কেন না, কোন মানুষের পক্ষে বিদেশীয় শাসনের প্রতি এইরূপ আনুরক্তি সম্ভব নহে। স্বদেশ-প্রীতি

রূপ বস্তুটীর বিনাশ ব্যতীত এরূপ হইতেই পারে না। তবে যদি রাজভক্তি অর্থ—প্রতিষ্ঠিত আইনের প্রতি অনুরাগ হয়, তবে ভারতবাসী নিশ্চয়ই রাজভক্ত—অত্যধিক মাত্রায় রাজভক্ত। যে দেশের ভদ্রলোক আফিসে সাহেবের কাণমলা খাইয়া আদালতে দৌড়ায় ও স্বাস্থ্যকর কর্ণ-বিমর্দ্দন কার্য্যের অবসর দেয়, সে দেশ যে আইনভক্ত, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। এই আইন-নিষ্ঠা কোন কোন ক্ষেত্রে কিয়ৎ পরিমাণে কমিলে দেশের প্রভূত মঙ্গল হইতে পারে। যে ক্ষেত্রে ইংরেজ ও ভারতবাসীর ব্যক্তিগত কলহ, সে ক্ষেত্রে এই আদালত-প্রীতি না কমিলে ভারতবাসীর কল্যাণ নাই। আমরা ভুলিয়া যাই যে, ইংরেজ বণিক জাতি, যে যা দেয়, তাহা সাড়ে ষোল আনা ফিরিয়া না পাইলে কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতে পারে না; চপেটাঘাতের পরিবর্ত্তে পদাঘাত না পাইলে সে কখনও হৃষ্টমনে গৃহে ফিরে না। ইংরাজ মার খাইয়া কখনও আদালতে যায় না। সে কখনও দেশীয়ের হাতে মার খায় না, তাহা নহে, কিন্তু আদালতে যাওয়াটা তাহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। যদিই বা যায়, তাহা আসামী রূপে, ফরিয়াদী রূপে নহে। সে একঘুষি খাইয়া দুঘুষি দেয়, না হয় আদালতে ৩্ টাকা জরিমানা দিবে। ইংরেজকে দুটা ঘুষি মারিলে ফাঁসী হয় না। সুতরাং ঘুষি খাইয়া ঘুষি ফিরাইয়া দিলে সেখানেই ল্যাঠা চুকিয়া যায়। আদালত-কেলেঙ্কারিতে পড়িতে হয় না। ইংরেজ ফরিয়াদী হয় না, ভারতবাসী যদি প্রতিজ্ঞা করে যে, বরং আসামী হইব তবু ফরিয়াদী হইব না, তবে নিশ্চয়ই এরূপ একটা মোকদ্দমাও আদালতে যাইবে না। একবার একজন কাবুলীকে কে মারপিট্ করে। সে আদালতের আশ্রয় লয়। বিচারে আসামীর ৫্ টাকা মাত্র জরিমানা হয়, তাহা দেখিয়া কাবুলী আদালতের মধ্যেই ১০্ টাকার একখানা নোট রাখিয়া দিয়া আসামীকে দ্বিগুণ প্রহার করে। আমরা যদি ঐ কাবুলীর যুক্তি অনুসরণ করিয়া আদালতের বাহিরেই এই সকল ঘটনার নিষ্পত্তি করি, তবে নিশ্চয়ই অধিকাংশ সাহেবের বুটের খরচ কমিবে, আমাদেরও জীর্ণ প্লীহা নিরাপদ হইবে। ইহাতে যে ভারতবাসীর রাজভক্তি তিলমাত্রও কমিবে, আমাদের এরূপ বিশ্বাস আদৌ নাই। নহিলে রাজভক্ত প্রজা হইয়া কখনও একথা বলিতাম না।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

উপনিষৎ গ্রন্থাবলী।

[ক্রমে প্রধান প্রধান উপনিষৎ সকল পয়ারাদি চির-প্রচলিত ছন্দে সহজ ভাষায় অনুবাদিত হইলে বঙ্গবাসীর প্রভূত উপকার সাধিত হয়, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া উপনিষৎ গ্রন্থাবলী নাম দিয়া প্রশ্নোপনিষদের মর্ম্মানুবাদ প্রকাশ করিলাম। অন্যান্য উপনিষৎ যথাকালে প্রকাশিত হইবে।]

প্রশ্ন।

তৃতীয় প্রশ্ন।

কৌসল্য অশ্বল-সুত জিজ্ঞাসে ঋষেরে ;—
"কোথা হৈতে জাত প্রাণ ? জীবের শরীরে
কিরূপে আসিয়া প্রাণ হৈলা অধিষ্ঠান ?

কিরূপে বিভক্ত তিনি? কহ মতিমান।
কেমনে শরীর হ'তে বহির্গত হ'ন?
অন্তর বাহির কিসে করেন ধারণ?"
ঋষি কহিলেন, "এ প্রশ্ন কঠিন,
জিজ্ঞাসিছ তুমি যাহা;
তুমি ব্রহ্মনিষ্ঠ, সেই হেতু তোমা,
কহিছি শুনহ তাহা।
সম্রাট যেমন ভৃত্য সকলে
করেন আজ্ঞাদান;
'করহ শাসন, এই এই গ্রাম,
এই এই সব স্থান।'
প্রাণ সেই মত অন্য অন্য প্রাণে
এ দেহ শাসন তরে,
করেন আদেশ; ভিন্ন ভিন্ন স্থানে
তা'ই তা'রা করে।
গুহ্যে উপস্থে অপানের স্থান,
চক্ষু কর্ণে প্রাণ নিজে,
মধ্য প্রদেশে আছেন সমান †
নিযুক্ত আপন কাজে।
জঠর অনলে আহুত অন্ন
বিতরি সর্ব্ব দেহে,
প্রাণই করেন দেহের পোষণ;
সপ্ত দীপ্তি ‡ তাঁরে কহে।
হৃদয়ে আত্মা করেন বসতি,
হৃদয়ে তাঁহার স্থান;
এক শত এক নাড়ী বহে তথা;
কর, বৎস, অবধান।
প্রতি নাড়ী হ'তে বহে এক শত
শাখা নাড়ী দেহ মাঝ;
প্রতি শাখে, নাড়ী বাহাত্তর* হাজার,
বাহিরি সাধিছে কাজ।
তা' সবার মাঝে সঞ্চারিছে ব্যান,
ব্যাপিয়া সর্ব্ব দেহ;
সব কার্য্যে সবে প্রাণ-ই যোজনা
করিছে, বুঝেনা কেহ।
উর্দ্ধগামী এক নাড়ীর † সংযোগে
উঠিছে উর্দ্ধে উদান,
পুণ্য কর্ম্মবশে পুণ্যলোকে জীবে
করিতেছে স্থানদান।
পাপ-কর্ম্ম হেতু পাপ-লোকে সবে
পাঠাইছে অনুক্ষণ,
দ্বিবিধ ‡ কর্ম্মেতে এ মানব লোকে
করিছে জীবে প্রেরণ।
তেজ-ই উদান; সেই তেজক্ষয়ে,
ইন্দ্রিয় প্রবেশে দেহে,
দেহ ত্যাগ করি তখনইত জীব
অপর শরীর গ্রহে।
মরণ সময়ে জীবের চিত্ত
যেমন যাহার রয়;
সেইরূপ চিত্ত সহ সেই জীব
প্রাণেরে প্রাপ্ত হয়।
উদান বায়ুতে যুক্ত হয়ে প্রাণ
পাপ পুণ্য কর্ম্ম মত,
লয়ে যা'ন জীবে যথাযোগ্য লোকে,
বুঝ চিত্তে সংযত।
এইরূপে প্রাণে বুঝেন যে জন
তিনিই জ্ঞানী সুমতি;
উৎপত্তি প্রাণের, আর আগমন
প্রাণের বিভুত্ব স্থিতি;

† প্রাণ অপান সমান ব্যান উদান এই পঞ্চ বায়ুর স্থান যথাক্রমে নির্দ্দেশ করিতেছেন।

‡ দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, দুই নাসিকা ছিদ্র এবং মুখ এই সপ্ত স্থানের ক্রিয়া প্রবর্ত্তক প্রাণ।

* ৭২ বাহাত্তর।

† সুষুম্না।

‡ পাপ পুণ্য উভয় প্রকার।

প্রাণের অধ্যাত্ম, সুনিগূঢ় তত্ত্ব
বুঝেন জগতে যিনি,
এই পঞ্চ জ্ঞানে, যিনি অধিকারী
তিনিই অমৃত জ্ঞানী।
তিনিই অমৃত জ্ঞানী।
ওঁ হরি ওঁ।
ইতি তৃতীয় প্রশ্ন।

চতুর্থ প্রশ্ন।

জিজ্ঞাসিলা ঋষিবরে গার্গ্য সৌর্য্যসুত।
"সুপ্ত কেবা এই দেহে? কে রহে জাগ্রত?
কে দেখেন স্বপ্ন? সুখ ভোগে কোন জন?
কাহার আশ্রয়ে জীব প্রতিষ্ঠিত হ'ন?"
উত্তর। সায়ন্থে তপনে * রশ্মি সকল,
হয় যথা একত্রিত,
পূর্ব্ব গগনে, উদয়ের কালে
পুনঃ হয় বিস্তৃত;
ইন্দ্রিয় বিষয় সেই মত হয়
সুপ্তিতে একত্র মনে,
শ্রবণ দর্শন ঘ্রাণ গ্রহণ
নাহি রহে সেই ক্ষণে।
নাহি রহে স্পর্শ নাহি রহে স্বাদ
না রহে অভিবাদন,
না রহে আনন্দ নাহি রহে ত্যাগ,
না রহে গতি গমন॥
তখন সকলে, সেই অবস্থারে
সুপ্ত বলিয়া কহে;
ইন্দ্রিয়, বিষয়, মনেতে উভয়
একীভূত হ'য়ে রহে।
তখন কেবল প্রাণ, অপান
সমান ব্যান উদান,
এই পঞ্চ বায়ু দেহের মাঝারে,
জাগ্রত হইয়া র'ন।

* অস্তগত সূর্য্যে।

এই পঞ্চ বায়ু পঞ্চ অগ্নি সম
যজমান সম মন;
ফল ভোগী তিনি † তাই প্রতি দিন
ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত হন।‡
ইন্দ্রিয় ভ্রান্ত হইলে শান্ত,
সুপ্তি সময় যবে,
বিচিত্র বিষয় মহিমা নিচয়,
অনুভব করে তবে।
পূর্ব্বে যে সব হ'য়েছে দৃষ্ট
আবার দেখিছে তাই,
শ্রুত অনুভূত নানা দিক্‌দেশে
শুনিছে বুঝিছে তাই।
অথবা যে সব কভু অনুভব
করেনি, ¶ দেখেনি * মন,
দেখেনি শুনেনি, আছে কিবা নাই,
সকলি করে দর্শন।
সর্ব্বরূপ হ'য়ে, সকলি করে দর্শন।
মন যবে হন তেজে অভিভূত
গভীর সুষুপ্তি কালে;
নাহিক স্বপ্ন, আনন্দ কেবল,
অনুভব সেই স্থলে।
বিহঙ্গ যেমন সায়াহ্ন সময়ে
বাস বৃক্ষে পশে আসি,
সুষুপ্তি সময়ে সমস্তই রহে
পরমাত্মা মাঝে পশি।
ধরা জল তেজ, বায়ু ও আকাশ
সূক্ষ্ম তন্মাত্ররূপে,
সুষুপ্তি সময়ে পরমাত্মা মাঝে
প্রবেশে বীজ স্বরূপে।
বিপঞ্চ $ ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়-বিষয়;
মন, বুদ্ধি অহংকার,

† মন। ‡ প্রত্যহ সুষুপ্তি সময়ে।
¶ করে নাই। * দেখে নাই।
$ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, বাক্, পাণি, পায়ু, পদ উপস্থ।

চিত্ত, তেজঃ প্রাণ, কিম্বা গ্রহণীয়
যত এ ষড় সম্ভার ;—
সুষুপ্তি সময়ে সমস্ত সমস্ত
পরমাত্মা মাঝে পশে ;
পরমাত্মা ভিন্ন, নাহি রহে অন্য
তাহে আসি সব মিশে।
এই যে দ্রষ্টা, এই যে শ্রোতা,
এই ঘ্রাতা. রসিয়াতা,
বোদ্ধা মন্তা কর্ত্তা, বিজ্ঞান আত্মা,
জাগ্রত পুরুষ জ্ঞাতা ;—
প্রবেশে তখন অক্ষর মাঝে
অক্ষর পরম গতি,
তিনি ছায়া হীন, অশরীর তিনি,
নির্গুণ চরম স্থিতি।
যে জন তাঁহারে, জানেন এ ভাবে
সর্ব্ব রূপ সর্ব্ব জ্ঞানী,
তিনিই ব্রহ্ম তিনিই ব্রহ্ম
নিষ্কল নিরভিমানী।
তিনি নিষ্কল নিরভিমানী ॥
ওঁ হরি ওঁ।
ইতি চতুর্থ প্রশ্ন।

পঞ্চম প্রশ্ন।

সত্যকাম। ওঁকার যাঁহারা করেন ধ্যান,
কোন্ লোকে হয় তাঁহাদের স্থান ?
পিপ্পলাদ ঋষি। ওঁকার ব্রহ্ম, পর অপর।
ধ্যানে জ্ঞানী লভে অন্যতর।*
অ-উ-ম, এই ত্রিমাত্র ওঁকার।
অকার মাত্র সাধনা যাঁহার,
তিনি শীঘ্রগতি সেই জ্ঞান বলে
লভেন জন্ম এই ধরাতলে।
ঋক্ মন্ত্র তাঁরে আনে [illegible]য়,
হেথা ব্রহ্মচর্য্য, শ্রদ্ধা, তপস্যায়
পরম মহিমা হয় অনুভব ;—
এক-মাত্র ধ্যানে ধরায় উদ্ভব।
অন্তরীক্ষে জন্ম দ্বিমাত্র ধ্যানে,
যজুর্ম্মন্ত্রে তাঁরে সোমলোকে আনে।
তথায় বিভূতি করি অনুভব,
আবর্ত্তে ধরায় আবার উদ্ভব।
ত্রিমাত্র ওঁকার করিলে ধ্যান
তেজোময় সূর্য্যলোকেতে স্থান।
ভুজঙ্গ যেমন তেয়াগে চর্ম্ম,
তেমতি ত্যজিয়া পাপ-কর্ম্ম,
ত্রিমাত্র সাধনে, সাম-মন্ত্র বলে,
লভে ব্রহ্মলোক, কালপূর্ণ হ'লে।
তখন বিলীন হয়ে জীব-ঘনে †
হেরে পরাৎপরে পুণ্য নয়নে,
যিনি সর্ব্বগত হিরণ্যগর্ভ,
যিনি আদি অন্ত যিনিই সর্ব্ব।
ত্রিমাত্র ওঁকার, একের সাধনে,
ব্রহ্ম দৃষ্টি নাহি হয় জীবগণে।
একের ধ্যানে মৃত্যুর ভয়
কভু অতিক্রম নাহিক হয়।
কিন্তু ক্রিয়াযোগে ত্রিমাত্র ওঁকার
সম্যক করিলে ধ্যান,
জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তির নাথ
সহ যুক্ত হয় প্রাণ ;
তাই জীব বিচলিত নাহি হয়,
অনন্ত পুরুষে জীবের লয়।
ঋক্ মন্ত্র বলে লভে ধরাতলে,
যজুর্ব্বলে অন্তরীক্ষ,
সাম-মন্ত্র বলে পাই' ব্রহ্ম লোক
জীবকুল লভে মোক্ষ।
ওঁকার ধ্যানে হইলে তন্ময়
লভে জীব অমৃত, অভয়,
অজর, অমর, শান্ত চিন্ময় ॥
ওঁ হরি ওঁ। ইতি পঞ্চম প্রশ্ন।

* পর এবং অপর ব্রহ্ম—এই দুইএর একতে লাভ করে।

† জীবের আধার আশ্রয়।

ষষ্ঠ প্রশ্ন।

ভারদ্বাজ ভক্তি ভরে জিজ্ঞাসিলা ঋষিবরে,
"ষোড়শ-কল ১পুরুষ কেবা, ভগবান ?
পারিনি ২ হিরণ্য-নাভে করিতে বর্ণন।
কুমার হিরণ্য নাভ, অহো! কিবা পরিতাপ,
কোশলের রাজপুত্র জিজ্ঞাসিলা মোরে,
"ষোড়শ-কল পুরুষ কে বিরাজ করে ?"
কুমারে কহিনু আমি, "এ তথ্য নাহিক জানি
জানিলে কয় না তোমা কিসের কারণ,
সমূলে বিশুষ্ক হয় মিথ্যাবাদী জন।"
মোর বাক্য শেষ হ'লে,কোনও কথা নাহি ব'লে,
রাজপুত্র চলি গেলা রথে আরোহিয়া ;
তা'ই, পিতঃ, আসিয়াছি, কহ বিবরিয়া।"
কহিলেন ঋষি, "হৃদয়-নিবাসী
পুরুষ ষোড়শ কল ;
এ ষোড়শ-কলা জনমে তাঁহাতে
তাঁহ'তে জাত সকল।
ভাবিলেন তিনি এ দেহ হইতে
কে উঠিলে উঠি আমি ?
কেবা প্রতিষ্ঠিত রহিলে এদেহে
প্রতিষ্ঠিত রহি আমি ?
ইহা করি ধ্যান সৃজিলেন প্রাণ,
শ্রদ্ধা, আকাশ, বায়ু ;
জ্যোতি, পৃথ্বীজল, ইন্দ্রিয় সকল
মন, অন্ন, বীর্য্য, আয়ুঃ।
অন্ন হ'তে বীর্য্য কর্ম্ম, মন্ত্র, তপঃ
সৃজিলেন লোক সব,
এমতে তাঁ'হতে মূর্ত্ত অমূর্ত্ত
সকলি হৈল উদ্ভব।
যেইমত নদী পশিলে সাগরে,
সাগরে মিশিয়া রয়,
নাম রূপ তার হ'য়ে যায় লোপ
ভেদচিহ্ন লুপ্ত হয়।
সেই মত, বৎস, এ ষোড়শ কলা
পুরুষে হইয়া লীন,
নাম রূপ সব হ'য়ে যায় লোপ,
হয় ভেদ-চিহ্ন-হীন।
পুরুষ তখন কলা-বিরহিত,
এক অমৃত হ'ন ;
যাঁ'হতে উদ্ভব তাঁহাতে বিলয়,
বুঝ তুমি বিচক্ষণ।
রথ নাভি মাঝে অর সব যথা
হ'য়ে থাকে সংলগ্ন ;
তেমতি যাঁহাতে বিশ্বচরাচর,
সকলি হইবে মগ্ন ;
জান, বুঝ তাঁরে, তাঁহারে বুঝিলে,
দূরে যায় মৃত্যু ভয়,
তিনি এক মাত্র নাহিক দ্বিতীয়,
জ্ঞাতা জ্ঞেয় সমুদয়।
তিনি জ্ঞাতা জ্ঞেয় সমুদয়॥
শুনি ভরদ্বাজ পূজিয়া ঋষিরে,
চরণে নমিলা শিরে,
কহিলা, "আপনি ব্রহ্মবিদ্যা খনি,
ব্রহ্ম বিদ্যা দিলা মোরে।
আপনিই পিতা, জ্ঞান-জন্মদাতা,
কোটি কোটি নমস্কার ;
আপনার পদে, ঋষিগণ পদে
কোটি কোটি নমস্কার।
করিতেছি কোটি কোটি নমস্কার॥"
ইতি ষষ্ঠ প্রশ্ন। *
ইতি প্রশ্নোপনিষৎ
সমাপ্ত।
ওঁ তৎসৎ ওঁ তৎসৎ॥

শ্রীশশধর রায়।

১ পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, অহংকার। ২ নাই।

* দ্বিতীয় প্রশ্নের ভ্রম সংশোধন।
"হরিবর্হ" স্থলে "হবিবর্হ" হইবে।
"যহাপ্রদ" স্থলে "যথাপ্রদ" হইবে।
"সেইরূপে" স্থলে "যেমরূপে" হইবে।
"মহাবাক্যে" স্থলে "বাহ্য বাক্যে" হইবে।
"ইহলোকে" শব্দের পর "আছে" যুক্ত হইবে।
"সেইরূপে" স্থলে "যেইরূপে" হইবে।

প্রাচীন ভারতের বাণিজ্য। (১০)

পাঠকগণ, আমরা বৌদ্ধকাল হইতে ভারতে মুসলমানাধিকারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সময়ের ভারতীয় বাণিজ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে একটী বিষয়ের অবতারণা অতীব প্রয়োজনীয় বোধ করি। বিষয়টী এই যে, ইতিহাস সামান্যতঃ আখ্যানময় ও বিজ্ঞানময়রূপে ভাগদ্বয়ে বিভক্ত হইয়া থাকে? যাহাতে বংশ-পরম্পরা, জীবনকাল, ঘটনা বিশেষ, যুদ্ধ-ঘটনা ও সভ্যতা-নিদান বাণিজ্য প্রভৃতি বিস্তৃতরূপে বর্ণিত থাকে, তাহাকে আখ্যানময় ইতিহাস বলে, এবং যাহাতে লোকচরিত, সমাজ-চিত্র, সামাজিক উন্নতি বা অবনতি প্রভৃতি বিশদরূপে বর্ণিত থাকে, তাহাকে বিজ্ঞানময় ইতিহাস কহে। প্রাচীন ভারতের বাণিজ্য-বিষয়ক বিজ্ঞানময় ইতিহাস ইতঃপূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। মহাভারতীয় কাল হইতে বাণিজ্য সম্বন্ধীয় আখ্যানময় ইতিহাস সম্পূর্ণ ভাবে না হইলেও, অসম্পূর্ণ ভাবে, উল্লিখিত হইতে পারে; কারণ, মহাভারতীয় কালের প্রধান নায়ক ধর্ম্মাবতার মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রাদুর্ভাব কালটী নির্ণীত হইলেই, তৎসাময়িক এবং তাঁহার পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী সময়ের বাণিজ্যকাল সমূহ সহজেই নির্দ্দিষ্ট হইতে পারিবে।

পূর্ব্বকালে আর্য্যগণ কোন ঘটনার সময় নির্দ্দেশ করিতে সচরাচর যুগাব্দ ব্যবহার করিতেন। এই যুগাব্দ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। কেহ বলেন যে, কোন খণ্ড প্রলয় বা পৃথিবীর আংশিক জলপ্লাবনকাল হইতে এই যুগাব্দ পরিগণিত হয়, আবার কেহ বলেন যে, রাজ্য বিপ্লবদ্বারা এবং সামাজিক রীতি, নীতি, আচার ও ব্যবহারের পরিবর্ত্তন দ্বারা যুগাব্দটী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বাস্তবিক, যাহারা মহাভারতাদি পাঠ করিয়া তৎকালের সামাজিক রীতি, নীতি, আচার ও ব্যবহারের সহিত তৎপরিবর্ত্তীকালের সামাজিক পরিবর্ত্তনাদি সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা বিলক্ষণ অবগত আছেন যে, উত্তরকালে মহাভারতীয়কালের শৌর্য্য বীর্য্য ও সামাজিক রীতি, নীতি, আচার ও ব্যবহারের এবং ধর্ম্মাদির পরিবর্ত্তন বিষয়ে যুগান্তর হইয়া গিয়াছে।

এই পরিবর্ত্তনটী বর্ত্তমানকাল হইতে ৫০০৫ বৎসর পূর্ব্বে সমাহিত হইয়া যুগান্তরে পর্য্যবসিত হয়, সুতরাং ঐকাল হইতেই কলিযুগাব্দ নামটী ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। যেমন পাশ্চাত্য খৃষ্টাব্দ বা যুগাব্দটী খ্রীষ্টাব্দ দ্বারা ব্যবচ্ছিন্ন হইয়াছে, তেমনি কল্যাব্দ বা কলিযুগাব্দটী এক সময়ে যুধিষ্টিরাব্দ দ্বারা ব্যবচ্ছিন্ন হইয়াছিল। এইরূপে যুধিষ্ঠিরাব্দও বিক্রমাদিত্যের সংবৎ দ্বারা বিলোপিত হইয়া গিয়াছে। যদি প্রতীচ্য বিদ্বদগণ-মানিত যুগাব্দটী খ্রীষ্টাব্দ দ্বারা ব্যবচ্ছিন্ন না হইত, তাহা হইলে এইক্ষণ খ্রীষ্টাব্দ ১৯০৪ না লিখিয়া খৃষ্টাব্দ বা যুগাব্দ ৫৯০৮ লিখিত হইত। বাইবেল শাস্ত্রানুসারে ৪০০০ বা ৪০০৪ খ্রীষ্টাব্দ পূর্ব্বে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু আমেরিকার নিউ অর্লিন্স নামক স্থানে যে এক অস্থিময় নরদেহ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বিশেষরূপে

পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছিলেন যে, উহা সপ্তপঞ্চাশৎসহস্র (৫৭০০০) বৎসরেরও বহু পূর্ব্বকালের নরদেহ-কঙ্কাল।

কাশ্মীর ইতিহাস রাজতরঙ্গিণীই সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডারে একমাত্র প্রমাণক আখ্যানময় হিন্দু ইতিহাস। ইহার প্রথম তরঙ্গে তৃতীয় পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে:—

"শতেষু ষট্‌সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে।
কলের্গতেষু বর্ষাণামভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ।"

কলির ৬৫৩ বৎসর গত হইলে কুরু পাণ্ডবেরা ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থে জ্যোতিঃশাস্ত্র-বিশারদ মহর্ষিগর্গের একটী বচন উদ্ধৃত হইয়াছে,—যথা:—

আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ
ষড়্‌দ্বিক-পঞ্চ-দ্বিযুতঃ শক-কালস্তস্য রাজ্যস্য।"

এই শ্লোকটীর প্রথমটীর পাদ-দ্বয়ের ব্যাখ্যা এই যে, মহর্ষিগর্গ জ্যোতিঃশাস্ত্রের সঙ্কেতানুসারে রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকাল বা জীবনকাল এবং শকাব্দারম্ভের কাল নির্দ্দেশার্থ বলিয়াছেন যে, রাজা যুধিষ্ঠির রাজ্য শাসন করিলে পর শকটাকার সপ্তর্ষি-মণ্ডল অর্থাৎ অগস্ত্যাদি মুনি নামধেয় সপ্ত নক্ষত্র মঘাদি নক্ষত্রে ছিল, অর্থাৎ মঘাগণের প্রত্যেক নক্ষত্রে এক এক শত বৎসর ও পূর্ব্বফল্গুনী হইতে উত্তরাষাঢ়া পর্য্যন্ত একাদশটী নক্ষত্রে এক এক শত বৎসর ভোগ করিতে ২৪০০ বৎসর গত হয়, অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরের রাজ্য কালের বা জীবনকালের পরে এবং শকাব্দারম্ভের পূর্ব্বে ২৪০০ বৎসর গত হইয়া যায়। আমরা রাত্রিকালে নভোমণ্ডলে কাল পুরুষ সংজ্ঞক অধোধঃ অবস্থিত যে তিনটী দেদীপ্যমান নক্ষত্র দেখিতে পাই, ঐ গুলিতে ক্ষুদ্রাকারে ত্রয়োদশটী নক্ষত্র বর্ত্তমান আছে, তাহাদিগকেই মঘাগণ বলিয়া থাকে। ঐ মঘা নক্ষত্রপুঞ্জের অনতিদূরেই শকটকার সপ্তর্ষি মণ্ডল দৃষ্ট হইয়া থাকে।

উক্ত শ্লোকটীর অপর পাদ-দ্বয়ের ব্যাখ্যা এইরূপ যে, যুধিষ্ঠিরের রাজা নাম প্রকাশের পর (যুধিষ্ঠিরের জন্ম হইতেই তাঁহার রাজা বলিয়া কথিত হইয়াছিল) ২৫২৬ বৎসর গত হইলে শকাব্দারম্ভ হইয়াছিল। রাজা যুধিষ্ঠিরের জন্মের পূর্ব্বগত ৬৫৩ বৎসরের সহিত তাঁহার জন্মের পরবর্ত্তী ২৫২৬ বৎসর যোগ করিলে কলিযুগের ৩১৭৯ বৎসর গত হইলে শকাব্দারম্ভ হইয়াছিল, ইহা জানা যায়। বর্ত্তমান শকাব্দ ১৮২৬ বৎসরের সহিত উক্ত ৩১৭৯ বৎসর যোগ করিয়া দেখিলে কলিযুগের ৫০০৫ বৎসর পাওয়া যায়। আমাদিগের দেশীয় পঞ্জিকায় কলিযুগের এই ৫০০৫ বৎসরই লিখিত আছে।

পূর্ব্বেই ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে যে, রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকাল বা জীবনকালের পরে ২৪০০ বৎসর অতীত হইলে শকাব্দারম্ভ হইয়াছিল, এবং তাঁহার জন্মকাল হইতে ২৫২৬ বৎসর গত হইলে ঐ শকাব্দারম্ভ হয়, তাহা হইলে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকাল অর্থাৎ তাঁহার জীবনকাল কত বৎসর, তাহা অনায়াসেই জানা যাইতে পারে; কারণ, উক্ত ২৫২৬ বৎসর হইতে ২৪০০ বৎসর বিয়োগ করিলে অবশিষ্ট যে ১২৬ বৎসর থাকে, তাহাই তাঁহার জীবন কাল। আমরা এস্থলে রাজা যুধিষ্ঠিরের জীবনগত কেবল মাত্র চারিটী সময়ের উল্লেখ করিব, অর্থাৎ তাঁহার জন্মকাল, রাজসূয় মহাযজ্ঞ কাল, কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধকাল এবং মহাপ্রস্থান কালগুলি মাত্র উল্লিখিত হইবে।

(১) কোন সময় মহারাজ পাণ্ডু, কুন্তী

ও মাদ্রী নাম্নী মহিষী-দ্বয় সমভিব্যাহারে হিমালয়ের প্রত্যন্ত পর্ব্বতস্থ কোন রমণীয় অরণ্যে মুনিগণ সমাবৃত হইয়া বাস করিতেছিলেন। ঐ কালে জ্যেষ্ঠা মহিষী কুন্তী গর্ভবতী হন্। পরে কার্ত্তিক মাসের ১৬ই তারিখ, সোমবার, ধনুরাশি, শুক্লাপঞ্চমী তিথি, বেলা দ্বিতীয় প্রহরের সময় কুন্তীদেবী প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যশ্লোক যুধিষ্ঠিরকে প্রসব করেন * (কল্যাব্দ ৬৫৩, ২৫২৬ শকাব্দপূঃ, ২৩৯১ সংবৎ পূঃ, ২৪৪৮ খ্রীঃ পূঃ)।

ক্রমে কুন্তীর গর্ভে ভীম, তৎপরে অর্জ্জুন এবং মাদ্রীর গর্ভে নকুল ও সহদেব যুগপৎ জন্ম গ্রহণ করেন। ইহারা সকলেই এক এক বৎসর পরে ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন †। কথিত আছে, যে দিন মহাবল ভীমসেন মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হন্, সেই দিবসেই দেবী গান্ধারী দুর্য্যোধনকে প্রসব করেন। ‡

(২) রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ সহ এক বৎসর দ্রুপদ ভবনে মহাসুখে বাস করিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে মাতৃ সমভিব্যাহারে হস্তিনায় প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা বৃদ্ধ নরপতি ধৃতরাষ্ট্রের অধীনে থাকিয়া বাহুবল দ্বারা অন্যান্য নৃপতিবর্গকে বশীভূত করিয়া বহুকাল যাবৎ তথায় বাস করেন ¶।

পরে রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ সহ দুর্য্যোধন-বশবর্ত্তী জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞানুসারে ইন্দ্রপ্রস্থে (পুরাতন দিল্লী) রাজধানী স্থাপন করত তাঁহার বয়সের ৭৪ বৎসর পর্য্যন্ত খাণ্ডব প্রস্থাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য শাসন করিয়া পরিশেষে সম্রাট হইবার মানসে রাজসূয় নামক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন*। তাহা হইলে কলির ৭২৭ বৎসর গতে, ২৪৫২ শকাব্দ পূঃ, ২৩১৭ সম্বৎ পূঃ এবং ২৩৭৪ খ্রীষ্টাব্দ পূর্ব্বে এই মহাযজ্ঞটী অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

(৩) অনন্তর মহারাজ যুধিষ্ঠির আহুত হইয়া হস্তিনায় সপরিবারে আগমন পূর্ব্বক দুষ্টমতি দুর্য্যোধনের সহিত অক্ষক্রীড়ায় পণে পরাজিত হইয়া দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃগণ সহ দ্বাদশ বর্ষ বনবাসে এবং এক বৎসর বিরাট নগরে অজ্ঞাতবাসে কাল যাপন করিয়াছিলেন। পরে চতুর্দ্দশ বর্ষে পঞ্চগ্রাম মাত্র পাইবার প্রার্থনা করিয়া দুর্য্যোধনের সহিত সন্ধির চেষ্টা বিফলিত হওয়ায় কুরুক্ষেত্র নামক স্থানে (বর্ত্তমান ত্রাণেশ্বর বা স্থানেশ্বর এবং তৎপ্রদেশীয় মরুদেশ) কুরুপাণ্ডবীয় মহাযুদ্ধ হইয়াছিল †। অতএব এই মহাযুদ্ধ কলির ৭৪২ বৎসর গতে, ২৪৩৭ শকাব্দ পূঃ, ২৩০২ সংবৎ পূঃ, এবং ২৩৫৯ খ্রীষ্টাব্দ পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল।

(৪) কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের পর মহারাজ [যু]ধিষ্ঠির কেবল মাত্র ৩৬ বৎসর সাম্রাজ্য

---

* ৬ শ্লোক—১২৩অঃ—আদিপর্ব্ব।

† অনুসম্বৎসরং জাতা অপিতে কুরুসত্তমাঃ।
পাণ্ডুপুত্রা ব্যরাজন্ত পঞ্চ সম্বৎসরাইব।
২১, ১২৪, আদি পর্ব্ব।

‡ যস্মিন্নহনি দুর্দ্ধর্ষো জজ্ঞে দুর্য্যোধনস্তদা।
তস্মিন্নেব মহাবাহুর্জজ্ঞে ভীমোপি বীর্য্যবান্।

¶ তেতত্র দ্রৌপদীঃ লব্ধা পরিসম্বৎসরোষিতাঃ।
বিদিতা হাস্তিনপুরং প্রত্যাজগ্মুররিন্দমাঃ।
৩০—৬১—আদিপর্ব্ব।

তত্রতেনাবসন্‌পার্থাঃ সম্বৎসরগণান্ বহূন্।
বশে শস্ত্র প্রতাপেন কুর্ব্বন্তোহন্যমহীভৃতঃ।
৩৪—৬১—আদিপর্ব্ব।

* ভুবনবৃত্তান্ত, ৪৮ পৃ।

† ততশ্চতুর্দ্দশেবর্ষে যাচমানাঃ স্বকং বসু।
নালভন্ত মহারাজ ততোযুদ্ধ মবর্ত্তত।
৫৪—৬১—আদিপর্ব্ব।

শাসন করিয়াছিলেন *। কালক্রমে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী ও বিদুর প্রভৃতি গুরুজন এবং প্রিয় সুহৃৎ কৃষ্ণ ও বলরাম প্রভৃতি বন্ধুগণ কলেবর পরিত্যাগ করিলে দায়াদ-বন্ধু-বান্ধব-বধ-জনিত শোক সন্তপ্তচিত্ত মহারাজ যুধিষ্ঠির নিঃসার নির্বীর ধরাতল ভোগ করিতে বীতস্পৃহ হইয়া মহাবীর অর্জ্জুনের পৌত্র অভিমন্যু-তনয় পরীক্ষিৎকে হস্তিনার সিংহাসনে স্থাপিত করিয়া ১২৬ বৎসর বয়সে হিমালয় প্রদেশে দারানুজগণ সমভিব্যাহারে মহা প্রস্থান করিয়াছিলেন। দেহত্যাগার্থ সঙ্কল্প করিয়া হিমালয়াদি প্রদেশে প্রস্থানের নাম মহাপ্রস্থান। কলির ৭৭৯ বৎসর গতে, ২৪০০ শকাব্দ পূঃ, ২২৬৫ সংবৎ পূঃ, এবং ২৩২২ খ্রীষ্টাব্দ পূর্ব্বে এই প্রস্থানটী সঙ্ঘটিত হয়।

অর্জ্জুনের পৌত্র মহারাজ পরীক্ষিৎ হস্তিনার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া ষষ্টি বর্ষকাল সাম্রাজ্য শাসন করিয়া স্বর্গগত হয়েন। (২৩২৩) ২২৬৩ খ্রীঃ পূঃ)

পরীক্ষিন্নন্দন মহারাজ জনমেজয় দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে ৮৪ বৎসর সাম্রাজ্য শাসন করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন। (২২৬৩-২১৭৯ খ্রীঃ পূঃ)

জনমেজয়াত্মজ মহারাজ শতানীক ১০০ বৎসর সাম্রাজ্য শাসন করিয়া পরলোকগত হন। কথিত আছে, মহারাজ শতানীকের শাসন কালে পৃথিবীতে একটী জলপ্লাবন ঘটে। (২১৭৯—২০৭৯ খ্রীঃ পূঃ)

শতানীক-তনয় মহারাজ সহস্রানীক ৭০ বৎসর সাম্রাজ্য ভোগ করিয়া কালকবলে নিপতিত হয়েন। (২০৭৯—২০০ খ্রীঃ পূঃ)

সহস্রানীক-সুত মহারাজ অশ্বমেধ সাম্রাজ্য-শাসন করিলে তৎ-পুত্র মহারাজাধিরাজ অসীমকৃষ্ণ মহাবল পরাক্রমে সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াছিলেন। ইনিই পাণ্ডব বংশের শেষ সম্রাট্। ইঁহার সময় পর্য্যন্তই ধনুর্ব্বেদ প্রভাবে যুদ্ধে প্রযুক্তবাণ-সমূহের অলৌকিক শক্তি সকল প্রকাশিত হইয়া অমানুষিক লোমহর্ষণ ব্যাপার সকল সঙ্ঘটিত হইত, সেই ধনুর্ব্বেদ মহারাজ অসীমকৃষ্ণের পরেই শিক্ষাভাবে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল ৭

তাঁহার পুত্র রাজা নিচক্রুর রাজ্যকালে ধনুর্ব্বেদবিদ্যা বিলুপ্ত হওয়ায় কেবলমাত্র ধনুর্বাণ শিক্ষা প্রচলিত ছিল।

মহারাজ অসীমকৃষ্ণের সময়ে হস্তিনাপুরী জলনিমগ্ন হয়। পরে তৎপুত্র রাজা নিচক্রু কৌশাম্বী নগরীতে (ইন্দ্রপ্রস্থের পর সাময়িক নাম) রাজধানী স্থাপন করেন। নিচক্রু হইতে ত্রয়োবিংশ রাজা ক্ষেমক পাণ্ডব-বংশের শেষ নরপতি। ইনি অতিশয় দুর্ব্বল ও ভীরু ছিলেন। উজ্জয়িনীপতি মহারাজ বিক্রমাদিত্য ইঁহার সমসাময়িক।

মগধদেশস্থিত পদ্মাবতী নগরী-(পাটলীপুত্র) পতি মহারাজ নন্দের বিশারদ নামক পুত্র রাজা ক্ষেমকের মন্ত্রী ছিল। এই মন্ত্রী বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক রাজা ক্ষেমককে হত্যা করিয়া তাঁহার সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছিল। রাজা ক্ষেমকের সহিতই পাণ্ডব-বংশ বিলোপ প্রাপ্ত হয় (কল্যব্দ ৩০৪৪ খ্রীঃ পূঃ ৫৭) (১)। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সাময়িক বাণিজ্য বিষয় পূর্ব্বে বিস্তৃতভাবে

* যুধিষ্ঠিরঃ ক্রমাদেবং কুরুরাজং বিজিত্যচ।
ষটত্রিংশদ্বৎসরানব্যাপ্য পৃথিবীং পর্য্যপালয়ৎ।
১ম খণ্ড, লঘুভারত।

(১) বেদবেদধযুক্তত্রিমিতেকল্যব্দকে গতে।
চন্দ্রবংশ-যশোজ্যোৎস্নাক্ষেমকেহসমং গমেৎ।
১ম খণ্ড, লঘুভারত।

লিখিত হইয়াছে। তাঁহার পরবর্ত্তী পাণ্ডব-বংশীয় সম্রাটগণ বহুকাল যাবৎ প্রবলপরাক্রমে রাজ্য শাসন করেন; সুতরাং তাঁহাদিগের সময়েও বাণিজ্য অবারিতরূপে প্রচলিত ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। এইজন্য পাণ্ডববংশীয় রাজাগণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লিখিত হইল।

ইহা এক প্রকার সর্ব্ববাদিসম্মত যে,ভারতবর্ষবাসীরাই সর্ব্বাগ্রে বাণিজ্যব্যবসায় আরম্ভ করে অন্যান্যদেশীয় লোকেরা তাহাদিগের নিকট হইতে এই ব্যবসায় শিক্ষা করিয়াছিল। এতদ্বিষয়ে বহুবিধ কারণ সত্ত্বেও আমরা তিনটী মাত্র কারণ প্রধান বলিয়া মনে করি; প্রথমতঃ, ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল হইতেই আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য নানাবিধদ্রব্য অন্যান্য দেশাপেক্ষা স্বভাবতই অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। ঐ সকল দ্রব্য দেশীয় লোকদিগের প্রয়োজন সম্পন্ন করিয়াও অধিক মাত্রায় উদ্বৃত্ত হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ, যে সকল দ্রব্য স্বভাবতঃ কেবলমাত্র একস্থানে উৎপন্ন হয়, অথচ সেই স্থান ভারতবর্ষ হইতে বহু দূরবর্ত্তী, কিন্তু সেই সমস্ত দ্রব্য অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতবাসীরা ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। তৃতীয়তঃ, ভারতবর্ষ হইতেই অন্যান্য দেশীয়েরা সভ্যতা এবং বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিল। যখন ভারত মহাভার শোক সুখ সমৃদ্ধি হইতে পরিভ্রষ্ট, তখনও মিশর (মিশ্র) দেশ সদ্যঃ প্রসূত বৎসের ন্যায় ভারত-সৌভাগ্য-পয়ঃ পান লালসায় প্রধাবিত। মিশরদেশ বা ইজিপ্টই সর্ব্বাগ্রে ভারতের সভ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

প্রাচীন ভারতের বাণিজ্য বিষয়ের প্রমাণ সকল কেবল যে হিন্দুশাস্ত্রেই রহিয়াছে, এমন নহে, অন্যান্য প্রাচীন সভ্য জাতীয় লোকদিগের গ্রন্থাবলীতে এবং দক্ষিণ সাগরস্থিত দ্বীপপুঞ্জের পুরাবৃত্তেও এ বিষয়ের ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রাচীন কালে যে সর্ব্বাগ্রে মিশরদেশের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য প্রচলিত ছিল, তাঁহার প্রচুর প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে।

লিপি আছে যে, ভারতবর্ষের সহিত সর্ব্বাগ্রে সুখতর দ্বীপ, মিশর ও আফ্রিকা খণ্ডের পূর্ব্বোপকূলবর্ত্তী প্রদেশ সমূহের বাণিজ্য প্রচলিত হয়।

ইতঃপূর্ব্বে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সাময়িক বাণিজ্যের বিষয় সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। মহারাজ যুধিষ্ঠির ২৩২২ খ্রীষ্টাব্দ পূর্ব্বে স্বর্গারোহণ করেন।

বাইবেল শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দ পূর্ব্বে আরবীয় বণিকগণ ভারতবর্ষোৎপন্ন ও ভারতীয় দ্বীপ সমূহ-জাত পণ্যদ্রব্য সকল লইয়া মিশরদেশে বাণিজ্য করিত। যদি পূর্ব্বোক্ত ২৩২২ খ্রীঃ পূঃ হইতে ১৭০৬ খ্রীঃ পূঃ বিয়োগ করা যায়, তাহা হইলে ৬১৬ খ্রীঃ পূঃ অবশিষ্ট থাকে। অতএব উক্ত ৬১৬ খ্রীঃ পূঃ বৎসরগুলিতে যে ভারতবর্ষের সহিত সুখতর দ্বীপ, মিশর এবং আফ্রিকার পূর্ব্বোপকূলবর্ত্তী ভূভাগের বাণিজ্য প্রচলিত থাকা নিতান্ত সম্ভবপর বলিয়া অনুমিত হয়।

এই প্রস্তাবে ভগবান্ বুদ্ধদেব জন্মিবার ১৭৬৫ বর্ষ পূর্ব্বকার ভারতের সহিত বৈদেশিক বাণিজ্য অতি সামান্য ভাবে উল্লিখিত হইবে। পরন্তু বুদ্ধদেব জন্মের পরবর্ত্তী কালীন ভারতের সহিত বৈদেশিক বাণিজ্যটী কিঞ্চিৎ বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইবে।

ভগবান বুদ্ধদেব ৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করিয়া ৪৭৭ খ্রীষ্টাব্দ পূর্ব্বে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত

হয়েন। বুদ্ধদেবের সময়ে ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডব-বংশীয় বৃহদ্রথ রাজা এবং মগধে শিশুপাল বংশীয় বিম্বসার প্রভৃতি নৃপতি রাজত্ব করিতেন। কুরুক্ষেত্র মহাসমরের পরে ভারতবর্ষ প্রকৃত বীরশূন্য ও মহাভারতোক্ত সমৃদ্ধিশূন্য হইয়া পড়িলেও বহু শতাব্দী যাবৎ উহা কখনও অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য-শূন্য হয় নাই। কেবল হিন্দু শাস্ত্রে নহে, বৈদেশিক প্রাচীন সভ্যজাতিদিগের গ্রন্থাবলীতেও ইহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। আমরা যথাক্রমে ভারতবর্ষের সহিত প্রাচীন মিশর, ফিনিসিয়া, আসীরিয়া, কালডিয়া, মীডিয়া, সিরিয়া, আরব, পারসীক, গ্রীস, ও রোম প্রভৃতি দেশের বাণিজ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

মহাত্মা টাইটলার সাহেব বলেন যে, খ্রীষ্ট জন্মিবার একবিংশ শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে কালডিয়ানেরা, ঊনবিংশ শত বর্ষ পূর্ব্ব হইতে মিশরীয়েরা, দ্বাদশ শত বৎসর পূর্ব্বে চীন দেশীয়েরা ও ফিনিসিয়ানেরা এবং ছয়শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে আরবীয় ও পারসীকেরা সভ্য পদবীতে পদার্পণ করে।

(১) লিপি আছে যে, মগধদেশীয় প্রদ্যোতন রাজার পুত্র পাল নামক নৃপতি শৈব ছিলেন। তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্ম-বিশ্বাস করিতেন না। তিনি বৌদ্ধগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ম্লেচ্ছ দেশ ও হিন্দুস্থানের মধ্যবর্ত্তী মিশ্রদেশে গিয়া বসতি করিয়াছিলেন। ইহাঁ দ্বারা মিশ্র (মিশর, বর্ত্তমান ইজিপ্ট) দেশে শৈবধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল (১)।

পূর্ব্বকালে মিশর দেশীয় লোকের সহিত ভারতবর্ষীয় বণিকগণের বিস্তৃত বাণিজ্য প্রচলিত থাকিবার বিস্তর নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দ পূর্ব্বে যখন যুষফ মিশরদেশে উপনীত হইয়াছিলেন, তখন আরবদেশীয় ইস্মায়েলীয় বণিকেরা তথায় ভারতবর্ষজাত এবং ভারত সাগরস্থিত দ্বীপপুঞ্জজাত তেজস্কর ভক্ষ্য ও গন্ধদ্রব্য সকল বিক্রয়ার্থ লইয়া যাইতেছিল (১)।

হিন্দু বণিকেরা অতীব যত্ন সহকারে স্বদেশের উপকূলে বাণিজ্যাদি কার্য্য সম্পন্ন করিত। তাহারা নদীমুখ হইতে সামুদ্রিক পোতে পণ্য দ্রব্যের উত্তোলন, সাগরতীরস্থিত এক আপণ হইতে অপর আপণে দ্রব্য প্রেরণ ও বিদেশীয় সমুদ্র পোতের সুপথ প্রদর্শন প্রভৃতি কার্য্যে সতত আসক্ত থাকিয়া মহোৎসাহে বাণিজ্য কার্য্য সকল সম্পাদন করিত। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের গ্রন্থে লিখিত আছে যে, আফ্রিকার পূর্ব্ব উপকূলের সহিত দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম উপকূলের বাণিজ্য বিশিষ্টরূপে প্রচলিত ছিল। গ্রীক্ ও রোমীয় বণিকদিগের সহিত ঐ বাণিজ্যের কোন সংস্রব ছিল না। অতি পূর্ব্বকাল হইতে তৈল, ঘৃত, শর্করা, তণ্ডুল, ও কার্পাস বস্ত্রাদি পণ্য দ্রব্যজাত পরিপূরিত সামুদ্রিক পোত সকল দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম উপকূল হইতে মহাসাগরের মধ্য দিয়া অপর পারে উপনীত হইত (২)।

ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে, হিন্দুরা সুখকর

---

(১) প্রদ্যোতনস্য তনয়ঃ পালনামা মহীপতিঃ।
শৈবধর্ম্মমুপাস্যৈব বৌদ্ধধর্ম্মং নিরস্তবান্।
স চ বৌদ্ধৈঃ পরাভূতঃ স্বদেশংহিপরিত্যজন্।
ম্লেচ্ছহিন্দুমধ্যগতং মিশ্রদেশং গতস্তদা।
১ম খণ্ড, লঘুভারত।

1. Bible Genesis XXXVII, 29.
2. Vincent's Commerce, Vol II, P. 288.

(Sokotra) দ্বীপে গিয়া বসতি করিয়াছিল। আফ্রিকার পূর্ব্ব উপকূলে সোকাল বা সোফার নামে একটী স্থান আছে। যেমন হিন্দুগণ সুখতর দ্বীপে যাইয়া উহার সংস্কৃত ভাষায় নাম রাখিয়াছিল, তেমনি তাহারা আফ্রিকার পূর্ব্ব উপকূলে বসতি করিয়া গুজ্জরাটের সন্নিহিত সুপারের নামানুরূপ ঐ স্থানের নাম সোফার রাখিয়াছিল। সোকাল বা সোফার, সুপার নামেরই অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হয়। এই সময় ভারতবর্ষের সহিত মিশরদেশের অত্যন্ত যোগাযোগ হইয়াছিল। ভারতীয় উৎকৃষ্ট সুখদ সামগ্রী সম্ভোগ এবং ভারতীয় দর্শন ও ধর্ম্ম শাস্ত্রাদি অনুশীলন দ্বারা মিশরবাসীদিগের সাংসারিক অবস্থা ও ধর্ম্মবিষয়ক মতামতের অনেক পরিবর্ত্তন সঙ্ঘটিত হয়। (১)

গরম মশলা (spices) কেবল ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ ভারতসাগরবর্ত্তী কতিপয় দ্বীপেই উৎপন্ন হইয়া থাকে, সুতরাং মিশরদেশীয় জনগণের ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যযোগেই ঐ সকল প্রাপ্ত হওয়া সম্ভাবিত।

মিশর দেশাধিপতি তৃতীয় থোথ্‌মিস্‌ নামা নৃপতি খ্রীষ্টাব্দের ১৪৯৫ বৎসর পূর্ব্বে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এই রাজার এবং তৎপরবর্ত্তী ফিরোণ নামক নৃপতিবর্গের সময়ে মিশরদেশে বৈদূর্য্যমণি প্রভৃতি বিবিধ ভারতীয় রত্ন, এবং নীল ও অপরাপর সামগ্রী আনীত হইত। মিশর দেশবাসীরা নীলবর্ণপ্রান্তবিশিষ্ট বস্ত্র সকল প্রস্তুত করিত (২)।

এতদ্বারা ইহা বিলক্ষণ প্রতীত হইতেছে যে, যুষফের সময় হইতে পূর্ব্বোক্ত নৃপতিগণের সময় পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের সহিত মিশর দেশের বাণিজ্য বহুকাল যাবৎ ধারাবাহিক রূপে প্রচলিত ছিল। ক্রমশঃ।

শ্রীতারিণীকান্ত বিদ্যানিধি।

1. Wilson's Vishnu Puran, Preface.

2: Wilkin's Ancient Egyptians, vol 3 P. 216—217 and P. 123—125.

নিদাঘে

নিশ্বাস ফেলি,—সম্ভাবি ফুলে, সমীরণ গেল কহিয়া,—
"দক্ষিণ হতে ভীষণ গ্রীষ্ম আসিছে বিশ্ব দহিয়া।"
নত, ব্যথিত অন্তরে
ফুল কলিকা;
মর্ম্মের দুখে মর্ম্মরে
তরু লতিকা।
মলিন হইল শ্যামল শস্য তরাসে;
শীতল সলিল-শীকর শুষ্ক হতাশে।

গৌরবে রবি কিরণে
শোভে ত্রিভুবন;
কর্ম্মের তাপে দীপনে
যথা যৌবন।
শঙ্কর দিঠি ফুটিয়া উঠিল স্মরণে;
রতি সম বনে বেদনায় ছায়া মূরছে।
শৈশব নাশি, যৌবন আসে; বসন্ত আজি কইরে?
দক্ষিণ পথে অগ্নির রথে নিদাঘ আসিছে ওইরে।

শ্রীবিজয় চন্দ্র মজুমদার।

আমাদের বড় লোক।

"যস্য দেবস্য যদ্রূপং তথা ভূষণং বাহনং।"

"বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচি" যেমন অসম্ভব, তেমনি "হাতীর মুখে দুর্ব্বা-ঘাস"ও অসঙ্গত। কাল্‌নায় এক জন পাগল ছিল। মধ্যে মধ্যে সে ব্যক্তি অদৃশ্য

হইত। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিত, "রাবণের বাড়ী ফলারের নিমন্ত্রণ ছিল।" ফলারের বর্ণনাকালে বলিত, "সেখানে প্রকাণ্ড সামিয়ানার মত পাতা পাতিয়া, বড় বড় গালিচার মত লুচি, গরুর গাড়ীর চাকার মত জিলাপী, মোঠা তাকিয়ার মত পান্তুয়া, এইরূপ সব আহার করিতে দিল। তার পর জল খাইতে গেলে পেট মোটা ঢাকাই-জালা তুলিয়া চুমুক দিতে হইল। আর কি শুনিবে?" খাদ্য সামগ্রী এইরূপ বৃহদাকার বর্ণিত হইলে লোকে প্রশ্ন করিত, "এত বড় বড় খাবার কেন?" তখন বুঝাইত, "যাহার নিজের দশটা মুখ, ভাইয়ের কলসীর মত কাণ, ভগ্নীর কুলার মত নখ, তাহার দেশে আমাদের মত ছোট ছোট খাবার হইলে যে নস্যতেও কুলাইবে না।" পাগল হইলেও তাহার পরস্পর-সম্বন্ধ-জ্ঞান বিলক্ষণ ছিল। বিশ্বসংসারে এই পরস্পর সম্বন্ধের কঠোর নিয়ম সর্ব্বত্র সমানভাবে বলবৎ থাকিয়া সমস্ত ব্যবস্থা নিরূপণ করিতেছে, কোথাও তিলমাত্র ভুল ভ্রান্তির সম্ভাবনা নাই। সুদীর্ঘ পদ-বিশিষ্ট জন্তুগণ লম্বগ্রীবা, পক্ষান্তরে যাহাদের স্থূল ও হ্রস্ব পদ, তাহাদের ঘাড় খাটো; ক্ষুদ্র চঞ্চু পক্ষিগণের অদীর্ঘ পদ, আবার যাহাদের লম্বা পা, তাহাদের ঠোঁটও সেই হিসাবে দীর্ঘ। এরূপ না হইলে চলে কি প্রকারে? দীর্ঘ পদের সহিত ক্ষুদ্র গ্রীবা বা হ্রস্ব পদের সহিত লম্বা গলা হইলে কি বিভ্রাট! সৌন্দর্য্যের কথা দূরে থাকুক, কার্য্যোপযোগিতার কি প্রকার ব্যাঘাত ঘটে! ঈশ্বর বল, আর প্রকৃতি নামেই ডাক, যে মহাশক্তি সেই সংসারের সকল বন্দোবস্ত করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহাকে কল-কারখানার মত জড় শক্তি বলিতে পার কি? তাঁহার সমস্ত ব্যাপারেই অতি সুন্দর ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা মানববুদ্ধির অগোচরে কার্য্য করিলেও সুবিধার দিকে, মঙ্গলের দিকেই গতিশীল। সুতরাং যে দেবতার যেমন রূপ, তাঁহার ভূষণ বাহনও তদ্রূপ নির্দ্দিষ্ট। আমাদের স্ত্রীলোকেরাও বলিয়া থাকেন, "যেমন উনুন মুখো দেবতা, তেমনি ঘুঁটের নৈবেদ্য।"

ক্রমবিকাশের ব্যবস্থানুযায়ী জড়-চেতন-উদ্ভিদ সবাই আপন আপন হিসাবে এক একটা আদর্শের দিকে ছুটিতেছে। এই ছুটাছুটির ভিতরে উত্থান পতনের দৃষ্টান্তও বিরল নহে। লক্ষ্য ঠিক রাখিয়া চলিতে পারিলে উন্নতি যেমন অবশ্যম্ভাবী, লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলে অবনতিও তেমনি অনিবার্য্য। কিন্তু তাই বলিয়া যে একবার পড়িতেছে, সে যে আর কখনও উঠিতে পারিবে না, এমন কথা নহে; যত্ন সহকারে অনুকূল অবস্থায় উপস্থিত হইতে পারিলে, অধোগতি হইতে আবার উঠিতে সক্ষম হওয়াও নৈসর্গিক নিয়মের অন্তর্গত। যাহার আদর্শ যখন যেমন হইতেছে, তাহার গতিও তখন সেই দিকে। সম্মুখে উচ্চ আদর্শ রাখিতে পারিলে প্রয়াসানুযায়ী উচ্চতা লাভ হইবেই হইবে। ইংরাজীতে বলে, "he who aims a high mountain hits a tree"—যে ব্যক্তি পর্ব্বতশৃঙ্গকে লক্ষ্য করিয়া বাণত্যাগ করে, তাহার তীর অন্ততঃ বৃক্ষশিরে পঁহুছিবে। পরন্তু গাছের আগা যাহার লক্ষ্য, উই-ঢিবীর মাথায় গিয়া তাহার বাণের গতি অবরুদ্ধ।

অধুনা পাশ্চাত্য জগতের দিকে তাকাইলে দেখিতে পাওয়া যায়, তথায় লোকের

আদর্শানুযায়ী মনোবাঞ্ছা পূরণ হইতেছে। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী," বিধাতার এই আইন চিরকাল সমানভাবে কাজ করিয়া আসিতেছে। আলেক্‌জাণ্ডার, সিজার, নেপোলিয়ন যাঁহাদের আদর্শ, তাঁহারা রণবীর উলজলী, রবার্টস, কিচনার হইতেছেন; গারিবাল্‌দি, ম্যাটসিনী, কাভুর যাঁহাদের পূজনীয়, তাঁহারা ক্রুজ, ডিওয়েট, বোথার পদে অভিষিক্ত; ম্যাকিয়াভেলি, মিরাবো, টালিরাণ্ড যাঁহাদের হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তাঁহারা বিস্‌মার্ক, বেকন্‌স্‌ফিল্ড, সল্‌স্‌বারি রূপে আবির্ভূত; ডিমস্থেনিস্, সিসিরো, বার্ক যাঁহাদের লক্ষ্য, তাঁহারা গাম্বেটা, গ্লাডষ্টোন, ব্রাইট হইয়া বক্তৃতার ছটায় জগৎ মুগ্ধ করিতেছেন; হোমার, বার্জিল, সেক্ষপীয়রকে যাঁহারা ভাবনা করিয়াছেন, তাঁহারা বায়রন, ব্রাউনিং, টেনিসন্ নামে খ্যাতাপন্ন; সক্রেটিস্, প্লেটো, আরিষ্টলের পূজকগণ কোমৎ, দার্বিন স্পেন্সরের মূর্ত্তিতে বিরাজিত; ক্রিসস্, মিদাস্, রথচাইল্ডের পদানুসরণ যাঁহাদের জীবনের লক্ষ্য ছিল, তাঁহারা আষ্টর, রকাফেলার, ভাণ্ডরবিল্টের ন্যায় ধনকুবের হইয়াছেন।

ইদানীং অনেকে আমাদের দুরবস্থার বিষয় আলোচনা করতঃ তাহার মূলীভূত কারণ ও প্রতিকারের উপায় নির্দ্ধারণে প্রয়াস পাইতেছেন। ভরসা করি, তাঁহারা এ কথা ভাবিয়া থাকিবেন যে, আমাদের আদর্শ ক্রমাগত উচ্চ হইতে নীচে নামিয়া পড়িতেছে, এবং তৎসহ আমাদের অবস্থা সর্ব্ব প্রকারে হীনাৎহীনতর হইয়া আসিতেছে। পর্য্যালোচনা দ্বারা বুধগণ সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, ভীষণ বেশ ভীমাকার-তুঙ্গশৃঙ্গ পর্ব্বতশ্রেণীর উচ্চতা কিম্বা উত্তাল-তরঙ্গ-সমাকুল সুগভীর সমুদ্রের গভীরতার সন্নিধানে যাহারা নিয়ত বাস করে, তাহাদের সাহস বেশী ও ভয় কম হইয়া থাকে। তদ্রূপ উচ্চ আদর্শের সম্মুখে যাহাদের মন সর্ব্বদা অবস্থিত, তাহারা ক্ষুদ্রাশয় সংকীর্ণ হৃদয় হইতে পারে না। পক্ষান্তরে যেমন প্রাকৃতিক শ্রীসম্পদ, শোভাসৌন্দর্য্য, পরাক্রম প্রতাপ, মহিমাগাম্ভীর্য্যাদির অভাব, বিশেষত্ব-বিহীন একভাবাপন্ন সমতল ক্ষেত্রের অধিবাসী নিরন্তর নিরুপদ্রবে দিন যাপন করতঃ দুর্ব্বল-স্নায়ু হইয়া দেহ মনের প্রভাব হারাইয়া থাকে, এবং সামান্য আধিদৈবিক, আধিভৌতিক বা অন্যবিধ উৎপাতে একান্ত বিক্লব হইয়া পড়ে, তেমনি, বৈচিত্র্যবিহীন গতানুগতিক শ্রেণীর নিস্তেজ সাধারণ জীবন আদর্শরূপে সর্ব্বদা যাহাদের হৃদয় পটে বিরাজিত, ক্রমওয়েল, ফ্রেডরিক, নেলসন্, নেপোলিয়ন প্রভৃতির জলন্ত উৎসাহ উদ্যম শৌর্য্য বীর্য্য প্রতিভা কষ্টসহিষ্ণুতার উন্নতভাব যাহাদের নিকট আকাশকুসুমবৎ অলীক শব্দ মাত্রে পর্য্যবসিত, তাহাদের গতি অধোদিকেই অনিবার্য্য এবং অবসাদজনিত ক্রমাবনতি তাহাদের অদৃষ্টফল।

আমরা শেষোক্ত দশায় পড়িয়াছি। আদর্শের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা চেষ্টা সবই ছোট হইয়া পড়িয়াছে। ছেলেবেলার খেলাঘরের মত আমাদের ঘরকন্নার সমস্ত সামগ্রী ক্ষুদ্রতা প্রাপ্ত হইয়াছে। উপর দিকে তাকাইতে আমরা একেবারেই অসমর্থ, সে ক্ষমতা যেন জন্মের মত হারাইয়াছি, অর্থাৎ স্থূল চক্ষুতে পরিদৃশ্যমান জড়রাজ্যের অতিরিক্ত যে আর কিছু আছে, তাহা আমাদের মনে স্থানই পায় না; সুতরাং

ঐহিক জগতের সার নির্যাস অর্থের প্রতি আমাদের প্রধান নজর; অন্য কোন প্রকার সদ্গুণ থাকুক আর না থাকুক, যে যত ধনী সে তত বড় লোক, এই চূড়ান্ত মীমাংসায় আমরা উপনীত; এমন কি, আমাদের ভাষায় "বড়লোক" শব্দে একমাত্র ধনাঢ্য ব্যক্তি-কেই বুঝাইয়া থাকে, ধন ভিন্ন অন্য কিছুতে মানুষ যে বড় হইতে পারে, ইহা আমাদের আধুনিক অভিধানে নাই, বহুকাল তাহা মুছিয়া ফেলা হইয়াছে; বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, ধর্ম্ম, প্রেম, পবিত্রতা প্রভৃতি সদ্গুণে যে মানুষ সাধারণ অপেক্ষা উচ্চে উঠিয়া বড় হইতে পারে, উহা আমরা প্রকারান্তরে অস্বীকার করিয়া থাকি; আর অর্থশালীর সহস্র দোষ সত্ত্বেও আমরা তাঁহাকে নির্ভেজাল বড়লোক বলিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করি না। এবম্প্রকার মতিভ্রমের গূঢ় কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে দেখা যায় যে, ক্ষুদ্রতাপ্রসূত অপদার্থতা হেতু আমাদের ভয় ও ভিক্ষা-বৃত্তি প্রখর হইয়াছে, সুতরাং যাহাকে ভয় করি বা যাঁহার নিকট কোন প্রত্যাশা রাখি,—কস্মিনকালে কিছু পাই বা না পাই, তাঁহাকে বড় বলিতে বাধ্য। ভয়, পাছে ধনমদমত্ত আঢ্য ব্যক্তি কোনরূপ অত্যাচার করেন, বা আমার মাথা ফাটাইয়া টাকার জোরে অভিনব প্রহসনের-নিত্যলীলা-ভূমি ইংরাজী-আদালত-প্রচলিত আইনের ফাঁকিতে অব্যাহতি-লাভান্তে আমার পৈতৃক প্রাণ বধে প্রবৃত্ত হন। ঈদৃশ অসীম ক্ষমতা-শালী পুরুষের পার্থিব ঈশ্বরবোধে পূজাভীতি অসঙ্গত নহে, যেহেতু সর্ব্বশক্তিমান টাকা তাঁহার করতলস্থ *। এরূপ ক্ষেত্রে পণ্ডিত জ্ঞানী ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ বড়লোক কি প্রকারে হইতে পারেন? হয়ত তাঁহাদের প্রতি অত্যাচার করিলেও তাঁহারা প্রতি-শোধ লইবার নিমিত্ত আমাকে বিপদে ফেলিবার চেষ্টা করিবেন না, কাজেই তাঁহা-দিগকে বড় বলিয়া স্বীকার করিবার কোন সার্থকতা দেখা যায় না। আমাদের মতে জমীদার বড়লোক, কারণ তাঁহার ভূমিবল, অর্থবল, লোকবল তিনই বিদ্যমান; তিনি মনে করিলে আমাকে এক টুক্রা জমী দিতে পারেন, রাগ করিলে আমার যাহা আছে, তাহাও কাড়িয়া লইতে পারেন; লোকজনের দ্বারা কোন বিষয়ে আমাকে সাহায্য করিতে পারেন, আবার ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে দিয়া আমার উপর নানারূপ উপদ্রব করিতেও পারেন; ধন-বলে মিথ্যা মোকদ্দমা সাজাইয়া আমাকে উৎখাত করিতে পারেন; টাকার সাহায্য তাঁহার নিকট আশা করা যাইতে পারে, যদিও পাওয়া কঠিন। যাহা হউক, নানা কারণে তিনি মহা প্রকাণ্ড বড়লোক। তন্নিম্ন শ্রেণীতে বেনিয়া-মহাজন বড়লোক; যদিও ইনি কেবলমাত্র অর্থবলে বলীয়ান, কিন্তু আমার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট; ঋণদায়, পিতৃমাতৃদায়, কন্যাদায়ে ঠেকিলে তিনি ভিন্ন আমার গতি নাই; কলিযুগে যখন "বলং বলং অর্থবলং" তখন তাঁহাকে প্রকাণ্ড বড়লোক কেমন করিয়া না বলি? তার

* অবাধ স্বাধীনতা ও স্বাবলম্বনের লীলাক্ষেত্র শ্বেত-দ্বীপে এরূপ সম্ভবে না, তথাকার আপামর সাধারণ স্বস্ব-প্রধান, কোন বিষয়ে কেহ কাহারও মুখাপেক্ষা করিয়া চলে না। লণ্ডনের রাজপথে অনেক ঘরামী-শ্রেণীর লোককে (bricklayer) বলিতে শুনা গিয়াছে, "আমি যুবরাজের কি তোয়াক্কা রাখি; তিনি কি আমাকে খাইতে দিবেন?"—"What the deuce do I care for the Prince of Wales? Would he come and fill my stomach?"

পরে বড়লোক লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল (সকল শ্রেণীর ব্যবহারাজীব)। তৃতীয় দফায় ইঁহার নাম পড়িলেও ইনি একত্রিত প্রথম দুইজন অপেক্ষাও বড়, কারণ ইনি একাধারে জমীদার-মহাজন, তদুপরি ইঁহার অতিরিক্ত এক প্রবল শক্তি আইন-বল, তদ্দ্বারা কাটা কাগজ ঘোড়া দিতে পারেন, সাদাকে কাল করিবার, হয়কে নয় করিবার যাদুমন্ত্র ইঁহারই আইন-তন্ত্রের অন্তর্গত, সুতরাং সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তা ভূতলে একমাত্র ইনি, টাকার অপেক্ষাও ইনি সর্ব্বশক্তিমান, ইঁহার ওকালতীর তুবড়িস্বরে না হয় এমন ভেল্কি নাই, ইনি দিবসে রজনী দেখাইতে পারেন, জীবিতকে মারিবার ক্ষমতা রাখেন, মৃতকে পুনর্জীবন দান করিতে সমর্থ, বিধবাকে পতি দিবার শক্তি ধরেন, সধবার পতি নাশ করিতে পারেন, অপুত্রকে পুত্র দেন, পতিপুত্রবতীকে অবীরা করেন, কদাচিৎ দরিদ্রকেও ধনশালী করিয়া থাকেন, পরন্তু ধনবানকে পথের কাঙ্গাল করা ইঁহার নিত্যকর্ম্মের মধ্যে, সংক্ষেপে ইঁহাকে কলির বিধাতা পুরুষ ভারতে অবতীর্ণ বলিলে অত্যুক্তিদোষ ঘটে না। এ হেন উকীল বাবুকে যদি অতি মহা প্রধান বড়লোক না বলা যায়, তাহা হইলে প্রকৃত ভাবব্যঞ্জক শব্দ বিন্যাসে আমাদের মাতৃ ভাষার ক্ষমতার অভাব প্রকাশ পায়। উকীল বাবু যখন আপনার কুদ্‌রতে মহাজনের পদে উঠিতে সমর্থ হইয়া জমীদারদের গুরু * হইয়াছেন, তখন বড়লোকদের মধ্যে তাঁহার স্থান যে কত উচ্চে, তাহা ভাবিয়া ঠিক করা কঠিন। ইঁহারাই আমাদের প্রধান আদর্শ †। এখন পাঠক বিচার করুন, আমাদের লক্ষ্য কোথায়?

পূর্ব্বোক্ত ব্যতীত অনেক খুচরা বড়লোক আছেন, যথা, হাকিম, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি। ইঁহারা গোপরো কেউটের দলে স্থান পাইবার যোগ্য না

* "গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ" এই শ্রেণীর গুরু; "দুর্লভোঽয়ং গুরুর্দেবি শিষ্যসন্তাপহারকঃ," সে গুরু নন; ওরূপ গুরু যে দুর্লভ, স্বয়ং মহাদেব বলিয়াছেন।

† ন্যূনাধিক পঁচিশ বৎসর হইল, মান্দ্রাজ প্রদেশের জনৈক তীক্ষ্ণধীকৃতবিদ্য ব্রাহ্মণ ইউরোপ পর্য্যটনান্তে ভারতে প্রত্যাগত হইয়া পাশ্চাত্য জগতের তুলনায় এ দেশের অবস্থা সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন, তন্মধ্যে তিনি বলেন:—"ভারতবর্ষের যেখানে যাই, দেখি উকীল ব্যারিষ্টরগণ সর্ব্বত্র সমাজের মুখপাত্র। এই শ্রেণীর লোক যে দেশে সকল বিষয়ে প্রধান, সে দেশের ভদ্রস্থ কোথায়?" প্রকৃত পক্ষে বিচার করিতে গেলে দেখা যায়, চাকরী যাহাদের একমাত্র ভরসা, এরূপ কতকগুলি লোক ব্যতীত আর সকলেই অন্ন বিস্তর আদালত-তীর্থের পাণ্ডাদের নিকট মাথা মুড়াইয়াছেন এবং মুড়াইতেছেন। ইহার পরিণাম এই যে, নানা স্থানে সঞ্চিত দেশের অর্থ উকীলেরা ছল-বল-কৌশলে বাহির করিয়া আত্মসাৎ করিতেছেন, এবং ইউরোপীয় ভোগ বিলাসে বিকীর্ণ হইতেছে। আদালতের অন্যান্য খরচে যে কত টাকা অত্যাপাতে যাইতেছে, তাহা বলা বাহুল্য। এতদ্দ্বারা অনিষ্ট বৈ ইষ্ট কি হইতে পারে? উকীলদের অত্যাচার এতই বাড়িয়াছে যে, উঁহাদের মধ্যে যাহারা বড় বড় মহারথী, তাহাদের হাতে বেশী মোটা কাজ যখন না থাকে, তখন বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া ব্রহ্মার পদ গ্রহণ করতঃ মকদ্দমা সৃষ্টি করিতে বসেন; সামান্য ছুতানাতা অবলম্বন করিয়া দুই জন ধনীর মধ্যে মেড়ার-লড়াই বাধাইয়া দেন। এমন কি, এরূপও দেখা গিয়াছে যে, পরামর্শ দ্বারা সূচনা করিবার পূর্ব্বে ভবিষ্যৎ আশায় ঘরের পয়সা খরচ করিয়া যোগাড় যন্ত্রের যথোপযুক্ত আয়োজন করিতেও ত্রুটি হয় নাই। (এ স্থলে উকীল মানে আইন ব্যবহারাজীব। ব্যারিষ্টার, উকীল, আটর্নি, মোক্তার সবাই এই পদ-বাচ্য।)

হইলেও কেহ চিতে, কেহ বোড়া, কেহ হেলে, কেহ ঢোঁড়ার মধ্যে। কিঞ্চিৎ বিষ থাকা চাই, অর্থাৎ অনিষ্ট করিবার ক্ষমতা থাকা চাই, নচেৎ তাঁহাকে আদত বড়লোক বলি কি প্রকারে? যাহা হউক, অর্থাগমের তারতম্যানুসারে বড়ত্বের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করাই সাধারণ নিয়ম; যাঁহাদের পৈতৃক ধন আছে, যাঁহারা সদসদুপায়ে নিজে পরের টাকা ঘরে আনিতে পারিয়াছেন, কিম্বা কোন রকম চাকরীতে মোটা বেতন পান *, তাহারাই বড়লোক। এবম্বিধ লোকই আমাদের আদর্শ, ইহাঁরা যাহা করেন, তাহাই প্রশস্ত, আর সব কাজ খারাপ, নিন্দনীয়, ইহাই আমাদের ধারণা †।

* প্রবাদ আছে যে ৺ ভূদেব বাবু পাঠশালাদি পরিদর্শন কার্য্যে কোন পল্লিগ্রামস্থ বড় জমিদারের বাটীতে উপস্থিত হইলে জিজ্ঞাসিত হন,—'কি কর?' উত্তর, "স্কুল তদারক করিয়া বেড়াই।" তাহাতে "ছাওয়াল পড়াও" বলিয়া উপেক্ষা প্রকাশ করা হয়। পরে খ্যাতন কত? প্রশ্নের উত্তরে যখন জানিলেন, ১০০০ টাকা মাহিনা, তখন "হা! সাবাস। বসিতে মোড়া দে" বলিয়া জমীদার মহাশয় অভ্যর্থনা করেন। পুলিস-জমাদারের যে মান আছে, কালেজের প্রোফেসরের তাহা নাই, কারণ শেষোক্ত ব্যক্তির ত ধর-পাকড়ের কোন ক্ষমতা নাই। আমাদের মতি গতি এতই হীন হইয়া পড়িয়াছে। সর্ব্বদা ভয়ে হতাশে জড়সড় ভাবে দিন যাপন করিয়া সঙ্কুচিত হইতেছি।

† প্রায় পঁচিশ বৎসর কোন স্থানে আমরা পাঁচ সাত জন মধ্যে মধ্যে মিলিত হইয়া জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোচনা করিতাম। তথাকার একজন ছোট জমীদাররকমের লোক সেই কথা শুনিয়া একদা অবজ্ঞাচ্ছলে বলিয়াছিলেন, "তোমাদের কি আর কোন কাজ নাই যে, দিবারাত্রি 'জীবাত্মা' 'পরমাত্মা' করিয়া বৃথা সময় নষ্ট কর, কৈ সবজজ, মুন্সেফ, উকীল প্রভৃতি বড় লোকেরা ত এ সকল কচ্‌কচি লইয়া থাকেন না, ও সব লক্ষ্মীছাড়ার কাজ। আমি পরমেশ্বরের নাম লইবার ভয়ে পবর্গ ত্যাগ করিতে উদ্যত, কেবল "পয়সার" খাতিরে পারি না।" উত্তরে আমরা আর কি বলিব খুজিয়া না পাইয়া জবাব দিলাম, "তা ঠিক, যেখানে লক্ষ্মী হাত পা ছড়াইয়া বিরাজিতা, সেখানে সরস্বতীর স্থান কি প্রকারে সম্ভবে?"

যেহেতু, "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ—আমাদের চিরকালের উপদেশ। মহাজন, অর্থাৎ যাঁহারা টাকা জমা করত সুদে খাটাইয়া তাহার বৃদ্ধি চেষ্টায় কায়মনোবাক্যে নিরন্তর নিযুক্ত থাকেন, ঐ মহাত্মারা যে ভাবে সংসারে চলেন, সেই পথ ভিন্ন অন্য কোন পথ আমরা কিরূপে অবলম্বন করিতে পারি?

উপসংহারে বিলাতের জনগণ কি প্রকারের লোককে বড় বলিয়া সম্মান করিয়া থাকেন, গ্লাডষ্টোনের দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা প্রদর্শন করিতেছি। উঁহাকে একবার মাত্র চক্ষে দেখিবার জন্য লোকে এতই উৎসুক ছিল যে, কোন পুস্তকের দোকানে তিনি প্রবেশ করিয়াছেন, জানিবা মাত্র শত শত লোক তাহার দরজায় দাঁড়াইয়া এমন ভিড় লাগাইত যে, তাঁহার বাহির হওয়া মস্কিল হইত; এ কারণ, তিনি দোকানের ভিতর গিয়াই জিজ্ঞাসা করিতেন, বহির্গমনের অন্য রাস্তা আছে কি না। এক বৎসর মে-উৎসবোপলক্ষে ১লা মে তারিখে হাইড্-পার্কে প্রায় দশ লক্ষ লোক একত্রিত হয়। সন্ধ্যাকালে উৎসবান্তে মেলা ভাঙ্গিলে তাহারা ফিরিতেছে, এমন সময়, দৈবযোগে গ্লাডষ্টোন সস্ত্রীক শকটারোহণে সেই পথে যাইতেছেন; যেমন তাঁহাদিগকে দেখিতে পাওয়া অমনি সমস্ত লোক টুপিসহ হাত তুলিয়া তারস্বরে বারম্বার "গ্রাণ্ড ওল্ড ম্যান"

বলিয়া রাজপথ কাঁপাইতে লাগিল। স্বয়ং ভিক্টোরিয়াকেও কখন ওরূপ ভাবে প্রাণ খুলিয়া অভিবাদন করিতে দেখা যায় নাই। বাস্তবিক পাশ্চাত্য জগতে যথার্থ মহত্বের সম্মান আছে, তাই ইউরোপ, আমেরিকা এ প্রকার উন্নত পদবীতে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। যাহার যেমন আদর্শ, তাহার তেমনি গতি। শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

৺শ্রীশ্বর বিদ্যালঙ্কার।

ক্রমে ক্রমে বঙ্গদেশ হইতে গৌরবের রত্নগুলি খসিয়া পড়িতে লাগিল। অদ্য আমরা গভীর বিষাদের সহিত, বঙ্গাকাশের একটী নক্ষত্র-পাতের কথা কহিব। যে কবি-কোকিল এত দিন উত্তরবঙ্গে থাকিয়া, মনোমাদন স্বরলহরী তুলিয়া, সুমধুর-রবে দিগ্‌দিগন্ত প্লাবিত করিতেছিল, সে কোকিল চিরতরে উড়িয়া গিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ "বিজয়িনীকাব্য" ও "দিল্লিমহোৎসবকাব্য" প্রভৃতি বহুকাব্যের রচয়িতা শ্রীশ্বর বিদ্যালঙ্কার বিগত ৬ই ফাল্গুন দিবা দ্বিপ্রহরের সময়ে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইঁহার তিরোধানের সঙ্গে সংস্কৃত-সাহিত্য-জগৎ একরূপ কবি-শূন্য হইল। ইনি কিরূপ অসাধারণ কবিত্বশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-সমাজ সবিশেষ অবগত আছেন; নব্যভারতের পাঠকবর্গও তাহা জানেন। ইঁহার শেষ জীবনে প্রণীত "বিজয়িনীকাব্য" এবং "দিল্লিমহোৎসবকাব্য"—এই নব্যভারতে ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিত দ্বারা অতি উচ্চ প্রশংসার সহিত সমালোচিত হইয়াছিল। সুতরাং ইঁহার কবিত্ব-শক্তির পরিচয় নূতন করিয়া দিবার কিছুই আবশ্যক নাই। "দিল্লিমহোৎসব কাব্য" প্রকাশিত হইবার পর, মান্দ্রাজের সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী মাসিক পত্র "ইণ্ডিয়ান্ রিবিউ"এর বিচক্ষণ সম্পাদক, এই কাব্যখানিকে ভারতীয় কালিদাসাদি প্রণীত প্রাচীন কাব্যনিচয়ের সঙ্গে সর্ব্বাংশে প্রতিযোগিতা করিতে পারে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। "ইঁহার মত বশ্যবাক্ কবি সমগ্র ভারতবর্ষে দুর্ল্লভ" বলিয়া, উড়িষ্যাসাহিত্যের অদ্বিতীয় মহাকবি, বর্দ্ধমান বিভাগের স্কুলসমূহের ভূতপূর্ব্ব ইনস্‌পেক্টর, স্বনামখ্যাত রায় রাধানাথ রায় বাহাদুর, যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ, পালি ও সংস্কৃত ভাষার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্. এ, মহোদয়, এই "দিল্লিমহোৎসব কাব্য" পড়িয়া বলিয়াছিলেন— "হ্রাসবৃদ্ধিবিহীন সংস্কৃত ভাষায় এরূপ বিরাট ব্যাপার বর্ণন করিয়া, আপনি নিজকে অমর এবং ইংরাজকীর্ত্তিকে চিরস্থায়িনী করিলেন। আপনি স্বভাবকবি, আপনার কবিত্বের প্রশংসা সহস্রকণ্ঠে ঘোষিত হইতেছে" ইত্যাদি। ফলতঃ, আমরা যতদূর শুনিয়াছি ও জানিয়াছি, তাহাতে একথা আমরা বলিতে পারি যে, অতি অল্প সংস্কৃত কবিই, শ্রীশ্বর বিদ্যালঙ্কারের ন্যায়, আপনার জীবিতকালে, এরূপ বিশ্বব্যাপী প্রশংসা লাভ করিতে পারিয়াছেন। শব্দসম্পদের বৈচিত্র্যে এবং শব্দগ্রন্থন কৌশলের মহিমায়, ইঁহার মত শক্তি বহুকাল ভারতবর্ষে দেখা যায় নাই। আজ ইঁহাকে হারাইয়া ভারতীয় কবিত্ব-জগৎ যেরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইল, তাহা

আর যে পূরণ হইবে, সে আশা অতি কম!

এই দুই কাব্য ছাড়া, ইনি আরো অনেকগুলি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ইনি কলাপ ব্যাকরণকে সহজে আয়ত্ত করাইয়া দিবার নিমিত্ত, পদসাধনপ্রণালী, সূত্র ও বৃত্তি সমন্বিত "কৌমারব্যাকরণ" পদ্যে রচনা করিয়াছিলেন। চণ্ডী অবলম্বন করিয়া, "সপ্তশতী" নামক মহাকাব্য, মেঘদূতের প্রণালী অনুসরণ করিয়া "জীবদূত" নামক খণ্ডকাব্য এবং প্রসিদ্ধনলোদয়ের অনুরূপ "রামোদয়" কাব্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন, বহু শতক প্রভৃতি ক্ষুদ্রাবয়ব কাব্য লিখিয়াছিলেন। অর্থাভাবে ও অন্যান্য বিঘ্ন বশতঃ সমস্তগুলি মুদ্রিত হইয়া উঠে নাই। ইনি অত্যন্ত দ্রুত কবি ছিলেন। যে সময়ে সুপ্রসিদ্ধা রমাবাই রঙ্গপুরে আগমন করেন, তখন ইঁহার অতি দ্রুত সমস্যাপূরণ শক্তি দেখিয়া, রঙ্গপুরের তদানীন্তন রাজপুরুষেরা বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলেন।

ইনি বালকের ন্যায় সরলপ্রকৃতি ছিলেন। জীবনে কিছুমাত্র আড়ম্বর বা অভিমান ছিল না। অনাসক্ত মহাপুরুষের ন্যায় ইনি জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। মৃত্যু সময়ে ইঁহার বয়স প্রায় অশীতি বর্ষ হইয়াছিল।

ইনি রঙ্গপুরান্তর্গত ইটাকুমারী নামক গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ পবিত্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। স্বনামখ্যাত রুদ্রমঙ্গল ন্যায়ালঙ্কার, ইহাকে ন্যায়গ্রন্থ অধ্যয়ন করান। কাকিনার বিদ্যোৎসাহী ভূপতি স্বর্গীয় সম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী, অল্প বয়সেই ইঁহার প্রতিভা ও কবিত্ব শক্তির উন্মেষের পরিচয় পাইয়া, আপন ব্যয়ে ইঁহাকে নবদ্বীপে পাঠান। তথায়, সুপ্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের নিকটে স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া, সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হন। তদানীন্তন আলঙ্কারিক সুপ্রথিতযশাঃ প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের নিকটে ইনি কাব্য ও অলঙ্কার নিচয় পড়িয়াছিলেন। এইরূপে নানাশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইলে, ইনি ১৮৬৬ সালে কাকিনায় আইসেন। রাজপ্রদত্ত ভূমি ও বাটীতে বাস করিতে থাকেন। রাজা শম্ভুচন্দ্র নিজে সংস্কৃত ও পারশী ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। ইনি আপন আলয়ে একটী 'নবরত্ন' সভার সৃষ্টি করেন এবং বিদ্যালঙ্কারকে কালিদাস স্থানীয় করিয়া, মহাভারতের অনুকরণে লক্ষ শ্লোকাত্মক "বিক্রম ভারত" নাম দিয়া সুবৃহৎ গ্রন্থ পদ্যে রচনা করিবার ভার দেন। বিদ্যালঙ্কারের কবিত্ব প্রাচীন কাব্যের ন্যায় মধুবর্ষী ছিল। বিক্রমভারত রচনা শেষ হইয়া উঠিলে, উহা যে ভারতের এক অতুল কীর্ত্তি হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মহাকবি শ্রীধরের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে একটী অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছিল। আমরা সেই পবিত্র কাহিনী সংক্ষেপে বলিয়া এই বিষাদময় প্রবন্ধের উপসংহার করিব! বিগত মাঘ মাসে বিদ্যালঙ্কার ভীষণ নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হন। সৌভাগ্য বশতঃ, ইঁহার কবিত্ব শক্তির প্রস্ফুরণের সহায়রূপে, ইনি ইঁহার পত্নী শ্যামা সুন্দরীকে পাইয়াছিলেন। শ্যামাসুন্দরী অত্যন্ত পতিপ্রাণা রমণী ছিলেন। স্বামীর সর্ব্বতোমুখী স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য, ইনি দিবারাত্রি যত্নপরায়ণা ছিলেন। উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় ভাবনিবদ্ধ প্রেম সর্ব্বদা জাগরূক ছিল। নিমন্ত্রণাদি উপলক্ষে কবিবরের সাময়িক বিচ্ছেদে, পত্নী শ্যামা সুন্দরীর যেরূপ ব্যাকু-

লতা দেখিয়াছি, আবার পত্নীর যৌগাদির সময়ে বিদ্যালঙ্কারের যেরূপ ব্যস্ততা ও অধীরতা লক্ষ্য করিয়াছি, তাহা বাস্তবিকই এ কালে অনন্যসাধারণ। বিধাতা যেন শ্যামাসুন্দরীকে কেবলমাত্র কবিবরের সর্ব্ববিধ অভাব ও পরিতোষের সঙ্গিনী করিয়াই পাঠাইয়াছিলেন। কবির এই অন্তিম রোগের সময়ে, শ্যামাসুন্দরী আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া যেরূপ অনন্যমনে শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, তাহা রমণীমাত্রেরই অনুকরণার্হ। বিদ্যালঙ্কারের যে দিন মধ্যাহ্নে জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হয়, তাহার পূর্ব্ব রাত্রে, কি জানি কি মন্ত্রবলেই যেন, শ্যামাসুন্দরী তাহা বুঝিতে পারেন। তাঁহার তদানীন্তন সকল কার্য্যেই, পতির সঙ্গে সঙ্গে যে তাঁহারও আয়ু শেষ হইবে, ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল। অরুণোদয়ের কিঞ্চিন্মাত্র পূর্ব্বে, শ্যামাসুন্দরী পুত্রের নিকটে চাবির গোছা ফেলিয়া দিয়া, মুমূর্ষু স্বামীর চরণ তলে আপন মস্তক স্থাপন করিয়া বসিয়া পড়িলেন। বোধ হইতে লাগিল যেন কেহ তাঁহার আত্মাকে বলিয়া দিল যে 'ঐ দেখ তোমার স্বামীর আত্মা অমরধামে যাইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে'। দেখিতে২ কথা বন্ধ হইল, হস্তপদ শিথিল হইয়া আসিল; সতীর পবিত্র দেহ যেন আলুথালু হইয়া, পতিপদতলে গড়াইয়া পড়িল। ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে বাহির করিয়া আনা হইল। ধীরে, অতি ধীরে, নিদ্রাগ্রস্তার ন্যায়, তাঁহার পবিত্র আত্মা আকাশ-পথে উড়িয়া গেল। ললাটফলকস্থ সিন্দুর-বিন্দু যেন আপনি প্রভায় আরো সমুদ্দীপিত হইয়া উঠিল। দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন একাগ্রতার অক্ষুণ্ণ পরাক্রমে সমাধিরূঢ় আত্মা দেহভেদ করিয়া অনন্তাকাশে উড্ডীন হইল। প্রাণশূন্য দেহ ধরায় খসিয়া পড়িল। এই মহাসতীর দেহাবসানের পাঁচ ঘণ্টামাত্র পরে; ধীরে, অতি ধীরে, সজ্ঞানে, বিধাতার নাম উচ্চারণ করিতে করিতে, মহাকবির আত্মাও,—যেন অগ্রগামিনী সতীর সঙ্কেত পাইয়াই, দেহ-পিঞ্জর পরিত্যাগ করিল। দম্পতীর প্রেম-বদ্ধ আত্মা দুইটী অনন্তাকাশে একত্র মিলিত হইয়া, পরলোকে প্রস্থান করিল।

সিন্দুর ও চন্দনে উভয়কে সজ্জিত করিয়া, একত্রে এক চিতায় বহন করিয়া, কলনাদিনী স্রোতস্বিনী ত্রিস্রোতার তীরভূমিতে লইয়া যাওয়া হইল। সেই পবিত্র তটে, পবিত্র মন্ত্রপূত অগ্নিতে, একত্র উভয়ের নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হইল!!

এইরূপে সেই নিষ্পাপবদ্ধ, সুপবিত্র, দম্পতীদ্বয় একত্র স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। এই অলৌকিক বার্ত্তা শ্রবণে, রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর লিখিয়াছেন—"তাঁহারা উভয়েই উচ্চস্বর্গে, সুখ-সম্মিলনে কৃতার্থ হইয়া দেবত্ব লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা উভয়েই একত্রে সেই ঊর্দ্ধতন 'বৈরাজ ধামে' স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন"। সুপ্রসিদ্ধ বৈদান্তিক পণ্ডিত রায় গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায় মহাশয় কবির পুত্রকে লিখিয়াছিলেন—"মাতৃদেবী যে স্বামীর প্রতি অলৌকিক ভাব-নিবন্ধনের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া স্বর্গস্থা হইলেন,ইহাতে আমার বিশেষ আনন্দ। যে সময়ে জলন্ত চিতানলে প্রাণ দেওয়ার সম্ভাবনা নাই, সে সময়ে এই ত সতীর পতি অনুগমনের প্রকৃষ্ট উপায়। আপনি এই অলৌকিক ব্যাপার চিন্তা করিয়া—অনুধ্যান করিয়া,—শোকমুক্ত হইবেন, ইহাই আশা করি।"

শ্রীধরের মৃত্যুতে ভারতের কাব্যজগতে যে ক্ষতি হইল, তাহা আর পূরণ হওয়া সুকঠিন! এতদিনে বাকিনার রাজমুকুটের উজ্জ্বল হীরক খণ্ড খসিয়া পড়িল! শ্রী—

স্ত্রী পুং ভেদ। (২)

আমরা দেখিয়াছি যে, অচিহ্নিত * অবস্থাই জীব-কোষের সাম্যবস্থা; অর্থাৎ অচিহ্নিত সময়ে কেন্দ্র-বিন্দুর † কুঞ্চন প্রসারণ শক্তি সমান থাকায় ভেদ চিহ্ন উৎপন্ন হয় না। অবোধগম্য কারণে সাম্যাবস্থা হইতে অসমতা উৎপন্ন হইয়াছে; এবং তাহার ফলে, কুঞ্চন শক্তির আধিক্যে পুং-ধর্ম্মের ও প্রসারণ শক্তির আধিক্যে স্ত্রী-ধর্ম্মের উৎপত্তি। আমরা দেখিয়াছি যে, জীবকোষস্থ কেন্দ্র-বিন্দুর কুঞ্চন প্রসারণ শক্তি, এবং ঐ দ্বিবিধ শক্তির অসমতা, অঙ্গীকার করিলে কীট ‡ ও ডিম্বের ¶ আকৃতি বুঝা যাইতে পারে; এবং এক পক্ষে প্রথমোক্তের সবলতা ও চঞ্চলতা, অপর পক্ষে শেষোক্তের দুর্ব্বলতা ও স্থিতিশীলতা দুর্ব্বোধ হয় না। কেন্দ্র-বিন্দুর কুঞ্চন প্রসারণ শক্তির সাম্যাবস্থাই মৌলিক অবস্থা; এই অবস্থা হইতেই বর্ত্তমান বিভিন্নতা উৎপন্ন হইয়াছে। এই শক্তিই জীবনী শক্তি, গূঢ় অথবা ব্যক্ত এই শক্তিই চৈতন্য।

কিন্তু এতক্ষণ আমরা এক ধর্ম্মযুক্ত অচিহ্নিত জীবকোষের স্ত্রী-ও-পুং-আকারে বিশ্লিষ্ট হওয়ার মূল কারণ বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। এতদ্বারা বর্ত্তমান সময়ে কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থলে কিরূপ ফল হইবে, তাহা বুঝিবার সাহায্য হয় না। কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থলে কোন্ ধর্ম্মযুক্ত অপত্য সঞ্জাত হইবে, তাহা বুঝিবার উপায় কি? নানা কারণে আমাদিগের এই বিষয়ক জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক। স্ত্রী ধর্ম্মযুক্ত বহু অপত্য অথবা পুং ধর্ম্মযুক্ত বহু অপত্য,—উভয়ই সমাজের অনিষ্টকর। § বর্ত্তমান সময়ে নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে কোন্ কোন্ কারণাধীনে স্ত্রী পুং ভেদ নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, তাহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

এ সম্বন্ধে পুরাকাল হইতে মানব সমাজে বহু মত চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু কোন মতই সম্পূর্ণ সন্তোষজনক নহে। এক স্থলে প্রয়োজ্য হইলে অন্য স্থলে উহাদিগের ব্যভিচার সর্ব্বদাই লক্ষিত হইতেছে। ঐ সকল মতের সামঞ্জস্য করিবার চেষ্টাও অনেক সময় করা হইয়াছে। এস্থলে তাহারই ফল কথঞ্চিৎ বিবৃত করা যাইতেছে। কিন্তু আমরা প্রথমে জীবকোষের যে কুঞ্চন প্রসারণ অঙ্গীকার করিয়াছি, তৎসহ এই সমন্বয়ের বিরোধ না হয়, এ পক্ষে বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

উপরি উক্ত বিভিন্ন মত সকলকে চারি-শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে;

(১) কীট অথবা বৃন্তের * আধিক্য;
(২) সবলতা;
(৩) মিলনকাল;
(৪) মিলন স্থান।

* যখন স্ত্রী পুং ভেদ চিহ্ন উৎপন্ন হয় নাই।

† সুতরাং জীবকোষের।

‡ Spermatozoon কিম্বা Pollen পুং বীজ।

¶ ovum স্ত্রী-বীজ।

§ সভ্যসমাজে স্ত্রী ও পুরুষের অনুপাত গড়ে প্রায় সমানই থাকে;

* Ovum স্ত্রীবীজ।

(১) (২) এই মতবাদীদিগের ধারণা গর্ভোপনিষদের কথায় সংক্ষেপে এইরূপ বলা যাইতে পারে। পিতুরেতোঽতি রেকাৎ পুরুষঃ, মাতুরেতোঽতি রেকাৎ স্ত্রী। * কিন্তু এই অতিরেকত্ব অথবা আধিক্য, সংখ্যা-বোধকও হইতে পারে, বলবোধকও হইতে পারে। প্রথম মতে বৃত্ত, কীট কর্তৃক অনু-প্রাণিত হইবার সময় † একটী বৃত্তের সহিত একাধিক কীটের সংমিশ্রণ হইলে অপত্য পুং ধর্ম্মযুক্ত; এবং একাধিক বৃত্তের সহিত একটী কীটের সংমিশ্রণ হইলে অপত্য স্ত্রী ধর্ম্মযুক্ত হয়। এই মতের ভ্রান্তি প্রদর্শন করা কঠিন; কিন্তু যতদূর জানা যায়, তাহাতে এক একটী বৃত্ত এক একটী কীট কর্তৃক অনুপ্রাণিত ও তৎসহ সম্মিলিত হই-বার সম্ভাবনাই অধিক। উদ্ভিদগণের সম্বন্ধে এই সম্ভাবনা আরও অধিক। যাহা হউক, কীট অথবা বৃত্তের সংখ্যার উপর অপত্যের স্ত্রী পুং ভেদ নির্ভর করে, এইরূপ অর্থে উপরোক্ত বচনকে গ্রহণ করা সঙ্গত বোধ হয় না। বরং বল-বাদীদিগের মত তদপেক্ষা সঙ্গত। এই মতে, সংমিশ্রণ কালে কীট অথবা বৃত্ত, যাহার বলাধিক্য থাকে, অপত্যও তদ্রূপ হয়। কীটের বলাধিক্যে পুংজাতীয় অপত্য, এবং বৃত্তের বলাধিক্যে স্ত্রী জাতীয় অপত্য উৎপন্ন হয়। এই মতকে আমি বল-বাদ নামে অভিহিত করিলাম। বলবাদ স্বভাবতই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়; দৈহিক বল ও জনন-বল। ইহা সহজেই বুঝা যায় যে, দৈহিক সবলতা ও জনন-সবলতা, এতদুভয় মধ্যে একের অভাব সত্ত্বেও অন্যের সদ্ভাব সম্ভব। ইহারা দুই স্বতন্ত্র বস্তু। সুতরাং বলবাদকে দৈহিক সবলতা ও জনন-সবলতা, এই দুইভাগে বিভক্ত করিলে দেখা যাইবে যে, দৈহিক সবলতা অপত্যোৎপাদনে অনেক সময় অকৃতকার্য্য হয়। এস্থলে কীটের দৈহিক সবলতাই উল্লেখ করা হইল। সুস্থকায় বলিষ্ঠ এবং পূর্ণাবয়ব কীটের নিষ্ফলতা অনেক সময় দেখা গিয়াছে। সুতরাং দৈহিক-বলবাদের ব্যভিচার দৃষ্ট হওয়ায় উহা সম্যক্ রূপে গৃহীত হইতে পারে না। বিশেষতঃ কীট অথবা বৃত্তের দৈহিক বল আহারের উপর যে পরিমাণ নির্ভর করে, তাহার পর্য্যালোচনাতেও ইহা দেখা যায় যে, এই মত সম্পূর্ণ স্বীকৃত হইতে পারে না। দৃষ্টান্ত স্থলে দরিদ্রগণের মধ্যেও পুত্রাধিক্য, এবং ধনীদিগের মধ্যেও কন্যা সন্তানের আধিক্য উল্লেখ করা যাইতে পারে। সুস্থ বলিষ্ঠ পিতারও পুনঃ পুনঃ কন্যা জন্মিতে দেখা যায়; আবার রুগ্ন বৃদ্ধ দুর্ব্বল পিতারও পুত্র সন্তান জন্মে। সুতরাং বলবাদের প্রথম অংশ দুষ্ট, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এক্ষণে শেষাংশের (জনন-সবলতার) কথা বিবেচনা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রেই মনে হয়, জনন-সবলতা কি? ইহা কি কোন নৈসর্গিক কারণের উপর নির্ভর করে? না জীব-কোষ নিহিত? আবার সেই পুরাতন প্রশ্ন; যাহা আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি!

(৩) (৪) নৈসর্গিক কারণ ও আনুষঙ্গিক কারণ বলিতেই উপরের লিখিত তৃতীয় ও

* "পুমান্ পুংসোধিকে শুক্রে স্ত্রী ভবত্যধিকো স্ত্রীয়াঃ।
সমেঽপুমান্" * * মনু।

† ফলতঃ কীট ও বৃত্ত—উভয়কেই উভয়ে অনু-প্রাণিত করে; উভয়ের দেহ এক হইয়া যায়। এই রূপঃ—৪০; প্রথম চিত্রে কীট ও বৃত্ত পরস্পরকে স্পর্শ করিল, দ্বিতীয়ে উভয়ে এক হইয়া যাইতেছে, তৃতীয়ে এক হইয়া গিয়াছে।

চতুর্থ মত আসিয়া উপস্থিত হয়; অর্থাৎ কাল ও স্থান। এক হিসাবে কালের স্ত্রী পুং ভেদ উৎপাদনে যে প্রভাব দেখা যায়, তাহা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। শরৎ কালে অনেক পুং জাতীয় কীটের জন্ম হয়। কিন্তু ইহা যে রস, তাপ, বায়ু, আলোক, ও আহার্য্য বস্তুর প্রভাব বশতঃ হয়, তাহা স্বীকার করা অসঙ্গত হইবে না। কিন্তু অন্য রূপেও কালের প্রভাব পুরাকাল হইতে স্বীকৃত হইয়াছে। সুশ্রুতে, শারীর স্থানে দেখা যায়ঃ—

চতুর্থ্যাং ষষ্ঠ্যাং অষ্টম্যাং দশম্যাং
দ্বাদশ্যাঞ্চো পেয়াদিতি পুত্রকামঃ। * *
অতঃপরং পঞ্চম্যাং সপ্তম্যাং নবম্যামেকাদশ্যাঞ্চ
স্ত্রীকামঃ॥

এ স্থলে দেখিবেন, পূর্ব্বার্দ্ধে যুগ্ম তিথির, এবং শেষার্দ্ধে অযুগ্ম তিথির উল্লেখ করা হইয়াছে। এই মতে যুগ্মে পুত্র, অযুগ্মে কন্যা সঞ্জাত হয়। কিন্তু রাজমার্ত্তণ্ড নামক জ্যোতিষ গ্রন্থের

ষোড়শর্ত্তু নিশা স্ত্রীয়াং তাসু যুগ্মেষু সংবিশেৎ।
যুগ্মে পুত্র বিজানিয়াৎ অযুগ্মে কন্যকা স্মৃতি।—

সই বচন দ্বারা যুগ্ম ও অযুগ্মদিগের প্রাধান্য স্বীকার করা হইয়াছে। *

উদ্ভিদ ও জন্তু, উভয় জীব দেহের উপরই তিথির আধিপত্য থাকা সকলেই স্বীকার করিবেন। সুদূর গ্রহ, উপগ্রহ অথবা নক্ষত্রাদি পার্থিব সকল পদার্থের উপরই সর্ব্বদাই স্বীয় প্রভূত আধিপত্য বিস্তার করিতেছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু কি উপায়ে এই আধিপত্য পরিচালিত হয় এবং ইহার ফল-ইবা কিরূপ, তাহা মানব এখনও কিছুই বুঝিতে পারে নাই, বলিলে অত্যুক্তি হইবেনা। সুতরাং উপরের উদ্ধৃত মত যদিও অস্বীকার করিবার উপায়—নাই, তথাপি আমাদিগের বর্ত্তমান আলোচ্য ভেদোৎপাদনে এই মত কত দূর এবং কিরূপ কার্য্যকর, তাহা বুঝা সহজ নহে। চতুর্থ মতবাদীগণ "স্থানের" আধিপত্য স্বীকার করেন। কীট ও বৃক্ষের মিলন স্থানের আধিপত্যও প্রধানতঃ গৌণ; কারণ স্থান ভেদে রস, তাপ, আলো, বায়ু এবং আহার্য্য বস্তুর প্রভেদ হওয়া অনায়াসেই বুঝা যায়। উচ্চ পর্ব্বতোপরি যে সকল অসভ্য জাতিগণ বাস করে, তাহাদের মধ্যে পুং জাতীয় সন্তানই অধিক জন্মে। ঐ সকল নৈসর্গিক কারণে জীব কোষের সবলতা ও দুর্ব্বলতা সাধিত হইয়া থাকে। সুতরাং স্থানের প্রভাবও বলবাদেরই একাংশ। তবেই দেখা যায় যে, কোন নির্দ্দিষ্ট স্থলে জনন-সবলতা যেরূপ আনুষঙ্গিক কারণের উপর নির্ভর করে, তাহা প্রধানতঃ নৈসর্গিক। কিন্তু ঐ নৈসর্গিক কারণ সকল কেবল জীবকোষের মৌলিক কুঞ্চন প্রসারণ শক্তির উপরই ক্রিয়া করে, তদ্ভিন্ন উহাদিগের অন্য কোন সফলতা নাই, ইহা কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলেই প্রতীয়মান হইবে। অর্থাৎ ঐ দ্বিবিধ মৌলিক কারণ নৈসর্গিক কারণের সহায়তায় কোন নির্দ্দিষ্ট স্থলে ফলোৎপাদন করে। এই অংশে নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে পুরুষকারের সফলতা হইবার আশা করা যায়। গর্ভাধানের পূর্ব্বে মানব স্বীয় চেষ্টা বলে নৈসর্গিক কারণাবলীর আধিক্য অথবা হ্রস্বতা উৎপাদন করতঃ বাঞ্ছিত ফল লাভ করিতে কৃতকার্য্য হইতে পারে, এমত আশা করা অসঙ্গত হয় না। যাহারা গৃহ-পালিত পশু-

* সটীক মাধবনিদান প্রণেতা শ্রীযুক্ত সারদা প্রসাদ গুপ্ত কবিরাজ মহাশয় সুশ্রুতের বচনটীর প্রতি এবং শ্রীযুক্ত নবীন চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় রাজমার্ত্তণ্ডের বচনটীর প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

শাবক অথবা পক্ষী শাবকের ব্যবসায় করে, (breeders and bird-fanciers) এবং আবশ্যক মত শাবক উৎপাদন করাইয়া বিক্রয় করে; অথবা যে সকল প্রাণীতত্ত্ববিৎ এই বিষয় আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা গৃহপালিত পশু অথবা পক্ষীগণের বংশ পরম্পরাগত ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নৈসর্গিক কারণের (আহার, তাপ, আলো-প্রভৃতির) তারতম্য ঘটাইয়া অনেক স্থলে অভিপ্রেত রূপে স্ত্রী জাতীয় অপত্য অথবা পুং জাতীয় অপত্য উৎপাদন করাইতে সক্ষম হইয়াছেন। * মানবের নিরাশ হইবার কোনই কারণ নাই। মনুষ্য সন্তানও বোধ হয় এই রূপে নিয়ন্ত্রিত হইতে পারিবে। কিন্তু এই বিষয়ে আরও অধিকতর অনুশীলন হওয়া আবশ্যক। সকলেই এ ক্ষেত্রে অল্লাধিক চেষ্টা অনায়াসে করিতে পারেন। নচেৎ এ বিষয়ের জ্ঞান চিরদিন অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে; এবং মানব সমজের কল্যাণ সুদূর-পরাহত হইবে। শ্রীশশধর রায়।

কবিওয়ালা। (৩)

৩। রাসু ও নৃসিংহ।

রাসু ও নৃসিংহ এক বৃন্তে দুটী ফুল, এক প্রাণে দুই দেহ। বঙ্গবাসীকে সখী-সম্বাদ ও বিরহ-সংগীতে মাতোয়ারা করিতেই যেন তাঁহারা জোড়ামাণিক হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাসু ও নৃসিংহ দুই সহোদর। বাঙ্গালা ১১৪১ সালে, ইংরেজি ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে রাসু এবং বাঙ্গালা ১১৪৪ সালে, ইংরেজি ১৭৩৮ খ্রীঃ অব্দে নৃসিংহ ফরাসডাঙ্গার অধীন গোন্দলপাড়া গ্রামে ভদ্রকায়স্থ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাহাদের পিতার নাম আনন্দী নাথ রায় ছিল। আনন্দী নাথ ফরাসি গবর্ণমেণ্টের অধীন সামরিক বিভাগে সামান্য মুহুরীগিরি কার্য্য করিতেন। এই পদের বেতন সামান্য নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও তাঁহার রোজগার কিন্তু সামান্য হইত না, অন্য উপায়ে তিনি বেশ উপায় করিতেন। রায় মহাশয় বলিতেন, অর্থ উপার্জ্জনের সময় ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা করিবে না, কিন্তু একবার হস্তগত হইলে তাহা যাহাতে উপযুক্ত কার্য্যে, ধর্ম্মার্থে ব্যয়িত হয়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃ রাখিতে হইবে। এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি নাকি অধর্ম্মোপায়ে অর্জ্জিত অর্থের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তদ্বারা বৎসরান্তে মহামায়া গণেশ জননী দুর্গার রাতুল চরণ জাঁক জমকের সহিত অর্চ্চনা করিতেন। উপার্জ্জনের সময় হিতাহিত জ্ঞান না থাকিলেও রায় মহাশয় অর্থের সদ্ব্যবহার করিতেন। তিনি দীন দুঃখীর অভাব মোচন ও অতিথি অভ্যাগতের পরিচর্য্যা করিতে কাতর হইতেন না। এই সকল কার্য্যে তাঁহার অর্জ্জিত অর্থের অধিকাংশই ব্যয়িত হইত।

* Yung raised the percentage of females in one brood (of tadpoles) from 56 in those unfed to 78 in those fed with beef. Giron divided a flock of 300 Ewes into equal parts, of which the one half was extremely well fed and served by two young rams, while the other was served by two mature rams and poorly fed. The proportion of ewe lambs in the two cases was respectively 60 and 40 percent, Encyclo. Brit. 9th Ed, Vol 21, P722.

এস্থলে জনক জননীর আহারের এবং এবং বয়সের তারতম্য ঘটাইয়া পরীক্ষা করা হয়।

রাসু ও নৃসিংহ পাঠার্থে একত্র গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় প্রেরিত হন। আনন্দী নাথের শ্বশুর-বাড়ী চুচুঁড়া; তৎকালে তথায় মিশনারীদিগের প্রতিষ্ঠিত একটী বাঙ্গালা বিদ্যালয় ছিল। এই বিদ্যালয় ১৮১৪খ্রীষ্টাব্দে পাদরী মে কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অস্তিত্ব রক্ষা করিয়াছিল। পাঠশালার কার্য্যপ্রণালী ও অবস্থা তাদৃশ সন্তোষজনক না হইলেও, আনন্দী সেই স্থানেই পুত্রদ্বয়ের অধ্যয়নের ব্যবস্থা করেন এবং শুভদিন দেখিয়া তাহাদিগকে নিজ শ্যালকের তত্ত্বাবধানে চুচঁড়ায় প্রেরণ করেন। এই সময় বাঙ্গালা শিক্ষাদানের প্রতি গবর্ণমেণ্টের ঔদাসিন্য পরিলক্ষিত হইত। কার মহোদয় লিখিয়াছেন,—

"Previous to 1823 comparatively little had been done for the advancement of Native Education. The number of Institution was very limited and they attracted very little interest. There was no organized system of superintendence. All matters connected with education were under the general control of the Government. But about this time the subject of Native Education began to revive a greater share of attention. *

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাস হইতে এতদ্বিষয়ে অনেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

রাসু ও নৃসিংহ মাতুলালয় হইতে লেখা পড়া করিতে আরম্ভ করিল, মাতুল মহাশয়ও ভাগিনেয়দ্বয়ের পড়া শুনার প্রতি একটু দৃষ্টি দিতে লাগিলেন,কিন্তু একটা কথা আছে 'অদৃষ্টে না থাকিলে ঘি, ঠক ঠকালে হবে কি?' বালকদ্বয়ের সম্বন্ধেও তাহাই হইল। রাসুনৃসিংহ মাতুলের চেষ্টা ও যত্ন সত্ত্বেও বিদ্যালয়ের নাম করিয়া পুস্তক লইয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পথের ধারে পুষ্করিণীতে পুস্তকের পাতা ছিঁড়িয়া নৌকা প্রস্তত করতঃ ভাসাইতে লাগিল। একদিন, দুই দিন, তিন দিন, তারপর এ সংবাদ তাহাদের মাতুলের কর্ণে পৌঁছিল। তিনি তাহাদিগকে বিশেষরূপে শাসন করিতে লাগিলেন সত্য,কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না,—চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী। অগত্যা মাতুল মহাশয়কে বাধ্য হইয়া এক বৎসর পর ভাগিনেয় দ্বয়কে গোন্দলপাড়া রাখিয়া আসিতে হইল। ইহার অল্প দিন পরেই আনন্দী কালকবলে পতিত হইলেন, সুতরাং তাহাদের শেষ অন্তরায় চিরদিনের মত অন্তর্হিত হইল, 'হরদম ফূর্ত্তি' করিবার বিপুল অবসর উপস্থিত হইল।

বালকদ্বয় এইরূপে সোণার শৈশবকাল ব্যর্থ অতিবাহিত করিলেও, তাহাদের হৃদয়ে সেই কবি-প্রতিভা উপ্ত হইতে লাগিল। দুর্গোৎসবের সময় তাহাদের বাড়ীতে মহামায়ার সম্মুখে কবির গাওনা হইত। এই সময় হইতেই কবি গানের প্রতি তাহাদের চিত্ত আকৃষ্ট হয়। যৌবনের প্রারম্ভে তাহারা গ্রামের কতিপয় ব্যক্তির সহযোগে এক সখের কবির দল গঠিত করিল। হরু ঠাকুর যাহার নিকট রচনা শিক্ষা করেন, ইহারাও সেই তন্তুবায় জাতীয় কবিওয়ালা রঘুনাথ দাসের নিকট প্রথম শিক্ষা লাভ করে। এই রঘু 'দাঁড়কবি' দলের সৃষ্টিকর্ত্তা। রাসু নৃসিংহ যখন দলবল সহ সন্ধ্যার পর বাড়ীতে বসিয়া আখড়াই দিত, পাড়ার লোকে তখন বলাবলি করিত, এইবার আনন্দীর বাড়ীতে ভূতে নৃত্য করিবে, তাহার ভিটায় ঘুঘু চরিবে। গ্রামবাসীগণের ধারণাই ছিল না যে, এই দুই বালক, কালে সংগীত তানে বঙ্গবাসীকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিবে। ১১৫৭ বঙ্গাব্দে

* Review of Public Instruction, Chap v.

তাঁহারা প্রথম কবির দল লইয়া কলিকাতার এক ধনাঢ্য ব্যক্তির ভবনে গাওনা করেন। এখানেই তাঁহাদের ভাবী-জীবনের পূর্ণ সাফল্যের সূত্রপাত হয়। এই সময় হরুঠাকুর প্রভৃতি প্রৌঢ়াবস্থা অতিক্রম করিয়াছিলেন, তাঁহাদের যশ ও সমৃদ্ধি সুপতিষ্ঠিত হইয়াছিল। লালু নন্দলাল, রাসু-নৃসিংহের সমসাময়িক।

আমাদের আলোচ্য কবিদ্বয় যে সকল গান রচনা করিতেন, তাহার ভণিতিতে দুই জনের নামই থাকিত। সুতরাং কোন্ গীতটী কাহার রচিত, তাহা ঠিক বলা যায় না। উভয় ভ্রাতাই কবি ছিলেন এবং উভয়েই সংগীত রচনায় সিদ্ধহস্ত হইয়াছিলেন। অনেকে অনুমান করেন যে, রাসু ও নৃসিংহের দুইজনের একজন কবি ছিলেন, এক জনই কেবল সংগীতাদি রচনা করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের উভয় ভ্রাতার প্রীতি-বন্ধন গাঢ়তর ছিল বলিয়া ভণিতিতে রাসু-নৃসিংহ দুই নামই সংযুক্ত হইত। এ কথা কতদূর সত্য, তাহা বলিতে পারি না। স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়, ১২৬১ সালের ১লা মাঘের 'প্রভাকরে' লিখিয়াছিলেন,—"ইহাঁদের বিরচিত সুর ও গীত শ্রবণে প্রধান প্রধান পণ্ডিত ও বিশিষ্ট সন্তান মাত্রেই অত্যন্ত সন্তুষ্ট ও সুখী হইতেন। উক্ত উভয় সহোদরের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি গীত ও সুর রচনায় নিপুণ ছিলেন, তদ্বিষয়ে আমরা কিছুই জানিতে পারি নাই। যাহা হউক, দুইজনের ভিতর এক ব্যক্তি সুকবি ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহাঁরা সখী-সম্বাদ ও বিরহগান যাহা যাহা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাই অতি উৎকৃষ্ট, অতিশয় শ্রুতি-সুখকর ও সর্ব্ববিষয়েই যশোযোগ্য।"

কবিওয়ালাদিগের এক এক জন এক এক বিষয়ের গীতরচনায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। রাম বসু—বিরহ সংগীত রচনায়, হরুঠাকুর—সখী-সম্বাদ রচনায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং তৎবিষয়ে তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্ববাদিসম্মত। রাসু-নৃসিংহ তাঁহাদের ন্যায় কোন এক বিষয়ে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে না পারিলেও, তাঁহাদের রচিত বিরহ ও সখী-সম্বাদ এই দুই ভাবের গীতই রামবসু ও হরুঠাকুরের পরে আসন পাইবার যোগ্য। তাঁহাদের একটী সখী-সম্বাদ এইরূপঃ—

প্রাণনাথ মোর সেজেছেন শঙ্কর,
দেখসিয়ে প্রিয়ে ললিতে।
অপরূপ দরশন আজু প্রভাতে।
বুঝি কারো কাছে রজনী জেগেছে।
নয়ন লেগেছে ঢুলিতে। (মহড়া)।
পার্ব্বতী-নাথের অর্দ্ধশশধর
সবিতা অর্দ্ধকপালেতে।
আমারো নাগর সেজেছেন সুন্দর
চন্দন সিন্দুর ভালেতে। (চিতেন)।
হায়, মথনের বিষ ভখিয়ে মহেশ,
নীলকণ্ঠ দেশে নিশানা।
নীলকণ্ঠনাম অতি অনুপম,
জগতে রয়েছে ঘোষণা। (অন্তরা)।
আমার নাগর গিয়েছিলেন কা.রা
কলঙ্ক সাগর মথিতে।
ফুরায়ে মন্থন এনেছেন নিশান
আঁখির অঞ্জন গলাতে। (চিতেন)।
হায়, ত্রিলোচন হর, জগতে প্রচার,
এক চক্ষু যার কপালে।
কৃষ্ণপ্রেমে ভোরা পাগলের পারা,
ধুতুরা শ্রবণ যুগলে (অন্তরা)।
ইহারো সেইমত সপত্র সহিত,
কদম্ব শ্রবণ যুগেতে।
ত্রিলোচন চিহ্ন দেখ দীপ্তমান,
কপালে কঙ্কণ আঘাতে। (চিতেন।) *

* ইহাঁদের অল্পকাল পরবর্ত্তী কবিওয়ালা রামবসুরও এই ভাবের একটী গান আছে,—

হর নই হে আমি যুবতী,
কেন জাগাতে এলে ঋতুপতি। ইত্যাদি

(১৩১১ সালের নব্যভারত, ৫৭১ পৃষ্ঠা দেখুন।)

উক্ত গীতটীতে যে অভিনব রূপে হর ও হরির সমতা প্রদর্শিত হইয়াছে, তদ্রূপ আর কোনও কবিই দেখাইতে পারেন নাই। অবশ্য তৎপূর্ব্বেও দুই একজন কবি হর হরির সমতা প্রদর্শন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহার সহিত এ গীতটীর কোনরূপ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় না। আমরা প্রথম প্রস্তাবে দেখাইয়াছি যে, বিদ্যাপতি ও জয়দেবের রচিত এই বিষয়ের দুইটী গান আছে। বিদ্যাপতি শঙ্করের সহিত বিরহবিধুরা নারীর সমতা দর্শাইয়াছেন এবং জয়দেব শঙ্করের সহিত বিরহখিন্ন কৃষ্ণের সমতা প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের উভয়েরই কল্পনা অন্য দিক্ দিয়া ছুটিয়াছে। সে যা হোক, রাসু-নৃসিংহের গীতটীর ভাবই আমাদের আলোচ্য। এইরূপ সরল ও স্বাভাবিক শ্লেষোক্তি কয়জন প্রাচীন কবির কাব্যে পাওয়া যায়? গুপ্তকবি এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"আহা! আহা! কবিওয়ালাদিগের মধ্যে এবম্ভূত শ্লেষঘটিত সরস রূপকরচনা প্রায় কখনই শ্রবণ পথের পথিক হয় নাই। এই গীতটীর তুল্য নাই, মূল্য নাই। এ বিষয়ে কি বাক্যে কবির সুখ্যাতি করিব, তদ্বর্ণনে বর্ণ বিবর্ণ হইল।" তাঁহাদের আর একটী সখীসম্বাদের কিয়দংশ—

ইহাই ভাবিহে গোবিন্দ! সঘনে,
আঁখি হাসে পরাণ পোড়ে আগুনে।
কি দোষ বুঝিলে, রাধারে তেজিলে,
কুঁজীয়ে পুজিলে কি গুণে? (মহড়া)।
জগত সংসার, ভুলাইতে পার,
তোমার বঙ্কিম নয়নে।
ওহে, কুঁজী অবহেলে, বসিয়ে বিরলে,
তোমারে ভুলালে কি গুণে? (চিতেন)
শ্যাম! রূপগুণে পূর্ণ, সকলি সুধন্য,
অতুল্য লাবণ্য রাধাযে।
ইহাই ভেবে মরি, কুব্জাবিহারী,
কি সুখে হয়েছ নাগরো। (অন্তরা।)
শ্যাম! গুণের গরিমা, কি কহিব সীমা,
আগমে যাহার প্রমাণ।
যার গুণ গেয়ে, মুরলী বাজায়ে,
নাম ধর বংশীবদন। (অন্তরা।)
শ্যাম! যার গুণাগুণ, করিতে সাধন,
সনাতন গেল কাননে।
ওহে, এ বড় বেদন, তেজিয়ে সে ধন,
অধনে রেখেছ যতনে। (চিতেন।) ইত্যাদি

এই সখী-সম্বাদটীর ভাবভঙ্গি, রচনা-পারিপাট্য, কবিত্ব-সৌন্দর্য্য যেরূপ মনোহারী, উহার ব্যঙ্গ, শ্লেষ প্রভৃতি আগ্নেয়-বাণও তেমনি হৃদয়-বিদারী। একদিকে যেমন একান্ত নির্ভরতা, রূপ গুণে বিমুগ্ধার ন্যায় একান্ত আসঙ্গলিপ্সার ভাব, অপরদিকে তেমনি অভিমান-স্ফুরিত দর্প ভাব, বিদ্বেষ-বুদ্ধি-প্রণোদিত অহমিকা প্রকাশিত হইয়াছে। অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবেন, প্রাচীন কবিওয়ালাদের মধ্যে এরূপ শ্লেষকর রূপক রচনা বিরল না হইলেও অতি অবিরল নহে।

এখন রাসু-নৃসিংহের একটী বিরহ-সংগীত শোনা যাক্—

কহ সখি! কিছু প্রেমেরি কথা,
ঘুচাও আমার মনের ব্যথা।
করিলে শ্রবণ হয় দিব্য জ্ঞান,
হেন প্রেমধন উপজে কোথা।
আমি এসেছি বিরাগে মনের বিরাগে,
প্রীতি-প্রয়াগে মুড়াব মাথা। (মহড়া)
আমি রসিকের স্থানে পেয়েছি সন্ধান,
তুমি নাকি জান প্রেম-বারতা।
কাপট্য ত্যেজিয়ে কহ বিবরিয়ে।
ইহার লাগিয়ে এসেছি হেথা। (চিতেন।)
হায়! কোন্ প্রেমে লাগি প্রহ্লাদ বৈরাগী,
মহাদেব যোগী কেমন প্রেমে।
কি প্রেম কারণে ভগীরথ জনে,
ভাগীরথী আনে ভারতভূমে। (অন্তরা।)

কোন্ প্রেমে হরি বধি ব্রজনারী।
গেল মধুপুরী করি অনাথা।
কোন্ প্রেম বলে কালিন্দীর কূলে।
কৃষ্ণপদ পেলে মাধবী লতা॥ (চিতেন।)

এ বিরহ-সংগীতে কি ইন্দ্রিয়-লালসার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হইতেছে? যে প্রেমে লোকে ছি ছি করে, গুরুজনে লাঞ্ছনা গঞ্জনা দেয়, যে প্রেমে লুকোচুরি আছে, হা হুতাশ আছে, পাপ আছে, কলঙ্ক আছে, এমন কি, শেষে অনুতাপও আছে, একি সেই প্রেম? যে প্রেম দর্শন মাত্র উৎপন্ন হয়, যে প্রেম আলিঙ্গনের নিমিত্ত আই ঢাই করে, যে প্রেম চোখের দেখার জন্য ছুটোছুটি করে, যে প্রেম ইন্দ্রিয়-বিনোদনে পরিতৃপ্ত হয়, একি সেই জঘন্য প্রেম-চিত্র? যদি তাহাই আপনার ধারণা হয়, তবে আমরা বলিব, আপনি কবির রচনা-সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। এ কবির এ প্রেম-চিত্র মানুষী প্রেম ছাড়াইয়া অমানুষী প্রেম রাজ্যের সামগ্রী। যে প্রেম অবিশ্রান্ত অনাদর ও হতাদরে অবিচালিত, যে প্রেম দর্শন অদর্শন, ও সুখ দুঃখের কঠোর ঝঞ্ঝাবাতে অপ্রকম্পিত, যে প্রেম দেহে দেহে, প্রাণে প্রাণে, হৃদয়ে হৃদয়ে মিশিয়া পশুকে মানুষ করে, মানুষকে দেবতা করে, এ সেই স্বর্গীয় অমানুষী প্রেম। ইহাতে আবিলতা নাই, বিলাসিতা নাই—এ প্রেম গুরুজন, পাড়া প্রতিবাসী, সকলের সম্মুখেই করা যায়!

এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, রাসু নৃসিংহের বা অন্যান্য কবিওয়ালাদিগের সকল প্রেম সংগীতগুলিই এই উচ্চ আদর্শে রচিত নহে। এমন অনেক রচনা আছে, তাহা মনে মনে পাঠ করিতেও লজ্জা বোধ হয়। সেই সকল প্রেম-সংগীত সম্বন্ধে রাসুনৃসিংহ গাহিয়াছেন,—

সখি! এ সকল প্রেম নয়,
ইহাতে মজিয়ে নাহি সুখের উদয়।
সুহৃদ্ ভঞ্জন, লোক গঞ্জন
কলঙ্ক ভঞ্জন হ'তে হয়॥ (মহড়া।)
এমন পিরীতি করি, যাতে তরি দুদিক
ঐহিক আর পার্থিক।
শ্রীনন্দনন্দন, দুখভঞ্জন,
সদা রাখি মনে তাঁরি পায়। (চিতেন।)

এই সকল ভোগ বিলাসে আবিলতাময় প্রেম সম্বন্ধে কবিদ্বয়ের তীব্র ব্যঙ্গোক্তি;—

তোমার চরিত, পথিক যেমত,
হ'য়ে শ্রান্তি যুত বিশ্রাম করে।
শ্রান্তি দূর হ'লে যায় সেই চলে,
পুন নাহি চায় ফিরে।

ইন্দ্রিয়-লালসাতে যে প্রেমের উৎপত্তি এবং ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিতে যাহার পরিসমাপ্তি, সে প্রেমের স্বভাব এইরূপ। এ বিষয়ে কবিদ্বয় যেরূপ সুতীক্ষ্ণ বাক্যবাণ বর্ষণ করিয়াছেন, অন্য কোন কবিওয়ালার রচনায় তদ্রূপ পরিলক্ষিত হয় না। রাসু নৃসিংহের রূপক রচনার নৈপুণ্য বহু ঊর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত।

আমরা কবিদ্বয়ের সখীসম্বাদ ও প্রেম-বিরহ-সংগীত ব্যতীত অন্য কোন ভাবের গীত প্রাপ্ত হই নাই। অপর কেহ পাইয়াছেন কি না, তাহাও জ্ঞাত নহি। রাসু নৃসিংহের যে গানগুলি দেখিয়াছি, তাহা হইতে বুঝিতে পারি, সরস, মধুর রচনার মধ্যে শ্লেষ ব্যঙ্গোক্তি বর্ষণ করিতে তাঁহারা বিশেষ অভ্যস্থ ছিলেন। অন্যান্য কবিওয়ালা-গণের প্রেম-সংগীতে যেমন রসের ছড়াছড়ি, প্রেমের গড়াগড়ি দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা সেরূপ উচ্ছৃঙ্খল, অশ্লীল ভাব ও

ভাষার প্রশ্রয় দেন নাই। এই অংশে তাঁহারা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। এই দুই সরল অশিক্ষিত কবি, তৎকাল-প্রচলিত কু-স্রোতে সন্তরণ দিয়াও উহার আবিলতাময় ঘূর্ণাবর্ত্তে নিমগ্ন হন নাই, এ ঘটনা বস্তুতই শ্রুতিসুখাবহ ও মনঃতৃপ্তিকর। ইহাঁরা কুরুচির প্রশ্রয় না দিলেও দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। হরুঠাকুর, রামবসু প্রভৃতির ন্যায় ইহাঁদের কবিগানও দেশের সর্ব্বত্র গীত হইত এবং তদ্দ্বারা তাঁহারা প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন।

শুনিতে পাওয়া যায়,রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের সহিত রাসু নৃসিংহের একবার সাক্ষাৎ হয়। ভারতচন্দ্র শ্রীবৃন্দাবন ধামে গমনোদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়া কিয়দ্দিবস গোন্দলপাড়ায় এক ব্রাহ্মণের আলয়ে অবস্থান করেন। এই সময় তাঁহার সহিত রাসুনৃসিংহের সাক্ষাৎ ও আলাপ পরিচয় হয়। ভারতচন্দ্রের তখন প্রৌঢ়াবস্থা এবং রাসু নৃসিংহ কেবল যৌবনে পদার্পণ করিয়াছিলেন।

ফরাসী গবর্ণমেণ্টের দেওয়ান স্বর্গীয় ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয় কবিগণের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি সময় সময় নানা স্থান হইতে কবির দল বায়না করিয়া আনাইয়া স্বভবনে গাওয়াইতেন। রাসু নৃসিংহও চৌধুরী মহাশয়ের কৃপা লাভে বঞ্চিত হইয়াছিলেন না। যতদিন চৌধুরী মহাশয় জীবিত ছিলেন, ততদিন তাঁহারা তাঁহার আনুকূল্য পাইয়াছিলেন। কবিওয়ালারা এবং অন্যান্য সংগীতকারগণ ফরাসিরাজ্যে এইরূপ সাহায্য পাইতেন বলিয়া, এককালে ফরাসডাঙ্গা সংগীতকারদিগের প্রধান আড্ডা হইয়া উঠিয়াছিল। কাহারও কোনও ব্যাপার উপলক্ষে সংগীতের প্রয়োজন হইলে, তাহাকে ফরাসডাঙ্গায় যাইয়া বায়না করিতে হইত। এ বিষয় আমরা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিব।

১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় ৭২ বৎসর বয়সে রাসুর মৃত্যু হয়। নৃসিংহ ইহার পরও কয়েক বৎসর জীবিত ছিলেন।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

অশ্বঘোষ।

(বুদ্ধচরিত)

(ধর্ম্মের অবতার ও বুদ্ধের জন্ম—১৮—৩০শ্লোক)

মহাযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধধর্ম্মে যে অবতারবাদ দৃষ্ট হয়, তাহা এই কাব্যের এই অংশে সুস্পষ্ট। অযোনি-জাত মহাত্মাদের কথা বহু পূর্ব্বের প্রবাদেও প্রচলিত ছিল; এ সর্গেও তাহার উপন্যাস আছে। কিন্তু পুংসংসর্গ ব্যতীত স্ত্রীগর্ভে জন্মের কথা এই কাব্যের সময়ের কত পূর্ব্বে প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। কৃষ্ণ জন্মের বিশেষ বিবরণ খ্রীষ্টপরবর্ত্তী যুগের গ্রন্থেই পাওয়া যায়; এবং সেই বিবরণে এইরূপ জন্মের কথা পরোক্ষভাবে পাওয়া যায়। যাহা হউক, বৌদ্ধ অবতারে এবং কৃষ্ণ অবতারে যখন অবতীর্ণদিগের মাতা বিবাহিতা পত্নী এবং পতিগৃহবাসিনী, তখন খ্রীষ্ট-

প্রবাদের কথা লইয়া যে সকল তর্ক উঠিয়াছে, তাহার আলোচনার প্রয়োজন নাই।

অনিন্দ্রিয়েনাত্মনি দুঃকুহোঽয়ং
ময়া জনো যোজয়িতুং নশক্যঃ।
ইতীবসূক্ষ্মাং প্রকৃতিং বিহায়
ধর্ম্মেন সাক্ষাৎ বিহিতা স্বমূর্ত্তিঃ॥

অনিন্দ্রিয় ধর্ম্ম ; তাই পারে নাকো কেহ
করিতে তাঁহার সাথে আত্ম সংযোজন ;
তেজিয়া প্রকৃতি সূক্ষ্ম, সুপ্রত্যক্ষ দেহ
করিলেন ধর্ম্ম তাই আপনি গ্রহণ।

চ্যুতোঽথ কায়া তুষিতা ত্রিলোকীং
উদ্যোতয়ন্-নুত্তম বোধিসত্ত্বঃ।
বিবেশ তস্যা স্মৃত এব কুক্ষৌ
নন্দা গুহায়াং-ইব নাগরাজঃ॥

আগমনে ত্রিভুবন আলোকে উদ্ভাসি
তেজিয়া তুষিত নামে স্বর্গ উচ্চতম
প্রবেশিলা রাণীগর্ভে বোধিসত্ত্ব আসি ;
নন্দা গুহা মাঝে যেন নাগরাজ সম।

ধৃত্বা হিমাদ্রিধবলং গুরু ষড়্ বিষাণং
দানাদি বাসিতমুখং দ্বিরদস্যরূপং
শুদ্ধোদনস্য বসুধাধিপদের্মহিষ্যাঃ
কুক্ষিং বিবেশ স জগৎ ব্যসনক্ষায়ায়।

হিমাদ্রি ধবল কান্তি করী রূপ ধরি
(মদ সুবাসিত মুখে ষড় দন্ত শোভে) *
হরিতে জগত পাপ প্রবেশেন মরি
রাজা শুদ্ধোদন পত্নী মায়ার গরভে।

রক্ষাভিধানং প্রতিলোকপালাং
লোকৈকনাথস্য দিবোঽভি জগ্মুঃ।
সর্ব্বত্রঃভাস্তোপি হি চন্দ্রপাদা
ভজন্তি কৈলাশ-গিরৌ বিশেষং।

লোকনাথ বলি তিনি, তাঁহার সকাশে
লোকপালগণ আসি নিল রক্ষা ভার ;
সর্ব্বত্র বিভাতে চন্দ্র, তবুও কৈলাশে
সবিশেষ প্রকাশিত কিরণ তাহার।

মায়াপি তাং কুক্ষিগতং দধানা
বিদ্যুৎবিলাসং জলদাবলীব।
দানাভিমর্ষৈঃ পরিতোজনানাং
দারিদ্রতাপং শময়াং চকার॥

শোভিলেন মায়া দেবী,—গর্ভে ধরে তাঁরে
বিজলি নিহিত গর্ভ জলদের মত ;
বরষিয়া দয়া রাণী দানের আকারে
জগতে দারিদ্রতাপ বিনাশেন যত।

সাস্তঃ পুরজনা দেবী কদাচিদথ লুম্বিনীং
জগামানুমতে রাজ্ঞঃ সংভূতোত্তমদোহদা।

যাইতে লুম্বিনীবনে হইল দোহদ মনে ;
পুরনারী সহ তাই করেন প্রবেশ
একদা সে বনে, লভি রাজার আদেশ।

শাখামালম্বমানায়াঃ পুষ্পভারাবলম্বিনীং
দেব্যাঃ কুক্ষিং বিভিত্ত্বাশু বোধিসত্ত্বো
বিনির্যযৌ।

হেলাইতে তরুশাখা পুষ্প ভার নতা,
কুক্ষি মাঝে বোধিসত্ত্ব প্রবেশিলা তথা।

ততঃ প্রসন্নঃ স বভূব পুষ্য-
স্তস্যাশ্চ দেব্যা ব্রত সংস্কৃতায়াঃ
পার্শ্বাৎ সুতো লোকহিতায় জজ্ঞে
নির্বেদনং চৈব নিরাময়ঞ্চ॥

ব্রত সংস্কারঃ পূত দেবী গর্ভ হতে
লোকাহিতে যবে সুত ভূমিষ্ঠ হইল,
উজ্জ্বল প্রসন্ন পুষ্য ছিল নভপথে ;
সুপ্রসবে ব্যথা রাণী কিছু না জানিল।

প্রাপ্তঃ পয়োদাদিব তিগ্মভানুঃ
সমুদ্ভবন্ সোপি চ মাতৃকুক্ষেঃ
স্ফুরণ্ময়ুখৈর্বিহতান্ধকারৈঃ
চকার লোকং কনকাবদাতং।

মাতৃ কুক্ষি হতে দেব লভিলা উদয়
পয়োদ ভেদিয়া দীপ্ত ভানুর মতন ;
আলোকে হইল দূর অন্ধকার চয়,
কনকের মত পৃথিবী শোভিল তখন।

---

* করীর বর্ণনা করিতে হইলেই মদস্রাব বর্ণনা করিবার রীতি ছিল। ষড়দন্ত হস্তীর কথা পূর্ব্ব প্রবাদেও হিন্দু সাহিত্যে পাওয়া যায়। প্রবাদের মূল কি, জানিনা।

তং জাতমাত্রমন্ত কাঞ্চনযূপগৌরং
প্রীতঃ সহস্রনয়নঃ শনকৈরগৃহ্লাৎ
মন্দার পুষ্প নিকরৈঃ সহতস্যমূর্দ্ধি
খান্নির্ম্মলে চ বিনিপেত ভূরম্বুধারে।

কাঞ্চন যূপের মত গৌর কান্তি তাঁর।
হেরিয়া লভিয়া তৃপ্তি সহস্র নয়ন
বরষিলা যুগ্ম ধারা মিশায়ে মন্দার
গগন হইতে তাঁর শিরে সেইক্ষণে।

সুরপ্রধানৈঃ পরিধার্য্যমাণো
দেহাং শুস্রাণৈ রমুরঞ্জয়ং স্তান্
সন্ধ্যাভ্রজালো পরিসং নিবিষ্টং
নবোডুরাজং বিজিগায় লক্ষ্ম্যা।

সুর প্রধানেরা আসি করিলা ধারণ;
রঞ্জিল তাঁদের তনু আলোকে তাঁহার।
সান্ধ্যমেঘ অধিষ্ঠিত চন্দ্রের কিরণ
পরাজি এ নবচন্দ্র শোভে চমৎকার।

উরোর্যথৌর্ব্বস্য পৃথোশ্চ হস্তাৎ
মান্ধাতুরিন্দ্র প্রতিমস্য মূর্দ্ধঃ
কক্ষীবতশ্চৈব ভুজাংশদেশাৎ
তথাবিধং তস্য বভূব জন্ম।

উরু হতে ঔর্ব, হস্ত হতে পৃথু জাত,
ইন্দ্রতুল্য মান্ধাতার জন্ম শির হতে,
ভুজে জাত কক্ষীবান্; তেমনি বিখ্যাত
হইল জনম তাঁর জানি এ জগতে।

ক্রমেন গর্ভাদভিনিঃসৃতঃ সন্
বভৌগতঃ খাদিব যৌন্যজাতঃ
কল্পেষনেকেষ্বিব ভাবিতাত্মা
যঃ সংপ্রজানন্ সুষুবে ন মূঢ়ঃ।

ভাতিল সে তনু, যেন নভপথে আসি,
অযোনী সম্ভূতরূপে জন্মি গর্ভ হতে;
শত শত কল্পে সংগ্রহিয়ে জ্ঞানরাশি
পূর্ণজ্ঞানে জন্ম তাঁর; নহে মূঢ় চিতে।

শ্রীবিজয় চন্দ্র মজুমদার

দম্পতির স্বর্গারোহণ। *

কেন আজ হেরি আঁধার কাকিনা?(২)
কেন রঙ্গপুর আঁধারে ভরা?
বঙ্গের উত্তর আঁধারে আবৃত?
আঁধারে আবৃত কেন এ ধরা?
জয়তী জননী ইটাকুমারীর (৩)
বদন মলিন হইল কেন?
চলেনা সমীর, বিলোকিছি আজ
প্রকৃতির শ্বাস-নিরোধ যেন।
কি অশিব আজ ঘটেছে বুঝিনা
কপাল ভেঙ্গেছে মোদের বুঝি
তাই আজ হেরি চারিদিকে; আর
পারি না মনের সহিতে যুঝি।
সুর-সরস্বতী কবিতা-নলিনী
সবিতা-সঙ্গিনী দিবারে লয়ে

বুঝি অস্তমিত হয়েছে হয়েছে,
তাই গেছে ধরা আঁধার হয়ে।
যার রসময়ী লেখনী নিয়ত
বরষিত কত সুধার ধারা,
সুর-সরস্বতী সুর-তরঙ্গিণী
তরঙ্গে ভাসায়ে দিত এ ধরা।
উঠিত, পড়িত, তরঙ্গ তুলিত,
সোণার সমান উঠিত জলি।
ভাষা-জলধির সলিলে মিশিত,
মুকুতার মত তরঙ্গ তুলি।
হায়! সেই মহা কবি-দেবকবি
শ্রীশ্বর এখন জগতে নাই।
কেন তার বীণা সহসা নীরব!
কোথা গেলে এবে তাঁহারে পাই?
বাণীকর হতে লইয়া বীণারে
ঝঙ্কারে মোহিল ভুবন যিনি।
কোথা সেই কবি? কোথা সে গায়ক?
কোথায় চলিয়া গিয়াছেন তিনি?

* অদ্বিতীয় সংস্কৃত মহাকবি শ্রীশ্বর বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের পত্নী শ্যামাসুন্দরী দেবীর সহিত স্বর্গারোহণ উপলক্ষে।
(২) রংপুর জেলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ গ্রাম।
(৩) কবির জন্মভূমি।

ভারতে অমর　　ভারতী-উপলে
বিক্রম ভারত (১) যে গেঁথেছিল।
শম্ভুচন্দ্র (২) স্মৃতি　　সুন্দর মন্দির
নিরমিতে যাঁর যতন ছিল।
সেই কবিপতি　　-স্থপতি এখন
নন্দন-কাননে আনন্দমঠ।
নিরমিতে বুঝি,　　বুঝেছি আহূত,
কে আঁকিবে আর তেমন পট ?
সুরবাণী ফুল　　দলে সুচিকণ
মালা গেঁথেছিল যে মালাকর।
কোথা গেল সেই ?　　মালা গাঁথিবারে
নিয়েছে কি তারে অমরবর ?
মাতাইয়া ধরা　　কবিতা-কাননে
গাইত পঞ্চমে যে পিকরাজ।
কোথা চলি গেল　　উড়িয়া গগনে ?
কেন পুন তারে দেখিনা আজ ?
যাঁহার কবিতা　　কাদম্বিনী পরে
চমকিত কত চপলাদাম,
তাহতে হইত　　সুধা-বরিষণ,
কেন আজ তিনি মোদের বাম ?
গ্রহণী-রোগেতে　　পয়োমাত্র-পায়ী
হইয়া শুইয়া শয়নে যিনি,
"বিজয়িনী" নামে　　কবিতা সুন্দরী
সৃজিলেন ; হায়! কোথায় তিনি ?
সেদিনের কথা,　　দিল্লীমহোৎসব"
বাহিরিল যাঁর লেখনী হ'তে,
যার বিনিময়ে　　ব্রিটিশরাজের
ধনরাশি এল তাঁহার হাতে।
যাঁহার মধুর　　লেখনী-জনিত
"হেমোদ্বাহ" নামে কবিতাধারা
আজিও কাকিনা　　রাজের (৩) নয়নে
প্রবাহিত করে সলিল-ধারা।
যে দেব গিরির　　দেব নিঝরিণী (৪)
ঝর ঝর করি বহিত সদা।

(১) লক্ষ শ্লোকে বিরচিত মহাভারতের ন্যায় বৃহৎগ্রন্থ।

(২) কাকিনার ভূতপূর্ব্ব রাজা।

(৩) বর্ত্তমান কাকিনাধিপতি শ্রীযুক্ত রাজা মহিমারঞ্জন রায় মহোদয়ের।

(৪) নির্ঝরিণী।

হায় রে! তাহারে　　ভাঙ্গিয়া ফেলিল
কোন নিঠুরের নিঠুর গদা ?
নাইরে বাল্মীকি,　　নাই ব্যাসদেব,
নাইরে ধাবক, শূদ্রক নাই,
নাই সুরসিক　　কবি-কালিদাস,
বিশাখেরে আর খুঁজে কি পাই ?
কবিতা-বিভূতি-　　ভবভূতি নাই,
ভাসের আভাস কোথায় আছে ?
হায়রে! বাণের　　নির্ব্বাণ হয়েছে,
দণ্ডীরে দণ্ডিত কে করিয়াছে ?
হরি! হরি! হরি!　　রাজা ভর্তৃহরি
নাই এ ভারতে, শঙ্কর কোথা ?
যার স্তুতিপাঠ　　করে নরনারী,
গেঁথেছিল, যিনি বিবেক গাথা।
নীতি-নলিনীর　　রবি যে ভারবি ;
তারেও ভারতে পাইনা খুঁজি।
যার উপদেশ　　অমোঘ, সে মাঘ
কোথা এবে ? সেও গিয়াছে বুঝি।
যার কলপনা (১)　　অতি সুবন্ধুর ;
সেই সুবন্ধুর পাইনা দেখা।
কোথা কবিরাজ ?　　যাঁহার রয়েছে
চরণ-চিহ্নের কিঞ্চিত রেখা।
নাইরে সিহ্লন,　　নাইরে কহ্লন,
বহ্লনে কে আর জানিতে পারে ?
ভট্টনারায়ণ　　কোথা গেছে চলি ?
কালতে কে আর দেখিবে তারে ?
নাই ভোজরাজ,　　নাই হর্ষদেব,
"নৈষধের" কবি শ্রীহর্ষ নাই।
"চণ্ড কৌশিকের"　　কবি-ক্ষেমীশ্বর ;
কোথা গেলে তারে দেখিতে পাই ?
অক্বিবর (২) রাজ　　কবি-গঙ্গাধর ;
"রস গঙ্গাধর' যাহার যশ ;
গঙ্গাস্তুতি গাঁথা　　গেয়েছিল যিনি ;
তিনিও কি আজ কালের বশ ?
নবীন-বীণার　　ঝঙ্কার তুলিয়া
"ললিতলবঙ্গলতা"র গানে।
মোহিয়া ভুবন　　ভুবন মোহনে
নেহারি গাইল যে একতানে।

(১) কল্পনা।

(২) আকবর।

সেই জয়দেবে পাইনা দেখিতে,
একে একে সবে গিয়াছে চলি
এত দুরদশা (১) হল ভারতের
এ দুখের কথা কাহারে বলি?
ভারত-কাননে রসাল-কবিতা
রসাল-শাখায় সুখেতে বসি,
একদিন কবি- পিকগণ, গানে
মাতাইয়াছিল মরমে পশি।
চূত তরুকুল মুকুলিত হ'ত
যাদের গানেতে; সে পিকগণ,
জানিনা, বুঝিনা, কোথা উড়ি গেল,
নীরব করিয়া ভারত-বন।
সেই নীরবতা ভাঙ্গিয়া পঞ্চমে
বঙ্গেতে গাইল এ কোন পিক?
একেলা গাইল; সে একের গানে
ভরিল ভরিল সকল দিক।
সে পঞ্চম গানে কুঞ্জ মঞ্জুরিল,
মুকুলিত হল রসাল তরু,
ঋতুপতি বুঝি আসি উতরিল,
সৌরভে ভুবন হইল ভরু (২)
বিদ্যুত চমকি সহসা গরজি
কাল-জলধর উদিল কেন?
তড়িত-স্ফুরণে গুরু-গরজনে
বরজ (৩) পড়িল মাথায় যেন।
এহেন বরষা (৪) হেরি, বুঝি, হায়!
উড়িল উড়িল সে পিকরাজ,
ছিড়ে গেল আশা লতিকা, বাতাসে
আমাদের শিরে পড়িল বাজ (৫)
আর কি পাইব সে শ্রীশ্বর-পিকে?
আর কি শুনিব তাঁহার গান?
কোথা গেল চলি? কোথা লুকাইল?
আর কি উঠিবে পঞ্চমে তান?
মধুর সময়ে মধুর-কুসুমে
পিয়া (৬) সহপান করিয়া মধু

(১) দুর্দ্দশা।
(২) পূর্ণ।
(৩) বজ্র
(৪) বর্ষা।
(৫) বজ্র।
(৬) প্রিয়া।

সেই মধুকর মধুর ঝঙ্কারে
ভুবন মোহিত (৭) সহিত বধূ।
কোথা গেল উড়ি ছাড়ি এই বন
বনিতার সহ সে অলিরাজ?
কালরূপে যে এ, ভুবন ভুলাল,
গুণের গৌরব ভুবন মাঝ।
তুষার-ধবল— কাকাতুয়া-পাখী
শবদের (৮) দোষে কে চায় তারে?
কাল হইলেও কোকিল, ভোমরা (৯)
শবদের গুণে মোহিত করে।
যে অগুরুতরু অতি গুরুতর
আলো করেছিল ভুবন-বন।
যেই মলয়জ— পরিমল নিয়ে
বিমল-সমীর মোহিত মন।
এ কোন পুরুষ পরুষ-প্রকৃতি
পরশু-পরশে (১০) কাটিল তারে।
কেবা অকরুণ? অতরুণ তরু
লতার-সহ যে কাটিতে পারে। (১১)
জ্বলিছে অনল, ভারতের বুকে
ধক্ ধক্ করি বাহিরি শিখা,
কিছু না রহিল, সব পুড়ি গেল,
আর কি পাইব তাদের দেখা?
সে দিনের কথা এ মহাশ্মশানে
শ্রীশ্বর হইয়ে ঈশ্বর নিজে
অমর-ভারতী— সতী-দেহ কাঁধে
কতই নাচিল দেখিনু কি, যে।
নাচিতে নাচিতে গাইয়া গাইয়া
অমৃত ঢালিয়া সে দেহে দিয়া!
বাঁচাইল সেই অমর-ভারতী
হাসি সে উঠিল কি যেন নিয়া।
যার পরসাদে (১২) মৃত ভাষা আজ

(৭) মোহিত করিত।
(৮) শব্দের।
(৯) ভ্রমর।
(১০) স্পর্শে।
(১১) লতা সহকারে, সহকারে আজ
ভাঙ্গিল এ কোন প্রমত্ত গজ,
ফুটন্ত মুকুল, ভাঙ্গিয়া পড়িছে
মুকুল কুলের উড়িছে রজ।
(১২) প্রসাদে।

অমৃত হইল, সে, মরভূমে
থাকিতে কি পারে? এ হেতু অমরে
লয়ে গেছে তারে অমর ধামে।
বিধাতা কি তারে পরখ (২) করিতে
পিয়ার (৩) পরাণ হরিল, তার।
পারে কিনা পারে, বাঁচাইতে পুন
নামাইতে তার গরব (৪) ভার॥
বড়ই ছরমে (৫) ভাঙ্গি গেছে দেহ,
সে সতীর দেহ কাঁধেতে আর
নিতে না পারিল, আপনি চলিল
সতী-সনে ছাড়ি দেহের ভার।
ওগো দিদি, যদি চলি যাবে, তবে
শিখালেনা নিজ দাসীরে কেন?
যে বিদ্যার গুণে স্বামী যাবে জানি,
যেতে পারা যায় আগেই হেন।
বড় সতী তুমি বড়ই গরবে
ছিলে এ ধরাতে পতির সনে।
ভাঙ্গিল না তোর সে গরব কণা
ভরমে (৬) দেখিল জগত জনে। (৭)
চিরকাল তুমি স্বামী-সোহাগিনী,
স্বামীর সোহাগে গলিতে সদা,
স্বামীরে লইয়া সরগে (৮) চলিলে,
হইল রোদনে কাকিনা কাদা। (৯)
কেলেশের (১০) লেশ যাতে না পরশে (১১)
পতিকে; এভাবে পতির কাজ
নিজ হাতে তুমি সকলি করিতে
সতত, এ হেতু সতি, কি আজ,
অতি তাড়াতাড়ি আগে আগে গিয়া
সরগ দুয়ার (১২) আপন-করে

(২) পরীক্ষা।
(৩) প্রিয়ার।
(৪) গর্ব্ব।
(৫) শ্রম।
(৬) সসম্ভ্রমে।
(৭) জন।
(৮) স্বর্গে।
(৯) কর্দ্দম।
(১০) ক্লেশের।
(১১) স্পর্শে।
(১২) স্বর্গদ্বার।

খুলি বুঝি আসি স্বামীরে ডাকিয়া
নিয়ে চলি গেলে সরগ-ঘরে। (৬)
হায়রে! কখন (ও) এমন দেখিনি,
বাঁচিবে না স্বামী ভাবিয়া নিজে
কিছু রোগ নাই; কি করি জীবন
ছাড়িলে; বুঝিনা ভাবিয়া এ, যে।
স্বামীর চরণে লুটায়ে পড়িলে,
আর না উঠিলে, ও দিদিমণি,
মুদিলে নয়ন, আর না খুলিলে,
দেখিলে না সুতে, কাঁদিছে ধনি,
মুখ-সরসিজ হাসি হাসি ছিল,
আর'ও অধিক ফুটিল আজ।
এমন সুন্দর, কেহ দেখে নাই,
সিন্দুর শোভিল কপাল মাঝ।
এ দেব-দম্পতি কোথা চলি যায়?
ফুল-বরিষণ হইছে কেন?
কোথায় বহিয়া লইয়া চলিছে
উপবীত-পূত বাহকগণ?
আজি দেবরাজ, দেবযান নিয়ে
শচীর সহিত গগন-মাঝে,
দেব-দম্পতিরে আগুসরি নিতে
আসিয়াছে, ঐ, কিরূপ সাজে।
রথেতে লেগেছে আগুনের সিঁড়ি, (১)
সতী, সতীপতি তাহে পা দিয়ে (২)
উঠিল বিমানে দুন্দুভি বাজিল
পদ পাখালিল (৩) অমৃত দিয়ে (৪)।
কালিদাস আদি কবিরা আসিয়া
জয়ধ্বনি করি দোঁহারে ঘিরি
লইয়া চলিল ফুল বরষিয়া
মোদের নয়ন বরিষে বারি।

শ্রীজগদীশ্বরী দেবী।
রংপুর।

(৬) স্বর্গগৃহে।
(১) সতীদেহ দাহের চিতাগ্নিরূপ সোপান।
(২) পদ দান করিয়া।
(৩) ধৌত করিলে।
(৪) দ্বারা।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

৩৫। ভাষা-পরিচ্ছেদ। সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী সমেত শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রাজেন্দ্র চন্দ্র শাস্ত্রী রায় বাহাদুর এম্‌.এ, কর্ত্তৃক অনূদিত। শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের অর্থ ব্যয়ে সাহিত্য সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

"ভাষাপরিচ্ছেদ" একখানি সংস্কৃত দার্শনিক গ্রন্থ। উহা বিশ্বনাথ ন্যায় পঞ্চানন কৃত। গ্রন্থকার একজন বাঙ্গালী। অনুবাদক শাস্ত্রী মহাশয় বলেন "আপন পৌত্র বা ছাত্র রাজীবের শিক্ষার্থ ন্যায় পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন; কিন্তু ইহাঁর নিবাস কোথায় ছিল, জানা যায় না"। কিন্তু আমরা কোনও গ্রন্থের ভূমিকায় দেখিয়াছি, ইহাঁর জন্মভূমি নবদ্বীপে ছিল। ন্যায়শাস্ত্র পাঠার্থী মাত্রেই প্রথম এই গ্রন্থখানি পাঠ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া তবে অপরাপর গ্রন্থ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। সুতরাং নৈয়ায়িক সমাজে ইহার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত অধিক। শাস্ত্রী মহাশয় ইহার বঙ্গানুবাদ করিয়া নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের একটী মহান্ অভাব দূর করিলেন। অতএব তিনি সাহিত্য-সেবিগণের অগণ্য ধন্যবাদের পাত্র।

"ভাষা-পরিচ্ছেদ" বৈশেষিক দর্শনের গ্রন্থ, কি ন্যায় দর্শনের গ্রন্থ, তাহা নিশ্চিত রূপে বলিতে পারা যায় না। কারণ নৈয়ায়িকেরা ষোড়শ পদার্থ স্বীকার করেন, কিন্তু ইহাতে ষোড়শ পদার্থ স্বীকৃত হয় নাই, বৈশেষিকদিগের ন্যায় সপ্ত পদার্থ অঙ্গীকৃত হইয়াছে। আবার গ্রন্থকার গ্রন্থ মধ্যেই কোন কোন স্থলে বৈশেষিক মত খণ্ডন করিয়াছেন। উহা দেখিয়া মনে হয়, এই গ্রন্থ খানি বৈশেষিক মত ও ন্যায় মত উভয়ের মিশ্রণে বিরচিত। যাহাই হউক, 'ভাষা পরিচ্ছেদ' যে প্রথম পাঠার্থীদের পক্ষে একখানি উপাদেয় গ্রন্থ, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে উপাদেয় হইলেও একান্ত সহজবোধ্য নহে। কারণ একখানি অল্পায়তন গ্রন্থের মধ্যে ন্যায় শাস্ত্রের যাবতীয় বিষয় অতি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, সুতরাং কিরূপে সহজ হইবে? উক্ত গ্রন্থকার ন্যায় পঞ্চানন ভট্টাচার্য্যই সাধারণের উপকারার্থে ভাষাপরিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী নামে এক টীকা রচনা করেন, কিন্তু যাঁহারা ঐ গ্রন্থের অধ্যয়ন অধ্যাপনা করেন, তাঁহারা একবাক্যে বলিয়া থাকেন যে, ভাষাপরিচ্ছেদ অপেক্ষা মুক্তাবলী দুরূহ। তবে একথা স্বীকার্য্য যে, মুক্তাবলীর অনুশীলন ব্যতীত ভাষাপরিচ্ছেদে সম্যক্ অধিকার লাভ হয় না। সুখের বিষয়, রায় বাহাদুর শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত সিদ্ধান্ত মুক্তাবলীর সহিতই ভাষাপরিচ্ছেদের অনুবাদ করিয়াছেন। যেরূপ দুরূহ গ্রন্থ, তাহাতে সাধারণের ইহাতে দন্তস্ফুট করিবার শক্তি নাই। শাস্ত্রী মহাশয় ন্যায় শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ বলিয়াই এরূপ কঠিন কার্য্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। অনুবাদ সুন্দর হইয়াছে, তবে যাঁহারা ন্যায় রসে বঞ্চিত, তাঁহারা সহজে ইহার আস্বাদ লাভ করিতে পারিবেন না। যাঁহাদের দর্শন শাস্ত্রে কিঞ্চিৎ অনুরাগ আছে, তাঁহারা অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে যথেষ্ট আনন্দ অনুভব করিতে পারিবেন। রায় বাহাদুর শাস্ত্রী ইংরাজী সংস্কৃত উভয় ভাষায়ই কৃতবিদ্য। তাঁহার বিদ্যার অনুরূপ বিনয়ও আছে, তিনি এই গ্রন্থের অনুবাদ কার্য্যে তাঁহার অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ও মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ প্রভৃতি যে সকল পণ্ডিতের নিকট হইতে সাহায্য পাইয়াছেন, ভূমিকায় তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। আর গ্রন্থ প্রকাশের ব্যয়দাতা শোভাবাজারের রাজা বিনয় কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের কৃত উপকারেরও বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন।

পুস্তকের কাগজ উৎকৃষ্ট, ছাপাও ভাল, কিন্তু মধ্যে মধ্যে দুই একটী মুদ্রাকর দোষ দেখিলাম। বোধ হয় শাস্ত্রী মহাশয় নানা

গুরুকার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় স্বয়ং প্রুফ দেখিতে পারেন নাই, তজ্জন্যই ঐরূপ ঘটিয়াছে। আশা করি, দ্বিতীয় সংস্করণে উহা সংশোধিত হইবে।

৩৬। লঘু পাণিনীয়। দ্বিতীয় ভাগ। শ্রীদেবেন্দ্র কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন, এম্, এ, প্রণীত। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন, তিনি অধ্যাপনাকালে পাণিনীয় ব্যাকরণ হইতে যে সকল প্রয়োজনীয় সূত্র সংগ্রহ পূর্ব্বক ছাত্রদের লেখাইয়া দিয়াছেন, তাহাই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া "লঘু-পাণিনীয়" নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহাতে ব্যাকরণের সকল প্রকরণের সূত্র নাই। কারণ রাজসাহী কলেজের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ সুবিজ্ঞ শ্রীযুক্ত কুমুদিনী কান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, মহোদয় তাঁহাকে কলেজ শ্রেণীতে পাণিনীয় ব্যাকরণের কিয়দংশ মাত্র অধ্যাপন করিতে অনুরোধ করেন, গ্রন্থকার সেই নির্দ্দিষ্ট অংশ হইতেই সূত্র সংগ্রহ করিয়াছেন। সুতরাং ইহাতে আত্মনেপদ বিধান, পরস্মৈপদ বিধান, কারক, সমাস, তদ্ধিতের কতকগুলি প্রয়োজনীয় সূত্র ও অমরকোষ অভিধানের লিঙ্গানুশাসনবর্গের কতকাংশ মাত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। সূত্রের নিম্নে বঙ্গানুবাদ ও উদাহরণ আছে। অনুবাদ যথাযথ হইয়াছে। ইহা দ্বারা সংস্কৃত শিক্ষার্থী কলেজের ছাত্রগণের বিশেষ উপকার হইবে, এরূপ আশা করা যায়।

৩৭। শ্রীচন্দ্রশেখর-মাহাত্ম্য-মেধসাশ্রমম্। উদাসীন-শ্রীমদ্বেদানন্দ-স্বামিবিরচিতম্। শ্রীদেবেন্দ্রবিজয় বসু-শ্রীবিজয় কেশব মিত্র-বিরচিত-বঙ্গানুবাদ-ভূমিকা-সমেতং তৎসঙ্কলিত-শ্রীমদ্বেদানন্দ-স্বামিদত্তোপদেশ-সহিতঞ্চ।

গ্রন্থের নাম দেখিয়া আপাততঃ বোধ হয়, ইহা চন্দ্রনাথ তীর্থের মহাত্ম্য কথা, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নহে। ইহা চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য্য ওরফে শ্রীযুক্ত শীতল চন্দ্র বেদান্ত-ভূষণের স্ব-বর্ণিত ও স্বলিখিত জীবনবৃত্তান্ত। প্রসঙ্গ ক্রমে চন্দ্রনাথ তীর্থের কথা এবং কিঞ্চিৎ ধর্ম্মোপদেশও আছে। বেদান্ত-ভূষণ মহাশয় এখন গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী। তাঁহার বর্ত্তমান নাম বেদানন্দ স্বামী, তজ্জন্য গ্রন্থের 'টাইটেল পেজে' উদাসীন বেদানন্দ স্বামীর রচিত বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

সন্ন্যাস কথাটা বড়ই উচ্চ। মানব কণ্ঠগত প্রাণ হইয়াও একটী কপর্দ্দকের মায়া ত্যাগ করিতে পারে না, আর স্ত্রী পুত্র, আত্মীয় বন্ধু, ভূমি, বিত্ত, পার্থিব সুখ সম্মান সমুদয় পরিহার করিয়া উদাসীন হওয়া, এ কি সহজ কথা? যাঁহারা সুকৃতির ফলে ঐরূপ পরমপদ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে কোন কথা লিখিতে হৃদয় স্বতই সঙ্কুচিত ও ভারাক্রান্ত হয়, কিন্তু উপায় কি? যে কর্ত্তব্যভার গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা সম্পন্ন করিতেই হইবে। এই গ্রন্থ তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে ভূমিকা। ইহা বেদানন্দ স্বামী কর্ত্তৃক সংস্কৃত ভাষায় লিখিত আত্মজীবন বৃত্তান্তের বঙ্গানুবাদ মাত্র, তবে উহাতে দুই একটী কথা অধিক আছে। দ্বিতীয় অংশে সংস্কৃত জীবনবৃত্তান্ত। তৃতীয় অংশে উপদেশ।

শ্রীযুক্ত শীতল চন্দ্র বেদান্তভূষণের জন্মভূমি বরিশাল জেলার অন্তর্গত গৈলা। ত্রয়োদশ বর্ষে ইঁহার প্রথম বিবাহ হয়। পত্নী ও মাতার মৃত্যুর পর ইনি মাদারিপুরের শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ পাঠকের জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন। তাঁহার

পর বিক্রমপুর, কাশী. বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে অধ্যয়ন করেন। দুই পুত্র, দুই কন্যা হয়। স্ত্রীর অনুমতি লইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এখন স্ত্রী দেহমুক্ত হইয়াছেন। ভূমিকায় দেখিলাম, সার্ জষ্টিস্ রমেশ চন্দ্র মিত্র, রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত, রায় নন্দ লাল বসু, প্রসিদ্ধা বিদুষী শ্রীমতী সরলা দেবী প্রভৃতি ইহাঁর নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। উপদেশাংশে ইনি সাংখ্যের মূলতত্ত্ব, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়, বাহ্যকরণ ও অন্তঃকরণ, দেহ ও দেহান্তর, সৃষ্টি প্রভৃতি কতিপয় বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষায় উপদেশ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা পুস্তক খানি পাঠ করিয়া পরিতুষ্ট হইয়াছি, অসার নাটক নভেল অপেক্ষা ইহা পাঠ করায় যে অনেক উপকার হইবে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু জীবন-বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া কোন কোন স্থলে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, উহা আমরা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। "শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র বেদান্তভূষণ বিক্রমপুরে কোন অধ্যাপকের নিকট কয়েক মাস কলাপ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়াই ব্যাকরণ শাস্ত্রে অদ্ভুত ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন, হরিনাভিতে কয়েক মাস থাকিয়াই কাব্য শাস্ত্রে বিশারদ হইলেন, সুব্রহ্মণ্য-শাস্ত্রী ও নারায়ণ শাস্ত্রীর নিকট কয়েক দিন ও শ্রীযুক্ত হরিনাথ বেদান্তবাগীশের নিকট কয়েক মাস পড়িয়াই দর্শন শাস্ত্রে অদ্ভুত পাণ্ডিত্য লাভ করিলেন। ফল কথা কিঞ্চিদুন দুই বৎসর মাত্র তিনি সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।" আমরা এই অদ্ভুত পাণ্ডিত্যের কোনই অর্থ বুঝিতে পারিলাম না।" কারণ যতই প্রতিভাশালী হউন না কেন, টীকার সহিত কলাপ ব্যাকরণ পড়িতে অন্ততঃ তিন বৎসর, কাব্য অলঙ্কার শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে হইলে অন্ততঃ পাঁচ বৎসর আবশ্যক হয়। অন্যদর্শন সকলের কথা ছাড়িয়া দিলেও বেদান্তদর্শনের ব্রহ্ম-সূত্র শারীরক ভাষ্যের সহিত পড়িতেই যে তিন বৎসরে কুলায় না। আর এক কথা, বেদান্তভূষণ মহাশয় একে বৈদান্তিক, তাহাতে আবার সন্ন্যাসী, "তত্ত্বমসি" শ্রুতির অনুশীলন বোধ হয় তিনি বিশেষ ভাবে করিয়াছেন। এ অবস্থায়ও চট্টলে নবাবিষ্কৃত মেধসাশ্রমে তিনি দক্ষিণাকালীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন কেমন করিয়া? তিনি বলেন, মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত মেধস মুনির আশ্রম চট্টলে তারা বাড়ীতে ছিল। উহার প্রমাণ কি? চণ্ডীর বর্ণনা পাঠ করিয়া ত মনে হয়, ঐ আশ্রম পর্ব্বতের উপরে ছিল না, কোন সমতল ভূমিতে অরণ্য মধ্যে ছিল। বেদানন্দ স্বামী বলেন, তিনি মৃত পত্নী ও আত্মীয় স্বজনকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। অবশ্য থিয়োসফিষ্টেরা এ কথা বলিয়া থাকেন, তিনি বৈদান্তিক হইয়া এ কথা বলেন কি প্রকারে?

বিংশ শতাব্দী বড়ই আড়ম্বরের সময়। অন্যে করে করুক, কিন্তু সন্ন্যাসীর জীবনেও কি আমরা এই আড়ম্বর-শূন্যতার আশা করিতে পারি না? গ্রন্থোক্ত কথাগুলি স্বামীজীর শিষ্য শিষ্যারা হয়ত বিশ্বাস করিতে পারেন, কিন্তু আমাদের মনে একটু "খট্কা" লাগিয়াছে, তজ্জন্য সরল মনে প্রকাশ করিলাম। আশা করি, স্বামীজী ইহাতে কিছু মনে করিবেন না।' করিবেনই বা কেন? তাঁহারা যে স্তুতি নিন্দার অতীত।

৩৮। বীরকুমার-বধ-কাব্য।

কাব্যকুসুমাঞ্জলি, কনকাঞ্জলি প্রভৃতি রচয়িত্রী শ্রীমান কুমারী প্রণীত, মূল্য ।॥০। এই সুন্দর পুস্তকখানি সম্বন্ধে, পুস্তকের প্রকাশক সুবিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় যে মন্তব্য লিখিয়াছেন, তাহা, আমাদের সম্পূর্ণ অনুমোদিত বলিয়া, স্বতন্ত্র মন্তব্য না লিখিয়া, তুলিয়া দিলাম।

"অভিমন্যু-কথা মহাভারতের একটী প্রধান ঘটনা। ইহা দ্বারা মর্ত্তালোকের মহোপকার সাধিত হইয়া আসিতেছে। অভিমন্যু-কথা শোকার্ত্ত মানবের সান্ত্বনা-স্থল।

"মাতুলো যস্য গোবিন্দঃ পিতা যস্য ধনঞ্জয়ঃ।
সোঽভিমন্যু রণে শেতে নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে।"

শ্রীহরি, বিপত্তিহারী যাহার মাতুল,
পিতা যার ধনঞ্জয় বিক্রমে অতুল;
দেখ! রণে সেই অভিমন্যুর মরণ,
কার সাধ্য নিয়তিরে করে নিবারণ?

অভিমন্যুবিষয়ক এই সকল গাথা চিরকাল মানবের শোকাগ্নি নির্ব্বাণ করিবে, অলঙ্ঘ্য নিয়তির জন্য মানবকে প্রস্তুত করিবে।

অভিমন্যু-নিধন, সানুজ ধর্ম্মরাজের ধর্ম্মরাজ্য-প্রতিষ্ঠার মূলভিত্তি। আসক্তি ও অভিমানের উপর ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। বৈরাগ্যই মহান্ ধর্ম্মের সিংহাসন। অভিমন্যু-নিধনে পাণ্ডব-হৃদয়ে একটী গভীর বৈরাগ্যের ছায়া পতিত হইয়াছিল; তাহাতেই তাঁহারা জয়োল্লাসে স্ফীত হন নাই; তাঁহারা সার্ব্বভৌম ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াও মত্ত বা বিচলিত হন নাই। হৃদয়ে বৈরাগ্য ও মস্তকে গুরুতর কার্য্যভার ধারণপূর্ব্বক, তাঁহারা অতি সংযতভাবে সনাতন কর্ত্তব্য-পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির সর্ব্বগুণান্বিত হইলেও, মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ বলিয়া তাঁহাতে একটু দুর্ব্বলতা ছিল; সেটুকু দ্যূতক্রীড়ায় আসক্তি; দ্যূতক্রীড়া ব্যসনমধ্যে পরিগণিত, সর্ব্বথা পরিহার্য্য। যিনি যুধিষ্ঠির দ্বারা জগতে ধর্ম্ম-সেতু বন্ধন করিবেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ, অভিমন্যু-নিধন ঘটাইয়া, ভক্ত যুধিষ্ঠিরের দ্যূতাসক্তি চিরকালের জন্য ঘুচাইয়া দিলেন, তাঁহাতে দুর্ব্বলতা মলিনতার লেশমাত্র রাখিলেন না। গ্রন্থকর্ত্রী অভিমন্যু-বধ-কাব্যের উপসংহারে মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষায় এ বিষয়টী বুঝাইয়াছেন।

"প্রতিপাদ্যমহিম্না চ প্রবন্ধো হি মহত্তরঃ"—প্রতিপাদ্য অর্থাৎ বর্ণনীয় বিষয়ের গৌরবেই গ্রন্থের উৎকর্ষ-বৃদ্ধি হয়। এজন্য, এ কাব্যের প্রতিপাদ্য-বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক।

"যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ"। এই মহাবাক্য—এই সার সত্যই এ কাব্যের প্রতিপাদ্য। গ্রন্থকর্ত্রী তাহা অতি ধীরে, অতি সন্তর্পণে, অতি মধুরভাবে বুঝাইয়াছেন। যিনি আচার্য্যের আসন গ্রহণ করিয়া, "উপদেশ দিতেছি" বলিয়া উপদেশ দান করেন, তাঁহার উপদেশবাক্য অমূল্য হইলেও, মর্ম্মস্পর্শী হয় না। এজন্য মনু, ঈশা ও মহম্মদাদির উপদেশ তাদৃশ ফলপ্রদ হয় নাই। কিন্তু কাব্যশাস্ত্র আচার্য্যের আসন গ্রহণ করে না। মধুরভাষিণী, হৃদয়সন্নিহিতা, প্রেমময়ী কান্তা যেমন উন্মার্গগামী স্বামীকে ধীরে ধীরে প্রেমানন্দ-ধারার মধ্য দিয়া সৎপথে আকর্ষণ করে, কাব্যও সেইরূপে পাঠককে ধর্ম্মপথে আনয়ন করে। এজন্য সহৃদয় পণ্ডিতেরা কবি-ভারতীর জয় ঘোষণা করিয়া থাকেন। ফলতঃ সৎকাব্যের ন্যায় প্রাণারাম উপদেষ্টা আর নাই।

কবি-কল্পনা কাহারও দাসী নহে। ইহা বিধাতার বিধান-সীমার অতীত, অথচ সৃষ্টি-স্থিতির মূল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। দেহাভিমান-মুক্ত আত্মার ন্যায় কবি-কল্পনা অনন্ত শূন্যে মুক্তপথে স্বেচ্ছায় বিহার করে; সুখ-দুঃখসঙ্কুল সংসারের পারে গিয়া, অবিমিশ্র আনন্দের রাজ্য নির্ম্মাণ করিয়া, মানবকে সেই আনন্দময়ের আদর্শে গঠিত করে। মূলে সত্যরূপ অমৃত (১) না থাকিলে, কবি-কল্পনায় এ মৃতসঞ্জীবনী শক্তি আসিত না। সে সত্যরূপ অমৃত আর কিছুই নয়, তাহা ধর্ম্মে প্রবৃত্তি ও অধর্ম্মে নিবৃত্তি, অর্থাৎ রাম হও, রাবণ হইও না,—"রামাদিবৎ প্রবর্ত্তিতব্যং ন রাবণাদিবৎ"। গ্রন্থকর্ত্রী প্রতি ছত্রে নব নব চরিত্র সৃষ্টি করিয়া, প্রত্যেক চরিত্রেই এই মহান্ সত্যকে পাঠকের প্রাণে প্রাণে গাঁথিয়া দিয়াছেন।

এই মহাকাব্যের রচয়িত্রী (২) সাত্ত্বিক-প্রকৃতির কবি; এজন্য ইহাঁর কাব্যে কৃষ্ণ, অর্জ্জুন, ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির, গান্ধারী প্রভৃতির চরিত্র ব্যাসবর্ণিত সেই সেই চরিত্র হইতে বিভিন্ন হয় নাই, বরং কোনও কোনও চরিত্র মূল মহাভারত অপেক্ষা উজ্জ্বলতর। কবির প্রকৃতি অনুসারে কাব্য প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর;—সত্ত্বগুণপ্রধান ও রজোগুণ-প্রধান। তমোগুণে কাব্য হয় না। রজোগুণপ্রধান কাব্য যদি রজোগুণেই পর্য্যবসিত হয়, অর্থাৎ তৎপাঠে লোক-চিত্ত সত্ত্বভ্রষ্ট হইয়া যায়, তবে তাহা অন্যদেশে কাব্য বলিয়া আদৃত হইলেও, ভারতীয় আচার্য্যগণের নিকট হেয় বলিয়া পরিত্যক্ত হয় (১)। ভারতীয় আচার্য্যেরা রসকে কাব্যের আত্মা বলেন, এবং তাহার স্বরূপ এইরূপে নির্দ্দেশ করেন;—

"সত্ত্বোদ্রেকাদখণ্ডস্বপ্রকাশানন্দচিন্ময়ঃ।
বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্যো ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ॥
লোকোত্তরচমৎকারপ্রাণঃ কৈশ্চিৎ প্রমাতৃভিঃ"।

যেমন অরুণ ভানুর উদয়ে নৈশ তিমির তিরোহিত এবং গগনতল অপূর্ব্ব রাগে রঞ্জিত হয়, তেমনি হৃদয়ে রসের উন্মেষমাত্রেই রজোগুণ ও তমোগুণ তিরোহিত হইয়া অনির্ব্বচনীয় সত্ত্বগুণের উদ্রেক হয়; তখন অদ্বৈত আনন্দ ভিন্ন আর কোনও জ্ঞেয় পদার্থের অস্তিত্ব থাকে না; সংসারের সুখ-দুঃখ, ভেদাভেদ, সকলি বিলয়প্রাপ্ত হয়। এই রস অখণ্ড, স্বপ্রকাশ, চিন্ময়, আনন্দময়, ব্রহ্মানন্দ-সম্ভোগের তুল্য।

এই কাব্যখানি পাঠ করিতে করিতে, চিত্ত সেই অপার্থিব সাত্ত্বিক রস আস্বাদন করিয়া পুলকিত ও পরিতৃপ্ত হয়, অলৌকিক বিস্ময়ে উৎফুল্ল হয়, স্বার্থ ও সঙ্কীর্ণতা ছাড়াইয়া অসীম মঙ্গলের পথে প্রসারিত হয়। অতএব সৎকাব্যের চরম উদ্দেশ্য ইহা দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে। বলিতে কি, এই গ্রন্থকর্ত্রীর হৃদয়-তন্ত্রী সত্ত্বগুণেই বাঁধা এবং সত্ত্বগুণেই সাধা।

এই কাব্যখানি অমিত্রাক্ষর ছন্দে বির-

(১) "অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ দ্বয়ং দেহে প্রতিষ্ঠিতম্।
মৃত্যুরাপদ্যতে মোহাৎ সত্যেনাপদ্যতেঽমৃতম্॥"
(মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব)

জীব-মধ্যে আছে দুটী,—সত্য ও অনৃত;
অনৃতেই রহে মৃত্যু, সত্যেই অমৃত।

(২) সংস্কৃত শাস্ত্রের লক্ষণ অনুসারে বঙ্গভাষায় মহাকাব্য বা নাটক হয় নাই, এবং হইতে পারে কিনা সন্দেহ। অতএব সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের লক্ষণ লইয়া কেহ যেন এ-কাব্যের বিচার না করেন।

(১) "কাব্যালাপাংশ্চ বর্জ্জয়েৎ"—অর্থাৎ অসৎকাব্যের কথা মুখেও আনিবে না।

চিত্ত। বাঙ্গালা অমিত্রাক্ষর ছন্দে যে অপূর্ব্ব মধু-ধারা প্রবাহিত করা যায়, তাহা মধুময় ৺মধুসূদন জানিতেন, এবং তিনিই ইহার প্রবর্ত্তক। সেই স্বর্গীয় কবির অমিত্রাক্ষরে একটী স্নিগ্ধ-গম্ভীর স্বরপ্রবাহ নিহিত আছে; তাহাই তাঁহার অমিত্রাক্ষরের প্রাণস্বরূপ। এই মহিলা-কবি ৺মধুসূদনের ভ্রাতুষ্পুত্রী। বংশ-গুণে ও সাধনার বলে ইনি পিতৃব্যের প্রদর্শিত সেই স্বরপ্রবাহকে আয়ত্ত করিয়াছেন; এই জন্যই অমিত্রাক্ষর রচনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিয়াছেন।

ইহার ভাষাবিষয়ে স্বতন্ত্র বক্তব্য কিছুই নাই। মাতৃভূমির গৌরব, প্রাতঃস্মরণীয় ৺বঙ্কিমচন্দ্র কাব্যকুসুমাঞ্জলি পড়িয়া ইহাঁর ভাষাবিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম;—

"কাব্যকুসুমাঞ্জলির কয়েকটী কবিতা পড়িলাম। কয়টাই বড় সুমধুর। এখনকার বাঙ্গলা কবিতার ভাষা কিছু বিকৃত রকম হইয়াছে; ইংরেজি যে না জানে, সে সকল সময়ে বুঝিতে পারে না। এই কবিতাগুলিতে সে দোষ নাই। বাঙ্গলাটুকু খাঁটি বাঙ্গলা। উক্তিও আন্তরিক।"

প্রকৃত সৎকাব্যই স্বদেশের, স্বজাতির ও মাতৃভাষার কল্পান্তস্থায়িনী কীর্ত্তি। দেখ! সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই, কিন্তু পতিতপাবন রামায়ণ অদ্যাপি পূর্ণযৌবনে বিরাজমান। যুধিষ্ঠিরের সে হস্তিনার এবং শ্রীকৃষ্ণের সে দ্বারকার চিহ্নও নাই, কিন্তু জ্ঞানসাগর মহাভারত ও ভাগবত, ভারতের অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভরূপে বিদ্যমান। গ্রীক ও রোমকজাতির সে সাম্রাজ্য ও সে বৈভব কোথায়? কিন্তু মহাকাব্য ইলীয়ড্ ও ইনীয়ড্ উহাদের জাতীয় গৌরবের দীপ্যমান সাক্ষী। এই জন্যই বলিয়া থাকে,— "কবিতা যদ্যস্তি রাজ্যেন কিম্"।

কবিত্বশক্তি নরলোকের দুর্লভতম সৌভাগ্য (১)। যিনি বিধাতার কৃপায় এ শক্তি লাভ করেন, তাঁহা দ্বারা মাতৃভূমি ও মাতৃভাষা চিরধন্য হয়। যে মঙ্গলময় ঈশ্বর এই গ্রন্থকর্ত্রীকে এ শক্তি দান করিয়াছেন, তিনি বঙ্গদেশের ও বঙ্গভাষার মঙ্গলের জন্য ইহাঁকে চিরজীবিনী করিয়া রাখুন।"

৩৯। **খোকার হাসি।** শ্রীশ্যামাচরণ দে প্রণীত। ভারতমিহির যন্ত্র। মূল্য ।৵০ আনা। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকারের প্রসিদ্ধ শিশুমনোমোহিনী পুস্তকাবলীর যে সমস্ত নকল বাহির হইতেছে, এ তারই অন্যতম। এ নকলে শিশুদিগের উপকার নাই, অথচ এদেশে এই নবীন পন্থার যিনি প্রবর্ত্তক, তাঁর কিছু না কিছু ক্ষতি আছে।

৪০। The Fourth Annual Report of the Ramakrishna Home of Service. এক লোকহিতকর অনুষ্ঠানের বার্ষিক বিবরণী।

৪১। A Note on the Sanitary Condition of the District of Jessore And How to Improve It. Printed by Thacker, Spink, &.Co. যশোহর জেলার স্বাস্থ্যোন্নতিকল্পে কি কি অনুষ্ঠান আবশ্যক, রায় শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর এই পুস্তিকায় তাহা প্রতিপাদিত করিয়াছেন। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, তাঁহার প্রস্তাবে গবর্ণমেণ্টেরও দৃষ্টি পড়িয়াছে।

৪২। Report of the Chaitanya Library for 1903 and 1904 চৈতন্য লাই-

---

(১) "নরত্বং দুর্লভং লোকে বিদ্যা তত্র সুদুর্লভা।
কবিত্বং দুর্লভং তত্র শক্তিস্তত্র সুদুর্লভা॥"
(আগ্নেয় পুরাণ)

ব্রেরির দিনে দিন উন্নতি হইতেছে দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করিতেছি।

৪৩। Social Reform in Bengal: A Side Sketch. By Sitanath Tattvabhushan. Bengal Press. Price Re. 1-4. গত ৬০।৭০ বৎসরে বঙ্গীয় সমাজে যে সকল প্রধান বিপ্লব ঘটিয়াছে, এই গ্রন্থ তার উত্তম ইতিহাস। সীতানাথ বাবুর ইংরেজী রচনা-রীতিতে আমরা চিরদিনই মুগ্ধ। এ পুস্তকের ভাষাও বিশুদ্ধ এবং মধুর। তবে, সংস্কার-প্রীতির প্রাবল্যে যেমন হইয়া থাকে, ইহাতে দুই একটু অতিরঞ্জন, দুই চারিটা অত্যুক্তিও আছে। শেষ, চিত্রে শ্রদ্ধেয় শশিপদ বাবু বড় বেশী সম্মুখে, বড় বেশী জাঁকাল রঙ্গে অঙ্কিত হইয়াছেন। সে চটকে কতকগুলি মহামূর্ত্তিও পরিম্লান! তা ছাড়া অন্য কারণেও জীবিতের জীবনসমালোচনা গর্হিত।

৪৪। Keshub Chunder Sen: Correct Statement of Some Disputed Facts of His Life, মূল্য ॥০ আনা। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে "কুচবিহার বিবাহ" ত্রিপথের সন্ধিস্থান। সেই বিবাহসম্বন্ধে লোকের অনেকপ্রকার কুসংস্কার আছে। তাহা বাদে, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের রামতনু-জীবনীতে ভক্ত কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে একটা অলীক প্রবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তক পাঠে সে সকল অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণে বিদূরিত হইতে পারে।

৪৫। রত্নমালা। প্রথম খণ্ড। শ্রীমধুসূদন ভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত। মেটকাফ প্রেস। মূল্য ২॥০ টাকা। এই পুস্তকে রাজনীতি ও স্ত্রীধর্ম্ম বিষয়ে মন্বাদি নানা শাস্ত্র হইতে কতকগুলি বচনের অনুবাদ সংগৃহীত হইয়াছে। এরূপ সংগ্রহের বড় একটা প্রয়োজন ছিল, বোধ হয় না। তবে প্রাচীন ব্যক্তি বাঙ্গালা ভাষায় শ্রীবৃদ্ধিসাধনে চেষ্টা করিতেছেন, ইহা সুখের বিষয় বটে।

৪৬। কায়স্থ-কথা। শ্রীকৃষ্ণবল্লভ রায় প্রণীত। বিশ্বকোষ প্রেস। মূল্য ॥০ আনা। এ কথার অবসান নাই, এই পুস্তকই তার প্রমাণ।

৪৭। মুসলমান বৈষ্ণব কবি। ৩য় খণ্ড। শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল সম্পাদিত। সমিতি প্রেস, রাজসাহী। মূল্য ।৴০ আনা মাত্র। এই সকল পদ প্রকাশিত করিয়া ব্রজসুন্দর বাবু বাঙ্গালা সাহিত্যের মহোপকার সাধন করিতেছেন। চতুর্থ খণ্ডও যন্ত্রস্থ।

৪৮। চণ্ডীদাস-চরিত। শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল প্রণীত। সমিতি প্রেস, রাজসাহী। মূল্য ১৲ টাকা। কিন্তু ব্রজসুন্দর বাবুর এই পুস্তকখানি পড়িয়া আমরা তত সুখী হইতে পারি নাই। রীতিমত মার্জ্জিত ভাষায় পূর্ব্বতন কতকগুলি গন্ধহীন, বর্ণহীন, "শিরা ও ব্রণ রহিত" সমালোচনার পুনরুক্তি ছাড়া এ পুস্তকে আর কিছু পাই নাই। দেশীয় ভাষায় এই কৃষ্ণগীতি বা বৈষ্ণব কাব্যের উৎপত্তি মধ্যযুগের ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে এক অপূর্ব্ব ঘটনা। শুধু মিথিলা বা বঙ্গদেশে নয়, এ কাব্যজ্যোতিঃ প্রায় একই কালে উৎকলে ও হিন্দুস্থানেও জ্বলিয়াছিল। শত তড়িন্ময় দীপ যেমন এককালে জ্বলিয়া উঠে, তেমনই জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। কিরূপে, কিসের প্রভাবে এই কাব্য জন্ম লাভ করিল? বিষ্ণুপুরাণেই ইহার আদিবীজ, বোধ হয়। কেন না, ভাগবত প্রভৃতি তার পরবর্ত্তী বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। এ কাব্যগীতিতে আর কোনও অর্ব্বাচীন সংস্কৃত কাব্যকলার ছাপ পড়িয়াছে কি না? চৈতন্যের পূর্ব্ববর্ত্তী

কোন্ দর্শন বা ধর্ম্মমতের ছায়ায় ইহা পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল? প্রাকৃত নায়কনায়িকার একটা প্রাকৃত, অনেক সময়ে অতি জঘন্য ভাব জগদীশ্বররূপে কল্পিত শ্রীকৃষ্ণে আরোপিত হইল কিসে? এ অভিনব উপাসনাতন্ত্রের ইতিহাস কিরূপ? বাঙ্গালা বৈষ্ণবকাব্যের সম্ভোগ বিরহে সর্ব্বত্র কেবল এই আধ্যাত্মিক রহস্যই কি জাগরূক? বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসে অন্ততঃ আরও কিছু আছে। লছিমা দেবীর প্রতি, বিদ্যাপতির, রামী ধোপানীর প্রতি চণ্ডীদাসের আসক্তির কথা যেমন তত্তৎকাব্যে অল্পাধিক ব্যক্ত, তেমনই পরম্পরাগত। প্রথমটা কিংবদন্তী হইলেও দ্বিতীয়ে আর সংশয় নাই। বৈষ্ণবকাব্যে কবির এই স্বীয় প্রকৃতি, স্বীয় বাসনা—এই নিজস্ব কতটুকু মিশিয়াছে? যেখানে এই নিজস্ব তাই, সেখানে কাব্যেও কৃত্রিম, ব্যক্তিহীন, একাকার। অনেক বৈষ্ণব পদও তাই। যে আধ্যাত্মিক রহস্যের উল্লেখ করিয়াছি, সুরাগন্ধে যেমন কুসুমসার দীপ্ত হয়, কবির আত্মজীবনে সেইরূপ তাহা বাসিত হইয়াছে। আপনার কলঙ্কে, রামীর দুঃখে ব্রজকলঙ্কদুঃখগীতে তাপ লাগিয়াছে। আবার যে কবির ইন্দ্রিয়রতি যত প্রবল, তাঁর কাব্যে ঐ রহস্যও সেই পরিমাণে কলুষিত বা অন্তর্হিত। বৈষ্ণবেরা শুনিলে হয়ত রাগ করিবেন, কিন্তু আমাদের মত এই যে, বিদ্যাপতির অনেক সম্ভোগে সে পরম রহস্য ঘৃণায় পলায়ন করিয়াছে। পক্ষান্তরে, ধর্ম্ম বা উপাসনা বিশেষের কেন্দ্রস্বরূপ হইয়া সে রহস্য অনেক কবির জীবনে সংযম আনিয়াছে। বাসনা শোধিত করিয়া কল্পনা উন্নত করিয়াছে। সে অঙ্গনে দৃষ্টি ফিরিয়াছে। মাংসময়ী মনোময়ী হইয়াছে! এরূপ উপাসনারহস্যের এরূপ পরিণাম কিছু বিস্ময়কর বটে, কিন্তু অসম্ভব নহে। স্বয়ং চৈতন্যদেবই তার সাক্ষী। এই দ্বিবিধ পরিণাম চণ্ডীদাসের কাব্যে কিরূপ দেখা যায়? সর্ব্বোপরি, যে অকপটতা কার্লাইলের মতে প্রতিভার অসাধারণ লক্ষণ, চণ্ডীদাসের চিৎচিত্রণে তাই বা কতটা লক্ষিত হয়? ব্রজ বাবুর গ্রন্থে এ সকল বিচারের অবতারণা নাই। কিন্তু রামী ধোপানী একদিন চতুর্ভুজা হইয়াছিল প্রভৃতি মধুর গল্প সবিস্তরে বিবৃত হইয়াছে! পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ গ্রন্থপাঠে আমরা সুখী হই নাই।

৪৯। ছিন্ন-দল। শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। কুন্তলীন প্রেস। এখানি গীতিকাব্য—বেশ ঠাণ্ডা, মিঠে রকমের Byronism এ পরিপূর্ণ। ঠাণ্ডা বলিতেছি, কেন না বড় জোর—

"অস্তিত্ব অঙ্গার তায় হইয়াছে আজি হের!" তার বেশী উষ্ণ কোথাও নাই। গ্রন্থকারের ছন্দোবোধও শোচনীয়।

৫০। প্রশ্ন। শ্রীশশধর রায় প্রণীত। দিনময়ী প্রেস। যুবকগণকে লক্ষ্য করিয়া এ পুস্তিকায় শশধর বাবু বিবিধ সুন্দর হিতোপদেশ দিয়াছেন।

৫১। অশ্রুহার। শ্রীআব্দর রহমান। কালিকা যন্ত্র। মূল্য।০ আনা। বাঙ্গালা ভাষায় লেখকের বেশ অধিকার আছে। কিন্তু কবিতাগুলির কোনও মূল্য নাই।

৫২। শান্তি-শতক। শ্রীশশধর রায় কর্ত্তৃক অনুদিত। বাণী প্রেস, রাজসাহী। মূল্য ।/০ আনা। অনুবাদ অবিকল না হইলেও মন্দ হয় নাই।

৫৩। জাগরণ। শ্রীরমেশচন্দ্র

দাস গুপ্ত প্রণীত। ন্যাশনাল মেশিন প্রেস, বরিশাল। মূল্য ৵৹ আনা। এখানিও কবিতাপুস্তক। "অশ্রুহার" সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, এখানি সম্বন্ধেও তাহা প্রযোজ্য।

৫৪। বঙ্গের কলঙ্ক। কাব্য। শ্রীকালীভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মেট-কাফ প্রেস। মূল্য ৮৹ আনা। সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া নাকি বখতিয়ার খিলিজি এই বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিল। বঙ্গের এই মিথ্যা কলঙ্ক দূর করিবার জন্যই গ্রন্থকার এই কাব্য লিখিয়াছেন। কিন্তু এ কলঙ্ক তো অনেক দিন হইল ইতিহাসে রাজকৃষ্ণ, কাব্যে বঙ্কিমচন্দ্র প্রক্ষালিত করিয়া গিয়াছেন। তবে আবার এ প্রয়াস কেন? এ কাব্যে কয়েকটী অপদার্থ গানও আছে। তার একটী আবার "মথুরাবাসিনী মধুর-হাসিনী"রই নকল।

৫৫। মুঞ্জরী। শ্রীমতী বসন্ত-কুমারী দেবী প্রণীত। ভিষক্দর্পণ প্রেস, ভবানীপুর। মূল্য ॥৹ আনা। লেখিকার প্রাঞ্জল রচনার শক্তি আছে, কিন্তু তাঁর কবিতায় সৌন্দর্য্য নাই।

৫৬। মর্ম্মোচ্ছ্বাস। শ্রীকুসুম কুমারী রায় প্রণীত। সুধারবন প্রেস, ভবানীপুর। মূল্য ১৲ টাকা ও ৮৹ আনা। আমরা জানিয়া দুঃখিত হইলাম, এই কাব্য প্রকাশিত হইবার অল্প পরেই নাকি লেখিকা পরলোক গমন করিয়াছেন। এখানিও গীতিকাব্য। প্রথম এবং অন্তিম কবিতাটী রবীন্দ্রনাথের "মানসী"র প্রথম এবং আর একটী কবিতার অনুকরণ। তথাপি ইহার অনেক কবিতারই প্রতিভার বিস্ফুরণ আছে। কাব্যের আদ্যন্তমধ্যে একটা অ[illegible]ব্যাহুঃখ—স্পন্দিত হ[illegible]

[illegible]হের বিবরণ। শ্রীকেদারনাথ মজুমদার প্রণীত। সবর্দ্ধন্ প্রেস, ভবানীপুর ও ভারতমিহির প্রেস, কলিকাতা। মূল্য ১৲ টাকা। কি ঐতি-হাসিক, কি ভৌগোলিক, কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক—ময়মনসিংহ জেলা সম্বন্ধে অবশ্যজ্ঞাতব্য যাবতীয় বিষয় অতি সুন্দর শৃঙ্খলার সহিত এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাতে গ্রন্থকারের বহু পরিশ্রম, গবেষণা এবং বিজ্ঞতার পরিচয় পাইয়াছি। তাঁহার লিখিত "ময়মনসিংহের ইতিহাস" এবং "ময়মনসিংহ কাহিনী" পাঠ করিবার জন্য আমরা উৎসুক রহিলাম।

৫৮। স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলী। প্রথম ভাগ। কেশব প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, মূল্য ॥৹ আনা। এই পত্র-গুলি প্রকাশিত হইতে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। ইহার অধিকাংশই মূল ইংরাজী হইতে অনূদিত। দুখানি সংস্কৃত পত্রও আছে। এ সকল চিঠীপত্রেও সে দিগ্বিজয়িনী প্রতিভার ছায়া পড়িয়াছে।

৫৯। গুপ্ত তত্ত্ব। ব্যাপ্টিষ্ট মিশন প্রেস। মূল্য ।৹ আনা। এখানি খ্রীষ্টধর্ম্ম বিষয়ক পুস্তক। ভাষা অনেক স্থলেই বেশ বিশুদ্ধ। এইজাতীয় পুস্তক প্রায় যেমন হইয়া থাকে, ইহা সেরূপ নহে।

৬০। মোসলেম্ জগতে বিজ্ঞান-চর্চ্চা। মৌলবী ইমদাদুল হক্ বি-এ প্রণীত। "ভারতী" হইতে পুন-র্মুদ্রিত। একমি প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্। মূল্য ৵৹ আনা। লেখক নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, এ প্রবন্ধ ভূতপূর্ব্ববিচারপতি

আমীর আলি সাহেবের Spirit of Islam নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলম্বনে লিখিত। প্রবন্ধে মোস্‌লেম্ সভ্যতার জ্ঞানাধার সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। ভাষা কিছু জটিল ও কৃত্রিম হইলেও, সে ভাষায় লেখকের উত্তম সংস্কার আছে। মুসলমান লেখকের রচনায় "বিশ্ব-শোষিকা জ্ঞানপিপাসা" বা "জ্ঞানকেন্দ্র-প্রবাহিত-সভ্যতাস্রোতোঽভিঘাত" দেখিয়া আমরা আনন্দে মগ্ন হইয়াছি। ১৯ পৃঃ চেঙ্গিজ খাঁর বর্ণনাও লেখকের কল্পনাশক্তি বর্ণনাশক্তি-দ্বয়েরই পরিচায়ক। এক দোষে প্রবন্ধটী কিঞ্চিৎ কলুষিত। অনেক স্থলে একটু Chauvinism এর দুর্গন্ধ আছে। দুই একটী দৃষ্টান্ত দিই। ২৩ পৃঃ আরবী চিকিৎসা-শাস্ত্রের প্রসঙ্গে লেখক বলিতেছেন, "অস্থি-বিদ্যা-সম্বলিত দেহতত্ত্ববিজ্ঞানের (Anatomy of Anatomical Physiology) * অভাবে হিন্দুর অঙ্গহীন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র ত তাহার সম্মুখে তিষ্ঠিতেই পারে না।" লেখক জানেন না যে, "অস্থিবিদ্যা-সম্বলিত দেহ-তত্ত্ববিজ্ঞান" চরক সুশ্রুতে যথেষ্ট আছে। তবে সূক্ষ্মযথার্থদর্শনজনিত নহে বলিয়া তাহা পদে পদে ভ্রমসঙ্কুল বটে। আধুনিক বিজ্ঞাননিকষে কষিয়া দেখিলে আরবী Anatomy বা Physiologyর দরও বড় বেশী দাঁড়াইবে, বোধ হয় না। তবে Anatomy ও Physiologyছাড়া আধুনিক ইউরোপীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের আর যে সমস্ত গৌরব—Histology, Pathology, Bacteriology, Pharmacodynamics—ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে সে সকলের নামগন্ধও নাই বলিলে হয়। আরবী শাস্ত্রে আছে কিনা, লেখক খবর লইবেন। না থাকিলে, বড়াই চলিবে না। আর এক কথা। মোস্‌লেম্ চিকিৎসাশাস্ত্র গ্রীক্ হিপক্রাটিস্ ও গালেনের চিকিৎসা-বিজ্ঞান হইতে সমুদ্ভূত। বেদের প্রমাণে ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় দেখাইয়াছেন, গালেন হিপক্রাটিসেরও পূর্ব্বে এদেশ বায়ুপিত্ত-কফরূপ ত্রিধাতুর তত্ত্ব অবগত ছিল। এই সংখ্যায় সমালোচিত "বুদ্ধদেব" গ্রন্থের ১৬৬—১৭০ এবং ২২০ হইতে ২২১ পৃষ্ঠা লেখক পাঠ করিয়া দেখিবেন। পূর্ব্বোদ্ধৃত বাক্যের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই আবার লেখক বলিয়াছেন, "রসায়নশাস্ত্রের আবিষ্কার ও উচ্চবিজ্ঞানে পরিণতি যে মোস্‌লেম্ পণ্ডিত-গণের দ্বারাই সম্পাদিত হইয়াছিল, এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত"। উক্ত ডাক্তার মহোদয়ের "হিন্দু রসায়নের ইতিহাস" প্রকাশিত হইবার পরে এখন অন্ততঃ ঐ 'আবিষ্কার' কথাটা প্রত্যাহার করিতে হইবে।

* Orই বোধ হয় ছাপার ভুলে of হইয়াছে। Anatomical Physiology জিনিসটাও বোধ হয় Human Physiology ছাড়া আর কিছু নয়।

৬১। **মহর্ষি খাজামইন উদ্দীন্ চিস্তী।** জীবনচরিত। শেখ ফজল্ করিম কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। একমি প্রিন্টিং ওয়ার্কস্। মূল্য ৷৵০ আনা। এই পুস্তকে এক মুসলমান সাধুর জীবনচরিত বর্ণিত হইয়াছে। "পরিত্রাণ কাব্য" লেখকের কবিত্বশক্তির পরিচয় পাইয়াছিলাম। তাঁর গদ্যও আমাদের কাছে বেশ লাগিয়াছে।

৬২। **হজরত মোহাম্মদ।** শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত প্রণীত। কালিকা যন্ত্র। মূল্য ।০ আনা। এখানি মহাপুরুষ মোহম্মদের সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত। রচনা যেমন বিশুদ্ধ, তেমনই মনোহর। লেখকও বিশেষজ্ঞ।

৬৩। **রাজা সীতারাম রায়।**

শ্রীযদুনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। বিশ্বকোষ প্রেস। মূল্য ১৷৹ সিকা। এ গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহে যদু বাবু যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। সংগৃহীত উপকরণের সন্নিবেশও-মোটের উপর বেশ হইয়াছে। সকল উপকরণের যথার্থ মূল্য নির্দ্দেশ করিবার সুযোগ আমাদের নাই। সকল প্রসিদ্ধ পুরুষের মত সীতারাম সম্বন্ধেও অনেক অলীক প্রবাদ লোকপরম্পরায় সঞ্চিত হইয়া থাকিবে। এমন অনেক গল্প লেখক নিজেও বর্জ্জন করিয়াছেন। কিন্তু যে সকল প্রবাদ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন অনেক স্থলেই তাহাদের কোনও প্রমাণ দেন নাই। যেখানে যেখানে বর্জ্জন করিয়াছেন, তারও সর্ব্বত্র বর্জ্জনের হেতু প্রদর্শন করেন নাই। এই ঐতিহাসিক বিবেকে গ্রন্থের বড় ত্রুটি আছে। ইহার অভাবে ইতিহাসে আর উপন্যাসে প্রভেদ থাকে না। বিশেষতঃ যাঁহারা এ পতিত জাতির লুপ্ত মহিমার উদ্ধরণে ধৃতব্রত, তাঁহাদের সঙ্কল্প থাকা উচিত, যেন অপাত্রে বা আকাশ-কুসুমে জাতীয় শ্রদ্ধা অর্পিত না হয়। যে তারা ধ্রুবতারা নয়, তার সাহায্যে দিঙ্‌নির্ণয় হয় না। সত্যমেব জয়তে নানৃতম্—এ শ্রুতি একাধিক ভাবে যথার্থ। কিন্তু প্রমাণ ছাড়া সত্যের প্রতিষ্ঠা কোথায়? যে ফুটনোট বা পরিশিষ্ট অন্য গ্রন্থে হয়ত নেত্রজ্বালা জন্মায়, ইতিহাসের তাহা অলঙ্কার। যদু বাবুর পরিশিষ্ট চতুর্গুণ বর্দ্ধিত হইলেও আমরা তুষ্ট বই রুষ্ট হইতাম না। গ্রন্থের দোষ কি, দেখাইলাম। কিন্তু ইহার গুণও অনেক আছে। এক অসাধারণ গুণ এই উন্নত ঐতিহাসিক কল্পনা ইন্দ্রজালবৎ [illegible]নিয়া-ধরে, যদু [illegible]। তাঁর রচন[illegible] [illegible]বন্ত, দ্রুত-[illegible]বাঙ্গালী পড়িতে শিখিয়াছে, তাহাকেই আমরা এ গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। সীতারাম রায়ের ইতিহাস বাঙ্গালীর বড় দুঃখের ইতিহাস।

৬৪। বুদ্ধদেব। শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, প্রণীত। বসু প্রেস। মূল্য ১৷৹ ও ২৲ টাকা। বৌদ্ধশাস্ত্রে সতীশ বাবু বস্তুতঃই "কৃতভূরিপরিশ্রম"। এই জন্যই তাঁর রচিত বুদ্ধরচিত আমরা সাদরে পাঠ করিয়াছি। অব্যবহিত পূর্ব্ব পুস্তকের সমালোচনায় যে কল্পনার উল্লেখ করিয়াছি, তার কিঞ্চিৎ অসদ্ভাব ছাড়া এ গ্রন্থে আর সমস্তই প্রশংসার যোগ্য। তবে বুদ্ধদেবের জীবনচরিত ও ধর্ম্মোপদেশ ইহার পূর্ব্বেও অনেক বাঙ্গালা পুস্তকে অল্লাধিক বিশুদ্ধি ও বিস্তারের সহিত বর্ণিত হইয়াছে। শিক্ষিত বাঙ্গালীমাত্রেই সে সকল পড়িয়াছেন। যাহার এখনও অভাব, সে বৌদ্ধদর্শনের ইতিহাস। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, দ্বিতীয় খণ্ডে সতীশবাবু বৌদ্ধ সাহিত্য ও দর্শনের ইতিহাস প্রকাশিত করিবেন। মাধ্যমিক মতই সে দর্শনের সারভাগ। শঙ্করের নির্গুণবাদ ও মায়াবাদ আর এই মাধ্যমিক বৌদ্ধের শূন্যবাদ ও সংবৃতিবাদে অত্যন্ত সাদৃশ্য আছে। দুয়ে জনজনক ভাব না থাকুক, পোষ্যপোষক ভাব আছে বলিয়া সন্দেহ হয়। এ সন্দেহ কতদূর সমূলক? পক্ষান্তরে, মোক্ষমূলরের মতে বৌদ্ধদর্শন পূর্ব্ববর্ত্তী উপনিষৎ ও সাংখ্যাদি দর্শন হইতেই সমুদ্ভূত। ভারতীয় অনাদি-জ্ঞান-প্রবাহ-তটে বৌদ্ধদর্শন অনেক তীর্থের এক তীর্থ মাত্র। পূর্ব্ব পূর্ব্ব

...কল তীর্থের জল আনিয়া এই তীর্থ যোগ করিয়া গিয়াছে। সতীশবাবুও বলেন, বুদ্ধদেব বেদ সাংখ্য যোগ বৈশেষিক হেতুবিদ্যা ও বার্হস্পত্য শাস্ত্রে "বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।" বুদ্ধদেবের প্রধান শিষ্য, মাধ্যমিকদর্শনের আদিপ্রবক্তা, মহাকাশ্যপও নব ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই সেকালের বিবিধ বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। পূর্ব্বলব্ধ এই সমস্ত জ্ঞানবিজ্ঞানের সংস্কার ...রে ইঁহাদের নবীন দর্শনে সংক্রমিত হইয়া থাকিবে, ইহা স্বাভাবিক মাত্র। যে জগন্মিথ্যাত্ববাদ বৌদ্ধদর্শন শাঙ্করদর্শন উভয়েরই প্রতিষ্ঠাস্থি, শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণের আপত্তিসত্ত্বেও উপনিষদেই তাহা প্রতিপাদিত দেখি। যে নির্গুণ শুদ্ধাদ্বৈতের সহিত মাধ্যমিক শূন্যের সাদৃশ্য ধরিয়াছি, তাহাও উপনিষদে আছে, মাধ্যমিকের চোরাই মালে নয়। যে অবিদ্যার [illegible] বুদ্ধদেব বার বার উপদেশ করিয়াছেন, উপনিষদে তাহা সুপ্রসিদ্ধ। নিরীশ্বর পরলোকবাদ কপিলে প্রথম। শেষ, প্রাচীন জগতের সে মহাপ্রতিবাদ— বেদ প্রামাণ্যতিরস্কার—লুথারও বাইবেল উড়ান নাই—সে প্রতিবাদও বুদ্ধদেব বার্হস্পত্য অর্থাৎ চার্ব্বাক মতে পাইয়াছিলেন। এইরূপ আরও অনেক আছে। বৌদ্ধদর্শনের কোন্ অংশ পুরাতন ...মের পুনরুল্লাস, কোন্ অংশ তার নিজস্ব, ...হা করিয়া দেখাইতে হইবে। "জগতের ... সমূহ পরস্পর সাপেক্ষ। কাহারও সত্তা নাই।" হেগেলের ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধের Dialectic এ প্রতিজ্ঞা পরি...র দেখিতে পাই। শূন্যবাদের ইহা ...ণস্বরূপ। শাঙ্কর দর্শনেও ইহার প্রয়োগ আছে। ইহারও কি বীজ উপনিষদে পাওয়া যায়? আশা করি, সতীশ বাবুর বৌদ্ধদর্শনেতিহাসে এ সকল বিষয়ের মীমাংসা থাকিবে। হিন্দুদর্শন হইতে পৃথক্ করিয়া বৌদ্ধদর্শনের ইতিহাস বুঝান যায় না।

৬৫। দেশের কথা। প্রথম ভাগ। শ্রীস রাম গণেশ দেউস্কর প্রণীত। মেট্‌কাফ প্রেস। মূল্য ১৲ টাকা। এ দেশের আর্থিক ও রাজনৈতিক অবস্থা এই পুস্তকে অতিনির্ম্মল হৃদয়স্পর্শিনী ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত দাদাভাই নৌরোজী, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত ও পরলোকগত মহামতি ডিগ্‌বি প্রভৃতির গ্রন্থ হইতে ইহার উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে। সে সকল গ্রন্থ যাঁহারা পড়েন নাই, অথবা যাঁহারা ইংরেজী জানেন না, তাঁহাদিগকে এই পুস্তক পাঠ করিতে বলি। লেখক বাঙ্গালা সাহিত্যে সুপরিচিত।

৬৬। উপাসনা, প্রার্থনা ও সাধুবচন। ডাক্তার [illegible]নাথ মিত্র প্রণীত ও সঙ্কলিত, মূল্য ১৷০। এই পুস্তকখানি অতি সুন্দর হইয়াছে। ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু মহাশয়ের পারিবারিক প্রার্থনায় যে সকল অভাব ছিল, তাহা ইহাতে দূর হইয়াছে। সঙ্গীত সহ পূর্ণাঙ্গ উপাসনা, পারিবারিক অনুষ্ঠান, শ্লোক সংগ্রহ, সাধুবচন—সব একাধারে সুন্দররূপে সংগৃহীত হইয়াছে। সাধু ভক্তদিগের নিকট এ পুস্তক বিশেষ রূপ আদৃত হইবে, আমরা আশা করি। আমরা পড়িয়া খুব উপকার পাইয়াছি।

৬৭। আদিম কায়স্থ সভা। ৩নং প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ষ্ট্রীট বাবু কুঞ্জলাল রায়, সম্পাদক। কলিকাতায় কায়স্থ সভা

যাহা করিতেছেন, এই আদিম কায়স্থ সভা তাহার বিরুদ্ধে চলিতেছেন। "কায়স্থ জাতি চারি বর্ণের অন্তর্গত নহে। ইহা একটী স্বতন্ত্র মৌলিক জাতি। কায়স্থ জাতি কর্ম্মিষ্ঠ বিদ্বান ও ধনী বলিয়া সর্ব্বত্র আদরণীয়। কায়স্থ জাতির উপর যে বিধি পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে ও আপাততঃ কায়স্থ জাতির ভিতর যাহা প্রচলিত আছে, তাহাই ঠিক ও সত্য।" এই প্রস্তাবের সত্যতা ১৯৫ জন সুপণ্ডিত দ্বারা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। এবং বহু সম্ভ্রান্ত কায়স্থও ইহাতে [illegible] দিয়াছেন। কায়স্থের [illegible] যে আন্দোলন চলিতে[illegible] প্রতিবাদ করা এই সভার উ[illegible] জানিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়া[illegible] সভার কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হ[illegible] বিধাতার নিকট প্রার্থনা।

৬৮। সংযম-শিক্ষা বা নিয়[illegible] সোপান। শ্রীচন্দ্রনাথ বসু এম-এ প্র[illegible] মূল্য ৵০। এই পুস্তক খানি অতি সু[illegible] হইয়াছে। বালকদিগের শিক্ষার পক্ষে [illegible] অত্যুত্তম পুস্তক।

প্রয়াণ।

(১)

বিশাল বারিধি-বক্ষে একটী করিয়া,
বীচিমালা ধীরে ধীরে, অনন্ত-সুনীল-নীরে,
উঠিয়া পড়িয়া যথা যায় মিলাইয়া,
তেমতি কালের চির ঘূর্ণ আবর্ত্তনে,
দিবা-মাস-ঋতু যত [illegible] হ'তেছে গত,
আপন গন্তব্য স্থল—অতীতের পানে।
সেই কাল-সূত্রে বাঁধা মানব জীবন।
আয়ু-সূর্য্য হৃদি হতে, অস্তমিত অলক্ষ্যেতে,
কেমনে হ'তেছে, কেহ না ভাবি কখন,
অন্তরে কল্পিত আশা করিছে পোষণ।

(২)

পূরব গগনে রবি অরুণ-বরণে
প্রকাশিল হাস্য মুখে, জগত ভাসিল সুখে,
কালের নিয়মে পুনঃ প্রতীচী গগনে,
ঢলিয়া পড়িবে ধীরি, সঞ্চারিবে বিভাবরী,
ঘোর বিভীষিকাময়ী, তম আবরণে।
এই নিশা অবসানে, আবার মেদিনী
হাসিবে পুলকে পুনঃ, হাসিবে জগত জন,
সম্ভাষিবে নবরবে করি শঙ্খধ্বনি।

(৩)

কিন্তু হায়, কেহ আর না লবে সন্ধান,
যে বর্ষটী পলে পলে, অনন্ত কালের কোলে,
অলক্ষ্যে, নীরবে, ধীরে করিছে প্রয়াণ।
তেমতি এ বিশ্বে হায় না কেহ আপন।
সবাই স্বার্থের পথে, চড়ি আশা-মনোরথে,
চলিছে সংসার-ক্ষেত্রে করি আস্ফালন।
শুধু সেই বিশ্বপতি করুণা-আধার,
মুছাইতে আঁখিজল দীনের আশ্রয়-স্থল,
অন্তিমে সবার তিনি শান্তি মূলাধার।
চরণে তাঁহার করি কোটি নমস্কার।

শ্রীআনন্দগোপাল ঘো[illegible]